গেল। বাবুরা আজ মেয়ে-পুরুষ সবাইকে মদ খাওয়াচ্ছে কি না—ঢালাও মদ, যে যত পারে; আমাদিগেও বললেক সুব যেতে—তো আমরা বললাম—যা তোরা, আমরা যাব পরে। আজ চার পহর রাতই ভাটি খোলা থাকবেক কি না, বাবু নিজে শুঁড়িকে বলে দিয়েছে। তার পর মুখ-আঁধার হতেই গেলাম দু'জনে ভুষণের কাছে। উয়ার খামারেই সব পাঁঠা জড় করেছে কি না! দু'কুড়ির চেয়ে বেশী তো কম নয়—নয় বাউল?"

বাউল ঘাড় নাড়িয়া তাহাতে সমর্থন করিল।

নফর কহিতে লাগিল,—"সারা গোয়ালটায় একেবারে তুলক্লাম লাগিয়ে দিয়েছে বেটারা। বললাম ভুষণকে—হেই দাদা! দু'টোকে ছেড়ে দাও। তোমাদের তো অনেক—দু'টো গেলে কেও ধরতে পারবেক নাই। তাছাড়া বাবুরা সন্ধ্যে থেকে বেসামাল-দমে মদ খেয়েছে সব; তার ওপর বাইনাচ হবেক এক পহর রাত থেকে—ভোর রেতে পূজো, কেও কিছু জানতেই পারবেক নাই। তো ভুষণকে তো জানেন, হাড়-বজ্জাত! একবারেই মাথা ঝাঁকিয়ে দিলেক। হাতে-পায়ে ধরলাম। মাথা নাড়িয়া কহিল—উহুঁ,—সেই ঝাঁকানি। তখন দু'জনে দশটা টাকা দিলাম। দিতেই বললেক—নিয়ে যা। আমাদের চিহ্নিত করা পাঁঠা—ঝপ করে চিনলাম। বললেক—মুখ বেঁধে নিয়ে যা—যেন না রা কাড়ে—তো মুখে দড়ি বেঁধে নিয়ে এলাম।"

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকা কোথায় পেলি?"

নফর কহিল—"আজ্ঞে আপনারই টাকা—পাঁঠার দাম থেকে কেটে আপনাকে খাজনা দেবার জন্যে দিয়েছিল সব আমাদের হাতে।"

বাউল কহিল—"ভুষণ আর সে ভুষণ নাই, আজ্ঞে—বাঁড়ুজ্যে বাবুর বাড়ীতে ঢুকে চামার হয়ে গেইছে একেবারে। বলে কি না—মা-কালীর নাম করে নিয়ে যাচ্ছিস তাই দিলাম, না হলে দিতাম ভাল করে। যেন মিন-পয়সায় দিয়েছে! কর-করে যে দশটা টাকা কোমরে উঠল তার কোন দাম নাই।"

পাঁঠা দুইটি আর্তনাদ করিতে লাগিল।

বাউল ও নফর হেঁট হইয়া মা-কালীকে এবং তার পর বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল—"আসি আজ্ঞে"—বলিয়া খুব সম্ভব ভাঁটির দিকে চলিয়া গেল।

বাবুলাল আসিয়া হাজির হইল—কোলে খোকা। বিশ্বেশ্বর কহিলেন—"কি দাদু, ইঞ্জো-পিঞ্জো করে এলে?"

বাবুলাল কহিল—"হাঁ-তো! খুব ইঞ্জো-পিঞ্জো করে এলাম দু'জনে"—পাঁঠার চীৎকার শুনিয়া পুলকিত হইয়া কহিল—"দিয়ে গেছে তা' হলে।"

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন,—"হাঁ।"

"লণ্ঠনটা লইয়া পাঁঠা দুইটার কাছে গিয়া ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল—নেহাৎ কচি! হাড়ে মাংস গজায়নি ভাল করে।"

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—"তা'ও অনেক কাণ্ড করে দিয়ে গেছে। অন্য সময় হলে নিতাম না কিছুতেই, কিন্তু এখন উপায় নাই বলেই নিতে হল। যাক্, এক কাজ কর দেখি! ফকরে কোথায় গেল? ওকে ডেকে এ দু'টোকে কিছু খেতে দেবার ব্যবস্থা কর। এসে থেকে চেঁচাচ্ছে। এসো দাদু, বাড়ী যাই"—বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন।

[ক্রমশঃ]

—ক্ষন্তব্য মে অপরাধ—

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কতই স্নেহের করিনি আদর ত্যজেছি উপেক্ষায়,
কত ভালবাসা বুঝিতে পারিনি হেলায় ঠেলেছি পায়।
ব্যথার ব্যথীকে ভাবিয়াছি পর এ ভুল করে কি কেহ?
কতই আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরে করিয়াছি সন্দেহ।
জীবনে এমন শত অপরাধ গোপনে হয়েছে জমা,
আজ অনুতাপ বিগলিত নীরে বারবার মাগি ক্ষমা।

নিকটে পাইয়া সুলভ ভাবিয়া ত্যজেছি মুহূর্তেতে—
মাতি' কোলাহলে সাড়া দিই নাই স্নেহের কলরবে।
[illegible] লই নাই, লইনি আশীর্বাদ
[illegible] দেখিয়া [illegible] সাধ।
[illegible] আদর বুঝিনি আর,
[illegible]

চোখের জলের মূল্য বুঝিনি না বুঝে দিয়েছি ব্যথা,
কোথাও ভুলেছি হিতৈষিগণে দেখাতে কৃতজ্ঞতা।
বহু আশা যারা পোষণ করেছে করেছি নিরাশ কত,
সাজির কুসুম পূজায় লাগিনি এমনি [illegible]।
নিশীথে সে সব মুখ মনে পড়ে [illegible]
[illegible]

বাল্মীকি ও কালিদাস

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

যে যুগে রামায়ণ মহাভারতের মত কাব্য রচিত হইত সে যুগের কাব্যও যেমন ছিল বিপুলায়তন, সে যুগের কবিগণও ছিলেন তেমনই বিপুলায়তন। একটি দানাকে কেন্দ্র করিয়া যেমন স্ফটিকের সকল দানা বাঁধিয়া উঠে, অথবা একটি জীবকোশকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য কোশের সমবায়ে যেমন একটি জীবদেহ গড়িয়া ওঠে, সে-যুগে তেমনই একটি বিশেষ প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগের ছোট-বড় সকল প্রতিভা একত্রে দানা বাঁধিয়া উঠিত; বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ বা ব্যাস-রচিত মহাভারত পাঠ করিলে মনে হয়, কয়েক দিনে বা কয়েক বৎসরে কোনও বিশেষ কবি এই বিপুলায়তন কাব্যগুলি রচিত করেন নাই; তাহারা বহন করিতেছে একটি বিপুল যুগের জীবন-ইতিহাস,—তাহারা রচিতও হইয়াছে একটি বৃহৎ যুগ ব্যাপিয়া। নলের পূর্ত্ত-প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া বিপুল বানরবাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা যেমন দক্ষিণ সাগরের উপরে বিরাট্ সেতুবন্ধ নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছিল, তেমনি করিয়াই বাল্মীকি এবং ব্যাসের প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া সে-যুগের অসংখ্য কবির ছোট বড় বহু সাহিত্য-সাধনার সমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে রামায়ণ ও মহাভারতের কাব্য-পরিধি। এইরূপ ছোট বড় বহু কবিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই বিপুলায়তন রামায়ণ ও মহাভারতের কবিরাও বিপুলায়তন।

যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন পর্য্যন্তও মানুষের সমাজ-বিবর্ত্তন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদগ্রতাকে প্রসব করে নাই; সমাজ ব্যবস্থায় তখন পর্য্যন্ত চলিতেছিল যৌথ-কারবারের লেন-দেন। কাব্যের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই সেই যৌথ-ব্যবস্থা। বড় বড় মহাজনের বিপুলায়তন বাণিজ্য-পোতের সহিত নিজেদের ভরা বাঁধিয়া দিয়া ছোট ছোট মহাজনেরা নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীতে ভাসিয়া পড়িতেন; এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভরা ডুবি হয় নাই; হাজার হাজার বৎসরের ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করিয়াও রামায়ণ মহাভারতের ভিতর দিয়া সে ভরা আসিয়া আমাদের বিংশ শতাব্দীর ঘাটে ভিড়িয়াছে।

কালিদাস এবং বাল্মীকির ভিতরকার যথার্থ সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কবিগুরু বাল্মীকির কবি-পুরুষা[illegible]ক এমনি করিয়া একটু বিশ্লেষ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়া[illegible]: কারণ, একান্ত সংশয়াতীত না হইলেও কালিদাস যেম[illegible]রয়া ঐতিহাসিক পুরুষ, বাল্মীকি আমাদের নিকটে তেমনতর ঐ[illegible]হাসিক নন। লৌকিক এবং অলৌকিক বহুবিধ কাহিনী এবং কিং[illegible]ন্তীর কুজ্ঝটিকার অন্তরাল হইতে বাল্মীকির যথার্থ কবি-সত্তাটিকে আজ আর খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। সুতরাং প্রথমেই সংশয় আসে, কাঁহার সহিত কাঁহার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়াছি। সুতরাং আমরা যখনই কবি বাল্মীকির কথা বলিব তখন বাল্মীকির কবি-সত্তা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা কি বুঝি সে প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাল্মীকি আমাদের নিকটে কোন বিশেষ ব্যক্তি-পুরুষ নহেন, তিনি রামায়ণিক যুগের কবি-প্রতিভার প্রতিনিধি-স্বরূপ।

রামায়ণ কাব্যখানিকে আজ আমরা [illegible] পাইতেছি* এইরূপে যে ইহা বাল্মীকি নামক কোনও একজন ঐতিহাসিক কবির লিখিত নয় এ সংশয়ের যৌক্তিকতা গ্রন্থের ভিতরেই এখানে-সেখানে নিহিত আছে। প্রারম্ভেই বাল্মীকির কবিত্বলাভের উপাখ্যান পাঠে বুঝিতে পারি, বাল্মীকি এই কাব্যাংশ লিখিত হইবার কালে ব্রহ্মা-নারদাদির সমশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার ভিতরকার অলৌকিক উপাদানের কথা বাদ দিলেও দেখিতে পাই, বাল্মীকি মুনির কবিত্বলাভের ইতিহাস তিনি নিজেই স্বহস্তে একটি তৃতীয় পুরুষের ন্যায় অমন ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ কথা মন খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে চাহে না। এরূপ সংশয়ের স্থল বহু রহিয়াছে। কিন্তু আমরা কোন ঐতিহাসিক তর্কের ভিতরে বর্ত্তমান আলোচনায় প্রবেশ করিতে চাহি না। মোটের উপরে আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার জন্য আদি-কবি বাল্মীকিকে আদি কবি-সমাজের মুখপাত্র বা প্রতিনিধিরূপেই গ্রহণ করিব, আমাদের নিকটে আদি-কবি-সমাজের যৌথরূপের অভিব্যক্তিই আদি-কবি বাল্মীকি।

কিন্তু এ-সত্ত্বেও একটা মুস্কিল থাকিয়াই যায়। বাল্মীকির বিরাট্ পক্ষপুটে যে শুধু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন কবিই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক অর্দ্ধপ্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন কবিও এই কবির দলে ভিড়িয়া গিয়া বেমালুম আত্মগোপন করিয়াছেন। সমস্যা ইঁহাদিগকে লইয়া। কিন্তু এ-সমস্যার কোন সমাধান নাই। পাণ্ডিত্যের কম্পাস্ এখানে দিক্-নির্ণয় করিতে সাহায্য না করিয়া দিগ্-ভ্রান্তও করিয়া তুলিতে পারে। সেই জন্যই পণ্ডিত-সুলভ ছাঁটকাটের ভিতরে আমরা বেশী যাই নাই। এ-ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই, আমরা আমাদের আলোচনায় বাল্মীকি সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি তাহার সমর্থনে রামায়ণের বিশেষ কোন অংশের একটি-আধটি দৃষ্টান্তের উপরই নির্ভর করি নাই,—গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ হইতে উদ্ধৃতির দ্বারা সেই কথা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এই প্রমাণ-প্রয়োগের ভিতরে অ-খাঁটি অংশ যেটুকু থাকিবার সম্ভাবনা তাহা দ্বারা আমাদের মূল বক্তব্য খুব শিথিল হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের ভারতবর্ষ গুরুবাদের দেশ; কিন্তু গুরুবাদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, গুরুর মাহাত্ম্য স্থাপনের দ্বারা শিষ্যের গৌরব কোথাও ম্লান হয় না,—আরও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে। আদি-কবি বাল্মীকিকে তাই পরবর্ত্তী কবিগণ কবিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস বাল্মীকির এই কবিগুরুত্বকে শ্রদ্ধা[illegible] স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং কালিদাসের ভাস্বর প্রতিভার উপরে বাল্মীকির শিষ্যত্বের ছাপ অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই শিষ্যত্বের ছাপ শুধু 'রঘুবংশে' নহে, কালিদাসের সমগ্র কাব্যসৃষ্টির ভিতরে ছড়াইয়া আছে; তাহারই বিশ্লেষণ আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কোনও কবি-প্রতিভার উপরে পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক কবি-প্রতিভার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন একটা সঙ্কোচ রহিয়া গিয়াছে, পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক প্রভাব গ্রহণের ভিতরেও যেন কবি-প্রতিভার প্রকাণ্ড একটা দৌর্ব্বল্য দেখা যায়।

---

* আমি বোম্বাই 'নির্ণয়-সাগর' প্রেস হইতে প্রকাশিত রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই সকল কথা বলিব।

কিন্তু প্রভাব-গ্রহণের ভিতরে এক দিকে যেমন একটা দুর্বলতা থাকিয়া যাইতে পারে, অন্য দিকে সে যে একটা দৃঢ় বলিষ্ঠতারও পরিচায়ক এ-কথাটা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অক্ষমের প্রভাব গ্রহণ কাব্যসৃষ্টির ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে হীন চৌর্য্যবৃত্তিতে ও অধম অধিকারীর ক্ষেত্রে তাহা দেখা দেয় অন্ধ অনুকরণের রূপে। কিন্তু সবলের ক্ষেত্রে তাহা দেখা স্বীকরণের রূপে। এই সার্থক স্বীকরণের ভিতরে প্রতিভার দৈন্য নাই, সক্রিয় সক্ষমতা আছে, তাহার গ্রহণ-শক্তি এবং পরিপাক শক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচয় রহিয়াছে।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই প্রাচীনের স্বীকরণের ভিতরে অবমাননা নাই, ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে। নিরন্তর এই স্বীকরণের ভিতর দিয়াই ত চলিতেছে ইতিহাসের অখণ্ড ধারা। বর্ত্তমান কাহাকে বলে? স্তূপীকৃত অতীতের আত্মাহুতির হোমশিখা হইতেই বাহিরিয়া আসে বর্ত্তমানের হেমদ্যুতি। অতীতের অসংখ্য 'গত কাল' গুলি নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে পৃথিবীর একটি 'আজে'র ভিতরে; নবপ্রভাতের অরুণিম অঙ্কুরটির শিকড় যতখানি পারে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে অতীতের সরস ভূমিতে; নতুবা সে শাখা বাহু ফুলফলে বাড়িয়া উঠিবার উপজীব্য সংগ্রহ করিবে কোথা হইতে?

মানুষ তাহার অখণ্ড সাধনার দ্বারাই চাহিতেছে তাহার চরম বিকাশ; 'কালে'র সঙ্গে 'আজে'র নিবিড় যোগের ভিতরেই রহিয়াছে মানুষের সকল সাধনার অখণ্ডতা। সাধনার যৌথত্বের ভিতরেই ত নিহিত চরম মঙ্গলের আদর্শ ও আশা। সর্ব্বপ্রকার স্বীকরণের ভিতর দিয়াই দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আমাদের সাধনা লাভ করে এই যৌথ রূপ। এক যুগ তাহার যুগব্যাপী সাধনায় মানুষের ইতিহাসকে যেখানে আগাইয়া দিয়া যায় সেই সাধনাকে স্বীকার করিয়া—অর্থাৎ আত্মসাৎ করিয়াই আরম্ভ হয় নবযুগের যাত্রা। এক যুগকে অপর যুগ এমনই করিয়া স্বীকার করিয়া—আত্মসাৎ করিয়া না লইলে মানুষের ইতিহাসের আদিযুগের আর শেষ হইত না,—কারণ, নতুবা প্রতিযুগকেই ত আবার প্রথম হইতে নূতন করিয়া যাত্রা সুরু করিতে হইত।

এক যুগের সাহিত্য তাই যুগের বুকে ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিয়া নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া যায় নব নব সম্ভাবনার বীজরূপে নবযুগের নবীন উর্ব্বর ক্ষেত্রে। বাল্মীকির বীজ তাই ফুটিয়া ওঠে কালিদাসের নূতন ফুলে, আবার কালিদাসের প্রতিভা ও সাধনা বীজরূপে ঝড়িয়া পড়িয়া নূতন নূতন ফুল ফুটাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিতে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে। বাল্মীকির ভাব ও ভাষা, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গিকে কালিদাস সগর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার উত্তরাধিকারকে প্রকৃতরূপে গ্রহণ এবং নিজের সাধনায় তাহাকে নানা ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া তোলা—এই খানেইত উত্তরাধিকারীর উত্তমাধিকারিত্ব। পিতৃপিতামহের সঞ্চিত ধন-রত্নকে গ্রহণ করিবার এবং ব্যবহার করিবার ক্ষমতা যাহার নাই সে ত অভাগ্য বঞ্চিত। কালিদাসের সে ক্ষমতা ছিল, তাই তিনি বাল্মীকির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী।

বাল্মীকির নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল দায়ভাগ গ্রহণ সত্ত্বেও কালিদাসের প্রতিভা জ্ঞানজ্যোতিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কালিদাস তাঁহার লব্ধ দায়ভাগের দ্বারা কোথাও আচ্ছন্ন বা বিমূঢ় নহেন; তাই তাঁহার 'অপূর্ব্ব বস্তু নির্ম্মাণ-ক্ষমা-প্রজ্ঞা' প্রতিভা তাঁহার নব নব উন্মেষশালী শক্তিতে অব্যাহত ভাবে নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আসলে কালিদাস বাল্মীকির সকল দানকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রকৃতির দানের মত। তাঁহার কবি-মানসের ভিতরে তাঁহার চারিপাশের জীবন—আলো-বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-প্রান্তর যেমন করিয়া গিয়া ভিড় করিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল, বাল্মীকির নিকট হইতে লব্ধ সকল চিন্তা, ভাব, আদর্শ তেমন করিয়াই তাঁহার কবি-মানসে বাসা বাঁধিয়াছিল। এই সকলের সমবায়ে গঠিত তাঁহার সমগ্র কবি-মানস; সেখানে স্বোপার্জ্জিত ধন এবং রিক্থ-সূত্রে লব্ধ ধনের ভিতরে কোনও ভেদ নাই। প্রাচীনের সকল উপাদান তাঁহার 'হৃদয়-বৃত্তির জারক-রসে জারিত' হইয়া একেবারে তাঁহার নিজস্ব হইয়া গিয়াছিল; ইহাকেই বলে প্রাচীনের স্বীকরণ। কালিদাসের কাব্য পড়িতে পড়িতে বহু স্থানে বাল্মীকির স্মরণ হয়; সে স্মরণ সর্বত্র 'বোধপূর্ব্ব'ও নহে, অনেক সময়ে 'অবোধপূর্ব্ব'; সব জড়াইয়া এই কথাই মনকে নাড়া দিতে থাকে যে, বাল্মীকির কাব্য কিরূপে কালিদাসের কাব্যে নব পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই নব-পরিণতির ভিতরে কালিদাস বাল্মীকির ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিকে অনেক স্থানে যে আরও গভীর এবং ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাল্মীকির নিসর্গ-প্রীতি ও কালিদাসের নিসর্গ-প্রীতি, বাল্মীকির উপমা-প্রয়োগ ও কালিদাসের উপমা প্রয়োগের ভিতরে হয়ত সাধর্ম্য বহু রহিয়াছে; কিন্তু বাল্মীকির ভিতরে যাহার আভাস রহিয়াছে কালিদাস তাহাকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছেন।

কালিদাস এবং বাল্মীকির ভিতরকার সম্পর্কটা অনেকখানি রবীন্দ্রনাথ এবং কালিদাসের সম্পর্কের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা 'বর্ষামঙ্গল' বা 'নববর্ষা' পড়িতে পড়িতে অবোধপূর্ব ভাবে কালিদাসের স্মরণ হইতে থাকে, এ যেন বীণার মূলতারে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট তারগুলির ঝঙ্কার। এ জাতীয় কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে আমরা সব সময়ে স্পষ্ট বুঝিতে পারি না রবীন্দ্রনাথ কালিদাস হইতে কি কি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কতটা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ-কথা মনে হয়, ভাবে, দৃশ্যে, ভঙ্গিতে, ভাষায় কালিদাস যেন রবীন্দ্রনাথের সহিত এক হইয়া অতি সহজ ভাবে মিলিয়া আছেন। কালিদাসের ভাব, চিত্র ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের ভিতরে গিয়া বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কালিদাসের 'মেঘদূত'কে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন, রচনা লিখিয়াছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা বা কবিতা পড়িলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, ইহা কালিদাস-রচিত পটভূমিকার উপরে সৃষ্ট একান্ত ভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'নবমেঘদূত'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মেঘদূতে' যে অতলস্পর্শ বিরহ, মানস-লোকের অগম পারে অবস্থিত যে পরম দয়িতের কথা বলিয়াছেন, অথবা সৌন্দর্য্যের অলকাপুরে যে পরিপূর্ণ প্রতিমার কথা বলিয়াছেন, তাহার আভাস কালিদাসের 'মেঘদূতে'র ভিতরে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা পড়িলে যেমন মনে হয়, কালিদাসের নিকট হইতে কবি অনেক গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই মনে হয়, কালিদাসের 'মেঘদূতে'র পটভূমিতে তিনি নূতন অনেক কিছু দিয়াছেন; 'মেঘদূতে'র ভিতরে তিনি যে

নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার দান; সে দান কালিদাসকেও মহিমান্বিত করিয়াছে, আপনাকেও মহিমান্বিত করিয়াছে। কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন যুগে নানা ভাবে দোলা দিয়াছে, এর ভিতরে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে যত বার 'কুমার-সম্ভবে'র দোলা লাগিয়াছে 'কুমার-সম্ভব'কে অবলম্বন করিয়া কবি তত বার নূতন ভাবে ও নূতন ভঙ্গিতে কাব্য-রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' (চিত্রা), 'মদনভস্মের পূর্ব্বে' ও 'মদনভস্মের পর' (কল্পনা), 'মরণ-মিলন' (উৎসর্গ), 'তপোভঙ্গ' (পূরবী), 'উদ্বোধন' (মহুয়া) প্রভৃতির পটভূমিতে দাঁড়াইয়া আছে যে কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' এ কথা অতি সহজ-বোধ্য; কিন্তু কালিদাসের পটভূমিতে ইহার প্রত্যেকটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দান, এবং রবীন্দ্রপ্রতিভাও এই কবিতাগুলির ভিতরে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। কালিদাসের যুগ-মানস এই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া কি পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহারই সুষ্ঠুতম পরিচয় রহিয়াছে এই কবিতাগুলির ভিতরে; ভাব ও প্রকাশ-ভঙ্গি উভয়ের ভিতরেই রহিয়াছে গভীর বিবর্ত্তন। এই বিবর্ত্তনের ভিতরেই সাহিত্যের ইতিহাসের অখণ্ড যোগ, এবং এইখানেই সাহিত্য সাধনার যৌথরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের সাধনার সকল সিদ্ধিকে—তাঁহার সকল ভাব ও ভাষাকে আমরা আজ আবার লাভ করিয়াছি তাঁহার উত্তরাধিকারী রূপে, সেই উত্তরাধিকারের ভূমিকায় যদি আমরা আনিতে পারি নব নব পরিণতি নিত্যনবীন সৃষ্টিতে তবে সেইখানেই ত রবীন্দ্রনাথের সকল দানের মর্য্যাদা।

কালিদাস বাল্মীকির নিকটে কোথায় কতখানি ঋণী এ কথা আলোচনার পূর্ব্বে কালিদাসের কবি-প্রতিভা এবং বাল্মীকির কবি-প্রতিভার ভিতরে যে পার্থক্য রহিয়াছে সে-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। এই কবি-ধর্ম্মের পার্থক্যের পশ্চাতে রহিয়াছে অনেকখানি যুগধর্ম্মেরই পার্থক্য। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বাল্মীকির রামায়ণ এবং কালিদাসের রঘুবংশের কথাই উল্লেখ করিতেছি। কালিদাসের 'রঘুবংশ' পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা কোন বিশেষ কবি কর্ত্তৃক রচিত, রামায়ণ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা রচিত নহে,—হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে ইহা শস্যের মত উৎপন্ন। কালিদাস আত্ম-সচেতন সুনিপুণ ভাস্কর, অতি যত্নে ধীরে-সুস্থে খুদিয়া খুদিয়া রঘুবংশের কাব্যগুলি তৈয়ার করিয়াছেন, তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া সুডৌল, সুদর্শন এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন,—দুর্লভ মণিমুক্তায় খচিত হইয়া কাব্য ঝলমল করিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের গভীর যোগে, বর্ণনার বিরল নৈপুণ্যে, বাগ্‌ভঙ্গির রমণীয় চাতুর্য্যে রঘুবংশ পরম আস্বাদ্য,—কিন্তু এ-কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, যে যুগের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন, সে যুগের জীবনের সহিত কবির কোন ঐকাত্ম্য বা নিবিড় পরিচয় ছিল না; ফলে কবিকে সমগ্র রঘুবংশকে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইয়াছে বিশুদ্ধ কবিকল্পনার সাহায্যে তাঁহার নিজের যুগের পটভূমিকায়। কিন্তু বাল্মীকি যেন সুনিপুণ কৃষক; তাঁহার যুগে একটি বিস্তীর্ণ ভূমিভাগের ভিতরে বৃহত্তর সমাজ-জীবনে ঘটিয়াছিল যত সোনার ফসল তাহাকেই বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কবি-কল্পনা দ্বারা আটি বাঁধিয়াছেন রামায়ণ কাব্যরূপে। রামায়ণের পত্রে পত্রে তাই সহজ জীবনের ভিড়; একটা বৃহৎ জাতির যুগান্তব্যাপী জীবন-ইতিহাস—তাহার কলমুখরতাই আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তোলে। বাল্মীকির কাব্যের ছোট বড় সকল সুখদুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, বীরত্ব-ভীরুতা একান্ত জীবন্ত হইয়াই দেখা দেয়; কালিদাসের 'অজবিলাপ'রূপ দীর্ঘ শোকবর্ণনাও বিলাপের নামে দীর্ঘ-বিলাস; সে বিলাসের নৈপুণ্যের ভিতরে চমৎকৃতির প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্য্য নাই।

পাশ্চাত্ত্য কাব্যবিভাগ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে পারি, বাল্মীকির কাব্য খাঁটি এপিক্ কাব্য—কালিদাসের কাব্য 'সাহিত্যিক এপিক্' বা কৃত্রিম এপিক্। রামায়ণের যুগ হইতে কালিদাস বহু দূরে নির্ব্বাসিত; সেখান হইতে কল্পনার মেঘদূত পাঠাইয়া তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না, আর সেই তথ্যকে কাব্যে রূপায়িত করিতে সমসাময়িক জীবনের পটভূমিকে বাদ দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাল্মীকির কাব্যে যে যুগ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা তাঁহার নিজেরই যুগ; সে যুগের বৃহত্তর সমাজ-সত্তা অপরূপ কাব্যমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে বাল্মীকির কবি-প্রতিভার ভিতর দিয়া; বাল্মীকির কাব্য তাই এত জীবন্ত।

বস্তুতঃ, কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের অন্য যতই মহৎ গুণ থাক, বাল্মীকি-রামায়ণের বলিষ্ঠ সজীবতা সেখানে বিরল। বাল্মীকি বর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্রের ন্যায় একটি প্রাণবন্ত চরিত্র আমরা কালিদাসের নিকট হইতে আশা করিতে পারি না। এই লক্ষ্মণ-চরিত্রকে এতখানি জীবন্ত করিয়া তুলিতে বাল্মীকির কোন কায়ক্লেশ বিপুল আয়োজন ছিল না,—অতি সহজ ভাবে—অতি সহজ ভাষায় তাহা মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে তাঁহার কাব্যে। রামের নির্ব্বাসনের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অতি রূঢ় ভাষায় তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছিল; ধর্ম্মজ্ঞ রাম নানা নীতিবাক্যে লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সে সকল ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ—

> তদা তু বদ্ধা ভ্রূকুটীং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নরর্ষভঃ।
> নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ। (অযো ২৩।২)

'নরর্ষভ লক্ষ্মণ দুই ভুরুর মধ্যে ভ্রূকুটী বদ্ধ করিয়া বিলস্থ রোষিত মহাসর্পের ন্যায় ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল';—এবং লক্ষ্মণ বলিল,—

> নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি। (ঐ ২৩।১১)

—'তুমি যতই ধর্ম্মবাক্য বল, এ-জাতীয় অবিচার সহ্য করিতে আমার কোনই উৎসাহ নাই,—এ বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।' এতখানি বলিষ্ঠতাকে কালিদাস এত সহজে এত ছোট এবং অল্প কথায় প্রকাশ কোথাও করেন নাই। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ এই প্রসঙ্গে রামকে বলিয়াছিল—

> ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
> নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাস্তম্ভহেতবঃ। (ঐ ২৩।৩১)

—'আমার এই দীর্ঘ বাহু দু'টি অঙ্গের শোভা বৃদ্ধির জন্ত হয় নাই,—আর ভূষণের জন্ত ধনু ধারণ করি নাই, বন্ধনের জন্ত অসি এবং স্তম্ভের

জন্য এই শরগুলি ধারণ করি নাই।'—কালিদাসের হাতে এই জাতীয় বীরত্ব-প্রকাশ বিপুল আয়োজনের অপেক্ষা রাখিত।

শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের জন্য রাম শোক করিয়া বলিতেছিল,—'আমি যখন অযোধ্যায় ফিরিব তখন মাতৃগণ এবং ভ্রাতৃগণ সকলেই আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে,—

সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্। (যুদ্ধ ১০১।১৭)

'তুমি বনে যাইবার কালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে, ফিরিবার কালে তাহাকে বিনা ফিরিলে কেন?' এ-শোকের ভিতর কবি-কল্পনার অতিশয়োক্তি নাই—এ-শোক এবং এ-শোকের ভাষা সবই বাল্মীকি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার চারিপাশে ছড়ান সাধারণ জনগণের জীবন হইতে।

রাবণবধের পর সীতা উদ্ধার করিয়া রাম সীতাকে সর্ব্বজনসমক্ষে বলিয়াছিল—

অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্য মে সফলঃ শ্রমঃ।
অদ্য তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ॥ (যুদ্ধ ১১৫।৪)

'আজ আমার পৌরুষ সকলে দেখিতে পাইল, আজ আমার সকল শ্রম সফল, আজ আমি প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ, আজ আমি নিজের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত'; কিন্তু—

প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া॥
তদ্ গচ্ছ ত্বামনুজানেঽদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্য্যমস্তি ন মে ত্বয়া॥
(ঐ ১১৫।১৭-১৮)

'তোমার চরিত্র আজ সন্দিগ্ধ, সুতরাং স্মিতমুখে আজ তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেও নেত্রাতুর লোকের নিকট প্রদীপের ন্যায় তুমি আজ আমার বিশেষ প্রতিকূলারূপে প্রতিভাত হইতেছ; সুতরাং হে জনকনন্দিনি, তোমাকে আমি এই অনুজ্ঞা দিতেছি,—এই দশদিক পড়িয়া রহিয়াছে—তুমি ইহার যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার, তোমাকে দিয়া আমার আর কোন কাজ নাই।' চরিত্রের এত বড় একটা কঠোরতাকে একখানি রূঢ় সরলতার ভিতরে প্রকাশ করিয়া কবিগুরু রামচন্দ্রকে একটি রক্তমাংসের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। সীতাও সরোষ রাঘবের এই রোমহর্ষণ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া গজেন্দ্র-হস্তাভিহতা বল্লরীর ন্যায় প্রব্যথিতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাষ্পপরিক্লিন্ন নিজের মুখ মার্জ্জনা করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে সীতাও উত্তর করিয়াছিল—

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে॥
(যুদ্ধ ১১৬।৫-৬)

'হে বীর, তুমি বীর হইয়াও প্রাকৃতজনের প্রাকৃত বাক্যের ন্যায় এরূপ শ্রোত্রদারুণ অসদৃশ বাক্য আমাকে শুনাইতেছ কেন? তুমি আমাকে যেরূপ জান, হে মহাবাহো, আমি সেরূপ নহি, তোমার শপথ—আমার নিজের চারিত্র দ্বারাই তুমি প্রত্যয় লাভ কর।' বেশ বোঝা যাইতেছে, এই সীতা পরবর্ত্তী কালের লোহা-বাঁধান সতীত্বের ফ্রেম নহে,—এ সতী হইলেও রক্তমাংসের নারী।

রামচন্দ্র যে-দিন দূর হইতে অতর্কিত ভাবে শর সন্ধান করিয়া বালীকে হত্যা করিয়াছিল, সেদিন বালী ভূমি-নিপতিত হইয়াও সগর্ব্বে রামচন্দ্রকে যে পরুষ বাক্য বলিয়াছিল, বাল্মীকি তাহাকে 'প্রশ্রিতং ধর্ম্মসহিতম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বালী বলিয়াছিল,—

ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা।
প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিধর্ম্মণা॥
শঠো নৈকৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশ্রিত-মানসঃ।
কথং দশরথেন ত্বং জাতং পাপো মহাত্মনা॥
ছিন্নচারিত্র্যকক্ষেণ সতাং ধর্ম্মাতিবর্ত্তিনা।
ত্যক্তধর্ম্মাঙ্কুশেনাহং নিহতো রামহস্তিনা॥
(যুদ্ধ ১৭।৪২-৪৪)

'হে কাকুৎস্থ, তোমাকে নাথরূপে লাভ করিয়া বসুন্ধরা যে সনাথা হইয়াছে তাহা বলা যায় না,—বিধর্ম্মী পতি দ্বারা শীলসম্পূর্ণা প্রমদা যেমন কখনও পতিযুক্ত হয় না। তুমি শঠ, পরাপকারী, ক্ষুদ্র, তোমার মন মিথ্যাশ্রিত; দশরথের ন্যায় মহাত্মা কর্ত্তৃক তোমার মত পাপ কিরূপে জাত হইল? চারিত্র্যের গলবন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, সৎ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়াছে, ধর্ম্মের অঙ্কুশকে ত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ একটি রামহস্তী দ্বারা আমি আজ হত হইলাম।' রামচন্দ্রের প্রতি এই জাতীয় ভৎসনাকে 'প্রশ্রিতং বাক্যং ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্' বলিয়া অভিহিত করিবার ভিতরে যে সংস্কারবর্জ্জিত স্বাধীন দৃষ্টি রহিয়াছে তাহাই রামায়ণ কাব্যখানিতে একটা বলিষ্ঠতা দান করিয়াছে।

এইরূপ পৌরুষ বা বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা বা চরিত্রের বর্ণনায়ই যে বাল্মীকির বলিষ্ঠতার প্রকাশ তাহা নহে। সহজ হাস্য-কৌতুক বা শোক-হর্ষ প্রকাশের ভিতরেও এই সজীব বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ছোট দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। হনুমান লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; বানরগণ হনুমানের নিকটে সীতার সংবাদ জানিতে পারিয়া 'মদোৎকট' হইয়া মধুপানের মানসে সুগ্রীব-রক্ষিত মধুবনে প্রবেশ করিল। হর্ষের আতিশয্যে—

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ
নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ
প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ॥
পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি
পরস্পরং কেচিদতিক্রবন্তি।
দ্রুমাদ্দ্রুমং [illegible]চিদভিদ্রবন্তি
ক্ষিতৌ ন[illegible]গ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ॥
[illegible]
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসংপতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি
রুদন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি॥
তুদন্তমন্যঃ প্রণুদন্নুপৈতি
সমাকুলং তৎ কপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ॥

কেহ কেহ গান ধরিয়া দিল, কেহ কেহ তুমুল হাস্য আরম্ভ করিয়া দিল; কেহ কেহ নৃত্য আরম্ভ করিল, কেহ কেহ প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল;—কেহ কেহ পাঠ শুরু করিল, কেহ কেহ ঘুরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ লম্ফ দিতে লাগিল, কেহ কেহ প্রলাপ বকিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পর পরস্পরকে ভর করিতে লাগিল, কেহ কেহ পরস্পরে গালমন্দ আরম্ভ করিয়া দিল,—কেহ কেহ গাছ হইতে বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল, কেহ কেহ পাহাড়ের চূড়া হইতে ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ উন্মত্ত আবেগে ভূমিতল হইতে গিয়া বড় বড় বৃক্ষের অগ্রভাগে পড়িতেছে, যে গান করিতেছে তাহার কাছে কেহ পরিহাস করিয়া আগাইয়া যাইতেছে, যে রোদন করিতেছে তাহার কাছে কেহ তীব্রতর রোদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে;—আবার একজনে যাহাকে নানা ভাবে পীড়িত করিতেছে অপরে তাহাকে বিনোদন করিতে আসিতেছে; এইরূপে সেই সমস্ত কপিসৈন্যই একেবারে সমাকুল হইয়া উঠিল; সেখানে এমন কেহ ছিল না যে, মত্ত হইয়াছিল না,—এমন কেহ ছিল না যে দৃপ্ত হইয়াছিল না।' হর্ষোন্মত্ত কবিগণের এই চিত্রটি বেছন্দ হৈ-হুল্লোড় এখানে একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বনরক্ষক সুগ্রীবের বৃদ্ধ মাতুল দধিবক্ত্র কপি এই প্রমত্ত বানর-গণকে বারণ করিতে গিয়া যে লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছিল তাহা আরও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের ভিতরে এরূপ বেসামাল বেছন্দ প্রমত্ততার স্থান নাই,—সেখানে সকলই পরিপাটি।

আসলে কালিদাসের যুগটাই পরিপাটি যুগ, সেখানে বেসামাল ভাবে হাসিতে পারা বা কাঁদিতে পারার সুযোগ কম। প্রিয়জনের জন্য শোক করিতে হইলেও নিখুঁত শ্লোকসমষ্টির ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া ইনাইয়া-বিনাইয়া বিলাপ করিতে হয়। বাল্মীকির যুগটায় কোন দিক হইতেই এরূপ আঁটসাট ছিল না; তখনও সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম তরল বায়বীয় অবস্থাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া একেবারে শক্ত শীতল কাঠামবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে নাই। সেটা ছিল বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সর্ব্বত্রই একটা গড়িয়া উঠিবার যুগ। কালিদাসের যুগ একটি বিলাসী সামন্ততন্ত্রের যুগ। সেই সামন্ততন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-জীবন কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতেছিল নাগরিক জীবনের স্বচ্ছন্দ বিলাসে। সে যুগে 'উদ্যানলতা' এবং 'বনলতার' ভিতরকার ভেদ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং যেখানে

দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।

সেখানেও কবির নাগরিকজনসুলভ বৈচিত্র্যপ্রয়াসী সুকুমার রস-বোধেরই পরিচয় রহিয়াছে। কবির বৈচিত্র্যপ্রয়াসী নাগরিক রসিক মনের পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 'মেঘদূতে'র ভিতরে। উদ্‌গৃহীতালকান্তা পথিক-বনিতাগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার লোভ, জনপদ-বধূগণের [illegible] প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দ্বারা পীয়মান হইবার লোভের ভিতর এই নাগরিকবৃত্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আসলে কিন্তু কবির পরিচয় 'বিদ্যুদ্দামং ললিতবনিতা'গণের সহিত; এবং কবি পথিকবধূ এবং জনপদবধূগণের কথা যতই বলুন, মেঘকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন,—

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি। মেঘদূত (২৭)

'তুমি উত্তর দিকে প্রস্থান করিয়াছ, সুতরাং তোমার পথ একটু বক্র হইবে,—তথাপি উজ্জয়িনীর সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখ হইও না, সেখানকার পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিত লোলাপাঙ্গের সহিত যদি রমণ না কর তবে তুমি চক্ষুদ্বারাই বঞ্চিত হইলে!'

বাল্মীকি যুগ আরণ্য কৃষিসভ্যতার যুগ। তখন পর্য্যন্তও মানুষ বন কাটিয়া চারিদিকে নগর পত্তন শেষ করে নাই,—মানুষের জনপদ-জীবনের সহিত আরণ্যজীবনের যোগসূত্র তখন পর্য্যন্ত ছাপিত হয় নাই। এই জনপদজীবন এবং আরণ্যজীবনের মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছে সকল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই মিলন এবং মিলনজাত বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিবর্ত্তনের ইতিহাসই রহিয়াছে বাল্মীকির কাব্যে। অরণ্যের বিরাট বিরাট শালবৃক্ষ কাটিয়া তখন জনপদের পত্তন করিতে হইত; গৈরিক ধাতুপূর্ণ পার্ব্বত্য ভূমিতে জনবসতির ব্যবস্থা করিতে হইত। বাল্মীকির কাব্যের উপমাগুলির ভিতরেই এই অর্দ্ধ-আরণ্য জীবনের পরিচয় রহিয়াছে। মৃত দশরথের বর্ণনা করিতে কবি বলিতেছেন;

তমার্ত্তং দেবসঙ্কাশং সমীক্ষ্য পতিতং ভুবি।
নিকৃত্তমিব সালস্য স্কন্ধং পরশুনা বনে। (অ ১২।২২)

ভূমিতে পতিত আর্ত্ত দেবসঙ্কাশ দশরথ যেন কুঠারচ্ছিন্ন বনের শালস্কন্ধ। লঙ্কার বর্ণনা দিতেও কবি বলিতেছেন—

মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং
শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্।
নানাতরূণাং কুসুমাবকীর্ণং
গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্। (সু ৭।৬)

বহুরত্নকীর্ণা লঙ্কা যেন নানা তরুগণের কুসুমাবকীর্ণ ধূলিকীর্ণ গিরিশৃঙ্গ। এই আরণ্য-জীবনে মানুষকে সর্ব্বদা হিংস্র আরণ্য পশুগণের সংস্পর্শে আসিতে হইত; বাল্মীকির উপমাগুলির ভিতরে তাই বনের সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ, সর্প প্রভৃতি চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে। বন্য মানুষের সহিতও যেমন তখন জনপদবাসী মানুষের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আরণ্য পশুগণকেও মানুষ তখন পর্য্যন্ত আয়ত্তে আনিতে পারে নাই। বাল্মীকির বর্ণনায় দেখিতে পাই, ক্রুদ্ধ বীরগণ অনেক স্থানেই 'নিশ্বসন্ ইব পন্নগঃ'। রাজগৃহ হইতে বহির্গত রামচন্দ্র 'পর্ব্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ' (অ ১৬।২৬); বিজন পার্ব্বত্য বনে নির্ভয়ে শায়িত রামলক্ষ্মণ দুই ভাই—

ততস্তু তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ
মহাবনে রাঘব-বংশ-বর্দ্ধনৌ।
ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেয়তু-
র্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ। (অ-৫৩।৩৫)

গিরিসানুগোচর দুইটি সিংহের ন্যায় মহাবল দুই ভাই নিশ্চিন্ত ভাবেই নিদ্রামগ্ন ছিল। বনমধ্যে বাষ্পশোকপরিপ্লুত রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণ যখন কথা বলিয়াছিল তখন—

অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্। (আরণ্য ২।২২)

...রথকে দেখিয়া কৌশল্যা এবং সুমিত্রা যখন শোক করিতে-...খন তাহারা—

করেণব ইবারণ্যে স্থানপ্রচ্যুতযূথপাঃ। (অ-৬৫।২১)

যূথপতি মহাগজ স্থানভ্রষ্ট হইলে অরণ্যে অসহায়া করেণুর মত। অশোকবনে সীতাকে রাবণ যখন কিছুতেই বশে আনিতে পারিতে-ছিল না তখন সে দুরন্ত রাক্ষসীগণকে আদেশ দিয়া গিয়াছিল,—

তর্জ্জনৈনাং তর্জ্জনৈর্ঘোরৈঃ পুনঃ সান্ত্বৈশ্চ মৈথিলীম্।
আনয়ধ্বং বশং সর্ব্বা বন্যাং গজবধূমিব। (আর ৫৬।৩১)

'এই মৈথিলীকে কখনও ঘোরতর্জ্জনের দ্বারা, পুনরায় সান্ত্বনা দ্বারা বন্যা গজবধূর মত বশে আনয়ন কর।' তখন—

সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসীবশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা। (ঐ ৫৬।৩৪)

হনুমান প্রথম যখন লঙ্কাপুরীতে সীতাকে দেখিয়াছিল তখন সীতাকে দেখাইতেছিল—

গৃহীতাং লাড়িতাং স্তম্ভে যূথপেন বিনাকৃতাম্।
নিশ্বসন্তীং সুদুঃখার্ত্তাং গজরাজবধূমিব। (সু-১১।১৮)

সীতা একটি গজরাজবধূর ন্যায়,—সে ধৃত হইয়াছে, উৎপীড়িত হইতেছে, যূথপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—আর গভীর দুঃখে আর্ত্ত হইয়া শুধু নিশ্বাস ফেলিতেছে। রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা সীতার কোন সন্ধান লাভে ব্যর্থকাম অবসাদগ্রস্ত রামের কথা বলিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,—

'পঙ্কমাসাদ্য বিপুলং সীদন্তমিব কুঞ্জরম্' (অ-৬১।১৩) *

কর্দ্দমের মধ্যে যেন বিষণ্ণ একটি বিপুল হাতী। রাবণ এক স্থানে শূর্পণখাকে বলিয়াছিল—

অযুক্তচারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্।
বর্জ্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ। (আ—৩৩।৫)

'অযুক্তচার দুর্দর্শ অস্বাধীন রাজাকে সকল লোকে সেইরূপই বর্জ্জন করে, যেমন হস্তিগণ দূর হইতেই নদীপঙ্ককে এড়াইয়া চলে।'

এই সকল বর্ণনা এবং উপমাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হইবে, এগুলির ভিতরে কবির সমসাময়িক আরণ্য জীবনের ছাপ পড়িয়াছে। [ক্রমশঃ।

* উবাচ রামং সংপ্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্ন ইব দ্বিপঃ। (কি-১৮।৪১)
গাঙ্গে মহতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্। (সু-১০।২৮)

—শাশ্বতী—

শ্রীশান্তি পাল

আমি যে গো সৌন্দর্য্য-পিয়াসী,
কল্পনা-বিলাসী,
ঐকান্তিকী পূজারী তাহার।
তাই বার বার
বাঁধিয়া রাখিতে চাহি সৌন্দর্য্যের প্রাণের শৃঙ্খলে
অন্তরের গূঢ় অন্তস্তলে।
তাই লক্ষ্য মোর, এ জীবন-তন্ত্রী যেন কোন দিন
বেতালা বেসুরা নাহি বেজে বেজে চলে।
বন্ধু বল, তুমিও কি এই ভালবাস?
বল বল সত্য ক'রে মোরে
এক আদর্শের 'পরে
বাজাতে কি চাহ তব বক্ষ-লগ্ন বীণ,
হে পান্থ নবীন?
তবে কেন জীবনের যত কিছু কুৎসিত পঙ্কিল,
খর্ব্বতা অমিল,
আনো ধরণীতে সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টির ভঙ্গীতে
অস্পষ্ট ইঙ্গিতে?
তবে কেন আনো এই ঘোর অনাচার
বীরাচারী বৈদগ্ধ্যের তান্ত্রিক আচার?
কি সুর তুলিতে চাহ কণ্ঠে তব অভিনব
শুনাইতে বিশ্বজনে যুগ-সন্ধিক্ষণে?
বন্ধু, চেয়ে দেখ দূর দিগন্তের পানে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা যত অবিরত
লিখিতেছে কত কাব্য কত গীত-গান
রাত্রি দিনমান,
কি অপূর্ব্ব ছন্দের বন্ধনে
ঝঙ্কারিয়া নব নব সুরের স্পন্দনে;
আকাশের পাতায় পাতায় নক্ষত্রের গায়
জোছনায়, কি সঙ্গীত লিখে লিখে যায়!
প্রভাতের অরুণ কিরণে গলিত হিরণে
বিশ্বতালে তাল দিয়ে তারা সবে চলে দলে দলে।
তুমি কোন্ ছলে সরে যেতে চাও
ভেঙে-চুরে যুগ-যুগ সাধনার ধনে
উদ্দাম উধাও?
বন্ধু, চেয়ে দেখ বনানীর শ্যাম স্নিগ্ধাঞ্চলে
তরঙ্গিত সমুদ্রের জলে;
দক্ষিণের মলয় হিল্লোলে;
নির্ঝরের স্বপ্নময় অনন্ত কল্লোলে;
চুপে চুপে রূপে রূপে
জন্ম-মৃত্যু চলিতেছে রেখে রেখে তাল
রাত্রিদিন বিরাম বিহীন,
চির তৃপ্তি চির শান্তি দানে
বল কার নিগূঢ় আহ্বানে!
হে ভ্রান্ত পথিক, এস ফিরে
জীবনের মন্দাকিনী তীরে।
ঝঙ্কারিয়া তোল শান্ত সুর—অপূর্ব্ব মধুর।

ইংরেজি সাহিত্য ও আমরা

বুদ্ধদেব বসু

আজ প্রায় দু'শো বছর হ'তে চললো আমরা ইংরেজের তাঁবেদার হ'য়ে আছি। এ-লজ্জা আমাদের পক্ষে যত বড়ো, ইংরেজের পক্ষে তার চেয়েও বেশি। কেননা, এর ফলে আমাদের ক্ষতি হয়েছে স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, স্বাচ্ছন্দ্যে, ইংরেজের ক্ষতি হয়েছে মনুষ্যত্বে। ভারতবর্ষের দুর্গতি ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতার পর পাতা কালো ক'রে দিচ্ছে; যে-পা দিয়ে ভারতবর্ষকে সে চেপে আছে সে-পা নিয়ে সে আর চলতে পারছে না, কেননা, চলতে গেলে পা সরাতে হয়। যেখানে আছে সেইখানেই কায়েমি হবার প্রচণ্ড চেষ্টায় তার মৌল মহিমা নষ্ট হচ্ছে দ্রুতবেগে। ভারতবর্ষের মাটিতে ইংলণ্ড তার আপন সত্যকে, আপন মহত্বকে শরশয্যায় শুইয়েছে, এ-কথা আজকের দিনে ইংরেজের কাছেও আর চাপা নেই। চার দিক থেকে নানা লক্ষণে এটা স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিচ্ছে যে ভারতবর্ষের ভার ইংরেজ আর বইতে পারছে না। ভারতবর্ষের চা পাট ধান গম তেল তুলোর লোভে ইংলণ্ড তার অন্তরকে ফতুর ক'রে ফেললো। এ-বাঁধন না ছিঁড়লে ইংলণ্ডের স্বস্তি নেই, পৃথিবীর শান্তি নেই।

মনে করা যাক এমন দিনের কথা যেদিন ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন আর স্মৃতিকথাও নয়, ইতিকথা। সেদিন ইংলণ্ডকে আমরা স্মরণ করবো তার কোন্ কীর্তিতে? এত বড়ো ইংরেজ জাতের কোন চিহ্ন, কোন পরিচয় এ-দেশে র'য়ে গেলো যা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না? ইংলণ্ডের স্থাপত্য বলতে তো কলকাতার কুৎসিত নির্বোধ প্রাসাদশ্রেণী আর নয়াদিল্লির জ্যামিতিক দুঃস্বপ্ন—ধুলোয় মিশে যাবার অনেক আগেই মানুষের মন থেকে তা মুছে যাবে। ইংলণ্ডের ভাস্কর্যের যা নমুনা কলকাতার ময়দানে পাওয়া যায় তার শিল্পমূল্য অতি সামান্য। চিত্রকলার কোনো নিদর্শন দেখতে পাই না, তার সংগীত আমাদের প্রাণকে ছোঁয়নি। মিশনারিরা মরীয়া হ'য়ে লাগলেন, তবু সরকারি খৃষ্টধর্ম এ-দেশে শিকড় মেলতে পারলো না; নামে যারা খৃষ্টান হ'লো তাদেরও মন বাঁধা রইলো পুরোনো দেব-দেবীদের কাছে। ইংলণ্ডের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি নিয়ে আমরা প্রথমটায় খুব খানিকটা নাচানাচি করেছিলুম, কিন্তু আজকের দিনেই সে-বিষয়ে আমাদের মোহমুক্তি হয়েছে, অতএব স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে তার প্রভাব খুব কি থাকবে? যদি বলা যায় যে সমাজ-সংস্কার ইংরেজের কীর্তি সে-কথাও ঠিক নয়, কেননা কোনো বড়ো রকম সংস্কারে হাত দিতে ইংরেজ কখনো ভরসা পায়নি, সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদেরই মহাপ্রাণ পুরুষদের আগ্রহে, আমাদেরই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায়। আর রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ ইত্যাদি কলকব্জা তো ইংরেজের একচেটে সম্পত্তি নয়, ওতে সমগ্র মানবের সমান অধিকার। এক জাতি অন্য জাতিকে তা দান করতে পারে না। ও-সব এ-দেশে আসতোই; এশিয়ার যে-সব দেশ কখনো মানচিত্রে লাল হয়নি সে-সব দেশেও গেছে।

তাহ'লে বাকি রইলো কী? মোগল রেখে গেছে তার স্থাপত্য, তার চিত্র, তার ধর্ম—রেখে গেছে সংগীতে হিন্দু-মুসলিম মিলনের চিরন্তন সুর। আর ইংরেজ? ইংরেজের কী আছে?

ইংরেজের আছে তার সাহিত্য। ইংরেজ সবচেয়ে বড়ো তার সাহিত্যে। সেই সাহিত্যই ভারতবর্ষের তীর্থে তার শ্রেষ্ঠ দান, তার ঐতিহাসিক দান। ইংরেজি সাহিত্য একমাত্র বিলেতি বস্তু যা আমাদের রক্তে মিশেছে। তার প্রভাব আমাদের সাহিত্যে, আমাদের চিন্তায়, আমাদের কর্মে, আমাদের ভাষায়। এইটেই আমাদের দেশে ইংরেজের একমাত্র স্থায়ী স্বাক্ষর। এ-স্বাক্ষর কখনো মুছবে না, ইংরেজ চ'লে যাবার পরেও না, যখন তাকে আর আমরা ইংরেজের ব'লে চিনতে পারবো না, তখনও না।

এ-কথা বিশেষ ভাবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে সত্য। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম পশ্চিমি হাওয়া বইতে শুরু করে। সে তো হাওয়া নয়, ঝড়! আমাদের দড়িদড়া প্রায় উড়িয়ে নিয়েছিলো। ব্রাহ্মধর্ম প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলো, তারপর বুক পেতে দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ। কিসের সে-উল্লাস, যার আবেগে আমরা আপন সত্তাটুকু পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে বসেছিলুম? সেটা সাহিত্যরসেরই উল্লাস। বাংলাদেশ সাহিত্যের দেশ, সাহিত্যবোধের শক্তি আমাদের মধ্যে সহজাত। আমরা কল্পনাপ্রবণ, আবেগমুখর, ভাব-বিলাসী। তাই ইংরেজি সাহিত্য আমাদের খুব সহজে এবং খুব শক্ত ক'রেই ধরেছিলো। আসলে আমরা শেলি শেক্সপিয়রেই মাতাল হয়েছিলুম, শেরি-শ্যাম্পেন শুধু ছুতো। আমাদের ঠাকুরদা'দের সময়ে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা মিলটনের দুটো-একটা সর্গ কিংবা শেক্সপিয়রের আস্ত একটা অঙ্ক অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। চরম উদাহরণ মধুসূদন, যিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রেমে প'ড়ে ইওরোপের সব ক'টা ভাষা শিখে ফেললেন, কিন্তু আপন মাতৃভাষারই মর্মস্থলে পৌঁছতে পারলেন না! এত বড়ো সাহিত্যের সম্পদ না নিয়ে এলে ইংরেজ কি আর এত সহজে বাংলাদেশের চিত্তকে দখল করতে পারতো!

আমরাও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলুম। যাত্রাগান কবিগান পাঁচালিতে আমাদের মন আর ভরছিলো না, আর ঠিক সেই সময়টায় আমাদের স্বদেশী সাহিত্য অনেকটা নিস্তেজ হ'য়েও পড়েছিলো। যখন আমাদের সমস্ত প্রাণ-মন কোনো একটা নতুনকে আকাঙ্ক্ষা করছিলো তখন এলো ইংরেজ তার বিশাল বিচিত্র সাহিত্য নিয়ে। আনন্দে আমরা আত্মহারা হলুম। প্রথম প্রণয়ের সে-উচ্ছ্বাস এখন আর নেই, ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সাহিত্য-সভায় আমাদের আসন পেতেছেন এবং আমাদের নিজস্ব সম্পদ দিন-দিন বাড়ছে, তবু ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা এখনো আমাদের মজ্জাগত। ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি, আমরা নিয়েছি—সেটা আমাদেরই শ্রদ্ধার, বিনয়ের, সত্যশীলতার পরিচয়। ইংরেজ যেখানে সত্যি বড়ো, সেখানেই তাকে আমরা গ্রহণ করেছি। ইংরেজ বলতে আমরা ক্লাইভ স্ট্রীটের বড়ো সাহেবকে বুঝি না, নয়াদিল্লির রাজপ্রতিভূকেও না, চেম্বরলেন চর্চিলকেও না, ইংরেজ বলতে আমরা শেলি কীটস ডিকেন্স হার্ডিকেই বুঝি। যে-সব রক্তবর্ণ দর্পিত শ্লেষ্মাভারাক্রান্ত সওদাগর ইংরেজের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়, তারা যে শেলি-কীটসেরই স্বজাতি, এ কথা, সত্যি বলতে, আমরা মনেই আনতে পারিনে। কেননা, তারা আমাদের কেউ নয়, একটা ধূসর বিবর্ণ সুদূরতায় তারা অধিষ্ঠিত আর শেলি-কীটস আমাদের ভাবলোকের, আমাদের স্বপ্নলোকের,

আমাদের আপন। যে-সব ইংরেজ এ-দেশে এসে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে, তাদের কাছে ঐ কবিদের অস্তিত্বই নেই, কিন্তু সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে ব'সে তাঁদের আমরা পেয়েছি।

এখানে ইংরেজের উপর আমাদের জিৎ। ওদের ভালোকে আমরা নিয়েছি, কিন্তু ওদের ধারণা হ'লো যে আমাদের কোনো-কিছু ভালো ব'লে স্বীকার করলে ওদের মান যাবে, জাত যাবে, রাজত্ব যাবে। প্রথমটায় এ-রকম ছিলো না, আমাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন, সামাজিক ও মানবিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে প্রথমে ওদের ঔৎসুক্যই ছিলো, নয়তো সামান্য এক স্কচ ঘড়িওলার মধ্যে সমস্ত ব্রিটিশ জাতির মহত্ত্ব মূর্ত হয়েছিলো কেমন করে। কিন্তু ডেভিড হেয়ারের ক্ষণবসন্ত একটি-দুটি কোকিলেই নিঃশেষ হয়ে গেলো, তার পরেই মেকলে নিয়ে এলেন দীর্ঘ শুষ্ক তৃষিত তাপিত ইংরেজ শাসন। সত্যাচারকে পদচ্যুত করে অত্যাচারকে মুকুট পরালেন মেকলে। সে-অত্যাচারের ফলা আমাদেরই আত্মিক সর্বনাশের জন্য শানানো হয়েছিলো, কিন্তু লাগলো গিয়ে তাঁরই স্বজাতির আত্মায়। মেকলে যেদিন বললেন যে সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্য একত্র করলে যা হয়, তার চেয়ে ইওরোপের যে-কোনো লাইব্রেরির একটি মাত্র শেলফ অনেক বেশি মূল্যবান, সেদিনই ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি ভিতরে-ভিতরে ফেটে গিয়েছিলো। সব মিথ্যাই আত্মঘাতী, এ-মিথ্যাও তাই। মেকলের চাতুর্য থেকে শুরু করে বেভর্লি নিকলস-এর মূঢ়তা পর্যন্ত আমাদেরকে হেয়, ঘৃণ্য, অবজ্ঞেয় বলে প্রমাণ করতে যত চেষ্টা ইংরেজ আজ পর্যন্ত করেছে, সেই সব পুঞ্জিত মিথ্যার কালিমা কি আমাদের গায়ে লেগেছে না ইংরেজেরই চরিত্রে, ইংরেজেরই ইতিহাসে। ইংরেজের কাছে আর আমাদের কোনো প্রত্যাশা নেই, তাই এখনো আমরা তাকে ভালোবাসতে পারছি; কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে ইংরেজের দৃষ্টি মোহে, ভয়ে, লোভে আচ্ছন্ন ব'লে কখনো সে আমাদের ভালোবাসতে পারলো না—হেয়ার, ডিরোজিও, নিবেদিতা, এণ্ডরুজ—স্বার্থের অন্ধ, অন্ধকার সমুদ্রে এঁরা কয়েকটি উজ্জ্বল, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হ'য়েই রইলেন। এইখানে আমাদের জিৎ।

বিশেষভাবে বাঙালির জিৎ এই কারণে যে বাঙালি তার আপন স্বভাবের অনিবার্য ঝোঁকে ইংরেজের সাহিত্যকেই নিয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ কেউ নিয়েছে ইংরেজের আইন, কেউ গণিত, কেউ বাণিজ্য। কিন্তু সাহিত্য ফুটলো বাংলাদেশেই। কথাটা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলো, 'ইংরেজের বদলে ফরাশি হ'লে আমরা সবাই মোপাসাঁ হতুম।'* শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর পাঁচ-পাঁচটি মহাদেশ এ-কথার উদাহরণ। ইংরেজ বহুকাল ধ'রে অর্ধেক পৃথিবীর উপর তার প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার ক'রে আসছে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড—এই চারটি বড়ো-বড়ো উপনিবেশে যারা বসবাস করছে তারা ইংরেজেরই রক্তমাংসের আত্মীয়, ইংরেজিই তাদের মাতৃভাষা। অথচ কোথায় তাদের মধ্যে সাহিত্যের উদ্দীপনা? তারা যে ওঅর্ডস্বর্থ ব্রাউনিঙের সুদূরতম জ্ঞাতি তার কিছুমাত্র পরিচয় কি আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে? চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে, রং-ওলা মানুষের বিরুদ্ধে আইনের পর আইনের পাঁচিল তুলে তারা তো দিব্যি সুখে আছে, শুধুমাত্র সুখেই আছে। মূল মাতৃভূমির আত্মিক গৌরব এক কণাও তারা বাড়ায়নি। খাশ ব্রিটেনের বাইরে একটিমাত্র দেশ তিনশো বছর ধ'রে ইংলণ্ডের সাহিত্যে রাশি-রাশি অমূল্য উপহার নিয়ে আসছে—সে-দেশ ইংলণ্ডের অত্যন্ত কাছাকাছি থেকেও নিজের স্বাতন্ত্র্য কখনো ভোলেনি, এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে তার সম্পর্কের ইতিহাস তিক্ত ক্ষুধিত রক্তময়। আয়র্লণ্ডের ইংরেজ-বিদ্বেষ যত তীব্র, তত প্রবল ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তার প্রেম। তাই ইংলণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে-করতেও সে ইংরেজি সাহিত্য-সূরীদের জন্ম দিয়েছে; আর ইংলণ্ডও ধন্য হয়েছে লড়াইয়ের ফাঁকে-ফাঁকে আইরিশ লেখকদের আপন হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ ক'রে। ইএটস একবার ডরথি ওয়েলেসলিকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'ইংরেজকে কি আমি ঘৃণা করতে পারি—শেক্সপিয়র, শেলি ও ব্লেকের কাছে আমার কত ঋণ!' ইংরেজ সম্বন্ধে আইরিশ সুধীজনের এই বোধ হয় সার্বভৌম মনোভাব—সম্ভবত আজকের দিনে ভারতীয় সুধীজনেরও।

আয়র্লণ্ডের সঙ্গে আমাদের অবস্থার বেশ কিছুটা মেলে। আমরাও ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে বিরূপ হয়েছি, কিন্তু ইঙ্গ-ভারতীর দিক থেকে কখনো মুখ ফেরাইনি। (অসহযোগ আন্দোলনের সময় একবার সে-রকম চেষ্টা হয়েছিলো, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের পরে সে চেষ্টা টিঁকতে পারলো না।) মেকলের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে আমরা আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পুরাতন সম্বন্ধে নূতন ক'রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠলাম, অথচ অচলায়তনের নিগড়েও বন্দী হলাম না, উজ্জ্বল তরুণ পশ্চিমের জন্য দুয়ার খোলা রইলো। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার, অতীতের পুনরুজ্জীবনের সাধনা, যার নাম Celtic Revival, তারই বিচ্ছুরণ জ্ব'লে উঠলো ইএটস-এর কবিতায়, রূপ নিলো ডবলিনের আবি থিয়েটরে। তেমনি বাংলাদেশের স্বদেশি আন্দোলনও শুধু একটা রাজনৈতিক হৈ-চৈ ছিলো না, তার ভিতর দিয়ে নিজেকে চিনতেই আমরা চেয়েছিলাম—সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, কর্মে। বৃহৎ বিচিত্র বিশ্বজীবনের স্বর-সংগতির মধ্যে আপন প্রাণের সুরটিকে মিলিয়ে নেবার সেই আমাদের চেষ্টা। স্বদেশি আন্দোলন যে-ভাবলোকে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলো সেটা সর্বদেশী, সেটা বিশ্বজনীন। সেল্টিক ভাবধারার পুনরুজ্জীবনের ভিতর দিয়ে আয়র্লণ্ডও বিশ্বকেই উপলব্ধি করেছিলো।

কিন্তু এ-সাদৃশ্য খুব বেশি দূর টানা চলবে না। হাজার হোক, ভাষায়, ধর্মে, রীতিনীতিতে ইংরেজের সঙ্গে আইরিশের অনেকখানি মিল। তারা প্রতিবেশী। নৃতত্ত্বঘটিত ভিন্নতা অতিক্রম ক'রে একই ইওরোপের লাতিন সংস্কৃতির, খৃষ্টান সভ্যতার তারা উত্তরাধিকারী। রাষ্ট্রিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনন্দ-বিনিময় করেছে, এটাকে খুব আশ্চর্য তাই বলা যায় না। কিন্তু কোথায় ইংরেজ আর কোথায় আমরা! কোনোখানে কিছু মিল নেই। তবু তো বাংলাদেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের সাহিত্যের নাড়ির ভিতর দিয়ে রক্তচলাচল সম্ভব হ'লো। আমরা যে শুধু নিয়েছি তা নয়, আমরা দিয়েছি। আমরা দিয়েছি আমাদেরই সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য তো আছেই, ইংরেজি সাহিত্যেও আমাদের দান তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষারই সাহায্যে

---

* সব-পেয়েছির দেশে: বুদ্ধদেব বসু। ২য় সং, পৃঃ ৮২—৮৩

বিশ্বের কাছে প্রকাশিত, তাঁর ইংরেজি অনুবাদের প্রভাব ইওরোপীয় সাহিত্যে পড়েছে, যদিও সে-অনুবাদ ইংরেজি সাহিত্য ব'লে সরকারি-ভাবে স্বীকৃত হয়। ইংরেজি সাহিত্যের মোটা-সোটা পত্রিকায় কিংবা সযত্ন-সম্পাদিত কাব্যসংকলনে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ কিংবা রচনা সাধারণত থাকে না, আমাদের দেশে যাঁরা মূল ইংরেজিতে লিখেছেন এবং ইংরেজিতে ছাড়া লেখেননি, যেমন তরু দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ, সরোজিনী নাইডু, তাঁদেরও থাকে না, যদিও কানাডা কি নিউজীল্যাণ্ডের নামমাত্র সাহিত্যের জন্য অনেক সময় স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের প্রবর্তন করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের রাষ্ট্রিক দাসত্বের জন্যই আমাদের সাহিত্য এখনো তার পুরো মূল্য পাচ্ছে না। সেজন্য অভিমান ক'রে লাভ নেই। আমাদের সৃষ্টির স্রোত ব'য়ে চলুক; আমাদের রাহুগ্রস্ত দশা কেটে যাবার পর একদিন পৃথিবীর লোক আমাদের সাহিত্য পড়বার জন্যই আমাদের ভাষা শিখবে, এবং স্বজাতিকে পড়াবার জন্য অনুবাদ করবে। তখন প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালির সাহিত্যের স্বরূপ। তা যতদিন না হয়, ততদিন রবীন্দ্রনাথ বলতে যে ঠিক কতখানি বোঝায় সে-কথাও কোনো বিদেশির পক্ষে ধারণা করা দুঃসাধ্যই থাকবে।

এখানে আর-একটা কথা ভাববার আছে। সরকারি কাগজ-পত্রে যা-ই বলুক, ভারতবর্ষ কিছুতেই ইংরেজের কলনি বা উপনিবেশ নয়। অস্ট্রেলিয়া কানাডার সঙ্গে কোনোদিক থেকেই এ-দেশের তুলনা হয় না। ইংরেজ এ-দেশকে গ্রহণ করেনি, শুধু দোহন করেছে। যদি তারা এ-দেশে বসবাস করতো, তাহ'লে কোনো সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষ তাদের নিঃশেষে শোষণ ক'রে নিতো, কিছু-দিনের মধ্যে তাদের পরিচয় হ'তো ভারতীয় ব'লেই। জয়ীকে জয় করাই ভারতের ধর্ম। চতুর ইংরেজ সে-ফাঁড়া কাটিয়ে গেলো অত্যন্ত সাবধানে নিজের জাত বাঁচিয়ে চ'লে, কলকাতায় বোম্বাইতে ছোটো-ছোটো ব্রহ্মসবরির পত্তন ক'রে, এত বড়ো দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্তভাবে আবদ্ধ থেকে।* ভারতবর্ষের অমর, সর্বগ্রাসী আত্মা তাই ইংরেজকে ছুঁতে পারেনি। তাদের এই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার নীতি এমন অনমনীয় যে তারা প্রথম এ-দেশে আসবার পর যে-অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জাতির উদ্ভব হয়েছিলো তারাও আজ পর্যন্ত এ-দেশকে স্বদেশ ব'লে ভাবতে পারলো না, যদিও এ-দেশের মাটিতেই তাদের জন্ম, মৃত্যু এবং ভবলীলা। ইংরেজকে তারা পূজা করে অথচ ইংরেজ তাদের চায় না, এবং ভারতীয় সমাজে গ্রহণযোগ্য হবার মতো কোনো লক্ষণই এ-পর্যন্ত তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। আজ যদি সমস্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কোনো-একটা জায়গায় একত্র আবদ্ধ করা যায়, তাহ'লে ভারতবর্ষের সে-অংশটুকুকে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের কলনি বলা যেতে পারে। সে-কলনির চেহারা মনোরম ব'লে ভাবা সম্ভব নয়. বর্তমান ভারতের প্রশ্ন-কণ্টকিত জটিলতার মধ্যে এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের বিধিলিপি সবচেয়ে শোচনীয়, সবচেয়ে অন্ধকার।

প্রথম যখন ইংরেজ এসেছিলো তাদের ঝোঁক ছিলো আমাদের সঙ্গে মিশে যাবার, আমাদের ঝোঁক ছিলো সাহেব হবার। তারা কালিঘাটে পুজো দিতো, আমরা ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতুম। তারপর আমাদের দিক থেকে আমরা সামলে নিলুম, তারাও স'রে পড়লো। আজ দীর্ঘকাল ধ'রে একই দেশে পাশাপাশি বসবাস ক'রেও তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোই যোগাযোগ নেই। বেসরকারি সকল ক্ষেত্রেই আনাগোনা বন্ধ। ইংরেজের পরিচয় পেতে হ'লে আমাদের বিলেতে যেতে হয়। ব্যক্তিগত সংস্রব সম্পূর্ণ বন্ধ হবার ফলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজের কোনো চিহ্নই পাকা রং লাগলো না। তাছাড়া ডিরোজিও-শিষ্যদের উন্মত্ততা কেটে যাবার পরে আমাদের পুরোনো ঐতিহ্য আবার আমরা প্রবলভাবে অনুভব করতে লাগলুম। আমরা কোট-পাৎলুন পরলুম না, হ্যাণ্ড-শেক করলুম না, ষাঁড়ের জিব খেলুম না—আমাদের খাওয়া-পরা আচার-ব্যবহার সময়ের প্রভাবে যথোচিত পরিবর্তিত হ'য়ে আমাদেরই রইলো। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের অন্তরের সংযোগের একমাত্র ক্ষেত্র রইলো তার সাহিত্য। সেই সব ইংরেজের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের বন্ধুতা গ'ড়ে উঠলো যাদের কখনো চোখে দেখবো না। যাঁরা কবি, যাঁরা শিল্পী, যাঁরা সাহিত্যিক। অনেকেই তাঁরা মৃত, যাঁরা জীবিত তাঁরাও দৈহিক অর্থে গ্রহান্তরের অধিবাসী। তবু তাঁদেরই সব-চেয়ে কাছের মানুষ ব'লে বরণ করলুম আমরা। তাঁদের উদ্দেশ্যে মনোলোকের অবারিত পথে আমাদের আনন্দময় যাত্রা। সেখানে কোনো জাতি-বর্ণের বাধা নেই। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের নিঃশঙ্ক মিলন। শেক্সপিয়র সম্বন্ধে কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হ'লে আমাদের কী উৎসাহ! ইংলণ্ডে কোনো নতুন শক্তিশালী লেখক দেখা দিলে তার সঙ্গে চেনা না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। ইংরেজের প্রভাব পৃথিবীর যত দেশে ছড়িয়েছে, তার মধ্যে ব্যবহারিক ও আধিভৌতিক জীবনে আমরা নিয়েছি সবচেয়ে কম, আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে নিয়েছি সবচেয়ে বেশি। আমি বলবো, বাঙালির সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্কের এইখানেই অনন্যতা, বাঙালির ইংরেজি সাহিত্যচর্চার এইটেই বৈশিষ্ট্য।

আমাদের সাহিত্যের উপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফল ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে-আলোচনার সময় এখন আর নেই। এটা মানতেই হবে যে ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আমাদের সাহিত্যে বিপ্লব এসেছে। মধুসূদনের সময়ে সে-বিপ্লব ছিলো অত্যন্ত নতুন, তাই অত্যন্ত উদ্দাম। তাকে বাঁধলেন রবীন্দ্রনাথ, তার শক্তিকে সমাহিত, শান্ত ও অন্তঃশীলা করলেন। আজকের দিনে আমাদের সাহিত্য এমন অবস্থায় এসেছে যে, সে-প্রভাব সম্বন্ধে আমরা আর সচেতনই নই। সেটাকে আমরা পরিপাক ক'রে দেহের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছি। তবু মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো ধাক্কা নতুন ক'রে লাগে—যেমন আধুনিক বাংলা কাব্যে এলিয়ট পাউণ্ডের হাওয়া—তখন প্রভাবটা আবার স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ে। এ-রকম না-হ'য়ে উপায় নেই, কারণ ইংরেজি সাহিত্যে থেকে-থেকে এমন-কিছু ঘটছেই যা বিশেষভাবে চোখে পড়বার মতো। তা ছাড়া ওর স্বভাব আমাদের স্বভাবের বিপরীত, ওখানে আমরা যা পাই নিজের সাহিত্যে তা পাই না, তাই সেটিকে নিজের সাহিত্যে আনতে চাই। ইংরেজি হ'লো জোরের সাহিত্য আর আমাদের সাহিত্য সুরের। ইংরেজি সাহিত্যের পথে যখন আনাগোনা করি তখন তার তীব্রতা, তার ব্যাপ্তি, তার অবাধ স্বাধীনতা দেখে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ না-হ'য়েই পারি না।

* 'জয়ন্তী-উৎসর্গ', ১ম সং : ১৭১ পৃষ্ঠার ফুটনোটে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথ ও ওএলস-এর আলাপ দ্রষ্টব্য।

যে-কোনো বিষয়, যে-কোনো ভাব, যে-কোনো আবেগকে সে টেনে আনছে, তার ভয় নেই, দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই, তার ভাষার জাদুকর গুরুচণ্ডালী জীবনের সমগ্রতাকে শোষণ ক'রে নিচ্ছে। এদিকে আমাদের সাহিত্য মৃদু ও মধুর, স্থমিত ও সুন্দর, তাতে নাটকীয়তা নেই, গান আছে, মত্ততা নেই, গভীরতা আছে। তখনকার মতো নিজের সাহিত্যকে বড়ো পরিমিত, বড়ো অসম্পূর্ণ মনে হয় এবং ইচ্ছে করে ঐ স্বাধীনতা, ঐ প্রখরতা ঐ উল্লাস আমাদের সাহিত্যেও আসুক।

নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে ইংরেজ দোকানদারের জাত। সে-কথা সত্য, আবার এও সত্য যে সে কবির জাত। ইংলণ্ডের কাব্য পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো, অন্য কোনো দেশে বড়ো-বড়ো কবির সংখ্যা এত বেশি নয়। ইংরেজ তার ব্যবহারিক জীবনে উচ্ছ্বাসটাকে মোটে জায়গা দেয় না, তাই বোধ হয় সমগ্র জাতির অবরুদ্ধ উচ্ছ্বাস তার কবিতায় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। এদিকে আমরা বোধহয় উচ্ছ্বাসটাকে আচারে-ব্যবহারে খরচ ক'রে ফেলি, তাই আমাদের কাব্যে, আমাদের সাহিত্যে শান্ত, স্নিগ্ধ, সলজ্জ ভাবটাই বেশি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালের ইংরেজি সাহিত্যচর্চা নিয়ে 'জীবন-স্মৃতি'তে যা লিখেছেন, এ-প্রসঙ্গে তা অনুধাবনযোগ্য :

> ···তখনকার দিনে তাকাইলে মনে পড়ে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে-পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে-পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেকসপীয়র, মিলটন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে-জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্য-শিক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়ারের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।
>
> আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়-ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না,—সমস্তই যত দূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এই জন্যই ইংরেজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল, যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার। * * * সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে, তাহা উত্তেজনারই দিন।*

সে-উত্তেজনা এতদিনে কেটে গেছে, গেছে রবীন্দ্রনাথেরই জন্য। ইংরেজি সাহিত্য থেকে খাদ্য আহরণ করবার মতো স্থৈর্য আমাদের এসেছে। যে-যুগে ইংরেজ মাষ্টার মশাই যে-কোনো তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজ লেখক সম্বন্ধে আমাদের ভক্তিগদ্‌গদ হ'তে, এবং নিজের সাহিত্যকে অবজ্ঞা করতে শেখাতেন, সে-যুগ অনেক পিছনে ফেলে এসেছি আমরা। আমাদের প্রিয় লেখকদের কোনো-না-কোনো ইংরেজ লেখকের নাম দিয়ে পুরস্কৃত করার প্রথা ইংরেজিতে চিঠিপত্র লেখার অভ্যাসের সঙ্গেই সহমরণে গেছে; বাংলার স্কট বাংলার বায়রনের দিন আর নেই। ইংরেজি সাহিত্যের দিকে নিরপেক্ষ মোহমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা তাকাতে শিখেছি। 'জীবনস্মৃতি'র উদ্ধৃত অংশের একটু পরেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

> ··· ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্যকলার সংযম এখনো আসে নাই ; এখনো সেখানে বেশি করিয়া বলা ও তীব্র করিয়া প্রকাশ করার প্রাদুর্ভাব সর্বত্রই। হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণ মাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে—সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনও ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই।
>
> আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল মাত্র এই ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। য়ুরোপের যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সাহিত্যকলার মর্যাদা সংযমের সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে, এই জন্যই সাহিত্য-রচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

মনে হয়, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অনুকম্পার কিছু অভাব ছিলো, তবু এ-কথা সত্য যে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে অত্যন্ত বেশি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে আমাদের কোনো-কোনো দিকে কিছু-কিছু ক্ষতি হয়েছে। প্রথম ক্ষতি সমালোচনায়। যদিও আমাদের লেখকদের গায়ে আর স্কট ডিকেন্সের লেবেল লাগাই না, তবু মনে-মনে ইংরেজ লেখকদের পাশে দাঁড় করিয়ে এখনো তাঁদের মাপ নিয়ে থাকি। অথচ ইংরেজ লেখক আর বাঙালি লেখকের মাপের অঙ্কই আলাদা। পাউণ্ডের কাছে ওড টু নাইটেঙ্গেল আশা করা যত বড়ো ভুল, তার চেয়েও বড়ো ভুল রবীন্দ্রনাথের কাছে রোমিও-জুলিয়েট কি লিয়র আশা করা। কিন্তু আমাদের সমালোচনায় আমরা ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শই মোটামুটি প্রয়োগ করি, ইংরেজ লেখকদের নামই বারবার ঘুরে-ঘুরে আসে, আর নয়তো সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র হয় আমাদের অবলম্বন। দুটোই ভুল ; কারণ, সংস্কৃত কি ইংরেজি, কোনো আদর্শই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, খানিকটা গোঁজামিল দিতেই হয়। প্রত্যেক পরিণত সাহিত্যেরই আপন স্বভাব অনুসারে স্বকীয় সমালোচনার ধারা গ'ড়ে ওঠে, আমাদের সাহিত্যে এখনো তা হয়নি। আমরা এখনো ঠিক জানি না আমাদের নিজেদের

* জীবনস্মৃতি : সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫০। পৃঃ ১১৪-১১৫।

আদর্শ কোনটা; ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্য চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলে আমাদের সমালোচকরা অত্যন্ত অসহায় হ'য়ে পড়বেন। বাঙালি লেখকদেরই পরস্পরের সঙ্গে তুলনা ক'রে সমালোচনার মূল সূত্র সৃষ্টি করবার সময় এতদিনে বোধহয় এসেছে, কিন্তু এ-বিষয়ে এখনো যে আমরা স্বাবলম্বী হ'তে পারছি না, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আমাদের মনের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের এই জাজ্বল্যমান উপস্থিতি।

দ্বিতীয় ক্ষতি হয়েছে আমাদের সংস্কৃতির সংকীর্ণতায়। 'আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে,' এ কথা এখনও সত্য। বলা যেতে পারে, ইংরেজি ভাষা আমাদের কাছে বিশ্বসাহিত্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে; আর বস্তুত, ইংরেজি অনুবাদের ভিতর দিয়ে ইওরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় যে আমাদের হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিছু কোনো অনুবাদেই মূলের সম্পূর্ণ রস পাওয়া যায় না, পাওয়া সম্ভব নয়। ইংরেজি ভাষার দ্বাররক্ষীকে পাওনা চুকিয়ে যেখানে যাবার ছাড়পত্র আমরা পাই সেটা মায়ালোক নয়, ছায়ালোক! আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন ফরাশি, জর্মন বা ইতালিয়ানের মূল সাহিত্যে যাঁর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি—রুশ, গ্রীক বা লাতিনের তো কথাই ওঠে না। মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক একটু ভ্রমণ করি বটে, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যেই ফিরে আসি। দড়িটা একটু লম্বা হ'লোই বা, ইংরেজির খুঁটিতেই আমরা বাঁধা। তাছাড়া ইংরেজি সমালোচনার আদর্শ আমাদের মনে দৃঢ়-গ্রথিত ব'লে অনিংরেজ ইওরোপীয় লেখক সম্বন্ধে আমাদের বোধশক্তি অনেক সময় ঝাপসা হ'য়ে পড়ে, এবং ইংরেজি সাহিত্যের খবর সব সময় খুব বেশি ক'রে কানে আসে ব'লে কখনো-কখনো, মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলি—একজন খুব সাধারণ ইংরেজ লেখকের সঙ্গে স্বদেশের বা অন্য দেশের একজন বড়ো লেখকের তুলনা ক'রে বসি। এদিক্ থেকে ইংরেজি সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্য থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রেই রেখেছে। বিশ্ব-সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সাহিত্যকে বা ইংরেজি সাহিত্যকে এখনো আমরা দেখতে শিখিনি।

এর মূল কথা অবশ্য আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বা অ-ব্যবস্থা। ছেলেবেলা থেকেই যে আমাদের একটা বিদেশি ভাষা শিখতে হয়, এবং সেই ভাষারই সাহায্যে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করতে হয়, এর দুঃসহ জবরদস্তি সামলে উঠতেই আমাদের অনেকখানি দম বেরিয়ে যায়। এর ফলে আমাদের শিক্ষা বিকৃত, মননশক্তি বিপর্যস্ত। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিও আমাদের স্বাভাবিক অনুরাগ অনেকখানি নষ্ট ক'রে দেয় পাঠ্যকেতাবের বিভীষিকা। সে-বিভীষিকা কাটিয়ে এখনো এতখানি ভালোবাসা যে আছে সেটাই আশ্চর্য। সেখানে আমাদেরই প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে। আমি আগে বলেছি যে ভারতবর্ষে ইংরেজের শ্রেষ্ঠ দান তার সাহিত্য। কিন্তু 'দান' কথাটা হয়তো ঠিক নয়, কেননা দান স্বেচ্ছাকৃত। ইংরেজ ইচ্ছা ক'রে এ-উপহার আমাদের দেয়নি, দিতে না-চাইলেও না-দিয়ে তার উপায় ছিলো না। মেকলে আমাদের ইংরেজি শিখিয়েছিলেন শেক্সপিয়র পড়াবার জন্য নয়, সস্তায় দিশি কেরানি তৈরি করবার জন্য। শেক্সপিয়রকে নিলুম আমরাই, আমাদের ইচ্ছায়, আমাদের আনন্দে, আমাদের প্রেমে। জোর ক'রে যে-এ বি সি ডি আমাদের গলার মধ্যে ঠেশে দেয়া হলো, আমরা তাকে পরিণত করলাম রসলোকের সেতুতে। কিন্তু এতদিনে মনে হচ্ছে সে-ভাষা আমাদের গলার কাঁটা হয়েছে, সেটা উগরে ফেলতে পারলেই ভালো।

এই শেষের কথাটা অনেকে হয়তো মানতে চাইবেন না। অনেকে বলেন, ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পর্ক যখন থাকবে না, তখনও ইংরেজি ভাষার ব্যবহার আমাদের রাখতেই হবে, নয়তো বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ থাকবে কেমন ক'রে? কিন্তু যে সব দেশের ভৌগোলিক সীমানা একাধিক ভাষার এলাকার মধ্যে প'ড়ে গেছে, সে-সব ছাড়া কোনো স্বাধীন দেশেরই সাধারণ লোক একাধিক ভাষা শেখে না—সেটা স্বভাবেরই নিয়ম নয়। এ-অবস্থা না-হ'লে মাতৃভাষায় পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। যতদিন আমাদের বিশ্বাস থাকবে যে ইংরেজি না-জানলে বিজ্ঞানে কিংবা বাণিজ্যে আমরা পেছিয়ে থাকবো, ততদিন বাংলা ভাষা ও-সব বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তেই পারবে না। শুধু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা তো আমাদের কাম্য নয়, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধীনতা থেকেও আমরা মুক্তি চাই। আমাদের বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষিত লোক নিখুঁত ইংরেজি বলে, তাই বিদেশীরা বছরের পর বছর এ-দেশে বাস ক'রেও আমাদের ভাষা শেখবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। যেদিন আমরা ইংরেজি ভুলবো, সেইদিনই ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশী যারা আসবে তারা আমাদের ভাষা শিখতে আরম্ভ করবে। এখন পর্যন্ত আমাদের দেশ থেকে এ ধারণা একেবারে চ'লে যায়নি যে ইংরেজি যে জানে না, সে-ই অশিক্ষিত। আমাদের মনের দাসত্বেরই পরিচয় এটা। এককালে ইংলণ্ডেও লাতিন-না-জানা লোককে শিক্ষিত বলতো না। রোমান ক্যাথলিক চর্চের পতনের পর ইওরোপের দেশগুলি যেমন লাতিন-মোহ কাটিয়ে উঠেছে, তেমনি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসানের পর ইংরেজি-মোহও নিশ্চয়ই ঘুচে যাবে। শিক্ষা বলতে যতদিন ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচয়মাত্র বুঝবো ততদিন শিক্ষা আমাদের জীবনে সত্য হ'তে পারবে না। সেইজন্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষার অপরিহার্যতা এ-দেশ থেকে যত শীঘ্র বিদায় নেয়, ততই মঙ্গল। যে-কোনো বিষয়ে ইংরেজির উপর নির্ভর করতে হ'লে আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবো না। মাতৃভাষা ছাড়া আর-কিছু যখন থাকবে না, তখন মাতৃভাষাতেই সব হবে; মাতৃভাষায় সব হওয়াবার সেইটেই উপায়। তার মানে এ নয় যে ইংরেজি আমরা কেউ শিখবো না। বাছা-বাছা লোকেরা শিখবেন, অন্তদের পক্ষে সেটা নিরর্থক হবে। 'শিখতে বাধ্য হবেন না ব'লে মন দিয়ে শিখবেন, পেটের দায়ে শিখতে হ'বে না বলে প্রাণের আনন্দে শিখবেন। তবে শুধু মাত্র ইংরেজি নয়, ফরাশি, জর্মন, ইতালিয়ান, রুশ, স্প্যানিশ—সব ভাষাই শিখবেন তাঁরা, কেউ এটা, কেউ ওটা, কেউ বা দুটো তিনটে। এশিয়ার অন্যান্য ভাষা শেখবারও ব্যবস্থা থাকবে। এই ভাবে মূল উৎস থেকে পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যের স্রোত আমাদের প্রাণে এসে মিলবে, ইংরেজির সঙ্গে অতি-সান্নিধ্যের অবরোধ কেটে গিয়ে বিশাল বিশ্বের প্রাঙ্গণে আমরা মুক্তি পাবো। তখনই ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা স্পষ্ট ক'রে, সত্য ক'রে উপলব্ধি করতে পারবো, এবং নিজের সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের দৃষ্টি অন্ধভাবালুতা ও অন্ধঅশ্রদ্ধা থেকে মুক্ত হবে।

হাসির গুণ

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি, টি, এম

হাসি ভালো না মুখ-ভার করা গাম্ভীর্য ভালো? এমন অনেক লোক আছে যারা সহজেই হেসে ওঠে, আবার এমন অনেক লোক আছে যারা কিছুতেই হাসে না। এর মধ্যে কাদের রীতি ভালো বলা যাবে?

হাসি অবশ্য নানা রকমের আছে—স্মিতহাসি, মৃদুহাসি, কাষ্ঠ-হাসি, উচ্চহাসি, দুই পাশ চেপে ধরে বেদম হাসি। কিন্তু হাস্যরস যেমন ভাবেই প্রকাশ হোক, হাসি জিনিসটা সভ্য, স্বাভাবিক এবং মনুষ্যোচিত। বিশেষতঃ জীব-জগতের মধ্যে এটা একান্ত ভাবে মানুষেরই একটা বিশিষ্ট গুণ, মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী হাসতে জানে না বা পারে না। যারা সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ, তাদের মুখে হাসি আপনিই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যারা অসুস্থ বা অস্বাভাবিক, যাদের মনের মধ্যে কিছু বিকার জন্মেছে, তারাই সহজে হাসতে পারে না। হাসি সব সময়েই সংক্রামক, তাই কাউকে হাসতে দেখলেই আমরা খুশি হই আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও হেসে উঠি। আমরা সকল সময় হাসি না বটে, কিন্তু পালে-পার্বণে হাসি, উৎসবে এবং ভোজের আয়োজনে অনেক লোক একত্র হ'লে প্রচুর পরিমাণে হাসি। নিমন্ত্রণ-সভায় খেতে বসে আমাদের হাসি যেন সংক্রামক ভাবে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

হাসি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। হাসি মানেই খুশি, আর খুশি হওয়া মানেই সুস্থতাবোধ। খেতে খেতে যেমন ক্ষুধা জন্মায়, হাসতে হাসতে তেমনি খুশি জন্মায়। খুশি হয়েই আমরা হাসি, আবার হাসলে আরো বেশি খুশি হই। এমনি খুশি হয়ে যদি হাসতে হাসতে খাওয়া যায় তা'হলে দৈনিক মাপের চেয়েও কিছু বেশি খাওয়া হ'য়ে যায় আর সেই খাওয়া সহজে হজম হ'য়ে যায়। মনে আশঙ্কা কিংবা উদ্বেগ নিয়ে খেতে বসলে খাওয়া যায় না, সে খাওয়া সহজে হজম হয় না, আর নিত্য নিত্য এরূপ অবস্থা ঘটলে তার থেকে দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগের সূত্রপাত হয়। যাদের ডিস্‌পেপ-সিয়া আছে তারা সহজে হাসতে পারে না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন যে, হাসি মানুষের উদ্বৃত্ত স্নায়বিক শক্তির বিকাশ। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, এটা শরীরকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবি রাখবার স্বাভাবিক প্রয়াস। হাসি রক্ত-স্রোতের মধ্যে চাঞ্চল্য এনে ব্লাড-প্রেসার বাড়িয়ে দেয়, তাই হাসলে মুখ-চোখ তৎক্ষণাৎ রঙীণ হয়ে ওঠে। এই চঞ্চল রক্তস্রোত তখন রসস্রাবী গণ্ডসমূহকে অধিক মাত্রায় রসক্ষরণ করায়, আর তারই ফলে মানুষের ধারাবাহিক মন্থর জীবনে কিছুক্ষণের জন্য একটা নতুন গতিবেগ আসে। শুধু তাই নয়, হাসির ফলে হজম-যন্ত্রাদির মধ্যে অধিকমাত্রায় পাচক রস ক্ষরিত হতে থাকে, সেই জন্য হাসতে হাসতে খেতে বসলে ক্ষুধাও বেড়ে যায় আর খাদ্যগুলি সহজে হজমও হয়ে যায়। কথায় বলে বেশি হাসলে লোকে মোটা হ'য়ে যায়, এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য যথেষ্টই আছে। যে বেশি হাসে, সে বেশি খেতে পারে এবং বেশি খেয়ে অনায়াসে হজম করতে পারে। পূর্বকালের রাজারা বোধ করি এই তথ্যটুকু জানতেন যে, রাজকার্য নিয়ে দিনারাত্র মুখভার করে গম্ভীর হ'য়ে থাকলেই তাঁদের ডিস্‌পেপসিয়া ধরবে এবং তাঁরা রোগা হয়ে যাবেন, তাই হাসাবার জন্য তাঁরা মাইনে করে ভাঁড় কিংবা বিদূষক রাখতেন। তারা তাঁদের খাবার সময় পর্যন্ত কাছে হাজির থাকতো আর সুযোগ পেলেই হাসাতো। এতে রাজারা যে মোটা হতেন তাতে সন্দেহ নেই, আর সেই হাস্যরসিক ভাঁড়েরাও যে দেখতে মোটাই ছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। হাসলে মানুষ সত্যিই মোটা হয়। তবে বেশি মোটা হওয়াটা অবশ্য ভালো নয়, আর মোটা হবার জন্যই যে আমরা হাসির এত গুণগান করছি তাও নয়। বেশি মোটা হওয়াটা দোষের, কারণ, অধিক মোটা লোকেরা দীর্ঘায়ু হয় না। কিন্তু হাসি যে সহজ, সরল এবং সুস্থ থাকার পক্ষে সহায়ক আমরা সেই কথাই এখানে বলছি।

হাসলে কেন যে খাদ্যবস্তু শীঘ্র শীঘ্র হজম হয়ে যায় তার আরও একটা স্থূল কারণ আছে। আমাদের বুকের গহ্বর আর পেটের গহ্বরকে আড়াল করে যে একটি মাংসপেশীময় মধ্যচ্ছদার (dia-phragm) দেয়াল আছে, হাসলেই সেটি ঘন ঘন সংকুচিত হ'তে থাকেএবং তার দ্বারা আমাদের পাকস্থলী ও তৎ-সংলগ্ন হজমের যন্ত্রগুলি অনবরত মর্দিত হতে থাকে। এই মর্দন ও কম্পনের ফলে সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় এবং সেগুলি অধিক পরিমাণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। হাত-পায়ের মর্দন করলে যেমন সেগুলির বল বাড়ে এও তারই অনুরূপ অবস্থা। এই জন্যই হাস্য-রসের উদ্রেক হলে তার সঙ্গে সঙ্গে হজমের রসগুলিও ক্ষরিত হতে থাকে। হাসলে যে চোখ দিয়ে

—মধুর হাসি—

—উচ্চ হাসি—

এবং জিভ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে এ-তো আমরা চোখেই দেখতে পাই। পেটের ভিতরেও তাই হয়।

ভয় পেলে, রাগলে কিংবা অধিক উদ্বেগযুক্ত হলে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। তখন যেমন আমাদের জিভ ও মুখ একেবারে শুকিয়ে যায়, ভিতরকার অন্যান্য যন্ত্রের রসও তেমনি একেবারে শুকিয়ে যায়। ভয় পেলে কিংবা রেগে উঠলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুততর হয়ে ওঠে ও সেই সঙ্গে হজমযন্ত্রস্থ রক্তসমূহ অন্যত্র চালিত হয়ে অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। কেবল রাগ বা ভয়ের প্রতিক্রিয়ামূলক কাজগুলি ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ তখন স্থগিত থাকে। এই স্থগিত রাখার ব্যবস্থাটি করে আড্রিন্যাল নামক দু'টি গণ্ড। রাগে এবং ভয়ে অন্যান্য সমস্ত রসই শুকিয়ে যায়, কেবল আড্রিন্যালের হর্মোন রস প্রচুর পরিমাণে ক্ষরিত হতে থাকে। এই হর্মোন রস আমাদের শরীরের মধ্যে চাবুক মারার ন্যায় একটা ক্ষিপ্র ক্রিয়াচাঞ্চল্য এনে দেয়, তারই ফলে আমরা সাময়িক ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠি, আমাদের জীবনীশক্তি আর ক্ষিপ্রকারিতা ক্ষণিকের জন্য খুব বেড়ে যায়। কিন্তু এটা শুধু সাময়িক, এর পরেই আসে অবসাদ ও অনুতাপ, যখন অড্রিন্যালের রস কমে যায়। এই আড্রিন্যালের ক্রিয়া আমাদের জীবনরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাগ ভয় প্রভৃতি মানসিক আন্দোলনের দ্বারা আবেগ-যুক্ত হয়ে ঐ গণ্ডকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করতে থাকলে কালক্রমে ওর স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হয়ে যায় আর তার ফলে শরীরে অতি শীঘ্র অকালবার্দ্ধক্য এসে পড়ে। এই জন্যই আমরা বলি, যারা হাসে তারা বেশি দিন বাঁচে, যারা রাগে তারা বেশি দিন বাঁচে না।

এটা আমরা নিজেদের স্বতঃপ্রেক্ষার দ্বারাই কতক বুঝতে পারি, তাই হাসিখুশি লোক দেখলেই আমরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হই আর রাগী লোক দেখলেই তাদের পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। তাই দেখা যায় যে, বন্ধুমহলে যার খুব হাসি-হাসি মুখ তারই বন্ধুর সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশি। যে মেয়েটির গোমড়া মুখ তাকে দেখতে সুন্দরী হ'লেও সহজে কেউ তার সঙ্গে মিশতে চায় না; সুন্দরী না হ'লেও যার মুখে হাসির মাধুর্যটুকু সর্বদা লেগে আছে, তার সঙ্গে মিশতে সকলেই ব্যগ্র হয়। যে ব্যক্তি হাসির গল্প বলতে পারে সে সকলেরই বন্ধু, কেউ তার শত্রু নেই। লোকে তার গল্প শোনবার জন্য সেধে সেধে ডাকাডাকি করে। এমন কি, লোকে একটু হাসবার সুযোগ পাবার জন্য লরেল-হার্ডির নিরর্থক ভাঁড়ামির অভিনয় দেখতেও আগ্রহের সঙ্গে সিনেমায় যায়। এর কারণ আর কিছুই নয়, হাসি জিনিসটাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। এতে আমাদের মানসিক উদ্বেগ আর শারীরিক ক্লান্তি দূর করে দেয়। জীবন-সংগ্রামের তিক্ততাটুকু এতে আমরা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হই, কায়িক ও মানসিক শ্রমলাঘবের দ্বারা খানিকটা নবীন উদ্যম সঞ্চয় ক'রে নিতে পারি, আর স্ফূর্তির সঙ্গে নতুন ক'রে আবার নিজেদের কাজে মন দিতে পারি। কোনো রকম বিষাদ কিংবা দুশ্চিন্তা তখন আর আমাদের কাবু করতে পারে না।

কিন্তু হাসি মাত্রই কি আনন্দের পরিচায়ক? ঠিক তা নয়। হাসির মধ্যে দু'টি রকমারি ভাগ আছে,—স্মিতহাসি, আর উচ্চহাসি। এই দু'টি একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের জিনিস। যে ব্যক্তি সুখী, সত্য আনন্দের পরিচয় যে পেয়েছে, সে কখনো হো হো ক'রে উচ্চৈঃস্বরে হাসে না। সে কেবল স্মিতহাসি হাসে। এই স্মিত-

—স্মিত হাসি—

হাসি দেখতে যেমন সুন্দর, উচ্চহাসি কখনই দেখতে তেমন সুন্দর হয় না বরং সময়ে সময়ে কুৎসিতই দেখায়। স্মিতহাসির মধ্যে আনন্দের বীজ আছে, তাই সে কুৎসিত মুখকেও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। উচ্চহাসির মধ্যে কৌতুক আছে, কিছু খুশির ভাবও আছে, কিন্তু সে অনিন্দ্যসুন্দর আনন্দ নেই যা আছে স্মিতহাসিতে। যে বিজয়ী সে কখনো উচ্চহাসি হাসে না, সে হাসে কেবল স্মিতহাসি। মা শিশুকে কোলে নিয়ে আপন মনে উচ্চহাসি হাসে না, সে হাসে স্মিতহাসি। আমরা বহু পরিশ্রমের কাজটি সম্পূর্ণ ক'রে কখনো উচ্চহাসি হাসি না, আমরা তখন হাসি একটু স্মিতহাসি। স্মিতহাসি হচ্ছে সার্থকতার পরিচায়ক, তৃপ্তির পরিচায়ক। উচ্চহাসি ঠিক তা' নয়। অনেক সময় আমরা উচ্চহাসির পরিশেষে কিছুক্ষণ স্মিতমুখে হাসতে থাকি বটে, কিন্তু তারও কারণ আছে। খানিকটা উচ্চহাসি হেসে নিয়ে আমরা যে তৃপ্তি পেয়েছি, আমাদের মনের কালিমা যে অনেক কেটে গেছে, ওটা তারই পরিচায়ক।

কিছু অদ্ভুত বা কৌতুকজনক দেখলেই আমরা হো হো ক'রে হেসে উঠি। কেউ ছুটতে গিয়ে যদি পা পিছলে পড়ে যায়, তা'হলে আমরা এমনি ভাবে হাসি। কোনো অদ্ভুত চেহারার লোক দেখলে, কাউকে কোনো অদ্ভুত পোষাক পরতে দেখলে, হাওয়াতে টুপি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তার পিছু পিছু কাউকে ছুটতে দেখলে, কাউকে অদ্ভুত ধরণে চলতে বা বলতে বা খেতে দেখলে আমরা এমনি ভাবে হাসি। এমন কি, কাতুকুতু দিলেও আমরা এমনি ভাবে হাসি। এ সকল হাসি তেমন আনন্দের নয় বটে, কিন্তু এও আমাদের পক্ষে উপকারী। বিদ্রূপের হাসি, বিকটতার হাসি, আর কৃত্রিমতাপূর্ণ কুটিল হাসি ছাড়া অন্য সকল রকমের হাসিই আমাদের পক্ষে উপকারী। যারা আমাদের অদ্ভুত রকমের দুর্দশা দেখে কৌতুক অনুভব ক'রে অতি সহজে হেসে ওঠে, তাদের হাসিও নিন্দনীয় নয়। তারা অল্প দুর্দশায় হাসে বটে, কিন্তু দুর্দশার মাত্রা অধিক হ'লেই সহানুভূতিতে তাদের মন ভরে যায়, সাহায্য দিতে তারাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। যারা এমন সহজে হাসতে জানে তারাই আমাদের হাসাতে শেখায়, নিজের দুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে আমরাও তাদের সঙ্গে সহজে হাসতে পারি।

হাসতে শেখা আমাদের পক্ষে নিতান্তই দরকার, আগেকার চেয়ে এখনকার যুগে আরো বেশি দরকার। ইংরেজ কবি বায়রণ বলেছিলেন,—সামান্য জিনিসেই আমি হেসে উঠি এই জন্যে যে, তাহ'লে আর আমি কাঁদবার কোনো সুযোগই পাবো না। নীট্‌শে বলেছিলেন,—জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই কেবল হাসতে জানে, তার কারণ এই যে, তার দুঃখের মাত্রা এতই গভীর যে, অনন্যোপায় হ'য়ে তাকে এই অত্যাশ্চর্য্য উপায়টি আবিষ্কার ক'রে নিতে হয়েছে; যে যত বেশি অসুখী আর অসহায় তাকে ততই বেশি স্ফূর্তির ভাব দেখাতে হয়। সুতরাং হাসতে শেখা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য নিতান্তই দরকার। হাসলে আর দুঃখে অন্যের সহানুভূতি পাবার কোনো প্রয়োজন হয় না, হাসলে কোনো বাইরের সাহায্য না নিয়ে নিজের সহানুভূতি আমরা নিজেরাই পেয়ে যাই। অতএব যেহেতু হাসলেই আমরা বেশ খুশি থাকি, সেই হেতু খুশি থাকবার জন্য আমাদের হাসাই দরকার।

—আঁখি—

শ্রীঅপর্ণা সান্যাল

বিরল-কোলাহল বিজন গৃহ-কোণে,
আছিনু বহু দিন উদাসী আনমনে,
ছিল না হাসি গান, ছিল না কোন কথা,
নিজেরে ঘিরে কোন বিরহ ব্যাকুলতা।
বাতাস দূর হতে বহিয়া যেত ডাকি
আকাশ একটুকু—আলোক মৃত-আঁখি।
ভাবনা ছিল কিছু, হয়ত ছিল না বা,
সকল কিছু ঘিরে একটি মৃদু আভা—
বাঁচিয়া আছি এই মাটির মা'র কোলে
না থাক আবাহন করুণ স্নেহ ছলে
এমনি কিছু কাল—সহসা এক দিন,
জাগিল দেহ-মন, সকল বাধাহীন।
বিজন দ্বারখানি খুলিয়া প্রসারিত,
বাহির হইলাম চকিত-ভীত-চিত;

বিরাট বিশ্বের অগাধ আলোরাশি,
বাড়ায়ে দুই বাহু ডাকিল মোরে হাসি,
ছড়ায়ে চারি দিকে গরল ও সুধা-খনি,
কেমনে তার মাঝে চিনিয়া লই মণি;
কাটিল ক্রমে ত্রাস, শিহরি-ওঠা লাজ,
জানিনু আমি আছি, আমারও আছে কাজ।
কত যে এলো কাছে, কত যে গেল ফিরে,
কত যে বাসিলাম ভালো এ পৃথিবীরে,
এমনি চাওয়া-পাওয়া, দেওয়া ও নেয়া মাঝে,
সহসা এক দিন বেদনা বুকে বাজে।—
চেয়েছি যারে সে তো দিল না মোরে ধরা,
পেয়েছি কারে সে তো হোল না মনোহরা।
আবার ভেঙে গেল গভীর ঘুম, হায়!
ফেলিয়া-আসা-নীড়ে হৃদয় ফিরে চায়।

—উপন্যাস—

প্রতিভা বসু

আমার রোজ মনোহারি দোকানে দরকার থাকে। সন্ধে হলেই আমি আর সেখানে না-গিয়ে থাকতে পারি না। এদিকে বাবার এক বাই বিকেল হ'লেই মোটরে চড়িয়ে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবেন লেকে, কোনো ওজর-আপত্তি মানবেন না।

মাসের প্রথমেই বরাবর আমাদের যার যা দরকার তা আসে; শেষের দিকে আর-কারো কিছু টান পড়লেও আমার কখনো পড়তো না, কিন্তু ছোটো ভাইএর জন্য একদিন চকোলেট কিনতে গিয়েই এটা হল।

ঘুষ দিয়ে ওর কাছ থেকে সর্বদাই আমি কাজ আদায় করি—কিন্তু সেদিন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে এক মনোহারি দোকান দেখে হঠাৎ মনে হল, ওর জন্যে কিছু চকোলেট কিনলে হয়। নামলাম গাড়ি থেকে। আমার বাবার গাড়ি, শহরের অনেক মানুষের মত দোকানিদেরও সচকিত করলো—তার উপর আমার নিজের সাজসজ্জা। দু'-তিন জন এগিয়ে এলো একসঙ্গে—আমি নেহাৎ অবজ্ঞাভরে বললুম, 'দিন তো এক টাকার চকোলেট।' আমার গলার স্বর শুনেই কিম্বা এক টাকার চকলেট শুনে জানি না, দোকানের এক কোণে একটা চেয়ারে ব'সে সামনে ছোটো টেবিলের উপর মুখ নিচু ক'রে যে-ভদ্রলোক কী লিখছিলেন, হঠাৎ চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে।

এমন একটা সলজ্জ বিনম্র ভঙ্গি ছিল তার মুখে যে, পরের দিন সন্ধেবেলাও মনে হল ও-দোকান থেকে ভালো একটা রাইটিং প্যাড আমার আর না-কিনলেই চলছে না। আর যেহেতু পাড়ার মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বড়ো না হলেও বেশ বড়ো দোকান, তখন একটু ঘুর-পথ হলেও সেখান থেকে কেনাই ভাল। লেকে হাওয়া খেয়ে ফেরবার পথে বাবাকে গাড়ি ঘোরাতে বললুম। বাবা বললেন, 'ভালো রাইটিং প্যাড এখান থেকে কিনবি কী রে, কাল চলিস আমার সঙ্গে, হোয়াইট-ওয়েতে সেইল হচ্ছে, ওখান থেকে আনবি পছন্দ করে।' কী মুস্কিল। বললাম, 'না বাবা সামান্য একটা রাইটিং প্যাড, তা আবার সায়েববাড়ি—এখান থেকেই কিনবো।'

'ওরে বাবা—' বাবা ঠাট্টা করলেন, 'স্বদেশপ্রীতি হয়েছে দেখছি আবার। আচ্ছা চল্—' এই বলে ঠাস করে অন্য একটা মনোহারি দোকানের সামনে গাড়ি থামালেন। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে এখানে না, এখানে না, ঐ যে চৌরাস্তার মোড়ের দোকানটায়, কী জানি নাম—'

ড্রাইভার কিন্তু বুঝলো, সঙ্গে-সঙ্গে সে গাড়ি ঘোরালো কালকের দোকানের দিকে।

বাবা বললেন, 'তুই আসিস্ না কি মাঝে মাঝে এখানে?'

'মাঝে-মাঝে আবার কোনদিন এলাম!' বাবা একান্ত সরল মনেই বলেছিলেন কথাটা, কিন্তু আমার জবাবটা একটু উগ্র হ'লো। বাবা গাড়িতেই থাকলেন, আমি নামলাম প্যাড কিনতে।

ঠিক সেই দৃশ্য। ভদ্রলোক তেমনি ব'সে লিখছেন, কর্মচারীরা তেমনি বেগে এগিয়ে এলো।

'ভালো রাইটিং প্যাড আছে?'

আড়চোখে লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোককে। গলা শুনে বুঝেছেন নিশ্চয়ই কালকের খদ্দের—তাকিয়ে দেখা আর দরকার মনে করলেন না।

এদিকে আমার আর পছন্দ হয় না—কর্মচারীরা গলদঘর্ম। একজন গিয়ে তাকে মৃদু স্বরে কী বললো—তিনি জবাব দিলেন, এর চেয়ে দামি আর নেই।'

কী আর করি, অবশেষে অকারণে—অনেকগুলি প্যাড নিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। বাবা বললেন, 'হলো?—তুইও শেষে তোর মা-র স্বভাব পেলি?'

একটু হেসে বললাম, 'কী করবো, বলো—যা দেখি তাই পছন্দ হয়। এরা লোকও খুব ভালো।' একটু পরে বললাম—'আচ্ছা বাবা, এদের থেকেই তো আমরা সমস্ত মাসেরটা এবার থেকে নিলে পারি।'

'এদের থেকে?'—বাবা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন—'তোর একলা এক মাসের জিনিশ জোগাতেই তো ওদের দোকান ফতুর হয়ে যাবে রে!'

বাবার ভয়ানক নাক উঁচু। কথা বললাম না আর।

পরের দিন সন্ধেবেলা কিন্তু আমার আবার যাবার দরকার হ'লো। দরকার—দরকারের তো কোনো নির্দিষ্ট কারণ থাকে না—মনের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার এর চেয়ে অন্য সুবিধে আর নেই। জীবনে যার এক পয়সার পেনসিলেরও দরকার ছিল না—না-চাইতেই যে চিরদিন পরিপূর্ণভাবে পেয়ে এসেছে, তার যে এমন হঠাৎ রোজ-রোজ দোকানে যাবার দরকার পড়তে পারে এ-কথা কি সে নিজেও জানতো? মা বললেন, 'কী আনবি। রুমাল? কেন, এই না সেদিন তোর বাবা মার্কেট থেকে এক ডজন কিনে আনলেন।'

আমতা-আমতা ক'রে বললাম, 'না, ঠিক রুমাল নয়, তবে থাক—'

'বল না কি জিনিশ—তোরই যে যেতে হবে তার কি মানে—রামদিন এনে দেবে 'খন। কাগজে লিখে দে।'

'না থাক—' ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিই তাড়াতাড়ি। মন কেমন উসখুস করতে থাকে যেন।

পরের দিন কিন্তু গেলামই! সন্ধেবেলা না—একেবারে ভরা দুপুরে। বাবা গেছেন কোর্টে—মা তাঁর ঘরে, বোধ হয় ঘুমিয়েছেন—বাহাদুরকে গাড়ি বার করতে বললাম। হঠাৎ মনে হ'লো দুপুরবেলাটা ব'সে-ব'সে নষ্ট করি কেন—একটু ছবি-টবি আঁকার চেষ্টা করলেও তো হয়। কিন্তু কাগজ? পেনসিল? রং তুলি—সে তো আবার এক মনোহারি ব্যাপার। নিজের কাছে নিজেরই একটু লজ্জা করলো কিন্তু আমল দিলাম না। দোকানে গিয়ে দেখলাম এই ভরা দুপুরে কর্মচারীরা কেউ নেই—চারদিকে কালো পরদা ফেলে ভিতরে পাখা চালিয়ে সেই ভদ্রলোক চুপচাপ ব'সে-ব'সে ইংরিজি উপন্যাস পড়ছেন। আমার জুতোর আওয়াজে চমকে চোখ তুলতেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। অদ্ভুত চোখ। ঈষৎ শ্যামল ছিপছিপে চেহারা—পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবির আবরণে অপরূপ দেখাচ্ছে। কথা ব'লতে আমার আটকে গেল। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চান?'

কী যে নিতে এসেছি তা আমি সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। মনিহারীর দরকার তো আমার ছিল না—মনেই [illegible]

না যে হঠাৎ আমার ছবি আঁকার শখ হয়েছিল। ঢোঁক গিলে বললাম, 'এই কয়েকটা'—এদিক ওদিক তাকিয়ে বললাম, 'কয়েকটা রুমাল নেব।' রাজ্যের রুমাল বার করে নিয়ে এলো সে—ঘেঁটে-ঘেঁটে (যথাসম্ভব দেরি ক'রে) অবশেষে খানকয়েক পছন্দ করতেই হলো। কিন্তু এক্ষুনি ফিরে যাবো? বললাম, 'ফাউনটেন পেন আছে—শস্তা দামের—এই দশ টাকার মধ্যে।'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বার করলেন কলম। কলম দেখতে অনেক সময় গেল। নিচু হয়ে নিব পরীক্ষা করতে দু'জনেই এত বেশি মন দিলাম যে কাউণ্টারের দু'পাশ থেকে আমাদের দু'জনের মাথা একবার সাংঘাতিক কাছাকাছি হয়ে গেল।

আরক্ত হয়ে মুখ তুলে বললুম, 'কলম আজ থাক, রুমালগুলোই বেঁধে দিন।'—টাকা বার করলাম ব্যাগ থেকে।

'আজ বেস্পতিবার—দোকানে আজ বেচা-কেনার নিয়ম নেই।'

'সে কী!'—আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

সলজ্জ হাসিতে তার মুখ ভরে গেল। যথাসম্ভব গলা নিচু ক'রে বললো, 'বেশ তো, পছন্দ করতে তো আইন লাগে না—আজ পছন্দ ক'রে গেলেন—কাল এসে নেবেন।'

ঈস্। আমার তো আর কাজ নেই। ভয়ানক রাগ হ'লো কথা শুনে—একটু ঝাঁজ দিয়ে বললুম, 'সে-কথা এতক্ষণ বলেননি কেন?'

'বললে আপনি দুঃখিত হতেন।'

'দুঃখিত! দুঃখিত আমি এতেই হলাম—কী আশ্চর্য! অনর্থক এতক্ষণ আমাকে ভোগালেন।'—মুখ-চোখ গম্ভীর ক'রে সবেগে বেরিয়ে এলাম আমি। গাড়িতে উঠে মুখ বার ক'রেই দেখি সেও বেরিয়ে এসেছে আমার পিছনে-পিছনে। চোখে চোখ পড়তেই মুখ নিচু ক'রে বললো, 'কাল আসবেন।' ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েছে ততক্ষণে, আমি জবাব দিলাম না—কিছুদূর এগিয়ে এসে চকিতে মুখ ফেরালাম পিছনে, দেখলাম সেই অদ্ভুত দুই চোখ মেলে সে তাকিয়ে আছে গাড়ির দিকে।

পরের দিন অনেক মন-কেমন-করা সত্ত্বেও আমি আর গেলাম না। তার পরে পর-পর একেবারে পাঁচ দিন। কিন্তু ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটলো। আমার বাবার বন্ধুপুত্র অভিলাষ (আমার ভাবী স্বামীও বলা যায়) হঠাৎ এসে উপস্থিত। সে কৃষ্ণনগরে পোষ্টেড। আই. সি. এস. হবার পরে এই তার সঙ্গে ভালো ক'রে দেখা শুনো। চেহারায় কথাবার্তায় মেজাজে একেবারে পুরোদস্তুর আই. সি. এস. হ'য়ে এসেছে। আমার মা বাবা দিশে-হারা হ'য়ে উঠলেন তার পরিচর্যায়। আমি দিনের মধ্যে কম ক'রেও দশবার শাড়ি ব্লাউসের শ্রাদ্ধ করতে লাগলুম, পাউডারের প্রলেপে মুখের আসল রং মুছে ফেললুম, মাথা আঁচড়াবার ঘটায় তিনখানা চিরুণি দাঁতভাঙা হয়ে এখানে-ওখানে গড়াতে লাগলো। বাড়িতে একখানা ব্যাপার বটে।

২

আমার বাবা বড়োমানুষ। এডভোকেট তিনি, ডেলি কি তাঁর পাঁচশো টাকা। প্রকাণ্ড গাড়ি বাড়ির মালিক তো বটেই, চাল-চলনেও আমাদের একটু নাকউঁচু ভাবের। আমার মার আগে এ নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্ক হতো, আমাদের এ সব ফ্যাশন—আর সবকার প্রতিই অবজ্ঞাভাব সর্বদাই তাঁকে আহত করেছে। [illegible] লাগেনি তাঁর বাবার হাব-ভাব। আমাদের (আমাদের মানে—একমাত্র মেয়ে আমি আর আমার ছোটো ভাই মন্টু) তিনি চেষ্টা করেছিলেন অন্যভাবে গড়তে—ছেলেবেলায় আমার ছেলের সঙ্গে খেলা করবার অনুমোদন তাঁর সর্বদাই ছিল—আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিতেন—কিন্তু হ'লে কী হবে—অতিশয় বিলাসিতার মধ্যে বেড়ে উঠে স্বভাবটা ঠিক বাবার মতো হ'য়ে গেল। আমাদের অবস্থার সঙ্গে যাদের এক আর একশোর তফাৎ তাদের সঙ্গে গলাগলিতে বেশ আত্মসম্মানে বাধতো। সর্বদাই তাদের করুণার চোখে দেখেছি—কথা ব'লে ভেবেছি ধন্য করলাম। আমার বাবার বন্ধু অভিলাষের বাবা পূর্ববঙ্গের এক বিখ্যাত ধনী—আর ধনী ব'লেই বাবার বন্ধু। তবে শুনেছি অভিলাষের বাবা মানুষটি ভারি ধড়িবাজ আর তাঁর ধনপ্রাপ্তির মূলেও এক ধূর্তামির ইতিহাস আছে ব'লে শুনেছি। সে যাই হোক্, টাকা তাঁর সত্যিই আছে, সে যে ক'রেই হোক।—এদিকে একমাত্র পুত্র অভিলাষ। আমার মা অভিলাষকে কি জানি কী কারণে স্নেহ করেন—মায়ের সম্বন্ধে এটুকু বুঝি যে আর যে কারণেই হোক্, আই. সি. এস. বলেও নয়—বড়োমানুষের পুত্র বলেও নয়। এমনিই হয়তো ভালো লাগে। বোধ হয় বিলেত থেকে ফিরে এসেই যেবার দেখা করতে এলো সেবার নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল ব'লে। মায়ের তো আবার ও-সব ভাব আছে।

খুব ছেলেবেলায় আমরা অনেকদিন এক জায়গায় ছিলাম। অভিলাষের বাবা তখন হাওড়াতে কাপড়ের ব্যবসা করছিলেন। এত একসঙ্গে থাকার ফলেই কিনা জানি না—অভিলাষকে ভালোবেসেছি, কিন্তু বিয়ে হবে ভেবে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠিনি—প্রাণের মধ্যে কোন সাড়াই পাইনি। অভিলাষের দিক থেকেও হয়তো তাই, কে জানে। বাবাতে বাবাতে বিয়ে ঠিক ক'রে রাখলেন তখন থেকেই। এর পরে অনেক দিন ছাড়াছাড়ি গেছে, আমরা তখন বড়ো। অভিলাষ ম্যাট্রিক পড়ছে, আমি বোধ হয়—ফিফ্‌থ ক্লাশ কি ফোর্থ ক্লাশে।

তারপর আমি যে-বছর সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ দিলাম সে বছর ও বিলেতে—ফিরে এসেছে বছরখানেক—আমার বাবা ফেরবার পর থেকেই তাগাদা দিচ্ছেন অভিলাষের বাবাকে, কিন্তু তিনি বোধ হয় এর চেয়ে ভালো শীকারের সন্ধানে ছিলেন, তাই এতদিন তা-না-না-না ক'রে কাটিয়ে মাসখানেক আগে একখানা চিঠিতে লিখেছেন, অভিলাষ শীঘ্রই সমস্ত ঠিক করতে যাচ্ছে।

অভিলাষের আগমনের উদ্দেশ্যটা এবার বোঝা গেল। আমার মা আমাকে বললেন, 'কী রে রুনি, অভিলাষকে কেমন লাগছে এত-দিন পরে?' আমি হেসে বললাম, 'অভিলাষকে বরাবরই আমার এ-রকম লাগে।'

'বেশ! বিয়ে হবে দু'দিন পরে—' মা মুখ ঘুরিয়ে অন্য কাজে যেতে-যেতে বললেন, 'এত দেখা-শোনা হলে কি আর কোনো মোহ থাকে না আনন্দ থাকে?'

আমার বাবার আই.সি.এসের উপর খুব ভক্তি—সেই দশ বছর বয়সের অভিলাষকে তিনি একেবারে মুছে ফেলেছেন মন থেকে—এমন কি আই.সি.এসের ভাবী স্ত্রী ব'লে আমার উপরও তাঁর যত্ন বেড়ে গেছে।

বিকেলবেলা অভিলাষ চা খেতে-খেতে বললো, 'আমি তো ভাবছি

শাসখনেকের মধ্যেই বিয়েটা সেরে ফেলবো।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলো, রুনি ?' আমি সলজ্জ হলুম না, কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলুম। মা জবাব দিলেন, 'আমাদের সকলেরই তো তাই মত। এখন তোমার বাবা—'

'বাবা—' অভিলাষ হেসে ফেললো, 'বাবার মতামতের জন্তে আমি ব'সে আছি নাকি ?'

'না, তা থাকবে কেন—' মা বললেন—'বড়ো হয়েছ, উপযুক্ত হয়েছ, বুদ্ধি হয়েছে—বিয়ে তুমি নিজেই করবে, কিন্তু তাহ'লেও তো তাঁর অনুমতি চাই,—আর যেখানে জানাই যে অনুমতি তুমি পাবেই।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'অভিলাষ, তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহ'লে আমি উঠি।'

'ওঠো, ওঠো, বাঃ—আমিও এক্ষুনি উঠবো।' সঙ্গে-সঙ্গে অভিলাষও উঠলো।

বাবা এমন সময় ঘরে এলেন—কোর্ট থেকে ফিরতে আজ তাঁর বড়োই দেরি হ'য়ে গেছে। আমাদের এক-সঙ্গে উঠতে দেখে খুশী হলেন বোধ হয়—ভাবলেন আর ভয় নেই। হাসিমুখে বললেন, 'কী, তোরা বেড়াতে যাচ্ছিস নাকি ?' আমার আগেই অভিলাষ বললো, 'আমার তো তাই ইচ্ছে—' ব'লে তাকালো আমার দিকে।

বাবা হেসে বললেন, 'তোমার ইচ্ছেই ওর ইচ্ছে—ওর আবার আলাদা ইচ্ছে আছে নাকি ?' আমার পিঠে চাপড় মেরে হেসে বললেন, 'কী বলিস ?'

আমি জবাব না-দিয়ে নিজের ঘরে চ'লে এলাম। খানিক পরেই বাইরে থেকে অভিলাষের গলা এলো, 'হোলো তোমার ?'

'আমি যাবো না।'

'কেন ?'

'মাথা ধরেছে।'

'তাই নাকি—' অভিলাষ ব্যস্ত হ'য়ে দরজায় টোকা দিয়ে বললো, 'আসবো ?'

বুঝলাম মাথা-ধরার ভানকে অভিলাষ টিপে-টিপে সত্যিকারের মাথা-ধরা না-বানিয়ে ছাড়বে না। হেসে বললাম, 'আরে পাগল নাকি—আমি কাপড় পরছি যে।'

'বললে যে মাথা ধরেছে।'

'ঠাট্টাও বোঝো না ?'

গলার স্বরে যথাসম্ভব আবেগ দিয়ে বললো, 'অসুখ-বিসুখ নিয়ে আবার ঠাট্টা কী।'

চট ক'রে বেরিয়ে এলাম শাড়ি প'রে।

সমস্ত লেকটা একবার চক্কর দিয়ে অভিলাষ বলল, 'এবার চলো নিরালা একটু বসি।'

আমি তক্ষুনি প্রতিবাদ ক'রে বললুম, 'না, না, ব'সে-ট'সে কাজ নেই, গরমের দিন কোথায় কোন সাপ ব'সে আছে।'

'পাগল—এই রোক্কো।'

গাড়ি থেমে গেল। ঘোরতর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর প্রতিবাদের সময় পেলাম না।

মাড়োয়ারি ক্লাবের বাঁয়ের রাস্তা ধ'রে একটু ঘুরে গিয়েই অভিলাষ মনোমতো জায়গা পেলো।

'বাঃ, কী সুন্দর জায়গা—' পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে পেতে বললো, 'বোসো।'

'ও মা—রুমালে বসবার কী হয়েছে আমার।' ঘাসের উপর ব'সে পড়লুম।

অভিলাষ বললো, 'বিয়েতে নিশ্চয়ই তোমার অমত নেই।'

'অমত কিসের।'

'হ'তে তো পারে।'

'হ'লেই বা উপায় কী—বাংলা দেশের মা-বাপের মতে তো তোমার চেয়ে ভালো পাত্র আর নেই।'

'ও—মা বাপের মর্জিমতোই তাহ'লে আমাকে পছন্দ হয়েছে তোমার। তোমার পিতৃমাতৃভক্তি দেখছি বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়েছে।'

'মা-বাপের মর্জি কেন ?' বিষণ্ণ মুখে ঘাস তুলতে-তুলতে বললুম, 'তোমার আমার বিয়ে হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা।'

অভিলাষ একটু অভিমান ক'রে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'তুমি খালি এড়িয়ে যাচ্ছো—নিজের মন আসলে সাড়াই দেয়নি।'

'মন সাড়া দেয়া কাকে বলে তা আমি জানিনে—তোমাকে তো নতুন দেখছিনে।'

অভিলাষ অকস্মাৎ আমার অত্যন্ত কাছে স'রে এলো; হাতের মধ্যে আমার হাত টেনে নিয়ে বললো, 'আমার তো তোমাকে ভয়ানক নতুন লাগছে। তোমার বয়স কি তুমি জানো ?'

গম্ভীর হ'য়ে বললুম, 'জানি।'

'তোমার সমস্ত শরীরে কী বিদ্যুৎ তা কি তুমি জানো ?'

'জানি।'

'তবে ?'—হঠাৎ অভিলাষ আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

'ছি ছি—' আমি সবেগে স'রে আসতে চেষ্টা করলুম ওর সান্নিধ্য থেকে, কিন্তু অভিলাষ ছাড়লো না—জোর ক'রে ধ'রে চুম্বন করতে-করতে বললো, 'তোমরা ভারতবর্ষের মেয়েরা একেবারে জড় পদার্থ—আজ বাদে কাল বিয়ে, এখনো তোমার একটুও সংস্কার কাটলো না। ওদের দেশে এই কোর্টশিপের সময়টাই তো সবচেয়ে মজার।'

আমার মুখ কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেল—প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে সোজা মোটরে এসে উঠলুম।

'হাউ সিলি।' অভিলাষ হাসতে-হাসতে পাশে এসে ব'সে বললো, 'ভারি ছেলেমানুষ আছো।'

পাশে ব'সেও সে রেহাই দিলো না—হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো। আবার তক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে বললো, 'না, আর তোমাকে ভয় দেখাবো না—বোকা।' ব'লেই গালে টোকা দিলো। গাড়ি যখন চৌরাস্তায় এলো—সেই মনোহারি দোকানটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো গাড়ি থেকে—মনে হ'লো অভিলাষের কবল থেকে আমাকে একমাত্র সে-ই বাঁচাতে পারে।

'রোক্কো। রোক্কো।' ক্যাঁচ্ ক'রে থেমে গেলো গাড়ি, লাফ দিয়ে নেমে ঠাশ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে অভিলাষ বললো, 'ওয়ান মোমেণ্ট প্লীজ—একটা সিগারেট কিনে আনি—' ওর কথা শেষ না হ'তেই আমিও নেমে পড়লাম দরজা খুলে।

'এ কী, তুমিও নামলে ?'

বললাম, 'দরকার আছে।'

'চলো তবে—' অত্যন্ত মুরুব্বির মতো এগিয়ে চললো আমাকে নিয়ে—যেন আমি এখনি ওর সম্পত্তি হ'য়ে গেছি।

দোকানে ঢুকেই সাহেবি ভঙ্গীতে ব'লে উঠলো, 'হ্যালো—আরে শ্যামল, তুমি।'

সেই চেয়ারে ব'সে সেই টেবিলে মুখ নিচু ক'রে লিখতে-লিখতে সে চমকে চোখ তুলে তাকালো অভিলাষের দিকে, তারপর ত্রস্তে এগিয়ে এসে অভিলাষের করমর্দন ক'রে সহাস্যে বলল, 'বাঃ অভিলাষ যে।'

'এই করছো আজকাল? বেশ, বেশ।'

ওস্তাদের মতো মুখভঙ্গি ক'রে অভিলাষ হাসলো। 'কী আর করা বলো? অনুপার্জিত আয় যখন নেই—' অভিলাষের মুখ কঠিন হ'লো—সে কথার জবাব না-দিয়ে লম্বা কাউণ্টারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে হেঁটে যেতে-যেতে বললে, 'একটু তোমার দোকানটা দেখি।'

'বেশ তো দেখ না।' বলে এইবার সে এগিয়ে এলো আমার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই মাথা নিচু করলো। আশ্চর্য্য লাজুক মানুষ। অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললাম, 'আমার রুমাল?'

'দিচ্ছি—' নিজের টেবিলের কাছে গেলো—ঠিক যে-ক'টা রুমাল আমি পছন্দ ক'রে গিয়েছিলাম—একটা ছোট্ট সোনালি বাক্সে ভরা সে-কটা রুমাল নিয়ে এলো টেবিল থেকে।

মৃদু হেসে বললাম, 'আলাদাই ছিলো দেখছি!'

মাথা নিচু ক'রেই বললো, 'তা ছিলো।'

'দিন—'

রুমালের বাক্সটা এগিয়ে ধরতেই অভিলাষ এদিকে এলো, 'কী নিচ্ছ?'

'ক'টা রুমাল।'

'দেখি কেমন—' বাক্সটা খুলে তচনচ ক'রে রুমাল দেখতে-দেখতে বললো, 'এ কী পছন্দ করেছ রুনি—চলো, আমি রুমাল কিনে দেবো তোমাকে।'

আমি ওর এই ব্যবহারে ভয়ানক লজ্জা বোধ করতে লাগলুম—হঠাৎ ওর তচনচ-করা রুমালগুলো মুঠোতে তুলে বললুম, 'তোমার যা নেবার নিয়ে এসো, আমি গাড়িতে যাচ্ছি।'

কারো দিকে না-তাকিয়ে গাড়িতে এসে বসতে-না-বসতেই অভিলাষ সিগারেটের টিন হাতে ক'রে ফিরে এলো। গাড়ি ছাড়তেই গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি বললাম ব'লেই জেদ্ ক'রে তুমি রুমালগুলো আনলে, না?'

'জেদ্ আবার কী—তুমি জানো যে ওগুলো আমি নেব ব'লে কথা দিয়েছি—সেখানে তোমার তাচ্ছল্যের ভঙ্গিটা না-করাই উচিত ছিল।'

'তুমিই বা ও-সব ছাইভস্ম পছন্দ করবে কেন? ওগুলো রুমাল? ওগুলো ভদ্রলোকে ব্যবহার করে? আসলে ঐ ছোকরার সুন্দর মুখই তোমার পছন্দ হয়েছে, রুমালগুলো নয়।' কথা কাটবার একেবারে প্রবৃত্তি ছিল না, তবু বললাম, 'তাই যদি হয়, তাহ'লেই বা তোমার এত ঈর্ষা কেন?'

'ঈর্ষা?'—হেসে উঠলো অভিলাষ—'ঈর্ষা করবার যোগ্য পাত্রই বটে। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে জিনিশ বিক্রি করছে যে-লোকটা তাকে ঈর্ষা করবে অভিলাষ দত্ত। রুনি, তোমার মাথা খারাপ।' জেদ চাপলো, বললাম, 'কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে বিক্রি করতে পারে—কিন্তু তাই বলে তাকে গণ্য করবো না এত বেশি আত্মমর্যাদাও আমার নেই।'

'কবে থেকে?' শ্লেষের ধার দিয়ে ও যেন আমাকে কাটতে চাইলো। এবার আমি চুপ ক'রে গেলাম। কেননা, এখন এই মুহূর্তে যে-কোনো অশ্লীল কথাই অভিলাষের মুখ দিয়ে বেরতে পারে।—ওর মন ছেলেবেলা থেকেই সন্দিহান—ওর বিলেত যাবার আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো। আমার এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিলো। সে অঙ্কের ছাত্র ছিলো—আমাকে অঙ্ক কষাতে আসতো,—এ নিয়ে অভিলাষ একদিন রাগ করলো। বললো, 'মেলামেশার একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার, হ'লোই বা ভাই।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম—'বলছো কী তুমি বোকার মতো!'

'আমি এ-রকমই বলি—'

'তবে তো তোমারও একটু মাত্রাজ্ঞান দরকার ছিলো'—আমি হেসে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু আমার চেষ্টার ফল হ'লো না, বললো, 'তোমাদের মেয়েদের আবার বিশ্বাস, তোমরা সব পারো—ঐ এক অঙ্ক কষার অছিলায় রাত-দিন একসঙ্গে থাকবার কী হয়েছে।'

'তোমার মন ভয়ানক ছোটো।'

আমি উঠে গেলাম সেখান থেকে। একটু পরেই আমার সেই ভাই এলো—এবং সে এসেছে টের পেয়েই আমি তাকে ডেকে নিয়ে চ'লে এলাম নিজের ঘরে। তার ঠিক তিন দিন পরে সে আমাদের এখানে খেয়েছিলো এবং ফিরতে তার রাত হ'লো। ট্রামের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন সে অপেক্ষা করছিলো তখন কে একজন ডেকে নিয়ে দূরে একটা অন্ধকার গলিতে তাকে এমন মার মেরেছিলো যে ঘণ্টাখানেক সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে ছিলো সেখানে। জানি না কে করেছিলো, কেন করেছিলো—কিন্তু তবু অভিলাষকে জড়িয়ে একটা সাংঘাতিক ধারণা আমার মনের মধ্যে আজও বদ্ধমূল হ'য়ে আছে।

[ক্রমশঃ।

"যাঁহারা কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্ম্মের মোহিনী মূর্ত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভা বড় খাটো হইয়া যায়।"—বঙ্কিমচন্দ্র

মহামুনি-শ্রীভরত-কৃত

নাট্যশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩

মূল :—আর যে নানা দৃষ্টি-সমন্বিত আস্যগত ভাব ইত্যাদি—তাহাও গৃহের প্রকৃষ্টতা-হেতু অত্যন্ত অব্যক্ততা পাইয়া থাকে। ২৩।

সঙ্কেত :—পাঠান্তর—যশ্চাপ্যাস্যগতো রাগো ভাবসৃষ্টিরসাশ্রয়ঃ (কাশী)—ইহার অর্থ হয় না। যশ্চ লাস্যগতো ভাবো নানাদৃষ্টিসমন্বিতঃ (কাশী পাঠান্তর)—ইহারও অর্থ হয় না। যশ্চাপ্যাস্যগতো রাসো ভাবদৃষ্টিরসাশ্রয়ঃ (বরোদা পাঠান্তর)—'রাসো' স্থলে 'রাগো' পাঠ হইলে উত্তম অর্থ হয়—ভাব-দৃষ্টি-রসাশ্রিত মুখ-রাগ—এই অর্থ বুঝায়। কিন্তু অভিনবগুপ্ত যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন—আমরা তদনুযায়ী অর্থ করিয়াছি। আস্যগত—মুখগত। আস্যগত ভাব—মুখভাব। ভাব বলিতে অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবগুলি বুঝাইতেছে—দৃষ্টি, অশ্রু, স্বেদ, বিবর্ণতা ইত্যাদি। তাহা ছাড়া মুখশোভা-সম্পাদক অলঙ্কারাদি—মুকুট ইত্যাদিও ইহার মধ্যে গণনীয়—ইহা অভিনবের অভিমত। মূলে আছে 'চ' (ইত্যাদি)—ইহার মধ্যে আঙ্গিক ভাবগুলিও গণনীয়। নানা দৃষ্টি—বিভিন্ন রস-ভাবাদির অভিব্যক্তিকালে বিভিন্নরূপ দৃষ্টির বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে—নাট্যশাস্ত্র অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। গৃহের—নাট্যগৃহের। প্রকৃষ্টতা-হেতু—অতিবিস্তীর্ণত্ব-হেতু। নাট্যগৃহ অতি বিস্তীর্ণ (জ্যেষ্ঠ পরিমাণের) হইলে অভিনেতৃবর্গের মুখভাব, দৃষ্টি, অলঙ্কারাদি শোভা, আঙ্গিক অভিনয়—এ সকলই অব্যক্ত হইয়া যায়—স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। অভিনব 'প্রকৃষ্টতা' পদটির দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—(১) অতিবিস্তীর্ণতা (২) অতিসঙ্কীর্ণতা। প্রগত হইয়াছে কৃষ্ট (অর্থাৎ কর্ষণ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য) যাহার তাহাই প্রকৃষ্ট—তাহার ভাব—প্রকৃষ্টতা—যাহার দৈর্ঘ্য নাই—অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ। এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে দ্বিতীয় অর্থটি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অর্থে—কনিষ্ঠ-পরিমাণের নাট্যমণ্ডপ সূচিত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ-পরিমাণের নাট্যমণ্ডপেও আস্যগত ভাব দৃষ্টি ইত্যাদি অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। এ অব্যক্ততা অতি-সামীপ্যকৃতা। মানবের দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা অতিদূরেও যেমন স্পষ্ট দেখিতে পায় না—অতিসমীপস্থ বস্তুকেও সেইরূপ স্পষ্ট দেখে না। ("অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ···সাংখ্যকারিকা ৭")।

তাই অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—ইহা দ্বিতীয় প্রকারের অব্যক্ততা; প্রথম প্রকারের অব্যক্ততা অতিদূরত্বকৃতা—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব, জ্যেষ্ঠমণ্ডপ ও কনিষ্ঠমণ্ডপ উভয় প্রকারের মণ্ডপেই মুখভাব দৃষ্টি ইত্যাদি অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়—এই কারণেই পর শ্লোকে প্রেক্ষাগৃহ-সমূহের মধ্যে মধ্যমই সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্টতম বলা হইয়াছে—অন্যথায় ঐ উক্তি অসংলগ্ন হইত (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫৪)।

মূল :—সেই হেতু—সকল প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে মধ্যমই ইষ্ট (বলিয়া গণ্য হয়)—যেহেতু উহাতে পাঠ্য ও গেয় ইত্যাদি অধিকতর শ্রব্য হইয়া থাকে। ২৪।

সঙ্কেত :—যস্মাৎ বাক্যং চ গেয়ঞ্চ সুখং শ্রাব্যতরং ভবেৎ (কাশী), —সুখশ্রব্যং ভবিষ্যতি (বরোদা পাঠান্তর)। পাঠ্য—বাচিক অভিনয়—সকল প্রকার অভিনয়ের মধ্যে ইহাই প্রধান—নাট্যের তনুস্বরূপ—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর গীত—প্রাণের উপরঞ্জক। মূলে দুইটি 'চ' আছে; দ্বিতীয় 'চ' (ইত্যাদি)—আতোদ্যের (বাদ্য) ও অন্য অভিনয়ের (আঙ্গিকাদির) সূচক। শ্রাব্যতর—অধিকতর সুখশ্রব্য।

মূল :—সকল প্রেক্ষাগৃহের তিন প্রকার বিধি প্রযোক্তৃগণ-কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া থাকে—বিকৃষ্ট চতুরস্র ও ত্র্যস্র। ২৫।

সঙ্কেত :—কাশী-সংস্করণে এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোকটি ধৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ পুনরুক্তি-বোধে উক্ত সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় বর্জ্জন করিয়াছেন। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে এই জাতীয় উক্তিই দৃষ্ট হয়, আর ত্রয়োদশ শ্লোকটিও ইহার অনুরূপ।

মূল :—নাট্যগৃহ-প্রযোক্তৃগণ-কর্ত্তৃক কনিষ্ঠ (নাট্যমণ্ডপ) ত্র্যস্র, ও চতুরস্র মধ্যম (বলিয়া) স্মৃত হইয়াছে; আর জ্যেষ্ঠ বিকৃষ্ট (বলিয়া) বিজ্ঞেয়। ২৬।

সঙ্কেত :—চতুর্দ্দশ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে—ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত—অতএব সেই দুই শ্লোকের সহিত ইহাদিগের পুনরুক্তি হইতেই পারে না। তবে সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকের সহিত পুনরুক্তি হওয়া সম্ভব। চতুর্দ্দশ শ্লোকের উপর আমাদিগের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই অভিনবের টীকায় শ্লোক দুইটি ধৃত হয় নাই। (নাট্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলিয়া ২৬ শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা চলে—ইহা চতুর্দ্দশ শ্লোকের সঙ্কেতে বলা হইয়াছে)।

মূল :—গৃহসমূহে ও উপবনসমূহে দেবগণের সৃষ্টি মানসী। পক্ষান্তরে মানুষ সকল ভাব যত্নভাব-দ্বারা বিনির্ম্মিত। ২৭।

সঙ্কেত :—'সর্ব্বে ভাবা হি' (বরোদা); সর্ব্বে ভাবাস্তু (কাশী) —শেষোক্ত পাঠটিই ভাল। তু—পক্ষান্তরে। দেবগণের সৃষ্টি মানসী (অযত্নসাধ্যা), আর মানুষগণের সৃষ্টি যত্নসাধ্যা—এই পার্থক্য দেখাইতে হইলে 'তু' পাঠটিই সঙ্গত বোধ হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পঞ্চম শ্লোকে (মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৫১) করা হইয়াছে।

এই শ্লোকে প্রধান বিচার্য্য—পঞ্চম শ্লোকের সহিত এই শ্লোকটির পুনরুক্তি হইয়াছে কি না। এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না; কারণ, কাশী-সংস্করণেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে আর অভিনবগুপ্তও ইহা নিজ টীকায় ধরিয়াছেন।

পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে—নরগণের ক্রিয়া শারীর-প্রযত্নসাধ্য—দেবগণের ক্রিয়া মানসী; অতএব ইতিকর্ত্তব্যতা মানুষের পক্ষেই বিহিত—দেবগণের কোন ইতিকর্ত্তব্যতাই নাই—কারণ, তাঁহাদিগের শারীর-ক্রিয়াই নাই—তাঁহাদিগের ক্রিয়া মানসী। আর এ স্থলে বলা হইতেছে অন্য কথা। ২৪ শ্লোকে বলা হইল যে—প্রেক্ষাগৃহ-সমূহের মধ্যে মধ্যম-পরিমাণই ইষ্টতম। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি দেবগণ প্রেক্ষক-শ্রেণীভুক্ত হন, তাহা হইলেও কি মধ্যম-পরিমাণ নাট্যমণ্ডপ ইষ্ট হইবে? এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তই ২৭ শ্লোকের অবতারণা। ইহাতে বলা হইল—দেবগণের মানসী সৃষ্টি—তাঁহাদিগের দর্শনাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার তাঁহারা অসঙ্কোচে করিতে পারেন—সে বিষয়ে মানুষের চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি সঙ্কুচিত—অতএব মানুষ-সৃষ্ট রঙ্গালয়-সম্বন্ধেই এই সকল বিধি উক্ত হইয়াছে। মধ্যম-পরিমাণ নাট্যমণ্ডপ মানুষের পক্ষেই বিহিত। অতএব, পঞ্চম শ্লোকের সহিত পুনরুক্তি হয় নাই।

মানসী সৃষ্টি—দেবগণের মন সত্ত্ববহুল, তাঁহাদিগের মনঃশক্তি নিরঙ্কুশ—তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তিও মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির ন্যায় সঙ্কুচিত—পরিচ্ছিন্ন নহে। তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তি বা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অতিদূরব্যাপী। উপবন সাধারণতঃ সুবিস্তৃত হয়। গৃহসমূহ—এস্থলে বহুবচনও এই বিস্তৃতির সূচক। সুবিস্তৃত গৃহে ও উপবনে

পর্য্যন্ত দেবগণের ইন্দ্রিয়শক্তি অবাধে ব্যাপৃত হইয়া থাকে—নাট্য-মণ্ডপের ত কথাই নাই। অতএব, জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ-পরিমাণের মণ্ডপে মানবের দর্শন-শ্রবণাদি অস্পষ্ট-ভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও দেবগণের সেরূপ সম্ভাবনা নাই। অতএব, জ্যেষ্ঠাদি পরিমাণ (বিশেষতঃ দণ্ডসমাশ্রিত)* সাত্ত্বিক-প্রকৃতি দেবগণের নিমিত্তই বর্ণিত হইয়াছে। রাজস-প্রকৃতি মানবগণের দর্শন-শ্রবণাদির পক্ষে অনুকূল মধ্যম-পরিমাণ নাট্যমণ্ডপ (আর তাহাও দণ্ড-সমাশ্রিত নহে—হস্ত-সমাশ্রিত—ইহা বুঝিতে হইবে)।

মূল :—অতএব দেবকৃত ভাবের সহিত মানুষ প্রতিস্পর্দ্ধা করিবে না। মানুষ-গৃহেরই লক্ষণ সম্যগ্‌রূপে বলিব। ২৮।

সঙ্কেত :—ভাব—পদার্থ, বস্তু। দেবকৃতৈর্ভাবৈর্ন বিস্পর্দ্ধেত মানুষঃ—দেবগণের সৃষ্ট বস্তুর সহিত নিজ সৃষ্ট পদার্থের প্রতিস্পর্দ্ধিতা করা মানুষের উচিত নয়। কারণ, দেবগণের মানসিক ও ঐন্দ্রিয়িক শক্তি মানবের অপেক্ষা অনেক অধিক। দেবগণ মানসী সৃষ্টি করিতে পারেন, মানুষ শারীরিক প্রযত্ন ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার পর দেবগণ সুবৃহৎ নাট্যমণ্ডপেও অব্যাহত ভাবে দর্শন-শ্রবণাদি করিতে পারেন, কারণ, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তি মানবের ন্যায় সঙ্কুচিত নহে; কিন্তু মানব তাহা পারে না, যেহেতু, তাহার ইন্দ্রিয় শক্তি সঙ্কুচিত। এ কারণে দেবতাগণ যদি দণ্ড-সমাশ্রয় জ্যেষ্ঠ-পরিমাণের নাট্যমণ্ডপে নাট্যাভিনয় করেন, তবে মানবগণেরও তাহার দেখাদেখি দেবগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দণ্ড-সমাশ্রিত জ্যেষ্ঠ-পরিমাণের নাট্যগৃহে নাট্যাভিনয় করা উচিত হইবে না। দেবগণের উক্ত প্রকার নাট্যমণ্ডপে দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া অবাধে চলিবে—কিন্তু ঐরূপ সুবৃহৎ মণ্ডপের এক প্রান্ত হইতে মানুষ স্পষ্ট দেখিতে বা শুনিতে পাইবে না। অতএব, দেবসৃষ্টির সহিত মানুষের নিজসৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত নহে; এই কারণে মহর্ষি মানুষের উপযোগী নাট্যগৃহেরই লক্ষণ এ স্থলে বলিতেছেন। মানুষস্য তু গেহস্য—তু—এব (ই) (অ: ভা:, পৃ: ৫৫)।

মূল :—প্রযোজক পূর্ব্বেই ভূমির বিভাগ পরীক্ষা করিবেন। তাহার পর যদৃচ্ছাক্রমে প্রমাণতঃ বাস্তু (নির্ম্মাণ করিতে) আরম্ভ করিবেন। ২৯।

সঙ্কেত :—পরীক্ষেত বিচক্ষণঃ (কাশী); পরীক্ষেত প্রযোজকঃ (বরোদা)। বাস্তু প্রমাণেন প্রারভেত যদৃচ্ছয়া (বরোদা); বাস্তু-প্রমাণঞ্চ···শুভেচ্ছয়া (কাশী)। ভূমির বিভাগ—কোন্‌টি হেয় (ত্যাজ্য) আর কোন্ ভূমিভাগটি উপাদেয়—এই বিভাগ (অ: ভা: পৃ: ৫৫)। প্রারভেত কর্ত্তুমিতি শেষ: (অ: ভা:, পৃ: ৫৫)।

মূল :—যে ভূমি সমা, স্থিরা, কঠিনা ও কৃষ্ণা বা গৌরী হইবে, কর্ত্তৃগণ-কর্ত্তৃক তথায়ই নাট্যমণ্ডপ কর্ত্তব্য। ৩০।

সঙ্কেত :—পূর্ব্বশ্লোকে যে বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, এ শ্লোকে সেই বিভাগের উপাদেয় (গ্রহণযোগ্য) অংশটির কথা বলা হইতেছে—কিরূপ ভূমি নাট্যমণ্ডপ-নির্ম্মাণের পক্ষে অনুকূল। সমা—যে ভূমিভাগ স্বভাবতঃ অতি নিম্ন বা অতি উচ্চ নহে। স্থিরা—অচলন-স্বভাবা; যাহাতে ভিত্তি বসিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। কঠিনা—অনূষরা (অ: ভা:, পৃ: ৫৬)। কৃষ্ণা গৌরী চ যা ভবেৎ—অভিনব বলিয়াছেন—এ স্থলে 'চ' পদের অর্থ 'বা'—মতান্তরে ব্যামিশ্র (অর্থাৎ কৃষ্ণা ও গৌরী একত্র মিশ্রিত)—"চো বার্থে, অন্যে তু ব্যামিশ্রিতত্ব-মেবাহু:" (অ: ভা:, পৃ: ৫৬)।

মূল :—প্রথমে শোধন করিয়া লাঙ্গল-দ্বারা সম্যগ্‌রূপে উৎকর্ষণ করিতে হইবে—অস্থি-কীল-কপালাদি ও তৃণগুল্ম শোধিত করিবে। ৩১।

সঙ্কেত :—শোধন—বাস্তুভূমি-শুদ্ধি—ভূমির উপরিস্থিত অশুচি দ্রব্য কাঁকর ইত্যাদির অপসারণ। তাহার পর হল-দ্বারা মাটি বেশ করিয়া চষিয়া মাটির মধ্যে প্রোথিত অস্থি ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে (সমুৎকৃষেৎ)। অস্থি—হাড়; বাস্তুর নিম্নে হাড় থাকিলে উহা শল্যরূপে গণ্য হয়—উহাতে গৃহস্বামীর বহু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে—এ কারণে শল্য উদ্ধার করা একান্ত কর্ত্তব্য। কীল—গোঁজ; ইহাও শল্যতুল্য অনিষ্টকর। কপাল—নরকপাল—মানুষের মাথার খুলি—ইহা ত অত্যন্ত অনিষ্টকর; অথবা ঘটের ভগ্নাংশকেও কপাল (খোলা) বলা যায়—বাস্তুর নিম্নে ইহাদিগের অস্তিত্ব বিশেষ অনিষ্টকর। তৃণ-গুল্ম—ঘাস, ছোট ছোট গাছের ছোপ—এগুলিরও লাঙ্গল চষিয়া পরিষ্করণ কর্ত্তব্য।

মূল :—বসুমতী শোধন করিয়া তত:পর প্রমাণ নির্দ্দেশ কর্ত্তব্য। [তিনটি উত্তর (নক্ষত্র), সোমাধিষ্ঠিত নক্ষত্র, বিশাখা ও রেবতী। ৩২। হস্তা, পুষ্যা ও অনুরাধা নাট্যকর্ম্মে প্রশস্ত।] পুষ্য-নক্ষত্রযোগে শুক্লসূত্র প্রসারণ করিবে। ৩৩।

সঙ্কেত :—ব্রাকেট-মধ্যস্থ অংশের উপর অভিনবের টীকা নাই—সম্ভবতঃ এই কারণে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত-বোধে ব্রাকেট-মধ্যেই ছাপা হইয়াছে বরোদা-সংস্করণে। কিন্তু অভিনব না ধরিলেই যে উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে—এরূপ কোন যুক্তি নাই। কাশী-সংস্করণেও ঐ অংশটি ধরা আছে। তিনটি উত্তর নক্ষত্র—উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনী। সৌম্য (মূল)—সোম যাহার অধিপতি; এক হিসাবে ২৭টি নক্ষত্রই সৌম্য—কারণ সোম উহাদিগের সকলেরই স্বামী বলিয়া পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে। জ্যোতিষে ২৭ নক্ষত্রের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ অধিপতি দেবতা উক্ত হইয়াছে—যথা অশ্বিনীর অধিপতি দেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভরণীর যম ইত্যাদি। সে হিসাবে মৃগশিরা: নক্ষত্রের অধিপতি দেবতা শশী (বা সোম)। হস্ত—হস্তা। তিষ্য পুষ্যা। শুক্লসূত্র—অভিনব বলিয়াছেন পিটুলি দিয়া উহা মাজিতে হইবে (পিষ্টরঞ্জনাদিনা'—অ: ভা:, পৃ: ৫৬)। অভিনবের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—পিটুলি দিয়া মাজিলে সূত্র শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত ও দৃঢ় হইবে। চর্ম্মকৃত মানসূত্র কর্ত্তব্য নহে। [ক্রমশঃ

* নাট্যমণ্ডপ দুই প্রকার—দণ্ড-সমাশ্রিত ও হস্ত-সমাশ্রিত। এক দণ্ড চারি হস্ত। দণ্ড-সমাশ্রিত নাট্যমণ্ডপ অতি বৃহৎ। একারণে হস্ত-সমাশ্রিত মণ্ডপই মানুষগণের পক্ষে উপযোগী।

"বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"—রবীন্দ্রনাথ

অধিকার কায়েম

জার্ম্মানি যে সব প্রদেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, সম্প্রতি বমার ও কামানের জোরে মিত্রবাহিনী সে সব প্রদেশের বহু অংশই পুনরধিকারভুক্ত করিতেছে—বোমা ফেলিয়া মিত্রশক্তি প্রথমেই করিতেছে ধ্বংস-লীলা সাধন। তার পর বোমা-বর্ষণে বিধ্বস্ত অঞ্চল-সমূহ অধিকার করিবামাত্র সেখানকার কল-কারখানাগুলি যাহাতে অচল না হইয়া চালু হয়, সেজন্য ফৌজের পিছনে-পিছনে চলে সঞ্জীবনী-ট্রেণ। ট্রেণে আটখানি করিয়া গাড়ী আছে। যে সব পাওয়ার-ষ্টেশন মিত্র-বাহিনীর বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়, সেগুলির সামনে এ ট্রেণ আনিয়া ট্রেণ-সংরক্ষিত বৈদ্যুতিক প্রবাহে নিমেষে জীর্ণ পাওয়ার-ষ্টেশনকে সঞ্জীবিত করিয়া দিকে-দিকে সে প্রবাহ সঞ্চালিত করা হয়। যে শক্তি ট্রেণে সঞ্চিত থাকে, তাহাতে বড় একখানি যুদ্ধ-জাহাজ চলিতে পারে সবেগে প্রায় পাঁচ শত মাইল! ট্রেণের প্রতি কামরায় কন্‌ডেন্সার আছে—প্রত্যেক কন্‌ডেন্সার হইতে মিনিটে আট লক্ষ ফুট পরিমাণ বাতাস নিঃসারিত হয়। এই ট্রেণের কল্যাণে দেশ-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জীবন ও কর্ম্ম-ধারাকে অব্যাহত রাখার যে ব্যবস্থা, তার আর তুলনা নাই!

অচলকে চালু

চুম্বক সম্মার্জ্জনী

যুদ্ধের নানা সরঞ্জাম-নির্ম্মাণে মিত্র-ফ্যাক্টরিগুলিতে অহর্নিশ যেন রাজসূয় যজ্ঞ চলিয়াছে! কাঁটা পেরেক, পিন, ওয়াশার প্রভৃতি যে সব ধাতব-সামগ্রী কাজের সমারোহে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তাদের সংখ্যা যেমন নির্ণয় করা কঠিন, তেমনি সেগুলি বাছিয়া কুড়াইতে না পারিলে অপচয় ঘটে প্রচুর। এ-কাজকে সহজ ও অনায়াস করিবার জন্য সমর-বিভাগের শিল্পীরা এক-রকম চুম্বক সম্মার্জ্জনী তৈয়ারী করিয়াছে! চুম্বকে ড্রাম তৈয়ারী করিয়া সুকৌশলে সে-ড্রামকে চক্রযুক্ত বাক্সে আঁটা হইয়াছে; লম্বা হাতা ধরিয়া এই বাক্স ঠেলিয়া টানা হয়; যন্ত্রযোগে বাক্স চলে এবং ড্রামটি ঘুরিতে থাকে। ফ্যাক্টরির মেঝেয় ড্রাম চালাইবামাত্র মেঝেয় বিক্ষিপ্ত লোহা পেরেক প্রভৃতি ড্রামের গায়ে আঁটিয়া ধরে; তখন সংগ্রহ করা সহজ হয়। ড্রামটি ৮১ ইঞ্চি মাত্র চওড়া। যুদ্ধ-শেষে এ সম্মার্জ্জনী নানা কাজে লাগিবে।

চুম্বক সম্মার্জ্জনী

অস্ত্রোপচারে সহায়

আমাদের দেহের কোনো জায়গা কাটিয়া গেলে রক্তপাত হয়। দেহ-নিঃসৃত এই রক্তে প্রোটিন-জাতীয় এক প্রকার পদার্থ থাকে। সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েক-জন বিশেষজ্ঞ মানব-দেহ-নিঃসৃত এই রক্ত হইতে স্পঞ্জের মত একরূপ আঠালো পদার্থ তৈয়ারী করিয়াছেন; এ পদার্থের স্পর্শমাত্র রক্ত-পাত চকিতে বন্ধ হয়। এই নবাবিষ্কৃত পদার্থের তাঁরা নাম দিয়াছেন ফাইব্রিন্ ফোম। এই ফোমের সাহায্যে মস্তিষ্কে ও শিরা-উপশিরায় অস্ত্রোপচার যেমন ক্ষিপ্র তেমনি নির্ব্বিঘ্ন-নিরাপদ হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা আশা করেন এই ফোমের সাহায্যে অস্ত্রোপচার অচিরে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ এবং অস্ত্রোপচারে রক্তস্রাব ঘটিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কাও একেবারে তিরোহিত হইবে।

রক্ষা-বোট

বোল-গেজী ইস্পাতে মার্কিণ সমর-বিভাগ এক-জাতের জীবন-রক্ষক বোট তৈয়্যারী করিয়াছে। এ বোট জলে ডুবিতে জানে না!

রক্ষা বোট

বোটখানি লম্বে ১৬ ফুট। দাঁড় বহিয়া এ বোটকে যেমন চালানো যায়, তেমনি আবার শুধু ভরা পালেও এ বোট জলে চলে! বোটের আপাদমস্তক বাহির হইতে আঁটা। দেখিলে মনে হয় যেন প্যাকিং বাক্স। জলের বুকে যেমন করিয়াই এ-বোটকে ফেলিয়া দিন—মাথা তুলিয়া বোট ঠিক ভাসিয়া উঠিবে এবং মাথা থাকিবে উপর দিকে। বোটটিতে আছে এয়ার-টাইট ১১টি কামরা। বোটে ২০ জন লোক ধরে এবং লোকের সঙ্গে ধরে হাল, দাঁড়, নোঙ্গর, মাস্তুল, রশদ, খাদ্য,

বাক্স ভেলা
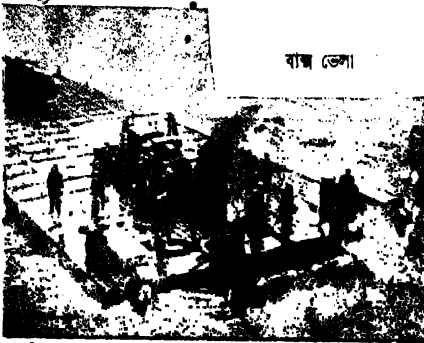
পানীয়, কম্বল, মাছধরার সরঞ্জামাদি, ঝড়-প্রতিরোধক তৈল প্রভৃতিতে আধ টন মাল-পত্র। খালি বোটের ওজন প্রায় সাড়ে ত্রিশ মণ।

—

অতিকায় প্লেন

ফিলাডেলফিয়ার বাড কোম্পানি বিপর্য্যয়-সাইজের প্লেন তৈয়্যারী করিয়াছেন। প্লেনের নাম কনেষ্টোগা। বে-দাগ ইস্পাতে এ প্লেন তৈয়্যারী হইয়াছে যুদ্ধের জন্য রশদ-পত্র বহিবার জন্য। প্লেনের মধ্যে আছে ২৪টি শীট এবং উড়ন্ আম্বুলান্স। প্লেনখানি লম্বে ৬৮ ফুট—পাখা দুখানির প্রত্যেকটির বিস্তার ১০০ ফুট করিয়া। দুখানি ১২০০ অশ্বশক্তি-এঞ্জিনে এ প্লেন চলে ঘণ্টায় ১৬৫ মাইল

অতিকায় প্লেন

বেগে। পেটের মধ্যে হাতী-ঘোড়াকে স্থান না দিলেও বড় বড় মোটর-গাড়ী পুরিয়া এ প্লেন অনায়াসে আকাশ-পাড়ি-সমাধানে সমর্থ। ১২৫ মণ ওজনের ভার-বহন—কনেষ্টোগা প্লেনের পক্ষে খুবই তুচ্ছ ব্যাপার!

—

বাক্স-ভেলা

সম্প্রতি নর্ম্যাণ্ডির কূলে নামিতে ধাতু-নির্ম্মিত বহু বাক্সে ভেলা তৈয়্যারী করিয়া সেই ভেলায় চড়িয়া মিত্র-বাহিনী চ্যানেল পার হইয়াছিল—রশদ-ট্যাঙ্ক-সমেত। আটু, আফ্রিকা, সিসিলি এবং ইতালীতেও এমনি ভেলার সাহায্যে মিত্র-বাহিনী বহু নদ-নদী পার হইয়াছিল। ভেলার সম্মুখে ও পিছনে একখানি করিয়া—মোট দুখানি মোটর-এঞ্জিন বসাইয়া পারাপারের কার্য্য সমাধা হয়। প্রয়োজন মত বাক্সগুলির মধ্যে জল ভরিয়া এ ভেলা সেতুতে পরিণত করাও চলে।

—যাযাবর—

দিনেশ দাস

এই সায়াহ্নেই
মনে হয় এখানে জীবন নেই,
নিষ্প্রাণ কঙ্করে
পিঙ্গল বালির ঢেউ সারাদিন শুধু হা-হা করে,
মনে হ'ল এই দিনান্তেই
এখানে জীবন নেই।

কালো ছায়া পড়ে
ধূ-ধূ-করা বালির উপরে
কালো কালো ছায়া সরে বালির মতই মসৃণ,
ধীরে ধীরে এ-মরুভূ ডুবে গেল অন্ধকারে—
নিভে গেল দিন।

শোনো!
কারা পথ হাঁটিছে এখনো
রিক্ত পরিশ্রান্ত পদক্ষেপ
ঝরানো পাতার মত বাতাসে ছড়ায় আক্ষেপ।

রাত্রি নামে—থামে কোলাহল,
আরব তিব্বত আর কির্‌ঘিজ ষ্টেপিসে
থামে যত বেদুইন-দল:
আর এরা এখনো যে পথ চলে
শুধু পথ করেই নির্ভর,
কোথাকার কোন্ যাযাবর?

এদের চিনেছি আমি—এদের সকলে
এগারোশো ছিয়াত্তরে এরা পথে এসেছিল
তেরশো পঞ্চাশে দলে দলে,
আজো দেখি এরা পথ হাঁটে
বাঙলা বিহার গুজরাটে
মাদ্রাজ পাঞ্জাবে
কত দূরে হেঁটে হেঁটে যাবে
অনির্দেশ—
কোথায় পথের শেষ—কবে এ পথের শেষ!

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

৮

প্যাসেঞ্জার ট্রেণ মন্থর-গতিতে চলিয়া যখন তাহার বিশেষ ষ্টেশনটিতে পৌছিল তখন সন্ধ্যার কিছু দেরি থাকিলেও হেমন্তের সূর্য্য ম্লান হইয়া আসিয়াছে। ছোট ষ্টেশন, লোকজন ওঠা-নামা করে কম—সুতরাং ট্রেণ পূরা এক মিনিটও বোধ হয় দাঁড়ায় না। ভূপেন আগে হইতেই কামরার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ী ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'কুলী'—'কুলী' করিয়া ডাকাডাকি শুরু করিল কিন্তু কোথায় কুলী? কাছাকাছি কোথাও কুলী বা ঐ জাতীয় কাহারও চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। এধারে তখনই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিয়া দিয়াছে, অগত্যা সে নিজেই স্যুটকেশ ও ভারী বিছানার বাণ্ডিলটা লইয়া কোনমতে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

এইবার ভূপেন ষ্টেশনটার দিকে চোখ বুলাইবার অবকাশ পাইল। নিতান্তই ছোট ষ্টেশন—কাছাকাছি লোকালয়ও বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। যে দিকে চোথ ফেরায় শুধু মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে। সেই দিগ্‌দিগন্ত জোড়া মাঠেরই মধ্য দিয়া দুইগাছি কালো সুতার মত রেল লাইন যেন আকাশের কোল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অপর দিকের আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিলে সেটাকে লাইন বলিয়া বোঝা যায়—সেইখানে আরও গোটা কতক লাইন বাহির হইয়াছে। ওপাশে মাল নামাইবার একটা প্ল্যাটফর্ম্ম আছে—এ ধারের যাত্রিবাহী প্ল্যাটফর্ম্মটাও খুব ছোট নয় কিন্তু সে সবই ফাঁকা, জনহীন। অন্ত সময় কখনও এ সবের প্রয়োজন হয় কি না বোঝা কঠিন—এখন এগুলিকে নিতান্ত পরিহাস বলিয়াই মনে হয়। টিনের ছোট ষ্টেশন ঘরটা না থাকিলে ইহাকে ষ্টেশন বলিয়া চেনা মুস্কিল হইত। ষ্টেশন বলিতে এতদিন যে সব ছবি ভূপেনের মনের মধ্যে ছিল, তাহার কোনটার সঙ্গেই যেন মেলে না— কুলীর গোলমাল নাই, খাবার-ওয়ালা নাই—এমন কি একটা পান-বিড়ি বিক্রেতা পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না।

এই জনহীন ষ্টেশন-মরুতে 'কুলী' খুঁজিবার প্রবৃত্তি আর তাহার ছিল না, কিন্তু দুইটি ভারি জিনিষ নিজে বহন করিয়া কতদূরই বা লইয়া যাইবে! কোন্ দিকে স্কুল তাও সে জানে না, কতটা পথ হাঁটিতে হইবে তাহারও ঠিক নাই। সে আর একবার ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল একটি মধ্যবয়সী লোকের সঙ্গে তেরো-চোদ্দর ছেলে মাঠ ভাঙিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে ছুটিতেছে এবং তাহার দিকে হাত নাড়িয়া কী ইঙ্গিত করিতেছে।

অগত্যা সে সেইখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। ততক্ষণে ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার খোপে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। প্লাটফর্মে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। একটু পরেই সেই দলটি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া হাজির হইল। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু এই বয়সেই গায়ের চামড়া কুঁচকাইয়া গিয়াছে বৃদ্ধদের মত, গায়ের রংও হয়ত এককালে ফরসা ছিল, গলার খাঁজের দিকে চাহিলে সেটা বোঝা যায় কিন্তু মুখখানা যেন পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। পরণে একটি খাটো কাপড়, গায়ে অত্যন্ত মলিন হাফসার্ট—পা খালি, একেবারে খালি নয়—হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গের ছেলেগুলির বেশভূষা আরও দীন—কাহারও গায়ে জামা নাই, শুধু গেঞ্জি ভরসা। বলা বাহুল্য পা সকলকারই খালি।

ইহারা ইস্কুল হইতে আসিয়াছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন, তবু ভূপেন তাহাদেরই দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল। বয়স্ক লোকটি একটু দম লইয়া কহিল, আপনিই কি নতুন মাষ্টার মশাই এলেন কলকাতা থেকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভূপেন জবাব দিল, আমার নাম শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।

লোকটি আসিয়াই একবার ঘটা করিয়া নমস্কার করিয়াছিল, এখন আর একবার নমস্কার করিয়া কহিল, আমরা আপনাকেই নিতে এসেছি। আমার নাম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মণ্ডল, আমি এখানকার থার্ড মাষ্টার।

তারপর, ভূপেনের স্তম্ভিত ভাব কাটিবার পূর্ব্বেই, তিনি নিজে তাহার স্যুটকেশটা তুলিয়া লইয়া ছেলেদের উদ্দেশে কহিলেন, নে-রে, তোরা কেউ বিছানাটা নে।

ভূপেন বিষম লজ্জিত হইয়া তাঁহার হাত হইতে স্যুটকেশটা ফিরাইয়া লইতে গেল, ওটা আমাকে দিন, ছি-ছি, আপনি কেন নিচ্ছেন—আমিই—

কিন্তু অক্ষয় বাবু ততক্ষণে চলিতে শুরু করিয়াছেন, তিনি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, বাবু, আপনাদের এ সব অভ্যাস নেই, আপনারা কি পারেন বইতে। তাছাড়া পথও ত কম নয়, প্রায় আধ ক্রোশ। অবিশ্যি আমাদের এ পথ কিছু লাগে না, আমরা রোজই ধরুন এখানে বেড়াতে আসি, কিন্তু আপনাদের কথা আলাদা। ট্রামে-বাসে চলা অভ্যাস আপনাদের—

তারপর সখেদে কহিলেন, এটা কি একটা দেশ না কি? না একটা গাড়ী ঘোড়া, না একটা কুলী। পয়সা দিয়েও ইচ্ছামত একটা খাবার পাবেন না।···নিতান্ত প্রেটের দায়ে পড়ে থাকা।

তিনি স্যুটকেশটা হাতে ঝুলিয়া হাঁটিতে শুরু করিলেন। ছেলের দলও বিছানাটা তুলিয়া লইয়াছে; অগত্যা ভূপেন বাধ্য হইয়াই অক্ষয় বাবুর অনুসরণ করিল। কিন্তু ব্যাপারটার গ্লানি ও লজ্জা তাহাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে লাগিল।

ষ্টেশনের সীমানা পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই ভূপেন বুঝিল কেন ইহারা সকলে খালি পায়ে আসিয়াছে। পথ পাকা নয়, তা না হউক, কিন্তু কাঁচা রাস্তা বলিতে ভূপেনের যে ধারণা ছিল তাহার সহিতও ইহার কিছুই মেলে না। অনেক দিন আগে সে কি একটা উপলক্ষে খাঁকুড় ষ্টেশনে নামিয়া ভিতরের দিকে অনেকটা গিয়াছিল। সেখানেও কাঁচা রাস্তা, তবে এ রাস্তার তুলনায় সে কিছুই নয়। সেখানে স্বচ্ছন্দে জুতা পায়ে ঘুরিয়া আসা গিয়াছিল কিন্তু এখানে প্রথম পা দেওয়া মাত্র ময়দার মত মিহি ধূলায় তাহার পায়ের গোছ সুদ্ধ ডুবিয়া গেল। হাত তিন-চার পথ যাইবার পরই তাহার নূতন জুতাটার যে অবস্থা হইল, তাহাতে জুতা বলিয়া চেনাই কঠিন। ভূপেনের একবার ইচ্ছা হইল জুতাটা খুলিয়া হাতে করে কিন্তু নিতান্ত চক্ষুলজ্জাতেই পারিল না।

সে বার বার পায়ের দিকে চাহিতেছে লক্ষ্য করিয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন, ও আর কি দেখছেন! জুতো পায়ে দেওয়া এখানে চলে না। নেহাৎ যদি চান ত হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে ইস্কুলটা পর্য্যন্ত যেতে পারেন, পথে বেরোনো চলবে না।···তা এক রকম ভাল, জুতোর খরচটা বেঁচে যায়, কি বলেন?

তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই এক চোট হাসিয়া লইলেন, তারপর কহিলেন, অসুবিধা হয় ত ঐ ছেলেগুলোর কাউকে দেন না, জুতাটা খুলে—নিয়ে চলুক।

ভূপেন প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, কিছু দরকার নেই।···তা ছাড়া এখনও ত আপনাদের দেশে অভ্যস্ত হইনি—খালি পায়ে চলতে পারব না।

ষ্টেশনের তারের বেড়া পার হইয়া আসিয়াই একটা বড় চালার নীচে পাশাপাশি ঘরে পোষ্ট আফিস, মনোহারীর দোকান ও একটা খাবারের দোকান পড়িল। ষ্টেশনের মালের শেড্‌টা আড়াল ছিল বলিয়া প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে ভূপেন দেখিতে পায় নাই। খাবারের দোকান বলিয়াও চেনা যাইত না, যদি না মোদকের পুত্র সেই সময়ই রসগোল্লা পাক করিতে বসিত—কারণ ধূলার ভয়ে এখানে খাদ্যদ্রব্য বাহিরে সাজানোর রীতি নাই, সাধারণ ঘরের মধ্যেই দোকান। কেরোসিনের পুরানো টিনে রসগোল্লা থাকে বারকোস চাপা, খরিদ্দার চাহিলে অন্ধকার ঘরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেয়। পাশের মনোহারী দোকানটিতে কিছু কিছু মাল বাহিরের দিকে সাজানো আছে বটে কিন্তু তাহার প্রত্যেকটির উপর যে পরিমাণ ধূলা জমিয়াছে তাহাতে কোন্‌টা কি জিনিস, দূর হইতে চিনিবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

তবু, লোকালয়ের চিহ্ন ঐ তিনটি ঘরেই কিছু মেলে, সেই চালাটা ছাড়াইয়া আসিয়া পথ চলিতে চলিতে ভূপেন যেদিকেই চায় শুধু মাঠ। মধ্যে দু-এক টুকরা ধান জমি আছে, সেই টুকুতেই দৃষ্টি বা আরাম পায়, নহিলে শুধুই ডাঙা—রুক্ষ, অনুর্ব্বর তৃণশূন্য বসতিশূন্য কঠিন সে ভূমি, সে দিকে চাহিলে বাংলা দেশের গ্রাম বলিয়া চেনাই যায় না। গাছের মধ্যে দু-একটা জায়গায় কাঁটা গাছ, আর দূরে দূরে এক-একটা শুষ্কিয়া তালের বৃক্ষ। বহু দূরে, মাঠের প্রায় প্রান্তে দু-একটা চালার মত কি নজরে পড়ে। তাহারই সঙ্গে গাছ-পালার একটা সবুজ রেখা তৃষিত পথিকের প্রাণে আশা জাগাইয়া আকাশের কোলে আঁকা রহিয়াছে। কিন্তু সে এতই দূরে যে ভয় হয়, বুঝি বা ওটা চোখেরই ভ্রম।···

অনেকটা হাঁটিবার পর যেটাকে মাঠের প্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহার কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ পথ এবং সেখানের জমি, দুই-ই নীচের দিকে হেলিয়া পড়িতে দেখা গেল, সামনেই অনেকগুলি চালাঘর জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে, গাছ-পালারও খুব অভাব নাই। অর্থাৎ—এইটিই গ্রাম। শুধু তাই নয়, দুই-একটি পাকা বাড়ীও নজরে

পড়ে, যদিচ ধুলায় তাহাদের দেওয়ালের চুণের মৌলিক রঙ অনেক দিনই চাপা পড়িয়াছে।

অক্ষয় বাবু বুঝাইয়া দিলেন, এইটেই হ'ল এখানকার গ্রাম। ইস্কুলটা কিন্তু আর একটু দূরে—ঐ সামনের মাঠটা পেরিয়ে। এখানকার জমিদার ইস্কুলের জমি বাড়ী দুই-ই দান করেছেন কি না, কাছাকাছি জমি পাওয়া যায়নি।···এইটে হ'ল এখানকার ডাক্তারের বাড়ী, ইনিই এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। আর এই হ'ল তারিণী বাবুর বাড়ী, খুব সাধক লোক ছিলেন, সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। ওঁর ছেলে আছে অবিনাশ সে-ও খুব বিদ্বান, সদরে ওকালতি করে। ভদ্রপাড়া বলতে এই সাত আট ঘর, বাকী সবই ছোট জাত আর মুসলমান!

ক্লান্ত ভূপেন সব কথা মন দিয়া শুনিলও না, শুধু অবসন্ন ভাবে একবার চাহিয়া দেখিলমাত্র। জুতার মধ্যে ধুলা জমিয়া ভারী হইয়াছে, মেঠোপথে চলিয়া পা-ও আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—এখন সে কোথাও বসিতে পারিলে বাঁচে।

অক্ষয় বাবু তখনও বক্তৃতা করিয়াই চলিয়াছেন, দূরে থাকা একরকম ভাল, বুঝলেন না? গরম পড়লেই কলেরা, আর ফি বৎসর গ্রাম যেন উজোড় হয়ে যায়, আমাদের ওটা অনেক দূরে বলে বেঁচে গিয়েছি, তবু মশায় এক কুয়ো নিয়ে বিভ্রাট,'খুব যখন রোগটা চাপে তখন সারা রাত জেগে কুয়ো পাহারা দিতে হয়।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

কুয়ো ত এদিকে খুব বেশী নেই, থাকলেও অত খরচ করে কে কাটাবে মশাই? অধিকাংশ কুয়োতেই জল যায় শুকিয়ে গরম না পড়তে পড়তেই; তখন সব ছোটে হোষ্টেলের কুয়োয় জল নিতে, আমাদের চাকরই তুলে দেয় যতটা পারে—কিন্তু যখন তখন ত আর তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ ওদের তুলতে দিলেই সর্ব্বনাশ, স্যানিটেশনের জ্ঞান ত একেবারে নেই, নোংরা বালতি দড়ি—যা পাবে তাই ডোবাবে, ফলে এই জলটি সুদ্ধ যাবে, বুঝলেন না? অথচ অতগুলো ছেলের জীবন-মরণ নির্ভর করছে ঐটুকু জলের উপর, সে রিস্‌ক্ ত কম নয়!

ততক্ষণে তাহারা মাঠ পার হইয়া ইস্কুলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। একেবারেই যে ফাঁকা তা নয়, দুই-একটি ঘর এখানেও আছে, তবে খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়। ইস্কুল-বাড়ীটি পাকা, খুব ছোটও নয়, ইংরাজী 'ই' অক্ষরের মাঝখানের ছোট্ট টানটা বাদ দিলে যেমন দাঁড়ায় সেইভাবে একতলা ঘরের শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। সামনে অনেকটা ফাঁকা জমি, সেটা খেলার মাঠও নয়, বাগানও নয়। উঁচু নীচু পতিত জমি, গাছপালা ত নয়ই, ঘাসও দূরবীণ দিয়া দেখিতে হয় এমনি দূরবস্থা। সীমানা ঘেরাও নাই, পাঁচিল দিবার ইচ্ছা ছিল, সেটা বোঝা যায় মাঝখানে পাকা ফটকের দুইটা থাম দেখিয়া—কিন্তু আর কিছুই করা হইয়া উঠে নাই।

ইস্কুলের ঠিক সামনেই হোষ্টেলবাড়ী, সেটিও খুব ছোট নয় কিন্তু কাঁচা। শক্ত মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের চালা, সামনে খানিকটা করিয়া টানা রোয়াক। তবে মাটির দেওয়াল হইলেও সে মাটি এতই কঠিন যে, ভিতরের চুণের কাজ দেখিলে মাটি বলিয়া বোঝা যায় না। মেঝেও সিমেণ্ট করা—অর্থাৎ মেটে ঘরের অসুবিধা কোনটাই নাই। আর, সব চেয়ে যেটা ভাল লাগিল ভূপেনের, হোষ্টেলের উঠানটি কাঁটা তার দিয়া ঘেরা এবং ভিতরে অসংখ্য ফুল ও ফলের গাছ। সেটা, অক্ষয় বাবু বুঝাইয়া দিলেন, কুয়াটা থাকার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। ছেলেদের স্নান ও অন্যান্য কাজ কর্ম্মের সমস্ত জলটা বাগানে আসে বলিয়াই এতগুলি গাছপালা, এমন কি কলা গাছ পর্য্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হইয়াছে—আর শুধু এই বস্তুটির অভাবেই ইস্কুলের উঠানটাতে কিছু করা যায় নাই।

উহাদের দলটিকে কাছাকাছি আসিতে দেখিয়া হেড মাষ্টার ও ছেলের দল ভীড় করিয়া আগাইয়া আসিল। পিছনে অন্য তিন চার জন শিক্ষকও ছিলেন। হেড মাষ্টার প্রবীন লোক, সৌম্যদর্শন, কাঁচা-পাকা দাড়ি, বেঁটে-খাটো লোকটি। গলায় মোটা তুলসীর কণ্ঠি, কপালে তিলক অর্থাৎ ঘোর বৈষ্ণব। এই মানুষটি সম্বন্ধে ভূপেনের একটু ভয় ছিল, ইনিই বারো-আনা মনিব, কেমন লোক হইবেন কে জানে। কিন্তু মানুষটিকে দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। মধুর হাসিয়া তিনি অভ্যর্থনা জানাইলেন, আসুন! আসুন! আপনিই বোধ হয় ভূপেন বাবু? আমার নাম শ্রীভবদেব দাস, আমিই এখানকার হেড মাষ্টার।

ছেলেগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন, ওরে নতুন মাষ্টার মশাইয়ের বাক্স-বিছানাটা ঐ ও পাশের ছোট ঘরে নিয়ে যা, যতীন বাবুর ঘরে। যতীন বাবু, আপনি ওগুলোর একটু তত্ত্বাবধান করুন গে—কেমন? —আসুন ভূপেন বাবু—এদিকে। বাবা ভজহরি, বাবুর মুখ-হাত ধোবার জল দাও একটু—

হোষ্টেলের ঠিক মাঝখানের ঘরটিতে ভবদেব বাবু থাকেন। সামনে বড় বড় দুইটি মাদুর পাতা রহিয়াছে, বোধ হয় এতক্ষণ ইঁহারা এইখানেই বসিয়াছিলেন। ভবদেব বাবু ভূপেনকে সঙ্গে করিয়া সেইখানেই লইয়া গেলেন, মাদুরটা দেখাইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন, একটু বিশ্রাম করুন। ওরে ভজহরি, বাবা জল দিলি? পা-টা একেবারে ধুয়েই বসুন, কেমন?

ভজহরি বালতিতে জল দিয়া গেল। ভবদেব বাবুর ইঙ্গিতে একটা ছেলে কোথা হইতে অত্যন্ত মলিন একটা তোয়ালেও লইয়া আসিল। ভূপেন কোনমতে আলতো জলটা মুছিয়া লইয়া মাদুরে আসিয়া বসিল; তারপর অন্যের অলক্ষিতে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ভাল করিয়া মুখ মুছিল।

সকলে বসিলে ভবদেব বাবু হাঁক দিলেন, ঠাকুর, চা হয়েছে?

ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় একটা ছেলে ময়রার দোকানের কাছে পিছাইয়া পড়িয়াছিল—এতক্ষণ তাহার কারণটা স্পষ্ট হইল। ঠাকুর একটি প্লেটে করিয়া গুটিচারেক রসগোল্লা এবং একটা কানাভাঙা কাপে এক কাপ চা রাখিয়া গেল। আরও দুই কাপ চা আসিল ছোট কলাই করা মগে, হেড মাষ্টার নিজে একটা এবং অপর একজন শিক্ষক আর একটা লইলেন। বাকী যে ক'জন শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদের দিকে কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে ভূপেন চাহিতেছে দেখিয়া ভবদেব বাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, ওঁরা কেউ চা খান না।

তারপর পশ্চিমের দিগন্তজোড়া মাঠটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, সন্ধ্যে অবিশ্যি হয়েছে—কিন্তু রাত হয়নি একেবারে, কী বলেন?—চা খাওয়া চলে? এঁ্যা—

সামনেই যিনি বসিয়াছিলেন তিনি কহিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—স্বচ্ছন্দে। তা ছাড়া আমার গুরুদেব বলেছেন—পানকে দোষ নেই।

ভবদেব বাবু একটু অপ্রতিভভাবে ভূপেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, মানে এখনও সন্ধ্যা করা হয়নি কি না—নিন, নিন, ভূপেন বাবু চা জুড়িয়ে গেল।

বলিয়া তিনি নিজেই বেশ বড় করিয়া একটা চুমুক দিলেন।

কুৎসিত চা—চা না বলিয়া গরম জলই বলা উচিত। তবু এই ট্রেণ ভ্রমণ এবং পথশ্রমের পর ভূপেনের আরামই লাগিল। রসগোল্লাগুলিও ভাল—দোষের মধ্যে একটু যা মাধুর্য্যের আতিশয্য।

চা খাইতে খাইতে ভবদেব বাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। ভূপেন বাবু আসুন, এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার মশাই, হায়ার ক্লাসে অঙ্ক আর জিওগ্রাফী পড়ান। এঁর সঙ্গে ত আপনার আলাপই হয়েছে, অক্ষয় বাবু। উনি যতীনবাবু, হিষ্ট্রীর মাষ্টার, ইনি হলেন রাধাকমল বিদ্যাভূষণ হেড পণ্ডিত, আর আপনার পিছনে উনি বিজয় বাবু, বিজয় বাবু হোষ্টেলে থাকেন না অবিশ্যি, উনি স্থানীয় লোক—শুধু আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন বলেই বসে আছেন।

যথারীতি নমস্কার বিনিময়ের পর আলাপ জমিয়া উঠিল। অপূর্ব্ব বাবুই অগ্রণী হইয়া আলাপ চালাইলেন—কলিকাতার হাল চাল কি, জিনিষপত্রের দাম কত, মাছ সব রকম পাওয়া যায় কিনা, দুধের কি দর, ভূপেন কেন এম-এ পড়া ছাড়িল, রিপন কলেজে আজকাল কে কে প্রোফেসর আছেন, বঙ্গবাসী কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল কেমন লোক—বাপের নাম রাখিতে পারিবেন কি না, এই সব রকমারী প্রশ্ন।

ছেলের দল তখনও কৌতূহলী হইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অধিকাংশই শীর্ণ, ম্যালেরিয়া ও খাদ্যাভাবে শুধু শীর্ণ নয়—অপুষ্টও বটে। প্রথম শীত হইলেও ঠাণ্ডার আমেজ আছে বেশ—কিন্তু অধিকাংশর গায়েই একটা গেঞ্জি পর্য্যন্ত নাই। ময়লা খাটো কাপড়—দুই একজনের একটু আধুনিকতার ছোঁয়াচ আছে—হাফ প্যাণ্ট। ভূপেন দুই একবার তাহাদের দিকে চাহিতেই অপূর্ব্ব বাবু প্রচণ্ড ধমক দিলেন, এই তোরা এখানে কেন রে? যা সব পড়তে বসগে যা—

তাড়া খাইয়া সকলেই চলিয়া যাইতেছিল, ভবদেব বাবু তাহাদের মধ্যে দুইজনকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন; দুজনেই প্রায় এক বয়সী, বছর ষোল হইবে—শ্যামবর্ণ,—একটি উহারই মধ্যে একটু বলিষ্ঠ গঠনের। ভবদেব বাবু গলা নামাইয়া কহিলেন, এই দুটি ছেলে এবার সেকেণ্ড ক্লাশে উঠবে, দুটিই বড় ভাল ছেলে—যত্ন নিতে পারলে ইস্কুলের নাম রাখবে। ওরে পদন, নতুন মাষ্টার মশাইকে পেন্নাম কর। কৈ রে সকলে—আয় আয়।

বলিষ্ঠ ছেলেটিই পদন্—হরিপদ নাম সংক্ষিপ্ত হইয়া পদনে দাঁড়াইয়াছে। অপর ছেলেটি মুসলমান, শোনা গেল মাইল আষ্টেক দূরে কি একটা গ্রামে বাড়ী, ছাত্রবৃত্তি পাইয়া হাই স্কুলে পড়িতে আসিয়াছিল, এখন ফ্রি পড়ে। অবস্থা খুবই খারাপ—কোনমতে হোষ্টেলের খরচটা বাপ চালায়, তাও বোধ হয় ঘটিবাটি বেচিয়া! ভরসা ছেলে ভাল করিয়া পাশ করিলে দুঃখ ঘুচিবে। তাহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সালেক ছেলেটি হোষ্টেলের কম্পাউণ্ড পার হইয়া মাঠের পথ ধরায় ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ও ছেলেটি যাচ্ছে কোথায়? হোষ্টেলে থাকে না?

ভবদেব বাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, ঐ যে দূরের চালাটা দেখছেন, ঐটেই হ'ল মুসলমানদের হোষ্টেল। একটা ঘর—গোটা চারেক সীট আছে। ইনস্পেক্টারের পেড়াপীড়িতে করতে হয়েছিল। দুটি মাত্র ছাত্র আছে মোটে—ওদের আর কে লেখাপড়া শিখ্ছে, আপনিও যেমন। এই ছেলেটি দেখছি যা দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তা ওদের খাওয়া দাওয়া?

এইখানেই খায়। খাবার ঘণ্টা পড়লে ওদের থালা গেলাস নিয়ে এসে উঠোনে পাতে, ভাত ডাল ঢেলে দেওয়া হয়। ওরা ওখানে নিয়ে গিয়ে খায়। নিজেদের থালা বাসন নিজেরাই মেজে নেয়—ঘর-দোরও ওদেরই ঝাঁট দিতে হয়। কী করব বলুন, দুটি ছাত্রের জন্য ত আর মুসলমান চাকর রাখা সম্ভব নয়।

শুধু তাই নয়, পরে ভূপেন জানিয়াছিল, স্নানের ও পানের জলের জন্যও ইহাদের এখানকার চাকরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়—কূয়া হইতে জল তুলিয়া লইবার অধিকার উহাদের নাই।

ছেলেরা চলিয়া যাইবার পর হইতেই অপূর্ব্ব বাবু ভূপেনকে দখল করিবার জন্য অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভবদেব বাবু চুপ করিতেই আবার তিনি উপর্য্যুপরি প্রশ্ন শুরু করিলেন। এই ভদ্রলোকটিকে প্রথম দর্শনেই ভূপেন যেন অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। শ্যামবর্ণের দোহারা দীর্ঘাকৃতি মানুষটি, অসাধারণত্ব চেহারায় কোথাও নাই। শুধু তাঁহার চশমার বিদ্যুতোজ্জ্বল লোহার ফ্রেমটা দ্রুত প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর মস্তকচালনায় ক্ষীণ হ্যারিকেনের আলোতেই বার বার চোখের সামনে ঝিলিক্ মারিতেছিল। কিন্তু সেজন্যও নয়, লোকটি কথা কহিতে পারেন দ্রুত, এবং প্রশ্নগুলি এমন ভাবে করিতে শুরু করিয়াছিলেন যে ভূপেনের মনে হইল বহুদিন হইতে তাহারই অপেক্ষায় এগুলি তিনি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতার হাল চাল হইতে শীঘ্রই অপূর্ব্ব বাবু ব্যাঙ্কিং-এ চলিয়া আসিলেন। কোন্ ব্যাঙ্ক কেমন চলে, কে কত সুদ দেয়, ক' মাসের ফিক্স্ড্ ডিপোজিটে কত সুদ পাওয়া যায়, কোম্পানীর কাগজের কি দাম, ওখানে তেজারতী কেমন চলে—এই ধরণের অজস্র প্রশ্ন। ভূপেনের ইহার কোনটাই ভাল করিয়া জানা ছিল না—সে জন্য অপূর্ব্ব বাবু যেন একটু ক্ষুণ্ণই হইলেন।

খানিক পরে ভবদেব বাবুই ভূপেনকে বাঁচাইয়া দিলেন, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আপনারা তাহ'লে গল্প করুন, আমি সন্ধ্যেটা সেরে নিই—কী বলেন? যতীন বাবু আপনি না হয় ততক্ষণ ভূপেন বাবুকে ঘরেই নিয়ে যান। যদি জামাকাপড় কিছু ছাড়তে চান্।

যতীন বাবু ভূপেনের কানে কানে কহিলেন, তাই চলুন ভূপেন বাবু, মাষ্টার মশায়ের সন্ধ্যে মানে দুটি ঘণ্টা—

অপূর্ব্ব বাবুও এদিক ওদিক চাহিয়া কহিলেন, আমিও উঠি, পণ্ডিত মশাই কই, সরে পড়েছেন বুঝি? আমিও যাই ভূপেন বাবু—আবার একটা কোচিং ক্লাস আছে কিনা।

উঠিয়া দাঁড়াইতে এতক্ষণ পরে ভূপেনের নজর পড়িল ভবদেব বাবুর ঘরের ভিতরদিকটায়। সামনেই একটা জলচৌকীতে বিভিন্ন দেবতার ছবি ও এক-জোড়া খড়ম মালা-চন্দন প্রভৃতিতে রীতিমত সাজানো। সামনে পূজার সমস্ত উপকরণ—ঠাকুর-ঘরের

মতই। পাশে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার ক্ষীণ আলোতে ঠাকুরের চৌকীর উপরের দেওয়ালে যে প্রকাণ্ড ছবিটা টাঙ্গানো রহিয়াছে সেটা ভাল করিয়া দেখা না গেলেও, ছবিটা যে কোন জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়, খুব সম্ভব ভবদেব বাবুর গুরুদেব হইবেন।

ভবদেব বাবু ঈষৎ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, এই নিয়েই আছি ভূপেন বাবু, শুধু ঠাট, ভজনপূজন-ত দূরের কথা, ওঁকে ডাকবারই বা কতটুকু সময় পাই।···আহা-হা, হরিবল, হরি বল—

যতীন বাবু একরকম ভূপেনকে টানিয়াই লইয়া আসিলেন নিজের ঘরে। একেবারে হোষ্টেলের একপ্রান্তে ছোট একটি ঘরে, দুটি তক্তা-পোষ পাতা—তাহার একটাতে যতীন বাবু থাকেন। আর একটা খালি ছিল, সম্প্রতি তাহার উপর ছেলেরা অপটুহস্তে ভূপেনের বিছানা খুলিয়া বিছাইয়া দিয়াছে। যতীন বাবু ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া কহিলেন, বাপ রে, ওর হাত থেকে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায় সহজে? কী বে-আক্কেলে লোক দেখেছেন ত! আপনি এলেন তেতে-পুড়ে, একটু বিশ্রাম করতে দেওয়া ত উচিত! তা ছাড়া আমরাও ত পাঁচজনে একটু আলাপ করতে চাই—বিজয় বাবু বেচারা বুড়ো মানুষ, দুটি ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে আছেন ঐ জন্যে শুধু। তা কি কোন বিবেচনা আছে—কুচক্কুরে স্বার্থপর লোক!

ভূপেন বুঝিল অপূর্ব্ব বাবুর কথা হইতেছে, কিন্তু এতটা ঝাঁজের কারণ কিছু অনুমান করিতে পারিল না। সে স্যুটকেশ খুলিয়া ধোওয়া কাপড় বাহির করিতেছে, যতীন বাবুই আবার ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, দেশে ঢের জমি-জমা আছে মশাই, ভাইদের ফাঁকি দিয়ে, মামলা-মোকদ্দমা করে সব ও নিজে নিয়েছে—হলে কি হবে পয়সার আহিক্কে কিছুতেই যায় না। এখানে যে মাইনে পায় সব তেজারতীতে খাটায়। এত টাকা ছড়িয়েছে মশাই যে, ছুটিতেও এখন বাড়ী যেতে পারে না।···সুদই কি কম, গত শ্রাবণ মাসে মেয়েটা টাইফয়েডে যায়-যায় হয়েছিল, তিরিশটি টাকা ধার চেয়েছিলুম, বল্‌ব কি মশাই, মাস-কাবার হতে তর সয় না, ঘাড়ে জোল্ দিয়ে বসে একটাকা চোদ্দ আনা আদায় করে নেয়। আবার বলে কি না, ভাই আমার লোকসান যাচ্ছে—চাষাভুষো হলে টাকায় দু-আনা পেতুম···চামার চামার!

বোধ করি বা ঘৃণাতেই তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণের মত বাধিয়া গেল। সেই অবসরে ভূপেন একবার জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, চলুন না একটু মাঠে গিয়ে বসি, চমৎকার চাঁদ উঠেছে!

যতীন বাবু অকস্মাৎ খুশি হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মন্দ বলেননি, তাই চলুন। এখানে আবার যে সব গুণধররা আছেন—আড়ি পাততেও পেছপা নন। ছুটো কথা যে কইব মশাই প্রাণ খুলে সে উপায় নেই। রাঢ়ের লোকগুলোই পাজি। আপনি আসবেন শুনে আমি মাষ্টার মশাইকে বলে আমার ঘরে ব্যবস্থা করলুম।

ভূপেন একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনিও কি কলকাতা থেকে এসেছেন?

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে যতীন বাবু উত্তর দিলেন, না—আমার বাড়ী হুগলী জেলায়।

মাঠে তখন চমৎকার জ্যোৎস্না নামিয়াছে। তৃণশূন্য, বৃক্ষলতা-শূন্য, দিগন্তপ্রসারী মাঠে সে আলো কোথাও কিছু মাত্র ম্লান হইবার অবসর পায় নাই, পালিশকরা রূপার পাতের মতই চক্‌চক্ করিতেছে। সে দিকে চাহিয়া ভূপেনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না—চাঁদের আলো যে এত উজ্জ্বল হয় তাহা সে এতদিন জানিত না, জ্যোৎস্নার এই অপরিসীম ঔজ্জ্বল্য কোথাও ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই।

হোষ্টেল হইতে অনেকটা দূরে, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে শ্রবণ-সম্ভাবনার বাহিরে গিয়া যতীন বাবু বসিলেন। পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে পূর্ব্ব কথারই জের টানিয়া কহিলেন, একটা পয়সা খরচ নেই ভাই ওর, বললে বিশ্বাস করবেন না। হোষ্টেল-খরচা মাসে চারটে টাকা তাও ওর লাগে না। মাষ্টার মশাইকে বলে ক'য়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পোষ্টটাও নিয়ে নিয়েছে। মাষ্টার মশাই যখন নিজে হোষ্টেলে থাকেন তখন ওঁরই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হওয়ার কথা—আর সত্যি-সত্যি দেখেনও উনিই, মাঝখান থেকে ও চারটে টাকা বাঁচিয়ে নিলে। সে দিন-কতক কী ভাগবত পড়ার ধুম আর মাষ্টার মশাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে মালা জপ করা! ব্যস্—উনি গেলেন গলে—ওঁকে বোঝালে কি জানেন? বললে, আপনি যদি এই সব নিয়ে থাকেন তা'হলে সাধন-ভজন করবেন কখন? আমি থাক্‌তে আপনাকে এভাবে সময় নষ্ট করতে দেবো না। অথচ চাকরীটি বাগাবার ওয়াস্তা, কোথায় বা গেল মালা, কোথায় বা গেল ভাগবত। মাষ্টার মশাই এখন আর চক্ষুলজ্জাতে কেড়ে নিতেও ত পারেন না!

কথা কহিতে কহিতে বিড়ি নিভিয়া গিয়াছিল, সেটা আবার ধরাইয়া কোনমতে দুই তিনটা টান দিয়াই যতীন বাবু শুরু করিলেন, অবিচারটা দেখুন, আমরা সবাই ওর চেয়ে কম মাইনে পাই, অবস্থাও আমাদের ঢের খারাপ কিন্তু সে কথাটা মাষ্টার মশাই একবারও ভেবে দেখলেন না। ঐ পণ্ডিত মশাই রয়েছেন, ছাপোষা লোক, মাইনে পান মোটে তিরিশটি টাকা—চারটে টাকা ওঁর বেঁচে গেলে কতখানি বাঁচত! তা ছাড়া অক্ষয় রয়েছে, আমি রয়েছি—একথাটা ওঁর ভেবে দেখা উচিত ছিল না!

তারপর অকারণেই গলার পর্দ্দাটা নামাইয়া কহিলেন, ঐ অক্ষয়টাই কি কম নাকি, দিন-রাত মাষ্টার মশাইয়ের ফরমাস খেটে আর ওঁর সামনে লোক দেখানো হরিনাম ক'রে এমন বাগিয়েছে যে, চুরি করছে জেনেও মাষ্টার মশাই ওকে কিছু বলেন না, ওর হাতেই সব বাজার, মায় ইস্কুলের যা কিছু খুচরো কেনা-কাটা খরচা সব ওর হাতে। ইস্কুলেও কিছু করে না—একের নম্বরের ফাঁকিবাজ! আর চুক্‌লি খাবার একখানি। খালি মোসাহেবীর জোরে চাকরী ক'রে যায় মশাই, নইলে অন্য ইস্কুল হ'লে একদিনও চাক্‌রী থাকত না। কিছু জানে না মশাই, বিশ্বাস করুন। নতুন এসেছেন, ঐ চিজটিকে খুব সাবধান।

সব শুনিয়া ভূপেনের মনটা কেমন যেন দমিয়া যাইতেছিল। মানুষ মানুষই, অবিনাশ বাবু কলিকাতাতেও আছেন—সুতরাং দুঃখ করিবার কিছু নাই কিন্তু বাড়ী হইতে, সহর হইতে, এত দূরে এই নির্জ্জন পল্লীগ্রামে যাহাদের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে তাহাদের যে পরিচয় সে পাইতেছে, তাহাতে দমিয়া যাইবারই কথা। বিশেষতঃ এই যতীন বাবু, এই লোকটি তাহার ঘরেই থাকিবেন—আশ্চর্য্য, এতক্ষণ ধরিয়া বিষ উদ্গার ছাড়া আর কিছুই করেন

নাই। কাহারও সম্বন্ধে বলিবার মত ভাল কথা কি কিছুই নাই?

যেন তাহার মনের কথাটা বুঝিতে পারিয়াই যতীন বাবু পুনশ্চ কথা কহিলেন, হ্যাঁ, মানুষ বলি ঐ বিজয় বাবুকে, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, একেবারে নিরীহ ভাল মানুষ। মানুষের উপকার ছাড়া কখনও অপকার করে না। অথচ তারই সব চেয়ে দুরবস্থা, ঘরে একপাল ছেলে-মেয়ে, জমি বলতে বিশেষ কিছুই নেই, যা করে এখানের ঐ কটা টাকা মাইনে। ভাল লোক কি নেই, কাল চলুন ইস্কুলে সব পরিচয় করিয়ে দেব'খন—আমাদের অধর আছে, খাসা ছোক্‌রা, একটু গান-বাজনার ঝোঁক আছে, তাই নিয়েই থাকে, কারুর কথায় কখনও নাক গলায় না।

তার পর হঠাৎ গলাটা আর একবার নীচু করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনার ভাগবত পড়া আছে? চৈতন্যচরিতামৃত, নিদেন জয়দেবের দু-একটা শ্লোক?

ভূপেন তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, বিশেষ পড়া নেই তবে দু-একবার উল্টে পাল্টে দেখেছি বই কি। কেন বলুন ত?

যতীন বাবু যেন বিশেষ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, তবে আর কি, আপনার দেখবেন চড়চড় ক'রে মাইনে বেড়ে যাবে। যেমন ইনি, তেমনি সেক্রেটারী—হরি-হরি ক'রেই গেল। আমি মশাই কিছুতেই ঐগুলো পড়তে পারিনে। যদি বা পড়ি ওষুদ গেলা ক'রে, কাজের সময় কিছুই মনে পড়ে না।

একটু পরেই খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল। ভূপেন যতীন বাবুর সঙ্গে খাবার-ঘরে গিয়া আহারে বসিল। খাবার-ঘর না বলিয়া সেটাকে একটা আটচালা বলাই উচিত—রান্নাঘরের সংলগ্ন এমনি একটা স্থানে সার সার আসন পড়িয়াছে। ছাত্র ও শিক্ষকরা একসঙ্গেই বসিয়াছেন, কেবল শিক্ষকদের জন্য একটু স্বতন্ত্র পংক্তির ব্যবস্থা আছে এই মাত্র। ভবদেব বাবু ভূপেনকে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন, কহিলেন, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বুঝি যতীন বাবুর সঙ্গে? কেমন লাগল আমাদের দেশ?

ভূপেন একটু জোর দিয়াই কহিল, বেশ লাগল। সত্যি এমন চাঁদের আলো এর আগে আর কখনো দেখিনি। আপনার কি এই জেলাতেই বাড়ী?

ভবদেব বাবু জবাব দিলেন, না—আমার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়, তবে বেশী দূরে নয়। এখান থেকে নিকটেই—

সকলেই আসিয়াছিলেন খালি পণ্ডিত মহাশয় ছাড়া। তাঁহার জন্য আসন একটি খালিই ছিল। সে দিকে একবার চাহিয়া ভবদেব বাবু হাঁক দিলেন, ঠাকুর, পণ্ডিত মশায়ের ভাত হ'ল?

ভূপেনের দিকে ফিরিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন, পণ্ডিত মশাই কারুর হাতে ভাত খান না। সব রান্না হয়ে গেলে ওঁর একটি ছোট্ট হাঁড়ি আছে পেতলের, তাইতে ভাত চাপিয়ে দেওয়া হয়, উনি নামিয়ে নেন।

বলিতে বলিতেই পণ্ডিত মহাশয় একটা বেড়িতে করিয়া তাঁহার ছোট হাঁড়িটা ধরিয়া প্রবেশ করিলেন। ততক্ষণে অন্য সকলকেও ভাত দেওয়া হইয়া গিয়াছে—পণ্ডিত মহাশয় আসনে বসিতেই সকলে আহার শুরু করিয়া দিল। ভাত, একটা জলবৎ ডাল এবং আলু-বেগুন-কচুর একটা তরকারী। অন্য কোন উপকরণ নাই—ছাত্র ও শিক্ষকরা সকলেই সেই একমাত্র ব্যঞ্জন দিয়া আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। এতক্ষণে ভূপেন বুঝিতে পারিল যে মাসিক চার টাকায় কেমন করিয়া খাওয়ানো সম্ভব হয় ইঁহাদের; ভবদেব বাবু কহিলেন, এখানে হপ্তায় দুদিন হাট হয় বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই মেলে না। বেগুন কচু আর কুমড়ো। কখনও কখনও উচ্ছে পাওয়া যায়—সেও দৈবাৎ।

ভূপেন পরে দেখিয়াছিল যে দৈবাৎ উচ্ছে পাওয়া গেলেও কোন সুবিধা হয় না। সেদিনও সেই একটাই মাত্র ব্যঞ্জন হয়, সকলে আগাগোড়া তেতো তরকারী দিয়াই ভাত খাইয়া ওঠেন। বিশেষ কোনদিন ছাড়া দ্বিতীয় উপকরণের কথা ইঁহারা ভাবিতে পারেন না—মাছ ত কল্পনার অতীত! জমিদার-বাড়ীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে মাছ ধরানো হইলে, এক একদিন তিনি হয়ত কিছু মাছ পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, সেই সব দিনগুলিতে এখানে রীতিমত উৎসব পড়িয়া যায়।

আহারাদির পর ভবদেব বাবু ভূপেনকে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইলেন। সে যে জুতাটা বাহিরেই ছাড়িয়া আসিল তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি খুশি হইলেন। হুঁকাটার গা বাঁ-হাতে মুছিয়া লইয়া সেটাকে মুখের কাছে আনিয়া কহিলেন, যাক্—তবু আপনি জুতোটা খুলে এলেন। আজকাল অনেকে ঠাকুর-দেবতাদের এটুকু সম্মানও দিতে চান না। ঠাকুর আছেন কি নেই সেটা বড় তর্ক ভূপেন বাবু, থাকলেও আমার এই পটটুকুর মধ্যে আছেন কি না সে কথাটাও আমি তুলব না, আমি শুধু বলতে চাই যে অপরের যদি বিশ্বাস থাকেই, সেটাকে আঘাত ক'রে লাভটা কি, বিশেষতঃ যদি তাতে ক্ষতি না হয়—কি বলেন?

সে-ত বটেই! ভূপেন নির্ব্বোধের মত ক্লান্ত কণ্ঠে সায় দিল।

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া ভবদেব বাবু কহিলেন, কেমন দেখছেন গ্রাম, থাকতে পারবেন? কখনও অভ্যেস নেই—মাষ্টারী সহ্য হবে কি?

খুব হবে। ভূপেন কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া কহিল, ছেলে পড়াতে আমার খুব ভাল লাগে। এখানের ছাত্রগুলি কেমন?

ঈষৎ অবজ্ঞায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভবদেব বাবু কহিলেন,—ঐ একরকম। সত্যি কথা বলতে কি, ও-কথা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। জীবন-ধারণের জন্য একটা বৃত্তি নেওয়া উচিত তাই একটা নিয়ে থাকা—কোনমতে দিনগত পাপক্ষয়। এম্‌নিতেই সাধন ভজনে বিঘ্নের অন্ত নেই—তার ওপর যদি দিন-রাতই ঐ নিয়ে থাকব ত তাঁকে ডাকব কখন?

ভূপেন একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। খানিকটা পরে ধীরে ধীরে কহিল, তবু একটা দায়িত্ব ত আছে।

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া ভবদেব বাবু কহিলেন, কতটুকু ক্ষমতা আপনার ভূপেন বাবু, কী দায়িত্ব আপনি বইতে পারেন?···আমি ও-সব কিছু বুঝি না, জানি রাধারাণী আমাকে দিয়ে যা করিয়ে নেবার তা নেবেনই। তার বেশী হাঁকড় মাকড় ক'রে কোন লাভ নেই, তাতে ঠক্‌তে হয়।

তার পর নীরবে কয়েকটা টান দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন,

আপনার এধারের সাহিত্য কিছু-কিছু পড়া আছে? শ্রীমদ্ভাগবত? আমি গীতার কথা বলছি না, আমি বলছি ভগবানের—

বুঝেছি। ভূপেন জবাব দিল, সামান্য সামান্য পড়েছি বৈ কি।

বেশ বেশ। ভালই হ'ল, আপনার সঙ্গে তবু মধ্যে মধ্যে একটু আলোচনা করা যাবে। বড় খুশি হলুম শুনে। এখন ত লোক ভাবে বুড়ো না হ'লে বুঝি ও-সব বই পড়তে নেই।···বড় রাত হয়ে গেছে, আপনিও ক্লান্ত—নইলে একটা বই একটু পড়ে শোনাতুম। বড় ভাল বই একটা হাতে এসেছে—

ভূপেন আর বেশী ভদ্রতা করিতে পারিল না, তাঁহার প্রথম কথাটারই সূত্র ধরিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভবদেব বাবু কহিলেন, চল্লেন? আচ্ছা যান—শুয়েই পড়ুন গে। কাল তখন ভাল করে আলাপ হবে'খন।

ভূপেনের আসল ইচ্ছা ছিল হোষ্টেলের ছেলেগুলির সহিত একটু আলাপ করিয়া বাজাইয়া দেখে কিন্তু তখন ক্লান্তিতে তাহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছে বলিয়া সে চেষ্টা আর করিল না। আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারেই নিজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যতীন বাবু বেচারা বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, যাক্—তবু ভাল যে শিগ্‌গির ছাড়া পেলেন। আমি বলি রাত্রেই বুঝি আপনাকে ভাগবত শোনাতে বসে; নিন্ মশাই শুয়ে পড়ুন শুয়ে পড়ুন। রাত ঢের হয়েছে।

তিনি আলো নিভাইয়া নিজেও শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভূপেন ঘুম পাওয়া সত্ত্বেও তখনই শুইতে পারিল না। বিছানায় বসিয়া জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। চাঁদের আলো তখন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যেন, বাহিরের মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিলে চোখ ধাঁধিয়া যায়।

নির্জ্জন, অতি নির্জ্জন পল্লীগ্রাম। কোথাও কোন প্রাণের লক্ষণ নাই; অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া সহসা ভূপেনের মনে হইল, সে যেন সেই সৃষ্টির প্রথম যুগে ফিরিয়া গিয়াছে, সে-ই এ পৃথিবীর প্রথম মানব। শহর, কোলাহল, আত্মীয়-স্বজন, চিরপরিচিত সেই সব আবেষ্টনী যেন কোন্ সুদূরে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। সে যেন জন্মান্তরের কথা, সে সব যেন স্বপ্নে দেখা!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। আশা আকাঙ্ক্ষা, জীবনযুদ্ধ আজ আর কিছু রহিল না—সমস্তই তাহার জীবন হইতে লেপিয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই জনহীন, কোলাহল-হীন, আশাহীন নির্ব্বান্ধব অপরিচিত জীবনের মধ্যে তাহার যেন সমাধি লাভ ঘটিয়াছে।

যাক্—হয়ত ভালই হইল। যাহা গিয়াছে, যাহাকে রাখিতে পারা যায় নাই তাহার জন্য বৃথা শোক আর সে করিবে না; এমন কি এ সংশয়ও মনে রাখিবে না যে ইহার প্রয়োজন ছিল কি না।···

ঘুমে সমস্ত চৈতন্য শিথিল হইয়া আসিতেছে, তাহারই মধ্যে মনে পড়িল সন্ধ্যার কথা। কাল সকালে কি তাহাকে একখানা চিঠি দিবে? না, দরকার নাই—তাহাদের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে অবাঞ্ছিত নিজেকে সে বারবার নিক্ষিপ্ত করিবে না কিছুতেই। সন্ধ্যা সুখী হোক্—আর কিছুই সে চায় না।

[ক্রমশঃ।

—আদিম স্রোত—

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

স্রষ্টার দুর্বোধ অভিলাষ,
সৃষ্টি-মাঝে তাই বারে বারে নগ্ন-পরিহাস।
ধূলি হ'তে উদয় লভিল যারা
ক্ষুধায় কি তারা
তুলিয়া বিদ্রোহী অংগুলি
ভুলে গেল ধরণীর ধূলি?
আকাশের দিকে মুখ করি
অনিশ্চিত মহাশক্তি স্মরি
পণ্ড করি জীবন-মুকুল
বারংবার দিতেছে মাশুল।

ধূলির নিশ্বাস আছে
মানুষের প্রতি কণা মাঝে;
সভ্যতার মসৃণতা যেথা নিরুপায়
দিতে এই আদিম ধূলিরে বিদায়।

লোক হ'তে ঊর্দ্ধলোকে
বৃথা ক্ষোভে
ধূলিহীন সভ্য-অভিসার;
তবু নির্বিকার
অন্তরের নিভৃত ঠাকুর।
বাহিরের উজ্জ্বল গরিমা
প্রসংশার সহস্র মহিমা
পারেনি কখন
রক্তেরে করিতে শোধন।

*   *   *

ফেলে-আসা দিবসের
আদিম প্রভাতে
অজ্ঞাতে
রক্তে বয়েছিল যে ধারা,
সভ্যতার নানা আবর্ত্তনে
সে ধারা কি হবে নাকো সারা?

মনের প্রাচীন যত বৃত্তি
চিরকাল করিবে কি সেকেলে আবৃত্তি?
বিপ্লবে কি নাহি কিছু বিবর্ত্তন?
—নাহি কিছু অভিনব?
ভুলিবে কি ধূলি মানবেরে?
—না, ধূলিরে মানব?

—বক রাজা—

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস,

১

গ্রীষ্মকাল। বিকাল বেলা। বাগদাদের খলিফা শছিদ সবেমাত্র তাঁর দুপুরের ঘুম থেকে উঠে আরাম করে সোফার উপর ব'সেছেন। গড়গড়াব লম্বা নলে মাঝে মাঝে ছোট্ট টান দিচ্ছেন—কখনও বা কাফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন—থেকে থেকে তাঁর লম্বা দাড়িতে খোস-মেজাজে হাত বুলোচ্ছেন। দিনের মধ্যে এই একটি সময় খলিফা খোস-মেজাজে থাকতেন। এই কারণে তাঁর প্রধান উজির মনসুর রোজ এই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। এ-দিন বিকালে উজিরকে একটু অন্যমনস্ক এবং চিন্তিত দেখে খলিফা কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উজির দুই বাহু বুকের উপর আড় ভাবে রেখে বিনীত ভাবে বললেন—"আজ সদর দেউড়ীর সামনে এক জন ফেরিওয়ালার কাছে এত সুন্দর ও দামী জিনিষ দেখে এলাম যে, তা কিনবার মত পয়সা আমার নাই; বোধ করি এই কারণেই আমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।"

খলিফা অনেক দিন থেকেই উজিরকে খুসী করবার জন্য ভাবছিলেন। কথা শুনে ফেরিওয়ালাকে তাঁর কাছে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। দেখতে দেখতে ফেরিওয়ালা এসে পড়ল। লোকটি বেঁটে, মোটা, মুখের রং তামাটে কালো, পরনে ছেঁড়া পোষাক। একটি বাক্সে ছিল তার হরেক রকমের জিনিষ—মুক্তা, আংটি, সুদৃশ্য পিস্তল, আয়না এবং চিরুণি। খলিফা ও উজির সব নাড়াচাড়া ক'রে দেখে উভয়ের জন্য দু'টি সুন্দর পিস্তল এবং উজিরের স্ত্রীর জন্য একখানি দামী চিরুণি কিনলেন। ফেরিওয়ালা যেমনি তার বাক্স বন্ধ করতে যাচ্ছে অমনি একটি ছোট দেরাজ খলিফার নজরে পড়ল। দেরাজের মধ্যে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় ফেরিওয়ালা সেটি টেনে বার ক'রে দেখাল তার মধ্যে একটি কৌটায় খানিকটা কালো রঙের গুঁড়া এবং একখানি কাগজে কি যেন লেখা আছে। এই লেখা খলিফা বা মনসুর কেহই পড়তে পারলেন না। ফেরিওয়ালা বলল,—"আমি এই জিনিষ দুটি এক জন দোকানীর নিকট পেয়েছি। সে লোকটি এগুলি মক্কার রাস্তায় পেয়েছিল। জানি না এর মধ্যে কি আছে, আপনারা যে দাম ইচ্ছা দিয়ে নিতে পারেন।" খলিফা কৌটা ও কাগজ কিনে ফেরিওয়ালাকে বিদায় দিলেন। ভাবলেন, লাইব্রেরীতে ত কত বই আছে যা তিনি পড়তে পারেন না—এ কাগজও না হয় সেইরূপই থাকবে। তবুও কৌতূহলবশে উজিরকে বললেন, "এ কাগজখানি পড়তে পারে এমন কোনও লোক জোগাড় করা যায় কি না।" উজির উত্তর দিলেন, "হুজুর ঐ বড় মসজিদে সেলিম পণ্ডিত নামে এক জন এলেম আছেন—তিনি সব ভাষা বুঝতে পারেন—সম্ভবতঃ তিনি পড়ে বুঝবেন।"

সেলিম পণ্ডিতকে তখনই ডেকে আনা হলো। খলিফা বললেন, "সেলিম, তোমাকে লোকে খুব বিদ্বান্ বলে জানে। একবার এই লেখাটি চেয়ে দেখ পড়তে পার কি না। যদি পার তবে অনেক দামী পোষাক উপহার পাবে, না পারলে কিন্তু বারো ঘা চাবুক ও পঁচিশ চটিজুতা তোমাকে মারা হবে এবং লোকে আর তোমাকে সেলিম পণ্ডিত বলে ডাকবে না।" সেলিম কুর্ণিশ ক'রে বলল—"সবই হুজুরের মর্জ্জি"—অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগের সঙ্গে কাগজখানি দেখে হঠাৎ চীৎকার করে সেলিম বলে উঠল—"হাঁ, হয়েছে হুজুর, এটি লাটিন ভাষায় লেখা—আমি এর অর্থ করে শোনাচ্ছি।"

এই বলে সেলিম অনুবাদ করে বলল—"যে লোক ইহা পাবে সে প্রথমে আল্লাকে এবাদত জানাবে। যে ব্যক্তি এই কৌটা থেকে গুঁড়া নিয়ে শুঁকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মুতাবর' কথা উচ্চারণ করবে—সে যে প্রাণীতে ইচ্ছা সেই প্রাণী হতে পারবে এবং তার ভাষা বুঝবে। আবার মানুষ হতে চাইলে তিন বার পুব দিকে নুয়ে ঐ কথা উচ্চারণ করতে হবে। কিন্তু সাবধান, কোনো প্রাণী হ'য়ে যদি কেউ হেসে ফেলে তবে এই মন্ত্র সে ভুলে যাবে এবং আর মানুষ হতে পারবে না।"

সেলিমের পড়া শুনে খলিফা যার-পর নাই খুসী হলেন। তিনি সেলিমকে প্রতিজ্ঞা করালেন যে, এই রহস্য যেন সে কারও কাছে প্রকাশ না করে। তার পর সেলিমকে অনেক সুন্দর সুন্দর দামী পোষাক দিয়ে খলিফা বিদায় দিলেন। উজিরের দিকে চেয়ে বললেন —"মনসুর, আজ বেশ ভালো জিনিষ পাওয়া গেছে। কি আনন্দই না হবে যখন আমি অন্য একটি প্রাণী হব। কাল খুব ভোরেই তুমি এখানে হাজির হবে। আমরা একসঙ্গে মাঠে গিয়ে কৌটা থেকে গুঁড়ো শুঁখব এবং শুনব, আকাশে বাতাসে জলে বনে প্রান্তরে কোথায় কি কানাকানি হচ্ছে।"

২

পরদিন প্রাতে খলিফা শছিদ জলযোগ সেরে বেশ পরিবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই উজির খলিফার আগের দিনের নির্দ্দেশ মত এসে হাজির হলেন। তার পর উভয়ে ভ্রমণে বেরোলেন। খলিফা ম্যাজিক পাউডারের কৌটাটি বেল্টের মধ্যে গুঁজে নিলেন—তাঁর অনুচরদিগকে

সঙ্গে যেতে নিষেধ করে উজিরের সঙ্গে একাকী পথে বেরিয়ে পড়লেন। খলিফার বিস্তৃত বাগান-বাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রথমে চললেন কিন্তু এর মধ্যে কোনও জীবিত প্রাণী চোখে পড়ল না, যেখানে তাঁর পাউডারের পরখ করেন। উজির প্রস্তাব করলেন যে, আরও দূরে একটি সরোবরের ধারে অনেক প্রাণী অর্থাৎ বক থাকে। বকগুলি তাদের গম্ভীর ভাব এবং শব্দের জন্য সর্বদা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খলিফা উজিরের প্রস্তাবমত তাঁর সঙ্গে সরোবরের দিকে গেলেন। তাঁরা সেখানে গিয়েই দেখলেন, একটি বক ব্যাঙের খোঁজে গম্ভীর ভাবে এদিক্ ওদিক্ ঘুরছে এবং থেকে থেকে চীৎকার করছে। সেই সময় আরও দেখলেন যে, উঁচু আকাশ থেকে আর একটি বক এদিকে উড়ে আসছে।

উজির বললেন—"আমি আমার দাড়ীর দিব্যি রেখে বলতে পারি যে, এই দুটি বকের মধ্যে ভারি সুন্দর কথাবার্ত্তা চলছে। আমরা বক হ'য়ে এই কথা শুনলে কত না মজার ব্যাপার হবে।" খলিফা উত্তর দিলেন—"ঠিক বলেছ, কিন্তু সকলের আগে আমাদের মনে রাখতে হবে কি করে আবার মানুষ হওয়া যাবে।—হ্যাঁ, তিন বার পূবদিকে নুয়ে 'মুতাবর' কথাটি উচ্চারণ করলেই তুমি উজির আর আমি বাগদাদের খলিফা হব। দোহাই ঈশ্বরের, আমরা বক হয়ে যেন হেসে না ফেলি—তা হলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ।"

খলিফা যখন এই কথা বলছিলেন, তখন আর একটি বক তাঁদের মাথার উপর উড়তে উড়তে মাটিতে এসে বসল। তাড়াতাড়ি বেল্টের ভিতর থেকে কৌটাটি বের ক'রে নিজে এক টিপ নিলেন এবং উজিরকে আর এক টিপ দিয়ে উভয়ে একসঙ্গে বলে উঠলেন—"মুতাবর"।

দেখতে দেখতে উভয়ের পা সরু এবং লাল হ'য়ে গেল; খলিফা ও উজিরের সুন্দর চটিজুতা বকের পায়ের নখ ও পাতাতে পরিণত হল। বাহু পাখাতে এবং গলা লম্বা হ'য়ে বকের লম্বা গলা ও চঞ্চুতে পরিণত হল, দাড়ীর চিহ্নমাত্র রইল না এবং উভয়ের সারা শরীর মসৃণ পালকে ঢেকে গেল।

খলিফাই প্রথমে বিস্ময়ের ঝোঁক কাটিয়ে বলে উঠলেন—"মনসুর, তোমার ঠোঁট বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।. পয়গম্বরের দিব্য দিয়ে বলছি, এমন সুন্দর বক জীবনে কখনো দেখিনি।"

মাথা নত ক'রে উজির উত্তর দিলেন—"হুজুরকে অশেষ ধন্যবাদ। সাহস দেন তো বলতে পারি, খলিফা অবস্থায় আপনাকে যত সুন্দর না দেখাত বক হওয়াতে আপনাকে অনেক বেশী সুন্দর দেখতে হয়েছে। আসুন, বক দুটির দিকে এগিয়ে যাই, দেখি তাদের কথাবার্ত্তা বুঝতে পারি কি না।"

ইতিমধ্যে অপর বকটি মাটিতে এসে নেমেছে। এ বকটি বেশ সৌখীন ব'লে মনে হল। সে সযত্নে ঠোঁট দিয়ে পা দু'টি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে—পালকগুলি সুন্দর ভাবে ঝেড়ে প্রথম বকের কাছে গেল। বক-রাজা ও বক-উজির লম্বা লম্বা পা ফেলে ঐ বক দু'টির কথাবার্ত্তা শোনবার জন্য তাদের দিকে চলল।

"সুপ্রভাত, দীর্ঘপদ, এত সকালেই যে আজ মাঠে হাজির।"

"ধন্যবাদ, প্রিয় সুগ্রীব। আমি সাধারণ রকমের জলখাবার জোগাড় করেছি। টিকটিকির চিলতে বা ব্যাঙের ঠ্যাং কোনটিতে তোমার অভিরুচি জানতে পারি কি?"

"আন্তরিক ধন্যবাদ, এখন আমার আদৌ ক্ষিদে নাই। বাবা আজ কয়েক জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, আমাকে তাদের সামনে নাচতে হবে—কাজেই আমি একটু নিরিবিলি নাচের মহড়া দিব ভাবছি।"

এই বলে সেই ছোট মেয়ে-বকটি মাঠের মধ্যে অদ্ভুত নাচ জুড়ে দিল। বিস্মিত হ'য়ে খলিফা ও মনসুর সেই নাচ দেখতে লাগলেন। বকটি যখন ছবির মত এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মনোরম ভাবে পাখা দুলিয়ে নাচতে লাগল তখন বক-রাজা ও বক-উজির আর স্থির থাকতে পারলেন না, অজ্ঞাতসারে তাঁদের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এমন হাসি এসে গেল যে, সে হাসি তাদের আর যেন থামতে চায় না। কিছুক্ষণ পরে হাসি থেমে গেলে খলিফা ব'লে উঠলেন—"এ বাস্তবিক একটা দেখবার মত জিনিস—হাজার মোহর খরচ করেও এমন তামাসা দেখা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের হাসিতে এর নাচ বন্ধ হয়ে গেল। পরে হয় তো আরও চমৎকার গান ছিল। কিন্তু আমাদের হাসির জন্যই সে গান শোনা আর আমাদের ভাগ্যে জুটলো না।

ইতিমধ্যে বক-উজিরের মনে পড়ে গেছে যে, এ অবস্থায় ত তাদের হাসি উচিত হয় না।"

খলিফাও উজিরের ভাবান্তর দেখে তাঁরা যে কি ভীষণ অন্যায় করেছেন তা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন—"এ বড় নিষ্ঠুর পরিহাস হবে, যদি আমাদের বক হয়েই জীবন কাটাতে হয়।

হ্যাঁ—সেই ম্যাজিক কথাটি—তিন বার পুবদিকে নুয়ে বলতে হবে—"মু-মু-মু"। বক-রাজা ও বক-উজির বহুক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই মু'র পরে কি তা আর মনে করতে পারলেন না। কাজেই তাঁদের মানুষ হওয়া আর ঘটল না। উভয়ে বকরূপেই র'য়ে গেলেন।

৩

গভীর মনঃকষ্টে এই দুই নতুন বক মাঠের ভিতর ঘুরতে লাগলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না, এই অবস্থায় তাঁরা কি করবেন। বকরূপ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেও কেউ তাঁদের চিনবে না—আর তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিলেই বা বাগদাদবাসীরা বিশ্বাস করবে কেন যে, এই বক খলিফা ছিলেন এবং সেই বিশ্বাসে একটি বককে তারা রাজসিংহাসনে বসতে দেবে।

এদিকে পেটের ক্ষিদে বারণ মানে না। অতি কষ্টে ঠোঁটের সাহায্যে মাঠের সামান্য ফলমূল সংগ্রহ ক'রে তাঁরা খেতে থাকলেন। টিকটিকি বা ব্যাং তাঁদের মুখে রোচে না। তার পর এই সব নোংরা জিনিষ খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়বেন সে ভয়েও তাঁরা এগুলি মুখে তুলতে পারেন না। সুতরাং এই অবস্থায় তাঁদের যে কি রকম অসহ্য কষ্ট হয়েছিল তা সহজেই বুঝা যায়। তাঁদের একমাত্র ভরসা ছিল যে, তাঁরা উড়তে পারেন। উড়ে গিয়ে মাঝে মাঝে বাগদাদের রাজ-প্রাসাদের ছাদে ব'সে উভয়ে দেখতেন সহরে কি ব্যাপার চলছে।

প্রথম দিন তাঁরা নগরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সেখানে ভীষণ অশান্তি ও দুঃখের ছায়া পড়েছে সকলের মুখে। বক হওয়ার তিন দিনের দিন তাঁরা প্রাসাদ-চূড়া থেকে একটি জাঁকালো দৃশ্য রাস্তায় দেখতে পেলেন। সোনার জরিদার পোষাক ও টুপি প'রে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চ'ড়ে এক জন লোক চলেছেন—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে

জমকালো পোষাক-পরা অসংখ্য অনুচর—ঢাক ও শানাইএর বাজনায় চারি দিক মুখরিত। সারা বাগদাদ সহর যেন ভেঙে পড়েছে তাঁর অভ্যর্থনায়। জনতা চীৎকার করছে—"বাগদাদ-অধিপতি মীরজা সাহেব কি জয়।" বক-রাজা ও উজির ছাদের উপর থেকে এই দৃশ্য দেখে অতিশয় বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। বক-রাজা ব'লে উঠলেন—"উজির, আমার এ দশা কেন হ'ল তা কিছু অনুমান করতে পারছ কি? এই মীরজা হচ্ছে আমার পরম শত্রু, মস্ত যাদুকর কাশেমের ছেলে। আমার সময় খারাপ তাই সে এবার প্রতিশোধ নিল; কিন্তু আমিও একেবারে নিরাশ হবার পাত্র নই। আমার এই চরম দুঃখের মধ্যেও একমাত্র সান্ত্বনা যে তোমার মত বিশ্বস্ত বন্ধু আমার সহচর। এস, আমরা হজরতের কবরের দেশেই উড়ে যাই হয়ত বা সেই পবিত্র স্থানমাহাত্ম্যে আমাদের এই দুর্দ্দশার মোচন হতে পারে।"

এই ব'লে উভয়ে প্রাসাদের ছাদ ছেড়ে উড়ে মদিনার দিকে চললেন। অনভ্যাস বশতঃ কেহই বেশী পথ উড়তে পারেন না। ঘণ্টা দুই পরে উজির কাতর স্বরে ব'লে উঠলেন—"হুজুর, আমি আর উড়তে পারি না! আপনি বড় জোরে ওড়েন। এদিকে সন্ধ্যাও হ'য়ে আসছে কাজেই এ অবস্থায় আমাদের এখন একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়াই ভাল।"

খলিফা মনসুরের কথা ঠিক বিবেচনা ক'রে অদূরে পাহাড়তলীর একটি ভাঙা বাড়ী দেখে আশ্রয়ের জন্য সেই দিকে উড়ে চললেন। বাড়ীটি আগে একটি দুর্গ ছিল ব'লে মনে হ'ল। গম্বুজের নীচে সারি সারি বড় বড় থাম। কয়েকটি ঘর এই ধ্বংস অবস্থার মধ্যেও যেরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিল, তা'তে এ বাড়ী যে এক কালে দেখবার মত বাড়ী ছিল তা তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন। তাঁরা বাড়ীর ভেতর ঢুকে ঘুরে ঘুরে খুঁজছিলেন খট্‌খটে শুক্‌নো কোনও জায়গা আছে কি না। এমন সময় সহসা বক-উজির বক-রাজাকে বললেন—"উজির হিসাবে আমাকে লোকে বুদ্ধিমান্ বলেই জানত, এখন কপালের দোষে বক হ'লেও একেবারে বোকা ব'নে যাইনি। আমার সন্দেহ হয়, এ ভূতের বাড়ী। একটা দীর্ঘশ্বাস এবং চাপা কান্নার স্বর কানে আসায় আমার খুব ভয় ভয় করছে।" খলিফাও কান পেতে শুনলেন, উজিরের কথা ঠিকই। ইতিমধ্যে বক-উজির ভয় পেয়ে বক-রাজার পাখায় ঠোঁট বুলিয়ে উড়ে পালানর জন্য ইঙ্গিত করছিলেন কিন্তু খলিফা বক হ'লেও তাঁর সাহস যাবে কোথায়? তাঁর পাখার নীচে যে সাহস-ভরা হৃৎপিণ্ড! যে দিক্ থেকে ঐ শব্দ আসছিল বক-রাজা ক্রমশঃ সে-দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি দরজার কাছে এসে পড়লেন। দরজাটি শুধু ভেজান ছিল এবং তার ভিতর দিয়াই দীর্ঘশ্বাস এবং করুণ স্বর শোনা যাচ্ছিল। তিনি ঠোঁট দিয়ে দরজায় আঘাত করলেন এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি ভাঙা জানালার সারসি দিয়ে ঐ অন্ধকার ভাঙা ঘরের মধ্যে যে সামান্য আলো পড়েছিল তা'তে তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন, মস্ত বড় একটা পেঁচা মেঝেতে ব'সে আছে। তার বড় বড় গোল চোখ বেয়ে জল পড়ছিল এবং তার বাঁকা ঠোঁটের ভিতর দিয়ে ভাঙা স্বরে করুণ কান্নার শব্দ আসছিল। ইতিমধ্যে বক-উজিরও সাহসে ভর করে মনিবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে পেঁচা সহসা জোরে হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। পাঁশুটে রঙের পাখা দিয়ে সে সলজ্জ ভাবে চোখের জল মুছে ফেলল এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় মানুষের মত ব'লে উঠল—"আসুন বক মহাশয়রা, আজ আমার বড় শুভ দিন। আপনাদের আগমনে আমার মনে বড়ই আশার সঞ্চার হচ্ছে, কারণ, ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, বকের সাহায্যেই আমার এই দুর্দ্দশা কেটে গিয়ে সৌভাগ্যের সূচনা হবে।"

পেঁচার মুখে এই কথা শুনে বক-রাজা ও বক-উজির যারপর নাই বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পরে বক-রাজা তাঁর লম্বা গলা নত করে, পা দুটি ভদ্রভাবে জোড় ক'রে বললেন—"পেচক, তোমার কথাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের আর একজন দুঃখের ভাগী ভগবান্ মিলিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের দ্বারা তোমার উদ্ধার কি ক'রে হবে বুঝি না। আমাদের কথা শুনলে বুঝতে পারবে আমরা নিজেরাই কত নিঃসহায়।" পেচক তখন বক-রাজাকে তাঁদের কাহিনী বলবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি তাঁর সমুদয় দুঃখের ইতিহাস বর্ণনা করলেন।

৪

খলিফার গল্প শেষ হ'লে পেচক তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুঃখের কাহিনী বলতে আরম্ভ করল।—"আমার ইতিহাস একটু মন দিয়ে শুনলে বুঝবেন, আমিও আপনাদের চেয়ে কম হতভাগ্য নই। আমার পিতা ভারতবর্ষের রাজা—আর আমি তাঁর একমাত্র দুর্ভাগ্য কন্যা, কাশিম নামে যে যাদুকর আপনাকে বক করেছে, সেই আমার এই দুর্দ্দশার মূলে। যাদুকর এক দিন আমার পিতার নিকট এসে তার পুত্র মিরজার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করে। মহাপ্রতাপশালী আমার পিতা তাঁর একমাত্র কন্যার এইরূপ হীন বিবাহ প্রস্তাব শুনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে যাদুকরকে সিঁড়ির উপর থেকে নীচে ফেলে দেন। যাদুকর অপমানে জর্জ্জরিত হয়ে কিসে আমাদের ক্ষতি করবে সেই চেষ্টায় থাকে। এক দিন আমি আমাদের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তৃষ্ণার্ত্ত বোধ করায় কাশিম একটি ক্রীতদাসের রূপ ধারণ করে আমাকে একটি পানীয় খেতে দেয়। সেটা পান করামাত্রই আমি এই কুৎসিত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি। সেই অবস্থায় সে আমাকে এখানে নিয়ে এসে কর্কশ স্বরে আমার কানের কাছে বলতে লাগল—"যে প্রাণীকে অন্য পশুপাখীরা পর্য্যন্ত ঘৃণা করে সেই অবস্থায় তুমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকবে। অবশ্য তোমার এই ঘৃণ্য অবস্থা দেখেও যদি কেহ স্বেচ্ছায় তোমাকে বিবাহ করে তবে তোমার মুক্তি হবে। মনে রেখো—তোমার পিতার এবং তোমার দাম্ভিক ব্যবহারের জন্য যাদুকর কাশিমের এই প্রতিহিংসা গ্রহণ।"

"সেই থেকে অনেক বছর কেটে গেছে। সন্ন্যাসিনীর মত নির্জ্জনে একাকী গভীর মনঃকষ্টে এই ঘরে আমি সময় কাটাই। জগতের সামান্য পশুপাখীদেরও আমি ঘৃণা এবং উপেক্ষার পাত্র। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য থেকে আমি বঞ্চিত। কারণ, দিনের বেলায় আমি অন্ধ। রাত্রিকালে যখন চন্দ্রের ম্লান আলো এই ভাঙা বাড়ীর উপর পড়ে কেবল তখনই আমার চোখের আবরণ খুলে যায়।"

পেচক তার দুঃখের কাহিনী শেষ ক'রে পাখা দিয়ে আবার তার চোখের জল মুছে ফেলল। এই বুকফাটা দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতে করতে তার দুই চোখে দরদর ধারে জল পড়ছিল।

বক-রাজা পেচক-রাজকন্যার কাহিনী শুনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—"জগতে সবাই প্রতারক নয়। তোমার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে—যেন আমাদের উভয়ের দুর্ভাগ্যের মধ্যে একই রহস্য রয়েছে—কিন্তু এই রহস্যভেদের উপায় কি ?"

পেচক উত্তর দিল—"জনাব, আমার কিন্তু খুব ভরসা হচ্ছে, কারণ ছেলেবেলায়—এক জন গুণী মহিলা আমার সম্বন্ধে ভবিষদ্‌বাণী করেছিলেন, জীবনে এক সময়ে একটি বকের দ্বারা আমার পরম উপকার হবে। আমার বেশ মনে হচ্ছে, আমরা শীঘ্রই আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজে পাব।"

বক-রাজা অতিশয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"কত দূরে সে পথের নাগাল পাব ? পেচক বলতে আরম্ভ করল—"যে যাদুকর আমাদের তিন জনকে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে এনেছে সে মাসের মধ্যে একবার এই ভাঙা বাড়ীতে এসে থাকে। এই ঘরের কাছেই একটি হলঘরে অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সে খানাপিনা করে। আমি দু-একবার আড়ি পেতে তাদের কথাবার্ত্তা শুনেছি। তাদের মধ্যে কে কি দুষ্কর্ম্ম করেছে, সে সম্বন্ধে এখানে তারা আলোচনা করে। তাদের এই কথাবার্ত্তার মধ্যে হয়ত বা আপনারা যে কথাটি মনে করতে পারছেন না সে কথাটি তারা বলে ফেলতে পারে।"

বক-রাজা উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—"হে পরমপ্রিয় রাজকন্যা, বল বল, কখন্ সে আসে এবং সে হলঘরই বা কোন্‌টি ?"

পেচক-রাজকন্যা একটু চুপ করে থেকে বললেন—"যদি আপনারা কিছু মনে না করেন তবে আমি বলতে চাই যে আপনারা একটি কড়ারে আবদ্ধ হ'লে আমি সানন্দে আপনাদের অভিলাষ পূর্ণ করতে পারি।"

শছিদ (বক-রাজা) উৎসাহের সঙ্গে বললেন—"বল বল, আদেশ কর, যে কড়ার বল তাতেই আমি আবদ্ধ হ'তে রাজী আছি।"

পেচক-রাজকন্যা কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "আমি তখনই মুক্তি পাব যখন আপনাদের মধ্যে কেহ আমাকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করবেন।"

এই প্রস্তাব শুনে বকেরা যেন একটু দমে গেলেন। শছিদ মনসুরের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে গেলেন এবং উজিরকে বিয়ে করতে অনুরোধ জানালেন। বক-উজির জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, বিয়ে করতে পারি কিন্তু তার ফল কিরূপ হবে বুঝতেই পারছেন—বাড়ী ফিরে গেলে আমার স্ত্রী আমার চোখ উপড়িয়ে দেবে। তার পর আমি বৃদ্ধ। আপনি অবিবাহিত এবং যুবক, সুতরাং আপনার পক্ষেই এই সুন্দরী যুবতী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ লোভনীয়।"

বক-রাজা দুঃখিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"কে জানে সে সুন্দরী এবং যুবতী—এ যেন না দেখে বস্তাবন্দী বিড়াল খরিদ।"

অনেক আলোচনা ও চিন্তার পর বক-রাজা বুঝলেন যে—উজির বরং বক হয়েই সারা জীবন কাটাবে তবু একে বিয়ে করবে না, তখন নিজেই পেচকের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে মনস্থ করলেন। ঘরের ভিতর গিয়ে বক-রাজা পেচকের কথায় স্বীকৃত হওয়ায় পেচক যারপরনাই আনন্দিত হল। সে বকদের বলল—"এত দিন পরে আজ সত্য সত্যই শুভক্ষণ এসেছে, কারণ তার মনে হচ্ছে, সেই রাত্রেই যাদুকরেরা হলঘরে সমবেত হবে।"

পেচক-রাজকন্যা বক-রাজা-উজিরকে নিয়ে হলঘরের দিকে রওনা হল। তারা কিছুক্ষণ একটি অন্ধকার পথে চলে দেখতে পেল, একটি আধভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল আলো আসছে। সেখানে পৌঁছানর পর পেচক সঙ্গীদের চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল, তারা দেয়ালের ফুটো দিয়ে মস্ত একটি হলঘরের ভিতর দেখতে পেল। হলঘরটি উঁচু উঁচু সুদৃশ্য থামে সুন্দর সজ্জিত ছিল। অনেকগুলি রঙিন আলো দিনের বেলাতেও ঐ ঘরে জ্বলছিল। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি গোল টেবিলে নানা প্রকারের বাছা বাছা খাবার সাজান ছিল, তার চার পাশে প্রকাণ্ড একটি সোফার উপর আট জন লোক বসে ছিল। এদের মধ্যে এক জনকে বক-রাজা ও উজির চিনতে পারলেন। এ লোকটি সেই ফেরিওয়ালা যার কাছ থেকে তাঁরা ম্যাজিক পাউডার কিনেছিলেন। তার পাশে উপবিষ্ট লোকটি তার নতুন কাজকর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করল। ফেরিওয়াল তার বিবিধ কাজের মধ্যে বাগদাদের খলিফা ও উজিরের বক হবার বৃত্তান্তও জানাল। অপর যাদুকর তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন্ মন্ত্রে সে তাদের বক করেছে।" লোকটি উত্তর দিল, "এটি খুব শক্ত ল্যাটিন মন্ত্র—'মুতাবর'।"

৫

বকেরা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে এই কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। তারা লম্বা লম্বা পা ফেলে এত তাড়াতাড়ি ভাঙা বাড়ীর সদর দরজার নিকট পৌছল যে, পেচক তাদের নাগালে ধরতেই পারলো না। পেচক তাঁদের নিকট পৌছিলে বক-রাজা পরম পুলকিত হয়ে পেচক রাজকন্যাকে বললেন—"আমার এবং আমার প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারকর্ত্রী আমাদের প্রাণের ধন্যবাদ গ্রহণ কর এবং আমার পূর্ব্বপ্রস্তাব মত তোমার পতিত্বে বরণ কর। দুই বকই তখন পূবদিকে নুয়ে পড়ে তিনবার 'মুতাবর' কথা উচ্চারণ করতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে উভয়ে মানুষ হয়ে গেলেন। খলিফা নতুন জীবন পাওয়ার মত আনন্দে অধীর হয়ে উজিরকে আলিঙ্গন করলেন। উভয়েরই দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। পরস্পরের পানে চেয়ে উভয়ের যে কি বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সহসা চেয়ে দেখেন, চমৎকার পোষাক পরে এক সুন্দরী যুবতী নারী তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে। হাসতে হাসতে রাজকন্যা খলিফার হাতে হাত রেখে বলল—আপনি আপনার পেচক-গৃহিণীকে বোধ করি আর চিনিতে পারছেন না ?" খলিফা রাজকন্যার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও সুরুচি দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তিনি আর না বলে পারলেন না—"এ তোমার পরম সৌভাগ্য, রাজকন্যা, যে খলিফা বকরূপ ধারণ করেছিলেন।"

তিন জনে তখন মনের আনন্দে বাগদাদের দিকে রওনা হলেন। বক হবার আগে যেখানে তাঁরা কাপড় চোপড় ছেড়ে ম্যাজিক পাউডার শুঁকেছিলেন সেখানে গিয়ে তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ, ম্যাজিক পাউডারের কৌটা এবং টাকার থলিটি পর্য্যন্ত পেয়ে পরম বিস্মিত ও অতিশয় আনন্দিত হলেন। এই অর্থে তিনি বাগদাদে জাঁকজমকের সঙ্গে যাবার উপযুক্ত বেশভূষা নিকটবর্ত্তী এক বাজার থেকে কিনে নিলেন। খলিফার বাগদাদ প্রত্যাগমনের সংবাদে সহরে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তিনি মারা গেছেন ধারণায়

বাগদাদবাসীরা যে পরিমাণে দুঃখিত হয়েছিল আজ তাঁর সশরীরে বাগদাদে ফেরার সংবাদে সেই পরিমাণে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

প্রতারক মির্‌জার প্রতি খলিফার হিংসানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেই প্রথমে তিনি বৃদ্ধ যাদুকর ও তার পুত্রকে বন্দী করলেন। সেই ভাঙা বাড়ীর যে ঘরে রাজকন্যাকে পেচক করে রেখেছিল বৃদ্ধকে সেই ঘরে নিয়ে ফাঁসী দেওয়া হল। যাদুকরের ছেলে পিতার অভিসন্ধি জানত না, সুতরাং খলিফা তাঁর প্রতি লঘু-দণ্ডের ব্যবস্থা করলেন—ম্যাজিক পাউডার শুঁখে অন্য প্রাণী হওয়া বা প্রাণদণ্ড এ দুয়ের যেটি তার ইচ্ছা সে বেছে নিতে পারে বললেন। প্রাণদণ্ডের চেয়ে ম্যাজিক পাউথার শুঁথাই শ্রেয়ঃ মনে করায় খলিফা তাকে ঐ পাউডার শুঁখিয়ে বক করে ফেললেন এবং তাকে একটি লোহার খাঁচায় পূরে খলিফার বাগানবাড়ীতে রেখে দিলেন।

খলিফা শছিদ বহুকাল জাঁকজমকের সহিত রাজত্ব করেন। বিকালের দিকে উজির হাজির হলেই যেদিনই তিনি খোসমেজাজে থাকতেন, সেই দিনই তাঁদের ফেরিওয়ালার কাছে ম্যাজিক পাউডার কিনে শুঁকে বক হওয়া—বক হয়ে হেসে ফেলা ও মন্ত্র ভুলে গিয়ে কষ্টে কালযাপন ও ভাগ্যক্রমে পেচকের সাহায্যে মুক্তিলাভ ইত্যাদি অতীত দিনের কথা একে একে মনে করে মনের সুখে গল্প-গুজবে পরম আনন্দ উপভোগ করতেন। *

—

—ইতিহাস যারা তৈরী করে—

র‍্যাফেলের বন্ধু

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

চিত্রকরের ছেলে র‍্যাফেলের শিল্পী হ'য়ে উঠতে দেরী হয়নি পেরুগিনোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। একুশ বছর বয়সের মধ্যেই ফ্লোরেন্সের সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীর সমকক্ষ তিনি, 'কুমারীর অভিষেক' এঁকে। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের প্রাসাদ ভ্যাটিকান সজ্জিত হ'তে সুরু হল তাঁর প্রথম জীবনের প্রসিদ্ধ ছবিতে, দশম লিয়োর রাজত্বে হল তা সম্পূর্ণ। কিন্তু তখন তাঁর আয়ু কতটুকুই বা ছিল? সেণ্ট-পিটার্স চার্চ্চের প্রধান চিত্রপরিচালকের পদ পেয়েও তিনি প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকাণ্ড এক বই লিখে ফেললেন।

ফ্রান্স আর ফ্লাণ্ডার্স পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো তাঁর খ্যাতি। জার্ম্মাণ চিত্রকর অ্যালবার্ট ডুরার র‍্যাফেলের গুণে মুগ্ধ হয়ে নিজের অনেক ছবির সঙ্গে তাঁর একখানি প্রতিকৃতিও উপহার পাঠালেন, জলের রং দিয়ে যা এমন একটি সূক্ষ্ম বস্ত্রে আঁকা ছিল যে, দুদিক থেকে দেখা যায়। র‍্যাফেলও বিনিময়ে পাঠালেন তাঁর তুলির পরিচয়। স্বর্ণশিল্পী ফ্রান্সিয়ার ভারী ইচ্ছে হল র‍্যাফেলের সঙ্গে পরিচয় করতে, কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ ফ্লোরেন্স পর্য্যন্ত যাওয়া তাঁর ঘ'টে উঠলো না। বলোনার লোকেরা গিয়ে র‍্যাফেলকে জানালে তাদের শিল্পী ফ্রান্সিয়ার কথা, র‍্যাফেল তাঁকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করে 'সেণ্ট সিসিলিয়া'র ছবি পাঠিয়ে ব'লে দিলেন বলোনার গির্জ্জায় এ ছবি ফ্রান্সিয়া নিজে খাটিয়ে দেবেন, এই তাঁর একান্ত অভিলাষ।

সেই অনন্যসাধারণ চিত্র দেখে আনন্দে এবং বিস্ময়ে ফ্রান্সিয়া হ'য়ে গেলেন নির্ব্বাক্‌, সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল তাঁর নিজের এত দিনের শিল্প সাধনা একেবারে ব্যর্থ। তাঁর ছবি পৃথিবীর, র‍্যাফেলের ছবি স্বর্গের। অথচ সেই র‍্যাফেল তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, ছবিতে যদি কোনো দাগ পড়ে, বন্ধু যেন ঠিক ক'রে দেন, যদি কোনো ভুল থাকে, বন্ধু যেন সংশোধন করেন। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সিয়াকে কিছুই করতে হয়নি। সযত্নে ছবিখানিকে যথাস্থানে সজ্জিত ক'রে তিনি নিজের জীবনের নিষ্ফলতায় শয্যা নিলেন এবং আর তাঁকে উঠ্‌তে হল না। লোকে মনে করে, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। জগদ্বিখ্যাত বন্ধুকে কোন দিন তিনি চোখেও দেখতে পেলেন না।

প্যালের্মোর সাণ্টা মেরিয়ার মঠের জন্যে র‍্যাফেল 'মণ্ট অলিভেটোর ভ্রাতৃবৃন্দ' নামে বৃহৎ এক ছবি আঁকেন, যাতে দেখানো হয়েছিল ক্রুশ হাতে ক'রে প্রসন্নমুখে খৃষ্ট চলেছেন স্বয়ং। যে জাহাজে ক'রে সেই ছবি পাঠানো হয়, ঝড়-তুফানে সমুদ্রগর্ভের পাথরে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং নাবিকদেরও কোনো সন্ধান মেলে না। অনেক দিন পরে এক দিন জেনোয়ার উপকূলে নীল সিন্ধুতরঙ্গে ভেসে আসে একটি সাদা প্যাকিং বাক্স, খুলে দেখা যায়, অপার্থিব ছবিখানি অক্ষতই আছে, উন্মত্ত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ ও ঝঞ্ঝা এত বড় কীর্ত্তিকে সম্মান দেখাতে ত্রুটি করেনি। সিসিলির প্যালের্মো নগরের সেই ছবিখানি তার আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসের চেয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে জগতে।

মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে পূর্ণ যৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পী যেদিন শেষ নিশ্বাস ফেললেন, সেদিন মহানগরী রোমের সমস্ত অধিবাসী ভিড় করে শেষ দেখা দেখতে আসে তাদের প্রিয় শিল্পীকে, প্রতিভা যাঁর ছিল স্বর্গীয়, কীর্ত্তি যাঁর দেশকালপাত্র অতিক্রম ক'রে গেছে।

—

—বিষ্ণুগুপ্ত—

শ্রীরবিনর্ত্তক

৪

সুনন্দার নয় ছেলেকে'ত এই ভাবে একটা হিল্লে হ'য়ে গেল। কিন্তু মহাপদ্মর মনের কোণে একটা কাঁটা ফুটে খচ্‌খচ্‌ করছিল। তাঁর ছোটরাণী মুরারও ত এক ছেলে—মৌর্য্য তার নাম। এই ছেলেটিকে তিনি সব চেয়ে ভালবাস্‌তেন। কারণ, সুনন্দার চেয়ে মুরার ওপর তাঁর টান ছিল বেশী। মুরার একমাত্র ছেলে এই মৌর্য্য—তার ওপর বেশী স্নেহ পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। শুধু কি তাই!—মৌর্য্য আবার ছেলেদের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে বড়। মুরারই ত ছেলে সব আগে জন্মেছিল কি না। তার পর সুনন্দার পেট থেকে মাংসের ডেলা বেরোয়—পরে রাক্ষসের বুদ্ধিতে সেই মাংসপিণ্ড ন'টি ছেলের রূপ নিয়েছিল। এ ছাড়া—মুরার ছেলেটি রূপে-গুণে অতুল। রাজ্যের সব প্রজা মৌর্য্যকে খুব ভালবাসৃত। এমন ছেলের কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না ভেবে মহাপদ্মের মনের অশান্তি বেড়ে

* মূল জার্মান অবলম্বনে

গেল। কিন্তু কি করবেন তিনি? পাটরাণীর ছেলে ছাড়া অন্য রাণীর ছেলে ত রাজ্য পাবে না—এই বংশের নিয়ম। সে নিয়ম তিনি ত নিজে ভাঙ্তে পারেন না। ভাঙলে প্রজারা হয়ত বিদ্রোহী হবে—আর তাঁর নয় গুণধর ছেলে ত বিদ্রোহ করবেই।

তাই অনেক ভেবে চিন্তে তিনি ছোটরাণী মুরার ছেলেটিকে ক'রে দিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। এতে ছোটরাণী মুরা যেমন সুখী—মৌর্য্যও তেমনি খুসী। প্রজারাও সকলে খুব আনন্দিত; কারণ, মৌর্য্য ছিলেন সকলের প্রিয়। আর নয় যুবরাজ নব নন্দ? তাঁরা যখন দেখ্লেন যে মৌর্য্য তাঁদের বড় ভাই হ'য়েও রাজ-সিংহাসনের দাবীদার হলেন না, তখন তাঁরাও যে বিশেষ সন্তুষ্ট হ'ননি—এমন নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ করা সেনাপতির কাজ। এ সব যুদ্ধ-বিগ্রহের দায়িত্ব তাঁদের নিজেদের উপর না রেখে মৌর্য্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল—এতে তাঁরা বুড়ো মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। ভাব্লেন—এবার মৌর্য্যই লড়াই ক'রে বেড়াবে—শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে হয় সেই দেবে—আর আমরা নয় ভাই মিলে নির্ঝঞ্ঝাটে কেবল স্ফূর্ত্তি করব।

রাক্ষস অবশ্য আগের মতই প্রধান মন্ত্রী রইলেন—রাজ্য চালাবার ভার তাঁরই ওপর। নব নন্দের না রইল বিপদের ভয়—না রইল রাজ্যপালনের দায়িত্ব—তাঁদের তখন মনের আনন্দ দেখে কে!

এই ভাবে রাজ্য ভাগ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বুড়ো মহারাজ মহাপদ্ম নন্দ সর্ব্বার্থসিদ্ধি তাঁর দুই রাণী সুনন্দা আর মুরার সঙ্গে বনে গেলেন তপস্যা করতে।

নব নন্দের প্রত্যেকেই ছিলেন ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর স্বভাবের—এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। নয় ভাইএর কারুর শরীরে এতটুকুও সদ্‌গুণ ছিল না। অথচ তাঁদের বৈমাত্রেয় ভাই মৌর্য্যের স্বভাব চরিত্র ছিল খুবই ভাল। তাঁর মত সুন্দর চেহারার আর নানা গুণে গুণবান্ লোক সে সময়ে রাজ্যে আর একটিও ছিল না। এ কারণে নন্দেরা সকলেই বরাবর ভিতরে ভিতরে মৌর্য্যের খুব হিংসা করতেন। আবার মৌর্য্যেরও মনে একটা বড় দুঃখ ছিল যে, তিনি বয়সে সবার বড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাবা তাঁকে রাজ্যের এতটুকু ভাগও না দিয়ে পক্ষপাত করেছেন; প্রধান সেনাপতি হ'য়েও এ দুঃখ তাঁর কোন দিন যায়নি। তাই তিনি বরাবরই চেষ্টা করতেন, কিসে রাজ্যের সকল লোকে তাঁকে সত্য সত্য ভালবাসবে। তাঁর মনের গোপনে—হয়ত তাঁরও চেতন মনের অজ্ঞাতে—এ আশাটুকু বাসা বেঁধেছিল যে এক দিন প্রজারাই নব নন্দের অত্যাচারে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্বে—সিংহাসন থেকে তাদের নামিয়ে দিয়ে মৌর্য্যকে বসাবে সেই আসনে। এই আশাতেই বুক বেঁধে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন সেনাপতির কর্ত্তব্য প্রাণ দিয়ে পালন ক'রে।

মৌর্য্যের শৌর্য্য-বীর্য্য আর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে রাজ্যের অনেক মাতব্বর প্রজার মেয়েরা উপযাচিকা হ'য়ে তাঁর গলায় মালা দিয়েছিলেন। অথচ নব নন্দের বিয়ের জন্য অশেষ চেষ্টা ক'রেও সারাটা রাজ্যে এক জনের একটাও পাত্রী জোটেনি, এ কি কম আপশোষের কথা! রাজার শ্বশুর হবার লোভে কখন কোন মেয়ের বাপ রাজী হ'লেও জেদী মেয়ে তাঁর বেঁকে বসত—নব নন্দ রাজার রাণী হবার আগেই সে পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করবে—নব নন্দের কোন নন্দকেই সে বিয়ে করতে রাজী নয়। আর ওদিকে মৌর্য্যের পোনের জন স্ত্রী। তাঁরা সতীনের উপরেই যেচে এসে মৌর্য্যকে বিয়ে করেছেন। শুধু বিয়ে করা নয়—কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি না ক'রে কয় সতীন মিলে মিশে সুখে ঘর-সংসার করছিলেন—ছেলে-মেয়ে নিয়ে—বহু কাল ধরে। মৌর্য্যের এক এক ক'রে একশটি ছেলে জন্মেছিল যোল স্ত্রীর গর্ভে। এই কিশোর কুমারগুলির প্রত্যেকেই যেমন সুন্দর তেমনই বীর। সকলের ছোট যেটি, তার ত তুলনাই নেই। সেটির নাম চন্দ্রগুপ্ত—সে যেন মৌর্য্যের তরুণ বয়সের প্রতিচ্ছবি।

বিলাসের সাগরে ডুবে থেকেও নব নন্দের প্রত্যেকেরই বোঝবার বাকি ছিল না যে—রাজসৈন্যেরা—রাজধানীর প্রজারা সকলেই মৌর্য্য আর তাঁর ছেলেদের খুব মেনে চল্ত—এমন কি, তাঁর কথায় তারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কাতর হ'ত না। তবে নব নন্দের মনে মনে একটা ভরসা ছিল যে, পাড়াগাঁয়ের প্রজারা ত মৌর্য্যের এত সদ্‌গুণের সাক্ষাৎ পরিচয় পায়নি। কাজেই সারা রাজ্যে প্রজা-বিদ্রোহ হওয়া অসম্ভব। এই ধারণা নিয়েই নিশ্চিন্ত মনে পালার পর পালা ক'রে তাঁরা রাজসুখ ভোগ ক'রে চলেছিলেন।

কিন্তু নব নন্দ যতই নিশ্চিন্ত থাকুন না কেন, মহামন্ত্রী রাক্ষস ততটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাল কাটাতে পারছিলেন না। কিন্তু মৌর্য্য আর তাঁর ছেলেদের জনপ্রিয়তা ভাল চোখে দেখেননি কোন দিন। তাঁর কেবলই মনে হ'ত—সারা রাজ্যের প্রজারাও যদি মৌর্য্যের গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁর বাধ্য হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে ত আর কথাই নেই—একেবারে সোণায় সোহাগা। নব নন্দকে বিনা যুদ্ধে তাড়িয়ে দিয়ে কিংবা বন্দী ক'রে রেখে রাজসিংহাসন দখল করা মৌর্য্যের পক্ষে একটুও কঠিন হবে না। মৌর্য্যের অন্তরের এই চাপা ইচ্ছাটা তাঁর নিজের মুখে থেকে বাইরে কারুর সামনে প্রকাশ না হ'লেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাক্ষসের কাছে কোন উপায়েই তা গোপন রইল না। প্রভুভক্ত প্রধান-মন্ত্রী রাক্ষস প্রধান-সেনাপতির এই মনের ভাব বুঝ্তে পেরে খুবই দুর্ভাবনায় প'ড়ে গেলেন। পাছে মৌর্য্য কোন দিন কোন রকম বিশেষ গোলমাল বাঁধিয়ে বসেন—এই ভয়ে রাক্ষস এক দিন নব নন্দদের নির্জ্জনে মন্ত্রণা-কক্ষে ডেকে খুলে বললেন সব কথা। তার পর তাদের মত নিয়ে রাক্ষস সেনাপতি মৌর্য্য আর তাঁর একশ' ছেলেকে কারাগারে বন্দী ক'রে রাখবার ব্যবস্থাও ক'রে ফেললেন। যাতে মৌর্য্যের অধীন সেনারা বা তাঁর ভক্ত ও আত্মীয় মাতব্বর প্রজারা তাঁর কোন সন্ধান পেয়ে বিদ্রোহ ক'রে তাঁর উদ্ধার না করতে পারে—এজন্যে এক অজানা জায়গায় মাটীর নীচে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর সকলের চোখের আড়ালে তাঁকে ও তাঁর ছেলেদের আটক রাখা হ'ল। এই ভাবে সুড়ঙ্গের মধ্যে মৌর্য্য আর তাঁর একশ' ছেলেকে ঢোকাবার জন্যে রাক্ষসকে কম বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু রাক্ষসের বুদ্ধির তুলনা ছিল না। হাসিমুখে তিনি নিজে মৌর্য্যের বাড়ী গিয়ে খুব গোপন মন্ত্রণা করবার ছল ক'রে বাপ আর ছেলেদের ডেকে নিয়ে গিয়ে এই পাতালপুরীর মধ্যে বন্দী ক'রে রাখলেন। মৌর্য্য বীর ও বুদ্ধিমান্ হ'লেও কূট রাজনীতির চালে রাক্ষসের কাছে মাৎ হ'য়ে গিয়ে সপুত্র হ'লেন বন্দী—ভবিষ্যতের আশা-ভরসা সবই তাঁকে এই ভাবে দিতে হ'ল বিসর্জ্জন।

[ক্রমশঃ

—খোকন ডাক্তার— :

ভাব—উৎপলা
ভাষা—তা—না—রা

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি…
আমি যেন……আমি যেন……।
খোকন পড়ে খুউব মন দিয়ে,—পড়ে
শব্দকল্পদ্রুম আর ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী—মুচিরাম গুড়
আর জ্যোতিষ রত্নাকর।

খালি ক্রিং আর ক্রিং! কে বাপু ডাকছে
হ্যালো! এ্যাঁ, মিনু? কি ভাই! অসুখ? মেনির?
এখনি যাচ্ছি। হ্যালো! ছেড়ে দিয়েছে…
এখুনি যেতে হল।…ভাবনার কথা!

আরে ছোঃ। মেনির কিছু হয়নি—খেলবে ব্যাডমিণ্টন।
তাই বল! খোকন্ পেছপা নয় কিছুতেই।...
কিন্তু র‍্যাকেট? এ যে ভাঙ্গা!

পি, সি, সরকার

বরফের সাহায্যে সিগারেট খাওয়া

খেলার নাম শুনিয়া হাসিবেন না! সত্য সত্যই বরফের সাহায্যে সিগারেট খাওয়া সম্ভবপর এবং আমি নিজে ইহা করিয়া দেখাইয়াছি। কন্‌ট্রোলের বাজারে যখন দিয়াশলাইর অভাব বোধ করেন, তখন আপনিও নিজে আমার নিম্নলিখিত উপায়ে খেলাটি করিবেন।

কিছু দিন আগেকার কথা, কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটে একটি নামকরা সরবতের দোকানে আমরা কয়েক জন বন্ধুতে মিলিয়া সরবত খাইলাম। সরবত খাওয়া শেষ হইলে দোকানদারকে দাম দেওয়ার পালা

বস্তুর সহিত স্পর্শ করিবামাত্র আগুন জ্বলিয়া উঠিবে এবং সিগারেট্ ধরিয়া যাইবে। 'কেমিষ্ট্রী' পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, 'পটাসিয়াম' জলের সংস্রবে আসিয়া হাইড্রোজেন গ্যাসের উৎপত্তি করে এবং এতটা গরম হয় যে ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কাজেই খেলাটি বিজ্ঞানেরই একটা কেরামতী মাত্র। আমাদের সমস্ত খেলাই প্রায় তাহাই। তবে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পটাসিয়ামকে সর্ব্বদা তৈল অথবা ঐ জাতীয় পদার্থে ডুবাইয়া রাখিতে হয় নতুবা অসময়েও হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিতে পারে এবং ঐ জিনিষ কখনও খালি হাতে স্পর্শ করিতে নাই।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
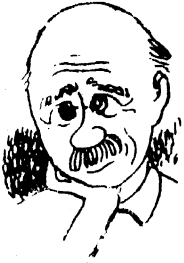
কোটালপুরের পটলবাবু ভালো মানুষ বড়;
হঠাৎ হোলো বিপদ গুরুতর।
চক্ষু তাঁহার উঠল চড়ক-গাছে,
আজকে তাঁহার রক্ষা কি আর আছে?
মেয়ের বিয়ে, কথা ছিল বরযাত্রী আসবে জনা বোলো,
হায় রে, তবে এ কী ব্যাপার হোলো?
সত্তর জন বরযাত্রী হল্লা করে' উঠল এসে পটলবাবুর বাড়ী,
বিপদ হোলো ভারি।
পটলবাবু ভয়ের চোটে পটল তোলেন বুঝি;
উপায় কিছু পান না তিনি খুঁজি'।

গরীব-মানুষ নেহাৎ তিনি, থাকেন গাঁয়ের দেশে,
অনেক কষ্টে' মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন শেষে—
জনা-কুড়ির ব্যবস্থাটা করেছিলেন পাকা,
নাইক' বেশী টাকা।
কোনো রকম জোগাড়-করে' শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে
ইচ্ছা ছিল সেরে মেয়ের বিয়ে।
সেই রকমই হয়েছিল রফা—
বোলোর স্থানে সত্তর জন হাজির হোলো বরযাত্রী;
সারলো বুঝি দফা!

ভাগ্নে হরু বল্লে, "মামা, ব্যস্ত হয়ো নাকো,
তুমি শুধু চুপটি করে' থাকো।
বিয়ের ব্যাপার চলতে থাকুক, আমি এদিকটাতে
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা নিচ্ছি নিজের হাতে।

চিন্তা তুমি ছাড়ো,
তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যাপার সারো।"

এদিকেতে বসলো খেতে বরযাত্রিদলে,
আসর-জুড়ে হল্লা-হাসি চলে।
রোগা-মোটা, লম্বা-বেঁটে, গুঁফো, টেকো, খাঁদা
কেউ বা ফাজিল, কেউ বা বাচাল, কেউ বা নীরেট হাঁদা,
হরেক রকম বরযাত্রী বসলো সারি সারি।
পড়লো পাতে লুচি ও তরকারি।

কুড়ি জনের জন্যে যাহা লুচি পোলাও তৈরি ছিল ঘরে
সবার পাতে কিছু কিছু দেওয়া গেলো ভাগাভাগি ক'রে
ফুরিয়ে যখন এসেছে তা, এমন সময় হরু—
গোয়াল থেকে ছেড়ে দিল সভার মাঝে সবার চেয়ে
দুরন্ত এক গরু।
লেজ উঁচিয়ে, শিং বাগিয়ে আসলো গরু তেড়ে;
"ও বাবা রে, ফেল্লে বুঝি মেরে।"
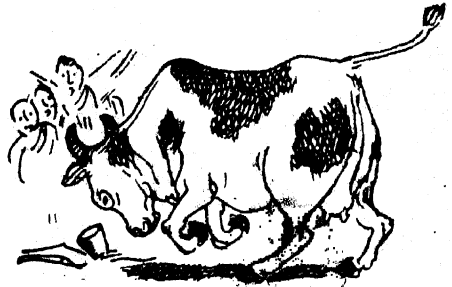
খাওয়া ফেলে সবাই পালায়, গরুর গুঁতোর অক্কা পাবে পাছে
হরু তখন চেঁচিয়ে বল্লে, "বসুন, বসুন, দই-সন্দেশ আছে—"

শুনবে কে আর হরুর কথা, গরুর তাড়া খেয়ে
একেবারে উঠল সবাই ইষ্টিশানে যেয়ে।
এ দিকেতে হয়ে গেল মেয়ের বিয়ে শুভলগ্ন দেখে,
পটলবাবু বেঁচে গেলেন কন্যাদায়ের থেকে।
হাসতে হাসতে হরু—
গোয়াল-ঘরে আটকালো ফের দুরন্ত সেই গরু।

ডেলো-যাত্রা (কালিম্পঙ)

শ্রীশশাঙ্কভূষণ চট্টোপাধ্যায়

এবার শরীরটা খারাপ থাকায় বাবা ঠিক করলেন যে ৺শারদীয়া পূজার ছুটিতে আমাকে নিয়ে কালিম্পঙ যাবেন। বাবা ও তাঁর তিন বন্ধুর সঙ্গে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কালিম্পঙ গেলাম। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গঙ্গেশানন্দ মহারাজ কালিম্পঙের প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে যে সুন্দর আশ্রম করেছেন সেখানে সকলে উঠলাম। মিশনের স্বামীজিদের তত্ত্বাবধানে দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল।

স্বামীজিদের মধ্যে একজন ছিলেন শ্রীযুত শচীন মহারাজ। শচীন মহারাজের অদম্য উৎসাহে আমরা কালিম্পঙে লম্বা লম্বা পাড়ি দিতাম। কালিম্পঙে পৌঁছাবার কিছু দিন পরে শচীন মহারাজ দূরবীন, দাঁড়ায় নিয়ে গেলেন। এটি কালিম্পঙের একটি উঁচু পাহাড়। এখানে উঠলে দার্জ্জিলিং, ঘুম, তিস্তা নদী, এমন কি পরিষ্কার থাকলে, জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত সুন্দর দেখা যায়। সেইখান থেকেই ঠিক হ'ল যে, ডেলোয় বেড়াতে যাওয়া হবে। শচীন মহারাজ, আমি, আমার বন্ধু সত্য ও রমেন মহারাজ এই চার জনে যাওয়া স্থির হ'ল।

বাবা ও তাঁর বন্ধুদের আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার কথা বলতে তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। মহারাজরা বললেন যে, "তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যাবে, আমরা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাব।" সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা বাজারে ঘোড়া ঠিক করতে গেলাম কিন্তু ঘোড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা পরদিন সকাল আটটার সময় বাজারে এসে দুটি ঘোড়া—আমার ও সত্যর জন্ত ঠিক করা গেল।

এখানে কালিম্পঙ সহরের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। বাঙ্গালাদেশের দুটো প্রধান hill stations-এর মধ্যে কালিম্পঙ অন্যতম। দার্জ্জিলিং সবচেয়ে বড়। কালিম্পং ইদানিংই hill station বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, আগে স্থানটি পশম-ব্যবসায়ীদের একটা আড্ডা বলেই প্রসিদ্ধ ছিল। তিব্বত থেকে ভারত পর্য্যন্ত হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর থেকে আসাম পর্য্যন্ত যে কয়টি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপথ আছে কালিম্পঙের রাস্তাটি তাদের মধ্যে একটি প্রধান। স্থানটি আগে সিকিমের অধীনে ছিল কিন্তু পরে—পঞ্চাশ বছরেরও কিছু উপর হবে—ব্রিটিশদের হাতে আসে। স্থানীয় অধিবাসীদের লেপ্‌চা বলা হয়।

শীতকালে কালিম্পঙ চমৎকার হয়ে উঠে। এই সময় গাছে গাছে কমলা লেবু হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্ত হিমালয় গিরিশিখরের তুষারমণ্ডিত বিরাট সৌন্দর্য্য ক্ষুদ্র মানুষকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করে দেয়। দার্জ্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু কালিম্পঙ থেকে বরফের শ্রেণী যত সুদূরপ্রসারী দেখা যায় দার্জ্জিলিং থেকে ততটা মোটেই নয়। অবশ্য Tiger Hill-এর কথা আলাদা। কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। বিরাট ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা জ্যোৎস্নালোকে শায়িত মহাদেবের মূর্ত্তির মতন মনে হয়েছিল।

ডেলো কালিম্পঙের উচ্চতম জায়গা—প্রায় ৬০০০ ফুট উঁচু। ১২ মাইল দূরে রেলি নদী থেকে পাইপে করে জল এনে এখানে একটি অতি বৃহৎ ট্যাঙ্কে রাখা হয় এবং নলের দ্বারা কালিম্পঙের আরও ২।৩টি বৃহৎ ট্যাঙ্কে আনা হয়। এইখান থেকেই সারা কালিম্পঙের জল সরবরাহ করা হয়।

আশ্রম থেকে বাজার দেড় মাইল, সেখান পর্য্যন্ত হেঁটে গেলাম। বাজার থেকে ঘোড়ায় চাপা গেল। খানিক দূর যাওয়ার পর লোকালয় প্রায় শেষ হয়ে এল, মাঝে মাঝে কেবল পাহাড়ীদের ২।১টা কুটীর চোখে পড়তে লাগল। আমরা ঘোড়া জোরে চালিয়ে দিলাম, মহারাজরা পেছনে পড়ে রইলেন। আমরা চারি ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম।

অর্দ্ধেকের উপর যখন উঠেছি তখন 'কালিম্পঙ হোমস' পাওয়া গেল। এই হোমস্ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অনাথ বালক-বালিকাদের লালন পালন করে এবং খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে। একটা পাহাড় জুড়ে এই হোমস্; প্রায় ৭০০ ছেলে-মেয়ে থাকে। এটি স্বর্গীয় ডাঃ গ্রেহাম্ সাহেবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। আমরা হোমসে নেমে খানিকক্ষণ নিজেরা জিরিয়ে নিয়ে ও ঘোড়াদের জিরেন দিয়ে আবার যাত্রা করলাম।

এবার খাড়া চড়াই। রাস্তা এত ভাঙ্গা ভাঙ্গা যে সেখান দিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য। যেতে যেতে এক দল বালক-বালিকা দেখলাম। তারা আমাদের "গুড মর্নিং" করল এবং আমরাও প্রত্যুত্তর দিলাম। আরও পনের মিনিটের রাস্তা চলবার পর একটি অনাথ বালকদের দল পেলাম। তাদের হাতে লাঠিতে বাঁধা সরু জাল—প্রজাপতি ধরবার জন্ত। ডেলোর নিকট যখন এসেছি তখন দুধারে লম্বা লম্বা ওক গাছের সারি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। এর পর আমরা ডেলোয় পৌঁছালাম।

শচীন মহারাজ যখন আমাদের জলের ট্যাঙ্ক দেখাচ্ছিলেন তখন তাঁর পায়ে একটি জোঁক লাগল। আমার চোখে পড়ায় মহারাজের সূক্ষ্ম শরীর রক্তশোষণের হাত থেকে শীঘ্রই পরিত্রাণ পেল। যে রাস্তা দিয়ে আমাদের চলতে হয়েছিল সেখানে আমাদের বুক সমান উঁচু ঘাস। এবার আমার পায়েও একটা জোঁক উঠল, শচীন মহারাজ দেখতে পেয়ে আমার প্রত্যুপকার করলেন এবং জোঁকটাকে টেনে ছাড়িয়ে দিলেন। আমরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলাম, কেন না, সেখানে অসংখ্য জোঁক। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছালাম। সেখানে দাঁড়িয়ে ফিল্ডগ্লাস্ দিয়ে তিস্তা নদী রঙ্গিত নদী দার্জ্জিলিং ঘুম জলপাইগুড়ি ইত্যাদি দেখলাম। দূর থেকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল সব। খানিকক্ষণ দেখার পর আমরা যা খাবার সঙ্গে এনেছিলাম তার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নামতে লাগলাম। এবার আর অশ্বপৃষ্ঠে নয়—পদব্রজে ৬ মাইল পাড়ি। পথে রোপওয়ে ষ্টেশন পড়ল। এইখান থেকে লোহার তারের দ্বারা রিয়াং রেল-ষ্টেশন থেকে কালিম্পঙে মাল সরবরাহ করা হয়। এই সব দেখতে দেখতে আমরা বাজারে এসে গেলাম এবং সেখান থেকে সোজা আশ্রমে চলে এলাম। সকাল সাড়ে ৭টায় বেরিয়েছিলাম ফিরে এলাম বেলা ২।০টায়। শচীন মহারাজ না থাকলে 'ডেলো'-যাত্রার উৎসাহ আমাদের হত না এবং এমন একটা আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ trip আমাদের ভাগ্যে জুটত না। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অবান্তর

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

আচ্ছা বাসন্তি তো নাম, তুই কি বোলে ডাকতিস বৌকে? কমল জিজ্ঞেস করলে মনোরঞ্জনকে। স্ত্রীর প্রসঙ্গ উঠলেই মনোরঞ্জন কেমন বিমর্ষ হয়ে যায়। কিন্তু কমল তাকে ছাড়ে না, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেবল তার বৌয়ের কথা জিজ্ঞেস করে।

কমল তার কথার উত্তর পাবার আগেই আবার বললে, নামটা কিন্তু ভাই ভালো নয়—দেখতে যে রকম সুন্দরী শুনেছি তোর মুখে—নামটা ঠিক সে রকম হ'লো না। দু'অক্ষরে যে মিষ্টি করে ডাকবি তার কোন উপায় নেই!

মনোরঞ্জন তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, কেনো, আমি তাকে ডাকি রাণী বলে। আমার হৃদয়ের রাণী, আমার অন্তরের রাণী, আমার সর্ব্বস্বের রাণী। এই কথা বলতে বলতে মুখ-চোখ উদ্ভাসিত হোয়ে উঠলো!

তাদের গভীর প্রেমের কথা শুনে কমলের মনে ঈর্ষা হয়। সে অবিবাহিত আর কোন দিন বোধ হয় তার বিয়ের আশাও নেই—পঁয়ত্রিশ বৎসর তার বয়েস! দেশের কাজে উৎসর্গ করেছে সে তার জীবন। পনেরো বছর আগে সেই যে কলেজ ছেড়ে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়েছিল আজও তার জের চলেছে। নিত্য নূতন সমস্যা, নিত্য নতুন মুক্তির উপায় চিন্তা করতে করতে সে ভুলেই গিয়েছিলো নিজের সুখের কথা। সমগ্র দেশবাসীর সুখে তার সুখ, তাদের দুঃখে তার দুঃখ। কমলের জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্য! তাই বিয়ের কথা যতবার তার হোয়েছে সে শুধু কঠিনভাবে বোলেছে, না। বিধবা মা বার বার বোলে শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। জেলে জেলে যার জীবনের অধিকাংশ দিন কাটে তাকে আবার মেয়ে দেবে কে? আজ ছ'মাস, কাল এক বছর, পরশু হাজত বাস অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। আর এতেই ছিল কমলের গর্ব্ব! যে সব যুবকেরা চোখে চশমা লাগিয়ে, আদ্দির পাঞ্জাবী উড়িয়ে, উঁচু গোড়ালীওলা জুতো-পরা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লেকে হাওয়া খেতে যায় তাদের তীব্র কশাঘাত করতে সে ছাড়তো না। বহুবার বহু জনসভায় বক্তৃতা করতে উঠে সে এই সব দেশবিস্মৃত আত্মসুখসর্ব্বস্ব যুবকদের দেশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক বলে উল্লেখ করেছে। বিবাহিত যুবকদের সে ঘৃণা করতো। মনোরঞ্জনকেও সে মনে মনে ঘৃণা করতো। একই জেলে একসঙ্গে বাস করলেও সর্ব্বদা তার সঙ্গে সে একটা ব্যবধান রেখে চলেছে। মনোরঞ্জনও ত্যাগী পুরুষ, সংযমী পুরুষ বলে মনে মনে কমলকে শ্রদ্ধা করতো।

কিন্তু সংযম ত্যাগ যত কঠিন বস্তুই হোক না কেন, মানুষের স্বভাব যে তাকে কেমন ক'রে, কোথা দিয়ে জয় করে তা বলা শক্ত। তাই হঠাৎ একদিন মনোরঞ্জনকে তার স্ত্রীর চিঠি পড়তে দেখে কমল জিজ্ঞেস করলে, কি হে, কি লিখেছে তোমার পরিবার?

বাসন্তি সেই চিঠিখানি এমন ভাষায় এবং এমন ভাবে লিখেছিলো যে তা মুখে বলতে গিয়ে মনোরঞ্জনের কেমন লজ্জা বোধ করলো, তাই চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বললে, ছাখো না পড়ে, আমার স্ত্রী অশিক্ষিতা, এর লেখা কি ভাল লাগবে তোমার?

কাঁচা-হাতে লেখা, অসংখ্য ভুলে ভরা সেই চিঠিখানি কমল পড়লে; কিন্তু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা কেমন হয়ে গেল। চিঠিখানি তাড়াতাড়ি তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সে তখন অন্তকথা পাড়লে।

মনোরঞ্জন একটু দমে গেল। তার বিশ্বাস ছিল যে তার স্ত্রীর মত এমন করে কোনো পাশ-করা মেয়েও চিঠি লিখতে পারে না। তাই সে সম্বন্ধে কমলকে নীরব দেখে সে বললে, আমি তো আগেই বলেছিলাম দাদা, আমার স্ত্রী মূর্খ, তার চিঠি তোমার মত শিক্ষিত লোকের ভালো লাগবে না।

কমল অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে, কেন, বেশ লিখেছে ত ?

মুখ টিপে একটু হেসে মনোরঞ্জন বললে, আর বেশ লিখেছে কি না তা তুমি কি করে বুঝবে—'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' !

কমল এ কথার ভালো রকম জবাবদিহি করতে পারলে না, শুধু ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

এই তুচ্ছ ঘটনাটি হ'লো সূত্রপাত। এর পর থেকে হঠাৎ মনোরঞ্জনের সঙ্গে কমলের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল এবং দেখতে দেখতে দু'জন দু'জনের অন্তরঙ্গ হোয়ে উঠলো। তারা উভয়েই বন্দী রাজ-দ্রোহের অপরাধে। একই ঘরে একসঙ্গে তারা সাত বছর আছে। এত বড় বড়যন্ত্র মামলা ভারতবর্ষে আর কখনো হয়নি। তাই কে প্রকৃত অপরাধী, কে নয়, সে সব এখনো বিচারাধীন। ভারতবর্ষের কত বন্দিশালায় যে তারা এ পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছে তার ঠিক নেই। এই স্নেহ মমতাহীন পাষাণপুরীর মধ্যে তারা দুজনে যেন আবার দুজনকে নতুন করে পেলে। এত দিন যে ব্যবধান ও যে শ্রদ্ধা তাদের মধ্যে প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছিল, নিমেষে তা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। তাই কমল যত জিজ্ঞেস করে, মনোরঞ্জন তত দ্বিগুণ উৎসাহে তার জবাব দেয়। বিয়ে হওয়ার দিন থেকে তার বিদায়ের দিন পর্য্যন্ত কোনো ঘটনা, কোনো খুঁটিনাটি বাদ দেয় না। কমলের শুনতে খুব ভালো লাগে—মন্ত্রমুগ্ধের মত সে একটি রমণীর প্রণয়লীলার কাহিনী তার স্বামীর মুখ থেকে শোনে। ফুলশয্যার রাত্রে কি কথা বলেছিল, অভিমানভরে এক দিন সারা রাত বাসন্তি মনোরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলেনি, ফলে কি ভাবে মানভঞ্জন হলো এবং পুলিশে যে দিন বাড়ী ঘেরাও করে তাকে ধরে নিয়ে এলো, সে দিন সেই বিদায়ের মুহূর্ত্তে অশ্রু-ছলছল চোখে বাসন্তি কি বলেছিল—সমস্ত মনোরঞ্জন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কমলকে গল্প করে। বলবার সময় ব্যথা ও আনন্দ-মিশ্রিত এক অদ্ভুত দীপ্তিতে মনোরঞ্জনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই দেখে কমলের মনটা কেমন হয়ে যায়। সে হঠাৎ তাকে চুপ করতে বলে। মনোরঞ্জনও চুপ করে, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে কমল নিজে থেকেই বাসন্তির কথা পাড়ে।

এই ভাবে চার বছর ধরে চলে আসছে একই রমণীকে নিয়ে আলোচনা। দু'মাস অন্তর হয়ত একখানা চিঠি আসে মনোরঞ্জনের নামে, তাও অর্দ্ধেক কথা পুলিশ বাদ দিয়ে দেয়। কমলের একমাত্র বৃদ্ধ মা ছিলেন বাড়ীতে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে চিঠিপত্রের কোন বালাই নেই। খুড়োর কাছ থেকে প্রথম প্রথম বছরে দু'-তিনখান, কিন্তু এখন বছর দুই হল তাও বন্ধ।

মনোরঞ্জনের সংসারেও কেউ নেই এক স্ত্রী ছাড়া। তাই যখন এই লাহোরের জেলখানার মধ্যে বসে কলকাতা থেকে মনোরঞ্জন চিঠি পেতো তখন কমলের মনে হতো, হায়, তার কি পৃথিবীতে খোঁজ নেবার কেউ নেই ?

কমল জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মনোরঞ্জন, তোর ক'বছর হলো বিয়ে হয়েছে ?

মনোরঞ্জন হিসেব করে বলে, এই আট বছর এক মাস।

তার মানে মোটে এক বছর তোরা স্বামি-স্ত্রীতে ঘর করেছিস ?

মনোরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললে, এক বছর ? তাহলেও বাঁচতুম—মাত্র দু'মাস—বাকী দশ মাস ত নতুনবৌ তার বাপের বাড়ীতে ছিল।

কমল একটু টিপ্পনী কেটে বললে, বাবা, দুমাসেই এই রকম প্রেম-পত্র! দু'বছর হলে না জানি কি করতিস তোরা ?

মনোরঞ্জন পুলকিত হয়ে ওঠে। সে বলে, এ রকম মেয়ে তুই দেখিস্‌নি কমল কোন দিন। রূপের কথা বলছি না—গুণ বলতে যা বোঝায়—প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া, সমস্তগুলো এত প্রবল তার মধ্যে যে কি বলবো তোকে। আবার একটু থেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে, জানিস কমল, কাঁদলে তাকে এত ভালো দেখায় যে বললে বিশ্বাস করবি না। ফুলে ফুলে সে কাঁদে—তার চোখ কাঁদে, মুখ কাঁদে, সর্ব্বাঙ্গ কাঁদে! বেদনায় তার সারাদেহ যেন শ্রাবণের আকাশের মত ভেঙ্গে পড়ে। আবার যখন হাসে, কি বলবো মাইরি—তাকে দেখলেই শরতের প্রকৃতির কথা মনে পড়ে। তার দেহের কূলে কূলে যেন শুধু আনন্দ, শুধু সৌন্দর্য্যের প্লাবন। এমন ভাবোদ্বেলতা আমি আর দেখিনি।

চুপ কর, নিজের স্ত্রীকে সকলেরই ওই রকম মনে হয়—পৃথিবীতে এইটেই আশ্চর্য্য! এই বলে কমল তাকে সহসা থামিয়ে দেয়। আসল কথা, সে আর যেন শুনতে পারছিল না।

মনোরঞ্জন বললে, আচ্ছা, বিশ্বাস না হয়, তুই নিজের চোখে দেখ্‌বি যে দিন, আমার কথা মিলিয়ে নিস্‌।

নিজের চোখে দেখবো! কমলের বুকের মধ্যেটা ধড়াস্‌ ক'রে ওঠে। তার সমস্ত অন্তর সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলেও কিন্তু মুখে সে সে-কথা স্বীকার করলে না, বললে, হ্যাঁ, পরস্ত্রীকে আমি দেখতে যাই আর কি—আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

মনোরঞ্জন বললে, আচ্ছা, মেয়েদের নাম শুনলে তুই লজ্জায় লাল হয়ে উঠিস্‌ কেনো বল্‌ তো ?

কমল ঈষৎ হেসে জবাব দিলে, মেয়েদের সংস্পর্শে কোনদিন আসিনি বলে—এতো অতি সহজ কথা।

যাক্‌, কারাবন্দীদের কথা এইখানে। এইবার বাসন্তির অবস্থা কি রকম দেখা যাক্‌।

স্বামী যার রাজবড়যন্ত্র মামলায় ধৃত এবং বিচারাধীন হ'য়ে সাত বছর কারাগারে বন্দী, তার মনের অবস্থা না বললেও যারা রক্তমাংসের মানুষ, তারা অনুমান করতে পারে।

ছ'মাস সাত মাস অন্তর স্বামীর একখানা ক'রে চিঠি আসে বাসন্তির কাছে—তাও কত ছাপ, কত কাটাকুটি হ'য়ে। কিন্তু তবুও প্রতিদিন সকালে উঠে বাসন্তি মনে ভাবে, আজ হয়ত একখানা চিঠি আসতে পারে। ডাক-হরকরা আসবার সময় হোলেই সে দরজার দিকে চেয়ে থাকে। তারা যে বাড়ীতে থাকে তাতে চোদ্দ ঘর ভাড়াটে। কলকাতার অন্ধ এক গলির মধ্যে পুরনো একখানি তিনতলা বাড়ী—ওপর নীচের মোট ষোলখানা ঘর। তারই নীচের তলার সিঁড়ির পাশে যে দু'খানি ছোট ঘর—তাতে থাকে বাসন্তি, তার মা, আর এক মাসতুতো ভাই। এই মাসতুতো ভাইটির রোজগারের ওপরই তাদের ভরসা। সে হাওড়ার চটকলে কাজ করে। সকাল ছটায় উঠে বেরিয়ে যায়, দুপুরে একবার বাড়ীতে খেতে আসে—আবার 'ওভার-টাইম' খেটে বাড়ী ফেরে একেবারে রাত্তির দশটায়।

বাসন্তি এই ভাইটিকে প্রাণ দিয়ে সেবা করে। তার নাম অমর। তার বয়েস এই একুশ—বাসন্তীর চেয়ে দুবছরের ছোট। সমবয়সী বন্ধুর মত দুটিতে হাসাহাসি করে, ঠাট্টা-তামাসা করে। কোনদিন হয়ত তরকারীতে নূণ কম হ'লে অমর খেতে খেতে বলে, হ্যাঁ রে দিদি, আজ বুঝি জামাই বাবুর জন্যে মন কেমন করছিল ?

ভাতের এঁটো-হাতাটা তার মাথায় ঠুকে দিয়ে বলে, দূর হ মুখপোড়া, আমি না তোর দিদি হই ?

অমর বলে, দিদি হোলে বুঝি আর জামাই বাবুর জন্যে মন কেমন করতে নেই।

ওমা, দেখো না, অমর কি কোরছে—ব'লে বাসন্তি চেঁচিয়ে মাকে ডাকে।

মালা জপতে জপতে তার মা সেখানে এসে বলেন, ছাখ বাসি, চেঁচাচ্ছিস্ কেন অমন ষাঁড়ের মতন—দিন দিন তুই যেন কচি খুকী হচ্ছিস্।

বাসন্তি বলে, হ্যাঁ, তুমি কেবল আমাকেই কচি খুকী হতে দেখো—আর ও যে আমায় কেবল কেবল কি বলছে তা একবারও ত শোনো না ? এই বোলে চাপা লজ্জা ও গোপন আনন্দে এক রকম অদ্ভুত সুর সে কণ্ঠে আনে।

মালাটা কপালে ঠেকিয়ে বৃদ্ধা বলেন, আমি জপ করতে করতে সব শুনেছি। তার পর সেই প্রসঙ্গটা সেইখানে চাপা দিয়ে সহাস্য বদনে বলেন, হ্যাঁ রে অমর, তোর জামাই বাবুকে মনে আছে ?

অমরের মনে একটা অস্পষ্ট ছবি ছিল। মাত্র বিয়ের দিন রাত্রে বরবেশে সে দেখেছিল মনোরঞ্জনকে, তাই ভাতের গ্রাসটা মুখে গুঁজতে গুঁজতে সে বললে, কিন্তু মাসিমা, তুমি কি জানো যে জেলে গেলে লোকের চেহারা একেবারে বদলে যায়—কেউ বা ইয়া দাড়ি-গোঁফ নিয়ে আসে—কেউ বা রোগা লিকলিকে কাঠির মত হয়ে যায়—আবার কেউ বা দারুণ মুটিয়ে যায়।

মাসিমা একবার মেয়ের মুখের দিকে, একবার বোনপোর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তা জানি। বাড়ীর মতন কে সেখানে যত্ন কোরবে ?

অমর একবার চট ক'রে বাসন্তির মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে ভাল মানুষের মত ডাঁটা চিবতে চিবতে বললে, দিদি, খুব সাবধান কিন্তু, দেখিস নিজের জিনিষ চিনে নিতে পারবি তো ?

দূর হ—বলে বাসন্তি লজ্জায় রাঙা হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ছিঃ, ওকথা ব'লে কি ঠাট্টা করতে আছে অমর ? মেয়েমানুষের স্বামী যে দেবতা, আর যে ভুল করে করুক, স্ত্রীর কি কখনো স্বামীকে চিনতে বিলম্ব হয় বাবা ? এই বলে মাসিমা গৃহান্তরে গেলেন।

অমর খেতে খেতে ভাবতে লাগল, বাস্তবিক তাঁর জামাই বাবুর চেহারার কোন বিশেষত্ব নেই। যত দূর তার মনে পড়ে, অতি সাধারণ লোকের মত তাকে দেখতে। পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও যাদের কষ্ট ক'রে মনে করতে হয়—মনোরঞ্জন তাদের দলে। তবে এটা তার স্পষ্ট মনে আছে—তখন রোগা একহারা চেহারা ছিল তার। যাই হোক্, এমনি ক'রে তাদের দিন কাটে।

বাসন্তির হাতে মাসের প্রথমেই মাইনে পেয়ে টাকা এনে দেয় অমর। সে মাকে যা দেবার দেয় এবং নিজে হাতে সংসার খরচ চালায়। বাসন্তিকে সবাই ভালবাসে, সে যাকে যা অনুরোধ করে কেউ তা সাধারণতঃ এড়াতে পারে না। দোতলার বামুনদের ছেলে রোজ তার বাজার ক'রে দেয়—দোকান থেকে জিনিষপত্তর এনে দেয় তিনতলার হেবো। এর জন্যে অবশ্য বাসন্তিকে কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা সঙ্কোচ বোধ করতে হয় না। কেন না, এই দুটি পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী। তাদের বিপদে আপদে সে প্রাণ দিয়ে ছাখে; তাছাড়া কারুর জামা তৈরী ক'রে দেয়, কারুর পশম দিয়ে মোজা বুনে দেয়, কারুর বা অসুখ হ'লে সারারাত্ত জেগে সেবা করে। সমস্ত দিন সে ওপর-নীচে ক'রে বেড়ায়। সমস্ত ঘরেই তার অবাধ-গতি। সবাই তার দ্বারা উপকৃত তাই সাগ্রহে পথ চেয়ে থাকে। তাছাড়া ভারী আমুদে বাসন্তি। হেসে, গল্প ক'রে, তাস খেলে সকলকে মাতিয়ে রাখে। তার সর্ব্বাঙ্গে যেন আনন্দের হিল্লোল। শিরায় উপশিরায় প্রাণের চঞ্চলতা। তার মা তাকে কিছু বলেন না। ভাবেন, মেয়ে যদি এই সব নিয়ে ভুলে থাকে ত থাক।

এমনি ক'রে বেশ দিন কাটছিল। এমন সময় এক বিপত্তি দেখা দিল নতুন ভাড়াটে গিন্নীকে নিয়ে। তিনি শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা, বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি—কলে গেলে আর রক্ষে নেই। অন্য সকলের কাজ বন্ধ। প্রায় একঘণ্টা ধরে একই বাসন বার বার মাজেন, এবং বার বার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ধোন—মনে হয়, তাঁর দেহের অশুচিতা কিছুতেই যেন দূর হয় না।

সমস্ত বাড়ীটায় ওই একটা মাত্র কল। তাই অন্যান্য বৌ-ঝিরা জল নিতে এসে অত্যন্ত বিপদে পড়ে—ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যতই তারা সেই শুচিবাই গিন্নীকে কল থেকে সরে আসতে অনুরোধ জানায় ততই তিনি বলেন, 'এই যাই মা'।

এমনি ক'রে যাই যাই করতে করতেও এক ঘণ্টা কেটে যায়। রাগ ক'রে কেউ বা চলে যায়, কেউ বা বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাসন্তি বহু দিন ধ'রে এই রকম সহ্য ক'রে শেষে এক দিন বললে, দ্যাখো দিদিমা, ও মনের ময়লা—যতই তুমি গা ধোও আর বাসন ধোও, কিছুতেই পরিষ্কার হবে না।

কলতলায় একটা হাসির রোল উঠলো। বাসন্তির গলা সকলকে ছাড়িয়ে গেল। ফিস ফিস ক'রে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দু'-চার জন বৌ বললে, বেশ বলেছিস ভাই, তোর কাছেই মাগি জব্দ, আমাদের কথা যেন কানেই তোলে না। মোট কথা, বাসন্তি এই বলতে সবাই খুব উল্লসিত হয়ে উঠলো, এবং মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো। কেউ কেউ আবার ইসারা করলে বাসন্তিকে, ওই রকম চোখা চোখা কথা আরও গোটাকতক শোনাবার জন্য। কিন্তু আর শোনাতে হলো না, তাদের হাসি থামবার আগেই দাঁতের গোড়া কাঠি দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে দিদিমা বললেন, হাঁলা বাসি, এত হাসি তোর আসে কোথা থেকে লা ? ভাতার যার জেলখানায় পচছে তার মাগের কি স্ফূর্ত্তি! ঘেন্নায় মরি, কালে কালে আরো কত দেখতে হবে।

যুবতী মেয়েদের মধ্যে আবার একটা হাসির ঝড় বয়ে গেল।

আ-মর ছুঁড়িরা, একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়লি যে। বলি এতে হাসির কথা কি হলো লা ? দিদিমা মুখটা বিকৃত করে এই কথা বললেন।

বাসন্তি বললে, হাসবো না ত কি কাঁদবো? আমার ভাতার তো আর চুরি করে জেলে যায়নি যে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করবে—তিনি গেছেন স্বদেশী ক'রে, দেশের চার দিকে কত ধন্যি ধন্যি পড়েছে তার জন্তে।

আ-মর—তাকে ধন্যি ধন্যি করেছে বলে তুই যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবি না কি! ছুঁড়ি দিনরাত যেন রসে ফেটে পড়ছেন—ওলো, জানি জানি, সব জানি—মনে করিসনি যে ডুবে ডুবে জল খাই শিবের বাবাও টের পায় না! এই বলে তিনি কণ্ঠে এমন একটা স্বর টেনে আনলেন যার অর্থ বুঝতে কারুর বাকি রহিল না।

কি জান গো দিদি, তোমায় আজ বলতেই হবে পাঁচ জনের সামনে। এই কথা বলতে বলতে বাসন্তির মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

আ-মর মাগী, সকালবেলা কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এলো দেখ! এই বলে এক বালতী জল মাথায় ঢেলে বুড়ী আবার বললে, পাঁচ জনকে বলতে হবে কেন, তাদের কি চোখ নেই, তারা দেখতে পাচ্ছে না? মাগো, দিন নেই, রাত নেই, দুপুর নেই, ওপর-নীচে ছুঁড়ি যেন চসে ফেলছে। বলি নিজের মেয়েকে যদি সামলাতে না পারে, ত পাঁচ জনের বাড়ীতে থেকে সকলকে না মজিয়ে দেশে চলে যাও না বাছা—তোমার আর কি, পাঁচটা পুরুষ নিয়ে যারা ঘর করে তাদেরি জ্বালা!

এই বলতে বলতে বুড়ি কলতলা থেকে এক মোট ভিজে কাপড় হাতে তুলে নিয়ে ওপরে চলে গেল।

সামনে বজ্রপাত হলেও বোধ করি সকলে এতটা আশ্চর্য্য হতো না। বাসন্তির চরিত্র নিষ্কলঙ্ক বলে সবাই জানতো, কোনদিন কারুর মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু মেয়েদের চরিত্র এমনি জিনিষ যে বুড়ীর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা জানা সত্ত্বেও তবু একটা সংশয় যেন সবার মনে কোথায় খচখচ করতে লাগল। তাই সে কথা শুনে সবাই শুধু নীরবে একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

খালি বাসন্তির মা রাগে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েকে বললেন, দেখ বাসি, আজ থেকে যদি আর কোনদিন তুই ওপরে যাবি ত আমার মরা-মুখ দেখবি। এই বলে তিনি যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন। অন্যান্য মেয়েরাও যে যার কাজ সেরে সরে গেল। শুধু পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে বাসন্তি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে তার মা ঘরের মধ্যে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, ওরে বাসি, ডালপোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে, শিগগির একঘটি জল নিয়ে আয়।

বাসন্তির যেন চমক ভাঙলো। সে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে ঘরে চলে গেল।

সেই দিন থেকে কেন জানি না, সমস্ত পৃথিবীর চেহারা যেন বদলে গেল বাসন্তির কাছে। সেই চঞ্চলা, কৌতুকপ্রিয়া মেয়েটি এমন স্তব্ধ হয়ে গেল যে তাকে দেখলে আর চেনা যায় না। সে এত বড় মিথ্যার প্রতিবাদ মুখে কিছু করলে না শুধু মনে মনে অন্তর্য্যামীকে জানালে—যিনি সকলের অলক্ষ্যে থেকেও সব কিছু দেখতে পান।

বাসন্তি নিজের ঘর ছেড়ে আর কোথাও যেত না। তাকে যারা সত্যি সত্যি ভালোবাসতো এমন কয়েকটি বৌ এসে দুপুরবেলা তার সঙ্গে গল্প ক'রে যেতো। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বাসন্তি কিন্তু আগের মত আর আনন্দ পেতো না। কি জানি, কেন তার মনে হতো হয়ত এরাও তাকে মনে মনে সন্দেহ করে। এমনি হয় নিষ্কলঙ্ক যার চরিত্র, প্রাণপণ চেষ্টায় কঠোর সংযমের দ্বারা যে তার পবিত্রতা রক্ষা করে এসেছে—ষোল বছর থেকে তেইশ বছর পর্য্যন্ত, হঠাৎ যদি তার নামে মিথ্যে কলঙ্ক কেউ রটায় ত তার মনে এমন ব্যথা লাগে যে, সে আর কাউকে সরল ভাবে বিশ্বাস করতে পারে না।

যাই হোক, এমনি ভাবে তার দিন কাটতে লাগল।

এমন সময় এক দিন তিনতলার বামুনদের মেয়ের হঠাৎ বিয়ের ঠিক হলো। তারা নিমন্ত্রণ করতে এলো বাসন্তিকে। মেয়েটির সঙ্গে তার ছিল খুব বন্ধুত্ব, তাই চুপি চুপি সে তাদের বললে, তার মাকে ভাল ক'রে অনুরোধ জানাতে।

বাসন্তির মা মেয়েকে দিব্যি দিয়েছিলেন, কিন্তু এরা এমনি পীড়াপীড়ি করলে যে তিনি তা ভুলে গিয়ে বললেন, আচ্ছা, যাবে বাসি, তুমি কি আমার পর। তবে কি জানো, পোড়া লোকজন যে খারাপ ভাই, তা না হলে আমার মেয়েকে আর আমি চিনি না?

মায়ের মুখ থেকে এ কথা শুনে বাসন্তির বুক থেকে যেন পাষাণ-ভার নেমে গেল। সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

বহু দিন পরে আবার মেয়ের সে মূর্ত্তি দেখে মায়েরও মনটা হাল্কা হলো বৈকি!

পরদিন বিয়ে। তাড়াতাড়ি ঘরের কাজকর্ম্ম শেষ করে বাসন্তি সাবান মেখে গা-ধুয়ে এলো। তখনও সন্ধ্যার একটু দেরী ছিল, কিন্তু সে তখনি ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে, তার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করতে লাগল। বাসন্তি একে সুন্দরী তায় তেইশ বৎসরের রুদ্ধযৌবন তার দেহের তটপ্রান্তে যেন উদ্বেলিত ভাদ্রমাসের যে নদী কূল ভাঙ্গে না অথচ জল তার কূলে বাধা মানে না—অনেকটা সেই রকম। প্রথম মুখে একটু পাতলা করে পাউডার ঘসলে তার পর বাঁকা ধনুকের মত দু'টি ভ্রূর মধ্যে বাসন্তি সিঁদুরের টিপ পরলে। আগেই সে ধূপছায়ার রঙের সাড়ীটা পরেছিল। তাই তোরঙ্গ থেকে বহুকালের পুরানো একটা 'এসেন্স' বার ক'রে গায়ে ঢেলে আবার সেটা চাবীর মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখলে।

এমন সময় তার মা এসে ঘরে ঢুকলেন। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, দিন দিন তুই যেন কচি খুকী হচ্ছিস না কি। বলি, লোকের দোষ কি—এরকম ক'রে সাজগোজ করলে মানুষে যদি কিছু বলে ত কার দোষ দেব বাছা? এই বলে একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, ও কাপড় খুলে ফেলে অন্য একটা রঙীন কিছু পর।

বাস্তবিক সেই কাপড়টা পরলে বাসন্তির রূপ যেন জ্বলে ওঠে।

লজ্জায় এবং ঘৃণায় বাসন্তির মুখটা নিমেষে যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বললে, আমি কাপড় খুলতেও চাই না, আর নেমন্তন্ন যেতেও চাই না। এতই যদি অবিশ্বাস তোমাদের, তবে কেন আমায় যাবার কথা বললে। একটা ভালো শাড়ী পর্য্যন্ত পরবার উপায় নেই, কেন আমি তোমাদের কি করেছি? এই বলে সে ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মা বললেন, বুড়ো মাগির কান্না দেখলে গা জ্বলে যায়! আমরা আবার করলুম কি? মেয়েমানুষের স্বামী ঘরে না থাকলে যে সাজ-গোজ করা শোভা পায় না—একথাও কি বুড়ো মেয়েকে শিখিয়ে দিতে

হবে ? এই বলে একটু থেমে তিনি আবার শুরু করলেন, লোকেরা যে বলে, অন্যায় ত বলে না—'হক' কথাই বলে—আমি কোন্ মুখে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবো !

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত বাসন্তি এইবার গর্জে উঠলো, বললে, তুমি মা হয়ে এত বড় কথা বলছো ?

কেন বলবো না—যার স্বামী কোথায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই, তার এত সাজ-সজ্জা কিসের জন্তে ?

ডুকরে কেঁদে উঠে বাসন্তি বললে, এক জন সধবা মেয়ের পক্ষে এটা কি এতই অন্যায় মা ?

দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে তিনি বললেন, শুধু অন্যায় নয়—পাপ ! মেয়েমানুষের রূপই বা কি আর সাজসজ্জাই বা কি—সবই ত স্বামীর জন্তে ! যার স্বামীর এই অবস্থা সে লোকসমাজে মুখ দেখায় কি করে ! আমরা হলে ঘেন্নায় সাতজন্মে ঘরের বাইরে পা দিতুম না। এই বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত মায়ের সেই কথাগুলো বাসন্তির সকল রিপুকে যেন একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিলে। সে একটা বালিস বুকে চেপে ধরে বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। মায়ের কাছ থেকে এই আঘাত সত্যিই মর্ম্মান্তিক। সংসারে একমাত্র এই মায়ের মুখ চেয়েই ত সে বেঁচে আছে। সেই মা যদি এ কথা বলেন ত সে দাঁড়াবে কোথায় ? আগে মাত্র দু'মাস তাদের দেখাশুনা হয়েছিল। সে সময় সে জানতো না যে তার স্বামী গোপনে বোমা তৈরী করে। তাহলে হয়ত আরো ভালো করে সে সেই দু'মাস স্বামীকে সেবা করতো, তার সঙ্গসুখলাভ করতো। বাসন্তি একটু লাজুক স্বভাবের —স্বামীর কাছে সে লজ্জা ধীরে ধীরে খসে পড়বে—স্বামী তাকে নিজে থেকে চিনে জেনে আবিষ্কার করে নেবে, এক দিন যেমন করে ফুলকে চিনে নেয় মৌমাছি। এই ছিল তার গোপন কিন্তু বিধাতা যে এমন করে তার সঙ্গে 'বাদ' সাধবেন তা সে কি করে জানবে। কান্নায় সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। স্বামীকে মনে মনে চিন্তা করতে গিয়ে দেখে সব অন্ধকার। ভয়ে তার বুক আরো কাঁপে। সে শুনেছিল তার না কি ফাঁসি হবে। আজও বিচার হয়নি—অবশ্য নির্দ্দোষ প্রমাণ হলে সে মুক্তিও পাবে। কিন্তু সে কবে—কত দিনে ? বাসন্তি যে আর অপেক্ষা করতে পারে না। এই গঞ্জনা ভর্ৎসনা যে তার আর সহ্য হয় না। ভগবানের কাছে সে প্রতিদিন তার স্বামীর মুক্তি প্রার্থনা করে।

কিছুক্ষণ পরে আবার তার মা এসে তাকে নেমন্তন্ন খাবার জন্তে অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন, কিন্তু সে আর কিছুতেই রাজী হলো না। বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজে তেমনি ভাবে পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

বাসন্তির মা অগত্যা জপের মালাটা হাতে নিয়ে শুয়ে শুয়ে জপ করতে লাগলেন। ঘরে টিপ-টিপ করে একটা রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। হাওয়ায় এক সময় হঠাৎ ঘরের খোলা দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ওপর থেকে বিয়ে-বাড়ীর অস্পষ্ট কলরব যেন ঘরের ভিতর ভেসে আসছিল। তাই শুনতে শুনতে কখন বাসন্তি ও তার মা—দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ খট্‌খট্ করে তাদের দরজায় কড়া-নাড়ার একটা শব্দ হলো। চমকে উঠে বাসন্তির ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে বিছানায় বসলো, তার পর তাড়াতাড়ি নেমে দরজাটা খুলে দিতে গেল। অমর এসে হয়ত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, সে মনে ভাবলে। কিন্তু দরজা খুলেই সে দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে একটি অপরিচিত পুরুষ। তার মাথায় বড় বড় চুল এবং দাড়ি ও গোঁফে মুখের অনেকটা চাপা।

এই পুরুষটি আর কেউ নয়, কমল। ষড়যন্ত্র-মামলায় তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হওয়ায় সে মুক্তিলাভ করেছে, তাই মনোরঞ্জনের নির্দ্দেশমত সে তার সংবাদ বহন করে এনেছে। মনোরঞ্জনের বিচার কবে শেষ হবে তার ঠিক নেই। কমল লাহোর থেকে সেই দিন কলকাতায় এসে পৌঁছেচে এবং রাত্রের মেলে সে রওনা হয়ে দেশে যাবে।

বাসন্তিকে চোখে দেখবার ইচ্ছা যে কমলের মনের কোণে একেবারে ছিল না, তা নয়; কিন্তু সত্যি সত্যি চোখের সামনে ওই রকম সুসজ্জিত অবস্থায় তাকে এসে দাঁড়াতে দেখে কমল বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

বাসন্তিও কাঁচা ঘুমভাঙা দুটি ডাগর চোখ বিস্ফারিত করে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখনো তার চোখের পাতা ভিজে গোলাপের পাপড়ির ওপর শিশির-বিন্দুর মত তার গণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু অশ্রু রয়েছে সঞ্চিত। কমল তা দেখতে পেয়েছিল কি না কে জানে। মিনিট কয়েক উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে থাকবার পর কমল বললে, আমি লাহোর জেল থেকে আসছি।

যেমন এই কথা উচ্চারণ করা, অমনি বাসন্তি কমলের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, তুমি ? ওগো, তুমি এলে এত দিন পরে এ কি সত্যি ?

কমলের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আজন্ম-ব্রহ্মচারী বলিষ্ঠ পুরুষ সে। তাই তেইশ বছরের এক যুবতী এবং রূপবতী রমণীকে এই ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় বুকের মধ্যে পেয়ে তার যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাসন্তি তার বুকের মধ্যে মুখটা ঘসতে ঘসতে বললে, ওগো, তুমি এমন করে চুপ করে রইলে কেন—তুমি কি আমায় চিনতে পারছো না ? বলো—বলো, আমার আর দেরী সয় না। কি লাঞ্ছনা কি গঞ্জনা যে তোমার অভাবে সহ্য করেছি তা কি বলবো। এই বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

কমল তার মাথায় হাত রেখে বললে, ছিঃ, কাঁদতে নেই, চুপ করো।

তার কণ্ঠস্বর শুনে বাসন্তি যেন চমকে উঠলো। সে তখন বুক থেকে মথাটা তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কমলের গালের ওপর একটা তিল ছিল। সেইটার ওপর নজর পড়তেই বাসন্তির মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে গেল। বাসন্তি তখন মনে করতে চেষ্টা করলে—মনোরঞ্জনের গালে তিল ছিল কি না। কিন্তু কিছুতেই তা স্মরণে আনতে পারলে না। তার পর মনে হলো, ছিল না, হয়ত হয়েছে। হ'তে কতক্ষণ লাগে—দীর্ঘ দিন ত সে তাকে দেখেনি।

এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলকে কমলের সারা দেহ-মন তখন কাঁপছিল। সে মৃদু কণ্ঠে ও রুদ্ধ দুরু দুরু বক্ষে ডাকলে, বাসি।

বাসন্তির চোখে এইবারে জল এসে পড়লো এবং মুখে হাসি

ফুটে উঠলো। এই নামে তাকে একমাত্র তার স্বামীই ডাকতো। এ কথা সে ছাড়া আর কেউ জানেও না। তাই আবার কমলের বুকের মধ্যে মাথাটা রেখে সে বললে, এই ক'বছরে তোমার চেহারা একেবারে বদলে গেছে।

কমলের মুখে এইবারে হাসি ফুটে উঠলো। সে বললে, কেন, তুমি কি আমায় চিনতে পারছো না রাণি ?

ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই—তোমাকে আমি চিনতে পারবো না —তা কি সম্ভব ? এই বলে ছোট মেয়ের মত বাসন্তি দু'হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরলে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে বাসন্তির মা চমকে উঠলেন। তার পর বললেন, হ্যাঁ রে বাসি, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস ?

আনন্দে উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়ে বাসন্তি মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তার দুই গালে চুমু খেয়ে বললে, মা, তোমার জামাই এসেছে যে—ওই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জামাই! ওমা, আমায় আগে ডাকবি ত! এই বলে তাড়াতাড়ি তিনি গায়ে-মাথায় ভাল করে কাপড়টা টেনে দিলেন। তার পর, 'কৈ কৈ রে আমার হারানিধি' বলতে বলতে একবারে কেঁদে ফেললেন।

বাসন্তি বললে, ওগো, তুমি ও-রকম করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ওখানে—এগিয়ে এসো।

কমল চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল। এই কথা শুনে সহসা তার উপস্থিত-বুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠলো। মনের সমস্ত জড়তা কাটিয়ে সে তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে বাসন্তির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

থাক-থাক—হয়েছে, হয়েছে! এই বলে তিনি শুরু করলেন, বাবা মনোরঞ্জন, ভালো আছো ত ? যেন তাঁর কণ্ঠ ভেঙ্গে পড়ছিল।

একটা ঢোক গিলে কমল বললে, এই এক রকম আছি মা! আপনার শরীরটা এখন কেমন ?

তিনি বললেন, আর আমার শরীর নিয়ে কি হবে বাবা? তোমরা বেঁচে-বর্ত্তে থাকো তা হলেই আমার হ'লো। এই বলে একটু থেমে তিনি বললেন, চোখটা বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে বাবা—আজকাল সব যেন কেমন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখি!

তার পর কত কথা! তিনি যত জিজ্ঞাসা করেন কমল তত উত্তর দেয় একটা একটা করে। মনোরঞ্জনের কাছ থেকে তাঁদের পরিবারের সমস্ত ইতিহাস তার শোনা ছিল বহু বার, তাই প্রায় সব প্রশ্নের জবাব কমল দিতে লাগল ঠিক ঠিক। নেহাৎ যেটা পারলে না, বললে, অনেক দিনের কথা, সব স্মরণ হচ্ছে না।

বাসন্তি হেসে উঠে বলে, ওমা, এর মধ্যে ভুলে গেলে কি গো? এই ত সে-দিনের কথা!

তার মা জামাইয়ের দিকে টেনে বললেন, আহা, তা হবে না। ওর মনের ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপটা গেল!

বাসন্তি আর মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছিল না, তাই ছুটতে ছুটতে একবার ওপরে উঠে বিয়ে দেখবার ছল করে সেই সংবাদটা দিতে গেল। তার সমবয়সীরা যখন তাকে বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন সে হুঁচু গলায় বললে, না ভাই, ও আবার রাগ করবে। অর্থাৎ তার অনুপস্থিতিটা যে সকলকে তার স্বামীর কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবে, এই কথাটা সর্ব্বসমক্ষে বলতে পেরে সে যেন বাঁচল। দু'-চার জন বন্ধুবান্ধব তখন বাসন্তির সঙ্গে নেমে এলো তার বরকে দেখবার জন্য। বাসন্তির সব চেয়ে বেশী ইচ্ছা করছিল সেই বুড়ীটার কাছে এই খবরটা যদি কেউ পৌঁছে দেয়।

ছুটতে ছুটতে আবার বাসন্তি নেমে এলো ওপর থেকে এবং সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে স্বামীর জন্য তাড়াতাড়ি বিছানা ক'রে দিয়ে আবার ওপরে খেতে গেল।

নিমন্ত্রণ খেয়ে সে যখন নামলো তখন বারোটা বেজে গেছে। বাসন্তি মনে করলে, বোধ হয় পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তার স্বামী এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে! তাই আলো নিবিয়ে দরজায় খিল দিয়ে সে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, ঘুমুলে না কি ?

কমল ঘুমোয়নি। তার বুকের মধ্যে তখন কালবৈশাখী যেন একসঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে। তাই কি বলবে সে খুঁজে পেলে না। অন্ধকারে চুপ ক'রে রইল।

বাসন্তি খাটের ওপর উঠতেই খাটটা যেই নড়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কমলের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। অন্ধকারের মধ্যে সে আর কিছু দেখতে পেলে না। বাসন্তি চুপি চুপি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

ভোরবেলা কমল ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাসন্তি চুপি চুপি বিছানায় উঠে বসে তাকে নিরীক্ষণ করছিল। সহসা ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে চোখ চাইতেই যেন কমল চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি বাসন্তির একটা হাত ধরে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখছো এমন করে।

বাসন্তি খিল খিল করে হেসে তার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে বললে, তোমায় যেন একেবারে নতুন লোক বলে আমার মনে হচ্ছে!

কমল জোর করে মুখে হাসি টেনে বললে, আমারও তাই। এই বলে কথাটাকে চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললে, গাড়ী কিন্তু ঠিক বারোটায়। আমাদের এখান থেকে এগারোটায় বেরুতেই হবে, তুমি তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাও।

বাসন্তি বললে, গোছাবো ত ছাই—আমার আছেই বা কি? তুমি ত সবই জানো। ওই একটা ট্রাঙ্ক, যা থাকবার ওতেই আছে, ওইটাই নিয়ে যাবো। এই বলে একটু থেমে সে আবার বললে, হ্যাগা, মা বলছিলেন দেশে না গিয়ে আমরা কাশীতে যাবো কেন ?

কমল বললে, দেশে কি আছে—কোন্ মুখে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবো। কাশীতে তবু আমার এক বন্ধু আছে, সে আমার জন্যে একটা চাকরী ঠিক করে রেখেছে। সেখানে গিয়ে আমরা নতুন করে এবার ঘরকন্না পাতবো।

বাসন্তি ঈষৎ হেসে বললে, সত্যি এবার তাহলে আমরা ঘরসংসার পাতবো ?

কমল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

এগারোটার সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো বাসন্তিদের বাড়ীর দরজায়—আর ভীড় ক'রে এলো ওপর-নীচের যত ভাড়াটে মেয়েছেলে সেখানে। বাসন্তি সগর্ব্বে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোটরে কমলের পাশে গিয়ে বসলো।

বাসন্তির মা দুর্গা দুর্গা বলে উঠতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সত্যং ব্রুয়াৎ

আমাদের জীবনকে কবি উপমাচ্ছলে বলেছেন, যেন পথ চলা! এ পথে পথিকের চলার যেমন বিরাম নেই, তেমনি এ পথের শেষও নেই! কালে-কালে কত পথিক এ পথে চলে গেছে, তাদের জীবনের সব কথা পথের ধূলিরেখায় মিশে আছে! পথের এই ধূলায় মিশে আছে দেশের আর মানুষের কত সুখ, কত দুঃখ, কত হাসি, কত অশ্রু, কত না বেদনার ইতিহাস!

এ পথে আমরাও চলেছি! পথে কত লোক দেখেছি চলতে-চলতে! সে সব লোকের মধ্যে কত জন আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন, কত জন দিয়েছেন অন্তরঙ্গতা! কতখানি পথ একসঙ্গে চলে কত জনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে, বিচ্ছেদ হয়েছে! আবার কাকেও হয়তো দেখেছি দূর থেকে! কাকেও বা চোখে দেখিনি, কাণে শুধু তাদের কথা শুনেছি। কি বিচিত্র সে-সবের ইতিহাস।

মধ্য-পথে গতির আবেগে এবং মনে ছিল অনেক কিছু প্রত্যাশা, তাই তখন পিছন-পানে চেয়ে দেখিনি! তখন নজর ছিল শুধু সামনের দিকে, ভবিষ্যতের পানে। পথের প্রান্ত-সীমায় এসে আজ পিছন-পানে মন বারে-বারে তাকিয়ে দেখছে! দেখছে পিছনে ধূলিরাশি জড়ো হয়ে আছে, সে ধূলির মাঝে চিক্-চিক্ করছে সোনার কত কুচি! মনে হচ্ছে, ঐ সোনার কুচি যতখানি পারি, জড়ো করে পথের পাশে রেখে যাই! সোনার দাম সকলে ঠিক কষে দেখতে পারে না! তবু মনে হয়, যাঁরা সোনা চেনেন, সোনার কুচি জড়ো করে দামী অলঙ্কার তৈরীর কৌশল জানেন, হয়তো আমার জড়ো-করা সোনার কুচিগুলি তাঁদের কারো কাজে লেগে যাবে! লাগে ভালো, না লাগে ক্ষতি নেই—আমার মনে এটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে ধূলির মধ্য থেকে কুড়িয়ে সোনার কুচিগুলিকে বাঁচাবার জন্ত খানিকটা চেষ্টা করেছি!

আমাদের সময় স্কুলে বাঙলা যে সমস্ত পাঠ্য গ্রন্থ পড়ানো হতো, সেগুলোয় শুধু পুরুতত্ত্ব আর হিতশিক্ষা, বল্মীক আর প্রবালের কথা! আমাদের মন সেগুলোর সমাস, সন্ধি-বিচ্ছেদ আর অর্থের গহনে বিড়ম্বনা ভোগ করতো—কোনো কিছুর নাগাল পেতো না। ইংলিশ টেক্সটে পড়তুম ইংরেজ ছেলেমেয়ের খেলাধূলার গল্প—হাসি-অশ্রুর কাহিনী। পড়তুম ফিলিপ হ্যাটো, কাশাবিয়াঙ্কা, লুশিগ্রে,—আর বাঙলা বইয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অধ্যবসায় এবং অপত্যস্নেহ—তাও মানুষের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব অধ্যবসায়ের কথা নয়,—বীভরের বাসা তৈয়ারীর কৌশল, মৌমাছির অধ্যবসায়, মৎস্যকুলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং শৃগালের বুদ্ধি-চাতুর্য্যের কথা। মনে হতো, রামায়ণ মহাভারতের পর মানুষ এমন কোনো কাজ করেনি, যে কথা বইয়ে লেখা চলে। আমাদের অবসর-বিনোদনের জন্ত দুখানি মাসিক-পত্র ছিল—"মুকুল" আর "সখা ও সাথী"। বাড়ীতে অভিভাবক এবং বাহিরে মাষ্টার-মশাইরা অহরহঃ উপদেশ দিতেন—ইংরিজি শেখো। ইংরিজি কথা, ইংরিজি ট্রানস্লেসন, ইংরিজি হাতের লেখা! পরস্পরে ইংরিজিতে কথা বলা চাই। গ্রামার-ইডিয়ম এ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের চাপে চেপটে পিষে কোনো মতে ইংরেজিতে দিগ্‌গজ হতে হবে—এমনি ভাবে আমাদের মনকে ইংরিজি করে তোলবার জন্ত ছিল প্রচণ্ড অধ্যবসায়। বাঙলা ভাষা ছিল একঘরে! যেন দুয়োরাণী! বাঙলা শেখবার জন্ত এতটুকু তাড়া বা উৎসাহ পেতুম না। ইংরেজি খপরের কাগজ যা দু'-একখানা মিলতো, আমাদের উপর হুকুম হতো, পড়ো; পড়ে তর্জ্জমা করো। ইংরেজি খপরের কাগজ দেখে কত 'নিউজ' তর্জ্জমা করেছি, তার সংখ্যা হবে না। তখনকার দিনে সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ—এঁদের কথাই শুধু শুনতুম স্কুলের সেই সেভেন্থ ক্লাশ থেকে। এঁরা বাঙালী হয়ে ইংরেজিতে যেমন বক্তৃতা করেন, তেমন ইংরেজি অনেক পণ্ডিত ইংরেজও বলতে পারেন না। মাষ্টার-মশাইরা হামেশা এঁদের গল্প বলতেন। এঁদের ছবি দেখতুম! আমাদের কিশোর মন বিস্ময়ে ভরে উঠতো। মনে হতো, বাক্যে-আচরণে ইংরেজ হলে তবেই বুঝি বড় হতে পারবো!

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সাহিত্য কি, তার কোনো ধারণা মনে ছিল না। বই বলতে আমরা বুঝতুম স্কুলে যে সব বই পড়া হয়; আর ঐ মোটা মোটা ডিক্সনারী এবং এনসাইক্লোপেডিয়া! এইগুলিই শুধু বই। এ-সব বই ছাড়া যে অন্ত কোনো বিষয়ের বই আছে পড়ার মতো—সে 'আইডিয়া' আমাদের মনে জাগেনি! ইংরেজি ১৮৯৪—বোধ হয় তখন স্কুলের ফোর্থ ক্লাশে পড়ি—এক দিন স্কুলে যাবা মাত্র শুনলুম, ছুটী! কেন? বঙ্কিম চাটুয্যে মারা গেছেন।

বঙ্কিম চাটুয্যে নামটি সেদিন প্রথম কাণে শুনলুম। ভাবলুম, কে এ ভদ্রলোক? নিশ্চয়—হাইকোর্টের জজ কিংবা স্কুলের সেক্রেটারী টেক্রেটারী কেউ হবেন। কিন্তু মাষ্টার-মশাই বললেন, তিনি মস্ত বড় লেখক। বঙ্গদর্শন কাগজ ছিল, তিনি ছিলেন সেই কাগজের সম্পাদক। বঙ্গদর্শন নাম শুনে মনে হলো, তাইতো, বাড়ীর আলমারির মধ্যে মোটা মোটা বাঁধানো বই দেখেছি, সোনার জলে নাম লেখা—বঙ্গদর্শন! কৌতূহল হলো, এ বঙ্গদর্শন কি, দেখতে হবে।

কিন্তু বইয়ের সে আলমারি আমাদের কাছে সেই রূপকথার গল্পের মতো নিষিদ্ধ পুরী! গল্পের রাজপুত্রকে যেমন বলা হয়েছিল, এ ঘরে ও ঘরে সব ঘরে যাবে কিন্তু খবর্দ্দার, যে ঘরে তালা দেওয়া, ও ঘরে উঁকি দিয়ো না। সেই ঘরে যাবার আগ্রহই রাজপুত্রের সব চেয়ে বেশী হয়েছিল! তেমনি আমারো মনে হলো, যেমন করে পারি একবার বঙ্গদর্শন বইখানি দেখতে হবে। বঙ্কিম চাটুয্যে এমন বই লিখে গেছেন—স্কুলের বইয়ের চেয়ে নিশ্চয় ভালো বই—নাহলে তাঁর জন্ত স্কুলের ছুটী হবে কেন!

চাবি চুরি করে আলমারি খুলে বার করলুম—বঙ্গদর্শন। তাড়াতাড়ি পাতা ওলটাতে গিয়ে চোখে পড়লো 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস। সেইখানটা চোখে পড়লো—ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনীর কথা—

ঘরে যাবো না লো সই
আমার মদনমোহন আসছে ঐ !

মদনমোহনের অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয়নি তবু খুব ভালো লেগেছিল চন্দ্রশেখরকে। এবং চন্দ্রশেখরের সৃষ্টিকর্তা বঙ্কিমচন্দ্রকে আরো ভালো লেগেছিল ঐ মীরকাশিম চরিত্রটির জন্য। স্কুলে তখন পড়ছিলুম ইতিহাসে মীরকাশিমের কথা। ইতিহাসের মীরকাশিমকে মানুষ বলে মনে হতো না। মনে হতো, ইতিহাসের পাতায় যেমন হাজার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হাজার নাম ছাপা আছে—সাল-তারিখের সঙ্গে জড়ানো। রাজা-বাদশা-সেনাপতিদের নাম—মীরকাশিমও তেমনি সেই হাজার নামের মালায় গাঁথা একটি নামমাত্র। তাঁর নবাবী মনের কোনো পরিচয় মনে জাগতো না। মনে হতো মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিমকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিয়েছিল মুর্শিদাবাদের গদি তাদের স্বার্থরক্ষার অভিপ্রায়ে। তার পর মীরকাশিমের সঙ্গে হলো কোম্পানির বিবাদ। সে বিবাদের ফলে যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে মীরকাশিমের তিরোভাব। মীরকাশিমের এমন সুন্দর ছবি,—তাঁর সাধু সঙ্কল্প, তাঁর দলনী বেগম,—মীরকাশিম বসে গান শোনেন, বাজনা শোনেন; তার উপর কোথায় বেদগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর—নবাব হয়ে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরকে তিনি এতখানি সম্মান করেন! এতেই কিশোর মন মীর-কাশিমকে কতখানি যে ভালো বেসেছিল, সে কথা আজ বলতে গেলে অনেকের মনে হবে ন্যাকামি করছি! কিন্তু ন্যাকামি নয়—বাঙলা ইতিহাসের উপর অনুরাগ এই থেকেই মনে জেগেছিল। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস আমাদের মনে জাগিয়ে তুলেছিল কল্প-লোকের পরিচয়।

জিওমেট্রী গ্রামার স্কুলের বাউণ্ডারীর বাইরে যে নতুন জগৎ, সেই জগতের পরিচয় নেবার জন্য আমাদের মনকে চন্দ্রশেখর অধীর আকুল করে তুলেছিল।

আজ সাহিত্যের যুগে গল্প-কবিতা-গানের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠছে ঐক্য-বাক্য বানান শেখার সঙ্গে-সঙ্গে। সেকালে আমাদের যুগে 'সাহিত্য' বলে কোনো-কিছুর কথা আমরা জানতুম না! ছেলেমেয়েদের জন্য তখন ঐ দুখানি মাত্র মাসিকপত্র বেরুতো—'সখী ও সাথী' এবং 'মুকুল'। সে দু'খানিতে ক'খানা করেই বা পাতা থাকতো! তবু সে পাতাগুলি আমরা বার-বার পড়তুম। পড়ে পড়ে প্রত্যেকটি প্রবন্ধ গল্প কবিতা যাঁধা আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। হাইকোর্টের জজ, বড় বড় ব্যারিষ্টার, উকিল এবং ডাক্তারের আদর্শ সামনে ধরে ঘরে-বাইরে অজস্র উপদেশ বর্ষিত হতো, ওঁদের মতো হতে হবে। বুঝতুম, ও-সব হওয়া চারটিখানি কথা নয়! তাছাড়া ওদিকে লোভও জাগতো না—হয়তো দুর্লভে লোভ করবার মত মূঢ়তা ছিল না। মনে হতো, পারি যদি কখনো চন্দ্রশেখরের মতো বই না হোক, অন্তত: ঐ মুকুলে-পড়া 'দামু-চামু' বা টমাশ সাহেবের মতো কিছু লিখতে, তাহলে তার চেয়ে বড় কামনা আর কিছু থাকবে না।

এমনি মনোভাব আমাদের সমসাময়িক অনেক ছেলের মনে জাগতো! এবং তার ফলে হঠাৎ এক দিন কবিতা লেখা সুরু করলুম। ফোর্থ ক্লাশে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সেই সঙ্গে তাঁর 'ছোট গল্প' আর 'রাজা ও রাণী' পড়বার সৌভাগ্য ঘটলো। মনে হলো, মাটীর পৃথিবী ছেড়ে বেলুনে চড়ে যেন ঊর্দ্ধ কল্পলোকে এসে গেছি! বনমালী বলে সেই যে ছেলেটি বাড়ীতে বোনেদের সঙ্গে পুতুল-খেলা করতো, তার মনে ছিল ভয়, ক্লাশের ছেলেরা এ খেলার কথা না জানতে পারে! জানলে লজ্জার সীমা থাকবে না—ছেলে হয়ে মেয়েদের মতো পুতুল নিয়ে খেলা করে! তাকে এত ভালো লেগেছিল! মনে হয়েছিল, আমাদেরো মনে ঠিক এমনি হয় তো—লেখক কি করে আমাদের মনের কথা জানলেন! এ সব গল্প আমাদের মনে যেন বাস্তু-তৃপ্তির স্পর্শ বুলিয়ে দিত। মনের মধ্যে কত বাসনা, কত কামনা কল্পনাই না জাগিয়ে তুলতো!

যখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি, তখন হিতবাদী সাপ্তাহিকের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের জেল হলো মানহানির মকর্দমায়। সে মকর্দমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত জানবার সুযোগ ছিল না—শুধু শুনেছিলুম, জাতি-বিচার বলে কি না কি কবিতা তিনি ছাপিয়েছিলেন তাঁর হিতবাদীতে; সে-কবিতার লেখকের নাম প্রকাশ না করে তিনিই তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। হিতবাদী কাগজ তখন বেশ জোরালো ভাষায় কুলির উপর, বাঙালী কেরাণীর উপর সাহেবদের যে অত্যাচার-অনাচার হতো, সে-সবের বিরুদ্ধে নানা কথা ছাপা হতো, এজন্য হিতবাদীর উপর আমাদের ছিল ভারী অনুরাগ। সেই হিতবাদীর সম্পাদক কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের জেল হতে আমি একটি কবিতা লিখেছিলুম। ক্লাশের ছেলেদের চাঁদায় সে কবিতা ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছিল। এই কবিতা দেখে আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টার ৺বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় মশায় (ইনি ছাত্রদের মস্ত বন্ধু ছিলেন। এঁর লেখা ইংলিশ ট্রানস্লেসনের বই পড়ে সেকালে কত ছেলে যে কৃতী হয়েছেন—নির্ভুল ইংরেজি বলতে এবং লিখতে সমর্থ হয়েছেন,

তার বোধ হয় সংখ্যা হবে না।) আমাকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন,—কবিতা লিখছো লেখো; কিন্তু যে-অপরাধের জন্ত কাব্যবিশারদের জেল হয়েছে সে অপরাধ তুচ্ছ করবার নয়; সে কবিতায় ছিল ভদ্র-মহিলার উপর কদর্য্য ইঙ্গিত—তার সমর্থন করা চলে না। এ অপরাধে জেল হয়েছে বলে যদি সমবেদনা জানাও, তাহলে অপরাধেরও সমর্থন করা হয়।

কবিতা ছাপিয়ে যে আত্মপ্রসাদ আর গৌরব বোধ করেছিলুম, হেড-মাষ্টার মহাশয়ের এ-কথায় সে গৌরব তখনি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বুঝেছিলুম, ফশ করে কোনো লেখা ছাপানো উচিত হবে না। হেডমাষ্টার মহাশয় আরো একটি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, অনেক মক্সো করবার পর তবে হাতের লেখা ভালো হয়; পাঁচ জনকে দেখাবার মতো হয়। কবিতা লেখা বা গল্প লেখা—এ-সবেও মক্সো দরকার। যা লিখবে, তাই ছাপাতে যেয়ো না। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে বলে গেছেন, লেখা কিছু দিন ফেলে রাখবে, তার পর পড়ে দেখলে বুঝবে, তার কোথায় দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি। যদি লেখক হবার সাধ থাকে, বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা মনে রেখো।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

লেখার দিক দিয়ে এই উপদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে পড়লুম কাব্যবিশারদের লেখা 'মিঠে-কড়া'। রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল"কে কাব্যবিশারদ তামাসা করেছেন। কড়ি ও কোমল পড়েছিলুম; খুব ভালো লেগেছিল—

রনিব্যি না পক্ষী
মাগো আমার লক্ষ্মী।
এই ছিলম খুলনায়
তাতে আর ভুল নাই"।
কলকাতা এসেছি সত্ত
বসে বসে লিখছি পত্ত।

এই কটি ছত্রকে ব্যঙ্গ করে' কাব্যবিশারদ মিঠে-কড়ায় লিখে ছিলেন—

জ্বালা মোর বাপ আজ্জা মন্দ,
মন্দ বড় বাঙ্গের বাচ
ঠেশ দিয়ে আমরুল গাছ
লেখেছেন পাঁকাটি
লেগে গেছে দাঁত-কপাটি।

রবীন্দ্রনাথের আরও একটি কবিতাকে লক্ষ্য করে কাব্যবিশারদ বশায় টিপ্পনী কেটেছিলেন—

উড়িস নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা—
তোর বক-বকম আর ফোঁস-ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা।
তাও ছাপালি গ্রন্থ হলো
নগদ মূল্য এক টাকা।

মিঠে-কড়া খুব চটি বই; কিন্তু এই সব টিপ্পনী অত্যন্ত কদর্য্য বোধ হয়েছিল। কাব্যবিশারদের উপর যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল, তা এই মিঠে-কড়া পড়ে চুর হয়ে গেল। শুনেছিলুম, তিনি 'লুক্রেশিয়া' কাব্য লিখে কোন্ বোর্ডে পাঠিয়েছিলেন; বোর্ড সেই কাব্যের জন্ত তাঁকে কাব্য-বিশারদ উপাধিতে বিভূষিত করেছিল।

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলির সরসতা এবং সারল্য—সর্ব্বোপরি ঘরোয়া ভাবধারা আমাদের কিশোর মনকে বিমুগ্ধ করেছিল। তার ফলে আমরা অন্ত কবির লেখা যে সব কবিতা পড়তুম, তাতে মন আর ভরতো না! মনে হতো, ছন্দোবদ্ধ রচনা পড়ছি। কবিতা কি, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকলেও মনে হতো সেগুলি যেন 'কবিতা' নয়! রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বামাত্র মনে হয়েছিল, মনকে তৃপ্তি দিতে পারে, এত দিনে এমন কবিতা পেলুম। তখন থেকে আমরা একটি দল রবীন্দ্রনাথের গোলাম হয়ে গেলুম। বেছে বেছে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে লাগলুম। মন নব নব জগতের পরিচয় পেয়ে বর্ত্তে গেল। মনে হতে লাগলো, দুঃখ নেই! পাঠ্যগ্রন্থের বাইরে আছে সুন্দর পৃথিবী! চমৎকার পৃথিবী! সেখানে কি অপরূপ আনন্দ!

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এমনি করে আমাদের মন যখন কল্প-লোকের পথ খুঁজছে, তখন ছেপে বেরুলো ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি খেলা' 'ছবি ও গল্প' বইগুলি। আমাদের কিশোর মনে তিনি যেন নূতন আগুন জেলে দিলেন।

এই ধরণের বই বাঙলায় যোগীন্দ্রনাথই প্রথম বার করেছিলেন। ছেলেমেয়েরা তাঁর ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবে না। এখন প্রত্যহ রাশি-রাশি বই বেরুচ্ছে ছেলে-মেয়েদের জন্ত তবু ছবি ও গল্প এবং হাসি-খেলার আদর সেযুগের ছেলেদের সভায় যতখানি ছিল, এ-যুগের ছেলেদের আসরেও সে-আদর কমেনি। [ক্রমশঃ।

হকি খেলার শেষ অধ্যায়

বোম্বায়ের আগা খাঁ ও কলিকাতার ন কাপ-প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হকি মরশুমের অবসান হইয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ব-ভারতের ক্রীড়াকেন্দ্র বোম্বাই ও কলিকাতায় এই দুই শ্রেষ্ঠ নিখিল ভারতীয় হকি-প্রতিযোগিতা প্রায় এক সময়ে আরম্ভ হওয়ায় এ বৎসর বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে স্থানীয় বাইটন কাপের মর্য্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বে ভারতীয় বিভিন্ন হকি-কেন্দ্রের নামকরা সেরা দলগুলি যোগদান করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষ উদ্দীপনা ও তীব্রতা সৃষ্টি করিত, স্থানীয় ক্রীড়ামোদিগণের ভাল খেলা দেখিবার সৌভাগ্য হইত এবং ক্রীড়ানুরাগী শিক্ষানবীশ খেলোয়াড়গণ অনুশীলনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিত। এ বৎসর বাইটন কাপে বহিরাগত দলগুলির সংখ্যা নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যুদ্ধ-নিবন্ধন ও যাতায়াতের অসুবিধায় বহু দলের যোগদান প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

এম, ডি, ডি

দিল্লী অকেশুনাল, যুক্তপ্রদেশ সম্মিলিত দল, ত্রিকমগড়ের ভগবন্ত ক্লাব, জি আই পি রেলদলের মধ্যে প্রথম নামীয় দল ব্যতীত আর কেহই শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। জি আই পি রেলদল আগা খাঁর খেলা শেষ করিয়াও না আসিতে পারার হেতু অজ্ঞাত। বোম্বাই প্রতিযোগিতার শেষ দল দুইটি কমলা স্পোর্টস্ ও ইন্দোরের কল্যাণমল মিলস্ দলে যথাক্রমে যুক্তপ্রদেশের বাছাই করা ও ত্রিকমগড়ের কয়েক জন খেলোয়াড় থাকায় কেহই সময়মত আসিতে পারে নাই।

বাঙলার হকি-কর্ত্তৃপক্ষ বহিরাগত দলগুলিকে সকল রকমে সহায়তা করেন। অহেতুক ও অনিশ্চিত ভাবে তাঁহারা ঐ দলগুলির আগমন প্রতীক্ষায় খেলাগুলি স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করেন। সে সময় এই দলগুলি অন্যত্র প্রদর্শনী-খেলায় ব্যাপৃত। এইরূপ অব্যবস্থার জন্য দায়ী কে? নিখিল ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সমিতি হিসাবে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত। সকল রকম সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া উভয় প্রতিযোগিতায় যাহাতে কোনরূপ সংঘর্ষ না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা ক্রীড়ামোদী ও উৎসাহী জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

আগা খাঁ হকি-প্রতিযোগিতা:

কাণপুর হইতে আগত কমলা স্পোর্টস ক্লাব ইন্দোরের কল্যাণমল মিলসকে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া এ বৎসর আগা খাঁ হকি-কাপ জয়ের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। খেলাটি বেশ আকর্ষণীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। সেমিফাইন্যালে জি আই পি রেল ও বাঙ্গালোর স্পোর্টিং দল যথাক্রমে পরাজিত হইয়াছিল। কলিকাতার লীগবিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং দল আগা খাঁ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডে বোম্বাই লীগবিজয়ী পুলিশ দলকে পরাজিত করিয়া চতুর্থ বশতঃ পরবর্ত্তী খেলায় বাঙ্গালোর স্পোর্টস্ এর নিকট পরাজিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করে।

বাইটন কাপ:

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাইটন কাপের শেষ খেলায় স্থানীয় লীগ-বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিংকে ৩—১ গোলে পরাজিত করিয়া বি এন রেলদল হকি-মহলে তাহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বিজয়ী রেলদল প্রথমে কলেজিয়ান্সকে ৭—০ গোলে অনায়াসে বিপর্য্যস্ত করে। পোর্ট কমিশনার্সের বিরুদ্ধে তাহারা ৪—১ গোলে জয়ী হয় ও বিশেষ কোন বাধা পায় নাই। তাহাদের জয়যাত্রা এ যাবৎ সুগম হইলেও দিল্লী অকেশুনাল ও ই আই রেল (জামালপুর) দলের বিরুদ্ধে তাহারা অতিকষ্টে একমাত্র গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়। অন্য দিকে জি আই পি রেল ও ভগবন্ত ক্লাবের অনুপস্থিতির সুযোগে তৃতীয় রাউণ্ডে উন্নীত মহমেডান স্পোর্টিং বি জি প্রেসকে খেলার শেষ সময়ে দুই গোলে পরাজিত করিয়া সেমিফাইন্যালে মোহনবাগানের সহিত এক গোলে পশ্চাৎপদ থাকিয়াও ড্র করে। দ্বিতীয় দিন তাহারা খেলায় প্রভূত উন্নতি সাধিত করে ও মোহনবাগানকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। কিন্তু চরম নিষ্পত্তির খেলায় তাহারা বি এন রেলদলের বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে পরাজিত হয়। মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম স্থানীয় ভারতীয় দল হিসাবে এই প্রতিযোগিতার শেষ পর্য্যায়ে খেলার গৌরব অর্জ্জন করে।

বাইটন কাপের পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল

১৮৯৫ ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স; ১৮৯৬ ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স; ১৮৯৭ এস পি জি মিশন, রাঁচী; ১৮৯৮ এস পি জি মিশন, রাঁচী; ১৮৯৯ ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব; ১৯০০ সেণ্ট জেমস স্কুল; ১৯০১ রয়েল আইরিশ রাইফেলস; ১৯০২ রয়েল আইরিশ রাইফেলস; ১৯০৩ এস পি জি মিশন, রাঁচী; ১৯০৪ হুর্ণযেটস এ সি; ১৯০৫ বি ই কলেজ; ১৯০৬ এস পি জি মিশন, রাঁচী; ১৯০৭ এস পি জি মিশন, রাঁচী; ১৯০৮ কাষ্টমস; ১৯০৯ কাষ্টমস; ১৯১০ কাষ্টমস; ১৯১১ ক্যালকাটা রেঞ্জার্স; ১৯১২ কাষ্টমস এ সি; ১৯১৩ ক্যালকাটা রেঞ্জার্স; ১৯১৪ এম এ ও কলেজ, আলিগড়; ১৯১৫ ক্যালকাটা রেঞ্জার্স; ১৯১৬ বি ওয়াই এসোসিয়েশন, লক্ষ্ণৌ; ১৯১৭ ক্যালকাটা রেঞ্জার্স; ১৯১৮ বি ওয়াই এসোসিয়েশন, লক্ষ্ণৌ; ১৯১৯ জেভেরিয়ান্স; ১৯২০ আসানসোল; ১৯২১ বি ই কলেজ; ১৯২২ ই বি আর; ১৯২৩ লক্ষ্ণৌ ওয়াই এম এ; ১৯২৪ ক্যালকাটা; ১৯২৫ কাষ্টমস; ১৯২৬ কাষ্টমস; ১৯২৭ জেভেরিয়ান্স; ১৯২৮ টেলিগ্রাফ; ১৯২৯ ই আই আর; ১৯৩০ কাষ্টমস; ১৯৩১ কাষ্টমস; ১৯৩২ কাষ্টমস; ১৯৩৩ ঝান্সি হিরোজ; ১৯৩৪ ক্যালকাটা রেঞ্জার্স; ১৯৩৫ কাষ্টমস; ১৯৩৬ বোম্বে কাষ্টমস; ১৯৩৭ বি এন আর; ১৯৩৮ কাষ্টমস; ১৯৩৯ বি এন আর; ১৯৪০ ভোপাল; ১৯৪১ ভগবন্ত ক্লাব; ১৯৪২ রেঞ্জার্স; ১৯৪৩-৪৫ বি এন আর।

য়ুরোপে যুদ্ধ শেষ—

রুশ সৈন্য বার্লিন অধিকার করিয়াছে। হিটলারের তথা জার্ম্মাণীর নাৎসী দল নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। নূতন জার্ম্মাণ সরকারের পক্ষ হইতে শেষ ফুয়ার এডমিরাল ডোয়েনিংস্ মিত্রপক্ষের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ডোয়েনিংসের ঘোষণা—

"German men and women! soldiers of the German Wehrmacht! our Fuehrer Adolf Hitler has fallen···It is my first task to save the German people from destruction by Bolshevism."

শ্রীতারানাথ রায়

হিটলার কোথায়?—

হিটলার না কি মরিয়াছেন,—সঙ্গে তাঁহার লাউড স্পীকার গোয়েবলস। এডমিরাল ডোয়েনিৎস ঘোষণা করিলেন—"The Fuehrer is dead, Long live the Fuehrer!" জার্ম্মাণ রেডিও ঘোষণা করিল—"The Fuehrer has fallen in battle at the head of the heroic defenders of the Reich Capital. Inspired by his resolve to save his people and Europe from destruction he sacri-

জার্ম্মাণীর শেষ পররাষ্ট্র-সচিব (?) কাউন্ট ফন ক্রোসিক্ সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—জার্ম্মাণী আর তৃতীয় যুদ্ধ বাধাইয়া মানব জাতির (humanity) ধ্বংস সাধনে যোগ দিবে না। 'liberty and dignity of individual" রক্ষা করিয়া যদি কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় জার্ম্মাণ জাতি তাহা সমর্থন করিবে। তিনি রুশিয়ার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ অনুগ্রহ পাইবার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে কি না ভবিতব্য বলিবে!

ইহার পর সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বকেন্দ্রে জার্ম্মাণ জাতির আত্মসমর্পণ—(৮ই মে রাত্রি ১১-১ মিঃ)। বার্লিনের পতন পূর্ব্বেও হইয়াছিল। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সুইডিশ বীর গুষ্টাভস্ এডলফাস) বার্লিন দখল করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ানরা বার্লিন লুণ্ঠন করে। ১৭৬০ খৃঃ রুশরা ফ্রেডরিক দি গ্রেটের হস্ত হইতে বার্লিন কাড়িয়া লয় মাত্র তিন দিনের জন্য। ১৮০৬ খৃঃ নেপোলিয়ান জেনার যুদ্ধের পর বার্লিন দখল করেন। কিন্তু বার্লিনের বর্ত্তমান পতনের গুরুত্ব অসামান্য। এংলো স্যাক্সন্ ডিক্টেটর চার্চ্চিল ইহাতে উল্লসিত। সমগ্র বিশ্বের উপর রাষ্ট্র ও অর্থনীতিক প্রভুত্ব প্রয়াসী ডিক্টেটর মিঃ রুজভেল্ট এ বিজয়ানন্দ ভোগ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বার্লিনের এই পতনে বিশ্বপরিস্থিতিতে অভিনব রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব সূচিত হইতেছে।

এডমিরাল ডোয়েনিৎস

······কোথায়?

ficed his life." রুশিয়া এ মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করে না। মার্কিণ সেনাপতি আইজেনহাওয়ারও বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বার্লিনের ধ্বংসস্তূপ ওলট-পালট করিয়া হিটলারের মৃতদেহ পান নাই। তবে ডাঃ গোয়েবেলস এবং তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদের শবে না কি বার্লিনে পাওয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ এমন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—"It may be

another Nazi fabrication, or at best a double may have been sacrificed to stage a little, diabolical Nazi drama"·—কেহ বলিতেছেন—"Hitler who would never agree to surrender, has been spirited away by the Nazi high-ups who are telling the world that Hitler is dead."

রয়টার সংবাদ প্রচার করেন (২রা মে), সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে যে হিটলার, গোয়েবলস ও জেনারল ক্রেবস আত্মহত্যা করেন।

গুজব-সম্রাট বার্ত্তাবাহীদের স্কন্ধে যেন ভর করিয়াছে; তাঁহারা কখন সংবাদ দিতেছেন, তাঁহারা আয়ারে (আয়র্ল্যাণ্ডে) পালাইয়াছেন; কখন সুইডেনে পালাইয়াছেন; 'গ্লোব' গল্প প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সাবমেরিনে চড়িয়া জাপানে গিয়াছে। মার্কিণ ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি বার্চ্চেৎসগাদেনে সন্ধান করিয়া না কি অবগত হইয়াছেন যে, হিটলার ও গোয়েরিংকে অষ্ট্রীয়ার লেক হিণ্টারের দিকে পলায়ন করিতে দেখা গিয়াছে। সংবাদ সত্য হউক চাই না হউক, আইরিশ রাষ্ট্রনায়ক ডি' ভ্যালেরা হিটলারের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

মুসোলিনী

মুসোলিনীর মৃত্যু—

মুসোলিনীও মরিয়াছেন। যে মিলানে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ সেই মিলানের এক প্রকাশ্য পার্কে—জনতা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তাহার মৃতদেহের উপর ২৫ হাজার নরনারী তাণ্ডব নাচিয়াছে। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে এই মিলান হইতেই মুসোলিনী রোম অভিযান করেন। তিনি প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—"demon" পরিচালিত এই দুর্জ্জয় পশুশ্রেষ্ঠকে আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, আলবেনিয়া, টিউনিসিয়া, কোর্সিকা, নাইস গ্রাস করিয়া আবার উদ্গিরণ করিতে হয়, ইটালী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়, পরিশেষে জনতার হস্তে অপঘাত মৃত্যু বরণ করিতে হয়। মুসোলিনীর কীর্ত্তি অকীর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিচারক তাঁহার দেশবাসী। কিন্তু বিদেশের শ্রেষ্ঠরা, বিশেষতঃ ইংরেজরা, তাঁহাকে কি নজরে দেখিতেন তাহা হয়ত অনেকের মনে নাই। প্রাক্তন ইংরেজ মিঃ চার্চ্চিল মুসোলিনীকে আহ্বান করিয়া একবার বলিয়াছিলেন—"If I had been an Italian, I am sure that I should have been whole-heartedly with you from the start to finish in your struggle against bestiel appetites and passions of Leninism."

চার্চ্চিল

মিঃ চার্চ্চিলের পূর্ব্ববর্ত্তী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সার্টিফিকেট—"To-day there is a new Italy which under the stimulus of the personality of Signor Mussolini, is showing a new vigour, in which there is apparent a new vision and a new afficiency in administration."

ইংরেজ রাজনীতির সনাতনী দলভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী মিঃ চার্চ্চিলের সগোত্র Lord Rothermereএর মত—"By saving Italy from the very edge of the abyss of Bolshevism Mussolini has saved civilization of Western Europe...." ইত্যাদি।

ফ্যাসিষ্টদের সহিত ইটালীর সমাজতন্ত্রী দলের মিলনের কথাবার্ত্তা বলিবার জন্যই না কি সিনর মুসোলিনী গত ২৪শে এপ্রিল মিলানে যান। রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সোস্তালিষ্ট, একশানপার্টি ও রিপাবলিকান ফ্যাসিষ্ট দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কথাবার্ত্তা যখন চলিতেছিল, সে সময় তাঁহাকে আক্রমণ ও হত্যা করিবারও যেন আয়োজন চলিতে থাকে।

পদানত ও অধিকৃত জার্ম্মাণী—

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানে প্রথমে যেমন যুদ্ধবিরতি ব্যাবস্থা হয়, এবার তেমন কোন যুদ্ধবিরতি হয় নাই। এবার জার্ম্মাণী পরাজিত ও অধিকৃত, এবার তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত। জার্ম্মাণীর যথাসর্ব্বস্ব আজ মিত্রপক্ষের সম্পত্তি। ৮ই মে মধ্যরাত্রির (রাত্রি ১১টা ১ মিঃ) পর হইতেই জার্ম্মাণীর সকল জনবল ও সামরিক সম্পদ, প্রত্যেক জার্ম্মাণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যথা-খুসী ব্যবহার করিবার অধিকার মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের।

সেণ্ট্রাল এলায়েড কণ্ট্রোল কমিশন এই পদানত জার্ম্মাণী শাসন করিবে। কমিশনের রাজধানী সম্ভবতঃ লিপজিগ বা ম্যাগডিবার্গ হইবে। কমিশনে মার্কিণ প্রতিনিধি হইবেন

জেনারল আইজেন হাওয়ার, ইংরেজ প্রতিনিধি হইবেন ফিল্ড মার্শাল সার হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার।

সম্ভবতঃ রুশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলি সহ বার্লিন রুশ শাসনাধিকারে রহিবে। বার্লিন হইতে রুশিয়া অস্থায়ী জার্ম্মাণ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিতে পারে। রুশিয়া আরও পাইবে নরওয়ের উত্তরাংশ। অবশিষ্ট নরওয়ে ইংরেজ আর আমেরিকানরা আপনাদের মধ্যে বাঁটিয়া লইবে। জার্ম্মাণী য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক চাবিকাঠি। জার্ম্মাণী সাম্যবাদী হইলে সমগ্র য়ুরোপ সাম্যবাদী হইবে। রুশিয়া জার্ম্মাণীকে লইয়া যে খেলা খেলিবে তাহার উপরই য়ুরোপের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

বিজয়ের মূল্য :—

এই মহাযুদ্ধে বিজয় অর্জ্জন করিতে ইংরেজ জাতিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইতে ১৯৪৫ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কি মূল্য দিতে হইয়াছে, তাহার এক অসম্পূর্ণ হিসাব ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে।—

বেসামরিক জনক্ষয়	৫৯ হাজার ৭৯৩
সামরিক জনক্ষয়	১১ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০২
মোট	১১,৮৬,৫৯৫
প্রথম মহাযুদ্ধে	১০,৮৯১১১

এ যুদ্ধে ১৯৪৫ খৃঃ ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইংরেজদের নৌ-ক্ষতি—

ব্যাটেলশিপ	৫
ডেষ্ট্রয়ার	১০৬
ক্রুজার	৩৮
সাবমেরিণ	৬১
বিমানবাহী জাহাজ	৮
অন্যান্য	৪৭৭

গত ২৮শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বিমান ক্ষতি—

মার্কিণ	ইংরেজের	জার্ম্মাণীর
৩২৯৩৮	১১৪৪৯	৭৯১১

(বোম্বার ৭৯৯৭)

গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কে কত বোমা ফেলে—

জার্ম্মাণ অধিকারে			বৃটেন
বৃটিশ	১,৩৮,৫০০	টন	×
আমেরিকান	১৪,৮৩,৬৫৫	টন	×

গত এপ্রিল পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী বৃটেনের উপর কি পরিমাণ বোমা ফেলে—

বোমা	৭৬২০	টন
রকেট	১০৪৮	"
উড়ো বোমা	৮০৭০	"
	১৬,৭৩৮	টন

এ যুদ্ধে রুশিয়ার ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেকে অনুমান করিয়াছে প্রায় আড়াই কোটি রুশ এ যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে।

যুদ্ধ থামে নাই—

কিন্তু যুদ্ধ থামে নাই। য়ুরোপের পরিত্রাতা
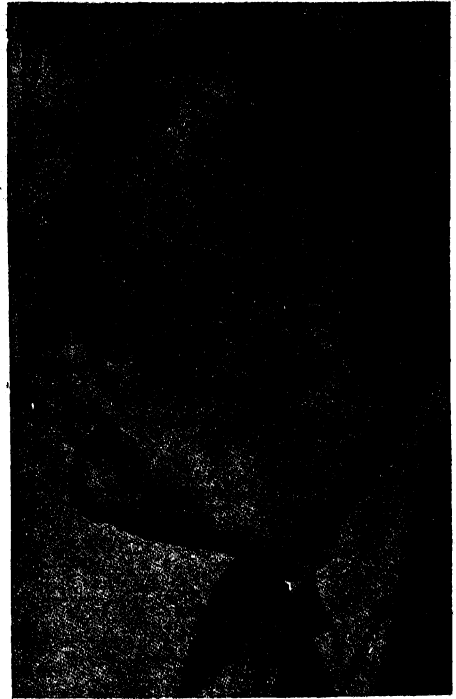
রুজভেল্ট

আমেরিকা বলিতেছে—জাপানীদের বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারের বন্ধনে আজিও প্রাচ্যখণ্ড পীড়িত। প্রতীচ্যকে উদ্ধার করা হইয়াছে, এবার প্রাচ্যকে ত্রাণ করিতে হইবে। ইংরেজও বলিতেছে, শঠ ও লোভী জাপান এখনও পরাজিত হয় নাই। জাপান বৃটেন, আমেরিকা ও আরও কয়েকটি দেশকে যে দাগা দিয়াছে, যে ভাবে সে নিষ্ঠুর আচরণ করিতেছে তাহাতে ন্যায়বিচারও যেমন চাই, প্রতিশোধও তেমন চাই। ইংরেজ বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন, জাপানের এখনও প্রথম শ্রেণীর ৫০ লক্ষ সৈন্য আছে। যুদ্ধ যতই খাস জাপানের নিকটবর্ত্তী হইবে ততই জাপ-প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাইবে।

ব্রহ্ম অভিযানের ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি মান্দালয় হইতে পেগু ও রেঙ্গুন পর্য্যন্ত স্থান পুনরধিকার করিয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে ব্রহ্মের প্রায় অর্দ্ধাংশ জাপ-কবলমুক্ত হইয়াছে। তবু জাপান ব্রহ্মে প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম করিতেছে। ফিলিপাইন হইতে জাপান এখনও সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয় নাই। ওকিনাওয়ায় ১ লক্ষ মার্কিণ সৈন্যকে এবং তারাকানে (বোর্ণিও) অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যকে জাপানীরা প্রবল বাধা দিতেছে।

টুম্যান

জার্ম্মাণীর আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে জাপ

পররাষ্ট্র-সচিব জার্ম্মাণীর নিন্দা করিয়া তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। জার্ম্মাণীর আত্মসমর্পণের] পর জাপ বেতার-কেন্দ্র বলে—"জাপান পৃথিবীতে আজ একা।'

রুশিয়া কি জাপযুদ্ধে নামিবে ?

জাপান সম্বন্ধে রুশিয়ার মনোভাব এখন পর্য্যন্ত রহস্যময়। জার্ম্মাণ যুদ্ধ শেষ হইবার পর আমেরিকা ও বৃটেন যেমন জাপানকে আক্রমণ করিবার জন্য তোড়জোড় করিতেছে, রুশিয়া তেমন কিছু করিতেছে বলিয়া'এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ বণ্টন করা হয় নাই। সানফ্রান্সিস্কো হইতে চলিয়া যাইবার সময় অপোষ কূটনীতি বিশারদ মলোটভ ইংরেজ, চীনা ও মার্কিণ রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দকে না কি আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন যে, ফ্যাসিজ্‌ম নির্ম্মূল না হওয়া পর্য্যন্ত রুশিয়া বিশ্রাম করিবে না। বর্ত্তমানে রুশিয়া য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য কিছু কাল ব্যস্ত থাকিলেও পূর্ব্ব-এশিয়ার সীমান্ত রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তাহার আছে। কিন্তু মলোটভ জাপানকে আক্রমণ করিবার কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না।

ষ্ট্যালিন

মিত্রশক্তিরা জাপ-পদানত জাতিগুলির মধ্যে জাপবিদ্বেষী দল গঠন করিয়াছেন। এ সকল দলকে রুশিয়া বড় একটা সমর্থন করিতেছে না। জাপানের সহিত বিরোধ এড়াইবার জন্য রুশিয়া না কি চীনে অবস্থিত মুমুক্ষু কোরিয়ান দলকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে। ইহা হইতে মনে হইতেছে যে, জাপানকে রুশিয়া এখনও ঘাঁটাইতে চাহিতেছে না। মনে হইতেছে, কোন না কোন অজুহাতে রুশিয়া প্রাচ্যের কম্যুনিজমবিরোধী প্রবলতম শক্তি জাপানকে নখদন্তহীন করিবার জন্য বৃটেন ও আমেরিকাকেই উৎসাহ দিবে মাত্র। জার্ম্মাণী রুশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। রুশিয়া প্রথমে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধ করে ও পরে শত্রুকে খেদাইয়া লইয়া গিয়া তাহার বিবরে তাহাকে বধ করিয়াছে। প্রাচ্যখণ্ডে জাপান রুশিয়াকে আক্রমণ করে নাই, রুশিয়ার মিত্রশক্তিবর্গের অর্জ্জিত এলাকা বাটপাড়ি করিয়া লইয়াছে মাত্র। রুশিয়ার যেন মনোভাব—আমাদের রাজ্য মাত্র আমাদেরই বাহুবলে এবং অশেষ জনক্ষয় করিয়া আমরা উদ্ধার করিয়াছি এবং জার্ম্মাণীর ধন জন ও অস্ত্র ক্ষয় করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে বৃটেনকে ও পশ্চিম য়ুরোপের সকল রাষ্ট্রকে রক্ষা করিয়াছি, তোমরা মাত্র পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছ। এবার তোমাদের বাহুবলে তোমরা তোমাদের স্থান পুনরধিকার কর, রুশিয়া মাত্র পরোক্ষ সাহায্য করিবে ও বাহবা দিবে।

ভারতের কথা—

আন্তর্জ্জাতিক মঞ্চপশ পবিত্রাত্মা ও বয়ংসিদ্ধ অভিভাবকরূপে স্বকার্য্য সাধনের জন্য পৃথিবীর পদানত ও ক্ষুদ্র জাতিগুলির অনেক স্তুতি-গান করিয়াছে। কিন্তু যাহাদের কাঁধে চড়িয়া তাহারা বিজয়-ফল পাড়িল, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত তাহারা করে নাই।

যেমন ভারত। অস্ত্রাঘাতে সমগ্র যুদ্ধে ইংরেজ জাতির যে জনক্ষয় হইয়াছে, এই যুদ্ধ চলিবার কালে নিঃশেষিত-শোণিত দরিদ্রতম ভারতবাসী, বিশ্বের মুনিক-মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার যুদ্ধের কারণে, অনাহারে প্রাণ দিয়াছে তাহার অপেক্ষা অধিক। তবু বিজয়-ঘোষণায় ইংরেজের রাজা, প্রধান-মন্ত্রী, বৈদেশিক মন্ত্রী, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি ভারতবাসীর ভাগ্য সম্বন্ধে আভাস ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দেন নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের বেত্রাহত অধৈর্য্য ভারত নিত্য প্রহার ও শোষণ হইতে মুক্তিলাভের যে অধিকারের ন্যায্য দাবী করে সে দাবী সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক পাটোয়ারগণ একটা কথাও বলিতেছেন না।

আগামী যুদ্ধ—

মার্কিণ ট্রুম্যান কমিটীর সদস্যরূপে মার্কিণ সিনেটর রাল্‌ফ ব্রুষ্টারকে সমর-ব্যয় সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এ সম্পর্কে তিনি পশ্চিম এসিয়া এবং আফ্রিকা পরিভ্রমণ করেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম এসিয়ার সঞ্চিত পেট্রোলের জন্য রুশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। রুশ কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থারূপে ইংরেজরা এই পেট্রোল চায়। আমেরিকাও এ অঞ্চলে কিছু যে চাহে না, তাহা নহে। আমেরিকার দুঃখ—We have not a landing field or a radio station in the middle East" আমেরিকার মতলব প্যালেষ্টাইনে মার্কিণ-বন্ধু ইহুদীদের স্বার্থ সমর্থন করিয়া ঐ স্থান হইতে পশ্চিম এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করা। আরব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসঙ্ঘ মিত্রপক্ষের আনুকূল্যে গঠিত হইলেও রুশিয়া বিমুখ হইলে পূর্ব্ব এশিয়ায় যেমন প্রবল যুদ্ধ চলিবে, পশ্চিম এশিয়াতেও তেমনই রাষ্ট্র-প্রিয়র্ত্তনের জন্য বিরোধের সম্ভাবনা।
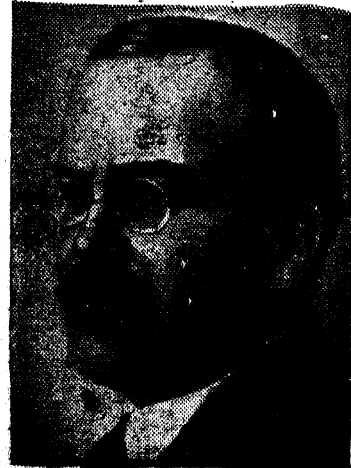
মলোটভ

সানফ্রান্সিস্কো বৈঠক—

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মহা সমারোহে ৪৬টি রাষ্ট্র সানফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। তথাকথিত বিশ্ব-নিরাপত্তা সনদ (World Security Charter) রচনা করিবার জন্য আড়ম্বর কম হয় নাই। কিন্তু সনদের যে খসড়া এ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে তাহাতে এমন কোন কথা নাই যাহাতে বুঝা যায় যে, স্বেচ্ছাসন্ধিসূত্রে আবদ্ধ না হইলে কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। অ্যাংলো-স্যাক্সন দুই জাতি—বৃটেন ও আমেরিকা, তাহাদের প্রকৃত পক্ষে তাঁবেদার ফ্রান্স ও চীনকে লইয়া (Big Four) পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অছিগিরী (International Trusteeship) করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। এ সম্বন্ধে চতুরঙ্গ জাতির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার মত শক্তি বৈঠকে সমবেত করধৃত অপর রাষ্ট্রগুলির হয় নাই। চতুরঙ্গ জাতি প্রস্তাব করিয়াছে, অছিশক্তিবর্গের সম্মতি ব্যতীত mandated দেশগুলির রাষ্ট্রমর্য্যাদার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি mandatory শক্তিবর্গ বিনাযুদ্ধে অছিগিরী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে।

'সি' ক্লাশ হইতে 'এ' ক্লাশ ?—

সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকে সঙ্গে সঙ্গে এক আন্তর্জাতিক শ্রমিক-বৈঠকেরও ব্যবস্থা আছে। এই বৈঠকের মতলব কি, তাহা সুপরিস্ফুট না হইলেও কতকটা বুঝা যাইতেছে। এ বৈঠকের নেতারা বলিতেছেন যে, তাঁহারা মাত্র পৃথিবীর শ্রমিকদের জীবনযাত্রার বর্ত্তমান দুরবস্থার উন্নতি সাধন করিবেন। মার্কিণ ইউনাইটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন—"No provision therein had been made for India." এক জন ভারতীয় বৃটিশ প্রতিনিধিকে সোজা প্রশ্ন করিয়া বলেন—"Do the organized labour in the United Kingdom favour an Independent India ?" উত্তরে সার ওয়াল্টার সাইট্রিন বলেন—"It will not be one of the function of our organisation to discuss the freedom of India. We will be satisfied if the workers of India can have their standards raised to the level of the highest in the world."

রুশিয়া বনাম নির্জ্জিত জাতি—

শুনা যাইতেছে, সোভিয়েট সরকার পরাধীন জাতিগুলি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করিবেন, ভারত তাহার মধ্যে পড়িলে ভারতের নসীব ফিরিলেও ফিরিতে পারে। সাংবাদিকদের বৈঠকে তিনি বলিয়াছেন—"Dependent countries must be put in a position to recover or to gain their national independence as soon as possible. For this purpose, a special organization should be set up now to expedite the job?" ভারতের সম্বন্ধে বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতা মিঃ ক্লিমেণ্ট এটলি চার্চ্চিলী সুরে মত প্রকাশ করিয়াছেন—"It is very difficult for us to do anything when we know that anything we offer would be rejected."—যাঁহার নিকট তিনি এ মত প্রকাশ করেন (মিঃ জে, জে, সিং) তিনি শুনাইয়া দেন, ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা না হইলে—"Within five years of cessation of Japanese war there would be an armed revolution in India with the help of the foreign power. You can easily guess which power I have in mind. Thus chaos and bloodshed would ensue. Do you want that ?" মিঃ এটলি উত্তর দেন—"Oh no! Oh no! Certainly not."

নাবালক জাতিদের আর্ত্তনাদ—

টি ভি সুং সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকের চীনা প্রতিনিধি (মাদাম চিয়াংএর ভ্রাতা, চীনের ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও পররাষ্ট্র-সচিব, চীনে মার্কিণ সমর্থনপুষ্ট শ্রেষ্ঠ ধনী)। তিনি আটলাণ্টিক চার্টারের বড় সমর্থক। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয় যে, এ চার্টার কি ভারতের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইবে? সুং উত্তরে বলেন—refer to the powers that framed it. বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে গালভরা কথায় বৈঠক প্রতিধ্বনিত হইলেও ভারত, কোরিয়া, পোল্যাণ্ড ও ইথিওপিয়ার প্রকৃত সমস্যার সমাধানের কোন ইঙ্গিত এ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না।

অর্থনীতিক দাসত্ব—

শুনা যাইতেছে, ল্যাঙ্কেশায়ার ও ম্যাঞ্চেষ্টারের স্থান আমেরিকা শীঘ্রই গ্রহণ করিতেছে। শীঘ্রই আমেরিকা হইতে ভারতের বাবু-ভদ্দরদের জন্য দেড় লক্ষ গজ চিকণ কাপড় ভারতে আসিতেছে, ভারত সরকার না কি আমদানী-লাইসেন্স পর্য্যন্ত মঞ্জুর করিয়াছেন। এ ব্যবসা কায়েম করিবার জন্য ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে ভারতীয় তুলা আমেরিকার জন্য রপ্তানী করা হইয়াছে।

ভারতের সকল শ্রমশিল্প রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি করিতেছে। 'রেকর্ডার' পত্রে সার এলফ্রেড ওয়াট্‌সন বলিয়াছেন, ভারত সরকারের এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাও নাই, তাঁহাদের কোন ব্যবস্থাও নাই। ইংরেজেরা বলেন—"India will want foreign capital, men of great technical experience, who must be imported and men who can develop markets and distribution." সুতরাং রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যে ভারতের যেমন অসুবিধা, অর্থনীতিক স্বাতন্ত্র্যেও তেমনই অসুবিধা। অতএব এংলো-স্যাক্সন জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকাই ভারতের শ্রেয়ঃ। বিপন্ন জাতির ত্রাণের জন্য রাজনৈতিক বকলমাধারী হইয়া ভক্তিসূত্রে আওড়াইবে কি না তাহা যুব-ভারতই বলিতে পারে।

নূতন অর্থ-সচিবের দায়িত্ব

ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন অর্থ-সচিব সার জেরেমী রেইসম্যান কার্য্যকাল অবসানে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সামরিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাত সার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস তাঁহার শূন্য স্থান পূরণ করিয়াছেন।

অর্থ-সচিব হিসাবে সার জেরেমী কতখানি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার সময় ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা এ বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেট সমালোচনার সময় আলোচনা করিয়াছি। মোটের উপর, যুদ্ধকালীন অর্থ-সচিব যুদ্ধের সময় যুদ্ধই বুঝিয়াছেন এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যাসমূহ লইয়াও যে এখনই মাথা ঘামানো দরকার, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। যুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পপ্রসারের প্রভূত সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সার জেরেমীর আমলে আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষারই বলিতে গেলে সমাধি রচিত হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় ভারত সরকারের রাজস্ব-তহবিলে আয় যথেষ্ট বাড়িলেও ব্যয় তদপেক্ষা অনেক বেশী হইতেছে বলিয়া অর্থ-সচিব এ পর্য্যন্ত সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়াইয়াছেন। যুদ্ধের আগেকার ১২ শত কোটির স্থানে এখন নূতন ঋণপত্র বিক্রয়ের কল্যাণে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার কোটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং এই বাড়তি দেনার জন্য সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি আছে গড়ে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা।

সার জেরেমী প্রধানতঃ যে সকল ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার জন্য সুদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৩ টাকার। অবশ্য ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সরকার ৬ টাকা ৪ আনা সুদে টাকা ধার নিতেন এবং সে হিসাবে শতকরা ৩ টাকা সুদে টাকা সংগ্রহ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক; কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতের অর্থনীতিতে এখন মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব চলিতেছে এবং এখন 'চীপ মনি' বা সস্তা টাকার যুগ। আগে ব্যাঙ্কে শতকরা ২ টাকা সুদেও যথেষ্ট চলতি আমানত পাওয়া যাইত না, এখন শতকরা ৪ আনা সুদেই বিপুল পরিমাণ আমানত জমা পড়িতেছে। সার রোল্যাণ্ডসের আশু কর্ত্তব্য, অতঃপর নূতন ঋণপত্র বিক্রয়ের সময় অল্পতর সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং তাহাতে এক দিকে যেমন সরকারের আর্থিক দায়িত্ব কমিয়া যাইবে, অন্য দিকে তেমনি সরকারী অর্থস্বাচ্ছল্য সম্বন্ধে দেশবাসীর বিশ্বাস জন্মিবে বলিয়া টাকা সংগ্রহে কোন অসুবিধা হইবে না।

ব্রিটেনে ভারতের পাওনা যে দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং জমিয়াছে তাহা বার্ষিক শতকরা ১ টাকা সুদে ব্রিটিশ ট্রেজারী-বিলে জমা না করিয়া অর্থ-সচিবের উচিত ২ টাকা সুদের মেয়াদী ঋণপত্রে জমা দেওয়া এবং তাহাতে ভারতের বার্ষিক প্রায় ১৫ কোটি টাকা মিথ্যা লোকসান বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এই পাওনা টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করাই সর্ব্বাগ্রে দরকার এবং এই টাকার পরিবর্ত্তে বিলাতী যন্ত্রপাতি আনিয়া এ দেশের শিল্পসমৃদ্ধি ঘটাইলে ভারত সরকারের আয়বৃদ্ধির অনুপূরক হিসাবে ভারতের আর্থিক স্বাচ্ছল্য সম্পাদিত হইতে পারে।
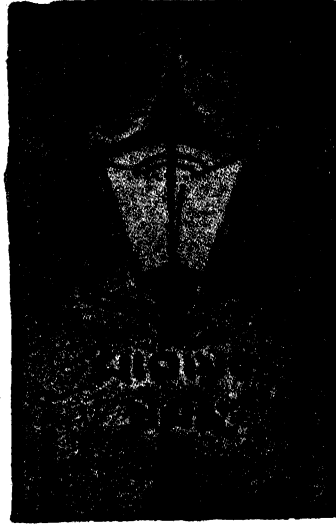
দরিদ্র ভারতের টাকা লইয়া বর্ত্তমানে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে যেরূপ অপব্যয় চলিতেছে তাহাও অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার এবং নূতন অর্থ-সচিব তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলে এই হিসাবেও ভারতের বহু টাকা বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধ এখন ভারত হইতে বহু দূরে সরিয়া যাইতেছে, যুদ্ধের পূর্ব্বের ৪৬ কোটির স্থানে এখন বার্ষিক ৪ শত কোটি টাকা সামরিক খাতে ব্যয় করার যৌক্তিকতা কতখানি, তাহা আমরা নূতন অর্থ-সচিবকে বিবেচনা করিতে বলি। বেসামরিক বিভাগেও যে অপব্যয় চলিতেছে তাহাও সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিষ্টার টাইসনের বেসামরিক ব্যয়সঙ্কোচ সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতেই প্রমাণিত হইয়াছে।

মোট কথা, ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা বর্ত্তমানে হীন হইলেও একেবারে হতাশজনক নয়। এখন নূতন অর্থ-সচিব যদি সহানুভূতির সহিত সকল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে ভারতের আর্থিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

যুদ্ধ ও ভারত সরকারের অর্থনীতি

ভারতবর্ষ আয়তনে বিপুল হইলেও তাহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা সর্ব্বজন-বিদিত। মাথা-পিছু যে দেশের লোকের বাৎসরিক আয় উর্দ্ধপক্ষে ৭৮ টাকা, সে দেশ যে কি করিয়া বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতেছে, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর ব্যাপার! অবশ্য বাঙ্গালা দেশের চেয়ে আকারে ছোট ব্রিটেন যদি দৈনিক গড়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সামরিক ব্যয় বহন করিতে পারে, সে ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে বৎসরে মাত্র ৪ শত কোটি টাকা বা দৈনিক ৮ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু ভারতের স্বাভাবিক দৈন্যের জন্য এই ব্যয়ভারও তাহার পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক যুদ্ধের বিপুল খরচ যোগাইতে ভারত সরকারকে করবৃদ্ধি ছাড়া বৎসরের পর বৎসর নূতন নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিতে হইতেছে। সামরিক ব্যয়ের কোন স্থিরতা নাই বলিয়া প্রাথমিক বাজেট অপেক্ষা সংশোধিত বাজেটে এবং সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা চূড়ান্ত বাজেটে প্রতি বৎসরেই ঘাটতির অঙ্ক বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই ঘাটতি পূরণে ঋণসংগ্রহ ছাড়া ভারত সরকারের অন্য কোন উপায় নাই।

যুদ্ধের সমস্ত খরচ মিটাইতে ভারত সরকারকে যে বহু অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে অপব্যয় বন্ধ করিয়া তাঁহারা অনায়াসেই প্রতি বৎসর অনেক টাকা বাঁচাইয়া দিতে পারিতেন।

সম্প্রতি বেসামরিক ব্যয়বাহুল্যের প্রতিবাদ জানাইয়া ইউরোপীয় দলের দলপতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হওয়ায় সরকারী তহবিলের অপব্যয় সম্বন্ধে পরিষদের সদস্যগণের মনোভাব জানা গিয়াছে। সামরিক খাতে ব্যয়ও যে সর্ব্বদাই সমর্থনযোগ্য এমন কথাও বলা যায় না। গত বৎসর দুই মাস আসাম-সীমান্তে যুদ্ধ চলিয়াছিল বলিয়া ভারত সরকারের ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের চূড়ান্ত বাজেটে সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা ১৬ কোটি টাকা বেশী ব্যয় ধরা হইয়াছে, অথচ ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারত-সীমান্তের বহু দূরে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের যে যুদ্ধ চলিবে, তাহার জন্য ভারতকে ৪ শত কোটি টাকা ব্যয় বহনে বাধ্য করার কারণ কি? আজ ঋণ করিলে ভবিষ্যতে যে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং সুদের দরুণ আর্থিক দায়িত্ব বহন করিতে হইবে, ইহাও ভারত সরকারের ভুলিয়া যাওয়ার কথা নয়। যুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পপ্রসারের বহু সুযোগ ছিল; সেই সব সুযোগ উত্তমরূপে ব্যবহৃত হইলে এবং শিল্পপ্রসারে দেশবাসীর আয়বৃদ্ধিতে সরকারী আয়বৃদ্ধি হইলে ভবিষ্যতে এই দেনা শোধ করা হয়ত তেমন কঠিন হইত না। বিদেশী অর্থসচিব ভারতের স্বার্থের বিনিময়ে বর্ত্তমান যুদ্ধজয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহার জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে অবশ্যই অভিনন্দিত করিবে, কিন্তু এদেশের আর্থিক বনিয়াদ তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফলে যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছে, তাহার পুনর্গঠন করিতে ভারতবাসীকে যে যুদ্ধের পরেও দীর্ঘকাল নানাবিধ করভারজনিত দুঃখভোগ করিতে হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—

বৃটেনের যুদ্ধোত্তর বহির্বাণিজ্য

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল আধুনিক মহাযুদ্ধের বিপুল ব্যয় বহনে বৃটেনকে বহু আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। গত যুদ্ধের খরচ এখনকার তুলনায় যথেষ্ট কম ছিল, তথাপি সেই ব্যয়ভার বহনও বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং যুদ্ধের পরে ভারতের পাওনা ১৪ কোটি পাউণ্ড বা প্রায় ১৯০ কোটি টাকা বাধ্যতামূলক দানের হিসাবে গ্রহণ করিয়া এবং পরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া বৃটেন কোনক্রমে তাহার আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখিয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বৃটেনের সম্মান বা সম্ভ্রম যতই বাড়াক, তাহার অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ যে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর প্রভৃতি দেশের নিকট পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণসংগ্রহ ছাড়াও বৃটেনের মূল্যবান ও লাভজনক বহু পরিমাণ বৈদেশিক সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই জোড়া-তালি দেওয়া অর্থনীতি যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে চলিলেও যুদ্ধের পরে বৃটিশ সরকারকে শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ও দেশের সর্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বা 'ফুল এমপ্লয়মেণ্ট' বজায় রাখিতে হইলে অবশ্যই অর্থাগমের নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বৃটেনকে যে যুদ্ধের পরে রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে, এ কথা এখন বৃটেনের যুদ্ধকালীন আর্থিক অবস্থার সহিত পরিচিত সকলেই বলিতেছেন। যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর হইতেই বৃটেনের বাণিজ্যনীতি নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইনষ্টিটিউট অব এক্সপোর্টস যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন, বৃটেনের সরকারী বাণিজ্য বিভাগও তাঁহাদের নানাবিধ ইস্তাহারে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির গুরুত্ব বহু বার স্বীকার করিয়াছেন। গত ১৪ই এপ্রিল আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান 'ফরেন পলিসি এসোসিয়েসন' একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন, "বৃটেন বর্ত্তমানে যুদ্ধোত্তর আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিতেছে এবং এদিক হইতে তাহাকে অবশ্যই উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে।"

বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বেশী এবং বিলাতী পণ্যের সহিত এ দেশবাসীর পরিচয়ও যথেষ্ট। ভারতবর্ষে নূতন বাজার সৃষ্টির যে বিপুল সম্ভাবনা আছে, একথাও কেহ অস্বীকার করেন না। চল্লিশ কোটি অধিবাসীর দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক ১০ টাকা আয় বাড়িলে বৎসরে এখানে ৪ শত কোটি টাকার নূতন বাজার সৃষ্টি হইবে, অথচ বর্ত্তমানে যে দেশের আয় মাথাপিছু বৎসরে ঊর্দ্ধপক্ষে ৭৮ টাকা সে দেশে তখন মাথা-পিছু বাৎসরিক আয় মাত্র ৮৮ টাকা হইবে এবং ইহা পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের তুলনায় প্রকৃতই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভারতবাসীও বর্ত্তমান যুদ্ধের চাপে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে; নিতান্ত মুষ্টিমেয় ব্যবসাদার বা জোগানদার ছাড়া এদেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থাই এখন নিঃস্বতার রিক্তপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। ভারতের আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্ট না হইলে বৃটেনের পক্ষে এ দেশে অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রয় কিছুতেই সম্ভব হইবে না। এ সময় বৃটেন যদি ভারতে শিল্প প্রসারে উদ্যোগী হয় এবং শিল্প প্রসারের ফলে অর্থের প্রচলন গতি বাড়িয়া যদি এ দেশের লোকের স্বচ্ছলতা সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বৃটেনের সেই সহযোগিতার বিনিময়ে ভারতবাসী স্বতঃই দেশীয় পণ্য ক্রয় ছাড়া বিদেশী অন্য যে কোন জিনিষের আগে বহু পরিমাণ বিলাতী মাল ক্রয় করিবে। ভারতকে কৃষিপ্রধান দেশ করিয়া রাখিয়া এ দেশের প্রভূত সম্ভাবনা এত দিন ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, শাসক সম্প্রদায়ের এই ভ্রমাত্মক নীতির গলদ সার আলফ্রেড ওয়াটসন প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের চেষ্টায় এখন প্রকাশ হইয়া গিয়াছে; এ সময় আত্মরক্ষার জন্যও চিরাচরিত নীতি ত্যাগ করিয়া ভারতের শিল্পপ্রসারে তথা আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সম্পাদনে বৃটেনের অবশ্যই সাহায্য করা উচিত।

—

ভারতীয় শ্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই এবং সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার আর্দ্দেশির দালাল ভারত সরকারের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুইটি বিবৃতি দিয়াছেন। সার আর্দ্দেশির সরকারী পরিকল্পনার পক্ষে ওকালতি করিয়া বলিয়াছেন যে, মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, দেশের শিল্পোন্নতির জন্য এই সরকারী ব্যবস্থা একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে। আর মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই বলিয়াছেন যে, দেশের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকার যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অনিষ্টকর। আমরাও

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সার আর্দ্দেশির গাছে কাঁটাল দেখিয়া গোঁফে তেল দিতেছেন এবং ভবিষ্যতে অর্থাৎ সমরোত্তর যুগে ভারতমাতার স্বর্ণডিম্ব প্রসবের যে স্বপ্ন তিনি দেখিতেছেন, তাহা একান্তই ব্যাধিজনিত দুঃস্বপ্ন। ঈশ্বর তাঁহাকে এই দুঃস্বপ্নের কবল হইতে রক্ষা করুন।

হঠাৎ ভারত সরকার তথা বৃটিশ ব্যবসায়ীর দল ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন কেন, তাহা রীতিমত চিন্তা করিবার বিষয়। যাঁহারা সুদীর্ঘ দেড় শত বৎসরের ইতিহাসে কোন দিন ভারতের শিল্পোন্নয়ন কামনা করেন নাই এবং প্রত্যেক পদে পদে শ্রমশিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় মূলধনের বিনিয়োগে বাধা দিয়াছেন, তাঁহারা হঠাৎ রাতারাতি ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতির জন্য কেন এত দরদী ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, তাহা যে কেহ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিগত মহাযুদ্ধের পরেও আমরা ভারতের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় বুলি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার কোনটাই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কাপড়ের কল ও চিনির কল প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা উৎসাহ পাইয়াছি, কিন্তু গুরু শিল্প বা মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ তো পাই-ই নাই, বরং প্রচণ্ড বাধা পাইয়াছি। অর্থাৎ আমরা চিরদিনই সস্তায় বৃটিশ শিল্প-কারখানায় কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়া আসিয়াছি এবং আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদে বৃটিশ ধনিকগোষ্ঠীর মুনাফা বৃদ্ধি হইয়াছে। এমন কি, কিছু দিন পূর্ব্বে এই মহাযুদ্ধের মধ্যেই যখন বালচাঁদ হীরাচাঁদ-প্রমুখ ভারতীয় শিল্পপতিগণ এ দেশে নৌ-শিল্প, মোটর-শিল্প ও বিমান-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন ভারত সরকার "ভারতরক্ষা বিধানের" দোহাই দিয়া সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। অর্থাৎ সাধারণ শালীনতা জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ভারত সরকার তখন এই যুক্তিও দিতে দ্বিধা করেন নাই যে, এই সব গুরু শিল্প যদি এখন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাঁহাদের যুদ্ধোদ্যমে ও ভারতরক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিবে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, চিরদিন—এমন কি এই সে দিন পর্য্যন্ত আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বৃটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পোন্নতির পরিপন্থী ছিলেন।

ভারত সরকার যে শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহাদের অভিসন্ধি অতি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং এই অভিসন্ধি যে আদৌ সাধু নহে, তাহা বৃটিশ ব্যবসায়ীদের আশীর্ব্বাদ ও সাধুবাদ হইতে স্পষ্টতররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারত সরকার মোটামুটি ভাবে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প, অটোমোবাইল, ট্রাক্টর ও বিমানশিল্প, নৌ-শিল্প, যন্ত্রনির্ম্মাণ-শিল্প, সিমেণ্ট, বৈদ্যুতিক শক্তি-শিল্প, রেলপথ প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক ও গুরু শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে চান। মৌলিক ও গুরু শিল্প অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশেই রাষ্ট্রপরিচালিত, সুতরাং ভারতবর্ষেও এই শিল্পগুলির রাষ্ট্রীকরণে কেহই আপত্তি করিবেন না। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণও সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির নিদর্শন পরিদর্শন করিয়া আসিয়া এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে যে, ভারতীয় মৌলিক শিল্পের রাষ্ট্রীকরণের জন্য যাঁহারা মাথা ঘামাইতেছেন, চিরদিন কি ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকার তাঁহাদেরই থাকিবে? আর বিদেশী শাসক যে রাষ্ট্রের সর্ব্বময় হর্ত্তাকর্ত্তা, সে রাষ্ট্রের শিল্পপ্রসারের পরিকল্পনা যে শেষ পর্য্যন্ত শোষণের উদ্দেশ্যেই খসড়া করা হইবে তাহাতে কি আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে? খসড়াও সেই ভাবে করা হইয়াছে। কারণ, মূলধন ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণ, শিল্পের একদেশতা ও লাইসেন্স প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারত সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতের ভারতীয় শিল্পোন্নয়নে যাহাতে বৃটিশ মূলধন বিনিময়ের প্রশস্ত সুযোগ থাকে এবং বৃটিশ ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে সেই দিকেই তাঁহাদের নজর বেশী। মার্কিণী মূলধন যে ভাবে ভারতবর্ষে আজ সর্ব্বক্ষেত্রে হাত-পা ছড়াইয়া জাঁকিয়া বসিতে চাহিতেছে, তাহাতে বৃটিশ ধনিকগোষ্ঠীর বাস্তবিকই আতঙ্কিত হইবার কথা। তাহার উপর সমরোত্তর পৃথিবী কি রূপ ধারণ করিবে, তাহাও আজ স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন। তাই সময় থাকিতে বৃটিশ ধনিক ও বণিকগোষ্ঠী তাঁহাদের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারত সরকারের শিল্পোন্নয়ন নীতি তাহারই একটি নমুনা মাত্র।

শিল্প-পরিকল্পনা বা জাতীয় পরিকল্পনা আমাদের দেশে নূতন কথা নহে। কংগ্রেস যে জাতীয় পরিকল্পনা সভা গঠন করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কার্য্যসূচি ও নানা প্রকার প্রস্তাবের সহিত পরিচিত। জাতীয় পরিকল্পনা ভিন্ন যে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতি সম্ভব নহে, তাহা কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা-সভাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণও এই সভায় যোগদান করিয়া তাঁহাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়াছিলেন। আজ কংগ্রেস কারাবন্দী এবং তাহার জাতীয় পরিকল্পনাও কাগজ-বন্দী। যদি সত্যই কোন জাতীয় পরিকল্পনা—ভারতের কোন শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা একমাত্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দ্বারা করা সম্ভব। ভারতের শিল্পপতিগণ এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বারংবার এই কথা বলিয়াছেন এবং আজও বলিতেছেন। বিদেশীর মূলধন-পরিপুষ্ট বা বিদেশীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন শিল্প-পরিকল্পনা কোন দিনই ভারতবাসী গ্রহণ করিবে না; কারণ, কোন দিনই তাহা ভারতের সামাজিক প্রগতির সহায়তা করিবে না। ভারতীয় শ্রম-শিল্প বা ভারতীয় মূলধন আজ পর্য্যন্ত ভারতের মাটিতে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইতে পারে নাই। সেই সুবর্ণ সুযোগ তাহার আসিতেছে এবং তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কোন বিদেশী শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর নাই। একমাত্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় গভর্ণমেণ্টই এই গুরুতর দায়িত্বের ভার বহন করিবার যোগ্য।

সার আর্দ্দেশির এই সহজ ও সরল সত্যটি উপলব্ধি করিবেন কি-না জানি না, তবে তাঁহার ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে কোন দিনই স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিবে না। তাঁহার পরিকল্পনা মুদ্রিত কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যেই চিরদিন বন্দী হইয়া থাকিবে।

খাদ্য-শিল্প

ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগকে খাদ্য-সংরক্ষণ শিল্প সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের লইয়া গঠিত কমিটীর প্রথম অধিবেশনে খাদ্যসচিব সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব জানান যে পূর্ব্বাঞ্চ

খাদ্যশিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে ভারতবাসীর খাওয়ার প্রয়োজন মিটে না, ভারতের বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। তা'ছাড়া ভারতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহারও অনেক নষ্ট হইয়া যায়। সার জওলাপ্রসাদ বলিয়াছেন, ভারতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ খাদ্য নষ্ট হয়, তাহার মূল্য প্রায় দশ কোটি টাকা। যে-দেশে শতকরা ৩০ জন লোকের বেশী দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে-দেশে খাদ্যের এই অপচয়! অথচ এই অপচয় নিবারণের কোন চেষ্টাই এ-পর্য্যন্ত হয় নাই। চেষ্টা করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর, এ সম্পর্কে তাঁহারা উদাসীন। সার জওলাপ্রসাদ বলিয়াছেন, যুদ্ধের ঝাঁকুনি লাগিয়া এই ঘুমন্ত অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে। যদি কাটিয়া গিয়া থাকে তবে খুবই ভাল কথা। কিন্তু খাদ্য-সমস্যা আমাদের বহুমুখী। তন্মধ্যে অধিক খাদ্য-উৎপাদন খাদ্য-সংরক্ষণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সার জওলাপ্রসাদ তাঁহার বক্তৃতায় খাদ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্য-সংরক্ষণ উভয়ের প্রতিই সমান ভাবে জোর দেওয়া আবশ্যক।

খাদ্য-শিল্পের তাৎপর্য্য যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় খাদ্য-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভারতে এ পর্য্যন্ত এদিকে কোন চেষ্টাই হয় নাই। কিন্তু খাদ্য-শিল্প বলিতে আমরা কি বুঝি, প্রথমে তাহাই উল্লেখ করা আবশ্যক। সার জওলাপ্রসাদ খাদ্য-শিল্পকে মোটামুটি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) খাদ্য নষ্ট হওয়া নিবারণ বা হ্রাস করা; (২) অনেক খাদ্য আছে, যেগুলি মরশুমের সময় প্রচুর পরিমাণে জন্মে, মানুষের প্রয়োজনে সমস্ত লাগে না, অনেক নষ্ট হয়। এই সকল খাদ্য নষ্ট হওয়া নিবারণ করা এবং মরশুমের সময় ছাড়া অন্য সময়েও সেগুলি লোকের কাছে সহজলভ্য করা,—এক কথায় খাদ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; (৩) খাদ্যের পুষ্টিকারিত্ব শক্তি রক্ষা করা; (৪) নূতন খাদ্য উৎপাদন। আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের বহু অপচয় হয়। পোকায় খাদ্যশস্য নষ্ট করে, গোলাঘরে ভাল ভাবে খাদ্যশস্য রাখিবার ব্যবস্থা না থাকায়ও বহু পরিমাণে খাদ্যশস্য নষ্ট হয়। প্রতি বৎসর পোকায় কি পরিমাণ খাদ্যশস্য নষ্ট করে, শস্যের গোলায় কি পরিমাণ শস্য নষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ অনুমান করিবার কোন উপায় নাই, পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য কোন চেষ্টাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু নষ্ট যে হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। ইহার জন্য আমাদের দেশের কৃষকদিগকে দায়ী করিলে চলিবে না। পোকা দ্বারা শস্য নষ্ট হওয়া কি ভাবে নিবারণ করিতে হইবে, কৃষকদিগকে তাহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু তাহাতেই হইবে না, তাহারা যাহাতে ঐ উপায় অবলম্বন করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষকদের গোলাঘরেও অনেক শস্য নষ্ট হয়। কিন্তু কি উপায়ে শস্য রক্ষা করিতে হইবে, তাহা জানিলেও আর্থিক সামর্থ্য না থাকিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করা কৃষকদের পক্ষে সহজ নয়। সমবায় সমিতিগুলি এ বিষয়ে কৃষকদিগকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে পারে। অবশ্য আরও নানা ভাবে শস্য নষ্ট হয়; সেগুলিও নিবারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে তরি-তরকারী, ফল ও মাছ উৎপন্ন হয়, ঠিক একথা বলা চলে না। তবে দেশের বহু লোক অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া এগুলি ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ, তরি-তরকারী, মাছ-মাংসের অভাব যে আমাদের কি পরিমাণ, এবার দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি ও পাইতেছি। সুতরাং খাদ্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে তরকারী, ফল, মাছ, দুধ, ডিম ইত্যাদি উৎপন্ন করিবারও ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। নতুবা সংরক্ষিত খাদ্যগুলি যদি সব বিদেশে চালান দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের লোকের জন্য কিছুই আর থাকিবে না। আমাদের দেশে মাছ শুকাইয়া রাখিবার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এই আদিম পদ্ধতির কোন সার্থকতা আর নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শুষ্ককরণ অন্যতম। যুদ্ধের সময়ে যে সকল খাদ্য সংরক্ষণ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যুদ্ধের পরে সেগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, এই শিল্পের কত অংশ যুদ্ধের পরে রক্ষা করা হইবে সে সম্বন্ধে সার জওলাপ্রসাদ বিজ্ঞানীদিগকেই নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যুদ্ধ উপলক্ষে এই যে নূতন শিল্পটি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা যুদ্ধের পরেও যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। যুদ্ধ উপলক্ষেও আমাদের শিল্প প্রচেষ্টা অতি সামান্যই উন্নতিলাভ করিয়াছে। যেটুকু শিল্পোন্নতি হইয়াছে তাহা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হইবে তো বটেই, তাছাড়া আরও নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠারও আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু সংরক্ষিত খাদ্য যাহাতে বিদেশে চালান হইয়া আমাদের খাদ্যাভাব আরও বৃদ্ধি না করে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক আয়োজন করিতে হইবে, কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কোন বাস্তব রূপ আজ পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

——

দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব

বাঙ্গালার 'স্মরণকালের মধ্যে শোচনীয়তম' দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব হইতে কেন্দ্রীয় সরকার, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এবং সমাজ কাহাকেও দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন (উডহেড কমিশন) রেহাই দেন নাই। প্রাক্ ওয়াভেল যুগের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। বৎসরের প্রথম দিকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা যখন ঘনাইয়া আসিতেছিল তখন বাঙ্গালার গভর্ণর ও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে এবং বিভিন্ন পরিচালক বিভাগ, গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার ছিল অভাব। দুর্ভিক্ষ যখন সত্যই দুয়ারে আসিয়া হানা দিল তখনও গভর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইল না। সমাজও দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। দুর্ভিক্ষকে মূলধন করিয়া অপরিমিত লাভ করা হইয়াছে। প্রাচুর্য্যের মধ্যে যাহারা বাস করিতেছিল, বহু লোকের অনাহারমৃত্যু সত্ত্বেও ঔদাসীন্য তাহাদের দূর হয় নাই। শাসনযন্ত্রের ন্যায় নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। 'পাইওনিয়র' পত্রিকায় নয়াদিল্লীস্থিত

বিশেষ সংবাদদাতা দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টের প্রথম অংশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই দুর্ভিক্ষের উল্লিখিত কারণগুলির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আরও জানা যায়, সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিশন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ যখন সত্য সত্যই দেখা দিয়াছিল তখনও সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার দ্বারা দুর্ভিক্ষের শোচনীয় পরিমাণকে নিবারণ করা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখিয়াছি? অন্নাভাবে যখন লোকসকল মরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও বাঙ্গালার তৎকালীন অসামরিক সরবরাহ-সচিব মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে আমরা দেখিয়াছি; আমরা দেখিয়াছি, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুর্ভিক্ষ ঘোষণার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি, বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এ সত্য যখন আর ধামা-চাপা দেওয়া গেল না, নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলী তখন হক-মন্ত্রিসভার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া নিজেরা সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত হইতে চাহিয়াছেন, বাজারে চাউল না পাওয়ার জন্য দায়ী করিয়াছেন বিরোধী দলের মন্ত্রীদিগকে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন খাদ্য-সচিব স্যার আজিজুল হক ভরসা দিয়াছিলেন, "বাঙ্গালায় এখনও চাউলের অভাব নাই,—সপ্তাহকালের মধ্যে চাউলের দর অনেক কমিবে।" প্রচার-সচিব স্যার সুলতান আহমদ খাদ্যাভাবকে বিরাট ভ্রান্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কলিকাতার রাজপথে মৃতদেহ পড়িয়া থাকাকে মিঃ কন্‌র্যান্ স্মিথ নাটকীয় অতিরঞ্জন বলিয়াই উড়াইয়া দিলেন। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষকে এই ভাবে লঘু করিবার চেষ্টাকে শুধু অব্যবস্থিতচিত্ততা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি? কেন তাঁহারা এইরূপ লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়া বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষকে ভীষণ হইতেও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কি সত্যই বিবেচনার বিষয় নয়? ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে চাহিলেন, তখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন কেন? বস্তুতঃ ঐ সময়ই বাঙ্গালার অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছিল যে, বাহির হইতে খাদ্য আনিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসেই বুঝা গিয়াছিল যে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রশমনে অসমর্থ হইয়াছেন। সেই সময় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদিগকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কেন গ্রহণ করেন নাই? যথাসময়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে চাউল ও গম চালান দিবার ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট করেন নাই। আরও অনেক পূর্ব্বে বৃহত্তর কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা কি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল না? খাদ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে মূল পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অযথা অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠন করাও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের একটা গুরুতর ভ্রান্তি। বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যেমন অসমর্থ হইয়াছেন, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টও তেমনি দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, কমিশন বন্যা-নীতির ফলে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পণ্য-চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় এবং সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের ধীবর প্রভৃতি শ্রেণীর বিশেষ কষ্ট হওয়ার কথাও আলোচনা করিয়াছেন। বন্যা-নীতিকে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের জন্য তাঁহারা কতখানি দায়ী করিয়াছেন এবং বন্যা-নীতি গ্রহণ করার সত্যই কোন প্রয়োজন ছিল কি না, সে সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত রিপোর্ট প্রকাশিত হইলেই আমরা জানিতে পারিব।

সরবরাহ এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই এবং কতগুলি ক্ষেত্রে ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাদ্য-শস্য সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট নিয়োগ অন্যতম একটি ভ্রান্তি। বস্তুতঃ সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ যদি খাদ্যশস্য ক্রয়ের ব্যবস্থা হইত এবং বড় বড় উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদিগকে যদি সমঝাইয়া দেওয়া হইত যে, তাহারা সরবরাহ বন্ধ করিলে সরকার তাহাদের সমস্ত খাদ্যশস্য গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে বাজারে খাদ্যশস্যের অভাব হইত না, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। খাদ্যশস্যের সরবরাহ যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বণ্টন করা হয় নাই। কণ্ট্রোল দোকান সম্বন্ধে তো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই আছে। বস্তুত: দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থায় খাদ্যশস্যের যে সরবরাহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চলে বণ্টন করা হয় নাই বলিয়াই কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেও অযথা বিলম্ব হইয়াছে। অর্থাভাবের অজুহাতে সাহায্যদান পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়াও সাহায্য দেওয়া যে উচিত ছিল, কমিশনের এই অভিমতের সহিত সকলেই একমত হইবেন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনানুযায়ী না হওয়ায় ভয় এবং লোভ বাঙ্গালার খাদ্যপরিস্থিতিকে আরও ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর দুর্নীতির বাতাসে অতিলোভের যে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, দুর্ভিক্ষ কমিশনের মতে তাহাতে ১৫ লক্ষ লোক পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। কি কি প্রমাণ মূলে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা ১৫ লক্ষ বলিয়া কমিশন সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে জানিতে পারিব। কিন্তু রিপোর্টে বলা হইয়াছে, অতিলোভী ব্যবসায়ীরা শুধু চাউলের ব্যবসা হইতেই ১৫০ কোটি টাকা লাভ করিয়াছিল। ব্যবসায়ীদিগকে প্রতি হাজার টাকা অতিলাভ যোগাইবার জন্য এক জন করিয়া লোককে অনাহারে প্রাণ দিতে হইয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ীদের অতিলোভ বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের জন্য যে কতখানি দায়ী তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতার দেশ এই বাঙ্গালায় ব্যবসায়ীরা 'নাল্পে সুখমস্তি' উপনিষদের এই বাণী উপলব্ধি করিয়া, 'ভূমৈব সুখম্' এই বাণী সার্থক করিবার জন্য অর্থাৎ অত্যধিক লাভ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। সরকারী অব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ীদের অতিলোভ মিলিয়া বাঙ্গালার এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া গেল, কিন্তু যাহারা অর্দ্ধমৃত হইয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সুব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

২৪শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ [২য় সংখ্যা

স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাঙ্গলার যে আন্দোলন পরবর্ত্তী কালে নিখিল-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে,—সেই স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা লইয়া আলোচনা খুব অল্পই হইয়াছে। চল্লিশ বৎসরের জাতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ব্যবধান হইতে যদি আমরা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিব, স্বদেশী আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নহে,—বাঙ্গালীর আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইবার আন্দোলন। দীর্ঘ এক শতাব্দীর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন,—ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতির ভাবধারা ; মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত নবীন সাহিত্য,—শতাব্দীর শেষভাগে জমিয়া ভরিয়া উঠিল এবং এই সমগ্র যুগের ভাবধারাকে গ্রাস করিয়া—নব্য ভারতের দুই বিগ্রহ বাঙ্গলা দেশে দেখা দিলেন—বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী অদ্বৈতবাদী—বেদান্ত দর্শনকে পারমার্থিকতার পরিবর্ত্তে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করিয়া স্বদেশবাসীকে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও সামাজিক-হীনতা হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাব-রস-পুষ্ট কবি, ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আধুনিক যুগোপযোগী সংস্কারের পক্ষপাতী। উভয়ের মধ্যে চিন্তা ও চরিত্রের পার্থক্য প্রচুর, দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত,—পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, জাতীয় ভাবধারার বাহক—এবং তাঁহার দীর্ঘজীবনে তাঁহার স্বাধীন চিন্তা স্বচ্ছন্দে মত হইতে মতান্তরে—পথ হইতে পথান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিবার স্থান ইহা নহে। বহু পার্থক্য সত্ত্বেও যে একই সাধনা তাঁহারা যুগধর্ম্মের নির্দ্দেশে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইল প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের সাধনা। ভারতীয় সভ্যতা ও সং স্কৃতির উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভাবধারার আদান-প্রদান, আধুনিক বিজ্ঞানকে বরণ, পাশ্চাত্যের বেগবান্ সামাজিক আদর্শবাদের প্লাবনে আত্মহারা না হইয়া, পরানুকরণপ্রিয় না হইয়াও উহাকে বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ ছিল উভয়েরই আদর্শ। স্বদেশী আন্দোলনের উপর এই দুই জীবন্ত প্রতিভার প্রভাব সর্ব্বাধিক।

সমস্ত দেশের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ ভঙ্গ করায় প্রতিক্রিয়ামুখে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিল, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই রকম একটা জাতীয় আন্দোলনের জন্য বাঙ্গলা দেশ বিগত শতাব্দীর শেষ দু'-দশক হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বিকৃতির পণ্ডশ্রমে বিভ্রান্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজক্রমে পাশ্চাত্য উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকিতেছিল। মাৎসিনী, গারিবল্ডী, বেনিতো ইতালীর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবধারা ইয়োরোপ-প্রত্যাগত নব্যবাঙ্গালী স্বদেশে লইয়া আসিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার বুয়োর যুদ্ধে মুষ্টিমেয় ঔপনিবেশিকের হস্তে প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব্ব লাঞ্ছনা—বিজয়ী হইয়াও বৃটেনের দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বায়ত্তশাসন দান ; রুশ-জাপান যুদ্ধে এশিয়াবাসীর হস্তে ইয়োরোপের প্রথম পরাজয় ; পরাধীন এবং শ্বেতাঙ্গ-প্রভাবিত সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে এক নূতন আশার

সঞ্চার করিল। জাতীয় মুক্তির একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা—সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন অংশকে দেশে দেশে আলোড়িত করিতে লাগিল।

এই আলোড়নের অন্যতম কেন্দ্র হইল, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা নগরী। সে কালের সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজেরা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি অত্যন্ত উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করিত। পাঙ্খাকুলী ও চা'বাগানের কুলীর শ্বেতাঙ্গ-পদস্পর্শে প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু—এবং বিচারে শ্বেতাঙ্গের হয় মুক্তি, নয় সামান্য জরিমানা, রেলগাড়ীতে পথে ঘাটে ইংরেজ ও গোরার গুণ্ডামীর সংবাদ সে কালের সংবাদ-পত্রে খুব বেশী আলোচিত হইত—শিক্ষিত যুবকেরাও আহত আত্মাভিমান লইয়া উহা আলোচনা করিতেন। বিদেশী ঘুসির বদলে স্বদেশী কিল ফিরাইয়া দিবার জন্য কলিকাতার তরুণ ব্যারিষ্টারেরা আখড়া তৈয়ারী করিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহদাত্রী ছিলেন বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। ঐ সকল আখড়ার যুবকদিগকে তিনি বলিতেন—If you see oppression before your eyes and don't try to prevent it, you betray your duty"—তোমার চক্ষুর সম্মুখে অত্যাচার দেখিয়াও যদি প্রতিবিধানের চেষ্টা না কর, তাহা হইলে তুমি কর্ত্তব্যপালন না করিবার অপরাধে অপরাধী।

ইহা ছাড়াও সরকারী উচ্চপদ, ইংরেজ ও ভারতীয়ের বেতন বৈষম্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি লইয়া শিক্ষিত ভারতবাসীর ক্ষোভ বাড়িতেছিল, নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে বাৎসরিক যথানিয়মে এই 'আবেদন নিবেদনের থালি' রাজসরকারে পেশ করা হইত। নিরুপদ্রব বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের মার্ত্তণ্ড তখন মধ্যাহ্ন-গগনে—নখদন্তহীন নিরস্ত্র ভারতবাসীর কাতর অনুনয় শাসকশ্রেণীর শুনিবার মত মানসিক অবস্থা নহে। বরং অনেকে অকৃতজ্ঞ ক্ষুদ্রের স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

অতএব বারুদ প্রস্তুত ছিল—কেবল দীপশলাকার অভাব। লর্ড কার্জ্জন সেই শলাকা নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দাবানলের মত সে আগুন সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। স্বদেশী ও বয়কট হইল নূতন আন্দোলনের বাণী। বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের উৎসাহ কেবল শিল্পবাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিল না। ছাত্র-সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিল—বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বনিম্ন শিক্ষায়তন পর্য্যন্ত 'গোলাম-খানা'রূপে অভিহিত হইল। স্কুল-কলেজের শিক্ষা দাস তৈয়ারীর শিক্ষা, অতএব জাতীয় বিদ্যালয় চাহি। বিদেশী শিক্ষা ও বিদেশী-চালিত শিক্ষায়তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন বৃটিশ শাসকদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—সংবাদপত্রে জাতীয় ভাব প্রচার ও বিদেশী শাসনের তীব্র সমালোচনা দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইলেন।

১৯০৫—০৮; এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত ও সচেতন অংশে ইহা এক অভিনব সামাজিক আলোড়ন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর উনবিংশ শতাব্দীর জমীদার ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের রক্ষণশীলতা শিথিল হইল, গণ্ডীবদ্ধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অনেক কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক নূতন 'স্বদেশী সমাজের' উদ্বোধনের সূচনা হইল। সরকারী খেতাব-ধারী ও সরকারী চাকুরিয়ারা এত কাল যে মর্য্যাদা ভোগ করিতেন, তাহা বিলুপ্ত হইল। ইঁহারা দেশবাসীর ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইয়া উঠিলেন। জাতীয় নেতা, কর্ম্মী ও শিল্পবাণিজ্যে অগ্রসর ব্যক্তিরা দেশবাসীর অভিনন্দন লাভ করিতে লাগিলেন। এক নবীন দেশাত্মবোধ, জাতি-অভিমান বাঙ্গালী-চরিত্রে এক আমূল পরিবর্ত্তন আনিল। বঙ্কিম-সাহিত্যে আমরা নব জাতীয়তাবাদ নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম,—বিবেকানন্দের কণ্ঠে ভারতমাতার জন্য আত্মোৎসর্গের আবেদন বাঙ্গালী যুবককে ঘরছাড়া করিল। স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র বাঙ্গালীর আন্দোলন নহে—শিক্ষিত সমাজের নেতৃত্বে বিশেষ ভাবে স্বাধীন উপজীবিকাসম্পন্ন আইনব্যবসায়ীদের নেতৃত্বে, ইহা বাঙ্গলার উচ্চশ্রেণীতে আবদ্ধ রহিল। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য বাহুবিস্তার করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। কতক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্যে, কতক রাজশক্তির ভেদনীতির কৌশলে মুসলমানেরা বিমুখ হইল। তথাপি এই আন্দোলন বাঙ্গলার সীমা অতিক্রম করিয়া মান্দ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে প্রতিধ্বনি তুলিল। এই আন্দোলনের নেতারা জাতীয় উচ্ছ্বাসের দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ লইয়া কংগ্রেসে প্রবেশ করিলেন—নিরীহ মিষ্টভাষী, মৃদুস্বভাব মডারেটদের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।

বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও স্বদেশী বস্ত্রের সমাদর—ভাবাবেগবর্জ্জিত দৃষ্টিতে পেলে অর্থ-নৈতিক কার্য্যক্রম। বিদেশী বস্ত্র, লবণ বয়কট করিতে গিয়া, ছাত্রসমাজ কিছুটা বলপ্রয়োগ করে, গভর্ণমেন্ট উত্তরে পুলিশী বলপ্রয়োগ করিলেন। এই সরকারী দমন-নীতির সম্মুখীন হইবার মত কোন কার্য্যক্রম স্বদেশী নেতারা উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বিপিনচন্দ্র যদিও এই কালে সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে Passive resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, তথাপি কোন নেতা ব্যাপক ভাবে উহা বাস্তব আন্দোলনে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী কার্য্যতঃ দক্ষিণ-আফ্রিকায় নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন

করিতেছিলেন,—কিন্তু বাঙ্গলার আন্দোলনে তাহা গৃহীত হয় নাই। কাজেই প্রচুর ভাবাবেগবহুল অথচ রাজনৈতিক কর্ম্মনির্দ্দেশহীন এই আন্দোলন রাজশক্তির বিরোধিতায়, পুনরুত্থানবাদী হিন্দু আন্দোলনরূপে বিবর্ত্তিত হইল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এই আন্দোলনের যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের মধ্যে এক হীরেন্দ্রনাথ ব্যতীত কেহই হিন্দু নহেন। কেহ ব্রাহ্ম, কেহ ব্রাহ্ম-সন্তান, কেহ বা গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের প্রেরণায় ব্রাহ্ম হইতে সদ্য বৈষ্ণব হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব সকলেরই বিশিষ্ট ধর্ম্মসাধনা ও মত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডীর মধ্য হইতে "স্বদেশী সমাজে" আসিলেন, বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইলেন, ব্রাহ্ম-সন্তান অরবিন্দ বেদান্তবাদী হইলেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম হতে ধর্ম্মান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া রোমান ক্যাথলিক বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব বর্ণাশ্রমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সকল নেতার রচনা ও বক্তৃতায় রাজনীতি ধর্ম্মোন্মাদনায় পর্য্যবসিত হইল। বিগত শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দুরা যে ভাবে হিন্দুত্ব ও হিন্দুয়ানীর মধ্যে সবই মন্দ দেখিতেন, স্বদেশী যুগের হিন্দুরা তেমনি হিন্দুয়ানীর গোঁড়া হইয়া উঠিলেন, হাঁচি, টিক্‌টিকি হইতে উপবীত ও শিখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইতে লাগিল। গীতাপাঠ ও ব্রহ্মচর্য্যের ধুম পড়িয়া গেল। রাজনৈতিক সভায় আর্য্যধর্ম্ম ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মহিমা কীর্ত্তন চলিল। গীতা ও চণ্ডীর মধ্যে আমরা ধর্ম্মযুদ্ধ ও অসুর নিপাতের বাণীতে অনুপ্রাণিত হইলাম। এই পুনরুত্থানবাদী হিন্দু আন্দোলনের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের গঙ্গাস্নান ও রাখীবন্ধনের ব্যবস্থা দান, বিপিনচন্দ্র-প্রমুখ নেতাদের শিবাজীর ইষ্টদেবী ভবানী-পূজার আয়োজন—বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন হইয়াও—ঘটনার ও রাজশক্তির চাপে একটা আধ্যাত্মিক আন্দোলন হইয়া উঠিল।

নেতারা যখন পথনির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না, এবং দমননীতির উগ্রতায় একে একে আন্দোলন হইতে সরিয়া গিয়া অধ্যাত্ম-সাধনার কথা বলিতে লাগিলেন, তখন অধীর যুবকশক্তি তলে তলে প্রলয় কাণ্ড বাধাইবার জন্য প্রস্তুত হইল—ইতালীর কার্বোনারী দলের অনুকরণে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল—বোমা পিস্তল লইয়া শাসক-শ্রেণীকে হত্যার ভীতি দেখাইয়া দেশ স্বাধীন করিবার দুঃসাহসী সঙ্কল্প অন্ধকার পথে জীবনমরণ-তুচ্ছকারী অভিসারে বাহির হইল। ১৯০৮এর বিখ্যাত আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ইহার আরম্ভ এবং ১৯৩০এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর এই অধ্যায়ের শেষ। বাঙ্গলার বৈপ্লবিক গুপ্ত আন্দোলনের এই ইতিহাস এক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

স্বদেশী নেতাদের ভীরুতা এবং শেষরক্ষা করিবার অক্ষমতা এক দিকে,—অন্য দিকে তীব্র দমননীতি এবং মডারেটগণের জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা, এই সকল মিলিয়া বাঙ্গলার যুবশক্তিকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। নব জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ তাহাদিগকে সহজেই গুপ্ত আন্দোলনের দিকে আকর্ষণ করিল, আর একটা অংশকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্মের দিকে লইয়া গেল।

স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় ঐক্যের বাণী ছিল, হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথাও ছিল। কিন্তু পুনরুত্থানবাদী হিন্দুত্ব স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হওয়ায়, উহা দ্বারা হিন্দুভাবাবেগ চরিতার্থ হইলেও মুসলমানদের মনে আর্য্য-বিভূতি ঘোষণা কোন রেখাপাত করে নাই। বহু বর্ষ পরে খিলাফৎ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী মুসলিম ধর্ম্মের ভাবাবেগ জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে বৃটিশ রাজশক্তি ভেদনীতির চাতুর্য্যে মুসলমানদিগকে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ করিয়া ১৯২০-২১এ গান্ধীজী সেই শক্তিকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বহু শতাব্দীর চেষ্টায় ইয়োরোপ তাহার রাজনীতিকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করিয়াছে, লৌকিক ব্যাপারে পারলৌকিক প্রশ্ন জড়িত করিবার অভ্যাস হইতে ইয়োরোপ মুক্ত হইলেও,—আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় উন্নতির জন্য আর্য্য জাতির অতীত মহিমা দ্বারা ভাবাবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে অসহযোগ আন্দোলনেও গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক জীবন ও সত্যাগ্রহের নৈতিক আদর্শের মিলিত প্রভাব রাজনৈতিক আন্দোলনে দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসে, রাজনৈতিক সভায়,—মৌলানা ও স্বামীজীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ম্মের ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্ত্তী কালে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে,—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মাদনা অভিভূত করিয়াছে। মুসলিম লীগ ও হিন্দু-মহাসভা এই দুই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য। বহুতর ধর্ম্মমত এবং উপসম্প্রদায়-প্লাবিত ভারতে—ধর্ম্মকে রাজনীতি হইতে পৃথক্ করা কঠিন। এখন পর্য্যন্ত আমাদের নেতা গান্ধীজী উপবাসের আধ্যাত্মিক শক্তি, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া দেশবাসীকে বিমূঢ় ও বিহ্বল করিয়া ফেলেন। ইন্দ্রিয়-পীড়ন, নিরামিষ আহার, বিবিধ আধ্যাত্মিক ব্যায়াম গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে অনেক দেশকর্ম্মী অনুকরণ করেন। ধর্ম্মাচরণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং অনেকাংশে সামাজিকও বটে। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত উহার মিলন

মিশ্রণের ফল শুভ হয় নাই। পরাধীন জাতির মধ্যে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ অথবা মৌখিক আনুগত্য,—আত্মাবমাননা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অথবা হীনতা ভুলিবার এক প্রধান অবলম্বন। সম্ভবতঃ এই কারণেই স্বদেশী যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি—যেখানে চাপে পড়িয়া অনেকেই আধ্যাত্মিকতার পথে রাজনীতি হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। কেবল কংগ্রেসে নহে, মুসলিম লীগে ইহা অতিমাত্রায় অধিক প্রকট। স্বদেশকে দেবী মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া ভাবানন্দে বিগলিত হওয়া, আর "বিপন্ন ইসলাম"কে তাহার অতীত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখা—একই মানসিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত; এবং এ দুই-ই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল নহে।

ধর্ম্ম নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিবলে টিকিয়া আছে। ধর্ম্মের নামে পরস্পরের প্রতি বৈরতা প্রকাশকে ধর্ম্মানুরাগ বলিয়া বা ধর্ম্মরক্ষার, প্রতিষ্ঠার বা বিস্তারের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে মাতামাতি করিলে চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি কৌশলে এড়াইয়া যাইবার উপায় হিসাবে ধর্ম্মকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অপকৌশল প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়াছে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ-মনকে ইহা প্রচুর বিদ্বেষ ও অন্ধ-গোঁড়ামী দিয়া অভিভূত করিয়াছে। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ধর্ম্মকে যথাস্থানে রাখিয়া, জনসাধারণের লৌকিক স্বার্থ ও অধিকারের দিক্ হইতে জাতীয় সমস্যা সমাধানের যাঁহারা পক্ষপাতী—তাঁহারা এ পর্য্যন্ত, ধর্ম্মের আবরণে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তিগুলিকে ব্যর্থ করিতে পারেন নাই। বৈদেশিক শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহও ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর পুনরুত্থানবাদী ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল স্বাভাবিক কারণে; কোন নেতা বা নেতৃবৃন্দ উহা সৃষ্টি করেন নাই; বরং তাঁহারাই উহা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে সচেতন ও সক্রিয় ভাবে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মানুরাগকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধের নৈতিক শক্তির কথা শুনিল—স্বরাজ রামরাজ্য, তুর্কী-সুলতানকে খলিফার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ইস্‌লামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অতএব হিন্দু-মুসলমান এক হও। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ভাটার মুখে দেখা গেল, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল। গান্ধীজী তিন সপ্তাহ উপবাস করিয়া ধর্ম্মান্দোলন-সঞ্জাত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঠেকাইতে পারিলেন না। সমস্ত বিংশ-দশক উত্তর-ভারতের বৃহৎ নগরগুলি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অশান্তি-সঙ্কুল হইয়া উঠিল,—জাতীয় স্বাধীনতা অপেক্ষা আরতি, নামাজ, মসজিদের সম্মুখে বাদ্য প্রভৃতিই মুখ্য হইয়া উঠিল। এই সুযোগে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের উপর নির্ভরশীল দালালেরা আবার রাজনীতির আসরে জাঁকিয়া বসিল। আজ পর্য্যন্ত আমরা এই দুর্ব্বুদ্ধির জের টানিয়া চলিয়াছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্য্যস্ত পৃথিবী পুনরায় আত্মস্থ হইতে চলিয়াছে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা-কামীরা আন্তর্জ্জাতিক মিলনের মধ্যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল মানব-স্বাধীনতার মধ্যে জাতীয়-স্বাধীনতা লাভের কামনায় অধীর। এই অবস্থার মধ্যে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায় কেন্দ্র-বিশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার প্রস্তাবও কড়া সুরে শুনান হইতেছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই বিহ্বল। গত মহাযুদ্ধে পরাজিত সাম্রাজ্যহীন তুর্কী-জাতি কামাল আতা-তুর্কের নেতৃত্বে—ধর্ম্ম হইতে রাষ্ট্রকে পৃথক্ করিয়াই, আজ শক্তিমান্ জাতিরূপে বিশ্বের দরবারে আসন করিয়া লইয়াছে,—ভারতেও আমরা তেমনি নেতৃত্বের প্রত্যাশা করিতেছি, যাহা ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে পৃথক্ করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যা সমাধান করিবে।

—বৈশাখের শাখে—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মধ্যাহ্নের মরুবিহঙ্গম
নিঃশব্দ পাখায় করি অতিক্রম
লোহিতসাগর আর সৈন্ধব-সঙ্গম,
ডানা মুড়ি' বসিল আমার বৈশাখের শাখে।
সেথা আজ—
শস্যহারা প্রান্তর উষর;
সেথায় পারদ-রৌদ্রে আকাশ ধূসর।
বিদেশী বিহঙ্গ আন্‌মনে
চঞ্চু ঘসে শাখে,
বিস্ময়-বিহ্বল বনে
পাতাটি না নড়ে
পাখীটি না ডাকে।
ম্লান চোখে শ্রান্তি সুনিবিড়,
পাখী কি বাঁধিবে হেথা নীড়?
চাহে উর্দ্ধপানে,—
পারদ-ধূসর সেথা আকাশ-দর্পণে
অনাগত শুক্লা রজনীর
আধ চাঁদ-মুখছায়া ভাসে যেন মনে।
তরুতলে চায়,—
সেথা ছায়া পাতি দাহ ঘুম যায়।
দক্ষিণে ও বামে—শস্যহারা মাঠ,
নিতান্ত নহে ত অনুর্ব্বরা কঙ্কর প্রখরা,
খড় কুটা শুষ্ক তৃণ সঞ্চয়ের নানা উঞ্ছে ভরা।
কলভাষা আভাসিয়া আসে
শুষ্ক চঞ্চুপুটে,
শ্রান্ত আঁখি লুব্ধ হ'য়ে উঠে।
সংগোপনে বনলতা গুঞ্জন দুলায়—
অজানা বিহঙ্গ হেথা বাঁধিবে কুলায়।
অকস্মাৎ এল ডাক!
ছাড়িয়া বৈশাখ,
বারেক বিদ্যুৎকণ্ঠে ছেদি দিগন্তর,
মেলি কালবৈশাখীর পাখা,
ভাঙি তার ক্ষণপূর্ব্ব আশ্রয়ের শাখা
মহাবিহঙ্গম যায় উড়ে
উধাও সুদূরে।

উড়ে গেছে মরুবিহঙ্গম,—
কোন্ শ্যাম উপকূল,
সে কোন্ প্রশান্ত মহাসাগরসঙ্গম!
ভগ্নশাখ বৈশাখের কাঁকে
নূতন আকাশ মেলে জ্যোৎস্নাপাণ্ডু আঁখি,
থেকে থেকে বহে মেঠো হাওয়া,
ডেকে ডেকে ওঠে বনপাখী।
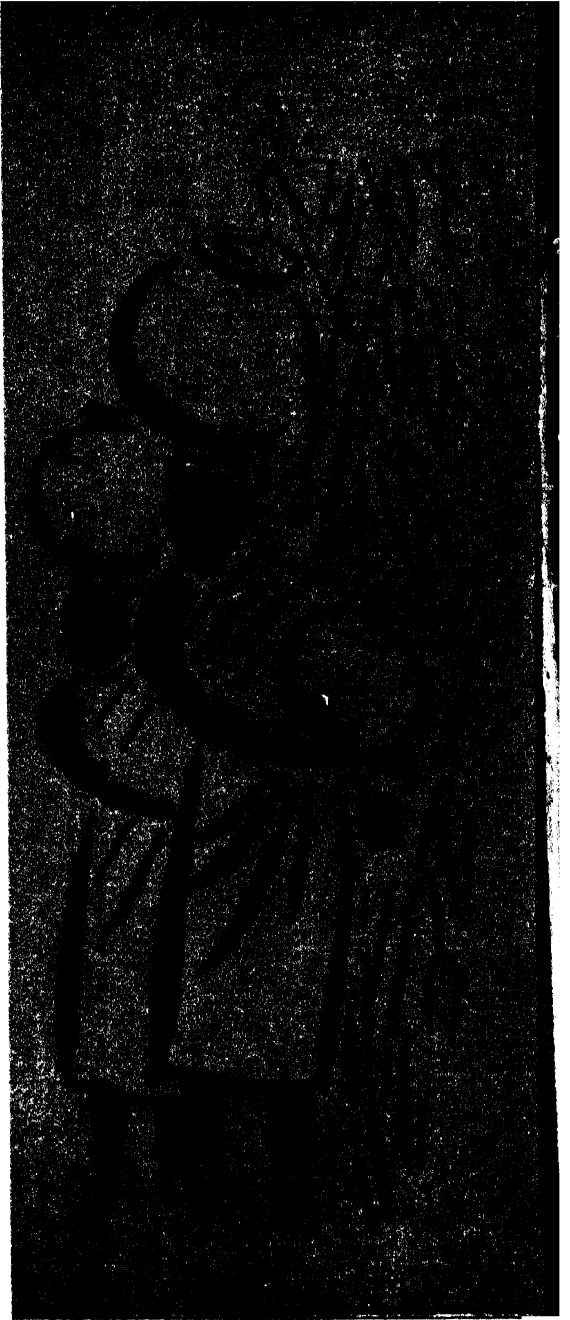
শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

অচিন্ত্যকুমার
সেনগুপ্ত

চড়ুই-পাখিদের দেশে একটা ময়ূর উড়ে এসেছে।

'ইং লেউ ইং—'

সেই পরিচিত স্বর। সেই পরিচিত ভারি পায়ের শব্দ। কিন্তু তেমন যেন আর সাড়া জাগায় না। আগে-আগে ভয় পেত সবাই, এখানে-ওখানে গা-ঢাকা দিত। এখন দিব্যি সবাই পথের উপর এসে দাঁড়ায়, পট্টাপট্টি তাকায় মুখের দিকে। আগে কেমন সম্ভ্রমের চোখে দেখত, এখন যেন কৌতূহলের, হয়ত বা কৃপার চোখে দেখছে। হল কি হঠাৎ? সে যেন সেই ডাকসাইটে ডাকাত নয়, ফকির মুসাফির।

মামুদ খাঁ হাসে মনে-মনে। হাতে লাঠি, জামার নিচে গায়ের চামড়ায় গরম হয়ে আছে ভোজালি।

'ইং লেউ ইং—'

কেউ যেন তাকিয়েও দেখে না। দেখলেও হাসে। অবজ্ঞার হাসি।

লোকজন অনেক বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু বন্দর-বাজার তেমনিই আছে নদীর ধার ঘেঁসে। সেই সব হোগলাপাতার চটি, বসেছে মুদি-মনোহারি বাজে-মালের দোকান। আছে সেই বড়-বড় বাহালীর দোকান, পেঁয়াজ-রশুন মরিচ-তেজপাতা টাল করা। সেই কাঠ-কাঠরার আড়ৎ। চলছে সেই দর্জির কল, কিস্তিটুপি আর দোলমান সেলাই করছে। লোহার-কামারের দোকানে নেহাইয়ের ঘা পড়ছে হাতুড়ির। হাসিল-ঘরে রসিদ দিয়ে গরু আর মোষ বিক্রি হচ্ছে। নৌকো এসেছে কাঁচামালে বোঝাই হয়ে, গুড়ের হাঁড়ি, তামাক আর ধান-চালের বেসাত নিয়ে। খেয়ার পাটনী তোলা তুলে নিচ্ছে। গাছের ছায়ায় কামাতে বসেছে নাপিতেরা। সবই সেই আগের মত। সেই আগের মতই বিকেল।

তবু, যেন হাওয়া শুঁকে টের পাওয়া যায়, দিন কি রকম বদলে গিয়েছে।

হাঁা, নতুন বাঁশের ছাউনি হয়েছে কতগুলি।

'কি এই সব?' এক জনকে জিগ্‌গেস করলে মামুদ খাঁ।

লোকটা বললে, 'এফ-আর-ই।'

মামুদ খাঁ হাঁ হয়ে রইল।

'হাসপাতাল। দুর্ভিক্ষের হাসপাতাল।'

হাঁা, বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষের কথা ভাসা-ভাসা শুনেছে মামুদ খাঁ। পাথার এক ঝাপটায় অনেক লোক উজাড় হয়ে গিয়েছে। অনেক লোক চলে এসেছে কঙ্কালের সীমানায়। তাদের কাছে আসেনি মামুদ খাঁ। এই বাজারেই যারা মুনাফা মেরে মোটা হচ্ছে, এসেছে তাদের কাছে।

'এই মেরা রূপেয়া লেউ।' মামুদ খাঁ পাকড়েছে ননীলালকে।

ননীলাল যেন একটুও ভয় পায় না। যেন খুব অবাক্ হয়েছে এমনি ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকায়। বোধ হয় মুচকে মুচকে একটু হাসেও।

'হাসতা কিঁউ? মেরা রূপেয়া লেউ।'

ননীলাল তবু ভড়কায় না এক-চুল। আগে-আগে পালাত আনাচ-কানাচ দেখে। দিনের বেলায় কোন দিন মুখোমুখি হবার সাহস পায়নি। আজ দিব্যি হাতের নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়ায়, দাঁড়ায় বুক ফুলিয়ে।

বলে, 'টাকা কিসের?'

টাকা কিসের! মামুদ খাঁর বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ভাবে স্পর্ধা কি লোকটার! মামুদ খাঁর হাতের লাঠি কি বেদখল হয়ে গেছে? জং ধরেছে কি তার ইস্পাতের ভোজালিতে?

পাঁচ বছর ফাটকে ছিল মামুদ খাঁ। তার লাঠির গাঁটে পাথরের মজবুতি ছিল, ভোজালির মুখে ছিল লক্‌লকে আগুন। জেল থেকে বেরিয়ে মামুদ খাঁ কিছু বে-তাগদ হয়েছে, লাঠিতে যেন আর সেই লা[illegible] নেই, ভোজালিতে নেই আর সেই রাগ-থেকেই-রক্তের ভোজবাজি। নইলে সেদিনের ননীলাল কি না বলে, টাকা কিসের!

'তুম শালা দিললাগি করছ হামার সাথ! হামি আদাল[illegible] যাব।'

ননীলাল হেসে ওঠে গলা ছেড়ে। বলে, 'সেদিন আর নেই, [illegible] সাহেব।'

সত্যি, সেদিন আর নাই। নইলে মামুদ খাঁ আদালতের রাস্তা বাতলায়! কে না জানে, কত দিন তামাদি হয়ে গেছে তা[illegible] টাকার দাবি-দাওয়া। তবু কি না আজ সে না-মরদের মত আদালতে[illegible] নাম করে। নালিশবন্দ হয়ে জবানবন্দি করবে! ছেঁচড়া উকিল মোক্তার টন্নি-মুহুরির তাঁবেদার হবে! [illegible] বদলেছে বই কি।

তবে কি ননীলাল উপস্থিত দুর্ভিক্ষের [illegible] পাড়ছে? ননীলা[illegible] যেন না বেহুদা বদমায়েসি করে! [illegible] 'ভাসানে' ব্যবসা ছিল শহর থেকে বাজে মাল কিনে এনে নৌকো করে গাঁয়ের হাটে-হা[illegible] বিক্রি করত, তার আলামাল বেড়েছে বই কমেনি একটুও। আ[illegible] মাটির একটা হাঁড়ি বেচে সেই হাঁড়ির মাপে চাল নিত, এখন এ[illegible] হাঁড়ি চাল দিয়ে প্রায় এক হাঁড়িই টাকা নিয়ে যায়। তার এখ[illegible] কালাও কারবার।

দেনার টাকা না হলে ডাকাবুকো হয়ে দাঁড়ায় অমন মুখোমুখি!

কিন্তু মামুদ খাঁও একেবারে মরে যায়নি।

আরো দু'চারজন জুটেছে এসে ক্রমে-ক্রমে। মোগলাই কাবা, ঘুন্সি-দেয়া পায়জামা, জরিদার মখমলের ওয়েষ্টকোট অনেক দিন পর এ অঞ্চলে একটা সোর তুলে দিয়েছে। যেন বিদেশ থেকে বহুরূপী এসেছে সে। যেন কেউ তাকে চেনে না, দেখেনি কোনো দিন।

এই যে নবী-নওয়াজ। জমিদারের তশিলদার। একবার তবিল ভেঙেছিল বলে গ্রেপ্তারি বেরিয়েছিল তার নামে। মামুদ খাঁর থেকে চড়া সুদে দু'শো টাকা ধার নিয়ে দু'বছরে মোটে কুড়ি টাকা শোধ করেছিল সে।

'এই মেরা রুপেয়া দেউ।'

প্যাঁকাটে চেহারা, দাড়ি বের করে দস্তুরমত হাসে নবী-নওয়াজ। বলে, 'টাকা গেছে দেশান্তরী হয়ে।'

'তুম শালা তো আছ হামার কবজার ভিতর—' মামুদ খাঁ তেড়ে আসে।

'ও দিন-কাল আর নেই, খাঁ সাহেব। ও সব টেণ্ডাই-মেণ্ডাই আর চলবে না।'

আশ্চর্য, কেন কে জানে, মামুদ খাঁ গুটিয়ে যায় আচমকা। আগে কেমন টগে-টগে থেকেও নবী-নওয়াজকে ধরতে পারত না, এখন চোখের সামনে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পাচ্ছে না বাগাতে।

'আইন-ফরমান সব বদলে গিয়েছে। সুদখোরদের ভাল ওষুধ বেরিয়েছে এবার।'

আইন-ফরমানকে মামুদ খাঁ কবে তোয়াক্কা করেছে শুনি? আজও তাতে তার টনক নড়ত না, কিন্তু আজ সে চমকাচ্ছে ননীলালের সাহসে, নবী-নওয়াজের দাড়ি-বের-করা নিশ্চিন্ত হাসিতে। বাজার-বন্দর গোলা-আড়ত, সব তেমনি আছে, কিন্তু, কি আশ্চর্য, সব থেকেও যেন কি নেই।

নেই আর তার পিছনের জোর, জনতার সম্মতি।

কে বলে জোর নেই? জবরদার হাতে মামুদ খাঁ নবী-নওয়াজের হাত চেপে ধরল। টানতে-টানতে নিয়ে চলল সামনের দর্জির দোকানে।

তবু নবী-নওয়াজ হাসে। যেন দর্জি-তাঁতি, মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমোর, জেলে-মুচি, সব আজ তারা এক দল।

দর্জি কেতাব আলি। অনেক দিনের মহব্বতি তার সঙ্গে। এখানে বসে মামুদ খাঁর অনেক লেন-দেন হয়েছে, অনেক বুঝ-সমুঝ। হাতচিঠায় পড়েছে অনেক টিপছাপ। কেতাব আলিও তার কাছ থেকে ধার খেয়েছে, কিন্তু বেইমানি করে ঠকায়নি কোনো দিন। কত জনের জন্তে ফেলজামিন দাঁড়িয়েছে।

'পাল্লা বদল হয়ে গিয়েছে, খাঁ সাহেব। দেশে মহাজনী আইন এসেছে। এসেছে নতুন দিন, ফিরিয়ে দেবার দিন। অনেক দিন এ অঞ্চলে আসনি বুঝি? তোমার দোস্ত-দোসরদের সঙ্গে মুলাকাত হয়নি? তারা তো কবে এ মুল্লুক থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে।'

উঁহু, কি করে জানবে? দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করে কয়েদ হয়েছিল তার। জেল থেকে বেরিয়ে সটান চলে এসেছে সে। এক ঘরওয়ালীর কাছে তার জামা-মেরজাই জুতো পয়জার ছিল, তাই চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। সব ছিঁড়ে-কেড়ে গেছে, কন্‌কনে শীতের হাওয়া ঢুকছে এসে হাড়ের মধ্যে।

কিন্তু আইনটা কি?

হাতের লাঠি নির্জীব হয়ে থাকে, ভোজালিটা ভোঁতা মনে হয়, মামুদ খাঁ জিগ্‌গেস্ করে আইনটা কি?

দর্জির দোকানে বসে আদালতের পিওন সমন-নোটিশ জারি করে, রিটার্ণ লেখে। পোষ্টাপিসের পিওন চিঠি বিলি করে, বোর্ডের ট্যাক্স-দারোগা ট্যাক্সো কুড়োয়।

আদালতের পেয়াদারই বেশি মান, বেশি দাপট। সে জানে-শোনে বেশি, সে একেবারে ভিতরের লোক।

সে বলে, 'এখন বাবা লাইসেন লাগে। যেমন লাগে বন্দুকের, মদ-গাঁজার। লাইসেন না নিয়ে তেজারতি করলেই হাতে হাতকড়া।'

টাকা কর্জ দিতে কে এসেছে? যে টাকা নিয়েছ তোমরা, তা ফিরতি দেবে না? এ কোন দিশি নয়া কানুন? আসল টাকাটাও গাপ হয়ে যাবে

হ্যাঁ, তামাদির গেরোর কথাটা জানা আছে মামুদ খাঁর। তার সে ভয় রাখে না। আদালতে যদি যেতেই হয় কোনো দিন, হাতচিঠাতে সে সুদের উশুল দিয়ে রাখতে জানে। কলম-ছোঁয়ানো সই করে রাখবার মত জালবাজ লোকের অভাব নেই। বটতলায় মিলবে অমন ঢের মুনসি-মুহুরি।

'নয়া কানুন না তো কি!' পাশের ঘরের মহেন্দ্র ডাক্তার তেড়ে এল: 'চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে চাষা-ভুষো বেপারি-কারবারি সবাইকে উচ্ছন্নে দিয়েছে, তাদের জন্তে নতুন আইন হবে না তো কি! সুদের সুদ, তস্য সুদ, যেন চক্কর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে-খেয়ে বেড়েই যাচ্ছে. খোলের চেয়ে আঁটি হয়েছে বড়, হাঁ-এর চাই খাঁই। আসল? আসল কবে ভুষ্টিনাশ হয়ে গেছে তার ঠিক নেই।'

'নেহি, আসল অন্তত: হামার চাই।'

'জানি না আমরা তোমার এই আসলের কারসাজি? দিয়েছ দশ টাকা, লিখেছ চল্লিশ। এখন সব বস্তা-বোঁচকা গাঁট-গাঁটরি খুলে দেখাতে হবে। এসেছে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার দিন।'

সত্যি, এ হল কি? গো-বদ্যি মহেন্দ্র সাপুই, ম্যালেরিয়ায়-ভোগা চিমসে চেহারা, সে পর্যন্ত আইনের চিপটেন ঝাড়ে। ত্যাড়া ঘাড়ে কথা কয়। চোখ পাকায়।

নিজেকে মামুদ খাঁর হঠাৎ অসহায় লাগে। বুঝতে পারে, তার পিছনে আর জনতার অনুমতি নেই। তার জবরদস্তির পিছনে নেই আর সেই ভয়ের বুজরুকি। যে ধার খায় সে যে অপরাধী নয়, সে যে শুধু অপারগ, রটে গেছে যেন তারই কানাঘুসো। অপারগের দল এবার তাই একজোট হয়েছে। পেরেছে একজোট হতে।

কিন্তু কিছু অন্তত: টাকা না পেলে মামুদ খাঁ দেশে ফিরে যায় কি করে? তার কারবার যখন বরবাদ হয়ে গেল তখন দেশে গিয়ে সে চাষ-বাস করবে। হাল-বলদ কিনবে। হিং-এর চাষ করবে। কিন্তু বিনি সম্বলে সে যাবে কোথায়? খাবে কি? গরিবপরওয়ার কেউ নেই তোমাদের মধ্যে?

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই মামুদ খাঁ লজ্জায় মরে যায়।

'এক আধলাও কেউ দেবে না। শুষে-শুষে ছিবড়ে করে ছেড়েছে। সোনার ডিম পাড়ত যে হাঁস, অতি লোভে তার পেটে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে—আছে কি আর আমাদের? যা তো থানায় গিয়ে খবর

দিয়ে আয় তো দারোগাবাবুকে।' মহেন্দ্র তড়পাতে থাকে: 'আজ কাল খাতকের বাড়ীতে গিয়ে ধন্না দেয়া বা চারপাশে ঘুরনা দেওয়াও মারপিটের সামিল। যা তো কেউ, দেখবি এখনি শালার আসথাস তলব হবে থানা থেকে।'

থানা-পুলিশের নাম শুনে মামুদ খাঁ জ্বলে ওঠে। বলে, 'তুম শালা তো কম্বল লিয়েছিলে—তার দাম ভি আইন নাকচ করে দেবে? আচ্ছা দাম না দাও, হামার কম্বল ফিরিয়ে দাও।' মামুদ খাঁ সত্যি-সত্যি হাত পাতে।

'তুম শালা একখানা কম্বল দিয়েছ আর গায়ের ছাল তুলে নিয়েছ একশো জনের। সেই ছালে ডুগি-তবলা বানিয়েছ। আর আমরা হাড়-গোড় বার করে দাঁত খিঁচিয়ে মরে আছি। বেইমানি করার আর তুমি জায়গা পাওনি? যাও, বেরোও।'

শের ছিল, কুত্তা হয়েছে আজ। তবু বেইমান কথাটা সহ্য করতে পারে না মামুদ খাঁ। তার এক কালের বেদানা-খাওয়া রক্ত লাল হয়ে ওঠে। লাঠি তুলে আচমকা মারতে যায় মহেন্দ্র সাপুইকে।

ঐ মারতে যাওয়া পর্য্যন্তই। হাতের মুঠ তার আঁট হয়ে বসতে পারে না। লাঠির উপর, ওরা তা অনায়াসেই কেড়ে নেয়। কাউকে কিছু বলতে হয় না, সবাই দাঁড়ায় এককাট্টা হয়ে। একসঙ্গে ঘাড়কাতা দিয়ে নামিয়ে দেয় তাকে দোকান থেকে। তার জামা ছিঁড়ে দেয়। পাগড়ি খুলে ফেলে। বাবরি ধরে টানে। ঢিল ছুঁড়ে মারে। একটা ঢিল লেগে কপাল ফেটে যায়।

বুকের উমে গরম হয়ে আছে যে ভোজালি, মামুদ খাঁ তা আর মনেই করতে পারে না।

স্পষ্ট বোঝে, জনবলের সঙ্গে পারবে না সে লড়াই করে। সমুদ্রে ভেসে যাবে কুটোর মত। আর, গায়ের জোর জিতলেও জিতবে না দাবির জোর। তার দাবির থেকে দাব গিয়েছে খসে। তার স্বত্বে বোধ হয় আর সত্য নেই।

মামুদ খাঁ পালিয়ে যায় জোর কদমে। যায় খেয়াঘাটের দিকে। কামারদের পিছনের গলি দিয়ে। পালিয়ে যাবার জন্যেই যেন সে এসে পড়েছে এই গলির আশ্রয়ে।

বাড়ীর মুখোরে নিত্যগোপী জলচৌকির উপর বসে জল দিয়ে চেপে-চেপে আরেকটা কে মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছে।

নিত্যগোপী চিনতে পারল মামুদ খাঁকে। এ অঞ্চলেও সে তার হিং ফিরি করতে এসে কর্জ খাইয়ে যেত। শুধু নিত্যগোপীকেই জপাতে পারেনি। একখানা শাল দিয়েও নয়। নিত্যগোপী অনেক সম্ভ্রান্ত। সে কাবলিওলাকে ঢুকতে দেবে না তার বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে।

খড়ম পায়ে নিত্যগোপী উঠে দাঁড়াল। বললে, 'এ কি হল খান সাহেব?'

'চোর ধরতে গিয়ে জখম হয়েছি।' রক্তে মামুদ খাঁর কপাল ও গাল ভেসে যাচ্ছে।

'সে কি কথা, এসো আমার বাড়ীতে। বাবুকে ডাকাই। ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিক।'

কোনো দিন সাধ ছিল বুঝি মামুদ খাঁর, নিত্যগোপীর ঘরে যায়। আজ নিত্যগোপী তাকে ডাকল, কামনার মত নয়, শুশ্রূষার মত।

বললে মামুদ খাঁ, 'দরিয়ার পানি জবর নোনা, থোড়া পানি খাওয়াতে পারবে?' ছোট উঠোন পেরিয়ে নিত্যগোপী তাকে ঘরে নিয়ে এল। ঘটি করে জল দিল খেতে।

মামুদ খাঁর মুখে ঘটিটা আর কাৎ হল না। দেখল নিচু-মতন একটা তক্তপোষে কতগুলি কম্বলের থাক। লাল মোটা কম্বল। প্রায় এক শো। কিংবা তারো বেশি।

'এ ক্যা?'

'বাবু এক গাঁট সরিয়েছেন হাসপাতাল থেকে। ঐ দুর্ভিক্ষের হাসপাতাল থেকে। বাবু ওখানে এখন চাকরি করছে কি না—' সমপর্য্যায়ের ব্যবসায়ী ভেবে নিত্যগোপী বললে নিশ্চিন্ত হয়ে।

'কে তোমার বাবু?'

'মহেন্দ্র বাবু। খলিফার দোকানের পাশেই যার দাওয়াইখানা। দুর্ভিক্ষের দিনে খুব পয়সা করছে দু' হাতে। নইলে আর আমার এখানে জায়গা পায়?'

জলভরা ঘটি নামিয়ে রাখল মামুদ খাঁ। বললে, 'পুলিশ ডাকে না কেউ? থানায় খবর দেয় না?'

'দারোগা-জমাদার সবাইকে দেয়া হয়েছে একখানা করে।' নিত্যগোপী মামুদ খাঁর ফালা-খাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া জোব্বা-জামার দিকে তাকাল। বললে, 'তুমি একখানা নেবে খান সাহেব? এই শীতে জামা-কাপড় তো তোমার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই যা হাওয়া ছুটবে নদীর উপর দিয়ে—'

'না। চোরাই মাল হামি ছুঁই না।'

মামুদ খাঁ নেমে পড়ল উঠোনে।

'এ কি, জল খেয়ে যাও।'

'না। পানি ভি খাব না।'

মামুদ খাঁ তার রক্তমাখা উপরের ঠোঁটটা চাটতে লাগল। যেন সে রক্তের স্বাদটা জেনে রাখছে। টক-টক, নোনতা-নোনতা। লোভের রক্তের স্বাদ। মহেন্দ্রদেরও কপাল যখন এক দিন ফাটবে তখন অনায়াসেই মনে করতে পারবে সে সেই রক্তের তার। জল দিয়ে তা সে আজ ফিকে করবে না।

লোকে দেখুক, দেখে রাখুক। রক্তমাখা মুখেই মামুদ খাঁ খেয়ার নৌকোয় গিয়ে উঠল।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার বিজ্ঞান

ডাঃ মেঘনাথ সাহা

ভারতের অবস্থা

এইবার আমাদের নিজের দেশের—ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করিব। আমাদের হিসাব মত ভারতের জনপ্রতি বাৎসরিক কার্য্যমান ১০০ হইতে ১২০ ইউনিটের অধিক নহে। জগতের অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জনপিছু ভারতবাসীর গড়পড়তা বার্ষিক আয় ৬৫ টাকা অর্থাৎ ৫ পাউণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; কারণ, আয় কার্য্যমানের উপর নির্ভর করে। এই নির্দ্ধারণ সম্পর্কে অনেক আপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু ভিন্ন উপায়ে গবেষণা করিয়াও আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এই তুলনায় বৃটেনের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় প্রায় ১২০ পাউণ্ড।

কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের রয়েল সোসাইটির সম্পাদক—অধ্যাপক এ, ভি, হিল ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক খবর সন্ধানের উদ্দেশে এ দেশে আগমন করেন। অধ্যাপক হিল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জনস্বাস্থ্য এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আমার ফলাফলের সহিত তাহা প্রায় এক। যে ভাবেই হিসাব করা যাক না কেন, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতের প্রায় শতকরা নব্বই জন অধিবাসী এখনও সেই মধ্যযুগে পড়িয়া আছে। বিদেশী পর্য্যটকরা সাধারণতঃ কলিকাতা, বোম্বাই অথবা দিল্লীর আধুনিকতা দেখিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভুলিলে চলিবে না, বর্ত্তমানে শতকরা নব্বই জন ভারতবাসী বিলাতের মধ্যযুগের অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশের শিশু-মৃত্যুর হার অতি উচ্চ, জনস্বাস্থ্যের অবস্থা লজ্জাজনক—শতকরা নব্বই জন লোক থাকে খোলার বস্তীতে। জীবনে তাহাদের কোন আনন্দ অথবা আকাঙ্ক্ষা নাই। অধ্যাপক হিল বৃটিশ জনসাধারণকে বার বার বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ভীষণ সঙ্কটের মুখে। আশু প্রতিকার আবশ্যক।

নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি ঠিক একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরশ একেবারেই লাভ করে নাই। যদি ভারতকে বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হয়, তবে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রুশিয়া যে উপায়ে অদ্ভুত সাফল্যের সহিত পুনর্গঠিত হইয়াছে, ভারতকেও সেই ভাবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিল্প-প্রক্রিয়ার সাহায্য লইয়া নিজের খনিজ, শস্যজ এবং অন্যান্য সম্পদের সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকার-মহল এই বিষয়ে কি চিন্তা করিতেছেন, তাহা এখনও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। সমস্যাটি এতই গুরুতর যে, কাহারও তাহা না দেখিয়া থাকার উপায় নাই। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমিতিগুলির মন্তব্যে কিন্তু মনে কোন আশার সঞ্চার হয় না। কেহ বলেন, রাস্তা বানাও। কিন্তু কেন? সেই রাস্তা দিয়া যাইবে কাহারা? যানবাহনের কি ব্যবস্থা হইবে? কেহ বা বলেন, কৃষির উন্নতি কর। কেহ বলেন, কৃষিজ এবং শিল্পজ বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা কর। কারণ, উপায় ও উপকারিতা সম্বন্ধে কোন সদুত্তরই তাঁহারা দেন নাই। সাধারণ লোক কেবল দেখিতেছে বড় বড় কমিটি গঠিত হইয়াছে, এবং অনেক অবসর-প্রাপ্ত বহুস্থলে অকর্ম্মণ্য কর্মচারী মোটা বেতনে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছেন। আসল কথা এই যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এই কমিটি-গুলিকে পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া দরকার মনে করেন নাই, সুতরাং প্রত্যেক কমিটিই নানারূপ অবান্তর পরিকল্পনায় সময়ের ও অর্থের অপব্যয় করিতেছে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নহে। এই নির্দ্দেশ খুবই সহজ ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে বলিতে হইবে যে, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে পূর্ণ ভাবে কাজে লাগাইয়া ভারতের প্রত্যেক লোকের আয় যত দূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদি বাস্তবিকই এই আশাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতের জনপ্রতি বাৎসরিক কার্য্যমানকে পাঁচ বা দশ বৎসরের মধ্যে ডবল করিতে হইবে, অর্থাৎ আগামী দশ বৎসরের মধ্যে জনপ্রতি বাৎসরিক কার্য্যমান ১০০ ইউনিট পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। ইহা এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বে মেক্সিকোর মত অনুন্নত দেশও জনপ্রতি বৎসরে গড়ে ১৮০ ইউনিট শক্তি উৎপাদন করিত, আর আমরা এখনও মাত্র ৯ ইউনিট উৎপাদন করিতেছি। এইরূপ একটি ঘোষণার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ. তাহা না করিলে সরকার যে সত্য সত্যই জাতির উন্নতি সাধন করিতে চান, তাহা জনসাধারণ বিশ্বাস করিতে পারে না। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে হইবে এবং তাহা যথাযথ কার্য্যে ব্যবহার করিতে হইবে।

আর এক দিক্ দিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। যদি ভারতবর্ষ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে মাথা-পিছু গড়ে ১০০ ইউনিট কার্য্য উৎপাদন করে, তবে সমগ্র কার্য্যের পরিমাণ হইবে ৪০,০০০ মিলিয়ন ইউনিট। এই সংখ্যা যুদ্ধের পূর্ব্বের যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যার তুলনায় সামান্য বেশী। P. E. P. (অর্থাৎ ডাঃ এলমহার্ষ্ট প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমিতির) গবেষণা অনুসারে হিসাবানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিমাণ বৈদ্যুতিক কার্য্য উৎপাদন শিল্পে ৬০০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূলধন আবদ্ধ ছিল। উৎপাদন ছিল সরকারের হাতে আর সরবরাহ ছিল বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে। হয়ত আমাদেরও প্রায় সমপরিমাণ মূলধন আবশ্যক হইবে, তবে সরকার বুদ্ধিমান হইলে আরও কমে সুব্যবস্থা হইতে পারে। গোড়ায় যাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করেন, তাঁহাদের অনেক ভুল-ত্রুটি থাকে। পরবর্ত্তী ব্যক্তিদের সেই ভুল-ত্রুটি এড়াইয়া চলা উচিত। যদি আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন শিল্প পরিকল্পনা-নুযায়ী অগ্রসর হয়, তবে বাহির-বিশ্বের বিশেষ করিয়া বৃটেনের সহিত তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইবে। দেশের অবস্থা ফিরিবে এবং যুদ্ধের অবসানে যে বিরাট বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে তাহা বহুল পরিমাণে লাঘব হইবে।

শিল্প-গঠন কার্য্য

প্রত্যেক শিল্পের,—তাহা রাসায়নিক, ধাতব, বস্ত্র বা আর যাহা কিছুই হউক না কেন, প্রথম ও প্রধান দরকার—প্রচুর পরিমাণ শক্তি। এক টন অ্যালুমিনিয়াম তৈয়ার করিতে প্রয়োজন হয় প্রায় ২৫,০০০ ইউনিট, এক টন কৃত্রিম রবার উৎপাদনে লাগে ৪০,০০০ ইউনিট। এই অত্যাবশ্যক কথাটি প্রত্যেক দেশকে মনে রাখিতে হইবে। সেই জন্য শক্তি উৎপাদন ও বণ্টন প্রত্যেক দেশে, এমন কি বৃটেনে এবং আমেরিকায়ও সরকারী তত্ত্বাবধানে থাকে, যদিও গোড়াতে এই শিল্প-স্থাপনা ও উন্নতি বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে এই শক্তি উৎপাদন শিল্প এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই, তথায় ব্যবস্থা এবং পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে উপযুক্ত নিয়মাধীনে বণ্টন-ব্যবস্থা ভারপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের হাতে আংশিক ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

উৎপাদিত শক্তির বেশীর ভাগ অংশই ব্যবহার করিতে হইবে ভারতে বিরাট্ এবং ব্যাপক ভাবে প্রধান প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠায়। দেশের জনসাধারণের খুব বড় অংশকে শিল্পের দিকে চালিত না করিতে পারিলে যুদ্ধোত্তর ভীষণ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি নাই। অনেকে সমস্যা সমাধানের হয়ত এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা আপত্তি করিবেন, পশ্চিম দেশসমূহে বিরাট্ বিরাট্ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে (যাহা ষ্টীম এঞ্জিন, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি আবিষ্কারের জন্য সম্ভব হইয়াছিল) আকৃষ্ট হইয়া বহু কৃষিজীবী গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছিল এবং কাজও পাইয়াছিল, কিন্তু পরে ধনীরা তাহাদের পরিশ্রমে অযথা মুনাফা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, ফলে তাহারা অভাবগ্রস্ত হইয়া বস্তী ইত্যাদিতে বাস করিতে থাকে। ধনী এবং মজুর দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়া বিলক্ষণ সামাজিক গণ্ডগোলের উদ্ভব হয়। ইহার উত্তরে বলিব যে, ধনীদের অত্যধিক অর্থলোভে কি কুফল ঘটিতে পারে আজ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং বুদ্ধিমান সরকার যদি উপযুক্ত শ্রমিক-আইন পাশ করেন, তাহা হইলেই এই বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সর্ব্বশেষ রিপোর্ট ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেনসাস হইতে দেখা যায় যে, ভারতের শতকরা ৮৯ জন লোক থাকে গ্রামে এবং মাত্র ১১ জন লোক থাকে সহরে। এই ৮৯ জনের মধ্যে ৭৫ জন কৃষিজীবী। বাকী ১৪ জনের মধ্যে কতক জমিদার, কতক খাজনা আদায় করে, আর কতক ভূমি-উৎপন্ন অর্থের উপর কোন না কোন প্রকারে পরগাছার মত নির্ভরশীল। যে কোন অর্থনীতিবিদ্ বলিয়া দিবেন যে, ভারতবর্ষে ভূমির উপর জনসাধারণের চাপ অত্যন্ত বেশী। দেশের অধিকাংশ লোকই যদি কৃষিজীবী হয়, তাহা হইলে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Mathus-র মতে কৃষির উপর নির্ভরশীল প্রত্যেক পরিবারেই বহু সন্তান উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতে ক্রমেই দারিদ্র্য বাড়িতে থাকে। Mathus এই প্রক্রিয়াকে Destructive Torrent of Children অর্থাৎ সর্বনাশকর সন্তান-প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী হওয়াতে এইরূপ "সর্বনেশে সন্তানপ্রবাহ" আসিয়া দেশের জনসংখ্যাকে দ্রুতবেগে বাড়াইয়া দিতেছে, এবং তাহাতে দেশে দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অযথা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে শাসক ও শাসিত উভয়েই ভীত হইয়া পড়িতেছে—এই অধিক লোকের খাদ্য জুটিবে কোথা হইতে?

এইরূপ গুরুতর পরিস্থিতির কারণ কি? ইতিহাস ঘাঁটিলে দেখা যায়, য়ুরোপের শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) পূর্ব্বে—যার প্রভাব ভারতের উপরও পড়িয়াছিল—ভারতের কৃষিজীবী ও শিল্পজীবী জনসংখ্যার মধ্যে বেশ একটা সমতা ছিল। ইংলণ্ডে যখন শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হইল, কৃষিজীবীরা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বড় বড় সহর গড়িয়া উঠিল। সহরবাসীর সংখ্যা দারুণ বৃদ্ধি পাইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল বার্মিংহাম প্রভৃতি ছোট ছোট গ্রাম বা সহরগুলি বিরাট্ নগরে পরিণত হইল।

ভারতবর্ষে কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হইয়াছিল। যখন বিদেশ হইতে সস্তা ফ্যাক্টরীর তৈয়ারী মাল আসিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিল, তখন বেশীর ভাগ শিল্পজীবী—জোলা, তাঁতি, কামার, কুমোর, ঠাটারী ইত্যাদিরা বেকার হইয়া পড়িল। ফলে তাহারা নিজ নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া কৃষি অবলম্বন করিল। তাহার পর যখন রেল, জাহাজ, ষ্টীমার ইত্যাদি আসিয়া পড়িল, তখন যাহারা এদিক্-ওদিক্ মাল পাঠাইবার কার্য্য করিত, তাহাদেরও কাজ ছাড়িয়া জমির উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে হইল। জমির উপর এই ভাবে অত্যধিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পর পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষ-কমিশনের রিপোর্টেও ইহাই প্রকাশ যে, দুর্ভিক্ষ, অনাহার ইত্যাদির প্রধান কারণ জমির উপর অত্যধিক চাপ। দুর্ভিক্ষ দূর করিতে হইলে জমির উপর চাপ কমাইতে হইবে। কৃষিজীবীদের বেশীর ভাগ অংশকে শিল্পজীবী করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্পের যা অবস্থা, তাহাতে জমির উপর চাপ কমাইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না।

কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যদিও এ দেশে প্রায় শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী, তথাপি ভারতবর্ষে ৪০০ কোটি লোকের উপযুক্ত খাদ্য জমি হইতে উৎপন্ন হয় না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে এই বিশেষ সত্যটি জগতের সমক্ষে অতি রূঢ় ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গত দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্যদ্রব্যের অভাবের অপেক্ষা অন্যান্য অব্যবস্থাই অধিক পরিমাণে দায়ী। তবুও ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে শস্যজ এবং জান্তব দ্রব্যের চিরকাল অভাব রহিয়াছে, ফলে চিরকালই বহু পরিমাণ লোককে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়। অধ্যাপক হিল বৃটিশ জনসাধারণকে বার বার এই কথা জানাইয়াছেন যে, ভারত এক ভীষণ বিপত্তির কূলে দাঁড়াইয়াছে, যে কোন সামান্য কারণে বিপদ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারে। এই বিপত্তির কারণ,—জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, জমির উপর চাপ বাড়িয়া চলিয়াছে, ফলে জমিকে বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হইতেছে না, তজ্জন্য উর্ব্বর জমির উৎপাদিকা-শক্তি নিঙড়াইয়া লইয়া তাহাকে অনুর্ব্বর করিয়া ফেলা হইতেছে। ভারত সরকারের পূর্ব্বতন কৃষি-কমিশনার ডাঃ বার্ণস ভারতীয় ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় ভূমি হইতে অন্য দেশের তুলনায় চার গুণ কম ফসল পাওয়া যায়। ভারতীয় ভূমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশের অভাবই ইহার

কারণ। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য এই অভাব দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ফলে জমির উর্ব্বরতাও কমিয়া যাইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, অন্যান্য দেশের মত ভারতীয় কৃষকরা সার ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া জমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে না কেন? উত্তর এই যে, বেশীর ভাগ কৃষকই অশিক্ষিত, অজ্ঞ। সারের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা তাহাদের নাই। থাকিলেও সস্তায় সার পাইবে কোথা হইতে? গত দশ বৎসরের মধ্যে না সরকার না ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সার-সমস্যা সম্পর্কে কোনরূপ বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কেন, তাঁহারাই জানেন। ফলে দেশে এমন একটি সারশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই, যেখান হইতে কৃষকদের সুলভ মূল্যে উপযুক্ত সার সরবরাহ করা চলে। ডাঃ বার্ণসের মতে ভারতবর্ষ যদি খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে নিরাপদ হইতে চায়, তবে উৎপাদন অন্ততঃ শতকরা ত্রিশ ভাগ বাড়াইতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে প্রায় ৩৫ লক্ষ টন **Ammonium Sulphate**এর প্রয়োজন। এই পরিমাণ সার বৈদ্যুতিক প্রণালীতে উৎপন্ন করিতে হইলে প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ন ইউনিট বৈদ্যুতিক কার্য্যের দরকার। ভারতবর্ষের বহু স্থানে নিশ্চিত ফসফরাসের অভাব লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু কতটা কি প্রয়োজন, সে বিষয়ে এখনও কোন গবেষণা হয় নাই।

মোট কথা, কৃষির উন্নতি করিতে হইলে অনতিবিলম্বে সারশিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন এবং বৈদ্যুতিক শক্তির বহুল অংশ এই শিল্পে ব্যয়িত হইবে।

আরও কয়েকটি ভাবিবার বিষয় আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মত ভারতের কৃষকদেরও কেবল খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। অর্থকরী শস্য—যথা, কার্পাস, পাট, আক, তৈল-বীজ, তামাক ইত্যাদিরও চাষ করিতে হইবে, তবে সেগুলি যদি শিল্পজ কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে অর্থাগম হইবে না। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে এই ধরণের কতগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক প্রয়োজন। ভারতবর্ষে খাদ্য-সংরক্ষণ শিল্প একেবারে নাই বলিলেই চলে। এত উপাদেয় এবং এত রকমের ফল বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাজারে পাওয়া যায় এই সকল ফসল মাত্র সেই ঋতুর কয়েক দিনের জন্য। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাতে যে নূতন খাদ্য-সংরক্ষণ প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে আপেল, কমলা,লেবু ইত্যাদি ফল, আলু এবং কপি ইত্যাদি সব্জীকে প্রায় এক বৎসর কাল অবিকৃত ভাবে রাখা যায়। এই খাদ্য-সংরক্ষণ শিল্পের জন্য প্রথম দরকার কৃত্রিম উপায়ে শৈত্য উৎপাদন করা, এবং তজ্জন্যও বহু পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রয়োজন। সার হ্যারল্ড হার্টলে তাঁহার 'মেথার লেকচারে' বলিয়াছেন, কৃষি এবং বনজ দ্রব্য বহু শিল্পের কাঁচা মাল যোগান দিতে পারে—যথা, Rayon বা কৃত্রিম রেশম, ইহা প্রস্তুত হয় পাইন্ ইত্যাদি গাছের মণ্ড (wood pulp), কাগজ, প্লাষ্টিক, নানা রকম গ্যাস্ ইত্যাদি—এবং এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিল্প এবং কৃষির মধ্যে কোনরূপ বিসম্বাদ নাই, বরং সহযোগিতাই আছে। শিল্পের এবং কৃষির উন্নতি না হইলে ভারতীয় গ্রামবাসীদের সেই মধ্যযুগের অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নতির পথে আনা সম্ভব হইবে না। ম্যালথুসিয়ান রীতি অনুযায়ী জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিবে, অথচ পর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে না। ফলে এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইবে, যাহা রাজা এবং প্রজা উভয়ের পক্ষেই আতঙ্কের বিষয়।

—দেয়াল—

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

দেয়াল ভাঙো।
ইটের, কাঠের, মঠের মাঠের দেয়াল ভাঙো
শ্বেত-মহলের, শ্বেত-পাথরের দেয়াল ভাঙো।
পৃথিবীর প্রাণ সবুজ ঢের
কেন মূল সেথা অনিষ্টের?
কারিকুরি যত অশিষ্টের
ভেঙে ফেলো।

ভাঙো দেয়াল কালো লোভের:
দেয়াল ভাঙো বিক্ষোভের—
বিচ্ছেদের,
ভেদাভেদের,
সব খেদের
দেয়াল ভাঙো।

কাহার আকাশ কে করে রোধ?
লুটে নেয় কার ভোরের রোদ?
আনে বিরোধ
করে না শোধ
যতেক ঋণ!
রাত্রিদিন
অর্থহীন
কেবল দেয়াল করে খাড়া:
কে বা তারা? কে বা তারা?

কেন তারা
দেয়াল তোলে
আকাশ ঘিরে, বাতাস চিরে?
হৃদয়-তীরে
আনে শুধু
হা-হা সাহারার মরু ধূ-ধূ!
কেন বলো?

মানুষে মানুষে কেন দেয়াল:
এক ধান খাই, একই ত চাল!

৩

একজন মানুষকে আর-এক জন মানুষ কেন আকৃষ্ট করে, তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ বার করা সহজ নয়। আমার মতো মেয়ের—যার বাপ মাসে দশ হাজার টাকা উপার্জন করে—যাকে বিয়ে করবার জন্য যুবক-মহলে উত্তমের নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিযোগিতা—বিশেষত যার ভাবী স্বামী এক জন আই. সি. এস. তার পক্ষে একটা মনোহারী দোকানের একজন যুবককে দেখে হঠাৎ এমন ব্যাকুল

—উপন্যাস—
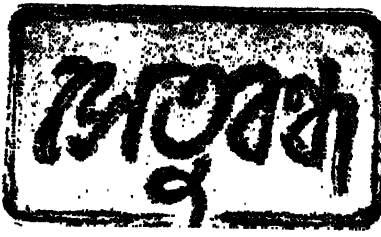
প্রতিভা বসু

হওয়া হয়তো নিতান্তই অস্বাভাবিক। কিন্তু যে-ব্যক্তিত্বের প্রখর ছাপ ওর চোখে-মুখে ছড়ানো ছিলো—সমস্ত শরীরে সলজ্জ ভঙ্গিতে যে অপূর্ব মাধুর্য ছিলো—তা আমি অস্বীকার করতে পারিনি, আমার মুগ্ধ মন আত্মচেতনাবিমুখ হয়ে সর্বান্তঃকরণেই তা গ্রহণ করেছিল। এত কথা আমার এর আগে মনে হয়নি—আমি বুদ্ধি দিয়ে কখনো বিশ্লেষণ ক'রে দেখিনি। হঠাৎ অভিলাষের ঈর্ষা-কাতর মন আমাকে এত সচেতন ক'রে তুললো যে মনের মধ্যে ভিড় ক'রে এলো কথার সমুদ্র।

অভিলাষ ব'সে-ব'সে গজরাতে লাগলো—বাঙালির শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে নানা রকম মন্তব্য আওড়ালো। কিন্তু আমি নিশ্চুপ।

রাত্রিতে খেতে ব'সে অভিলাষ বাবাকে বললো, 'কাকাবাবু, আমি তো পর্শুই যাচ্ছি; বাবাকে আপনি লিখুন—এ-মাসের মধ্যেই যাতে বিয়ে হয়ে যায়। যে-কোনো এক শনি-রবিবারে ফেলবেন—আমি এসে রেজিস্ট্রি ক'রে যাব।

'রেজিস্ট্রি কেন?'—মা মুখ তুললেন অবাক হ'য়ে।

'আমার সময় কি এতই মূল্যহীন, কাকিমা, যে হিন্দু বিবাহের মতো একটা "সিলি" ব্যাপারে নষ্ট করা যায়?'

মা আহত হয়ে বললেন, 'আমাদের তো একটা সংস্কার আছে, এত কাল ধরে যে প্রথা এত আনন্দের মনে হয়েছে তা চট ক'রে উচ্ছেদ করা—বিশেষত আমার একটিমাত্র মেয়ের বেলায়—'

বাবা ধমকে উঠলেন—'তোমাদের স্ত্রীলোকের বুদ্ধি রাখো। যত সব বাজে—'

বাবা একেবারে অভিলাষের ছায়া। পাছে অভিলাষ রুষ্ট হয় এই ভয়ে তিনি যে সর্বদাই আড়ষ্ট। অভিলাষের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ অভি—ও-সবের কি কোনো মানে হয়?'

'আপনি নোটিশ দিয়ে রাখবেন আপিশে—আমি দেখুন পর্শু যাচ্ছি—পর্শু হোলো বেস্পতিবার তার পরে গেল এক শনি—তার পরের শনিবারই আমি এখানে চ'লে আসবো তাহ'লে।' আমি লক্ষ্য করলুম, এ-কথা বলতে-বলতে অভিলাষ আড়চোখে আমার দিকে তাকালো।

তার পরের দিন সকালে অভিলাষ চা খেয়েই কোথায় বেরিয়ে গেলো, এলো অনেক বেলায়। ভালো ক'রে দেখা হলো সেই বিকেলের চায়ে। চা খেতে-খেতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আজকে যাবে নাকি বেড়াতে?'

'না।'

'কেন?'—মা খাবার দিচ্ছিলেন, কী মনে ক'রে একটা কাজের অছিলায় বেরিয়ে গেলেন। মা যেতেই অভিলাষ কাছে এসে বসলো। বললো, 'রাগ করেছো নাকি আমার উপর?'

'বাঃ, রাগ করবো কেন?'—ওর আবেগকে হালকা ক'রে দেবার চেষ্টা করলাম।

'রাগ না-করলে কেউ এ-রকম ক'রে থাকে?'

আমার হাঁটুর উপর হাত রাখলো। গায়ে হাত না-দিয়ে ও কথাই বলতে পারে না।

বাধা দিলাম না—এ-বাড়িতে আমার উপর ওর অবাধ স্বাধীন চি—আমি ওর ভাবী স্ত্রী। কিন্তু মুখের চেহারা আমার বদলে গেল, তক্ষুনি হাসতে চেষ্টা ক'রে বললাম, 'পাগল! তোমার উপর কি রাগ করতে আছে?'

'তবে চলো বেড়াতে—যদি বেড়াতে যাও তবে বুঝবো রাগ করোনি!'

বুঝলাম অভিলাষের মস্তিষ্কে কিছু বিকৃতি হয়েছে। কালকের ব্যাপারে ওর লোভ প্রশ্রয় পেয়ে একেবারে চরমে উঠেছে। শক্ত হ'য়ে বললাম 'রাগ অভিমানের কথা নয়, অভিলাষ, আজকে আমার একজনদের বাড়ি না-গেলেই নয়।'

হঠাৎ বাবা ঘরে ঢুকলেন—এ-সময় তিনি আমাদের সঙ্গে চা খান না—খান না তার কারণ অবিশ্যি এ-সময় তিনি কোর্ট থেকেই ফেরেন না। আজ সকাল-সকাল ফিরেছিলেন। ঘরে ঢুকেই অভিলাষকে প্রায় আমার গায়ের সঙ্গে লেগে কথা বলতে দেখে একটু অপ্রস্তুত হলেন—অভিলাষ সপ্রতিভভাবে বলল, 'আজ খুব শিগগির ফিরেছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই কাজ হ'য়ে গেলো'—তোমার মা কোথায়, রুনি?'

'কী যেন, দেখি'—এই অছিলায় আমি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম—কিন্তু মা তক্ষুনি ঘরে এলেন—আমি হতাশ হ'য়ে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, 'মা, আজ আমি একবার অঞ্জলিদের বাড়ি যাবো।'

'অঞ্জলিদের বাড়ী? কেন?'—বাবা প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, 'দরকার আছে।'

'কী যে তোদের দরকার। না, না, সন্ধেবেলা কোথাও কোনো বাড়িতে আটকে থাকা আমি ভালবাসি না। অভি আজ যাচ্ছো না বেড়াতে?'

'আমি তো সেধে-সেধে হয়রান হয়ে গেলুম, কাকাবাবু।'

আমার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বিদ্রোহ করা উচিত ছিলো। আমি জানি, অভিলাষের আজ আর মাত্রাজ্ঞান থাকবে না। মনে হলো কালকের ইতরামির কথা সব ব'লে ফেলি—কিন্তু মুখেও বাধলো—আর বললেও এটা তাঁরা ইতরামি হিশেবেই নেবেন কিনা সন্দেহ। ভেবে উঠতে পারলাম না, কী করি।

অভিলাষ বললো, 'যাও, চান টান ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে নাও গে।'

বাধ্য মেয়ের মতো উঠে গেলুম, স্নানও করলুম তারপর স্নান ক'রে এসে ভাবতে লাগলুম কী করি। মনে হ'লো মাকে খুলে বলি—কিন্তু

বলি-বলি ক'রে কিছুতেই তাঁকে বলতে পারলুম না। চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম বিছানায়।

কালকের মতো আবার অভিলাষের গলা পেলাম, 'তোমার হলো?'

জবাব দিলাম না।

'রুনি—ও রুনি!' আমি চুপ।

কিন্তু অভিলাষের আস্পর্ধার তো সীমা নেই, পরদা সরিয়ে সে মুখ বার ক'রে অবাক হ'য়ে বললো, 'এ কী, কাপড় পরোনি, শুয়ে আছ যে!'

শুয়ে থেকেই কাতর গলায় বললাম, 'অভিলাষ; মাকে একটু পাঠিয়ে দিতে পারো? বাথরুমে প'ড়ে গিয়ে ভয়ানক লেগেছে দাঁড়াতে পারছিনে।'

'প'ড়ে গেছো? মাই গুডনেস্!'—লাফ দিয়ে সে ঘরে ঢুকলো—'কোথায়, কোথায় লেগেছে'—ডাক্তারের মতো সে প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে হাতে মাথায় টিপে-টিপে স্থান নির্দেশ করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অস্বস্তিতে উদ্বেগে আমি ঘেমে উঠলুম—জোরে-জোরে ছোটো ভাইয়ের নাম ধ'রে নিজেই ডাকবার চেষ্টা করলুম। অভিলাষ বললো, 'ওকে ডাকছো কেন—আমিই তো আছি। আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না?'

'না।'

অভিলাষ হাসলো। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাই আর ওঠে না রুনি—কেননা, তুমি তো আমার স্ত্রী?'—মুখ নিচু করলো আমার মুখের উপর। ওর উদ্দামতায় আমার গলার স্বর অস্ফুট হ'য়ে কোথায় মিলিয়ে গেলো আর ছেলেমানুষের মতো আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। মনে হ'লো, সমস্ত শরীরটা আমার কুকুরে চেটে দিয়েছে—ঘৃণায় লজ্জায় শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওকে ঠেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সোজা একেবারে নিচে খাবার ঘরে এসে দাঁড়াতেই আমার উসকো-খুসকো চুল আর মুখের চেহারা দেখে মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললেন, 'এ কী রে—তোর চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন।'—বাপও তাকালেন—'সত্যিই তো। কি হয়েছে রে?'

বলতে পারলাম না, গলা বুজে গেলো। অভিলাষ আশ্চর্য ছেলে। তক্ষুনি নেমে এসেছে নিচে।—ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'কাকিমা, ও ভয়ানক আছাড় খেয়েছে—কোথায় চোট লেগেছে দেখুন তো!' মুখের চেহারা সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন ক'রে ও দাঁড়িয়ে রইল।

মা, বাবা এবার ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন—এলো আমবাক, ঠাণ্ডা জল, গরম জল—শুইয়ে দেয়া হলো বিছানায়। এত সব ক'রে অভিলাষ একাই বেরিয়ে গেলো শেষে। পরের দিন ও চ'লে গেলো, গেলো দুপুরের দিকে। বাবার আদেশ মতো আমি ওকে সী-অফ করতে গিয়েছিলাম—ফেরবার পথে মনোহারী দোকানে না-গিয়ে কিছুতেই পারলাম না। যাবো কি যাবো না—যাবো কি যাবো না—এ-কথা যে কত লক্ষ বার চিন্তা করেছি তা গুনলে বোধ হয় সংখ্যায় কুলোতো না। অভিলাষকে ষ্টেশনে পৌঁছতে যাবার সময় থেকেই আমার মন ঐ এক চিন্তাতেই ভ'রে ছিলো। বলামাত্রই যে ওকে তুলে দিতে যেতে চাইলাম ষ্টেশনে—তার মূল কারণই বোধ হয় ঐ দোকান। এত ভেবে-ভেবে হঠাৎ ঠিক করলাম—আমার যাওয়া একান্ত দরকার—কালকের রুমালের দামই যে বাকি রয়েছে। কিন্তু এও মনে হ'লো আজ আরেক বিষ্যুৎবার—বেচা-কেনা বন্ধ—তা হোক—অত্যন্ত শঙ্কিত পায়ে দোকানে ঢুকলাম—এত লজ্জা আর কখনো কোনো কারণেই আমি বোধ করিনি এর আগে। অপরাধীর মতো নিঃশব্দে গিয়ে কাউণ্টারে হাত রেখে দাঁড়ালাম। নিবিষ্ট হ'য়ে বই পড়ছিলো, পড়তে-পড়তে হঠাৎ সে চোখ তুলে তাকালো—'এসেছেন?'—আমাকে দেখতে পেয়ে এমন সাগ্রহে কথাটা বললে যে এতক্ষণ যেন সে এই প্রতীক্ষাই করছিলো।

উঠে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো। আমি ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে বললুম, 'কাল তাড়াতাড়িতে রুমালের দামটা—'

'আজ আরেক বিষ্যুৎবার যে'—মৃদু-মধুর হেসে সে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

'বিষ্যুৎবারে তো আর বিক্রি করছেন না,'—আমি বললাম, 'দামটাই নিচ্ছেন।'

'ও একই কথা—কিন্তু আপনি বসুন।'—হঠাৎ ও ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো বসতে দেবার জন্য। আমি গম্ভীর হ'য়ে বললাম 'কেন, আমি কি বসতে এসেছি?'

'না, বসতে আপনি আসেননি—আর বসতে দেবার যোগ্যই নাকি আমি? কী আশ্চর্য! কিন্তু অভিলাষ আমার বাল্যবন্ধু কিনা, তার স্ত্রীকে'—

'স্ত্রী!—আপনি এ-সব কোথায় শুনলেন?'

'কেন, অভিলাষ কাল যে এসেছিলো আপনি তা জানেন না?' তারপর একটু হেসে বললে, 'রুমালের দামও সে দিয়ে গেছে।'

আমার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো।

হঠাৎ ঘরের ডান-দিকের একটা দরজা খুলে এক বিধবা ভদ্রমহিলা মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন, 'খোকা,' পরমুহূর্তেই আমাকে দেখে থমকে গেলেন।

'মা, এসো—ইনি আমাদের অভিলাষের স্ত্রী—মানে অভিলাষের সঙ্গে এঁর বিয়ে হচ্ছে।'

'অভিলাষ!' ভদ্রমহিলা কপাল কুঁচকোলেন মনে করবার জন্য।

ও বললো, 'গোপাল দত্ত-রায়ের ছেলে অভিলাষ—ভুলে গেলে?'

'ও'—ভদ্রমহিলার মুখ একটু যেন কঠিন হ'লো—কিন্তু তখুনি সামলে নিয়ে বললেন, 'বাঃ, বেশ তো বৌ।'

'ওঁকে বসতে দাও,—দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি।'

'না, না'—আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'আমায় এখুনি যেতে হবে।'

'বাঃ, তা কি হয়—একটু এসো।' ওঁর মা এগিয়ে এলেন—দোকানেরই পিছনে ছোট্ট ফ্ল্যাট—সুন্দর দক্ষিণ খোলা—ঝকঝকে ঘর দুটো। ঘর-সংলগ্ন খোলা বারান্দা—আর বারান্দার অর্ধেক জুড়ে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্যাকিং কেসে মাটি ফেলে চমৎকার বাগান করা। হঠাৎ এমন ভালো লেগে গেলো যে আমাদের বিরাট তেতলা রাজপ্রাসাদেও এর আস্বাদ কখনো পেয়েছি মনে হ'লো না।

আমাকে যে-ঘরে বসালেন—ভদ্রলোকের ঘর বোধ হয় সেখানা। মাঝখানে ছোট্ট লোহার খাট পাতা—চার পাশে মোটা-মোটা অসংখ্য বইয়ের সারি। কোণের দিকে লম্বা একটা হেলানো কাউচ—তার পাশে ছোট্টো একটা ষ্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্প, তার পাশেই টেবিল ফ্যান। বুঝলাম আসল আড্ডা এই কাউচখানাই। ভদ্রমহিলা বললেন, 'একটু

বোসো, মা—আমি আসছি। খোকা, একটু কথা বল।' ঘর ঠাণ্ডা করবার জন্ত বোধ হয় সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ ছিল—আবছা-আবছা আলোভরা ঘর—ওর সঙ্গে একা ব'সে থাকতে হঠাৎ যেন কেমন লাগলো। দোকানে আসি—অছিলাই হোক যাই হোক—একটা উপলক্ষ্যের সেতু সর্বদাই থাকে আমাদের মাঝখানে। মুখ তুলে তাকাতেও সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। একটু পরে উনি বললেন, 'আপনাদের বিয়ে কবে হচ্ছে?'

'আমি কী জানি।'

'বা: আপনি না-জানলে জানবে কে।'

'জানতাম যদি বিয়ে হ'তো।'

'সে কী—বিয়ে তাহ'লে আপনাদের হচ্ছে না।'

বললাম, 'না'—কেমন ক'রে বললাম, কেন বললাম জানি না, কিন্তু সেই মুহূর্তে এ-কথা ছাড়া অন্ত জবাব মুখে এলো না। আমার মুখের দিকে সে এবার অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল—তারপর হঠাৎ উঠে বললো, 'একটা জানলা খুলে দি, বড়ো অন্ধকার।

এবার ঘরে ওর মা এলেন। তাঁর হাতে একখানা পাথরের থালা ভরা একরাশ ফল আর সন্দেশ।

বললেন, 'খোকা, ঐ টেবিলটা দে তো কাছে।'

আমি এমন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। কিসে থেকে এ কী হ'লো। বললাম,'এ আপনি কী করেছেন—আমি দেখুন কিছু খাবো না—'

'খাবে বই কি—আহা ছেলেমানুষ—আমি জল নিয়ে আসছি।'

উনি জল আনতে যেতেই আমি ওঁকে বললাম, 'এ ভারি অন্যায়।'

উনি হেসে বললেন, 'অন্যায় তো আমি করিনি—মাকে বলুন।'

'আপনারই দোষ, আপনি ছাড়া কখনোই এ-রকম হতো না।'

'তা না হয় হ'লোই একটু।' মৃদু হেসে ও তাকালো আমার দিকে।

আমি জবাব দেবার আগেই ওঁর মা জল নিয়ে ফিরে এলেন।

'যা হয় একটু মুখে দাও, মা—' ভদ্রমহিলা আঁচলে মুখ মুছে আমার পাশে বসলেন।

আমাকে খেতেই হ'লো শেষে। হাত-ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলুম, পুরো এক ঘণ্টা এখানে কাটিয়েছি, লজ্জিত ভাবে উঠে প'ড়ে বললুম, 'ভয়ানক দেরি হ'য়ে গেলো—আজ আসি।' নিচু হ'য়ে প্রণাম করলুম ওঁর মাকে। বিদায় দেবার সময় ভদ্রমহিলা অতিশয় স্নেহভরে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আবার এসো, মা।'

'নিশ্চয়ই আসবো। আপনিও তো একদিন আসতে পারেন আমাদের ওখানে। আসবেন?'

'মা? মা যাবেন?' ভদ্রলোক এমন অবজ্ঞাভরে হাসলেন যে হঠাৎ আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেলো। বিরূপ চোখে তাকালাম একবার মুখের দিকে। গাড়িতে তুলে দিতে এসে ভদ্রলোক বললেন, 'রাগ করেছেন নাকি?'

'কেন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে যদি হয়ই, তবে করেছি।'

'কী আশ্চর্য! আমার মতো অধমকে আপনি এতটা সম্মান দেবেন নাকি? অভিলাষ যদি—'

'অভিলাষের কথা অভিলাষকে বলবেন,' আমি গাড়িতে উঠে বসলুম।

গাড়ি যখন ষ্টার্ট দিয়েছে—তখন একেবারে ভিতরের দিকে মুখ এনে বললো, 'আবার আসবেন।'

এমন অদ্ভুত অস্পষ্টস্বরে কথাটা বললো যে আমি আশ্চর্য হ'য়ে তাকালাম মুখের দিকে। চোখে চোখ পড়লো—আর আমার বুকের মধ্যে শিরশির ক'রে উঠলো। [ক্রমশ:।

—কবি—

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

নকল করা নয় কো আমার কাজ গো,
নকলনবীশ নইকো লিপিকর,
বুলায় দাগা—দেখতে লাগে লাজ গো,
আমার এত নাইকো অবসর।

নিতুই নব ভাব নিয়ে কারবার তো,
রেখায় রঙে আমার পরিচয়,
সুরের-শরেই বাঁধবো পারাবার গো,—
গাছ-পালা কি ইট-পাথরে নয়।

আরশি চাঁদের রূপ করে আড়াল গো,
ফুটায় সে রূপ সাগর সুবিশাল।
যেই মাধুরী ধরতে নাহি জাল গো
তাই ধরিতে ঘুরছি চিরকাল।

ফুলের আমি নইকো মালাকার তো।
চাইনে আমি সে বেসাতির লাভ।
আমার ফুলের পরিমলেই স্বার্থ,
খুঁজি সেথা ভোলা স্মৃতির ছাপ।

ক্ষুদ্র আমি কাজ বড় কঠিন গো,
সাহস দেখে অন্যে থাকে চুপ,
রসিক না হই রাসায়নিক দীন গো
রূপ ছানিয়া গড়াই অপরূপ।
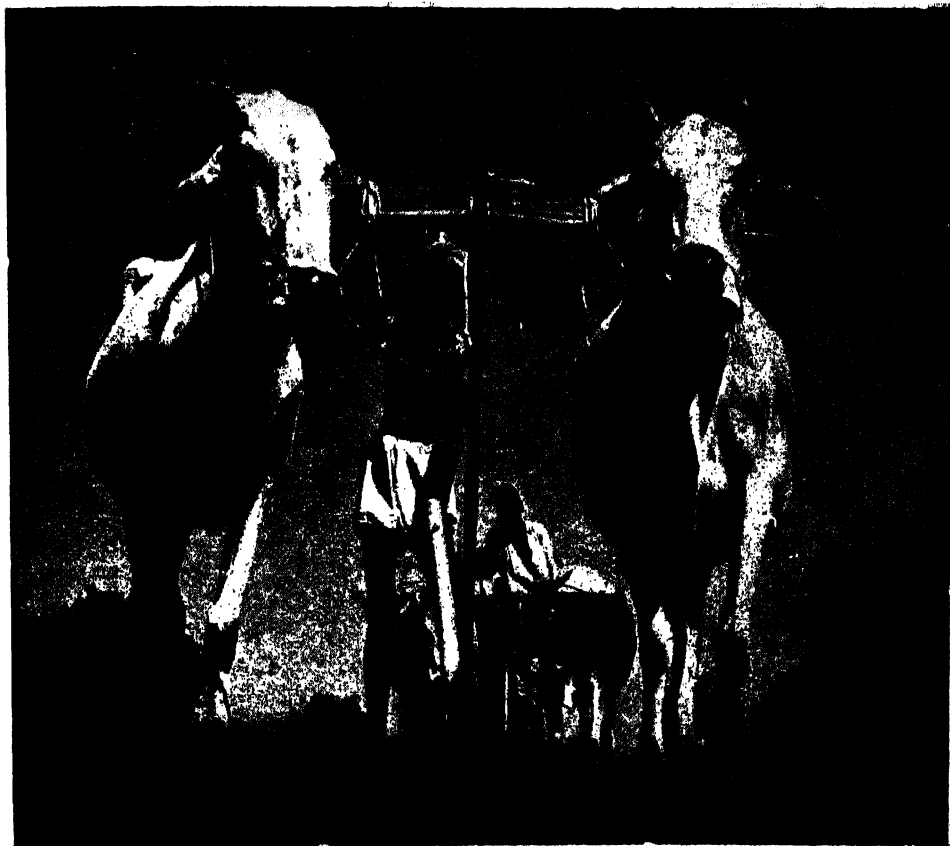
ছবি—নীরোদ রায়

ওরাই চষে ওরাই মাড়ে
ওরাই যোগায় অন্ন
ভূতের মত খাটে কিন্তু
দুখের মত বন্য
—সত্যেন দত্ত

—ঘুমাও ! ঘুমাও !—

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঘুমুলে তোমায় কী যে সুন্দর দেখায় !
সোনার অঙ্গে কাঁপে যৌবন
প্রতিটি রেখায় রেখায় ।
অগোছালো শাড়ী, মাথায় বিনুনী ভাঙা
বাসনার রঙে রাঙা
বালিশে ছড়ানো কালো চুলে ঘেরা
ঘুমন্ত মুখখানি ।

সারা আকাশের তারা পড়ে ঘুয়ে
বিরহী বাতাস তনু যায় ছুঁয়ে
চাঁদের রাতের খোলা জানালায়
ভোলা-মন জেগে থাকে,
অলস ফাগুন হাওয়ায়
নিমের শাখায় রাতজাগা পাখি ডাকে ॥

শাল-মহুয়ার মধুঝরা বায়ু
নব-ফাগুনের চঞ্চল আয়ু
তোমার মদির নিঃশ্বাসে বহে যায়,
স্বপ্ন-বিভোরা তনুটি ঘুমায়
রাঙা-বাসনার চাঁদের চুমায়
অপলকে চেয়ে থাকি
সময়ের ঢেউ দোলা দিয়ে যায়
ডাকে রাতজাগা পাখি ॥

চোখের পাতায় মৃদু-কম্পিত
রক্তিম আকুলতা
ভীরু পাপড়ীর আড়ালে
যুগল ভ্রমর,
বেঁধেছে অশ্রু-সুধায় আপন ঘর ।
ঘরে জ্বলে লাল আলো,
সোনার অঙ্গ কেঁপে কেঁপে ওঠে
ফুল ফোটে শিহরণে,
তবু কাছে যেতে কী গভীর মায়া
পাছে ও তনুতে পড়ে কালো ছায়া
বাঁধ-ভাঙা রাঙা অধরের পরশনে ॥

লেখনী লীলার মৃণালে তোমার
ঘুমের পথ ফোটে,
এলোমেলো সুর অলস ছন্দ
কোমল পাপড়ী অমল গন্ধ
তুমি কাছে তবু কাব্য-কাননে
কস্তুরী মৃগ ছোটে ॥

হৃদয়ে আমার শুভ্র নিথর
জ্বলে অপরূপ শিখা,
আলোয় আলোয় সৃষ্টির নীহারিকা—
চিত্তে ঘনায় । প্রেম ওঠে জেগে
মর্মফুলের সৌরভ লেগে
ছোট ঘরখানি কাঁপে
ঘুমাও, ঘুমাও, জাগাবো না মিছে
সৃষ্টির উত্তাপে ॥

রিম্, ঝিম্, রিম্, ঝিঁঝি-ডাকা রাত
সম্ভ্রম জাগে মনে
তোমার শয়ন এলোমেলো তবু—
স্বপ্নের উপবনে,
উরসে বিবশ ভুজ-বল্লরী
সন্ধানী বাসনায়,
ঈষৎ চমকে বিধুর পুলকে
সুপ্তির বেদনায় ।
অন্তরে মোর রূপের পিয়াসী
জাগে অকারণ অলস উদাসী
ঘুমভাঙা রাঙা উন্মুখ কামনায় !

বিরহী কামনা বুকে চাপা থাকে
ব্যথার লাল-কমল ।
অলস হাওয়ায় বৃথা ব'হে যায়
অঙ্গের পরিমল ।
সুখের সোনালি পাড় বুনে চলি
তন্দ্রার বাঁধন ঘিরে,
ঘুমাও, ঘুমাও, অ-ধরা স্বপ্নে,
বাসন্তিকার বাসর-লগ্নে
যৌবন-নদী তীরে ।

কালীপূজা

[বড় গল্প]

শ্রীঅমলা দেবী

ও-পাড়ার ঢাক বাজিয়া উঠিল। বাবুলাল হাঁকিয়া কহিল—"আমাদের ঢেকো কই রে। পরাণ—ও পরাণ—" কাহারও সাড়া মিলিল না। বিশ্বেশ্বরের খামারে একটা চালায় পরাণ ও তাহার নাতির থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাবুলাল আটচালা হইতে আরও খানিকটা আগাইয়া গিয়া ডাক দিল—"পরাণ ও পরাণ" তবু পরাণের সাড়া পাওয়া গেল না। বাবুলাল কহিল—"বুড়ো কি সাঁঝ রেতেই ঘুমিয়ে পড়ল না কি—কি কাণ্ড দেখ দেখি! যত বুড়ো হাবড়া নিয়ে কাণ্ড!" বাবুলাল খামারের ভিতরে ঢুকিয়া চালাটার সামনে গিয়া হাঁকিল—"পরাণ ও পরাণ—"

পরাণ ও তাহার নাতি মুড়ি-সুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। বার কয়েক ডাকার পরে পরাণ কহিল—"কি গো—আমাকে ডাকছ না কি!"

বাবুলাল বিরক্ত হইয়া কহিল—"তোকে নয় ত কাকে?" এতক্ষণে হুঁস হল তোর! সাঁঝ রাত থেকেই ঘুমিয়ে অসাড় হলি না কি!

পরাণ উঠিয়া বসিয়া কহিল—"না গো সিং দাদা! অসাড় হব কেন? বিকেল থেকে গাটা কেমন করছিল—ভাবলাম জ্বরই আসে বা। তাই এক টান টানলাম, তো মাথাটা কেমন করতে লাগল, তাই শুলাম একটু—"

বাবুলাল কহিল—"তোর নাতিকেও টানিয়েছিস্ না কি?"

পরাণ ক্ষোভের স্বরে কহিল—"তাহলে আর ভাবনা ছিল কি দাদা! উ বিড়ে থাকলে মালোয়ারী জ্বরের সাধ্য কি? নেহাৎ বাচ্চা তো! উয়ার জ্বর এসেছে। তিন পহর রাত পর্য্যন্ত উ আর মাথা তুলতে নারবেক—"

বাবুলাল কহিল—"তা হলে তুই-ই চল, এক কাঠি বাজিয়ে দে। সব ভং ভং করছে যে! পুজো বলেই মনে হচ্ছে না।"

পরাণ কহিল—"চল যাচ্ছি—কাঁসি নাই" নাতিকে ডাক দিয়া কহিল—"ও ছিরু—ছিরু উঠতে পারবি? পারিস তো চল দাদা, বসে বসে একবার ঠেকাটা দিয়ে আসবি।" ছিরুর নড়িবার চড়িবার লক্ষণ দেখা গেল না। কাজেই পরাণ একা আসিয়াই বাজাইতে সুরু করিল।

মন্দিরের মধ্যে বালি আসিয়া হাজির হইয়াছে। পরিধানে কেটের থান কাপড় কোমর বাঁধিয়া পরা। পাশের পুকুর হইতে বালতি বালতি জল লইয়া আসিয়া মন্দিরের মেজে ধুইতেছে আর আপন-মনে বক্ বক্ করিতেছে।

বাবুলাল মন্দিরের সামনে আসিয়া কহিল—"কি বলছ গো বালি দিদি!"

বালি কহিল—"কি আর বলব! যা দেখছি তাই ক[illegible]এখনই।

ফকির আসিয়া কয়েকটা অশথ গাছের ডাল পাঠ[illegible]ত পাঠিয়েছিল ফেলিয়া দিতেই তাহারা চীৎকার বন্ধ করিয়া থা[illegible] খাঁদা গোসাইকে

গ্রামের কতকগুলা ছেলে হৈ-চৈ [illegible]দিকে তাকাইয়া কহিল হাজির হইল। মন্দিরের সামনে

দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও [illegible]—"ভুবন বাঁড়ুজ্যে এসে খুলে প্রতিমার কাছে দাঁড়াতেই প[illegible]

দিকদিকে সরু—ম্যালেরিয়া হয়েছে[illegible] কি?"

বালি দাঁত-মুখ খিচাইয়া কহিল—"হাঁ রে ছোঁড়ারা—ম্যালেরিয়া হয়েছে বৈ কি! যা—তোরা এখান থেকে—"

ছেলেগুলা সরিয়া আসিয়া পাঁঠা দুইটার সামনে জড় হইল—এক জন কহিল—"ওরে—মাত্র দুটি পাঁঠা হাড় জির-জিরে চেহারা, রক্ত আছে কি না সন্দেহ। যেমন কালী তেমনই তার পাঁঠা।"

ফকির আসিয়া তাড়া দিয়া কহিল—"উয়াদের আর কেন জ্বালাচ্ছ বাবু তোমরা—কতক্ষণই বা বাঁচবে? ছাড়ান দাও।"

হঠাৎ সন্‌সন্ শব্দে একটা হাউই আকাশে উঠিয়া ঠিক মাথার উপর ফট্ করিয়া ফাটিয়া লাল-নীল-সবুজ রংয়ের ফুলঝুরি ঝরাইয়া দিল। ছেলেগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে বাজী পোড়ান আরম্ভ হয়েছে—চল—চল" বলিয়া সকলে দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিল।

পরাণ ঢাকটা নামাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া গিয়া নাতিকে উঠাইতে লাগিল—"ও ছিরু—ওঠ—দেখবি আয়। বাজি পোড়ান হচ্ছে—হাউই বাজী—উঠ—উঠ রে দাদা—" অল্পক্ষণ পরেই পরাণের হাত ধরিয়া ছিরু আসিয়া হাজির হইল।

আবার একটা হাউই উঠিল—ঠিক মাথার উপরে—আবার আগেকার মত বিচিত্র রংএর আলোর ফুলঝুরি—সমস্ত আকাশ ঝলমল করিয়া উঠিল।

ছিরু কহিল—"মাথাটা ঘুরোচ্ছে দাদা! আমাকে রেখে আসবে চল।"

পরাণ কহিল, "আর ওখানে একলা পড়ে থাকবি কেন দাদা, আটচালার এক ধারে শুয়ে থাকবি চল।" বলিয়া তাহাকে আটচালার দিকে লইয়া চলিল।

শোঁ-শোঁ শব্দে হাউইএর পর হাউই উঠিতে লাগিল, প্রচণ্ড শব্দে বোমের পর বোম ফাটিতে লাগিল—বিভিন্ন রকমের আতস বাজীর বিভিন্ন শব্দ সারা আকাশের বুকে ঢেউ তুলিতে লাগিল—ধনীর দম্ভ যেন উন্মত্ত উল্লাসে সারা পল্লীর বুকে মাতামাতি সুরু করিল।

বিশ্বেশ্বর খোকাকে বুকে করিয়া, চাদর দিয়া বেশ করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া, মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাউইএর খোলগুলা সশব্দে এখানে সেখানে পড়িতে লাগিল। কাছে-পিঠে একটা পড়িতেই বিশ্বেশ্বর কহিলেন—"ও দাদু! কাজ নাই এখা[illegible]—মাথায় পড়ে তো মাথা ফেটে যাবে।" [illegible]। বিশ্বেশ্বর শুষ্ক

বাবুলাল কহিল—"ঐ একটা তে[illegible]

বাবুলাল কহিল—[illegible] "এই [illegible]ওয়া গেল না। সাপুরের কাসিম মিঞা বলল—'তার সব পাঁঠা বাঁড়ুজ্যেরা নিয়ে গেছে।' পলাশবনির তারক চাটুজ্যে বলল—'তার যা' ছিল মিলিটারীকে দিয়েছে, ছাগল জোগাড় করতে লোক পাঠিয়েছে—কাল দুপুর নাগাদ আসতে পারে।'—কিন্তু তাতে আমাদের কি হবে! চাটুজ্যেকে বললাম—'যদি গাঁয়ে কারও থাকে তো জোগাড় করে দাও, তো বলল—পাঁঠার কথা ছেড়ে দাও—একটা পাঁঠি পর্য্যন্ত নাই গাঁয়ে—আজ-কাল সব চলে যাচ্ছে।' ভুরু নাচাইয়া বাবুলাল কহিল—"ওঃ বেটারা পাঁঠী পর্য্যন্ত খাচ্ছে দাদা! দেশে ছাগল আর থাকবে নাই।"

ফকির কহিল—"হঃ—পাঁঠা! বলে গাইগুলোকে খেয়ে হুড় করে দিচ্ছে!"

বাবুলাল বলিয়া উঠিল—"বেটারা সব রাক্ষস! লঙ্কার যত রাক্ষস মরে—"

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া কহিলেন—"কি হবে?"

বাবুলাল কিছুক্ষণ চিন্তার ভাণ করিয়া কহিল—"আমি আসতে আসতে মনে মনে একটা ঠিক করেছি দাদা, আপনি যদি আপত্তি না করেন—"

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে কহিলেন—"কি?"

বাবুলাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"অটলা মুচির সেই বাচ্চা ছাগলটা—"

বিশ্বেশ্বর প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"ছিঃ ছিঃ, তা কি হয়! ওর মা দুধ বন্ধ করে দেবে—দুধ বিক্রী করেই অটলার সংসার চলছে।"

বিশ্বেশ্বরের ভালমানুষী দেখিয়া বাবুলালের রাগ হইল, বিরক্তির সহিত কহিল—"তা'হলে তো আর উপায় দেখছি না—আপনি যা' ভাল হয় করুন।"

ফকির কহিল—"হলই বা আজ্ঞে! কাজ আমাদের হাঁসিল হয়ে যায়—তার পর একটা দুধেল পাঁঠী ওকে কিনে দিলেই হবেক।"

একটা মোটরের শব্দ কানে আসিল—সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলো! বাবুলাল বিস্ময়ের স্বরে কহিল—এখন আবার হাওয়া গাড়ী চড়ে কে আসছে?" সকলে উৎসুক নয়নে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। অনতিবিলম্বে একটা মোটর আসিয়া থামিল।

গাড়ী হইতে নামিল—একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের সুশ্রী মেয়ে—পরিধানে গরদের দামী সাড়ী, সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা, পায়ে হিল-তোলা জুতা; এক জন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সের সুদর্শন যুবা—দামী পোষাক-পরিচ্ছদ, চোখে চশমা, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পাম্প-শু, মুখে ধূমায়মান সিগারেট; এক জন কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়সের ছেলে—পরিধানে মিহি ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে স্যাণ্ডাল এবং কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। কাছে আসিয়া ছেলেটি বিশ্বেশ্বরকে কহিল—"কি দাদামশায়! ভাল আছেন?"

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—"হ্যাঁ, বেঁচে আছি কোন মতে—তুমি গণপতির ছেলে অমর না?"

ছেলেটি কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

প্রথম যুবক ও তাহার সঙ্গিনী আগাইয়া গিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বিশ্বনাথ কহিলেন—"ওদের তো চিনতে পারলাম না!"

অমর কহিল—"উনি আমার মাসীমার জামাই, কলকাতায় বাড়ী, মস্ত বড়লোকের ছেলে—সঙ্গের মেয়েটি আমার মাসতুতো বোন। আমাদের পূজোর এখনও ঢের দেরী, ভোরের সময় বলি আরম্ভ করতে হবে কি না, না হলে মাংস খারাপ হয়ে যাবে, কাল সারা গাঁয়ের লোক আমাদের ওখানে খাবে তো। রাণীগঞ্জ থেকে নাচওয়ালীরা এসেছে—এখন তাদের নাচ হচ্ছে—মিলিটারী সাহেবেরা, বাবার সহরের বন্ধু-বান্ধবরা নাচ দেখতে এসেছে—বাবা তাদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমার বোন বলল—ভাল লাগছে না—চল গাঁয়ে আর কোথাও পূজো আছে তো দেখে আসা যাকগে—তাই নিয়ে এলাম এদের।"

মেয়েটির গলা শোনা গেল—"বাপ রে, এ যে ঘুটঘুটে অন্ধকার! আলো জ্বালেনি কেন?"

যুবকটি জবাব দিল—"কেরোসিন যোগাড় করতে পারেনি বোধ হয়।"

বিশ্বেশ্বর অমরকে কহিলেন—"এখন নিয়ে এলে; তোমাদের জামাই তো আমারও কুটুম্ব—বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে—"

অমর বাধা দিয়া কহিল—"কিছু দরকার নাই। এমনই কারও বাড়ী যান না উনি। আমার নিজের কাকা কাল ওকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন—উনি যেতে চাইলেন না।"

বিশ্বেশ্বর আর কোন কথা না বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। মেয়েটি জুতা খুলিয়া মন্দিরের চাতালে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তার পর স্বামীকে কহিল—"তুমি প্রণাম করবে না?"

স্বামী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল—কহিল—"প্রণাম করেছি দূর থেকেই—" বলিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। ছেলে-মেয়েগুলি কলরব করিতে লাগিল। এক জন কহিল—"আলো নেই, বাজনা-বাদ্যি নেই, কিছু নেই, ছাই পূজো!" একটি ছোট ছেলে বিশ্বেশ্বরকে কহিল, তোমাদের ছাগল নেই? বলি দেবে কি?"

বিশ্বনাথ জবাব দিলেন না। জবাব দিল বাবুলাল—"তোমরাই যে দেশের ছাগল ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছ খোকাবাবু, আমরা কোথায় পাব!"

অমর কহিল—"সত্যি! আপনাদের বলির ব্যবস্থা হয়নি?"

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"আমার সাধ্যে তো কুলোল না। মা যদি পারে তো নিজের বলি নিজে যোগাড় করে নিক।"

অমর মৃদু হাসিয়া কহিল—"তা'তো করেনই মা—কিন্তু তাতে তো আপনার কল্যাণ হবে না।"

অমরের কথার ভাবার্থ বুঝিতে দেরী হইল না বিশ্বেশ্বরের। কান্নার চেয়ে করুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন—"কল্যাণ-অকল্যাণের বাইরে চলে গেছি, ভায়া। যা' নেবার তা'তো নিয়েছে মা। এক টুকরো যা পড়ে আছে—তাতেও যদি লোভ থাকে তো তাই নিক্।"

বাবুলাল ধমক দিয়া কহিল—"দাদা! কি যা' তা' বলছেন পূজোর দিনে! বলির ভাবনা নাই! আমি এখনই যোগাড় করে নিয়ে আসছি।"

বিশ্বেশ্বরের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল—আজ ভর অমাবস্যার মায়ের সামনে দাঁড়াইয়া এ কি কথা উচ্চারণ করিলেন তিনি! দেবীকে স্মরণ করিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন এবং প্রাণাধিক প্রিয় পৌত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন।

যুবক ও যুবতী দেবীদর্শন ও প্রণাম সারিয়া ফিরিয়া আসিতেই অমর মেয়েটিকে কহিল—"হল দেখা?" মেয়েটি লজ্জিত মুখে মৃদু হাসিল। অমর কহিল—"চল তা' হলে"—বিশ্বেশ্বরের কাছে বিদায় লইয়া সকলে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

বাদি ওং পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সকলে চলিয়া যাইতেই হাঁক দিয়া কহিল—"ঐ কেরতা দেওয়া মেয়েটা কে গা বাবুলাল দাদা?"

বাবুলাল কহিল—"গণু বাঁড়ুজ্যের কুটুমের মেয়ে—"

—"তা গণপতির ছোট ছেলে অমরকে দেখলাম না?"

বাবুলাল কহিল,—"হ্যাঁ, এসেছিল—মজা দেখে গেল আর কি!

বাইনাচ হচ্ছে, সাহেব-সুবো এসেছে শুনিয়ে গেল"—বিশ্বেশ্বরকে অনুযোগের সুরে কহিল—"আর আপনার দাদা যার তার কথায় কান দেবার কি দরকার ?"

বালি কহিল—"বলল কি গা ?"

বাবুলাল কহিল—"বলি না হলে অমঙ্গল হবে—এই বলছিল আর কি ?"

বালি খন্-খন্ করিয়া কহিল—"বলি হবে না কেন ? তোমরা পুরুষমানুষ হয়ে সারা গাঁয়ে একটা ছাগল এতক্ষণেও জোগাড় করতে পারলে না। ঐ যে অটলা মুচির একটা বাচ্চা রয়েছে—সেটাকে ধরে নিয়ে এস। অটলা তো মায়ের প্রজা—খাজনা-পত্তর বোধ হয় এক পয়সাও কখনও দেয় না—"

গৌর পূজা থামাইয়া কহিল—"আরে নে-নেহাৎ যা-বাচ্চা যে। মেরে-কেটে এক সেরটাক মা-মাংস হয় কি না সন্দেহ !"

ক্ষুদিরাম কহিল—"তা' হোক—তাই নিয়ে এস বাবুলাল—বলির আর দেরী নাই।"

বালি সোৎসাহে কহিল—"হ্যাঁ—টালমাটাল করবার সময় নাই—নিয়ে এসগে। মায়ের পূজোর বলি না হলে যে মহাপাপ !"

বাবুলাল কহিল—"আমি তো অনেক আগেই বলেছি বালি দিদি—দাদা শুনছিলেন না—বলছিলেন দুধ বিক্রী করে ওদের—"

বালি বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল—"দুধ বিক্রী করে তো সবাইকে বড়লোক করে দিয়ে যাচ্ছে। দাদার চিরদিনই ঐ এক ভালমানুষী ! ঐ করেই তো এই দাঁড়িয়েছে। যেমন ঘোড়া তার তেমনি চাবুক হলে কি এমন হোত !" বাবুলালকে কহিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোবার আর সময় নাই—চলে যাও তোমরা।"

গৌর ও ক্ষুদিরাম উৎসাহ দান করিল।

গ্রামের এক প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে মুচিদের বাড়ী। আগে দশ-বারো ঘর মুচি বাস করিত। এখানে ব্যবসা না চলায় কয়েক ঘর আগেই সহরে চলিয়া গিয়াছিল। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময়ে বাকী কয়েক ঘর সরিয়া পড়িয়াছে। শুধু চিররুগ্ন অটলের সরিয়া পড়িবার সাধ্য ছিল না। তাঁহার ছেলে ছিল না—স্ত্রী-কন্যা লইয়াই সংসার। কন্যাটির বিবাহ দিয়া-জামাইটিকে কাছে রাখিয়াছিল। জামাইটি কিছু কিছু কাজ-কর্ম্ম করিত, ভাল থাকিলে অটল নিজেও কাজ করিত, বিশ্বেশ্বর সময়ে-অসময়ে সাহায্যও করিতেন,—এমনই ভাবে এক-রকম করিয়া অটলের সংসার চলিত। গত বৎসর স্ত্রী তাহার মারা গিয়াছে, জামাইটি সহরে পলাইয়াছে—সেখানে নাকি সে আবার বিবাহ করিয়াছে ; এদিকে তাঁহার শরীরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া উঠিতেছে—নড়িতে চড়িতেও কষ্ট হয় ; একটি ছাগলী আছে—তাহারই দুধ বিক্রয় করিয়া, এখানে-সেখানে ভিক্ষা করিয়া কোন মতে সংসার চলে।

গাঢ় অন্ধকার। পুকুরের ওপারে কতকগুলা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। দূরে মাঠের মধ্যে একটা ফেউ ডাকিতেছে।

ফকির চাপা গলায় কহিল—"শুনছ বাবুকাকা। উঁয়ারা বেরিয়েছেন বোধ হয়—শুশুনের পাহাড়ে তো থাকেন এক-জোড়া !"

বাবুলাল সাহস দিয়া কহিল—"দূর বোকা। কোথায় পাবি ? অমনই ডাকে।"

অটলের বাড়ীর সামনে আসিয়া বাবুলাল ডাক দিল—"এই অটলা ! অটলা !"

অটল কাসিতেছিল—কাসি বন্ধ করিয়া টান-গলায় কহিল—"কে র‍্যা। কে ?"

বাবুলাল কহিল—"দরজাটা খোল্ দেখি !"

অটল বিরক্তির স্বরে কহিল—"এত রাত্রে কিসের লেগে ডাকছ ?"

বাবুলাল কহিল—"দরজাটা খোল না, খুললেই শুনতে পাবি।"

অটল চুপ করিয়া রহিল। বাবুলাল কহিল,—"খোল না—পেসাদ নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব—মা কালীর পেসাদ—বাবু নিজে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

অটল হাঁক দিল—"পটলী ও পটলী, দরজাটা খুলে দে দেখি—বাবুলাল আইছে পেসাদ নিয়ে, বাবু তো বাবু বিশু বাবু। এমন লোক পিথ্‌থিমিতে আর হয় না।"

দরজা খুলিয়া দিয়া পটলী কহিল,—দাও পেসাদ।"

বাবুলাল কহিল—"দিছি দাঁড়া। সর দেখি"—বলিয়া তাহাকে প্রায় ঠেলিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল। অটলের শোবার ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল বাবুলাল ; কহিল—"ওরে অটলা। তোর কটা পাঁঠা আছে বল দেখি ?"

ছিন্ন-মলিন কাঁথার উপরে ঢাকাঢুকি দিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল অটল ; আজন্ম হাঁপানির রোগী সে ; কিছুক্ষণ বাবুলালের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল—"ওঃ। পেসাদ লয়। এই ফন্দী তুমাদের !" ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"আমি জানি ছোটলোককে বাড়ী বয়ে পেসাদ পাঠায়—এমন ভদ্দর লোক জন্মায় নাই পিথ্‌থিমীতে"—হাত নাড়িয়া কহিল—"পাঁঠা কোথায় পাবে ? একটি মাত্র পাঁঠী—"

বাবুলাল কহিল—"বাচ্চা তো আছে ?"

অটল কহিল—"কোথায় পাবে ? দুটো বাচ্চা হয়েছিল—একটাকে হুড়োলে নিয়ে গেছে"—বিরক্তির সহিত কহিল—"যাও বাবু যাও। রাত দুপুরে দিক্ কোরো-নাই। পটলীটার সন্ধ্যে থেকে জ্বর, ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে—যাও দেখি।"

বাবুলাল কড়া গলায় কহিল—যাব বৈ কি। থাকতে এসেছি না কি তোর ঘরে। বাচ্চা পাঁঠাটি দিতে হবে তোকে, বাবু বলে দিয়েছে। বলির পাঁঠা পাওয়া যায় নাই।"

অটল দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল—"ওরে আমার কে রে।" বলিয়া সেই টানেই কাসিতে সুরু করিল।

বাবুলাল কহিল—"বাবু বাচ্চা-শুদ্ধ পাঁঠী তোকে কিনে দেবে বলেছে—"

কাসির ধমকে অটল অস্থির হইয়া উঠিল—কথা বলিবার শক্তি ছিল না—হাত-মুখ নাড়িয়া ক্রমাগত জানাইতে লাগিল—সে কোন কথা, কারও কথা শুনিবে না—"

বাবুলাল কহিল—"জোর করে নিয়ে যেতে হবে তা'হলে। আজ পাঁচ বৎসর তো খাজনার এক পয়সাও ঠেকাসনি। ভালয় ভালয় না দিস তো খাজনার বাবদ পাঁঠার দাম কাটান করিয়ে দিব—"

বাবুলাল চলিয়া আসিল। অটল অনুনয়ের স্বরে কহিল—"উ কাজ কোরো না বাবু দাদা। দুধেল পাঁটী, দুধ বিক্রী করেই বাপ বেটীর খাওয়া চলছে—উপোস দিয়ে মরে যাব দু'জনে। শুনছ। ও বাবুলাল। উ কাজ কোরো না ভাই—"

ফকির কহিল—"হঃ—পাঁঠী! বলে গাইগুলোকে খেয়ে হুড় করে দিচ্ছে!"

বাবুলাল বলিয়া উঠিল—"বেটারা সব রাক্ষস! লঙ্কার যত রাক্ষস মরে—"

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া কহিলেন—"কি হবে?"

বাবুলাল কিছুক্ষণ চিন্তার ভাণ করিয়া কহিল—"আমি আসতে আসতে মনে মনে একটা ঠিক করেছি দাদা, আপনি যদি আপত্তি না করেন—"

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে কহিলেন—"কি?"

বাবুলাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"অটলা মুচির সেই বাচ্চা ছাগলটা—"

বিশ্বেশ্বর প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"ছিঃ ছিঃ, তা কি হয়! ওর মা দুধ বন্ধ করে দেবে—দুধ বিক্রী করেই অটলার সংসার চলছে!"

বিশ্বেশ্বরের ভালমানুষী দেখিয়া বাবুলালের রাগ হইল, বিরক্তির সহিত কহিল—"তা'হলে তো আর উপায় দেখছি না—আপনি যা' ভাল হয় করুন।"

ফকির কহিল—"হলই বা আজ্ঞে! কাজ আমাদের হাঁসিল হয়ে যায়—তার পর একটা দুধেল পাঁঠী ওকে কিনে দিলেই হবেক।"

একটা মোটরের শব্দ কানে আসিল—সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলো! বাবুলাল বিস্ময়ের স্বরে কহিল—এখন আবার হাওয়া গাড়ী চড়ে কে আসছে?" সকলে উৎসুক নয়নে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। অনতিবিলম্বে একটা মোটর আসিয়া থামিল।

গাড়ী হইতে নামিল—একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের সুশ্রী মেয়ে—পরিধানে গরদের দামী সাড়ী, সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা, পায়ে হিল-তোলা জুতা; এক জন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সের সুদর্শন যুবা—দামী পোষাক-পরিচ্ছদ, চোখে চশমা, পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম্প-শু, মুখে ধূমায়মান সিগারেট; এক জন কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়সের ছেলে—পরিধানে মিহি ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে স্যাণ্ডাল এবং কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। কাছে আসিয়া ছেলেটি বিশ্বেশ্বরকে কহিল—"কি দাদামশায়! ভাল আছেন?"

বিশ্বেশ্বর কহিলেন—"হ্যাঁ, বেঁচে আছি কোন মতে—তুমি গণপতির ছেলে অমর না?"

ছেলেটি কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

প্রথম যুবক ও তাহার সঙ্গিনী আগাইয়া গিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বিশ্বনাথ কহিলেন—"ওদের তো চিনতে পারলাম না।"

অমর কহিল—"উনি আমার মাসীমার জামাই, কলকাতার বাড়ী, মস্ত বড়লোকের ছেলে—সঙ্গের মেয়েটি আমার মাসতুতো বোন। আমাদের পূজোর এখনও ঢের দেরী, ভোরের সময় বলি আরম্ভ করতে হবে কি না, না হলে মাংস খারাপ হয়ে যাবে, কাল সারা গাঁয়ের লোক আমাদের ওখানে খাবে তো। রাণীগঞ্জ থেকে নাচওয়ালীরা এসেছে—এখন তাদের নাচ হচ্ছে—মিলিটারী সাহেবেরা, বাবার সহরের বন্ধু-বান্ধবরা নাচ দেখতে এসেছে—বাবা তাদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমার বোন বললে—ভাল লাগছে না—চল গাঁয়ে আর কোথাও পূজো আছে তো দেখে আসা যাক্—তাই নিয়ে এলাম এদের।"

মেয়েটির গলা শোনা গেল—"বাপ রে, এ যে ঘুটঘুটে অন্ধকার! আলো জ্বালেনি কেন?"

যুবকটি জবাব দিল—"কেরোসিন যোগাড় করতে পারেনি বোধ হয়।"

বিশ্বেশ্বর অমরকে কহিলেন—"এখন নিয়ে এলে; তোমাদের জামাই তো আমারও কুটুম্ব—বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে—"

অমর বাধা দিয়া কহিল—"কিছু দরকার নাই। এমনই কারও বাড়ী যান না উনি। আমার নিজের কাকা কাল ওকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন—উনি যেতে চাইলেন না।"

বিশ্বেশ্বর আর কোন কথা না বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। মেয়েটি জুতা খুলিয়া মন্দিরের চাতালে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তার পর স্বামীকে কহিল—"তুমি প্রণাম করবে না?"

স্বামী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল—কহিল—"প্রণাম করেছি দূর থেকেই—" বলিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। ছেলে-মেয়েগুলি কলরব করিতে লাগিল। এক জন কহিল—"আলো নেই, বাজনা-বাদ্যি নেই, কিছু নেই, ছাই পূজো!" একটি ছোট ছেলে বিশ্বেশ্বরকে কহিল, তোমাদের ছাগল নেই? বলি দেবে কি?"

বিশ্বনাথ জবাব দিলেন না। জবাব দিল বাবুলাল—"তোমরাই যে দেশের ছাগল ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছ খোকাবাবু, আমরা কোথায় পাব!"

অমর কহিল—"সত্যি! আপনাদের বলির ব্যবস্থা হয়নি?"

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"আমার সাধ্যে তো কুলোল না। মা যদি পারে তো নিজের বলি নিজে যোগাড় করে নিক।"

অমর মৃদু হাসিয়া কহিল—"তা'তো করেনই মা—কিন্তু তাতে তো আপনার কল্যাণ হবে না।"

অমরের কথার ভাবার্থ বুঝিতে দেরী হইল না বিশ্বেশ্বরের। কান্নার চেয়ে করুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন—"কল্যাণ-অকল্যাণের বাইরে চলে গেছি, ভায়া। যা' নেবার তা'তো নিয়েছে মা। এক টুকরো যা পড়ে আছে—তাতেও যদি লোভ থাকে তো তাই নিক্।"

বাবুলাল ধমক দিয়া কহিল—"দাদা! কি যা' তা' বলছেন পূজোর দিনে! বলির ভাবনা নাই! আমি এখনই যোগাড় করে নিয়ে আসছি।"

বিশ্বেশ্বরের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল—আজ ভর অমাবস্যায় মায়ের সামনে দাঁড়াইয়া এ কি কথা উচ্চারণ করিলেন তিনি! দেবীকে স্মরণ করিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন এবং প্রাণাধিক প্রিয় পৌত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন।

যুবক ও যুবতী দেবীদর্শন ও প্রণাম সারিয়া ফিরিয়া আসিতেই অমর মেয়েটিকে কহিল—"হল দেখা?" মেয়েটি লজ্জিত মুখে মৃদু হাসিল। অমর কহিল—"চল তা' হলে"—বিশ্বেশ্বরের কাছে বিদায় লইয়া সকলে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

বাগদি ও পাতিরা দাঁড়াইয়াছিল—সকলে চলিয়া যাইতেই হাঁক দিয়া কহিল—"ঐ কেরতা দেওয়া মেয়েটা কে গা বাবুলাল দাদা?"

বাবুলাল কহিল—"গপু বাঁড়ুজ্যের কুটুমের মেয়ে—"

—"তা গণপতির ছোট ছেলে অমরকে দেখলাম না?"

বাবুলাল কহিল,—"হ্যাঁ, এসেছিল—মজা দেখে গেল আর কি!

বাইনাচ হচ্ছে, সাহেব-সুবো এসেছে শুনিয়ে গেল"—বিশ্বেশ্বরকে অনুযোগের সুরে কহিল—"আর আপনার দাদা যার তার কথায় কান দেবার কি দরকার ?"

বালি কহিল—"বলল কি গা ?"

বাবুলাল কহিল—"বলি না হলে অমঙ্গল হবে—এই বলছিল আর কি ?"

বালি খন্‌-খন্‌ করিয়া কহিল—"বলি হবে না কেন ? তোমরা পুরুষমানুষ হয়ে সারা গাঁয়ে একটা ছাগল এতক্ষণেও জোগাড় করতে পারলে না ! ঐ যে অটলা মুচির একটা বাচ্ছা রয়েছে—সেটাকে ধরে নিয়ে এস। অটলা তো মায়ের প্রজা—খাজনা-পত্তর বোধ হয় এক পয়সাও কখনও দেয় না—"

গৌর পূজা থামাইয়া কহিল—"আরে নে-নেহাৎ যা-বাচ্চা যে ! মেরে-কেটে এক সেরটাক মা-মাংস হয় কি না সন্দেহ !"

ক্ষুদিরাম কহিল—"তা' হোক—তাই নিয়ে এস বাবুলাল—বলির আর দেরী নাই।"

বালি সোৎসাহে কহিল—"হ্যাঁ—টালমাটাল করবার সময় নাই—নিয়ে এসগে। মায়ের পূজোয় বলি না হলে যে মহাপাপ।"

বাবুলাল কহিল—"আমি তো অনেক আগেই বলেছি বালি দিদি—দাদা শুনছিলেন না—বলছিলেন দুধ বিক্রী করে ওদের—"

বালি বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল—"দুধ বিক্রী করে তো সবাইকে বড়লোক করে দিয়ে যাচ্ছে। দাদার চিরদিনই ঐ এক ভালমানুষী ! ঐ করেই তো এই দাঁড়িয়েছে। যেমন ঘোড়া তার তেমনি চাবুক হলে কি এমন হোত !" বাবুলালকে কহিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোবার আর সময় নাই—চলে যাও তোমরা।"

গৌর ও ক্ষুদিরাম উৎসাহ দান করিল।

গ্রামের এক প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে মুচিদের বাড়ী। আগে দশ-বারো ঘর মুচি বাস করিত। এখানে ব্যবসা না চলায় কয়েক ঘর আগেই সহরে চলিয়া গিয়াছিল। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময়ে বাকী কয়েক ঘর সরিয়া পড়িয়াছে। শুধু চিররুগ্ন অটলের সরিয়া পড়িবার সাধ্য ছিল না। তাঁহার ছেলে ছিল না—স্ত্রী-কন্যা লইয়াই সংসার। কন্যাটির বিবাহ দিয়া-জামাইটিকে কাছে রাখিয়াছিল। জামাইটি কিছু কিছু কাজ-কর্ম্ম করিত, ভাল থাকিলে অটল নিজেও কাজ করিত, বিশ্বেশ্বর সময়ে-অসময়ে সাহায্যও করিতেন,—এমনই ভাবে এক-রকম করিয়া অটলের সংসার চলিত। গত বৎসর স্ত্রী তাহার মারা গিয়াছে, জামাইটি সহরে পলাইয়াছে—সেখানে না কি সে আবার বিবাহ করিয়াছে ; এদিকে তাঁহার শরীরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া উঠিতেছে—নড়িতে চড়িতেও কষ্ট হয় ; একটি ছাগলী আছে—তাহারই দুধ বিক্রয় করিয়া, এখানে-সেখানে ভিক্ষা করিয়া কোন মতে সংসার চলে।

গাঢ় অন্ধকার। পুকুরের ওপারে কতকগুলা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। দূরে মাঠের মধ্যে একটা ফেউ ডাকিতেছে।

ফকির চাপা গলায় কহিল—"শুনছ বাবুকাকা। উঁয়ারা বেরিয়েছেন বোধ হয়—ওগুনের পাহাড়ে তো থাকেন এক-জোড়া।"

বাবুলাল সাহস দিয়া কহিল—"দূর বোকা ! কোথায় পাবি ? ওমনই ডাকে !"

অটলের বাড়ীর সামনে আসিয়া বাবুলাল ডাক দিল—"এই অটলা ! অটলা !"

অটল কাসিতেছিল—কাসি বন্ধ করিয়া টান-গলায় কহিল—"কে য়্যা ! কে ?"

বাবুলাল কহিল—"দরজাটা খোল্ দেখি !"

অটল বিরক্তির স্বরে কহিল—"এত রাত্রে কিসেয় লেগে ডাকছ ?"

বাবুলাল কহিল—"দরজাটা খোল না, খুললেই শুনতে পাবি।"

অটল চুপ করিয়া রহিল। বাবুলাল কহিল,— "খোল না—পেসাদ নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব—মা কালীর পেসাদ—বাবু নিজে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

অটল হাঁক দিল—"পটলী ও পটলী, দরজাটা খুলে দে দেখি—বাবুলাল আইছে পেসাদ নিয়ে, বাবু তো বাবু বিশু বাবু। এমন লোক পিথ্‌থিমিতে আর হয় না।"

দরজা খুলিয়া দিয়া পটলী কহিল,—দাও পেসাদ।"

বাবুলাল কহিল—"দিছি দাঁড়া, সব দেখি"—বলিয়া তাহাকে প্রায় ঠেলিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল। অটলের শোবার ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল বাবুলাল ; কহিল—"ওরে অটলা ! তোর কটা পাঁঠা আছে বল দেখি ?"

ছিন্ন-মলিন কাঁথার উপরে ঢাকাচুকি দিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল অটল ; আজন্ম হাঁপানির রোগী সে ; কিছুক্ষণ বাবুলালের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল—"ওঃ ! পেসাদ লয় ! এই কন্দী তুমাদের !" ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"আমি জানি ছোটলোককে বাড়ী বয়ে পেসাদ পাঠায়—এমন ভদ্দর লোক জন্মায় নাই পিথ্‌খিমীতে"—হাত নাড়িয়া কহিল—"পাঁঠা কোথায় পাবে ? একটি মাত্র পাঁঠী—"

বাবুলাল কহিল—"বাচ্চা তো আছে ?"

অটল কহিল—"কোথায় পাবে ? দুটো বাচ্চা হয়েছিল—একটাকে হুড়োলে নিয়ে গেছে"—বিরক্তির সহিত কহিল—"যাও বাবু যাও ! রাত দুপুরে দিক্ কোরো নাই। পটলীটার সন্ধ্যে থেকে জ্বর, ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে—যাও দেখি।"

বাবুলাল কড়া গলায় কহিল—যাব বৈ কি ! থাকতে এসেছি না কি তোর ঘরে ! বাচ্চা পাঁঠাটি দিতে হবে তোকে, বাবু বলে দিয়েছে। বলির পাঁঠা পাওয়া যায় নাই।"

অটল দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল—"ওরে আমায় কে রে !" বলিয়া সেই টানেই কাসিতে সুরু করিল।

বাবুলাল কহিল—"বাবু বাচ্চা-শুদ্ধ পাঁঠী তোকে কিনে দেবে বলেছে—"

কাসির ধমকে অটল অস্থির হইয়া উঠিল—কথা বলিবার শক্তি ছিল না—হাত-মুখ নাড়িয়া ক্রমাগত জানাইতে লাগিল—সে কোন কথা, কারও কথা শুনিবে না—"

বাবুলাল কহিল—"জোর করে নিয়ে যেতে হবে তা'হলে। আজ পাঁচ বৎসর তো খাজনার এক পয়সাও ঠেকাসনি। ভালয় ভালয় না দিস তো খাজনার বাবদ পাঁঠার দাম কাটান করিয়ে দিব—"

বাবুলাল চলিয়া আসিল। অটল অনুনয়ের স্বরে কহিল—"উ কাজ কোরো না বাবু দাদা। দুধেল পাঁঠী, দুধ বিক্রী করেই বাপ-বেটীর খাওয়া চলছে—উপোস দিয়ে মরে যাব দু'জনে। শুনছ ! ও বাবুলাল ! উ কাজ কোরো না ভাই—"

এক টুকরা চালা। তারই এক পাশে খুঁটীতে বাঁধা ছাগলীটি শুইয়া শুইয়া জাবর কাটিতেছিল—বুকের কাছে ছোট্ট বাচ্চাটি ঘুমাইয়াছিল। পটলী সতর্ক প্রহরিণীর মত দৃঢ় ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়াছিল। বাবুলাল কাছে যাইতেই—পটলী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—"দেব না বাচ্চা—চলে যাও তুমরা—"

বাবুলাল ধমক দিয়া কহিল,—"তোর বাপ দেবে—বাড়ে বাস করছে, খাজনা দেয়নি—তার বদলে পাঁঠা নিয়ে যাব, যা করতে পারে করবে—"

ঝট্ করিয়া বাচ্চাটাকে কোলে তুলিয়া, বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, একেবারে দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া পটলী কহিল—"আমাকে না মেরে পাঁঠা নিয়ে যেতে নারবে তুমরা।"

বাবুলাল রুষ্ট কণ্ঠে কহিল—"দে বলছি, পটলী। না হলে জোর করে কেড়ে নিতে হবে বলছি—"

ও-ঘর হইতে অটল কহিল—"ও বাবুলাল, দোহাই দাদা, উ কাজটি কোরো না দাদা—"

বাবুলাল জবাব না দিয়া কহিল—"হারামজাদী তো ভারী একগুঁয়ে দেখছি। এই ফকরে, নে তো কেড়ে ছুঁড়ির কাছ থেকে!"

ফকির তাহাই চাহিতেছিল। পটলী কুৎসিত, অস্থিচর্ম্মসার, অপরিচ্ছন্ন চেহারা তাহার, তবু ষোল বৎসরের যৌবন তাহার বুকে ফুটিয়া আছে। কত দিন রাস্তায় ঘাটে দেখা হইলে ফকির সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়াছে। কিন্তু পটলী তীব্র বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে।

বাবুলালের কথা শুনিতেই পটলী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বাচ্চাটাকে বুকে লইয়া, উবু হইয়া বসিয়া পড়িল। ফকির পিছন হইতে পটলীকে জাপটাইয়া ধরিয়া বাচ্চাটাকে কাড়িয়া লইতে গিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—"উঃ, কামড়ে দিয়েছে হতভাগী। ওঃ। বাবুকাকা। ছাড়ছে না যে—"

ও-ঘর হইতে অটল ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ও ফকির। ও বাবুলাল। ছেড়ে দাও ওকে—" ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিছ তুমরা। ভেবেছ কি। মগের মুলুক। যাচ্ছি আমি—" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়াই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"ওরে বাবা। উঠতে নারছি যে। ও ভগবান। মেরে দাও আমাকে—"

বাবুলাল আগাইয়া গিয়া ঠাস করিয়া সজোরে চড় মারিল পটলীর গালে—মারিতেই ফকিরের হাত ছাড়িয়া দিল পটলী। ফকির সরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে কহিল—"রক্ত বার করে দিয়েছে—হতভাগী—"

বাবুলাল সক্রোধে সজোরে এক লাথি মারিল পটলীর পিঠে—লাথির ধাক্কায় পটলী কাত হইয়া পড়িয়া গেল। বাবুলাল জোর করিয়া বাচ্চাটাকে কাড়িয়া লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—"হারামজাদী—নচ্ছার, এত বাড় তোর। নিয়ে চললাম তোর পাঁঠা—একটি পয়সাও পাবি না—" বাচ্চাটাকে লইয়া উঠানে নামিয়া দাঁড়াইয়া বাবুলাল হাঁকিয়া কহিল—"এই অটলা—নিয়ে চললাম বাচ্চাটাকে; এক পয়সা দাম পাবি না বলে দিয়ে যাচ্ছি—খাজনার তলে কাটান হয়ে গেল দাম।"

অটল তখন কাঁদিতে সুরু করিয়াছে—"মরণ দাও ভগবান। দুষ্টের দমন কর ভগবান। এ পাঁঠা যেন ঘর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে না হয় ইয়াদের—মাঠে শামুকভাঙ্গা সাপে যেন ছোবলায় উয়াদিগে।"

পটলী দাওয়ায় বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল। ফকির তখনও দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্বলন্ত চোখে তাহার দিকে তাকাইয়াছিল। একটা কুৎসিত গালি দিয়া তাহার দিকে আগাইয়া যাইতেই পটলী ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিল—"এক পা আগিও না বলছি, আবার কামড়ে দেব—"

একটা কুৎসিত গালি দিয়া সরিয়া পড়িল ফকির।

কাপড়-চোপড় সামলাইয়া পটলী কাঁদিতে কাঁদিতে বাবুলাল ও ফকিরের পিছু পিছু ছুটিল—নাকি-সুরে ক্রমাগত বলিতে লাগিল—"ও বাবু দাদা। ফিরিয়ে দিয়ে যাও—মরে যাব আমরা, ফিরিয়ে দিয়ে যাও—"

বলির সময় হইয়া গিয়াছে। গৌর বার বার তাগাদা দিতে লাগিল—"ও জ্যে-জ্যেঠামশায়, এল বাবুলাল? সময় হয়ে গে-গেল যে।

বিশ্বেশ্বর আটচালায় ঘুমন্ত খোকাকে বুকে লইয়া গম্ভীর মুখে নীরবে পায়চারী করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ একটা বোমের আওয়াজ হইল—বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কায় সারা গ্রামটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

গৌর কহিল—"ও-পাড়ায় পূ-পুজোতে বসল বোধ হয়।" বাঁড়ুজ্যে-দের পূজার বিপুল বিচিত্র আয়োজনের সঙ্গে এখানের সামান্য সংক্ষিপ্ত আয়োজনের তুলনা করিয়া গৌরের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

বাবুলাল ও ফকির ফিরিয়া আসিল। বাবুলাল তখনও বলিতেছে—"ওঃ। ছুঁড়িটা কি বজ্জাত। ছাড়তেই চায় না। ফকরের হাতটা কামড়ে রক্তারক্তি করে দিয়েছে—" কাছে আসিয়া কহিল—"একটা পয়সা দিবেন না দাদা। বাপ-বেটী দুটোই বজ্জাতের ধাড়ী—"

ফকির তখনও হাতে হাত বুলাইতেছে।

বাচ্চাটিকে আটচালার মেজেতে নামাইল বাবুলাল। উষ্ণ মাতৃ-বক্ষচ্যুত ছাগ-শিশু থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষীণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

গৌর লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"এনেছ?" তিন লাফে আটচালায় আসিয়া বাচ্চাটাকে দেখিয়াই একেবারে দমিয়া গেল—আর্ত্তকণ্ঠে কহিল—"এতে মায়ের যেন নস্যি হবে নাই গো। আমি ভাবলাম—"

ক্ষুদিরাম হাঁকিয়া কহিল—তা' হোক, তুই চুবিয়ে নিয়ে আয় দেখি—আমি উচ্ছুগ্‌গু করে দিই।"

বাচ্চাটাকে তুলিয়া লইয়া গৌর পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে পটলী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই একটানা কান্না—একই বুলি—"ছেড়ে দাও বাবারা।"

বাবুলাল ধমক দিয়া কহিল—"এখানেও এসেছিস্। চলে যা—না হলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব, বজ্জাত।"

বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া পটলী কহিল—"হেই কর্ত্তা মশায়। ফিরে দেন বাচ্চাটাকে, আমরা মরে যাব না হলে।"

বিশ্বেশ্বর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পটলী হঠাৎ আটচালায় উঠিয়া পড়িয়া বিশ্বেশ্বরের পায়ের কাছে উবুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহার পা ছুঁইবার জন্য হাত বাড়াইতেই বিদ্যুৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। —খালি মন্দিরের চাতালে দাঁড়াইয়াছিল।

করিয়া উঠিল—"এ্যা মরণ! ছুঁয়ে দিবি না কি! ছুঁড়ির সাহস দেখ—আটচালায় উঠেছে! এই কফরে! দে না ছুঁড়িকে টেনে নামিয়ে! দূর করে দে এখান থেকে। ছোটলোকের ভারী বাড় হয়েছে আজ-কাল! হবে না কেন! বাবুরা যে নাচাচ্ছে মাথায় করে আজকাল—মুখে আগুন! মুখে আগুন!"

ফকিরের রাগ এখনও কমে নাই। কড়া-গলায় কহিল—"এই ছুঁড়ি, নেমে আয় বলছি—"

বালি কহিল—"টেনে নামিয়ে দে না। তুই ত আর গোঁসাই-পুত্তুর নয় যে তোর ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার করতে হবে?"

ফকির কহিল—"না গো বামুন পিসি, ভারী বজ্জাত, কামড়ে তায়—এই দেখ না কি করেছে, এক খাবল মাংস তুলে নিয়েছে কামড়ে—"

বালি আটচালায় আসিয়া ফকিরের হাতে ক্ষত-স্থান দেখিয়া গালে হাত দিয়া কহিল—"তাই তো রে! ছুঁড়ির মুখে মার না লাথি, দাঁতগুলো ভেঙ্গে দে।"

পটলী সমানে কাঁদিতেছে—"ও বাবু মশায়! দাও বাচ্চাটাকে!"

বিশ্বেশ্বর ধীর-পদে আটচালা হইতে নামিয়া গেলেন। তার পর মন্দিরের মধ্যে উঠিয়া গিয়া দেবী-প্রতিমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

বালি মারমুখী হইয়া একেবারে পটলীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া উগ্র কণ্ঠে কহিল—"এ্যাই। উঠে যা বলছি—না হলে ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব। আমাকে জানিস্ তো! আর একবার না হয় চান করব—কিন্তু তোকে আর আস্ত রাখব না—"

পটলী কান্না বন্ধ করিয়া বালির রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির দিকে মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্ম তাকাইয়া থাকিল—তার পর আটচালা হইতে নামিয়া গিয়া প্রাঙ্গণের এক পাশে বসিয়া আবার কান্না সুরু করিল—"আমরা মরে যাব বাবু মশায়—আমাদের ভাত মের না বাবু মশায়—"

বলির আয়োজন প্রস্তুত। ছাগশিশুকে স্নান করাইয়া আনিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইল। নির্ব্বোধ ছাগশিশু অভিশপ্ত ছাগ-জন্ম হইতে আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় বিন্দুমাত্র উৎফুল্ল হইয়া না উঠিয়া ভয়ে ও শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একটানা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

বলি করিবে গৌর। গলা টিপিয়াই যে ছাগশিশুর ভব-লীলা সে সাঙ্গ করিয়া দিতে পারে, তাহাকেই হত্যা করিবার জন্ম সে মালকোঁচা মারিল, হাত দুইটা বার দুই মেলিয়া—গুটাইয়া হাতের মাংসপেশীর জড়তা কাটাইয়া লইল, তার পর বাচ্চাটাকে জাপটাইয়া ধরিয়া বলিকাষ্ঠের কাছে লইয়া গিয়া নামাইল। পটলী অদূরে বসিয়া এতক্ষণ মিহি সুরে কাঁদিতেছিল, হঠাৎ হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলি-কাষ্ঠের দিকে ছুটিয়া আসিতেই—ফকির ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল! ধাক্কার চোটে পটলীর অনাহার-ক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

ওদিকে ক্ষুদিরাম ও বাবুলাল তখন ছাগ-শিশুকে বলিকাষ্ঠে পরাইয়া দুই জনে দুই দিকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া, তাহার দেহটাকে চ্যাপ্টা করিয়া দিয়াছে! ছাগ-শিশুর আর্ত্তনাদ করিবারও শক্তি নাই।

দেবী-মূর্ত্তির মুখের দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া, বার দুই তারস্বরে 'মা-মা' বলিয়া হাঁকিয়া, গৌর ভারী খড়্গের আঘাতে ছাগশিশুর সুকোমল কণ্ঠ দ্বিখণ্ডিত করিল। ক্ষুদিরাম রক্তস্রাবী ছাগমুণ্ড ও উষ্ণ রক্তে পরিপূর্ণ মাটীর কটরা দেবীকে নিবেদন করিবার জন্ম মন্দিরে লইয়া গেল, পরাণ ঢাক বাজাইতে বাজাইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল, গৌর রক্তাক্ত খড়্গটা দুই হাতে মাথার উপরে তুলিয়া ধরিয়া এবং বাবুলাল দুই হাত তুলিয়া উন্মত্ত উল্লাসে নাচিতে লাগিল।

পটলী ছাগশিশুর মুণ্ডহীন মৃত দেহটার পাশে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—ও বাবু মশায়! দয়া করলে না—বাবু মশায়! ও মা কালী, এই তোমার মনে ছিল মা! আমার এক কোঁটা বাচ্চার রক্ত না হলে তোমার তিয়াষ মিটছিল না মা!"

বিশ্বেশ্বর দেবী-প্রতিমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। পটলীর বুক-ফাটা কান্না তাঁহার অন্তরকে শূলের মত বিঁধিতে লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল—ক্ষুদ্র ছাগ-শিশুর অপ্রচুর রক্তে দেবীর শোণিত-পিপাসা মিটে নাই। তাই আরও রক্তপানের জন্ম রক্তাক্ত জিহ্বা মেলিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁহার বক্ষলগ্ন পৌত্রের দিকে তাকাইয়া আছেন।

বিশ্বেশ্বর সবলে পৌত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

প্রথমা

শ্রীপ্রশান্তি দেবী

তুমি আজ স্বপ্ন শুধু আর কিছু নয়,
নিশান্তের চন্দ্রলেখা ফুরায়েছে তোমার সময়
কবির অন্তর হ'তে—প্রণয়ের প্রথম স্বপন,
অন্তর বাসর ঘরে চিরবধূ আনত নয়ন।

কোন দিন কর্ম্মহীন পূর্ণিমার উজ্জ্বল নিশীথে
নিদ্রাহীন আঁখি 'পরে অতীতের স্বপ্ন ওঠে ভেসে,
মনে পড়ে কিশোরীর প্রেমে ভরা স্ফুরিত অধর—
হৃদয়ে লাগায় দোলা সচকিত সহসা অন্তর।

তবু তুমি বহু দূরে তোমারে ভুলিতে জানি হবে,
তুমি আজি নির্ব্বাসিতা আমাদের বসন্ত উৎসবে
আজিকার পুষ্পরাগ হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস
কেহ নহ তার মাঝে কোথা তব নাহিক প্রকাশ।

তবু তো ভুলিনি তোমা তুমি যে গো ভুলিবার নয়
তব চোখে দেখেছিনু যৌবনী প্রথম প্রণয়।

সাহিত্যের ষ্টাইল

প্রথম প্রস্তাব

শুভেন্দু ঘোষ

ষ্টাইল কি ?

ইংরেজি সাহিত্যসমালোচনায় ষ্টাইল বলে একটা কথা পাই, বাংলায় আমরা তার নাম দিয়েছি লিখনভঙ্গী বা বাচনরীতি। এ নামকরণ বিশেষ সুবিধার বলে মনে হয় না। ষ্টাইল ঠিক লিখবার বা বলবার—প্রকাশ করবার কোনো ঢং নয়। যেমন বীরবলের ভাষা-ব্যবহারের নিজস্ব কায়দাটাকেই তাঁর ষ্টাইল বললে ভুল হবে।

অনেকের লেখার ষ্টাইলের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে, অনেকটা করা যায়ও; তবু সাহিত্যের সব চেয়ে সেরা ষ্টাইলগুলোই অলঙ্কার-শাস্ত্রের সমস্ত শাসনের বাইরে গিয়ে পড়ে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ষ্টাইল হল সাহিত্যের আত্মা; বহিরঙ্গে তার ব্যঞ্জনা থাকলেও তা সত্যি সত্যি বহিরঙ্গের ব্যাপার নয়।

ষ্টাইল সাহিত্যের অলঙ্কারও নয়, তার অবয়বসংস্থানও নয়! এ কথা সত্যি যে, ষ্টাইলকে বহিরঙ্গের ব্যাপার মনে করে তার বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ষ্টাইল যেন একান্তভাবে অবয়বের সংস্থানেরই উপর নির্ভর করে! ফ্লোবেয়রকে ফরাসী গদ্য-সাহিত্যে ষ্টাইলের রাজা বলা হয়, তিনি না কি মাত্র একটা বাক্য রচনার জন্তে অনেক সময় দু'-চারটে দিনই কাটিয়ে দিতেন, তাঁর মতে, "বাক্যাংশ বেঁচে থাকতে পারে তখনই যখন তা শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক প্রবাহকে একটুকু ব্যাহত করে না। যখন দেখি সেটা বেশ জোর গলায় পড়া চলছে, তখন বুঝি সেটা ঠিক হয়েছে। খারাপ করে তৈরী বাক্য এ পরীক্ষায় উৎরোতে পারে না,—বুকের ওপর ভারের মত ঠেকে, স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনে বাধা দেয়, সুতরাং জীবন-ক্ষেত্রের একেবারে বাইরে গিয়ে পড়ে।"

সার ওয়াল্টার র‍্যালের ষ্টাইলের উৎকর্ষের কথা বলতে গিয়ে ধরোও এই ধরণের কথা বলেছেন—ঐ স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বাক্যের তাল রেখে চলার কথা।

ভালো ষ্টাইল কি, বোঝাতে গিয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলছেন, "ভালো ষ্টাইল হচ্ছে ঐ যে সূর্য্যরশ্মিটা জানলার সার্সির ওপর ঝক্‌ঝক্‌ করছে ঐটার মত। সাতটা বর্ণ দিয়ে ওটা তৈরী, সাতটা বর্ণের ঘনিষ্ট সমাবেশে ওর ঐ বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা। সহজ ষ্টাইল হচ্ছে সাদা আলোর মত; আসলে ওটা জটিল, কিন্তু বোঝবার জো নাই! ভাষায় সত্যিকার সরলতা—যে সরলতা শ্রেয় এবং প্রেয়, তা মোটেই সরল নয়; উপর উপর দেখলে সরল বলে মনে হয় মাত্র। সমগ্রটার বিভিন্ন অংশের সূক্ষ্ম সমন্বয় এবং সার্ব্বভৌম সংযম থেকে এর উদ্ভব।"

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক প্রবাহের-সঙ্গে তাল রেখে রেখে এই যে বাক্যের গতি,—(হৃদয়াবেগের সঙ্গে আবার শ্বাসপ্রশ্বাসের নিবিড় সংযোগ আছে),—বিভিন্ন অংশের এই সমন্বয়, এই সংযম—এ সব কি আঙ্গিক-সাধনা থেকেই পাওয়া যায়? শব্দ, বর্ণ, ধ্বনি, ছন্দ—ভাষার মধ্যস্থতার [illegible] এই উপাদানগুলো থাকলেই কি রসকে প্রকাশ করা চলে? রস তো গণিতেরা, সাধারণ মাপ-জোপের আয়ত্তাধীন, অভ্যস্ত দুনিয়ার সত্য নয়; অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করাই যে সাহিত্যের সত্যকার পরিচয়। রোটেনষ্টাইন ঠিকই বলেছেন; "আঙ্গিক জাল ছাড়া আর কি, যেটুকু সত্য তাতে ধরে সেই সত্যটুকুকে ধরবার একটা জাল। জাল যদি অতি স্পষ্ট করে দেখা যায় তাহলে লাজুক, চমক-দিয়ে-চলে-যাওয়া প্রকৃতির সত্যকে ধরা যায় না। আঙ্গিক বলতে রোটেনষ্টাইন অবশ্য বাঁধাধরা আঙ্গিকের কথাই বলেছেন। অবশ্য, এ কথা সত্যি যে আঙ্গিকের অধিকার থাকলে অনির্বচনীয়কে ধরবার অনেক সময় কতকটা সুবিধা হয়। শুধু, ষ্টীফান্‌-ৎস্‌ইগের মত স্বীকার করতেই হয়, "আমরা যাকে জীবন বলি সেই অবিরত গতিকে সীমার মধ্যে ধরে দেওয়া কী শক্ত!"

ষ্টাইলের দিক থেকে সাহিত্যকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, এক হচ্ছে সহজ প্রেরণায় সাহিত্য, রস এতে চিত্তের গভীর উৎস হতে উৎসারিত হয়ে আপনা থেকেই যেন রূপ ধরে ওঠে। এরকম রচনা কোন্ নিয়মে জন্ম নেয় তার হদিশ পাওয়া যায় না। —"There is a certain perfection in accident which we never consciously attain." এ ধরণের রচনা অনবদ্য; বিশ্লেষণ করে যেমন পূর্ণতার বোধ পাওয়া যায় না, এগুলোর ষ্টাইলেরও তেমনি বিশ্লেষণ সম্ভব বলে মনে হয় না। আমাদের বাংলা ভাষায়, ঈশান যুগী প্রভৃতির দু'-চারটে বাউল গান হচ্ছে অবিমিশ্রভাবে এই ধরণের রচনা। সংস্কৃত উপনিষদ্-এ এই ষ্টাইলের বহু দৃষ্টান্ত মেলে। অবশ্য এ ষ্টাইলে একটানা দীর্ঘ-রচনা পৃথিবীতে খুবই কম।

দ্বিতীয়ত: পাচ্ছি সেই সাহিত্য, যাতে রস সিধে মূর্ত্তি ধরে বেরুতে পারেনি বটে কিন্তু প্রকাশ পাবার জন্তে শিল্পীর চিত্তকে মথিত করে মানুষের বা প্রকৃতির কাছে চিত্ত যা কিছু সৃষ্টি-রীতি শিখেছে তার সমস্তকে প্রয়োজন মত কাজে লাগায়। এ ধরণের সাহিত্যে প্রকৃতি নিজেই কথা বলে না, তার মুখের কথা শোনানো হয়। সুতরাং এর ষ্টাইল প্রকৃতির মত নৈর্ব্যক্তিক, নির্বিকার হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত: হচ্ছে যাকে বলা চলে কারিগরী সাহিত্য—এ সাহিত্যে রচয়িতা আঙ্গিকের জাল ফেলে সত্য ধরবার চেষ্টা করে। এ সাহিত্য হচ্ছে ফ্যাসনের সাহিত্য—আনুষ্ঠানিক সাহিত্য। সুতরাং এর ষ্টাইলও হচ্ছে ফ্যাসনের,—কৃত্রিম,—মেক-আপ-সর্বস্ব।

* * * *

ছবি আর ফোটোগ্রাফ এক জাতের জিনিষ নয়; ফোটোগ্রাফ বিষয়কে বাস্তবত: যথাযথভাবে ধরে দিয়েই খালাস,—তার বেশী তার কাছ থেকে আমরা আশা করি না। আর ছবি হচ্ছে নতুন একটা সৃষ্টি,—বিষয়ের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র নয়। যথাযথ হবার দায় তার নয়, আমাদের সত্তার স্বীকৃতি পেলেই তা সার্থক। ধরা যাক্, একই গাছের একটা ছবি আর ফোটোগ্রাফ পাওয়া গেল। ফোটোগ্রাফে পাচ্ছি গাছটাকে মাত্র—যে গাছটা আমরা দেখি বটে তবু দেখি না,—যা থেকেও নাই,—অরবিন্দের ভাষায়, যা হচ্ছে 'dead existence' আর ছবিটাতে ঐ গাছটাকেই পাচ্ছি আপনজনের মত সত্য করে—'a living presence to the spirit'। ছবিতে গাছটার শুধু বাহ্যরূপ মাত্র পাচ্ছি না—তাকে অন্তরে পেয়ে, অনুগত হয়ে, চিত্রকরের [illegible] পাচ্ছি।

সাহিত্য হচ্ছে ছবির জাতের। তারও কাজ হচ্ছে মানবসত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার যে নিগূঢ় আত্মীয়তা আছে—যে গোপন ঐক্যবোধ আছে সেইটাকে প্রকাশ করা। আমি দেখি বা না দেখি, গাছটা আছে—তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে; আমিও আছি। কিন্তু যেই গাছটাকে আমার ভাল লাগল, গাছটা আমার কাছে আর সে-গাছ রইল না,—আমিও আর সে-আমি রইলাম না: গাছ আর আমি আর স্বতন্ত্র রইলাম না—পুরোনো রইলাম না—নতুন হয়ে উঠলাম। এই নতুনকে চেনার বিস্ময় হল প্রকাশ বেদনার মূলে; এ বিস্ময় অনির্বচনীয়। লেখার যে বিশেষ গুণে এই অনির্বচনীয় বিস্ময় অক্ষের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে সেইটাই সাহিত্যের ষ্টাইল।

আমরা তো অবিরতই নানান্ জিনিষ দেখছি—কল্পনা করছি। সে সবই ভাসা ভাসা ভাবে। আমাদের চিত্তকে সেগুলো স্পর্শ করছে না। তার কারণ, সেগুলোকে আমরা দেখছি আমাদের সংসারযাত্রার তাদের প্রয়োজন অপ্রয়োজনের হিসেবের চশমার মধ্যে দিয়ে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সংসারী দৃষ্টিটাই বেশী রকম সক্রিয়। এ ছাড়াও আর একটা দৃষ্টি আছে—সেটাকে বলা যেতে পারে নিষ্কাম ভোগীর দৃষ্টি। উপনিষদে এই দুই রকমের দৃষ্টির সম্বন্ধে চমৎকার একটা আখ্যান আছে:—এক পিপুল গাছে দু'টো পাখী চিরকাল একত্র বাস করত, তাদের একটা খেত পিপ্পলের মিষ্টি ফলগুলো, আর একটা দেখেই আনন্দ পেত। আমাদের মধ্যে যে মানুষটা দেখেই আনন্দ পায়, সেই মানুষটাই হল কবি, শিল্পী। আমাদের মধ্যেকার এই বৈরাগী মানুষটাই অকারণে খুসী হয়ে উঠতে পারে—গাছটা আছে বলে, ফুলটা ফুটছে বলে, শিশুটা উঠে বসবার চেষ্টায় গড়াগড়ি দিচ্ছে বলেই, থুরথুরে বুড়োটির কথাগুলো পাখীর মত ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ে চলছে বলেই, সে খুসী। কী কাজে লাগবে তার মাপ-কাঠিতে সে সত্তাকে যাচাই করে না—প্রয়োজনের মাপে তাকে ছোটো করে না—সে যে সেই—এই মহাবিস্ময় তাকে আনন্দে আত্মহারা করে তোলে। প্রয়োজনকে ত্যাগ করেই তার ভোগ। প্রয়োজনের হিসাব সে রাখে না বলেই আমাদের মধ্যেকার এই বৈরাগী মানুষটি কোনো কিছুকে খাটো করে দেখে না—সব কিছুকে 'স্বে মহিম্নি' দেখতে পায়।

মানুষের আত্মা আছে, মানুষ বিশ্বের সব কিছুকে অনুভব করতে পারে। এখানে অনুভব শব্দটা তার ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করছি। মানুষ সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে—সব কিছুতে তদ্‌গত হতে পারে। এই অনুভব করাটাই আনন্দ। 'স্বে মহিম্নি' যখন কাউকে দেখলাম, তাকে অনুভব করাতে আর বাধা হইল না—ভালোবেসে তার মধ্যে আত্মহারা হওয়ায় আর কোনো বাধা রইল না। সেটাকেও পূর্ণ মহিমায় দেখলাম, আপন আত্মাকেও। প্রেম হলে শুধু প্রিয়ই পূর্ণ গৌরবে দেখা দেয় না, প্রেমিকও বলে ওঠে, "তুমি মোরে করেছ সম্রাট্।" যা বলছিলাম, নিজের এই প্রসার বোধ, এতেই আনন্দ.—"ভূমৈব সুখম্"। সংসারী মনের খণ্ডিত দৃষ্টিতে যা নিরর্থক, যা অসুন্দর, বৈরাগী মনের সমগ্র দৃষ্টিতে—স্বে মহিম্নি দেখার গুণে তাই হয়ে ওঠে সার্থক, সুন্দর, সত্য। যা অভ্যস্ত দুনিয়ায় বেদনাময় বা কুশ্রী বলে মনে হয়, বৈরাগী দৃষ্টিতে বিস্ময়ের দুনিয়ায় তাও অপরূপ সুন্দর হয়ে ওঠে। ক্লিওপেট্রাকে আমাদের ভালো লোকেরা কেউ সুচরিত্রা বলবেন না; এই ক্লিওপেট্রাকেই সেক্সপীয়র আমাদের কাছে হাজির করেছেন তাঁর অপরূপ মহিমায়। ক্লিওপেট্রাতে আমরা দেখছি আদিম প্রবৃত্তির দুর্জয় শক্তি, বিরাটের একটা স্ফূর্তি। এ প্রসঙ্গে শেখভের 'ডার্লিং' গল্পটা মনে পড়ে; এক নারী যখন যে মানুষকে পাচ্ছে কাছে, তাকেই প্রাণভরে ভালোবাসছে। সুরুতে শেখভ চেয়েছিলেন ঐ নারীর চরিত্রকে ব্যঙ্গ করতে; রূপ দিতে গিয়ে অজান্তে তিনি তাকে ভালোবেসে ফেললেন, তাকে আবিষ্কার করে ফেললেন! গল্পে ফুটে উঠল ডার্লিং-এর চিরন্তন রূপ, নারী-চরিত্রের মহিমা। সামাজিক সংস্কারের চোখে যা কুশ্রী ছিল, বৈরাগী দৃষ্টিতে সুনীতি-দুর্নীতির হিসেব কাটিয়ে উঠে তা সুন্দর হয়ে দেখা দিল।

সাহিত্যে বিষয় যখন নিজ মহিমায় প্রকাশ পায়, তখন সাহিত্য হয় সার্থক। আঙ্গিক দিয়ে অলঙ্কার দিয়ে ঐ মহিমাকে প্রকাশ করা যায় না; ওটা হচ্ছে কায়ার ভিতর দিয়ে ফুটে-ওঠা আত্মার জ্যোতির মত। লেখার যে গুণে সেটা প্রকাশ পায়, তাকেই বলা যায় ষ্টাইল।

—গান—

কানাই সামন্ত

আমার গানে গানে
সুর-উপহার পাঠাই যে কার পানে
কে জানে কে জানে।
থাকে সে কোন্ সুদূর নন্দনে,
সুরের ফুলে সুরের চন্দনে
সাজাই তারে, সুরের বন্ধনে
দূরের থেকে বাঁধতে যে চাই
সাধতে যে চাই
কে জানে কে জানে
আমার গানে গানে।

ভিখারিণীর বেশে সে কি
পথে পথেই ফিরে?
দেখেও তায় হয় না দেখা,
দিশা হারাই পথিকজনের ভিড়ে।
দেবের প্রসাদ-সুধা কি তার কাছে—
পারিজাতের গাঁথন গাঁথা আছে?
একলা তরীর হালে আমার
পালের পাছে পাছে
চোখের জলে জোয়ার জাগে
তার কি দীর্ঘনিশ্বাস লাগে
কে জানে কে জানে
আমার গানে গানে।

মহামুনি শ্রীভরত-কৃত

নাট্যশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪

মূল :—কাপাস অথবা বাল্বজ, মৌঞ্জ অথবা বাল্কল—সূত্র বুধগণ-কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য—যাহার ছেদ থাকিবে না। ৩৪।

সঙ্কেত :—কার্পাসং বাল্বজং বাপি বাল্কলং মৌঞ্জমেব চ (কাশী)···বাল্কলং চাপি বাল্বজং মৌঞ্জমেব চ—···শণজং বাপি বাল্কলং মৌঞ্জমেব চ (পাঠান্তর, বরোদা সং)। কার্পাস—কাপাস-তুলোর সূতা। বাল্বজ—বল্বজ-তৃণ-নির্ম্মিত সূত্র; বল্বজ এক প্রকার তৃণ। মৌঞ্জ—মুঞ্জা-তৃণ-নির্ম্মিত সূত্র; মুঞ্জাও তৃণ-বিশেষ। বাল্কল—বল্কল হইতে প্রাপ্ত সূত্র। যস্য চ্ছেদো ন বিদ্যতে—যাহার ছেদ থাকে না—অর্থাৎ যাহা সহজে ছিন্ন হয় না—দৃঢ় সূত্র। এই শ্লোকটি হইতে বরোদা-সংস্করণের শ্লোকসংখ্যা ভুল ছাপা হইয়াছে (৩১—হইবে ৩৪)।

মূল :—সূত্র অর্দ্ধচ্ছিন্ন হইলে স্বামীর ধ্রুব মরণ হইয়া থাকে; রজ্জু ত্রিভাগ ছিন্ন হইলে রাষ্ট্রকোপ বিহিত হইয়া থকে। ৩৫।

সঙ্কেত :—অর্দ্ধছিন্ন মাপের সূতা যদি আধা-আধি ছিঁড়িয়া যায়। স্বামীর—প্রেক্ষাগৃহের অধিপতির, অর্থাৎ—মালিকের। ধ্রুব—নিশ্চিত। ত্রিভাগচ্ছিন্ন—তিন ভাগের এক ভাগ ছিঁড়িলে রাজরোষ উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রকোপ—দুইরূপ অর্থ হয়—(১) রাজা কুপিত হন, (২) রাজার উপর দৈব-কোপ হইয়া থাকে। পাঠান্তর—রাষ্ট্রকোপো বিধীয়তে—রাষ্ট্রকোপোঽভিধীয়তে—রাষ্ট্রক্ষোভো বিধীয়তে—রাষ্ট্রং কোশশ্চ হীয়তে (রাষ্ট্র ও কোশের হানি হয়)।

মূল :—পক্ষান্তরে চতুর্ভাগ ছিন্ন হইলে প্রযোক্তার নাশ কথিত হইয়া থাকে। অথবা হস্ত হইতে প্রভ্রষ্ট হইলেও কোনরূপ অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা। ৩৬।

সঙ্কেত :—চতুর্ভাগ—এক-চতুর্থ অংশ। প্রযোক্তা—নাট্যাচার্য্য (অ: ভা:, পৃ: ৫৬)। অপচয়—ক্ষতি। হাত হইতে মাপের সূতা খসিয়া পড়িলে কোন না কোন ক্ষতির একান্ত সম্ভাবনা।

মূল :—সেই হেতু নিত্য প্রযত্ন-সহকারে রজ্জুগ্রহণ অভিলষিত। পক্ষান্তরে, নাট্যগৃহের মানও প্রযত্ন-সহকারেই কর্ত্তব্য। ৩৭।

সঙ্কেত :—প্রযত্ন-সহকারে রজ্জুগ্রহণ—যাহাতে রজ্জু অচ্ছিন্ন থাকে ও হস্ত হইতে প্রভ্রষ্ট না হয়, এরূপ প্রযত্নসহকারে রজ্জুগ্রহণ কর্ত্তব্য। নিত্য—সর্ব্বদা; কেবল প্রথমবার মাপিবার সময়ই রজ্জু-গ্রহণ প্রযত্ন-সহকারে কর্ত্তব্য এমন নহে—যেহেতু অন্য সময়েও (যথা—স্তম্ভ-সন্নিবেশের সময়েও) সাবধানে রজ্জুগ্রহণ কর্ত্তব্য। প্রযত্ন-সহকারে মান কর্ত্তব্য—যাহাতে নাট্যগৃহের পরিমাণ অল্প বা অধিক না হয়—ন্যূনাধিক্য-দোষ বর্জ্জনের নিমিত্ত যত্ন কর্ত্তব্য। এই তাৎপর্য্য বুঝাইতে একই শ্লোকে দুইবার 'প্রযত্নসহকারে' পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে—অথচ তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই (অ: ভা:, পৃ: ৫৬)।

মূল :—অনুকূল মুহূর্ত্তে, তিথিতে, শোভন করণে ব্রাহ্মণগণের তর্পণপূর্ব্বক অনন্তর পুণ্যাহ বাচন করিতে হইবে। ৩৮।

তৎপর শান্তিবারি দান করিয়া তদনন্তর সূত্র প্রসারিত করিবে।

সঙ্কেত :—অনুকূল মুহূর্ত্ত—যথা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। অনুকূল তিথি—ভদ্রা তিথি। অনুকূল করণ—বিষ্টিকরণাদি-বর্জ্জিত (অ: ভা: পৃ: ৫৬)। শান্তিতো যত্নতো গৃহ্য তত্র সূত্রং প্রসারয়েৎ (কাশী); শান্তিতোয়ং ততো দত্ত্বা ততঃ···(বরোদা)।

মূল :—চতুঃষষ্টি হস্ত দ্বিধাভূত করিয়া তাহার পর পুনরায়—।৩৯।

পৃষ্ঠভাগে যে ভাগ থাকিবে, দ্বিধাভূত তাহার সম-অর্দ্ধবিভাগানুসারে রঙ্গশীর্ষের প্রকল্পনা করিতে হইবে। ৪০।

সঙ্কেত :—অভিনব অতি স্পষ্ট ভাষায় রঙ্গগৃহের নক্সা ছকিয়া দিয়াছেন—দৈর্ঘ্যে চতুঃষষ্টি হস্ত ও বিস্তারে দ্বাত্রিংশৎ হস্ত একটি ক্ষেত্র লইয়া উহার ঠিক মধ্যস্থলে বিস্তারক্রমে (অর্থাৎ আড়াআড়ি—চওড়ার দিকে) সূত্র বিস্তার করিতে হইবে। উহাতে প্রযোক্তার পৃষ্ঠের দিকে যে অংশ থাকে, তাহারই নাম 'পৃষ্ঠ' (অর্থাৎ—প্রযোক্তা দর্শকগণের প্রতি সম্মুখ করিয়া রঙ্গপীঠে দাঁড়াইলে যে দিকে তাঁহার পিঠ থাকে, তাহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা—'পৃষ্ঠ')। তাহার (অর্থাৎ পৃষ্ঠের) মধ্যভাগে বিস্তারক্রমে (চওড়া-চওড়া ভাবে) সূত্র-বিস্তার করিতে হইবে। তাহা হইলে পৃষ্ঠের দুইটি ভাগ হইল—প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য—ষোড়শ হস্ত। উহার পৃষ্ঠগত ভাগটিকে আবার অর্দ্ধবিভক্ত করিলে—অষ্ট-হস্ত-পরিমিত 'রঙ্গশিরঃ' হইবে। উহা রঙ্গপীঠে প্রবেশকারী পাত্রগণের মধ্যগত স্থান—অর্থাৎ—নেপথ্য ও রঙ্গপীঠের মধ্যবর্ত্তী এই 'রঙ্গশিরঃ'। নাট্যমণ্ডপকে যদি উত্তানভাবে সুপ্ত কোন পুরুষের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে এই অষ্ট-হস্ত দীর্ঘ রঙ্গশিরঃ উহার মস্তক-স্থানীয় হয়—আর মুখ-স্থানীয় হয়—'রঙ্গপীঠ'। রঙ্গশিরের পৃষ্ঠভাগে দৈর্ঘ্যে ষোড়শ হস্ত ও বিস্তারে বত্রিশ হস্ত 'নেপথ্য'-গৃহ। ইহাই অভিনবের উক্তির সারাংশ। নাট্যমণ্ডপের চিত্রখানি দেখিলেই সকল বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইবে। চিত্রখানি আগামী কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

পাঠান্তর :—"চতুঃষষ্টিং করান্ কৃত্বা দ্বিধা কুর্য্যাৎ পুনশ্চ তান্ ।৩৪। পৃষ্ঠতো যো ভবেদ্ভাগো দ্বিধাভূতো ভবেচ্চ সঃ। তস্যার্দ্ধেন বিভাগেন রঙ্গশীর্ষং প্রযোজয়েৎ" । ৩৫ ।—কাশী; তস্যাপ্যর্দ্ধার্দ্ধভাগে তু—এ পাঠ ধরিলে—রঙ্গশীর্ষের দৈর্ঘ্য হয় চার হাত মাত্র।

মূল :—যথাবিধি যথাযথ ভাবে আনুপূর্ব্বী-অনুযায়ী ভাগ সমূহ বিভাগ করিয়া অনন্তর পশ্চিম বিভাগে নেপথ্যগৃহের আদেশ করিবে। ৪১।

সঙ্কেত :—পশ্চিম বিভাগে—পশ্চাদ্দেশে—পৃষ্ঠদেশে। রঙ্গশীর্ষের পশ্চাতে—পৃষ্ঠভাগে নেপথ্যগৃহ—ইহাই অর্থ। আর রঙ্গশীর্ষের সম্মুখে—মুখদেশে রঙ্গপীঠ। অভিনব বলিয়াছেন—রঙ্গপীঠ বিস্তারে ষোড়শ হস্ত ও দৈর্ঘ্যে অষ্ট হস্ত—ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। মতান্তরে—উহার বিপরীত মাপ—দৈর্ঘ্যে ষোড়শ হস্ত ও বিস্তারে অষ্ট হস্ত। অভিনব বিশেষ কিছু এ সম্বন্ধে না বলিয়া কেবল উল্লেখ করিয়াছেন যে, রঙ্গপীঠও নাট্যমণ্ডপের মত বিকৃষ্টাকৃতি হইবে—"রঙ্গো বিকৃষ্টো ভরতেন কার্য্যঃ" (না: শা: ১২।১১)।

মূল :—আর শুভনক্ষত্র-যোগে মণ্ডপের নিবেশন। শঙ্খ-দুন্দুভির নির্ঘোষ সহ মৃদঙ্গ-পণবাদি সকল প্রকার আতোদ্য বাদিত করিয়া স্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। ৪২-৪৩।

সঙ্কেত :—নিবেশন—মণ্ডপের ইষ্টকা-স্থাপন (অ: ভা:, পৃ: ৫৮)। ইহাই বর্ত্তমানে ভিত্তি-স্থাপন বা নাট্যগৃহারম্ভ বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বাতোদ্যৈঃ প্রণুদিতৈঃ (বরোদা)—সর্ব্বতূর্য্যনিনাদৈশ্চ (কাশী)। প্রণুদিত—বাদিত; একযোগে চালিত। স্থাপন—ইষ্টকা-স্থাপন—ভিত্তিস্থাপন।

মূল :—পক্ষান্তরে, অনিষ্ট-সমূহ উৎসারিত করা কর্ত্তব্য—আর পাষণ্ডি-আশ্রমভুক্ত, কাষায়-বসনধারী ও বিকল যে সকল নর (তাহাদিগেরও উৎসারণ কর্ত্তব্য)। ৪৩-৪৪।

সঙ্কেত :—অনিষ্ট—যাহা ইষ্ট নহে—অপ্রিয়-দর্শন বস্তু ও প্রাণী। পাষণ্ডি-আশ্রম—যাহারা বেদবিরোধী নাস্তিক, তাহাদিগের নাম 'পাষণ্ডী'; কাষায়-বসনধারী—বৌদ্ধভিক্ষু বুঝাইতেছে। নাস্তিক, বৌদ্ধভিক্ষু, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি ব্যক্তিগণকে নাট্যগৃহের ভিত্তি-স্থাপনকালে সম্মুখে থাকিতে দেওয়া অনুচিত।

মূল :—আর রাত্রিতে দশ দিক্ আশ্রয় করিয়া নানারূপ ভোজ্য-দ্রব্য-সংযুক্ত-গন্ধ-পুষ্প-ফল-যুক্ত বলি (প্রদান) কর্ত্তব্য। ৪৪-৪৫।

সঙ্কেত :—চারি দিক্, চারি বিদিক্ (কোণ), ঊর্দ্ধ ও অধঃ—এই দশ দিক্। দশ দিক্ আশ্রয় করিয়া বলি প্রদান করিবে—অর্থাৎ দশ দিকে বলি দিবে। কিন্তু এই কথা বলিবার পরই চারিটি মাত্র দিকে বলি-প্রদানের ব্যবস্থা উক্ত হইতেছে।

মূল :—পূর্ব্ব (দিকে) শ্বেতবর্ণ অন্নযুক্ত বলি, দক্ষিণে নীল (বলি হইবে), পশ্চিমে পীত বলি, আর পক্ষান্তরে, রক্ত উত্তরে।৪৫-৪৬।

পক্ষান্তরে যে (সকল) দিকে যেরূপ দেবতা পরিকল্পিত (আছেন) তথায় সেইরূপ মন্ত্র-পুরস্কৃত বলি দাতব্য। ৪৬-৪৭।

সঙ্কেত :—দশ দিকে বলিদান কর্ত্তব্য বলিয়া মাত্র চার দিকের উল্লেখ করা হইল কেন?—ইহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—বাকি অবান্তর দিক্গুলির সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে সাধারণ বিধি উক্ত হইয়াছে—দেবতানুযায়ী বলি হইবে। অতএব, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ বলি হইবে। মন্ত্রপুরস্কৃত: (মূল)—মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক। মন্ত্রগুলি রঙ্গপূজাবিধি-কালে বর্ণিত হইবে। এই মন্ত্রগুলির একটা বিশেষত্ব এই যে—এই মন্ত্র-দ্বারা স্মৃত কর্ম্ম করার বিধি স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মতান্তরে তত্তদ্দেবতাময় শ্রুতিমন্ত্র-দ্বারাই বলিকর্ম্ম কর্ত্তব্য। অপরে বলেন—তত্তৎ দেবতার চিহ্ন-বিশিষ্ট মন্ত্র দ্বারাই বলিকর্ম্ম করণীয়।

মূল :—আর স্থাপনে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে ঘৃত-পায়স দাতব্য।৪৭।

আর রাজাকে মধুপর্ক ও কর্ত্তৃপক্ষগণকে গুড়-মিশ্র অন্নদান কর্ত্তব্য। ৪৮।

সঙ্কেত :—অভিনব বলিয়াছেন—কেবল যে মাপিবার উপক্রমেই ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিবিধান কর্ত্তব্য—তাহা নহে। কারণ স্থাপনেও ব্রাহ্মণ-তর্পণ কর্ত্তব্য।

মূল :—পক্ষান্তরে, বুধগণ-কর্ত্তৃক মূলা (নক্ষত্রে) স্থাপন কর্ত্তব্য।৪৮।

অনুকূল মুহূর্ত্তে, তিথিতে ও সুকরণে—এইরূপে স্থাপন করিয়া ভিত্তিকর্ম্মের প্রয়োগ করিবে। ৪৯।

সঙ্কেত :—প্রথমে মানবিধি—নাট্যমণ্ডপ, রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গপীঠ, নেপথ্যগৃহ ইত্যাদির মাপ করিবার বিধান। পরে স্থাপন বিধি—ইষ্টকা-স্থাপন। পরে ভিত্তিবিধি—অবশেষে স্তম্ভবিধি।

মূল :—ভিত্তিকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পর (শুভ) তিথিনক্ষত্র-যোগে শুভ করণে স্তম্ভ-সমূহের স্থাপন (কর্ত্তব্য)। ৫০।

রোহিণী অথবা শ্রবণা (নক্ষত্রে) স্তম্ভ-সমূহের স্থাপন কর্ত্তব্য।

সঙ্কেত :—স্তম্ভ-স্থাপন—স্তম্ভ উচ্ছ্রয়ণ (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৫১); থাম বসান—পিলপে গাঁথা। নিবেশন বা ইষ্টকা-স্থাপন বা ভিত্তি-স্থাপন হইতে স্তম্ভ-স্থাপন সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার।

মূল :—সুসংযত ও ত্রিরাত্র উপবাসী আচার্য্য-কর্ত্তৃক—। ৫১।

শুভ সূর্য্যোদয় (কাল) উপস্থিত হইলে স্তম্ভ-সমূহের স্থাপন কর্ত্তব্য।

প্রথমে ব্রাহ্মণস্তম্ভে ঘৃত-সর্ষপ-সংস্কৃত—। ৫২।

সর্ব্বশুক্ল বিধি কর্ত্তব্য। আর পায়স-মাত্র প্রদেয়।

সঙ্কেত :—প্রথম ব্রাহ্মণ-স্তম্ভের স্থান আগ্নেয় কোণ—ইহা অভিনব বলিয়াছেন। সর্ব্বশুক্লবিধি—পুষ্প-চন্দন-বস্ত্র-মাল্য-নৈবেদ্য ভোজ্য ইত্যাদি সকল পূজোপকরণ শ্বেতবর্ণের হইবে। এসব স্তম্ভপূজার উপকরণ। সর্পিঃ সর্ষপসংস্কৃতঃ (মূল)—ঘৃত-সর্ষপ-মিশ্রিত উপকরণ-গুলি প্রদেয়। পায়স—পয়ঃ অর্থে দুগ্ধ; পায়স—দুগ্ধের বিকার—ঘন দুগ্ধ (যাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় ক্ষীর বলা হয়) ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ-গণকে পায়স প্রদান করিতে হইবে—ইহা প্রকরণ পর্য্যালোচনায় বুঝা যায়।

মূল :—আর তাহার পর ক্ষত্রিয়স্তম্ভে বস্ত্র-মাল্য-অনুলেপন। ৫৩।

সবই রক্তবর্ণের প্রদেয়—আর দ্বিজগণকে গুড়ৌদন দান করিতে হইবে।

সঙ্কেত :—স্তম্ভের দিঙ্-নির্দ্দেশ না থাকিলেও পারিশেষ্য-ন্যায়ানু-সারে বুঝিতে হইবে—দক্ষিণ-পশ্চিম (নৈর্ঋত) কোণ। গুড়ৌদন গুড়-মিশ্রিত অন্ন।

মূল :—বৈশ্যস্তম্ভে পশ্চিমোত্তর দিগ্‌ভাগে বিধি কর্ত্তব্য।—৫৪।

সকল (উপকরণ) পীতবর্ণের প্রদান করিতে হইবে ও ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতৌদন (প্রদান কর্ত্তব্য)।

সঙ্কেত :—বৈশ্যস্তম্ভের স্থান—বায়ুকোণ। ঘৃতৌদন—ঘি-ভাত।

মূল :—শূদ্রস্তম্ভে পূর্ব্বোত্তরাশ্রিত (কোণে) সম্যগ্‌রূপে বিধি কর্ত্তব্য। ৫৫।

সপ্রযত্নে নীল-বহুল (উপকরণ দেয়) ও কৃসর দ্বিজগণের ভোজ্য।

সঙ্কেত :—শূদ্রস্তম্ভের স্থান—ঈশান কোণ। নীলপ্রায়ং (মূল) পুষ্প-মাল্য-গন্ধ-বস্ত্র—সবই যতদূর সম্ভব নীলবর্ণের হইবে। ব্রাহ্মণ-গণের ভোজন হইবে—কৃসর-দ্বারা। কৃসর—খিচুড়ি।

মূল :—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণস্তম্ভে শুক্ল মাল্য ও অনুলেপন (দেয়)।৫৬।

(উহার) মূলে কর্ণাভরণ-সংশ্রিত কনক নিক্ষেপ করিবে।

সঙ্কেত :—পূর্ব্বে প্রথমে। অনুলেপন—চন্দনাদি। কর্ণাভরণ-সংশ্রিত কনক—কানের গহনার আকারে যে সোনা সেই সোনা ব্রাহ্মণস্তম্ভের তলায় দিতে হইবে।

মূল :—ক্ষত্রিয়-সংজ্ঞক স্তম্ভের অধোদেশে তাম্র প্রদাতব্য। ৫৭।

আর বৈশ্যস্তম্ভের মূলে রজত সম্যগ্‌রূপে প্রদান করাইবে। পক্ষান্তরে, শূদ্রস্তম্ভের মূলে আয়সই দান করিতে হইবে। ৫৮।

সঙ্কেত :—আয়স—লৌহ।

মূল :—আর অবশিষ্ট স্তম্ভ-মূল-সমূহেও কাঞ্চন নিক্ষেপ করা উচিত।

সঙ্কেত :—বরোদা-সংস্করণের মূলের ছাপা পাঠ অতি অশুদ্ধ—"শেষেষপি তু নিক্ষিপ্তং স্তম্ভমূলে তু কাঞ্চনম্"—ইহার অর্থ হয় না। বরং পাদটীকার পাঠান্তরগুলি ভাল। কাশী-সংস্করণের পাঠও ভাল—'শেষেষপি চ নিক্ষেপ্যং স্তম্ভমূলেষু কাঞ্চনম্'। এই পাঠের অনুযায়ী ভাবান্তরই প্রদত্ত হইল।

মূল :—স্বস্তি-পুণ্যাহ-শব্দ-দ্বারা ও জয়-শব্দ-দ্বারাই—। ৫৯।

পুষ্পমালা-পুরস্কৃত স্তম্ভসমূহের স্থাপন কর্ত্তব্য।

সঙ্কেত :—স্বস্তি-পুণ্যাহ-ঘোষ—প্রত্যেক শুভ কর্ম্মের প্রথমে বলিতে হয়—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু (৩ বার) —উত্তরে ব্রাহ্মণগণ বলেন—"ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্", ঐরূপ বলা হয়—"……ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু (৩বার) উত্তরে ওঁ ঋধ্যতাম্" (৩ বার)। ঐ ভাবে—"……ওঁ স্বস্তি…" (৩ বার)।

উত্তর—"ওঁ স্বস্তি" (৩ বার) [পরে স্বস্তিবাচন, সান্ধ্য-মন্ত্র পাঠ সঙ্কল্পাদি কর্ত্তব্য। পুষ্পমালা-পুরস্কৃত অগ্রে পুষ্পমালা-শোভিত করিয়া। পাঠান্তর (কাশী)—পর্ণমালা পুরস্কৃতম্। পর্ণ—পাপ। পাতার মালা টাঙাইয়া—যেমন আজকাল দ্বারে আমপাতা দেবদারু পাতা দড়িতে গাঁথিয়া টাঙান হয়, সেইরূপ পাতার মালায় স্তম্ভগুলি শোভিত করার বিধি।

মূল :—অনল্প রত্নদান, গোদান ও বস্ত্রদান-সহকারে—। ৬০।

ও ব্রাহ্মণগণের তর্পণপূর্ব্বক তদনন্তর অচল ও অকম্প্য, আরও পুনরায় অচলিত স্তম্ভসমূহের উত্থাপন করিবে। ৬১।

সঙ্কেত :—অনল্প—বহু। কাশীর পাঠ—ব্রাহ্মণান্ স্থাপয়িত্বা। বরোদার পাঠ অশুদ্ধ—"স্তম্ভানুত্থাপয়েত্ততঃ। অচলং চাপ্যকম্প্যং চ তথৈবাচলিতং পুনঃ"। স্তম্ভান্—বহুবচন; তাহার বিশেষণগুলি অচল, অকম্প্য, অচলিত—এগুলি একবচন—ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। কাশীর পাঠ—"স্তম্ভমুত্থাপয়েৎ ততঃ। অচলং…"। ইহাতে অন্বয়ের সুবিধা হয়। অচল, অকম্প্য ও অচলিত স্তম্ভের স্থাপন করিবে—এইরূপ অর্থ হইবে। স্তম্ভ—জাতি বুঝাইতে একবচন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—স্তম্ভগুলিকে একবার 'অচল' বলার পর পুনরায় 'অচলিত' বলা হইল কেন? এই আপাত-প্রতীয়মান পুনরুক্তি যে দোষদুষ্ট নহে তাহা বুঝাইবার জন্যই মূলে—'তথৈবাচলিতং পুনঃ' (আরও পুনরায় অচলিত) বলা হইয়াছে।

অভিনব বলেন—'অচল' অর্থে যাহা স্থানান্তরে নিবেশের অযোগ্য —অর্থাৎ যাহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া বসান যায় না। অকম্প্য—যাহার স্থান-শিথিলতা নাই। কোন পদার্থকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরান না যাইলেও সে পদার্থটি হয়ত সেইস্থানে দৃঢ়-নিবিষ্ট না হইতেও পারে। সে পদার্থটিকে সে স্থান হইতে নড়ান যায় না বটে—অথচ সেই একই স্থানে উহা নড়বড় করে। এরূপ নড়নড়ে যাহা নয়, তাহাই অকম্প্য। আর অচলিত—বলয়াকারে আবর্ত্তন যাহার হয় না। কোন পদার্থকে হয়ত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নড়ান যায় না—সে স্থানে উহা যে নড়বড় করে তাহাও নহে—তবে উহা হয় ত ঐ একই স্থানে থাকিয়া ঘুরপাক খাইতে পারে। এরূপ ঘূর্ণন বা আবর্ত্তনও যাহার নাই, তাহার নাম অচলিত। পাঠান্তর—অস্খলিত অচলিত। অভিনব অচলিত পাঠই ধরিয়াছেন। অচলিত পাঠটিও ভাল—পরে উহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

মূল :—স্তম্ভের উত্থাপনে এইগুলি দোষ সম্যগ্‌রূপে উক্ত হইয়াছে। চলনে অবৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, বলনে মরণ-ভয়। ৬২।

কম্পনে পরচক্র হইতে দারুণ ভয় হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, এই সকল দোষবিহীন মঙ্গলকর স্তম্ভ উত্থাপন করিবে। ৬৩।

সঙ্কেত :—দোষ—এইগুলি দোষ-সূচক ও দোষ-কারক বলিয়া 'দোষ' নামে কথিত হয়। বলনে—আবর্ত্তনে, বলয়াকারে ঘূর্ণনের নাম বলনা বা বলন। এই শ্লোকে 'বলন' পাঠ পাওয়া যায় বলিয়াই ৬১ শ্লোকে 'অবলিত' পাঠটিকেই সাধু ও সঙ্গত পাঠ বলিয়া মনে হয়। অভিনবগুপ্ত 'অচলিত' পাঠ ধরিলেও উহার অর্থ করিয়াছেন—অবলিত।

পরচক্র—পররাষ্ট্রমণ্ডল।

মূল :—আর পবিত্র ব্রাহ্মণস্তম্ভে গো-দক্ষিণা দাতব্য; (আর) অবশিষ্ট (স্তম্ভ) গণের স্থাপনে কর্ত্তৃসংশ্রিত ভোজন কর্ত্তব্য। ৬৪।

সঙ্কেত :—বরোদা কাশীর পাঠ—"পবিত্রং ব্রাহ্মণস্তম্ভে দাতব্যা দক্ষিণা চ গৌঃ"—ইহার অর্থ হয় না। বরং পাঠান্তর আছে— "পবিত্রে ব্রাহ্মণস্তম্ভে'—এই পাঠ অনুযায়ী অর্থ করা হইয়াছে।

কর্ত্তৃসংশ্রিত ভোজন—কর্ত্তা যে ভোজন করাইয়া থাকেন। অথবা কর্ত্তৃগণ যে ভোজন করেন।

অবশিষ্ট স্তম্ভ—ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-স্তম্ভ।

মূল বক্তব্য—ব্রাহ্মণস্তম্ভ উত্থাপন-কালে গো-দক্ষিণা দিতে হইবে। অভিনব বলিয়াছেন, এ দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণকে দিতে হইবে; কারণ, দক্ষিণা-দান-গ্রহণের অধিকারী ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ নহেন। আর ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-স্তম্ভগুলির উত্থাপনকালে (কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের) (পুরোহিতকে) ভোজন করান উচিত। পুরোহিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত নৃপকেও ভোজন করান কর্ত্তব্য, আর নিজেরাও ভোজন করিবেন—ইহা পরে বলা হইয়াছে।

মূল :—উহা ধীমান্ নাট্যাচার্য্য-কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত করিয়া প্রদেয়। পুরোহিত ও নৃপকে মধু-পায়স-দ্বারা ভোজন করান উচিত। ৬৫।

কর্ত্তৃপক্ষীয় সকলকেও লবণ-মিশ্রিত কৃসর (ভোজন করান কর্ত্তব্য)।

সঙ্কেত :—মন্ত্রপাঠ করিয়া নাট্যাচার্য্য ব্রাহ্মণকে গো-দক্ষিণা দিবেন। পুরোহিত ও নৃপকে মধু আর ঘন দুগ্ধ (পায়স) ভোজন করাইতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সকলে লবণসহ খিচুড়ি খাইবেন।

মূল :—এইরূপে সকল বিধি (পালন) করিয়া সকল বাদ্য প্রকৃষ্টরূপে বাদিত করিতে করিতে—। ৬৬।

যথান্যায় অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক শুচি হইয়া স্তম্ভ উত্থাপন করিতে হইবে।

সঙ্কেত :—সর্ব্বমেব বিধিং কৃত্বা (বরোদা); উহা অপেক্ষা কাশীর পাঠ ভাল—সর্ব্বমেবং বিধিং কৃত্বা।

মূল :—মেরু গিরি ও মহাবল হিমবান্ যেরূপ অচল—।৬৭।

নরেন্দ্রের জয়াবহ তুমিও সেইরূপ অচল হও।

সঙ্কেত :—অভিনব বলিয়াছেন—বাস্তুবিদ্যাবিদ্‌গণের অভিমত—এই স্তম্ভ-স্থাপন মন্ত্রটি প্রণব-নমস্কার-মধ্যবর্ত্তী করিয়া পাঠ করিতে হইবে—অর্থাৎ এইরূপ হইবে—"ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ মহাচলঃ। জয়াবহো নরেন্দ্রস্য তথা ত্বমচলো ভব নমঃ।"

অভিনব বলিয়াছেন—'তুমি অচল হও'—ইহাই প্রাথমিক বিধি। 'তুমি নরেন্দ্রের জয়াবহ হও'—এরূপ আর একটি বিধি এই সঙ্গে যোজিত থাকিলেও তাহার পুনরুক্তি হইবে না।

মূল :—স্তম্ভ-দ্বার ও ভিত্তি আর নেপথ্যগৃহও এইরূপে তজ্জ্ঞানবান্ বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা উত্থাপিত করিবেন।

সঙ্কেত :—অভিনব বলিয়াছেন—এইরূপে—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-পাঠ-পূর্ব্বক। তবে প্রয়োজন মত মন্ত্রটির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহার নাম 'উহ'। যথা—ভিত্তি-শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 'অচল'কে 'অচলা' ও 'জয়াবহ'কে 'জয়াবহা'রূপে পাঠ করিতে হইবে। আর গৃহ-শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'অচলং' ও 'জয়াবহং' হইবে। তজ্জ্ঞানবান্—ভিত্তি-নেপথ্যগৃহ-ইত্যাদির নির্ম্মাণজ্ঞান যাঁহার আছে—, রঙ্গবাস্তুবিদ্যাবিৎ। বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম—যথাবিধি (যথোচিত) ক্রিয়া।

মূল :—পক্ষান্তরে রঙ্গপীঠের পার্শ্বে মত্তবারণী কর্ত্তব্যা। ৬১।

সঙ্কেত :—পার্শ্বে—পার্শ্বদ্বয়ে। রঙ্গপীঠের উভয় পার্শ্বে (অঃ ভাঃ পৃঃ ৬১)।

[ক্রমশঃ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রকৃত দীক্ষা বা সাধন খোলা কি ?

যে পথেই সাধনা করা যাক—ক্রিয়া-যোগের পথে, জ্ঞান-বিচারের পথে, ভক্তি বা ভাব-সাধনাদির পথে, দেহকে কেন্দ্র করে হঠযোগাদির পথে অথবা এই একান্ত সমর্পণে নিরালম্ব সাধনার পথে, যতক্ষণ সাধকের অন্তরে সূক্ষ্মানুভূতির দুয়ার না খুলছে ততক্ষণ তার যোগানুভূতির পথে প্রবেশই হয় নাই, তত দিন অবধি সে নিতান্তই বাহিরে এই স্থুল জড়-জগতেই পড়ে আছে, আসল যোগদীক্ষা তার হয় নাই, তত দিন সে মহাশক্তির চিহ্নিত আধার নয়। গোড়ার ক্রিয়া-যোগাদির পথে শুষ্ক অভ্যাসের এবং অহঙ্কারাশ্রিত চেষ্টার কিছু আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে বটে, কিন্তু সেটুকু স্থুল উপায় হিসাবে নিতান্তই বহিরঙ্গ। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বকৃত চেষ্টাসাপেক্ষ ক্রিয়ার বা ভাবভক্তির অনুশীলনে অন্তর একাগ্র করার অভ্যাস হয়, আধার স্থির করে মনে-প্রাণে সত্যকে ভগবানকে ডাকতে আমরা শিখি, কিন্তু ক্রমশ: যোগস্ফূর্তি ঘটেই এই সব ক্রিয়া বা ভাবকে সত্য করে তোলে, তখনই হয় সত্যকার পারমার্থিক দীক্ষা। তার আগে অনুষ্ঠিত কোন প্রকার শুষ্ক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে খাঁটি দীক্ষা বলা যায় না, শিষ্যের কাণে গুরুর বাচনিক মন্ত্রদানও যোগদীক্ষা নয়—যতক্ষণ না তার ফলে শিষ্যের আধারে যোগশক্তি জাগে বা সঞ্চারিত হয়।

যোগসাধনা ফাঁকা উপদেশ নয়, প্রাণহীন নিষ্ফলা স্থুল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নয়, মৃত শব্দবহুল নির্বীর্য্য মন্ত্র নয়, এ হচ্ছে এক জীবন্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপার; সাধকের জীবনে এ অঘটন যখন ঘটে, উর্দ্ধের দুয়ার যখন খোলে, অতীন্দ্রিয়ের খেলা যখন আপনিই আরম্ভ হয়, তখন থেকে সে মানুষটি চলে অল্পবিস্তর সেই উর্দ্ধলোকের মহাশক্তির বশে—সেই অন্তরের ইঙ্গিতে, স্বতস্ফূর্ত্ত সেই সাধনার মধুর অমোঘ টানে। এই অবস্থার মানুষকেই বলে প্রবাহ-পতিত বা সাধনখোলা মানুষ। এই যোগস্ফূর্ত্তি সাধনার সূচনামাত্র, এখান থেকেই প্রকৃত যোগসাধনার সূত্রপাত, বহু বৎসরে বহু স্তর ও অবস্থা পার হয়ে তবে এর সিদ্ধি।

এই ভাবে সাধনা খুলে প্রারম্ভিক অনুভূতি আরম্ভ হয়েও আবার সে খেলা রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, উর্দ্ধের সে দুয়ার ঈষৎ ফাঁক হয়েও আবার নানা কারণে কখনও কখনও বুজে যায়, বা ঐ স্বতস্ফূর্ত্ত ক্রিয়ার পাকে—দর্শনের নিম্নস্তরে সাধক বহু দিন ঘুরপাক খেতে থাকে। বড় বড় তথাকথিত যোগী বা গুরুদের এরকম বহু শিষ্য আছেন যাঁরা এই রকম এক-আধটা অনুভূতির পুনরাবৃত্তি নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, কেউ বা এই যোগানুভূতির স্ফূর্ত্তিকে গুরুনির্দিষ্ট ন্যাস বা মুদ্রাদির ফল মনে করে তাই যন্ত্রের মত আনুষ্ঠানিক ভাবে বছরের পর বছর করে চলেছেন। তাঁরা জানেন, তাঁদের গুরুকরণও হয়েছে এবং সাধনাও তাঁরা করে যাচ্ছেন, সফল বা নিষ্ফল সাধনার জ্ঞানের কোন বালাই তাঁদের নাই, তাঁরা গুরুর ভক্তি নিষ্ঠাবান্ অজ্ঞ শিষ্য। হয় তাঁদের গুরু কিঞ্চিৎ যোগশক্তি-বিশিষ্ট খণ্ডযোগী ছিলেন, একেবারে যোগদীপ্ত রূপান্তরিত আধার নন, অথবা গুরুর প্রভূত যোগবল থাকলেও শিষ্যের ভূমি ছিল নিতান্তই অনুর্ব্বর, পূর্ণতর জাগরণের শুভ মুহূর্ত্ত তাঁর তখনও আসে নাই, এক রকম অকালেই তাঁকে যোগদীক্ষা দেওয়া হয়েছে।

কার সাধনা কখন খুলবে বা কি কি অনুভূতি—spiritual experience দিয়ে আরম্ভ হবে তা' বলা বড় কঠিন। সে গূঢ় রহস্য সাধকের সত্তার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের বা স্বভাবের মধ্যেই লীন হয়ে আছে—অজ্ঞাত একটি বৃক্ষের বীজগর্ভস্থ স্বভাবের মত; সে গূঢ় অপ্রকট রহস্য কেবল সিদ্ধ যোগদীপ্ত গুরুই হয়তো বলতে পারেন এবং শিষ্যের আধারস্থ পরম চৈতন্য (অহং জ্ঞান নয়) শিবসত্তাই তা' জানে। শাস্ত্রে প্রাথমিক যোগস্ফূর্ত্তির লক্ষণগুলি বলেছে, যথা—

> নীহারধূমার্কানিলানলানাং
> খদ্যোৎবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
> এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
> ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি লোকে।

পরম সত্যের অনাবিল ও অনাবৃত রূপ দর্শন বা সাক্ষাৎকার করা বহু দিনের দীর্ঘ একাগ্র একটানা সাধনাসাপেক্ষ। সেই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য মানব-চেতনাকে প্রস্তুত ও গঠন করতেই যোগশক্তি আধারে সঞ্চারিত হয়ে খেলতে থাকে; তার প্রারম্ভিক অনুভূতিগুলিরই মাত্র কয়েকটির নির্দেশ দিচ্ছে উপরোক্ত শ্লোক। নীহার, ধূম, অর্ক বা সূর্য্য, বায়ুতরঙ্গ, অগ্নি, স্বচ্ছ স্ফটিক ও চন্দ্র এই সব দর্শনকে সম্মুখে করে ব্রহ্মানুভূতি জাগে অর্থাৎ এই সবই গোড়ায় যোগসাধনায় বসে সাধক ধ্যান-নেত্রে দেখতে পান,—ঘাসের ওপর লক্ষ লক্ষ শিশিরবিন্দু যেমন ঝক্ ঝক্ করে জ্বলে, তেমনি বিন্দু বিন্দু স্নিগ্ধ জ্যোতি দর্শন, কুণ্ডলে কুণ্ডলে ধূম দর্শন, স্নিগ্ধ সোনার থালা সূর্য্য দর্শন, বায়ুতরঙ্গের স্বচ্ছ হিল্লোলের অনুভূতি, অগ্নিশিখা দেখতে পাওয়া, আকাশ-জোড়া লক্‌লকে বিদ্যুতের খেলা, জোনাকির মত হাজার হাজার জ্যোতিবিন্দু বা পূর্ণকলা চাঁদ এইগুলিই সাধকের ধ্যান-মগ্ন অন্তশ্চক্ষে জাগে। এই সব প্রাথমিক অনুভূতি হ'লে বোঝা যায় সাধকের মন-প্রাণ স্থির হয়ে আসছে।

তার পর যোগসাধনায় প্রথম প্রথম কি লাভ করা যায় সেই শুভ ফলগুলির বর্ণনা আছে নীচের শ্লোকটিতে—

> লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
> বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
> গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
> যোগঃ প্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি।

ধ্যানীর দেহ তার নিজের কাছে ফুলের মত লঘু মনে হয়, রোগ ব্যাধি ক্রমশঃ কমে কমে নিরাময়তা আসতে থাকে, নানা রকম ভোগ-বস্তুতে আহারে বিহারে লোভ কমতে থাকে, দেহের বর্ণ উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হয়, কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য আসে, শরীরে ঘর্ম্মাদিজনিত স্বাভাবিক দুর্গন্ধ তো থাকেই না বরঞ্চ চন্দন-ধূপ-পুষ্পাদির সুঘ্রাণ জাগে এবং মলমূত্রাদি পরিমাণে অল্প হয়ে যায়।

সাধনাজনিত spiritual experiences বহু প্রকার; তার মধ্যে কোন্‌টি দিয়ে কার প্রথম সাধন খুলবে সঠিক না বলতে পারলেও কতকটা বলা যায়। যে সব আধারে ভাব, স্নেহ, মমতা, প্রেম আদি কোমল ধর্ম্ম স্বভাবতঃই অধিক—বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধনা প্রায়ই খোলে চিত্তপটের উন্মোচনে, ধ্যাননেত্রে visions দৃশ্যাদি জেগে; হয়তো ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি, যোগী-ঋষির উজ্জ্বল তপোজ্জ্বল তনু

চোখের সামনে ফুটে উঠলো ; হয়তো নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ, অপূর্ব্ব সব প্রাকৃতিক দৃশ্য চন্দ্র-সূর্য্য জেগে উঠলো। নয়তো বা মানুষের বা যক্ষ রক্ষ কিন্নরের সুন্দর কুটিল করাল রূপ চোখের সামনে আসতে-যেতে লাগলো। ভাবপ্রবণ emotional প্রকৃতির সাধক যারা তাদের সাধনা ভাব, প্রেমানন্দ, অশ্রু, রোমাঞ্চ, পুলক এই দিয়েও খোলে। ধ্যানে বসে বুক ভরে কি এক অব্যক্ত আবেগ ঠেলে আসে, চোখে আসে অহেতুক জল, শরীরে দেয় কাঁটা, কে যেন কাছে অতি প্রিয়জন এসেছে, আমাকে কোলে নিয়েছে, এমনই সব ভাব সত্য হয়ে ওঠে সাধনার্থীর কাছে। নানা প্রকার আনন্দ অবতরণেও ভাবুকের সাধনা খুলতে দেখা গেছে। হঠাৎ বাণী বা সূক্ষ্ম ধ্বনি গীতবাদ্যাদিও তাঁদের কাছে ভেসে আসতে পারে, অপূর্ব্ব ধূপ-পুষ্প-গন্ধের সঙ্গে আসতে পারে অতীন্দ্রিয় সুখদ স্পর্শ।

জ্ঞানী বা intellectual বুদ্ধিজীবী মানুষের এই দর্শনাদির দিকটা প্রায়ই প্রথমে চাপা থাকে। তাঁদের সাধনা আরম্ভ হয় মন নিয়ে, বিচার-বিতর্ক জেগে, একটা হয়তো psychological মানস পরিবর্ত্তনে। আমাদের নিছক মন যা রচনা করে—হৃদয়-প্রাণের রসবর্জ্জিত হয়ে, শুধু শুষ্ক বুদ্ধি-বিচারের কষ্টিপাথরে ঘসে তা হয় প্রায়ই রূপ-রং-বর্ণ-গন্ধ-বর্জ্জিত neutral রঙের ফাঁকা সৃষ্টি ; তাই বিচারশীল র‍্যাশনাল মন যখন সাধন-জগতে সূক্ষ্ম স্তরে সত্য খুঁজতে যাত্রা করে, তখন সে ইন্দ্রিয় বা হৃদয়-প্রাণগ্রাহ্য পরিচিত অনুভূতিগুলিকে বাদ দিয়ে চলে,—এ ছাড়া আর কি আছে এই সব ইন্দ্রিয়-রচিত ইন্দ্রজালের পিছনে তাই হয় তার অন্বেষণ। মন বা বুদ্ধি প্রধান হলে তার কাছে ভাব প্রেম স্নেহ মমতার মূল্য যায় তুচ্ছ হয়ে কমে, শুষ্ক পণ্ডিত এগুলোকে অনাদরে ফেলে দেন দুর্ব্বলতার স্নায়বিক বিকৃতির পর্য্যায়ে। কাজেই সে রকম ক্ষেত্রে ও প্রকৃতিতে প্রায়ই প্রথমেই জাগে বিচার ; নেতি নেতি করে বিশ্লেষণ করতে করতে তার মন সব রং ও রূপ ফেলে মুছে এই ভাবে একটা neutral বে-রঙা পর্দ্দার বা পটভূমিকার হয় সৃষ্টি। এই বিচারের ও বিশ্লেষণের বেগে যতই তার মন স্থির হয়ে আসে ততই সূচ্যগ্র হয়ে ওঠে তার অনুধাবন শক্তি, স্থির অপলক ধ্যান-দৃষ্টিতে মন প্রাণ হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ সব ধরা পড়তে পড়তেই থেমে যায়; তখন সেই অন্তরদর্শী সাক্ষিবৎ নির্লেপ মনের কাছে বাহ্য দেহাদি-বোধ চলে যেতে থাকে, একটা বিশাল বিপুল শূন্য ও ব্যাপ্তিবোধ জাগে, হয় তো অসীম ব্যোম প্রত্যক্ষ হয়ে এসে সব লুপ্ত ও গ্রাস করে নিতে পারে। এ অবস্থায় শরীর ও স্থূল ব্যক্তিত্ব গলে গিয়ে অশরীরী স্থিতিও জাগতে পারে। কারু বা কাছে মনের চিন্তাগুলি বিপুল বিদেহ সেই নির্লিপ্তের মাঝে লঘু আকাশচারী মেঘের মত কোথায় যেন ভেসে চলেছে মনে হয়। এই হচ্ছে বুদ্ধিজীবী মানুষের জন্য সূক্ষ্মলোকের সত্যরাজ্যের সিংহদ্বার—বিদেহ-স্থিতির আরম্ভ।

যে মানুষ আবার শুষ্ক বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতও নয়, প্রেমালু ভাবুকও নয়, সে হচ্ছে চঞ্চল ভোগমুখী রাজস প্রাণের অবতার, এক কথায় নিছক প্রাণবান্ vital man শক্তির উপাদানে গড়া মানুষ। তার সাধন খোলার ব্যাপার আর এক অদ্ভুত বিচিত্র ধরণের। প্রাণ অর্থে বুঝি শক্তি energy,—এই তার জীবনের ভিত্তি তাই তার ক্ষেত্রে শক্তির powerএর খেলাই গোড়ায় আরম্ভ হয়। আধারে তার শক্তির অবতরণ হয়ে দেহটা মনে হয় বিশাল গিরিশৃঙ্গের মত, মনে হয়, হাতের এক ঠেলায় ঘূর্ণমান পৃথিবীটাকে কক্ষচ্যুত করে দিতে পারি ; অন্তর অসীম শক্তিস্পর্শে মত্ত হয়ে গর্জ্জন করতে থাকে, স্নায়ু উপশিরা মাতাল হয়ে ওঠে সে অপরিমিত শক্তিমদে। শ্রীঅরবিন্দ প্রাণস্তরকে ত্রিধা ভেঙ্গে সূক্ষ্ম থেকে স্থূলরূপে তিন ভাগ করেছেন,—হৃদয়, প্রাণ ও স্নায়ু—এ সবই প্রাণ তাঁর হিসাবে। সাধক তার সত্তার ধর্ম্মে যতই স্থূল প্রাণ গঠিত মানুষ হবে ততই তার এই খেলা সূক্ষ্মানুভূতির জাগরণও দেহপ্রান্তে ঘটতে থাকবে, রাজযোগের ক্রিয়া সব প্রাণায়াম, কুম্ভক, মুদ্রা আসন আপনি হতে থাকবে, সাধক চেষ্টা করেও দেহপ্রাণের সে সব গতিকে ঠেকাতে পারবে না। কারু বা প্রাণশক্তি গুটিয়ে গিয়ে দেহ থেকে উৎক্রান্তি বা বহির্গমন আপনি হবে। কিন্তু খুব মূঢ় স্থূলবুদ্ধি অথচ স্নায়বিক neurotic লোকের এ সব না হয়ে দেহ তার স্নায়ুমণ্ডলী নিয়ে একটু অপ্রাকৃত শক্তির বশে চলতে থাকে, নানা অঙ্গভঙ্গী হয়, উত্তেজনা বশে সে হাসে কাঁদে, লাফায়, মুদ্রাসন করতে থাকে, নিজেকে এই উন্মাদ অপ্রাকৃত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে সে সুখ পায়, বিস্ময়-বিমূঢ় লোকের সহজপ্রাপ্ত পূজা ও প্রশংসায় সে আরও হয়ে পড়ে অধাতস্থ unbalanced ; মনের বল ও বিচার-শক্তি থাকলে এরকম সাধক ক্রমশঃ প্রশান্ত অবস্থায় ফিরে আসে, নতুবা দুর্ব্বল আধার হ'লে পাগল হয়ে যায় বা স্নায়বিক রোগে ভোগে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ অবধি প্রায় চল্লিশ বছরের সাধনায় আমি বহু সাধক ও সাধনার্থীর সংশ্রবে এসেছি, বিচিত্র সব আধার দেখেছি, শ্রীঅরবিন্দের কাছেও কম যোগপিপাসুকে আসতে দেখিনি, তাদের সকলের সাধন-সঞ্চারের কাহিনী লিখতে গেলে একটি চিত্তাকর্ষক আরব্যোপন্যাস লেখা হয়ে যায়, সাধন-জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ র‍্যাশনালিষ্ট দল তা পড়ে আমাকে গঞ্জিকাসেবী বা miracleএর ব্যাপারী রহস্যবাদী occultist বলে ধরে নেবেন ; বহরমপুরের চটরাজ নামে একটি যুবক সাধকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল ; অল্প দিন হলো সে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে সমাধিতে দেহত্যাগ করেছে। আমার কাছে সে আসা-যাওয়া করতো এবং পত্রবিনিময়ের দ্বারা তার অনুভূতিগুলি সবিস্তারে জানিয়ে যোগসাধনার ইঙ্গিত গ্রহণ করতো। সে ছিল ধূমাচ্ছন্ন রজের বিরাট আধার, তবু জন্মযোগী, যাদের জন্মগ্রহণই যোগসাধনার জন্য—পূর্ব্বজন্মের প্রারব্ধ যোগ সম্পূর্ণ করার জন্য। চটরাজ আহার-নিদ্রা ভুলে একাগ্র হয়ে সাধনা করতো, অন্য চিন্তা ভাবনা কামনা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। বোধ হয় ঐকান্তিক একাগ্র চেষ্টায় আপনি তার সাধনা খোলে, পাতঞ্জল যোগসূত্রের "তীব্রসংবেগানাম্ আসন্নঃ!" এই পর্য্যায়ের মানুষ ছিল চটরাজ। প্রবল রজোধর্ম্মী মানুষ বলেই চটরাজের প্রারম্ভিক অনুভূতিগুলি আরম্ভ হয় দেহ ও প্রাণে শক্তির অবতরণে, সাধনার বশে কঠিন কঠিন মুদ্রা ও আসনাদি তার আপনি হতো, দেহে সব অদ্ভুত ভঙ্গী ও বিকৃতি জাগতো, শক্তির আবেশের ঠেলায় সে হুঙ্কার ছেড়ে আসনে দাঁড়িয়ে উঠতো। ক্রমে প্রশান্ত সাম্যের অটল ভিত্তিও চটরাজের জীবনে এসেছিল, এই সব উদ্দাম গতি ও বিকৃতি গভীর প্রশান্তির মাঝে স্থির হয়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রায় ছিল না। চটরাজকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি তরুণ আধার সাধনা করতো।

আমার সাধনার প্রথম স্ফুরণ হয় কামানন্দের অবতরণে। এই কথা আমি বিশদ করে "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনীতে" লিখেছি।

মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে এই তীব্র অসহ্য মৈথুনানন্দ নেমে সমস্ত শরীর ছেয়ে ফেলবার চেষ্টা করতো; যে আনন্দ সংসারী মানুষ কয়েক মিনিট বা সেকেণ্ড মাত্র অতি কষ্টে ধারণ করে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তা' আধ ঘণ্টা ধরে আমার দেহে একটানা চলতো। আমার সাধন-গুরু বিষ্ণুভাস্কর লেলে বলেছিলেন,—"তোমার কামনা-মলিন রাজস আধার, তাই আনন্দ এরকম রূপ নিয়েছে, সাধনায় স্থৈর্য্য এলে ক্রমে এটি উচ্চতর শুদ্ধতর আনন্দে পর্য্যবসিত হবে।" হয়েছিলও তাই, পরে দ্বীপান্তরে যোগবাশিষ্ঠ্য অবলম্বনে জ্ঞানের সাধনায় এ আনন্দ গাঢ় অটল জমাট স্নিগ্ধ শান্তিতে পরিণত হয়েছিল; তার আগে ফাঁসীঘরে প্রেমের সাধনায় গাঢ় প্রেমানন্দ এসে সমাধিতে সংজ্ঞালোপ হয়ে যেতো। বিচারাধীন অবস্থায় একটি ষোল বছরের ছেলে আমার ঘরে থাকতো, এই কামানন্দ তার হওয়ায় সে সহ্য করতে না পেরে মাটিতে গড়াতো; পরে এই রাজসাহীর ছেলেটি ছাড়া পেয়ে বাড়ীতে গিয়ে কিছু দিন পরে কি কারণে জানি না আত্মহত্যা করে।

আন্দামানে গভর্ণমেণ্ট অফিসের হেড-ক্লার্ক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ কৈলাস বাবু তহবিল-তছরূপের মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে জেলে আসেন, এসেই আমার কাছে এসে যোগ নেন। সাধনায় মন স্থির করে উৰ্দ্ধমুখ হয়ে বসবামাত্র তাঁর রূপ দর্শন খুলে যায়, সাত দিন ধরে অবিরাম চোখের ওপর দিয়ে নানা রকম চিত্র, রূপ ও দৃশ্যাবলি বায়স্কোপের ছবির মত ভেসে যেতে থাকে। তিনি ছয় মাস আমার কাছে থেকে সাধনা করে মুক্তি পেয়ে সেলুলার জেল থেকে চলে যান। ঠিক এই ভাবে একটি আঠার বছরের যুবক আন্দামান সেলুলার জেলে খুনের দায়ে কয়েদীরূপে আসে। এক দিন সন্ধ্যার পর পাশের কুঠরী (cell) থেকে সেই হৃষীকেশ মণ্ডল আমাকে ডেকে আলাপ করে। নিজের পরিচয় দিয়ে সে যোগসাধনা গ্রহণ করবার অনুরোধ জানায়। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি কুঠরী এক লাইনে পাশাপাশি অবস্থিত। মাঝে প্রহরী আলো নিয়ে ঘুরছে, আমরা তখন যে যার কক্ষে রুদ্ধ দ্বারটিতে বসে মৃদুগুঞ্জনে পাশের কুঠরীর বাসিন্দের সঙ্গে আলাপে রত আছি। আমি তখনও হৃষীকেশকে চক্ষে দেখি নাই! তাকে যোগসাধনার কথা বলতে বলতে আর সাড়া পেলাম না, পরক্ষণেই প্রহরী (Sentry) ভয় পেয়ে এসে আমাকে জানাল যুবকটি বেহুঁস অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি Sentryকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "সে ভাল হয়ে উঠবে এখনই, তুমি alarm ঘণ্টা দিও না।" আধ ঘণ্টা কি পনের মিনিট পরে হৃষীকেশ সংজ্ঞা পেয়ে কেঁদে উঠলো; বললো, "দাদা, এ আমার কি হলো?" বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সাধিকা সরোজিনী দেবীর কন্যা মুক্তাগাছার জমিদার আচার্য্য চৌধুরীর বাড়ীর বধূরাণী পুরীতে আমার কাছে যেদিন প্রথম ধ্যানে বসে, সেই দিনই তার গভীর বাহ্যজ্ঞানহীন অন্তর্মুখ অবস্থা রাত্রি ১২টার আগে ভাঙ্গে নাই; তাই দেখে তার স্বামী ভয় পেয়ে স্ত্রীকে আমার সংশ্রব থেকে সরিয়ে নেন। আমার এই সামান্য যোগজীবনে এ রকম শত শত ঘটনা আছে। একটি জাগা বা আধজাগা আধারকে কেন্দ্র করে যোগশক্তি এমনি খেলাই খেলে।

সরোজিনীর কন্যা প্রভৃতি অবশ্য অসাধারণ আধার। সাধারণ আধারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতি দিয়ে বহু কালে বহু কষ্টে সাধনার স্ফুরণ অতি শনৈঃ শনৈঃ হয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। একেবারে কঠিন, মলিন, জড় বা রুদ্ধ আধার খুলতে কয়েক বৎসরও লেগে যায়। আমার কোন এক গায়ক কবিবন্ধুর যোগ খোলে পণ্ডিচেরীতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে; তাঁর মুখে একটা শিরশির করে স্নায়বিক অনুভূতি হতো, মন অমনি সেই দিকে ঝুঁকে পড়তো। শুধু এইটুকুই মাত্র তার ক্ষেত্রে দশ-পনর বছর অবধি চলেছিল, আজ তার আধার আরও উন্নত হয়েছে—এত দিনের একটানা অধ্যবসায়ের ফলে ও ভোগজীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতজনিত শুদ্ধি আসার ফলে।

গুরু বা অগ্রসর সাধকের স্পর্শে, দর্শনে, আলাপে বা সঙ্গ ফলে সাধন খোলা কাকে বলে Paul Bruntonএর "A Search in Sacred India"—বইখানিতে চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাঁর নিজের ঘটনা লেখা আছে। নারী ফকীর পার্শী মেয়ে হজরৎ বাবাজানের এক দিনের স্পর্শে ও একটি চুম্বনে, বালক মেহের বাবার অন্তর্মুখ জড়ভরত অবস্থা লাভ এরই এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। পার্শী যোগী মেহের বাবা কিন্তু সাধিকা বাবাজানের সে শক্তিপূত ঋতম্ভরা স্পর্শকে জীবনে সম্পূর্ণ উৰ্দ্ধমুখী ও সফল করতে পারেন নাই। কারণ, বাসনামুখর মন-প্রাণ তাঁর এই সব সদ্যজাগরিত শক্তি ও প্রেরণা নিয়ে গুরু ও জগৎত্রাতার বেসাতী খুলতে প্রলুব্ধ হয়েছিল, অশুদ্ধ চঞ্চল অপরিণত আধারে ও সত্তায় যোগশক্তির অবতরণের এই রকমই তার অপব্যবহার ও তজ্জনিত কুফলের বহু দৃষ্টান্ত আমিও দেখেছি।

হজরৎ বাবাজান ও মাদ্রাজের মৌন সমাধিস্থ যোগীর স্পর্শে Paul Bruntonএরও ভাবান্তর ঘটে, তাঁর যোগপথ অল্প কিছু খোলে, কিন্তু তাঁর বিধিনির্দ্দিষ্ট পথপ্রদর্শক ছিলেন অরুণাচলের রমণ মহর্ষি; এই আসল গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক হবার আগে এঁরা Paulকে দিলেন আংশিক দীক্ষা। হজরৎ বাবাজান পলের হাতখানি কয়েক মিনিট ধরে রেখে চোখে চোখ মিলিয়ে ছিলেন, তা'র ফলে পলের মনে অপূর্ব্ব এক ভাবান্তর হয়ে মনে স্পষ্ট অনুভূতি এসেছিল যেন এই যোগিনীর অপলক চক্ষু তাঁর অন্তরতম হৃদয়ে প্রবেশ করে সব কিছু দেখছে। এর ঠিক অব্যবহিত পরেই তাঁর মৌন-সমাহিত যোগীর সঙ্গে দেখা, কিছুক্ষণ শ্লেটে লিখে আলাপ ও উপদেশের পর যোগী তাঁকে বিদায় দেবার সময় লিখে দিলেন, "এই গ্রহণ কর আমার দীক্ষা!" এই লিখিত লাইনটুকু পড়া মাত্র পলের শরীরে শিরদাঁড়ার পথে এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রবেশ করতে লাগল, তাঁর ইচ্ছাশক্তি পেল যেন এক অটুট দৈবী বল, অন্তরে স্বতঃই বাণী জাগলো, পলের মনে হলো—"অটল এই শক্তি নিয়ে আমি নিশ্চিতই অসাধ্য সাধন করবো!" Paul Bruntonএর কথায় এই ঘটনাটি শুনুন—

"I hardly finish talking in the purport of this answer when I suddenly feel a strange force entering my body. It pours through my spinal column and stiffens the neck and draws up the head. The power of will seems raised to a superlative degree. I become conscious of a dynamic urge to conquer myself and make the body obey the will to realise one's deepest ideals."

এই দুই জন সাধকের স্পর্শ পেয়ে শঙ্করাচার্য্য মহারাজের যোগদীপ্ত আশীষ নিয়ে তিনি এলেন অরুণাচলে রমণ মহর্ষির কাছে। সেখানে পল উপস্থিত হয়ে দেখেন, পাথরের কোঁদা মূর্ত্তির মত স্থির সমাহিত হয়ে বসে আছেন, মহাস্থবির উন্মীলিত দূর আকাশ-প্রান্তে রুদ্ধ চক্ষে পলক

নাই, অভিনিবেশ নাই। তাঁকে বেষ্টন করে মাটিতে চিত্রার্পিতের মত নিঃশব্দে বসে আছে ভক্তমণ্ডলী, তারা সকলেই ঊর্দ্ধমুখ তদর্পিত দৃষ্টি। Paul Bruntonও সমাধিস্থ যোগীর দিকে চেয়ে বসে রইলেন। প্রথমে এই ভাবেই এক ঘণ্টা কেটে গেল, তার পর সমান নীরবে নিরুত্তরে যখন দ্বিতীয় ঘণ্টাও কেটে যাচ্ছে, তখন ক্রমশঃ Paulএর সন্দেহাকুল আবিল চিন্তাজাল স্থির হয়ে এলো, ভিতরে জাগতে আরম্ভ হ'লো এক অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর। Paul Bruntonএর কথায়ই বলি—"But it is not till the second hour of the uncommon scene that I become aware of a silent resistless change which is taking place within my mind. One by one answers which I have prepared in the train with such meticulous accuracy drop away. For it does not seem to matter whether I solve the problems which have hitherto troubled me. I know only that a steady river of quietness seems to be flowing near me, and that a great peace is penetrating the inner reaches of my being and that my thought-tortured brain is beginning to arrive at some rest.

How petty grows the panorama of the lost ground! The passage of time now provokes no irritation because I feel that the chains of mind-made problems are being broken and thrown away."—দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত হতে না হতে আমি অনুভব করতে আরম্ভ করলাম, আমার অন্তরে এক নিঃশব্দ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। ট্রেণে বসে যত প্রশ্ন ও সমস্যার কথা আমি এমন সযত্নে গুছিয়ে এনেছিলাম, যা এত দিন আমাকে বিচলিত করতো সে সবের যেন কোন মূল্য ও সার্থকতাই আর রইলো না। কারণ, আমার স্পষ্ট প্রতীতি হতে লাগল, আমার কাছে বইছে কোথায় একটি পরিপূর্ণ অন্তঃসলিলা শান্তিধারা, এবং একটি শীতল প্রশান্তি আমার সত্তার অন্তরতম প্রদেশ ভরে তুলছে, আমার এত দিনের চিন্তা-জর্জ্জর মস্তিষ্ক পাচ্ছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বিশ্রাম।

অতীতের ঘটনাবলী যেন হয়ে গেছে কত তুচ্ছ কত নিরর্থক। মনের গ্রথিত সমস্যা ও দ্বন্দ্বের মালাখানি কে যেন ছিন্ন করে দিচ্ছে কালের জলে ফেলে। অক্ষোভ সমাহিত মনে কালের গতি কোন ক্ষোভ কোন জ্বালার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না।

পল তার দ্বিতীয় বারের গুরুদর্শনে এর চেয়েও অনির্ব্বচনীয় গভীর অবস্থা লাভ করেছিল; এরই নাম গুরুস্পর্শ বা সাধনদীক্ষা; এ না হ'লে গুরুকরণই ব্যর্থ। তবে এরূপ অমোঘ আশুফলদায়ী শক্তিপূত স্পর্শ ও তজ্জনিত প্রাথমিক জাগরণও ব্যর্থ হয়ে যায় যদি সাধনার্থী শিষ্যের ক্ষেত্র থাকে অশান্ত ও অপরিণত। গুরু বা শিক্ষকের যোগবল সাধনার্থীর আধারে হঠাৎ সঞ্চারিত হয়ে তাকে তখনকার মত তুলে দেয় মনের ঊর্দ্ধে বিপুল এক অক্ষোভ সমতার চেতনায়, তাই তখন মন-প্রাণে গ্রথিত বাসনা-কামনা ভাল-মন্দ দ্বন্দ্বের খেলা ঝরে পড়ে ছিন্নসূত্র মালার ফুলগুলির মত; কিন্তু এই সঞ্চারিত শক্তি সরে গেলে অভ্যাসবশে চেতনা আবার মনের স্তরে নেমে পড়ে, এত বড় জাগরণ হয়ে পড়ে সন্দেহের বস্তু অলীক। যত দিন নিজের সাধনার বলে মন-প্রাণ ক্রমে ক্রমে প্রশান্ত না হয়, ঐ উচ্চ ভূমিতে টিকে থাকবার সামর্থ্য না অর্জ্জন করে, ততক্ষণ সাধকের স্থায়ী পরিবর্ত্তন আসে না।

যোগীরা হন বড় প্রেমিক, বড় দরদী মানুষ, দয়াপরবশ হয়েও তাঁরা বহু ক্ষেত্রে অপাত্রে অথবা অসময়ে সুপাত্রে এই পরমধন দিয়ে ফেলেন। তখনকার মত আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও সে সঞ্চারিত শক্তি সব ভোগ, সুখ ও কর্ম্মচাঞ্চল্যের অন্তরালে নিঃশব্দে কাজ করে যায়, তার ফলে বহু কাল পরে ভোগক্ষয়ে আবার জাগে বৈরাগ্য ও ঊর্দ্ধের টান। আমার সতীর্থ বন্ধু উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ঘটেছিল এমনি ভাবান্তর বিষ্ণুভাস্কর লেলের স্পর্শে কিন্তু সে জ্ঞানদায়ী অপূর্ব্ব স্পর্শকে বহির্ম্মুখী চঞ্চল বন্ধু আমার জীবনে সফল ও সার্থক করে তুলতে পারেন নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দের দীক্ষার ও সমাধির কথা সকলেই জানেন, অথচ রাজসকর্ম্মা প্রদীপ্তপ্রাণ বিবেকানন্দ জগতে কাজ করতে এসেছিলেন বলে সেই শক্তি ও জ্ঞান নিয়ে জগৎময় ছুটে বেড়ালেন, কর্ম্ম অবসানে দেহ তাঁর টিকলো না, সাধনার পরম বস্তুকে জীবনে পূর্ণ সিদ্ধির মাঝে পরিপূর্ণ মহিমায় ঐশ্বর্য্যে রূপ দেওয়া ঘটলো না। এ সবই মহাশক্তির খেলা, কোন্ মানব-আধারে কি কাজ হবে সবই সেই পরম বিধানে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, তারই নাম মানুষ দিয়েছে ভাগ্য, সে অমোঘ অবশ্যম্ভাবী পথরেখা এড়িয়ে চলে কার সাধ্য?

সাধনা ও যোগধর্ম্ম কথা মাত্র নয়, ফাঁকা শাস্ত্রোপদেশ নয়, যম নিয়ম আসনের বহিরঙ্গ অর্থহীন আনুষ্ঠানিক পুনরাবৃত্তি নয়; যোগধর্ম্ম হচ্ছে জীবন্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপার—সৃষ্টির অন্তরালে সক্রিয় মূল সব শক্তি নিয়ে তাদের পরীক্ষা বা experimentই যোগসাধনা। তপোভূমি ভারতে সকল যুগে সকল সময়েই দীপ্তশিরা পুরুষ ও নারী সব আসছেন যাচ্ছেন, সংসারের এই স্থূল কর্ম্মমুখর কোলাহলের অন্তরালে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত মানবপদ্ম বিকশিত হচ্ছে তাঁদের জ্বলন্ত জীবন্ত ঋষিস্পর্শে। বহির্ম্মুখী তর্কবাগীশ আদার ব্যাপারীর দল তার কোন সন্ধানই রাখে না।

যোগবলসম্পন্ন সাধকের হাতের ছোঁয়ায়, নেত্রপাতে, তার সঙ্গে আলাপ বা সঙ্গ করার ফলে কোন রকমের একটু যোগাযোগের ফলে সাধনার্থীর সাধনা খুলতে পারে। বহু দূরে অপরিচিত যোগীর সঙ্গে ধ্যানে বা নিদ্রায় স্বপ্নে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ঘটে যেতে দেখা গেছে, তার ফলেও হঠাৎ যোগশক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়। সে শক্তি এমনই আধার থেকে আধারান্তরে আপনি চলে ইন্ধন থেকে শুষ্কতর ইন্ধনে সঞ্চারিত অগ্নির মত; এতে গুরুর কোন বিশেষ কৃতিত্ব নাই। তিনি চেষ্টা করলে রুদ্ধ আধারে একবিন্দু শক্তি দিতে পারেন না, তিনিও যে সেই ঐশী শক্তির চালিত যন্ত্রমাত্র। অন্তর-গুরুই আসল গুরু, সেই মনগুরু একবার জাগলে আর বাহিরের গুরুর আবশ্যক থাকে না। প্রথমে একটি বিশেষ আধারে সেই ঊর্দ্ধের মহাশক্তি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তার পর সেই জাগা মনকে কেন্দ্র করে তার আরও মন জাগাবার পালা আরম্ভ হয়। ভারতে সর্ব্বকালে সকল যুগে এমনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু মানবগুরু জন্মাচ্ছে এবং নিজ নিজ পথে বিশেষ বিশেষ ধারায় সিদ্ধিলাভ করছে। জড়বুদ্ধি বহির্ম্মুখী লোকদের চক্ষুর অগোচরেই চলেছে পরম জ্যোতির এই ক্রমাবতরণের লীলা।

—সত্যপীরের আড্ডা—

যামিনীমোহন কর

আমাদের ক্লাবের নাম সত্যপীরের আড্ডা। সেখানে সকলেই সত্য কথা বলে। তবে যত সত্য কথাই বলা যাক্, কিছু না কিছু ভেজাল থাকবেই। আমাদেরও থাকে। শতকরা মাত্র এক শত ভাগ। সেইটুকু বাদ দিলেই বাকীটা নির্জ্জলা খাঁটি সত্য।

সত্য কথা বলবার বাৎসরিক কম্পিটিশন চলছে। ফাষ্ট রাউণ্ড, সেকেণ্ড রাউণ্ড সব হয়ে গেছে। আজ সেমিফাইন্যাল এবং ফাইনাল দুই-ই। ওদিক্ দিয়ে খাঁদা ফাইনালে উঠে বসে আছে। এধারে আছে নন্তু আর পটলা। ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট জজের আসনে আসীন। ভাইস প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী তাঁকে বিচারে সাহায্য করবে। প্রথমে নন্তুর পালা। সে আরম্ভ করলে—তোরা সব কুমীর কুমীর করিস্। আমি আজ তোদের কুমীর শিকারের এক সত্য ঘটনা বলব। যেমন ভয়াবহ, তেমনি চমকপ্রদ। আমি, ছোটকা, আমার পিসতুতো ভাই গণশা আরও কয়েক জন। ছোটকার সঙ্গে যাচ্ছিলুম বিলেত। হল্ট করলুম কায়রোতে। আমাদের সকলেরই শিকারের নেশা। শুনেছি, মিশরে নাইল নদীতে খুব বড় বড় কুমীর পাওয়া যায়। গেলুম শিকারে। ওরে বাবা, সে কি সাইজ! ট্রামের ফার্ষ্ট-ক্লাসের সামনে থেকে সেকেণ্ড-ক্লাসের শেষ অবধি। গড়া গড়া সব শুয়ে আছে। অমন বিশ-ত্রিশটা হবে।

কুমীর শিকার কি রকম করে করতে হয় জানিস্ তো। দু'টো চোখের মাঝখানে থাকে ওদের মস্তিষ্ক। সেখানে টিপ করে মারতে পারলেই এক গুলীতেই সাবাড়। আমরা ছ'জন ছিলুম। ছ'জনে ছ'টা কুমীরকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লুম। ছ'টাই কাত। একেবারে নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু। বাকীগুলো ভয়েতে ঝপাঝপ নদীর মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ল। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে আমরা এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ এক বিরাট চীৎকার। যেন বাজ পড়ল। তার পর যেন ঝড় উঠল। কিছু বোঝবার আগেই দেখলুম, এক ব্যাটা কুমীরের প্রশ্বাসের সঙ্গে তার মুখের ভেতর ঢুকে গেছি। অমনি সে দিলে হাঁ বন্ধ করে, ভাব অবস্থা। প্রকাণ্ড হাঁ। দাঁত বাঁচিয়ে মুখের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। ব্যাটা জিভ নেড়ে আমায় পেটের ভেতর টানবার চেষ্টা করতে লাগল। সঙ্গে ছিল ছোরা। দিলুম জিভ কেটে। যন্ত্রণায় সে মুখব্যাদান করে চীৎকার করলে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছিট্‌কে দশ হাত দূরে গিয়ে পড়লুম; ততক্ষণে ছোটকা আর এক গুলী মেরে তাকে শেষ করে দিলেন। সেই দিনই আমরা দুর্গা দুর্গা বলে সেখান থেকে সরে পড়লুম। কুমীরগুলো আর সঙ্গে করে আনা হ'ল না। তা না হলে দেখতিস্, কি পেল্লায় চেহারা!

গল্প শেষ করে নন্তু বসল। এইবার পটলার পালা। আমাদের মনে হল নন্তুই জিতবে। যা ছেড়েছে একখানা। তবে পটলাও বড় যা-তা নয়। পটলা আরম্ভ করলে—

আমার পিসতুতো মামা অর্থাৎ মা'র পিসতুতো ভাই খুব বড় সায়েন্টিষ্ট ছিলেন। ছিলেন কেন, এখনও আছেন, তবে—, সেই কথাটাই আজ বলব। মামা ছিলেন প্রাণিতত্ত্ববিদ্, জুলজিষ্ট। কুমীর সম্বন্ধে বলতে গেলে তিনি এক জন অথরিটি ছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের দস্তুরই এই যে, যখন যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, তখন সেই বিষয়ে একেবারে মন-প্রাণ ঢেলে দেন। শয়নে-স্বপনে কিবা জাগরণে মামার সেই এক চিন্তা—কুমীর। এক দিন কি হয়েছে, আমি, মামা, আরও বাড়ীর কয়েক জন, সবাই জু-গার্ডেনে বেড়াতে গেছি। এদিক্-ওদিক্ বেড়াচ্ছি, মামা বললেন, চল্ কুমীর দেখে আসি। কুমীরের ওখানে গেলুম। মামা একদৃষ্টে কুমীরের দিকে চেয়ে আছেন, যেন পাষাণ বনে গেছেন। চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে। হঠাৎ 'দাদা গো' বলে বেড়া টপকে তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমরা 'কি হ'ল, কি হ'ল' করে চীৎকার করে উঠলুম। পর-মুহূর্ত্তেই মামা ভেসে উঠলেন কিন্তু মনুষ্যরূপে নয়, কুমীরের দেহ ধারণ করে। আগেকার কুমীর আর মামা-কুমীর দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। উভয়ের চোখ দিয়েই টপ-টপ করে জল ঝরছে। শাস্ত্রে পড়েছিলুম, ভরত রাজা দেবদত্ত নামক হরিণ-শিশুর কথা মনে করতে করতে হরিণ বনে গেছলেন। বিশ্বাস করতুম না। সে দিন থেকে বিশ্বাস হ'ল। শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হয়? মামা কুমীরের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে কুমীর বনে গেলেন। তোদের বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গে এক দিন জু-গার্ডেনে যাস, কুমীর-মামাকে দেখিয়ে দেব।

পটলা বসল। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। বিচারকরা কিছুক্ষণ ফিস্-ফিস্ গুজ-গুজ করে বললেন, পটলা জিতেছে। জিতবেই। যা ছেড়েছে, নন্তু একেবারে তলিয়ে গেছে।

প্রেসিডেণ্ট বললেন, এই বার ফাইনাল। পটলাকে আর নতুন কোন সত্য ঘটনা বলতে হবে না, এইতেই চলবে। এইবার খাঁদার পালা।

খাঁদা আরম্ভ করলে—

যে ঘটনার কথা আজ তোদের বলব, সেটা একেবারে সত্য ঘটনা,

কিন্তু এত আশ্চর্য্যি যে কেউ হয় ত' বিশ্বাসই করবে না। তবে জানিস্ তো, ট্রু থ ইজ ষ্ট্রেঞ্জার ত্যান ফিকশন।

আমরা কয় জন বন্ধু মিলে রাঁচীতে গেছি। চেঞ্জও হবে, শিকারও হবে। মিলিটারীদের মত থাকব ঠিক করলুম। প্রত্যেকের জন্ত ছোট ছোট তাঁবু ভাড়া করা হ'ল। একটা জনবিরল মাঠে আমরা তাঁবু ফেলে আস্তানা গাড়লুম। সঙ্গে আমাদের দু'টো চাকর গিছল। তারা তাঁবু, জিনিষপত্তর আগলাতো, রান্না-বান্না করত, আর আমরা সমস্ত দিন ঘুরে-ঘুরে শিকার করে বেড়াতুম। রাত্রে যে যার তাঁবুতে খড়ের ওপর সতরঞ্চি পেতে শুতুম। গরম কাল। লেপ-কম্বলের বালাই ছিল না।

এক দিন সকালে চা খাবার সময় দেখি বোঁচা নেই। কি ব্যাপার! কুড়ের বাদশাহ এখনও ঘুমুচ্ছে। সকলে মিলে তার তাঁবুর সামনে গিয়ে খুব হল্লা করতে লাগলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তবুও বোঁচার সাড়াশব্দ নেই। মনে যেন কেমন খট্‌কা লাগল। তাঁবু খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি—ওঃ হরি! এ কি! বোঁচাও নেই, বোঁচার বিছানাও নেই। সকলে মাথায় হাত দিয়ে পড়লুম, কি হ'ল। বোঁচা গেল কোথায়?

তখনই খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। এদিক্ ওদিক্ সেদিক্ আমরা চষে ফেললুম। কিন্তু বোঁচাকে পাওয়া গেল না। শেষ অবধি পুলিশে খবর দেওয়া হল। ইন্সপেক্টর এলেন। আত্তোপান্ত ব্যাপার শুনলেন, ডায়েরী করলেন। তার পর এদিক্ ওদিক্ আমাদের মত কিছুক্ষণ ঘুরে বললেন—'হয় বাঘে নিয়ে গেছে, না হয় সাঁওতালী গুণ্ডারা চুরি করেছে। ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। কেসটা খুবই ঘোরালো। যাই হোক, আমি আমাদের বিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ ব্লেককে ডেকে পাঠাচ্ছি। তিনি এলে এর একটা না একটা হদিশ হবে।'

এক জন কনষ্টেবলকে পাঠান হল। অল্পক্ষণ পরেই বিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ ব্লেক এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে একটা বাঘের মত কুকুর আর এক জন হাড়গিলে মার্কা যুবক। ইন্সপেক্টর পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনি বিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ ব্লেক,—ইনি এর সহকর্মী অর্থাৎ অ্যাসিষ্টান্ট মিঃ স্মিথ, আর এটি এর কুকুর ভাইপার।' তার পর মিঃ ব্লেককে সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন। মিঃ ব্লেক মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এদিক্ ওদিক্ কিছুক্ষণ ঘুরলেন। তার পর বললেন—'না, বোঁচা বাবুকে বাঘেও নিয়ে যায়নি আর সাঁওতালী গুণ্ডারাও চুরি করেনি। বাঘ নিয়ে যায়নি; কারণ নিয়ে গেলে টেনে নিয়ে যেতে হ'ত। জমিতে টেনে নিয়ে যাবার দাগ পড়ত। কিন্তু তেমন কোন দাগই দেখতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া বাঘ যদি সতরঞ্চি কামড়ে ধরে ছুট দিত, তা হলে বোঁচা বাবু পড়ে থাকতেন, আর যদি বোঁচা বাবুকে কামড়ে ধরে ছুট দিত, তবে সতরঞ্চি পড়ে থাকত। যখন দু'টোই নেই, তখন বাঘে নিয়ে যায়নি।'

আমরা সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে টিক্‌টিকির মত মাথা নাড়ছিলুম। তিনি বলে চললেন—"সাঁওতালী গুণ্ডারা নিয়ে যায়নি। কারণ, জমিতে পায়ের দাগ নেই। তা ছাড়া তারা মহুয়া খায় কিন্তু আমি মহুয়ার গন্ধ পাচ্ছি না।"

আমরা আবার মাথা নাড়লুম। আমি সাহস করে বললুম—'আপনি যা বলছেন, সবই ঠিক। কিন্তু বোঁচা তাহলে গেল কোথায়?'

তিনি হেসে বললেন—'এখনই সে খবর আপনাদের জানাব। স্মিথ, তুমি ভাইপারকে আমার কাছে নিয়ে এস।' আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—'বোঁচা বাবুর ব্যবহৃত কোন জিনিষ দিতে পারেন?'

আমি তখনই বোঁচার সার্টটা তাঁর হাতে দিলুম। তিনি সেটা ভাইপারকে শোঁকালেন। ভাইপার অমনি খড়ের গাদার ওপর দাঁড়িয়ে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। তখন তিনি স্মিথকে বললেন, ভাইপারকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। তার পর পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে উপুড় হয়ে পড়ে খড়ের গাদা পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমরা একদৃষ্টে তাঁর কার্য্যকলাপ দেখতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মিঃ ব্লেক বললেন—'দেখুন, আপনাদের বন্ধু বোঁচা বাবুর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, তিনি আর ফিরবেন না।'

আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললুম—'কেন? কি হয়েছে? কোথায় গেছে?'

মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে তিনি বললেন—'তিনি কোথাও যাননি। সমস্ত রাত এইখানেই ছিলেন। আচ্ছা, বোঁচা বাবু কি ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করতেন?'

আমরা বললুম—'হ্যাঁ, প্রায় রোজই সে ঘুমের ওষুধ খেত। নইলে ঘুমোতে পারত না।'

প্যাঁচার মত মুখ করে তিনি বললেন—'আমি ঠিকই ধরেছি। এইবার একটা নিদারুণ সংবাদ শোনবার জন্ত আপনারা প্রস্তুত হ'ন। বোঁচা বাবু রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেয়ে সতরঞ্চিতে শুয়েছিলেন। রাতারাতি উইয়ে তাঁকে এবং তাঁর সতরঞ্চিকে খেয়ে ফেলেছে। তিনি মাটি হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন।'

তাঁরা সবাই চলে গেলেন। আমরা সব হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলুম। কিন্তু বৃথা শোক করে কি হবে। বোঁচা তো আর ফিরবে না। অগত্যা বোঁচা-হীন অবস্থায় আমরা সেই দিনই কলকাতায় ফিরলুম। এখানে এসে প্রচার করে দিলুম, শিকার করতে গিয়ে বোঁচাকে বাঘে খেয়েছে। তাছাড়া উপায় কি। চোখে না দেখলে কি কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে। কবি ঠিকই বলেছেন—ট্রু থ ইজ ষ্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।

বিচারকরা এক-মত হয়ে খাঁদার গলায় বিজয়-মাল্য পরিয়ে দিলেন। আমরা সকলে ঘন ঘন করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলুম। খাঁদা সেই বছরের জন্তে 'সত্যপীর দি গ্রেট' উপাধিতে ভূষিত হ'ল।

—দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ে—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

জাপান

জাপানীরা ছেলেমেয়ে খুব ভালোবাসে। তবে মেয়ের চেয়ে ছেলের আদরই বেশী। ছেলেরাই বাপ-মায়ের সম্পত্তি পায়, ছেলেরাই পূজা করার অধিকারী,—অনেকটা আমাদের দেশের মত। তা'বলে মেয়েদের উপর কোন অনাদর হয় না। শিশু জন্মাবার সপ্তম দিনে তার নামকরণ হয়। বছর খানেক বয়স অবধি সে শুয়েই কাটায়, তার পর বড় বোনেদের পিঠে চড়ে সে ঘুরে বেড়ায়।

ছোট ছেলেমেয়েকে কোলে নেওয়ার চেয়ে পিঠে বেঁধে নিতেই ওরা বেশী পছন্দ করে।

আর একটু বড় হলেই মায়ের কাছে শুরু হয় তার গল্প শোনা; বেশীর ভাগ গল্পের মধ্যেই থাকে, দেশের কথা। রাজাকে কেমন করে ভক্তি দেখাতে হবে, বাপ-মায়ের কথা শুনতে হবে, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, কর্ত্তব্য পালনে পিছিয়ে এলে চলবে না—এই সব সামাজিক আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়ে দেওয়া হয় এই গল্পের মধ্য দিয়ে।

সাত বছর বয়স হলেই ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায়। সেখানে তারা তেরো বছর বয়স অবধি পড়াশুনা করে। ছেলেমেয়ে এক-সঙ্গেই পড়ে, তবে মেয়েদের পড়াশুনা ছাড়াও রাঁধা, সেলাই করা প্রভৃতি শেখানো হয়। ইস্কুলের সবার আগে শেখানো হয় জাতীয় সঙ্গীত—'কিমিগায়ো'—গাইতে, আর জাতীয় পতাকা আঁকতে।

প্রাথমিক ইস্কুলের পড়া শেষ করে ছেলেরা যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ইচ্ছামত কেউ এখানে এসে ভর্ত্তি হতে পারে না। পরীক্ষা করে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হয়। এই সময় ইংরেজী ও চীনা ভাষাও শেখানো হয়। ছাত্র বা ছাত্রীর স্বাস্থ্য ভালো নাহলে তাদের অনেক সুবিধা দেওয়া হয়, তাদের পাঠ্যকে হাল্‌কা করে দেওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয় বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। মধ্য বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়তে দেওয়া হয় না। গ্রাজুয়েট হবার পরে এম-এ ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীরা আবার একসঙ্গে পড়ে। আইন ও ডাক্তারীতেও ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়ার কোন বাধা নেই।

ইস্কুল বসে সকাল আটটায়। বারোটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা চলে, তার পর এক ঘণ্টা টিফিন। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে ইস্কুলে আসার সময় বাড়ী থেকে ভাত মাছ প্রভৃতি একটি ছোট্ট বাক্‌সে ভরে, কাপড়ে বেঁধে নিয়ে আসে। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার একটার সময় ইস্কুল বসে। ছুটী হয় চারটের সময়। ছোট ছেলেমেয়েদের মাষ্টার মশাইরা সঙ্গে করে বাড়ী পৌছে দেন।

প্রত্যেক ইস্কুলের ছেলে কালো হাফ প্যাণ্ট আর কেপ কলার কালো কোট পরে, কালো টুপীতে, কোটের বোতামে ইস্কুলের চিহ্ন দেওয়া থাকে, তাই দেখে কে কোন্ ইস্কুলে পড়ে তা জানা যায়। আর মেয়েরা পরে ঢিলে জাপানী কোট—'কিমোনো'। তার কোমরে একটি কাপড়ের ফালি বাঁধা থাকে।

ইস্কুলে মার-ধর করার রীতি নেই। মিষ্টি কথায় ছেলেমেয়েদের বশ করতেই শিক্ষকেরা বেশী ভালোবাসেন। সারা ইস্কুল খুঁজলে একখানি বেত পাওয়া যাবে না। সেই জন্যই ছাত্র ও শিক্ষকের সৌহার্দ্য জীবনে কোন দিন ম্লান হয় না। শিক্ষকেরা সে-দেশে কত ভালো হয় তার একটা কাহিনী বলি: এক জন বাঙালী শিক্ষার জন্য জাপানে যান, পর-পর ক'দিন ঠিক সময় তিনি ক্লাশে আসতে পারলেন না। অধ্যাপক জিজ্ঞেস্ করলেন—'রোজ তোমার দেরী হয় কেন?' ছাত্র বললো—'ঠিক সময় ভাত পাই না, আসতে দেরী হয়ে যায়।' অধ্যাপক বললেন—'যেখানে আছ ওখানে কারুর কোন অসুখ করেছে?' ছাত্র বললো—'তেমন তো কিছু শুনিনি।' অধ্যাপক বললেন—'বিদেশে এসেছ লেখাপড়া শিখতে, পয়সাও খরচ করছ নিজের; যদি সুবিধাই না হয় তাহলে ওখানে থাকার দরকার কি? আমি তোমার জন্য অন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দোব।' দিন দু'-তিনের মধ্যে অধ্যাপক তার জন্য এক বাড়ীতে ব্যবস্থা করে দিলেন, কিন্তু শুধু খবর দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত হলেন না, জিনিষপত্র নিয়ে যাবার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তাই দেখবার জন্য ছাত্রটির বাড়ীতে এলেন। ছাত্রটি তখন সব জিনিষপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছু পড়ে রইল কি না দেখবার জন্য অধ্যাপক ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন এক কোণে এক বোঝা কাঠ পড়ে আছে। অধ্যাপক নিজেই সেই বোঝা ঘাড়ে তুলে নিয়ে অগ্রসর হলেন। বাঙালী ছেলেটি এই কাঠের বোঝা বইতে লজ্জা পাচ্ছিল, এখন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। অধ্যাপক বললেন—'এর জন্য তুমি কিছু ভেবো না, চলো। দেখো, পথে কোন কিছু পড়ে না যায়!' লেখা-পড়া শেখা মানে যে বাবুয়ানি নয়, সে দিন সেই বাঙালী ছেলেটি তা ভালো করেই শিখলো।

ইস্কুল বসার আগে প্রতিদিন ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গান করে। সপ্তাহে এক দিন করে জাতির মহাপুরুষদের কাহিনী শোনানো হয়। সারা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় রাখার জন্য প্রতিদিন জানার মত যা কিছু খবর তা মাষ্টার মশাই গল্পের ছলে ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেন। তাছাড়া প্রায়ই ছেলেমেয়ের দল নিয়ে মাষ্টার মশাই ঘুরতে বেড়ান—কোন দিন চিড়িয়াখানা, কোন দিন বা যাদুঘর, কোন দিন কোন ছবিঘর (আর্ট গ্যালারী), কোন দিন বা কোন স্মৃতিসৌধ, কোন দিন বা ফুলের বাগানে কি কোন ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে রীতিমত চাষ আবাদ ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার চর্চ্চা চলে। ছেলেমেয়েরা যখনই যা জিজ্ঞেস করে, শিক্ষক তখনই তার উত্তর দেন, হাতে-কলমে শিক্ষা হয়।

জাপানীদের লেখাপড়া শেখা বড় সহজ নয়। জাপানীরা চীনা অক্ষর ব্যবহার করে। চীনাদের অক্ষর আছে মোট তিন হাজার, প্রতিটি কথার জন্য এক একটি অক্ষর। এই অক্ষর শিখতেই ছাত্রদের অনেক সময় কেটে যায় দেখে সে দেশের শিক্ষাবিদেরা 'হিরাকানা' ও 'কাটাকানা' নাম দিয়ে দু'ভাগে মোট ছিয়ানব্বইটি চীনা অক্ষর বেছে নিয়েছে জাপানী ছেলেমেয়েদের কষ্ট কমাবার জন্য। কিন্তু আকার ইকার না থাকায় বিশেষ্যের বচন ও ক্রিয়ার পুরুষ না থাকায় মাত্র ৯৬টি অক্ষরে সব কিছু কুলিয়ে উঠছে না। প্রয়োজন মত আরো অক্ষর তাদের শিখতে হয়। এক একটি অক্ষর এক একখানি ছবি বললেই হয়। লিখতেও সময় লাগে অনেক। তবু জাপানে অশিক্ষিত লোক নেই বললেই চলে। *আর এক রুশিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে অতো ছেলে-মেয়ে ইস্কুল-কলেজে পড়ে না। বৃটেনে কলেজে পড়ে ৫৪ হাজার ছেলে-মেয়ে, ফ্রান্সে ৭৩ হাজার, ইতালিতেও ৭৩ হাজার, জার্ম্মাণীতে ৭৪ হাজার, জাপানে ১ লাখ ৪৬ হাজার, আর রুশিয়ায় ৫ লাখ ৫০ হাজার। আর ইস্কুল-কলেজ মিলিয়ে জাপানের ছাত্র-ছাত্রী ১ কোটি ২০ লাখ ৭৪ হাজার। জাপানের মোট লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৭২ লাখ ১৬ হাজার। হিসাব করলে দেখা যায়, প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক পড়াশুনা করে। এই জন্যই বোধ হয় সে দেশে যত বেশী খবরের কাগজ বিক্রী হয় পৃথিবীর আর কোন দেশে তা হয় না। 'আসাহি-সিম্‌বুম' বিক্রী হয় বিশ লাখ, 'ওসাকা-মাইনিচি' পনেরো লাখ, আর লাখ খানেক বিক্রী হয় এমন কাগজ অনেক আছে।

জাপানীরা চীনা অক্ষরেই লেখে বটে, কিন্তু তাদের ভাষা ভিন্ন।

জল কথাটি বোঝাতে হলে জাপানীরাও যে অক্ষর লিখবে, চীনারাও সেই অক্ষরই লিখবে, তবে চীনারা পড়বে 'সুই' আর জাপানীরা পড়বে 'মিজু'।

জাপানীদের লেখার ধরণেও নূতনত্ব আছে, যখন কোন লোকের ঠিকানা লিখবে, তারা লিখবে :—

জাপান, তোকিও
১২২ গিংজা ষ্ট্রীট
সাকুরাই, শ্রীযুক্ত

ইস্কুলে ছেলেদের শরীরের দিকেও নজর রাখা হয়। প্রত্যেককে যুযুৎসু-বিদ্যা শিখতে হয়। গায়ে জোর না থাকলেও বিপদে পড়লে যুযুৎসুর প্যাঁচ আত্মরক্ষায় খুব কাজে লাগে। তাছাড়া ছেলেদের জন্য কুস্তি, দাঁড়টানা, ফুটবল, ক্রিকেট, এ সব তো আছেই। মেয়েদের ইস্কুলে তলোয়ার খেলা, তীর ছোড়া প্রভৃতির প্রচলনই বেশী। ব্যায়াম বাধ্যতামূলক, এ থেকে ছেলেমেয়ে কেউই রেহাই পায় না।

হাই ইস্কুলে পড়ার সময় ছেলেরা ইচ্ছা করলে যে কোন রকম হাতের কাজ শিখতে পারে, আর সেই শিক্ষার ফলে ইস্কুলের পাঠ শেষ হবার পর কোন দিন কাউকে বসে থাকতে হয় না। রুশিয়ার পর, পৃথিবীতে একমাত্র জাপানেই বেকার-সমস্যা নেই।

ও-দেশে মেয়েরাও চাকরী করে। অনেক সময় গরীব লোক অভাবে পড়লে টাকা ধার করে; কথা থাকে, তার মেয়ে বড় হয়ে কয়েক বছর কাজ করে সেই টাকা শোধ দেবে। মেয়েরা বড় হয়ে সেই সর্ত্ত মত কাজ করে। অনেক মেয়ে আবার বিয়ের পোষাক কেনার জন্য কারখানায় চাকরী নেয়। মেয়েদের বিয়ের পোষাকের দাম খুব বেশী, গরীব বাপ-মা সব সময় তা কিনে দিতে পারেন না। বরপক্ষকে দেবার পণের টাকাটাও মেয়েরা জমিয়ে ফেলে কারখানায় চাকরী করতে করতে।

জাপানে ছোট-বড় কারখানা আছে ১৫ হাজার। সেখানে বেশীর ভাগ মেয়েরাই কাজ করে। সকাল ছ'টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত কারখানার কাজ চলে। মাঝে একবার আধ ঘণ্টা ছুটী হয় খাবার জন্য, আর পনেরো মিনিট করে দু'বার ছুটী হয় ব্যায়াম করার জন্য। প্রত্যেককে দশটি ঘণ্টা রীতিমত কাজ করতে হয়। এই দশ ঘণ্টার মধ্যে বসা নিষিদ্ধ। একভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতো খাটুনীর পর মজুরী মেলে ৮৫ সেন—প্রায় বারো আনা। তা থেকে অর্দ্ধেকের বেশী কেটে নেওয়া হয় থাকা, খাওয়া, আর পোষাকের জন্য। বাকীটা জমে। মেয়েদের কারখানার মধ্যে থাকাই রীতি, তবে সপ্তাহে এক দিন ছুটী পায় কারখানার বাইরে যাবার জন্য। এই ভাবে খেটে তিলে তিলে বিবাহের খরচ সঞ্চয় করতে এক-একটি মেয়ের সময় লাগে প্রায় পাঁচ বছর। বছর ষোল বয়সে কারখানায় এসে তারা ভর্ত্তি হয়, বছর কুড়ি-একুশে বিদায় নেয় সেখান থেকে।

আর এক দল মেয়ে আছে, যারা ঠিক এই ধরণের খাটুনি পছন্দ করে না, তারা চলে যায় নাচ-গানের দিকে। সৌখীন লোকদের মজলিশে গান শুনিয়ে নাচ দেখিয়ে তারা পয়সা উপায় করে। তাদের বলে 'গায়শা'। কারখানার মেয়েদের চেয়ে এরা বেশী রোজগার করে বটে, কিন্তু নাচ-গানের ইস্কুলে এদের রীতিমত পড়াশুনা করতে হয়।

বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে মেয়েরা যখন স্বাবলম্বী হয়, ছেলেরা তখন যায় সামরিক শিক্ষালয়ে। প্রত্যেক ছেলেকে দু'বছর যুদ্ধবিদ্যা শিখতেই হবে, অবশ্য অসুস্থ হলে অন্য কথা। প্রতি বছরে দেড় লাখ ছেলে যুদ্ধবিদ্যা শিখে বের হয়। তা'বলে প্রত্যেককেই যে সৈনিক হতে হবে তার কোন মানে নেই। তবে যখন প্রয়োজন হয় তখনই সম্রাট্ তাদের যুদ্ধে যাবার জন্য আহ্বান করতে পারেন।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে জাপানীরা বড় বেশী সজাগ। সব সময় ছোট ছেলে-মেয়েদের উপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি। বাইরের ধুলো-বালিতে ছোটদের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে বলে পথে বেরুবার আগে তাদের এক রকম 'নাক-ঢাকা' পরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে নিশ্বাসে কোন রকম দূষিত বীজাণু দেহে প্রবেশ করতে না পারে। তাছাড়া সেখানে সকালে কাজে বেরুবার আগে স্নান করে বেরোনোর রীতি নেই, সারা দিনের কাজ শেষ করে এসে সন্ধ্যাবেলা তারা গরম জলে স্নান করে ত্বককে ক্লেদমুক্ত করে। গ্রীষ্মকালেও গরম জলে স্নান করতে তারা ভালোবাসে। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য রাত্রে তারা কিছু আহার করে না, সন্ধ্যাবেলায় রাত্রির আহার শেষ করে।

জাপানী ছেলেমেয়ে সাঁতার কাটতে খুব ভালোবাসে, ওলিম্পিকের বিশ্ব-ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তারা সাঁতারে শীর্ষস্থান দখল করেছিল।

ছেলেদের মাঝে কুস্তিরও খুব প্রচলন আছে, তবে সে কুস্তি আমাদের দেশের মত নয়। বালির উপর খড়ের দড়ি দিয়ে তারা একটা গোল বৃত্ত করে, সেই বৃত্তের মাঝে দু'জন মল্ল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। সহজে কেউ কাউকে আক্রমণ করে না। আক্রমণ করার উপক্রম করে শুধু। কুস্তিগীরের কায়দায় ঝুঁকে পড়ে পরস্পরের পানে। বেশী সময় এই ভাবে আক্রমণের উদ্যোগ-পর্ব্বেই কাটে, তার পর লড়াই হয় অল্পক্ষণ মাত্র। এক জন যেই অপর জনকে দড়ির সীমার বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারবে, অমনি তার জিত। দেহের কোন অংশ দড়ির সীমা পার হয়ে মাটি ছুঁলেই তার হার। রেফারীর মুখে বাঁশী থাকে না, হাতে থাকে চাঁদ-সূর্য্য আঁকা একখানি আরসী, আগিয়ে এসে বিজেতার মুখের সামনে তিনি আরসীখানি ধরেন। কুস্তি শেষ হয়।

জাপানী ছেলে-মেয়েদের জীবনে বছরে তিনটি দিন বিশেষ আনন্দের। প্রথম হোল নববর্ষ। বছরের প্রথম দিন খুব ভোরে সবাই ঘুম থেকে ওঠে, দলে দলে একটি উঁচু জায়গায় গিয়ে জড়ো হয় সূর্য্যোদয় দেখবার জন্য। জাপানীদের বিশ্বাস, নতুন বছরের সূর্য্যোদয় দেখলে না কি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। সবাই সে দিন বাড়ী-ঘর পথ-ঘাট সুন্দর করে সাজায়, নতুন পোষাক পরে, ভাগ্যদেবীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দেয়। বাড়ীর গরু-ঘোড়াকে পর্য্যন্ত নতুন পোষাক দেয়। দু'-তিন দিন সব অফিস-ইস্কুল বন্ধ থাকে। ঘুড়ী ওড়ানোর উৎসব লেগে যায় ছেলেদের মধ্যে। পাড়ায় পাড়ায় দল হয়। কোন্ দলের ঘুড়ী কে কত কাটতে পারে, তারই পাল্লা চলে।

তার পর ৩রা মার্চ্চ হয় মেয়েদের পুতুল-উৎসব—মোমো-নো-সেক্কু। এই দিন মেয়েরা যার যত পুরানো পুতুল বাক্স থেকে বের করে সেলফের তাকের উপর সাজায়। নিজেরা রান্না করে বাড়ীর লোকদের ভোজের ব্যবস্থা করে। সারাদিন হৈ-হৈ হুল্লোড় চলে। তার পর সন্ধ্যাবেলা পুতুলগুলোকে আবার বাক্সের মধ্যে তুলে রাখে পরের বছরের জন্য। ফিরের সময় নিজ নিজ পুতুল মেয়েরা

ধর্ম্মাবলম্বী দেশগুলি ১লা জানুয়ারী থেকে নববর্ষ গণনা সুরু করে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দের আগেই জার্ম্মাণ, সুইডেন ও ডেনমার্কে নববর্ষের প্রথম দিন সুরু হয় ১লা জানুয়ারী থেকে। ইংল্যাণ্ডও অবশেষে ১লা জানুয়ারী তারিখই পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ করল আরো কিছু কাল পরে। সে ত এই সেদিন—১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে। সেই থেকে সমগ্র ইউরোপের ১লা জানুয়ারীই নববর্ষের প্রথম দিন।

প্রাচীন মিশরীয়, ফিনীসীয় ও পারসিকরা তাদের নববর্ষ গণনা করত ইংরাজী ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ২১শে ডিসেম্বরই ছিল গ্রীকদের নববর্ষের প্রথম দিন।

প্রাচীন রোমানদের মধ্যেও ২১শে ডিসেম্বর থেকে নববর্ষ সুরু হোত। পরে জুলিয়াস সীজারের আমল থেকে জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১লা জানুয়ারীই নববর্ষের প্রথম দিন বলে গণ্য হয়।

ইহুদীরা চিরকালই ৬ই সেপ্টেম্বরকে নববর্ষের প্রথম দিন ধরে এসেছে। অবশ্য তাদের ধর্ম্মাঙ্গীণ বৎসর সুরু হয় ২১শে মার্চ্চ থেকে।

বিচিত্র পত্রিকা

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ

এটা তোল নানান্ রকমের পত্রিকার যুগ। পৃথিবীর নিভৃততম কোণে বসেও আমরা এই সব পত্রিকার সাহায্যে বহির্জ্জগতের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর পেয়ে থাকি। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কত বিচিত্র ও অসংখ্য মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক, পাক্ষিক ইত্যাদি নানান্ রকম পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। এদের মধ্য থেকে আজ কয়েক রকমের বিচিত্র পত্রিকার খবর তোমাদের শুনোচ্ছি।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আগে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোত, নাম তার Le Clochard অর্থাৎ কি না ভবঘুরে। এতে কেবল ভবঘুরেদেরই কথা ও খবর থাকত, এমন কি, এতে বিজ্ঞাপনও নেওয়া হোত এমন সব জিনিষের, যে সব কেবল ভবঘুরেদের কাজেই লাগতে পারে। Historique Muse (হিষ্টোরিক মিউস) নামে একখানা দৈনিক খবর-কাগজ পনেরো বছর ধরে একাদিক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সংবাদ, বিজ্ঞাপন, রচনা, যা কিছু সবই কবিতা দিয়ে রচিত হোত। এত দিনের মধ্যে এতে একছত্রও গদ্যরচনা বার হয়নি। অদ্ভুত নয় কি?

বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন খুব প্রচণ্ড ভাবে ইংল্যাণ্ডে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছিল, তখন বিখ্যাত সংবাদপত্র Pearsons Weekly ইউক্যালিপটাস্ অয়েলে ভিজিয়ে বার করা হোত।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে Gaeenock Newsclout কাপড়ের উপর ছাপা হয়ে প্রকাশ হতে লাগল। কেন জান কি? কারণ, সংবাদ-পত্রের কাগজের উপর শুল্ক ছিল অনেক বেশী। সরকারকে সেইটা ফাঁকি দেওয়ার জন্যই এই সব ব্যবস্থা।

আর্ম ডে দ্বীপে 'ডেলী পাইলট' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ হোত। এর আকার ছিল ১ ফুট লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া। এর এক পিঠে ছাপা হোত।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জের বিমিনি দ্বীপ থেকে 'বিমিনি বিউগ্‌ল্' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা এখনও প্রকাশ হয়ে থাকে। এর আকার লম্বায় সাড়ে ৪ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৩+১/৮ ইঞ্চি।

নিউইয়র্কে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Illuminated Quadruple Cons'ellation নামে একখানি শতবার্ষিক কাগজের প্রথম সংখ্যা মাত্র বার হয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যাটি বেরুবে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন থেকে আরও তের বছর পরে। এই শতবার্ষিক কাগজের আকার দৈর্ঘ্যে সাড়ে ৮ ফুট, এবং চওড়ায় ৬ ফুট। এতে আছে আটটি পৃষ্ঠা, এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তেরটি করে স্তম্ভ। New York Times সাধারণ পাঠাগারগুলির জন্য এক বিশেষ সংস্করণ কাপড়ের উপর মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন। এর বিশেষত্ব, শীঘ্র ছেঁড়ে না।

কানাডা থেকে একটি সংবাদপত্র বার হয়ে থাকে; এক জন রেড ইণ্ডিয়ান এর সম্পাদক। প্রায় ২০,০০০ রেড ইণ্ডিয়ান এর একনিষ্ঠ পাঠক।

China Times নামে একটি সংবাদপত্র আছে; এটি চীনা, জাপানী, জার্ম্মাণ, ইটালিয়ান, রাশিয়ান, ফরাসী ও ইংরেজী,—এই সাতটি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

মার্কিণ মুল্লুকের একটি বিশেষ পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হচ্ছেন সেখানকার যত হোটেলওয়ালারা। এই পত্রিকায় কেবল হোটেল চোরদেরই সংবাদ প্রকাশ হয়ে থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো সংবাদপত্র হচ্ছে চীন দেশের Tching Pao পত্রিকা। এই 'সিং পাও' পত্রিকাটি ১০২২ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

সিকাগোর দস্যু-তস্কররা যুদ্ধের আগে, নিজেদের খবরাখবর রাখবার জন্য এক রকম সাঙ্কেতিক চিহ্নে (code) একখানি পত্রিকা প্রকাশ করত। এর সম্পাদক ছিল এক জন নামজাদা খুনে ডাকাত।

"অন্যায় যে করে আর—অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।"
—রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যিকা

শ্রীমতী বাণী রায়

আজও নিশীথ স্বপ্নের অবসানে মধুর তন্দ্রায় কানে ভাসিয়া আসিল করুণ একঘেয়ে বিষাদাচ্ছন্ন একটি সুর। ধীরে ধীরে সেই সুর শব্দে মূর্ত্তি গ্রহণ করিল—

"Ramona, I hear the mission bells's ring···

···I bless you, I caress you—"

আমার মুদিত চক্ষের সম্মুখে ইতস্তত: তুলিক্ষেপে ছবি চিত্রিত হইয়া গেল—কোন বিদেশী তটিনীর তীরে মিশনবাড়ীর ঘণ্টাস্পন্দন, উদাস নয়নে কোন রামোনা? আমার সহস্র আশীর্ব্বাদও কোন রামোনাকে রক্ষা করিতে পারে নাই?

ক্ষুদ্র গৃহে অজস্র জনসমাগম। মৃত্যুর সম্মুখে মূক জনতা। শুভ্র পুষ্পে অধিকার আছে কি না জানি না, তবু শয্যা তাহার সাদা ফুলে আবৃত। পাণ্ডু অধরে চিরাভ্যস্ত বিষণ্ণ হাসি, ক্লান্ত নয়ন নিমীলিত। জীবনে তাহাকে যাহারা ভালবাসে নাই তাহাদের চক্ষেও বস্ত্রখণ্ড। কিন্তু আমারও চক্ষে অশ্রু কেন? এক দিন তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছি, কিন্তু আজ তাহার মৃত্যুতে আমিও শোক করিতে আসিয়াছি।

চায়ের সময়। আমার রেকাবে জেলী-মাখানো রুটী দিতে দিতে সে গান ধরিয়াছিল—"Ramona, I hear the mission bells's ring"—সেই তাহার শেষ কণ্ঠধ্বনি আমার শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই বোধ হয় প্রভাত-স্বপ্ন আমার ব্যাহত হয় বিদেশী সঙ্গীতের অস্পষ্ট গুঞ্জরণ স্মৃতিতে। কিন্তু সে গাহিয়াছিল লঘু চাপল্যে, আর আমি শুনিতেছি বিষাদ-অশ্রুতে,—'রামোনা—'।

না, না আমি তাহাকে ভালবাসি নাই। বাসিয়াছিলাম অসম্ভব বেশী। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনে আমি ছিলাম একমাত্র অনাত্মীয় পুরুষ, যে তাহাকে বাসনার চক্ষে দেখে নাই।

প্রতুল ছিল ল ক্লাশে আমার একমাত্র বন্ধু। কিছু বেশী বয়সে আইন পড়িতেছিলাম। শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করি নাই। প্রতুল আমার পাশে বসিত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে সে ব্যস্ত। আমার পুস্তকাদির সাহায্য তাহাকে লইতে হইত, কারণ, পুস্তক ক্রয় করিবার অর্থ তাহার প্রায় থাকিত না।

বই দেওয়া-নেওয়া করিতে প্রতুলের জীর্ণ একতালা বাটীর সদর দ্বারে এক দিন তাহার সহিত আলাপ হইয়া গেল—"দাদা ছাত্র পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। এই বইখানা আপনাকে দিতে বলে গেছেন।"

আমি অবিবাহিত যুবক, সুন্দরী তরুণীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে উপন্যাস-বর্ণিত একটি নিগূঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু, উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে আমার প্রভেদ এই যে, আমার বন্ধন প্রেমের নহে, অপরিসীম স্নেহের। মনে হইল, কত যুগ হইতে তাহাকে যেন আমার কত কি দিবার আছে, দেওয়া হয় নাই। মনে হইল, তাহার সুখ যেন আমার হস্তে নির্ভর করিতেছে। সে যেন আমারই পথ চাহিয়া আছে। অপরিচয়ের সঙ্কোচ আমার আগ্রহকে দমন করিয়া রাখিতে পারিল না। 'আপনি' শব্দের দ্বারা ব্যবধান রচনা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া চলিবার উপক্রম করিতে প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"তুমি বুঝি প্রতুলের বোন? তোমার নাম কি?" সাহস সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল না, সে আমারি পথ চাহিয়াছিল।

সেই প্রতুলের ভগিনী জয়ন্তী দত্তের সহিত আমার প্রথম আলাপ। কিছু দিন গেল। এক দিন প্রতুল আমাকে সকুণ্ঠ ভাবে বলিতে আসিল,—"তোমরা ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্থ, আর তাছাড়া আমরা বড় গরীব। নইলে জয়ন্তীকে তুমি যে রকম ভালবাস, তাতে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হলে বড় সুখী হতাম।"

শিহরিয়া উঠিলাম। জয়ন্তীর সহিত আমার বিবাহ? অসম্ভব। প্রতুল ভালবাসা দেখিয়াছে, তাহার রূপটি দেখে নাই। বলিলাম,—"ছিঃ, জয়ন্তীকে যে আমি নিজের বোনের মত ভালবাসি।"

দ্বিধায় আমার দিকে চাহিয়া প্রতুল বলিল,—"তাহলে তুমি ওর ভাই হলে?"

সবেগে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, তাই! তাই!"

জয়ন্তীর ঘন পক্ষ্মসমাবৃত করুণ নয়ন দু'টি আমার বড় ভাল লাগিত। শ্যামল তনুদেহে, দীর্ঘ কৃষ্ণ অলকরাশিতে এবং পরিপূর্ণ ঈষৎ স্থূল অধরে তাহার যে রূপ লক্ষ্যগোচর হইত, তাহা পুরুষচিত্তে আকাঙ্ক্ষা-উদ্রেককারী। কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিলে দেখিতাম, সরলা কিশোরীর অসহায় আত্মভোলা অন্তঃকরণের চিত্র। কখনও কখনও উদাস আত্মবিস্মৃত দৃষ্টিতে সে এক দিকে চাহিয়া থাকিত। সে [illegible] ডাকিয়া উত্তর পাই নাই। এক দিন

তাহার এই ঘন ঘন আত্মবিস্মৃতি লইয়া পরিহাস করায় প্রতুল উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—"জানো না প্রভাত, ও যে সাহিত্যিকা।"

—"সাহিত্যিকা?"

—"হ্যাঁ, গল্প লেখে, কবিতা লেখে। রাত্রে রোজ শোবার আগে কবিতা পড়ে শোয়। বড় বড় লেখকদের লেখা সমালোচনা করে। অবশ্য সমস্তই কাগজে-কলমে। এখনও প্রকাশ হয়নি। নীরব সাহিত্যিকা।"

বলিলাম—"কেন জয়ন্তী? কাগজে পাঠালে পারো।"

সাগ্রহে আমার দিকে চাহিয়া জয়ন্তী প্রশ্ন করিল,—"তারা ছাপাবে?"

সেই আশায় ভাস্বর মুখের প্রতি চাহিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, জয়ন্তীর রচনা প্রতিটি-পত্রিকা শোভিত করিবে, আমি তাহা সাধ্যায়ত্ত করিব। অর্থের অভাব আমার ছিল না।

—"এ কি?"

পুরুষকণ্ঠের স্থির, আত্মনিশ্চিত স্বর শোনা গেল—"প্রতিভা থাকলেও মেয়েরা সংস্কারমুক্ত হয় না, তার প্রমাণ তুমি। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। আমি তোমাকে চাই। সে চাওয়ার সীমারেখা নেই। আলাদা কোরো না, শরীর আর প্রেম এক।"

—"না, না। আমি আপনাকে ভালবাসতে চাই। দয়া করুন।"

জ্বলন্ত লৌহশলাকা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। জয়ন্তী,—আমার জয়ন্তী এই সমস্ত কথা শুনিতেছে—আমিই ছয় মাস পূর্ব্বে পরিচয় করাইয়া দিয়াছি—মণিবর্দ্ধনের মুখ হইতে। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মণিবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়। জয়ন্তী প্রত্যাখ্যান করিতেছে, তবু কেন আমার বক্ষে অসহনীয় যন্ত্রণা? জয়ন্তী,—আমার জয়ন্তী বলিতেছে সে ভালবাসিতে চায়। কাহাকে? মধ্যবয়স্ক, বিবাহিত মণিবর্দ্ধন। তাঁহার বচনবিন্যাস তাঁহার চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিবে।

চোরের মত আমি শুনিয়াছিলাম। চোরের মত অন্দরের দ্বার দিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছি। চৌর্য্যবৃত্তি আমার স্বধর্ম। আজ সাহিত্যিকা বলিয়া জয়ন্তীর খ্যাতি জন্মিয়াছে। আমার এক বৎসরের সাধনায় গৃহাঙ্গনের তুলসীবৃক্ষকে আমি প্রকাশ্য রাজপথে রোপণ করিয়াছি। সাহিত্যিকগণের সাহিত্যিকার নিকট অবারিত গতির দাবী আছে। জয়ন্তী শুধু প্রতুলের ভগিনী, বৃদ্ধ পিতার কন্যা, আমার অশেষ স্নেহপাত্রী নহে—সে বঙ্গ-সাহিত্যের।

মণিবর্দ্ধনকে কিছু বলিতে পারিলাম না, জয়ন্তী তাঁহাকে ভালবাসে। সাড়া দিয়া পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

জয়ন্তী প্রবেশ করিল। বিদেশী ভয়েলের বস্ত্র তাহার অঙ্গে, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়িতেছে।

কি বলিতে কি বলিলাম?—"চুলে তেল দাও না কেন জয়ন্তী?"

—"ও আমাকে মানায় না।"

—"তোমাকে কি মানায় আর কি মানায় না, সে সম্বন্ধে মতামতটা স্তাবকদের কাছ থেকে না নিয়ে আয়নার কাছ থেকে নিলেই পারো।"

—"কি হয়েছে আপনার প্রভাত দা, এত রাগ কেন?"

ওঃ। কথাও যেন জয়ন্তী বলিতেছে মণিবর্দ্ধনের অনুকরণে। সেই অধরের পার্শ্বে ব্যঙ্গ হাস্য ও নয়নের তির্য্যক দৃষ্টি।

—"শোন জয়ন্তী, বোস। একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে। ও-ঘরে মণিবর্দ্ধন বাবু কি—?"

মুখ ফিরাইয়া অপ্রতিভ স্বরে জয়ন্তী বলিল—"চলে গেছেন।" জয়ন্তী আমার পায়ের কাছে-একটা নীচু বেতের মোড়ায় বসিল।

—"ভবিষ্যতে কি করবে স্থির করেছ? সব কাগজে লেখা তো বার হলো। বিস্তর সভা-সমিতি করলে। এখন কি করবে বলো? ডিগ্রী নেই, সুতরাং চাকরী চলবে না। বাঙ্গালী মেয়ের যা অবশ্য কর্ত্তব্য তাই করো। বিয়ে করো, একটি সুপাত্র দেখি।"

সেই আত্মবিস্মৃত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জয়ন্তী উত্তর দিল, —"না, বিয়ে আমি করতে পারব না। আমি সাহিত্য নিয়ে সারা জীবন থাকব।"

—"সাহিত্য শুধু হলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু, তার প্রধান আনুষঙ্গিকটি তোমাকে যে গ্রাস করতে চাচ্ছে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জয়ন্তী বলিল, "প্রধান আনুষঙ্গিক? ও, বুঝেছি। আচ্ছা প্রভাত দা, সাহিত্যিকেরা সকলে এত ভাল, তবু নৈতিক বন্ধন মানেন না। আমি কি খারাপ মেয়ে, যে ওঁরা আমার সঙ্গে অমনি করেন?"

—"তুমি খারাপ নও, তুমি অন্য রকম। নিজেদের মত না হলে ওঁরা মিশে স্বস্তি পান না।"

জয়ন্তীর সহিত কথা বলিতে বলিতে দুই দিন পূর্ব্বের একটি চিত্র আমার চক্ষে ভাসিয়া আসিল।

সঞ্জয় মিত্রের নূতন নাটকের প্রথম অভিনয়। জয়ন্তী নিমন্ত্রিতা হইয়াছিল। তাহার সঙ্গী হিসাবে আমিও গিয়াছিলাম টিকেট কাটিয়া। প্রতুলের অবকাশ ছিল না।

মধুলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় সঞ্জয় মিত্র ও তাহার সাহিত্যিক বন্ধুবর্গ জয়ন্তীর চতুষ্পার্শ্বে ভিড় করিয়াছিল। তরুণ, অবিবাহিত যুবক সঞ্জয়ের ব্যাকুলতা আমাকে তৃপ্তি দিয়াছিল, কারণ, সঞ্জয় জয়ন্তীর স্বজাতি।

আমার উপহার হীরকখচিত কর্ণাভরণ দোলাইয়া জয়ন্তী সঞ্জয়কে বলিতেছিল,—"ইস, কি ভাবেন আপনি আমাকে? একা আমি এখন আপনার সঙ্গে ময়দান থেকে ঘুরে আসতে পারি না?"

সুপুরুষ সঞ্জয় মিত্রের বঙ্কিম অধরে হিসাব-খতিয়ানের সতর্ক হাস্যরেখা দিল,—"মিস্ দত্ত, ভুলে যাচ্ছেন আপনার অভিভাবকেরা এখানে উপস্থিত নেই। ওঁদের অনুমতি নেওয়া হল না। আপনি যে এখনও বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করেন না।"

সবেগে জয়ন্তী প্রতিবাদ করিল—"কক্ষনও না। আমার অভিভাবকের মধ্যে বাবা আর দাদা। তারা তো কোন কাজে আমাকে বাধা দেন না।"

—"দিলে ভাল করতেন জয়ন্তী দেবী। আপনি এখনও বড় ছেলে-মানুষ—" চুরটের ধূম্রজালের মধ্য হইতে চিন্তান্বিত মুখে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক নয়নারায়ণ রায় বলিলেন।

—"তাহলে নয়নারায়ণ বাবুর অনুমতিটাই নেওয়া যাক। আধ ঘণ্টা বিরতি আছে, এর মধ্যে আমরা ঘুরে চলে আসছি। দেখি কেমন আপনার সৎসাহস।"

সম্মতি প্রত্যাশার দৃষ্টিতে জয়ন্তী আমার প্রতি চাহিল।

ধীরে ধীরে বলিলাম,—"এখন আর যেয়ে লাভ কি, জয়ন্তী? ঠিক

সময়ে ফিরে আসতে পারবে না। সঞ্জয় বাবুর বই, উনি উপস্থিত না থাকলে ভাল দেখায় না। বাড়ী ফিরবার পথে নামলেই হবে।"

উচ্চ হাস্যের সহিত সঞ্জয় বলিল—"ওহো, এখানে যে প্রভাত বাবু রয়েছেন সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রভাত বাবু যে মিস্ দত্তের সব চেয়ে বড় অভিভাবক!"

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জয়ন্তী বলিল,—"হ্যাঁ, প্রভাত দা আমার নিজের দাদা না হলেও তারও বেশী।"

একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়া আলোকোজ্জ্বল চতুষ্কোণ নাট্যগৃহের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

জয়ন্তীর কাল শাড়ী-ঢাকা পৃষ্ঠদেশে হস্ত রক্ষা করিয়া অবশেষে মণিবর্দ্ধন উঠিলেন,—"আচ্ছা জয়ন্তী, ময়দান অনেকটা দূর, কাছে কাছেই না হয় চলো, এত বেড়াবার ইচ্ছা যখন তোমার। নামিতে এস। বড় তেষ্টাও পেয়েছে।"

মন্ত্রমুগ্ধা সর্পীর মত জয়ন্তী দীর্ঘাকৃতি মণিবর্দ্ধনের অনুগমন করিল। দেখিলাম, এবারে আমার অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইল না। ইহাদের মধ্যে মণিবর্দ্ধনের জয়ন্তীর প্রতি আকর্ষণ কিছুটা ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাই বড় ভয় হয়। কামনার আহ্বান জয়ন্তী উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যেখানে বিন্দুমাত্র প্রেমের অনুপান মিশ্রিত আছে, সে বিষ যে তাহার সাহিত্যিক-চিত্তের অমৃত-রসায়ন।

—"তুমি সাধারণ মনোবৃত্তি দিয়ে সাহিত্যিকের বিচার করতে যেয়ো না জয়ন্তী, তাহলেই তোমার আসবে গোলমাল আর জটিলতা।"

শুনিলাম আমারি কণ্ঠ শান্ত, অনুত্তেজিত নিয়মবদ্ধ ভাবে জয়ন্তীকে হিতোপদেশ দিতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত ক্রমাগত বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে একটির পর একটি অতীত দৃশ্যে।

মাসখানেক পূর্ব্বে। দেখিয়াছিলাম জয়ন্তীর বাটীতে বৈকালিক জনসমাগমের মধ্যে কি দীনতা-মিশ্রিত ব্যাকুলতা। ভিখারীর প্রার্থনা সকলেরি নয়নে, ভঙ্গিতে। চায়ের পাত্র লইবার অছিলায় লম্পট-চূড়ামণি অম্বর বসুর জয়ন্তীর হস্তধারণ। দেখিয়াছিলাম, সঞ্জয় মিত্রের হেলিয়া জয়ন্তীর দেহ স্পর্শ করিয়া অন্তরঙ্গ আলাপ। জয়ন্তীর বৃদ্ধ পিতা পাশের কক্ষে ভাগবতপুরাণ পাঠ করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাহিত্য-আসরের অট্টহাসি শ্রবণ করিতেছেন। প্রতুল নিত্যকার মত ছাত্র পড়াইতে গিয়াছে। তাই সাহিত্যিক না হইলেও এই সমস্ত সাহিত্য-সভার এক কোণে অপ্রতিভ হাস্য মুখে টানিয়া আমার বসিয়া থাকিতে হইত। বুভুক্ষু নেকড়ের পালের মধ্যে জয়ন্তীকে একা ফেলিয়া আমি যাইতে পারি না।

কাল আবরণীর মধ্য হইতে স্তিমিত আলোর দ্যুতি দরিদ্রগৃহের সামান্য আসবাবকে ধনিগৃহের উজ্জ্বলতায় শোভিত করিবার বৃথা প্রচেষ্টারত। সেই আলোর নিম্নে গৃহের একমাত্র সভ্য আসনে সোজা হইয়া বসিয়া নীরবে সমস্ত দেখিতেছেন—মণিবর্দ্ধন।

"High on the throne of royal splendour
Exalted satan sat.…"

এই বিশাল নয়নে প্রকৃত প্রতিভার জ্যোতিঃ সন্দেহ নাই, উদার ললাটে জ্ঞানগরিমার চিহ্ন। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম-পাশ এড়াইবার শক্তি জীবনে কোন দিনই মণিবর্দ্ধন সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পান নাই। উঁহার চারি পাশের দীনতা-লঘুতার মধ্যে অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে; রাজকীয় নিঃসঙ্গতায় তিনি সাধারণ সাহিত্যিকের পর্য্যায় হইতে বহু স্বতন্ত্র। তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। মনে হইল, বায়সকুলের বিফল কলহ ও চঞ্চু-আস্ফালনের ঊর্দ্ধে প্রদীপ্ত দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিয়াছে শিকারী ঈগল। তাহার যখন যাহাতে প্রয়োজন নিঃশব্দে সে তখনি সেটি সংগ্রহ করিবে। অযুত বায়সবৃন্দের বাধা প্রদান করিবার সামর্থ্য হইবে না।

শুনিলাম, মণিবর্দ্ধনের কথা বলিতেছি—"এই দেখ না মণিবর্দ্ধন বাবুকে। কত বড় প্রতিভা, কিন্তু রুচি বিকৃত। নয় কি?"

—"কিছুমাত্র নয়—" শুনিলাম, তীব্রকণ্ঠে জয়ন্তী প্রতিবাদ করিতেছে—"উনি প্রকৃতির নিয়মের ওপর মানুষের নিয়ম প্রচলিত করেন না। সমস্ত কিছুর আদি রূপটি ওঁর চোখে পড়ে, এমনি আশ্চর্য্য বুদ্ধি ওঁর, আপনি আমি এবং সাধারণ মানুষে মিলে বস্তুটির যে বিকৃত রূপ দিচ্ছি সেটা উনি গ্রাহ্য করেন না। বিকৃত রুচি আমাদের প্রভাত দা, ওঁর নয়।"

মনে হইল, সহসা যেন জয়ন্তী আমার নিকট হইতে কত দূরে চলিয়া যাইতেছে। যেন উভয়ের মধ্যে খরস্রোতা কোন অজানা তটিনী প্রবাহিতা। অস্পষ্ট কুয়াসাজালে জয়ন্তীর সর্ব্বদেহ যেন মণ্ডিত হইয়া গেল। আমার দৃষ্টি আর তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। বিদেশিনী! আমার জগৎ বুঝি তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ মণিবর্দ্ধনের জগৎ তাহার জগৎ। 'আমরা' বলিয়া জয়ন্তী আমাকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেও বুঝিলাম আজ আমরা অর্থাৎ আমি একা। মণিবর্দ্ধনের মতামতে আর জয়ন্তীর মতামতে পার্থক্য নাই। তাই চিরন্তন সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া আত্মদানে অস্বীকৃতি জানাইলেও জয়ন্তীর মণিবর্দ্ধনকে ভালবাসিবার পক্ষে কোন বাধা হইতেছে না। নদীর ওপারে বিদেশিনী জয়ন্তী, এপারে আমি। ধিক্! কারণ আমি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত, আর জয়ন্তী? জয়ন্তী সাহিত্যিকা!

জয়ন্তীদের গৃহপার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে চেতনা লাভ করিয়া শুনিলাম, আমারি শান্ত কণ্ঠ বলিতেছে,—"সমাজে থাকতে হলে সামাজিক নিয়মগুলো স্থূলভাবে মেনে চলতে হয়। বুদ্ধির খেলা সেখানে চলে না। আদি বস্তুর ওপর যাঁর অত আকর্ষণ তাঁর মনুষ্য-সমাজ ত্যাগ করে অরণ্যবাসী হওয়া উচিত। যেগুলো করা উচিত নয় সেগুলো বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ না করে অন্ধভাবে মেনে চলাই কর্ত্তব্য।"

—"হৃদয় উচিত অনুচিত মেনে চলে না।"

চমৎকার! জয়ন্তীর সাধারণ সহজাত বুদ্ধি আজ কাব্যমদিরায় আচ্ছন্ন। আমাকে কঠোর হইতে হইবে।

—"তিনি বিবাহিত, সুতরাং কোনও কুমারী মেয়ের সঙ্গে মিশতে হলে যতটা সংযম রক্ষা প্রয়োজন তা তিনি করছেন না।"

অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখভাব লক্ষ্য করিতে করিতে জয়ন্তী বলিল,—"দোষ তাঁর একার নয়। বিবাহিত ব্যক্তির কথা কুমারী মেয়েরও বিবেচনা করা উচিত।"

—"জয়ন্তী চুপ করো। মণিবর্দ্ধনের মনে সম্পূর্ণ প্রেম জাগাতে যে মেয়ে পারে, তুমি সে মেয়ে নও। তোমার লেখা অত্যন্ত ভাল হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কোমল। এই চরিত্রগত কোমলতা তোমার সর্ব্বনাশ করবে।"

—"উনি তো আমাকে তাহলে বিয়ে করতেও প্রস্তুত আছেন" —বক্র কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া জয়ন্তী উত্তর দিল।

শিহরিয়া উঠিলাম, বলিলাম—"জয়ন্তী, তুমি কোনও দুরবস্থায় পড়লে কি মণিবর্দ্ধনের কাছে কেঁদে দয়া ভিক্ষা করবে?"

অবিচলিত স্বরে জয়ন্তী উত্তর দিল,—"না, আত্মহত্যা করব।"

নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও কোথাও অপরিসীম সান্ত্বনা পাইলাম। মণিবর্দ্ধন আমার জয়ন্তীকে সর্ব্বগ্রাস করিতে পারেন নাই। এখনও অবশিষ্ট আছে—তাহার আত্মসম্মান।

বলিলাম—"তারও প্রয়োজন হয় না। তোমার জয়ন্তী দত্ত নাম যদি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তোমার যে কোনও সন্তানের পক্ষেও যথেষ্ট হবে। অনাহূত, অবজ্ঞাত যারা আসে, পৃথিবীতে তাদের দিয়েও প্রয়োজন আছে।"

আমার সন্নিকটে জয়ন্তী সরিয়া আসিল, করুণা অনুশোচনায় তাহার ঘন পক্ষ্মনয়নে রাত্রির গভীরতা নামিল,—"কেন মন খারাপ করছেন আপনি? আমি কথা দিচ্ছি কিছুই হবে না।"

একটু নীরবতার পরে জয়ন্তী ধীরে ধীরে বলিল—"আপনার কিন্তু মণিবর্দ্ধন বাবুর ওপর একটা অহেতুক বিশ্রী ধারণা রয়েছে। জানেন, উনি হাতযোড় করে আমাকে তাড়াতাড়ি কোন সুপাত্রকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছেন। উনি যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী না-ই হবেন তাহলে ও-কথা বলবেন কেন?"

"জয়ন্তী, সাহিত্যিক মনে দু'টো বৃত্তিই আছে। জান না, ধূলোয় বসে তাঁরা স্বর্গরচনার স্বপ্ন দেখেন? যে হাত সময় বিশেষে পানপাত্র ধরার পক্ষেও শিথিল হয়, সেই হাত আবার অনবদ্য সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারে। মণিবর্দ্ধন অন্তরে বাহিরে এক জন প্রকৃত সাহিত্যিক।"

তাহার পরে আর কিছু বলি নাই, শুধু দেখিয়া গিয়াছি এবং মনে মনে অর্থ করিয়া গিয়াছি। দেখিয়াছি, জয়ন্তীর উদাস কমল নয়নে শ্রান্তির নিবিড় প্রলেপ! দেখিয়াছি, সরল, মনোহারী হাস্য জয়ন্তীর বিষাদ-মলিন! অধরের পার্শ্বে একটি দুইটি গভীর রেখাতে, কপোলের পাণ্ডুতাতে তাহার মানসিক সংগ্রাম প্রকট। প্রেমাস্পদের প্রেম লালসাপ্রধান হইলে সে আহ্বান প্রেমিকার নিকট অমার্জ্জনীয়, অথচ ব্যাকুলতা তাহার অহর্নিশ ডাকিয়া ফেরে।

দেখিয়াছি, মণিবর্দ্ধনের সুদীপ্ত নয়নের তীব্রদৃষ্টি ক্রুদ্ধ সর্পের দৃষ্টির একাগ্রতায় জয়ন্তীকে অনুসরণ করিতেছে! উজ্জ্বলতা তাঁহার নয়নে দ্বিগুণ হইয়াছে, যেন কোন অনির্ব্বাণ অনল তাঁহাকে জ্বালা দিতেছে।

প্রতুলকে এক দিন আমার নির্জ্জন বাটীতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম—"আর দেরি কোর না। জয়ন্তীর বিয়ে এখন না দিলেই নয়। চেনা-জানার মধ্যে ঐ সঞ্জয় মিত্র লোকটি বেশ! আসা-যাওয়া করছেন খুব, জয়ন্তীর ওপর মন আছে। ওর কাছে তুমি নিজে যেয়ে প্রস্তাব করো।"

দ্বিধার সহিত প্রতুল বলিল,—"কিন্তু বিয়ে কোত্থেকে দেব? বাবার পেন্‌সনের টাকা আর আমার ছাত্রপড়ানো! এতে কোন মতে খরচ কুলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিয়ে! আর তাছাড়া বিয়ে করতে জয়ন্তী রাজী নয়। তার অমতে—"

বাধা দিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলাম—"সে জন্য ভেব না। টাকা আমি দেব। ধার নিও, পরে উকীল হয়ে শোধ দিও। আর জয়ন্তীকে রাজী করাবার ভার আমার। কালই সঞ্জয়ের বাড়ী যাও।"

প্রতুল বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া জয়ন্তীর সাহিত্যিক বন্ধু ও স্তাবকের নিকট গিয়াছিল। সঞ্জয় মিত্র যথাযোগ্য সমাদরের পর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকা জয়ন্তী দত্তের ভ্রাতাকে জানাইলেন, যে উক্তা মহিলার সহিত বিবাহের কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। প্রভাত বাবু যাঁহার পাণিপ্রার্থী, স্বয়ং মণিবর্দ্ধন বাবু যাঁহার প্রেমপ্রার্থী, তাঁহাকে বিবাহ করিবার দুঃসাহস কোন নবীন নাট্যকারের থাকে না।

—"এ-সব কথা আমার ভাল লাগে না।"

—"আমি রক্তমাংসের মানুষ, পাথরের দেবতা নই। কেন আমাকে নিয়ে সময় কাটাতে চাও তুমি? আমাকে মুক্তি দাও, জয়ন্তী।"

—"আপনার কাছে কিছু চাই না, শুধু একটু আমাকে ভাল-বাসুন। কেউ আমাকে ভালবাসে না।"

খণ্ড-খণ্ড কথার অংশ আবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, আবার মনে হইল, আমার হৃদয় যেন বেদনায় রক্তমোচন করিতেছে! মণিবর্দ্ধনের এই সমস্ত কথা, জয়ন্তীর করুণ স্বর কোথাও যাইয়া ভুলিতে পারি না। নিষ্ঠুর ঘাতকের নৃশংসতায় এই সমস্ত রচনাবলী আমাকে অনুসরণ করিয়া ফেরে। যাহার সামান্য সুখের নিমিত্ত সমগ্র জীবন তাহার পদতলে আস্তৃত করিয়া দিতে পারি তাহাকেই এক জন অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে। পুরুষের প্রবল আকর্ষণের সহিত তাহাকে অহরহঃ সংগ্রাম করিতে হইতেছে। তাহাকে!—যাহার নয়নের ঈষৎ বিষাদ-মলিনও আমি চাহিয়া দেখিতে পারি না।

আমার তাগিদে প্রতুল অস্থির হইয়া উঠিল। পরিচিত সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বজাতীয় পাত্র অন্বেষণ প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। জয়ন্তী সাহিত্যিকা, সাহিত্যিক মণিবর্দ্ধন তাহার হৃদয় হরণ করিয়াছেন। অন্য কোন সুযোগ্য সাহিত্যিক আনিয়া ধরিলে কিশোরীর ভুলিতে হয়তো বেশীক্ষণ লাগিবে না।

দিনে দিনে জয়ন্তীর পরিবর্ত্তন দৃশ্যমান হইতে লাগিল। বাঙ্গালী মেয়ের সহজাত নম্রতা, তাহার নিজের চরিত্রগত ভীরুতা কিছু যেন আর তাহাকে বন্ধন দিতে সক্ষম হইতেছে না। প্রখর বেশভূষায়, অনর্থক বাক্যের জালে নিজের স্বকীয়তাকে আবৃত করিয়া চিত্রাঙ্গদার তপস্যা তাহার চলিয়াছে। আয়ত নয়নকে কজ্জলশোভায় বিম্বিত করিতে যাহার সঙ্কোচ হইত, আজ বৈদেশিক বর্ণপ্রলেপে দেহ রঞ্জিত করিয়া সে বিদেশিনী সাজিতেছে। ইংরেজির অধ্যাপক লম্পট-চূড়ামণি অম্বর বসু তাহাকে ইংরেজি-সাহিত্যে পাঠ দিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারি প্রবাসকালে অভ্যস্ত ইংরেজি গীতিসমূহ কাজে অকাজে জয়ন্তীর মধুর কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল, আজও স্বপ্ন-জাগরণে একটি সঙ্গীত শুনি—

"Ramona! —I bless you, I caress you!"

একটা সন্দেহ কিছু দিন হইতে হইতেছিল। অবশেষে স্পষ্টতঃ জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—"জয়ন্তী, বহু দিন মণিবর্দ্ধন বাবুকে দেখি না যে? কি ব্যাপার বল তো?"

—"আমি আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।"

এক মুহূর্ত্তে আমার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল। নিজের

মনে অর্থ করিয়া লইলাম, তবে জয়ন্তীর এ তপস্যা আত্মবিস্মৃতির জন্য নহে, কাহাকেও ভুলিবার জন্য।

—"জয়ন্তী, কি হয়েছে? এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?"

আমার মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া জয়ন্তী উত্তর দিল—"সঞ্জয় বাবুর ফ্ল্যাটে। ওঁর নতুন নাটকের প্রথম দৃশ্য শোনাবার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দাদা কলেজ থেকে ফিরবার আগেই চলে গিয়েছিলাম। অবশ্য নাটক আর শোনা হল না।"

—"জয়ন্তী, এসব কি বলছ তুমি?"

তেমনি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া জয়ন্তী বলিতে লাগিল,—"ঠিকই বলছি প্রভাত দা। যথার্থ সাহিত্যিক হবার পক্ষে শুনি সবচেয়ে বড় বাধা নৈতিক বন্ধন। সকলেই তাই বলে। সেইটাই আজ ঘুচিয়ে দিয়ে এলাম। অম্বর বাবু এসব ক্ষেত্রে নিজেকে উদ্দেশ্য করে কি বলেন শুনবেন?" 'Oh Lucifer; Son of the Morning! How fallen thou art'!"

—"জয়ন্তী, একবার বলো তুমি মিথ্যা বলে আমাকে পরীক্ষা করছ?"

জয়ন্তীর অধরপার্শ্বে কঠিন হাস্য দেখা দিল,—"আপনাকে পরীক্ষা করবার আমার কি প্রয়োজন, প্রভাত দা? আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মণিবর্দ্ধন বাবুর বিষয়ে। সে কথা আমি রেখেছি। এবারে মণিবর্দ্ধন বাবুকে পুনরাহ্বান করা যেতে পারে।"

—"জয়ন্তী, তুমি কি জান, এই সঞ্জয় তোমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেছে?"

ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে জয়ন্তী উত্তর দিল—"তাতে কি হয়েছে? ভাল না বাসলে কেউ কি বিয়ে করতে চায়? কেউই তো আমাকে ভালবাসেনি, শ্রদ্ধা করেনি—আপনিও নয়।"

নিমিষে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখনি মনে মনে তাহার মৃত্যু-কামনা করিলাম।

দুই মাস পরের ঘটনা। প্রতুলদের বাড়ীতে অপরাহ্ণের সময়ে আসিয়াছি। আসন্ন আইন-পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পরে যে কথা সর্ব্বদা আমার মনে জাগরূক সেই কথা তুলিলাম। জয়ন্তীর বিবাহের কথা।

বিষণ্ণ ভাবে প্রতুল বলিল,—"তোমার তাগিদে যথাসাধ্য চেষ্টা তো করছি। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! যারা ওর সঙ্গে একটু কথা বলবার জন্যে পাগল, তারাও বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। এই সাহিত্যিকেরা বিশেষ ভাল লোক নয়, প্রভাত। এদিকে পরস্ত্রীর কাছে উদার মতবাদের পরাকাষ্ঠা, অথচ বিয়ের সময়ে একটি অশিক্ষিতা অসূর্য্যম্পশ্যা! আধুনিক মেয়েরা না কি অত্যন্ত বিলাসী, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তাদের দ্বারা সম্ভব। তাই তাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা চলতে পারে, বিবাহ নয়।"

উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম,—"সাহিত্যিক রসাতলে যাক্। এমনি সাধারণ ঘরে চেষ্টা করো না। যত টাকা লাগে দেওয়া যাবে। এত বড় বোন গলায় করে বসে আছ কোন্ বিবেচনায়?"

বিস্মিত প্রতুল বলিয়া উঠিল,—"কি বলছ, প্রভাত? সাধারণ ঘরেও কি চেষ্টার ত্রুটি রাখছি? জয়ন্তী দেখতে ভাল, পাশ না করলেও রীতিমত শিক্ষিতা, কত বড় লেখিকা তার ওপরে। ওর কেন যে বিয়ে হচ্ছে না।"

জয়ন্তীর ভাগ্য-বিধাতার উপর নিষ্ফল ক্রোধ জীবনে প্রথম সেদিন জয়ন্তীর সম্বন্ধে কতকগুলি রূঢ় কথা আমারি মুখ দিয়া বহির্গত করাইল—"লেখিকা! লেখিকা হয়েই তো মাটি করেছে। সাহিত্যিকা শুনলে সকলেই ভয় পায়, সাহিত্যিকেরা পর্য্যন্ত। ও হাতী পুষবার ক্ষমতা অনেকেরি নেই কি না। কি ভুল করেছি আমি ওকে সাহিত্যিক হবার সুযোগ দিয়ে! তবে আমার ধারণা ছিল না যে, জয়ন্তী স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে। ছি, ছি, পশুর জীবন যাপন করার চেয়ে মরাও ভাল। আজ-কাল একটু এসব দিকে চোখ রেখ, প্রতুল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে জয়ন্তী একা যাচ্ছে, রোজ বাড়ীতে যে সে এসে সাহিত্য-সভা জমিয়ে তুলছে। এসব দেখলে কোন্ ভদ্র-সন্তান সে মেয়েকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে রাজী হতে পারে? ওই মণিবর্দ্ধনটা আবার এসে জুটেছে। ওর দ্বারাই সর্ব্বনাশ হবে। যে মেয়ের চরিত্রে এতটুকু দৃঢ়তা নেই তাকে কি এমনি করে ছেড়ে দিতে হয়?"

—"মণিবর্দ্ধন বাবুর সঙ্গে তো তুমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে, প্রভাত! জয়ন্তীকে একমাত্র উনিই বুঝতে পারেন। উনি সাধারণ নন।"

রুক্ষ স্বরে বলিলাম,—"স্বীকার করা যাচ্ছে যে মণিবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় এক জন বোদ্ধা ব্যক্তি। তবে জয়ন্তী যেমন হৃদয়াবেগ সংবরণ করতে পারে না, উনিও তেমনি শারীরিক চাঞ্চল্য নিবৃত্ত করতে পারেন না। উভয়েই সাহিত্যিক কি না। উনি অসাধারণ বলেই তো ভয়। তাই তো জয়ন্তীকে মণিবর্দ্ধন একেবারে বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। তুমি কি কিছুই বোঝ না, প্রতুল?"

চকিত ভাবে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া প্রতুল অন্যমনস্ক স্বরে বলিল,—"অনেক কিছুই বুঝি, প্রভাত! কিন্তু বুঝলেই বা আমার কি করবার আছে? তবে একটা কথা বলি, রাগ কোর না। অনেক দিন আগে কথাটা তোমাকে একবার বলেছিলাম। আমার মনে হয়, জয়ন্তীকে তুমি বিয়ে করলেই সমস্ত দিক থেকে ভাল হয়। তুমি তো ওর সব জান। বাইরে যা হোক, ভেতরে ওর এতটুকু পাপ স্পর্শ করেনি।

বাধা দিয়া উগ্র কণ্ঠে বলিলাম,—"অসম্ভব! 'জয়ন্তীকে আমার বিয়ে করা অসম্ভব! তাছাড়া, জয়ন্তী রাজী হবে না। জানি জয়ন্তীকে পাপ স্পর্শ করেনি।"

প্রতুল ধীরে ধীরে বলিল,—"তোমার যত বুদ্ধিই থাক প্রভাত মাঝে মাঝে ভুল হয়। জয়ন্তী আমার বোন, আমি তাকে জানি। তোমার সঙ্গে বিয়েতে সে রাজী হবে। অবশ্য তুমি যদি তাকে ভাল না বাস—"

এ আলোচনা আমার পক্ষে অসহ্য! অতি রূঢ় ভাবে বলিলাম—"জয়ন্তী রাজী হলেও আমি রাজী হব না। ভালবাসার একটা রূপই তোমরা দেখেছ চিরকাল। ভালবাসা! আচ্ছা, তবে জেনে নিশ্চিন্ত হও—জয়ন্তীকে আমি ভালবাসি না।"

পার্শ্বের কক্ষ হইতে জয়ন্তী আসিয়া দাঁড়াইল। সেই রুক্ষ কেশে অর্দ্ধাবৃত মুখে চিরাভ্যস্ত করুণ হাসিটি! ভীত দৃষ্টিতে প্রতুলের প্রতি চাহিলাম। তবে কি জয়ন্তী পাশের ঘর হইতে সব কথা শুনিয়াছে? অথবা এই মাত্র সে বাহিরে আসিল?

আমার সংশয়ের মীমাংসা করিয়া লঘু কণ্ঠে কথা কহিল জয়ন্তী,—

—ক্ষণিকা—

"চন্দ্রহাস"

অসাম্য

সাহারা করে হাহাকার
কোথাও জল নাহি তার !
কেঁদে ভাসায় প্যাসেফিক্—
কেবলি জল, হা রে ধিক্ !

পেয়াদা

শার্দ্দূল মারিয়া যারা মর্দ্দানির করে বাহাদুরী
তারাই মশার ভয়ে মশারির ভিতরে লুকায় ;
বিমান বোমারু পানে হেসে যারা বাজাইল তুড়ি,
বোল্‌তা-গুঞ্জন শুনি তাহাদের বদন শুকায়।
চার্চ্চিল-আমেরি-দলে অত ভয় করি না রে দাদা
আসলে করেছে কাবু অতিক্ষুদ্র পুলিস-পেয়াদা।

"পাশের ঘরে বসে জেলী তৈরি করতে করতে আপনাদের তর্ক শুনছিলাম। জেলী দিয়ে রুটি-চা না খেয়ে চলে যাবেন না, প্রভাত দা।"

জয়ন্তীর আত্মহত্যার কারণ তখনি বুঝিতে পারি নাই। উপন্যাস-বর্ণিতা নায়িকার মত সে কোন পত্র রাখিয়া যায় নাই। সে মরিল আমার সহিত কথাবার্ত্তায় উল্লেখিত কোন বিপদে পড়িয়া অথবা মণিবর্দ্ধনের সম্পর্কে আমাকে যে কথা দিয়াছিল তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, বুঝিলাম না। অথবা জীবনে তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছিল ? তখনি বুঝিতে পারি নাই।

প্রচার করা হইল, এশিয়াটিক্ কলেরায় সুবিখ্যাতা লেখিকা জয়ন্তী দত্তের তিরোভাব ঘটিয়াছে। শুভ্র পুষ্পে আচ্ছাদিত তাহার শবদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শেষবার প্রতুলের জীর্ণ বাটীতে সাহিত্যিক-সমাগম হইল। এক পাশে দাঁড়াইয়া আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, ইহার মধ্যে কাহার জন্য জয়ন্তী মরিয়াছে। বোঝাপড়া আমাকেই যে করিতে হইবে।

মণিবর্দ্ধন ! সহস্র শিকারীর দৃষ্টি চক্ষে লইয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে মণিবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় মৃতার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া নত হইয়া তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার নয়নে অপরিসীম করুণা। তাহার পরেই মুখ ফিরাইয়া তিনি স্থিরদৃষ্টিতে একবার আমার প্রতি চাহিলেন। ক্ষমাহীন নীরব ক্রোধের দৃষ্টি। স্বাভাবিক ঔদাস্যের সহিত মণিবর্দ্ধন গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নিমেষে সমস্ত বুঝিলাম। প্রতুলের অসংখ্য ইঙ্গিতে, জয়ন্তীর নিঃশব্দ অভিমানে যাহা এত দিন বুঝিতে পারি নাই, মণিবর্দ্ধনের ক্ষণিক দৃষ্টিক্ষেপে তাহা আর আমার অজানা রহিল না।

জয়ন্তীর জীবনে প্রথম অনাত্মীয় পুরুষ আসিয়াছিলাম আমি। জন্ম-লগ্নে অনপনেয় কলঙ্কলেখায় ললাটদেশ রঞ্জিত করিলেও বিধাতা অনন্যসাধারণ রূপ ও স্বাস্থ্যপ্রাচুর্য্যে আমার দেহ ভূষিত করিয়াছিলেন, প্রাণে অনন্ত ভালবাসা দিতেও কার্পণ্য করেন নাই। সেই প্রেম স্নেহের প্রলেপে আবৃত করিয়া জয়ন্তীর কোমল কবিচিত্তের নিকটে দুই হস্তে ধরিয়া আমি উপহার আনিয়াছিলাম। মাতৃস্নেহ-বঞ্চিতা কিশোরী ভালবাসিয়াছিল—আমাকেই।

আমার নিকটে সে আশ্রয় পায় নাই। আর আমার মনে কোন দ্বিধা নাই। আমি বুঝিয়াছি, কোন্ বেদনা তাকে অস্থির করিত। অন্তের বাহু-বন্ধনে সে কেন তৃপ্তি খুঁজিয়া মরিত। যে প্রেম আমি অন্তরের এক পার্শ্বে অযত্নে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই প্রেম নব ছন্দোজালে গাঁথিয়া মণিবর্দ্ধন তাহাকে শুনাইয়াছেন। তাঁহার নিকটে সে শুধু সান্ত্বনা চাহিয়াছে, ভালবাসিয়াছে আমাকে।

পিতৃ-পরিচয় দিবার অধিকার লাভ করি নাই। আমার কলঙ্কিত জীবনের সহিত তাহাকে যুক্ত করিব না ভাবিয়া দূরে সরিয়া থাকিয়া তাহার ধ্বংস আমি আনিয়া দিলাম। আমার অযাচিত স্নেহকে প্রতুল ও তাহার ভগিনী দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা বলিয়া ভুল করিয়াছিল। আমার মুখের কথায় আমি ভালবাসি না বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম।

ভুল একমাত্র আমি করিয়াছি। মানুষের তুচ্ছ সমাজজালে আচ্ছন্ন, নির্বুদ্ধি আমার দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মণিবর্দ্ধনকে সে ভালবাসে এ ভুল কেন করিয়াছিলাম ? কত দিন দেখিয়াছি, তাহার নয়নে আকুল আমন্ত্রণ। তবু আমি নীরব হইয়াছিলাম।

যে আমার অন্তরাত্মা, তাহাকে স্বহস্তে আমিই হত্যা

কুটির-শিল্প

"ভাস্কর"

১

বিবেকানন্দ রোডে 'বিচালি-ভবনে' ভজহরি সরখেল বাস করেন। মস্ত কণ্ট্রাক্টর। সমস্ত দিন মোটরে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সন্ধ্যার পর একটু আড্ডা, তার পরেই ঘুম।

বেলার হইয়াছে মুস্কিল। বাড়ীতে দু'টি মাত্র প্রাণী, তার এক জন থাকেন সর্বদা বাহিরে। ঝি, চাকর, পাচক আর দরওয়ানের উপর হুকুম করিয়া, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া, ছাদে-বারান্দায় দাঁড়াইয়া, নভেল পড়িয়া আর শুধু শুধু একতলা দোতলা করিয়া সময় তো আর কাটে না। এক মাসীবাড়ী ছাড়া অন্য কোথায়ও যাতায়াত নাই। এক দিন বেলা ভজহরিকে বলিল, দেখ, এমন নিষ্কর্মা জীবন তো ভাল লাগে না। সারা দিন কি করি বল তো?

ভজহরি বলিল, লেখাপড়া করবে? যদি বল তো জন দুই মাষ্টার রেখে দি। এক জন সকালে পড়াবে, আর এক জন বিকালে।

বেশ তো। তাই কর, আমি পড়া-শুনা করব।

মাষ্টার আসিল। পড়াশুনা চলিতে লাগিল। কিন্তু বেশি দিন বেলার ভাল লাগিল না। বাংলা সে ভালই জানিত। মাষ্টার মহাশয়দের নিকট হইতে ইংরাজিও বেশ শিখিল। কিন্তু পাঁচ সাতটা বিভিন্ন বিষয় পড়িয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া, এটা তার একেবারেই পছন্দ হইল না। সে পড়িতেছে স্বেচ্ছায়। যাহা ভাল লাগিবে, তাহা পড়িবে, যাহা ভাল লাগিবে না, তাহা পড়িবে না। কিন্তু যাহা ভাল লাগে না, তাহা ভাল করিয়া না পড়িলে বিশ্ববিদ্যালয় শুনিবে না। সুতরাং বেলার পড়াশুনার 'ইতি' হইল। মাষ্টারেরা চলিয়া গেলেন। বেলার বর্ধিত বিদ্যার ফলে ঘরে তিনটি নূতন আলমারী আসিল। ইংরাজি ও বাংলা ভাল ভাল বইতে আলমারীগুলি ভরিয়া গেল।

কিন্তু তবু বেলার সময় কাটে না।

ভজহরি গেল বন্ধু নরহরির মেসে। নরহরি সব শুনিয়া বলিল, এ তো ভাল কথা নয়।

এখন কি করি বল তো? ওকে বিয়ে করে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক তো প্রায় শেষ হয়েছে। একটা ছেলেপুলেও হ'ল না এখনো।

আচ্ছা, এক কায কর। একটা 'কুটির-শিল্প' আরম্ভ কর। লাগিয়ে দে তোর বৌকে। সময়ও কাটবে, দু'পয়সা ঘরেও আসবে।

কি শিল্প করবে? চরকা? তাঁত? আমসত্ব? আচার? ফ্রক, ব্লাউস? কি আরম্ভ করা যায়, বল তো?

ওসব করতে পার। কিন্তু ওর চেয়ে ভাল শিল্প হচ্ছে মাদুলী-শিল্প।

মাদুলী-শিল্প?

হ্যাঁ। যদি একবার ভাল করে পত্তন করতে পার, তা'হলে ভবিষ্যতের ভাবনা থাকবে না। তোমার কন্ট্র্যাক্ট কণ্ট্র্যাক্ট—যত বড়ই হোক, ওর উত্থান-পতন আছে। কিন্তু—

আচ্ছা, তাই করা যাক।

কিরূপে কাজ আরম্ভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া, চা খাইয়া, নরহরিকে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া ভজহরি বাড়ী ফিরিল এবং সব কথা বেলাকে খুলিয়া বলিল।

২

এক দিন সকালে খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হইল, তালতলার ভূপতি চাটার্জ্জির সঙ্গে ভবানীপুরের শ্রীপতি ব্যানার্জ্জির মোকদ্দমা হইতেছে। বাদী ভূপতি, প্রতিবাদী শ্রীপতি, দাবী আড়াই লক্ষ টাকা। সংবাদ পড়িয়া বেলা ভজহরিকে বলিল, এদের ঠিকানা দু'টে আনিয়ে দাও না।

ভজহরি কোর্টে গেল। যেখানে কোর্ট সেখানেই বটগাছ। একটি বটগাছের তলায় একটি পাকা মুহুরিকে ধরিয়া, সে কাহাকেও কিছু বলিবে না, এইটুকু প্রতিশ্রুতি লইয়া, তাহাকে বলিল, এই ভূপতি ও শ্রীপতির ঠিকানা দু'টো চাই।

মুহুরি বলিল, এ আর এমন কি কাজ। এখুনি এনে দিচ্ছি।

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি চেনেন না কি ওদের?

ওদের? আপনি হাসালেন। আমি প্রত্যহ চীন দেশ থেকে আরম্ভ করে পেরু পর্যন্ত যে কোন দেশের যে কোন লোককে আইডেণ্টিফাই করি, আর এই ভূপতি আর শ্রীপতিকে চিনবো না?

ভজহরি ঠিকানা দুইটি আনিয়া বেলাকে দিল।

পরদিন সকালে দুইটি মুমূর্ষু-অশ্ব-বাহিত একখানি থার্ডক্লাসের ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া থামিল তালতলার ভূপতি বাবুর দরজায়। ভূপতি বাবু উকিল। কয়েক জন পাকা উকিলের সহায়তায় নিজেই নিজের মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেছেন। অনেকগুলি লোক চারি পাশে বসিয়া আছে। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন একটি রূপসী বিবাহিতা নারী। ঢুকিয়া সকলের সামনে আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, ভূপতি বাবু বুঝি তোমার নাম?

উকিল বাবুর বৈঠকখানায় উকিল বাবুকে চিনিতে পারা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অপরিচিতা সুন্দরীর মুখে অকস্মাৎ নিজ নাম শুনিয়া ভূপতি বাবু খুবই বিস্মিত হইলেন। পার্শ্বচরেরাও কম বিস্মিত হইলেন না। সুন্দরী বলিলেন, বাবা, তুমি বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছ। থাকতে পারলুম না। এই নাও, এই মাদুলীটা পর। সব ঠিক হয়ে যাবে। সময় মত আমি আবার আসবো। বৃথা আমার খোঁজ করো না।

এই কথাগুলি বলিয়াই সুন্দরী বাহির হইয়া আসিয়া অস্থিসার ঘোটকবাহিত গাড়ীতে চড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন। বৈঠকখানার লোকেরা অবাক্ হইয়া গেল। এ কি হইল! স্বপ্ন না মায়া, না মতিভ্রম। ভূপতি বাবু মাদুলীটি মাথায় ঠেকাইয়া বাম বাহুতে পরিয়া ফেলিলেন। এক জন বলিলেন, এ দৈবশক্তির আবির্ভাব। এ মোকদ্দমায় তোমার আর হার নেই। অপর এক জন বলিলেন, কিছুই কিন্তু বোঝা গেল না। প্রথম বক্তা বলিলেন, কতটুকু আমরা বুঝি? দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ ত্থান আর ড্রেম্পট্ অফ ইন ইওর ফিলজফি। এ নিশ্চয়ই দৈব আবির্ভাব! ভূপতি বাবুর চেয়ারের পিছনে কাচের আলমারির মধ্যে মোরক্কো চামড়ায় মুখ ঢাকিয়া মিল এবং বেন্থাম পরস্পরের দিকে অপাঙ্গে চাহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুন্দরীকে দেখা গেল ভবানীপুরে শ্রীপতি বাবুর বাড়ীতে। সেখান হইতে ঘোড়া-গাড়ীতে রসা রোড পর্যন্ত গিয়া পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে মোটরে উঠিয়া ফিরিলেন বিবেকানন্দ রোডে। টপাটপ সিঁড়ি বাহিয়া বেলা উঠিল দোতলায়। ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, মাদুলী দিয়ে আসতে পেরেছ?

হ্যাঁ, দু'জনকেই দিয়েছি। এক জন তো মোকর্দ্দমায় জিতবেই।

৩

সে দিন দুপুরবেলা। মির্জাপুর ষ্ট্রীট এবং রাধানাথ মল্লিক লেনের কাছে মোটর রাখিয়া বেলা আসিয়া দাঁড়াইল গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, গামছার রাশির পাশে। সে দিন ইউনিভারসিটির একটা পরীক্ষা ছিল। ছেলেরা সব ডাব, কমলালেবু, আখ, শশা, চীনাবাদাম, ইত্যাদি খাইতেছে এবং কলরব করিতেছে। একটি ছেলের কাছে গিয়া আস্তে তাহার কাঁধে হাত দিয়া বেলা বলিল, তুমি বুঝি পরীক্ষে দিচ্ছ?

ছেলেটি একটু অবাক্ হইয়া দেখিল, মহিলাটি ঠিক তার সেজ মাসিমার মত। পরীক্ষার চাপে মনটা খুবই নরম হইয়াছিল, মহিলার কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেল! বলিল, হ্যাঁ। এবেলার পরীক্ষাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। ওবেলায় ভাল না হলে ফেল করব।

বালাই, ষাট! ফেল করতে যাবে কেন? কত কষ্ট করে বাছারা সারা বছর পড়াশুনা করেছ। এই নাও। এই মাদুলীটা পরে ফেল।

এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ছেলেটি বাঁ-হাতের সার্টের আস্তিন গুটাইয়া মাদুলীটি পরিয়াই তাড়াতাড়ি ঢাকিয়া দিল। দাম-জিজ্ঞাসু হইয়া মহিলাটির দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন, ছিঃ বাবা, ও কথা ভাবতে নেই। দাম কিসের? বরং তোমার ঠিকানাটা দাও। পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখব পাশ করেছ কি না। পাশ তো তুমি করেই আছ। হ্যাঁ, কিছু ভেবো না।

ছেলেটি তার নাম, স্কুল, রোল নম্বর, বাড়ীর ঠিকানা সব লিখিয়া মহিলাটির হাতে দিল।

[illegible] করিয়াই বেলা প্রায় পঞ্চাশটি মাদুলী বিতরণ করিয়া এবং পঞ্চাশটি ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

বৈকালে ভজহরিকে বলিল, একটু ঘুরে আসছি মাসী-বাড়ী থেকে।

মাসী-বাড়ী গিয়াই মাসীমাকে বলিল, দেখি হাতখানা, একটা মাদুলী পরিয়ে দি।

কেন? আমি মাদুলী পরব কেন?

দেখই না, তোমার সেই ফিক্-ব্যথাটা সারে কি না।

মাদুলীতে আবার অসুক সারে!

সারুক আর নাই সারুক, পরই না।

মাসীমা মাদুলী পরিলেন। মাসীমার দেওরের স্ত্রীর সন্তান হইতে অকারণ বিলম্ব হইতেছিল, মাসিমার ভাসুরঝির হিষ্টিরিয়া কিছুতেই সারিতেছিল না, মাসীমার ভাসুরপো পর পর তেইশখানা দরখাস্ত পাঠাইয়াও চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারে নাই এবং এইরূপ অন্যান্য অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব নানারূপ দৈহিক, ঐহিক ও মানসিক ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই একটি করিয়া মাদুলী পরিলেন। বিনামূল্যে সর্ব্বরোগহর ঔষধ পাইলে কে না ব্যবহার করে?

উপরোক্ত প্রকারে এবং অন্য নানাবিধ উপায়ে কিছু দিনের মধ্যেই প্রায় পাঁচ শত বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর বাহুতে, মণিবন্ধে, কটিদেশে ও গলদেশে বেলা দেবী-বিতরিত পরম-হিতকর দৈব কবচ শোভা পাইতে লাগিল।

৪

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ছেলেদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ভূপতি-শ্রীপতি মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। অন্যান্য যাঁহারা মাদুলী পরিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ফল পাইয়াছেন। সে ফল মাদুলীর জন্যই হউক, বা অন্য ঔষধের জন্যই হউক, বা আপনা-আপনি প্রকৃতির নির্দেশেই হউক, মোট কথা ফল কোন কোন ক্ষেত্রে ফলিয়াছে। যেমন, মাসীমার দেওরের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন, মাসীমার ভাসুরঝির হিষ্টিরিয়া সারে নাই, ভাসুরপো চাকরি পাইয়াছে, ইত্যাদি।

সংবাদপত্র মারফত শ্রীপতি বাবুর জয়লাভের সংবাদ পাইয়া বেলা আবার চলিল ভবানীপুরে। শ্রীপতি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার ভক্তিগদ্গদ প্রণতি ও সাড়ম্বর প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া এবং অতি বিনীত ভাবে কোনরূপ পারিতোষিক গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া স্বকীয় দেবীত্বের মর্যাদাসহ গৃহে ফিরিলেন।

ছেলেদের পরীক্ষার ফল যখন সংবাদপত্রে বাহির হইল, তখন নাম দেখিয়া এবং পূর্ব্ব-আহরিত ঠিকানা মিলাইয়া পাশ করা ছেলেদের বাড়ীতে গিয়া প্রচুর জলযোগসহ প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিতে বেলার বিলম্ব হইল না। যাহারা পাশ করিয়াছিল, তাহারা মনে করিল, মাদুলীর গুণেই তাহারা পাশ করিয়াছে। যাহারা ফেল করিল, তাহারা মনে করিল, অদৃষ্টের দোষেই ফেল করিল।

এমনি করিয়া নানা স্থান হইতে নানাবিধ নরনারীর নিকট নানাবিধ প্রশংসাপত্র সংগৃহীত হইল।

এক দিন প্রাতে প্রত্যেকখানি দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই কাগজ-দুষ্প্রাপ্যতার দিনেও এক পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন। পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে শ্রীযুক্তা বেলা-দেবী কবচ-বাচস্পতি—বিতরিত "পরমব্রহ্ম কবচের" মহিমা প্রচারিত হইয়াছে। পৃষ্ঠার চারি দিকে সমাজের প্রত্যেক স্তরের নরনারীর এক একখানি প্রশংসা-পত্র। কবচের মূল্য নাই। কিঞ্চিৎ দক্ষিণামাত্র আছে—সাধারণ, তাড়াতাড়ি ফলদায়ক এবং অতি তাড়াতাড়ি ফলদায়ক—এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পর হইতে বেলার আর আহার-নিদ্রার সময় রহিল না। কেবল অর্ডার আর অর্ডার। বাড়ীর নীচের তলাটা ভরিয়া গেল শুকনো গাঁদা ফুল আর শুকনো তুলসীর পাতায়। হাজারে হাজারে তামা, রূপা ও সোনার মাদুলী আসিতে লাগিল। কয়েক জন লোক রাখা হইল, তত্ত্বাবধানের জন্য। বেলার কুটির-শিল্প সার্থক হইল।

ভজহরি নরহরিকে গিয়া বলিল, তোমার কুটির-শিল্প তো বেশ জেঁকে উঠেছে। এক দিন গিয়ে দেখে এস।

দেখবো আর কি? বিজ্ঞাপনের বহর দেখেই বুঝতে পারছি।

আচ্ছা, লোকগুলো এই সব প্রশংসাপত্র দেখে ভোলে কি করে? একশ' জনের মধ্যে এক জন হয়ত উপকার পেয়েছে—অন্য কোন কারণে। বাকী নিরানব্বই জন যে কোন উপকারই পেল না, এ কথাটা লোকে ভেবে দেখে না।

এই ফ্যালাসি-অব-ম্যাল-অবজারভেশন বড় ভয়ানক ফ্যালাসি। যখন লজিকে এটা পড়েছিলাম তখন কল্পনাও করিনি যে এর এত বড় প্রতাপ।

সবাই তো আর লজিক-পড়া বিদ্বান্ নয়।

এ ব্যাপারে বিদ্বান্-মূর্খের প্রভেদ নেই। বরঞ্চ দেখবে, অনেক বড় বড় ডিগ্রীর আড়ালে বড় বড় মাদুলীর সমারোহ!

ভজহরি সন্ধ্যার পরে বেলাকে বলিল, তুমি কি সারাদিন তোমার মাদুলী নিয়েই থাকবে। আমার সঙ্গে একটু কথা বলবার সময়ও নেই তোমার?

যাক্, এবার তবু বুঝেছ, এত দিন আমার কেমন লাগত।

যাই বল, বাড়ীর উপর এত বড় ফ্যাক্টরি চলবে না। ভাবছি, একটা লিমিটেড কোম্পানির হাতে এটা দিয়ে দি। ফ্যাক্টরির নাম দেব, 'দি বেলা দেবী অ্যামুলেট ফ্যাক্টরি লিমিটেড।'

—হাজার বছর পরে—

গোপাল ভৌমিক

হাজার বছর পরে যদি দেখা হয়—
সে-দিন কি চিনবে আমাকে?
এইখানে এ পথের বাঁকে—
তুমি আমি অন্য কেউ নয়:
তবু কি পারবে চিনে নিতে—
নিঃসঙ্কোচে পারবে কি হাতে হাত দিতে—
দূরে ফেলে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয়—
মিথ্যার বেসাতি আর সত্যের বিপুল অপচয়?
হাজার বছর পরে এ পথের ধারে
তুমি আমি মুখোমুখী:
নিঃশঙ্কে তাকাই বারে বারে—
পরিচিত তবু যেন কেমন নতুন—
কে জানে কোথায় বুঝি ধরেছে কি ঘুণ!

এই আলো হাসি গান—
সুস্থ দেহে শক্তি আর খুসীর তুফান—
এ কি আমাদের সেই প্রাচীন স্বদেশ—
হাজার বছর আগে দেহে যার মৃত্যুর আবেশ
বার বার করেছে সজাগ:
কারাগার মহামারী মৃত্যু আর কলঙ্কের দাগ
মুছে গিয়ে কখন সহসা—
স্বাস্থ্য আর যৌবনের পেয়েছে ভরসা!
সে কালের ঘূর্ণাবর্তে তুমি আমি
এসেছি কোথায়:
হাজার বৎসর আগে ফেলে-
ফেরা মনের ছায়ায়
আবার কি ফিরে যাওয়া যায়?

হাজার বছর পরে তুমি আমি পথের মিছিলে:
শান্তির মধুর বাণী আকাশের নীলে
রক্তে এনে দিল এক নতুন পৃথিবী:
সে এক নতুন গান—
পুরাতন গিয়েছে হারায়ে—
তুমি আমি রয়েছি দাঁড়ায়ে
ঠিক দুটি মূর্তির মতন।
হাজার বছর পরে—
মরে গিয়ে বেঁচেছে এ মন।

নিউইয়র্ক সহর

ইসবেল রস

নিউইয়র্ক সহরের ভাগ্য কতকটা গ'ড়ে উঠেছে ভৌগোলিক প্রভাবে—আর এর সৌন্দর্য্য গ'ড়ে তুলেছে এর অধিবাসীরা। এই দ্বীপ-ভূমির সব চেয়ে বেশী বিস্তার আড়াই মাইল। তারই উপর স্তবকে স্তবকে বড় বড় বাড়ী উঠেছে, এর পাহাড়ে ভিত্তিভূমির মধ্যে গ্রানাইট পাথরের অংশগুলিতে মাইকা ও কিছু দামী পাথর নিহিত আছে।

স্থলভাগে বিরাট্ আলোক-মন্দিরের মত এই সহরের মাঝখানে পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা (১২৫০ ফিট) এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং একেবারে আকাশচুম্বী হ'য়ে খাড়া হ'য়ে আছে। এই দ্বীপটির মধ্যে ছোট ছোট বসতবাটীও রয়েছে। আবার তাদের পিছন দিকে লাগোয়া একটু একটু বাগানও আছে। নিউইয়র্ক সহরের প্রসার্য্য শক্তি ও যৌবনোচিত উদ্দামতা যেন আপাত-বিরোধী ব'লেই মনে হয়। এত বড় সহর আশ্চর্য্যজনক ভাবে নীরব। এর যান-বাহনে কলকব্জার সুশৃঙ্খল ঝঙ্কার আছে, ভেঁপুর শব্দও দমিত, নদীতে হুইসিলের আওয়াজই এই সহরের একমাত্র দীর্ঘকালস্থায়ী শব্দ। জনসংখ্যা খুব বেশী হ'লেও নির্ব্বাচনের সময় প্রচার-যানের আওয়াজ ছাড়া রাস্তায় হাঁক-ডাকের কিছুই নেই।
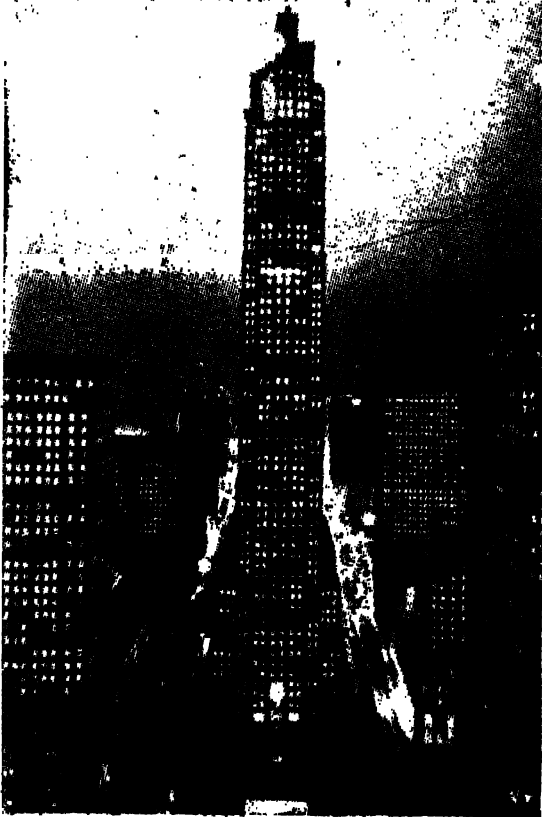
৩২০ বর্গ-মাইল নিউইয়র্কের স্থলভূমি আর জলভাগ ৫৭৮ মাইল। এই সহরে ২২০০ দশ তলা উঁচু বাড়ী, ১৫০০০ রেস্তোরাঁ ও ৫০০ হোটেল আছে। ৫০টি জাতির সমন্বয়ে আমেরিকান জীবনধারার সঙ্গে মিশে আছে এর ৭০ লক্ষ অধিবাসী, এঁরাই এই সহরের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস গঠন করেছেন।

এর সামুদ্রিক খামখেয়ালী আবহাওয়া দারুণ ঝঞ্ঝার সৃষ্টিও করে, আবার গ্রীষ্মের স্থির সৌন্দর্য্যও বিস্তার করে। কখনও শীতের তুষারপাতে গাছপালা বরফাচ্ছন্ন হ'য়ে সহরের পুকুরগুলিতে ছেলে-মেয়েদের স্কেটিং খেলা চলে। সহরের পার্কগুলিতে ডগউড ফুল বসন্তে ফুটে ওঠে। গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ বলেই কষ্টকর। এক এক সময় উত্তাপ এত বেশী হয় যে, জর্জ্জ ওয়াশিংটন দোলা-সেতুর মাঝখান ধনুকের মত বেঁকে যায়। তখন রেস্তোরাঁ সিনেমার শীতল কক্ষে, ছাদের বাগানে বা বৈদ্যুতিক পাখার তলায় অথবা অদূরে সুন্দর সমুদ্রতীরে লোকে আরাম পায়।

চতুষ্কোণ অট্টালিকাশ্রেণীগুলিকে গাছপালা ও ফুল থেকে অসম্ভব দূরে মনে হলেও নিউইয়র্ক সহরে বাড়ীর চেয়ে গাছ আছে বেশী। ১৩টি পার্ক ত আছেই, ছাদের বাগান-গুলিও বসন্তে ও গ্রীষ্মে পুষ্পিত হ'য়ে ওঠে। আর ব্রুকলিনে চন্দ্রমল্লিকার মত ফুল ফুটে থাকে। ম্যাপেল ও সাধারণ গাছ খুব বেশীই আছে, তবে "ব্যাক্ ইয়ার্ড গাছ" ব'লে প্রসিদ্ধ চীনা আইলানথাস গাছ এখানকার আবহাওয়ায় ধমকের বিরুদ্ধে যুঝতে বেশী পারে। সম্মুখ ভাগে বাগান খুব কমই নিউইয়র্কে আছে কিন্তু লতানে গোলাপ, দ্রাক্ষালতার বেড়া, পাহাড়ে বাগান, টিউলিপ ফুলের তলভূমি, ঝরণা আর ইটালীয় প্রতিমূর্ত্তি ছোট ছোট ইঁটের বাড়ীর পিছন দিকে বা বাড়ীর প্রাঙ্গণে দেখতে পাওয়া যেতে পারে। সহরের সীমার মধ্যেই আইভিলতার নীচের মরুগুলি আছে। পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্দ্ধের বিরাট্ সহরে নূতন ও পুরাতনের মোহন সংযোগ ঘটেছে আর এর বাসিন্দারা শুধু সারি সারি গৃহস্তবকে কাল কাটাতেই অভ্যস্ত নয়।

প্রসিদ্ধ আমেরিকান পরিবারগুলির আকাশচুম্বী সৌধমালায় ঘেরা সেন্ট্রাল পার্ক হ্রদ ও খেলার মাঠে ভর্ত্তি। সব রকমের গাছ এখানে আছে। বসন্তে এখানে লরেল, ম্যাগনোলিয়া ও ডগ্উড ফুল ফুটে ওঠে। সারা বছর এই পার্কে চড়াই ও অন্যান্য জাতির পাখী বাসা বাঁধে। মেট্রোপলিটন মিউজিয়ম বা সেন্ট পাট্রিক গীর্জ্জার কার্ণিশে যে সব কবুতরের বাসা তারাও এর খোলা জায়গায় উড়ে বেড়ায়। এই পার্কে নাগরিকেরা ঘোড়ায় চড়ে, সাইকেল চালায়, রোলার স্কেট বা বরফের স্কেট খেলে; অথবা পল্লীনৃত্যে যোগ দেয়। রোজমেরী ও ভায়োলেট ফুলের এক সেক্সপীয়ার

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং—পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা

যুগের অনুরূপ বাগানও এখানে আছে। ছোট একটি পশুশালা, বহু মূর্ত্তি ও একটি জলাধারও এখানে দেখবার জিনিষ। সহরের একটু বেশী আগে ব্রাঙ্কসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে উট থেকে দুর্লভ প্যাণ্ডা জাতীয় প্রাণী মিলিয়ে ৩০০০ জাতীয় প্রাণীর এক পশুশালা আছে।

ব্রুকলিনের প্রসপেক্ট পার্ক নিউইয়র্কের তিনটি বৃহৎ পার্কের একটি; কিন্তু এ ছাড়াও আরও পার্ক আছে। ম্যানহাটান দ্বীপে সবুজের এক ত্রিকোণ মাঠের ২০০ বছরেও কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। নিউ-ইয়র্কে এই মাঠ যেন পুরাতনের সঙ্গে সংযোগবিশেষ—আর এই মাঠটি ওয়াল ষ্ট্রীটের একেবারেই কাছে। এই ওয়াল ষ্ট্রীটেই সহরের উচ্চতম সৌধের এক-তৃতীয়াংশ ম্যানহাটান দ্বীপে নদী থেকে নদীতে পর্ব্বতশৃঙ্গের মালার মত সৃষ্টি করেছে। সহরের উপর দিকের আকাশচুম্বী সৌধশ্রেণী আকাশে স্বর্ণোজ্জ্বল মধুক্রমের মত আলো দেয়, আর ওয়াল ষ্ট্রীটের এই অঞ্চল ঠিক তার বিপরীত, এ অঞ্চল রাত্রে থাকে অন্ধকার। সহরের নিম্ন দিকের গিরিমুখগুলির অভ্যন্তর ভাগে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত ফ্রসেস ট্যাভারন্ যেন তন্দ্রা যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকান বিপ্লবের শেষে এইখানে জর্জ্জ ওয়াশিংটন তাঁর অনুকারী কর্ম্মীদের বিদায় দিয়েছিলেন। আরও উত্তরে ব্রডওয়েতে ট্রিনিটি চার্চ্চের প্রাচীন সমাধিপীঠগুলি যে যায়গাটিতে আছে, সেটি ইংলণ্ডের রাণী অ্যানের কাছ থেকে অনুশাসনে পাওয়া গিয়েছিল।

নিউইয়র্কে কয়েক ধরণের বিশৃঙ্খলতাও আছে। সহরের আরও কিছু উপর দিকে গ্রীণউইচ গ্রামে মিনেষ্টা লেনের তলা দিয়ে একটি নালা বহে গেছে। লেখক, শিল্পী ও গায়কদের প্রিয় স্থান এই গ্রীণ-উইচ গ্রাম। এখানে পথগুলি কাটাকাটি হ'য়ে আছে, গাড়ীর বাতি ছোট ছোট সুসংস্কৃত আস্তাবলের সামনে জ্বলতে থাকে, বাড়ীগুলির সম্মুখ ভাগে অলিন্দ ও পশ্চাৎ ভাগে বাগান আছে। প্রতিবাসীদের মধ্যে পরস্পরে পরিচয় আছে, একই রুটীওয়ালা, একই রজক বা একই জুতাবুরুশদার বংশপরম্পরায় কাজ করছে। এই অঞ্চল থেকেই আমেরিকার অধিক প্রসিদ্ধ নাট্যকার, কবি ও শিল্পীর অভ্যুদয় হয়েছে। ইউজেনি ও'নিল, ভিনসেণ্ট মিলে, থিয়োডোর ড্রেসিয়ার, সিংক্লেয়ার লিউইস ও সমসাময়িক বিখ্যাত লোকেদের এই গ্রামে সম্পর্ক আছে। ওয়াশিংটন স্কোয়ারে প্রাচীন ইয়োরোপের গন্ধ আছে, কিন্তু একটি বিরাট্ আকাশচুম্বী অট্টালিকা যেন ওয়াশিংটন আর্চ্চকে খর্ব্ব করে দিয়েছে। প্রাচীর বা বেড়ায় ঝুলিয়ে চিত্রকরেরা আর একটু দূরে পথে ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

হাডসন নদীর পশ্চিম দিকে ওয়াশিংটন বাজারে প্রত্যুষের পূর্ব্বেই চাষীরা তাদের গাড়ীতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে আসে। নানা রঙ্গে ও পাতায় সমৃদ্ধ ফল ও সব্জী খুচরা বিক্রেতা ও সকালের ক্রেতাদের জন্য স্তূপাকারে জমা করে রাখা হয়। নিউইয়র্কে রাত্রির জন্যবহুতা এর বৈশিষ্ট্য। রাত্রির কর্ম্মীরা বা যারা হঠাৎ বাইরে থেকে যান, তাঁরা সহরের জলভাগের দিকে ঘোরাফেরা করে। যুদ্ধশিল্পের কর্ম্মীরা দিনে ও রাত্রিতেও যাতায়াত করে, আর সহরের পুলিস নীরবে পাহারা দেয়। দুগ্ধবাহী গাড়ীগুলি ঘোড়ায় টানে, যদিও ঘোড়ার গাড়ীর বদলে আজ-কাল বেশীর ভাগ মোটর গাড়ীর ব্যবহার হচ্ছে। দু'চাকার বগী গাড়ী ও বড় বড় ভিক্টোরিয়া গাড়ী এই দু'রকমের গাড়ীই নিউইয়র্কের পথে ও পার্কে দেখা যায়। যুদ্ধের আগের সময়ের চেয়ে গাড়ী অনেক কম হ'লেও পীত, সবুজ ও বাফ, রঙের ট্যাক্সি সহরে ঘুরে বেড়ায়।

নিউইয়র্কের জলভাগের দিকে ১৮০০ জাহাজের আশ্রয়-তোরণ, জেটি ও কাঠের প্রাচীর আছে। হাডসন নদী তীরে আতলান্তিক

সেণ্ট জন ক্যাথিড্রাল

পারাপারে ঘাঁটিস্বরূপ আশ্রয়-তোরণের সান্নিধ্যে সেক্সরবিধির অন্তরালে জাহাজ যাওয়া-আসা করে। সহরের শিল্পগুলিকে যেমন যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়েছে তেমনি জাহাজের আশ্রয়-তোরণগুলিতে, জেটিতে ও ডকে দিনরাত্রি কাজ চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে লোক পাঠাবার জন্য আর তারই জন্য জাহাজ মেরামত ও তৈরী করার প্রয়োজনে। দুঃসাহসিক অভিযানের যাত্রী নিয়ে উড়ো-জাহাজগুলি লাল, সবুজ ও পীতবর্ণের মণির মত আলো জ্বালিয়ে রাত্রে সহরের উপর দিয়ে উড়ে যায়।

নিউইয়র্ক সহরের বাজারে পণ্যদ্রব্যের চেয়ে মজুরীর বিনিময় বেশী ঘটে। ৩০ লক্ষ শ্রমিক সহরের দোকান, অফিস ও কারখানা-গুলিতে প্রত্যহ কাজ করে। পোষাক, খাদ্য, বই, পত্রিকা, ধাতুজ দ্রব্য, কাচ ও কাঠের জিনিষ, কাপড় ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত

জর্জ্জ ওয়াসিংটন দোলা-সেতু

করতে বেশী লোক কাজ করে। আমেরিকার পোষাকের অধিকাংশ তৈরী হয় নিউইয়র্ক সহরে। এখানকার ৭০০০ পোষাকের কারখানায় দুই লক্ষ লোক কাজ করে। ছাপা ও পুস্তক-প্রকাশের কাজ এর পরের স্থান অধিকার ক'রে আছে।

নিত্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপার সহরে অনেক আছে। সম্মিলিত জাতির সৈনিকদের জন্য টাইম্‌ স্কোয়ারে জুতাবুরুশদায় থেকে সাধারণের টেলিফোনও রয়েছে। সহরের প্রস্তর-স্তম্ভ ও ইস্পাতের পাঁজরের মধ্যে মানুষের প্রাণের স্পন্দন অসংখ্য পাওয়া যায়। সহরের সম্পত্তির অর্দ্ধেকের মালিক এই সহরবাসীরা। বাউলিং গ্রীন, গ্রীনউইচ গ্রাম, গ্রেমার্সে পার্ক, মারে হিল ও গ্রেসি হিলে সহরের গোড়া-পত্তনের ইতিহাসের ছোঁয়াচ থাকলেও সমসাময়িক ইতিহাস আন্দোলিত হচ্ছে সহরের বুকে ফিতের মত ফিফ্‌থ এভিনিউ পথটিতে। প্রত্যুষের প্রার্থনা ও সান্ধ্য-স্তোত্রে এই পথে যোগ দিতে পারা যায়। এখানে মিউজিয়ম, চিত্রশালা ও পুস্তকালয় আছে। এর বিপণিগুলিতে পৃথিবীর বাজারের সেরা জিনিষগুলিই পাওয়া যায়। রূপার ও কাচের বাসন, জড়োয়া অলঙ্কার ত' আছেই, তাছাড়া পৃথিবী-বিখ্যাত প্রসাধন-ব্যবসায়ী এলিজাবেথ আর্ডেন, হেলেনা রুবিনষ্টাইন ও ডরোথি গ্রের এই প্রধান কেন্দ্র ; গাউন, জুতা, রূপার জিনিষ, ফিতা ও লিনেন কাপড়ের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাজার এই সহরে।

শরতের গোধূলিতে ফিফ্‌থ এভিনিউ জগতের সুন্দরতম রাস্তার মত দেখায়। দিনের যে কোন সময়ই এর জাঁকজমক আছে। এই রাস্তার উত্তর দিকে নব্য ক্লসিক যুগের মেট্রোপলিটান মিউজিয়মে সর্ব্বকালের চিত্রশিল্প রক্ষিত আছে। দক্ষিণে সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রস্তর-সিংহের প্রহরিবেষ্টিত দ্বার দিয়ে প্রত্যহ ১১০০০ পাঠক যাওয়া-আসা করে।

এরই মধ্যভাগে একটি সুশৃঙ্খল সহরের মত বিরাট্‌ রকফেলার সেণ্টারের চারি পাশে পাহাড়ের মত সৌধশ্রেণী খাড়া হয়ে রয়েছে। মধ্যভাগে শীতের সময় অধিবাসীরা বরফে স্কেট খেলে ও গ্রীষ্মের সময় রৌদ্রনিবারক আতপত্রের তলায় বিশ্রাম করে। এই সেণ্টারের ৭০ তলা পর্য্যবেক্ষণ মন্দিরের ওপর থেকে নিউইয়র্কের স্বচ্ছন্দ-বিহারীরা সহরটির অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পায়। এর একটি ছাদের বাগানে ছোট একটি নদী এঁকে-বেঁকে বহে যায়। এই সেণ্টারে থিয়েটার, অফিস, রেস্তোরাঁ ও দোকান ছাড়া দেশের শ্রেষ্ঠ বেতার প্রতি-ষ্ঠানের দুইটি ষ্টুডিও আছে। এর প্রাচীর, দ্বারপথ ও মেঝেগুলিতে সমসাময়িক চিত্রের বাহার। সমস্ত সেণ্টারটিতে নূতনত্ব ও বিস্ময়কর ব্যাপারে যেন ভ্রমণকারীদের ভূস্বর্গের প্রতিরূপ আছে। জোন সার্ট ও এজরা ষ্টোনের প্রাচীর-চিত্র এর স্থাপত্য-শিল্পে নাটুকে ছোঁয়াচ দিয়েছে। এর সঙ্গীতশালায় ৬২০০ জনের বসবার আসন আছে, আর ৩০০ টন ইস্পাতের বন্ধনীর উপর এর ৬০ ফিট উচ্চ স্বর্ণনির্ম্মিত মঞ্চের সম্মুখ ভাগ খাড়া আছে। এই সেণ্টারেই আছে নিউ-ইয়র্কের বিজ্ঞান ও শিল্পের মিউজিয়ম ; হাজার হাজার মডেল ও রঙদার ছবি, কার্য্যকলাপের প্রদর্শনী, ২৫০০ স্থায়ী প্রদর্শনী ও নিত্য-নূতন প্রদর্শনী এই মিউজিয়মের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। দর্শকরা এখানে সবচেয়ে নূতন লৌহশিল্পের বা বিমান-শিল্পের ব্যাপারও যেমন দেখতে পায় তেমনি পুরাতন যুগের আবৃত শকট, স্লেজ গাড়ী ও ২০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের সময়কার মিশরীয় গোশকটও দেখতে পেতে পারে। 'T' মডেলের ফোর্ড গাড়ীও এখানে দেখা যেতে পারে।

ম্যানহাটান দ্বীপের দক্ষিণাংশে নৌকায় যাত্রীদের সহরের সবচেয়ে বড় পোতাশ্রয় ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয় ; উত্তরাংশে বেস্‌বল খেলার একটি ষ্টেডিয়াম আছে। এরই মাঝে সারা পৃথিবীর দর্শনীয় বিষয় নিয়ে প্রাকৃতিক ইতিহাসের মিউজিয়ম রয়েছে। মিউজিয়মের কাছাকাছি হেডেন প্ল্যানেটেরিয়ামের ঘূর্ণ্যমান ছাদে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে ও গ্রহবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক সহর যেন সারা দুনিয়ার একটি ছোট সংস্করণ। রোমে অধিবাসী ইটালীয়নদের চেয়ে বেশী ইটালীয়ন এই সহরে বাস করে, ডাবলিন সহরের চেয়ে বেশী আইরিশও এখানে থাকে। মালবেরী ষ্ট্রীটে নিয়াপলিটানদের স্যান জেনারোর ভোজ-উৎসব পালিত হয়। জানুয়ারী মাসে এপিফ্যানী উৎসবে গ্রীকগণ সমুদ্রকে আশীর্ব্বাদ দিবার জন্ত ক্রশ ভাসিয়ে দেয়।

নিউইয়র্কে সব রকম মতবাদের গীর্জ্জাই আছে। ম্যানহাটানের গোঁড়া রুশ গীর্জ্জাও আছে, আবার সিরিয়দেশের নানা রকমের গীর্জ্জাও আছে। ব্রুকলিনে মুসলমানদের এক মসজিদও আছে। এখানকার লিট্‌ল চার্চ্চ বেশীর ভাগ থিয়েটারের লোকের বিবাহ দিয়ে প্রসিদ্ধ। এই চার্চ্চের ছাদওয়ালা দরজা, বড় এল্‌ম গাছ ও স্তম্ভবেষ্টনীর গবাক্ষগুলি মিলিয়ে সহরের এটি একটি সৌন্দর্য্যক্ষেত্রবিশেষ। বিরাট্ সেণ্ট জন ক্যাথিড্রালে এখন নির্ম্মাণশেষ না হলেও প্রতি রবিবার প্রার্থনাকারীদের ভিড় লেগে যায়। রোমান ক্যাথলিকদের সেণ্ট প্যাট্রিক্‌স ক্যাথিড্রালেও ভিড় জমে।

নিউইয়র্ক সহর জাতির ভাব-বিনিময়ের কেন্দ্রবিশেষ। আমেরিকার সৃষ্টিকরী শক্তি যেন এই সহরেই কেন্দ্রীভূত হয়। পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ ছাড়া আমেরিকার বামপন্থী থেকে প্রতিক্রিয়াশীল সকল রকম মতবাদের প্রতিরূপ নিয়ে নয়টি প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য সংবাদপত্র এখানে প্রকাশ হয়। বৃহত্তম চারিটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই সহরেই অবস্থিত। এইখান থেকেই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বেতার-গুণীদের স্বর ও বিভিন্ন ভাষায় নানা রকমের বেতার সংলাপ বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে সারা জগতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহর জগতের সঙ্গীত-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। মেট্রোপলিটান অপেরা, কার্ণেগী হল ও নিউইয়র্ক ফিলহার্মোনিক সম্প্রদায় জগতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ও ঐক্যতানের উৎকর্ষ সাধারণের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেয়। আর্টুরো টস্কানিনির নেতৃত্বে ন্তাশান্তাল ব্রডকাষ্টিং সিম্‌ফনি অর্কেষ্ট্রা বিশিষ্টতা অর্জ্জন করেছে। সঙ্গীত ও নাটকের নিউইয়র্ক সিটি সেণ্টার প্রতিষ্ঠান সস্তায় নাগরিকদের কাছে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক অনায়াসলভ্য করে দিয়েছে। গ্রীষ্মকালে লিউইসন ষ্টেডিয়মের অনাবৃত সোপানশ্রেণীর উপর বসে সঙ্গীতামোদিগণ গান শুনতে ভালবাসেন।

ব্রড্‌ওয়েতে আমেরিকার সঙ্গীত-জীবনে নিউইয়র্কের সঙ্গে সংযোগ আছে। অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে ব্রড্‌ওয়েতে নূতন নাটকের অভিনয় হয়। হলিউডের স্বষ্ট [illegible] প্রথম ব্রড্‌ওয়েতেই মুক্তিলাভ করে। ব্রড্‌ওয়ের থিয়েটার, আলোকমালা, দর্শকদের গ্যালারি ও আর কলের রসের উৎসগুলির মধ্যে যে কোন কিছুই ঘটার সম্ভাবনা আছে। একটি [illegible] জোন, বিয়েট্রিস লিলি, এডউইন্ ও [illegible] চলাফেরা ক'রতে দেখতে পাওয়া যেতে পারে। বিরাট্ ব্রড্‌ওয়ের অনুভূতি-প্রবণতাও বিখ্যাত। এর অধিবাসীদের সারল্য, দয়া, গুণ ও স্বেচ্ছাতন্ত্রতাও লক্ষ্য করবার মত। ক্রমশঃ জীর্ণ ও পুরাতন হ'তে থাকলেও এর ঔজ্জ্বল্য বেশ উঁচুদরের হ'য়ে যোগ্য সময়ে প্রকাশ হয়। এখানকার নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে সম্মিলিত জাতির সৈনিকদের যুদ্ধের পোষাকগুলিতে।

আমেরিকার ক্রীড়াগৃহগুলির প্রধান কেন্দ্র ব্রডওয়ের ম্যাডিসন্ স্কোয়ার উদ্যান। এখানে কম পয়সায় অশ্ব-প্রদর্শনী, মুষ্টিযুদ্ধ, বরফের হকি খেলা, স্কি-প্রতিযোগিতা, সাইকেল-রেস ও সার্কাস দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের জন্তও এখানে লোকে সমবেত হয়। বাড়ীর বাইরে যাঁরা খেয়ে আরাম পান, তাঁদের জন্ত এক জন আগেকার হেভিওয়েট বক্সিং-চ্যাম্পিয়ন একটি বিরাট রেস্তোরাঁ চালান এই ব্রড্‌ওয়েতে।

নিউইয়র্কের রাজপথ

রেশনিংএর পূর্ব্বে নানা দেশের রকমারী খাবার এখানে লোকে খেতে পেত, আর খাওয়া-দাওয়া মেঘের কাছাকাছি ব'সেও চ'লতে পারে বা পথিপার্শ্বের কাফেগুলিতেও সারা যেতে পারে।

সারা দুনিয়ার গুণ ও রুচির প্রতিবিম্ব নিউইয়র্কে প্রতিফলিত হয়; নাৎসী-তাড়িত নির্ব্বাসিত গুণিগণ সহরটিতে সঙ্গীত, শিল্প ও শিক্ষা-সম্পদ্ বৃদ্ধি ক'রছেন। যুদ্ধের মধ্যেও জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত মানুষ কি ক'রছে তার সম্বন্ধেও বক্তৃতা, আলোচনা ও শিল্প-প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে জানানো হয়। আধুনিক শিল্পের মিউজিয়মে সামরিক শিল্পেরও কদর যথেষ্ট আছে।

সহরের কলম্বিয়া, নিউইয়র্ক, ফর্ডহাম ও সিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে আধুনিকতম শিক্ষাব্যবস্থা আছে। ৮৪১টি অবৈতনিক দিবা ও সান্ধ্য বিদ্যালয় নিউইয়র্কে আছে। বেসরকারী বিদ্যালয়ও আছে আর শিক্ষায় যারা পিছিয়ে প'ড়েছে বা অন্ত কোন অসুবিধা [illegible] এই সব ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অজস্র অর্থব্যয় করা

স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার

যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের পর্য্যালোচনা করা বিশেষ দরকার। প্রয়োজন দু'টি কারণে। প্রথমতঃ, আমরা এগিয়ে থাকলে কত দূর এগিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ, যদি এগিয়ে না থাকি তাহলে অনগ্রসরতার কারণ কি। অবশ্য এই আলোচনা যিনি বা যাঁরা করবেন তাঁদেরও কতকগুলি গুণ থাকা দরকার। যেমন নিরপেক্ষতা; ঐতিহাসিকতাবোধ; আর চাই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ—এই রকম আরও দু'-একটি গুণ। আমার এ গুণগুলি আছে, সে কথা বলছি না। আমার মনে কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে, কতকগুলি সংশয় আমার মনকে দোলা দিয়েছে। কখনও তার উত্তর পেয়েছি, কখনও পাইনি। সেই জন্যই আজ এই ধৃষ্টতা। যদি আমার সংশয় দূর হয়।

জাতীয় জীবনে আমরা কি চেয়েছি? আমরা চেয়েছি স্বাধীনতা—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আমাদের দামাল ছেলেরা ছুটকো গুলীগোলা ছুড়ে, বোমা ফাটিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে গিয়ে উঠেছে; আমাদের নেতারা মঞ্চে আর সংবাদপত্রের স্তম্ভে কথার আগুন ছুটিয়েছেন। এই সম্মোহন মন্ত্রের আহ্বানে অশিক্ষিত জনসাধারণ দিনের পর দিন কষ্ট সহ্য করেছে। ছেলে-বুড়ো নানান্ হুজুগে মেতেছে। আমরা ভেবেছি যে, স্বাধীনতা এলেই আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচে যাবে। অনেকে আবার তাও ভাবেনি বা ভাবতে পারেনি। তারা জানে, কাজ করে যেতে হয়, তাই তারা কাজ করে গেছে।

কিন্তু আজও কি ভাববার সময় আসেনি? স্বাধীনতা এলেই কি আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচে যাবে? যদিই বা ধরে নি যে হাঁ ঘুচবে, তাহলেও তো প্রশ্ন করতে পারি কি-কি দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচবে? তাহলেও তো জিজ্ঞাসা করবো, আমাদের আজকের সব দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কি পরাধীনতা? বৃটিশ-শাসনে থাকার কুফল? বৃটিশের শাসনের আগেও তো মুসলমান শাসন ছিল? ইংলণ্ড আমাদের শাসক ও শোষক—ইংলণ্ড তো স্বাধীন; তবুও সেখানে বস্তি আছে কি করে; সেখানেও বেকারত্ব ঘোচেনি কেন, সেখানেও কেন মানুষকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শ্রম ও মন তো দিতেই হয়, এমন কি দেহও বিক্রয় করতে হয়? কেন? আমাদের অনাহারের সুযোগ নিয়ে আমাদেরই স্বদেশী ব্যবসায়ীরা আর শিল্পপতি আমাদের অন্ন-বস্ত্র নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলেছেন তাও তো ভোলবার নয়? এর জবাব কে দেবে?

স্বাধীনতা আসবে কি করে? আমরা শুনে আসছি যে, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত দাবী। ঠিকই তো। কিন্তু ভিক্ষা করে কি দাবী পাওয়া যায়? আজ যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা বক্তৃতা দিয়ে, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি ছাপিয়ে স্বাধীনতা আনবার চেষ্টা করছেন এবং এই বক্তৃতা, বিবৃতি, কাকুতি-মিনতি সবই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছেই পেশ করা হচ্ছে! অথচ এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আমাদের স্বাধীনতা কাড়তে হবে। আমাদের কাছে ভিক্ষা আর দাবী, কাড়াকাড়ি আর আহরণ একই হয়ে যাচ্ছে।

তার পর আমাদের স্বাধীনতার রূপ কি হবে, সে সম্বন্ধেও আমাদের কোনও ধারণা নেই। এ সম্বন্ধে যে ধারণা থাকা উচিত সেটাও আমরা ভাবি না। আমরা স্বাধীনতা চাই সমস্ত দেশের জন্য, জন-কয়েক নেতা ও ধনীর জন্য নয়। আমরা স্বাধীনতা চাই ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার জন্য, নিজেদের শাসনেও সেই অনন্ত দুর্দ্দশা ভোগ করবার জন্য নয়। আমার রক্ত দিয়ে যে স্বাধীনতা আসবে সেটা ভোগ করবে অন্য লোক এবং মুষ্টিমেয় কয়েক জন লোক, এ আমি কি করে সহ্য করবো?

আমরা একে বলি সংগ্রাম, কিন্তু আসলে রেখেছি আমাদের অন্যতম সখ হিসেবে। চরকা কাটলে স্বাধীনতা আসবে অর্থাৎ আমরা গরুর গাড়ীর যুগে ফিরে যেতে চাই। আরও একটা কথা—চরকা কেটে লাভ হচ্ছে কার? অস্পৃশ্যতা দূর করলে স্বাধীনতা আসবে—কাগজে-কলমে লিখে দিলেই কি অস্পৃশ্যতা দূর হয়ে যাবে? আমরা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবো না, দায়ী করবো সরকারকে। কিংবা বলবো যে, জাতীয় সরকার হলেই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বেশ, তাহলে বলা হচ্ছে না কেন যে, জাতীয় সরকার এলেই আমরা অস্পৃশ্যতা দূর করে ফেলবো। কারণ, এই অস্পৃশ্যতা বজায় রাখার জন্য দায়ী হচ্ছে বর্ত্তমান বিদেশী সরকার।

আমার বক্তব্য অতি সামান্য। অর্থাৎ আমরা পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেরা চুপ করে যেতে যাই। ফাঁকি দিয়ে কোনও বড় কাজ হয় না, এটা মনে রাখলেই আমরা এই রকম ভাবে নিজেদের দোষ স্কালন করবার চেষ্টা হয়তো করবো না।

আরও একটি। রাজনীতি রাজনীতিই। তাতে sentiment চলে না। অথচ আমাদের রাজনীতিতে sentiment ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের যদি স্বাধীনতা-সংগ্রাম করতেই হয় তাহলে তৈরী হয়েই করতে হবে। এলোপাথাড়ি রাজনীতি যুগ চলে গিয়েছে; অথচ আমরা মুখে মুখে বড় বড় কথা বলি বটে, আসলে পুরোনো যুগেই পড়ে আছি। যদি পুরোনো যুগেই পড়ে থাকতে হয়, তাহলে সেই যুগের ভাল জিনিষগুলো খুঁজে বের করলেই হল। তাতেও লাভ আছে।

[পূর্ব্ব-পৃষ্ঠার পর]

হয়। বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন শিশুদের তাড়াতাড়ি শিক্ষার জন্য আরও কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার সকল রকম উন্নত ধারার বিকাশ নিউইয়র্কে দেখতে পাওয়া যায়।

বয়স্কদের শিক্ষায় অধিবাসীদের বেশ আগ্রহ আছে। চার থেকে পাঁচ লক্ষ লোক নানা বিষয়ে নানা প্রকার প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষালাভ করে।

জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উন্নত হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের [illegible] বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। সারা সহরেই হাসপাতাল আছে। বেলভিউ হাসপাতাল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত আরোগ্য-নিকেতন ব'লে খ্যাত। ৮০০ পরিদর্শক-ধাত্রী বিনা মূল্যে সহরের রোগীদের সেবা করে।

স্বেচ্ছাতন্ত্রতা ও চরম মতবাদ মিলিয়ে নিউইয়র্ক সহরে আজও দেহ, বুদ্ধি ও মনের সকল রকম বিকাশের সুযোগ আছে। সহরটি বহু খ্যাত, প্রাণময়, অভিজ্ঞিপ্রাবণ অথচ সরল আর এখানে মানুষের [illegible] আছে।

সিঁদুর

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ভোরবেলা। তপোবনের নৈঋত-কোণে একটি নিম্ববৃক্ষের তলায় একটি বেদীর—অর্থাৎ মাটির ঢিপির—উপর বসিয়া মহর্ষি খালিত দাঁতন করিতেছিলেন। এ হেন সময়ে জনৈকা তরুণী আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভু, আমি আপনার তপোবনে আশ্রয়-প্রার্থিনী।"

খালিত দাঁতন করিতে করিতেই অম্লান বদনে কহিলেন, "বেশ তো।" কহিয়া অম্লান বদনেই দাঁতন করিতে থাকিলেন; আর কিছু কহিবেন বা করিবেন বলিয়া মনে হইল না।

অবশেষে চিন্তিতা হইয়া তরুণী কহিল, "প্রভু, আশ্রয় পাইব কি?"

"নিশ্চয়ই পাইবে" বলিয়া মহর্ষি আবার অম্লান বদনে দাঁতন করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া তরুণী ঈষৎ ব্যতিব্যস্তা হইয়া কহিল, "প্রভু, দীনার ধৃষ্টতা হইলে মার্জনা করিবেন, কিন্তু আমার মনে হইতেছে আপনি আমাকে সম্যক্‌রূপে খেয়াল করিতেছেন না। বোধ হইতেছে, আপনি কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, আমি আসিয়া আপনার চিন্তার বিঘ্নস্বরূপ হইতেছি মাত্র। অন্য সময় হইলে, এবং আপনি মহর্ষি খালিত না হইয়া অন্য কেহ হইলে আমি সম্ভবতঃ ক্রোধ পূর্ব্বক চলিয়া যাইতাম। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার আশ্রয় আমার একান্তই প্রয়োজন বলিয়াই আমি—"

এইবার মহর্ষির যেন সহসা স্বপ্নভঙ্গ হইল। এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে কথা কহিতেছিলেন। এইবার হাতের দাঁতন হাতেই রাখিয়া তরুণীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "বৎসে, কি কহিলে আবার কহ। ছি ছি! এতক্ষণ তুমি দণ্ডায়মানা হইয়া আছ অথচ আমি খেয়ালই করি নাই। এই বেদীতেই উপবেশন কর এবং তোমার বক্তব্য বল। দেখ, এই বেদীটি অতি পবিত্র। প্রতি প্রাতে ইহারই উপর উপবেশন করিয়া আমি এই নিমগাছেরই অংশ-বিশেষের সাহায্যে দাঁতন করিয়া থাকি। বৎসে, দাঁতন করা অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া জানিবে। চিত্তশুদ্ধির অন্যতম সোপান দন্তশুদ্ধি। দন্ত অপরিষ্কৃত থাকিলে তদ্দারা চর্ব্বিত ভক্ষ্যদ্রব্যও অপরিষ্কৃত হইবে; অপবিত্র আহার দেহের বিকার ঘটাইয়া ক্রমে মনেরও বিকার ঘটাইবে। বাহিরের সহিত ভিতরের এবং দেহের সহিত মনের যে কি নিকট-সম্বন্ধ, তাহা তোমাকে একদা অবসর মত বুঝাইয়া বলিব। বর্ত্তমানে তোমার বক্তব্য বল, আমি শ্রবণ করি।"

তরুণী ইতিমধ্যে মহর্ষির অনতিদূরে বেদীতে উপবেশন করিয়াছিল। সে বলিল, "প্রভু, আমার নাম বেপথুমতী। আমার অন্য পরিচয় বর্ত্তমানে আমি দিতে ইচ্ছা করি না, যথাসময়ে পাইবেন।"

মহর্ষি খালিত মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "বৎসে বেপথু, তোমার শুধু অন্য পরিচয় কেন, নাড়ী-নক্ষত্র পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিলে আমার অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমি এই মুহূর্ত্তে জানিতে পারি। কিন্তু সে ক্ষমতা আমি এ পর্য্যন্ত কখনো ব্যবহার করি নাই, এক্ষণেও করিব না। কেন না আমার মনে হয়, লোক হইয়া অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করা আমার পক্ষে শোভন হইবে না। তোমার পরিচয় গোপন রাখিতে চাও রাখ, সে সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নাই। অপরিচিতা-রূপেই তোমাকে আমি আমার তপোবনে আশ্রয় দিব।"

শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বেপথুমতী কহিল, "প্রভু, আমি কোনও কারণে গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। কিছু দিন আপনার আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস করতে চাই।"

শুনিয়া মহর্ষি খালিতের দুইটি চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বৎসে, আজ প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ হইল আমার সহধর্ম্মিণী একমাত্র কন্যা চিকীর্ষাকে আমার কাছে রাখিয়া ওপারে রওনা হইয়া গিয়াছেন। ভাগ্যে আমার দূর-সম্পর্কীয়া জনৈকা পিতৃস্বসা ছিলেন, সেই বৃদ্ধাই আমার শিশু কন্যাটিকে লালন করিয়াছিলেন। চিকীর্ষা আমাকে এবং আমার বৃদ্ধা পিতৃস্বসাকে কাঁদাইয়া কিছু দিন হইল স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে। তুমি যত দিন ইচ্ছা আমার স্বামিগৃহগতা কন্যার শূন্যস্থান পূর্ণ কর। বৃদ্ধাও তোমাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইবেন। তিনি একটু বহুভাষিণী, তাঁহার বহু ভাষণ সহ্য করিয়া নিও। আরেকটি অনুরোধ, আমার তপোবনের ঐ দিকের যে অংশটি দেখিতেছ, ওই অংশে আমার অধ্যাপনা বিভাগ। সেখানে আমার তপোবনবাসী চারি জন ছাত্রকে আমি শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া থাকি। তাহাদের এখন চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম চলিতেছে। তোমাকে দেখিলে তাহারা পরবর্ত্তী আশ্রমটির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে। তাহা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, কেন না, ছাত্র বর্ত্তমানে যেরূপ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে একটি ছাত্রও হাতছাড়া হইলে তাহার শূন্যস্থান পূর্ণ সহজে হয় না। অতএব বৎসে বেপথুমতি, তুমি আমার তপোবনের এই দিকের এই মহিলা বিভাগেই নিজেকে গোপন রাখিও। আমার ছাত্রবৃন্দের দৃষ্টিপথে ভুলক্রমেও আসিয়া তাহাদের চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ ঘটাইও না।"

সুন্দরী বেপথুমতীর অধরে রহস্যময়ী মৃদু হাসি ক্রীড়া করিয়া গেল। সে কহিল, "প্রভু, আমি সে চেষ্টাই করিব।" শুনিয়া বিধাতা পুরুষও সম্ভবতঃ অলক্ষ্যে মৃদু হাস্য করিলেন। মহর্ষি খালিত মনে করিলেন, তিনি সমস্তই বুঝিলেন; তিনি বাস্তবিক বুঝিলেন কি না বিধাতাই বুঝিলেন।

বেপথুমতী মহর্ষি খালিতের পিতৃস্বসা গান্ধারী দেবীর হেফাজতে আশ্রয় পাইল। চিকীর্ষা স্বামীর গৃহে চলিয়া যাইবার পর হইতেই গান্ধারী দেবী বিষণ্ণা হইয়াছিলেন। এইবার বেপথুমতীকে পাইয়া তিনি পরম আনন্দিতা হইয়া উঠিলেন। খালিতের ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ জানিতেও পারিল না যে, তাহারা যে তপোবনে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছে তাহারি নৈঋত-কোণে অতুলনীয় লাবণ্যময়ী তরুণী-বেপথুমতী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এক দিন মহর্ষি খালিত স্থির করিলেন, ছাত্রবৃন্দ সহ নদীর ওপারে বৈকালে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া ফিরিবার সময় কিছু উত্তম ফলমূল লইয়া আসিবেন; তিন জন ছাত্র তাঁহার সঙ্গে চলিল। চতুর্থ ছাত্র ক্ষপণকের শরীর খারাপ লাগায় সে তপোবনেই রহিয়া গেল।

তখনো গোধূলি লগ্ন আসিতে বিলম্ব আছে, যদিও আকাশে নির্জলা স্বচ্ছ শ্বেত মেঘখণ্ড ছড়াইয়া থাকায় সূর্য্যতেজ ম্লান। গান্ধারী দেবী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তপোবনের যে-দিক্‌টাতে ব্রহ্মচর্য্য-বিভাগ, সে-দিক্‌টা দেখিবার গভীর আগ্রহ ছিল বেপথুমতীর মনে। এখন তাঁহার মনে হইল, এ হেন সুযোগ হয়তো আর কখনো পাওয়া যাইবে না। ছাত্রগণ সকলেই গুরুর সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, অধ্যাপনা বিভাগ জনহীন—এই তো সুযোগ। এদিকে ক্ষপণক বেচারী যে সহসা শরীর খারাপ হইয়া—ধন্য শরীর খারাপ!—তপোবনেই রহিয়া গিয়াছে তাহা বেপথুমতী জানে না। অন্ততঃ জানিবার কথা নহে, কারণ মহর্ষি খালিত গান্ধারী দেবীকে ডাকিয়া বেপথুমতীর সম্মুখেই কহিয়াছিলেন তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিতে পারে, কেন না ছাত্রবৃন্দসমভিব্যাহারে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেছেন।

তপোবনের ঐদিক এবং এই দিকের মাঝখানে একটা উঁচু বেড়া; বেড়ার মাঝখানে একটা ঝাপ দরজা, তাহাতে খিল লাগাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই ঝাপ-দরজা ঠেলিয়া বেপথুমতী ওদিকে গেল। গিয়া দেখিল, সে যেন এক আলাদা জগৎ। বাগানে ফুলগাছ আছে, কিন্তু ফুল নাই, পাতাগুলি সমস্ত শুষ্ক অথবা শুষ্কপ্রায়। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় গাছগুলিতে কদাচিৎ জল দেওয়া হয়।

একটি কুটীরের বারান্দায় অর্দ্ধচক্রাকারে সজ্জিত পাঁচটি কুশাসন, প্রত্যেকটি কুশাসনের সম্মুখে একটি কাঠের তৈয়ারী গ্রন্থাধার, তাহার উপর শাস্ত্রগ্রন্থাদি এলোমেলো ভাবে সাজানো। মাঝামাঝি জায়গায় একটি কাষ্ঠাসন পাতা রহিয়াছে; বোঝা গেল, আচার্য্য খালিত অধ্যাপনার সময় উহারই উপর উপবিষ্ট থাকেন।

শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রতি বেপথুমতীর তীব্র কৌতূহল হইল। ইহা কি জিনিষ, ইহাদের ভিতর কি লেখা থাকে, তাহা তাহার জানা ছিল না। সে কাষ্ঠাসনের মুখামুখী অবস্থিত কুশাসনটির উপর শিষ্যের ভঙ্গীতে উপবিষ্টা হইয়া সম্মুখস্থ গ্রন্থাধার হইতে একটি গ্রন্থ তুলিয়া লইল। নারী সম্বন্ধে পুরুষকে কত রকমে সাবধান হইতে হইবে, তাহারই বিস্তৃত বর্ণনায় গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। দেখিয়া বেপথুমতীর বড় আমোদ অনুভব হইল। সে মনোযোগের সহিত "ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা"র পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিল।

প্রথমে দেখিল, ব্রহ্মচর্য্য-সাধকের পক্ষে ভোজন-সংযম অত্যাবশ্যক, এবং এই সংযমের পক্ষে নিম্বপত্র ভক্ষণ অতীব সহায়ক। অদূরবর্ত্তী নিম্ববৃক্ষটি প্রায় পত্রহীন কেন, তাহা এইবার বেপথুমতীর নিকটে আর রহস্য রহিল না। তার পর দেখিল, ব্রহ্মচারী যথাসম্ভব স্বল্প আহার করিবে; মিষ্ট, ঝাল, টক, লবণ ইত্যাদি যত কম খাইবে ব্রহ্মচর্য্য তত বেশী জোরালো হইবে। মাথার চুলে তৈল প্রদান এবং দর্পণে মুখ-দর্শন করা চলিবে না; কারণ, তাহাতে অহমিকা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

তার পর দেখিল, নারীই ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে চরম বিপদ্-স্বরূপা, ইহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে; দর্শন, শ্রবণ, রসনা, চিন্তা প্রভৃতিকে নারীজাতির দিকে পিছন ফিরাইয়া রাখিতে হইবে। নারীর দিকে তাকানোই নিষেধ; নেহাৎ তাকাইতেই হইলে তাকাইতে হইবে পায়ের দিকে। পড়িতে পড়িতে শেষকালে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বেপথুমতী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ক্ষপণক কুটীরের ভিতরে ইষ্টকের উপাধানে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। সহসা মধুর নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত হাস্যধ্বনি শুনিয়া পরম বিস্ময়ে এবং পরম আনন্দে বাহির হইয়া আসিয়া কিছুক্ষণ নিজের দেহে চিমটি কাটিয়া দেখিল, ব্যথা লাগে কি না। দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করিয়া চমকিতা বেপথুমতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আপনি···"

বিমুগ্ধ ক্ষপণক কহিল, "আমি ক্ষপণক। মহর্ষি খালিতের অন্যতম ছাত্র। আপনি···"

বেপথুমতী কহিল, "আমি বেপথুমতী। আজ সপ্তাহ দুই হইল মহর্ষি খালিতের তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। কি আশ্চর্য্য! আপনি মহর্ষির সহিত ভ্রমণে গমন করেন নাই দেখিতেছি।"

ক্ষপণক মনে মনে কহিল, "ভাগ্য-দেবতাকে ধন্যবাদ।" মুখে কহিল, "হঠাৎ ঈষৎ জ্বরবোধ হওয়ায় রহিয়া গিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি এত দিন এ তপোবনে আছেন অথচ একটি দিনের তরেও জানিতে পারি নাই!"

মৃদু হাসিয়া বেপথুমতী কহিল "জানিবার তো কথা নয়। ও কি! আপনি আমার মুখের দিকে তাকাইতেছেন যে! নেহাৎ যদি তাকাইতেই হয় তো পায়ের দিকে তাকান। অশাস্ত্রীয় কাজ করিতেছেন কেন?"

নিম্বপত্র-ভোজী ব্রহ্মচারী ক্ষপণক সহসা মধু-জিহ্ব হইয়া উঠিল। কহিল, "ভগবান্ আপনাকে যে ঐশ্বর্য্য উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে না তাকাইয়া, হে দেবি, আমি তাহার অমর্য্যাদা করিতে পারিলাম না।"

পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি হয় তো ছিল—যাহার মুখে এই জাতীয় কথা শুনিলে বেপথুমতী পুলকে উচ্ছ্বসিতা হইয়া উঠিত। তেমন ব্যক্তি ক্ষপণক হয় তো হইতেও পারিত, কিন্তু কয়েক বৎসরব্যাপী শাস্ত্রীয় সাধনা এবং বহু নিম্বপত্রভক্ষণের ফলে এখন ক্ষপণক তেমন ব্যক্তি নহে। সুতরাং উচ্ছ্বসিতা না হইয়াই বেপথুমতী সহজ ভাবে কহিল, "অনর্থক এরূপ প্রশংসা করিবেন না। আপনার মুখে শোভা পায় না।"

কথাটার অর্থ ক্ষপণক কি বুঝিল সেই জানে। কবিত্ব করিয়া কহিল, "অতি যথার্থ কহিয়াছেন। যাহাকে প্রশংসা করিবার ভাষা নাই, ভাষার সাহায্যে তাহাকে প্রশংসা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। দেবি, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।"

ক্ষপণকের কথার প্রতি মনোযোগ না দিয়া বেপথুমতী কহিল, "ছি ছি! কি ভুলই করিলাম। আপনাদের এদিকে আসা মহর্ষি খালিতের এক-রকম নিষেধই ছিল।"

"কিন্তু বিধাতার নিষেধ ছিল না।" ক্ষপণক কহিল।

বেপথুমতী কহিল, "এইবার আমি যাই। গান্ধারী পিসী কখন্ জাগিয়া উঠিবেন কিছু ঠিক নাই। আপনারা কেহ নাই জানিয়াই এদিকে আসিয়াছিলাম। আপনি আছেন জানিলে আসিতাম না।"

ক্ষপণকের তখন মাথার ঠিক ছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এই নারী ছলনা করিয়া মিথ্যা কহিতেছে　ক একটা কথা যদি

বলি করিয়াও ক্ষপণক না বলিয়া থামিয়া গেল। মন বলিল, রে মূর্খ, সে কথা এখনো নহে।"

বেপথুমতী কহিল, "আমি যে আসিয়াছিলাম, সে কথা কেহ যেন না জানে।"

ক্ষপণক কহিল, "কেহ জানিবে না।"

বেপথুমতী বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, ক্ষপণক মুগ্ধনেত্রে বিদায় দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কি যেন একটা স্থির করিল।

রাত্রি আরম্ভ হইবার কিছু পরেই বাকী শিষ্যসহ মহর্ষি খালিত তপোবনে ফিরিলেন। মহর্ষি গেলেন নিজ ভবনে, শিষ্যগণ গেল তাহাদের নিজ বিভাগে। কুটীরে প্রবেশ করিতে করিতে তাহারা শুনিতে পাইল, ক্ষপণক গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। শুনিয়া অবাক্ হইল। তাহারা জীবনে কখনো ক্ষপণককে গান গাহিতে শোনে নাই; ভাবিল, জ্বরে হয় তো বা তাহার চিত্তবিকার ঘটিয়াছে।

ক্ষপণকের চিত্তবিকার ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু জ্বরে নহে। তাহার মনে হইতেছিল, এত দিন মহর্ষি খালিত যে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন তাহা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সত্য নাই। পরক্ষণেই আবার তাহার মনে হইতেছিল, "ছি ছি! এ কি পাপ চিন্তা করিতেছি?" দোটানায় পড়িয়া তাহার মন হয়রাণ হইয়া উঠিল।

ভরদ্বাজ, কপিল ও উদ্দালক ক্ষপণকের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া কহিল, "তোমার দেহ কি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইতেছে ক্ষপণক?"

ক্ষপণক কহিল, "না। আমি আজ এক নূতন চিন্তাধারার আঘাতে জর্জ্জর বোধ করিতেছি। আমার মনে হইতেছে, আমরা এই আশ্রমে এত দিন যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা ভুল।"

শুনিয়া তিন জন শ্রোতাই এক-সঙ্গে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, "মহর্ষি খালিত আমাদিগকে ভুল শিক্ষা দিয়াছেন? তুমি কি পাগল হইয়াছ ক্ষপণক?"

"পাগল হই নাই। অথবা এক হিসাবে হইয়াছিও বলিতে পার। আজ আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে। দেখ, ফুলের শোভা যদি উপভোগ না করিব তাহা হইলে ভগবান্ ফুলের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? দেহে ও মস্তকে যদি তৈল না দিব তাহা হইলে নারিকেল, তিল ও সরিষাকে ভগবান্ নিস্তৈল করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? পৃথিবীতে এত বিচিত্র রকমের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় থাকিতে নিম্বপত্র ভক্ষণ করিয়া মরিব কেন?"

ভরদ্বাজ, কপিল ও উদ্দালক ক্ষপণকের উত্তেজনা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মহর্ষি খালিতের শিষ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষপণকই ছিল শ্রেষ্ঠ। সে যেরূপ কঠোর ভাবে সংযম সাধনা করিত তাহাকে হঠযোগ সাধন বলিলেই চলিত। হঠাৎ সে এরূপ উল্টা গাহিতেছে কেন? নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছে।

ভরদ্বাজ কহিল, "শোন ক্ষপণক! গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত তোমার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই তোমার কানে শুনাইতেছি। পৃথিবীতে নানা রকম ভোগের উপকরণ ছড়াইয়া রাখিয়া ভগবান্ মানুষকে পরীক্ষা করিতেছেন মাত্র। ভোগের প্রলোভনে নিজেকে এলাইয়া দেওয়া অতি সহজ; সে ব্যাপারে মানুষ পশুর সমতুল্য। কিন্তু সকল প্রকার ভোগের প্রলোভন জয় করিয়া যে আত্ম-সংযম, ব্রহ্মচর্য্যের যাহা আদর্শ, তাহাতেই মানুষ দেবতাদের সমতুল্য হইয়া উঠে।"

শুনিয়া ক্ষপণক কহিল, "অর্থাৎ তুমি বলিতে চাও দেবতাদের আদর্শ অনুকরণ বা অনুসরণই মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয়?"

ভরদ্বাজ মাথা নাড়িল।

ক্ষপণক হাস্য করিয়া কহিল, "তবেই দেখ, এত দিন আমরা ভুল পথে চলিয়া আসিয়াছি। দেবতাদের সংযমের কোন বালাই নাই। স্বর্গের নন্দন কাননে রূপসী অপ্সরাদের নৃত্য তাঁহাদের নিকট কখনো পুরাতন হয় না, তাই মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচী ইহাদের মধ্যে কেহ না কেহ নৃত্য করিতেছেই। এমন কি, বেচারী বেহুলা যখন স্বামী লক্ষীন্দরের প্রাণ ফিরিয়া পাইবার জন্য স্বর্গে গিয়াছিল দেবতারা তাহাকে পর্য্যন্ত নাচাইয়া ছাড়িয়াছিলেন, দুঃখিনী বলিয়া রেহাই দেন নাই। তাছাড়াও দেবতাদের আরো যে কত রকমের লীলা-খেলা—"

কপিল দেখিল গতিক বড় ভাল নয়। এই বেলা থামাইয়া দেওয়া দরকার। কহিল "দেখ, দেবতাদের লইয়া অনর্থক টানাটানি করার দরকার কি? আমাদের আদর্শ মহর্ষি খালিত।"

ক্ষপণক কহিল, "আমিও তো ঠিক তাহাই বলি। তাঁহার আদর্শ আমরা পালন করিলাম কোথায়? তিনি যে আমাদের মত নিম্বপত্র ভক্ষণ তো দূরের কথা, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের প্রতি আমাদের শতাংশের একাংশ অনাদরও দেখান নাই, তাঁহার নধর বপুটিই তাহার প্রমাণ দিতেছে। তাঁহার দুহিতা চিকীর্ষাকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ; তাহার জননী অপরূপা সুন্দরী ছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ আমাদের বেলায় মহর্ষি খালিত বলিতেছেন—"

উদ্দালক কহিল, "দোহাই তোমার, ক্ষান্ত হও ক্ষপণক। তুমি আজ প্রকৃতিস্থ নহ। বর্ত্তমানে এ আলোচনা বন্ধ থাকুক।"

আলোচনা আর অগ্রসর হইল না বটে, কিন্তু সকলেরই মনে কেমন একটা দোলা লাগিয়া রহিল।

সে-দিন গভীর রাত্রে ঘুমন্ত ক্ষপণকের উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া তাহার তিনটি সতীর্থেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই ঘুমের ভাণ করিয়া সমস্তই শুনিল। উদ্দালক ভাবিল, ভরদ্বাজ ও কপিল ঘুমাইতেছে, ভরদ্বাজ ভাবিল কপিল ও উদ্দালক ঘুমাইতেছে, কপিল ভাবিল, উদ্দালক ও ভরদ্বাজ ঘুমাইতেছে এবং প্রত্যেকেই ক্ষপণকের ঘুমের ঘোরে বক্তৃতা শুনিয়া জানিতে পারিল, অতুলনীয়া সুন্দরী বেপথুমতী মহর্ষি খালিতের তপোবনেই গান্ধারী পিসীর আশ্রয়ে বাস করিতেছে এবং ক্ষপণকের চিত্ত তাহারই রাতুল চরণ-পদ্মে লুটাইতেছে। ফলে তাহাদের তিন জনের চিত্তেরও ঐ অবস্থাই হইল, এবং তাহারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বেপথুমতীর দর্শন-কামনায় আকুল হইয়া রহিল।

"ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়" প্রবাদটি সব সময় সত্য না হইলেও ইহাদের বেলায় সত্য হইল। ইহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একে অন্যকে না জানাইয়া অতি গোপনে বেপথুমতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং ভাবিতে লাগিল বেপথুমতী বিহনে এ জগতে বাঁচিয়া কোন লাভ নাই, অতএব বাঁচা যাহাতে লাভজনক হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেকেরই মন বেপথুমতীতে ভরিয়া উঠিল, উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে তাহারা বেপথুমতীর কথাই ভাবিতে লাগিল। ও-দিকে বেপথুমতী কিন্তু এ সকলের কিছুই জানে না, অথবা জানিয়াও না জানিবার ভাণ করে।

পাঠক-পাঠিকা সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে মহর্ষি খালিতের ছাত্র-চতুষ্টয়ের

অবস্থা মনে মনে মক্স করিয়া নিতে পারিয়াছেন। ক্ষপণকের ধারণা, বেপথুমতীর তপোবনে উপস্থিতির কথা এবং বেপথুমতীর প্রতি ক্ষপণকের মনোভাবের কথা তাহার তিন সতীর্থের মধ্যে কেহই জানে না। বাকী তিন জনের প্রত্যেকের ধারণাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় "ক্ষপণক বেপথুমতীর প্রেমে উন্মাদ। হায়, সে জানে না, আমিও যে তাহারই মত প্রেমের দহনে দহিতেছি। বাকী দুই বন্ধুই ভাল আছে, তাহারা বেপথুমতীর কথা জানে না। আহা, আমিও যদি বেপথুমতীকে না জানিতাম না দেখিতাম! না না, সে দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তাও করা যায় না। এই দহনেও যে আনন্দ আছে।"

ক্ষপণক এক দিন বেড়াইতে বাহির হইয়া কোথা হইতে দর্পণ, চিরুণী, কেশতৈল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং তিনটিরই ব্যবহার সুরু করিল। বাকী তিন জন যে যাহার নিজের মনে ব্যাপারটা বুঝিয়াও না বোঝার ভাণ করিয়া কহিল, "ও কি ক্ষপণক?"

ক্ষপণকের ধারণা ছিল, আসল ব্যাপারটা ইহারা কেহই জানে না। কহিল, "সে-দিন যাহা বলিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখি না।" কহিয়া তাহার নূতন আদর্শ পালন করিতে লাগিল। ভরদ্বাজ, উদ্দালক এবং কপিলও ক্ষপণকের আদর্শ অনুকরণ করিল।

ও-দিকে তখন মহর্ষি খালিতের মৌনব্রতের সপ্তাহ সুরু হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে এই একটি সপ্তাহ তিনি একা থাকেন, বাহির হন না, কাহাকেও দেখা দেন না, কাহারও সহিত কথা বলেন না, এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন অভ্যাস করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহার অধ্যাপনা বিভাগে যে কি আমূল পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। সপ্তাহ শেষে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া তিনি যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন তাহা কহতব্য নহে। তিনি দেখিলেন, কাহারো মাথায় রুক্ষ জট্‌-পাকানো চুল নাই, প্রত্যেকেরই মাথার বাম-অংশে ললাটের উপরিভাগ হইতে সুরু করিয়া একটি সরল সরু পথ পিছন দিকে চলিয়া গিয়াছে, এবং এই পথের দুই ধারে তৈল-চিক্কণ কালো চুল সুবিন্যস্ত ভাবে শায়িত রহিয়াছে। প্রত্যেকেরই চেহারা দেখিয়া বোঝা যাইতেছে, ইহারা স্নানের পূর্ব্বে সযত্নে প্রচুর পরিমাণে সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়াছে, এবং ইহাদের আহার্য্য-তালিকায় নিম্বপত্র বাদ পড়িয়া প্রচুর গব্য এবং অন্যান্য প্রকার উপাদেয় দ্রব্য যুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় ত্যাগ-সাধনার পথ হইতে এই সাত দিনের মধ্যেই তাহারা ভোগ-সাধনার পথে বহু দূর দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহর্ষি খালিত ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, "ক্ষপণক!"

পূর্ব্বে হইলে গুরুদেবের এই হুঙ্কারে পরম-বিনীত শ্রদ্ধাবান্ ছাত্র ক্ষপণক ত্রস্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু বেপথুমতীর স্বপ্নে মশ্‌গুল্ হওয়ার পর হইতে সে অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। পরম শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, "গুরুদেব!"

গুরুদেব অগ্নিময় কণ্ঠে কহিলেন, "এ তোমরা করিয়াছ কি?"

তেমনি শান্ত কণ্ঠে ক্ষপণক জবাব দিল, "গুরুদেব, ঠিকই করিয়াছি।"

মহর্ষি খালিত কহিলেন, "এত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক বৃথাই তোমাদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা দিলাম।"

ক্ষপণক সবিনয়ে কহিল, "গুরুদেব, যথার্থই কহিয়াছেন।"

মনের যে চরম অবস্থায় পরম বিনয়কে পরম ধৃষ্টতা মনে হয়, মহর্ষি খালিত তখন সেই অবস্থাতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এই মুহূর্ত্তে তোমরা আমার তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। তোমাদের মত ছাত্রের আমার প্রয়োজন নাই।"

ছাত্রেরা এমন ভাবে গুরুদেবের চরণধূলি দ্রুতবেগে শিরোধার্য্য করিয়া তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল যেন এই পরম মুহূর্ত্তটির জন্যই বহু দিন ধরিয়া তাহারা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে ক্রোধের উপশম হইলে মহর্ষি খালিত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে-হইতে কহিতে লাগিলেন, "হায়, এ কি করিলাম! মুহূর্ত্তের তরে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চিরতরে ছাত্রহারা হইলাম! আর কি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? আর কি তাহাদের শূন্যস্থান পূর্ণ হইবে? না হয়, তাহারা বালসুলভ সারল্যবশতঃ কিঞ্চিৎ ধৃষ্টতা করিয়াই ছিল, কিন্তু কেন আমি গুরুসুলভ ঔদার্য্যের সহিত তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিলাম না? জগতে শুদ্ধমাত্র সুমতিই যদি থাকিত তাহা হইলে গুরুর কোন প্রয়োজন থাকিত না, দুর্ম্মতি আছে বলিয়াই তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গুরুর প্রয়োজন। হায়, আমার অবোধ ছাত্রগণ যখন দুর্ম্মতির বশীভূত, তাহাদের সেই চরম প্রয়োজনের কালেই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলাম? হে জগদীশ্বর, হে বিশ্বপাতা! তোমার শ্রীচরণকমলযুগল ধ্যানযোগে স্পর্শ করিয়া আমি নতমস্তকে স্বীকার করিতেছি আমি আর মহর্ষি নামের যোগ্য নহি, আমি আজ হইতে মহামূর্খ খালিত।" কিন্তু মহামূর্খ খালিতের মন ছাত্রদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছুটিলেও মহামূর্খ খালিত স্বয়ং তাহা পারিলেন না, আত্মাভিমানে বাধিল।

ও-দিকে ছাত্রেরাও উত্তেজনার বশে তপোবন ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াই প্রত্যেকে মনে মনে নিম্নলিখিতরূপ চিন্তা করিতে লাগিল:

"হায় হায়, এ কি করিলাম! মুহূর্ত্তের অভিমানে আত্মহারা হইয়া প্রাণপ্রতিমা বেপথুমতীর সান্নিধ্যহারা হইলাম! আর কি গুরুদেব ডাকিয়া লইবেন? আর কি বেপথুমতীর সান্নিধ্য লাভ করিব? অহো, 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা' গ্রন্থোক্ত ক্রোধ-উপশমের এক হইতে বিংশতি পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গণনার কৌশলটি অবলম্বন না করিয়া কি ভুলই করিয়াছি! বাহির হইয়া আসার পূর্ব্বে ঐরূপ গণনা আরম্ভ করিলে সম্ভবতঃ বিংশতি পর্য্যন্ত পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই ক্রোধ শীতল হইয়া আসিত এবং গুরুদেবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তপোবনেই রহিয়া যাইতাম। হায়, এক্ষণে আর কোন্ মুখে তপোবনে ফিরিয়া যাইব?" তাহাদের প্রত্যেকেরই মন অনুতপ্ত হইয়া তপোবনে ফিরিয়া গিয়া মহর্ষি খালিতের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহারা স্বয়ং তাহা পারিল না—আত্মাভিমানে বাধিল। তাহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল এবং প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া কহিল, তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সমাপ্ত হওয়ায় তাহারা গুরুদেবের নির্দ্দেশে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই সংবাদে পুলকিত হইয়া তাহাদের স্বজনগণ তাহাদিগকে গার্হস্থ্য আশ্রম সুরু করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উত্তম উত্তম বিবাহের প্রস্তাব আনিতে লাগিলেন, কিন্তু বেপথুমতীগতপ্রাণ তরুণ চতুষ্টয় কোন না কোন অজুহাতে প্রত্যেকটি প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তাহাদের আত্মীয়গণ

হাল ছাড়িয়া দিলেন, এবং তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বেপথুমতী যে অন্তর জুড়িয়া রহিয়াছে সে অন্তরে অন্য কোন নারীর স্থান-সংকুলান হইতে পারে না।

কেন বলিতে পারি না, ইহাদের প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস, বেপথুমতীকে সুযোগমত প্রেম-নিবেদন করিতে পারিলেই বেপথুমতী তাহা ফেরৎ দিবে না, সানন্দে গ্রহণ করিবে। প্রত্যেকেই যথাসম্ভব গোপনে নিয়মিত ভাবে মহর্ষি খালিতের তপোবনের আশে পাশে ঘুরিয়া সুযোগের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং নিয়মিত ভাবে ব্যর্থ হইতে লাগিল। এই ভাবে এক দিন দুই দিন করিয়া অনেকগুলি দিন এক দিক্ দিয়া আসিয়া অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে চারি জনের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মুখামুখি হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঐকান্তিক বেপথুমতীগতপ্রাণতা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া প্রত্যেকের মনই গোপনে কাঁদিয়া উঠিল। তখন ক্ষপণক কহিল, "বন্ধুগণ, ইহা পরম পরিতাপের বিষয় যে, বেপথুমতী মাত্র এক জন এবং আমরা চারি বন্ধুই তাহাকে প্রাণ সঁপিয়া ফেলিয়াছি। মহাভারতের যুগ বহু দিন হইল বিগত হইয়াছে, সুতরাং একা বেপথুমতীর পক্ষে আমাদের চারি জনের প্রাণ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না; আমাদের মধ্যে তিন জনকে বিফলমনোরথ হইতেই হইবে। এক্ষণে সমস্যা হইতেছে, এই তিন জন কে কে হইবে।" বলিতে বলিতে ক্ষপণকের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

কপিল কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল, "আইস, আমরা কোন নির্জ্জন বনে গমনপূর্ব্বক আমরণ দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হই। শেষ পর্য্যন্ত যে এক জন বাঁচিয়া থাকিবে সে-ই অতুলনীয়া বেপথুমতীকে—"

ভরদ্বাজ কহিল, "তা এক-রকম মন্দ বল নাই কপিল। কিন্তু ঐরূপ করিলে তিন জনকে যে মরিতে হইবে।"

উদ্দালক কহিল, "বেপথুমতীকে না পাইলে জীবন রাখিয়াই বা কি লাভ হইবে?"

ক্ষপণক কহিল, "কিন্তু কপিলোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের চারি জনের মধ্যে কোন্ তিন জন মরিবে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। এমন হইতে পারে যে, মৃত তিন জনের মধ্যে এক জনেরই বেপথুমতীর প্রিয়তম হইবার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সুতরাং বেপথুমতীর মন না জানিয়া আন্দাজে কিছু করা ঠিক হইবে না।"

কথাটা সকলের মনেই লাগিল। সুতরাং সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি খালিতের শরণাপন্ন হইবে, এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় অতুলনীয়া বেপথুমতীর রাতুল চরণপদ্মে প্রেম-নিবেদন করিবে; চারিটির মধ্য হইতে একটি প্রেম বেপথুমতী নিজের রুচিমত বাছিয়া লইবে।

পরদিন কল-কোকিল-কূজিত প্রভাতে মহর্ষি খালিত দাঁতন করিতেছেন, এ-হেন সময় ক্ষপণক, ভরদ্বাজ, কপিল ও উদ্দালক তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কহিল, "গুরুদেব, আমরা আসিয়াছি। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

মহর্ষি খালিত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "তোমাদের মার্জ্জনা-ভিক্ষার পূর্ব্বেই আমি মার্জ্জনা করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি জানিতাম তোমরা ফিরিয়া না আসিয়া পারিবে না।" বলিয়া তিনি যে অর্থে হাসিলেন তাহার অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়া ছাত্রগণ ভাবিল, তাহাদের প্রেম-কাহিনী মহর্ষি খালিতের অজানা নাই।

তখন ক্ষপণকই অগ্রণী হইয়া কহিল, "গুরুদেব, আমাদের চারি জনেরই এক অবস্থা। বেপথুমতীকে লাভ করিতে না পারিলে আমরা কেহই প্রাণে বাঁচিব না। সুতরাং তিন জনকে প্রাণে মরিতেই হইবে। আপনি কৃপা করিয়া বেপথুমতীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দিন, যেন—"

মহর্ষি খালিত হাতের দাঁতন হাতেই রাখিয়া কহিলেন, "কিন্তু—"

উদ্দালক কাঁদিয়া কহিল, "গুরুদেব, ইহাতে আর কিন্তু করিবেন না। আমরা আপনার সন্তান তুল্য। আমাদের অপরাধ হইয়া থাকিলে নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া নিবেন। কিন্তু—"

মহর্ষি খালিত কহিলেন, "কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে বেপথুমতীর স্বামী আসিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বেপথুমতীকে লইয়া গিয়াছে। সে স্বামীর সহিত অভিমান করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল।"

বেপথুমতী স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে? বেপথুমতী বিবাহিতা? হায়! হায়! প্রথমেই তাহা জানা থাকিলে তো কাহারও প্রাণ এত দূর অগ্রসর হইত না। মহর্ষি খালিতের চারি জন ছাত্রই নিদারুণ হতাশায় শিশিরসিক্ত তৃণদলের উপর বসিয়া পড়িয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

* * * *

কাহিনীটি এখানে শেষ করিয়া দিলেই বোধ হয় আর্ট বজায় থাকিত ভাল। কিন্তু এমন পাঠক-পাঠিকাও আছেন, যাঁহারা আর্ট অপেক্ষা তথ্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী; তাঁহাদের খাতিরেই বিদায় নিবার পূর্ব্বে আরও খানিকটা অগ্রসর হইতে হইবে।

ক্ষপণক, কপিল, ভরদ্বাজ ও উদ্দালক অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িল, এবং আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক একাগ্র হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং মহর্ষি খালিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিল। যে নিম্ব-বৃক্ষটি কিছু দিন যাবৎ বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেছিল তাহা পুনরায় চারি জন নিম্বপত্রভোক্তার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল।

ছাত্রদিগকে ফিরিয়া পাইয়া মহর্ষি খালিত পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের সদা-বিমর্ষ বদন দেখিয়া মনে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন। ভাবিতেন, "হায়, ইহারা না বুঝিয়া প্রাণ সঁপিয়া কি নিদারুণ যাতনাই না ভোগ করিতেছে! যদি প্রথমেই জানিতে পারিত বেপথুমতীর চরণ-পদ্মে একটি প্রাণ পূর্ব্বেই স্থান দখল করিয়া বসিয়া আছে, নূতন প্রাণের আর স্থান নাই, তাহা হইলে ইহারা আর অগ্রসর হইত না। প্রথমে একটুকু ভুলের ফলে ইহারা দুঃসহ মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতেছে। অনুরূপ ভুল করিয়া ইহাদেরই মত আরও কত তরুণ-প্রাণ বেদনার তুষানলে দহিবে কে জানে? অতএব বিবাহিতা রমণীর এরূপ কোন চিহ্ন ধারণ করা প্রয়োজন, যাহা দেখিলেই তাহার চরণপদ্ম হইতে কুমারগণ নিজ নিজ প্রাণ সাবধানে রাখিবে, আমার এই ছাত্র-চতুষ্টয়ের মত ভুল করিয়া পূর্ব্ব-দখলিত চরণপদ্মে প্রাণ সঁপিয়া ফেলিয়া পরে অবথা অসহ দুঃখ ভোগ করিবে না।"

বর্ত্তমানে আমাদের নারীসমাজে সীঁথিতে এবং ললাটের মধ্যস্থলে সিন্দুর-প্রয়োগের যে রীতি আছে তাহার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে করিতে গোড়া পর্য্যন্ত গেলে দেখা যাইবে যে, ইহা মহর্ষি খালিতেরই প্রবর্ত্তনার ফল।

বাল্মীকি ও কালিদাস

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাল্মীকির যুগে কৃষিই ছিল প্রধান বৃত্তি; তাই মহাকবির বর্ণনায় কৃষিসম্বন্ধীয় বহু উপমা বর্ত্তমান। যুবরাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প লইয়া দশরথ বলিতেছেন,—

বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান্। (অ-১।৩৮)

'সর্ব্বভূতানুকম্পক লোকের বৃদ্ধিকাম রাম বৃষ্টিমান্ মেঘের ন্যায় আমা হইতেও সকলের নিকট প্রিয়তর।' রাম ব্যতীত রাজ্য দশরথের নিকট 'শস্যং বা সলিলং বিনা' (অ-১২।১৩)। লঙ্কার অশোকবনে হনুমানকে দেখিয়া সীতা বলিয়াছেন,—

ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রিয়বক্তারং সংপ্রহৃষ্যামি বানর।
অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যেব বৃষ্টিং প্রাপ্য বসুন্ধরা। (সু-৪০।২)

'হে বানর, প্রিয়বক্তা তোমাকে দেখিয়া আমি সেই ভাবে প্রহৃষ্ট হইয়াছি, যেমন প্রহৃষ্ট হয় অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যা বসুন্ধরা বৃষ্টিকে পাইয়া।' মারীচ যখন রাবণকে সদুপদেশ দান করিয়াছিল, তখন রাবণ বলিয়াছিল যে মারীচের—

বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোষরে। (আ-৪০।৩)

'অতিশয় অর্থযুক্ত হইলেও তপ্তপাত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় তাহার বাক্য একেবারেই নিষ্ফল।'

এই কৃষিযুগে গোধনই ছিল শ্রেষ্ঠ ধন। রাবণ বিভীষণকে বলিয়াছিল,—

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ। (যু-১৬।১)

গাভীতেই ছিল সম্পদ্,—তাই গাভী এবং বৃষের উপমা বাল্মীকির সমগ্র রামায়ণে ছড়াইয়া আছে। দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—

যথা হ্যপালা পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্।
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে। (অ-১৪।৫৪-৫৫) *

রামচন্দ্র যে দিন বনে গমন করিলেন তখন—

ইতি সর্ব্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ। (অ ২০।৬)

কৌশল্যা রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

কথং হি ধেনুঃ স্ববৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি। (অ ২৪।৯)

'বৎস যে দিকে যায় ধেনু যেমন তাহাকেই অনুগমন করে, আমিও সেইরূপ তুমি যেখানে যাইবে সেইখানেই তোমার অনুগমন করিব।' হনুমান্ যে দিন সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান মণি লইয়া রামের নিকট পৌঁছিয়াছিল সে দিন সেই মণিদর্শনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট বলিয়াছিল—

'যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্বৎসস্য বৎসলা।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ। (সু-৬৬।৩)

'বৎসলা গাভী যেমন বৎস অবলম্বন করিয়া স্নেহবশতঃ দুগ্ধ স্রবণ করে, এই মণিশ্রেষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া আমার হৃদয়ও তদ্রূপ হইতেছে।'

এই কৃষি-সভ্যতার নিদর্শন অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রাণী কৌশল্যার একটি উক্তিতে। রামচন্দ্রের বনগমনের পর বিষণ্ণ দশরথকে লক্ষ্য করিয়া কৌশল্যা বলিতেছেন—

কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি।
পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোবধূমিব। (অ-৪৩।১২)

'বৃষভ যেমন গোবধূকে সম্মুখে রাখিয়া আগমন করে, সেইরূপে মহাবাহু রাম কবে আবার রথে সীতাকে সম্মুখে রাখিয়া অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিবে।' একান্ত কৃষিসভ্যতার যুগ না হইলে মায়ের পক্ষে পুত্র এবং পুত্রবধূকে বৃষ এবং গোবধূর সহিত উপমিত করা সম্ভব হইত না, শোভনও হইত না। এ উপমা আমাদের যুগে একেবারেই অচল। কালিদাসের যুগেও চলিত না,—অন্ততঃ কোথাও চলে নাই; 'বৃষস্কন্ধঃ' পর্য্যন্ত চলিত,—অধিক চলিত না; কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের সকল পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে উপমাটি আশ্চর্য্যরূপে মানাইয়া গিয়াছে। গাভী সম্বন্ধে সপ্রদ্ধ বর্ণনা কালিদাসের অনেক আছে। দিলীপ-রক্ষিত বশিষ্ঠের হোমধেনু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাং
জুগোপ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্। (রঘু-২।৩)

দিলীপ গোরূপধরা পৃথিবীকেই যেন রক্ষা করিয়াছিলেন, পৃথিবীর চারিটি সমুদ্র যেন হোমধেনুর চারিটি বাঁটযুক্ত পয়োধরে পরিণত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় এই হোমধেনু যখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিত তখন—

সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি
কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা
প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ। (রঘু-২।১৫)

এখানে মুনির হোমধেনুকে সূর্য্যপ্রভার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সূর্য্যপ্রভাও সারাদিন সকল দিগন্তরকে তাপ দ্বারা পূত করিয়াছে, ধেনুও তাহার প্রচরণের দ্বারা দিগন্তর পূত করিয়াছে; দিনান্তে সূর্য্যপ্রভাও পল্লবরাগ-তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ঋষির ধেনুটিও পল্লবরাগ-তাম্র। সূর্য্যপ্রভা আপন নিলয়ে চলিল—ঋষির ধেনুটিও আশ্রমে চলিল। তার পরে মধ্যম লোকপাল দিলীপ যখন ধেনুর অনুগমন করিতে লাগিল তখন—

বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন
শ্রদ্ধেব সাক্ষাৎ বিধিনোপপন্না। (রঘু-২।১৬)

সাধুজনের বহুমান্য রাজা কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া গাভীটি বিধিযুক্তা মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধার মত শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ দিলীপ ধেনুটির পশ্চাতে আসিতেছে—আর পার্থিব ধর্ম্মপত্নী সুদক্ষিণা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল,—

তদন্তরে সা বিররাজ ধেনু-
র্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা। (ঐ ২।২০)

উভয়ের মাঝখানে পাটলবর্ণা ধেনুটি দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তী সন্ধ্যার ন্যায় বিরাজমানা! কালিদাসের এই সকল বর্ণনার ভিতর দিয়া কালিদাসের বর্ণনার চমৎকৃতি এবং তৎসঙ্গে স্বর্গীয় কামধেনুসুতা

* যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্। (অ ৬৭।২১)

ঋষির হোমধেনুরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এই সকল বর্ণনার সহিত বাল্মীকির পূর্ব্বোক্ত উপমাটির তুলনা করিলেই কালিদাসের যুগ এবং কাব্যপ্রতিভা এবং বাল্মীকির যুগ এবং কাব্য-প্রতিভার পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

এই গাভী এবং বৃষভের কথা কবির মনে জাগিয়া উঠিয়াছে বহু বর্ণনায়। রামচন্দ্রের শরে বালী নিহত হইলে—

হতে তু বীরে প্লবগাধিপে তদা
বনেচরাস্তত্র ন শর্ম লেভিরে।
বনেচরাঃ সিংহযুতে মহাবনে
যথা হি গাবো নিহতে গবাম্পতৌ। (কি ২২।৩১) *

'বানরাধিপ বীর বালী হত হইলে বনেচর বানরগণ কিছুতেই সুখ বা স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না; তখন বনেচরদের অবস্থা গবাম্পতি নিহত হইলে সিংহযুক্ত মহাবনে গাভীদের অবস্থার ন্যায়।'

কবি যেখানে বর্ষাত্যয়ে শরতের বর্ণনা দিতেছেন সেখানেও—

শরদ্গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ
প্রহর্ষিতাঃ পাংশুসমুক্ষিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতি যুদ্ধলুব্ধা
বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি। (কি-৩০।৩৮)

'শরৎগুণে বৃষগুলির রূপশোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেগুলি অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহ ধূলিযুক্ত করিয়াছে; এবং সম্প্রতি মদোৎকট হইয়া যুদ্ধলুব্ধ বৃষগুলি গোরুগুলির মধ্যে গিয়া নাদ করিতেছে।' †

লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া হনুমান্ আকাশে চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিল।

ততঃ স মধ্যংগতমংশুমন্তং
জ্যোৎস্নাবিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং
গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্। (সু ৫।১)

'তাহার পর হনুমান্ (মধ্যরাত্রে) তারকামধ্যগত অংশুমান্ চন্দ্রকে দেখিতে পাইল; সে (চন্দ্র) প্রতিমুহূর্ত্তে জ্যোৎস্নাবিতান বমন করিতেছিল, সূর্য্যসহযোগে প্রকাশবত্ত্ব লাভ করিয়া সে গোষ্ঠে মত্ত বৃষের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল।'

এইরূপে দেখিতে পাই সমুদ্রতিতীর্ষু হনুমান্ 'সমুদ্গ্রশিরোগ্রীবো গবাংপতিরিবাবভৌ' (সু ১।২); এইরূপে বীর্য্যবান্ গবাক্ষ রাক্ষস 'গবাং দৃপ্ত ইবার্ষভঃ' (যু ৪।১৫)। রামচন্দ্র যখন আবার চতুর্দশবর্ষ পরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল তখন ভরত বলিয়াছিল,—

ধুরমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেণ বলীয়সা।
কিশোরবদ্গুরুং ভারং ন বোঢ়ুমহমুৎসহে। (যু ১২৮।৩)

'বলবান্ বৃষভই যে জোয়াল বহন করিতে সমর্থ তাহাই আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে; কিশোর বৃষের ন্যায় এই গুরুভারকে বহন করিতে আমার আর উৎসাহ নাই।'

বেদের বহু বর্ণনায়ও আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিগণ গাভী ও বৃষের উপমায়ই বহু জিনিষকে বর্ণনা করিয়াছেন। ধন হিসাবে গাভী-বৃষের মূল্য তখন বাল্মীকির যুগের মূল্য অপেক্ষাও বেশী ছিল,—এই কারণেই বেদে গাভীবৃষের উপমার এত ছড়াছড়ি দেখিতে পাই।

উপরি উক্ত আলোচনার ভিতর দিয়া বাল্মীকি ও কালিদাসের যুগ এবং উভয়ের কবিপ্রতিভার পার্থক্যের একটা আভাস পাওয়া যাইবে মনে হয়। 'রঘুবংশে'র প্রারম্ভে কালিদাস বাল্মীকি প্রভৃতি পূর্ব্বসূরীর উল্লেখ করিয়া অবশ্য বলিয়াছেন—

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। (১।৪)

কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, বিষয়-বস্তুতে কালিদাস বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বাল্মীকি-রামায়ণে যেখানেই বিচিত্র চরিত্রের সমবায়ে এবং সঙ্ঘাতে জীবনের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে কালিদাস তাহাকে দুই একটি শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া জনপদ এবং অরণ্যের সেই ভিড় এড়াইয়া চলিয়াছেন। তিনি শুধু প্রধান প্রধান কয়েকটি চরিত্র এবং বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঘটনা বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই প্রধান চরিত্র এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিকল্পনা প্রকাশের সুযোগ খুঁজিয়াছেন। ঘটনা-বহুল জীবনের ভিড় কবিকে এক স্থানে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে দেয় না, ঠেলিয়া লইয়া চলে। কিন্তু কালিদাস এইরূপ ভিড়ের ঠেলা খাইয়া হাঁটিবার পাত্র নহেন, যেখানে যেটুকু কবিকল্পনা ঢালিবার ইচ্ছা তাহা নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে কবির সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিবার কোন লক্ষণ কোথাও প্রকাশ পায় নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের বিষয়বস্তু কালিদাসে অতি সংক্ষিপ্ত,—তিনি আশেপাশেই রং ফলাইয়াছেন বেশী। বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রের আরণ্য জীবন এবং সেই আরণ্য জীবনে আরণ্যক মুনি-ঋষি এবং পার্ব্বত্য ও বন্য জাতিগুলির সহিত মিলন-সংঘাতই সর্বাপেক্ষা বেশী স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু কালিদাস বিদর্ভরাজদুহিতা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় সমাগত রাজপুত্রগণের রূপগুণ বর্ণনায় যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, এই আরণ্য প্রাণিগণের বর্ণনায় কোথায়ও সে উৎসাহ প্রদর্শন করান নাই। রামায়ণের গল্পাংশের ঠাসবুনানীর ভিতর দিয়া কালিদাস প্রায় দৌড়াইয়া চলিয়াছেন; কিন্তু তিনি থামিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এক জায়গায়,—লঙ্কা হইতে রামসীতার বিমানযোগে প্রত্যাবর্তনের পথে সমুদ্র ও বনের উপরিভাগস্থ বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষলোকে কবি তাঁহার কবিকল্পনাকে ঘোর ফের করাইবার একটি সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সুতরাং রঘুবংশের সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ সর্গে চলিয়াছে শুধু রামসীতার প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা। এ বর্ণনার মূল বাল্মীকি রামায়ণে থাকিলেও (দ্রঃ যুদ্ধকাণ্ড, ১২৩ সর্গ) এবং স্থানে স্থানে কালিদাসের বর্ণনা অতি ক্ষীণ ভাবে বাল্মীকিকে স্মরণ করাইয়া দিলেও * এ বর্ণনার চমৎকারিত্ব কালিদাসের কবিকল্পনার দান।

---

* তুঃ—অহং পুত্রসহায়া ত্বামুপাসে গতচেতনম্।
সিংহেন পাতিতং সদ্যো গৌঃ সবৎসেব গোবৃষম্। (কি-২৩।২৬)

† আরও:—
বেণুস্বরব্যঞ্জিততূর্য্যমিশ্রঃ
প্রত্যূষকালেঽনিলসম্প্রবৃত্তঃ।
সংমূর্চ্ছিতো গহ্বরগোবৃষাণা-
মন্যোন্যমাপূরয়তীব শব্দঃ। (কি-৩০।৫০)

* তুঃ—এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে। (রামায়ণ)

কালিদাসের কাব্য পাঠ করিতে করিতে স্থানে স্থানে অস্পষ্টভাবে বাল্মীকির স্মরণ হয়। যেমন রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলীপের বর্ণনা ও তাঁহার রাজত্বের বর্ণনা পড়িলে বালকাণ্ডে বাল্মীকিবর্ণিত দশরথের বর্ণনা ও তাঁহার রাজত্বকালীন অযোধ্যার বর্ণনার কথা মনে পড়িয়া যায়। 'কুমার-সম্ভবে'র দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণের ব্রহ্মার নিকটে গমন এবং তারকাসুরের নিধন প্রার্থনার সহিত বাল্মীকিবর্ণিত বালকাণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে রাবণ কর্তৃক উৎপীড়িত দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণের সমবেতভাবে ব্রহ্মার নিকট গমন ও রাবণের নিধন প্রার্থনার সহিত প্রায় পংক্তিতে পংক্তিতে মিল রহিয়াছে। † 'কুমার-সম্ভব' নামটিও বোধ হয় কালিদাস বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। * 'কুমারসম্ভবে'র বসন্ত ও মদন সহায়ে উমার শিবের তপস্যাভঙ্গের চেষ্টা এবং ক্রুদ্ধ শিব কর্তৃক মদনভস্ম ইহার সহিত রামায়ণ বর্ণিত ইন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত রম্ভার বসন্ত ও মদন সহায়ে কঠোর তপস্যানিরত বিশ্বামিত্র মুনির ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা ও ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র কর্তৃক রম্ভাকে শাপদানের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এখানেও ব্রীড়িতা এবং ভীতা রম্ভাকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছেন—

> সুরকার্য্যমিদং রম্ভে কর্ত্তব্যং সুমহত্ত্বয়া।
> লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্।
>
> *   *   *   *
>
> কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে।
> অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ।
> ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্।
> তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্। (বা ৬৪।১, ৬-৭)

'কুমারসম্ভবে'র উমার জন্মদিনের বর্ণনা হয়ত রামায়ণের রামচন্দ্রের বিবাহ-দিনের বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। †

কিন্তু মহাকবি কালিদাসের উপরে কবিগুরু বাল্মীকির প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া এই সকল অস্পষ্ট বা স্পষ্ট স্মরণকে অতি অকিঞ্চিৎকর এবং একান্ত বাহ্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই জাতীয় আলোচনায় আর প্রবেশ না করিয়া উভয় কবির কাব্যপ্রতিভার মৌলিক লক্ষণের ভিতরে যদি কোন গভীর মিল থাকে তাহা লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। উভয় কবির কবিধর্মের মৌলিক পার্থক্য যেখানে আমরা পূর্বে তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় কবির কবিধর্মে যে মিল রহিয়াছে তাহাও অতি গভীর। যে ইতিহাস উভয় কবির ভিতরে যুগের ব্যবধান ঘটাইয়া কবিধর্মের পার্থক্য ঘটাইয়াছে সেই ইতিহাসই আবার উভয় কবির ভিতরে একটি গভীর যোগসূত্রও রক্ষা করিয়াছে।

আমাদের বিচারে কালিদাসের কাব্যগুলি যে-সকল মহদ্গুণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহার ভিতরে একটি প্রধান গুণ বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের গভীর যোগ এবং কাব্যের ভিতরে এই গভীর যোগের অনন্যসাধারণ প্রকাশ। প্রথমে এই দিক্ হইতেই কালিদাস এবং বাল্মীকির সাধর্ম্যবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

> বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
> মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্। (রঘু)
>
> পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্।
> অপারমিব গর্জ্জন্তং শঙ্খশুক্তিসমাকুলম্। (রামায়ণ)
> উদ্ধাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ
> ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথম্। (রঘু)
> এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি—
> পর্য্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ। (ঐ)
>
> এষা সা দৃশ্যতে পম্পা নলিনী-চিত্রকাননা।
> ত্বয়া বিহীনো যত্রাহং বিললাপ সুদুঃখিতঃ। (রামায়ণ)
> দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদা-
> দমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ।
> অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্না-
> মন্যোহন্যদত্তোৎপলকেসরাণি।
> দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে
> ময়া প্রিয়ে সস্পৃহমীক্ষিতানি। (রঘু)

আরও তু:—এতদ্গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদ্
> আবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।
> নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ
> ত্বদ্বিপ্রয়োগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্। (রঘু)

† কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' দ্বিতীয় সর্গের সহিত তুলনীয়—
> তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।
> অব্রুবন্ লোককর্ত্তারং ব্রহ্মাণাং বচনং ততঃ।
> ভগবন্ ত্বৎপ্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
> সর্বান্নো বাধতে বীর্য্যাচ্ছাসিতুন্তং ন শক্নুমঃ।
> ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা।
> মানয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে।
> উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান্ দ্বেষ্টি দুর্মতিঃ।
> শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
> ঋষীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তথা।
> অতিক্রামতি দুর্দ্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ।
> নৈনং সূর্য্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
> চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে।
> তন্মহন্নো ভয়ন্তস্মাদ্রাক্ষসাৎ ঘোরদর্শনাৎ।
> বধার্থন্তস্য ভগবন্ উপায়ং কর্তুমর্হসি।
> (রামায়ণ, বালখণ্ড, ১৫।৫-১১)

* দ্র:—এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
> কুমার-সম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ। (বা-৩৭।৩১)

† তু—প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং
> শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
> শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং
> সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব। (কুমারসম্ভব, ১।২৩)
> পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
> দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
> ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
> বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত। (বা ৭৩।৩৭-৩৮)

কালিদাসের কাব্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনা সম্বন্ধে সর্বপ্রথমেই একটা কথা আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে; তাহা এই যে, কবি তাঁহার কাব্যে বিশ্ব-প্রকৃতির জড় অংশটা এবং চেতন অংশের ভিতরে স্পষ্ট কোন ভেদ-রেখা টানিতে পারেন নাই,—সমস্ত কাব্যের ভিতরে জড় ও চেতনের একটা আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। এই মিলটির পশ্চাতে কবির কোনও বৃহৎ তত্ত্বদৃষ্টি নাই; এ-মিল কবির কাব্যে সর্বত্রই এমন সহজ ভাবে দেখা দিয়াছে যে, কোথাও তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই জাগে না। * কবি তাঁহার চিত্তের ভিতরে প্রকৃতির এমন একটি রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যাহার ভিতরে জড়সত্তা এবং চেতনসত্তা ওতপ্রোতভাবে অন্বিত হইয়া আছে। কবির কাব্যের ভিতরে এইরূপ নিরন্তর জড় হইতে চেতনে বা চেতন হইতে জড়ে যাতায়াত করিতে আমাদের মনের কোনরূপ ক্লেশ নাই, এই যাতায়াত সম্বন্ধে আমরা কোথায়ও সচেতনও নহি। কালিদাসের 'রঘুবংশে' বর্ণিত সীতা যে ধরণী-দুহিতা ইহা একটা পূর্বলব্ধ সংস্কার মাত্র নহে; সীতাকে কবি নিজেও ধরণী-দুহিতা রূপেই দেখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতা যেদিন নির্বাসিতা হইয়াছিল জননী বসুন্ধরার সহিত সীতার নাড়ীর যোগ সেদিন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। কালিদাস বর্ণিত এই যোগ নিছক কবিকল্পনা না হইয়া বহু স্থানে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার মহর্ষি বাল্মীকির একটি সান্ত্বনার কাব্যের ভিতরে মাটির সহিত সীতার যোগ সহজ হইয়া উঠিয়াছে। মহর্ষি বলিয়াছিলেন,

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্ সংবর্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্।
(রঘু, ১৪।৭৮)

'নিজের সামর্থ্যানুসারে পয়োঘটের দ্বারা আশ্রম বালবৃক্ষদিগকে সংবর্ধিত করিয়া তুমি অসংশয়ে পুত্রজন্মের পূর্বেই স্তনন্ধশিশু পালনের প্রীতি লাভ করিবে।' †

'কুমার-সম্ভবে'র প্রথমেই দেখিতে পাই উত্তর দিকে অবস্থিত দেবতাত্মা নগাধিপ হিমালয় পর্বতের বর্ণনা। এই হিমালয়ের পরিচয়ের ভিতরে পর্বত হিমালয়েরই কতগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃশ্য এবং ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাই। অনন্তরত্নপ্রভব হিমালয়ের কঠোর হিমের বর্ণনা আছে, ইহার শিখরস্থ গৈরিক ধাতুর রক্তিমা মেঘমালায় সংক্রামিত হইয়া অকাল সন্ধ্যার ন্যায় অপ্সরাগণকে বিলাসভূষণ সম্পাদনে প্ররোচিত করে, এখানে তুষার পতনে রক্তবিন্দু ধৌত হইলেও কিরাতগণ নখরন্ধ্র মুক্ত গজমুক্তাফল দর্শনে গজহন্তা কেশরীদের পথ জানিতে পারে; এখানকার গুহামুখোত্থিত বায়ু কীচকরন্ধ্র পরিপূরিত করিয়া কিন্নরগণের সঙ্গীতে তান প্রদান করে; এখানে কপোলকণ্ডূয়ন নিবারণার্থ হস্তিগণ দেবদারু বৃক্ষ ঘর্ষণ করে, সেই ঘর্ষণ-নিঃসৃত নির্যাসের সুরভিগন্ধে সমস্ত সানুদেশ পরিপূর্ণ হয়। এই হিমালয় দিবাভীত অন্ধকারকে তাহার গুহার ভিতরে দিবাকরের হাত হইতে রক্ষা করে; চমরীমৃগগণ চন্দ্রকিরণগৌর লাঙ্গুল বিশেষের দ্বারা নগাধিরাজকে ব্যজন করে, মৃগান্বেষী কিরাতগণ এখানে ভাগীরথীর নির্ঝরকণাবাহী সমীরণের দ্বারা সেবিত হয়। এই হিমালয়েরই আদরিণী কন্যা উমা। পাষাণে গড়া তাহার দিগন্তব্যাপী বিরাট কর্কশ দেহ, তবু পিতৃস্নেহের কোনও অভাব নাই। রুদ্রতেজে মদন ভস্মীভূত হইলে উমা যখন শোচনীয় পরাজয় লাভ করিল তখন পিতা আগাইয়া গিয়া রুদ্রকোপে ভয়হেতু মুকুলিতাক্ষী দুহিতাকে দুই বাহু বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, এবং সুরগজ ঐরাবত যেমন করিয়া আদরে দন্তলগ্না পদ্মিনীকে বহন করে তেমন করিয়াই তাহার কর্কশ বুকে উমাকে লইয়া বেগে দীর্ঘকৃতাঙ্গ হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা
দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিমাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
প্রতিপথগতিরাসীদ্ বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ। (কুমারসম্ভব, ৩।৭৬)

উমাকে যেখানে চিরন্তন সামাজিক বিধানে বিবাহ দিবার সময় আসিল সেখানে পিতা হিমালয়কেও সামাজিক জীব হইতে হইল। কালিদাস হিমালয়কে অতি কৌশলে পর্বত হিমালয়ও রাখিয়াছেন আবার তৎসঙ্গে সামাজিক জীবও করিয়া তুলিয়াছেন। যোগীশ্বর মহাদেবের বিবাহের ঘটক হইলেন সপ্তর্ষিগণ; তাঁহারা সম্বন্ধের বার্তা লইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন হিমালয়ের পুরী 'ওষধিপ্রস্থে'। এই 'ওষধিপ্রস্থ' নামটিই লক্ষণীয়। এই 'ওষধিপ্রস্থ'

গঙ্গাস্রোতঃপরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তর্জ্বলিতৌষধি।
বৃহন্মণিশিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্।
জিতসিংহভয়া নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ।
যক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ পৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ। (৬।৩৮, ৩৯)

এই পুরী গঙ্গাস্রোতদ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রাচীরের অভ্যন্তরে ওষধিগুলি প্রজ্বলিত হইয়াই দীপের কাজ করিতেছে; বৃহৎ মণিশিলা খচিত ইহার প্রাচীর—গুপ্ত হইলেও মনোহর। এখানে হাতীগুলির আর সিংহের ভয় নাই, বিল হইতে অশ্ব জাত হয়; যক্ষ এবং কিন্নর ইহার পৌরজন, বনদেবতারাই পুরকামিনী।—এমনি করিয়া কালিদাস 'ওষধিপ্রস্থে'র যে বর্ণনা করিলেন তাহা একটি পার্বত্য অঞ্চলও বটে—আবার পুরীও বটে। এই 'ওষধিপ্রস্থে'র নাগরিক হিমালয় সপ্তর্ষির অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন—

নময়ন্ সারগুরুভিঃ পাদন্যাসৈর্বসুন্ধরাম্। (৬।৫০)

তাঁহার গুরুভার পাদন্যাসে বসুন্ধরাকে নমিত করিয়া আসিতেছিলেন। এই হিমবান্—

ধাতুতাম্রাধরঃ প্রাংশুর্দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ।
প্রকৃত্যৈব শিলোরস্কঃ সুব্যক্তো হিমবানিতি। (৬।৫১)

তাঁহার ধাতুতাম্র অধর, উন্নত দেহ, দেবদারুর বিশালভুজ, প্রকৃতিতেই প্রস্তরের বক্ষ—সেই যে হিমবান্ ইহা সুব্যক্ত। হিমালয় মহর্ষিগণকে পাদ্য-অর্ঘ্যে অভ্যর্থিত করিয়া বলিলেন—

* দ্রঃ—'সাহিত্য-পরিচয়'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১২৫-১৩০

† তুঃ—অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং
পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং
স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ।
কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিৎ
বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ
সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ। (রঘু, ২।৩৬-৩৭)

ভবৎসম্ভাবনোত্থায় পরিতোষায় মূর্চ্ছতে।
অপি ব্যাপ্তদিগন্তানি নাঙ্গানি প্রভবন্তি মে।
ন কেবলং দরীসংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ।
অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোঽপি পরং তমঃ। (৬।৫৯-৬০)

আপনাদের অনুগ্রহজন্য আনন্দ এত অপর্য্যাপ্ত হইয়াছে যে, আমার দিগন্তব্যাপী অঙ্গেও তাহার স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না। জ্যোতির্ময় আপনাদের দর্শনের দ্বারা কেবল আমার গুহাস্থিত তমঃই দূরীভূত হইল না, আমার আভ্যন্তরীণ রজঃ (ধূলি এবং রজোগুণ) এবং তমঃও (অন্ধকার এবং তমোগুণ) দূরীভূত হইল। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই হিমালয় পর্বতও বটে, সামাজিক জীবও বটে। কবি বলিয়াছেন যে, হিমালয়ের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দুইটি রূপ আছে ; এবং এই দুই রূপকে একত্রে মিলাইয়াই এখানে তিনি হিমালয়ের সকল বর্ণনা করিয়াছেন। আসলে বিশ্বপ্রকৃতিরই একটা স্থাবর রূপ এবং একটা জঙ্গম রূপ রহিয়াছে, এবং এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রকৃতি উভয় রূপকে এক করিয়া কবির দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল ; কবিও তাই প্রকৃতির ভিতরে স্থাবর-জঙ্গমকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখিতে চাহেন নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই, কন্দর্পের সহিত যে অকাল বসন্তকে সহায় করিয়া গিরিরাজ-দুহিতা উমা কৃত্তিবাসের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিল, সে বসন্ত কন্দর্প এবং উমার মতই বিগ্রহবান্ এবং প্রাণবান্। দিকে দিকে প্রাণলীলার প্রাচুর্য্যে এবং চাঞ্চল্যে সে জীবতনুর ন্যায়ই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। সহসা অশোকের স্কন্ধদেশ পর্যন্ত নবকিশলয়-রঞ্জিত রাশি রাশি কুসুমগুচ্ছে ভরিয়া গেল, আম্রশাখা কিশলয় অঙ্কুর এবং আম্রমুকুলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, নির্গন্ধ কর্ণিকারের বর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরিত হইল, বসন্ত-সঙ্গতা শ্যামল বনভূমির গাত্রে বালেন্দুবক্র অশোকের নখক্ষত দেখা দিল, মধুশ্রীর মুখে ভ্রমরের তিলক এবং বালারুণকোমল চূতপ্রবালোষ্ঠ শোভা পাইল, পিয়ালতরুমঞ্জরীর রেণুকণায় দৃষ্টিপাত বিঘ্নিত হইলেও মদোদ্ধত মৃগগণ যেখানে বনস্থলীর মর্মর পত্রধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর দিয়া সমীরণাভিমুখে ধাবিত হইল, চূতাঙ্কুরাস্বাদে কষায়কণ্ঠ কোকিলের রব জাগিয়া উঠিল,—দিকে দিকে লীলাচঞ্চল প্রাণের সাড়া পড়িয়া গেল ; কুসুমের একটি পাত্রে ভ্রমর-ভ্রমরী মধুপানে মত্ত হইল, স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীকে কৃষ্ণসার মৃগ কণ্ডূয়নের দ্বারা সোহাগ করিতে লাগিল, রসের আবেশে করেণু গণ্ডুষপূর্ণ পদ্মরেণুগন্ধি জল হাতীকে দিল, অর্ধোপভুক্ত মৃণালখণ্ডের দ্বারা চক্রবাক নিজের প্রিয়াকে সাদর সম্ভাষণ জানাইল, বনের তরুগণও পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবক-স্তনবতী প্রদীপ্ত-পল্লবোষ্ঠযুক্ত মনোহরা লতাবধূগণের নিকট হইতে বিনম্রশাখা-ভুজবন্ধন লাভ করিয়াছিল। এখানে প্রকৃতি জড়-চেতন, স্থাবর-জঙ্গমের অভেদরূপে মূর্ত। এক দিকে যেমন কবি এমনি ভাবে প্রাণ-লীলায় জীবন্ত করিয়া প্রকৃতিকে মানুষের অনেকখানি সজাতীয় করিয়া মানুষের কাছে টানিয়া আনিয়াছেন,—অন্য দিকে আবার তিনি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে-সরিয়া যাওয়া চেতন-বিলক্ষণ মানুষকে টানিয়া আনিয়া প্রকৃতির সহিত সহজ ভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই পূর্বোক্ত বসন্তোজ্জীবিত বনস্থলীর পটভূমিতে যে উমার আবির্ভাব ঘটাইলেন তাহার—

অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগ-মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী
আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগং
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। (৩।৫৩-৫৪)

উমার অঙ্গে অশোকগুচ্ছ পদ্মরাগমণিকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল,—কর্ণিকার স্বর্ণের দ্যুতি কাড়িয়া লইয়াছিল, সিন্ধুবারপুষ্পই মুক্তা-কলাপের স্থান অধিকার করিয়াছিল ; অঙ্গে অঙ্গে নবযৌবনা উমা বসন্তপুষ্পাভরণ বহন করিতেছিল। উমা স্তনভারে যেন কিঞ্চিৎ আনম্রা—তরুণার্করাগ বসন পরিহিতা—যেন পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকের ভারে অবনম্র সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

এখানে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, যেমন করিয়া বসন্তের বনস্থলীতে তরুলতা নব প্রাণরসে পুষ্পে-পল্লবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে—যেমন করিয়া সহকার তরু নবযৌবনা লতাবধূর ভুজবন্ধন লাভ করিয়াছে, যেমন করিয়া ভ্রমর-ভ্রমরী হরিণ-হরিণী, চক্রবাক-চক্রবাকী, গজ এবং গজ-বধূ প্রেমলীলায় চঞ্চল—উমার যৌবনশ্রী এবং প্রেম-চাঞ্চল্য ঠিক সেই একই ছন্দে গাঁথা। কবি এমন একটি মোহের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার ভিতরে কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় না, এখানে বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের ন্যায় চেতন ধর্মে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, না উমা তাহার সকল মনুষ্যধর্ম লইয়াই বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়াই সর্বত্র স্থাপন করিয়াছেন কালিদাস মানুষ এবং বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে গভীর আত্মীয়তা।

এই গভীর আত্মীয়তাই মূর্তি লাভ করিয়াছে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' এবং 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকেও। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র চতুর্থ অঙ্কে আশ্রম-প্রকৃতি যে একান্ত সজীব হইয়া একটি নাট্যবর্ণিত চরিত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার ভিতরেও দেখিতে পাই কালিদাসের সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি এক দিকে আশ্রম-প্রকৃতিকে যেমন জঙ্গম চেতনধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনিই শকুন্তলাকে যতখানি পারেন প্রকৃতি-দুহিতা করিয়া তুলিয়াছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে যেখানে আশ্রম-তরুলতার আলবালে জল-সেচননিরতা শকুন্তলা বলিতেছে—'ন কেবলং তাদনিওও এব্ব, অত্থি মে সোদরসিনেহোবি এদেসু'—তাত কাশ্যপের নিয়োগের জন্যই নহে, এই আশ্রম-তরুগণের প্রতি আমারও একটা সোদর স্নেহ রহিয়াছে—সেইখানেই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের আভাস ধ্বনিত হইয়াছে। প্রকৃতির কোলে পরিবর্ধিত তরুলতা পশু-পাখী সকলের সহিতই প্রথমাবধি বল্কলপরিহিতা শকুন্তলার একটা সজাতীয়ত্ব—একটা সোদরত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শকুন্তলার বর্ণনায়ও কালিদাস যতটা পারেন তাহাকে প্রকৃতির কাছে টানিয়া রাখিয়াছেন। সে 'ণোমালিআ কুসুমপেলবা', সে শৈবালমণ্ডিত সরোজ অপেক্ষাও অধিক মনোজ্ঞা, তাহার—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।

এবং এইরূপে সহোদরা বলিয়াই 'বাদেরিদপল্লবঙ্গুলিহিং তুবরেদি বিঅ মং কেসররুক্খও'—বায়ুচালিত পল্লবাঙ্গুলি দ্বারা বকুল গাছ তাহাকে কাছে ডাকে ; সে পতিগৃহে যাত্রা করিলে আশ্রম-প্রকৃতি মাঙ্গল্য উচ্চারণ করে, তাহাকে ক্ষৌমবসন, অলক্তক এবং বিবিধ উপহার দান করে, আশ্রম পরিত্যাগ কালে তাহার বসনাঞ্চল টানিয়া ধরে, বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া গভীর বিষাদে অশ্রুমোচন করে।

[ক্রমশঃ

ডা: পশুপতি ভট্টাচার্য্য

ঘুমের বরাদ্দ

যে গ্রহে আমরা বাস করি, তার আবর্ত্তন-ধারায় যেমন রয়েছে রাত্রি-দিনের ছন্দ, সেই সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে আমাদের জৈব-জীবনেও তেমনি গড়ে উঠেছে ঘুম-জাগরণের ছন্দ। দিনের পরে যখন রাত্রি আসে, আলোর পরে অন্ধকার আসে, আমাদের চোখেও তখন সঙ্গে সঙ্গে জাগরণের পর ঘুম আসে। এই প্রাত্যহিক ঘুম আসবার ছন্দটিকে যদি আমরা ভেঙে দিতে চাই, তা'হলে যে কেবল ছন্দপতনেরই দোষ হয় তা নয়, তাতে আমাদের জীবনেরও হানি হয়। খাওয়া আর ঘুমানো, এই দুটি কাজ আমাদের শরীররক্ষার পক্ষে নিতান্তই দরকার। আমাদের ক্ষয়শীল জীবনীশক্তিকে বারে বারে সঞ্জীবিত করে তোলবার জন্য এই দুটির প্রয়োজনীয়তা প্রায় সমান সমান, তবে খাওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা তবু কতক পরিমাণে আমাদের ইচ্ছাধীন ক'রে নিয়ে চালাতে পারি, কিন্তু ঘুমের ব্যাপারটাকে তাও পারি না। হয় তো দশ-পনেরো দিন পর্য্যন্তও আমরা কিছু না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি, কারণ, শরীরের মধ্যে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা ভাঙিয়ে ভাঙিয়েও তখন আমাদের জীবনরক্ষার কাজ এক-রকম চলে যায়। কিন্তু ঘুমের কোনো সঞ্চয় নেই, কিছুমাত্র না ঘুমিয়ে অত দিন পর্য্যন্ত থাকা অসম্ভব। এটা যদিচ কখনো পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়নি যে, আদৌ না ঘুমিয়ে মানুষ কত কাল বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু নিম্নতর প্রাণীদের সম্পূর্ণ বিনিদ্র অবস্থায় রেখে দেখা হয়েছে যে তারা তাতে খুব অল্প দিনের মধ্যেই মারা যায়।
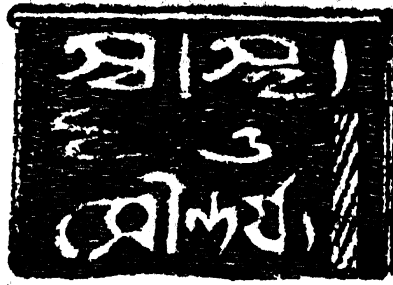
আমেরিকায় এক রকম শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তাতে দু'দিক্ থেকে সঙীন উঁচিয়ে অপরাধীকে সর্ব্বক্ষণ জাগিয়ে রাখা হয়। ঘুমে ঢুলে পড়লেই খোঁচা খেতে হবে, সুতরাং বাধ্য হ'য়ে অনবরতই তাকে জেগে থাকতে হয়। দেখা গেছে যে, কাউকে জব্দ করতে হ'লে এর মতো শাস্তি আর নেই। নিদ্রাশূন্য অবস্থায় থাকলে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি অত্যন্ত দুর্ব্বল আর রোগা হয়ে যায়। এমন কি, উপবাসে থাকলে লোক যতটা রোগা হয়, অনিদ্রায় থাকলে তার চেয়ে অনেক বেশি রোগা হয়। সুতরাং মনে হয় যে, আমাদের খাওয়ার চেয়ে ঘুমের দরকারটা যেন আরো বেশি। এ কথা সত্য কি না আর এর কিছু কারণ আছে কি না?

অবশ্যই এর কারণ আছে। আমরা সকলেই জানি যে, মুখ দিয়ে যে সকল খাদ্য খাই সেগুলো পেটে গিয়ে নানাবিধ উপায়ে হজম হ'তে হ'তে অবশেষে একটা তরল সারে পরিণত হয়, তার পরে পেট থেকে সেই তরল সার রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে যায়। এই পর্য্যন্ত খুবই সহজ কথা। কিন্তু তার পরে সেই খাদ্যসার সমগ্র দেহপদার্থের পরতে পরতে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কোষের মধ্যে গিয়ে পৌঁছানো চাই, তবেই তো তার ক্রিয়া হবে, নতুবা তার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু এই কাজটি খুব সহজে সম্পন্ন হয় না। রক্তের মধ্যে খাদ্যসার জমা হ'য়ে প্রস্তুতই থাকে, শরীরস্থ যাবতীয় কোষগুলিও সেই খাদ্য গ্রহণ করবার প্রত্যাশাতে উন্মুখ হ'য়ে থাকে, কিন্তু যতক্ষণ মানুষ জেগে আছে, ততক্ষণ পরস্পরের মধ্যে এই যোগাযোগটি ঘটবার উপায় নেই, কেবল ঘুমের সময়টিতেই এই যোগ-যোগ ঘটবে আর খাদ্যসারগুলি অনায়াসে সমস্ত কোষে কোষে পৌঁছে যাবে। অতএব খাদ্য যতই খাওয়া যাক, যতক্ষণ ঘুম না হচ্ছে ততক্ষণ প্রকৃতপক্ষে তার কোনো কাজই হলো না। অর্থাৎ যদি কেউ নিয়মিত খেয়ে যেতে থাকে আর একটুও না ঘুমিয়ে অনবরত জেগে থাকে, তা'হলে সব কিছু খাওয়া সত্ত্বেও সে অভুক্তের মতো অবস্থাতেই থেকে যাবে আর দ্রুতগতিতে রোগা হ'য়ে যেতে থাকবে। কিন্তু এর পরিবর্ত্তে যদি কেউ খেতে না পেয়ে কেবল ঘুমোতে পায়, তা'হলে সে এতটা দ্রুতগতিতে রোগা হয় না, কারণ, উপস্থিত খাদ্য না পেলেও শরীরের মেদ প্রভৃতি সঞ্চয়ের স্থান থেকে তার ঘুমের সময় কোষে কোষে যথাসম্ভব সরবরাহ চলতে থাকে। শরীরের সকল অংশে খাদ্য বণ্টন করবার জন্য ঘুমই হচ্ছে একমাত্র সময়, আর প্রত্যহ আমাদের এই সুযোগটি মেলা দরকার।

ঘুমের আরো এক মস্ত প্রয়োজন বিশ্রামের কারণে। যত কাল বেঁচে থাকা যায় তত কাল বিশ্রাম বলতে আমাদের কিছুই নেই। তবে জাগ্রত অবস্থাতেও আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ এবং প্রত্যেকটি যন্ত্র পালা ক'রে কিছু কিছু সাময়িক বিশ্রাম নিয়ে নেয় আর কাজ ও বিশ্রামের একটা ছন্দ রেখে চলে। এমন কি, হৃদ্‌যন্ত্রের প্রত্যেকটি সংকোচন-ক্রিয়ার পরেও এক একটা নিয়মিত বিরতি থাকে, ফুস্‌ফুসের শ্বাসবায়ু গ্রহণের মাঝে মাঝেও বিশ্রাম থাকে। কিন্তু সজ্ঞান ও জাগ্রত অবস্থায় আমাদের নার্ভাস সিস্‌টেমের কোনো বিশ্রাম নেই। যতক্ষণ জেগে আছি ততক্ষণ অনবরতই এই বিভাগকে কাজ ক'রে যেতে হচ্ছে, ক্রিয়াশীল যাবতীয় যন্ত্রগুলিকে শক্তি সরবরাহ ও হুকুম প্রেরণার দ্বারা চালনা করতে হচ্ছে, অবসরের সময়েও সক্রিয় হবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে, সুতরাং এই বিভাগের কাজের কোনো বিরাম নেই। কিন্তু এরও নিজস্ব বিশ্রামের জন্য একটা স্বতন্ত্র সময় দরকার, যখন অপর কোনো কাজে নিযুক্ত না থেকে একটু আপনার দিকে দৃষ্টি দিতে পারবে, রিক্তপ্রায় ভাণ্ডারে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারবে। জাগ্রত অবস্থাতে এটা কখনই সম্ভব নয়, কেবল ঘুমের অবস্থাতেই এই অতি-প্রয়োজনীয় বিশ্রামটুকু মেলা সম্ভব।

এই বিশ্রামের কেন প্রয়োজন, সেটা বোঝবার জন্য আমাদের নার্ভাস সিস্‌টেম বা কর্ম্মচালনা বিভাগ সম্বন্ধে খানিকটা মোটামুটি পরিচয় থাকা দরকার। মাথার খুলির ভিতর অবস্থিত আন্দাজ দেড় সের ওজনের একটি মস্তিষ্ক (ব্রেণ) আর তার থেকে উদ্‌গত বারো জোড়া নার্ভ এবং এই মস্তিষ্কের সঙ্গে সংলগ্ন মেরুমজ্জা (স্পাইনাল কর্ড) আর তার থেকে উদ্‌গত একত্রিশ জোড়া নার্ভ,—এই নিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্‌টেম গঠিত, যা আমাদের জানিত ভাবে শরীরের সমস্ত ক্রিয়ার পরিচালনা করে। এ ছাড়া মেরুদণ্ডের দুই পাশে গাঁঠ গাঁঠ নার্ভ পদার্থ ও তৎসংলগ্ন তন্তুসমূহের দ্বারা গঠিত দুটি লম্বা চেনের আকারে বিস্তৃত যে নার্ভগুলিকে দেখা যায়, সেগুলি এক স্বতন্ত্র অটোনমিক সিস্‌টেমের অন্তর্গত, যা আমাদের অজানিত ভাবে শরীরের সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ও

রক্তচলাচল প্রভৃতির পরিচালনা করে। মোটের উপর এই দুই বিভাগের সরঞ্জামগুলিকে নিয়ে আমাদের তথাকথিত নার্ভাস সিস্টেম সম্পূর্ণ। এর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান-বস্তু ঐ মস্তিষ্কটি। ঐ মস্তিষ্কের মধ্যেও আবার নানা রকমের বিভাগ আছে, এবং তার বাহিরে ধূসর ও ভিতরে শ্বেত দুই স্বতন্ত্র বর্ণের পদার্থ আছে। কিন্তু আমাদের যেটুকু মোটামুটি জানা দরকার সেটুকু এই যে, ঐ ধূসরবর্ণের পদার্থই প্রকৃত মস্তিষ্ক, এবং তা কেবল অসংখ্য নার্ভকোষের দ্বারাই গঠিত। কোষগুলি স্তরে স্তরে পাশাপাশি সাজানো আছে আর এক-রকম সংযোজক বস্তুর দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যেই আছে প্রোটোপ্লাজম নামক জীবন্ত পদার্থ, আর প্রত্যেক কোষ থেকেই তন্তুবৎ একাধিক শাখাপ্রশাখা নির্গত হয়েছে। এই শাখা-প্রশাখাগুলি পাশাপাশি অন্যান্য কোষের শাখাপ্রশাখার সঙ্গে মিশে গেছে, কেবল প্রতি কোষের একটিমাত্র শাখা কারো সঙ্গে না মিশে বরাবর লম্বমান হয়ে মেরুমজ্জার মধ্যে নার্ভ-তন্তুরূপে চলে গেছে। এই রকম বিভিন্ন কোষের বিভিন্ন তন্তু একত্রে মিশে প্রস্তুত হয়েছে এক একটি নার্ভ, আর সেইগুলি শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের সঙ্গে শরীরের প্রত্যেকটি অংশের সংযোগ রক্ষা করেছে। সুতরাং শরীরের যে কোনো স্থানের যে কোনো নার্ভ নিয়েই পরীক্ষা করা যাক, শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে যে, তার মধ্যে রয়েছে কতকগুলি তন্তু—যার উৎপত্তিস্থান মস্তিষ্কের কতকগুলি বিশিষ্ট কোষে, আর সেই তন্তু কেবল ঐ বিশিষ্ট কোষগুলির আজ্ঞাই বহন করে আর সেইগুলির কাছেই খবরের আদান-প্রদান করে। অতএব আমাদের শরীরের কার্য্য-চালনার যত কিছু প্রক্রিয়া তা কেবল নার্ভতন্তুর মারফতেই সম্পন্ন হয়, আর সে জন্য যা-কিছু শক্তিপ্রেরণার আবশ্যক, তা কেবল মস্তিষ্কের তাবৎ কোষগুলির দ্বারাই প্রেরিত হয়। মস্তিষ্কের কোষগুলির কাজই এই, তার মধ্যে প্রভূত শক্তি বা এনার্জি স্থৈতিকরূপে (potential) সঞ্চিত করা থাকে, নার্ভতন্তুর মারফতে অনবরত চলমান (kinetic) হ'য়ে সেই শক্তি ক্রমশঃ ব্যয়িত হয়। কিন্তু সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের শেষে সেই শক্তির ভাণ্ডার প্রায় রিক্ত হ'য়ে আসে, তখন আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। তখন কোথায় পাওয়া যাবে সে নবীন শক্তি? পাওয়া যাবে নিকটবর্ত্তী রক্ত-স্রোতের মধ্যে। আর কেবল ঘুমন্ত অবস্থাতেই রক্ত থেকে সে শক্তি আহরণ করা সম্ভব, তা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এটা বিশেষ ভাবেই পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে। মস্তিষ্ক-কোষের মধ্যে যে শক্তিরূপী পদার্থ থাকে তার নাম chromatic granules। দেখা গেছে যে, বহু ক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় থাকলে ঐ পদার্থ অত্যন্ত কমে যায়, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকলেই ঐ পদার্থ কোষের মধ্যে বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়।

অতএব মস্তিষ্কের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তুলনা করা যায় একটি ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির সঙ্গে। ব্যাটারির মধ্যেও মস্তিষ্ককোষের ন্যায় অনেকগুলি কোষ থাকে, তাতে রাসায়নিক উপায়ে খানিকটা স্থৈতিক শক্তি সঞ্চয় করা থাকে, সেই শক্তি তৎসংলগ্ন তারের মারফত চলমান হয়ে কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। ব্যাটারিতেও যেমন কোষগুলির পরস্পরের মধ্যে সংযোগ-স্থাপন করা আছে, আর এই সংযোগের ফলেই শক্তির আধিক্য হয়, মস্তিষ্কেও ঠিক তদ্রূপ। ব্যাটারির শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লে যেমন তাকে কারখানায় পাঠিয়ে কৃত্রিম উপায়ে চার্জ দিয়ে আবার তাকে শক্তিশালী করা হয়, মস্তিষ্কের বেলাতেও অনেকটা তদ্রূপ। নতুন করে চার্জ দেবার জন্য তাকে ঘুমের কারখানাতে পাঠাতে হয়। ব্যবহার করলে যেমন ব্যাটারি ভালো থাকে, অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যায়, মস্তিষ্কও অনেকটা তদ্রূপ। এ'কে ভালো অবস্থায় রাখতে হলে এর রীতিমত ব্যবহার করাও চাই, আবার নিয়মিত ঘুমের কারখানাতেও পাঠানো চাই।

ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্ক যে মৃতবৎ অচেতন হয়ে যায় তা নয়, তাহলে আর স্বপ্ন দেখা সম্ভব হতো না। ঘুমের সময়েও মস্তিষ্কের কতকগুলি কাজ ধীরে ধীরে চলতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস রক্তচলাচল হৃদয়ের কাজ

—নারী—

পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর দৃষ্টিতে

প্রকৃতিও মস্তিষ্কের পরিচালনায় চলতে থাকে, কিন্তু মস্তিষ্ককোষের ভিতরকার আণবিক চাঞ্চল্য স্থগিত হয়ে যায়, সুতরাং বাইরের চেতনা আর ইচ্ছাশক্তি-ঘটিত ক্রিয়াগুলি সাময়িক ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়।

ঘুম পায় কেন, এ সম্বন্ধে অনেক রকমের থিওরি আছে। অনেকে বলেন যে, মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা (এনিমিয়া) ঘটলেই তার

চাঞ্চল্য কমে যায়, তখন ঘুম পায়। এ কথা আংশিক হিসাবে সত্য; কারণ দেখা গেছে যে, ঘুমোলেই মস্তিষ্কে রক্তের পরিমাণ অনেক কমে যায় আর জেগে উঠলেই বেড়ে যায়, কিন্তু ঐটাই তার কারণ কি না সে কথা বিচারসাপেক্ষ। কোনো ক্রিয়ার সময় স্থানীয় রক্তের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর অবসরের সময় কমে যাবে, এটা সকল যন্ত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। কেউ কেউ বলেন, শ্রান্তিতে শরীরে যে বিষবৎ পদার্থের সৃষ্টি হয় তারই ক্রিয়াতে ঘুম পায়। আমাদের মাংসপেশী সকল পরিশ্রম করলে সেখানে একরূপ অ্যাসিড পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার দ্বারা ঘুম আসা অনেক স্থলে সম্ভব বটে, কিন্তু যারা কুঁড়ে প্রকৃতির এবং মোটে পরিশ্রম করে না তারাও অনেক সময় পরিশ্রমীদের অপেক্ষা বেশী ঘুমায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মূত্রমধ্যে একরূপ ঘুমপাড়ানো পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাই আমরা ঘুমাই, আর ঘুমের অবস্থায় তার বিপরীত পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাই জেগে উঠি। হয়তো সব থিওরিই আংশিক ভাবে সত্য, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, প্রয়োজনের জন্যই ঘুম পায় আর সে প্রয়োজনকে কিছুতেই অবহেলা করা চলে না।

যে যতই নিদ্রাতুর হোক, শুয়ে পড়বামাত্রই তৎক্ষণাৎ ঘুম আসতে পারে না। আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের প্রত্যেকটি অংশ যখন একে একে বিশ্রাম গ্রহণ করে তখনই ঘুম আসে। তার মধ্যে কোনো একটি অংশ যদি উত্তেজনাহেতু চাঞ্চল্য ত্যাগ করতে না পারে, তখন অন্যান্য সকল অংশ বিশ্রামের অবস্থায় থাকলেও ঘুম আসতে বিলম্ব হয়। ঘুমের সময় কোন্ অংশের পরে কোন্ অংশ বিশ্রাম লাভ করবে তারও একটা ধারাবাহিক নিয়ম আছে। মস্তিষ্কের যে অংশ আমাদের মাংসপেশী সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রথমে সেইটাই নিষ্ক্রিয় হয়। তাই দেখা যায় যে, ঘুম আসবার সময় আগে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাংসপেশীগুলি একে একে শিথিল হয়ে যেন নেতিয়ে পড়ে, তাই দেখেই বোঝা যায় যে, এবার ঘুম এসে গেছে। কিন্তু মস্তিষ্কের কেন্দ্র যখন নিদ্রিত হয় তখনও মেরুমজ্জার কেন্দ্রগুলি সজাগ থাকে, তাই প্রথম ঘুমের অবস্থায় আমরা আপন অজ্ঞাতে হাত-পা নেড়ে ছট্‌ফট্ করে থাকি, মশা কামড়ালে আপন অজ্ঞাতেই চম্‌কে উঠি এবং চুলকোতে থাকি। ঘুম খুব গভীর হ'লে আর এগুলি সম্ভব হয় না।

ঘুম এলে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি একে একে লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। প্রথমে অনুধাবনশক্তি, তার পরে বিচারশক্তি, তার পরে স্মৃতিশক্তি ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। তখন কল্পনা এলোমেলো ভাবতে শুরু করে, আর অহংজ্ঞান আপন স্থান-কালের অবস্থাটুকু বিস্মৃত হয়ে ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে যায়। এর পরে আসে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিলুপ্তির পালা। প্রথমে যায় দৃষ্টিশক্তি। বোজা চক্ষুপল্লব দু'টি আরো বুজে যায়, তারকা সঙ্কুচিত হয়ে অক্ষিগোলক দু'টি উপর দিকে আর ভিতর দিকে ঘুরে যায়। তার পরে লোপ পায় শ্রবণশক্তি। এর বিলুপ্তি এত দেরীতে ঘটে বলেই ঘুমের প্রথম দিকে একটু শব্দ হলেই আমরা তৎক্ষণাৎ জেগে উঠি, কিন্তু ঘুম একটু গভীর হলে আর শব্দ সম্বন্ধে এতটা সজাগ থাকি না। তখন কোনো অপ্রত্যাশিত শব্দে আমাদের সহজে ঘুম ভাঙে না, কিন্তু যদি কাউকে আগের থেকে বলা থাকে, ডেকে দিতে কিংবা যদি এলার্ম-ঘড়িতে দম দিয়ে রাখা থাকে তখন এই প্রস্তুতিহেতু সেই প্রত্যাশিত শব্দে অল্পেই আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। আরো এক আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কোনো একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে

যদি ঘুমিয়ে পড়ি তা হ'লে সেই শব্দ হঠাৎ থেমে গেলেই আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। চলন্ত রেলগাড়িতে যদি আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তা হ'লে কোনো ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে সেই শব্দ থেমে গেলেই আমাদের

ঘুম ভেঙে যায়। শোনা যায় যে, আগেকার দিনে কোনো এক নবাব ছিলেন, তিনি নহবতের বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমোতেন, আর পাছে সেই বাজনা থামলেই তাঁর ঘুম ভাঙে, তাই প্রত্যহ সারারাত্রি নহবৎ বাজাতে হতো।

ঘুমের সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া মন্থর হয়ে আসে, অর্থাৎ মিনিটে যার আশী বার নাড়ী চলে তার ঘুমের সময় প্রায় সত্তর বার হ'য়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসও খুব মন্থর গতিতে চলে, তাও মিনিটে প্রায় দশ বারো বার কমে যায়। শরীরের উত্তাপও তখন কিছু কম হয়, প্রায় এক ডিগ্রি থেকে দুই ডিগ্রি পর্য্যন্ত। সুতরাং নিদ্রাকালে সকল প্রকার যন্ত্রই আংশিক ভাবে বিশ্রাম পায়।

কার পক্ষে ঘুমটি কখন অত্যন্ত প্রগাঢ় হবে, সে কথা বলা শক্ত; তবে মোটের উপর বলা যায় যে, এক জন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রথম এক ঘণ্টার ঘুমই সকলের চেয়ে গভীর হয়, তার পরে ঐ ঘুম ক্রমে ক্রমে পাতলা হয়ে আসে। সেই জন্যই দেখা যায় যে, রাত্রে আহারাদির পর দুই এক ঘণ্টা মাত্র ঘুমোতে পারলেই অনেকের শরীর ও মন বেশ চাঙ্গা হয়ে যায়, তার পর আর ঘুমোবার সুযোগ না পেলেও তাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। প্রথম ঘুমটাই সকলের চেয়ে বেশি দরকারী, তার কারণ, তখন মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্রামের জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে, সেই অবসরটুকু পেলেই প্রথমে যে যার খোরাক তাড়াতাড়ি খানিকটা আহরণ করে নিয়ে নেয়। তার পর থেকে ঘুমের সময়কার বাকি উপকারটুকু লব্ধ হতে থাকে ধীরে ধীরে।

কার পক্ষে কতটা ঘুমের দরকার, তাও নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা যায় না; সমস্তই নির্ভর করে ব্যক্তিগত প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের উপর। কারো ঘুম হয়তো স্বভাবতঃই খুব গভীর, তার অল্প সময়ের ঘুমেই কাজ হ'য়ে যায়, আবার কারো ঘুম হয়তো খুব পাতলা, অনেকক্ষণ ঘুমোতে না পারলে তার তৃপ্তি হয় না। ঘুম যতই দীর্ঘ হবে ততই যে তা উপকারী হবে, এমন কোনো কথা নেই। বরং প্রয়োজনের চেয়ে ঘুমকে দীর্ঘায়িত ক'রে ভোগ করতে চাইলে তাতে শরীর খারাপ হয়। সেই জন্য দেখা যায় যে, সমস্ত রাত ঘুমোবার পরে ঘুম ভেঙে উঠে যদি কুঁড়েমি ক'রে বিছানায় শুয়ে অধিক বেলা পর্য্যন্ত আবার এক চোট ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, তাতে কোনো স্ফূর্তি না হ'য়ে শরীর ম্যাজ্‌-ম্যাজ্‌ করতে থাকে।

কোন্‌ বয়সের পক্ষে কতটা ঘুমের দরকার, এর একটা মোটামুটি নির্দেশ দেওয়া চলে। পুরুষদের চেয়ে সাধারণতঃ মেয়েদের ঘুমের দরকার বেশি, তার কারণ, পুরুষদের চেয়ে যদিও মেয়েদের পরিশ্রম অনেক কম, কিন্তু তাদের নার্ভাস সিস্‌টেম সর্বদাই চঞ্চল ও শীঘ্রই অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু মেয়েদের সহনশীলতা অনেক বেশি, তাই প্রয়োজন হ'লে তারা সাময়িক ভাবে নিদ্রাশূন্য অবস্থায় অনেক কাল কাটিয়ে দিতে পারে। ঘুমের দরকার সকলের চেয়ে বেশি শিশুদের পক্ষে। কেবল স্নান-খাবার সময়টিতে ছাড়া আর সকল সময়েই তাদের ঘুমোতে দেওয়া উচিত। কারণ, তখন তাদের গঠনের প্রথম মুখ, যতই বিশ্রাম দেওয়া যাবে আর নাড়াচাড়া না করা হবে, ততই তাদের গঠন ভালো হবে। তার পরে যতই বয়স বাড়তে থাকবে ততই ঘুমের পরিমাণ কমতে থাকবে। পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়স পর্য্যন্ত আন্দাজ ১৪ ঘণ্টা ঘুমের দরকার, সাত থেকে দশ বছর পর্য্যন্ত দৈনিক ১২ ঘণ্টা ঘুমের দরকার, দশ থেকে কুড়ি বছর পর্য্যন্ত ৯ ঘণ্টা ঘুমের দরকার। কুড়ি থেকে ষাট্‌ বছর বয়স পর্য্যন্ত আট ঘণ্টা ঘুমোলেই যথেষ্ট। ষাট্‌ বছরের পরে আর কোনো নিয়ম নেই, তখন নির্দিষ্ট ঘুমের সময় ছাড়াও যখন যতটুকু ঘুমিয়ে নিতে পারা যায় ততটুকুই ভালো। যদিও শিশুদের মতো ঘুমের প্রয়োজন বুড়োদের নয়, কিন্তু তখন ব্যাটারির চার্জ কমে এসেছে, যত বিশ্রাম দেওয়া যাবে ততই সেটা টেঁকসই হবে। বুড়ো বয়সে যারা রীতিমত ঘুমোতে পারে তারা দীর্ঘায়ু হয়।

কেউ কেউ নিদ্রাজয়ের অভ্যাস করেন। শোনা যায় যে, বুদ্ধদেব অর্ধশায়িত অবস্থায় সারা রাত জেগে থেকেই বিশ্রাম নিতেন, কিন্তু এটা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ কেউ আবার ইচ্ছানিদ্রার অভ্যাস রাখেন। নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার উপর বসেই কিছু কাল ঘুমিয়ে নিতে পারতেন। ডিউক অফ ওয়েলিংটনও না কি যখন খুশি অল্প একটু ঘুমিয়ে নিতে পারতেন। তাঁর রাত্রে ঘুমোবার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এও অসম্ভব।

যাদের শারীরিক পরিশ্রম বেশি, তাদের ঘুমের দরকার একটু বেশি, নতুবা তাদের পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর হয় না। যাদের কেবলই মানসিক পরিশ্রম, যারা লেখক কিংবা শিল্পী, তাদের ঘুমের দরকার কম হয়। তাদের মন সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে ব'লে সহজে তাদের ঘুমও আসে না, অনিদ্রায় বহু ক্ষণ তাদের কষ্ট পেতে হয়। যারা শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত থাকে, তারাই শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। এই জন্য যারা অনিদ্রায় ভোগে, তাদের কিছু কিছু শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস করা দরকার।

অভুক্ত থাকলে নিদ্রা ভালো হয় না, ভরা পেটেই ভালো নিদ্রা হয়। তার কারণ, পেটে খাদ্য ভরা থাকলে সেটা হজম করবার জন্য পেটের ভিতরেই অধিক রক্তসঞ্চালন হ'তে থাকে, সেই জন্য মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত রক্তশূন্য হওয়াতে সহজেই ঘুম পায়। কিন্তু এ কথা স্বাভাবিক পরিমাণ খাদ্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যারা অতিভোজন করে তাদের পক্ষে এ কথা নয়, তারা অতিভোজনের জন্য প্রায়ই অনিদ্রায় ভোগে। যতটা খাদ্য তারা পেটে বোঝাই করেছে, ততটা তাদের দেহপ্রকৃতি চায় না; সুতরাং অনবরতই প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, আর দুইএর মধ্যে এই বিরোধ-হেতু অতিভোজনকারীকে অনিদ্রার শাস্তি ভোগ করতে হয়।

শীতের সময় যেমন সুনিদ্রা হয়, গরমের সময় তেমন হয় না। তার কারণ, শীতের সময় শরীরকে গরম রাখতে কিছু শক্তিক্ষয় হয় আর কিছু পরিশ্রমেরও আধিক্য হয়, সুতরাং সহজেই ঘুম পায়। অত্যন্ত গরমের সময় ঘুম আসা কঠিন, তখন শোবার আগে একবার ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে নিলে চমৎকার ঘুম হয়।

ঘুমোবার সময় কেমন ভঙ্গীতে শোয়া উচিত? তার কোনো একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যার যেমন অভ্যাস সেইটাই তার পক্ষে করা উচিত। কিন্তু আমাদের বহু কালের আদিম ও অকৃত্রিম পদ্ধতি হচ্ছে উবুড় হয়ে শোওয়া। পূর্বকালে চতুষ্পদ জন্তু অবস্থায় আমরা এই ভঙ্গীতেই নিদ্রা যেতাম। এখনও লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, শিশুরা সাধারণতঃ উবুড় হ'য়ে শুয়েই ঘুমোয়, ঘুরিয়ে শুইয়ে দিলেও তারা আবার আপনি উবুড় হ'য়ে যায়। উবুড় হ'য়ে শুলে নিশ্বাসবায়ু ত্যাগ করা আরো সহজ হয়। তা ছাড়া ওতে পেটের

ভিতরকার যন্ত্রাদির পিছনে অবস্থিত প্রধান রক্তশিরাগুলির উপর থেকে চাপের অপনোদন হওয়াতে রক্তচলাচলও খুব সহজ হয়। চিৎ হ'য়ে শুলে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা ঘটে, অর্থাৎ সমস্ত যন্ত্রগুলি তখন রক্তশিরার উপর চেপে বসে। উবুড় হ'য়ে শোবার যে কি গুণ তা শীতকালে পরীক্ষা ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে। প্রচণ্ড শীতের সময় সহজে আমাদের ঘুম আসতে চায় না একটিমাত্র কারণে, তখন পা দু'টো ঠাণ্ডায় যেন জমে যায়, কিছুতে গরম হ'তে চায় না। শীতপ্রধান দেশে তাই পায়ের তলায় গরম জলের ব্যাগ দিয়ে লোকে বিছানায় শোয়। কিন্তু তখন যদি উবুড় হ'য়ে শোওয়া যায় তা'হলে পা দু'টি শীঘ্রই আপনি গরম হ'য়ে যাবে। তার কারণ, পেটের শিরার রক্তস্রোত চাপমুক্ত হ'লে সেই রক্তের দ্বারাই পা শীঘ্র গরম হ'য়ে যাবে এবং ঘুমও এসে যাবে। যাদের কখনও অভ্যাস নেই তাদের উবুড় হ'য়ে শুতে প্রথমটায় অসুবিধা হবে সন্দেহ নেই। বালিশটা এক-পাশে সরিয়ে ফেলতে হবে, আর মাথাটা ও হাত দু'টো কেমন ভাবে রাখা যায় তাই নিয়েই এক বিভ্রাট বাধবে। কিন্তু দিন কয়েক অভ্যাস করলেই এটা খুব সহজ হ'য়ে যাবে। সমস্ত রাতই যে উবুড় হ'য়ে শুয়ে থাকতে হবে তা নয়, প্রথমটায় এই ভাবে শুয়ে তার পরে এক পাশে ফেরা যেতে পারে। উবুড় হ'য়ে শোওয়াটা আমাদের যে একেবারেই অভ্যাস নেই তাও নয়। নিতান্ত ক্লান্ত বা বা দুঃখিত হ'লে আমরা স্বাভাবিক প্রেরণায় বিছানায় গিয়ে আগে ঐ ভাবেই শুয়ে পড়ি। নিশ্চয় তখন ওতে আমরা যথেষ্টই আরাম পেয়ে থাকি।

যারা মানসিক পরিশ্রম বেশী করে তাদের মাথার বালিস কিছু উঁচু হওয়া উচিত, নতুবা সহজে তাদের ঘুম আসবে না। যাদের শারীরিক পরিশ্রম বেশি, তাদের বালিশ নীচু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাশবালিশ নিয়ে শোওয়া একটা বিলাস, কিন্তু তাতে ঘুম আসবার পক্ষে অনেক সাহায্য করে।

কারো কারো সহজে ঘুম আসতে চায় না, বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তারা অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে। কেউ কেউ আবার ঘুম আসবার জন্ম রীতিমত লড়াই শুরু ক'রে দেয়। চোখের পাতা দু'টোকে চিপে প্রাণপণে বুজিয়ে রেখে, দাঁতে দাঁত চেপে আর হাতের মুঠো শক্ত ক'রে নাক-মুখ সিঁটকে সজোরে বিছানা আঁকড়ে ধরে তারা ঘুমের জন্ম কসরৎ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এমন ভাবে কখনো ঘুম আসতে পারে না, কেবল আড়ম্বর করাই সার হয়। ঘুম আসবার জন্ম শরীরের সমস্ত অঙ্গকে সম্পূর্ণ শিথিল ক'রে দিতে হবে আর মনকে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ক'রে ফেলতে হবে। এলোমেলো চিন্তাকে আসবার সুযোগ না দিয়ে কোন্ অঙ্গটি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট আর শিথিল হ'তে বাকি আছে সেই দিকে মনোযোগ দিতে হবে, নিজের দেহটা যেন ঢিলাঢালা অবস্থায় ভারী পাথরের মতো বিছানার উপর ফেলে রেখেছি এমনি ভাবটা মনে আনতে হবে। চোখ বুজে বহু সুদূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, মনে মনে কল্পনা করতে হবে, যেন আমি দূর-দিগন্তের দিকে চেয়ে আছি, হয়তো কোনো একটা আবছায়া ছবি দেখছি। এমনি ভাবে থাকতে থাকতে আপনিই ঘুম এসে যাবে। নিশ্চেষ্টতাই ঘুমের সহায়ক, চেষ্টাকৃত সাধ্যসাধনা নয়।

তবুও যাদের ঘুম আসতে বিলম্ব হচ্ছে তাদের শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া উচিত, ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে খুব খানিকটা পায়চারি ক'রে আসা উচিত, তার পর হাতে-পায়ে মুখে এবং কানের পাশে জল দিয়ে শুলে শীঘ্রই ঘুম আসবে। শোবামাত্রই যাদের ঘুম আসে না তারা অনেকে বই নিয়ে বিছানায় শোয়, কিছুক্ষণ পড়তে পড়তেই তাদের ঘুম এসে যায়। এ-ও মন্দ ব্যবস্থা নয়। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ঘুম আসবার যে-সব অন্তরায় আছে সেগুলোকে আগের থেকে দূর করা উচিত। বিছানাটি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, ঘরে যেন যথেষ্ট বাতাস আনাগোনা করবার ব্যবস্থা থাকে। ঘুমের প্রধান শত্রু ছারপোকা আর মশা, এদের নিবারণ করবার যেন উত্তম রকমের ব্যবস্থা থাকে।

কোনো কিছু বাধাবিঘ্ন নেই, তবুও যাদের দিনান্তে বিছানায় শুয়ে কিছুতে ঘুম আসে না, তাদের শরীরে কিংবা মনে নিশ্চয় কিছু বিকৃতি ঘটেছে, সেটা পরীক্ষা করানো দরকার।

—ঊর্ণনাভ—

শ্রীরঘুনাথ ঘোষ

মরুক—মরুক, কান্না কিসের, যক্ষ্মাকাশ ?
বনেদীয়ানায় কংক্রীট্ করা—এই তো চাই :
রাজা-রাজড়ার সুখের অসুখ—মরণ-ফাঁস,
আকাশ তোদের পুড়ে পুড়ে হল পাংশু ছাই।

পাঞ্জাব-পুরী-চীন-দেওঘর-জাপ-মিশর,
তোদের মুঠোর বাইরে অনেক—কেঁদে কি ফল ?
তোদের সুইস—এঁদো বস্তীর খোলার ঘর,
দেখবে না কেউ, দেখবে না তোর চোখের জল।

বাতাসে-আলোয় জীবনে তোদের নেই দাবি,
সৌখীন সব যক্ষ্মা-রুগীর খাস-দখল ;
তাদের হাতেই আজকে তোদের ভাঁড়ার-চাবি,
রক্তে তোদের যক্ষ্মাকাশের ফলে ফসল।

জবর খবর, আরাম পেলায় : যক্ষ্মাকাশ !
তাহলে এবার শুক্‌নো হাড়ের গঙ্গালাভ,
আর ভয় নেই—নির্ঘাত তোর স্বর্গবাস ;
ওই চেয়ে দেখ, চারি দিকে তোর ঊর্ণনাভ !

বিজ্ঞান জগৎ

সূর্য্য হইতে শক্তিসংগ্রহ

[শেষাংশ]

পি, এস্

ক্লোরোফিল নামক যে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে উদ্ভিদ্‌গণ সূর্য্যরশ্মি কাজে লাগায় তাহার রহস্য ভেদ হইলে সৌরকর ব্যবহার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ক্লোরোফিল সৌরকরের সহিত জীবনের যোগসূত্র। ইহার সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও অনেক কিছুই অজ্ঞাত রহিয়াছে। পরীক্ষাগারে প্রস্তুত ক্লোরোফিল ও উদ্ভিদের ক্লোরোফিল ঠিক এক বস্তু নহে। দ্বিতীয়টির সহিত আর কিছু সংযোগ আছে যাহা দানা-গঠন ও জৈব বিস্তার দৃষ্টিতে ইহাকে প্রথমটি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্য হইতে আরও সরাসরি শক্তি লইবার অন্য অনেক উপায় আছে, তবে সেগুলি আদৌ কাজের নয়। কয়েক রকমের ধাতুখণ্ড পাশাপাশি ঠেকাইয়া রাখিয়া

উত্তপ্ত করিলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্ট হয়। এই পরস্পরস্পৃষ্ট ধাতুখণ্ডগুলিকে থার্মোকাপল বলে। ইহার উপর সূর্য্যের তাপ দিয়া অতি সহজে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, কিন্তু উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণ এত অল্প যে অতি ক্ষুদ্র মোটর চালাইতেও ২০টি থার্মোকাপল লাগে। তথাপি অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এই উপায়েই সৌরশক্তি ব্যবসায়ে লাগাইবার মত কার্য্যকরী হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাইজার উইলহেল্‌ম ইনষ্টিটিউটের ডাঃ ব্রুনো লাপে সূর্য্যালোকের সাহায্যে একটি বিজলী বাতি কয়েক মাস জ্বালাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ইহাতে রৌপ্য ও সেলেনিয়মের এক যৌগিক পদার্থের সহিত আর একটি ধাতুর সংযোগে প্রস্তুত একখানি প্লেট ব্যবহার করেন। এই দ্বিতীয় ধাতুটি কি তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। বলা হইয়াছিল যে, মাত্র ৪ ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ একখানি প্লেটে সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে ছোট একটি বৈদ্যুতিক মোটর চালানো যায়। যে ফটো-সেলগুলি এখন ধূমের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ, স্বয়ংক্রিয় দ্বারোদ্‌ঘাটক প্রভৃতির জন্য ব্যবসায়-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আলোক-রশ্মির সংযোগ-বিয়োগ সাহায্যে কার্য্য করে। এই সেলগুলিতে আলোক প্রভাবিত কোন পদার্থ (যথা কায়েসিয়ম) ভ্যাকুয়ম নলের ইলেকট্রোডের উপর পাতলা করিয়া লাগানো থাকে। সাধারণ টকি ছবির যন্ত্রে যেমন আলোকের সাহায্যে শব্দ উৎপাদিত হয় সেইরূপ ইহাতে আলোকের প্রভাবে ইলেকট্রনগুলি মুক্ত হওয়ায় একটি অতি মৃদু বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্ট হয়। সাধারণ থার্মোকাপল অপেক্ষা এই উপায়ে সহজে অনেক অধিক শক্তিশালী বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপাদিত হইতে পারে। এই উপায়ে সুলভ মূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সুবৃহৎ কারখানা গঠন করা চলে। হিসাবে দেখা যায় যে, ১ বর্গ-মাইল একখানি প্লেটে সূর্য্যালোকের সাহায্যে তিন লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদকের সমান কাজ হইতে পারে। ইহাতে আনুমানিক ব্যয় কিলোওয়াট পিছু ৫০ পাঃ পড়িতে পারে। ইহা সাধারণ উৎপাদক অপেক্ষা অধিক হইলেও ইহাতে ইন্ধনের খরচ নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন বৈজ্ঞানিক ৫ লক্ষ থার্মোকাপল বা তাপযুগ্ম ব্যবহার করিয়া সূর্য্য হইতে প্রচুর শক্তি আহরণের এক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাপযুগ্মগুলির তলদেশ কংক্রীটে গাড়িয়া উপরিভাগে পূর্ণ সূর্য্যালোক ফেলিবার কল্পনা ছিল। হিসাবে দেখা গেল যে, ইহাতে যে ব্যয় হয়,—বর্ত্তমানে শক্তি উৎপাদনের অন্যান্য উপায় থাকিতে—কিছুতেই চলিতে পারে না।

সূর্য্য শুধু তাপই দেয় না, তাহার আলোক নানাবিধ রোগের বীজাণুও ধ্বংস করিয়া থাকে। এই জন্য গৃহনির্ম্মাণের সময়ে যাহাতে প্রত্যেক ঘরে যথেষ্ট সূর্য্যালোক যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা রাখা উচিত। আজকাল বৈদ্যুতিক আলো সস্তা বটে, কিন্তু সূর্য্যের আলো আরও সস্তা এবং বিজলী বাতির সূর্য্যকিরণের মত রোগবীজাণুনাশক শক্তি নাই। এখন আমেরিকায় আর্শীর সাহায্যে ঘরে ঘরে সূর্য্যালোক লইয়া যাইবার ব্যবস্থা রাখিয়া বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। ইহাতে ছাদের উপরে আর্শীর সাহায্যে ৩০০০০ বাতির মত একটি রশ্মি সংগৃহীত হয়। আর্শীগুলির সূর্য্যের আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অনুযায়ী ঘুরিবার ব্যবস্থা আছে। সেই রশ্মি একটি কূপপথে নিচে চালানো হয় এবং প্রতিফলক (reflector) সাহায্যে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন তলে ও ভিন্ন ভিন্ন ঘরে দেওয়া হয়। এইরূপ একটি রশ্মিতে ১০০টি ঘরে আলো দেওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ইহাতে শতকরা বৈদ্যুতিক আলোর খরচ বাঁচে। গ্রীষ্মমণ্ডলে আরও অধিক। এইরূপে বাড়ীতে আলো দেওয়ায় আর এক লাভ এই যে, ইহাতে ঘরে জানলা রাখিবার প্রয়োজন থাকে না। ফলে বায়ু-চলাচলের অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ও উৎকৃষ্টতর যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে। মরুভূমিতেই প্রথম সৌরশক্তির ব্যবহার সম্ভব কারণ, এইখানেই এই শক্তি প্রচুর বর্ত্তমান ও সর্ব্বদা প্রাপ্য। জলসেচনের কার্য্যেই ইহার ব্যবহার সব চেয়ে সুবিধাজনক।

দুর্গম পথের যাত্রী

পথে-ঘাটে এই যে আজ অসংখ্য মোটর-জীপ-গাড়ী দেখিতেছি, পথ চলিতে এ গাড়ীর তুল্য সহায় আর নাই। এই জীপ লইয়াই মিত্র-বাহিনী আজ জলে-স্থলে উভয় পথেই দিগ্বিজয়-যাত্রাকে সুগম ও

সুনিশ্চিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ম্মা-রোডে জীপ-বাহী ফৌজ বহু স্থলে দুর্গম গিরি এবং খরস্রোতা নদী পাইয়াছিল। সে-পথ-

নদী পার

জীপের কল্যাণে অনায়াসে পার হইয়া ফৌজ লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়াছিল। গিরির শৃঙ্গে-শৃঙ্গে মোটা তারের কাছি আঁটিয়া সেই কাছিতে ঝুলাইয়া জীপ-ফৌজ যেমন গিরি লঙ্ঘন করিয়াছে, তেমনি

ঝুলন্ত

বড় বড় ত্রিপলে আপাদ-মস্তক মুড়িয়া জীপকে ভাসানো হইয়াছে খরস্রোতা নদীর বুকে, এবং কোদাল-খুঁটা প্রভৃতিকে লগি ও দাঁড়ের স্থলাভিষিক্ত করিয়া নদী-পার হইতেও ফৌজকে কোনখানে এতটুকু বেগ পাইতে হয় নাই!

কয়লার কীর্ত্তি

ময়লা বলিয়া কয়লা চিরদিনই সৌখীন সমাজে অনাদর পাইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তার নানা গুণে মুগ্ধ হইয়া বৈজ্ঞানিক আজ বলিতেছেন, কয়লার মত অমূল্য সম্পদ্ পৃথিবীর বুকে আর নাই! মানুষের মত বাঁচিতে চাহিলে, আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য চাহিলে কয়লাকে শিরোধার্য্য করা চাই। কয়লা শুধু পৃথিবীকে শক্তি ও উত্তাপ জোগাইতেছে তা নয়—রাসায়নিকের হাতে কয়লা আজ সর্ব্বজনের সর্ব্ব অভাব মোচন করিতেছে। কয়লা কত-বড় সম্পদ, আমেরিকা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে। দারুণ অধ্যবসায়ে আমেরিকার বুকে মার্কিণ জাতি যে কয়লার সন্ধান পাইয়াছে, তাহাতে তিন হাজার বৎসর নিশ্চিন্ত আরাম-উপভোগ সম্ভব। কয়লা মহা-শক্তির উৎস। রেল-ষ্টীমার চালাইতে বিদ্যুৎ আজ যত সাহায্য করুক না কেন, এ শক্তির শতকরা ৬৫ ভাগ বিদ্যুৎ পায় কয়লা হইতে। ইস্পাত যে পৃথিবীতে আজ এমন বিরাট 'আসন পাতিতে

মুখের উপরে ঘোমটার ঝালর

পারিয়াছে, সে শুধু কয়লার কল্যাণে। কয়লার যে কালো ধোঁয়াকে এত-কাল আবর্জ্জনা বলিয়া আমরা নাসা কুঞ্চিত করিতে-ছিলাম, সেই কালো ধোঁয়ার এতটুকুও আজ আর রাসায়নিকেরা নষ্ট হইতে দেন না; প্রাণপণে সে ধোঁয়াকে রক্ষা করিতেছেন। কয়লা হইতে আজ তৈয়ারী হইতেছে বিটুমিনস, আনথ্রাসাইট প্রভৃতি কত না সামগ্রী! তার উপর বিলাস-প্রসাধনের জন্য কয়লা-সম্ভূত নাইলন ও নিয়োপ্রেন্ হইতে বিচিত্র মনোহর কত সামগ্রীর সৃষ্টি হইতেছে, তার পরিচয় পাওয়া যাইবে উপরের ঐ ছবিতে। রূপসী মুখে যে মিহি ঝালরের আবরণ টানিয়াছেন, তাহার সৃষ্টি হইয়াছে কালো কয়লার কদর্য্য আলকাৎরা হইতে।

অতিকায় দূরবীণ

নক্ষত্র-বিজ্ঞান-অনুশীলনের জন্য এ যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বহু দূরবীণ যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। যে দুটি দূরবীণ সব চেয়ে বড়, তার একটির ব্যাস ১০০ ইঞ্চি; এটি আছে মাউন্ট উইলসনে

সংস্থাপিত; অপরটির ব্যাস ২০০ ইঞ্চি—এটির অবস্থান মাউণ্ট পালোমারে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রটিকে যদি ম্যাগনিফাইইং লেন্স বলিয়া মনে করি, তবে ভুল হইবে। ধারা-যন্ত্রে যেমন বৃষ্টিধারা ধরা হয়, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে ধরা হয় তেমনি নক্ষত্রপুঞ্জের আলোক-ধারা। আমাদের অনেকের ধারণা, জ্যোতির্বিদ্‌রা এই দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে চোখ রাখিয়া দিবারাত্র বসিয়া আছেন! এ ধারণা ভুল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে নক্ষত্ররাজির যে আলোক-ধারা আসিয়া পড়ে, সে ধারার অনেকখানি রন্ধ্রপথে বাহির হইয়া যায়—এ জন্য নক্ষত্রানুশীলনের জন্য অধুনা

দূরবীণে সূর্য্যচ্ছায়া

তৈয়ারী হইয়াছে স্পেকট্রাম্‌। স্পেকট্রাম-যন্ত্রটি নিখুঁত। নক্ষত্ররাজির সাদা আলো ও রৌদ্র এই যন্ত্রের সাহায্যে রামধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় বিচ্ছুরিত হয়; এবং সেই বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দেখিয়া জ্যোতির্বিদ্‌রা গ্রহ-নক্ষত্রাদির তাপের বিভিন্ন মাত্রা কষিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন,—তা ছাড়া নক্ষত্ররাজির বায়ুতরঙ্গে কি কি রাসায়নিক সামগ্রী আছে, নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবেগ কত এবং কোন্‌ নক্ষত্র কোন্‌ দিকে চলিয়াছে,—এ-সবও বলিয়া দিতে' পারেন। পৃথিবী হইতে কত দূরে কোন্‌ নক্ষত্রের অবস্থান, তাহাও ঐ বর্ণচ্ছটা দেখিয়া তাঁহারা সঠিক কষিয়া দিতে পারেন। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে ফটোগ্রাফিক-প্লেট সংলগ্ন করিয়া এখন গ্রহ-উপগ্রহের ফটো তোলা হইতেছে—ইহার ফলে নক্ষত্র-বিজ্ঞান আজ মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়াছে।

জলের ফুটা-ফাটা ট্যাঙ্ক

বড় বড় জলের ট্যাঙ্ক ফুটা-ফাটা হইলে তাহাতে জল রাখা চলে না—নূতন ট্যাঙ্ক কিনিতে হয়! এখন একটা বড় ট্যাঙ্ক কেনা—সে সামর্থ্য ক'জনের আছে! এ বিপদে নিস্তার-লাভের উপায় হয় শুধু তেরপল এবং আলকাৎরার কল্যাণে। ট্যাঙ্কের কোনো জায়গা ফুটা

ট্যাঙ্ক সারানো

হইলে বা ফাটিলে তেরপলে পুরু করিয়া আলকাৎরা মাখাইয়া ট্যাঙ্কের গায়ে সেই তেলপল আঁটিয়া দিবেন। আঁটিবার পর ব্রাশ দিয়া তেরপলের গায়ে পুরু করিয়া আবার দু'কোট আলকাৎরা লেপিয়া দিবেন—ভিতরে-বাহিরে দু'দিকেই প্রলেপ লাগাইতে হইবে। প্রলেপ লাগাইবার সময় আলকাৎরা গালানো চাই—যেন নরম থাকে।

—জীবনের দীর্ঘহ্রস্ব—

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ন্যগ্রোধ শাল্মলী সম সুবিশাল প্রাংশু কলেবরে—
বাড়িয়া প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে দীর্ঘ কাল কিবা ফল তা'য়
অটল গিরির মত শরীরে অক্ষয় বট ক'রে—
বাঁধিলেও বাহিরিবে প্রাণ তবু রহিবে না হায়।

রহিবে না প্রাণ যদি তবে সেই প্রাণটুকু নিয়া—
শিখাটি জ্বালায়ে রাখি—স্নিগ্ধ ভাতি আশা-বর্ত্তিকায়
মাটীর প্রদীপ সম সুরভিত স্নেহ সঞ্চারিয়া—
দীপ সম পুষ্প সম নিবে ঝরে প্রাণ যেন যায়।

এতটুকু ক্ষীণ রশ্মি এতটুকু গন্ধ উপহার
দীর্ঘ জীবনের চেয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তু সে আমার
আছে মোর যতটুকু ততটুকু দিব ভালোবেসে
আলো দিয়া গন্ধ দিয়া নিবে ঝরে যাবো অবশেষে।

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১

স্কুলটি ছোট—মোট শ'-দুই ছাত্র। সে অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম নয়। যে সব শিক্ষক আছেন, বেশী খাটিবারও প্রয়োজন নাই, তাঁহারা একটু মন দিলেই ইহাকে প্রথম শ্রেণীর বিদ্যায়তনে পরিণত করা যায়। কিন্তু, কয়েক দিন পড়াইবার পরই ভূপেন বুঝিতে পারিল যে, এই ব্যাপারটা লইয়া এখানে কেহই মাথা ঘামায় না। স্কুলে একটাও খবরের কাগজ আসে না, গ্রামে না কি মোটে একখানা কাগজ আসে জমিদারের বাড়ী, কিন্তু দুনিয়ার সংবাদের জন্য এত বেশী আগ্রহ ইঁহাদের কাহারও নাই যে সেখানে গিয়া পড়িয়া আসিবেন। কখনও কোন সহরের লোকের সঙ্গে দেখা হইলে ভাসা-ভাসা দুই-একটা সংবাদ সংগ্রহ করেন—নহিলে অধিকাংশ সময়ই গ্রামের সাধারণ চাষীদেরও মধ্যে প্রচারিত এবং তাহাদের নিকট হইতেই সংগৃহীত গুজব লইয়া আলোচনা করেন। শুধু বাহিরের খবর নয়, বইও দুষ্প্রাপ্য। গ্রামে লাইব্রেরী নাই, থাকা সম্ভব নয়—স্কুলে একটা লাইব্রেরী আছে, বার্ষিক ষাট টাকা তাহার জন্য বরাদ্দও আছে, কিন্তু পুরাতন বই বাঁধাই, ম্যাপ প্রভৃতি কিনিতেই তাহার অর্দ্ধেকের বেশী চলিয়া যায়, বাকী টাকায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শুধু বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ কেনা হইয়াছে—বলা বাহুল্য, ভবদেব বাবু ছাড়া সে সব বই আর কেহই পড়েন না। কিন্তু সে জন্য কোন ক্ষোভ বা বেদনা বোধও কাহারও মনে নাই, কেহ এ বিষয়ে প্রতিবাদ ত দূরের কথা, আলোচনা পর্য্যন্ত করেন না। অর্থাৎ সাহিত্য গ্রন্থ থাকিলেও যে তাঁহারা কেহ পড়িতেন, বিজ্ঞান কি ইতিহাস বা অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভে যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, এমন সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। শুধু যতীন বাবু কী একটা নূতন উপন্যাস লাইব্রেরীতে কিনিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভবদেব বাবু কেনেন নাই—এ জন্য মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিয়া থাকেন। গত গরমের ছুটিতে একটা বিখ্যাত ফিল্ম তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ঐ উপন্যাসখানিই না কি সেই ফিল্মের ভিত্তি।

ফলে, বহু দিন আগে স্কুল-কলেজে পড়িবার সময় যে-টুকু বিদ্যা বা জ্ঞান শিক্ষকরা আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধি ত পায়ই নাই—এত দিনের অব্যবহারে তাহারও অনেকখানি মরিচা পড়িয়া গিয়াছে। সব চেয়ে দুর্দ্দশা নীচের ক্লাসগুলিতে, ভূপেন নিজে যখন ছোট ছিল, তখন স্কুলে কি ভাবে পড়ানো হইয়াছে তাহা আজ আর তার মনে নাই। তাই মোহিত বাবু যখন বার বার দুঃখ করিয়া বলিতেন, 'যেখান থেকে শিক্ষার বনেদ গড়ে ওঠে, সেইখানেই আমাদের দেশে সব চেয়ে অবহেলা বাবা, এ দিকে যত দিন না আমরা মন দিচ্ছি তত দিন আমাদের নতুন করে জেগে ওঠার কোন আশা নেই। অনার, প্রেষ্টিজ, ন্যাশানালিজম্—এ সমস্ত সেন্সগুলোই যদি বাল্যকাল থেকে গড়ে না ওঠে ত পরে হাজার ভাল কথা বললেও বোঝানো যাবে না—অথচ সে সব শেখাবে কারা? লেখাপড়াটাই ভাল করে শেখানো হয় না। যত অপদার্থ লোক সব দেওয়া হয় নীচের ক্লাসে। অথচ ও-দেশের বই-কাগজে অনবরতই দেখি, শিশুদের কী করে লেখাপড়া শেখাবে তাই নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই—অনবরতই গবেষণা চলছে। আর ওদের কথাই বা শুনতে হবে কেন বাবা, এ ত সহজ কথা যে, বনেদ শক্ত না হলে সারা ইমারতটাই দুর্ব্বল হয়ে পড়ল।' তখন সে কথার অর্থটা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই—কথাটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল আজ, সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া।

আমাদের দেশে শিক্ষার যে কয়টা স্বীকৃত মাপকাঠি আছে, নীচের ক্লাসে যাঁহারা পড়ান, সে মাপকাঠিতেও তাঁহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই, লেখাপড়াটা তাঁহাদের জানা ছিল নামমাত্র—সেই সামান্য সঞ্চয়টুকুও তাঁহারা অভাবে, অস্বাস্থ্যে ও অব্যবহারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। মাহিনা পান অতি সামান্য—তাহাতে সংসার চলে না। কলিকাতায় সে নিজে ট্যুইশনি করিতে গিয়া এই শ্রেণীর শিক্ষক কয়েক জনকে দেখিয়াছে, সেখানেও ইহারা মাহিনা পান লজ্জাকর রকমের কম। সে জন্য সংখ্যা দিয়া সেটাকে পূরণ না করিলে চলে না। এক এক জন সকালে-বিকালে আটটা পর্য্যন্ত ট্যুইশনি করেন, ফলে স্কুলে যখন যান তখন শ্রান্তিতে তাঁহাদের সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে আসে। এখানে ট্যুইশনি নাই। জমি-জমা চাষ-বাস আছে। পয়সার জোর নাই বলিয়া সে ব্যাপারেও খাটিতে হয় বেশী, সংসারের কাজও পল্লীগ্রামে সহরের তুলনায় অনেক বেশী—স্কুলে আসিয়াই বলিতে গেলে তাঁহারা বিশ্রামের অবকাশ পান। সুতরাং ভাল করিয়া পড়ানো ত দূরের কথা, ছেলেদের দিকে চোখ মেলিয়া বসিয়া থাকাই সম্ভব হয় না। কোন মতে গতানুগতিক ভাবে পড়া দেওয়া ও পরের দিন পড়া ধরা হয়—সে পড়াটা যে স্কুলেই তৈরি করিয়া দেওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কাহারও ধারণা পর্য্যন্ত নাই। যেন পড়াটা ছেলেরা বাড়ীতে তৈয়ারী করিয়াছে কি না এইটা পরীক্ষা করিবার জন্যই শুধু তাঁহারা বেতন পান। অসহায় শিশুর দল ভুলে-ভরা অর্থপুস্তক মুখস্থ করিয়া কোন মতে ক্লাসে পড়া দেয় এবং পরীক্ষায় পাস করে। যতটা মুখস্থ করে তাহার মধ্য হইতে দুই-একটা বাক্য ছাড় পড়িলেও তাহারা ধরিতে পারে না—যেটুকু লিখিল তাহার অর্থ হয় কি না, সেটা বুঝিবার মত বিদ্যাও তাহাদের কাহারও নাই। শিক্ষকরাও ইহাতে অভ্যস্ত, ছেলেদের উত্তর-পত্র দেখিয়া কে আশুতোষ দেব এবং কে সুবল মিত্রের অর্থপুস্তক ব্যবহার করে—এ না কি তাঁহারা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, এই তাঁহাদের গর্ব্ব। তাঁহারা নম্বর দেনও সেই ভাবে, মধ্যে পদ বা বাক্য ছাড় পড়িলে সেই অনুপাতেই নম্বর কাটেন—সবটার অর্থ দাঁড়াইল কি না, সেটা বিবেচনা করিয়া পরীক্ষা করেন না, কারণ, তাহা হইলে না কি 'ঠক বাছিতে গাঁ উজোড়' হইবে।

সব চেয়ে মজার কথা এই যে, অঙ্ক পর্য্যন্ত এখানে মুখস্থ চলে। পরীক্ষার পূর্ব্বে মাষ্টার মহাশয়রা শক্ত শক্ত অঙ্কগুলি বোর্ডে কষিয়া দেন, ছেলেরা খাতায় হুবহু টুকিয়া লয়, এবং সেই ভাবে মুখস্থ করিয়া গিয়া পরীক্ষাপত্রে লেখে। সেখানেও দুই-একটা ধাপ বাদ চলিয়া গেলেও অসুবিধা নাই—তাহাতে দুই-এক নম্বরই কাটা যায় মাত্র। উপরের ক্লাসে হেডমাষ্টার নিজে সেখানে পড়ান, এমন কি, সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে কি প্রশ্ন আসিতে পারে

সেইটা হিসাব করিয়া পড়ানো হয়। কোন ধৃষ্ট ছাত্র যদি অন্য দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া ফেলে ত মাষ্টার মহাশয়রা অম্লান বদনে এই বলিয়া থামাইয়া দেন যে,—ও-সব কোশ্চেন আসে না কখনও। তার চেয়ে আমি যেগুলো বলি দাগ দিয়ে নে। এইগুলো ইম্পর্টেণ্ট, ওটা লিখে রাখ ভেরি ইম্পর্টেণ্ট।

ছেলেরাও সেই ভাবে তৈয়ারী হইতেছে। অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলে যাহারা, তাহারা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ম্যাট্রিকের প্রশ্নপত্র এবং গত বৎসরের টেষ্টপেপারগুলি হইতে কঠিন প্রশ্নের জবাব শিক্ষকদের নিকট হইতে লিখাইয়া লয় এবং সেই উত্তরগুলি রাত জাগিয়া মুখস্থ করে। ইহার বেশী কিছু তাহারাও জানিতে চাহে না, শিক্ষকরাও জানান না।

ভূপেনের মন এই দূষিত বাতাসে যেন হাঁপাইয়া ওঠে। তাহার স্বপ্ন, তাহার আদর্শ শিক্ষার এই প্রহসনে বার বার অপমানিত হয়। তাহার ক্ষুব্ধ আত্মা অন্তরে গজরাইতে থাকে, মিছামিছি ছেলেগুলির এ কৃচ্ছ্র-সাধন কেন? এত কষ্ট করিয়া এ কিসের তপস্যা করিতেছে তাহারা? শিক্ষার, না জ্ঞানের, না পাস করার—না চাকরী করার? ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও সামনেই শিক্ষার আদর্শ নাই। ছাত্রদের একমাত্র চিন্তা পাস করিয়া সহরে চাকরী পাইব—শিক্ষকদের একমাত্র চিন্তা ইহাদের পাস করাইয়া চাকরী বজায় রাখিব। দেশ, বা ভবিষ্যৎ জাতি সম্বন্ধে তাঁহাদের যে এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব আছে সে কথা স্মরণ করাইতে গেলে হয় ত বা তাঁহারা চম্‌কাইয়া উঠিবেন।

ভূপেনকে ক্লাস সেভেন ও এইট-এ ইংরাজী এবং ইতিহাস পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। সে প্রথমটা পড়াইতে গিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। মোহিত বাবুর সংসর্গে আসিয়া শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণা হইয়াছিল—শিক্ষাসম্পর্কিত বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও তিনি পড়াইয়াছিলেন ভূপেনকে—কিন্তু পড়ানোর সে-সব পদ্ধতির সহিত এই ছাত্রগুলির পরিচয় মাত্র নাই—তাহারা শুধু অবাক্ হইয়া চাহিয়াই থাকে না, পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে না, হাসাহাসিও করে না। ভূপেন যায় তাহাদের পড়াটা বুঝাইয়া দিতে, কিন্তু এই বোঝানোটা যে কি পদার্থ সেইটাই বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অস্বস্তি বোধ করে। তাহাদের সেই বিস্মিত ও শূন্য-দৃষ্টির দিকে চাহিয়া ভূপেনের বুকের ভিতরটা ভারী হইয়া আসে—এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে কোন দিন যে সে ভাষা ফুটাইতে পারিবে, সে আশা আর রাখা যেন সম্ভব হয় না।

পড়াইতে আরম্ভ করার দিন-পনেরোর মধ্যে বার-কয়েকই এই শিক্ষকতা ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়াছে ভূপেন, কিন্তু তাহার পিতার বিলাপ এবং অবিনাশ বাবুর বিদ্রূপের হাসি কল্পনা করিয়া আবার মনকে দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছে। তা ছাড়া, সেখানে গিয়া করিবেই বা কি? এ তবু তাহার নেশার জিনিস, আশার জিনিসও বটে। সেখানে এখন ফিরিয়া গেলে ত সেই কেরাণীগিরি ছাড়া আর কোন পথ খোলা পাইবে না। সে যে কি ব্যাপার তাই বা কে জানে, সে যদি আরও অসহ্য বোধ হয়? তার চেয়ে এই ভাল—এখানে সে যদি একটি ছাত্রের মধ্যেও যথার্থ জ্ঞানের পিপাসা জাগাইতে পারে, যদি একটি ছেলেকেও অন্ধকারে আলোর সন্ধান দিতে পারে, তাহা হইলেও এ কষ্টভোগ, আত্মার এ অবমাননা হয় ত সার্থক হইবে।

ভূপেন একটা ব্যাপারে কিছু সুফলও পাইল। সে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সাধারণ জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় অথচ শিক্ষায়ও সাহায্য করে অন্ততঃ তাহাতে অনুরাগ বাড়ে এমন সব গল্প বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এবং সে ইচ্ছা করিয়াই পাঠ্য পুস্তকের অগ্রগতিকে সংহত করিয়া গল্পের সংখ্যা দিয়াছিল বাড়াইয়া। আর কোন ফল হউক না হউক—তাহার সম্বন্ধে বিস্ময়ের সহিত একটা যে বিদ্বেষ ও অপরিচয়ের ভাব ছিল ছেলেদের মন হইতে সেটা দূর হইয়া গিয়াছিল—এখন বরং তাহারা আগ্রহের সহিতই তাহার ক্লাসের অপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, ভূপেন দেখিল, শিক্ষকরা ছাত্রদের সম্বন্ধে যে অনুযোগ করেন, তাহারা বুঝাইয়া দিলে মনে রাখিতে পারে না বলিয়াই বাধ্য হইয়া তাঁহারা মুখস্থ করান, সেটা সম্পূর্ণ না হোক, অংশতঃ ভিত্তিহীন। কারণ, ভূপেন বহু দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, গল্পগুলি একবার মাত্র শুনিয়াই তাহারা মনে করিয়া রাখে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই সেটা আনুপূর্ব্বিক বেশ গুছাইয়া বলিতে পারে। যাহারা এটা পারে, তাহারা যে পড়াটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে মনে রাখিতে বা লিখিতে পারিবে না কেন—এ কথাটা ভূপেন কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

কিন্তু এ-ধারে সুফল পাইলে কি হইবে, বিপদ ও বাধা আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। হঠাৎ এক দিন রাত্রে আহারের পর মাঠে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া যতীন বাবু ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, ও মশাই, এ-ধারে শুনেছেন, ঐ অক্ষয় শালা আপনার নামে কি লাগিয়েছে মাষ্টার মশাই-এর কাছে?

ভূপেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। সে তাহার সহ-কর্ম্মীদের সহিত যথাসাধ্য সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারই করে, কোথাও কোন ঔদ্ধত্য বা দুর্ব্বিনয় প্রকাশ না পায় সে-দিকে তাহার খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল—কিন্তু এ আবার কি কথা? তাহার সম্বন্ধে কাহারও বিদ্বেষ পোষণ করার কথা ত নয়!

সে কহিল,—কৈ, না ত? আমি আবার কি করলুম?

যতীন বাবু অকারণেই গলাটা খাটো করিয়া কহিলেন,—আপনি না কি বড্ড ফাঁকি দেন ক্লাসে, পড়ার ধার দিয়েও যান না, কেবল গল্প করেন—এই সব। মাষ্টার মশাই সে কথা শুনে পদনকে ডেকে পাঠিয়ে আবার কত কি জিজ্ঞেস করলেন—

ক্রোধে ও ক্ষোভে ভূপেনের ললাটের শিরা দুইটা অসহ্য বেদনায় যেন টন্‌-টন্ করিতেছিল, সে যেন কতকটা নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রশ্ন করিল,—কী বললে পদন?

যতীন বাবু কহিলেন,—পদন আপনার খুব মুখরক্ষা করেছে। সে বললে, 'না, উনি গল্প ত এমনি করেন না, আমাদের পড়া বুঝিয়ে দেবার জন্য মাঝে মাঝে উদাহরণস্বরূপ দু-একটা গল্প বলেন।'

যতীন বাবু আরও কত কি বলিয়া গেলেন—তাহার একটি কথাও ভূপেনের মাথায় ঢুকিল না—সে শুধু একটা অসহ অথচ নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত অন্তরটা তাহার রি-রি করিতেছিল। যাহারা যথার্থ ফাঁকি দেয়, যাহাদের শিক্ষা বা শিক্ষকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ নাই, তাহারাই কি না অপরের ফাঁকি ধরিতে যায়! আশ্চর্য্য সাহস ত!

রাত্রে বিছানায় শুইয়া বিনিদ্র প্রহরগুলির ফাঁকে ফাঁকে বার বার মন স্থির করিবার চেষ্টা করিল—এ প্রহসনে আর প্রয়োজন নাই, এইখানেই শেষ করিয়া চলিয়া যাইবে সে। কিন্তু বার বারই মোহিত বাবুর কথাগুলি তাহাকে সে সংকল্প হইতে ফিরাইয়া দিল। মনে পড়িল, মোহিত বাবু একবার কী একটা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'বাবা, কর্ত্তব্যের সমস্ত দায়িত্ব বুঝে তা পালন করতে পারে, এমন কি করার চেষ্টাও করে, এ রকম লোক আমাদের দেশে খুব কম।' এ রকম তুচ্ছ কারণে হয় ত এই কথা প্রয়োগ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা, তবু সে এই কথাগুলি স্মরণ করিয়াই মনে বল পাইল। মোহিত বাবুকে সে শ্রদ্ধা করিত বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই যে এমন করিয়া মনে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে তাহা সে-দিন ছিল কল্পনারও অতীত।

পরের দিন সেক্রেটারী আসিলেন স্কুল দেখিতে। সেক্রেটারী স্থানীয় জমিদার, তাঁহারই অর্থে স্কুলের পাকা বাড়ী হইয়াছে। লোকটি না কি এক কালে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজেও ঢুকিয়াছিলেন, তার পর আর পড়াশুনা অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য তাহাতে সেক্রেটারী হইতে বাধে নাই, কারণ, তাঁহার অর্থবল ছিল এবং তিনিই গ্রামের মধ্যে একমাত্র লোক, স্কুলটি সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ আছে।

স্কুল দেখিতে আসিলেও তিনি কিন্তু অন্য কোথাও গেলেন না, আফিস-ঘরে বসিয়া দুই-একখানা কি চিঠি সই করিয়াই ভূপেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভূপেন তখন পাশের ঘরে অর্থাৎ শিক্ষকদের বসিবার ঘরেই ছিল, সে এ-ঘরে আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়ে যতীন বাবু প্রায় বিবর্ণ মুখে কহিলেন,—খুব সাবধান ভাই, দেখবেন। আপনার পড়ানো নিয়ে কথা উঠবে নিশ্চয়।

বিরক্তিতে ভূপেনের মন ভরিয়া গেল, তবু সে অতি কষ্টে চিত্ত দমন করিয়া শান্তমুখেই এ-ঘরে আসিল। সেক্রেটারী হাসি-হাসি মুখে অভ্যর্থনা করিলেন,—এই যে আসুন ভূপেন বাবু, কেমন লাগছে আমাদের দেশ? বসুন, বসুন—

ভূপেন সবিনয়ে নমস্কার জানাইয়া উত্তর দিল,—ভালই লাগছে। বেশ দেশ আপনাদের।

তার পর আরও দুই-একটা কুশল প্রশ্নের পর সেক্রেটারী কহিলেন, —সামনে এগজামিন আসছে, এখন অবশ্য পড়াশুনার কোন প্রশ্নই উঠে না—তবু রিভিসনটা বেশ থরো হওয়া দরকার। এই সময় একটু তাড়াতাড়ি করবেন, বুঝলেন? আপনাকে আর বেশী বলব কি, তবে আমাদের দেশের ছেলেরা বড় ব্যাকওয়ার্ড বোঝেন ত, সারা বছরের পড়াটা এই সময় আর একবার ঝালিয়ে না দিলে—বুঝলেন না? এটা পল্লীগ্রামের স্কুল বটে ত!

ভূপেনের কাণের কাছটা অকারণেই কতকটা গরম হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, যতীন বাবুর অনুমানই ঠিক। মুহূর্ত্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—দেখুন, আপনাদের এখানে যে সিষ্টেমে পড়ানো হয়, তা কোন দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন লোক মেনে নিতে পারে না। আপনি রিভিসনের কথা বলছেন, আমি ত দেখছি, তাদের আদৌ পড়ানোই হয়নি—সে ক্ষেত্রে রিভিসন কি করব বলুন।

হেডমাষ্টার ভবদেব বাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, পাশের ঘরের পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া যতীন বাবুর দল ভূপেনের আসন্ন সর্ব্বনাশের কথা চিন্তা করিয়া সেই শীতকালেই ঘামিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভূপেন তখন মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছে, সে যখন অন্যায় করে নাই তখন মাথা নীচু করিয়া তিরস্কার ত নয়ই, এমন কি, তাহার কোন প্রকার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত মানিয়া লইবে না।

সেক্রেটারী কতকটা স্তম্ভিত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—আ-আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ভূপেন কণ্ঠস্বরে বেশ জোর দিয়াই কহিল,—ছেলেদের পড়াটা বুঝিয়ে দেওয়াই হ'ল পড়ানোর আসল উদ্দেশ্য, অন্ততঃ আমরা তাই জানি, কিন্তু আপনারা এখানে দেখি বইয়ের খানিকটা জায়গা দেখিয়ে দেন, বড় জোর একবার নিজেরা রিডিং পড়ে দিয়ে সেটা বোঝবার এবং তৈরী করবার সমস্ত দায়িত্ব তাদের ওপরই ছেড়ে দেন। ফলে তারা কতকগুলো মানের বই দেখে রিডারগুলো পড়ে আর হিষ্ট্রী, জিওগ্রাফী—মাষ্টার মশাইরা যেটাকে ইম্পর্টেন্ট ব'লে দাগ দিয়ে দেন সেইগুলো মুখস্থ করে। তাই ওদের এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে, অঙ্কসুদ্ধ ওরা মুখস্থ করতে চায়। একে কি আপনি পড়ানো বলেন? এ পড়া ওদের কী কাজে আসবে? এরই ফলে আমরা আজ জাতি হিসাবে সর্ব্বত্র হটে যাচ্ছি। জেনে-শুনে ছেলেদের এ সর্ব্বনাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সেক্রেটারীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিল,—তাহ'লে এঁরা কি সবাই সর্ব্বনাশই করছেন এখানে বসে?

জেনে করছেন না। হয় ত এঁরা এত-সব কথা কোন দিন এ ভাবে ভেবেই দেখেননি—গতানুগতিক ভাবে বহু দিন থেকে যে প্রথায় পড়ানো চলে আসছে তারই পুনরাবৃত্তি করছেন মাত্র। কিন্তু আমি এ নিয়ে ভেবেছি, বহু বইও পড়েছি। শিক্ষা সম্বন্ধে ও-দেশে যে সব গবেষণা-আলোচনা চলছে তার সবটা না হোক্ খানিকটাও খবর রাখি। আমি যেটুকু পড়াচ্ছি সেটুকু যতক্ষণ না ছাত্ররা ভাল ক'রে এবং সহজে বুঝতে পারছে, ততক্ষণ আমি এগোতে পারব না। তাতে তাদের পরীক্ষায় ফল ভাল হোক্ না হোক্।

তাহার কঠিন কণ্ঠস্বরে সেক্রেটারী বোধ করি একটু দমিয়াই গিয়াছিলেন। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—কিন্তু পরীক্ষার পাস করাটাও ত দরকার, গরীব ছেলে এখানকার, একটা বছর নষ্ট হ'লে ক্ষতি হবে না কি?

ভূপেন জবাব দিল,—অন্য সাব্‌জেক্ট ত আছে, সেগুলোয় পাস করলে আমার সাব্‌জেক্টের জন্য আট্‌কাবে না। তা ছাড়া সারা বছরে অনেক মুখস্থ করেছে ওরা, তাতেই পরীক্ষা দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।···কিন্তু সে-দিক্ দিয়ে একটু অসুবিধা হলেও, আমার কাছে যতটুকু পড়ছে সেটুকু তাদের সত্যিকার কাজে আসবে।

তার পর একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অবিশ্যি আপনাদের যদি অসুবিধা হয় সে আলাদা কথা, সে ক্ষেত্রে কোন রকম সঙ্কোচ না করে বলবেন আমি নিঃশব্দেই সরে যাবো। কিন্তু পড়ানোর দায়িত্ব যতক্ষণ আমার ওপর থাকবে, ততক্ষণ আমার বিবেক অনুসারেই আমি চলবো, নিজেকে ফাঁকি দিতে পারব না। আচ্ছা, নমস্কার।

ভবদেব বাবুকেও একটা নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। [ক্রমশঃ।

ফুটবল লীগ-প্রতিযোগিতা

কলিকাতায় ফুটবল মরশুম চলিয়াছে। ফুটবল-পিয়াসী বাঙালীর কোলাহলে ময়দান এখন গুল্‌জার। লীগ-প্রতিযোগিতার প্রথম দফার খেলার পালা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। বিগত মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগ হইতে বিভিন্ন দলের শক্তি-সমৃদ্ধি সম্বন্ধে খেলোয়াড়মহলে ও ক্রীড়ানুরাগী জনসাধারণের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। বাঙলা এখন সকল বিষয়ের মত খেলার জগতেও দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। খেলার ধারার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়-মহলেও কলুষের ভাব দেখা দিয়াছে। এক খেলোয়াড় কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন দলের হইয়া প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, এ দৃষ্টান্ত অধুনা বিরল নহে।

এম, ডি, ডি

কিন্তু ক্লাব-প্রীতির অভাব বা অসহানুভূতি আসে কোথা হইতে? বাঙলার বাহির হইতে খেলোয়াড় আনার যে রেওয়াজ আছে, সে সংক্রামণা হইতে কেহ রক্ষা পায় নাই। জনপ্রিয় ও প্রবীণতম বাঙালী ফুটবল দল মোহনবাগান পর পর দুই বার লীগ-বিজয়ের গৌরব অর্জন করিয়াছে। এবার কিন্তু তাহারা অবাঙালী খেলোয়াড় আমদানীর লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। বুচী ও দেশমুখ ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে সুপরিচিত সন্দেহ নাই। তাহাদের আগমনে মোহনবাগান সমৃদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম দফার খেলার অবসানে তাহারা লীগ-তালিকার শীর্ষস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। এই দিকের শেষ খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের নিকট মোহনবাগান প্রথম পরাজিত হয়। এ বৎসরের এই প্রথম চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগানের বহু প্রশংসিত রক্ষণবিভাগের বিরাট্ ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনোবলের অভাবে জয়লাভ করা জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এক গোলে পশ্চাৎপদ হইয়া মোহনবাগানের খেলোয়াড়গণ এরূপ নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দুই গোলে লাঞ্ছিত হয়। ভবানীপুর ও মহমেডান স্পোর্টিংএর বিরুদ্ধে তাহারা অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করে। এই দুইটি খেলায় কোন গোল হয় নাই। একেবারে নবীন ও অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়গণ লইয়া গঠিত কালীঘাট মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ভাবে খেলা শেষ করিয়া বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। লীগের শ্রেষ্ঠ স্থান এখন ভবানীপুরের অধিকারে। এ যাবৎ কোন খেলায় তাহারা পরাজিত হয় নাই। প্রাক্তন মহমেডান দলের খেলোয়াড় তাজ মহম্মদ ও ইসমাইল এই দলের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। একমাত্র বি এণ্ড এ রেলদল ও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাহারা একটি করিয়া পয়েন্ট নষ্ট করিয়াছে। অবশ্য ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তাহাদের জয়লাভ নিতান্ত ভাগ্যক্রমে হইয়াছে বলিলে অন্যথা হইবে না।

ত্রিবাঙ্কুরে দক্ষিণ-ভারত ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় পরাজিত হইলেও ইষ্টবেঙ্গল ত্রিবাঙ্কুর হইতে চতুর ও নবীন খেলোয়াড় সালেকে সংগ্রহ করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের মহাবীর যোগদান করায় ও বহু বিতর্কের পর সোমানার পুনরাগমনে ইষ্টবেঙ্গল লীগে ক্রমে ক্রমে স্বীয় সুনাম বিস্তার করিবে বলিয়া মনে হয়। ভবানীপুরের বিরুদ্ধে অদৃষ্টের পরিহাসে তাহারা বিপর্য্যস্ত হয়। কালীঘাট ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাহারা আশাতীত ভাবে পয়েন্ট নষ্ট করিয়াছে। সম্পূর্ণ নূতন খেলোয়াড় লইয়া গঠিত ফুটবল-জগতে যুগান্তরকারী ইতিহাসের স্রষ্টা মহমেডান স্পোর্টিং সূচনায় খুব বেশী সুবিধা করিতে না পারিলেও শেষ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে দলগত সংহতি ও শক্তির প্রসার করিতেছে।

একমাত্র ভবানীপুর তাহাদের অপরাজয়ের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। নবাগত খেলোয়াড়গণের মধ্যে ব্যাকে করিম নওয়াজ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী। অ-ভারতীয় দলগুলির মধ্যে ক্যালকাটা এবার অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী। এক ভাবে অগ্রগতি বজায় করিতে না পারিলেও বর্ষার সঙ্গে তাহারা অবস্থার অশেষ উন্নতি করিবে বলিয়া আশা করা যায়। লীগের একমাত্র সামরিক দল ই সি সিগন্যালের খেলা মোটেই প্রশংসনীয় নহে। হীটন ব্যতীত আর কোন নিয়মিত খেলোয়াড় দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

গত বৎসরের আই এফ এ শীল্ড ও লাহোরের নিখিল ভারত অনুষ্ঠান মন্তেমোরেন্সী কাপ-বিজয়ী বি এণ্ড এ রেলদলের নিকট অনেক বেশী উন্নত স্তরের খেলা দেখার আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু এ যাবৎ তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই। লীগের সর্ব্বনিম্ন স্থানীয় পুলিশদল মাত্র একটি খেলায় জয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছে।

লীগ-তালিকা

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
ভবানীপুর	১১	৯	২	০	২৬	৫	২০
মোহনবাগান	১২	৮	৩	১	২৩	৬	১৯
ইষ্টবেঙ্গল	১২	৭	৪	১	২৬	৪	১৮
মহঃ স্পোর্টিং	১২	৭	৪	১	২৮	৭	১৮
ক্যালকাটা	১২	৮	০	৪	২০	১৫	১৬
বি এণ্ড এ রেল	১১	৫	৩	৩	১৯	১১	১৩
এরিয়ান্স	১১	৪	৩	৪	১৯	১৫	১১
স্পোর্টিং ইউ	১২	৩	৩	৬	৯	১৭	৯
কালীঘাট	১০	২	৪	৪	৭	১৫	৮
ই সি সিগন্যাল	১২	৩	০	৯	১১	৩৩	৬
রেঞ্জার্স	১০	২	২	৬	৪	১৯	৬
ডালহৌসী	১২	১	১	১০	৮	৩০	৩
পুলিস	১১	১	০	১৯	৪	২৪	২

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমাদের হেড-মাষ্টার ৺বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেড-পণ্ডিত ৺শ্রীপতি কবিরত্ন মহাশয়ের উপদেশে ভালো করে' ইংরেজী ভাষা শেখার জন্ম একটি সমিতি গড়া হলো—জুভেনাইল এসোসিয়েশন। সে-সমিতিতে আমাদের ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখে পড়তে হতো—ইংরেজীতে ডিবেট্‌ হতো। তার পর এন্‌ট্রান্স পাশ করে আমরা কলেজে ঢুকলেও এসোসিয়েশনের মায়া কাটাতে পারলুম না। তখন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে কলেজের ছাত্র আমরা মিলে-মিশে গেলুম। আমাদের এসোসিয়েশনে নেবার জন্ম সমিতির নাম বদলে নাম দেওয়া হলো—এক্সেলশিয়র ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বহু বহু দ্বার যেন খুলে গেল—জীবনকে গড়ে তোলবার কত উপায়ের সন্ধান আমরা পেলুম।

তখন কলকাতায় এসেছেন সিষ্টার নিবেদিতা। এ দেশের উপর তাঁর মায়া কি! কিশোরদের উপরও ছিল তাঁর মায়ের মতো স্নেহ-মমতা! ভয়ে ভয়ে আমরা ক'জন মিলে তাঁর সঙ্গে এক দিন দেখা করতে গেলুম—সেই বাগবাজারে। যাবা মাত্র দেখা পেলুম। আর কি যত্নই করলেন। আমরা ইউনিয়নের কথা বললুম। আমাদের কথায় তিনি এসে আমাদের অধিবেশনে এক দিন সভানেত্রীত্ব করলেন। বললেন, প্রায় আসবেন। আমাদের যেতে বললেন তাঁর কাছে। তিনি আমাদের সমিতিতে এসে প্রাচীন ইতিহাস, ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম-সংস্কৃতির গল্প বলতেন। সে সব গল্প শুনে আমাদের মনে জাগলো জাতীয়তা-বোধ। ভাবলুম, কি দুঃখে ফিরিঙ্গি হবো! আমাদের অতীত এমন উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎকে আবার আমরা উজ্জ্বল করে' তুলবো। তিনি বলতেন,—সেবা-ধর্ম্মের চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর নেই। বলতেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা মনে রেখো! তিনি সখেদে বলে গেছেন, what man has made of man! মানুষকে তোমরা করো তোমাদের দেবতা। সব মানুষের মধ্যে ভগবান বিরাজ করেন। কোনো মানুষকেই কোনো দিন ছোট ভেবো না—মানুষকে অবজ্ঞা করো না। তাঁর কৃপায় শ্রীশ্রীপরমহংসদেব এবং বিবেকানন্দ স্বামীর পরিচয় যেন নূতন করে' লাভ করলুম। মনে হলো, বিবেকানন্দ স্বামীজীকে কায়মনোবাক্যে মেনে চলতে পারলে আমাদের ওঠবার আশা দুরাশা হবে না। আমাদের তিনি পড়তে দিতেন স্বামীজীর লেখা। সিষ্টারের লেখা The Web of Indian Life বইখানি কি মন দিয়েই না পড়েছি! তাঁর স্নেহ-উপদেশে আমাদের কিশোর-জীবন ধন্য হয়েছিল। অন্ধকারের জীব আমাদের মনে আলোর চমক জেগেছিল। এবং তিনি বুঝিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ স্বামী যে মন্ত্র প্রচার করেছেন—কর্ম্ম-মন্ত্র—সেই কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষা নিলে আবার আমরা জাগবো! এ-যুগে ধ্যানতন্ময়তা বা বৈরাগ্য চলবে না—সারা পৃথিবীতে কর্ম্মের সাড়া জেগেছে—কর্ম্মী হতে হবে। ভারতের আদর্শ শিরোধার্য্য করে' কর্ম্মক্ষেত্রে নামা চাই! সিষ্টারের উপদেশে আমাদের ইউনিয়নে বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ লেখা এবং আলোচনাদি সুরু হলো। এবং আমার বেশ মনে আছে, বন্ধুবর ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ইউনিয়নের এক অধিবেশনে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন—'সন্ন্যাসী'। এ অধিবেশনে সিষ্টার নিবেদিতা ছিলেন সভানেত্রী! বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষও (সেই ছাত্র-জীবনেই) একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। প্রবন্ধের নাম মনে আছে Natural Man; প্রবন্ধটি বাঙলা ভাষায় তিনি রচনা করেছিলেন। আমাদের ছোটদের হাতে লালিত হলেও এক্সেলশিয়র ইউনিয়ন তখনকার দিনের সম্ভ্রান্ত বহু সুধীজনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় আমাদের নিমন্ত্রণে ইউনিয়নের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০২ জুলাইয়ে বিবেকানন্দ স্বামী দেহত্যাগ করেন। ইউনিয়নের উদ্যোগে স্মৃতিসভা হয়। সে-সভায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা এনেছিলুম সভাপতি করে' (১৩ই জুলাই ১৯০২)। তিনি বলেছিলেন,—প্রবন্ধ লিখে সভায় পাঠ করেছেন চিরদিন—বক্তৃতা কখনো করেননি। স্বামীজীর উপর তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা। স্বামীজীর উপদেশ এ যুগে আমাদের সর্ব্বথা শিরোধার্য্য করা চাই—তিনি যে যুগধর্ম্ম প্রচার করেছেন, সেই ধর্ম্মই আমাদের অবলম্বন করতে হবে। বলেছিলেন, পাশ্চাত্য রীতিতে মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপনা করে বা তৈলচিত্র ঝুলিয়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষা করা নয়; তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ মেনে চললে তবেই হবে তাঁর স্মৃতির সম্মান-রক্ষা। নিজেদের মানুষ করে' তোলা চাই। তিনি সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, প্রবন্ধ পাঠ করেননি। এ গৌরব এর আগে কোনো সমিতি লাভ করেনি।

সিষ্টার নিবেদিতা

[ক্রমশঃ]

শ্রীতারানাথ রায়

সোভিয়েট-ভীতি—

১১ বৎসর পূর্ব্বে প্যারির 'Vu' পত্রে বিশিষ্ট ফরাসী লেখক Drieu la Rochelle ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"If the bourgeoisie of the West triumphs over Germany, then Russia is bound to triumph too. The bourgeois armies of the West will enter Germany only to find the Red Army setting up soviets."
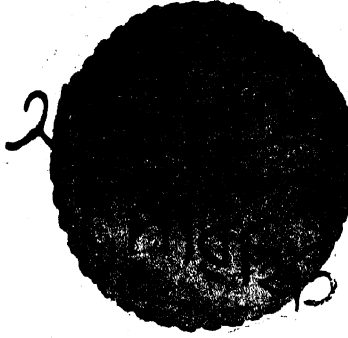
জার্ম্মাণীর আত্মসমর্পণের পর রুশিয়া যেন এই সাংবাদিকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিতেছে। রুশিয়া আপন অধিকৃত মণ্ডলের মধ্যে বৃটেন বা আমেরিকাকে প্রবেশই করিতে দিতেছে না। ৬ই জুন বার্লিনে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ-পরিষদের বৈঠকে মার্শাল ঝুকোভ স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, রুশ-অধিকৃত অঞ্চল হইতে বৃটিশ বা মার্কিণ সৈন্য সম্পূর্ণ অপসারিত না হইলে রুশিয়া বৈঠকে যোগই দিবে না। মিঃ চার্চ্চিলের সাধের "Our great ally" প্রতি পদে যে এংলো-স্যাক্সন প্রচেষ্টায় বাধা দিবে, এ কল্পনাও কেহ করিতে পারে নাই। বস্তুতান্ত্রিক রুশিয়া পোল-সমস্যা সম্বন্ধে একটুও আপোষ করিল না। স্বগৃহে পুনর্গঠন এবং পরাজিত জার্ম্মাণীর ধ্বংসস্তূপ অপসারণ-কার্য্যে যেন রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতই অপরিহার্য্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ যেমন ভারতীয় সমস্যাকে তাহার ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া গণ্য করে, রুশিয়াও তেমনি পোল্যাণ্ড ও পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীকে তাহার নিজস্ব সমস্যা বলিয়া মনে করিতেছে। রুশিয়া বরাবরই বলিয়া আসিতেছে যে, সে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের পৃথক্ অস্তিত্ব লোপ করিবে না। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, শীত পড়িতে পড়িতে য়ুরোপের শস্যভাণ্ডার যখন শূন্য হইয়া আসিবে, তখন য়ুরোপে আবার অশান্তি দেখা দিবে।

রুশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিণ সম্পর্কে যেন একটা স্পষ্ট গোল বাধিয়াছে। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের' কূটনৈতিক সংবাদদাতা (৩১শে মে) লিখিতেছেন—"রুশিয়ার ইহাই মনোভাব যে, রুশ-প্রভাব-মণ্ডলে অন্য কোন শক্তি যেন হস্তক্ষেপ না করে, রুশিয়াও তাহাদের প্রভাব-মণ্ডলে হস্তক্ষেপ করিবে না। এ অঞ্চলে রুশিয়া কি করিতেছে বা কি করিতে চাহে, অন্ততঃ সে সংবাদটুকু ত বৃটেন ও আমেরিকার জানা দরকার। কিন্তু পূর্ব্ব-য়ুরোপে কি হইতেছে তাহার কোন সংবাদই প্রচারিত হইতেছে না। বন্দোবস্ত যাহা হইতেছে তাহা গোপনে গোপনে। পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত না কি ইয়াণ্টা বৈঠকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ভাবে স্থির করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার পৃথক্ আর কোন অস্তিত্ব নাই। রুশিয়ার ও পোল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী যে সীমারেখা ছিল তাহা যেন লুপ্ত হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থাও কতকটা যেন তাহাই।" রুশিয়ারও অভিযোগ, মিত্ররা ঠিক মিত্রের মত ব্যবহার করিতেছে না। সে জানাইতেছে, লণ্ডনস্থ পোল সরকার না কি সোভিয়েট য়ুনিয়নের বিরুদ্ধে ইংরেজ জাতির মন তৈয়ারী করিয়া দিতেছে। মস্কো বেতারকেন্দ্র স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছে, লণ্ডনস্থ পোলরা "openly preached Anglo-Soviet war, pleading with the British to make a military alliance with Germany."

ইঙ্গ-রুশ-পাঁয়তারা—

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক মিঃ এইচ, জি, ওয়েলস 'ডেলি ওয়ার্কার' কাগজে লিখিয়াছেন—আমি বেশ জানি যে, রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইবার জন্য বৃটেন ও আমেরিকা গোপন আন্দোলন চালাইতেছে। এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জানিবার প্রমাণ কি তা অবশ্য প্রকাশ করা হয় নাই। তবে ইহারই মধ্যে রুশিয়ার বিরুদ্ধে নানা রকমের অপপ্রচার সুরু হইয়া গিয়াছে। রুশিয়া না কি কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, আর ফরমোজা দাবী করিয়াছে। রুশিয়ার তরফ হইতে ইহার অবশ্য প্রতিবাদ হইয়াছে। ভারত সম্বন্ধে ইংরেজের মনোভাবে রুশিয়ার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে বলিয়া বৃটিশ অধ্যাপক হেরল্ড লাস্কী মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পশ্চিম-এশিয়ায় গোল কেন?—

পশ্চিম-এশিয়ায় সিরিয়া ও লেবাননকে কেন্দ্র করিয়া গোল পাকিয়া উঠিয়াছে। রুশমিত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সিরিয়া তথা আরব জাতিগুলিকে উত্তেজিত করা হইতেছে।

এই গোলমালের মূলে আছে পেট্রোল। ১ম মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণরা মেসোপোটামিয়ায় টার্কিশ অয়েল কোম্পানীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিল। এ সময় তৎকালীন বৃটেন নৌসচিব মিঃ চার্চ্চিলের পরামর্শে পারস্যে এংলো-পারসিয়ান অয়েল কোম্পানীর বেশীর ভাগ শেয়ার কিনিয়া ফেলে। দ্বন্দ্ব ঐ সময় হইতেই। ইংলণ্ড ও আমেরিকা আজ পারস্যোপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের তট পর্য্যন্ত আরবী তৈলখনিগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া এ অঞ্চল হইতে তিন হাজার মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধের জন্য তৈল সংগ্রহ করিতে চাহে। এ জন্য আরব জাতিগুলির আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যক্ষ বাধা দিতে মিত্রপক্ষ চাহিতেছে না। এ সকল অঞ্চল পূর্ব্বে ফরাসী শাসন-নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু আজ সিরিয়া বলিতেছে, সিরিয়াকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ফ্রান্সের আর এই শাসন-কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। বৃটেন উভয় দলকে থামাইয়া রাখিতে চাহে। যে অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিণ জাতির প্রাণ-শোণিত সংরক্ষিত, সে স্থানের জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করিতে ইংলণ্ড বা আমেরিকা কেহই চাহে না, ইহাতে যদি সাময়িক ভাবে ফ্রান্সের সহিত বিচ্ছেদ হয় সে-ও ভাল।

রুশ-জাপ সম্পর্ক—

জেনারেল ষ্টিলওয়েল মনে করেন যে, "even if Russia declares war on Japan it would make little immediate difference." কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে ষ্ট্যালিন এখনও জেহাদ ঘোষণা করেন নাই। জাপানীরা তাই বলিয়াছে,

এ যুদ্ধ চলিবার কালে জাপান ও সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা চুক্তির মর্য্যাদাহানি যে কোন অছিলাতেই করেন নাই, তাহা ভবিষ্যতে সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে রাখিবে।

গুজব প্রবল যে, মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্ম জাপান তাহার মিত্র রুশিয়ার উপর ভার দিয়াছে। জাপানের প্রতি রুশিয়ার কেমন যেন একটা আকর্ষণের আভাস নানা ব্যাপার হইতে পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, বার্লিন চুক্তির সর্ত্ত ছিল, অধিকৃত জার্ম্মাণীতে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধ জাতির সকল ব্যক্তি ও সম্পত্তিকে মিত্রপক্ষের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। রুশরা শেষ মুহূর্ত্তে সর্ত্তের এমন একটি সংশোধনের প্রস্তাব করে, যাহাতে জার্ম্মাণীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে ধৃত কোন জাপানীকে মিত্রপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইবে না।

রুশিয়ার এই জাপ-প্রীতি ঠিক "মুর্গী পোষার" মত কি না ঠিক বলা যাইতেছে না, তবে এরূপ আয়োজন যেন সুস্পষ্ট যে, রুশিয়া পশ্চিমে যেমন বাল্‌টিক হইতে এড্রিয়াটিক তট পর্য্যন্ত সোভিয়েট মিত্র-রাষ্ট্র সংগঠনের জন্য ব্যাপক আয়োজন করিতেছে, তেমনই পূর্ব্ব দিকে রণধর্ম্মী জাপানের সহিত যুদ্ধ ইংরেজ ও আমেরিকার হাতে ছাড়িয়া দিয়া মেরু-সাগরের তট হইতে বঙ্গোপসাগরের তট পর্য্যন্ত স্থানে সোভিয়েট-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। চিয়াং কাইশেক-পন্থী চীনের উপর তাহার আস্থা নাই, তাই চিয়াং পদত্যাগ করিয়া শ্যালক সুংকে প্রধান-মন্ত্রিত্ব দান করিয়া রুশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের যেন চেষ্টা করিতেছেন।

চীনে প্রসিদ্ধ সাংবাদিকরা বলিতেছেন—য়েনানে চীনা কম্যুনিষ্ট সরকারকে রুশিয়া মানিয়া লইবার জন্ম যে আয়োজন করিতেছে, তাহাতে মার্কিণ পররাষ্ট্র বিভাগের আশঙ্কা হইতেছে—Moscow may create another problem like that of Poland by deciding to support a Red regime in China.

প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের হেঁদো কথা—

প্রাচ্যখণ্ডে এংলো-স্যাক্সন জাতিদ্বয়ও আপনাদের প্রভাব প্রসার করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এশিয়া শ্বেতাঙ্গদের লুণ্ঠন-ভূমি। তাই শ্বেত জাতিদের আন্তরিকতায় এশিয়াবাসী সন্দিহান্। ভারত স্বাধীনতা চায়; ব্রহ্ম স্বাধীনতা চায়; ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জও পরাধীন থাকিতে চাহে না। কিন্তু এ সকল দেশকে সানফ্রান্সিস্কোর বৈঠকীরা তাহারা নিজেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, সে প্যাটার্ণের স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিতে চাহে না; বড় জোর দিতে পারে—"স্বায়ত্ত-শাসন"। কারণ, এসিয়ার এ সব দেশের পৃথক্ সত্তা নাই। যথা—ভারত বৃটেনের সম্পত্তি, কাজেই ভারত আন্তর্জ্জাতিক অছিদের তত্ত্বাবধানে যাইতে পারে না।

বৃটিশ কমনস্ সভা বর্ম্মা বিল পাশ করিয়া বলিয়াছে যে, জাপকবলমুক্ত ব্রহ্মদেশকে যথাসম্ভব শীঘ্র ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইবে (স্বাধীনতা নহে)। জাপান্ ব্রহ্মদেশ দখল করিবার পূর্ব্বেই এক দল বর্ম্মী যুবক জাপানে গিয়া 'স্বাধীন ব্রহ্মের' এক সৈন্যদল গঠন করে। ব্রহ্মের জাপনিয়ন্ত্রিত 'বা-ম' সরকার এই ফৌজের নাম দেয় Burma Defence Army। ব্রহ্মে জাপান হারিতে আরম্ভ করিলে এই সৈন্যদল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখা হয়—বর্ম্মা ন্যাশন্যাল আর্ম্মি। এখানে Burma Patriotic Front নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহা ফ্যাসিজম্‌বিরোধী; কম পক্ষে ১০টি রাজনৈতিক দলের মিশ্রণে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। রাজনৈতিক দলগুলি এই (১) মং-থান-তুণের নেতৃত্বে বর্ম্মার কম্যুনিষ্ট দল, (২) ছাত্রদল, পিপল্‌স্ রিভোলিউশনারী পার্টি, (৩) অধুনা দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্দী ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী উ-স'র ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টি, (৪) বর্ম্মা ফেবিয়ান পার্টি, (৫) থাকিন পার্টি (এই দলই না কি জাপানের সহিত সহযোগিতা করে), (৬) বর্ম্মা ন্যাশন্যাল আর্ম্মি, (৭) ইয়ুথ লীগ অব বর্ম্মা, (৮) ডাঃ বা-ম'র মহা-বামা দল (বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট), (৯) ফুঙ্গিসঙ্ঘ, এবং (১০) ওমেনস্ ফ্রিডম লীগ। ব্রহ্মের যুব-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা বৃটেনের এই সাম্রাজ্যবাদী স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ হইবে কি? সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ তথা শ্রমিকদল অনুভব করিয়াছেন যে, বর্ম্মীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে না, তাই পরামর্শ দিয়াছেন, 'রহ ধৈর্য্যম্।'

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যদি জাপকবল-মুক্ত হয়, তাহা হইলে দ্বীপগুলি সম্বন্ধে ওলন্দাজ সরকার কি trusteeship নীতি অবলম্বন করিবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ওলন্দাজ প্রধান মন্ত্রী সোজাসুজি বলিয়াছেন—না। দ্বীপগুলি নেদারল্যাণ্ডসের বাহিরে নয়, সুতরাং স্বাধীনতার প্রশ্ন অবাস্তর।

সুতরাং যে প্রাচ্যখণ্ড, স্বজনের ক্ষুধার গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাহাদের অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধের রসদ যোগাইল, সে যে মাত্র 'ধন্যবাদ' বকশিস্ পাইয়া 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' বলিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্ম ধ্যান-নির্ব্বাক্ রহিবে, এ আশা করা বাতুলতা।

—বহুরূপী চার্চিল—

বস্ত্র-সঙ্কট ও সরকার।

বরাদ্দ-ব্যবস্থায় মাথা-পিছু কি পরিমাণ কাপড় পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা, তৎসম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ বিবৃতি যে প্রামাণ্য নয়, তাহা জানাইবার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে সম্প্রতি একটি প্রেসনোট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেসনোটে বর্ণিত প্রামাণ্য বিবরণ পড়িয়া বাঙ্গালার অধিবাসীদের যে হাস্য-অশ্রু-পুলক-কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিকী ভাববিকার উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাপড়ের বরাদ্দ-ব্যবস্থা কবে প্রবর্তিত হইবে মাথা-পিছু কি পরিমাণ কাপড় পাওয়া যাইবে, তাহা জানিবার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের কথা উপলব্ধি করিয়াই বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ এই প্রেসনোট প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে যে-সকল প্রামাণ্য বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের আগ্রহ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে! মাথা-পিছু কতখানি কাপড় পাওয়া যাইবে, সে তো অনেক দূরের কথা, কাপড়ের বরাদ্দ-ব্যবস্থা যে কবে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাই এখন পর্য্যন্ত ঠিক নাই। বাঙ্গালার অধিবাসীদের আশ্বস্ত হইবারই কথা বটে! গত মার্চ্চ মাসে নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলী যখন বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন মিঃ সুরাবর্দ্দীর মুখে আমরা শুনিয়াছিলাম, ছয় সপ্তাহের মধ্যে বাঙ্গালায় কাপড়ের বরাদ্দ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং পুরা বরাদ্দ-ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত একটা সাময়িক ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত না করিয়া তাঁহারা ছাড়িবেন না। ছয় সপ্তাহ অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। ৭ই মে হইতে কাপড়ের অস্থায়ী বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কাপড় পাইবার সৌভাগ্য কাহার হইয়াছে তাহা কিছুই আমরা জানিতে পারি নাই। সারা কলিকাতায় দুই হাজার গাঁইট কাপড় একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া বণ্টন করিলেও অনেকের ভাগেই জুটিবে না। অনুমোদিত দোকানের সম্মুখে বিজ্ঞাপন ঝুলান আছে—'পারমিট ও রেশন কার্ড আনিলে কাপড় দেওয়া হয়।' সামান্য কিছু কাপড়ও দোকানে সাজান আছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই! এ যেন একটা নিয়ম-রক্ষা গোছের ব্যবস্থা! শুনিয়াছিলাম, জুন মাসে কাপড়ের রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। তার পর শুনিলাম, জুলাই মাসের মাঝামাঝি রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। সরকারী প্রেসনোট হইতে প্রামাণ্য ভাবে জানা যাইতেছে যে, কবে রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে তাহাই এখন পর্য্যন্ত ঠিক নাই। সুতরাং আমাদের আর কাপড় পাওয়ার বাকী রহিল কি?

আলোচ্য প্রেসনোটে অনেক কথাই গভর্ণমেন্ট দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন, শুধু এক বরাদ্দ-ব্যবস্থা কবে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা ছাড়া। প্রথমতঃ বণ্টনের জন্য কাপড় পাওয়া যে-কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহা বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে। যে-পরিমাণ কাপড় এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় আসিয়া পৌঁছান উচিত ছিল তাহা পৌঁছে নাই। বাঙ্গালার জন্য কাপড়ের যে কোটা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে তাঁতের কাপড়ও আছে প্রচুর পরিমাণে। হাজার হাজার তাঁতির নিকট হইতে এই সকল তাঁতের কাপড় সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রেসনোটে দৃঢ়তার সহিত আরও জানান হইয়াছে যে, কাপড় সম্পর্কে বাঙ্গালার প্রাপ্য অংশ লাভের জন্য, মজুতদারদের মজুত কাপড় উদ্ধারের জন্য, যত দূর সম্ভব শীঘ্র কাপড়ের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। চেষ্টা করিতে করিতে তো কয় মাস কাটিয়া গেল, আরও কয় মাস কাটিবে কে জানে? গত সেপ্টেম্বর মাস হইতেই বাঙ্গালায় কাপড়ের অভাব তীব্র ভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ইহার জন্য চোরাবাজারের উপর দায়িত্ব চাপাইতেও আমরা দেখিয়াছি। অবশ্য চোরাবাজারই যে কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গভর্ণমেন্ট এত দিন চোরাবাজার দমন করিতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন নাই, কাপড়ের বরাদ্দ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ঔদাসীন্য ও আত্মসন্তুষ্টির ভিতর দিয়াই দীর্ঘ দিন সরকারের কাটিয়াছে। অনেক বিলম্বে সরকার মজুত কাপড় উদ্ধার ও আটক করিবার কাজে মন দিলেন, কিন্তু বণ্টনের কোন ব্যবস্থাই করা হইল না। সরকার জানাইয়াছিলেন, চোরাবাজার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই কাপড় আটক করা হইতেছে। ফলে এই হইয়াছে যে, সরকার কাপড় আটক করিয়াছেন বটে, কিন্তু চোরাবাজার বন্ধ হয় নাই। এখনও চোরাবাজারে কাপড় পাওয়া যায় বলিয়া শোনা যায়, তবে সরকার কাপড় আটক করার ফলে চোরাবাজারে কাপড়ের দাম না কি দ্বিগুণ তিন গুণ বাড়িয়া ৩০।৪০ টাকা জোড়া হইয়াছে। চোরাবাজারে কাপড় কোথা হইতে আসে, ইহা যেমন সত্যই এক সমস্যা, ভারত গভর্ণমেন্টের টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেলোডী বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় কাপড়ের দুর্ভিক্ষ হয় নাই। কিন্তু বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের প্রেসনোট হইতে বুঝা যাইতেছে, বাঙ্গালায় কাপড়ের অভাব এত বেশী যে, বণ্টন-ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। দুর্ভিক্ষ আর কাহাকে বলিব? কিন্তু আমরা দুর্ভিক্ষ বলিলে কি হইবে। যতক্ষণ না চার্চ্চিল আমেরী-কোম্পানী ইহাকে দুর্ভিক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, ততক্ষণ 'অফিসিয়ালি' দুর্ভিক্ষ হয় নাই, ইহাই মনে করিতে হইবে।

তেরশ' পঞ্চাশ সালের চাউলের দুর্ভিক্ষ হওয়া সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পুনরভিনয়ই এবার কাপড়ের দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাইতেছি। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট এবং বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট উভয়েই নিজ নিজ ঘাড় হইতে দায়িত্ব অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঙ্গালা কি পরিমাণ কাপড় পাইয়াছে তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট এবং বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে প্রদত্ত বিবৃতি এখানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ২৫শে মার্চ্চ হইতে দৈনিক

দুই হাজার গাঁইট করিয়া কাপড় বাঙ্গালায় পাওয়ার কথা। এই বরাদ্দ অনুসারে বাঙ্গালা দেশে ৩১শে মে পর্য্যন্ত ৩৫ হাজার গাঁইট কাপড় আসিয়াছে। কিন্তু প্রেসনোটে বলা হইয়াছে,—"এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ কাপড় আসিয়া পৌঁছান উচিত ছিল, তাহা পৌঁছে নাই।" কিন্তু কি পরিমাণ কাপড় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ২৫শে মার্চ হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত পাইয়াছেন, তাহা প্রেসনোটে জানাইয়া দেওয়া হয় নাই কেন? ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যাহা বলিবেন, তাহার উত্তর দিবার জন্ত একটা ফাঁক রাখিবার উদ্দেশ্যেই কি এইরূপ অস্পষ্ট উক্তি করা হইয়াছে? অতঃপর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের এই অভিযোগের উত্তরে কি বলেন, তাহা অবশ্যই আমরা শুনিতে পাইব। কিন্তু তাহাতে তো আমাদের বস্ত্রাভাব দূর হইবে না। গত দুর্ভিক্ষের সময় যেমন মফঃস্বল হইতে প্রত্যহ চাউলের অভাবের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, এবার তেমনি নানা স্থান হইতে কাপড়ের অভাবের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় যেমন দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা আমরা দেখিয়াছি, বর্ত্তমানেও তেমনি দায়িত্ব এড়াইবার প্রয়াসই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গত দুর্ভিক্ষের মত এবারও চলিতেছে শুধু অব্যবস্থা। সরকারী ব্যবস্থা যে-ভাবে গদাইলস্করী চালে চলিতেছে, তাহাতে কাপড়ের রেশন-ব্যবস্থা কোন্ দিন প্রবর্ত্তিত হইবে সে-সম্বন্ধে কোন ভরসাই আমরা করিতে পারিতেছি না। তবে বিদেশ হইতে কাপড় আমদানির যে কথা আমরা শুনিতেছি, তাহা হয়ত এক দিন সার্থক হইয়া উঠিতে সকলেই দেখিতে পাইবে। যে-দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিয়া গেল, সে-দেশের জনগণকে বস্ত্রহীন করিয়া রাখা বিদেশী শাসকবর্গের পক্ষে কঠিন না হওয়ারই কথা।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে "স্বার্থসংশ্লিষ্টদল কর্ত্তৃক ভারতীয় শিল্পকে পঙ্গু করিবার এবং কৃত্রিম উপায়ে এ-দেশে দারুণ বস্ত্র-সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া বিদেশ হইতে আমদানী মাল বিক্রয় করিবার" সম্ভাব্য প্রচেষ্টায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের মধ্যে যে আশঙ্কা সূচিত হইতেছে, তাহা যেমন তাৎপর্য্যপূর্ণ, তেমনি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। হায়দারী মিশন বিলাতে যাইয়া তথা হইতে ভারতে কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কাপড়ের পূরা রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে গভর্ণমেণ্টের এই বিলম্ব দেখিয়া এই আশঙ্কাই কি লোকের মনে জাগ্রত হইবে না যে, রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্ত বিলাত হইতে কাপড় আসার প্রতীক্ষাই গভর্ণমেণ্ট করিতেছেন? রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে দেশী-ই হউক আর বিদেশী-ই হউক, যে কাপড় গভর্ণমেণ্ট দিবেন, তাহাই গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকিবে না। উল্লিখিত প্রস্তাবেও এই আশঙ্কাই সূচিত হইতেছে। এই আশঙ্কা যদি সত্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের এই বস্ত্র-সঙ্কট যে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাও সত্য। বর্ত্তমানে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে যে পরিমাণ কাপড় তৈয়ার হইতেছে, তাহাতে অনায়াসেই ভারতের প্রয়োজন মিটিয়া যাইতে পারে, যদি বিদেশে কাপড় রপ্তানী করা না হয়। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশে ভারতীয় কাপড় প্রেরণ করিতেছেন। ইহাই বস্ত্রাভাবের একটা প্রধান কারণ। বস্ত্রের এই অভাব সত্ত্বেও কাপড়ের দুর্ভিক্ষ আমাদের হইত না, যদি আমাদেরই দেশের মিল-মালিক এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা চোরাবাজার সৃষ্টি না করিতেন। ভারতবাসী আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দেশী কাপড় কিনিয়াছে এবং ভারতের বস্ত্র-শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইয়াছে, বর্দ্ধিত করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে সুযোগ পাইয়া কাপড়ের কলের মালিকগণ এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা তাহাদের স্বদেশবাসীকে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছেন। তাঁহাদের অতিলোভই কি বিদেশী বস্ত্র আমদানীর অন্যতম কারণ নহে? ভারতের বস্ত্র-শিল্প যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থবাদীদের অপেক্ষা ভারতের কায়েমী স্বার্থবাদীরা উহার জন্ত কম দায়ী হইবেন না।

দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা

যুদ্ধের পরে ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তনের জন্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া কিছু দিন পূর্ব্বেই শোনা গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এবং বণিক্-সমিতির সহিত এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যে পত্র-ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতেই এই মুদ্রা-পরিবর্ত্তন পরিকল্পনার মোটামুটি বিবরণ জানিতে পারা যায়। বোম্বাই হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্ট দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমতও জানিতে চাহিয়াছেন। যুদ্ধের পরে প্রচুর পরিমাণে টাকা ও খুচরা মুদ্রা ভারত গভর্ণমেণ্টকে তৈয়ার করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই সুযোগে ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রচলন করিতে ইচ্ছুক। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে খুচরা মুদ্রার বিপুল চাহিদা মিটাইবার জন্ত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে নূতন 'দুই আনী', 'এক আনী', 'ডবল পয়সা' এবং 'এক পয়সার' প্রচলন করেন। যুদ্ধের জন্ত নিকেল এবং টিনের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সকল খুচরা নূতন মুদ্রা নিকেল এবং পিত্তলের সংমিশ্রণে তৈয়ার করা হইয়াছে। এই নূতন মুদ্রাগুলিকে যে শুধু জনগণই অপছন্দ করিয়াছে তাহা নয়, জালমুদ্রা তৈয়ারীর অনেক সুবিধা হইয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন। ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় বাসনপত্রের অধিকাংশ পিতল দ্বারা তৈয়ার করা হয়। সুতরাং এই সকল নূতন মুদ্রা জাল হওয়ার পক্ষে যেমন সুবিধা আছে, তেমনি উহাতে পিত্তলেরও যথেষ্ট অপচয় হয়। যুদ্ধের পরে গভর্ণমেণ্ট খুচরা মুদ্রাগুলি আবার নিকেল-মিশ্রিত তামা দ্বারা তৈয়ার করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষে পয়সাকেও নূতন রূপ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে এক টাকা ১৯২ পাইয়ে বিভক্ত। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় এক টাকা ১০০ সেণ্টে অথবা ২০০ অর্দ্ধ সেণ্টে বিভক্ত হইবে। টাকা এখন যেমন আছে তখনও তেমনি থাকিবে। আধুলী এবং সিকি আকারে ও ওজনে বর্ত্তমানের মতই থাকিবে, কিন্তু নামের পরিবর্ত্তন হইবে। আধুলীর নাম হইবে ৫০ সেণ্ট এবং সিকির নাম হইবে পঁচিশ সেণ্ট। সিকির পরবর্ত্তী খুচরা মুদ্রাগুলির নাম হইবে যথাক্রমে ১০ সেণ্ট, ৫ সেণ্ট, ২ সেণ্ট, এক সেণ্ট এবং সম্ভবতঃ অর্দ্ধ সেণ্ট। বর্ত্তমানে প্রচলিত আধুলী, সিকি

দুই আনী, এক আনী, ডবল পয়সা, পয়সা প্রভৃতিকে এক দিনে এবং একসঙ্গে সবগুলিকে বাজার হইতে উঠাইয়া লওয়া সম্ভব নহে। কাজেই কিছু দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মুদ্রা এবং নূতন মুদ্রা দুই-ই বাজারে প্রচলিত থাকিবে। ইহাতে কেনা-বেচার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য উভয় শ্রেণীর মুদ্রার মধ্যে সম্পর্কটা বুঝাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রচুর পরিমাণে প্রচার-পত্র প্রচার করিবেন।

বহু দিন ধরিয়া মূল্যের পরিমাপক এক ধরণের মুদ্রা ব্যবহার করিয়া আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হইলে কিছু দিন যে কেনা-বেচার ব্যাপারে দাম দিতে এবং দাম চাহিতে কিছু অসুবিধা হইবে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই অসুবিধা গুরুতর কিছু হইবে না। বর্ত্তমান দুই আনী প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় হইবে সাড়ে বার সেণ্ট, এক আনী হইবে সোওয়া ছয় সেণ্ট, এক পয়সা হইবে ১.৫৬২৫ সেণ্ট এবং এক পাই হইবে .৫২০৮ সেণ্ট। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বর্ত্তমান দুই আনীর স্থলে হইবে ১০ সেণ্ট, এক আনার স্থলে হইবে ৫ সেণ্ট নামীয় মুদ্রা। সুতরাং কেনা-বেচার ব্যাপারে খুব বেশী অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এবং নূতন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইতেও বিলম্ব হইবে না। তার পর বর্ত্তমান খুচরা মুদ্রাগুলি বাজার হইতে যখন ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া লওয়া হইবে, তখন ত সুবিধাই হইয়া যাইবে। দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হওয়া সম্বন্ধে ভারতবাসীর এক বিদেশী নাম ছাড়া আপত্তি হওয়ার অন্য কোন কারণ দেখা যায় না।

যুদ্ধব্যয়

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতে যুদ্ধ বাবদ যে ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বহন করিয়াছেন ১০৩ কোটি ১০ লক্ষ ষ্টার্লিং এবং ৯৭ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং বহন করিয়াছে ভারত। ভারতে যুদ্ধব্যয় শুধু ভারতরক্ষা ব্যয়ই নয়, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার ব্যয়ও বটে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার সহিত সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ভারতে যুদ্ধব্যয়ের খুব বড় একটা অংশ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বহন করিয়াছেন এ কথা বলা যায় না। বৃটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের শিল্পোন্নতিকে ব্যাহত করা হইয়াছে এবং এই কারণেই ভারতের দারিদ্র্য।

যুদ্ধের এই ব্যয় বহন করা ভারতের সাধ্যাতীত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা নগদ দেন নাই অথচ ভারতকে নগদ দিতে হইয়াছে; বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডনস্থ শাখায় ভারত গভর্ণমেণ্টের হিসাবে ষ্টার্লিং ঋণপত্র জমা দিয়াছেন। উহার নাম ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। এই সিকিউরিটির ভিত্তিতে নোট ছাপাইয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট নগদ অর্থে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার ইহাই প্রধানতম কারণ।

সামরিক ব্যয়ের মত কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য ক্রয়েও এই ব্যবস্থা। তাহারা দিয়াছে ঋণপত্র, আর আমরা দিয়াছি নগদ। তজ্জন্য অর্থেক নূতন নোট ছাপাইতে হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির ইহা অন্যতম কারণ। ভারত গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের জন্য ভারতবাসীর প্রয়োজনের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া যথেচ্ছ ভাবে পণ্য ক্রয় করিয়াছেন। তাহার ফলে ভারতে ব্যবহার্য্য পণ্যের অভাব হইয়াছে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পণ্যের দাম ঋণপত্রে না দিয়া যদি স্বর্ণ দ্বারা নগদ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট ভারতের যে এক শত কোটি ষ্টার্লিং জমা হইয়াছে তাহা হইতে পারিত না।

বস্তুতঃ কি ভারতে যুদ্ধব্যয়ের অংশ, কি পণ্য-ক্রয়, কোনটার জন্যই এ পর্য্যন্ত বৃটেনকে নগদ এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টকে নগদ দিতে গিয়া নোট ছাপাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছেন। ভারতে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া চলতি মুদ্রা ও পণ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা সম্ভব হইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বণ্টনের সুব্যবস্থা ব্যতীত মূল্য-নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রাস্ফীতির রাসায়নিক সংযোগে চোরাবাজার সৃষ্টি হওয়ায় ভারতবাসীর প্রাণ রাখিতেই প্রাণান্তকর অবস্থা হইয়াছে, ভারতের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন কবে হইবে তাহা যেন কিছুই অনুমান করা সম্ভব হইতেছে না। তেমনি ভারতের ষ্টার্লিং তহবিলের ভাগ্যও আজ পর্য্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ট্রেণ-যাত্রা না শেষ-যাত্রা

৭ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকায় সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে মনিরামপুর ষ্টেশনের নিকট এক গুরুতর ট্রেণ-দুর্ঘটনা হইয়াছে। ১২ জন লোক দুর্ঘটনার ফলেই নিহত হয়, এক জন আহত অবস্থায় নীত হইবার সময় পথে মারা যায় এবং অল্প-বিস্তর আহতের সংখ্যা ৭৩ জন।

ভারতবর্ষে প্রথম রেল গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে বোম্বাই অঞ্চলে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় প্রথম রেলপথ খোলা হয়। ই বি রেলওয়ে (বর্ত্তমান বি এণ্ড এ রেলওয়ে) বোধ হয় প্রথম খোলা হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। এই রেলপথ খোলার ১৫ বৎসর পরেই রাণাঘাটের নিকট আড়ংঘাটায় প্রথম ট্রেণসজ্ঘর্ষ হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জব্বলপুর লাইনে ইম্পিরিয়াল মেল লাইনচ্যুত হইয়া একটা বিরাট চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতেই রেল-দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ১৯০৭এ দেরাদুন হইতে ১৩ মাইল দূরে একটি ট্রেণসজ্ঘর্ষ হয়। ১৯২২এ মধুপুরের নিকট পঞ্জাব মেলের গুরুতর দুর্ঘটনার কথা আজও সকলের স্মরণ আছে। ১৯৩৩এ ডাউন পাঞ্জাব মেল লাইনচ্যুত হইয়াছিল। ১৯৩৭এ বিহিটা রেল দুর্ঘটনা সকলেরই মনে আছে। ১৯৩৮এ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে তিনটি রেল দুর্ঘটনা হয়, ১৯৩৯এ আরও দুইটি। গত নভেম্বর মাসে আরা ষ্টেশনের নিকট পাঞ্জাব মেল এক দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিল। ই বি রেলপথে ঢাকা মেল এ পর্য্যন্ত পাঁচটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ইহা ব্যতীত ভারতীয় রেলপথে আরও যে কত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ দিতে গেলে এক মহাভারত লিখিতে হয়।

এত বেশী দুর্ঘটনার কারণ কি? রেল-কর্ত্তারা Sabotage বলিয়া রেহাইয়ের পথ খোঁজেন। তদন্তে বহু বার রেল-কর্ম্মচারীদের গুরুতর অমনোযোগিতাই ইহার কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

রেল পরিচালন-ব্যবস্থায় আগাগোড়া সর্ব্বত্র এত গলদ প্রবেশ করিয়াছে যে, উহার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত রেলযাত্রীর জীবন নিরাপদ করিবার উপায় নাই। আজকাল ট্রেণ-যাত্রা যেন শেষ-যাত্রায় দাঁড়াইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার আগমনী

আসন্ন বর্ষায় কলিকাতা সহরে গত বৎসর অপেক্ষাও ব্যাপক ও প্রবল ভাবে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সুরু হইবে বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ডক্টর আহমদ যে আশ্বাস-বাণী শুনাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের দেহ-মনে পুলক শিহরণ জাগিয়াছে। গত বৎসর কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব যেরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, অতীতে তেমন আর কখনও হয় নাই। সেই আক্রমণে ভাটা পড়িতে না পড়িতেই জাগ্রত বসন্ত (বসন্তকাল নয়) আসিয়া দুয়ারে আঘাত করিল। এমন প্রবল আক্রমণ দীর্ঘকাল কলিকাতার উপর হয় নাই। একটু উপশম হইতে না হইতে আসিল মহামারী। তাহার পরেই আবার শুনিতে পাইতেছি ম্যালেরিয়ার আগমন-সঙ্গীত!

দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতার স্বাস্থ্যের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকণ্ঠে অসংখ্য খানা ডোবা ও পুকুর রহিয়াছে। নিকটেই লোনা জলের হ্রদ। এইগুলিই ম্যালেরিয়া-বীজাণুবাহক এনোফিলিস মশকের সূতিকা-গৃহ। পূর্ব্ব-কলিকাতায় জলনিকাশের জন্য ড্রেণের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত তো নাই, অবস্থাও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। বহু দিন ধরিয়াই এই অবস্থা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার প্রতিকার কই?

ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইলে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক, ডক্টর আহমদ বলিয়া দিলেও তাহা অনুমান করার মত কিছু বুদ্ধি আমাদেরও আছে। তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই জানাইয়া দিয়াছেন, ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বিপুল কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব-সম্পন্ন করিবার মত সামর্থ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নাই। শুনিয়া কলিকাতার করদাতাগণ যে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ট্যাক্স আদায় করিলেই কর্পোরেশনের দায়িত্ব শেষ। করদাতাগণের দেয় অর্থ মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীদের বেতন যোগাইতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। করদাতাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সামান্য কিছু করিবার মত অর্থও অবশিষ্ট থাকে না। বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের ঔদাসীন্যের নিমিত্ত ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ব্যাধি। ইহার প্রতিকারের উপায় বহু দিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা যাহাদের হাতে, তাহাদের নিশ্চেষ্টতার মত চরম দুর্ভাগ্য আর দেশবাসীর কি হইতে পারে?

বাঙ্গালার বিস্মৃত দেশপ্রেমিকগণ

বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। উত্তেজনা-প্রবণ জাতি আমরা, মুহূর্ত্তেই যেমন উত্তেজিত হই, তেমনি পর-মুহূর্ত্তেই আবার নিস্পন্দ, অসাড়, জড় পদার্থে পরিণত হই। দেশের প্রতি, দেশপ্রেমিকদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবোধ তাই সর্ব্বদা সজাগ থাকে না। যে দেশপ্রেমিকদের লইয়া আমরা জীবন-পণ করিয়া মাতামাতি করিয়াছি, তাঁহারা কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন এবং আজও বাঁচিয়া আছেন কি-না, তাহাও বোধ হয় অনেকেই জানেন না। দেশবাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয়, অপমান ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং-প্রমুখ বাঙ্গালার বীর দেশপ্রেমিক যুবকগণ এক দিন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে রাজনৈতিক রূপকথার নায়ক ছিলেন, আজও আছেন। আজ তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের আমরা কি করিয়া এমন ভাবে ভুলিয়া গেলাম জানি না। সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত এক এক জনের কারাবাসের কথা চিন্তা করিলে আজ মনে হয়, এক দিন এই সোণার বাঙ্গালার যে সোণার তরুণের দল শৃঙ্খলিতা, নির্য্যাতিতা, পরাধীন দেশমাতার পদতলে দাঁড়াইয়া নবীন তারুণ্যের প্রত্যূষে বাঙ্গালার আকাশে স্বাধীনতার রক্তিম অরুণোদয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আজ তাহারা লৌহ-গরাদের অন্তরালে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে যৌবনের সায়াহ্নে আসিয়া পৌঁছিল, তবু দেশের সবুজ, শ্যামল ক্ষেত ও মাটি, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কঙ্কাল দেখিবার সৌভাগ্য আজও তাহাদের হইল না। আমরা প্রশ্ন করিতে পারি কি, বাঙ্গালায় এই সর্ব্বজন-আদরণীয়, নির্ভীক দেশপ্রেমিকগণ আজও পর্য্যন্ত এমন কি অপরাধে অপরাধী হইয়া আছেন, যাহার জন্য তাঁহাদের সারা-জীবন বন্দিনিবাসে থাকিয়া তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে? এই দেশপ্রেমিকদের প্রতি দেশবাসীর কি কোন কর্ত্তব্য নাই? ইঁহাদের জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় দেশের মুক্ত মাটিতে ফিরাইয়া আনা কি দেশবাসীর দায়িত্ব নয়? দায়িত্ব কঠিন, কর্ত্তব্য কঠোর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে যদি আমরা এড়াইয়া বা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাস ও বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ বংশধররা কি কোন দিন আমাদের শ্রদ্ধা করিবে, ক্ষমা করিবে?

আজ আমাদের দেশে বেলসেন্ ও বুশেন্‌ওয়াল্ডের নাৎসী বন্দি-নিবাসের মর্ম্মস্পর্শী চিত্র প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আজ যদি আমরা প্রশ্ন করি, বাঙ্গালা দেশের এই বন্দীদের সম্পর্কে আজও যে নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহা কোন্ দেশীয় গণতন্ত্রের আদর্শ অনুমোদিত, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ কি উত্তর দিবেন? নাৎসীবাদের বর্ব্বরতা আমরা আন্তরিক ঘৃণা করি; কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদীদের মানবতার বিচার-বোধ নাই, তাহাদের আমরা ভুলিয়াও কোন দিন শ্রদ্ধা করি না। তাঁহাদের নিকট আজ আমরা করুণ ভাবে আবেদন করিতেছি, অন্ততঃ মানবতার সম্মানরক্ষার জন্য বাঙ্গালা দেশ হইতে এই দ্বিতীয় বেলসেন্ ও বুশেন্‌ওয়াল্ড তুলিয়া দেওয়া হউক। তাহাতে মানবতার জয় হইবে এবং বহু-বিঘোষিত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শেরই জয় হইবে।

ব্রহ্মদেশের সমস্যা

সকলের দৃষ্টি যখন মধ্য-প্রাচ্যের সিরিয়া ও লেবাননের সঙ্কটজনক অবস্থার উপর নিবদ্ধ, তখন ধীরে ধীরে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরেও যে একটা জটিল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা আজ লক্ষ্য করিবার সময় আসিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট জাপ বিতাড়ন করিতে করিতে ব্রহ্মদেশে সসৈন্যে প্রবেশ করিবার পর হোয়াইট পেপার মারফৎ

তিন বৎসরের জন্য নিরঙ্কুশ গভর্ণর-রাজ প্রতিষ্ঠার কথা সকলকে জানাইয়া দিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলেন, এবং তাঁহাদের ধারণা হইল, বুঝি এবার একটা মস্ত কাজ করিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে লাভের মধ্যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের যেটুকু তথাকথিত সাজানো স্বাধীনতা ছিল, এবার বৃটিশ সরকারের সংস্কার-সাধনের ঠেলায় তাহার অস্তিত্বও লোপ পাইল। কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি মার্কিণ পত্রিকা জাপ-অধিকৃত স্থানগুলি হইতে জাপানীদের পরাজিত করিয়া বিতাড়নের প্রশ্ন আলোচনা করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছিল যে, জাপানীরা ঐ সব দেশগুলির যে স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহার সত্যকারের মূল্য কিছু না থাকিলেও অধিকৃত দেশের লোকের মানসিক অবস্থার উপর তাহার প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং জাপানীদের এই সুচতুর প্রচার-কৌশল রোধ করিতে হইলে মিত্রপক্ষকে উপনিবেশের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু প্রথমেই চার্চ্চিল কোং যে প্রগাঢ় বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের ঔপনিবেশিক নীতি যে কত দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, তাহা আর বিশেষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

এই ভাবে জনসাধারণকে বাদ দিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালনার চেষ্টার ফল হইয়াছে শোচনীয়। এই নীতির সহিত আমরা, ভারতবাসীরা বিশেষরূপেই পরিচিত, কারণ, ইহার জন্যই বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষে মুনাফাখোরেরা গভর্ণমেণ্টের সহিত হাত মিলাইয়া জনসাধারণের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে সাহস পাইয়াছে এবং আজ বস্ত্রের ব্যাপারেও গভর্ণমেণ্টের সেই আমলাতান্ত্রিক অকর্ম্মণ্যতা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের ভাগ্যেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রথমেই জাপানীদের ছড়ানো নোটের কথা ধরা যাক্। জাপানীরা ব্রহ্মদেশে তাহাদের কাজ-কারবার চালানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নোট ব্যবহার করিয়াছিল। এখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই সকল নোটের পরিবর্ত্তে বৃটিশ-মুদ্রা দিতে অস্বীকার করায় জনসাধারণের দুর্গতির সীমা নাই। যে সকল বুদ্ধিমান্ লোক পূর্ব্ব হইতেই বৃটিশ-মুদ্রা লুকাইয়া জমা করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহারা বর্ম্মী চাষীদের বহু জাপানী-মুদ্রার বিনিময়ে স্বল্প বৃটিশ-মুদ্রা দিতেছে। এইরূপে মুদ্রা-বিনিময়ের ক্ষেত্রেও জনসাধারণ চোরা কারবারের কবলে পড়িয়া আজ বিপন্ন। ইহার উপর অন্ন এবং বস্ত্র-সমস্যায় বাঙ্গালা দেশের বেলায় শাসকবর্গ যেরূপ অদূরদর্শিতা ও দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন এ-ক্ষেত্রেও ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে চলিয়াছে। চাউলের অভাব অবশ্য এখনো বেশী রকম প্রকট হইয়া সঙ্কট সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু এ-ভাবে চলিতে দিলে যে সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না, তাহাও নিশ্চিত। গভর্ণমেণ্ট চাউল কিনিয়া লইতে পারে, এই আশঙ্কায় বহু মজুতদার এখন হইতে স্বল্প মূল্যে চাষীদের নিকট হইতে ধান-চাল কিনিয়া মজুত করিতেছে। বস্ত্র-সমস্যা কিন্তু অন্ন-সমস্যা অপেক্ষা প্রবল। বর্ম্মীদের মধ্যে যে, লুঙ্গী বিতরণ করা হইতেছে, একে তো তাহা যথেষ্ট নহে, তাহার উপর গভর্ণমেণ্ট নিজেদের পেটোয়া কতকগুলি লোককে বস্ত্র বিতরণ করিয়া অন্য সকলকে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আর এক ভীষণ সমস্যা রহিয়াছে। জাপানী-দখলের সময় যে সকল বর্ম্মী অস্ত্রশস্ত্র পায়, তাহাদের প্রত্যেকের নাম-ধাম ইংরেজেরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। এখন বৃটিশ পুলিশ ঐ সব অস্ত্র ফেরৎ দিতে বলিতেছে। এই গেরিলাদের কেহ কেহ অস্ত্র প্রত্যর্পণ করিয়াছে বটে; কিন্তু অন্যেরা বাধা দিতেছে এবং বিক্ষিপ্ত লড়াইও হইয়াছে।

এই বর্ম্মী গেরিলা কাহারা? ভারতের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও যুদ্ধের পূর্ব্বে স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে যে 'থারাবাডি' বিদ্রোহ হয়, বৃটিশ টোরীরা বেয়নেটের জোরে কয়েক হাজার বর্ম্মীকে হত্যা করিয়া তাহা কঠোর ভাবে দমন করে। ব্রহ্মদেশের ফিরোজ খাঁ নূনেরা ব্যতীত অন্য সকলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা পোষণ করিত। জাপানী যুদ্ধ আরম্ভের পর গভর্ণমেণ্ট ডাঃ বা ম'র সিন ই থা দল বে-আইনী ঘোষণা করে এবং ডাঃ বা ম'কে গ্রেপ্তার করে। ফল হইল এই যে, যখন জাপানীরা ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিল, তখন পুরাতন জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত জনসাধারণ সম্পূর্ণ ভাবে জাপানীদের সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যখন ভুল বুঝিতে পারিল, তখন তাহারাই আবার "বর্ম্মা পেট্রিয়টিক ফ্রণ্ট" নামে একটি জাপবিরোধী আন্দোলন গঠন করে। ইহাতে পুরাতন সরকারী চাকুরীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া থাকিন দলের নূতন কর্ম্মী, 'বর্ম্মার স্বাধীনতাকামী সৈন্যবাহিনী'র সৈন্যদল এবং কম্যুনিষ্টরা সকলেই যোগদান করিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রহ্মে পুরাতন রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় কোন অস্তিত্বই নাই—'বর্ম্মা পেট্রিয়টিক ফ্রণ্ট'ই এখন জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি। ইহাদের অধীনে দশ হাজার সৈন্য ও বহু গেরিলা জাপ-বিতাড়ন কার্য্যে বৃটিশ বাহিনীকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। এমন কি, অনেক সহরে বৃটিশ বাহিনী প্রবেশ করার পূর্ব্বেই ইহারা সেগুলি জাপ-কবলমুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কিন্তু বৃটিশ টোরীরা আজ ইহাদের ভয় করিতে সুরু করিয়াছে, কারণ, ইহারা স্বাধীনতা চায়। বৃটিশ টোরীরা যে-দেশেই পদার্পণ করিয়াছে, সে-দেশেই বৃটিশ সৈন্যদের জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখিবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এখন হইতে এই ঘৃণিত হীন প্রচেষ্টা বন্ধ না হইলে এশিয়ার আগ্নেয়গিরিগুলিতে অগ্ন্যুৎপাত অবশ্যম্ভাবী।

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি স্মৃতিভাণ্ডার

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ (যিনি পূর্ব্বাশ্রমে ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে সুপরিচিত ছিলেন) গত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট শনিবার তারিখে কলিকাতায় দেহরক্ষা করিয়াছেন।

দরিদ্রগণকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিবার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং "দীনের বন্ধু" রূপে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হন।

কিন্তু কেবলমাত্র চিকিৎসা ব্যবসা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল না। তিনি জনসাধারণের সুচিকিৎসার জন্য কলিকাতায় বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। দীন-দরিদ্র পরিবারের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য হরনাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অধিকন্তু, তিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁহার সহজাত ধর্ম্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিশেষে বিগত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী

স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

তারিখে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে হরিদ্বার মহাতীর্থে তাঁহার জীবনের চির-ঈপ্‌সিত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

এই মহামানবের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনকল্পে তাঁহার অগণিত বন্ধু, শিষ্য ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ একটি যোগ্য স্মৃতিমন্দির স্থাপন করেন। গত ২৭শে মে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদপুরে যাইয়া উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

ডাঃ সাহার মস্কো-যাত্রা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে ৫-১০মিনিটে বিমানযোগে ডাঃ মেঘনাদ সাহা তেহরাণের পথে করাচী যাত্রা করিয়াছেন। তেহরাণ হইতে তিনি মস্কো ও লেনিনগ্রাডে সোভিয়েট রুশিয়ার রজত-জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করিবার জন্য রওনা হইবেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাইতে পারিলেন না। আমরা আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক, যেমন ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অথবা ডাঃ সুশীলকুমার মিত্র যাইবেন। কিন্তু শেষ অবধি ডাঃ সাহা একাই গেলেন। সঙ্গে আর কেহ যাইতে পারিলেন না। সে জন্য আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

নোবেল প্রাইজ

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন এক জন চীনা রাসায়নিক ডাঃ চাউ-হাউ কু। ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভের পর তিনি চীনে ফিরিয়া ১০ বৎসর চেকিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর মাত্র। চীনদেশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল প্রাইজ পাইলেন। নোবেল প্রাইজের মূল্য ২০ হাজার মার্কিণ ডলার, কিন্তু চীনা এক্সচেঞ্জে তিনি পাইবেন মাত্র ১০০ ডলার। তাঁহার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়াইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আজ যাঁহারা কর্ত্তা, সুযোগ পাইলেই তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইতে কসুর করেন না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগ একটি নহে, অসংখ্য। কংগ্রেস ভারতের সকলের পক্ষে কথা কহিতে পারে না; কারণ, ভারতবর্ষের বহু লোকেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়াছে; কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধি, সুতরাং মুসলমানদের হইয়া কথা বলা তাহার সাজে না; কংগ্রেসের অন্তঃকরণ ফ্যাসিষ্ট-প্রীতির রসে ভরপুর এবং মহাত্মা গান্ধী যাহাই বলুন না কেন, আসলে তিনি জাপানের প্রতি গুপ্ত দরদ পোষণ করেন—ইত্যাদি বহু মিথ্যা রটনা বৃটিশ প্রচার-যন্ত্রের মারফৎ নিত্য-নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া দেশে-বিদেশে প্রচারিত হইয়া থাকে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কেহই ইহার অধিক কিছু প্রত্যাশা করে না, বরং তাঁহারা যদি আজ অকস্মাৎ উল্টা সুরে গাহিতে আরম্ভ করেন তবেই সন্দেহ হইবে, হয়ত ভিতরে ভিতরে কোন গণ্ডগোল ঘটিয়া গিয়াছে। সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনেও যাহাতে ভারতের সত্যকার সংবাদ পৌঁছিতে না পারে, সে জন্য বৃটিশ রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই এবং এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনটি মূর্ত্তিমানকে তাঁহারা সেখানে হল্লা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন, তাই কোথা হইতে কালবৈশাখের মত আসিয়া তাঁহাদের অত সাধের তাসের ঘর লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন বিজয়লক্ষ্মী।

এখন আবার সাম্রাজ্যবাদীদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া জুতার মধ্যে আর একদল বর্ণ-চোরা পা ঢুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা আমাদের স্বনামধন্য কমরেড মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিকাল চেলা-চামুণ্ডারা। যত দিন পর্য্যন্ত ইঁহারা কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন তত দিন পর্য্যন্ত সমগ্র ভাবে কংগ্রেসকে গালাগালি দিতে কেহ ইঁহাদের দেখে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করায় কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইবার পর হইতেই এক দিন সুপ্রভাতে ইঁহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি মহা ফ্যাসিষ্ট দল। তাহার পর হইতে ইঁহারা মহা উৎসাহে কংগ্রেসের নামে চার্চ্চিল-আমেরি কোং-এর শেখানো হাজার হাজার মিথ্যার জাল বুনিয়া এ দেশে এবং বিদেশে জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার কত অপচেষ্টাই যে করিয়াছেন, তাহা ইঁহাদের দলের নানারূপে প্রচার-পত্র হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে।

সম্প্রতি এই র‍্যাডিকাল দলের তায়েব শেখ নামক এক জন অনুচর সানফ্রান্সিস্কোতে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের নিকট এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া সকলকে সজাগ করিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"Some of our countrymen here have strenuously sought to misrepresent the real

situation in India. Most of them had spoken in the name of the Indian National Congress and tried wrongly to impress upon you that that the Congtess represents the Indian people and their aspiration for freedom. We challenge the democratic representative character of the Congress and also its right to speak in the name of the Indian people. For ever since the Congress assumed the character of mass movement its Gandhian leadership at every stage of its development has betrayed the interests of the toiling masses of India whom it pretends to represent. Those of us who worked in the direction of freeing the people of India from deceptive reactionary politics of Congress leaders were sternly dealt with and expelled from the Congress. Inspite of its loud anti-Fascist profession, when war was declared against the citadel of international Fascist Hitlerite Germany the Congress refused to act up to its professions and support the war-effort. On the contrary it took to bargaining for political concessions. It openly advocated boycott of the war effort—the Congress was not keen about this anti-Fascist war. The Japaneese had already appeared on the soil of India. The Congress would rather come to some arrangement with the invaders. Today the Congress does not represent the great bulk of Muslims in India, thanks to the anti-social character of Gandhian politics. The Congress, also does not represent the great bulk of untouchables and above all it does not represent the common man of India. Only it represents the privileged - primitive minority of Indian vested interests The tide of war having turned Congress leaders are once again making efforts to get back to the position of petty political power both at the Central and in the provinces. This privileged minority headed by Messrs Tata, Birla and Company wants Congress leaders to get into power. For they are anxious to get hold of the sterling balance of India so that those sterling balances might be utilised in conformity with their plan of post-war reconstruction—the Bombay plan. The loud demand for a National Government, is indeed, a device to put the Birla-Tata project of industrial development of India into practical operation only for the purpose of making the privileged minority richer and richer."

ইঁহাদের ক্রোধের কারণ যে আছে, তাহা এইবার যেন আমরা বুঝিতেছি। সত্যই তো, এইরূপ বীর র‍্যাডিক্যালরা থাকিতে কংগ্রেস ভারতের জনগণের জন্য মাথা ঘামাইবে কেন? কিন্তু যখন সার রামস্বামী মুদালিয়র প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের চরেরা ভারত সম্বন্ধে অর্দ্ধ সত্য ও অসত্য প্রচার করিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিতেছেন, তখন এই সব তায়েব শেথ প্রভৃতি বীরপুঙ্গবেরা কোথায় ছিলেন? পাছে বৃটিশ-কর্ত্তারা মনে করেন যে, তের হাজার টাকার নুন খাইয়াও এই সব অকৃতজ্ঞরা গুণ গাহিতেছে না, এই আশঙ্কায় সম্ভবতঃ ইঁহাদের দলবল চুপচাপ করিয়া কচ্ছপের ন্যায় মাথা ঢুকাইয়া বসিয়াছিলেন। যখনই বিজয়লক্ষ্মী বৃটিশ সরকার-প্রেরিত সিংহচর্ম্মাবৃত রাসভদের আসল স্বরূপ ফাঁস করিয়া দিতে লাগিলেন, তখনই ইঁহারা তের হাজার টাকার মান রক্ষা করিবার জন্য 'হুক্কা হুয়া' রব ছাড়িতে সুরু করিয়াছেন।

অথচ শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী সানফ্রান্সিস্কোতে ভারতের স্বাধীনতার কথাই বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসেরই হস্তে ক্ষমতা দানের প্রশ্ন তুলেন নাই বা কংগ্রেস যে ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি, এমন অদ্ভুত দাবীও করেন নাই; তিনি যে দাবী করিয়াছিলেন, সোভিয়েট পক্ষ হইতে মঃ মলোটভও সেই দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা শুনে কে? যাহাকে মারিতে হয় তাহার নামে অন্ততঃ আগে একটা বদ্‌নাম তো রটাইতেই হইবে। সুতরাং শ্রীযুত মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিকালগণ তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, কংগ্রেস ভারতবর্ষের মাত্র দুই-চারিটি বড়লোকের প্রতিনিধিত্ব করে—আর আমরা র‍্যাডিক্যালরা ভারতের অসংখ্য প্রোলিটারিয়েটের জন্য দুঃখে প্রাণপাত করিতে ব্যস্ত।

কিন্তু আজ যাঁহারা কংগ্রেসের নামে মিথ্যা প্রচারকে মূলধন করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের অতীত কার্য্যকলাপ এই দরিদ্রবন্ধু সাজিবার চেষ্টা কত দূর সমর্থন করে? ভারতের ক্ষেত্রে ইঁহারা ভারতীয় শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রধান সঙ্ঘ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে ভাঙ্গিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতের পুতুল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রমিকদের যে সংহতি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্ব্বপ্রধান হাতিয়ার তাহা নষ্ট করিবার জন্য ইঁহারা যথেষ্ট চেষ্টাই করিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও ইঁহারা বিলাতী শ্রমিকদলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সহিত হাত মিলাইয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের অন্যান্য প্রগতিশীল শ্রমিকসঙ্ঘগুলির বিরোধিতা করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। তখনই ইঁহাদের দরিদ্রবন্ধুর মুখোস্ খুলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কতক শ্রেণীর লোক ইঁহাদের নীতির সহিত ভারতীয় সাম্যবাদীদলের নীতি গুলাইয়া ফেলেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেক অপকর্ম্মের জন্য সাম্যবাদীদের দায়ী করেন। কিন্তু আজ ইঁহাদের সত্য করিয়া চিনিবার সময় আসিয়াছে। ইঁহারা দরিদ্রবন্ধু নন, গভর্ণমেণ্টের দালাল মাত্র।

স্মরণে

প্রফুল্ল-স্মৃতি

আজ এক বছর হইল, বাঙ্গালার শেষ স্বর্ণ দেউটি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। জাতীয়তার মূর্ত্ত প্রতীক, ত্যাগ ও কর্ম্মে সমুজ্জ্বল, বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, আর্ত্তবন্ধু, দেশ-হিতব্রতী মহাপুরুষ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৬ই জুন ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কেবল অধ্যাপকই ছিলেন না, ছাত্রদের বন্ধু ছিলেন। নিজেকে বঞ্চিত করিয়া গরীব ছাত্রদের দুঃখ কষ্ট দূর করিতেন! তাঁহার আচার্য্য নাম সার্থক।

'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার স্বদেশপ্রেম বিজ্ঞান-প্রেমকেও ছাপাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার আত্মাকে তৃপ্তিদান করিতে হইলে তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য করিতে হইবে, তবেই আমরা তাঁহার অবিনশ্বর আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদানের অধিকারী হইব।

দেশবন্ধু

দেশবন্ধু। চিত্তরঞ্জন নামের উপর বাঙ্গালী ও-নাম স্থাপন করিয়া ছিল। ২০ বৎসর হইল ঠিক এমনই দিনে তিনি আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন। জাতি তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে কি না যুবশক্তি বলিতে পারে। ভোগিশ্রেষ্ঠ— সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগের অবতার। ভারতে তাঁহার জুড়ি নাই। বাঙ্গালার রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই শেষ মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধানের পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল আজিও তাহা কেহ পূর্ণ করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আখ্যা দিয়াছিলেন—The creative force of a great aspiration that has taken a deathless from in the sacrifice." এই creative force মহাত্মাজীর শক্তিকে খর্ব্ব করিয়াছিল,এই creative forceই যে সমগ্র কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী ভারতকে আপনার কর্ম্মপদ্ধতিতে দীক্ষিত করিয়াছে তা বর্ত্তমানে parliamentary প্রচেষ্টাতেই বুঝা যাইবে। যত দিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন দেশের অনেক রাজাগোপাল, শ্যামসুন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া নয়া গঠিত মন্ত্রিতন্ত্রের অনেক অর্থ ও পদলিপ্সুর সহিত সংগ্রাম করিতেই তাঁহার অধিক সামর্থ্য ব্যয় করিতে হয়। বন্ধনের বাধা অতিক্রম করিতে গিয়াই রণক্লান্ত এই বীরকে দেহ দান করিতে হয়।

শোক-সংবাদ

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়

১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বেলা ১০টায় খিদিরপুর বাকুলিয়া হাউসের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, খ্যাতনামা ব্যবসায়ী রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

তিনি মেসার্স জি, ডি, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ রামগোপাল বাবুর মিষ্ট-মধুর নম্র ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইতেন। যাদবপুর টিউবারকুলোসিস হাসপাতালে এবং বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ও একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়-স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

ডাঃ এইচ, কে, সেন

২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বিহার গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এইচ, কে, সেন পরলোক-গমন করিয়াছেন। প্রায় দুই মাস আগে তিনি একবার সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন। সারিবার মুখে রবিবার সকালে পুনরায় আক্রান্ত হন, এবং সেই আক্রমণেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার বিধবা পত্নী ও একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ এবং ভারত রাসায়নিক শিল্পের এক জন পৃষ্ঠপোষক হারাইল। তিনিই ছিলেন ভারতের প্লাষ্টিক শিল্পের অন্যতম প্রবর্ত্তক।

শ্রীযামিনীমোহন কর অঙ্কিত

পূর্ব্বরাগ

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

২৪শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৫২ [৩য় সংখ্যা

ধর্ম্মরাজের প্রশ্নচতুষ্টয়

[[illegible]]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সে দিন সন্ধ্যাবেলা চেয়ে দেখলাম, আকাশে যেন কালো মেঘের বান ডেকেছে। গগনচারী দেবতারা তাড়াতাড়ি আপনার আপনার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে বসে আছেন ; একটা জোনাকির পর্য্যন্ত নামগন্ধ নেই। চারি দিক্ একেবারে নিঝুম. নিস্পন্দ। বুঝলাম আজ দেবলোকে কি একটা ষড়্‌যন্ত্র চলছে। আকাশের এই অন্ধকার রূপের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছি, এমন সময় বেশ বড় এক ফোঁটা জল কোথা থেকে লাফিয়ে এসে আমার নাকে তিলক কেটে দিল। সে দিন সন্ধ্যার আগেই আফিমের মাত্রাটা বেশ একটু চড়িয়েছিলাম। এ রকম বদ্‌রসিকতায় মৌতাত চোটে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ কচ্ছে দিচ্ছি, এমন সময় প্রথমে টপাটপ্ পরে ঝমাঝম্ ক'রে বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

একে হাতে কাজ-কর্ম্ম নেই ; তার উপর ব্রাহ্মণীও গেছেন বাপের বাড়ী। সুতরাং ধর্ম্মচর্চ্চার এই উপযুক্ত অবসর ভেবে প্রদীপটাকে একটু উস্‌কে দিয়ে মহাভারত-খানা কোলের কাছে টেনে নিলাম।

বইখানা খুলেই দেখি, বনপর্ব্বের মাঝখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহা বিপদে পড়েছেন। ধর্ম্মরাজ যক্ষরূপ ধ'রে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছেন। যুধিষ্ঠিরের তখন তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে। শাস্ত্রচর্চ্চা-উপযোগী মেজাজ একেবারেই নয়। কিন্তু করেন কি ? সরোবরের তীরে যা' দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যে বৃকোদরের হুঙ্কারে পাহাড় কেঁপে উঠতো, তাঁর মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই। তিনি প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফের উপর কাদা লাগিয়ে সরোবরের তীরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। সব্যসাচী অর্জ্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব একেবারে ছিট্‌কে পড়েছে ; তূণভ্রষ্ট পাশুপত অস্ত্রের উপর একটা কোলা ব্যাঙ বেশ আরামে ব'সে চক্ষু বুজে সঙ্গীত-আলাপ করছে। নকুল সহদেবের অমন ফুটন্ত ফুলের মতো মুখ দু'খানি একেবারে কাল্‌চে মেরে গেছে। যুধিষ্ঠিরের প্রাণটা ভ্রাতৃস্নেহে কেঁদে উঠলো। ধর্ম্মরাজের পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল বলেই কি অমন শূরবীরের মতো ভাইগুলোকে প্রাণে মারতে হয়!

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সহানুভূতিতে ফুলে আমার বুকখানা যেমনি ফোঁস্ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটাও গেল নিবে। শূন্য বিছানায় শুতে যাবারও বিশেষ প্রলোভন ছিল না। আর মনটাও ধর্ম্মরাজের অবিচারে একটু খারাপ হয়ে গেছলো। তাই চুপ-চাপ করে সেইখানেই প'ড়ে রইলুম।

* * *

হঠাৎ মনে হলো আমার পিঠে যেন ছপাং ক'রে একগাছা চাবুক পড়লো, আর মনে হলো, কে যেন আমার টিকির গোছা ধরে টান্‌তে টানতে আমার শরীর থেকে আত্মাপুরুষকে বা'র করবার চেষ্টা করছে। আমি চীৎকার করতে গেলুম। কিন্তু মুখে কোন শব্দই হলো না। আমার তো ভয়ে অঙ্গ হিম হয়ে গেল। মনে মনে ভাবছি—এ আবার কার পাল্লায় পড়লাম। এমন সময় শব্দ হলো—"ভয় নেই, ভয় নেই ; তুমি আমার কথাই ভাবছিলে, তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তুমি যুধিষ্ঠিরের ভাইগুলির জন্ত দুঃখে

কাহিল হচ্ছিলে; কিন্তু আমি ঐ চারটি প্রশ্ন এ পর্য্যন্ত অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি; আর যারা সদুত্তর দিতে পারেনি, তাদের সকলেরই ঐ দশা হয়েছে।"

তখন আমার হুঁস হলো। বুঝলাম, তা' হলে ইনিই হলেন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম। একটু সাহসে ভর ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু ধর্ম্মরাজ! আপনি যে পাণ্ডবদের ছাড়া আর কাউকে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, সে কথা তো শাস্ত্রে লেখে না।" ধর্ম্মরাজ একটু হেসে বল্লেন—"লেখে বৈ কি! তবে সে সব শাস্ত্র—সংস্কৃতে লেখা নয় ব'লে তোমরা মানো না। আমি সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাও যে জানি, এটা স্বীকার করলে যে তোমাদের শাস্ত্রব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে! আর তা ছাড়া আরও একটা কথা কি জান, আমি বহুরূপী ব'লে লোকে আমাকে সব সময় চিনতে পারে না।"

"ওঃ! তাই না কি! আমি তো জানতাম আপনি বৃষরূপেই বুড়ো শিবকে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ান; আর কখনো বা বকরূপ ধ'রে পুকুরের পাড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যান করেন।"

ধর্ম্মরাজ আমার টিকিতে একটা হেঁচকা মেরে বল্লেন—"এত বুদ্ধি না হলে আর তোমরা গোল্লায় যাবে কেন? এই যে সেদিন কুলি-মজুরের রূপ ধ'রে রুশিয়ার জার (Czar)কে ঐ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করেছিলাম তা বুঝি তোমরা বুঝতে পারোনি?"

আমি তো ভয়ে হাঁ করে ফেললাম। ধর্ম্মরাজ যে বুড়ো বয়সে বলশেভিক সেজে দেশে দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে বেড়াবেন, এ কথা আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কি ক'রে বিশ্বাস করি বলো! কিন্তু কিছু বলতে আমার সাহস হলো না। তখনও আমার টিকিতে হাত যে! ধর্ম্মরাজ কিন্তু অন্তর্য্যামী কি না! টপ্ করে আমার মনের ভাবটুকু বুঝতে পেরে বল্লেন—"আমি বলশেভিক, টলশেভিক কিছুই নই। ওটা আমার ইউরোপে এ যুগের রূপ মাত্র। এক দিন আসবে যখন ষ্টালিনকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। চার্চ্চিলও বাদ যাবে না।

ধর্ম্মরাজের প্রোগ্রামটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। বলশেভিকদের কথা ভেবে আমার পেটের পিলে তখনও চমকে চমকে উঠছিলো। আমি সবিনয়ে নিবেদন করলুম—"মহারাজ, কিন্তু আপনার পুজোয় এতটা রক্তারক্তি কি ভাল হলো?"

ধর্ম্মরাজ আমার টিকিতে আর একটা হেঁচ্কা মেরে বল্লেন—"বাবা, আমি তো তোমাদের কংগ্রেস ক্রীডে এখনও সহি করিনি। আর তোমাদের দেশের চাল-কলার নৈবেদ্যের উপর নির্ভর ক'রে যদি আমাকে বাঁচতে হতো তাহলে ভগবান্ আমাকে অমর কোরে সৃষ্টি করলেও আমাকে এত দিন মরে ভূত হয়ে যেতে হতো। তোমরা আমার বক-রূপটিকেই চিনেছ বলে সবাই বকধার্ম্মিক সেজে আলোচালের উপর দুটো ফুল ফেলে দিয়ে কাজ সারতে চাও। কিন্তু আমি আমার পাওনা-গণ্ডা সুদে-আসলে আদায় ক'রে নিতে ভুলিনে। তোমরা মরতে ভয় পাও ব'লে আমি তো আর মারতে ভয় পাইনে। তোমরা অহিংসার দোহাই দাও বলেই আমাকে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা আর দুর্ভিক্ষের রূপ ধ'রে নিজের হিসাব বুঝে নিতে হয়।"

কথাগুলো একটু বাঁকা রাস্তায় চলছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি ওগুলো পাল্টে নেবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম—"প্রভুপাদ! ইউরোপে তো আপনার যাতয়াত আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার পর আপনি কি এ দেশে আর আসেননি?"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"দেখ, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পর প্রায় হাজার বৎসর আর এদেশে আসিনি। তার পর যখন এলুম, তখন দেখলুম, সে ক্ষত্রিয়কুল একেবারে সাফ্ হয়ে গেছে। মহানন্দ নামের একটা বুড়ো মড়া-খেকো রাজা মগধের সিংহাসনে বসে আফিম খেয়ে ঝিমোচ্ছে, আর রাজপ্রসাদসেবী ব্রাহ্মণেরা খুব টিকি দুলিয়ে দুলিয়ে যজ্ঞের ভস্মে ঘি ঢালছেন। সব ক'টার টিকি টেনে টেনে দেখলুম—আরে রামচন্দ্র! একেবারে পরচুলের সাজান টিকি। টান দিতেই খসে এলো। কেবল একগোছা টিকি টানতে গিয়ে দেখলুম—হাঁ, টিকির মত টিকি বটে; একেবারে মগজ থেকে বেরিয়েছে। টিকিধারীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"পণ্ডিত-জীর নাম?" ব্রাহ্মণ আমার আপাদমস্তক তীব্র দৃষ্টিতে দেখে বল্লেন—'কৌটিল্য।' সে রকম তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভারতবর্ষে আর বেশী দেখেছি ব'লে মনে হয় না। হাঁ, একটা মানুষের মতো মানুষ বটে! নমস্কার ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি পণ্ডিতজী, বার্ত্তা কি?" কৌটিল্য বল্লেন—"বার্ত্তা এই যে, যারা ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়েও নিজেদের ক্ষত্রিয় ব'লে পরিচয় দেয়, তারাই এখন ভারতের রাজা।"

আমি বললাম—"বটে! কি আশ্চর্য্য!"

কৌটিল্য খুব চালাক লোক। কথাটা শুনে বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। বল্লেন—"আশ্চর্য্য বৈ কি! যাদের চারি দিকে আগুন জ্বলে উঠছে, সিংহাসন যাদের টলছে, তারাও চিরদিন লোকের বুকে বসে দাড়ী ওপড়াবার স্বপ্ন দেখছে। ভাবছে, তাদের রাজ্য চিরস্থায়ী।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"তাই তো, পণ্ডিতজী; চারি দিকে যখন গণ্ডগোল, তখন এ রাজ্যে সুখী কে?"

কৌটিল্য একটু হেসে উত্তর দিলেন—"ধ্বংসের

মধ্যে যারা নূতন সৃষ্টির বীজ দেখতে পাচ্ছে তারাই সুখী।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—"এই নূতন সৃষ্টির পন্থা কি, পণ্ডিতজী।"

কৌটিল্য একটু চিন্তিত হলেন। শেষে বল্লেন—"দেখুন, আমি অনেক ভেবে দেখেছি; পুরাতন ভিত উপ্ড়ে ফেলে আবার নূতন ক'রে গোড়াপত্তন করা ছাড়া আর উপায় নেই। দেশে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় আর নেই। অর্থহীন সংস্কারের চাপে প্রকৃত ধর্ম্ম নষ্ট হ'তে বসেছে। দ্রোণাচার্য্য যাদের নিষাদ ব'লে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, গুরুদক্ষিণা গ্রহণের ভাণ ক'রে তিনি যাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নিয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু ক'রে রাখবার সংকল্প করেছিলেন, আমি সেই শূদ্রকেই সংস্কারপূত করে রাজা ক'রে তুলবো, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে বসাব। দেশকে তোলবার ঐ এক পন্থা।"

কৌটিল্যকে আশীর্ব্বাদ ক'রে ফিরে এলুম। দেখলুম, তখনও ভারতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাব হয়নি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—"তার পর এ দেশে কখনও আপনার পদধূলি পড়েনি?"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"এসেছিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপার দেখে এ দেশে ঢোকবার আর প্রবৃত্তি হয়নি। দেখলুম—ভারতের দরজার কাছে মহম্মদ ঘোরী তার দেড় হাত লম্বা দাড়ী নিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে, আর রাজপুতেরা খুব বড় বড় পাগড়ী বেঁধে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরে, ধুম-ধাড়াক্কা নিজেদের মধ্যে ফুর্ত্তিসে লাঠালাঠি করতে লেগে গেছে। ভগবান যাকে মারেন, তাকে যে আগে থেকেই অন্ধ করে দেন, তা স্পষ্টই দেখতে পেলুম। বুঝলুম, কৌটিল্যের নূতন সৃষ্টির কল্পনা কৌটিল্যের সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে গেছে।"

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"মোগল বাদসাদের আমলে কখনও এখানে এসেছিলেন কি?"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"এসেছিলুম একবার। আলমগীর বাদসা তখন বুড়ো বাপের মৃত্যু কামনা করতে করতে দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লীর দিকে সবেগে ছুটে চলেছেন। হজরৎজী যে রকম প্রচণ্ড ধার্ম্মিক, তাতে মোগল বাদসাহদের তক্তে যে ঘুণ ধরেছে তা' আর বুঝতে বাকী রইল না। তাঁকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন বোধ করলুম না। তখন মোগল-দরবারে এক জন মারাঠী যুবকের কথা অল্পবিস্তর শোনা যাচ্ছিল। আমার মনে হলো, একবার ছোকরাকে দেখে আসি। সহ্যাদ্রির পাদদেশে এসে দেখলুম, এক জন দীর্ঘকায় বীরলক্ষণ-চিহ্নিত উন্নত ললাট গৌরবর্ণ পুরুষ কল্পনার বলে ভবিষ্য ভারতের সৃষ্টি করছেন, আর মহাশক্তি তাঁকে আশ্রয় করে সমগ্র মহারাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত করে তুলছেন। বুঝলাম এই শিবাজী। অনেক দিন পরে একটা খাঁটি মানুষ দেখে আমারও আনন্দ হলো। আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে তাঁকে আমার চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম। শিবাজী বল্লেন—"মহারাজ! মুষ্টিমেয় তুর্ক এসে ভারতের ক্ষত্রিয়-শক্তিকে পদানত করে রেখেছে, এই একমাত্র বার্ত্তা। যাদের জোরে তুর্ক সিংহাসনে বসে আছে, তারা একবার স্বপ্নেও ভাবে না যে সংঘবদ্ধ হলে তারাই দেশের অধীশ্বর হতে পারে—এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি? এ মোহ যে ভেঙ্গে দিতে পারে সেই সুখী। আমি মহারাষ্ট্রের শক্তি উদ্বুদ্ধ করে তাকে সমগ্র ভারতের কর্ত্তা করে দেবো—এই আমার পন্থা।"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—আমি যা' ভয় করেছিলাম, তাই হলো। পন্থার কথাটা শুনেই আমার মনে খট্কা লেগেছিল যে, হয় তো মারাঠার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে কিন্তু থাকবে না। হলোও তাই। বর্গীর তরবারি একবার বিদ্যুতের মত সকলকার চোখ ঝলসে দিয়েই আবার অন্ধকারে ডুবে গেল।"

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলুম না। কিন্তু মনে হলো যেন ধর্ম্মরাজের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলুম—"তার পরে আর এ দেশে আসেননি, বোধ হয়।"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"না। এখনও আসবার ইচ্ছা ছিল না। তবে চিত্রগুপ্ত খাতাপত্র দেখে হিসাব করে বল্লে যে ভারতের প্রায়শ্চিত্তের দিন নাকি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাই একবার তোমাদের দেখে-শুনে যেতে এলাম। আচ্ছা, তুমিই আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। বল দেখি—বার্ত্তা কি?"

ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকে গেল। আমি বল্লাম—"দোহাই ধর্ম্মরাজ; আমি রাজারাজড়া নই; আর ওয়াভেলী কায়দার প্রসাদাৎ আমার লাট-পরিষদের সদস্য হবার সম্ভাবনাও নেই। আমি নিতান্তই গরীব ব্রাহ্মণ। শেষে আপনার পরীক্ষায় ফেল হয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে কি ব্রাহ্মণীকে অনাথা করবো?"

ধর্ম্মরাজ হেসে বল্লেন—"আরে, ভয় নেই, ভয় নেই। তোমরা কি আর বেঁচে আছ যে তোমাদের আবার মারবো?"

তখন আমি সাহস পেয়ে বল্লাম—"হাঁ, তা বটে। আর আপনি যখন নাছোড়বান্দা তখন আমার বিদ্যের দৌড়টাই দেখে যান। এ দেশের এখন প্রধান বার্ত্তা হচ্ছে এই, দেশের সব মাতব্বর পুরুষেরা স্থির করেছেন যে, কোন রকমে একবার নূতন লাট-পরিষদের সদস্য হয়ে জাপানী যুদ্ধের খরচটা জুগিয়ে দিতে পারলেই চালের দর আর কাপড়ের দর একদম নেমে যাবে, ছেলেদের

পেটের পিলে সেরে যাবে, সাদায় কালায় গলা ধরাধরি করে নৃত্য করতে থাকবে; ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত সব দূর হয়ে যাবে; এক কথায় ভারতে সভ্য যুগের প্রথম লক্ষণ দেখা যাবে।"

ধর্ম্মরাজ খুব খুসী হয়ে বল্‌লেন—"বেশ, বেশ। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও—সুখী কে?"

আমি বল্‌লাম—"ধর্ম্মরাজ, এ প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা। এ দেশে সুখী দুই দল—মাড়োয়াড়ী ব্রাদার্স আর ভুলাভাই কোম্পানী।"

তখন তৃতীয় প্রশ্ন হ'লো—"আশ্চর্য্য কি?"

আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম—"হুজুর, আমরা যে এই বুদ্ধি নিয়ে এখনও বেঁচে আছি, এইটাই আমার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।"

ধর্ম্মরাজ পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করে মাথা নেড়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, এখন পন্থা কি?"

আমি ধর্ম্মরাজের পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বল্‌লুম—"হুজুর, ঐটি আমায় মাফ করতে হবে। পন্থা বাৎলে দিতে গিয়ে কি বল্‌তে কি বলে ফেলবো। আমি আর এ বয়সে ঠ্যাঙানি খেতে পারবো না। আমায় রামে মারলেও মেরেছে, রাবণে মারলেও মেরেছে। উত্তর না দিলে আপনার হাতে মারা পড়বো, আর উত্তর দিলে আবার কালই আমায়—"

হোঃ হোঃ হোঃ শব্দে একটা বিরাট হাস্য করে ধর্ম্মরাজ আমার টিকিটা ছেড়ে দিলেন। দিতেই ঠক্ করে টেবিলের উপর আমার মাথাটা ঠুকে গেল।

* * *

হোঃ হোঃ হোঃ।

চেয়ে দেখি, আমার বড় নাতি সুমুখে দাঁড়িয়ে হোঃ হোঃ করে হাসচে।

"ও দাদু, এরই মধ্যে বসে বসে ঘুমুচ্ছ? ভাত খাবে না?"

"ভাত কি রে? ধর্ম্মরাজ চলে গেছেন?"

"সে আবার কে? স্বপন দেখছ না কি?"

"স্বপন কি রে? এই যে এতক্ষণ আমার টিকি ধরে বসেছিল।"—ব'লে উঠ্‌তে গিয়ে দেখি যে ব্রাহ্মণী যে দড়িগাছটায় গামছা ঝুলিয়ে রাখতেন সে দড়িগাছটা ছিঁড়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ঝুলছে, আর তার একটা মুখ আমার টিকির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।"

কি দুঃস্বপ্ন! গোবিন্দ, গোবিন্দ! নাতিকে বল্‌লুম —"চল্ ভাই, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়িগে। আর রাজা-উজীর মেরে কাজ নেই।"

—ষোড়শী—

বিমলচন্দ্র ঘোষ

অনেক অনেক রাত হ'ল
পথে আর পথিক চলে না
একা চাঁদ জেগে জেগে সারা,
নিরজনে দীপ জ্বলে যায়,
দেখা হ'ল তোমার আমায়
কেহ নেই শুধু জাগে তারা
চারি চোখে পলক পড়ে না,
তোমার বয়স সবে ষোলো!

ভুলে গেছি সকালের কথা,
ভুলে গেছি তুমি ছিলে কাছে
কত কাজ করেছিল ভীড়,
হিসাবের খাতার পাতায়;
রজনীতে মোর কবিতায়
তুমি আজ বাঁধিয়াছ নীড়
কী যাদু তোমার আঁখিপাতে
ওগো মোর চির আকুলতা!

যে কথাটি বলি কানে কানে
মিলনের চির গোপনতা,
সুরভিত ফাগুনের গীতি
মিলিত প্রাণের পিপাসায়;
বাতায়নে চাঁদ দেখা যায়
দু'জনার সীমাহীন প্রীতি
পুলক-জাগানো সজীবতা
অধীর ব্যাকুল দু'টি প্রাণে।

অনেক অনেক রাত হ'ল
অধীর যুগল বাহু পাশে
বাঁধা সাত-সাগরের ঢেউ
কী অসীম মদির মায়ায়।
নিবু নিবু দীপের শিখায়
জানি হেথা আসিবে না কেউ
বনের কামনা ভেসে আসে;
তোমার বয়স সবে ষোলো

কলম

শ্রীসরোজকুমার রায়

সকালে উঠে খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম, খবরটি প্রকাশিত হয়েছে :

"এস্‌প্লানেডথেকে শ্যামবাজারগামী প্রথম শ্রেণীর ট্রামে একটি ফাউণ্টেন পেন পাওয়া গেছে। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে মালিক নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে সেটি নিয়ে যেতে পাবেন।"

অফিসের এবং বাড়ীর দুই ঠিকানাই দেওয়া াছে। যাঁর হারিয়েছে তিনি ১০টা থেকে ৬টার মধ্যে অফিসে এবং সকালে সন্ধ্যায় বাড়ীর ঠিকানার দেখা করতে পারেন। যাতে তাঁর সুবিধা হয়।

পর পর চারখানা কাগজ দেখলাম। প্রত্যেক-খানিতেই একটি দুটি ফাউণ্টেন পেন পাওয়ার বিজ্ঞাপন আছে।

ঠিকানাগুলি নোট বইতে টুকে নিলাম।

কলমটি হারিয়েছে পরশু। তার পর থেকে মনে আর শান্তি নেই।

পার্কারের কলমের এ বাজারে দাম আছে। এমনিতে তো পাওয়াই যাবে না, ব্লাকমার্কেটে কিনতে গেলে হয়তো একশো টাকার উপর দাম নেবে।

কিন্তু দামের জন্যেই শুধু নয়। কলম আমার কেনা নয়, কাকেও বিক্রি করবার ইচ্ছাও ছিল না। এমনও কিছু ঠেকা নয় যে, কলমটা হারিয়ে এখনই একটা কলম আমাকে কিনতে হবে।

আসল কথা, বড় সখের জিনিষ। ওর উপর আমার কেমন মমতা পড়ে গেছে।

অবশ্য শুধু সখের জিনিস ব'লেই নয়, মমতা পড়ার আরও কারণ াছে :

অনেক দিন আগের কথা। তখন ইংরিজিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স নিয়ে সবে এম-এ আর ল' ক্লাশে ভর্তি হয়েছি। সেই সময় বিয়ে হ'ল। বিয়ের পরে আমার পিসশ্বশুর ওটি উপহার দিয়েছিলেন।

হয়তো শুধুই স্নেহের উপহার। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর জামাই এক দিন হাইকোর্টের জজ হবে এবং জজের উঁচু চেয়ারে ব'সে এই কলমে নাম সই করবার সময় তাঁকে একবার স্মরণ করবে।

উপহার দেবার সময়, তাঁর মনে কি ছিল তিনিই জানেন। কিন্তু নেবার সময় আমার মনে ওই কথাটিই উঠেছিল। কলমটিকে আমার প্রাপ্য বলেই নিয়েছিলাম। এবং যখনই সেটিকে দেখতাম, আমার মন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নে ভরে উঠতো।

সে স্বপ্ন আজকে আর নেই। কলমটা হারিয়ে অনেক দিন পরে স কথা আজ মনে পড়ল, নয়তো দশটা-পাঁচটা অফিসের নিরেট অবকাশের মধ্যে মনেই পড়তো না।

সে স্বপ্ন নেই, সে স্ত্রীও নেই। কালধর্মে সে শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গেও মস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শুধু স্মৃতিস্বরূপ ছিল এই কলমটি। তাও গেল।

কি কারণে জানি না এই কলমটির উপর আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মন সপত্নী-বিদ্বেষ পড়েছিল।

কলমটি হারালে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কেবল তিনিই হেসে বলেছিলেন, বেশ হয়েছে! যেমন দিনরাত্রি কলম কে নিয়ে বেড়ানো, তেমনি হয়েছে!

এখন বিজ্ঞাপনটি হাতে নিয়ে রান্নাঘরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, ভগবানের ইচ্ছায় কলমটি পাওয়া গেল বোধ হয়।

মুখ না ফিরিয়েই তিনি বললেন, বোধ হয়? তাহ'লে পাওয়া যায়নি এখনও?

তাড়াতাড়ি বললাম, না, সে এক-রকম পাওয়া যাওয়াই। বিজ্ঞাপন দিয়েছে খবরের কাগজে।

—ও। তাহলে আর দেরি কোরো না।

মুখ দেখা না গেলেও আমি বুঝছিলাম, সেই অন্ধকার রান্নাঘরে উনানের আলোয় ওঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আর কিছু না ব'লে আমি বেরিয়ে এলাম।

আজ আর আফিস যাওয়া হবে না। বিজ্ঞাপনে ঠিকানা যা দেওয়া হয়েছে,—একেবারে টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত। একখানি ঘুরে এসে আর আফিস যাওয়া সম্ভব নয়। ডাকঘরের পিওন যেমন চিঠিগুলো পরের-পর সাজিয়ে নেয়, আমিও তেমনি ঠিকানা-অনুযায়ী বিজ্ঞাপনগুলো সাজিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

টালা থেকেই আরম্ভ করা যাক। সকালবেলায় যত দূর হয় হোক বাকি বিকেলে দেখা যাবে।

শোবার ঘরে মা-কালীর ছবিতে বার বার প্রণাম ক'রে বেরিয়ে পড়লাম।

• • ষ্ট্রীট, সে কি এখানে? খানিকটা ট্রামে, খানিকটা বাসে, খানিকটা হেঁটে সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম। নম্বরটাও বিদঘুটে, ২১।১।১ বি। ছাব্বিশ অবধি পেলাম, তার পরেই বত্রিশ। উনত্রিশ তাহ'লে বোধ করি ওই সরু গলিটার ভিতরে।

অন্ধকার সরু গলি। দু'ধারে উঁচু-উঁচু বাড়ি, মাঝখানে এক হাত চওড়া ইট বারকরা সরু গলি। আমের খোসা, ময়লা কাগজ আর ন্যাকড়া ছড়ানো। তারই মধ্যে বাঁকের মুখে একটা ডাষ্টবিন পর্য্যন্ত আছে।

যেমন নোংরা, তেমনি দুর্গন্ধ।

কলমের টানে দুর্গানাম স্মরণ ক'রে তারই মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

একটু গিয়েই দেখা গেল, কারা যেন সারিবন্দী দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন একটা গোলযোগও বেধেছে।

ভাবলাম, এর ভিতরে বোধ হয় একটা রেশন-শপ আছে।

কিন্তু পাস কাটিয়ে যাই কি করে?

কাছে গিয়ে দেখি, রীতিমত দাঙ্গার অবস্থা:

—সকাল থেকে এ তো এক আচ্ছা ঝামেলা বাধিয়েছেন মশাই! রাস্তা ছাড়ুন, আমাদের আফিস যেতে হবে না?

—মশাই, এই তো আপনাদের রাস্তা। এ ছাড়বোই বা কোথায় ধরবোই বা কোথায়?

—তাহ'লে আপনাদের উৎপাতে আমাদের কি আফিস কাছারী বন্ধ করতে হবে?

কে এক জন চুপি-চুপি বললে, করুন না এক দিন বন্ধ।

—বটে! মামার বাড়ীর আবদার! সরুন, যেতে দিন।

আমি পাস কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই এক জন খপ্ ক'রে আমার হাতখানা চেপে ধরে বললে, কি মশাই পাড়ার লোক, না কলম?

—মানে?

—মানে কলম হ'লে আর এগিয়ে যাবেন না, আমার পেছনে দাঁড়ান।

—আপনারা কি কলমের জন্তে···

লোকটি সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই সকাল সাড়টা থেকে। এক জন লোক বেরিয়ে এলেন। কিউ একটু এগুলো।

ভদ্রলোক বেরুনো মাত্র কিউ চঞ্চল হয়ে উঠল:

—কি মশাই, পেলেন?

ভদ্রলোক গোঁ গোঁ ক'রে কি যেন বলতে বলতে মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

কিউ খুশি হয়ে উঠলো:

—যাক, তাহ'লে এখনও চান্স আছে।

—আছে তো। কিন্তু কার?

কিউ আবার যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

সাড়ে ন'টায় আমার ডাক পড়লো।

ভিতরে যেতেই ভদ্রলোক বললেন, ফিস্‌ফিস্ ফিসফিস বলুন মশাই আপনার কি কলম। আমার আফিসের তাড়া আছে।

—পার্কার!

—না। আপনি আর দাঁড়াবেন না, যেতে পারেন।

না?

সংসারে এত বড় নিষ্ঠুর শব্দ যে থাকতে পারে, আমার ধারণাতেও ছিল না।

না? আমার নয়? তাহ'লে আমার কলমটা গেল কোথায় মশাই? সেটা যে হারিয়েছে তাতে তো আর ভুল নেই!

কিন্তু ভদ্রলোক আর একটি সেকেণ্ডও আমাকে ঘরের মধ্যে থাকতে দিতে নারাজ।

সুতরাং বেরিয়ে আসতেই হ'ল।

এর পরে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

দশটার মধ্যে পৌঁছুতে পারলে হয়তো ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা পাওয়া যাবে।

ছুটলাম হন্ত-দন্ত হয়ে।

সেখানেও সেই কিউ। কেবল সুবিধা এই যে, রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত চওড়া। পথচারীদের সঙ্গে কলহের অবকাশ অল্প। তবে যাবার আসবার সময় পথচারীরা কৌতুকে অবজ্ঞায় মিশ্রিত যে দৃষ্টি হেনে যাচ্ছে, তাতেই সেটা পুষিয়ে যাচ্ছে।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। সেই রোদে সকলের পিছনে এসে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে আরও কয়েক জন আমার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। তার মধ্যে এক জন টালার, কিউতেও আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেও তাঁকে দেখে আমার কী ভালোই যে লাগলো, সে আর বলবার নয়! মনে হল ভদ্রলোক যেন আমার কত কালের আত্মীয়।

সাদরে অভ্যর্থনা জানালাম, আসুন আসুন!

ভদ্রলোকও আমাকে দেখে যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে এক গাল হেসে বললেন, এই যে!

এক জন ঘরের ভিতর থেকে ব্যর্থ হয়ে বেরিয়ে আসে, আর এক জন ভিতরে যায়, আমরা এক পা ক'রে এগুই, তার পরে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকি। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ। দেখতে দেখতে স্থান-কালের বোধ লুপ্ত হয়ে গেল। কেন দাঁড়িয়ে আছি, কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, সব ভুলে গেলাম যন্ত্রের মতো মাঝে মাঝে এক পা এগিয়ে যাই, আবার দাঁড়াই।

এমনি ক'রে কতক্ষণ চললো জানি না, হঠাৎ এক সময় দেখলাম, আমি একটা ছোট ঘরের ভিতরে।

ছোট ঘর। দেওয়ালে চুনকাম মলিন হয়ে গিয়েছে। তাতে চারি দিকে অনেকগুলো ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। মধ্যে একখানা ভাঙা টেবিল, তার উপরে একখানা খবরের কাগজ পাতা। তার ওদিকে একখানা একহাত-ভাঙা চেয়ারে খালি গায়ে এক জন স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোক হাইকোর্টের জজের মতো গম্ভীর ভাবে বসে।

আমাকে দেখামাত্র হাঁকলেন, কি কলম আপনার?

কলম? কলমের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। থতমত খেয়ে বললাম, আজ্ঞে পার্কার।

—রং বলুন।

—সবুজ রং, মাথার ক্লিপের কাছে···

—আপনার নয়। আপনি যেতে পারেন।

ক্ষুধা পেয়েছে ভয়ানক। কিন্তু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছিল না। সেখানে গৃহিণীর সেই কৌতুকোজ্জ্বল চোখ:

—পেলে না?

তার পরে ঠোঁটটা একটু উল্টে গেল।

সেই দৃশ্য মনে পড়তেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

কলম না নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। অন্ততঃ সন্ধ্যার আগে নয়। আশা এখনও যায়নি। আর একটা বিজ্ঞাপন আছে, ভবানীপুরে, বেলতলা রোডে। সেখানে না পাওয়া গেলে টালিগঞ্জ।

কিন্তু ক'টা বাজে এখন?

—ক'টা বাজে মশাই?

ভদ্রলোক নিঃশব্দে বাঁ হাতটা উল্টে দেখালেন।

বারোটা!

এর মধ্যে বারোটা বেজে গেল? অজ্ঞাতসারে উজ্জ্বল ধূসর আকাশের দিকে চাইলাম।

স্নান হবে না আর। তবে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। তার পরে রইল বেলতলা। ক্লান্ত আমার টাক-মাথা।

খুঁজে খুঁজে বাড়িটা যখন বের করলাম, তখন বোধ করি বা দুটোই হবে।

এখানে একটা সুবিধা—কিউ নেই। সে-পর্ব সম্ভবতঃ সকালেই চুকে গেছে। কিন্তু বাবু বাড়ী আছেন কি না কে জানে?

নিচের দরজা-জানালা সব বন্ধ। হয়তো সব মধ্যাহ্ন-নিদ্রা উপভোগ করছে। এ সময় কড়া নেড়ে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে?

ভাবছি। এমন সময় উপরে ছোট ছেলেমেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তারা ঘুমোয়নি, খেলা করছে।

যা করেন মা কালী ব'লে কড়াটা ঠকাঠক নেড়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে উপরে ছেলেমেয়ের কলরব বন্ধ হ'ল।

আবার একবার কড়া নাড়লাম।

—কে?

আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো। রক থেকে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালাম।

—কে?

একটি বছর বারো-তেরোর ছেলে দোতলায় রেলিঙ থেকে মুখ বাড়ালে।

—বাবু আছেন?

মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং তার পরে:

—বাবা, আবার সেই কলম!

—বলিস কি? এই দুপুর রোদে? সারা সকাল ওই ঝামেলা পোহালাম।—(কণ্ঠস্বরে বিরক্তি)।

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—কি ক'রে বুঝলি?

—অবিকল কলম-হারানোর মতো মুখ!

—আঃ জ্বালাতন! মুখপোড়ারা দুপুরেও একটু ঘুমুতে দেবে না গা? বল্ বাবু বাড়ি নেই।—(বিরক্ত নারীকণ্ঠ, বোধ করি সুপ্তোত্থিত গৃহিণীর)—বিকেলে উঠেই কলমটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবে, এই তোমাকে ব'লে দিলাম। এক দিনেই অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি তখন কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠেছি।

ইতিমধ্যে বাইরের ঘরের দরজা খুলে গেল। কিন্তু বাবু নয়, চাকর। চোখ মিটমিট ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, কি? কলম?

মনে হ'ল বলি, না, কলম নয়। বাগবাজার থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনেছি বাবুকে দিতে।

কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হ'ল না।

চাকরটি সকৌতুকে আপাদ-মস্তক আমার দিকে চেয়ে বললে, আপনার কলম নয়। সে অনেক দামী কলম, বুঝলেন? বলে ফিক ক'রে হেসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেক দামী কলম? সুতরাং আমার হতে পারে না?

এতক্ষণে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়লো:

জুতোর উপর সহস্র জুতোর পীড়ন-চিহ্ন। কাপড়খানা বোধ করি খুব ফর্সা ছিল না। এখন তা রীতিমত মলিন। ট্রামের ধস্তাধস্তিতে পাঞ্জাবীর পিঠের আধখানা ছিঁড়ে গেছে। আয়না-ছাড়া নিজের মাথা দেখবার ভাগ্যিস্ ভগবান সুবিধা দেননি। নইলে দেখতাম, মাথার চুল রুক্ষ, মুখ শুকনো এবং দুর্ভাবনায় আর এই এক দিনের ঘোরাঘুরিতেই চোখের কোণে কালি পড়েছে!

কিন্তু সে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। এর পরে আর এক মুহূর্ত্ত বেলতলায় দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক নয়।

আর রইল টালিগঞ্জ।

কিন্তু সেখানেও যদি এই কথাই বলে?

বাড়ি গিয়ে তেল মেখে স্নান করে ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় প'ড়ে টালিগঞ্জে যাওয়া অবশ্য যায়। কিন্তু গৃহিণীর মুখ স্মরণ ক'রে সে ইচ্ছা দমন করলাম। স্থির করলাম, টালিগঞ্জ সন্ধ্যার মুখে যাওয়া যাবে। তাহ'লে পরিচ্ছদের মলিনত্ব সহজে দৃষ্টিগোচর হবে না। বিকেলটা রেষ্টুরেণ্টে এক পেয়ালা চা খেয়ে আর পার্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে দিব্যি কেটে যাবে।

টালিগঞ্জে যখন পৌঁছুলাম বাবু তখন বৈঠকখানা ঘরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প করছিলেন।

ফরাসের উপর ধোপ-দুরস্ত চাদর পাতা। তার উপর গোটা কয়েক তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কয়েক জন ব'সে। মধ্যে একটা ডিসে অনেকগুলো পান। তামাক এবং সিগারেট দুইএরই ব্যবস্থা আছে। মাথার উপর পাখা ঘুরছে। দেওয়ালের দিকে খানকয়েক চেয়ার।

ঘরে ঢোকবার আগেই 'কলম' শব্দ কানে আসতে এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়লাম।

হ্যাঁ, কলমেরই গল্প চলচে।

কিন্তু আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। সবলে সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালাম।

দাঁড়ানো মাত্র মধ্যের ভদ্রলোকের ওষ্ঠ থেকে যেন অজ্ঞাতসারেই একটি অস্ফুট শব্দ স্খলিত হ'ল: এই!

এক সেকেণ্ড নিস্তব্ধ।

তার পরেই একটা প্রচণ্ড হাসির শব্দ যেন বোমার মতো বিস্ফুরিত হয়ে উঠলো। সে হাসি যেন শুধু মানুষের কণ্ঠ থেকেই উঠছে না। দেওয়ালে-টাঙানো ছবির পাশ থেকে, পাখার আর্মেচার থেকে, সর্বত্র থেকে উঠছে। এমন কি, মনে হ'ল ডিসের পানগুলো শুদ্ধ যেন হাসির ঠমকে কেঁপে উঠলো।

এর পরে মরিয়া লোকের পক্ষেও কম্পিত পা দু'খানার উপর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হ'ল।

গৃহস্বামী যথাসম্ভব দ্রুতবেগে হাসি মুছে ফেলে প্রশ্ন করলেন, কলম?

তখনও তাঁর চোখের কোণে এবং ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেশ রয়েছে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে যথাসম্ভব শক্ত হয়ে উত্তর দিলাম, আজ্ঞে হাঁ। একটা পার্কার পেন,...

—পার্কার? কি রং?

—সবুজ।

—সবুজ? বসুন, বসুন। তার পরে?

চেয়ারে ব'সে মুখস্থ বলার মতো ক'রে ব'লে গেলাম, মাথায় ক্লিপের কাছে একটা কাটা দাগ আছে।

ভদ্রলোক এবার সত্য সত্যই যেন উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, রেজিষ্টার্ড নম্বর মনে আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ১৩৪৬১।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন:

—ওরে ভজুয়া, বাবুর জন্যে শিগগির এক বাটি চা এনে দে।

তার পরে সব নিস্তব্ধ।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পোনেরো মিনিট।

চা এলো, খাওয়া হ'ল, চায়ের বাটি নিয়ে ভজুয়া চলে গেল।

ঘর নিস্তব্ধ। শুধু ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একটু পরে ভদ্রলোক বললেন, আমার সন্দেহ নেই যে কলম আপনার।

আবার নিস্তব্ধ।

—কিন্তু সে কলম অন্য লোকে ধাপ্পা মেরে নিয়ে গেছে।

ঘরশুদ্ধ সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলো: বলো কি? ধাপ্পা মেরে?

—হ্যাঁ।

এত কথার কিছু আমার কানে গেল, কিছু গেল না। কি বুঝলাম জানি না। আপন মনেই একটু হাসলাম। সমস্ত দিনের মধ্যে এই প্রথম হাসি।

তার পর একটা নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলাম।

—অদ্বয়—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

থেকে থেকে মন কেন বা এমন
ভেঙে পড়ে বৈরাগ্যে ?
বসন্ত আজ গিয়েছে যখন,—
যাক্ গে।

গেছে যৌবন এসেছে ত জরা
বহু পুণ্যের কল্যাণে ভরা
পাকা চুলে সীঁথি সিন্দুর পরা
ঘর করে সেই কল্যাণী ;
জড়াইয়ে তারে চীনাংশুকের
অন্তরালে
আজও বাহিরাই ক্ষুদ্র ভ্রমণে
নিদাঘের প্রতি প্রাতঃকালে
বায়ুভূত আয়ু সন্ধানি'।
ভাগ্যবতী সে-আয়ুষ্মতীর স্বামী
নোয়া ক্ষয় দিয়ে আজও বেঁচে আছি আমি ;
বেঁচে আছে আজও আমার বসুন্ধরা,—
আমারি প্রাণের গানে রূপে রসে
গন্ধে পরশে ভরা।
আজও ত আমার আঁখির তারায়
আকাশের তারা আঁধারের চাঁদ
ডুব দিয়ে দিয়ে রূপ খুঁজে পায়,
কর পাতি' তারি দুয়ারে দাঁড়ায়
আলোর ভিখারী রবি,
পলক ফেলিয়া প্রলয় আঁধার
পলে পলে অনুভবি।
আমারি শ্রবণ রচে নিখিলের গান,
আমারি পরশ-পুলকে বিশ্বপরাণু
বেপথুমান।
নিশ্বাসে মোর মালঞ্চ-কোণে
ফুটাই যৌবনগন্ধা,
লীলায়িত করে দুলাই আকাশে
বিজন মনের সন্ধ্যা।
আছে এ জীবনে আছে তাই আজও সব,
মূক অতীতের মুখে তাই ফুটে
আগামীর কলরব।

মোর যৌবনে ফাগুন-পবনে
নব মঞ্জরী জাগালো যারা,
কত কুহরণ কত গুঞ্জন
কত রঞ্জনে রাগালো, তারা
একে একে গেছে চলিয়া, তবু
যায়নি কেবলই ছলিয়া গো !
নীরব সে সব পিক-অলিদল
চেয়ে আছে মোর অন্তরতল
স্মৃত বিস্মৃত অগণিত গীত-সৌরভে,
তাদেরি কণ্ঠ-পরম্পরায়
ঝরা বকুলের মালা গাঁথি আর
ঋতু-বালিকারা কবরী জড়ায়
নিতি নৃত্যের উৎসবে।
মোর জীবনের দিক্ দিগন্ত ভরি
কুহক কণ্ঠে যত ডাকে—'কুহু কুহু',—
মাটীর কবরে খুলি' আবরণ
অঙ্কুরি' উঠে শত শিহরণ,
ফুলে ফুলে আঁখি মেলিয়া মরণ
বেঁচে উঠে মুহু মুহু।
জাগে গুঞ্জন উথলে গন্ধ
রসের সাগরে রূপের ছন্দ
শতদলে উঠে দুলিয়া।
একবার ছিঁড়ে হারানো ছড়ানো,
আর বার গেঁথে কণ্ঠে জড়ানো,—
আপন নিজনে সৃজন-লয়ের
লীলা-মঞ্জুষা খুলিয়া !
আমি যদি আছি, সবই তবে আছে,
এ মোর জীবনে মরণও যে বাঁচে,
মোর দ্বারে জরা যৌবন যাচে,—
মিছে কেন বৈরাগ্য ?
আমারি লীলায় যা আসে যা যায়
থাকে থাক্ যায় যাক্ গো।

★

শিকার-কাহিনী

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শিকার অত্যন্ত প্রচণ্ড রকমের একটা নেশা। এক শিকারীই তাহা উপলব্ধি করতে পারে। এমন বহু দিন হইয়াছে, Bait বাঁধিয়া অথবা মড়ি (Kill)র উপর বসিয়া বিনিদ্র রজনীই যাপন করিয়াছি; কতক দিন উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, অধিকাংশ দিনই ব্যর্থ প্রয়াসে ফিরিতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের উৎসাহ শিথিল হয় নাই, চেষ্টা কমে নাই। অবসর ও সুযোগ পাইলেই পুনরায় গিয়াছি। শিকারে একটা মাদকতা আছে। অজানার মোহ, অনিশ্চিতের আহ্বান, বিপদের আকর্ষণ মানুষকে যুগে যুগে টানিয়াছে; দুর্গম গিরি লঙ্ঘনে, দুস্তর পারাবার অতিক্রমণে তাহাকে প্রেরণা যোগাইয়াছে! অবশ্য ইহা মহামানবের পক্ষে। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি আমাদিগকেও এই প্রেরণাই ক্রিয়া-প্রতিযোগিতায় বা শিকারের অন্বেষণে নিয়োজিত করে।

সে-দিন কার্ত্তিকের শুক্লা দশমী। আকাশ মেঘমুক্ত, নির্ম্মল। স্নিগ্ধ কৌমুদীধারায় চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত। বনের প্রান্তে এক ঝোপের মধ্যে গরুর গাড়ীর ছই পাতিয়া আমরা তিন বন্ধুতে ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা করিতেছি। ছইএর সম্মুখে ১৫।১৬ হাত দূরে রজ্জুবদ্ধ ছাগশিশু ক্রমাগত ডাকিয়া চলিয়াছে। তাহার ডাকে প্রলুব্ধ হইয়া বাঘ সম্মুখে আসিলেই আমরা গুলী করিব। এ অঞ্চলে এক ব্যাঘ্র-দম্পতি কয়েক দিন যাবৎ উপদ্রব করিতেছে। গৃহস্থের ছাগ-মেষ গো-বৎসাদির অনেকগুলিই তাহাদের উদরসাৎ হইয়াছে। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন আমরা ছই পাতিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, তখনই জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের গর্জ্জন কয়েক বার শোনা গিয়াছিল। আমাদের অনধিকার প্রবেশে বোধ হয় বিরক্ত হইয়া অসন্তোষ জানাইতেছিল। সন্ধ্যার ২০।২৫ মিনিট পরই ব্যাঘ্র দুইটি আমাদের ছইএর পশ্চাতে আসিয়া নানারূপ গর্জ্জন করিতে লাগিল। ছইএর চারি পাশই ডালপালা দিয়া আবৃত। কেবল সম্মুখ ভাগে স্বল্প-পরিসর চতুষ্কোণ একটি ফাঁক আছে। সেই রন্ধ্র পথে সম্মুখ দিক্ দেখা যায় ও বন্দুকের নল বাহির করিয়া গুলী করা চলে। ছইএর পশ্চাতে অতি নিকটেই ব্যাঘ্রের অবস্থিতি বুঝিতে পারিলেও গুলী করিবার কোনও উপায় ছিল না। বাঘ দুটি কখনও আমাদের বাম পার্শ্বে কখনও দক্ষিণ পার্শ্বে যায়, কখনও দূরে সরিয়া যায়, আবার নিকটে ফিরিয়া আসে। অনেক বারই মনে হইল যে, এইবার ছাগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কিন্তু রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল, বাঘ সম্মুখে আসিল না এবং আস্তে আস্তে দূরে চলিয়া গেল। আমরাও হতাশ হইয়া ছই হইতে বাহিরে আসিলাম। মনে হয়, বন্ধুবর বন্দুকের নলটি বাহির করিয়া যেরূপ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছিল তাহাতেই আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বাঘ লোভনীয় আহার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। চিতাবাঘ স্বভাবতঃই অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির।

২

ফাল্গুনের মাঝামাঝি, শীতের প্রকোপ হ্রাস হইয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে খোসবাগে এক আম্রকাননে উচ্চ শাখায় মাচান বাঁধিয়া তিন বন্ধুতে বসিয়া আছি। পূর্ব্বের মত সম্মুখে একটি ছাগল রজ্জুবদ্ধ আছে। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় অদূরবর্তী [illegible] বাঘের সুগম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি কয়েক বার শোনা গেল। কিন্তু এক ঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করিয়াও ব্যাঘ্র-সন্দর্শন-সৌভাগ্য হইল না। পরদিন সন্ধ্যায় পুনরায় মাচানে বসিলাম। যখন আমরা মাচানে আরোহণ করি তখনই বনের প্রান্তে বাঘটি গর্জ্জন করিতেছিল। সম্ভবতঃ ঐ পথেই বাহিরে আসিতেছিল, আমাদের উপস্থিতিতে তাহার ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। মাচানে উঠিবার পর আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই। রাত্রি ৯টায় দূরে ফেউ ডাকিল। মনে করিলাম বাঘটি আজিও চলিয়া গেল; অত্যন্ত সুচতুর, Baitএ আসিবে না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্তি আসিয়াছিল। বন্দুকটি মাচানের উপর রাখিয়া চক্ষু দুইটি একটু মুদ্রিত করিয়াছি। বন্ধুবরও বৃক্ষশাখায় হেলান দিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনার উদ্যোগ করিতেছে। আজ তারই শিকার করিবার পালা। মিনিট খানেক না যাইতেই মাচানের নীচে হইতে বাঘটি ছাগলকে charge করিয়াছে। শব্দে চক্ষু উন্মীলন করিতেই দেখি যে ছাগলটি ঘুরিয়া গিয়াছে ও তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য বাঘটিও ঘুরিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রের অন্ধকারেও বুঝিতে পারিলাম যে, ব্যাঘ্রটি বিশেষ বৃহদাকার ও গতরাত্রির গর্জ্জন শুনিয়া যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা নহে। আমি বন্দুকটি হাতে উঠাইতেছি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বন্ধু অন্ধকারেই গুলী করিল। তাহার টর্চের স্ক্রু ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বন্দুকে টর্চ সংযোজিত করা হয় নাই। গুলী লাগে নাই। নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া গিয়া বাঘটি জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বন্ধুবর "হ" বলিল, "বাঘ নহে শৃগাল।" মাচানের উপর আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা বৃথা আশায় কাটাইয়া যখন নীচে নামিয়া আসিলাম তখন ছাগলের অঙ্গের ক্ষত দেখিয়া উহা যে বাঘ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ রহিল না।

সে-বার বর্ষাকালে ভাল বৃষ্টি হয় নাই। শীতের শেষে অধিকাংশ পুষ্করিণী, খাল, ডোবা শুকাইয়া গিয়াছিল। সংবাদ পাইলাম, বহরা গ্রামে এক পুষ্করিণীতে একটি বাঘ প্রতি সন্ধ্যায় জল খাইতে আসে। পুষ্করিণীটি পল্লীর এক প্রান্তে। এক পারে এক গৃহস্থের বাটী, অপর তিন দিকে খোলা মাঠ। বন্ধুবর "হ" তীরসংলগ্ন প্রাঙ্গণে আমগাছ ও নিমগাছের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইল। আমি অদূরে গোশালার এক কোণে আশ্রয় লইলাম। জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল ছিল না। বন্ধুবর বন্দুকে টর্চ সংলগ্ন করিয়া লইয়াছিল। অল্প কয়েক মিনিট পরই দেখি—পুষ্করিণীর পাড়ে টর্চের আলো ফেলিয়াছে। আমগাছের একটি শাখা জলের উপর আসিয়া পড়ায় পাড়ের সেই স্থানটি আমার দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে। প্রায় ৬।৭ সেকেণ্ড টর্চ জ্বালাইয়া রাখিল। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হইল ও বাঘটি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া পলাইল। পরে জানিলাম যে, বাঘটিকে পাড়ে নামিতে দেখিয়া বন্ধুবর টর্চ জ্বালিয়া লক্ষ্য লইবার জন্যই বিলম্ব করিতেছিল, কিন্তু বন্দুকের নলটি নামিয়া যাওয়াতে গুলী লাগে নাই। শিকারীর স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, first aim is the best aim এবং aim লইতে অধিক সময় লইলে লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা আছে।

৩

আমাদের বাসস্থানের ৮।৯ মাইল পূর্ব্বে বালির বিলের অপর পারে কয়েকখানি গ্রামে বাঘের ভয়ঙ্কর উৎপাত হইয়াছিল। এক দিন বৈকালে বন্ধুদের সহিত সেখানে উপস্থিত হইলাম।

জানিলাম, পূর্ব্ব-রাত্রেই এক গোয়ালার গোশালায় বাঘ পড়িয়াছিল। কিন্তু গৃহস্থ সজাগ থাকায় কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই। গ্রামের বাহিরে অদূরে একটি দীর্ঘিকা আছে। প্রতি রাত্রেই জল খাইতে বাঘ সেখানে আসে। উহার পাশ দিয়া গ্রামে প্রবেশের পথ গিয়াছে। সেই পথের ধারে এক খণ্ড পতিত জমির পাশে বাসকের ক্ষুদ্র ঝোপ। তাহার মধ্যে গরুর গাড়ীর ছই পাতিয়া অল্প দূরে একটি ছাগল বাঁধিয়া রাখা হইল। রাত্রি প্রায় ১টা; বাঘের গর্জ্জন বা ফেউএর ডাক কিছুই শুনিতে পাইলাম না। চৈত্রের শুক্লা চতুর্দ্দশী। সমুজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। অদূরস্থ পল্লীর কর্ম্ম-কোলাহল সন্ধ্যার পর নীরব হইয়া গিয়াছে। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরস্থ আম্রকানন হইতে পাপিয়ার সুমধুর স্বরলহরী বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনীর সেই স্বপ্নভরা রূপ মনে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেগের সঞ্চার করিয়াছিল। শিকারীর সদ্য-কর্ত্তব্য হইতে মন বিভ্রান্ত হইয়া আকাশের বাতাসের সেই পুলক মাদকতায় নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। সহসা কিসের শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া বাঘটি ছাগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুবর ছইএর সম্মুখ ভাগে বসিয়াছিল। লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলী ছুঁড়িল। বাঘটি ছাগলের গ্রীবা স্বীয় মুখবিবরে লইয়া যেমন বসিয়াছিল সেইরূপই থাকিল। —পুনরায় গুলী করিল। এইবার বাঘটি লুটাইয়া পড়িল। ছইএর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, প্রথম গুলী বাঘের হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া দিয়াছে ও সেই দণ্ডেই মৃত্যু ঘটিয়াছে।

সারগাছি ষ্টেশনের নিকট কয়াগ্রামে বাঘের ভীষণ দৌরাত্ম্য হইয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আম্রকুঞ্জে একটি বাঘ আশ্রয় লইয়াছে। গ্রামে প্রবেশ করিবার জন্য বাঘটি যে পথে আসিত সেই পথের ধারে বৃক্ষশাখায় একটি মাচান বাঁধিয়া লওয়া হইল। সম্মুখে একটি ছাগল বাঁধা থাকিল। সন্ধ্যা হইতেই ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। অল্পক্ষণ পরেই ছাগলের নিকট ১০০।১২৫ গজ দূরে বাঘটি দেখা দিল। কখন বা থাবা পাতিয়া বসিতেছে, কখন বা দেহের অগ্রভাগ ভূমি-সংলগ্ন করিয়া শুইয়া পড়িতেছে। এরূপ ভাবে প্রায় তিন কোয়ার্টার কাটিলে বাঘটি অতি দ্রুত-পদক্ষেপে আসিয়া ছাগলটিকে ধরিয়া বসিয়া পড়িল। ম্লান জ্যোৎস্নাতে কোন্‌টি ছাগল কোন্‌টি বাঘ কিছুই চেনা যাইতেছে না। উহাদের দেহের সামান্য সঞ্চালন হইতে ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছি। বন্ধুবর পর পর গুলী করিল। বাঘটি ছাগশিশুকে ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই বাহির হইয়া ছাগলের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইতেছিল। বন্ধুবর পুনরায় গুলী করিল। এবার বাঘটি ছুটিয়া গিয়া ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোক বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। চীৎকার করিয়া তাহাদের নিষেধ করিলাম। সেই চীৎকারে আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া বাঘটি স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। নতুবা নধর ছাগ-মাংসের লোভ তাহাকে পুনরাগমনে প্রলুব্ধ করিতে পারিত মনে হয়। সুখের বিষয়, ছাগলটি অক্ষতই ছিল।

৪

এক দিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সংবাদ আসিল যে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বাঘে বলদ মারিয়াছে ও 'মড়ি' পাহারায় লোক নিযুক্ত আছে। তিন বন্ধুতে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেই ভয়ে মড়ি-রক্ষীরা সকলেই স্ব স্ব গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। মড়ির নিকট কোনও গাছ ছিল না, গ্রামেও গরুর গাড়ীর ছই পাওয়া গেল না। অগত্যা একখানি গরুগাড়ী টানিয়া আনিয়া খড় দ্বারা আবৃত করিয়া তাহার নীচেই আমরা বসিলাম। বাঘটি খুব সম্ভব আহার ত্যাগ করিয়া দূরে যায় নাই। নিকটস্থ ঝোপে লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছে। রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াও তাহার দর্শন পাইলাম না। অনাবৃত স্থানে মড়ি পড়িয়া থাকিলে শকুনে খাইতে পারে বলিয়া মড়িটি টানিয়া কিছু দূরে অবস্থিত আমগাছের নীচে রাখিয়া আসিলাম। সেই বৃক্ষশাখায় মাচান বাঁধিয়া সন্ধ্যায় তিন বন্ধুতে ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা করিতেছি। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমিয়াছে ও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম যে, একটি শৃগাল অতি সন্তর্পণে আসিয়া মড়িটির নিকট দাঁড়াইল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই দ্রুত পলায়ন করিল। বুঝিলাম, বাঘ নিকটেই আসিয়াছে। শুষ্ক পত্রের উপর মৃদু পদক্ষেপের শব্দ শুনিলাম। অতি সাবধানে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। কিছু দূর আসিয়া বেগে ছুটিয়া পালাইল। এইরূপ তিন-চারি বার হইল। বুঝিলাম, তাহার সন্দেহ ঘুচে নাই—আশঙ্কাও দূর হয় নাই। শেষ রাত্রে মাচান হইতে নামিয়া আসিলাম। পরদিন সন্ধ্যায় পুনরায় মাচানে উঠিতে যাইতেছি, নিকটস্থ বাঁশবনের মধ্য দিয়া কোনও জন্তুর চলিয়া যাইবার শব্দ পাইলাম। মড়ির নিকট গিয়া দেখি, বেচারা কেবল ভোজনে উদ্যত হইয়াছিল। আমাদের আকস্মিক আগমনে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। যাহা হউক, মাচানে আরোহণ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি সাড়ে ১টার পর সতর্ক পদসঞ্চারে আসিয়া বাঘটি অনিচ্ছায় পরিত্যক্ত আহার সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বন্ধুবর 'হ' আমাকে বলিল, "কিছুক্ষণ খাইতে দাও, একসঙ্গে দুই জনে গুলী করিব।" ১০।১২ মিনিট পরে দুই বন্ধুতে বন্দুক উঠাইয়া টর্চ জ্বালিতেই দেখিলাম যে, মড়িটি খানিক দূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে ও গাছের একটি শাখা ব্যাঘ্র ও আমাদের মধ্যে অন্তরালের সৃষ্টি করিয়াছে। 'হ' গুলী করিল কিন্তু পাতায় বাধা পাইয়া লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। মাচানে উঠিয়া মনে হইয়াছিল যে, শাখাটি কাটিয়া ফেলিলে ভাল হইত। সামান্য অনবধানতার জন্য এই কয় দিনের পরিশ্রম বৃথা হইল। এই তিন দিন যাবৎ বাঘটি মড়ি পাহারা দিতেছিল। শৃগাল বা সারমেয় কেহই খাইতে সাহস করে নাই। বাঘের পক্ষে এরূপ পাহারা দেওয়া বিচিত্র নহে।

চন্দ্রহাট গ্রামে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় একটি গোবৎস বাঘে লইয়া গিয়াছে। অপরাহ্নে বন্ধুবর 'হ' এর সহিত সেখানে পৌঁছিলাম। বাছুরটিকে কোন্ দিকে লইয়া গিয়াছে গ্রামের কেহ বলিতে পারিল না। আওড়া, বৈচী ও লম্বা ঘাস প্রভৃতির জঙ্গলাকীর্ণ জমিতে অনুসন্ধান করিতেছি, একটি স্থান দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দীর্ঘপথ গুরুভার বহনের ক্লান্তিতে ব্যাঘ্রটি ঐ স্থানে বিশ্রাম লইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। দূরে আম্রশাখায় বসিয়া একটি কাক নীচের ঝোপের দিকে চাহিয়া কেবল ডাকিতেছে। বুঝিলাম, ঐ ঝোপেই মড়িটি রাখিয়া গিয়াছে। আরও অল্প দূর অগ্রসর হইতেই ঝোপের মধ্যে মড়িটি দেখিতে পাইলাম। 'হ' মড়িটি টানিয়া লইয়া গিয়া আমগাছের

শাখায় মাচান বাঁধিবার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু মড়িটি সরাইতে আমার আপত্তি। কয়েক দিন পূর্ব্বে এইরূপ মড়ি সরাইয়া দুই রাত্রি বৃথা জাগরণে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। গরুর গাড়ীর একখানি ছই আনিয়া স্যাওড়া গাছ কাটিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। গুলীর পথে বাধা হইতে পারে, এরূপ দু-একটি ডাল মাত্র কাটাইয়া লইলাম, যাহাতে বাঘটির সন্দেহের কোনও কারণ না ঘটে। সমস্ত ব্যবস্থা হইলে লোকগুলিকে গল্প করিতে করিতে চলিয়া যাইবার নির্দ্দেশ দিলাম। বাঘটি নিকটে কোথাও থাকিলে আগন্তুকেরা যে চলিয়া গিয়াছে বুঝিবে। সে নিশ্চয়ই অঙ্ক-শাস্ত্রে পণ্ডিত নহে যে, দুই জন অবশিষ্ট থাকিয়া গেল জানিতে পারিবে। সন্ধ্যা নামিতেই গরুর পাল মাঠ হইতে গৃহে ফিরিয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। একবার মনে হইল, বাঘটি আমার বাম পার্শ্বে আসিয়াছে, কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক কাল আর কোনও সাড়া পাইলাম না। অল্প অন্ধকার হইতেই বাঘটি আসিয়া মড়ির নিকট দাঁড়াইল। অতি সাবধানে বন্দুকটি উদ্যত করিয়া টর্চ্চের বোতাম টিপিয়া ট্রিগার টিপিলাম। বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া বাঘটি ৮।১০ হাত দূরে গিয়া ধরাশায়ী হইল।

৫

৪।৫ দিন পরেই নিকটে কুমোরপাড়া গ্রামে বেলা ৩।৪টার সময় এক আম্রকাননে একটি পূর্ণবয়স্কা গাভী নিহত হইল। মড়ির সন্নিকটে বৃক্ষশাখায় মাচান বাঁধিয়া বন্ধুবর 'হ' ও আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। কৃষ্ণপক্ষের দশমী বা একাদশী। সূচিভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টি প্রতিহত হইতেছে। ঘন পল্লব ভেদ করিয়া নক্ষত্রের আলো সেখানে প্রবেশের পথ পাইতেছে না। আমাদের সম্মুখে সাদা মড়িটি কৃষ্ণবর্ণ জমিতে শুভ্র বস্ত্রখণ্ডের মতই প্রতীত হইতেছে। রাত্রি সাড়ে ৮টার সময় শুষ্ক পত্র দলনের শব্দ পাইলাম। অতি মৃদুগতিতে ব্যাঘ্রটি মড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্রতি পদক্ষেপেই থামিতেছে। চারি দিক্ নিস্পন্দ নিঃশব্দ। ঝোপের মধ্য দিয়া ব্যাঘ্রের ধীর-মন্থর গতির সর-সর শব্দ শুনিতে পাইতেছি। নিস্তব্ধতার এরূপ মূর্ত্ত রূপ কখনও অনুভব করি নাই। অনুমান হয়, বাঘটি মড়ির নিকট হইতে ৮।১০ হাত দূরে আসিয়া থামিল, কিন্তু জানি না কেন হঠাৎ ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আরও ঘণ্টা দুই অপেক্ষায় রহিলাম। রাত্রি সাড়ে ১০টার সময় বাঘটি পুনরায় মড়ির দিকে অগ্রসর হইল। আমাদের মাচানের প্রায় নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১০।১২ হাত যাইলেই মড়ির নিকট পৌঁছিবে ও তখন গুলী করা চলিবে। বন্ধুবর 'হ' কাসিয়া উঠিল। বাঘটি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। পরের দুই রাত্রিও মাচানে যাপন করিলাম। মড়িটি কিন্তু আর স্পর্শ করে নাই। এমনি সন্দিগ্ধ স্বভাব উহাদের।

আশ্বিনের পূর্ণিমা। মাচান বাঁধিয়া আমি মড়ি পাহারা দিতেছি। সন্ধ্যায় একটি 'মিউ মিউ' ডাক শুনিয়াছিলাম, খেয়াল করি নাই। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বাঘের আগমনের কোনও সম্ভাবনা না দেখিয়া উঠিবার মনস্থ করিতেছি। মড়ির উপর টর্চ্চের আলো ফেলিতে ঝোপের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে ভয় বা সঙ্কোচের কোনও চিহ্ন নাই। শাবক নিকটে আছে, ব্যাঘ্রী আসিতে পারে মনে করিয়া আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। রাত্রি ১২টার সময় যখন নামিয়া আসি তখনও বাঘের ছানাটি ঝোপের মধ্যে বসিয়া আছে। তাহার স্বাভাবিক সংস্কার অগ্রসর হইয়া খাইতে তাহাকে বাধা দিতেছে। বুঝিলাম, শাবকের জন্য আহার্য্যটি রাখিয়া ব্যাঘ্রী শিকার অন্বেষণে দূরে গিয়াছে।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর প্রসাদপুর গ্রামে একখানি ছই পাতিয়া মড়ির উপর বন্ধুবর 'হ' ও আমি বসিয়া আছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেই বাঘ আসিয়া মড়ির নিকট দাঁড়াইল ও বন্ধুবরের এক গুলীতেই ভূমিশায়ী হইল। উহার জোড়াটি আসিতে পারে ভাবিয়া আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও গ্রামের লোকের বাঘ দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে তাহা সম্ভব হইল না। কিন্তু পরদিন প্রাতে মড়ির নিকট গিয়া দেখিলাম, বাঘ আসিয়া উহার অনেকটা খাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় দুই বন্ধুতে পুনরায় ছইএর মধ্যে আশ্রয় লইলাম। অন্ধকার হইতেই বাঘটি আসিয়া ছইএর সন্নিকটে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল; কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখনও বা পশ্চাতে। কিন্তু সম্মুখে একবারও অগ্রসর হইল না। রাত্রি ৪টার পর দূরে সরিয়া গেল; আমরাও নিরাশ হইয়া উঠিয়া আসিলাম। বাঘটির সন্দেহের কারণ অনুমান করিতে পারি নাই। হয়ত নিকটে কোথাও অবস্থান করিয়া আমাদিগকে ছইএর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থাকিবে। ব্যাঘ্রের ন্যায় সুচতুর ও সতর্ক জন্তু বিরল।

শিল্পী-গোপাল ঘোষ

প্রস্তাবিত হিন্দুকোড

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত আছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট হিন্দু আইন কমিটি নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হিন্দু আইন সঙ্কলিত করিবার জন্য ঐ সমিতির উপর ভার দিয়াছেন। উক্ত সমিতিতে চারি জন সদস্য আছেন—যাঁহাদের নাম বহু বার সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে।

এই সমিতি কেন্দ্রীয় সভার অধিকার অনুসারে সমস্ত বিষয়ে আইন রচনায় অক্ষম বলিয়া নিম্নোক্ত চারিটি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতেছেন—(১) উইলবিহীন উত্তরাধিকার, (২) বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, (৩) নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব এবং (৪) পোষ্যপুত্র গ্রহণ।

এই আইনের নাম হইবে 'হিন্দু কোড'। যত দিন না ইহা আইনে পরিণত হয়, তত দিন ইহা প্রস্তাবিত বা খসড়া হিন্দুকোড নামে পরিচিত হইতেছে। এই খসড়া হিন্দুকোডের বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য ইতিমধ্যে হিন্দু জনসাধারণের নিকট হইতে মতামত ও সাক্ষ্য গ্রহণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং মতামত প্রেরণ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সাক্ষ্য গৃহীত ও মতামত সঙ্কলিত হইয়াছে। উক্ত সমিতি ঐ সকল সাক্ষ্য ও মতামত হইতে সংগৃহীত বিবদমান বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় আইন-সভায় প্রেরণ করিবেন। কেন্দ্রীয় আইন-সভার উভয় গৃহে—প্রস্তাবিত হিন্দুকোড অপরিবর্ত্তিত বা পরিবর্ত্তিত, যে ভাবে গৃহীত হইবে, সেই ভাবে তাহা আইনরূপে পরিণত হইবে।

যদি কোন অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা করেন যে, হিন্দুকোড রচনার প্রয়োজন কি হইয়াছিল? ইহার জন্য কোন আন্দোলন ইতিপূর্ব্বে ত' শুনা যায় নাই বা আদালতে বিচারকার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা বা অচল অবস্থার কথাও আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। বরং এই হিন্দুকোড ও তাহার পূর্ব্ব রূপ—Hindu Intested Succession Bill কেন্দ্রীয় সভায় উপস্থাপিত হইবার পর হইতেই কিছু কিছু আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এবং তথাকথিত মহিলা-সম্মেলন যুবসঙ্ঘ প্রভৃতির অস্তিত্ব জানা যাইতেছে।

যে সময়ে জনসাধারণ অন্নবস্ত্রের সমস্যা লইয়া বিপন্ন, কোন বিষয়ে সুস্থ-মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেও অসমর্থ, ঠিক এইরূপ সময়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং যুদ্ধের সঙ্কট অবস্থায়—এবং যাহা গভীর ভাবে চিন্তনীয় এইরূপ বিষয়—হিন্দুর সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতির পরিবর্ত্তনকারী হিন্দুকোড আনয়ন করিবার প্রয়োজন বুঝিয়া উঠা সাধারণের পক্ষে খুবই দুরূহ। শুনিতে পাই, ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা এই সমিতির কার্য্যপরিচালনায় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, আরও কত ব্যয় হইবে, কে জানে?

বস্তুতঃ, আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টের মহদুদ্দেশ্য সব সময়ে সাধারণ স্থূলবুদ্ধি জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া কঠিন। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন বা মহামারীর সময়ে টাকার অপব্যয় যাহাতে না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর খুব সতর্ক থাকেন। এই আইন প্রবর্ত্তন যে ঐ সকল বিপদ হইতেও গুরুতর, তাহা বুঝিবার লোক বিরল হইয়াছে বলিয়াই আমাদের দুঃখ।

হিন্দুকোডের খসড়ায় দুইটি প্রয়োজনের উল্লেখ আছে—(১) এ দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত হিন্দু-ব্যবস্থাশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রগতিমূলক বিধানগুলি মিলিত করিয়া সকল হিন্দুর পক্ষে সমান ভাবে প্রয়োগের উপযুক্ত একটি হিন্দু আইন প্রণয়ন করা।

(২) যেহেতু, ব্রিটিশ-ভারতে বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দু আইনের কোন কোন শাখা সংশোধন ও বিধিবদ্ধ করা বিহিত, সেই হেতু এই আইন রচনা।

প্রথম প্রয়োজনের বিশ্লেষণে—হাইকোর্টের প্রবীণ এডভোকেট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—'প্রথমটি ব্রিটিশ-ভারতের সমস্ত হিন্দুকে এক অখণ্ড হিন্দুজাতিরূপে পরিণত করার একটা বড় উপায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দুগণের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় যোগসূত্র স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন। দেশের মধ্যে হিন্দু সংগঠনের যে কথা শুনা যায়, সেই সংগঠনের ইহা একটি প্রধান উপায়।

অখণ্ড হিন্দুজাতি তৈয়ারী ও হিন্দু সংগঠনের মত প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই যে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বড় ব্যস্ত হইয়া হিন্দুকোড রচনায় মনোযোগী হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, এবং এই কথাটা আবিষ্কার করিয়া শ্রীযুক্ত অতুল বাবু হয়ত অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝি অন্যরূপ। কথাটা এই যে, হিন্দুকোডের দ্বারা যদি বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দুকে অখণ্ড হিন্দু জাতিতে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান, বিভিন্ন ভাষাভাষী বৌদ্ধ ও বিভিন্ন ভাষাভাষী খৃষ্টানদের মধ্যেও ত যোগসূত্র স্থাপন ও অখণ্ডত্ব প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। একটা মুসলিম-কোড করিলে শিয়া-সুন্নি, লীগ-মোমিন প্রভৃতি বিভিন্ন বাদের একটা মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে—এ বিষয়ে আর একটু পূর্ব্বে সচেতন হইলে হয়ত

আমানুল্লার সিংহাসন ত্যাগও ঘটিত না! এইরূপ বৌদ্ধ-কোড দ্বারা চীন-জাপানের মনোমালিন্যের অবসান হইত। ক্রিশ্চিয়ান-কোড আরও আবশ্যক, ইহার দ্বারা সমস্ত ক্রিশ্চিয়ান ইউরোপে একটা অখণ্ড ক্রিশ্চিয়ান নেশন গড়িয়া উঠিত এবং হয়ত এই বিরাট্ যুদ্ধের চির-সমাপ্তি হইয়া যাইত। অতুল বাবু আমাদের যেমন জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, 'হিন্দুকোড ব্রিটিশ-ভারতবাসী হিন্দুর একতা-মূলক সংগঠনে একটা প্রধান উপায়', তেমন ভাবে অন্যান্য দেশবাসীকে এই কোডের মহিমা যদি বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন মনোবৃত্তি-ঘটিত সমস্যাগুলির একটা সমাধান হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় নাই কেন? পক্ষান্তরে, ব্রিটিশ-ভারতের অধিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও অখণ্ডতা সম্পাদনের জন্য 'হিন্দুকোড' বিধানের সৃষ্টি হইলে দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিবাসী হিন্দুদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও এই সঙ্গে ঘটিবে না কি? ব্রিটিশ-শাসনের বাহিরে দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রায় ছয় কোটি হিন্দুর বাস—তাহাদিগের জন্য থাকিল—মিতাক্ষরা, আর ব্রিটিশ-ভারতের জন্য প্রস্তুত হইল—'হিন্দুকোড'; সুতরাং এই দ্বিবিধ আইনের প্রবর্ত্তনের জন্য দ্বিবিধ হিন্দু সংস্কৃতির উদ্ভব হইলে ব্রিটিশ-ভারত হইতে পৃথগ্‌ভাবে দেশীয় রাজ্যে একটি নূতন হিন্দু 'পাকিস্থানের' সৃষ্টি হইবে বলিয়াই মনে হয়।

বাঙ্গালা ও আসাম ভিন্ন সমগ্র ভারতের (দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ ব্যতীত) অন্যান্য প্রদেশে ৭।৮ শত বৎসর ধরিয়া এক মিতাক্ষরা শাসন চলিতেছে—এই সকল প্রদেশে যদি যোগসূত্র স্থাপন ও অখণ্ডতা সম্পাদন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই 'হিন্দুকোডে'র নূতন করিয়া প্রবর্ত্তন—সেই সকল প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত যোগসূত্র ছিন্ন করিবে এবং তাহা কত দিনে পুনর্যোজিত হইবে তাহাও নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। আর যদি যোগসূত্র মোটেই স্থাপিত না হইয়া থাকে,—তাহা হইলে হিন্দুকোড যে তাহা সিদ্ধ করিবে, এমন কোন মহিমা বা যাদুমন্ত্রের সন্ধান তাহাতে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত অতুল বাবু লিখিয়াছেন যে,—"বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত হিন্দু আইনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তাকে এক আইনের রূপ দেওয়া।"

এই রূপটি হিন্দুকোডে কি ভাবে আসিবে—তাহা আলোচনার বিষয়, কারণ, হিন্দুকোডের খসড়ায় লিখিত আছে যে, উত্তরাধিকার বিধান—

(ক) চীফ কমিশনারের প্রদেশের অন্তর্গত কৃষি-জমি ছাড়া অন্য কৃষি-জমিতে খাটিবে না।

(খ) উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রচলিত কোন নিয়ম মতে কিংবা কোন দানপত্র বা আইনের সর্ত্তমতে যে এষ্টেট কেবল এক জন উত্তরাধিকারীতে বর্ত্তায়, সেই এষ্টেটে খাটিবে না।

(গ) মারুমক্কত্তয়ম্, আলিয়সন্তানম্, কিংবা নাম্বুদ্রি উত্তরাধিকার আইনের অধীন কোন হিন্দুর সম্পত্তির বেলা খাটিবে না।

ইহা বলাই বাহুল্য যে,—চীফ কমিশনারের কৃষিজমি বাদ দিলেও বহু কৃষি-জমি-ব্রিটিশ ভারতে বর্ত্তমান, তাহার ভাগই অধিক। সুতরাং অধিক স্থলেই এই 'হিন্দুকোড' প্রযোজ্য হইবে না। ইহা ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের অনেকটা স্থানে যেখানে ঐ সকল বিশেষ আইন প্রচলিত আছে—সেখানেও 'হিন্দুকোড' প্রযোজ্য নহে। ব্রিটিশ-প্রান্তের কৃষি-জমিতে চলিবে সেই পুরাতন বিধান—আর ব্রিটিশ-ভারতের বাস্তভিটা ও নগদ টাকার বেলায় খাটিবে হিন্দুকোডের নব বিধান! এই জাতীয় এক আইনের রূপ—অপরূপ নহে কি?

শ্রীযুক্ত অতুল বাবু—কোড শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—সংহিতা। সংহিতা বা সঙ্কলনাত্মক গ্রন্থ বলিতে ইহাই সাধারণতঃ বুঝা যায় যে—প্রতিষ্ঠিত বিধিসমূহের একত্রীকরণ। কিন্তু তিনি এই সঙ্গে কতকগুলি হিন্দু আইনের সংস্কারকেও 'হিন্দুকোডে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

একই সঙ্গে সংহিতা ও সংস্কার—(codification ও modification) যেন অর্দ্ধ 'কুক্কুটী' ন্যায়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটি কুক্কুটীর অর্দ্ধাংশ রন্ধন ও অর্দ্ধাংশ হইতে ডিম্ব প্রসব! এক দিকে সংগ্রহ—অন্য দিকে পরিবর্ত্তন। ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণে হিন্দু আইনের সংস্কারের জন্য অনেক দিন হইতেই প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে—যথা, সর্দ্দার বিবাহ আইন, সহবাস-সম্মতি আইন প্রভৃতি। কতকগুলি বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই,—যথা, ডাঃ গৌরের হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ডাঃ ভগবান দাসের অসবর্ণ বিবাহ বিল প্রভৃতি। হিন্দুকোডের মধ্যে এইগুলিকে এবারে স্থান দেওয়ার বেশ সুযোগ হইয়াছে। লোকমতের অপেক্ষা নাই—সংস্কারকামিগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, হিন্দু আইন একেবারে ঢালিয়া না সাজিলে এখনকার যুগে হিন্দু সমাজ না কি অচল হইয়া পড়িয়াছে! এদিকে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশমুখের হিন্দুনারীর উত্তরাধিকার আইন বিধিবদ্ধ হয়, উহা শাস্ত্রীয় বিধিকে দলিত করায় বর্ত্তমান কালোপযোগী সংস্কাররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। অথচ এই আট বৎসর কাল অতীত হইতে না হইতে 'পুনর্মূষিকো ভব' অবস্থা; কাজেই সেই শাস্ত্রীয় মতে প্রত্যাবর্ত্তনের লজ্জা হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদের উদার গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেন যে হিন্দু আইনকে একেবারে ঢালিয়া সাজা হউক। দেশমুখের ঐ আইনে যেখানে কন্যার ধর্ম্মতঃ উত্তরাধিকার, সেখানে কন্যাকে বঞ্চিত করা ও কন্যার স্থানে বিধবা পুত্রবধূকে উত্তরাধিকারিণী করা হইয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে কয়েক স্থান হইতে উক্ত দেশমুখের আইন সংশোধনার্থ ৮।১০ খানা বিল পেশ করা হয়। তখন সংস্কারপন্থী গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতীয় সদস্যগণ নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার কলঙ্ক প্রচ্ছাদনের জন্য এই সম্পূর্ণ হিন্দু আইন সংস্কারের অজুহাতে 'হিন্দুকোড' রচনায় উদ্যুক্ত হইলেন। বস্তুতঃ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'সিভিল ম্যারেজ এক্ট' যে ভাবে সংস্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সংস্কারপন্থীদের কোন অসুবিধা নাই; তাহাতে আন্তর্জাতিক বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং সগোত্র-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে উদার মতবাদীদের জন্য সিংহদ্বার উন্মুক্ত আছে, এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ অবকাশ দেওয়া হইয়াছে।

কাজেই 'হিন্দুকোডে'র উদ্ভব কোন সম্প্রদায়ের চাহিদা বা জনসাধারণের প্রয়োজন হইতে নহে—হিন্দু সমাজের কোন ইষ্ট সাধনের জন্য নহে,—ইহার উদ্ভব সংস্কারবাদী গবর্ণমেণ্টের ও তদীয় অনুবর্ত্তনকারীদের মুখরক্ষার জন্য।

এদিকে, পুত্রবধূ ও কন্যার অধিকার শাস্ত্রে যেমন ব্যবস্থিত আছে—তেমনই পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাতে ও নূতন

সুবোধ ঘোষ

মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন জনপদের পাথর-বাঁধানো পথের ওপর এক দিন প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ অরেল ষ্টাইন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন সূর্য্য ডুব্‌ছে। মরুভূমির তরঙ্গায়িত বালুকার বিস্তার এক দিকে পূর্ব্বাকাশের আব্‌ছায়ায় গিয়ে মিশেছে আর এক দিকে অস্তাচলের রক্তাক্ত আলোকসাগর—স্তব্ধ বালুকার ঢেউ তারই মধ্যে নিজের সীমাহীনতা ডুবিয়ে দিয়েছে। এই রকম একটি দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে-ছিলেন অরেল ষ্টাইন দূরে ও নিকটে সেই বালুকাময় নিরালা পৃথিবীর বুকে এক একটি সঙ্গিহীন সাদা পাথরের টাওয়ার দাঁড়িয়েছিল। এক হাজার বছর আগে প্রহরীরা এই টাওয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে। তাদের নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি এক দিন মরুভূমির দিগন্ত-হারা বিস্তারের মধ্যে ভেসে ভেসে দূরাগত শত্রুর সন্ধান করেছে।

এই প্রাচীন জনপদের অনেকখানিই ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছে—ধ্বংস স্তূপের মত খানিকটা বিষণ্ণ রূপ। কিন্তু অনেকখানি আজও একেবারে অটুট রয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, জনপদবাসী মাত্র কিছুক্ষণ আগে অদূরে কোথাও দল বেঁধে উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছে। আবার এখুনি ফিরে আসবে।

পথের ওপরে একটি পাথরের কৌটা পড়েছিল। অরেল ষ্টাইন সেটা কুড়িয়ে নিলেন। পরমুহূর্ত্তে তাঁর দৃষ্টি পড়লো দূরের একটি টাওয়ারের দিকে। টাওয়ারের কালো কোটরের মত ছায়াবৃত গবাক্ষ দিয়ে যেন কোন জাগ্রত প্রহরীর রুষ্ট চক্ষু তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অরেল ষ্টাইন হঠাৎ শিউরে উঠলেন, তাঁর হাত থেকে কৌটাটা পড়ে গেল। নিতান্ত অনধিকারীর মত তিনি যেন এই পরিত্যক্ত জনপদের সমাধিস্থ গাম্ভীর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, অমর্য্যাদা করেছেন। এক নিরীহ নাগরিকের সাধের জিনিষ তিনি যেন ভুল করে চুরি করেছিলেন। টাওয়ারের গবাক্ষ থেকে একটা ভ্রূকুটি তাঁকে যেন সাবধান করে দিচ্ছে।

মধ্য-এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক-আবিষ্কারের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে অরেল ষ্টাইন এই ঘটনাটি লিখেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের সংশয়পরায়ণ বৈজ্ঞানিক মন কিছু ক্ষণের জন্য শোকাভিভূত হয়েছিল। অরেল ষ্টাইন তাঁর এই বেদনার করুণতাকেও বর্ণনা করেছেন—"কোথায় গেল এই সুন্দর জনপদের অধিবাসীরা? তাদের এত সাধের বাস্তু ও বস্তুময় সংসার পড়ে রয়েছে, কিন্তু সেই জীবনের নিশ্বাস ও হাসি-কলরব বিদায় নিয়েছে চিরকালের জন্য। মানুষ চলে গেছে—তাই এই জনপদকে আজ প্রেতলোকের একটি ভগ্নাংশ বলে মাঝে মাঝে ভ্রম হয়।"

জনপদ-জীবনের মধ্যে কোথায় যেন একটা নশ্বরতার বীজ লুকিয়ে আছে। তাই অরেল ষ্টাইনের এত আক্ষেপ। শুধু মধ্য-এশিয়ার এই নামহীন ক্ষুদ্র জনপদ নয়, পৃথিবীর সকল বিখ্যাত জনপদের পরিণামের মধ্যে এই একই নিয়মের খেলা আমরা দেখতে পাই; উর, কিশ, ব্যাবিলন, মহেঞ্জোদাড়ো—স্থাপত্যও ভাস্কর্য্যের বৈভব নিয়ে আজও প্রাচীন সভ্য মানবের অধিষ্ঠানগুলির নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। সেই নগরগুলি আজও রয়েছে, কিন্তু নাগরিকেরা কোথায়?

সেই নাগরিকেরা কোথাও নেই। নগরধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাগরিক-সভ্যতারও ধ্বংস হয়েছে, শুধু তাদের রক্তমাংসের মনুষ্যত্বটুকু নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে, মহামানবের সহস্রস্রোতে মিশে গেছে। মহেঞ্জোদাড়োর মানুষের শোণিত ভবিষ্যপুরুষের ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়োর সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকার আসেনি।

নগর-সভ্যতার এই পরিণামের মধ্যে কার্য্য-কারণের পরম্পরাগুলি বিচার করে আমরা একটা তত্ত্বকে ধরতে চাই। অর্থাৎ, নগর-সভ্যতার এই ধ্বংসপ্রবণতার মূল কারণ কি? নগর-সভ্যতার উদ্ভব কি কি কারণে সম্ভব হয়েছিল? এই তথ্যগুলি বিচার করে, আমরা সভ্যতা সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করতে পারি কি না?

এর পর বিচার্য্য বিষয় হলো, গ্রাম-সংস্কৃতি বা গ্রামীণ-সভ্যতা। গ্রাম-সংস্কৃতি বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি? এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য কি? নগর-সভ্যতার সঙ্গে গ্রামীণ-সভ্যতার পার্থক্য কোথায়? মানুষের রুচি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোন্ সংস্কৃতির স্বাভাবিক মিল আছে? বর্ত্তমান পৃথিবীর সমাজ-বিজ্ঞানী পণ্ডিত সাহিত্যিক শিল্পী ও রাষ্ট্রীয় সাধকদের চিন্তাধারা কোন্ দিকে চলেছে? ভাবী সমাজের রূপ অর্থাৎ সভ্যতার কোন নতুন বিচার ও সংজ্ঞা আমরা পাচ্ছি কি না?

প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান-স্বরূপ নগরগুলির ধ্বংসের অনেক কারণ আছে। ঐতিহাসিকেরা সে-সম্বন্ধে অনেক রহস্য ভঞ্জন করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, হঠাৎ আকস্মিক প্লাবন ঝঞ্ঝা প্রভৃতির কারণে, আবহাওয়া অর্থাৎ শীতাতপের ঘোর পরিবর্ত্তনের কারণে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং রোগমারী ইত্যাদি সমাজ-বিরুদ্ধ পীড়া ও বিকারের কারণে—প্রাচীন নগরগুলি ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু কখনো এমন ঘটনা হয়নি যে, সেই নগরগুলির অধিবাসীরা হঠাৎ একটি দিনে সব মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নগরে অতিষ্ঠ হয়ে, অর্থাৎ কোন কারণে নগরবাস অসহ বা অসম্ভব হওয়ায় মানুষের দল অন্যত্র চলে গেছে।

এইখানে একটা প্রশ্ন ওঠে, সেই সঙ্গে আমরা একটি তথ্যের খুব

পাই। মানুষেরা অন্যত্র চলে গেছে কিন্তু সেই নাগরিক-সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়ে তারা যেতে পারেনি। তারা শুধু তাদের জীবন্ত দেহগুলি নিয়ে সরে পড়েছে, কিন্তু সংস্কৃতিগত রুচি মন ও শক্তিটুকু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। নগর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা সংস্কৃতিগত শক্তিতে ও প্রতিভায় দীন হয়ে পড়েছে। মহেঞ্জোদাড়োর নগরের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সংস্কৃতির লিপি ভাষা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মহেঞ্জোদাড়োর মানবের রক্ত আজও মানুষের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু সেই রুচির ঐশ্বর্য্য কোন রূপান্তরের ভেতর দিয়ে বা কোন ক্রমিক উৎকর্ষের নিয়মে আমাদের মধ্যে আসেনি।

সুতরাং একটা সিদ্ধান্ত করতে হয়, মহেঞ্জোদাড়ো সংস্কৃতি একান্ত ভাবে মহেঞ্জোদাড়োর ইঁট-পাথর ইত্যাদি নাগরিকতার বন্ধনের মধ্যেই সত্য হয়েছিল। সেই ইঁট-পাথর জীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে, অথবা পরিত্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই নগর-সংস্কৃতির মেরুদণ্ডও ভেঙে গেছে। দ্বিতীয় মহেঞ্জোদাড়ো আর গড়ে ওঠেনি। মানুষের ভাস্কর্য্য-স্থাপত্য আজও আছে, ঐ সিন্ধু-উপত্যকাতেই পরবর্ত্তী কালে আরও অনেক সভ্যতার পত্তন আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তার মধ্যে মহেঞ্জোদাড়োর আর খুঁজে পাই না।

নাগরিক-সভ্যতার এই ভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে একটা কারণ আমরা নির্ণয় করতে পারি। এই সভ্যতা নিতান্তই বৈষয়িক গঠন বা কর্ম্মের (Form) ওপর নির্ভর করে থাকে। অত্যন্ত ব্যবস্থিত আয়োজন, শাসন-বন্ধন এবং নিয়ম-তন্ত্রের মধ্যে এই নগর-সভ্যতার স্থায়িত্ব। অর্থাৎ মাত্র আচারগত সভ্যতা। এই আচার বিবিধ বৈষয়িক উপকরণের আশ্রয়েই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত। উৎকর্ষবান মানুষের শক্তির তিনটি স্তরভেদ আছে। সর্ব্বনিম্ন স্তর হলো আচার (Habit)। এই আচার একটা অনুশাসনের জোরেই বহাল থাকে। অনুশাসন না থাকলে আচারও লুপ্ত হয়। কিন্তু এই আচার যখন স্বভাবজ হয় তখনই আমরা আর একটু উন্নত শক্তি লাভ করি—যার নাম রুচি। 'রুচি' মানুষকে সচেতন ভাবে প্রয়াসে নিযুক্ত করে। রুচিগত অনুশীলন দীর্ঘ কালের সাধনায় প্রায় প্রবৃত্তির (instinct) পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। যে মানুষ প্রবৃত্তিগত ভাবে (instinctively) দয়ালু, সে মানুষ আচারগত দয়ালু বা রুচিগত দয়ালু মানুষের চেয়ে জীব হিসাবে উন্নত ও বেশী শক্তিমান্। কারণ, অনুশাসন বা বিধানের অভাবে আচার লুপ্ত হয়, প্রেরণার অভাবে রুচি নষ্ট হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিগত আচরণ স্বয়ং-নির্ভর।

সংস্কৃতিতত্ত্ব বিচারের জন্ত কয়েকটি দার্শনিক কথা বলে নিতে হলো। কারণ আমরা দেখতে পাই, নগর-সভ্যতার মানুষ তার সাধের নগর থেকে উদ্বাস্ত হওয়া মাত্র সকল উৎকর্ষ ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। নাগরিক-জীবনে শুধু আচারগত দিক্‌টাই দিন দিন পুষ্ট ও প্রবল হতে থাকে। রুচি ও প্রবৃত্তিগত দিক্ উপেক্ষিত থাকে।

এইবার গ্রাম-সংস্কৃতি বা গ্রামীণ-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বিচার করা যাক্। গ্রাম-সংস্কৃতি অর্থ মানুষেরই সংস্কৃতি, কিন্তু এই সংস্কৃতি নগর-সভ্যতা থেকে মূল ধর্ম্মে ও প্রকৃতিতে ভিন্ন।

গ্রামীণ-সভ্যতার মূল আশ্রয় হলো মানুষ। গ্রামীণ-সভ্যতা মানবতাসর্ব্বস্ব। ব্যক্তি-মানুষ (individual) কতখানি উন্নত হলো, সেটাই গ্রামীণ-সভ্যতার পরিচয় ও মাপকাঠি। গ্রামীণ-সভ্যতার অধিকারী যে-মানুষ হতে পেরেছে, সে-মানুষ স্থানান্তরে গিয়ে বা অবস্থান্তরে পড়েও তার সাংস্কৃতিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। বৈদিক যুগের মানুষ গ্রামীণ-সভ্যতায় পুষ্ট ছিল। একটা উপমা দিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যাক্। বৈদিক যুগের ঋষি-কবিরা বহু গাথা ঋক্ রচনা করেছিলেন। এগুলি তাঁদের প্রতিভার সৃষ্টি ও চিন্তার ঐশ্বর্য্য। কিন্তু সে-সময় লিপি (Script) সৃষ্টি হয়নি। তবু আমরা গ্রামীণ-সভ্যতার একটি বিস্ময়কর শক্তি দেখতে পাই, লিপির অভাবে বা পুঁথির অভাবে ঋক্ মন্ত্র লুপ্ত হয়নি, মানুষ শ্রুতিধর হয়ে যুগান্ত কাল ধরে সেই চিন্তাকে ধারণ ও বহন করে এনেছে। অর্থাৎ গ্রামীণ-সভ্যতার ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত আত্ম-নির্ভর ও বহিরুপকরণ-নিরপেক্ষ ছিল। এই ঘটনার সঙ্গে একটা বিপরীত তুলনা ও অনুমান করা যাক্: কোন অপশক্তির প্রভাবে দেশের ছাপাখানা এবং পুঁথিগুলি লুপ্ত হয়ে গেল। এর ফলে এই হবে যে, রবীন্দ্র-কাব্যের ঐতিহ্যের এইখানেই অবসান হবে, ভবিষ্য-বংশীয়েরা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে রবীন্দ্র-কাব্যের কতগুলি খণ্ড খণ্ড নিদর্শন আবিষ্কার করবে।

এখানে কেউ প্রশ্ন করে একটা বাধা দিতে পারেন। তাহ'লে কি ছাপাখানা ইত্যাদি মানুষের যত বৈষয়িক আবিষ্কার আয়োজন ও উপকরণ, এই সবই বর্জ্জনীয়?

এটা অবান্তর প্রশ্ন। সভ্যতার মর্ম্মগত সত্য এই যে—সমাজবদ্ধতা, সমাজব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উপকরণ, এই সবারই লক্ষ্য হলো ব্যক্তি-মানবকে উন্নত করা। ব্যক্তি-মানবের প্রতিভা প্রবৃত্তি ও শক্তিকে কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যবস্থার কাছে বন্ধক দিয়ে রাখা সভ্যতার লক্ষ্য নয়। গ্রামীণ-সভ্যতায় এই ব্যক্তি-মানবের উৎকর্ষের সম্ভাবনা আমরা পাই। নাগরিক-সভ্যতার মধ্যে একটা ব্যবস্থাগত বন্ধনের রূপটাই প্রবল। ব্যক্তিত্বকে এর মধ্যে কয়েদী করে রাখা হয়, তার স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী আশা করেন, ছাপাখানা নামে আবিষ্কার ও আয়োজন আজ ব্যক্তি-মানবের স্মৃতি ও চেতনাকেই আরও প্রখর ও শক্তিময় করে তুলবে, যার ফলে ছাপাখানা লুপ্ত হলেও, আমাদের চেতনা জাতি-স্মৃতি (Race Memory) রূপে সজীব থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের ঐতিহ্যকে বহন করে চলবে। যদি সেটা না হয়, তবে এই ছাপাখানা নামে আবিষ্কারের নৈতিক সার্থকতা ব্যর্থ হলো বুঝতে হবে। কারণ, স্মৃতিশক্তি নামে একটা মানবিক বৃত্তির স্বভাবজ উৎকর্ষ এই ছাপাখানার দ্বারা ব্যাহত হলো। মানুষের ধারণা ও মননশক্তি এক দিন এমন অবস্থায়ও ছিল যেদিন এক থেকে দশ পর্য্যন্ত গুণতে তাকে এক ঘণ্টা ধরে মাটীতে আঁচড় কাটতে হয়েছে, দশটি লাঠি পুঁতে তার প্রথম ধারাপাতটি তৈরী করতে হয়েছে। কিন্তু তার মননশক্তি ঐ আদিম রূঢ় ধারাপাতের ওপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে থাকেনি। ঐ লাঠি-পোঁতা ধারাপাতকে সে তার মননশক্তির ব্যায়ামের কাজে লাগিয়েছে। বৈষয়িক ব্যবস্থার সাহায্যকে অতিক্রম করে, ছাড়িয়ে উঠে, নিজের ব্যক্তি-প্রতিভাকে উন্নত করে সে এগিয়ে এসেছে। মানুষের গণিত সার্থক হয়ে উঠেছে তার মনের শক্তির মধ্যেই, ধারাপাত বা রেডি রেকনারের মধ্যে নয়।

মানুষের প্রথম সমাজগত চেতনার উন্মেষের প্রধান সত্যটির দিক্ যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে বুঝতে পারি যে, সর্বসাধারণকে অর্থাৎ

সমষ্টিকে উন্নত করার জন্যই এই সামাজিকতার প্রয়োজন হয়েছিল। গ্রামীণ-সভ্যতার মধ্যে সামাজিকতার এই ঐতিহাসিক স্বরূপটি আজও লুকিয়ে আছে। গ্রামীণ-সভ্যতায় দীক্ষিত মানুষ এমন কিছু আবিষ্কার করে না, বা এমন কোন ব্যবস্থা বা উপকরণের প্রশ্রয় দিতে চায় না, যা ব্যক্তি-মানবের আচার রুচি ও প্রবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। প্রাচীন মানুষ বাঁশী নামে যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিল, সেটা ব্যক্তির প্রয়োজন ও প্রসন্নতাকে সুসিদ্ধ করার জন্যই। মানুষের শ্রুতিশক্তি ছন্দজ্ঞান ও স্বরশক্তিকে দুর্ব্বল করার জন্য বা অবসর দেবার জন্য বাঁশীর আবিষ্কার ও প্রসার হয়নি।

এইবার উল্টো প্রতিবাদের যুক্তি তোলা যাক্। মানুষের যে-সব বৈষয়িক আবিষ্কার ও ব্যবস্থা, সে-সবই কি একমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য ও রুচি প্রবৃত্তিকে সাহায্য করে চলবে? এ ছাড়া কি আর কোন সার্থকতা নেই? মানুষ মোটরযান আবিষ্কার করেছে, এর ফলে মানুষের হেঁটে চলার শক্তি কমে যেতে পারে। কিন্তু সেই জন্যেই মোটরযানকে মানুষের জীবনযাত্রা থেকে বাতিল করে দেওয়া উচিত? দূর ব্যবধানকে অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা যায় মোটরযানের সাহায্যে। সমাজ-জীবনের পক্ষে এই দিক্ দিয়ে মোটরযানের কল্যাণকর ধর্ম্মটুকু উপেক্ষা করা যায় কোন্ যুক্তিতে?

এর উত্তর গ্রামীণ-সভ্যতার ধর্ম্মের মধ্যেই রয়েছে।

যে-কোন ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের দানকে সর্ব-ব্যক্তির আয়ত্তে ও অধিকারে রাখাই গ্রামীণ-সভ্যতার প্রকৃতি। বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ ব্যক্তির অধিকারে যখন কোন ব্যবস্থা বা আবিষ্কারকে সঁপে দেওয়া হয়, তখনি মানুষের সামাজিক ইতিহাসের তথা গ্রামীণ-সভ্যতার সত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। ছাপাখানা নামে যন্ত্রসমন্বিত একটি ব্যবস্থাকে যদি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত রাখা হয়, সর্ব্বসাধারণ অনধিকারী থেকে যায়, তা'হলে মাত্র অহিত সৃষ্টি হবে। গ্রামীণ-সভ্যতায় পুষ্ট মানুষের মন ও প্রতিভা তাই এমন সকল যন্ত্র ও উপকরণ আবিষ্কার করে, যা সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তযোগ্য হয়। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রেরণা মাত্র সেই ধরণেরই উপকরণ সৃষ্টি করে এসেছে, যা সর্ব্বসাধারণের অর্থাৎ ব্যক্তি-মানবের শক্তির নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং অধিকারভুক্ত। লাঙ্গল কাস্তে ঢেঁকি চরকা তাঁত কুমোরের চাক ইত্যাদি সভ্যতার প্রবীণ উপকরণগুলির পেছনে স্রষ্টাদের এই মনোভাবটিই স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। ৫

যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও উপকরণের সম্বন্ধে যে-কথা বলা হলো, প্রাচীন ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। উৎসব, ধর্ম্মচর্চ্চা, ব্রত, শিকার, কৃষি, যজ্ঞ, পঞ্চায়েৎ ইত্যাদি যে সকল ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সব ব্যবস্থার মধ্যে সর্ব্বব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত। গ্রামীণ-সভ্যতার এই রীতি।

সামাজিকতার ইতিহাস এই স্বাভাবিক পথে অর্থাৎ গ্রামীণ-সংস্কৃতির রূপে চলে আসছিল। এর মধ্যে মাঝে মাঝে যে-সব অবাস্তব উদ্ভব দেখা দিয়েছিল, তারই ধ্বংস আজ আমরা দেখতে পাই উর কিশ ব্যাবিলন আর মহেঞ্জোদাড়োতে।

একটু পরিষ্কার করেই বলা যাক্। সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়মে জীভূত হওয়া এবং কেন্দ্রীভূত হওয়া এই দুই ব্যাপারই অস্বাভাবিক। নগর বা সহরের রূপ একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার রূপ। কয়েক সহস্র বা কয়েক লক্ষ মানুষ নানা জায়গা থেকে এসে একটা সীমা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে একত্রিত হয়। কুটীর, অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে। সঙ্গে সঙ্গে পথ-ঘাট পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি নানা আয়োজনও করতে হয়। এই ভিড়ধর্ম্মী উপনিবেশের সমস্যা ও রীতি-নীতি নানা জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে থাকে। এর মধ্যে সূর্য্যালোক সভয়ে উঁকি দেয়, বাতাসের প্রবাহ প্রাচীরে প্রাচীরে আহত হয়, গাছের শ্যামলতা ফিকে হয়, ফুলের সৌরভ ও পাখির ডাক দূরে সরে যায়। আকাশের নীলিমা ধোঁয়ার জ্বালায় অস্পষ্ট হয়। এক সঙ্কুচিত ঠাঁই, সহস্র সতর্কতা ও ব্যবস্থা দিয়ে ঘেরা ও বাঁধা—তারই মধ্যে কয়েক সহস্র মানুষের সংসার-সাধনা চলতে থাকে।

কেন এই অস্বাভাবিকতা? মানুষের সামাজিকতার সূত্রপাত এই ভাবে হয়নি। একটি গ্রাম, তার নিজের প্রতিভায় ও প্রয়োজনের দাবীতে নিজের জনসংখ্যা বিস্তার করে সহরে পরিণত হয়েছে, এমন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। গ্রাম থেকে সহর কখনো সৃষ্টি হয়নি। বহু গ্রাম থেকে মানুষ আহরণ করে, বহু গ্রামকে নষ্ট ও জনবিরল করে, বহিরাগত বহু ব্যবস্থাকে একত্রিত করে সহর সৃষ্টি হয়েছে। সহর গ্রামের ক্রমবিকশিত রূপ বা রূপান্তরিত পরিণাম নয়। সহর গুণে-ধর্ম্মে গ্রাম থেকে ভিন্ন জিনিষ। সহরের ইতিহাস খুঁজতে গেলে প্রধানতঃ তিনটি কারণ পাওয়া যায়: (ক) বাণিজ্যিক কারণ, (খ) তীর্থমহিমার কারণ এবং (গ) রাজশক্তির কেন্দ্র হওয়ার কারণ।

এই তিনটি কারণই গ্রামীণ-সভ্যতার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সহর সৃষ্টি করেছে। এই তিনটি কারণই শ্রেণীবিশেষের স্বার্থবাদের ইঙ্গিত। প্রতি গ্রাম থেকে বাণিজ্যলক্ষ্মীর আসনটি তুলে এক জায়গায় নিয়ে এসে সহর বন্দর গড়া হলো। প্রতি গ্রামের পুণ্যকে ও দেবতাকে ক্ষুদ্র করে দিয়ে বিশেষ একটি স্থানে বহু পুণ্য পুঞ্জীভূত করে একটি বেশী মহিমাময় দেবতাকে বসানো হলো—তীর্থভূমি পত্তন হলো। বহু গ্রামের স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন জীবনযাত্রাকে ছোট করে একটা বিশেষ স্থানে রাজশক্তির আধার ও শাসনের কেন্দ্র খাড়া হলো। এই কেন্দ্রিকতা (Centralisation) নগর-সভ্যতার প্রাণ। এর বিপরীত হলো গ্রামীণ-সভ্যতা।

এইবার বর্ত্তমান যুগের নগর-সভ্যতার প্রসঙ্গে আসা যাক্। বর্ত্তমান নগরগুলির রূপ ও প্রাণের মধ্যে একটি মাত্র তত্ত্ব সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে—ব্যবসায়। ব্যবসাগত সুবিধার খাতিরেই এই নগরগুলির জন্ম। নগরগুলির গঠন ও ব্যবস্থার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে এই বাণিজ্যনীতির ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। কোন রাজশক্তির মহিমার জন্য নয়, দেবায়তন বা তীর্থ-ভূমির মহিমার জন্য নয়, এই নগরগুলি গড়ে উঠেছে মাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য এবং সেই বণিক্-স্বার্থ কায়েম রাখার উপযুক্ত রাজশাসনের ব্যবস্থার জন্য। এই সহর প্রাচীন সহর থেকে রীতি ও প্রকৃতিতে ভিন্নতর। আধুনিক সহরে কেন্দ্রিকতার চূড়ান্ত পর্য্যায় সফল হতে চলেছে! য়ুরোপে শিল্প-বিপ্লবের সময় যে-ধরণের সহর সৃষ্টি হয়েছে, বর্ত্তমান পৃথিবীর সব সহরগুলি সেই ধরণেরই ছোট বড় সৃষ্টি। মানুষের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক বিকাশ ও রূপান্তরের ধারা সহরের মধ্যে এসে জিহ্মমুখী হয়ে গেছে। এই জিহ্মমুখীনতা

সর্ব্বব্যক্তির হিতার্থে নয়। সহরের সভ্যতায় গ্রামীণ-সংস্কৃতির মূল সত্য অস্বীকৃত। এখানে উৎসব ধর্ম্ম, ক্রীড়া আমোদ শিক্ষা বিচার নীতিবোধ—সব কিছুই একটি নতুন নিয়মে চালিত। এক নতুন মান (standard) ও মাপকাঠি। অর্থাৎ ব্যবসায়িক স্বার্থ, ভোগবাদ, বিত্তকৌলীন্যের কাছে সব কিছু বাঁধা। মানুষের সংস্কৃতিকে ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করা হয়েছে। শিল্পকলা, শিক্ষালয়, হাসপাতাল, আমোদ-ভবন, ইত্যাদি সংস্কৃতিমূলক সমস্ত ব্যবস্থাগুলির গঠন মার্কেটের মত। কারখানা, অফিস, আদালত, খেলার মাঠ (Sport) ইত্যাদির মধ্যে এই একই পরিদৃশ্য দেখতে পাই। সবার ওপরে বাণিজ্য সত্য, এই তত্ত্বের ওপর আধুনিক সহরের ভিত্তি। সর্ব্বত্র কেন্দ্রিকতার প্রাবল্য ও বাহুল্য। কারখানা নামে পণ্য উৎপাদনের যে ব্যবস্থা, তার মধ্যে বীভৎস কেন্দ্রিকতার প্রয়াস। কয়েক শত মানুষকে এক জায়গায় একত্রিত করে প্রচণ্ড বেগে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পণ্য উৎপাদন—এই হলো কারখানার গঠনতন্ত্র। শিল্প-বিপ্লবের সময়ে ও পরে উপনিবেশ-শোষক জাতি ও রাষ্ট্রগুলি নিজদেশে এবং পরদেশে অজস্র পণ্য বিক্রয়ের জন্ম যন্ত্রপাতিকে নতুন ভাবে গঠন করে যে-ব্যবস্থা করলেন তারই নাম কারখানা। এই কারখানার গঠনের মধ্যে যে ঐতিহাসিক কারণটি কাজ করেছে, সেটা নিছক মুনাফাবৃত্তি ও লোভ। কল্যাণ-বুদ্ধির দাবীতে কারখানা সৃষ্টি হয়নি।

বৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্ম বিজ্ঞানীকে ও এঞ্জিনিয়ারকে কে নির্দ্দেশ দিয়েছিল ? পৃথিবীর মানুষ এই নির্দ্দেশ দেয়নি। নতুন এক বণিক্‌শ্রেণী তাদের কারবারের থাঁকৃতি মেটাবার জন্মই এই কাণ্ড করেছে। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যদি দাবী করে, তবে তারা ছোট ছোট যন্ত্রই দাবী করবে, যে-যন্ত্র ঘরে ঘরে তাদের কর্ম্মসহচর হয়ে থাকবে, যার সঙ্গে গৃহপালিত পশুর মত মমতার সম্পর্ক হবে। কিন্তু যন্ত্রকে অতিকায় দানবীয় রূপ দিয়েছে সহর-সভ্যতায় পুষ্ট স্বার্থবাদী মানুষের প্রতিভা। গ্রামীণ-সভ্যতায় যন্ত্র সহজ ভাবে এবং স্বাভাবিকরূপে গৃহীত হতো। কিন্তু সহর-সভ্যতায় যন্ত্র অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ করেছে। এই অপ্রাকৃত অতিকায় যন্ত্র সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। সাধারণ মানুষ এই অতিকায় যন্ত্রের হৃদয় হাতড়ে পায় না ; কারণ, এই যন্ত্র নখর-কণ্টকে আবৃত। মানুষ স্বয়ং এই যন্ত্রের খণ্ড খণ্ড অংশরূপে, দাসরূপে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। নিজেরই জ্ঞানের সন্তানের এই রূপ মানুষ আশা করেনি।

আধুনিক সহরের কোন ব্যবস্থাকেও মানুষ হৃদয়ের সান্নিধ্যে পায় না, হাতড়ে পায় না। আধুনিক সহরের অফিস একটি অতিকায় যন্ত্রস্বরূপ। এর বড় সাহেব প্রস্তর-বিগ্রহের চেয়েও অচল অনড় ও কেতাদুরস্ত। একটি নির্গুণ ও নির্ব্যক্তিক সিস্‌টেম বা বিধান আছে, সেই বিধানের মধ্যে মস্তিষ্ক ও হৃদয় ছাড়া আর সবই আছে। মানুষের আচরণ থেকে বিচার ও আবেগ নির্ব্বাসিত করে শুধু হাত-পা নাড়ার সজীবতা নিয়ে থাকাই সহরে-সভ্যতার লক্ষণ।

আধুনিক সহরে-সভ্যতার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ কি ?

প্রথম অভিযোগ, সহরে-সভ্যতায় মানবিকতা সম্পূর্ণ ভাবে বিদায় নিতে চলেছে। কিন্তু আমরা জানি সভ্যতার পরম পাথেয় হলো মানবিকতা নামে সাধনার ঐশ্বর্য্য। ব্যক্তি-মানব উন্নত হবে, মানুষের অধিকার প্রসারিত হবে, সকল জ্ঞান ও শিল্প মানুষের অধিকারে সফল হবে—মানুষের সকল আচরণের মধ্যে এই মানবিকতাকেই বজায় রাখার প্রয়াস সব চেয়ে বেশী। মানুষ গরু-ঘোড়াকেও মানুষের মত নামকরণ করে। গরু তার কাছে শুধু জীব নয়—সুশীলা কপিলা শ্যামলী ধবলী বুধীরূপে তারা পরিচিত। মানুষ তার যন্ত্র-সহচর ঢেঁকি ও নৌকার গায়ে সিঁদুর লেপন করে। বন জঙ্গল পাহাড় নদীকে নাম দিয়ে সৌহার্দ্দ্যে যুক্ত করে। শিল্পী মানুষ বরুণ ইন্দ্র ও অগ্নিরূপী অশরীরী দেবতাকে ভাস্কর্য্যে শরীরী মানবের রূপে পরিণত করেছে। দার্শনিকের নির্বস্তুক (abstract) চিন্তার বিষয়কে কাব্যরসে সুললিত করে তোলে। ঋষি বাল্মীকির দেবতা রাম তুলসীদাসের হাতে ঘরের ছেলের রূপে মানবিকতা (humanised) লাভ করেছেন। গ্রামীণ-সংস্কৃতি মানবিকতা-প্রধান। সহর তার উল্টো।

একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক্। কয়েক বছর আগে কলকাতা সহরের সমস্ত সার্ভিস মোটরবাসগুলির এক একটা নাম ছিল—'উর্ব্বশী' 'তিলোত্তমা' 'পথের আলো' ইত্যাদি। আজ দেখ্‌তে পাই, সেই নাম নেই, তার বদলে নম্বর হয়েছে।

নিশ্চয় কলিকাতাবাসী মানুষের সম্মিলিত দাবীতে মোটরবাস-গুলির এই নাম অর্থাৎ মানবিকতার রংটুকু নিশ্চিহ্ন করা হয়নি। ব্যবসায়ীরা স্বয়ং তাদের যৌথগত সুবিধার খাতিরে, কারবারের সুবিধার জন্মই নাম তুলে নম্বর দিয়েছেন। কটু সমালোচকের কল্পনায় তাই এমন একটা ভবিষ্যৎ অসত্য নয়, যে-দিন কলিকাতাবাসী মানুষেরও নাম উঠে যাবে। নম্বর দিয়েই তাদের পরিচয় ঘোষিত হবে। কারণ, তাতে সহরের কাজের অনেক সুবিধা হবে। অফিসের কেরাণী-নিয়ন্ত্রণ, মজুর-নিয়ন্ত্রণ, ভোটার-নিয়ন্ত্রণ পরিচালনের উপযুক্ত একটি ফিটফাট খাতা-বাঁধা ব্যবস্থা সম্ভব হবে। এবং কবি রবীন্দ্র-নাথের আত্মা আবার নতুন করে আক্ষেপ করে উঠবেন—

"সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রইবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।"

ভারতবর্ষের আধুনিক সহর নিছক ভোগীর (consumer's) উপনিবেশ। সেই কারণে ভারতের আধুনিক সহর আরও নিষ্ঠুর। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যে-ব্যবস্থা, তার সব চেয়ে বড় এক্সিকিউটিভ হলো সহর।

বর্ত্তমান সভ্য মানুষের সমাজ-ব্যবস্থার এই শোচনীয় বিকৃতি সম্মুখে দেখতে পেয়েই সর্ব্বদেশে একটি নতুন চিন্তার উন্মেষ হয়েছে। য়ুরোপীয় চিন্তা থেকে উদ্ভূত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা সোসালিজমের মধ্যে বর্ত্তমান সহরে-সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করে তার এই বাণিজ্যসর্বস্ব শোষক রূপ আবিষ্কার করা হয়েছে। য়ুরোপীয় চিন্তাশীলেরা প্রধানতঃ সভ্যতার এই বিকৃত ভ্রান্ত এবং ঐতিহাসিক পথভ্রষ্ট রূপকেই 'বুর্জোয়া' সভ্যতা নামে অভিহিত করেছেন। এই জটিল পীড়াকর অবস্থা থেকে কি ভাবে মুক্ত হওয়া যায় তার নির্দ্দেশও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু তার পর থেকে মণীষীদের চিন্তা আরও অগ্রসর হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আরও বহু ঘটনায় নতুন সত্যের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের হৃদয় থেকে একটি নতুন বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। এই বাণী ভারতের প্রতিভার বাণী। ভারতের মনীষা সভ্যতার এই বিকৃতিকে রোধ করার জন্ত উপায় উদ্ভাবন করেছে। ভারতের মানুষের জীবনে ও মাটিতে সভ্যতার বিকার যে দুঃখের দাহন সৃষ্টি করেছে, তা বোধ হয় অন্ত দেশের চেয়ে বেশী। এই-খানেই সহুরে-সভ্যতার অকল্যাণের আয়োজন চরম ভাবে হৃদয়হীন হয়ে উঠেছে। তাই ভারতবর্ষই সমাজ-বিজ্ঞানীর পক্ষে সব চেয়ে বড় পরীক্ষাগার।

বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ গান্ধী—ভারতের চিন্তার প্রতিনিধিস্বরূপ এই সর্বধর্মযোগী সাধকদের সকল যুক্তি বিচার ও ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা একটা ইঙ্গিত দেখতে পাই। সেই ইঙ্গিত গ্রামীণ-সভ্যতার আহ্বান। শুধু এই তিন মনীষী নন, ভারতের বহু গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে আজ একটা কথা ধ্বনিত হচ্ছে। নানা ভাষায় ও ভাবে তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। 'গ্রামে ফিরে চল' 'গ্রাম-স্বরাজ' 'গ্রাম-উদ্যোগ' 'পল্লী-সংস্কার' 'গ্রাম-শিল্প উন্নয়ন' 'বনিয়াদী শিক্ষা' ইত্যাদি বাণীর মধ্যে আমরা ভারতের ঐতিহাসিক চেতনার সেই বৈপ্লবিক সংঘটন ও রূপান্তরের দাবী শুনতে পাই। এঁদের মধ্যে কেউ বিষয়টাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে ধরেছেন, কেউ সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে সমর্থন করেছেন, কেউ বা শুধু প্রাচীনতার প্রতি নিষ্ঠার জন্ত করেছেন এবং অনেকে একটা ধর্ম্মবোধ থেকে করেছেন। যে যে ভাবেই দাবী করুন না কেন, সবার চিন্তার পেছনে সেই ঐতিহাসিক চেতনাই কাজ করছে। এই পল্লী উন্নয়নের অর্থ মজা দীঘির পঙ্কোদ্ধার নয়, ম্যালেরিয়া দূর করা অথবা চরকার প্রচলন নয়। এই সবই সেই মূল সত্যের প্রতিষ্ঠার দিকে খণ্ড খণ্ড প্রয়াস। এই সাধনা 'ফিরে যাওয়ার' (back to village) সাধনা নয়। বলতে পারি, ঘরে আসা বা home coming।

গ্রামীণ-সংস্কৃতি অর্থ সামাজিকতার স্বাভাবিক উৎকর্ষ। এই সংস্কৃতি প্রধানতঃ মানবিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি বিকেন্দ্রীকৃত (Decentralised) উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্কৃতি সমাজবাদ বা সাম্যবাদের সহজ আশ্রয় এবং স্বাভাবিক ভিত্তি।

আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাক্। বর্ত্তমানের গ্রামগুলিই কি গ্রামীণ-সভ্যতার আধার ও বাহন? গ্রামবাসীদের মনোভাব বুদ্ধিবৃত্তি ও রুচির মধ্যে কি গ্রামীণ-সভ্যতার সত্যগুলি বজায় আছে?

না, বর্ত্তমানের গ্রাম গ্রামীণ-সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ মাত্র। গ্রামীণ-সভ্যতার প্যাটার্ণ গ্রামের মধ্যেই ভেঙে গেছে। সহরের সভ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন সভ্যতা। সহুরে-সভ্যতার মধ্যে জাতিগত ঐতিহ্যের কোন প্রকাশ নেই। কলকাতার সভ্যতা এবং লণ্ডনের সভ্যতা প্রকৃতিতে একই। কলিকাতাবাসী নাগরিক ও লণ্ডনবাসী নাগরিকের রুচি নীতি ও জীবন-যাপন প্রণালীর মূল কাঠাম একই ফ্রেমে বাঁধানো। কোন সুস্থ আন্তর্জাতিকতার গুণে ও দাবীতে এই সাদৃশ্য সম্ভব হয়নি। জাতিকতা নেই অর্থাৎ স্বাভাবিক ঐতিহাসিক স্বরূপ নেই—মাত্র এই পরিচয়হীনতা ও বৈশিষ্ট্যের অভাবের জন্তই সহুরে-সভ্যতাকে 'আন্তর্জাতিক' বলে ভুল করা হয়। সর্ব্বজাতির বুদ্ধি হৃদয় ও প্রতিভার সৃষ্টি এবং পরিচয় কলকাতায় খুঁজে পাওয়া যায়—কলকাতার আন্তর্জাতিকতা এই রকমের নয়। কোন জাতিরই হৃদয়ের ছাপ কলকাতার মধ্যে নেই, এই কারণে কলকাতা সহর 'আন্তর্জাতিক' হয়েছে। ঠিক ব্যাকরণগত ভাষায় বলা উচিত—অজাতিক।

আবার যখন দেখি কংক্রীটের কুঠুরিতে বসে সহুরে মানব তার ফুলদানীতে কাগজের ফুলগুলির দিকে মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে রয়েছে, তখন বোঝা যায় যে, বেচারা সেই স্বাভাবিক রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে ভরা গ্রামীণ-সভ্যতার প্রসাদটুকুই পাওয়ার জন্ত প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে। তাই যন্ত্রের সাহায্যেই সহুরে মানব ঘরের ভেতর কৃত্রিম জ্যোৎস্না, কৃত্রিম ফোয়ারা, কৃত্রিম পাখির ডাক রচনা করে। এক দিকে ব্যারাকসুলভ বাধ্য জীবনের দাবী আর এক দিকে মনের মধ্যে প্রাকৃতিক সামাজিক আবেদন। এই দ্বন্দ্বের প্রকোপ সহুরে মানুষকে উতলা করেছে।

মাসখানেক আগে সংবাদপত্রে এই রকম একটা খবর বের হয়েছিল: "সুন্দরবন এলাকায় ধূপখাল নামক একটি খালে জোয়ারের জলের সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড তিমি মাছ আসে এবং তীরে উঠে বসে থাকে। ভাঁটার সঙ্গে জল সরে গেলে গ্রামবাসীরা তিমি মাছটিকে দেখতে পায়। গ্রামবাসীরা দলে দলে এসে তিমি মাছের গায়ে তেল সিঁদুর ঢেলে দেয়। পরের দিন আবার জোয়ারের সময় ঢাক বাজিয়ে তিমিকে বিদায় দেয়। জোয়ারের জলের সঙ্গে তিমিটা আবার অদৃশ্য হয়।"

এই ছোট ঘটনার মধ্যে মানব-প্রকৃতির একটা সুস্থ আদর্শগত রূপের আমরা সন্ধান পাই। এই হলো প্রাচীন-সভ্যতার মনোভাব। এই মানবিক-রোমাণ্টিক শিল্পীসুলভ মনোভাব। তিমি মাছটিকে মেরে তেল বার করে বাজারে বিক্রী করবার স্পৃহা যে কোন গ্রাম-বাসীর হয়নি, এর মধ্যে আমরা সেই স্বাভাবিক সত্যেরই প্রকাশ দেখতে পাই। গ্রামবাসীর মনেও আজ পর্য্যন্ত অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে সেই গ্রামীণ-সভ্যতার আবেগটুকু রয়ে গেছে। তার চার দিকে সেই হারানো-স্বর্গের, সেই গ্রামীণ-সভ্যতার ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে আজও একটা চাপা নিশ্বাস গোপন ভাবে রয়ে গেছে। আধুনিক যুগের কতগুলি অসামাজিক ও স্বার্থ-সর্বস্ব অর্থনীতির ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপে উৎক্ষিপ্ত বালুকার জঞ্জালে গ্রামীণ-সভ্যতার রূপ চাপা পড়ে আছে, তাই আমরা গ্রামকে আজ ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে করি। কিন্তু এই জঞ্জাল সরিয়ে ফেললেই সেই গ্রামীণ-সভ্যতার সজ্জারাম আবার দেখা দেবে, আধুনিক যুগের মানুষ নতুন জ্ঞানের আনন্দ দিয়ে সেই সজ্জারামকে সাজাবে। আরও নতুন স্তম্ভ রচিত হবে, আরও নতুন প্রদীপ জ্বালবে, পথহারা পথিক পথ খুঁজে পাবে।

সহরকেও তার এই উদ্ভিভূষিত অমানবিক ড্রিল-প্যারেড দুরন্ত ব্যারাকপীড়িত ফ্ল্যাট-সঙ্কুচিত জীবনের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে। তার প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে আবার গ্রহণ করতে হবে। ভিড়-করা জীবনের হাঁপানি থেকে উদ্ধার লাভ করতে হবে। সবার ওপরে মানুষ সত্য—সেই 'হিউম্যান'কে সর্ব্বভাবে আয়ত্ত প্রসারিত ও উন্নত করার সাধনাই সামাজিক সভ্য মানুষের সাধনা। নইলে গ্রাম এবং সহর নামে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জীবনের প্যাটার্ণ মানুষজাতিকেই ভিন্ন করে রাখবে। দূর ভবিষ্যতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের প্রয়োজন মিটে গেলেও, সহর ও গ্রাম নামে দুই পরস্পর-বিরোধী রুচি বৃত্তি স্বার্থের অধিকারী দু' শ্রেণীর জনতার মধ্যে হিংস্র সংগ্রামের আশঙ্কাও অমূলক নয়।

গ্রামীণ-সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে সামাজিক হৃদয়ের প্যাটার্ণ, নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বৈষয়িক উপকরণ। প্রথমটিকে বালুকাস্তরণ সরিয়ে পুনরাবিষ্কার ও উদ্ধার করতে হবে। দ্বিতীয়কে প্রাচীরের বন্ধন ভেঙে মুক্ত করে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর ফলে আমাদের লাভ হবে এমন একটি সংসারের রূপ, যা আধুনিক সহরও নয় এবং আধুনিক গ্রামও নয়।

যদি তা না হয়, তাহ'লে হাজার বছর পরে আর একজন অরেল ষ্টাইন এসে কলকাতার সহরের ধ্বংসস্তূপের কাছে দাঁড়াবেন। আবার তাঁকে লিখতে হবে—"এই জনপদকে আজ প্রেতলোকের একটি ভগ্নাংশ বলে মাঝে মাঝে ভ্রম হয়।"

আজকের দিনে আমরা ভুল করে এই মানবতাহীন সহরগুলির মধ্যে প্রেতলোকের ভূমিকা রচনা করে চলেছি। কলকাতার জনারণ্য সত্যিকারের অরণ্যের মতই। মানুষ এখানে নিছক উপকরণ হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

সুখের বিষয়, ভারতীয় মনীষীদের মধ্যেই সমাজবিজ্ঞানের এই তত্ত্বটি আজ সম্যক্‌ভাবে ধরা পড়েছে। পশ্চিমের পণ্ডিতীয়ানার মধ্যে বিষয়টি এখনো ততটা গ্রাহ্য হয়নি। মাত্র সূচনা হয়েছে। পশ্চিমী চিন্তার মধ্যে এখনো Form ও Content-এর সংজ্ঞা সুস্থির হয়নি, ফর্মের রূপ এক ধরণের এবং কনটেন্টের রূপ আর এক ধরণের, একই ব্যবস্থার না কি এই দ্বয়ী সত্তা সম্ভব হতে পারে। ভারতবর্ষের আধুনিকতম চিন্তা আরও অগ্রসর হয়ে, সমাজবিজ্ঞানের গভীরতর সত্যটিকে ধরতে পেরেছে। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের সামঞ্জস্য—ভারতীয় চিন্তার এই বাণী। আধুনিক কারখানার ফর্ম বা গঠন এই রকমই থাকবে, আধুনিক ইউনিভার্সিটির ফর্ম এই ভাবেই থাকবে, আধুনিক সহরের গঠন এই কাঠামোতেই আবদ্ধ থাকবে—শুধু এই সব ব্যবস্থা-গুলির ওপর সর্ব্বসাধারণের অধিকারকে সফল করে দিতে হবে। এই ভাবে সামাজিকতা অগ্রসর হবে। পশ্চিমী চিন্তার রীতি এই ধরণের।

আধুনিক ভারতীয় চিন্তায় আরও বৈপ্লবিক নীতি ধ্বনিত হয়েছে: ঐ ফর্মেরও পরিবর্ত্তন ও ভাঙন চাই। কারখানার ফর্মই শোষণ ব্যবস্থার উপযোগী। তরবারি হত্যা করার জন্যই, সাধু মানুষের হাতে তরবারির স্বত্ব সঁপে দিলেই সে তরবারি দিয়ে মাটি চাষ করবে না। অত্যধিক মুনাফা ভোগ করার জন্য, মজুরকে ঠকিয়ে অমানব করে অল্প সময়ে প্রচুর পণ্য উৎপাদনের জন্যই কারখানা নামে একটি সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কারখানার যন্ত্রের দাঁত নখ গর্জ্জন বেগ—সবই ঐ মূল উদ্দেশ্যের উপযোগী করে তৈরী। কারখানার ওপর সাধারণের অধিকার সত্য করে দিলেই সমস্যা চুকে যায় না। কারখানার ঐ গঠনকেই ভেঙে দিতে হবে। 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' সকল বুদ্ধিজ কীর্ত্তির সঙ্গে কল্যাণভাব যুক্ত হওয়া চাই। অর্থাৎ কোন্ ধরণের যন্ত্র এবং কোন্ ধরণের কারখানা, কোন্ ধরণের জনপদ, সামাজিক মানুষের মানবিকতাকে সহজ সার্থক ও উন্নত করবে—সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এটাই একমাত্র প্রশ্ন।

আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ধারা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা এই ঐতিহাসিক তত্ত্বটির তাৎপর্য্য বুঝতে পেরেছেন। ভারতবর্ষের এই নতুন বাণীর মধ্যে পৃথিবীর বিভ্রান্ত চিন্তা একটা শান্ত আশ্রয়

—ক্ষণিকা—

"চন্দ্রহাস"

অবাক কাণ্ড

নগ্নিকা কথা কয় ভাঙা ভাঙা বুলিতে,
কিশোরীর চোখে নামে লজ্জার পল্লব,
তরুণীর তনু ঘিরি যৌবন-উৎসব,
বৃদ্ধা জপেন্ মালা হরিনাম-ঝুলিতে।
অবাক কাণ্ড এ কি দুনিয়ায় দেখি যে—
বয়স তফাৎ শুধু—মানুষটা একই যে!

লাভ করতে চলেছে। আমরা ভারতীয়েরা তাই অরেল ষ্টাইনের মত হতাশায় শুধু আক্ষেপ করি না। আমরা বিশ্বাস করি—'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু মুদুম্বরম্।' এগিয়ে চলাই হলো অমৃতলাভ, এগিয়ে চলাই তার স্বাদু ফল। প্রচণ্ড বেগে ঘূরপাক খাওয়া একটা অস্থিরতার কীর্ত্তি মাত্র, কিন্তু এই অস্থিরতা এগিয়ে চলা নয়।

আজকের দিনে সমস্যা জটিল ও কঠিন। বাধা প্রচুর। কিন্তু এই নিরাশায় বিষণ্ণতাই আজ একমাত্র ব্যাপ্ত দৃশ্য নয়। ভারতবর্ষের মাটিতেই গ্রামীণ-সভ্যতার অভ্যুত্থানের একটি সুর শোনা যাচ্ছে। গ্রামীণ-সভ্যতা আজও সাত লাখ গ্রামের জীর্ণ পাঁজরের আড়ালে স্পন্দিত হচ্ছে। তাকে নতুন নিশ্বাসে ভরে দেওয়াই আজকের দিনের সাধনা। সুতরাং আমাদের চোখের সামনে ধ্বংসস্তূপের দৃশ্যটাই বড় হয়ে ওঠে না। দুঃখিত অরেল ষ্টাইনকে আমরা ডেকে আনতে পারি, আর একটি দৃশ্য দেখতে। শান্ত মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুভ বুদ্ধির প্রেরণায় ধীরে ধীরে এক একটি পাথরের সিঁড়ি পার হয়ে এলিফ্যান্টা দ্বীপের পাহাড়ের ওপর উঠতে থাকি, এক বিরাট পাষাণের মূর্ত্তির কাছে এসে দাঁড়াই। ত্র্যম্বক সদাশিব মূর্ত্তি। আমরা বার বার গ্রামীণ-ভারতের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর এই বিরাট সৃষ্টির দিকে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে থাকি। "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে"—সত্যিই শিল্প সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তুলেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতের গ্রামীণ-সংস্কৃতির এই স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করি। তখন আমরা আর অরেল ষ্টাইনের মত শোকাচ্ছন্ন হই না। গ্রামীণ-ভারতের সেই শিল্পীর হৃদয়টিকে আমরা চিনতে পারি। আমরা অনুভব করি, জাগ্রত প্রহরীর মত সর্ব অকল্যাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ত্র্যম্বক সদাশিব তাকিয়ে আছেন আরব সমুদ্র ছাড়িয়ে দিগন্ত পর্য্যন্ত। গ্রামীণ-ভারতের সত্যিকারের 'গেট অব ইণ্ডিয়া' এইখানে। আমরা উপলব্ধি করি, ধ্বংসস্তূপের ওপর আমরা আর দাঁড়িয়ে নেই। অব্ গ্রামীণ-ভারতের তোরণদ্বারে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি।

আলু খালিফার শেষ খুন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগে নাম ছিল আলাউদ্দিন—সং ক্ষে পে দাঁড়ালো আলু। আলু নয়—আলু খলিফা।

লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান—জাত-কসাইয়ের ছেলে। লাল টকটকে দুটো চোখ যেন হিংসায় আরক্তিম হয়ে আছে। হাতে লম্বা একখানা চকচকে ভোজালি—তার হাতীর দাঁতের বাঁটটার রঙ প্রথমে ছিল দুধের মতো শাদা। কিন্তু অনেক পশুর রক্ত জমতে জমতে তার রঙ হয়েছে কুচকুচে কালো। শুধু ভোজালির ফলাটায় এতটুকু মালিন্য পড়েনি—ক্রমাগত রক্ত-মাংসের শাণ পড়ে পড়ে এখন যেন তার ওপর থেকে হীরের আলো ঝলকে যায়।

আকস্মিক এক দিন দর্শন দিলে প্রেতমূর্ত্তির মতো।

শীতের সকাল, কিন্তু সকাল হয়নি। শেষ রাত থেকে নেমেছে স্তরে স্তরে কুয়াসা। দূরের নিদ্রিত নির্ব্বাক্ সিংহাবাদের বিস্তীর্ণ হিজলের বন থেকে কৃষ্ণকালীর বিলের দুর্গন্ধ মরা জলের ওপর থেকে সেই কুয়াসা উঠে এসেছে—সমস্ত বন্দরটা শীতের আড়ষ্টতায় পড়ে আছে মূর্চ্ছাতুরের মতো। দু' হাত দূরের মানুষ চোখে দেখা যায় না।

গাঁজা-মদের সরকারী লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার জগদীশ তখন অঘোর ঘুমে মগ্ন। জগদীশ নেশা করে না, কিন্তু দিন-রাত নেশার জিনিষ নাড়াচাড়া করে তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে একজাতীয় অভ্যস্ততা এসে দেখা দিয়েছে। নিজের পরিচিত জায়গাটিতে না শুলে ঘুম আসে না জগদীশের। কেরোসিন-কাঠের পুরোনো তক্তপোষ থেকে সারি সারি ছারপোকা সারা রাত সুড়সুড়ি দেয়—মাথার কাছে পায়া-ভাঙা টেবিলে গাঁজার নিক্তি আর গাঁজার পুরিয়া থেকে নিরুদ্ধ ঘরের মধ্যে অত্যুগ্র দুর্গন্ধ ভেসে বেড়ায়, পায়ের কাছে পঁয়তাল্লিশ গ্যালন মদের পিপা থেকে পচা মহুয়া, চিটেগুড় আর অ্যালকোহলের একটা সুরভি নিশ্বাসে নিশ্বাসে জগদীশের স্নায়ুগুলোকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। ওয়াড়হীন বাঁদিপোতার লেপে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে জগদীশ মধুর স্বপ্নে তলিয়ে থাকে। স্বপ্ন দেখে: বন্দরের খোকা ভুঁইমালির সুন্দরী বিধবা বোনটা তার জন্যে এক খিলি দোক্তা-দেওয়া পান এনে সোহাগভরা গলায় তাকে সাধাসাধি করছে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে জগদীশ লেপের মধ্যে যখন বিড়-বিড় করে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কানের কাছে যেন বাজ ডেকে গেল।

খোকা ভুঁইমালির সুন্দরী বোনের কোকিল-কণ্ঠ নয়, এমন কি খোকার কট্‌কটে ব্যাঙের মতো গলাও নয়। জগদীশ লাফিয়ে উঠে বসল।

বন্ধ দরজায় তখন লাঠির ঘা পড়ছে। ঘরের মধ্যে শীতার্ত্ত অন্ধকারে মিট্ মিট্ করছে লণ্ঠনের লাল-শিখা, রাত শেষ হয়েছে কি না জগদীশ অনুমান করতে পারল না। এমন অসময়ে যে ভাবে হাঁকাহাঁকি করছে, ডাকাত পড়ল নাকি?

শীতে আর ভয়ে জগদীশের দাঁত ঠক্ ঠক্ করে বেজে উঠল: কে।

—দারু চাই বাবু।

দারু! জগদীশের ধড়ে প্রাণ এল। নিশ্চয় মাতাল। অসীম বিরক্তিভরে দাঁত খিঁচিয়ে বিশ্রী একটা শব্দ করলে জগদীশ: এই মাঝরাত্তিরে দারু? ইয়ার্কি পেলি নাকি? যা ব্যাটা—পালা।

আরো জোর গলায় কথাটার পুনরাবৃত্তি শোনা গেল: দারু চাই বাবু।

ক্রুদ্ধ জগদীশ লেপটাকে গায়ে জড়িয়ে নিয়েই উঠে পড়ল, ধড়াস্ করে খুলে ফেললে দরজাটা। যাচ্ছেতাই একটা গাল দিয়ে বললে, সরকারী আইন জানিস? বেলা নটার আগে—

কিন্তু কথাটা আর শেষ হতে পারল না। শীত-মন্থর আড়ষ্ট অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে পৈশাচিক ভাবে হেসে উঠল লোকটা, ঝিকিয়ে উঠল হাতের ভোজালিখানা। জগদীশ দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্ত্তির মতো, শুধু হাঁটুর অস্থি-সংস্থানগুলো যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়ে পা দুটো, থর থর করে কাঁপতে লাগল।

—সরকারী আইন? আইন-ভাঙা মানুষ আমরা বাবু, আইন দেখিয়ো না। দু পয়সা বেশি নেবে নাও, কিন্তু লক্ষ্মী ছেলের মতো এক বোতল কড়া মাল বার করো দেখি। ভোর বেলায় হামলী আমার ভালো লাগে না।

দেখা গেল, ভোর বেলায় হামলী জগদীশও পছন্দ করে না। নিঃশব্দে আলমারী খুলে শিল-করা ত্রিশের একটা বোতল বার করলে। কর্ক ক্রুর প্যাঁচ পড়ল—হিস্‌স্ শব্দ করে তীব্র অ্যালকোহলের খানিকটা বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়। কালো কুর্ত্তা-পরা রাক্ষসের মতো চেহারার মানুষটা বোতলটাকে মুখের কাছে তুলে ধরল। ঢক-ঢক-ঢক। এক নিশ্বাসেই আগুনের মতো বিশ আউন্স পানীয় নিঃশেষিত। একবার মুখ বিকৃতি করলে না, শরীরের কোনোখানে দেখা গেল না এতটুকু প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ। তার পর দুটো টাকা ছুঁড়ে দিলে টেবিলের ওপর, ভোজালিখানাকে

হাতে তুলে নিলে, ব্যঙ্গচ্ছলেই কিনা কে জানে জগদীশকে একটা সেলাম দিলে এবং পায়ের নাগরা জুতোর মচমচ শব্দ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। তমসাচ্ছন্ন কুয়াসায় মিলিয়ে গেল ভৌতিক একটা ছায়ামূর্তি।

আট গণ্ডা পয়সার চেয়ে পাওনা ছিল লোকটার—ফেলে গেছে অবজ্ঞাভরে। কিন্তু সেদিকে মন ছিল না জগদীশের। হাঁটুটা তখনো কাঁপছে, বুকের মধ্যে রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো শব্দ হচ্ছে তখনো। স্তব্ধ স্তম্ভিত জগদীশ ভাবতে লাগল: কে এই লোকটা যে এক নিশ্বাসে বিশ আউন্স আগুন পান করতে পারে এবং একটুখানি পা যার টলে না, যার হাসি অমন ভয়ানক এবং যার ভোজালি অমন ধারালো?

কিন্তু কয়েক দিন পরেই তার পরিচয় কারো কাছে অজানা রইল না।

লক্ষ্ণৌ সহরের এক্সটার্ণড গুণ্ডা। মোট পাঁচ বার জেল খেটেছে, দু বার রাহাজানিতে, তিন বার দাঙ্গায়। অবশ্য বয়সে ভাঁটা পড়েছে এখন, দাঙ্গা-রাহাজানি আলুর আর ভালো লাগে না। ছোট একটা মাংসের দোকান বসিয়ে নির্বিঘ্নে কয়েকটা শান্তিপূর্ণ দিন যাপন করবার বাসনাই তার ছিল। কিন্তু পুলিশের বুদ্ধি একটু ভোঁতা—সব জিনিষই বোঝে কিছু দেরীতে। অতএব সারা জীবন উদ্দামতার মধ্যে কাটিয়ে যখন প্রৌঢ়ত্বে নখদন্তগুলোকে সে আচ্ছাদিত করবার চেষ্টায় আছে, সেই সময়েই তার ওপরে এক্সটার্নমেন্টের অর্ডার এল।

প্রথমে ভেবেছিল মানবে না আইনের শাসন, লুকিয়ে থাকবে এদিকে ওদিকে। কিন্তু বৈচিত্র্যের লোভ, পৃথিবীকে ভালো করে ঘুরে দেখবার একটা মোহ তার মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে। এই লক্ষ্ণৌ শহর, নবাবি আমলের বাগ-বাগিচা, চক-বাজার—এর বাইরে কোন্ পরিধি—কত বড় বিস্তীর্ণ জগৎ? লক্ষ্ণৌয়ের লু-হাওয়া ঘূর্ণির ঝড় উড়িয়ে ডাক পাঠালো আলু খলিফাকে। ট্রেণ ছুটে এল কলকাতায়।

ক্যানিং ষ্ট্রীটের এক খোলার ঘরে গ্রেট মোগলাই হোটেল। সেই হোটেলের ম্যানেজার এক দিন খুন হয়ে গেল। ফুসফুসের মধ্যে ভোজালির ধারালো ফলা বিঁধে গেছে আমূল। আলু খলিফার কিছু হাত ছিল কিনা অথবা কতখানি হাত ছিল ভগবান্ বলতে পারেন। কিন্তু পুলিশ আবার পেছনে লাগল—আলুকে কলকাতা ছাড়তে হল।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়েছে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে। উত্তর-বাংলার এক প্রান্তে মাঝারি গোছের একটা গঞ্জ। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে সরীসৃপ-গতিতে। বাবলা গাছের ডালে বসে আছে শঙ্খচিল। এপারে ছোট গঞ্জ, বাঙালী আর হিন্দুস্থানী ধান-ব্যবসায়ীর উপনিবেশ। ওপারে ঢালু ব্রহ্মডাঙা—শস্যহীন, কুশ আর কাঁকরে আকীর্ণ। তারই ভেতর দিয়ে গোরুর গাড়ির ধূলি-মলিন পথ চলে গেছে ষোলো মাইল দূরের রেল-ষ্টেশনে। ছোট বড় রাঙা মাটির টিলার ওপরে বিচ্ছিন্ন তালগাছগুলো নিঃসঙ্গতার বিরাট ব্যঞ্জনা।

আলু খলিফার ভালো লাগল জায়গাটা। আকাশে বাতাসে, ভাবায় মানুষে আর সীমাহীন শূন্যতায় কোথায় যেন তার দেশের সঙ্গে মিল আছে এর। তা ছাড়া ফেরারীর পক্ষে এর চাইতে নিরাপদ জায়গা আর কী কল্পনা করা চলে। সংসারে অবলম্বন তার দুটি ছেলে—দুজনেই গেছে যুদ্ধ করতে, কোনো দিন ফিরবে কি না কেউ জানে না। সুতরাং স্বচ্ছন্দ মনে জীবনের বাকী দিন কটা এখানে বানপ্রস্থ যাপন করতে পারে আলু খলিফা।

দিন কয়েকের মধ্যেই বন্দরের এক পাশে গড়ে উঠল ছোট একটা মাংসের দোকান। যে ভোজালি সে বাগের মাথায় গ্রেট মোগলাই হোটেলের বুকে বসিয়ে দিয়েছিল এবং অন্ততঃ সাতটি মানুষের রক্ত-কণিকা যার বাঁটে অনুসন্ধান করলে খুঁজে পাওয়া যায়—সেই ভোজালি দিয়ে কচাকচ খাসির গলা কাটতে সুরু করে দিলে। মানুষ আর খাসির মধ্যে তফাৎ নেই কিছু, কাটবার সময়ে একই রকম মনে হয়। তা ছাড়া প্রথম মানুষ মারবার যে উত্তেজনা, লক্ষ্ণৌ শহরে দু তিনটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে সে উত্তেজনা ভোঁতা হয়ে গেছে। মানুষ কাটলে ফাঁসির ভয় আছে, কিন্তু পশুর বেলায় তা নেই। অতএব অর্থকরী এবং নিরাপদ দিক্‌টাই বেছে নেওয়াই ভালো।

বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে নতুন জীবন। দৈনিক একটা খাসি—কখনো বা একটা বকরী জবাই দেয় আলু। রুদ্ধকণ্ঠ পশুটার শ্বাসনলী বিদীর্ণ করে দেয় তীক্ষ্ণধার ভোজালি—তীরের মতো ধারায় ছুটে যায় রক্ত—মুমূর্ষু অহিংস জীবন মাটিতে লুটিয়ে ছট্‌ফট্ করে। অদূরে দাঁড়িয়ে পরিতৃপ্ত চোখে আলু লক্ষ্য করে তার মৃত্যু-যন্ত্রণা। রক্ত আর ধূলোর মিলিত কটু গন্ধ ছড়িয়ে যায় আকাশে। খচখচ করে চলতে থাকে অস্ত্র। তার পর দড়ি ঝোলানো ছোট বড় মাংসখণ্ড ক্রেতাদের লোভ বর্ধন করে।

—কত করে সের, ও খলিফা?

—বারো আনা।

—বারো আনা! এ যে দিনে ডাকাতি।

ডাকাতি! আলু খলিফা হাসে। ডাকাতির কী জানে এরা, বোঝেই বা কতটুকু। করকরে খানিকটা প্রবল হাসিতে মুখরিত করে দেয় চারদিক্।

—সেরা খাসি বাবু, থক্‌থকে তেল। কলকাতা লক্ষ্ণৌ হলে সের হত আড়াই টাকা।

নানা জাতের খরিদ্দার আসে। হিন্দুস্থানী নিরামিষাশী ব্যবসাদারেরা লোক পাঠিয়ে গোপনে মাংস কেনে। কাঁধে কাছিম ঝুলিয়ে, বাঁশের দোলায় শূয়োর নিয়ে হাট-ফিরতি ওঁরাও, তুরী কিংবা সাঁওতালেরাও এক আধ সের মাংস নিয়ে যায়। ভোজালির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মাংস-কাটা কাঠটার নীচে জমে ওঠে রক্তমাখা সিকি আধুলি, এক টাকার নোট। বারোটার মধ্যেই বিক্রী-পাটা শেষ হয়ে যায় আলু খলিফার।

সন্ধ্যায় জগদীশের দোকান। এক বোতল তিরিশের মদ—ছিলিম তিনেক গাঁজা। জগদীশের সঙ্গে আলুর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আজ কাল—এ রকম শাঁসালো খরিদ্দার দুর্লভ। বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ মাঝে মাঝে আলু জগদীশকে মাংস খাওয়ায়।

রাত ঘন হয়ে আসে। গ্রাম্য বন্দরের দোকানগুলো একটার পর একটা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। মদের দোকান থেকে ফিরে আসে আলু। কোনো দিন খাওয়া হয়, কোনো দিন হয় না। রক্ত আর

ক্রেদের ওপরে সাঁতসেঁতে চট বিছিয়ে আলু তার ওপরে এলিয়ে পড়ে। বাসি মাংসের গন্ধ ঘরময় ভেসে বেড়ায়, হাওয়াতে দড়ি-বাঁধা খাসির পায়ের শেষাংশটুকু ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এদিকে ওদিকে দুলতে থাকে। নদীতে হিন্দুস্থানী মাল্লাদের ঢোলের শব্দ আর উদ্দাম চীৎকার শান্ত হয়ে আসে। শুধু বালুচরে থেকে থেকে গাং-শালিক কেঁদে ওঠে: টি—টি—টি—হট্—টি—টি—টি—

আলু খলিফা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে লক্ষ্ণৌ শহরের। দাঙ্গা বেধেছে। আল্লা-হু আকবর। লাঠির ঠকাঠক শব্দ—মানুষের চীৎকার—লেলিহান আগুন। হাতের ভোজালি বাগিয়ে ধরে ভিড়ের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল রক্তলোলুপ বন্য জন্তুর মতো। বিদ্যুতের মতো ঝলকে উঠল ভোজালি। খাসির গলা নয়—মানুষের বুক। ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে আলুর দুখানা হাতকে রাঙিয়ে দিয়েছে।···

জগদীশ ছাড়া আরো দুটি বন্ধু জুটেছে আলু খলিফার। একটি ছোট মেয়ে—রামদুলারী তার নাম। তার বাপ বাজারে কী এক হালুয়াই দোকানের কারিগর। মাংস কিনতে আসে না—মাংস কিনবার পয়সা নেই। মাঝে মাঝে দূরে দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়।

স্নেহ-ভালোবাসা বলে কোনো জিনিস নেই আলুর জীবনে। তবু এই মেয়েটাকে তার ভালো লাগল। বছর পাঁচ ছয় বয়েস, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। কালো রঙের ওপরে সুঠাম মুখশ্রী। গলায় কাচের মালা—হাটের শেষে একটা কেরোসিনের ঢেবি জ্বালিয়ে রাত করে পয়সা খুঁজে বেড়ায়। কী পায় কে জানে, কিন্তু সাধনার বিরাম নেই।

আলুই নিজে থেকে যেচে আলাপ করে নিয়েছে ওর সঙ্গে। প্রথম প্রথম কাছে আসতে চায়নি, রক্ত-মাংসের মাঝখানে ওই অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর মানুষটাকে দেখে ছুটে পালিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তার পরে সহজ হয়ে এসেছে সমস্ত।

সকালে ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে দেখা দেয় ধূলি-মলিন রামদুলারী।

—আজকে কটা বকরি বানালে চাচাজী?

—দুনিয়ার তামাম মানুষ বকরি হয়ে গেছে বেটি, তাই বকরি আর বানাই না। তা হলে তো, দেশভর লোককে জবাই করতে হয়। তাই খাসি কেটেছি।

রামদুলারী কথাটা বুঝতে পারে না। বড় বড় বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে চাচাজীর মুখের দিকে। বলে দুনিয়ার সব লোক বকরি?

—বকরি বৈ কি। কিন্তু সে থাক। মাটিয়া লিবি বেটি? এই নে—ভালো মাটিয়া রেখেছি তোর জন্যে। এক পোয়া আধ পোয়া মেটে প্রকাণ্ড মুঠিতে যা ওঠে, কলাপাতার ঠোঙায় করে রামদুলারীর হাতে তুলে দেয় আলু খলিফা। ভালো লাগে রামদুলারীকে—ভালো লাগে এই দাক্ষিণ্যটুকু। বাংলা দেশের মাটিতে পা দিয়ে বাংলার স্নেহ-স্নিগ্ধ কোমলতা তার চেতনায় মায়া ছড়িয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের এমনি একটা মেয়ে থাকলে খুসি হত সে।

আর একটি বন্ধু জুটেছে—তার নাম বনশীধর। আড়তদার মহাবীরপ্রসাদের ছেলে। কুড়ি বাইশ বছর বয়স—এর মধ্যেই সব রকম নেশায় সিদ্ধহস্ত। আলুকে সে তার দোসর করে নিয়েছে।

ফলে এই হয়েছে যে জগদীশের দোকানে আলুকে আর গাঁটের কড়ি খরচ করতে হয় না। বনশীধর নিয়মিত তার নেশার খরচ যোগায়। হাতে প্রকাণ্ড ভোজালি নিয়ে বনশীধরের দেহরক্ষীর মতো তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আলু খলিফা। চরিত্রগুণে বনশীধরের শত্রুর অভাব নেই, কিন্তু তার সহচরের দিকে চোখ পড়তেই শত্রু-পক্ষের যা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব প্রশমিত হয়ে গেছে।

অত্যন্ত খুশি হয় বনশীধর। বলে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব তোমাকে খলিফা, তুমি আমার খাস বরকন্দাজ বনে যাও।

প্রকাণ্ড মুখে করকরে হাসি হাসে আলু খলিফা।

—কোনো দিন গোলামী করিনি, আজও করব না। তুমি আমার দোস্ত আছো এই ভালো।

দিন কাটছিল—নিস্তাপ নিরুত্তেজ জীবন। আলুর মন থেকে মুছে আসছিল অতীতের যা কিছু স্মৃতি। কোথায় কত দূরে লক্ষ্ণৌ শহর—কোথায় সে সব হিংস্র উন্মত্ত দিন। চোখ বুজে ভাবতে গেলে সত্যকেই এখন স্বপ্ন বলে বিভ্রম এসে যায়। এই ঝাঁপ-ফেলা ছোট দোকান। সামনে বন্দর—টিনের চাল, খড়ের চাল, ছোট ছোট ফড়িয়া আর পাইকার। সকলের ওপরে জেগে আছে মহাবীরপ্রসাদের হলদে রঙের দুতলা বাড়ীটা। প্রতিদিনের চেনা নির্বিরোধ সমস্ত মানুষের মুখ, ধুলোর গন্ধ, বেনেতি মশলার গন্ধ, খাসির রক্ত আর বাসি মাংসের গন্ধ, জগদীশের দোকানে মদের গন্ধ। বাবলা গাছের তলা দিয়ে, কাঁকর আর কুশের তীক্ষ্ণাগ্রে আকীর্ণ দিক্-প্রান্তের মধ্য দিয়ে তেমনি করে বয়ে যায় ক্ষীণস্রোতা নদী। নিশীথ রাত্রে তেমনি করে গাং-শালিকের ডাক: টি-টি-টি-টি—হট্—টি-টি-টি-টি—

মায়া বসে গেছে এখানে—মায়া বসে গেছে এখানকার স্বল্পাবর্তিত সংকীর্ণ জীবনের ওপরে। স্বপ্নের মধ্যে সহস্র গলায় আল্লা-হু-আকবর আর রক্তকে ফেনিল করে তোলে না—রামদুলারীর মিষ্টি হাসি আর কচি মুখখানা ভেসে বেড়ায় চোখের সামনে। বয়স বেড়েছে আলু খলিফার। নিত্যসঙ্গী ভোজালির চওড়া ফলাটা ক্ষয়ে এসেছে আর তেমনি করে দিনের পর দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে মনের সেই পাশবিক উগ্রতা, সেই আদিম হিংস্রতার খর-নখরগুলো।

দিন কাটছিল—কিন্তু আর কাটতে চায় না। বাংলা দেশে মন্বন্তর এল।

পূর্ব-দিগন্ত থেকে পশ্চিমের রণাঙ্গন থেকে কার একখানা আকাশ-জোড়া মহাকায় থাবা বাংলা দেশের ওপরে এসে পড়ল। নেই-নেই-নেই। তার পরে কিছুই নেই। তারও পরে দেখা গেল শুধু একটা জিনিষ মাত্র অবশিষ্ট আছে—সে মৃত্যু। প্রতীকারহীন, উপায়হীন তিল তিল মৃত্যু।

প্রথম প্রথম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করত আলু খলিফা: দেশের এ কী হল ভাই।

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসত: যুদ্ধ।

যুদ্ধ—জং। কিন্তু জং তো আজকের দিনের ব্যাপার নয়, তারই দুই ছেলে তো জঙ্গী হয়ে জার্মাণ ঘায়েল করতে গেছে। এত দিন এই সর্বাঙ্গীণ অভাব কোথায় লুকিয়েছিল। তা ছাড়া ছোট খাটো যুদ্ধ সেও না করেছে এমন নয়। সেই সব দাঙ্গা—লাঠির শব্দ—মশালের আলো যুদ্ধ ছাড়া আর কী হতে পারে? কিন্তু এমন সর্বব্যাপী অভাবের মূর্তি তো চোখে পড়েনি কখনো।

খাসির দর বাড়ল—মাংসের দর বাড়ল। এক পোয়া আধ-পোয়ার খরিদ্দারেরা আর এ পথ মাড়ায় না। দলে দলে দেহাতি লোক বন্দরে আসে, ভিক্ষা চায়, কাঁদে, হাটখোলার পাশে পাশে পড়ে মরে যায়। দিনের বেলাতেই শেয়াল-কুকুরে মড়া খায় এখানে ওখানে। যুদ্ধ।

নেই-নেই কিছুই নেই। সাধারণ মানুষ যেন মৃত্যুর সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে লড়াই করে দিন গুজরান করে। এ এক আচ্ছা তামাসা—এও এক জং। আলু খলিফার বুকের রক্তে চন্ চন্ করে ওঠে উত্তেজনা। প্রতিপক্ষকে যেখানে চোখে দেখা যায় না অথচ যার অলক্ষ্য মৃত্যুবাণ অব্যর্থ ভাবে হত্যা করে চলেছে—তাকে হাতের কাছে পাওয়ার জন্তে একটা হিংস্র কামনা অনুভব করে আলু।

এক পোয়া আধ পোয়ার খদ্দের নেই, কিন্তু দুসের আধ সেরের খদ্দের বেড়েছে। একটার জায়গায় দুটো খাসি জবাই করতে হয়, হাটবারে চারটে। আলু একা মানুষ—অভাব বোধ তার কম, তবুও অভাব এসে দেখা দিয়েছে। দামী মাংসের দামী খদ্দের বেড়েছে, জগদীশের দোকানে সন্ধ্যায় আর বসবার জায়গা পাওয়া যায় না। বনশীধর টাট্‌কা সিল্কের পাঞ্জাবী পরে, দোক্তা-দেওয়া পান চিবোয়; মদের জন্তে নির্বিকার মুখে নোটের পর নোট বার করে। সমস্ত জিনিষটা একটা গোলকধাঁধা বলে মনে হয় যেন। এত টাকা বেড়েছে বনশীধরের, টাকা বেড়েছে হনুমানপ্রসাদের, টাকা বেড়েছে আড়তদার গোলাম আলীর, কিন্তু এত মানুষ না খেয়ে মরে যায় কেন?

দাঙ্গায় মানুষ মারতে ভালো লাগে—যে মানুষের রক্ত উদ্বেলিত—হৃৎপিণ্ড উত্তেজনায় বিস্ফারিত। কিন্তু যাদের অস্থিসার দেহ টুকরো টুকরো করে কাটলেও এক বিন্দু ফিকে জোলো রক্ত বেরিয়ে আসবে না, তাদের এই মৃত্যু দুঃসহ বলে মনে হয়। আলু খলিফার অস্বস্তি লাগে।

বনশীধর আজকাল বিষয়কর্ম্মে মন দিয়েছে। প্রায়ই বাইরে থাকে, শহরে যায়, ইষ্টিশনে যায়, আরো কোথায় কোথায় ছুটে বেড়ায়। তারপর এক দিন দেখা দেয় অতিশয় প্রসন্নমুখে। গায়ে পাটভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে গ্লেজ-কিডের জুতো, মুখে স্ফূর্ত্তি দেওয়া পান আর সিগারেট। মদের দোকানে খুলে দেয় সদাব্রত।

—তারপরে—তামাম চীজ্ পাচ্ছ তো খলিফা?

—কই আর পাচ্ছি!—বোকার মতো মুখ করে তাকায় আলু খলিফা। বড় বড় দুটো আলুর মতো আরক্তিম চোখ মেলে তাকিয়েই থাকে বনশীধরের পানের কস-রাঙানো পুরু পুরু ঠোঁটের দিকে: ভাই, এ কি হল বাংলা মুলুকের হাল-চাল?

পুরোনো প্রশ্নের পুরোনো জবাব সংক্ষেপেই দেয় বনশীধর; লড়াই।

—লড়াই! কিন্তু তোমরা এত টাকা পাচ্ছ কোথা থেকে?

—খোদা মানো? যাকে দেয় ছপ্পর ফুঁড়ে দেয়।

—তা বটে?

কিন্তু খোদা মানলেও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ তো একটা থাকা দরকার। লক্ষ্ণৌ শহরের এক্সটার্ণড গুণ্ডা অনেক বুঝতে পারে কিন্তু এই সোজা কথাটা বুঝতে পারে না কিছুতেই। জীবনের গতি তার প্রত্যক্ষ আর সরল। বাহুবলে, অস্ত্রবলে উপভোগ করো সমস্ত। কেড়ে নাও—ছিনিয়ে নাও। রাহাজানি করো, মানুষ মারো। কিন্তু রাহাজানি নেই—হাঙ্গামা নেই, অথচ টাকা আসছে আর মানুষ মরছে। হাঁ—একেই বলে তগদীর। খোদা দেনেওলাই বটে।

ছিন্নকণ্ঠ খাসির রক্তে দোকানের সামনে মাটিটা শক্ত কালো পাথরের মতো চাপ বেঁধে গেছে। কিন্তু এত মানুষ যে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে মরে গেল, তাদের রক্ত জমল কোথায়? এই হাজার হাজার মানুষের রক্তে সমুদ্র তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে কোন্‌খানে?

তারপর একদিন আলু খলিফার খেয়াল হল আজ অনেক দিন রামদুলারী তার দোকানে আসেনি। চাচাজীর কাছ থেকে মেটে চেয়ে নিয়ে যায় নি কলাপাতার ঠোঙায়। কী হল রামদুলারীর?

মনে পড়ল শেষ যেদিন এসেছিল, সেদিন মেটে চায়নি। চেয়েছিল আধ সের চাল: চাচাজী, কাল সারাদিন আমাদের খাওয়া হয়নি।

বারো আনা দিয়ে আলু চাল কিনে দিয়েছিল রামদুলারীকে। কিন্তু পরদিন থেকে আর আসেনি রামদুলারী। নানা বিড়ম্বনা, বন্দরের পথে ঘাটে মড়া, সন্ধ্যায় জগদীশের দোকানে বনশীধরের টাকায় মদের অবাধ স্রোত—কালো মেয়েটার কথা ভুলেই গিয়েছিল একবারে। কিন্তু সকালে দোকানের ঝাঁপ খুলতে গিয়ে সমস্ত মনটা আলুর খারাপ হয়ে গেল।

সত্‌নারাণ হালুয়াইয়ের ঘর বন্দরের বাইরে। আলু বেরিয়ে পড়ল রামদুলারীর সন্ধানে।

সত্‌নারাণের অবস্থা খারাপ, কিন্তু এত যে খারাপ আলু তা জানত না। ভাঙা খোড়ো ঘর দাঁড়িয়ে আছে অসহায় ভাবে, নদীর বাতাসে তার চালটা কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। বারান্দায় একটা ভাঙা খাটিয়া, তার ওপরে আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে সত্‌নারাণ হালুয়াইয়ের বউ।

—রামদুলারী কাঁহা—রামদুলারী?

সত্‌নারাণের বউ আরো তারস্বরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। নামজাদা গুণ্ডা আলু খলিফার বুক কাঁপতে লাগল—জীবনে এই প্রথম ভয় পেয়েছে, এই প্রথম আশংকায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে।

—কী হয়েছে, কোথায় রামদুলারী?

রামদুলারী নেই। হাঁ—সত্যিই সে মরে গেছে। ভারী অসুখ হয়েছিল, কিন্তু এক কৌটা দাওয়াই জোটেনি। মরবার আগে চেঁচিয়েছে ভাত ভাত করে। গলা বসে গেছে—কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে দুটো মুমূর্ষু চোখ—চিঁ চিঁ করে আর্ত্তনাদ করেছে ভাতের জন্তে। কিন্তু ভাত জোটেনি—কোথায় ভাত? রামদুলারী মরে গেছে। তার মুখে আগুন ছুঁইয়ে শীর্ণ দেহটাকে নদীর জলে গাংগেই করে দিয়ে এসেছে বাপ সত্‌নারাণ।

টলতে টলতে চলে এল আলু খলিফা। সে খুন করবে—বহু দিন পরে খুন করবার প্রেরণায় তার শিরাস্নায়ুগুলো ঝমর ঝমর করে উঠেছে। খুন করবে তাকেই—যে রামদুলারীকে মেরে ফেলেছে, শুষে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেই অলুপ্ত শত্রুকে—যার অলক্ষ্য মৃত্যুবাণ অব্যর্থ লক্ষ্যে হত্যা করে চলেছে? কোথায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বী? ভোজালির সীমানার মধ্যে তাকে পাওয়া যায় কী করে?

জগদীশের দোকান। আলুর মুখ দেখে জগদীশ চমকে গেল।

—কী হয়েছে খলিফা ?

আলু সে কথার জবাব দিলে না। শুধু বললে, একটা বোতল।

—এই অসময়ে !

আলু চেঁচিয়ে উঠল কদর্য্য একটা গাল দিয়ে : তাতে তোমার কী !

জগদীশ আর কথা বাড়ালো না। নিঃশব্দে বোতল খুলে দিলে আলুর দিকে। কী যেন হয়েছে লোকটার—এমন মুখ, এমন চোখ সে আর কখনো দেখেনি। যেন থম থম করছে ঝড়ের আকাশ।

এক বোতল—দু বোতল। আলু কাঁদতে জানে না, তার চোখের জল আগুন হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। খুন করবে, খুন করবে সে। কিন্তু কোথায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী—তার শত্রু ?

পা টলছে, মাথা ঘুরছে। বহুদিন পরে আজ আবার নেশা হয়েছে আলুর। এমনি নেশা হয়েছিল সেদিন—যেদিন গ্রেট মোগলাই হোটেলের ম্যানেজারের বুকে সে তার ছোরাখানা বিঁধিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ কী মনে হল—আরক্ত আচ্ছন্ন চোখ মেলে সে জগদীশকে লক্ষ্য করতে লাগল। একে দিয়েই আরম্ভ করবে না কি ? জগদীশের পেটে বাঁট শুদ্ধ বসিয়ে দিয়ে প্রথম শাণ দেবে ভোজালিতে ?

আলু চিন্তা করতে লাগল।

কিন্তু নিছক পিতৃপুরুষের পুণ্যেই এ যাত্রা জগদীশের ফাঁড়া কেটে গেল। গ্রেজ-কিড জুতো মচমচিয়ে ঘরে ঢুকল বনশীধর।

উল্লসিত কণ্ঠে বনশীধর বললে কী খবর খলিফা, এই সাত-সকালেই মদ গিলতে বসেছ ?

আলু বললে, আমার মর্জি।

একটা বড় কন্‌সাইন্‌মেন্টের টাকা হাতে এসে পৌঁছেছে—অত্যন্ত প্রসন্ন আছে বনশীধরের মন : তা হলে এসো, এসো, আরো চালানো যাক্।

জগদীশ বললে, দু' বোতল গিলেছে কিন্তু।

আলু গর্জে উঠল : দশ বোতল গিলব—তোমার মুণ্ডু শুদ্ধ গিলব আমি।

—দশ বোতল কেন, ভাঁটিটাই গিলে ফেল না। কিন্তু দোহাই বাপু, আমার মুণ্ডুটাকে রেয়াৎ কোরো দয়া করে—জগদীশ রসিকতার চেষ্টা করলে একটা।

বনশীধর হেসে উঠল, কিন্তু আলু হাসল না। চোখের জল আগুন হয়ে ঝরে যাচ্ছে। কে মেরে ফেলেছে রামদুলারীকে, কে কেড়ে নিয়েছে তার রোগের দাওয়াই, তার মুখের ভাত ? কোথায় সেই শত্রুর সন্ধান মিলবে ?

বোতলের পর বোতল চলতে লাগল। শরীরে আর রক্ত নেই—বয়ে যাচ্ছে যেন তরল একটা অগ্নি-নিঃস্রাব। বনশীধরের কাঁধে ভর দিয়ে জীবনে এই সর্বপ্রথম আলু মদের দোকান থেকে বেরিয়ে এল। এই প্রথম এমন নেশা হয়েছে তার—এই প্রথম তার পরের ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে।

চলতে চলতে আলু জড়ানো গলায় বললে, বলতে পারো দোস্ত, চাল গেল কোথায় ?

—চাল ?—বনশীধরের নেশাচ্ছন্ন চোখ দুটো পিট্ পিট্ করতে লাগল। অর্ধচেতন এই মানসিক অবস্থায় আলু অনেকখানি বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে তার কাছে। একটা বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছে—এমনি ফিস্ ফিস্ করে চাপা গলায় বনশীধর বললে, দেখবে কোথায় চাল ?

—দেখব।—প্রতিটি রোমকূপে অগ্নিস্রাব যেন লক্ষ লক্ষ শিখা মেলে দিয়েছে : দেখব আমি।

বনশীধরের অন্ধকার গুদামের ভেতর থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ। লোক জন ছুটে এল ঊর্ধ্বশ্বাসে, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। স্তূপাকার চালের বস্তার ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বনশীধর—রক্তে ভেসে যাচ্ছে চার দিক্। আর তারই হাঁটুর ওপরে বসে ভোজালি দিয়ে নিপুণ কশাইয়ের মতো আলু খলিফা তার পেটটাকে ফালা ফালা করে কাটছে—বনশীধরের মেটে বার করবে সে। মানুষ আর খাসির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই—কাটতে একই রকম লাগে।

এত দিন ঘাতকের মতো মানুষের প্রাণ নিয়েছে আলু খলিফা—কিন্তু কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতেও পারেনি। কিন্তু যেদিন সে খুনের প্রথম অধিকার পেল, সেদিনই সে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে।

—সনেট—

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আজো মোর আয়ু আছে, বেঁচে আছি আমি কোনরূপে,
এখনো আমার দেহে, ধমনীতে, শিরায় শিরায়
হৃৎপিণ্ড হতে বয় উষ্ণ রক্ত ঢিমে তেতালায়,
এখনো এ দেহ তার মিলায়নি মৃত্তিকার স্তূপে।
ম্লান ঘাসে আজো আমি চলাফেরা করি চুপে চুপে;
এখনো বুকের তলে পুরাতন স্মৃতি চমকায়—
বিষণ্ণ আহ্বান কত, আজ যার সবি আবছায়,—
তারি তীরে, ঘোলাটে আঁধার-মাঝে আছি আমি ডুবে।
এখানে দেখেছি আমি কত দেহ হয়েছে বিলীন,
এই পৃথিবীতে কত হাসি গান চূর্ণ হয়ে গেছে,—
মাটির মলিন রঙে মিশে গেছে পীতাভ কঙ্কাল,
ঝরেছে অজস্র ফুল, মরে গেছে তৃপ্তিময় দিন।
কোন মতে আমি শুধু প্রাণ নিয়ে বসে আছি বেঁচে।
দেখে যেতে অনাগত ভবিষ্যের নতুন সকাল।

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১০

ব্যাপারটা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত রহিল না। চাকরী যে ভূপেনের যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—শুধু সেটা কবে, সেই তারিখটা লইয়াই যত কিছু দুশ্চিন্তা। শুধু তাই নয়, ইহার পর দুই-তিন দিন এক বিজয় বাবু ছাড়া অন্য কোন শিক্ষক ভূপেনের সহিত প্রকাশ্যে কথা কহিতেই সাহস করিলেন না। শুধু পণ্ডিত মহাশয় আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, বেশ করেছো ভায়া। আমরা সংসারে জড়িয়ে পড়েছি, আমাদের এখন কোন মতে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যাওয়া, কিন্তু তোমরা জেনে-শুনে অন্যায় করবে কেন। ভালই বলেছ, এরা না রাখে তোমার মত কৃতী ছাত্রের মাষ্টারীর অভাব হবে না।

আর প্রকাশ্যেই বাহবা দিলেন বিজয় বাবু। মানুষটি অত্যন্ত নিরীহ, তাঁহার দারিদ্র্যও সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু তবু তিনিই সকলকার সামনে কমন্-রুমে বসিয়া বলিলেন, তুমি ভাই আজ যা বলে এলে তাতে এক দিক্ দিয়ে আমাদেরই অপমান করা হ'ল বটে, কিন্তু অন্য দিক্ দিয়ে আমাদের মুখও রাখলে। আমাদের যে বিবেক আছে, দায়িত্ব আছে, এ কথাটা যেন আমরা ভুলেই গেছি। আর সত্যিই ত, আমরা ছেলেদের পড়াবো আমাদের বিদ্যে, সেখানে যদি অন্যায় কিছু না থাকে তাহ'লে ওঁদের কাছে আমরা ভয়-ভয় করেই বা চলবো কেন আর ওঁদের ডিক্টেশানই বা মানবো কেন!

ইঁহারা যতটা ভয়ই করুন—ভূপেনের নিজের বিশ্বাস ছিল, শেষ পর্য্যন্ত সেক্রেটারী কথাটা হজমই করিবেন। সে যখন চলিয়া আসে তখন অন্ততঃ তাঁহার মুখের চেহারায় সেই কথাই ছিল। আর হইলও তাই—একে একে দুই দিন চারি দিন কাটিয়া গেল, না সেক্রেটারী না হেডমাষ্টার কাহারও তরফ হইতে কোন উচ্চবাচ্য হইল না। বরং ভবদেব বাবু এক দিন ভূপেনকে ডাকিয়া বলিলেন, কাল আপনার পড়ানো সেক্রেটারী আড়াল থেকে শুনেছেন। তিনি খুব প্রশংসা করলেন আপনার মেথডের।···এ সব কি আপনি বই পড়ে শিখেছেন?···হ্যাঁ, এডুকেশন সম্বন্ধে অনেক বই বেরিয়েছে বটে আজকাল, আমাদের প্রথম বয়সে এ সব ছিল না, পড়িওনি। এখন আর সময় হয় না, কাজের বই যা, মানুষের জীবনে যা সত্যিকারের কাজে আসবে তাই বা ক'খানা পড়তে পাই এখন!···রাধে রাধে,—জানি না, রাধারাণী কোন দিন অবসর দেবেন কি না আবার।

এ ক্ষেত্রেও মোহিত বাবুর কথাটা কাজে লাগিয়া গেল, তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'মানুষকে যত ভয় করবে বাবা, তত সে পেয়ে বসবে। এক পক্ষ কঠিন হ'লেই দেখবে অপর পক্ষ নরম হয়ে গেছে। একটা কথা মনে রেখো, ভবিষ্যৎ জীবনে যদি কোথাও কোন বোঝা-পড়া করার সময় আসে আর সে সময় যদি সত্য তোমার দিকে থাকে, তা'হলে তুমিই আগে রুখে উঠবে—তা প্রতিপক্ষ যত প্রবলই হোক্।'

কথাটা ভূপেন প্রচার না করিলেও চাপা রহিল না। ফল হইল এই যে, এবার শিক্ষক মহাশয়েরা বড় দু'টি দলে ভাগ হইয়া গেলেন। এক দল ভূপেনের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন, আর এক দল মুখে মিষ্ট কথা বলিয়া এবং সুমিষ্ট ব্যবহার চলিলেও মনে মনে তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। শেষোক্ত দলের দলপতি হইলেন অপূর্ব্ব বাবু। ভূপেনের প্রথম হইতেই এই মানুষটিকে ভাল লাগে নাই, অপূর্ব্ব বাবুর মনোভাব তাহার সম্বন্ধে কখনও ভাল ছিল না। এখন তিনি স্পষ্টই ভূপেনকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভূপেন এত দিন মোহিত বাবুর কাছে বৃথা শিক্ষা পায় নাই সে নিজের শান্ত উপেক্ষার বর্ম্মে তাঁহার সমস্ত আক্রমণই ফিরাইয়া দিত—কোন বিদ্রূপই তাহার সে বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

কিন্তু এই সমস্ত দলাদলির মধ্যে এক জন শুধু ছিলেন অত্যন্ত নির্ব্বিরোধী, পবিত্র—তিনি বিজয় বাবু। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই ভূপেন এই মধুর প্রকৃতি মানুষটির অনুরক্ত হইয়া উঠিল। লোকটি দরিদ্র, লেখাপড়াও ভাল করিয়া করিতে পারেন নাই—বি-এ ফেল করিয়া মাষ্টারী করিতে ঢুকিয়াছিলেন, সেদিন আশা ছিল যে, আর একবার পরীক্ষা দিয়া বি-এ এবং এম্-এ পাস করিবেন চাকরী করিতে-করিতেই; কিন্তু সংসারের চাপে সেটা আর কোন দিনই সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। তাই আজও তাঁহাকে অল্প বেতনে নীচের ক্লাসেই মাষ্টারী করিতে হয়—আজও প্রতিটি দিনের সমস্যা তাঁহার কাছে জীবন-মরণের সমস্যা হইয়াই আছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আহারাদি সারিয়া প্রদীপের সামান্য তেলটুকু বাঁচাইবার সাধনা করিতে হয়। অথচ—বিজয় বাবু এক দিন মাত্র দুঃখ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার এক দূর-সম্পর্কের মামা ছিলেন রেলের বড় অফিসার, তিনি বার বার বলিয়াছিলেন যে বি-এ পাস করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেই তিনি একটা ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। গ্রাজুয়েট যে নয় তাহাকে আত্মীয় বলিয়া তিনি পরিচয় দিতে পারিবেন না, বা আত্মীয় পরিচয় দিয়া কোন ছোট কাজে লাগাইতে পারিবেন না। কিন্তু সে সুযোগ তিনি লইতে পারেন নাই, আর একটা বছর পড়িবার মত বা অপেক্ষা করিবার মত সংস্থান ছিল না বলিয়া।

ভূপেন প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু আপনি ফেলই বা করলেন কি ক'রে। আপনাকে দেখে ত ঠিক সে শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন বলে মনে হয় না।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয় বাবু উত্তর দিয়াছিলেন, ফোর্থ ইয়ারে উঠতেই মা মারা গেলেন, বাবা বুড়ো মানুষ রাঁধতে পারতেন না, আমিও বড় অপটু ছিলাম ও সব ব্যাপারে। তাই বাধ্য হয়েই বাবা বিয়ে দিলেন। মায়ের মৃত্যু, তার ওপর পরীক্ষার ঠিক আগে বিয়ে—দু'টো জড়িয়ে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। নইলে পড়াশুনোয় আমার সত্যিই মন ছিল ভাই—আমরা বড় গরীব তা ত জানই, খুব যখন ক্ষিধে পেত ছেলেবেলায় বই নিয়ে বসতুম। পড়তে বসলে আর ক্ষিধের কথা মনে থাকত না।

আরও একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয় বাবু আবার বলিলেন, অবিশ্যি ফেল করার জন্য আমি কারুরই দোষ দিইনি এমন কি অদৃষ্টেরও না। আমার স্ত্রী বড় মিষ্টি মেয়ে ছিলেন ভাই—হয়ত রূপসী নন্ তবু তাঁকে পেয়েই আমার জীবন ধন্য হয়েছে। দারিদ্র্য ত আছেই, চিরদিনই ছিল, চিরদিনই থাকবে, ওটা গা-সওয়া

হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু সে সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে যে মাধুর্য্য তিনি দিয়েছেন তাকে কোন দিনই অস্বীকার করতে পারব না। বিয়ের পর দু'টি মাস যে স্বপ্নে কেটেছে তার স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে, সেইটুকু সে দিন পেয়েছিলুম বলেই আজ আমি অনায়াসে একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে বলতে পারব যে, এ পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হয়েছে। তার পর অনেক দুঃখ পেয়েছি, তিনিও পেয়েছেন—গয়না ত দূরের কথা, একটা ভাল কাপড়ও কোন দিন কিনে দিতে পারিনি—এমন কি, তাঁর অসুখের সময় চিকিৎসাও করাতে পারিনি। তবু মনে হয় কি জানো ভাই—মানুষ স্বার্থপর বলেই বোধ হয় মনে হয়—বাবা সে-দিন বিয়ে দিয়ে ভালই করেছিলেন, আমি ত আমার জীবনের পাথেয় পেয়ে গেছি।

কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দু'টি ছলছল করিয়া উঠিয়াছিল। ভূপেনের মন ব্যথায়, শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল ; সে শুধু চুপি চুপি কহিয়াছিল, বৌদি কি নেই দাদা ?

সহজ কণ্ঠেই বিজয় বাবু উত্তর দিয়াছিলেন, না ভাই, আজ বছর পাঁচেক হ'ল নেই।

তাহ'লে সংসার ?

এক বিধবা দিদি ছিলেন, তা তিনি আবার চোখে ভাল দেখেন না। সংসার চালায় আমার বড় মেয়ে কল্যাণী। বড় লক্ষ্মী মেয়ে ভাই, বড় ঠাণ্ডা মেয়ে। মায়ের মতই স্বভাব হয়েছে, খাটতে পারে বরং তার চেয়েও বেশী।···মেয়েটা বড়ও হয়ে উঠেছে ভাই, আঠারো বছরে পড়ল। কী করে কার হাতে যে দেব তা জানি না। আর দিলেই বা চলবে কি করে—দিন-রাত আকাশ-পাতাল ভাবছি, ভেবে কূল-কিনারা পাই না।

বিজয় বাবু এমনিতে অত্যন্ত শান্ত, বরং চাপা বলাই ভাল। এক দিন মাত্র মনের আবেগে কথা কয়টি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু ভূপেন সেটা ভুলিতে পারে নাই। ঐ কয়টি কথাতেই তাঁহার যে অন্তরের পরিচয় সে পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় তাঁহাকে অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত মনে হইতেছিল যেন সে মরুভূমিতে আছে—অথচ এক জনও যদি অন্তরঙ্গ না থাকে ত মানুষ বাঁচে কি করিয়া ? বিজয় বাবুকে শ্রদ্ধা করিত সে বরাবরই, কারণ, তিনিই ইস্কুলের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র মানুষ—যাঁহাকে কখনও কাহারও সম্বন্ধে একটিও অপ্রিয় কথা বলিতে ভূপেন শোনে নাই। পৃথিবীতে কাহারও বিরুদ্ধে তাঁহার নালিশ ছিল না—না মানুষ, না ভগবান্।

সেক্রেটারী-সংবাদের কয়েক দিন পরেই সহসা ভূপেন ছুটির পর এক দিন বলিয়া বসিল, চলুন দাদা, আপনার বাড়ী ঘুরে আসি।

বিজয় বাবু যেন মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তাহার পরই সহজ কণ্ঠে কহিলেন, চলো না ভাই, সে ত আমার সৌভাগ্য।

তাহার পর পথ চলিতে চলিতে প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, অনেক দিন এই কথা আমার মনে হয়েছে ভাই—আর আমারই বলা উচিত ছিল আগে কিন্তু সাহস পাইনি, আমরা বড় গরীব ভাই—কি জানি কি ভাববে তুমি, সহরের লোক। এ সঙ্কোচ রাখা হয় ত উচিত ছিল না—তবু এড়াতেও পারিনি।

ভূপেন স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তাতে কি হয়েছে দাদা, আমিও আপনার আহ্বান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিনি। তা ছাড়া সঙ্কোচ ত মানুষ মাত্রেরই থাকে।

বিজয় বাবুর বাড়ীটি ছোট নয়, সাধারণ মাটির বাড়ী, ঘরও এককালে কম ছিল না, যদিচ তাহার অনেক কয়টাই সংস্কারের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এখন মাত্র দুইটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সে দুইটিও অবিলম্বে খড় না পড়িলে যে বেশী দিন টিকিবে না—তাহা একবার মাত্র চোখ বুলাইয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল। বাড়ীর উঠানে একটা কঙ্কালসার গরু বাঁধা—একটা মরাইয়ের বেদীও আছে, অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থের যাহা থাকা উচিত তা এককালে সবই ছিল। কিন্তু আজ দারিদ্র্য ও লোকাভাবের ছাপ তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখানো। উঠানে ভাঙ্গা-চোরা কাঠ-কাঠরা, কতকগুলি পুরাণো টিন স্তূপাকার করা—বোধ হয় বহু কাল হইতেই ঐ ভাবে আছে—তাহাদের উপরে বহু বন্য গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে।

কতকটা কৈফিয়তের সুরে বিজয়দা কহিলেন, ঐ ত একটা মেয়ে, সারাদিন রেঁধে, গরুর কাজ ক'রে, বাসন মেজে আর এ-সব পরিষ্কার করা পেরে ওঠে না। ওমা কল্যাণী, এ-দিকে এস।

'যাই বাবা !' বলিয়া বোধ করি রান্না-ঘর হইতেই একটি বছর সতেরোর তরুণী মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। তাহার রং ময়লা, যদিও একেবারে কালো নয়। সাধারণ ধরণের মুখ, একহারা ঢ্যাঙ্গা গঠন—তবু মোটের উপর একেবারে শ্রীর অভাব নাই—ভূপেনের বরং ভালই লাগিল।

সহসা বাহিরে আসিয়াই বিজয় বাবুর সহিত অপরিচিত লোককে দেখিয়া কল্যাণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বিজয় বাবু কহিলেন, দাঁড়ালি কেন মা, আয় আয়—ইনিই সেই ভূপেন বাবু, আমাদের নতুন মাষ্টার মশাই। এঁর কথা ত তোকে অনেক বলেছি মা।

তাহার পর ভূপেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, এই মেয়েটিই আমার এখন বন্ধু, সেক্রেটারী সব—যা কিছু গল্প ওর সঙ্গেই করি।

কল্যাণী প্রথমটায় লজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর সঙ্কোচ করিল না। দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন আপনারা।···চা হবে ত, বাবা ?

বিজয় বাবু কহিলেন, দুধ আছে কি।···আমি ত র' চা খাই—কিন্তু ভায়া আমার—

কল্যাণী নতমুখে কহিল, সে যা হয় হবে বাবা।

বিজয় বাবু নিশ্চিন্ত এবং খুশী হইয়া কহিলেন, বেশ, বেশ : ব'স ভাই, বস—

একটু পরে কল্যাণীর ছোট একটি ভাই একটা বাটি হাতে কোথায় বাহির হইয়া গেল। ভূপেন বুঝিল যে, সে দুধের সন্ধানেই চলিয়াছে। এই অল্পবয়সী মেয়েটি যে দরিদ্রের সংসারের সব ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে তাহা বুঝিয়া সে একটু বিস্মিতই হইল। সে প্রশ্ন করিল, ছেলেমেয়ে ক'টি দাদা ?

মেয়ে ঐ একটি ভাই—ছেলে তিনটি। ওর চেয়ে সবাই ছোট।

আরও দুই-একটা কথার পরই কল্যাণী চা লইয়া আসিল। একটা কলার পাতে তেলমাখা মুড়ী, খানিকটা পাটালী গুড় এবং কলাইয়ের বাটিতে চা। বিজয় বাবুর যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল—কহিলেন, চিনি ছিল না ?

সলজ্জ ভাবে হাসিয়া। কল্যাণী কহিল, গুড় থেকেই চিনি করে নিয়েছি বাবা। কেন, গন্ধ হয়েছে গুড়ের?

বিজয় বাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, না—না, গন্ধ হবে কেন।

কল্যাণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার যা ব্যাপার, তোমাকে জিজ্ঞাসা করাই ভুল। ও-বেলা ডালে নুণ দিতে ভুলে গিয়েছিলুম, তা ত তুমি এক বারও বললে না বাবা, নুণও চাইলে না। তোমার কি জিভে স্বাদও লাগে না!

বিজয় বাবু অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, নুণ কি হয়নি মা ডালে? কৈ, আমি ত বুঝতে পারিনি।

কী সর্ব্বনাশ! হাসি চাপিতে গিয়া ভূপেনের বিষম লাগিয়া গেল। সে কহিল, স্রেফ আলুনি খেয়ে উঠে গেলেন? আশ্চর্য্য!

অতটা বুঝতে পারিনি। বলিয়া বিজয় বাবু মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কল্যাণী সস্নেহ অনুযোগের সুরে কহিল, কি লোককে নিয়ে যে আমাকে ঘর করতে হয় তা যদি জানতেন! রাত্রে শোবার আগে কিছুতেই দোরে খিল দিতে দেন না, বলেন, আমরাও ভগবানের নাম করে শুই, চোরেরাও ভগবানের নাম ক'রে বেরোয়—তিনি যে-দিন যাকে যা দেবার দেবেনই। দোর বন্ধ করে কাকে ঠেকাবি বল্।

হেমন্তের ম্লান গোধূলির আলোতে বিজয় বাবুর শীর্ণ বলিরেখাঙ্কিত মুখই যেন ভূপেনের চোখে পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই দূর প্রবাসে দাসত্ব করিতে আসিয়া এই একান্ত ভাগবত মানুষটির সাহায্যই তাহার বড় লাভ হইয়াছে।

ইহার পর গল্প জমিয়া উঠিল দ্রুত। মেয়েটি তাহার বাপ সম্বন্ধে বহু অনুযোগ করিল, কিন্তু প্রত্যেকটিই তাহার প্রতি কন্যার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগেরই পরিচয় দিল। এমনি বহু ক্ষণ ধরিয়া কল্যাণী ও বিজয় বাবুর সহিত গল্প করিয়া অনেক রাত্রে যখন সে আবার হোষ্টেলের পথ ধরিল, তখন তাহার মনে হইল যে, অনেক দিন পরে যেন তাহার মনটা কী কারণে হাল্কা হইয়া গিয়াছে।

[ক্রমশঃ

—স্মরণী—

পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেক মধুর দিন, অনেক স্বপনময় রাত
অনেক শ্রাবণ-বেলা, অনেক মিলন-উষা কাল
হঠাৎ সকাল কতো অনেক নীরব হাসি নিয়ে
গাঁথিয়া গিয়াছে নানা জীবনের স্নিগ্ধ পুষ্পহার।

মিলনের লগ্ন কত আষাঢ়ের বর্ষণ-সন্ধ্যায়
শীতের দুপুর রাতে ঘুমভাঙা কত শিহরণ,
রজনীর জেগে থাকা তারা সাথে কত রাত্রি জাগা
জীবনের শ্যাম ক্ষেত্রে ফেলিয়াছে নীরব চরণ।

মধুর স্মৃতির স্বপ্ন আজিকার রাত্রিরে আমার
নিদ্রার পাত্রের পরে বুলাইয়া দিল কোন সুর…
স্মরণের গ্রন্থি টানি হৃদয়ের উদ্বেগ ভীষণ
চঞ্চল বক্ষের তীরে দেয় আজি শাশ্বত কী দোলা।

আমার চোখের জল আজিকে কী আনে সর্ব্বনাশ!
আমার নিশ্বাস আজি কী যে দেয় মৃত্যুর বিলয়!
আমার রাতের স্বপ্ন ধরিত্রীর পায় না আশীষ!
আমার মিলন-লগ্ন তাই আজি মিথ্যা বয়ে যায়!

আজিকার নিদ্রাহীন এই মত কত রিক্ত রাত
দূরের স্মৃতিরে দেয় অশ্রুগলা গানের মঞ্জরী!
তবু এ'ত মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় এই জেগে থাকা
অনেক স্মৃতির বুকে এও রবে চির অমলিন।

অনাদি অতীত শেষে প্রদোষের আধো অন্ধকারে
রাত্রি জাগা তারা সাথে হবে যবে নিত্য আলাপন;
অনেক দিনের কথা, অনেক রাতের স্বপ্ন-মাঝে
আজিকার রাত্রি দিবে অতীতের নবীন মিলন।

তামাকের দোষগুণ

পশুপতি ভট্টাচার্য

তামাক খাওয়া যে অপকারী, এ কথা আমরা সকলেই বলে থাকি, অথচ প্রায় সকলেই আমরা কোনো-না-কোনো ভাবে তামাকের নেশা ক'রে থাকি। হুঁকা-গড়গড়ার রেওয়াজ আজ-কাল এক-রকম উঠেই গেছে, সভ্য লোকেরা সিগারেট বা চুরুট খায়, তার মধ্যে যারা আরো একটু হাল ফ্যাশানের তারা সাহেবদের অনুকরণে পাইপ খায়, আর যারা পয়সা বাঁচাতে চায় তারা গরিবদের অনুকরণে বিড়ি খায়। যারা মোটেই ধূমপান করে না, তাদের মধ্যেও অনেকে তামাক অন্য ভাবে ব্যবহার করে, সাধারণতঃ পুরুষেরা নেয় নস্য, আর মেয়েরা খায় দোক্তা। অনেক পুরুষেও আবার মেয়েদের মতো সখ ক'রে পানের সঙ্গে দোক্তা খায়। কিন্তু যে যেমন ভাবেই তামাক ব্যবহার করুক, এটা যে অন্যায় কাজ, তা সকলেই স্বীকার করে। স্বীকার করা সত্ত্বেও এই অন্যায় কাজটি করতে সকলেরই লোভ হয়, আর তাই থেকে দাঁড়িয়ে যায় একটা অভ্যাস। তখনও কিন্তু দোষ করা হচ্ছে বলে মনে মনে সকলেরই একটা ধারণা থেকে যায়, তাই বড়োদের সুমুখে ছোটোরা প্রায়ই ধূমপান করে না। এটা অবশ্য ছেলেবেলাকার শিক্ষার ফল। ছেলেবেলা থেকেই আমরা জেনে আসছি যে, ছোটোদের পক্ষে ধূমপান করা এক মহা অপরাধ, কিন্তু বড়োদের বেলায় এতে কোনো দোষ নেই। এই ধারণাটা চিরকাল বজায় থাকে, তাই বৃদ্ধেরাও অতিবৃদ্ধদের সামনে ধূমপান করে না, কিন্তু ছোটোদের সামনে অবলীলাক্রমে ধূমপান করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাদের এই কুকর্মটি করতে বারে বারে নিষেধ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই নিষেধ করবার জন্যই তামাকের নেশা এতখানি সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, এমন কি, আজকালকার প্রগতিশীল মেয়েরাও সেই নিষেধের বেড়া ভেঙে ধূমপান করতে কৌতূহলী হ'য়ে উঠছে। রক্ষণশীল পুরুষেরা গম্ভীর ভাবে ধূমপান করতে করতে এই নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করছে যে, এবার চরম অধঃপতনের আর অধিক বিলম্ব নেই।

তামাক কিসে এত অনিষ্টকারী? লোকে বলে তামাকের মধ্যে নিকোটিন (nicotine) আছে, সেই জন্যই ওটা আমাদের শরীরের অনিষ্ট করে। কিন্তু এটা কেবল অর্ধেক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য কথা তা নয়। বস্তুতঃ তামাকের মধ্যে নিকোটিন ছাড়াও আর দুটি স্বতন্ত্র রকমের বিষাক্ত পদার্থ আছে,—তার মধ্যে একটি পাইরিডিন (pyridine), আর একটি কার্বন মনোক্সাইড (carbon monoxide)।

পাইরিডিন এক অতি বিষাক্ত সামগ্রী। আগেকার কালে এটি অতি অল্প মাত্রায় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হতো হাঁপানি রোগের টান কমাবার জন্য, আজ-কাল সে ব্যবহার উঠে গেছে। আজ-কাল এটি ব্যবহার করা হয় মশা-মাছি প্রভৃতি পোকা-মাকড় মারবার জন্য আর, কখনো কখনো বীজাণুনাশের জন্য। তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে এই পাইরিডিন থাকে বলেই তার দ্বারা কণ্ঠদেশের ঝিল্লিতে একটা প্রদাহ উপস্থিত হয়, আর সেই জন্যই ধূমপান করলে গলা খুসখুস করে। এতে কারো কারো এমন অবস্থা হয় যে, তারা অষ্টপ্রহরই কেবল এক ধরণের শুষ্ক কাসি (smoker's cough) কাসতে থাকে, অবশেষে কিছুতে সে কাসি নিবারণ করতে না পেরে তারা ধূমপান করা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।
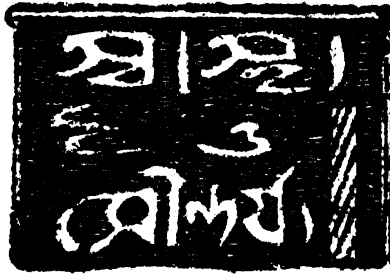
কার্বন মনোক্সাইড যে কতখানি বিষাক্ত জিনিস সে কথা সকলেই জানেন। অসম্পূর্ণ ভাবে পোড়া কয়লার অঙ্গার থেকে এই বাষ্পের সৃষ্টি হয়। কয়লার উনন জ্বালবার সময় নীলবর্ণের শিখারূপে আমরা এই বিষাক্ত গ্যাসকে দেখতে পাই। কয়লার খনির মধ্যে আর বন্ধ ঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে এই গ্যাস থেকে যে কত লোকের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মোটর গাড়ির পিছন দিক থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয় তার মধ্যেও এই গ্যাস থাকে। নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেই এর বিষক্রিয়া শুরু হ'য়ে যায়। তৎক্ষণাৎ এই গ্যাস সেখানে গিয়ে রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং সেই হিমোগ্লোবিন তখন তৎকর্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে থাকায় আর প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বাষ্পটুকু গ্রহণ করতে পারে না। অতএব রক্তের মধ্যস্থতায় যে অক্সিজেন শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে জীবকে বাঁচিয়ে রাখতো, তারই অভাবে সমস্ত কোষগুলি প্রাণশূন্য হয়ে যায় আর সেই দুর্ভাগ্য জীব অবসন্ন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বন্ধ ঘরের আবহাওয়ার মধ্যে শতকরা এক ভাগ মাত্র কার্বন মনোক্সাইড থাকলেই তার বিষক্রিয়া রীতিমত টের পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, এর চেয়ে কম পরিমাণে থাকলেও সেই ঘরে কিছুক্ষণ বাস করলে মাথা ধরে, মাথা ঘোরে, এবং একটা অবসাদের ভাব উপস্থিত হয়। সিগারেট বা সিগার বা পাইপে টান দিতে যে ধোঁয়াটুকু মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, তাতে কতখানি কার্বন মনোক্সাইড থাকে, এ সম্বন্ধে প্রফেসর ডিক্সন বিশেষরূপে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তিনি বলেন, সিগারেটের ধোঁয়াতে থাকে শতকরা আধ থেকে এক ভাগ পর্য্যন্ত; পাইপের ধোঁয়াতে থাকে শতকরা এক ভাগের কিছু বেশী; আর সিগার বা চুরোটের ধোঁয়াতে থাকে শতকরা ৬ থেকে ৮ ভাগ পর্য্যন্ত। তিনি বলেন, তামাক যতই জোরে ঠেসে ভরা হয় ততই বেশি এই বাষ্প জন্মায়, আর যতই তাড়াতাড়ি ধূমপান করা হয় ততই বেশি এটা নির্গত হ'তে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে, এই বাষ্প ফুসফুস্ পর্যন্ত গিয়ে না পৌঁছুলে এর কোনো বিষক্রিয়া হ'তে পারে না। যারা চুরোট বা মোটা সিগার খায় তারা মুখ পর্যন্ত টেনে নিয়েই ধোঁয়াটা ছেড়ে দেয়, সে ধোঁয়া ভিতরে বেশি প্রবেশ করে না, সুতরাং পরিমাণে বেশি থাকলেও এই গ্যাসের বিষক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ভাবে অনেক কম হয়। পাইপের ধোঁয়াতে তার চেয়ে কিছু বেশি হয়, কারণ, পাইপের ধোঁয়া কিছু পরিমাণে ফুসফুসে প্রবেশ করে। সিগারেটের ধোঁয়াতে এই অনিষ্ট সব চেয়ে বেশি হয়, কারণ, যদিও তাতে এই গ্যাসের পরিমাণ সব চেয়ে কম থাকে, তবু সিগারেটে টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার সবটুকু ধোঁয়াই আমরা গলাধঃকরণ ক'রে নিই। অনেকখানি ধোঁয়ার মধ্যে যে খানিকটা পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড থাকবে তাতে আর সন্দেহ

কি, এবং সেই জিনিষটা ফুসফুসে ঢুকলেই তার থেকে শরীরের কিছু অনিষ্ট ঘটবে। এই ধূমপান অনবরত চলতে থাকলেই অনিষ্টটা আরো কিছু বেশি হবে। সিগারেটের ধোঁয়াতে কোনো অনিষ্ট হয় কি না তা অনেকেই বুঝতে পারেন থিয়েটার কিংবা সিনেমা দেখতে গিয়ে, এবং আরো বিশেষ ক'রে বুঝতে পারেন, যদি তাঁদের ধূমপান করার অভ্যাস না থাকে। সিনেমা থিয়েটার দেখতে গেলেই অনেকে মাথাধরা নিয়ে বাড়ী ফেরেন। তার কারণ আর কিছুই নয়, সেখানে একে তো চতুর্দিক্ রুদ্ধ থাকার জন্ত অক্সিজেনের খুবই অভাব, তার উপর বহু জনে মিলে অনবরত সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে আর সেই ধোঁয়ার কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত হ'য়ে উঠছে। অক্সিজেনের অভাবে ঐ গ্যাস আরো উত্তমরূপে ক্রিয়াশীল হয়, সেই জন্ত সেখানে কিছুক্ষণ থাকলেই মাথা ধরে। আরো একটা লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ঘরের মধ্যে ধূমপান করলে যতখানি অনিষ্ট হয়, বাইরে মুক্ত বায়ুতে ধূমপান করলে তার চেয়ে অনেক কম অনিষ্ট হয়। তার কারণ ঐ একই, প্রচুর অক্সিজেন থাকলে সেখানে এই বাষ্পের বিষক্রিয়া কম হয়।

তামাকের মধ্যে নিকোটিনের তৃতীয় স্থান। কিন্তু এর বিষাক্ততা সম্বন্ধে অনেকের কোনো ধারণাই নেই। খাঁটি নিকোটিন সায়ানাইড ও প্রুসিক্ অ্যাসিডের মতোই তীব্র ও ক্ষিপ্রকারী বিষ। এর মাত্র দুটি ফোঁটা যদি কোনো কুকুরের জিভে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ মরে যাবে। এর দুই গ্রেণ মাত্র খেলে এক জন জোয়ান মানুষ মরে যাবে। একটি সিগার বা চুরোটের মধ্যে যতখানি নিকোটিন আছে, সেটুকু বের ক'রে নিয়ে যদি কোনো মানুষের রক্ত-শিরার মধ্যে ইনজেকশন করে দেওয়া হয় তবে সেও তৎক্ষণাৎ মরে যাবে। আগেকার দিনে যখন ক্লোরোফরম আবিষ্কার হয়নি তখন রোগীকে মাতালের মতো অসাড় করবার জন্ত তামাকে তরল সার এনিমার দ্বারা প্রয়োগ করা হতো, তাতে কেউ কেউ মারাও যেতো। দৈবাৎ খানিকটা তামাক গিলে ফেলে ছোটো ছেলেমেয়ে মারা গেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। নিকোটিনই এই সকল মৃত্যুর কারণ। এই নিকোটিন যদিও সাধারণ তামাকের মধ্যে অল্প পরিমাণেই থাকে এবং যদিও তার অল্পই আমাদের পেটের ভিতর ঢোকে, কিন্তু তবু সামান্ত পরিমাণে তো যায়ই,—তার কোনো আশু বিষক্রিয়া দেখা না গেলেও একটা বিলম্বিত ক্রিয়া চলতে থাকে। অনেকে বলেন, গড়গড়ায় ধূমপান করলে জলে ধুয়ে এই নিকোটিন কিছু নষ্ট হ'য়ে যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে খুব সামান্তই। গড়গড়ায় খুব লম্বা নলে ধূমপান করলে ধোঁয়াটা খানিক জলের উপর দিয়ে ও খানিক অক্সিজেনের ভিতর দিয়ে কিছু হাল্কা হ'য়ে আসে, এই এক সুবিধা।

তামাকের মধ্যে যে সমস্তই কেবল দোষের, আর গুণের কিছুই নেই, এমন কথা বলা যায় না। অন্ততঃ এটা প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে, যারা তামাকের চাষ করে তাদের মধ্যে ক্যান্‌সার রোগটি খুবই কম হয়। কেউ কেউ বলেন যে, তামাকের মধ্যে সামান্ত কিছু ফর্মালিন আছে, তাতে মুখের মধ্যে এক রকম অ্যাণ্টিসেপটিকের কাজ করে এবং দাঁতের গোড়া ভাল থাকে। কিন্তু এ-সব গুণের কথা নিতান্তই টেনে-যানে-করার মতো।

তবে তামাক ব্যবহার ক'রে আমরা কোন্ সুখ পাই? অবশ্যই কিছু পাই বৈ কি, নতুবা নিতান্ত অভাব থাকলেও আমরা এই নেশাটির জন্ত অর্থব্যয় করতে বিরত হই না কেন? এতে যে সুখ পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি মৌতাত। এই মৌতাতটুকুর জন্ত ব্যয় করতে আমরা কখনো কুণ্ঠিত হই না। এই মৌতাত আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করে, অশান্তি দূর করে, বিষণ্ণ অন্তঃকরণে কিছু প্রসন্নতা এনে দেয়। আগে যখন হুঁকা-গড়গড়া প্রভৃতির ব্যবহার ছিল, তখন ধীরে ধীরে কলিকাটিতে তামাক সেজে তাতে আগুন ধরিয়ে হুঁকার জল ফিরিয়ে যখন টান দিতে শুরু করা হতো ততক্ষণে এই তোড়জোড়ের দ্বারা মৌতাতটি অনেক জমাট হ'য়ে উঠতো। এখন যদিও সে ব্যবস্থা নেই তথাপি সিগারেট প্রভৃতির মধ্যেও একটা পৌরুষব্যঞ্জক তেজের ভাব আছে, ওতে যেন স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমার কিছু পুরুষত্ব আছে। অনেকের পক্ষে এটা মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তামাকের অনেক সুখ্যাতি করে গেছেন। তিনি নিজেও যথেষ্ট তামাক খেতেন, তাঁর এতে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো তামাক ব্যবহার করেন নি। তাঁর শান্ত ও সমাহিত প্রকৃতির পক্ষে এটার প্রয়োজন হয়নি, নতুবা সুযোগ তাঁর যথেষ্টই ছিল। সুতরাং অনেকটাই নির্ভর করে প্রকৃতির উপর। অনেকে সিগারেট না খেতে পেলে মনে কোনো একাগ্রতা আনতে পারেন না, সিগারেট খেতে-খেতেই তাঁদের কাজ করতে হয়। ধূমপানের মধ্যে যেন একটা ছন্দের ভাব আছে, প্রয়োজন অনুসারে কখনো তা দ্রুত, কখনো বিলম্বিত। যখন একটা উদ্বেগ বা উত্তেজনা চলেছে তখন মানুষ ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়ে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায়। যখন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন তখন সিগারেট পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। মাঝে মাঝে যখন চৈতন্ত হচ্ছে তখন সিগারেটে একটা টান পড়ছে, সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মনের চিন্তাধারা কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে উপরের দিকে উঠে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে। পাড়াগাঁয়ের চাষারা এখনও যখন বর্ষার সময় সারাদিন জলে ভিজে মাঠে কাজ ক'রে এসে সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় বসে হুঁকাটি হাতে ধরে তামাক খায়, তখন তাদের সেই টান দেবার ছন্দটা দেখলেই বুঝতে পারা যায়, বর্ষার ছন্দের সঙ্গে তার কোনো মিল আছে কি না। যদি অনাবৃষ্টি হয়, তখনও তারা দাওয়ায় নিষ্কর্মা বসে তামাক খায়, কিন্তু তখন তার টানের ছন্দ একেবারে স্বতন্ত্র।

তামাকের একটা নিজস্ব সুগন্ধ আছে, তাও আমাদের আকৃষ্ট করে। এ বিষয়ে আমাদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। যারা মৌতাতি লোক তারা একটু ইতরবিশেষই বুঝতে পারে জিনিষটা খাঁটি না ভেজাল, দামী না সস্তা। গন্ধের দ্বারাও তারা মৌতাতটি উপভোগ করে।

অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আমরা তামাকের অপ-কারিতাগুলোকে কাটিয়ে দেবার খানিকটা স্বাভাবিক শক্তি (tolerance) নিয়েই জন্মগ্রহণ করি। তামাক ব্যবহার করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিটুকু আমাদের ক্রমশঃ ফুরিয়ে যায়, তখন আর ঐ শক্তি নতুন করে অর্জিত হয় না। সুতরাং যৌবন কালে আর মধ্য বয়সে যদি আমরা অপরিমিত ভাবে তামাক ব্যবহার করতে থাকি তা হ'লে প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি গিয়ে সেই শক্তিটুকু

নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তার পরেও যখন আমরা অভ্যাসবশতঃ তামাকের ব্যবহার ক'রে যেতে থাকি তখন ধীরে ধীরে কতকগুলি রোগলক্ষণ দেখা দেয়। হজমের দোষ, নিদ্রাহীনতা, এখানে ওখানে বাতের ব্যথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতিই (neuralgia) এই সমস্ত লক্ষণ। আমরা মনে করি যে এগুলো অন্য কোনো কারণে ঘটেছে। তামাক ব্যবহারই যে তার কারণ, এ আমরা ধারণাই করতে পারি না, কারণ পূর্বে কখনো তামাকের দ্বারা কিছু অনিষ্ট ঘটতে দেখা যায়নি। হয়তো কেউ সাবধান ক'রে দিলে তামাকের ব্যবহার কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তখনও ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। আগে অনেক তামাক হজম ক'রেও যা হয়নি, এখন অল্প ব্যবহারেও তাই হচ্ছে, এ কথা কেউ বললেও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিকই তাই হয়, কারণ তামাক সহ্য করার শক্তি তখন একেবারেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, তখন সামান্য মাত্র ব্যবহারেও অপকার করতে থাকবে। কারো কারো এর দ্বারা মারাত্মক রকম রোগেরও সৃষ্টি হয়, হার্ট খারাপ হয়, ব্লাডপ্রেসার বাড়ে, এমন কি সায়াটিকা (sciatica) পর্য্যন্ত হ'তে দেখা যায়। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তামাক একেবারে ছেড়ে দিলে তখন এগুলি ধীরে ধীরে আরোগ্য হ'য়ে যায়।

তামাক অধিক পরিমাণে অভ্যাস করা উচিত নয়। নিয়মিত ও পরিমিত ব্যবহারে এতে অনেক তৃপ্তি পাওয়া যায় আর বিনা বাধায় বহুকাল পর্য্যন্ত উপভোগ করতেও পারা যায়।

শিল্পীর চোখে

বিশ্বপতি চৌধুরী

শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে যে শব্দটির সঙ্গে আমাদের হামেসাই দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে থাকে, সেটি হচ্ছে 'সৌন্দর্য্য'। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও উক্ত শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিতান্ত কম ঘনিষ্ঠ নয়।

তথাপি সাধারণ লোকের সৌন্দর্য্যবোধ আর শিল্পীর সৌন্দর্য্য-বোধের মধ্যে যে অনেকখানি তফাৎ রয়ে গেছে, সে কথা কে অস্বীকার করবে? এই যে তফাৎ, এটা যদি শুধু পরিমাণগত হোতো, তাহলে ও নিয়ে আমাদের বিশেষ মাথা ঘামাতে হোতো না। আমরা এই বলে মনকে মোটামুটি বোঝাতে পারতাম যে, আমাদের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যবোধ অল্প পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে, শিল্পীর মনে সেই একই সৌন্দর্য্যবোধ রয়েছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা নয়, এবং সেই কারণেই এর মধ্যে অনেক কিছু জটিলতা এসে দেখা দিচ্ছে।

আমরা গৌরবর্ণ সুঠাম দেহযুক্ত যুবক বা যুবতীকে বলি সুন্দর, ময়ূরকে বলি সুন্দর, রাজহংসকে বলি সুন্দর, বক্রগ্রীব বলবান শ্বেত অশ্বটিকে বলি সুন্দর; কিন্তু অস্থিচর্ম্মসার জরাজীর্ণ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে সুন্দর বলি না; বেয়াড়া গড়নের শকুনিটাকে সুন্দর বলি না; কাদামাখা নোংরা, ছুঁচোমুখো শূকরটাকে সুন্দর বলি না।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এদের সুন্দর লাগছে না কেন?—তখুনি উত্তর আসবে,—এরা যে আমাদের চোখকে আনন্দ দিতে পাচ্ছে না, কাজেই আমাদের চোখে ওরা অসুন্দর ত ঠেকবেই।

কথাটা খুবই সত্য। যা চোখকে আনন্দ দিতে পারে না, চোখ দু'টো তাকে সুন্দর বলে গ্রহণ করতে যাবে কিসের দায়ে?

শিল্পীকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসবে—আমাদের চোখে ত সবই সুন্দর। ময়ূরও সুন্দর, শকুনিও সুন্দর, তেজী ঘোড়াটাও সুন্দর, আবার কাদামাখা ঐ নোংরা ছুঁচোমুখো শূকরটাও সুন্দর।

এমন যদি হোতো যে, ময়ূর আমাদের চোখে যতটা সুন্দর লাগে, শিল্পীর চোখে তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হয়ে দেখা দেয়; অপর পক্ষে শকুনি আমাদের চোখে যতটা কদাকার ঠেকে, শিল্পীর চোখে তার চেয়ে অনেক বেশি কদাকার হয়ে দেখা দেয়, তাহলে বুঝতুম, আমাদের সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণার সঙ্গে শিল্পীর সুন্দর-অসুন্দরের ধারণার কতকটা মিল আছে, এবং তফাৎ যা, তা প্রকৃতিতে নয়, পরিমাণে।

কিন্তু ব্যাপারটা ত তা নয়। আমরা যাদের অসুন্দর বলে নাসিকা কুঞ্চিত করি, শিল্পীরা তাদের মধ্যেই পাচ্ছেন আনন্দ, পাচ্ছেন সৌন্দর্য্য।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, শকুনি বা শূকরের বেলায় না হয় শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের গরমিল হচ্ছে, কিন্তু ময়ূর বা তেজী ঘোড়াটার বেলায় ত শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ দিব্যি মিলে যাচ্ছে।

আমরা কিন্তু বলব, না ওখানেও মিলছে না। কারণ, শিল্পীরা শূকরকে বা শকুনিকে সুন্দর দেখছেন যে চোখ দিয়ে, ঠিক সেই চোখ দিয়েই তাঁরা সুন্দর দেখছেন ময়ূরকে বা তেজী ঘোড়াটাকে। সুতরাং আমাদের চোখ এবং শিল্পীর চোখ যদি ঐ ময়ূর বা তেজী ঘোড়াটার বেলায় মিলে গিয়ে থাকে, তাহলে শূকর আর শকুনির বেলায়ও তা না মিলে কিছুতেই পারতো না। একই ধরণের দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, অথচ গোটাকতক জিনিষের বেলায় দৃষ্টিফল এক হচ্ছে, আর গোটাকতক জিনিষের বেলায় হচ্ছে না, এ কেমন করে হতে পারে? কাজেই বলতে হবে, শিল্পীদের দেখা আর আমাদের দেখা এক ধরণের নয়; অর্থাৎ শিল্পীদের চোখ আর আমাদের চোখ দুনিয়াটাকে এক ভাবে দেখছে না, দেখছে বিভিন্ন ভাবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, শিল্পীদের চোখে ময়ূরও সুন্দর আবার শকুনিও সুন্দর। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি সুন্দর তাও সুন্দর, আবার আমরা যাদের বলি অসুন্দর বা কুৎসিত, তাও সুন্দর।

এখন কথা উঠতে পারে, শিল্পীদের চোখে কি তবে অসুন্দর বলে কিছুই নেই?

আছে বৈ কি! শিল্পীদের চোখে সবই যেমন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, তেমনি সবই আবার অসুন্দর বা কুৎসিত হয়েও উঠতে পারে। ময়ূর তাঁদের চোখে সুন্দরও লাগতে পারে আবার অসুন্দরও লাগতে পারে। শকুনি অসুন্দরও লাগতে পারে, আবার সুন্দরও লাগতে পারে। এই যে সুন্দর বা অসুন্দর লাগা, এটা ময়ূরের উপরও নির্ভর করছে না, শকুনির উপরও নির্ভর করছে না,—নির্ভর করছে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৃষ্টিক্ষেত্রের উপর। এইখানেই আমাদের দেখা এবং শিল্পীর দেখার আসল তফাৎ।

আমরা সুন্দরকে দেখি, শিল্পী সুন্দরকে করেন আবিষ্কার। আমরা বলি, দুনিয়ায় দুই শ্রেণীর বস্তু আছে,—সুন্দর আর অসুন্দর। কেননা

স্বভাবতঃই সুন্দর, সেগুলো আপনা হতেই আমাদের চোখে সুন্দর ঠেকবে, এবং যেগুলো স্বভাবতঃই অসুন্দর, সেগুলো অসুন্দর বলেই আমাদের চোখকে পীড়িত করে তুলবে। অর্থাৎ আমাদের চোখ এখানে passive বা পরাধীন,—সে কেবল গ্রহণ করার একটা প্রাণহীন passive যন্ত্র মাত্র।

শিল্পীরা কিন্তু বলেন, দুনিয়ায় সুন্দরও নেই, অসুন্দরও নেই, আছে কেবল অসংখ্য শ্রেণীর বস্তু ও প্রাণী, তাদের অসংখ্য ধরণের রূপ ও রেখার বিশেষত্ব নিয়ে। তাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যও নেই, কদর্য্যতাও নেই, তাদের মধ্যে আছে কেবল সুন্দরকে গড়ে তোলবার উপযুক্ত উপাদান বা মালমশলা। শিল্পীর চোখ এদের স্বতন্ত্র করে দেখে না, দেখে সম্মিলিত ভাবে। কোন্ জিনিষটার সঙ্গে কোন্ জিনিষটা একত্র করে মিলিয়ে দেখলে সুন্দরকে পাওয়া যায়, শিল্পীর চোখ কেবল তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। আসল কথা, শিল্পীর চোখ সুন্দরকে দেখে না, সে সুন্দরকে করে আবিষ্কার। সে সুন্দরকে পায় না, সে সুন্দরকে করে সৃষ্টি, এবং তার আনন্দও পাওয়ার আনন্দ নয়, তার আনন্দ হচ্ছে সৃষ্টি করার আনন্দ।

শিল্পীর কাছে সৌন্দর্য্য একটা যৌগিক এবং মিশ্র পদার্থ। সৌন্দর্য্য বা কদর্য্যতা কোন বিশেষ প্রাণী বা বিশেষ বস্তুর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, ওটা হচ্ছে প্রাণীর সঙ্গে বস্তুর, বস্তুর সঙ্গে প্রাণীর বর্ণ ও রেখাগত সুসমঞ্জস সংমিশ্রণের একটা বিশিষ্ট যৌগিক ফল। সুতরাং শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে রয়েছে একটা সক্রিয় (active) ব্যক্তিগত (personal) মানসিক প্রক্রিয়া, যা আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে নেই। আমাদের মন সৌন্দর্য্য গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় ভাবে অর্থাৎ passive-ভাবে। সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাব কাজ করছে না, কাজ করছে আমাদের জাতিগত বা শ্রেণীগত সংস্কার অর্থাৎ সেখানে আমরা ব্যক্তি নই, আমরা class বা শ্রেণী।

গোলাপ ফুল, ময়ূর বা ঐ তেজী ঘোড়াটা যেখানে আমার চোখে সুন্দর লাগছে, সেখানে মনুষ্যজাতি বা মনুষ্যশ্রেণীর সাধারণ চোখ দিয়ে আমি তাদের দেখছি। সেখানে আমার সঙ্গে এক জন অশিক্ষিত, এমন কি নিতান্ত অসভ্য বুনো মানুষটারও কোনো তফাৎ নেই। সেখানে অবোধ শিশুর চোখে আর আমার চোখে বিশেষ পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে আমি শ্রেণীভুক্ত সাধারণ মানুষ, ব্যক্তি-বিশেষ নই। সেখানে আমি মনুষ্যজাতির সাধারণ প্রাথমিক দৃষ্টি সংস্কার অজানিত ভাবে মেনে চলেছি নিতান্ত নিষ্ক্রিয় ভাবে।

আসল কথা, শিল্পীর মধ্যে আছে ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যচেতনা, আর সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে জাতিগত বা শ্রেণীগত সৌন্দর্য্য-সংস্কার।

চেতনা আর সংস্কার, এ দুটো সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। একটা হচ্ছে সক্রিয় বা active, আর একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় বা passive, একটা হচ্ছে মানসিক বা subjective, আর একটা হচ্ছে জৈব বা organic ; একটা হচ্ছে প্রকৃতিনিষ্ঠ, আর একটা হচ্ছে বিচারনিষ্ঠ, একটার মধ্যে কাজ করছে instinct বা জৈবসংস্কার, আর একটার মধ্যে কাজ করছে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও নির্বাচনরুচি।

সাধারণ জৈবসংস্কার যেখানে কাজ করছে, সেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই বললেই চলে, এমন কি, মানুষে এবং পশুতেও সেখানে তফাৎ খুব বেশি নয়।

মানুষ যে ইতরপ্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব, অর্থাৎ মানুষ যে বিবর্ত্তনের পথে পশুপক্ষীর চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে চলেছে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, মানুষ তার প্রকৃতিগত প্রাথমিক instinct বা জৈবসংস্কারগুলোকে ঠিক অন্ধভাবে মেনে চলছে না ; সে সেগুলোকে নিজের ব্যক্তিগত বাসনা, রুচি ও স্থানকালোচিত অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের অনেকটা রূপান্তরিত করে ফেলেছে। অসভ্য মানুষের সঙ্গে সভ্য মানুষের তফাৎও ঠিক এইখানে। এক্ষেত্রেও সেই বিবর্ত্তনের প্রশ্ন এসে পড়ে। আর বিবর্ত্তন বলতে শ্রেণীগত প্রাথমিক প্রকৃতিনিষ্ঠ জৈবসংস্কারের নিষ্ক্রিয় অন্ধ দাসত্ব থেকে রুচি ও বিচারনিষ্ঠ ব্যক্তিচেতনার স্বাধীনতার পথে জীবকোষের ক্রমাভিব্যক্তির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

শিক্ষিত সুসভ্য মানুষের সঙ্গে অসভ্য অশিক্ষিত মানুষের তফাৎ এই যে, এক জনের Primary instinct-গুলো তাদের আদিম স্বধর্ম্মকে যতটা ছাড়িয়ে এসেছে, আর এক জনের Primary instinct-গুলো ততটা ছাড়িয়ে আসতে পারেনি। আবার দেখা গেছে, এক বিষয়ে এক জন অত্যন্ত সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তির প্রাথমিক সংস্কারগুলো তাদের আদিমতম স্বভাব ও স্বধর্ম্মকে যতটা ছাড়িয়ে আসতে পেরেছে, আর এক বিষয়ে তার শতাংশের একাংশও পারেনি।

অনেক সময় দেখা গেছে, কোন কোন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের বর্ণ ও রেখার অনুভূতি তার আদিমতম প্রাথমিক সংস্কারের অর্থাৎ Primary instinct-এর স্থূলতম প্রভাবের হাত থেকে খুব বেশি মুক্তি পায়নি। সেখানে ঐ মনীষী ব্যক্তিটি হয়ত এখনও পড়ে রয়েছেন কোন্ আদিম বর্ব্বর যুগে। সেখানে এক জন তৃতীয় শ্রেণীর নগণ্য চিত্রশিল্পীও বিবর্ত্তনের পথে তাঁকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

সাধারণ মানুষের সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের তফাতটা অনেকটা যেন বিবর্ত্তনগত।

আসল কথা, বর্ণ ও রেখাগত সৌন্দর্য্যচেতনার দিক্ থেকে সাধারণ মানুষের রূপবাসনা এখন পর্য্যন্ত তার স্থূল প্রাথমিক জৈবসংস্কারকে ছাড়িয়ে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। অপর পক্ষে চিত্রশিল্পীর রূপবাসনা স্থূল প্রাথমিক প্রকৃতিনিষ্ঠ জৈবসংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে বিচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যবুদ্ধির ক্রমবিবর্ত্তনের পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে। অর্থাৎ বর্ণ ও রেখাগত চেতনার দিক্ থেকে শিল্পীদের মানসিক বিবর্ত্তনটা আমাদের চেয়ে অনেকখানি অগ্রগামী।

ডারউইন প্রভৃতি বিবর্ত্তনবাদী বৈজ্ঞানিকদের মতে আমাদের evolution homgenity থেকে heterogenityর দিকে। অর্থাৎ সমতা থেকে বৈচিত্র্যের দিকে, সরলতা থেকে জটিলতার দিকে। আমরা যতই সভ্য হয়ে উঠছি, ততই আমাদের জীবন জটিলতর হয়ে উঠছে। পশুর জীবনে আর মানুষের জীবনে তফাৎ এই যে, পশুর জীবন নিজেকে নিয়েই নিজে সম্পূর্ণ, আর মানুষের জীবন অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তবে সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। এদিক্ থেকে মানুষের জীবন পশুপক্ষীর জীবনের চেয়ে অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। মানুষ ত আর পশুর মত তার সহজাত জৈবসংস্কার বা জৈববৃত্তিগুলোর বাঁধা এবং সোজা পথ

ধরে চলছে না ;—সে বিবর্ত্তনের পথে চলতে চলতে নিত্য নূতন সংস্কার, নূতন প্রবৃত্তি, নূতন নূতন বাসনা-কামনা গড়ে তুলছে, এবং তাদের সঙ্গে আদিম জৈববৃত্তিগুলোর একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করে চলেছে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, সুসভ্য মানুষের বাসনা, কামনা, অনুভূতি প্রভৃতি সবই হচ্ছে কতকটা instinctive এবং অনেকটা intellectual ; আর পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর বাসনা, কামনা, অনুভূতি প্রভৃতি সবই হচ্ছে পুরোপুরি instinctive ঃ অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে চলতে পারা যায়, পশুপক্ষীর জীবন হচ্ছে passive আর মানুষের জীবন হচ্ছে active বা creative।

মনুষ্যজীবন তথা মানবচরিত্রের এই creative দিক্‌টা মানুষকে দিয়ে গড়িয়েছে তার সমাজ, তার ধর্ম্ম, তার নৈতিক আদর্শ, তার অনেক কিছু, এবং এই সবের সঙ্গে তার জৈববৃত্তিগুলোর একটা না একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থাও করেছে। এই যে বোঝাপড়া, এরই অপর নাম হচ্ছে culture, civilisation, কৃষ্টি, সভ্যতা ইত্যাদি।

আর্টের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা যেতে পারে। সাধারণ মানুষের চেয়ে শিল্পীর রেখা ও বর্ণঘটিত সৌন্দর্য্যবোধের বিবর্ত্তনটা অনেক বেশি হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শিল্পী সভ্যতা এবং কৃষ্টির দিক্ থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তার সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে এসে পড়েছে অনেকখানি জটিলতা, অনেকখানি complexity ; আর সাধারণ মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ তার প্রাথমিক ও সাধারণ প্রকৃতিদত্ত জৈবধর্ম্মের চিরপরিচিত সহজ সরল পথে আজও চোখ-কান বুজে বিচরণ করছে।

মানুষ যতই সভ্য হয়ে উঠছে, ততই তার সাধারণ জৈবসংস্কারগুলো মানুষেরই গড়া নূতন নূতন বিচিত্র বাসনা, কামনা ও নূতন নূতন সংস্কারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নানা ভাবে বিচিত্র উপায়ে নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করছে। এমনি করেই কাম থেকে এসেছে প্রেম, স্বার্থবুদ্ধি থেকে এসেছে সমাজ-চেতনা, এবং আরো অনেক কিছু থেকে অনেক কিছু।

কামপ্রবৃত্তি এবং প্রেমানুভূতির মধ্যে যে তফাৎ, সাধারণ মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ এবং শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের মাঝখানে অনেকটা সেই তফাৎই বিদ্যমান। কাম জিনিষটা অত্যন্ত সহজ, সরল, স্পষ্ট। তার মধ্যে জটিলতা নেই, সূক্ষ্মতা নেই। প্রেম কিন্তু অত্যন্ত জটিল, সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট। মানব-সভ্যতা তার বিবর্ত্তনের পথে এগুতে এগুতে এই জটিলতার সন্ধান পেয়েছে।

সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ কথাই বলা যায়। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধের যত বেশি বিবর্ত্তন হচ্ছে ; ততই তা জটিলতর এবং সূক্ষ্মতর হয়ে উঠছে। আর্টের ক্ষেত্রে এই complexity বা জটিলতা বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি, তাই এখন দেখতে হবে।

জটিলতা মানে যদি এই হয় যে, অনেকগুলো জিনিষ জট পাকিয়ে একটা বেখাপ্পা কাণ্ড করে বসেছে, তাহলে তা কোন দিন মানুষকে আনন্দ দিতে পারতো না। যার মধ্যে কোন ঐক্য নেই, ছন্দ নেই, সামঞ্জস্য নেই ; এক কথায় যার মধ্যে কোন উদ্দেশ্যসূত্র নেই, তা আমাদের চিত্তকে কোন দিনই প্রসন্ন করে তুলতে পারে না। বিশেষ করে সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে বেখাপ্পা, বেসুরা, ছন্দহীন, অসমঞ্জস কোন জিনিষের স্থান হতে পারে না। সৌন্দর্য্য মানেই সামঞ্জস্য, ছন্দ।

আর্টের ক্ষেত্রে জটিলতা নামক শব্দটি দুটো জিনিষকে একই সঙ্গে বোঝায়—বৈচিত্র্য ও সমগ্রতা বা অখণ্ডতা।

সভ্য মানুষের গড়া সমাজের দিকে তাকালেই জিনিষটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। পশুপক্ষীর আত্মসর্ব্বস্ব জীবনযাত্রার চেয়ে সমাজনিষ্ঠ সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা যে অনেক জটিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সমাজ-জীবনের মধ্যে এই জটিলতাই কি কেবল সত্য হয়ে উঠেছে ? তার ভিতর থেকে কি কোনো ঐক্য, কোনো ছন্দ, কোনো অখণ্ডতা, কোনো সমগ্রতা, কোনো উদ্দেশ্য-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না ?—নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। এই যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সূত্র, এই জিনিষটিই সামাজিক জীবনের সমস্ত জটিলতার মধ্যে এনে দিয়েছে একটা সমগ্রতা, একটা অখণ্ডতা। সামাজিক জীবনের সমস্ত জটিলতা সরল হয়ে উঠেছে এইখানে, মুক্তি পাচ্ছে এইখানে।

আর্টের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে যে সব জটিলতা রয়েছে, সেগুলো শেষ পর্য্যন্ত জটিল থেকে যাচ্ছে না ;—তারা একত্র হয়ে, সম্মিলিত হয়ে, পরস্পরের সঙ্গে একটি অখণ্ড উদ্দেশ্যসূত্রে সমন্বিত হয়ে একটা অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতার সৃষ্টি করছে। এই সমগ্রতার মধ্যে আর জটিলতা নেই। সমস্ত জটিলতা এই সমগ্রতার মধ্যে এসে একটি অখণ্ডতার সারল্য লাভ করছে।

তাহলেই দাঁড়াচ্ছে, শিল্পী সরল সৌন্দর্য্যকে জটিল করে তুলছেন, জটিলতা সৃষ্টি করবার জন্যে নয়, সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতর, গভীরতর সারল্যে পৌঁছবার জন্যে।

এই দেখুন না কেন, অবোধ শিশুর কাণকে পরিতৃপ্ত করতে হলে একেবারে সমধর্ম্মী, অর্থাৎ সমান ওজনের বা সমান মাত্রাবিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ পর পর আওড়ে যেতে হয়। শব্দের সঙ্গে শব্দের ধ্বনিগত মিল বা ঐক্য যত সরল এবং স্পষ্ট হয়, শিশুর কাণ ততই তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। আমাদের কাছে কিন্তু ঐ শ্রেণীর ছন্দ নিতান্তই হাল্কা ঠেকে। ওখানে আমাদের কাণ শিশুর কাণের চেয়ে অনেকখানি তৈরী যে। অর্থাৎ ওখানে আমাদের কাণ তার প্রাথমিক জৈবধর্ম্মের সহজ, সরল, নিষ্ক্রিয়, passive স্বভাব ছেড়ে সক্রিয় হয়েছে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

রং ও রেখার বেলায়ও ঠিক ঐ কথাই বলা যায়। সাধারণে রং ও রেখাঘটিত সৌন্দর্য্যোপভোগ অবোধ শিশুর শব্দসম্ভোগের মতই হাল্কা, সহজ, সরল, অগভীর। শিশুর কাণের মতই সাধারণের চোখ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার আনন্দ হাতে হাতে চুকিয়ে নিতে চায়।

শিল্পীর চোখ কিন্তু তা চায় না। সে চোখ অত সহজে তুষ্ট হবার নয়। শিল্পী সারল্যকেই চায়, সমতাকেই চায়, কিন্তু সে সারল্য বা সমতা নানা জটিলতার ভিতর দিয়ে, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে উদ্ভূত হচ্ছে। তাকে নিছক জৈবসংস্কারের বাঁধা পথে আপনা হতে চোখ-কাণ বুজে পাওয়া যায় না, তাকে পাওয়া যায় সজাগ ও সক্রিয় বিচারনিষ্ঠ সৃষ্টিচেতনায় অভিনব ক্ষেত্রে।

[ক্রমশঃ।

ডাঃ সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম্পত্য-জীবনের সমস্যা নিয়ে বর্ত্তমান যুগে প্রতি সমাজে বহু প্রশ্ন ও বাদানুবাদ শোনা যায়—আইন-কানুনও রচনা করা হয়েছে—নিত্য-নূতন চিন্তায় চেষ্টার ক্রটি নেই।

দাম্পত্য-জীবনে প্রেমের বন্ধন নিবিড় করে রক্ষা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু তাঁদের সমস্যার চাইতেও বৃহৎ সমস্যা যেখানে বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়—একে অপরের কাছে অর্থের দাবী উপস্থিত করেন—সে এক ক্লেশকর সমস্যা। যেখানে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না—দুর্ব্বহ জীবন ধীর পদক্ষেপে নীরবে মৃত্যুকে বরণ করে অথবা আত্মহত্যা ক'রে জীবনের অবসান এনে ফেলে—সেখানে সমাজের কাছে দাম্পত্য-জীবনের চরম প্রশ্ন—মীমাংসা কোথায়?

সমাজের সহস্র নিয়ম বন্ধনে এ সমস্যার মীমাংসা হয় নাই—আইনের কঠোর ব্যবস্থায় পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করা হয়েছে—একান্ত অবাঞ্ছনীয় হলেই যেখানে সম্ভব ছিন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে। নিয়ম ও আইনের বেড়াজালে প্রেমের বন্ধন কি রক্ষা করা যায়? যেখানে অন্তর্নিহিত শিথিলতা, সেখানে এ বেড়াজালের অর্থ কি? প্রেম যেখানে অন্তর্হিত হয়েছে অথবা প্রেম যেখানে স্থাপিত হয় নি, সেখানে আইন ও নিয়মের শৃংখলে মানুষের কতটুকু সাহায্য হ'তে পারে?

নিয়মের শৃংখল ও আইনের কঠোরতা অতিক্রম করেও মানুষ স্বেচ্ছায় নূতন নূতন মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা সমাজের বন্ধন ছিন্ন করে নূতন সমাজের আইনের সাহায্যে কঠোর ব্যবস্থা শিথিল করে নিয়েছে। ব্যক্তিগত মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে বিবাহ-বন্ধন সম্ভব করে তুলেছে। সুখের সন্ধানে মানুষের চেষ্টার ক্রটি নেই। তথাপি সমস্যার মীমাংসা হয় নি।

প্রেমই যেখানে একমাত্র বন্ধন, সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে প্রেমের অর্থ কি? প্রেম কি অজানার অপরূপ-অবগুণ্ঠনের বৈচিত্র্যে অথবা ভোগের তাৎপর্য্যে, বিলাসিতায় কি কঠোর দায়িত্বে ত্যাগের মন্ত্রে, সংযমের কঠোরতায় ও ব্রহ্মচর্য্যে—কি ভাবে প্রেম লাভ করা যায়? সম্ভোগে যেখানে মানুষের ব্যর্থতারই অনুভূতি হ'য়েছে, অভিজ্ঞতায় মানুষ যেখানে অপূর্ণতায় ক্ষুণ্ণ বোধ করেছে, সেখানে বৈরাগ্য অবলম্বন করতেই মন অগ্রসর হয়ে যায়। প্রেমের সার্থকতা কোথায়? কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না, সুস্থ পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ নাই। এই আকর্ষণকেই প্রেম বলা যায়। মানুষ যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করে তারই বিপরীত দিকে চালিত হয়ে যায়। প্রেম প্রকাশ হওয়া এবং প্রেমের অনুভূতি হওয়া অতিশয় কঠিন কাজ।

স্বামী প্রেমিক হলেই স্ত্রী তাঁর স্বামীর প্রেম অনুভব করতে পারবেন, এমন না-ও হতে পারে। অনুরূপ ভাবে স্ত্রীর প্রেম স্বামী না বুঝতে পারেন। অনুভব করার শক্তির বৈশিষ্ট্যের উপরে দাম্পত্য-জীবনের সফলতা নির্ভর করে।

মানুষ প্রেম লাভ করার জন্যই উদ্‌গ্রীব—মানুষের মনে ত প্রেম আছেই, প্রকাশ করতে ও অনুভব করতে বাধা কোথায়? এই প্রশ্ন। মানুষ প্রকাশ করতেও অক্ষম, অনুভব করতেও অক্ষম। মানুষ তার দুর্ব্বলতা অন্তরে অনুভব করে, জানে সে অক্ষম, কিন্তু নিজের কাছে সংজ্ঞান মনে (In conscious mind) এ কথা জানা থাকলেও সংগ্রামরত বাহ্য জগতে তার এই অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা সে কখনও প্রকাশ করতে পারে না। আমাদের কাজে, কথায়, ব্যবহারে, চিন্তায়, এমন কি স্বপ্নেও, আমরা আমাদের গোপন কথা সহজে প্রকাশ করতে পারি না। প্রত্যেক বিষয়ে রং ঢেলে রঙীন করেই প্রকাশ করি—স্বরূপ প্রকাশ করতে আমাদের এতোই দ্বিধা-সঙ্কোচ। প্রতি মুহূর্ত্তে ভয়-সঙ্কুচিত মনে রং ঢালাঢালির কাজ চলেছে—কোন কথাটা আমরা সহজ ভাবে বলতে পারি। ক্রোধে, অপমানে, দুঃখে, শোকে, আনন্দে, মনের অবগুণ্ঠন আমরা উন্মোচন করতে পারি না। নানা রঙ্গে রঙীন করা, সাজান গোজান, পোষাক পরান সব কথা ও ভাবসমষ্টিগুলির সঙ্গে আরো কত কথা চাপা পড়ে থাকে, সে সব কথা প্রকাশ করা অক্ষম সংজ্ঞান মনের কাজ নয়। আমরা সাবধানে চলি, চাপা পড়া কথা প্রকাশ হলে প্রেমের বন্ধন শিথিল হবে কি একেবারে মুছে যাবে, এ আলোচনা করতেও আমাদের মন ভরসা পায় না।

কিন্তু জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতায় প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ পায়। স্বামী ও স্ত্রী যখন দুঃখের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে বাধ্যতা অনুভব করেন, তখন দুঃখ দিয়ে প্রেম ক্রয় করতে হয়। প্রেমের উদ্দেশ্য স্বানন্দ দান করা। যেখানে প্রেম দুঃখকে অতিক্রম করতে পারে না, সেখানে এ প্রেম হিংসার স্বরূপ মাত্র—গ্লানি-বিশেষ। দাম্পত্য-জীবনে হিংসা অনুভব করার সম্ভাবনা যখন ক্রমে বৃদ্ধি পায়, তখন জীবনের ব্যর্থতা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। স্বামী বা স্ত্রী সম্ভোগের জন্য—সামান্য মতবাদের জন্যও পরস্পরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্য আছে, অপেক্ষা করারও আবশ্যক আছে—একান্ত অহিংস মনোভাবের প্রয়োজন। প্রেম লাভ করার জন্য গহনা, শাড়ী প্রভৃতি বাহ্যিক যত কিছু আয়োজন ব্যর্থ হয়—স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য বাহ্যিক সমস্ত আয়োজনই অর্থহীন হয়ে পড়ে। উৎকোচ দিয়ে প্রেম লাভ করা যায় না।

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ব্বে নির্ব্বাচন-সমস্যায় মনের বিশেষ

প্রভাব লক্ষ্য করা প্রয়োজন। নির্ব্বাচনে অনেক অস্বাভাবিক কামনার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের মনে নারীসুলভ ও পুরুষ-সুলভ দুই রকম—শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। নারী যেখানে পুরুষের মধ্যে নারীসুলভ কমনীয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা (passivity) লক্ষ্য করে স্বামী নির্ব্বাচন করেন, সেখানে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপর দিকে যুবক যেখানে নারীর মধ্যে পুরুষ-সুলভ মূর্ত্তি লক্ষ্য করে সুখী হন—সমস্যার সূচনা হয়। নারী যেখানে নারীসুলভ ভাব লক্ষ্য করেন, সেখানে স্বামীর মধ্যে তাঁর মাতাকেই সন্ধান করেন। কিন্তু স্বামীর কাছে মাতার ব্যবহার আশা করে অবশ্যই নিরাশ হতে হয়। স্বামীও তাঁর স্ত্রীর কাছে পিতার ব্যবহার আশা করতে পারেন না। যদি উভয়ের মধ্যে এক জন অপরের দুর্ব্বলতার কারণ বুঝতে পারেন, তাহলে জীবন-যাত্রা অনেকটা সুখকর করতে পারেন। কিন্তু যেখানে উভয়েই একইরূপ অস্বাভাবিক হন সেখানে কোনরূপ মিলনই সম্ভব হতে পারে না। এখানে ইতরকামী (Hetero-sexual) হওয়াই উদ্দেশ্য কিন্তু পরস্পর এখানে সমকামী (Homo-sexual).

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তাঁরা ইতরকামী না হয়ে সমকামী হলেন ? ইতরকামী হতে তাঁদের বাধা আছে। অনুসন্ধান করলে কোন বংশগত প্রভাব অথবা শৈশবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব হয়ত দেখা যাবে। অতীত জীবনে ভয়, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি কোন না কোন হেতু এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, ইতরকামী হতে বাধা আছে। ইতরকামী হতে আনন্দ লাভ না হয়ে দুঃখের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। সুতরাং ইতরকামী হতে আকাঙ্ক্ষা থাকলেও মনোভাবের সঙ্গে দুঃখময় অভিজ্ঞতা জড়িত থাকার ফলে ইতরকামী হতে অত্যন্ত সাহসী হতে হয়। অজানা রাজ্যে সহায়-সম্বলহীন হয়ে যেমন প্রবেশ করতে সাহসের প্রয়োজন হয়, এ ক্ষেত্রেও সেই রকম সাহস না থাকলে ইতরকামী রাজ্যে প্রবেশ করাও সহজ নয়। কল্পনায় কিন্তু ইতরকামী রাজ্য রোমাঞ্চকর—অতি রহস্যময়—অজানা সুন্দর মনকে চঞ্চল করে রঙ্গীন করে তোলে। এই জন্যই সমকামীরা মরিয়া হয়ে অতি সাহসী হয়ে অতিরিক্ত ইতরকামিতার কার্য্য করে বসতে পারেন ; অথবা ঘৃণা, ত্যাগ প্রভৃতি মনোভাব অবলম্বন করে অবিবাহিত ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করেন। এই চিন্তার সঙ্গেই যৌন ক্ষমতার অভাব (sexual impotency) বোধ জড়িত হয়ে থাকে দেখা যায়। তাঁরা বিবাহিত হলেও সুখী হন না। অনেক সময় দেখা যায়, কুমারী নারী অত্যন্ত পিতৃভক্ত এবং সর্ব্বদাই পিতার গুণগানে মুগ্ধ। বিবাহিত জীবনে স্বামীর মধ্যেও পিতার সন্ধান করেন। অনুরূপ ভাবে স্বামী অনেক সময় স্ত্রীর মধ্যে মায়ের মূর্ত্তির অনুসন্ধান করেন—মায়ের যত্ন, ব্যবহার প্রভৃতি স্ত্রীর কাছে আশা করেন—শৈশবে যেমন আশা করতেন তেমনই আশা করেন—শিশুর মতই তাঁদের ব্যবহার—তখনও মায়ের অঞ্চলে মন বাঁধা থাকে—এ যেন বয়স্ক বালক। এই ধরণের স্বামি-স্ত্রী কখনই সুখী হতে আশা করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে। বাধ্য হয়েই তাঁরা অতিরিক্ত ইতরকামী হয়ে পড়েন।

দাম্পত্য-জীবনে অসুখী হয়ে পড়েন—এমন লোকের অভাব নাই। অনেকে মানসিক রোগেও আক্রান্ত হন। অতি সামান্য বিষয় উপলক্ষ্য করেই রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। নারী ও পুরুষ যিনি যে কারণেই অপরকে ত্যাগ করেন বা ঘৃণা করেন, অথবা অতিরিক্ত আসক্তি দেখান, তাঁরা কেহই সুস্থ নন। মানসিক অসুস্থতার জন্যই তাঁদের ব্যবহারও বিকৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণ লোক, সুস্থ লোকের ব্যবহারের সঙ্গে বিকৃত লোকের ব্যবহারের পার্থক্য সহজে বুঝে উঠতে পারে না। শারীরিক রোগে শরীরের অসুস্থতার লক্ষণ সম্বন্ধে মানুষ অনেকটা পরিচিত কিন্তু মনের অসুস্থতার লক্ষণ সম্বন্ধে ততটা পরিচিত নয়। এই জন্যই কলেরার রোগী ঘর বিছানা অপরিষ্কার করলে তার চিকিৎসা হয়—দোষী সাব্যস্ত করে তার বিচার হয় না। কিন্তু মানসিক রোগীর বিকৃত কথা শুনেও অনেক সময়েই তার শাস্তির ব্যবস্থা হয়—চিকিৎসা হয় না।

অনেকে মনে করেন, মনের তেজ থাকলে সবই জয় করা যায়—অভ্যাসের দ্বারা মনের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু সংজ্ঞান মনের প্রয়াসের কোনই অর্থ হয় না—নিজ্ঞান মনের উপরে তার কোনই প্রভাব নাই। শরীরের পেশী যেমন। ইচ্ছা করলে হাত-পা আমরা চালনা করতে পারি—এ সব যায়গার পেশীগুলোকে voluntary muscles বলা হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অথবা পরিপাক-যন্ত্রের পেশীগুলোর উপরে আমাদের ইচ্ছার প্রভাব নাই—ইচ্ছানুযায়ী হৃৎপিণ্ডের পেশীর ক্রিয়া আমরা বন্ধ করতে পারি না—চালনা করতেও পারি না। এই জন্যই এগুলোকে involuntary muscles বলা হয়। আমাদের মনের জ্ঞান (conscious) অংশের উপরে আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ পায় কিন্তু অপর এক অংশ, যাকে আমরা নিজ্ঞান মন (unconscious mind) বলি—তার উপরে আমাদের হাত নাই ; সুতরাং মনের এক অংশ voluntary ও অপর অংশ involuntary বলা যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, কি ভাবে দাম্পত্য-জীবনের সমস্যা মীমাংসা হতে পারে। নিজ্ঞান মনের যত কিছু অস্বাভাবিক কল্পনা—সজ্ঞান মনে নিয়ে আসতে পারলে মানুষ অনেকটা স্বাভাবিক হতে পারে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে কর্ম্মের নির্ব্বাচনে মনের উন্নতি হতে দেখা যায়। কর্ম্মের প্রভাব মানুষের জীবনে যে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, এই চিকিৎসায় জানা যায়। মনোবিজ্ঞানে বৃত্তীয় চিকিৎসা (Occupational Therapy) মন বিশ্লেষণের (Psycho-analysis) সাহায্যে হওয়া প্রয়োজন।

যৌন-জীবনের স্তরগুলি অতিক্রম করে মানুষ যখন সহানুভূতি, দৃঢ়তা ও ইতরকামের (Hetero-sexuality) পরিপূর্ণতা নিয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে, দাম্পত্য-জীবন অর্থহীন বন্ধন মাত্র নয়—সুস্থ মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—আনন্দপূর্ণ প্রেমের অনুভূতি—দাম্পত্য জীবনের দান।

টাকার মূল্য ও বিনিময়-হার

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

আশাবাদী মানুষ—বার বার বিফল-মনোরথ হইয়াও চেষ্টার ক্রটি করে না, নৈতিক দিক্ দিয়া এ কথা যতটা সত্য—অর্থনৈতিক ব্যাপারেও ইহা সমপ্রযোজ্য। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হারসেল কমিটী নিযুক্ত হয়, অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার সহিত ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য। তার পর ফাউলার, চেম্বারলেন, ব্যারিংটন, স্মিথ প্রভৃতি কত কমিটী না বসিল, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। ভারতীয় জনমতের অনুমোদিত মুদ্রার বিনিময়হার আজও নির্দ্ধারিত হইল না।

যুদ্ধের ফলে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটে অভাবনীয় ভাবে—সাথে সাথে আসে অর্থনৈতিক বিবর্ত্তন। এবারের যুদ্ধেও এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ রাজ্যকে একটা অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে কোন দেশই সক্ষম হয় নাই। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যুদ্ধ যত দিন চলিতে থাকিবে তত দিন সামরিক কার্য্যে লিপ্ত থাকার জন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই রণনীতি ভিন্ন অন্য দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার বিশেষ অবসর থাকিবে না। কিন্তু আজ যুদ্ধ-বিরতির ধ্বনি উঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে অর্থনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষে আমরাও কি আশা করিতে পারি না যে, আমাদের দেশের কুয়াসাচ্ছন্ন অর্থনৈতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে না হইলেও কতকাংশ পরিষ্কার হয়? ভারতীয় মুদ্রার প্রকৃত যাহা মূল্য তাহাই স্থিরীকৃত হউক।

মুদ্রা-বিনিময়-হার নির্দ্ধারণের আলোচনা বর্ত্তমানে কিয়ৎ পরিমাণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ভারতকে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডারে (International monetary fund) যোগ দিতে হইবে। এই ভাণ্ডারে যোগ দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশের মুদ্রা-বিনিময় হার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আর একবার উহা স্থিরীকৃত হইলে পুনরায় উহার পরিবর্ত্তন অর্থভাণ্ডারের অনুমতি-সাপেক্ষ। অন্যথায় ভাণ্ডার হইতে অবসর গ্রহণ। ভারতবর্ষের পক্ষে দুয়ের কোনটিই সম্ভবপর হওয়া কঠিন বা কষ্টসাধ্য। কাজেই বিনিময়-হার নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বেই বিষয়টি সম্যক্‌রূপে চিন্তা করা উচিত।

অর্থনীতি-বিশারদগণ টাকার মূল্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—এক অন্তর্দ্দেশীয় অর্থাৎ দেশের মধ্যে টাকার পণ্যদ্রব্য ক্রয়-ক্ষমতা; আর এক বহির্দ্দেশীয়—বিদেশীয় মুদ্রার তুলনায় বিদেশী পণ্যদ্রব্য ক্রয়-ক্ষমতা। যখন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য বিনা বাধায় চলিতে থাকে, তখন অন্তর্দ্দেশীয় ও বহির্দ্দেশীয় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সমতা অনেকাংশে লক্ষিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধের ফলে ভারতীয় মুদ্রার ভিতর ও বাহিরের মূল্য দুই বিপরীত ধারায় নির্ণীত হইতেছে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলে ভারতীয় মুদ্রার দর ষ্টার্লিং-এর সাথে ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। আজও পর্য্যন্ত বহির্বাণিজ্যের জগতে ভারতীয় মুদ্রার ঐ হারই বিদ্যমান আছে। ষ্টার্লিংএর উঠা-নাবার সাথে সাথে ভারতীয় মুদ্রার দর পুতুল-নাচের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহার নিজস্ব কোন গতি নাই।

শত্রু আক্রমণের ফলে আজ একাধিক দেশ ব্যবসায় বাণিজ্যে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও দুই একটি নিরপেক্ষ দেশের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে; যথা—সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, পর্টুগাল প্রভৃতি। বাস্তব ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই ব্যবসায়ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে ভারতের উল্লেখযোগ্য সহযোগী, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা, ডলারের মূল্য ও ষ্টার্লিংএর সঙ্গে বাঁধা থাকায় (১ ষ্টার্লিং প্রতি ৪·০২ ডলার) বহির্বাণিজ্যে ভারতের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য চলতি নোটের পরিমাণ সকল দেশেই অল্প-বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে দ্রব্যমূল্যের পরিমাণও হইয়াছে অনেক বেশী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায়। নিম্নে প্রদত্ত রেখাঙ্কন (Graph)
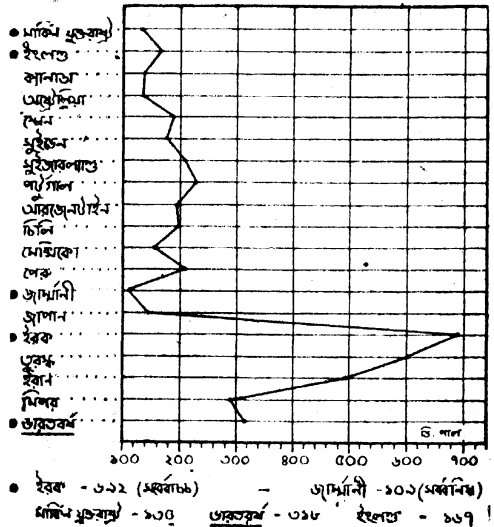
হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, স্বাধীন দেশগুলিতে অন্য দ্রব্যের মূল্য তেমন ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে পরাধীন ও অর্থনৈতিক দিকে অসংলগ্ন দেশগুলিতে। ভারতবর্ষও এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিহীন হইলে মুদ্রাস্ফীতির চাপে দেশের আর্থিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় চীন দেশকে। সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে চুংকিংএ জীবিকা নির্ব্বাহের খরচের মাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ৬০·৭৪ চাইনীজ ডলারে দাঁড়াইয়াছিল ভারতীয় মুদ্রামানের প্রায় ১৯৮৭ টাকা। হতাশার কথা এই যে, এই খরচ মিটাইবার জন্য সরকারের হাতে মুদ্রা যন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন পন্থাই উন্মুক্ত নাই।

যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক 'কনট্রোল' যখন তুলিয়া দেওয়া

হইবে, যখন সপ্ত ডিঙ্গা পাল তুলিয়া আবার সাগর পাড়ি দিতে থাকিবে, তখন মুদ্রা-বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত হইবে অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতার তারতম্যের উপর। উহা কি ভাবে এবং কি নিয়মে স্থিরীকৃত হইবে তাহা সঠিক ভাবে বলা যদিও আজ সম্ভব নয়, তবুও উহার আভাস কতকাংশে দেওয়া চলে।

রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নত দেশের প্রতীক ইংলণ্ড ও অবনত দেশের দৃষ্টান্তস্থল ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিলে দেখা যায়, ইংলণ্ডে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য মুদ্রাস্ফীতি হইলেও মানুষের সহজ জীবনযাত্রার পথে কোনরূপ বিরাট বাধার সৃষ্টি করা হয় নাই। নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রশংসনীয় নিয়োগ দ্বারা পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিম্ন স্তরে রাখা হইয়াছে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় ভিন্ন অনাবশ্যক খরচের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। ফলে ইংলণ্ডে জনসাধারণের জমার খাতের অঙ্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সরকার যদিও বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ত্রুটি করেন নাই, ফল লাভ কিন্তু তেমন আশানুরূপ হয় নাই। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে সরকারী সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, ডিফেন্স সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট প্রভৃতিতে মোট জমা ছিল ১৪১.৪৫ কোটি মুদ্রা—১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫৭.২৫ কোটি মুদ্রা। সুতরাং যুদ্ধের ৫।৬ বৎসরে জমার পরিমাণ হইয়াছে ১৫.৪০ কোটি মুদ্রা। ইহা হইতে যদি সুদ বাবদ ৭.৪০ কোটি মুদ্রা বাদ দেওয়া হয় তবে নিট্‌ জমার পরিমাণ ৮ কোটি টাকার বেশী হইবে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ডিফেন্স সেভিং ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অঙ্গ-বিশেষ। এই দুই খাতে জমার পরিমাণ আলাদা করিলে দেখা যায়, পোষ্ট অফিসে ক্যাশ সার্টিফিকেটের জমার পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ছিল ৫১.৫৭ কোটি মুদ্রা। ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৫.১৩ কোটি মুদ্রা। আর সেভিংস্ ব্যাঙ্কের জমা যাহা ছিল ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ৮১.৮৮ কোটি মুদ্রা তাহাই হইয়াছে ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে ৭১.৭৮ কোটি মুদ্রা। সঞ্চয়-বৃদ্ধি দূরে থাকুক, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির নিষ্পেষণে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের জন্য যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল তাহা নিঃশেষ করিয়াও তাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে না। অনটনে, অনাহারে বিনা চিকিৎসায় এই কয়েক বৎসরে কত প্রাণ যে মৃত্যু-যজ্ঞে আহুতি দিল তাহার শেষ কোথায়, কে বলিবে? অর্থসঞ্চয় কেহ কেহ যে না করিয়াছে তাহা নহে, যুদ্ধের দৌলতে আষাঢ়ের ব্যাঙাচির মত যে সব কণ্ট্রাক্টর "চোরাবাজারের ব্যবসায়ী" জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বিপুল অর্থ লুণ্ঠন করিতে সক্ষম হইয়াছে কিন্তু সে সঞ্চয়ের পরিমাণও ইংরেজ জনসাধারণের সঞ্চয়ের কাছে যৎসামান্য মাত্র। গত ১ই মার্চের হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষে ইম্পিরিয়ল ও সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট জমার পরিমাণ ছিল ১০৬০.২৬ কোটি মুদ্রা মাত্র—আর ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের হিসাব নিকাশে দেখা যায়, ঐ দিন ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক সমূহের আমানত টাকার পরিমাণ ছিল ৪৫৪৫,০০০,০০০ ষ্টার্লিং অর্থাৎ ৬০৬০ কোটি ভারতীয় মুদ্রা (১ শিঃ ৬ পেঃ হিসাবে)—ভারতের সঞ্চিত সমুদয় অর্থের ৫ ৫/৮ গুণ মুদ্রা।

যুদ্ধাবসানে বে-সামরিক জনগণের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমবৃদ্ধি পাইবে। সৈন্য বিভাগ হইতে ছাড়-পত্র লাভ করিবার পর প্রত্যেকেই একাধিক পরিধেয় চাহিবে। ফলে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দ্রব্যমূল্য কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভারতে বিপরীত পরিস্থিতি উদ্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। ভারতের বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির মূলে আছে মিত্রশক্তির যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যয়ের নিমিত্ত অর্থের বিপুল চাহিদা। গত দুই তিন বছরের বাৎসরিক এই ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ২৫০।৩৫০ কোটি মুদ্রা। যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া যাইবে এ, আর, পি, সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি অফিসে নিয়োগপত্রের পরিবর্ত্তে যখন বরখাস্তের পালা সুরু হইবে তখন আমাদের সমস্যা হইবে কি ভাবে পণ্যদ্রব্য মূল্যের হ্রাস রুদ্ধ করা যায়। বর্ত্তমানের গগন-চুম্বী দ্রব্যমূল্য কেহ না চাইলেও এটা ভাবা উচিত, হঠাৎ দ্রব্যমূল্য কমিয়া গেলে কৃষি, মজুর, ব্যবসায়ী প্রভৃতির দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। সৈন্য খাতে ২৫০।৩৫০ কোটি মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইয়া গেলে অর্থের বাজারে এক হাহাকার দেখা দিবে। ভরসার কথা, কেন্দ্রী প্রাদেশিক ও সামন্ত রাজ্যগুলি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কিছুটাও কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলে এই সমস্যার সমাধান হইবে। যেমন করিয়াই হিসাব করা যাউক না কেন, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেরূপ ছিল যুদ্ধান্তে উহার মান উহা হইতে উচ্চস্তরে রাখিতে হইবে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। পূর্ব্ব-বর্ণিত রেখাঙ্কন হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২১৮ ভাগ, আর ইংলণ্ডে হইয়াছে ৬৭ ভাগ। সেই হিসাবে টাকার মূল্য ১৮ পেনীর স্থলে ১২.৫ পেনী হওয়া দরকার। কার্য্যতঃ ইহাই সঠিক বিনিময়-হার হইবে কি না তাহা এত শীঘ্র বলা যায় না। ভারতে ও বিদেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য উঠা-নামা করিয়া কি স্তরে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যে বিনিময়-হার নির্দ্ধারণ করিলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বিদেশের বাজারে অক্ষুণ্ণ থাকে * তাহাই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। উপরোক্ত আলোচনা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতির উপর ছায়াপাত করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিনিময়-হার নির্দ্ধারণ কার্য্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। এই এপ্রিল মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বয়স দশ বৎসর হইতে চলিল। প্রথম চারি বৎসর ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যবসা-বাজারে মন্দা যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক সংগঠন কার্য্য হয়তো তেমন সন্তোষজনক করিতে পারে নাই। তার পর যুদ্ধকালীন ছয় বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডের ক্রীড়নক হিসাবে চলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার কার্য্য সমাধান করিতেছে না কি? কিন্তু ইহাই কি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যশ-মান বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট? ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা স্যার চিন্তামন ব্রিটনউড আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। আশা করি, কার্য্যকালে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সাধনে দেশবাসীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইবেন।

---

* অথচ আমাদের প্রয়োজনের জন্য বিদেশজাত কলকব্জা ক্রয় করিতে অযথা বেশী মূল্য না দিতে হয়।

হিটলার ও আমি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

বাড়িওয়ালা তিনকড়ি দত্ত জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন আদেশের অপেক্ষায়; এতক্ষণ তিনি স্বয়ং মিস্ত্রির সঙ্গে উপস্থিত থেকে আমার ঘরের প্রত্যেকটি ফাটল সিমেণ্ট করিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন, চুণকামটা কবে করিয়ে দিলে আপনার সুবিধে হবে, সার?

সত্যিই তিনকড়ি দত্তের মতো বাড়িওয়ালা সহজে দেখা যায় না। এ রকম বিনয় বৈষ্ণব পাড়াতেও দুর্লভ।

কিন্তু কেন?

এ কথার উত্তর দিতে হ'লে একটুখানি পটভূমিকা দরকার।

যখনকার কথা বলছি তখন আমার কলকাতা-বাস প্রায় দু'বছর পূর্ণ হয়েছে। যুদ্ধের সম্পর্কিত একটি চাকরি নিয়েই প্রথম কলকাতা এসেছি, কিন্তু তখন কে জানত যুদ্ধের ঢেউ কলকাতার গায়েও লাগবে? জাপানীরা বর্মায় পা দিতে না দিতে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল! কলকাতা শহরটি হয়ে পড়ল একটি প্রকাণ্ড কড়ার মতো। সে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। এত-বড় কড়াটা তরল পদার্থে কানায় কানায় পূর্ণ। এমনি অবস্থায় জাপানী বোমার ঝাপটা লাগল তার গায়ে। কড়াটা একবার পূবে, একবার পশ্চিমে হেলতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের তরল পদার্থ একবার শিয়ালদ, একবার হাওড়ায় ঢেলে পড়তে লাগল। এমনি ভাবে ১৯৪২এর শেষে দেখি, তলানী যেটুকু পড়ে আছে তারই মধ্যে পড়ে আছি আমি শ্রীজলধর গাঙ্গুলী, আমার পরিবার এবং আমাদের বাড়ির মালিক তিনকড়ি দত্ত। কিছু সান্ত্বনা পাওয়া গেল তাতেও।

আমার পালাবার উপায় ছিল না। পৃথিবীতে তখন দু'জন লোক জীবন-যুদ্ধে বিব্রত—হিটলার ও আমি। আমরা দু'জনেই জানতাম, যুদ্ধের শেষ মানে আমাদেরও শেষ। আমাদের দু'জনেরই লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ উপলক্ষে নিজেদের সুবিধে ক'রে নেওয়া।—কিন্তু সে কথা যাক্।

শূন্য শহরের দৃশ্য জীবনে ভুলব না। এত বড় প্রকাণ্ড একটা দেহ অথচ হৃৎপিণ্ড নেই! দিনে মন উদাস হয়ে যায়, রাত্রে গা ছম-ছম করে, মনে হয় শ্মশানে বাস করছি। পথের আবর্জনা পথেই পড়ে আছে, কারও কোনো দিকে লক্ষ্য নেই, পথের ধারে ধারে দু'-চার জন লোকের জটলা, কিন্তু তারা যেন মানব-সমাজের কেউ নয়, যেন সব ছায়া-মূর্তি। এর উপর আবার প্রতিরাত্রে সাইরেন বাজার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকা এবং বাজলেই আশ্রয়ে গিয়ে ঢোকা! বোমা ফাটার শব্দ শুনলে কেবলই মনে হ'তে থাকে পেট বড় না প্রাণ বড়?

কিন্তু সব অন্ধকারই আলোহীন নয়, সব দুঃখেই সান্ত্বনা আছে। যে দিন রাত্রে বোমাগুলো কানের কাছেই ফাটল, তার পরদিনই তিনকড়ি দেখা দিলেন করুণার অবতাররূপে। কণ্ঠে তাঁর গভীর অনুকম্পা। জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়িতে কোনো দিকে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

তাঁর এই পরম আত্মীয়জনোচিত কথায় মন বিগলিত হ'ল। বললাম, "না অসুবিধা তেমন কিছু হচ্ছে না, তবে ভাবছি থাকব কি যাব।"

তিনকড়ি দত্ত বিচলিত ভাবে বললেন, "না না, যাবেন কেন? গেলে বড্ড ভুল করবেন, ভীষণ ঠকবেন, আমার দিক্ দিয়ে যতটা পারি সুবিধে ক'রে দিচ্ছি, আপনি থাকুন।"

"সুবিধে আর কি করবেন? প্রাণটাই যদি যায়—"

"প্রাণটাকে খুব মূল্যবান মনে করছেন বুঝি? তা করুন আপত্তি নেই, কিন্তু প্রাণের চেয়েও দামী কি কিছু নেই? তার জন্যেও কি থাকতে চাইবেন না?"

"সেটা কি জিনিস?"

"টাকা, মশাই, টাকা। বাড়িভাড়া কমিয়ে দিচ্ছি, খুব সুবিধে ক'রে দিচ্ছি। ভাড়াটেদের সুবিধে যদি আমরা না করি তা হ'লে আর কে করবে?"—এই ভাবে আমাকে তিনি অনেক বোঝালেন।

অবশেষে তিনকড়ি দত্তের কাছে আমি হার মানলাম। আমাকে স্বীকার করতে হ'ল প্রাণের চেয়ে টাকা বড়।

"কিন্তু কত কমাবেন ভাড়া?"

"কত দিলে আপনি খুশী হন?"

একটু ভেবে বললাম, "গোটা দশেক টাকা দেব মাসে।"

তিনকড়ি আমার দিকে চাইলেন, তাঁর মুখে হাসি, চোখে কাতরতা। চল্লিশ টাকা দশ টাকায় নেমে আসার বেদনা তাঁর অন্তরে।

"হ্যাঁ, ঐ দশ টাকাই নেবেন। কত বাড়ি, মশাই, খালি পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে বিনা ভাড়ায় থাকা যায়।"

তিনকড়ি হেসে বললেন, "আর বলতে হবে না, কি দুর্দিনই এল—দড়াম ক'রে এক বিপর্যয় কাণ্ড!—আপনি দশ টাকাই দেবেন, তবু তো থাকবেন, তাতেই আমি খুশী হয়েছি।"

তিনকড়ি আমাকে কড়ির মায়ায় আবদ্ধ করলেন, নইলে হয় তো আপাততঃ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদটাই বড় হয়ে উঠত। যুক্তিও একটা জাগল মনের মধ্যে।—বোমা ঠিক আমাদের মাথাতেই পড়বে কেন? লটারিতে টাকা পাওয়া কঠিন, বোমায় মরাও তেমনি কঠিন—যার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই।

তার পর কালিঘাট, কোষ্ঠীবিচার, মাদুলিধারণ এবং নিশ্চিন্ত হওয়া। সাইরেন বাজলে আর বুক কাঁপে না। এই আশ্চর্য পরিবর্ত্তনে একটা মস্ত উপকার হ'ল। এবারে অন্তর-প্রদেশ থেকে বাইরে চোখ ফেরাবার সুযোগ হ'ল। তাকিয়েই সবিস্ময়ে দেখি, বহিঃপৃথিবীতে পরম সুযোগ উপস্থিত। অর্থাৎ পলায়মান লোকদের আসবাবপত্র বড় শস্তায় যাচ্ছে।—সেই দিকেই মন দিলাম কিছু দিন।

বোমা-ভীত লোকেরা দেখে অবাক হ'ল, আমিও নিজের ব্যবহারে কম অবাক হইনি। ওদিকে হিটলারও রাশিয়া আক্রমণ করে আমারই মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু যে ঘরে বাস করি তার সকল দেয়ালে ফাটল,—দামী আসবাব-পত্র যে ঘরে মানায় না। চূণকামও করা হয়নি দু'বছর। কথাটা তিনকড়ির কাছে তোলামাত্র তিনি ত্রুটির জন্যে বার বার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, "আমার কাছে ফর্ম্যালিটি করবেন না, সার্। যখন যা দরকার হয় ঘাড় ধ'রে করিয়ে নেবেন।"

ক্রমে একটার পর একটা অসুবিধা চোখে পড়তে লাগল—এবং তিনকড়িও নিজে মিস্ত্রির সঙ্গে উপস্থিত থেকে সব ঠিকঠাক ক'রে দিতে লাগলেন। এক দিন হেসে বললেন, "বলুন তো এ ঘরে একটা মস্ত বড় দোষ কি আছে?"

আমি চিন্তা করতে লাগলাম। তিনকড়ি বললেন, "বুঝতে পারেননি, আশ্চর্য! আর্সোলার মস্ত এক আড্ডা আছে রান্নাঘরের ঐ কোণে।"

"ঠিক বলেছেন তো! আর্সোলার উৎপাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে; খাওয়ার সময় সব উড়তে আরম্ভ করে"—

"কিছু ঘাবড়াবেন না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

সেই দিনই লোক লাগিয়ে তিনি হাজার কয়েক আর্সোলা মেরে দিলেন। আমারও চোখ খুলে গেল সেই মুহূর্ত্ত থেকে; আগে যা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, এখন থেকে তা একে একে সবই চোখে পড়তে লাগল। পরদিন তিনকড়ির সঙ্গে দেখা হ'তেই আমার পরবর্ত্তী আবিষ্কারের কথাটা জানিয়ে দিলাম। বললাম, "মশাই, আপনার বাড়িতে ইঁদুরের অত্যাচার বড্ড বেশি—এ কথাটা এত দিন গোপন করা আপনার অন্যায় হয়েছে।"

"কেন, ইঁদুর কি এত দিন আপনার চোখে পড়েনি?"

"হয় তো পড়েছে, কিন্তু এত দিন কি আর দেখবার মতো চোখ ছিল?—এবারে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

তিনকড়ি ভয়ে ভয়ে বললেন, "মুস্কিলের কথা।"

"তার মানে?"

"মানে, ইঁদুর ধরাও যেমন শক্ত, মারাও তেমনি শক্ত। ঐ উৎপাতটা, সার্, মেনেই নিতে হবে।"

"তার মানে ইঁদুর সম্পর্কে আপনার দায়িত্ব অস্বীকার করতে চান?"

"না—ঠিক তা নয়"—

"ও সব চালাকি চলবে না, ব্যবস্থা করুন, নইলে বাড়ি ছেড়ে দেব।"

দাবী করলেই সুবিধা আমার হয়, দাবী বাড়িয়েই চললাম, এবং সেই সঙ্গে আমার স্বাভাবিক সুর ক্রমশঃ চড়া ও কড়া হতে লাগল। তিনকড়িকে অগত্যা বলতে হ'ল, "আচ্ছা দাঁড়ান, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

সন্ধ্যায় হঠাৎ মিউ মিউ শব্দে সচকিত হয়ে চেয়ে দেখি, তিনকড়ির চাকর কোত্থেকে দু'টি বেরালছানা জোগাড় ক'রে এনেছে। তিনকড়ি কিছু দুধও ঐ সঙ্গে পাঠিয়েছেন।—

এই ক'দিনের মধ্যেই আমি জমিদার হয়ে উঠেছি—তিনকড়ি হয়েছেন আমার প্রজা। তাঁকে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' সম্বোধন ধরেছি। কিন্তু তাতে ফল আরও ভালই হয়েছে। ঘরের ঝুল পরিষ্কার ব্যাপারেই সেটা আরও বুঝতে পারলাম।

দেয়ালের কোণে কিছু ঝুল জমেছিল, তাঁকে ডেকে বললাম, "তোমার এই নোংরা বাড়িতে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না, অবিলম্বে ঝুল পরিষ্কার করিয়ে দাও, নইলে খুনোখুনি হয়ে যাবে।"

তিনকড়ি তখুনি লোক পাঠিয়ে দেবেন বলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে গেলেন, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও কোনো ব্যবস্থা হ'ল না। আমার গলা চড়ে গেল। তাকে চোর-জোচ্চোর যা মুখে আসে গাল দিতে লাগলাম।—হিন্দী ভাল বলতে পারি না—অবশেষে বাংলা ভাষার চরম কথাটি বেরিয়ে গেল মুখ থেকে—চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম, "শালা জোচ্চোর।"

তিনকড়ি জোড় হাতে বিনীত সুরে প্রায় কেঁদে এসে বললেন, "এই বারটি মাপ করুন, সার্, লোকজন কেউ ছিল না, তাই পাঠাতে পারিনি—এলেই পাঠিয়ে দেব।"

"বেশ আমি আরও এক ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যেও যদি ঝুল পরিষ্কার না হয় তা হ'লে আমি এক পয়সা ভাড়া দেব না।"

"তার পরেও, সার্, পিঠে জুতো মারবেন।"—বলে তিনকড়ি বিদায় হলেন, এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই লোক পাঠিয়ে ঘরের যাবতীয় ঝুল সাফ করিয়ে দিলেন।

বাড়িভাড়ার দশটা টাকাও সময় মতো দিতাম না। তিনকড়িও যেন নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে টাকাটা নিতেন। অনেক সময় এ নিয়েও

তাকে দিয়ে বলেছি, "ন্যাকামি না ক'রে টাকাটা নিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর।"

সময়ের দ্রুত পরিবর্তন হ'তে লাগল। ইতিমধ্যে হিটলারও ষ্টালিনগ্রাড থেকে ফিরে আসার আয়োজন করছেন।

আমার কাজের চাপ অসম্ভব বেড়ে গেছে। তিনকড়ির সঙ্গে ঝগড়া করার সময় আর আমার নেই। ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরি তখন নিজেকে হিটলারের মতোই পরাজিত মনে হয়।

১১৪৩ সাল। শহরের অবস্থাও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কলকাতার পথে যত লোক মারা গেল না খেয়ে, তার পঞ্চাশ গুণ জীবন্ত লোক এসে শহর ছেয়ে ফেলল। খালি বাড়িগুলো দেখতে দেখতে ভর্তি হয়ে গেল, বাড়িভাড়া চড়তে লাগল মিনিটে মিনিটে।

তিনকড়ি দত্ত দেখা হ'লে এখন আর মাথা নত করেন না, কথাও বলেন না, তাঁর নোয়ানো মাথা খাড়া হয়ে উঠেছে, তাঁর এখন সময়ের বড় অভাব।

অবশেষে যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল। যথাসময়ে ভাড়া-বৃদ্ধির নোটিস্ পেলাম। এ দিকে বাড়িটি যথাপূর্ব আর্সোলা, ইঁদুর এবং ঝুলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বেরালগুলো সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়, ইঁদুরের চেয়ে মাছই তাদের বেশি পছন্দ।

এমনি নোংরা ঘরে আসবাবপত্র বেমানান হয়ে উঠল। আমার ছোটখাটো জমিদারি মনটিও নানা কারণে বিষিয়ে উঠল।

ভাড়াবৃদ্ধির জন্যে অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম, তবু ভেবেছিলাম দু'-একটা কথা বলব তিনকড়ির সঙ্গে। ভেবেছিলাম, বলি, বিপদের সময় ছেড়ে যাইনি, এখন কি একটুও বিবেচনা করবেন না? কিন্তু বলতে সাহস হ'ল না। দেখলাম, আমাদের বাড়িতে যতগুলো পৃথক্ ফ্ল্যাট ছিল, সমস্ত ভর্তি হয়ে গেছে, পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে নতুন সব ভাড়াটে এসেছে, আরও ফ্ল্যাট খালি আছে কি না তার সন্ধান নিতে প্রতিদিন দলে দলে লোক আসছে। সুতরাং দশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকায় বিনা প্রতিবাদেই ফিরে গেলাম।

বর্ষাকাল এল। পুরনো বাড়ি, ছাদের একটা কোণ থেকে ভিতরে জল চুঁইয়ে পড়তে লাগল। তিনকড়িকে জানিয়েও কোনো ফল হ'ল না। তাঁকে 'তুমি' সম্বোধন করছিলাম, আবার 'আপনি' ধরলাম, কিন্তু তাতেও কোনো সুবিধে হ'ল না।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম এক দিন—দু'টি বেরালছানার জন্যে দু'টাকার এক বিল পেয়ে। বুঝলাম এবারে তিনকড়ির পালা।

তাঁরই বা দোষ কি? শহরের যেখানে যেটুকু জায়গা ছিল সমস্ত দখল হয়ে গেছে। মোটর গারাজে, গোরুর ঘরে লোক বাস করতে শুরু করল। ছাদে তাঁবু খাটিয়ে নতুন ভাড়াটে বসানো হল। আত্মীয়-স্বজনে গৃহস্থবাড়ি ভরে উঠল, বাকী রইল শুধু গাছের ডাল।

তিনকড়ি কিছুতেই ছাদ মেরামত করলেন না। ভয় দেখানোর উপায় নেই, উঠে যাবার উপায় নেই, উঠলেই দ্বিগুণ ভাড়ায় লোক আসবে—তিনকড়ির তো সেটাই কাম্য।

আরও একবার চেষ্টা করলাম। অতি বিনীত ভাবে একখানা চিঠি পাঠালাম তাঁর কাছে। উত্তরে পেলাম এক নোটিস্—বাড়িভাড়া বৃদ্ধি হ'ল আরও দশ টাকা। নিজে গিয়ে আবেদন জানালাম, "অনেক দিন আছি, একটু দয়া হবে না, স্যর্ ?"

"দয়া?"—তিনকড়ি নির্মম ভাবে বললেন, "দয়া?—যে বাড়িতে আছ তার ভাড়া এখন আশি টাকা। সেখানে পঞ্চাশ টাকা দয়া নয়?"

"কিন্তু ছাদ দিয়ে জল পড়ে"—

কুৎসিত রসিকতা ক'রে তিনকড়ি বললেন, "বৃষ্টি হ'লে জল পড়বে না তো পড়বে কি সোনা-রূপো?" এ ভাবে অকারণ বিরক্ত কর তো জুতিয়ে লম্বা করব।"

জোর ক'রে হাসার চেষ্টা করলাম।

তিনকড়ি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "যাও, যাও, পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় নবাবী করা চলে না, খুশী হয় থাক, না হয় উঠে যাও। এত দিন যা চেয়েছ তা দিয়েছি, এখন আর পারব না, মাপ কর।"

তিনকড়ি ক্রমেই আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল, আমাকে বোধ হয় তুলে দেওয়ার মতলব করছেন। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব? আমি সাবধান হ'লাম। কিন্তু ভাড়ার টাকাটা পয়লা তারিখে দেবার চেষ্টা ক'রেও তাকে ধরতে পারা গেল না। রোজই শুনি বাড়িতে নেই। এমনি ক'রে সাত-আট দিন কেটে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভাড়া না দেওয়ার অপরাধে বাড়ি ছাড়তে হ'লে কলকাতায় আর দাঁড়াবার জায়গা নেই—যেমন ক'রে হোক ভাড়াটা জমা দিতেই হবে।

ভোর-বেলা উঠে গেলাম তিনকড়ির দরজায়। ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়লাম।

"কে?"—প্রশ্ন এল ভিতর থেকে।

"আমি জলধর গাঙ্গুলি, স্যর্।"

বিরক্তিপূর্ণ চাপা স্বর শোনা গেল, "শালা ভোর রাত্রে এসেছে জ্বালাতে।"

ভাড়াটা হাতে তুলে দিয়ে মনে হ'ল যেন মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল। কিন্তু ভাগ্যকে রোধ করবে কে? হিটলার জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হ'লেন, ঐ সঙ্গে আমিও। যুদ্ধের দরুণ অফিসটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল।

এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা: হিটলার নেই, আমিও নেই।

"খালি বই পড়া শিক্ষা হলে হবে না, যাতে চরিত্র গড়ে উঠে, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।

"আমাদের চাই স্বাধীন ভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরাজী ও science পড়ান। চাই technical education, চাই যাতে industry বাড়ে।"

—বিবেকানন্দ

—উপন্যাস—

প্রতিভা বসু

বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছিলো দেখে এদিকে মা খুব ভাব ছিলেন হয়তো, আসতেই বললেন 'এই যে রুনি। কী রে, এত দেরি হলো যে?'

বলতে যাচ্ছিলাম, নির্দিষ্ট ট্রেন অভিলাষ ফেল করেছিল ব'লে ব'সে থাকতে হয়েছিলো, কিন্তু মার মুখোমুখি এই প্রথমবার এতবড়ো মিথ্যেটা হঠাৎ ক'রে কিছুতেই বার করতে পারলাম না। বললাম 'ফেরবার পথে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম।'

মা চোখ তুলে বললেন 'কার বাড়ি রে? অঞ্জলি।'

'না মা—তুমি চিনবে না তাদের।'

'না, চিনবো না'— অবিশ্বাসের হাসিতে মার মুখ ভরে গেলো 'তুই চিনিস আর আমি চিনবো না।'

এবার আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসলাম এসে মা র খাটে। আমি যে একান্তই গোপনে এই মেশামেশিটা চালাচ্ছিলাম সে-একথা বুকের মধ্যে আমার পাথর হ'য়ে চেপেছিলো। এ সুযোগটা আমি নিলাম। সহজ হবার চেষ্টা ক'রে বললাম 'আমার সঙ্গে একজনদের আলাপ হয়েছে, মা। ভারি চমৎকার লোক।'

মা বললেন 'কারা?'

'অভিলাষের চেনা'—এটুকু ব'লে আমি মা-র মনটা একটু তৈরি করবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু মা যত উৎসাহিত হবেন ভেবেছিলাম তা তিনি হলেন না,—অতিশয় উদাস ভঙ্গিতে বললেন 'নাম কি মেয়েটির?'

এর উত্তর দিতে গিয়ে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। কুণ্ঠিতভাবে বললাম 'মেয়ে নন তিনি। তিনি অভিলাষের ছেলেবেলাকার বন্ধু। নাম বোধ হয় শ্যামল।' মা-র দিকে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হলো, বুকের মধ্যে যত ভয় যত শঙ্কা সব যেন তিনি জেনে ফেলেছেন। চুপ ক'রে গেলাম। এতক্ষণ মা শুয়ে ছিলেন—এবার কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে বললেন 'কেন গিয়েছিলে সেখানে—অভিলাষ কিছু জানাতে বলেছিলো?'

ঢোঁক গিলে বললাম 'না।'

'তবে?'

'এমনিই।'

'আরো গিয়েছ না কি কখনো?' মা-র গলার স্বরে একটু কাঠিন্যের আভাস পেলাম। অস্ফুটে বললাম 'গিয়েছি।'

'কে আছে তাদের বাড়ি?'

'তাঁর মা।'

'হুঁ'—মা কনুইয়ের ভর থেকে মাথা নামিয়ে শুলেন।

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললাম 'ওঁদের মনোহারী দোকান কি না—মাঝে-মাঝে জিনিষ কিনতে গিয়েই দেখা হয়েছে।'

হেসে বললেন 'দোকানিদের সঙ্গে আবার বন্ধুতা কী রে?'

হঠাৎ আমি উত্তেজিত বোধ করলাম এ-কথায়। মা-র অবজ্ঞা আমাকে আঘাত দিলো। তাঁর উজ্জ্বল অদ্ভুত দুই চোখ আমি দেখতে পেলাম কাছে। বললাম 'কেন, আই.সি.এস. ছাড়া বুঝি তোমাদের মানুষকে মানুষ জ্ঞান হয় না?'
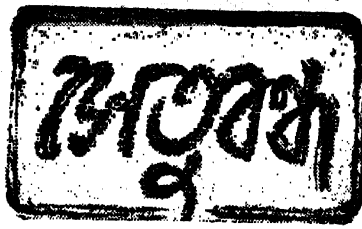
আমার উত্তেজনায় মা অবাক হলেন কিনা জানি না। কিন্তু শান্ত ভাবে বললেন 'তা তোদের কাছ থেকেই তো এ-ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে।'

'তোদের মানে? আমার কাছ থেকে কখনোই না।'

'তোর আবার মত কী ইচ্ছে কী, তুই তো তোর বাবারই ছায়া।'

'কক্ষনো না'—কথাটায় গলার স্বর এত চ'ড়ে গেল যে নিজের কানেই অদ্ভুত লাগলো। লজ্জিত হলাম।

মা বললেন 'আজ বোধ হয় অভিলাষের বন্ধু ব'লেই তুই তাকে এক জন মানুষ ব'লে গণ্য করছিস্।'

আমি জবাব দিলাম না। অভিলাষ, অভিলাষ, অভিলাষ। এদের মন অভিলাষেই আচ্ছন্ন। রাগ ক'রে উঠে আসছিলাম, মা ডাকলেন 'শোন—'

থমকে দাঁড়াতেই বললেন 'ছাখ রুনি, আজ সকালবেলা অভিলাষ বেরিয়ে যাবার আগে আমাকে বলেছিলো চৌরাস্তার মোড়ে না কোথায় এক মনোহারি দোকান আছে, তুই মাঝে-মাঝে সেখানে যাস। ওর ইচ্ছে—'

'কী ওর ইচ্ছে?' সম্পূর্ণ না-শুনেই আমি ঝাঁঝ দিয়ে উঠলাম, 'দেখ মা, সবটারই একটা সীমা থাকা দরকার। অভিলাষ আমাকে সব নিয়েই শাসন করবে আর তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে তার প্রশ্রয় দেবে—'

'তা তো দেবোই'—হঠাৎ মা উঠে বসলেন বিছানার উপর, রাগ ক'রে বললেন 'অভিলাষের সঙ্গে তোমার যে-সম্বন্ধ তাতে তার কথা মান্য করতেই আমি তোমাকে শেখাবো। তোমাদের আজকালকার রীতিই এই—স্বামীকে অবহেলা ক'রে নিজের আমিত্বের জাহির। খাবার পরবার বেলা তো সেই মানুষেই নির্ভর।'

'তবে তুমি কী বলতে চাও আমাকে?'

'বলতে চাই অভিলাষকে তুমি মান্য করবে। আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার বাবার শিক্ষায় মানুষ হ'য়ে তুমি অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির হয়েছো।'

'আমি এর চেয়ে বেশি মান্য করতে জানি না।'

'তা না-জানলে অভিলাষ তোমাকে বিয়ে করবে না।'

'ব'য়ে গেছে'—আমি সবেগে উঠে দাঁড়ালাম; বললাম 'ভেবেছো কী তোমরা আমাকে, আমি কেবল বিয়ের জন্যে ওর পদলেহন করতে থাকবো? আমার প্রাণ নেই, আমার আত্মা নেই?'

'না, নেই। এ-সব ক্ষেত্রে মেয়েদের আলাদা অস্তিত্ব থাকলে তাতে সর্বনাশ ঘটে। এখন তুমি যাও।' গম্ভীরভাবে আদেশ ক'রে মা ফিরে শুলেন। রাগে দুঃখে সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধ'রে গেলো আমার। স্তব্ধ হ'য়ে খানিক ব'সে থেকে উঠে এলাম সেখান থেকে।

পরের দিন কোর্টে যাবার মুখে বাবা আমাকে ডাকলেন। আমি যেতেই তিনি বললেন, 'অভিলাষ বলে গেছে রেজিস্ট্রি অফিসে একটা নোটিশ দিয়ে রাখতে। খুব সম্ভব এ রোববারের পরের রোববার ও আবার আসবে—তোমার মত তো আমি জানিই, তবুও কথাটা ব'লে গেলাম।'

আমার মুখ নীল হ'য়ে গেলো। অভিলাষের ধরনে একবার বুঝি পড়ি, কী উপায় হবে আমার। ওর সন্দেহাচ্ছন্ন ইতর মনের পরিচয়

আমি কেমন ক'রে মা-বাবাকে বোঝাবো। অভিলাষ আই. সি এস.—এর উপরে আর কথা নেই। সমস্ত শরীরকে শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম বাবার কাছে। বাবা একটুখন অপেক্ষা ক'রে বেরিয়ে গেলেন। বুঝে গেলেন আমার সম্মতিরই আভাস এটা। এর পরের দু'দিন আমি কোথাও বেরুলাম না—ভালো ক'রে কথা বললাম না কারো সঙ্গে—মনের মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তির আগুনে পুড়তে লাগলাম একা-একা।

বোঝালাম মনকে—অভিলাষকে গ্রহণ করবার সমস্ত যুক্তি জোগাতে লাগলাম আপন মনের মধ্যে, কিন্তু ভুলতে পারলাম না তাঁর কথা। সামান্য মনোহারি দোকানের সুদর্শন অধিকারী আমার সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে রইলো। আমার বাবা লক্ষপতি—রাজকন্যা আমি—আমার আত্মমর্যাদার পক্ষে এর চেয়ে অপমান আর কী আছে। কিন্তু হার মানলাম হৃদয়ের কাছে। সমস্ত যুক্তিতর্কের অতীত হ'য়ে দুই চোখ জলে ভ'রে গেলো।

এর তিন দিন পরে সকালবেলা চা খেতে ব'সে বাবা বললেন 'রুনি, আজ সিনেমা দেখতে যাবি না কি? খুব ভালো একটা হিন্দি ছবি হচ্ছে প্যারাডাইসে, তুই তো হিন্দি ছবির গান শুনতে চেয়েছিলি।'

'যেতে পারি।'

'উৎসাহ নেই যে বড়ো?'

ছোটো ভাই মণ্টু লাফিয়ে উঠলো ও-পাশ থেকে, 'ও বাবা, আমি যাবো।'

'যাবি তো যাবি, অস্থির হচ্ছিস কেন? তুই যাবি না কি রে?' বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

মা বললেন 'আমি তো আজ শ্যামবাজার যাবো ছোড়দির ওখানে।'

'আমি তো যাব না'—আমি বললাম—'আমি আর মণ্টু দুপুরের শো'তে সিনেমায়ই যাব।' বোঝা গেল, মা বেশি খুশি হলেন না—তাঁর ভাব স্বভাব খানিকটা সেকেলে।—বাবা আবার আজ কাল আধুনিক হয়েছেন—দু'দিন পরে আই. সি. এসের স্ত্রী হবো অথচ একা একা একটা আধটা সিনেমা পর্যন্ত দেখবো না, এ বদনাম ঘোচাবার জন্যেই বোধ হয় তাঁর এই উত্তম।

কিন্তু সে যাই হোক, বাড়ি থেকে আমার যে হাঁপ ধরেছিলো তা থেকে তো খানিকটা বাঁচবো। মনে-মনে কেমন-একটা আরাম হ'লো।

মণ্টু পারলে বারোটার সময় গিয়েই ব'সে থাকে, এমন অবস্থা। বাবা কোর্টে গেলেন, মাকেও সেই গাড়িতে পৌঁছে দিতে নিয়ে গেলেন। এবার আমার মনের মধ্যে এক অদম্য ইচ্ছার সাড়া পেলাম। এখনকার মতো তো আমি স্বাধীন—এখন কি আমি যেতে পারি না ইচ্ছে করলে। আজ দোকান ছুটি—আজ বিষ্যুৎবার। বিদ্যুতের মতো বুকের মধ্যে চমকাতে লাগলো—একটি কালো পর্দা-ঘেরা ঠাণ্ডা ঘর, কোণে একটি টেবিল আর তার চেয়ারে ব'সে অপেক্ষমান একটি মনুষ্যমূর্তি।—কিন্তু সত্যিই কি সে অপেক্ষা করছে?—কী আশ্চর্য আমাদের মন? আমরা যাকে চাই স্বতই কেন এ কথা ধ'রে নিই যে অন্য পক্ষও সেই তীব্রতা দিয়েই আমাকে প্রার্থনা করছে।

আপন মনই কেন অন্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় বারে-বারে?—আমি অভিলাষের স্ত্রী—ওঁর কাছে আমার সেই তো পরিচয়। মনকে প্রশ্রয় না-দিয়ে স্নান করতে ঢুকলাম গিয়ে বাথরুমে। স্নান ক'রে এসে মণ্টুর দেখি অসাধারণ তাড়া। ইতিমধ্যেই সে স্নান ক'রে খেয়ে হাফপ্যান্টের উপরে বেল্ট বসাতে লেগে গেছে, আর বারে-বারেই উঁকি মেরে দেখছে গাড়ি কেন ফিরে আসছে না মাকে রেখে—আমাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে বললো 'ও মা—তুমি মাত্র চান ক'রে এলে? কী হবে?' হেসে বললাম 'আজ আর আমাদের সময় নেই যাবার।'

'ঈশ!'

'ঈশ কী—ভাখ না ঘড়িতে কত বেজে গেল—তার উপর ঘড়িটা স্লো অথচ এখনো মোটে গাড়িই ফিরলো না।'

মণ্টু বিষণ্ণ হয়ে গেলো। তক্ষুণি হেসে বললো 'দুষ্টুমি, না? দাঁড়াও, আমি পাশের দোকানের ঘড়িটা দেখে আসি।' ছুটলো সে ঘড়ি দেখতে।

আমার নিজেরও বাড়ি থেকে বেরুবার গরজ মন্দ ছিল না। নিজের মনকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না—প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিলো, ইচ্ছাকে এ-ভাবে দমন করবার অধিকার আমার নেই—আমি যাবো, আমার যাওয়া উচিত।

তিনটার সময়ে শো—রওনা হলাম আড়াইটারও আগে। রাসবিহারী এভিনিউ ছাড়িয়ে রসা রোডে পড়তেই আমার চোখ থমকে গেল। দেখলাম, ট্রামের অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আমার অজ্ঞান্তেই আমি গাড়ি ঘোরাতে আদেশ দিলাম—নির্দেশমত তার সামনে এসে গাড়ি ঘ্যাঁচ ক'রে থেমে গেলো। 'আপনি!' আমার মুখের দিকে সে অবাক হ'য়ে তাকালো। হঠাৎ লজ্জায় আমার সমস্ত রক্ত যেন গরম হ'য়ে গেলো—এমন কোনো ঘনিষ্ঠতা ওঁর সঙ্গে আমার নেই যাতে গাড়ি থামিয়ে দেখা করা যায়। কথার জবাব দিতে পারলাম না—চোখও তুলতে পারলাম না। ও এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে বললো 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'সিনেমায়।'

'তাই না কি? আমিও যে যাচ্ছি।'

বুকের রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠলো, তবু বললুম 'তবে তো একই পথ আশা করি—অন্তত: চৌরঙ্গী পর্যন্ত।'

'তাতো নিশ্চয়ই—কিন্তু ঐ যে আমার ট্রাম যায়—'

'যাক্—আপনি গাড়িতে আসুন।'

'গাড়িতে?'—লজ্জিত মুখে সে ইতস্তত: করতে লাগলো—আমি দরজা খুলে ডাকলুম 'আসুন।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য।' মধুর হেসে সে এ-দিকের দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো।

মুহূর্তে আমার মন বিগড়ে গেলো। বাবুর এখানে বসা হ'লো না—ড্রাইভারের পাশে না-বসলে ওঁকে মানাবে কেন? হাজার হোক, দোকানদার তো। গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলুম বাইরের দিকে তাকিয়ে। মণ্টু ফিসফিসিয়ে জিগেস্ করলো 'কে, দিদি?'

'তা দিয়ে তোর দরকার কী।'

'খুব সুন্দর না?'

'তোর মতোই।'

'বড়ো হয়ে আমি ও-রকমই হবো দেখো।'

ওদিক্ থেকে সে মুখ ঘোরালো—'এটি আপনার ভাই নিশ্চয়ই।'

'হুঁ।'

'আশ্চর্য মিল কিন্তু।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

এতক্ষণে সে আমার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করলো বোধ হয়। একটু তাকিয়ে থেকে ফিরে বসলো চুপ ক'রে। একটু পরেই দেখলুম, ড্রাইভারের সঙ্গে তার আসন বদল হচ্ছে। ষ্টিয়ারিং হুইল ধরতেই আমি অবাক হয়ে বললুম 'এ কী!'

'হাত নিশ্পিশ করছে বড়ো।'

'না, না, ও আপনি ছেড়ে দিন ওর হাতেই।'

মুখ না-ঘুরিয়েই বল্‌লো 'কিচ্ছু ভয় নেই আপনার।'

'না, না, আমার কথা শুনুন আপনি।'

'আপনি বললে শুনতেই হবে—' চকিতে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো—কিন্তু গাড়িটা তেমনিই আশু মুখার্জি রোড দিয়ে ছুটে চল্‌লো পূর্ণবেগে।

একটু পরে আবার চকিতের জন্য মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লো 'অপরাধ নেবেন না'—না ব'লে পারলুম না.—'নিলেও যে আপনি কথা শুনবেন তার তো কোনো লক্ষণ দেখছিনে। আমি কি আপনাকে কেবল গাড়ি চালাবার জন্যে ডেকেছি'—শেষের কথাটায় আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অভিমানটা একটু প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। নিমেষে আবার বদল হ'লো আসন—ড্রাইভারের হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়ে বসলো সত্যিই।

'আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছিলো এখন।'

'তবু ভাগ্যি।'

'ভাগ্যি আর আপনার নয়—যে-অভাগা সমস্তটা সকাল আর দুপুর প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষায় ব্যর্থ হ'য়েও শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে তার মত ভাগ্যবান্ অন্তত এই মুহূর্তে তো আর কেউ নয়।' কথাটা ঠাট্টা ক'রে বলতে গিয়েও সুরটা যেন ওর গভীর হ'য়ে গেলো হঠাৎ। অভিলাষ ওর বন্ধু—আর আমি অভিলাষের স্ত্রী, এই অছিলার সেতু মাঝখানে রেখেই ও আমাকে এত বড় ঠাট্টাটা করতে পেরেছিলো, কিন্তু এ কথা যে একান্তই ওর মনের কথা, এটা বুঝতে আমার সময় লাগলো না। চোখ তুলে তাকালুম—মোটা পুরু কাচের আবরণ ভেদ ক'রেও ওর চোখের ভাষা আমাকে রোমাঞ্চিত করলো।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ সচকিত হয়ে দু'জনেই একসঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলুম।

এর পরে অনেকক্ষণ আর কথা বলতে পারলুম না। গাড়ি চৌরঙ্গিতে আসতে ও বলল 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন আমি তো তা জানিনে—আমি লাইটহাউসে যাব।'

মণ্টু এতক্ষণে সুযোগ পেলো কথা বলবার, সগৌরবে বল্‌লো, 'আমরা যাচ্ছি কঙ্কণ দেখতে প্যারাডাইসে।'

'তাই নাকি! বাঃ! তুমি বুঝি খুব হিন্দি ছবি ভালোবাসো।'

মণ্টু বিপদে পড়লো। সে-বেচারার এই প্রথম অভিযান হিন্দি ছবিতে, কিন্তু তা সে প্রকাশ করলো না—আড়চোখে আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে বল্‌লো 'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু তাই একটাও দেখিনি।'

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে মণ্টু বল্‌লো 'তাহলে চলুন না আমাদের সঙ্গে—লীলা চিটনিস্ আর অশোককুমার—ওঃ কী তোফা করে।'

আমার হাসি রাখা দায় হ'লো, বললুম 'এই চালিয়াৎ, তুই ক'বার দেখেছিস্ রে?'

আমার কথা মণ্টু গ্রাহ্যই করলো না—ইস্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে যা সংগ্রহ করেছে তাই ভদ্রলোকের কাছে সগৌরবে নিজের ব'লে চালাতে লাগলো। আর সে-ও তেমনি সব কথাতেই দু'চোখ বড়ো ক'রে দারুণ অবাক হবার ভাণ করতে লাগলো। অবশেষে কোন্‌ক্রমে লাইটহাউস পার হ'য়ে যখন গাড়ি প্যারাডাইস্ ধরো ধরো তখন তার খেয়াল হ'লো। 'তাই তো, লাইটহাউস যে ছাড়িয়ে এলাম।'

'খুব ভালো হয়েছে'—মণ্টু হাততালি দিয়ে উঠলো—'আমি তো দেখেইছি যে লাইটহাউসের গলি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি ইচ্ছে ক'রেই চুপ ক'রে ছিলাম।'

'ভারি তো চালাক তুমি'—মণ্টু গর্বের হাসি হেসে মাথা নিচু করলো।

আমার দিকে তাকিয়ে নেহাৎ যেন নিরুপায় এই ভাব ধ'রে বল্‌লো 'কী করি বলুন তো?'

মুখের হাসি যথাসম্ভব গোপন ক'রে বল্‌লাম 'কপালে যখন দুর্গতি লেখাই আছে তখন তা খণ্ডনের চেষ্টা না-করাই ভালো।'

'তাহ'লে আপনি বলছেন—'

মণ্টু কোঁশ ক'রে উঠলো, 'দিদি আবার বলবে কী, আপনাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে।'

এলাম প্যারাডাইসে। পাখার তলা বেছে তিনখানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট করা হলো—প্রথমে আমি মাঝখানে সে—আর তার পাশে মণ্টু। রেকর্ড বাজানো হচ্ছে তখনো। ও বলল 'পান খাবেন?'

'না।'

'সে কী! সিনেমায় আর বিয়েবাড়িতে না কি আবার মানুষে পান খায় না। আমি নিয়ে আসি গিয়ে।'

আমি হাত বাড়িয়ে রাস্তা আটকে বললুম 'কী আশ্চর্য, সত্যিই আমি পান খাইনে—তাছাড়া এই তো এক্ষুনিই আরম্ভ হবে—দেখছেন না দরজা বন্ধ করছে, ইনটারভেলে বরং যাবেন।'

সত্যি-সত্যি একটু পরেই আরম্ভ হ'য়ে গেলো।

খানিকক্ষণ দেখার পরে ও বললো 'আচ্ছা দেখুন, এই যে অত বড়ো জমিদারের ছেলের সঙ্গে সামান্য একটা পূজুরির মেয়ের প্রেম হ'লো, এটা কি উচিত?'

'নিশ্চয়ই। মানুষের হৃদয়টাই আসল—টাকাটা তো আর নয়।'

'কী জানি, হবেও বা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—মেয়েটা দরিদ্র, ওর না-হয় বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার একটা দুর্বাসনা হয়েছে, কিন্তু ছেলেটার এটা নিশ্চয়ই একটা খেলা।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম 'কী বলেন তার ঠিক নেই—বড়লোক হ'লে আর তাদের মানুষকে ভালবাসবার ক্ষমতা থাকে না, না? আর কেবল টাকা দিয়েই লোক বিচার করে।'

'কী জানি—বড়োমানুষের হৃদয়ের খবর কী ক'রে জানবো, বলুন।'

'সবই মানুষে হাতে-কলমে জানে না—জীবনে একটা মানুষের পক্ষে তা সম্ভবও নয়, বেশির ভাগ বিষয়ই মানুষে বুঝে নেয়। তা নইলে তো এক জন লেখককে সৎ অসৎ চোর বদমাস সব রকম চরিত্র আঁকবার জন্য সব রকমই হ'তে হতো।'

'হবে বা।'

আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম 'হবে বা বলছেন কেন—এ-কথা আপনাকে আমি জোর ক'রেই বলবো যে ভালোবাসার ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

'বিয়ের সময় অবশ্যই ওঠে'—একটু হেসে 'ধরুন এই অভিলাষের যদি কতগুলো টাকা না থাকতো আর সে যদি আই. সি. এস. না হ'তো—'

আমি এবার ওর মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম ও কী বলতে চাইছে। আমি কোনো জবাব দেবার আগেই—আবার বলল, 'আচ্ছা বলুন তো গল্পটার শেষ কী হবে?'

অত্যন্ত সহজভাবে বললাম 'শেষে নিশ্চয়ই এদের বিয়ে হবে।'

'হবে?'

'অন্তত উচিত তো—'

'আমি বলছি না, উচিত না। ছেলেটির তো কত বড়ো ঘরে নিজের সমকক্ষ সমাজে বিয়ে ঠিক করেছেন ওর বাবা—তা ছেড়ে এখানে বিয়ে করা ওর একান্তই বোকামি হবে।'

আমি ওর মনের কথা বুঝলাম, তাই বাধা দিয়ে বললাম 'ছবিটা কি দেখতে দেবেন না?'

'নাই বা দেখলেন।'

'তবে এলাম কেন?'

'এসেছেন অবশ্যই ছবি দেখতে।'

'তবে?'

'তবে কী। আমি কি বলেছি নাকি ছবি না দেখে আমাকে দেখুন।'

কাজলেমি আছে মন্দ না তো। হেসে বললুম, 'এমন করলে কখনো ছবি দেখা যায়?'

আবছা অন্ধকারে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো।

ইতিমধ্যে ইনটারভেল হ'য়ে দপ ক'রে আলো জ্ব'লে উঠলো।

মণ্টু বললো 'তোমরা কী কথাই বলতে পারো, দিদি। সারাক্ষণ কেবল ফিশ ফিশ করছিলে।'

ও বললো 'আমি না।'

আমি মুখের দিকে তাকাতেই হেসে ফেললো—'তাকাচ্ছেন কেন, আমি বলেছিলাম কথা?'

বললাম 'একটুও না।'

মৃদু হেসে এবার উঠে গিয়ে ও মণ্টুর জন্য চকোলেট কিনলো, আইসক্রীম কিনলো, আমার জন্যে পান—খানিক খাওয়া চলল, এর পরে আবার আরম্ভ হ'লো।

অনেকক্ষণ আমাদের চুপচাপ কাটলো—আড়-চোখে তাকিয়ে দেখলুম ভয়ানক মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

আমি আর কথা বললাম না, কিন্তু একটু পরে সে নিজেই বলল 'লাইটহাউসে খুব ভালো ছবি হচ্ছে একটা—হাইফেৎসের বাজনা আছে। যাবেন নাকি এক দিন?'

'আপনি বুঝি সেখানেই যাচ্ছিলেন?'

'যাচ্ছিলাম, কিন্তু টিকিট পেতাম কিনা জানি না।'

'এত ভিড়?'

'তা তো হবেই, হাইফেৎস্ নিজে আছেন এই ছবিতে।'

'বিলেতি সংগীতে আপনার অনুরাগ আছে মনে হচ্ছে।'

'কেন, আপনার নেই?'

'ভালো বুঝিনে।'

'ঐ আপনাদের এক দোষ। বুঝিনে আবার কী—কান দিয়ে শুনে-শুনে অভ্যেস করলেই বোঝা যায়। এ-জন্যে আর পণ্ডিত হ'তে হয় না। চলুন না এক দিন—ছবিটা দেখে আসবেন। খুব ভালো লাগবে বাজনা।'

'বেশ তো।'

'আমার তো আবার বিষ্যুৎবার ছাড়া ছুটি নেই।'

হঠাৎ যেন আমার ভিতরকার উদ্ধত বড়োমানুষি মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। দোকানদারের আশকারা তো কম নয়। ওঁর সঙ্গে ছাড়া আমি যেতে পারি না—আর গেলেই বা টিকিটখানা তো আমাকেই কিনতে হবে, ওঁর দৌড় বড় জোর ন' আনা। ছবি দেখতে-দেখতেই বললাম 'আপনার বিষ্যুৎবার ছাড়া ছুটি নেই বটে—কিন্তু আমি তো যে-কোনো দিনই আসতে পারি।'

'হাঁ, সে তো আপনি পারেনই, কিন্তু—'

'কিন্তু আর কী—আজ তো নেহাৎই দৈবযোগ।'

আমার সঙ্গে বসে সিনেমা দেখছে—এর চাইতে ভাগ্য ওর আর কী থাকতে পারে—এটা বোঝাবার জন্য আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম।

ও বললো 'দৈবটাকে আরেকদিনও ইচ্ছে করলে যোগ করা যায়, এ-কথাই আমি বলছিলাম।'

গম্ভীরমুখে বললুম 'না, তা যায় না—অন্তত সব ক্ষেত্রে যায় না।'

'তা তো বটেই'—মুখ ম্লান ক'রে ও ছবির দিকে তাকিয়ে রইলো।

মনে-মনে আত্মপ্রসাদ ভোগ করতে লাগলুম। কিন্তু অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পরে মনে হ'লো এ-গুমোটটা সৃষ্টি না-করাই উচিত ছিলো। আমিই তো নিয়ে এসেছি, ও তো নিজে থেকে আসেনি। ভাবতে লাগলাম, কী ভাবলাম জানি না—কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা চাপা অশান্তি ছেয়ে গেলো।

এক মুহূর্তও আর ব'সে ছবি দেখতে ইচ্ছে করলো না। আর যত রাগ সমস্তই সঞ্চিত হ'তে লাগলো ওর উপর। মনে হতে লাগলো কেন এসেছিলাম। এক সময় অত্যন্ত বিরক্তভাবে বললাম 'কী কুক্ষণেই এসেছিলাম—শেষ হ'লে বাঁচি।'

প্রতিপক্ষ থেকে কোনো জবাব না-পেয়ে মনটা আরো বিরূপ হ'য়ে উঠলো—খানিক পরে সোজাসুজি বললুম—'ভালো লাগছে আপনার এ সব রাবিশ। আশ্চর্য!'

মৃদু হেসে চুপ ক'রে রইল।

বললুম 'মানুষের রুচি জিনিসটা যে কতদূর নামতে পারে তার চরম দৃষ্টান্তই হচ্ছে আমাদের দেশের এই রাবিশগুলো। আমি তো সইতেই পারিনে।'

'এলেন কেন?'

দপ্ ক'রে আলো জ্বলে ওঠবার অবকাশ পেলাম এবার একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললাম 'এলাম কেন তার কৈফিয়ৎ কি শেষে আপনার কাছে দিতে হবে না কি?'

'মিলেনই বা—'

'বটে?'

আমার এ-উত্তরের পরে এতক্ষণে ও ছবি থেকে মুখ ঘোরালো। আবছা অন্ধকারে সে-মুখ জ্বলে উঠলো আমার চোখে। আর আমার সমস্ত অন্তর মন নিমেষে সংকুচিত হ'য়ে উঠলো তার চোখের দিকে তাকিয়ে। নিজের ঔদ্ধত্যে লজ্জিত হ'য়ে মাথা নিচু করলাম।

এর পরে ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত সে আর আমার সঙ্গে একটিও কথা বললো না।

ছবি শেষ হ'লে বাইরে এসে আমরা গাড়িতে উঠলুম—কিন্তু সে আর উঠলো না, হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে মিশে গেলো রাস্তার জনারণ্যে। মণ্টু ব্যস্ত-ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলো, কিন্তু সে-ডাক তার কানে গেলো না।

বাড়ি আসবার সমস্তটা পথ আমি গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলুম আর মণ্টু অনর্গল বকতে লাগলো। এক সময় সে বললো 'দেখ দিদি, অভিলাষ বাবুকে তোমরা অত পছন্দ করো কেন? এই ভদ্রলোক তার চেয়ে অনেক চমৎকার। কী সুন্দর দেখতে।'

আমি বললাম 'অভিলাষ বাবুর সঙ্গে এঁর তুলনা? যেমন তুই, তেমনিই তোর পছন্দ।'

মণ্টু ভীষণ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে গেলো—সেই মুহূর্তেই চোখ কুঁচকে দারুণ অবহেলায় ভঙ্গিতে বললো 'ওঃ, অভিলাষ বাবু—তোমরা কিছু বোঝো না। আমাদের ফার্স্ট ক্লাশের সুধীনদা বলেন—মানুষ হবে মানুষের মতো—হাত পা নাক চোখ হ'লেই তো আর হ'লো না—আসল হচ্ছে তার হৃদয়—আর সেই হৃদয় বোঝা যাবে তার চোখে—'

আমি বিস্মিত হ'য়ে তাকালাম মণ্টুর দিকে। বারো বছরের বালক—এই সেদিন ওকে ব'লে-ব'লে কথা শিখিয়েছি—ধ'রে ধ'রে হাঁটিয়েছি—সে বোঝে চোখের ভাষা! স্তম্ভিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম।

চোখ! সত্যিই কি ওঁর চোখে ওঁর হৃদয়ের ভাষা? আরো শোনবার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন ব্যাকুল আবেগে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ওর ফার্স্ট ক্লাশের সুধীনদা যে ওর কাছে এক জন বিশেষ কেউ এ কথা স্পষ্টই বুঝে বললাম 'তোর সুধীনদাই বুঝি জগতের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি?'

'সর্বাপেক্ষা কেন—তা তো বলিনি—কিন্তু খুব বুদ্ধিমান।'

'বুদ্ধিমান আর নির্বোধ তুই কী ক'রে বুঝিস্?'

'বুঝি না! নিশ্চয়ই বুঝি। আমাদের পঞ্চাননটাই তো একটা গোবর। সবাই জানে ও গোবর। জানো দিদি, সুধীনদা স্বদেশী।'

'স্বদেশী আবার কী রে?'

'ওমা, সে কী! স্বদেশী জানো না! এই যে দেশে হাহাকার পড়েছে, সব লোক খেতে পাচ্ছে না—এদের জন্য আত্মদান—এর প্রতি-বিধান—এ-সবই তো স্বদেশী করা। সুধীনদার দুই দাদা জেলে।'

'মণ্টু, তুই যে অনেক শিখেছিস্। মা বাবা এ-সব শুনলে তোকে কী শাস্তি দেবেন জানিস?'

'মা বাবা? মা বাবাকে আমি বলবোই নাকি এ সমস্ত কথা।' মণ্টু একটু ভীতভাবে বললো।'

'তবে আমাকে যে বললি বড়ো।'

মণ্টুর মুখ চুণ হ'য়ে গেলো। কাকুতি ক'রে বললো, 'তুমি ব'লে দিয়ো না, দিদি।'

আমি দুই হাতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করলাম।

—আষাঢ়ের প্রথম দিবস—

শ্রীমহাদেব রায়

রেখে গেছ তুমি কালিদাস
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বিরহীর মিলন-উল্লাস
কবি-কীর্তি তব চিরজীবি। বরষে বরষে মেঘদল
নীলাঞ্জন দীপ্তি মাঝে আজও, বহিতেছে গৌরব উজ্জ্বল
সেই তব কীর্তির বারতা। ধনিনী যে ধনে ঋতুরাণী,
সে তো কবি, তব মানসের বিরহীর হৃদয়ের বাণী
—মিলনের তরে হাহাকার: তব দূত দীর্ঘ পথ ধরি
মন্দ মন্দ ছন্দে চলিয়াছে মানবের দুঃখ বক্ষে করি
দ্বিগুণ উন্নত উদার। তুমি দেখিয়াছ মহাকবি,
এ দিনের অই মেঘে মেঘে সংযোজন-পটুতায় পরিপূর্ণ ছবি
পাঠায়েছ করি' তারে দূত, দূর করিবারে ব্যবধান,
বিরাট্ শূন্যেরে পূর্ণ করি, মিলনের উড়ায়ে নিশান।
লহ আজ ওগো মহাকবি
স্মৃতির বার্ষিকী দিনে পূজা-বেদনার অশ্রুরাশি সবই।
মানুষে-মানুষে ব্যবধানে—দেশ হ'তে আজ দেশান্তরে,
সুগভীর বেদনায় সদা ঘরে ঘরে তপ্ত অশ্রু ঝরে।
ঘুচাইয়া সব ব্যবধান, এ ভারতে তব আত্মা হ'তে
জাগুক মিলন-মন্ত্র তব অমরত্ব দিতে এ মরতে।
দেশে দেশে, জাতি ও সমাজে
পরিপূর্ণ মহা-মিলনের আকুলতা বিশ্বে যদি জাগে,
ভারতের এ পুণ্য উৎসবে লভে যদি পৃথিবী হরষ,
নব জন্মে ধন্য হবে তবে, আষাঢ়ের প্রথম দিবস।

"স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ"

(পুনরালোচনা)

শ্রীপ্রশান্তকুমার মৌলিক

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার মহাশয়ের "স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ" শীর্ষক প্রবন্ধটা পড়ে বেশ ভাল লাগল। লেখকের মনে কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে, কতকগুলো সংশয় মনকে দোলা দিয়েছে। সত্যি, আমাদেরও মনে ঐ রকম অনেক প্রশ্ন জেগে মাঝে মাঝে বেশ ভাবিয়ে তোলে। তাঁহার মতই কখন উত্তর পেয়েছি, কখনও পাইনি। যা উত্তর পেয়েছি তা' যে খুব যুক্তিসঙ্গত, তাও মনে হয়নি। তাই আমার এই ধৃষ্টতা, যদি কোনও সদুত্তর কারো কাছে আশা করতে পারি।

যে স্বাধীনতা আজকের দিনে অধিকাংশ ভারতবাসী আশা করে, তা' সকলেরই অনাস্বাদিত বস্তু। যাঁরা এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা, তাঁরা স্বাধীন দেশসমূহের দিকে তাকিয়ে এর কতকটা স্বরূপ উপলব্ধি করেন, কিন্তু আমরা জনসাধারণরা প্রায় কিছুই বুঝে উঠতে পারি না ;—আমরা স্বাধীনতা পেলে আমাদের দেশে সুব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হবে কি, যার ফলে আমরা অধিকতর সুখে বাস করতে পারব ? আমাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত, শুধু তারই ফলে অনেক দুরূহ সমস্যার দেখা দিয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে, যার মীমাংসা করতে অনেক বেগ পেতে হবে। তা' ছাড়াও অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নানান্ রকম অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার মীমাংসা করতে দেশের বড় বড় নেতা তাঁদের জীবনের মহামূল্য সময় অতিবাহিত করছেন। এ পর্য্যন্ত কোনও সন্তোষজনক মীমাংসায় তাঁরা এসে পৌঁছিতে পারলেন না। দেশের স্বজনের বাধা অতিক্রম করতে গিয়েই বীরগণ দেশের স্বাধীনতা -সংগ্রামের নামে জীবন দান করছেন। দেশের মনীষিশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যে বস্তু লাভের জন্য এ ভাবে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছেন তা' যে দেশের প্রভূত উপকারক, আমরা সাধারণরা তা' বোধ হয় নিঃসংশয়ে ধরে নিতে পারি।

"আমরা স্বাধীনতা চাই সমস্ত দেশের জন্য, জন কয়েক নেতা বা ধনীর জন্য নয়।" যারা ধনী তাঁরা অনেকে এ কথাটা বুঝেও নির্ব্বিকার ভাবে চুপ করে থাকেন অথবা সখের 'স্বদেশী' করেন, এ রকমও দেখা যায়। কারণ তাঁরা সুবিধাবাদী, দেশের বর্ত্তমান হীন অবস্থায় তাঁরা চরম ভোগের শ্রেষ্ঠ সুযোগ পাচ্ছেন। পণ্ডিত জওহরলাল সেদিন এক সাংবাদিক-বৈঠকে বললেন, "আমি কখনও পোকা-মাকড়ও মারি না, কিন্তু বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী মুনাফা-খোরদের ফাঁসী দেওয়া হলে বেশী সুখী হতাম।" স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও এ সব সুবিধাবাদী মুনাফাখোর ধনীর অস্তিত্ব থাকবে আমাদের দেশে। কাজেই আমাদের "ভাল ভাবে বেঁচে থাকার জন্য" এই সব ধনীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু তার আগে এই জাতীয় ধনীদের চোখ কি ফুটবে না ? তারা কি এখনও বুঝবে না দেশের কি সর্ব্বনাশ করেছে, করছে তারা ?—যার প্রায়শ্চিত্ত যুগ যুগ ধরে করে গেলেও তাদের এ কলঙ্ক কখনও মোচন হবে না।

"কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে শূন্যতল।
কোন্ অন্ধ কারা-মাঝে জর্জ্জর বন্ধনে অনাথিনী মাগিছে সহায়।
স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি'
করিতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া।
বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার।
সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস লুকাইছে ছদ্মবেশে।"

—এই ক্রন্দনের অবসান, এই অবিচারের বিচার কখনও হবে কি ? এই অবসান ঘটানর জন্য, অবিচারের বিচারের জন্যই কি আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম নয় ? শুধু এই প্রশ্নই বার বার মনে জাগে।

চরকা কাটলে স্বাধীনতা আসবে কি না, আমরা গরুর গাড়ীর যুগে চলে যেতে চাই কি না, সে কথা আর আমি তুলতে চাই না। তবে পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, ফাঁকি দিয়ে, ফাঁকা বক্তৃতা দিয়ে আর স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলবে না। দেশের উপযুক্ত শিক্ষা প্রয়োজন, যাতে আমরা সবাই স্বাধীনতা জিনিষটার যথার্থতা বুঝে নিতে পারি, স্বাধীনতার নামে লোভে ও স্বেচ্ছাচারিতায় দেশ না ভেসে যায়। ভাল ভাবে বেঁচে থাকার উপযুক্ত শিক্ষা যেন পাই। কথার চাইতে কাজেরই বেশী প্রয়োজন। তাই আসুন, আমরা ক্রিয়াশূন্য কথার জাল বুনানো ছেড়ে যথাসাধ্য কাজে লেগে যাই।

চিতা

শামসুদ্দীন

মুছিয়াছ আঁখি-নীর মরণের পথে
চলিয়াছ ঝটিকার সাথে ; পিছু পানে

স্বর্ণ-সিন্ধু ডাকিয়াছে ; অরুণিমা রথে
ছুটিয়াছ, দেখ নাই কী যে ব্যথা হানে!
ঘৃণা-ভরে চলিয়াছ পথের ধুলায়
ফেলি তারে—যে তোমারে বাসিয়াছে ভাল ;
কাঞ্চন দেখিলে শুধু রাতের তারায়।
সোনালী ধানের ক্ষেতে তাই অগ্নি জ্বাল।

দেখ না কি : রাজপথে কাঁদে নর-নারী
সজীব কংকাল সাথে শিশু কেঁদে যায় ;
পথ-প্রান্তে পরমায়ু দেখে অনাহারী
গলিত মাংসের স্তূপে দিবস-নিশায়।
আর নহে অগ্রসর, হে আমার মিতা,
কেমনে নিভাবে বল আপনার চিতা ?

—বাল্মীকি ও কালিদাস—

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ যোগের আর একটি অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাই 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে। রাজা পুরূরবার প্রিয়তমা উর্বশী পার্বত্যবন-প্রদেশে লতারূপে পরিণত হইয়াছে, পুরূরবা বিরহে উন্মত্ত হইয়া সেই পার্বত্য বনদেশে তাহার প্রিয়ার সন্ধান করিতেছে। অঙ্কটির আরম্ভেই দেখিতে পাই, উর্বশী-সখী চিত্রলেখা সহচরী উর্বশীর বিরহে কাতর হইয়া দ্বিপদিকা তাললয়ে গান ধরিয়াছে—

সহঅরিদুক্খালিদ্ধঅং সরবরঅম্মি সিণিদ্ধঅম্।
বাহোবগ্গিঅণঅণঅং তম্মই হংসীজুঅলঅম্॥

'সহচরী দুঃখে কাতর বাষ্পাচ্ছাদিতনয়ন স্নিগ্ধ হংসীযুগল আজ সরোবরে তাপ ভোগ করিতেছে।' এখানে চিত্রলেখা এবং সহজন্যাই সরোবরের স্নিগ্ধ হংসীযুগল, সহচরী উর্বশীর বিরহে তাহারা কাতর। আর তাহার পরে দেখিতে পাই, তাহারা যখন পুনরায় উর্বশীর সহিত দর্শনের আশা পাইল তখন—

চিন্তাদুম্মিঅমাণসিআ সহঅরিদংসণলালসিআ।
বিঅসিঅকমল-মণোহরএ বিহরই হংসী সরবরএ॥

'সতত চিন্তায় ব্যাকুলমানসা হংসী সহচরীর দর্শন-লালসায় বিকসিত-কমল-মনোহর সরোবরে বিহার করিতেছে।' তাহার পর যখন আকাশে বদ্ধদৃষ্টি বিরহোন্মত্ত রাজা পুরূরবা প্রবেশ করিল তখন—

হিঅআহিঅপিঅদুক্খও সরবরএ ধুঅপক্খও।
বাহ বগ্গিঅ-ণঅণও তম্মই হংসজুআণও॥

'হৃদয়ভরা প্রিয়াদুঃখ, বাষ্পাকুলনয়নে হংসযুবা সরোবরে ডানা ঝাপটায় আর ক্লেশ ভোগ করে!' এই প্রিয়াদুঃখকাতর বাষ্পাকুলনয়ন হংসযুবা পুরূরবা। এই গানগুলিকে কবি এমন ভাবে সমস্ত অঙ্কটির মাঝে মাঝে ভরিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা একটি নৈপথ্য-সঙ্গীতের সুরের জালে যেন অতিসূক্ষ্ম এবং মোহময় একটি যবনিকার সৃষ্টি করিয়াছে; সে যবনিকার এক দিকে রহিয়াছে মানুষের জীবন-লীলা, অন্য দিকে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণলীলা; বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত নদ-নদী, তরু-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতির প্রাণ-লীলার বিরাট পটভূমিতেই কবি দেখিতে চাহিয়াছেন মানুষের জীবনের সকল সুখ-দুঃখকে। তাই দেখিতে পাই, কবি পুরূরবার বিরহ-দশার আর একটু বর্ণনা দিয়াই আবার নৈপথ্য-সঙ্গীতের সুর তুলিয়াছেন,—

দইআরহিও অহিঅং দুহিও বিরহাণুগও পরিমন্থরও।
গিরিকাণণএ কুসুমুজ্জলএ গঅজূহবঈ উঅ ঝীণগঈ॥

'দয়িতারহিত অধিক দুঃখিত বিরহানুগত এবং একান্ত মন্থর গজযূথপতি কুসুমোজ্জ্বল কাননে আজ অতীব হীনগতি।' কবি মানুষের প্রণয়কাতর জীবনকে একটু একটু করিয়া রঙ্গমঞ্চে আনিয়াছেন আর ক্ষণে-ক্ষণে এই গানগুলি দ্বারা মানব-জীবনের চারি দিকে বিরাট পটভূমির মত বিশ্বজীবনের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই পটভূমিকা রচনার ফলে বিরহী রাজার বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যে যোগ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা একটা কবিকল্পনামাত্র না হইয়া গভীর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বর্ষার জলস্পর্শে মলিনগর্ভ আরক্ত নবকন্দলী কুসুমগুলি কোপহেতু অন্তর্বাষ্প-আরক্তিম প্রিয়ানয়ন দু'টির কথাই বিরহী রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ইন্দ্রগোপ কীটের সহিত অচিরোদ্গত ঘাসগুলি দেখিয়া মনে হইয়াছে, প্রিয়া রোষ-বশে চলিয়া যাওয়ায় তাহার শুকোদরশ্যাম স্তনাংশুক পড়িয়া আছে, চোখের জল অধররাগের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্তনাংশুকে লাল লাল বিন্দু ধারণ করিয়াছে। নৃত্যতৎপর ময়ূরকে দেখিয়া রাজা প্রশ্ন করিয়াছিল—

বরহিণপবর ভ! পই অব্ভত্থেমি, আঅক্খ হি মে তা।
এত্থ অরণ্ণে ভমন্তে জই পই দিট্ঠা সা মহ কন্তা॥

'হে ময়ূররাজ, তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি; এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি যদি আমার কান্তাকে দেখিয়া থাক তবে আমাকে তাহা বল।' কাননের পরভৃতিকাকে ডাকিয়াও রাজা জিজ্ঞাসা করিল—

পরহুঅ! মহুরপলাবিণি কন্তী ণন্দণবণ-সচ্ছন্দ-ভমন্তী।
জই পই পিঅঅম সা মহ দিট্ঠা তা আঅক্খহি মহু পরপুট্ঠা॥

'হে মধুরপ্রলাপিনি কান্তা পরভৃতবধূ, নন্দনবনে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি আমার সেই প্রিয়তমাকে তুমি দেখিয়া থাক তবে আমাকে তাহা বল।' এমনি করিয়া মানস-গামী রাজহংসদিগকে ডাকিয়া রাজা প্রিয়ার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছে, গোরোচনা-কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাকের নিকট, করিণীসহায় নাগাধিরাজের নিকট, স্ফটিকশিলাতল নির্মল নির্ঝরশালী পর্বতের নিকট প্রিয়ার বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। প্রিয়া-বিরহের গভীরতা তাহার চোখের সম্মুখ হইতে জড় ও চেতনের ভেদের পর্দাখানি সরাইয়া দিয়াছে। তাহার পরে বেগে ধাবমানা নদীকে দেখিয়া মনে হইয়াছে—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা বিদ্ধং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা॥

রাজার মনে হইল, নিশ্চয়ই সেই অসহিষ্ণু প্রিয়া আজ এই নদী-ভাবে পরিণতা; তরঙ্গ তাহার ভ্রূভঙ্গ, ক্ষুভিত বিহগশ্রেণী তাহার মেখলা, ফেনপুঞ্জ তাহার রোষশিথিল বসন—স্খলিত বসন যেন বার বার টানিয়া চলিতেছে; আর রোষাবেগে যেন বার বার হোঁচট খাইয়া বক্রগতিতে চলিয়াছে।—কিন্তু ইহার কোথায়ও প্রিয়ার সন্ধান না পাইয়া সর্বশেষে একটি বনলতাকে দেখিয়া রাজার মনে হইল, তাহার অভিমানিনী প্রিয়া নিশ্চয়ই ঐ পার্বত্য বনলতায় পরিণত হইয়াছে।

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্ বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্গমা।
চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপ্যেব সা॥

মেঘজলসম্পাতে ধৌতপল্লবা তন্বী এই লতা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অধরপল্লব বিধৌত করিয়াছে; অকালে পুষ্পোদ্গম বন্ধ হওয়ায় যেন আভরণশূন্যা, ভ্রমরের শব্দহীন বলিয়া সে যেন চিন্তামৌন হইয়া আছে, মনে হয়, পাদপতিত আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই সততকোপনা প্রিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে।—এই বলিয়া বিরহী রাজা বনলতাকে আলিঙ্গন করাতে সেই বনলতাই উর্বশী মূর্তিতে রাজার বাহুডোরে ধরা দিল। উর্বশীর এই লতারূপে পরিণতি এবং বনলতার পুনরায় উর্বশী মূর্তিতে পরিণতির ভিতরে কবি কিছু অলৌকিকতার আমদানী করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিকতার যাথার্থ হইতে এখানে

কাব্যধ্বনিই প্রধান এবং অধিক মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত গভীর আত্মীয়তায় চেতন-অচেতনের অদ্বয়ত্বই এখানে কাব্য-ধ্বনি,—উহাই কালিদাসের অন্তর্লব্ধ বাণী।

কালিদাসের মেঘদূতের ভিতরে—বিশেষ করিয়া 'পূর্বমেঘে' এই কবিদৃষ্টির একটি বিচিত্র পরিণতি দেখিতে পাই। কবি এখানে 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা' বিরহী যক্ষের ভূমিকায় আষাঢ়ের প্রথম দিনে পর্বতের সানুদেশে বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ মেঘকে দেখিয়া অন্তর্বাষ্প হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য দ্বারা তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণ জানাইয়া রামগিরি পর্বত হইতে অলকাপুরীতে তাঁহার কল্পিত প্রিয়ার নিকট দূত পাঠাইবার প্রস্তাব জানাইলেন। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দর্শনে এই অন্তর্বাষ্পত্ব সম্বন্ধে কবি অবশ্য একটা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ-
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

এবং 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুত্'ের সন্নিপাতে গঠিত মেঘকে কেন দূত করিয়া পাঠাইতেছেন তাহার জবাব দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

বিরহী ব্যক্তির চেতন এবং অচেতনে কোন ভেদ থাকে না। আসলে কবির এই সকল জবাবদিহী অ-সহৃদয় এবং অরসিক পাঠকের জন্য। কালিদাসের বাসনা-লোকে বিশ্বজীবনের এক ছন্দে চেতন এবং অচেতন পরস্পরে মেশামিশি করিয়া এক হইয়া আছে,—সমস্ত পূর্বমেঘের ভিতরেই রহিয়াছে এই চেতন-অচেতনের যৌথলীলা। রামগিরি হইতে কৈলাস শিখরের অঙ্কে অবস্থিত অলকাপুরী পর্যন্ত পল্লী-নগরী, নদ-নদী, বন-উপবন, সমতলক্ষেত্র এবং পর্বতরাজি-সমন্বিত যে একটা বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ রহিয়াছে, আষাঢ়ের গতিশীল মেঘকে বাহন করিয়া সেই বিচিত্র ভূমিভাগের উপর দিয়া কবি তাঁহার সজাগ মনটিকে একবার ঘুরাইয়া আনিয়াছেন। মেঘাশ্রয়ে কবিমন দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পৃথিবী হইতে একটু ঊর্ধ্বে উঠিয়া আশে-পাশে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছেন,—সে চোখে বিরহের বাষ্পাবরণ কম—মিলন-বিচ্ছেদে বিচিত্র প্রেমের সুনিপুণ অঞ্জনরেখাই স্পষ্ট। এই বিস্তীর্ণ ভূমিভাগের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কবি যাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহার সকল দৃশ্য ও ঘটনা মিলিয়া মিশিয়া একটি অখণ্ড প্রেম লীলার ঐকতানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই প্রেম-লীলার ভিতরে প্রকৃতির কোন অংশটাই স্থাবর নয়, আবার একান্ত ভাবে স্থাবর-বিলক্ষণ জঙ্গমও নয়; কোন অংশই যেমন সম্পূর্ণভাবে অচেতন নয়, ঠিক তেমনই আবার মনে হয়, চেতন অংশটাও যেন অতি উগ্র ভাবে অচেতন-বিলক্ষণ চেতন নহে।

আষাঢ়ের নবীন মেঘকে দেখিয়া প্রিয়াগমনের প্রত্যয়বশতঃ যে পথিকবনিতাগণ উদ্‌গৃহীতালকান্তা হইয়া ঊর্ধ্বে তাকাইবে, অনুকূল বাতাসে মন্দ আন্দোলিত মেঘের বামে থাকিয়া যে চাতকগুলি মধুর রব করিবে, গর্ভাধান-ক্ষণপরিচয় বশতঃ যে আবদ্ধমালা বলাকাশ্রেণী নয়ন-সুভগ মেঘের সেবা করিবে, মেঘের শ্রবণ-সুভগ যে রবে ধরণী শস্যশ্যামলা হইয়া ওঠে সেই রব শুনিয়া মানসসরোবর গমনে উৎসুক যে রাজহংসগুলি খণ্ড খণ্ড মৃণালের পাথেয় লইয়া কৈলাসপর্বত পর্যন্ত মেঘের সঙ্গী হইবে, চিরসুহৃদের ন্যায় দীর্ঘবিরহান্তে যে চিত্রকূট-পর্বত উষ্ণবাষ্প মোচন করিয়া মেঘের প্রতি স্নেহ ব্যক্ত করিবে, পবন গিরিশৃঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে না কি, এই কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া যে সিদ্ধাঙ্গনাগণ মেঘের দিকে ভীত নয়নে তাকাইবে, ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ যে জনপদবধূগণ তাহাদের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দ্বারা মেঘকে পান করিবে, তাহাদের ভিতরে বিজাতীয়ত্বের স্পষ্ট ভেদরেখা কোথায়? মেঘবর্ষণে প্রশমিতদাবাগ্নি সেই সানুমান্ আম্রকূট,. কর্কশ হস্তীর গাত্রে শোভিত রেখা-বিন্যাসের ন্যায় বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা উপলবিষমা বিশীর্ণা রেবানদী, সেই অর্ধসমুৎপন্ন কেশরসমূহে হরিৎ ও কপিশবর্ণ কদম্বপুষ্পের দর্শনে উৎফুল্ল এবং ভূমিকদলীর প্রথমোৎপন্ন মুকুল ভক্ষণ করিয়া বনভূমির মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছে যে হরিণগুলি, স্বাগতস্তবকারী শুক্লাপাঙ্গ সজলনয়ন কেকাগুলি, সেই দশার্ণদেশ—যেখানে কেতকীপুষ্পে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে উপবনের বেড়াগুলি,—যেখানে গৃহবলিভুক্ পাখিগণের নীড়নির্মাণ-কোলাহলে আকুল হইয়া উঠিয়াছে গ্রাম-পথের বৃক্ষগুলি—যে দেশ বর্ষাগমে পরিণত ফল শ্যামজম্বুতে বনান্ত ভরিয়া গিয়াছে,—সেই বেত্রবতী নদীর চলোর্মি সভ্রূভঙ্গ মুখ,—সেই নবজলকণায় বননদীতীরে জাত যূথিকাকলিকা—সেই যূথিকালাবী নারীগণ—কপোলের ঘাম মুছিতে গিয়া যাহাদের কর্ণোৎপল মলিন হইয়া গিয়াছে—আর সেই উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিত লোলাপাঙ্গ নয়নের দৃষ্টি—সকল মিলিয়া যেন একটা অদ্ভুত 'সঙ্গতে'র সৃষ্টি করিয়াছে। এখানেও কবি বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দিকে দেখিয়াছেন যে, বিরহ-মিলন-মধুর প্রেমলীলা তাহাই যেন মানুষের সকল সম্ভোগ বিপ্রলম্ভের একটা বিরাট পটভূমিকা বা নেপথ্য-সঙ্গীতের মত দাঁড়াইয়া আছে; এই নেপথ্য-সঙ্গীতের সহিত মানুষের জীবন-সঙ্গীত মিশিয়া গিয়া একটা অখণ্ড আস্বাদনের সৃষ্টি করিয়াছে।

কালিদাসের এই কবিমানসের পশ্চাতে কবিগুরু বাল্মীকির দানকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। কালিদাসের কাব্যসাধনা এখানে বাল্মীকির কাব্যসাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়; তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা উচিত, বাল্মীকির সাধন-ফল পরবর্তী কালের জন্য আপনার ভিতরে যে বীজ গড়িয়া তুলিয়াছিল কালিদাস সেই বীজে অনেক নূতন ফুল এবং ফল ধরাইয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের গভীর যোগ আবিষ্কৃত হইলেও কালিদাসের প্রতিভা-বৈশিষ্ট্য সেই কারণেই অম্লান থাকে। বাল্মীকিতে যে কথার আভাস রহিয়াছে—কালিদাস তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিতে তাহাকে স্থানে স্থানে আরও নিবিড় করিয়া তুলিয়াছেন।

বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরে স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতনের ভিতরে যে মিলন দেখিতে পাই আমরা কালিদাসের কাব্যে, সেই সত্যটিকে পাঠকের নিকটে একটি রসস্বরূপ কাব্য সত্য করিয়া তুলিতে হইয়াছে কবিকে তাঁহার নিপুণ সৃষ্টি-কৌশলের দ্বারা। প্রতিভাবলে কবি এমন একটি স্বতন্ত্র মোহময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, যেখানে একবার প্রবেশ করিলে পাঠক কবির বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু বাল্মীকির সমস্ত কাব্যে ছড়াইয়া আছে এই সত্যটি একটি আদিম বিশ্বাসের রূপে। সে বিশ্বাসকে কবি এমন সহজ ভাবে আনিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের আদিম বিশ্বাস উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সকল সংশয় নিরসন করে;

কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে আমরা দেখিয়াছি, উমা হিমালয় পর্বতের দুহিতা। রামায়ণের ভিতরেও দেখিতে পাই, ধাতু সকলের আকর শৈলেন্দ্র হিমালয়ের স্ত্রী মেরুদুহিতা মেনা; তাহাদের দুইটি কন্যা,—জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা উমা। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে হিমালয় দেবগণের অনুরোধে ত্রিলোকের হিতের জন্য ত্রিপথগা করিয়া পাঠাইয়াছেন; আর কনিষ্ঠা উমা উগ্র ব্রত অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যা আচরণ করিয়াছিল; সেই তপস্বিনী কন্যাকে হিমালয় রুদ্র মহেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।—

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি॥
যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া॥
তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব।
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্য্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্॥
দদৌ ধর্মেণ হিমবান্ তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া॥
... ...
যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥

(বা—৩৫।১৩-১৭, ১৯-২০)

কবিগুরু এখানে গঙ্গাকে উমার সহোদরা করিয়া হিমালয়ের সহিত উমার দুহিতৃসম্বন্ধকে আরও সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। গঙ্গার শিবের মস্তকে পতন সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে,—

হিমবৎ-প্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে। (বা—৪৩,৮)

ধরণীর বুক হইতে সীতার উৎপত্তিকে কবিগুরু অতিবাস্তব রূপ দিয়াছেন একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়।—

উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ॥

হলক্ষতমুখে শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া মাটির পৃথিবীর যে কন্যার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার সমস্ত অঙ্গে কীর্ণ রহিয়াছিল ক্ষেত্রের ধূলিকণা; মাটির মেয়ের অঙ্গে সেই ধূলিকণা দেখা দিয়াছিল শিশু-অঙ্গে বিচ্ছুরিত পদ্মরেণুর মত; আর-এই ধূলি-ভূষণের ভিতরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল একটা মঙ্গলের দীপ্তি, তাই 'শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ।' বাল্মীকির পূর্বে এবং পরে ক্ষেত্রের ধূলিকে এমনতর 'পদ্মরেণুনিভ' করিয়া আর কেহ কোথায়ও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; এক দিকে এই পদ্মরেণুনিভ শুভ কেদারপাংশু যেমন সীতার দেহশ্রীকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে ইহার ভিতর দিয়া মাটির ধরণীর সহিত সীতার যোগও অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। বনে ঋষিপত্নীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে গিয়াও সীতা বলিয়াছিল—

তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্।
অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা॥
স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ।
পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোঽভবৎ।

(অ—১১৮।২৮-২৯)

সীতা যখন প্রথম ক্ষেত্র হইতে আবির্ভূতা হয় তখন সে ছিল পাংশু-গুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী—তাহাকে দেখিয়া জাগিয়াছিল লাঙ্গলহস্ত জনকরাজার পরম বিস্ময়।

রামায়ণের আরম্ভে দেখিতে পাই পতিবিয়োগে ক্রৌঞ্চী 'রুরাব করুণং গিরম্'; এইখান হইতেই রামায়ণ-কাব্যের অনুপ্রেরণা। ক্রৌঞ্চীর এই করুণ ক্রন্দন যে রামায়ণ-কাব্যের প্রেরণা যোগাইল তাহার কারণ এই, পতিবিরহিত সীতাকেও বাল্মীকি অসহায়া কুররীর মত করুণ-ক্রন্দনরতা দেখিয়াছিলেন। এক কুররীর ক্রন্দন অপর কুররীর ক্রন্দনের জন্য কবিচিত্তকে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল। বাল্মীকি বিগ্না সীতাকে বহু স্থানেই 'কুররীব দীনা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (অরণ্য—৬৩।১১, কি—১১।২৮)। কালিদাসও সীতাকে বিগ্না কুররী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (রঘু ১৪।৬৮) এবং কালিদাসের বর্ণনায় দেখি, এই বিগ্না কুররীর সঙ্গে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী বিজন বনে দেখা হইয়াছিল সেই করুণহৃদয় মহাপ্রাণ কবির

নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ
শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শ্লোকঃ। (রঘু—১৪।৭০)

নিষাদের শরবিদ্ধ বক্ষবিহঙ্গকে অবলম্বন করিয়া যাঁহার শোক এক দিন শ্লোকত্ব লাভ করিয়াছিল।

কালিদাসের রঘুবংশে দেখিতে পাই, লক্ষ্মণের মুখে সীতা যখন তাহার নির্বাসনের কথা শুনিয়াছিল তখন ধরণীদুহিতা সীতা একটি বনলতার ন্যায়ই ধরণীমায়ের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।—

ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা—
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম॥

হঠাৎ প্রবল বাত্যার আঘাতে লতা যেমন তাহার ফুলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া পড়ে, সীতাও সেইরূপ বিপদ্ ও অপমান-বাত্যায় আহত হইয়া আভরণের কুসুমগুলি ছড়াইয়া দিয়া নিজের জন্মদাত্রী ধরণীর বক্ষেই লুটাইয়া পড়িল।

বাল্মীকিও বিপদ্ ও অপমানে আহতা সীতাকে 'গজেন্দ্রহস্তাবহৃতা বল্লরী' বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (সুন্দর—১৫।২৪)*

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ যখন সীতাকে নির্বাসিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে তখন—

---

* আরও তুলনীয়—

নষ্টেব সীতাং পরমাতিজাতাং
পথিস্থিতে রাজকুলে প্রজাতাম্।
লতাং প্রফুল্লামিব সাধুজাতাং
দদর্শ তন্বী মনসাভিজাতাম্। (সুন্দর—৫।২৩)

তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং
রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারা-
চ্চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ। (রঘু, ১৪।৬৮)

আর বিগ্না কুররী সীতার আর্ত্তক্রন্দন শুনিয়া মাতা ধরণীর বন-বক্ষও বেদনায় বিমথিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই—

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবম্
অত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি।

ময়ূর তাহার নৃত্য পরিত্যাগ করিল—বৃক্ষগুলি ফুল ঝরাইয়া দিতে লাগিল, হরিণগুলি কবলিত কুশগুচ্ছ পরিত্যাগ করিল; এইরূপে সমস্ত বনস্থলী সীতার দুঃখে সমদুঃখভাব প্রাপ্ত হইলে সেই বনে অত্যন্ত রোদনধ্বনি জাগিয়াছিল। শকুন্তলা যেদিন আশ্রম-পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছিল সেদিন শকুন্তলাও যেমন আশ্রম-বিরহে ব্যথাতুর হইয়া উঠিয়াছিল, সমগ্র বন-আশ্রমও তেমনি শকুন্তলা-বিরহে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলিয়াছিল,—

ণ কেবলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এব্ব। তুএ
উবট্ঠিদবিওঅস্স তবোবণস্স বি অবত্থং পেক্খ দাব।—
উগ্গলিঅদব্ভকবলা মিঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও।

সখীই যে কেবল তপোবন-বিরহকাতরা তাহা নহে, তোমার বিয়োগকাল উপস্থিত বলিয়া তপোবনের অবস্থাও দেখ;—মৃগী তাহার কবলিত কুশগুচ্ছ মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়াছে, ময়ূরী তাহার নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, পাণ্ডুপত্র ঝরাইয়া দিয়া লতা যেন অশ্রু মোচন করিতেছে।

মানুষের সহিত আরণ্য প্রকৃতির এই সমবেদনা যেমন কালিদাসের কাব্যের সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়, বাল্মীকির রামায়ণের সর্ব্বত্রও আমরা এই সমবেদনা লক্ষ্য করিতে পারি। রাম কর্তৃক নির্বাসিতা সীতার বর্ণনায় বাল্মীকি বলিয়াছেন—

দূরস্থং রথমালোক্য লক্ষ্মণং চ মুহুর্মুহুঃ।
নিরীক্ষমাণাং তুদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ।

তখন— সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী
যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী।
রুরোদ সা বর্হিণনাদিতে বনে
মহাস্বনং দুঃখপরায়ণা সতী।

এখানেও দেখিতে পাই, দুঃখভারাবনতা সতী যখন একান্ত অসহায় ভাবে বনে মহাস্বন তুলিয়া রোদন করিয়াছিল, তখন বনস্থলীও বর্হিনাদের দ্বারা সীতার সহিত সমভাবে রোদন করিয়াছিল। শুধু এইখানেই নহে, রামায়ণের বহু স্থানে রাম ও সীতার সহিত আরণ্য প্রকৃতির যোগ অতি অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণ ও সীতাসহ অযোধ্যাপুরী ত্যাগ করিয়া বনে রওনা হইল, তখন সমস্ত প্রজাবর্গ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহাদিগকে বনে গমনে বাধা দিতে লাগিল। তাঁহাদের ভিতরে—

তে দ্বিজাস্ত্রিবিধং বৃদ্ধা জ্ঞানেন বয়সৌজসা।
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ।
বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমা।
নিবর্ত্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্ত্তরি। (অযো- ৪৫।১৩-১৪)

জ্ঞান, বয়স এবং তপোবল এই ত্রিবিধভাবে বৃদ্ধ দ্বিজগণ—বয়সের জন্য যাঁহাদের শির কম্পিত হইতেছে—তাঁহারা দূর হইতে রথের অশ্বগুলিকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন—'তোমরা বনগমনে নিবৃত্ত হও—বনে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই—তোমরা তোমাদের প্রভুর হিত কর।' রামচন্দ্র এইরূপ অতি দ্বিজবৃদ্ধগণকে প্রলাপ করিতে দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক পায়ে হাঁটিয়াই বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে দ্বিজবৃদ্ধগণ তখনও ডাকিয়া বলিতেছেন—

যাচিতো নো নিবর্ত্তস্ব হংসশুক্লশিরোরুহৈঃ।
শিরোভির্নিভৃতাচার মহীপতনপাংশুলৈঃ। (ঐ ৪৫।২৭)

হে নিশ্চলধর্মাচারী রাম, আমরা আমাদের হংসশুক্লকেশপূর্ণ মস্তককে ভূমিপতন দ্বারা ধূলিপূর্ণ করিয়া তোমার নিবর্ত্তন যাচ্ঞা করিয়াছি,—তুমি ফেরো।'

দ্বিজ বৃদ্ধগণ কাতর স্বরে আরও বলিতে লাগিলেন,—'শুধু আমরাই যে তোমাকে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছি তাহা নহে; ঐ দেখ—

অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ।
নিশ্চিষ্টাহারসঞ্চারা বৃক্ষৈকস্থাননিশ্চিতাঃ।
পক্ষিণোঽপি প্রযাচন্তে সর্ব্বভূতানুকম্পনম্। (ঐ ৪৫।৩০-৩১)

'ঐ দেখ মূলের দ্বারা উদ্ধতবেগ উন্নত পাদপগুলি তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়া বায়ুবেগে তাহাদের বিক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। পক্ষীগুলি আহারান্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া গতিরহিতভাবে বৃক্ষের এক স্থানে নিশ্চল হইয়া তোমার নিকট সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা প্রার্থনা করিতেছে।' দ্বিজগণ যখন রামের নিবর্ত্তনের জন্য এইরূপে আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তমসা নদীও তাহার জলপ্রবাহ দ্বারা রামচন্দ্রকে বনগমনে বারণ করিয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।— "

এবং বিক্রোশতাং তেষাং দ্বিজাতীনাং নিবর্ত্তনে।
দদৃশে তমসা তত্র বারয়ন্তীব রাঘবম্। (ঐ ৪৫।৩২

রাম বনে চলিয়া গেলে বিরহ-অযোধ্যাবাসী এই বলিয়া মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল—

শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্বতাঃ।
কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽনুগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্ত্যনর্চিতুম্।
বিচিত্রকুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিধারিণঃ।

—চিরদিনের—

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এখানে বৃষ্টি-মুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই তবু এখানে যে পথ হাঁটা।

জোড়া দীঘি, তার পাড়েতে তালের সারি
দূরে বাঁশ-ঝাড়ে আত্মদানের সাড়া,
পচা জল আর মশায় অহংকারী
নীরব এখানে অমর কিষাণ-পাড়া।

এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস
এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।

রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য-শাঁখে
কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখানে জড়ো করে জনমত।

দুর্ভিক্ষের আঁচড় জড়ানো গায়ে,
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।

রাত্রি হ'লেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে,
কেমন করে সে আকালেতে গত বারে
চ'লে গেলো লোক দিশাহারা দিকে দিকে।

এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতী তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কাণে
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।

হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ সে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে,
সবুজ ফসলে সুবর্ণ আসে॥

—নব মেঘদূত—

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

আরো কেউ কেউ আছে—
যারা চেনে মেঘ।
আরেক নোতুন সুরে হাওয়া এলে গাছে
তারা না কি চেনে সেই হাওয়ারো আবেগ।

দুরন্ত মেঘের রাতে তারা না কি জেগে থাকে ঠায়:
মেঘ দেখে তারা নাকি ঘুম ভুলে যায়:
ঝড়ের গোঙানি শুনে, বৃষ্টির ফোঁটা গুণে
পড়ন্ত বেলার মত কাঁপে জানলায়!
মেঘে বুঝি চিরকাল:
ঝড়ে বুঝি চিরকাল:
তারা গলে যায়।

সে' সব প্রাণের কান্না শুনেছে কি কেউ?
সে' সব প্রাণের বৃষ্টি দেখেছে কি কেউ?
কারো প্রাণে দিতে তারা পেরেছে কি ঢেউ?

সেই সব মুঠো মুঠো প্রাণ:
সেই সব কাঁচা কাঁচা প্রাণ:
যাদের নীড়ের স্বপ্ন মুছে মুছে যায়—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে যারা শুধু ক'রে ক'রে যায়—
খড়ের মতন আর, কুটোর মতন আর
ভেসে ভেসে যায়—
ঝড় দেখে, মেঘ দেখে, আকাশে প্রণাম রেখে
যারা শুধু চ'লে চ'লে যায়!

তাদের প্রাণের কান্না শুনেছে কি কেউ?
তাদের প্রাণের বৃষ্টি শুনেছে কি কেউ?
ঝোড়ো রাতে কখনো কি জেনেছে' তাদের?
প্রাণের কাছেতে প্রাণ এনেছে তাদের?

সেই সব কত যখ:
সেই সব লাখো যখ:
যারা আছে ঘিরে—
ব্রহ্মপুত্র, দামোদর, অজয়ের তীরে!

অকালে চাপি মুখ্যাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্গিরয়ো রামমাগতম্।
প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্।
পাদপাঃ পর্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্।

(ঐ—৪৮।১০-১৫

'রম্যকাননে অটবী সমূহ, গভীর স্রোতস্বিনী এবং সানুমন্ত পর্বত রামচন্দ্রের পোভাসম্পাদন করিবে। কাননে বা শৈলে যেখানেই রাম গমন করিবে সেইখানেই প্রিয় অতিথিকে পাইলে যেরূপ অর্চনা না করিয়া পারা যায় না, সেইরূপ তাহারা রামকে অর্চনা না করিয়া পারিবে না। বহু মঞ্জরীধারী ভ্রমরশালী বৃক্ষগুলি রামচন্দ্রকে বিচিত্র কুসুমের শিরোভূষণ দেখাইবে। পর্বতগুলি সহানুভূতির আতিশয্যে অতিথি রামকে অকালেই মুখ্য মুখ্য ফুল এবং ফল দেখাইবে; বহু বিচিত্র বিবিধ নির্ঝরগুলি দেখাইতে দেখাইতে পর্বতগুলি বিমল সলিল প্রস্রবণ করিতে থাকিবে; পর্বতের অগ্রস্থিত বৃক্ষগুলি রামকে আনন্দ দিতে থাকিবে।

[ক্রমশঃ

মহামুনি-শ্রীভরত-কৃত

নাট্যশাস্ত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

৫

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

মূল :—চতুঃস্তম্ভযুক্ত, রঙ্গপীঠ প্রমাণানুযায়ী সার্দ্ধ-হস্ত উচ্চ মত্তবারণী কর্ত্তব্য ।৭০।

সঙ্কেত :—এই প্রসঙ্গে অভিনব স্তম্ভ-সন্নিবেশ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা অতি অস্পষ্ট। হয়ত মুদ্রিত পুস্তকের ভাষায় দোষ আছে—এ কারণে পঙ্‌ক্তিগুলি দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেবল লেখকের বা মুদ্রিত সংস্করণের দোষ দিলেও চলিবে না। কোথায় কিরূপে স্তম্ভ-নিবেশ করিতে হইবে, সে বিষয়ের সাম্প্রদায়িক জ্ঞান বর্ত্তমানে আমাদিগের না থাকাতেই এই জটিলতা ও দুর্ব্বোধ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। যতদূর সম্ভব, অর্থ উদ্ধারে আমরা চেষ্টা করিব—ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা প্রতি পদেই রহিল।

মত্তবারণী দুইটি—রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে। অভিনবের পঙ্‌ক্তি হইতে মনে হয়—প্রত্যেকটি মত্তবারণীর চারিটি করিয়া স্তম্ভ। স্তম্ভ চারিটি মণ্ডপের (অর্থাৎ রঙ্গপীঠের) বাহিরের দিকে স্থাপিত অর্থাৎ মণ্ডপক্ষেত্রের বাহির দিকে ভিত্তি-বিভাগের সীমানায় উপরে দুইটি স্তম্ভ। 'মণ্ডপক্ষেত্র' বলিতে বুঝায় রঙ্গপীঠাতিরিক্ত স্থান—রঙ্গপীঠের পশ্চাতে যাহা অবস্থিত। ঐ মণ্ডপক্ষেত্রের বাহিরের দিকে—পীঠ-ভিত্তি-বিভাগের সীমানার উপরে দুইটি স্তম্ভ স্থাপনীয়। উক্ত ভিত্তির (পীঠভিত্তির) বাহিরের দিকে—পরস্পর অষ্ট হস্ত অন্তর—আর পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভদ্বয় হইতেও অষ্ট হস্ত অন্তর—আর দুইটি স্তম্ভ স্থাপনীয়। তাহা হইলে ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে—চারিটি স্তম্ভের প্রত্যেকটি পরস্পর অষ্ট হস্ত অন্তরে স্থাপিত হইল। অতএব, মত্তবারণীর বিস্তারও হইল—অষ্টহস্ত, আর উহা সমচতুরস্র। রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে দুইটি মত্তবারণী—এই দুইটিই পীঠপার্শ্বে খোলা বারান্দা বা তৎকালীন রঙ্গপীঠ-পক্ষের (wings) কার্য্য করিত। রঙ্গপীঠ হইত বিকৃষ্টাকৃতি—উহার দুই দিক্ ষোড়শহস্ত পরিমাণ আর দুই দিক্ অষ্ট হস্ত। কোন্ দিক্‌কে দৈর্ঘ্য, আর কোন্ দিক্‌কে বা বিস্তার ধরা যাইবে—সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন—দৈর্ঘ্য আট হস্ত, আর বিস্তার ষোড়শ হস্ত। যাঁহারা দৈর্ঘ্যকে বিস্তার অপেক্ষা অল্প বলিয়া স্বীকারে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগের মতে—দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উল্‌টাইয়া ধরিতে হইবে—অর্থাৎ যে দিক্ ষোড়শহস্ত তাহাই দৈর্ঘ্য, আর যে দিক্ অষ্ট হস্ত তাহাই বিস্তার। পক্ষান্তরে, যাঁহারা বলেন যে আয়াম (অর্থাৎ বিস্তৃতিই) পরিমাণের নির্দ্দেশক তাঁহারা দৈর্ঘ্যকে অষ্টহস্ত ও বিস্তার ষোড়শ হস্ত ধরিয়া থাকেন। মোটের উপর পারিভাষিক দৈর্ঘ্য বা বিস্তার যে দিক্‌কেই ধরা হউক না কেন, আসলে রঙ্গপীঠের পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। উহা ১৬ হাত × ৮ হাত—এই পরিমাণ থাকিয়া যায়—আর তাহা হইলেই উহাকে বিকৃষ্ট বলা চলে। তাহা হইলে মোট কথা দাঁড়াইল এই যে, রঙ্গপীঠ বিকৃষ্ট—১৬ হাত × ৮ হাত, মত্তবারণী দুইটির প্রত্যেকটি সমচতুরস্র—৮ হাত × ৮ হাত। অধ্যর্দ্ধহস্তোৎসেধ—সার্দ্ধহস্ত উচ্চ।

মূল :—রঙ্গমণ্ডপকে উচ্চতায় উহাদিগের উভয়ের তুল্য করিতে হইবে।

সঙ্কেত :—রঙ্গমণ্ডপ—এস্থলে রঙ্গপীঠকে বুঝাইতেছে। 'রঙ্গমণ্ডপ' বলিতে কখনও কখনও সমগ্র প্রেক্ষাগৃহকেও বুঝান হইয়াছে। এস্থলে অবশ্য কেবল রঙ্গপীঠকেই রঙ্গমণ্ডপ-শব্দ-দ্বারা বুঝান হইয়াছে—অন্যথায় কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না।

তয়োঃ—উহাদিগের উভয়ের—দুইটি মত্তবারণী। একটি মতে—রঙ্গপীঠ অপেক্ষা সার্দ্ধহস্ত পরিমাণ উচ্চতা হইবে মত্তবারণীর। কিন্তু সে মত ভরতের অনুমত নহে। মত্তবারণীরও যতটা উচ্চতা—রঙ্গপীঠেরও ঠিক ততটাই উচ্চতা। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, একেবারে তলার জমি হইতে রঙ্গপীঠের উচ্চতা সার্দ্ধ হস্ত অর্থাৎ দেড় হাত। এই প্রসঙ্গে অভিনব আর একটি কথা বলিয়াছেন যাহার মর্ম্মগ্রহণ করা কঠিন—"তেন মত্তবারণ্যালোকেনাত্যর্থং রঙ্গপীঠস্য দুষ্প্রেক্ষতা" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬২)। আমাদিগের মনে হয়, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—মত্তবারণী ও রঙ্গপীঠ যখন সমান উচ্চ, তখন মত্তবারণীস্থিত আলোকপাতে রঙ্গপীঠ অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠে—সে দিকে প্রায় তাকানই যায় না। ইহা হইতে বোধ হয়—মত্তবারণীই সে যুগে উইংস্‌এর কার্য্য করিত—আর মত্তবারণী হইতে আলোক-সম্পাত করিয়া রঙ্গপীঠকে উজ্জ্বল করা হইত। ইহাই ফোকাস্ বা স্পট্‌লাইট্ দিবার অনুরূপ ব্যবস্থার ইঙ্গিত বলিয়া বোধ হয়।

মূল :—উহাতে (মত্তবারণীতে)—নানাবর্ণের মাল্য ও ধূপ ও গন্ধ আর বস্ত্র—॥ ৭১

ও ভূতগণের প্রিয় বলি প্রদেয়। কুশল (নাট্যগৃহকারগণ-কর্ত্তৃক) তথায় স্তম্ভসমূহের অধোভাগে আয়স প্রদাতব্য ।৭২

সঙ্কেত :—নানাবর্ণের মাল্য, ধূপ, গন্ধ (চন্দন), যন্ত্র ও বলি (উপহার-দ্রব্য) মত্তবারণী-নির্ম্মাণ-কালেই প্রদেয়। মত্তবারণীর স্তম্ভসমূহের অধিপতি দেবতা—ভূত-যক্ষ-পিশাচ-গুহ্যক ইত্যাদি (প্রথমাধ্যায় ১০-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই কারণে অধিষ্ঠাতা ভূতাদির সর্ব্বাগ্রে সযত্নে পূজা কর্ত্তব্য। আয়স—লৌহ-বিকার, লৌহময় দ্রব্য। কাশীর পাঠ—পায়সং চাত্র—আয়সং তত্র (তত্র)—পাঠান্তর।

মূল :—আর-ব্রাহ্মণ-ভোজন-যোগ্য কৃসর-ভোগ অবশ্য দাতব্য। এইরূপ বিধি-পুরঃসর মত্তবারণী কর্ত্তব্যা। ৭৩।

সঙ্কেত :—কৃসর—খিচুড়ি। বিধি—বাস্তুবিদ্যাশাস্ত্রোক্ত বিধি।

মূল :—অনন্তর বিধিদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা রঙ্গপীঠ কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, ষড়্-দারু-সমন্বিত রঙ্গশীর্ষ করণীয়। ৭৪।

সঙ্কেত :—বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম—বাস্তুশাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম—বিধি-বিহিত কর্ম্ম—যথাবিধি কর্ম্ম।

রঙ্গপীঠ-নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে রঙ্গশিরঃ-নির্ম্মাণের কথা বলা হইতেছে। এই ষড়্‌দারু অর্থাৎ ছয়খণ্ড কাষ্ঠফলক কি প্রকারে সন্নিবেশিত হইবে—অভিনব তদ্বিষয়ে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার অর্থ মোটেই স্পষ্ট নহে। তিনি বলিয়াছেন—নেপথ্যগৃহের ভিত্তিলগ্ন দুইটি স্তম্ভ স্থাপনীয়—উহাদিগের পরস্পর ব্যবধান হইবে—অষ্ট হস্ত। উহাদিগের প্রত্যেকটির চতুর্হস্ত অন্তরে একটি করিয়া মোট আর দুইটি স্তম্ভ স্থাপনীয়। এই চারিটি স্তম্ভের অধোদেশে একখানি ও উপরিভাগে একখানি—মিলিয়া ছয়খানি কাষ্ঠ [অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬২]

অভিনবের এই উক্তি অস্পষ্ট হইলেও এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, রঙ্গপীঠের পশ্চাতে একটি কাঠের পরদা দেওয়া থাকিত। চারিটি স্তম্ভ নেপথ্যগৃহের ভিত্তিতে নিবেশিত হইত। ঐ চারিটি স্তম্ভের ব্যবধান যথাক্রমে—ক স্তম্ভ হইতে খ স্তম্ভ পর্য্যন্ত—চার হাত; খ হইতে গ—আট হাত, গ হইতে ঘ স্তম্ভ—চার হাত। এই ক খ গ ঘ—চারিটি স্তম্ভের উপরে ও নিম্নে দুইখানি কাষ্ঠফলক লাগান থাকিত। স্তম্ভগুলিও কাষ্ঠময়। অতএব, চারিটি কাষ্ঠস্তম্ভ ও দুইখানি কাষ্ঠফলক

—মোট ছয়খানি কাষ্ঠখণ্ড। অথবা—এরূপ অর্থও করা চলে—ক হইতে খ পর্য্যন্ত একখানি, খ হইতে গ পর্য্যন্ত আর একখানি, ও গ হইতে ঘ পর্য্যন্ত আরও একখানি—মোট তিনখানি ফলক (অর্থাৎ তক্তা) নিম্ন দিকে ও ঠিক ঐ ভাবে আর তিনখানি ফলক ঊর্দ্ধদিকে দিলে মোট ছয়খানি কাষ্ঠফলক সাজান হইল। উহাতে একটি কাষ্ঠময় ব্যবধান (partition) রচিত হইতে পারে।

অভিনব আবার একটি মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—দুই পার্শ্বে দুই খণ্ড কাষ্ঠ, উপরে ও নিম্নে আর দুই খণ্ড—আর দুইটি স্তম্ভ (সে দুইটির সন্নিবেশ কোথায় তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই)—এই ছয় খণ্ড কাষ্ঠ। আবার আরও একটি মত তুলিয়াছেন। এ মতে—স্তম্ভের শিরোদেশ হইতে দূরে নির্গত একখণ্ড কাষ্ঠ—অনেকটা কড়ি-কাঠের মত (ইহার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'উহ') ঐ উহ হইতে শূন্যে নির্গত কয়েক খণ্ড কাষ্ঠফলক—চতুষ্কোণাকারে সজ্জিত—অনেকটা বরগার মত (সংস্কৃত নাম—'তুলা'—পারিভাষিক সংজ্ঞা 'প্রত্যুহ')। এই উহ-প্রত্যুহ চতুষ্কোণাকারে সজ্জিত স্তম্ভে আশ্রিত—ইহাদিগের উপর সিংহাদি পশু ও সর্পাদির মূর্ত্তি স্থাপিত থাকিত ও পুরী, নিকুঞ্জ, পর্ব্বত, গহ্বর ইত্যাদির কৃত্রিম রূপ (set) প্রদর্শিত হইত—ইহাই ষড়্দারু-নিশ্মিত হইত। ইহাই ছিল তৎকালীন দৃশ্যাবলী (বা set)। মোটের উপর, স্তম্ভোপরি আশ্রিত দৃশ্যাবলী-শোভিত এই ষড়্দারু-ফলকময় ব্যবধান (partition) রঙ্গের শোভা সম্পাদন করিত; আর সেই সঙ্গে যে সকল নট বিশ্রামার্থ ভিতরে প্রবেশ করিত, অথবা পীঠে অভিনয়ার্থ প্রবেশের নিমিত্ত যাহারা নেপথ্যগৃহ হইতে সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিত, তাহাদিগের আত্মগোপনের সহায় হইত এই ষড়্-দারু-ব্যবধান-সমন্বিত রঙ্গশীর্ষ। নেপথ্যগৃহ হইতে নির্গমন ও পীঠে প্রবেশের মধ্যবর্ত্তী কালে, আর পীঠ হইতে প্রস্থানের পর নট-নটী-বৃন্দ এই রঙ্গশীর্ষ-নামক স্থানেই বিশ্রাম ও আত্মগোপন করিতেন—ইহা ছিল নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গপীঠের মধ্যবর্ত্তী স্থান ('পাত্রাণাং বিশ্রান্ত্যৈ আগচ্ছতাং চ গুপ্ত্যৈ রঙ্গস্য শোভায়ৈ রঙ্গশিরঃ কার্য্যম্'—অঃ ভাঃ পৃঃ ৬৩)

মূল :—আর এই স্থলে নেপথ্যগৃহের দুই দ্বার (নির্ম্মাণ করা) কর্ত্তব্য। আরও এ স্থলে পূরণের নিমিত্ত সপ্রযত্নে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা প্রদান করা উচিত। ৭৫।

সঙ্কেত :—অভিনব বলিয়াছেন—দ্বার দুইটির একটি হইবে দক্ষিণ দিকে আর একটি উত্তর দিকে ('একঃ দক্ষিণতঃ। অপরমুত্তরতঃ' অঃ ভাঃ পৃঃ ৬৩)। নেপথ্যগৃহের দুইটি দ্বার—একটি উত্তরে অপরটি দক্ষিণে। পাত্রগণ রঙ্গপীঠে অভিনয়ার্থ প্রবেশকালে 'প্রদক্ষিণ-প্রবেশ' (অর্থাৎ নিজেদের ডানহাতি দরজা দিয়া প্রবেশ) করিবেন—ইহাই অভিনব গুপ্তের অভিমত। তাহা হইলে যে দ্বার দিয়া পাত্রগণের রঙ্গে প্রবেশ—তাহার বিপরীত দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্তি—ইহাই বুঝিতে হইবে।

মূল :—লাঙ্গল দ্বারা সম্যগরূপে উৎকর্ষণপূর্ব্বক লোষ্ট্র-তৃণ-শর্করা-বর্জ্জিত (কৃষ্ণা মৃত্তিকা পূরণে প্রদেয়—এই ভাবে পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বয়।)

আর লাঙ্গলে শুদ্ধবর্ণ দুইটি ধুর্য্য প্রযত্ন-সহকারে যোজনীয়। ৭৬।

সঙ্কেত :—লোষ্ট্র—ঢিল; শর্করা—কাঁকর। শুদ্ধবর্ণ—শুক্লবর্ণ—দান্ত—শান্তপ্রকৃতি। ধুর্য্য—ধূঃ—অক্ষদণ্ড বা শকটের অগ্রভাগ। তাহাতে যোজিত বৃষভের নাম 'ধুর্য্য'। লাঙ্গলাগ্রে বৃষভ দুইটি শ্বেতবর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ অভিনব বলেন যে—শুক্লবর্ণ বৃষভ দান্ত (অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতি হয়।)

মূল :—আর এ ক্ষেত্রে যে সকল পুরুষ অঙ্গদোষ-বিবর্জ্জিত, তাঁহারাই কর্ত্তা (হইবেন)। আর পীবর অহীনাঙ্গ নরগণ-কর্ত্তৃক মৃত্তিকা বহন করান উচিত। ৭৭।

সঙ্কেত :—অঙ্গদোষ—হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ; শ্বিত্র-কুষ্ঠাদি-রোগ-যুক্ত পুরুষও অঙ্গদোষ-বিশিষ্টের শ্রেণীতে পড়িবেন। পীবর—স্থূল, হৃষ্ট-পুষ্ট, মাংসল, ব্যায়ামপুষ্ট—অতএব নিশ্চিত কর্ম্মদক্ষ। অহীনাঙ্গ—হীনাঙ্গ নহে; অধিকাঙ্গও বাদ পড়িবেন—কারণ, হীনাঙ্গ উপলক্ষণ-মাত্র—অঙ্গদোষ-বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন।

কাশীর পাঠ—"পীঠকৈর্নবৈঃ"—নূতন পীঠে করিয়া অহীনাঙ্গ নরগণ-কর্ত্তৃক মৃত্তিকা বহন করাইতে হইবে। পীঠক—পীঁড়া। কাঠের পীঁড়ার উপর মাটির তাল রাখিয়া বহন করার রীতি অদ্যাপি দেখা যায়।

মূল :—প্রযত্ন-সহকারে এইরূপ ভাবে রঙ্গশীর্ষ প্রকৃষ্টরূপে কর্ত্তব্য।—কূর্ম্মপৃষ্ঠ-(তুল্য) (উহা) কর্ত্তব্য নহে—আর মৎস্যপৃষ্ঠ-(বৎ) ও (করা উচিত নহে)—। ৭৮।

সঙ্কেত :—রঙ্গশীর্ষ-নির্ম্মাণের নিষেধ পূর্ব্বে ও বিধি পরে উক্ত হইতেছে। কিরূপ রঙ্গশীর্ষ কর্ত্তব্য নহে—(১) কূর্ম্মপৃষ্ঠ-তুল্য কর্ত্তব্য নহে; 'কূর্ম্মপৃষ্ঠ' বলিতে বুঝায়—চারিদিক্ নিম্ন, মধ্যস্থল উচ্চ ও গোলাকার। (২) মৎস্যপৃষ্ঠ-তুল্যও কর্ত্তব্য নহে; 'মৎস্যপৃষ্ঠ' বলিতে বুঝায়—চারিদিক্ নিম্ন, মধ্যস্থল উচ্চ—তবে কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত বর্ত্তুলাকার নহে—দীর্ঘাকার। কূর্ম্মপৃষ্ঠ গোল, মৎস্যপৃষ্ঠ লম্বা—এইমাত্র প্রভেদ। এই দুই প্রকার রঙ্গশীর্ষ কর্ত্তব্য নহে। তবে রঙ্গশীর্ষ কিরূপ হইবে?—ইহার উত্তর পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইতেছে—

মূল :—শুদ্ধ আদর্শ-তলাকার রঙ্গশীর্ষ প্রশস্ত। আর ইহাতে বিচক্ষণগণ-কর্ত্তৃক রত্নসমূহ প্রদেয়—পূর্ব্বে বজ্র—। ৭৯।

সঙ্কেত :—আদর্শ—দর্পণ। শুদ্ধ-নির্ম্মল। নির্ম্মল আদর্শতলের ন্যায় মসৃণ, সমতল ও স্বচ্ছ হইবে রঙ্গশীর্ষ। উহার নির্ম্মাণকালে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রত্ন প্রদেয়। যথা—পূর্ব্বদিকে 'বজ্র' দেয়। বজ্র—হীরক।

মূল :—দক্ষিণপার্শ্বে বৈদূর্য্য, আর পশ্চিমে স্ফটিক ও উত্তরে প্রবাল; পক্ষান্তরে, মধ্যে কনক হইবে। ৮০।

সঙ্কেত :—পূর্ব্বে হীরক, দক্ষিণে বৈদূর্য্য, পশ্চিমে স্ফটিক, উত্তরে প্রবাল ও মধ্যে স্বর্ণ—এই ভাবে পঞ্চরত্ন প্রদেয়। স্বর্ণ ধাতু হইলেও পঞ্চরত্ন-মধ্যে গণনীয়। বৈদূর্য্য—lapis lazuli, cat's eye, প্রবাল—পলা, coral.

মূল :—এইরূপে রঙ্গশিরঃ (নির্ম্মাণ) করিয়া দারুকর্ম্মের প্রয়োগ করিতে হইবে। ৮১।

সঙ্কেত :—দারুকর্ম্ম—কাঠের কাজ। রঙ্গমণ্ডপে কোথায় কিরূপ কাষ্ঠ প্রযুক্ত হইবে—কোন কাষ্ঠখণ্ডের আকার কিরূপ হইবে—তাহাতে কিরূপ শিল্পকার্য্য থাকিবে—তাহার বিবরণ পরবর্ত্তী পাঁচটি শ্লোকে পাওয়া যাইবে।

[ক্রমশঃ

—সহজ ষ্টাইল—

শুভেন্দু ঘোষ

তরুবিরল পাহাড়ী জঙ্গলে দুপুর বেলায় আকাশছোওয়া বন্দ্ধুরের মধ্যে পাহাড়েদের বাঁশি যারা শুনেছে তারা জানে সেই বাঁশির স্বল্প-বৈচিত্র্য সুরের মধ্যে ধরা থাকে—শুধু বাঁশিওয়ালার উদাস মনটা নয়, সেই মনকে যে উদাস করল সেই রৌদ্র,—সেই নির্জন উপলময় প্রান্তর—সেই মাঝে মাঝে বয়ে-যাওয়া দমকা হাওয়া। বাংলার সারী গানে, ভাটিয়ালীর সুরে ভরা আছে বাংলার ঋতুর বিশেষ রূপ,—বাংলার জলহাওয়া, সেই জলহাওয়ায় যুগে যুগে গড়ে-ওঠা বাঙালীর মন।

এই সব সুর কোনো এক জন মানুষের রচিত সুর নয়—এ গুলো আবির্ভাব—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিত্তের যে শাশ্বত বিরহ-মিলনের লীলা চলেছে, এ তারই সৃষ্টি। প্রকৃতি আর মানুষের চিত্ত—এই দুইয়ের সংগমে এর জন্ম। ফুল ফোটার মতই এ সহজ; যে আনন্দের মধ্যে এর সৃষ্টি তারই মত এ স্বতঃস্ফূর্ত। তার অর্থ এ নয় যে, সৃষ্টির সময় চিত্ত থেকেছে নিষ্ক্রিয়; মানুষের বুদ্ধি ত তার শিক্ষালব্ধ নিপুণতা—এগুলো থেকেছে জড়। ঠিক তার উল্টো। চিত্ত হয়েছে অত্যন্ত সহজ ভাবেই পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়, আত্মভোলা ভাবে সক্রিয়; বুদ্ধি, নিপুণতা সবই পূর্ণ একাগ্রতায় কাজ করেছে, তাই তাদের প্রয়াসের ছাপ পড়েনি কোথাও। যেখানে আত্মলোপী সক্রিয়তা নাই সেখানেই বিকৃতি—সেখানেই অসহজতা—সেখানেই প্রয়াসের ছাপ। ভালোবাসা ফুটে ওঠে চোখে-মুখে, ভাবে ইঙ্গিতে,—কত কিছুতে; চোখের সেই জ্যোতিটা আনতে, মুখের সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে আনতে, ভাবের সেই একাগ্রতা, ইঙ্গিতের সেই অপরূপ মধুরতা আনতে কি কোনো প্রয়াস লাগে? সব আপনা থেকেই এসে যায়।

সুরের সম্বন্ধে যা বলা গেল, সাহিত্যের ষ্টাইল সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা চলে। সাহিত্যের মধ্যেও এমন ষ্টাইল পাওয়া যায়, যার গুণে মানসচক্ষে ফুটে ওঠে একটা সমগ্র পরিবেশ,—একটা বিশেষ দেশ, একটা বিশেষ কাল, সেই দেশ-কালের মধ্যে মানব-চিত্তের একটা বিশেষ স্বাভাবিক রস। তবুও তা শাশ্বত।

এই সহজ ষ্টাইলই হচ্ছে সব চেয়ে দুর্লভ ষ্টাইল, তার কারণ সহজ হাওয়ায় সাধনা—'সবার সুরে সুর মেলানোর' সাধনাই হচ্ছে সব চেয়ে দুরূহ সাধনা। এই সহজ ষ্টাইলই হচ্ছে সপ্তবর্ণের সামঞ্জস্যে গড়ে ওঠা সূর্য্যরশ্মির মত। এই সহজ ষ্টাইলই হচ্ছে সত্যিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ষ্টাইল।

যা সত্যি সত্যিই ভালো ষ্টাইল,—সত্যি সত্যিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যা স্বাভাবিক লাবণ্য, তা আসে আত্মার অসীম প্রসারতা হতে। মানুষের কোনো কিছুর সঙ্গেই একাত্ম হওয়ায় বাধা নাই,—আত্মার গতি কোনোখানে ব্যাহত হবার নয়; এই জন্যেই আত্মা থেকে যে বাণী ফুটে ওঠে, সবার বাণী হয়ে ওঠায় কোনো বাধা তার থাকে না; তার মধ্যে সব কিছুর নিবিড় স্পর্শ ধরা-থাকাটাই স্বাভাবিক। শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল এই জন্যেই দেয় একটা সমগ্রতার আস্বাদ,—তার আবেদন এই জন্যেই হয় সার্বজনিক। এই সমগ্রতা বস্তুপুঞ্জের সামূহিকতা নয়, এটা হচ্ছে জীবনের পরিপূর্ণতা।

বাইবেল, ইলিয়ড, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত—এ সবের ষ্টাইলের অপূর্বতার রহস্য এই যে, এগুলোতে যেন একটা সমগ্র সমাজ, একটা সমগ্র দেশের চিত্ত উৎসারিত হয়েছে,—এগুলো যেন কোনো কালেই কোনো ব্যক্তির রচনা ছিল না। এর একটা সূত্র নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ব্যক্তি হতে হয়েছিল,—অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে—চিত্তরসের একটা উচ্ছল প্রকাশে। তার পর কত কাল ধরে কত মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে, তাদের চিত্তের রঙের ছোঁয়াচ নিয়ে, তাদের বিচিত্র আনন্দবেদনায় পুষ্ট হয়ে এগুলো যেন উত্তরোত্তর প্রাণসঞ্চার করে বেড়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে যা কিছু মৌলিক, যা কিছু স্থায়ী সেইগুলোই যেন এই সব সাহিত্যে রূপ পেয়ে এসেছে—এই সব সাহিত্যের গভীর, মৌলিক জীবনই তাদের সহজ ষ্টাইলের ফুল ফুটিয়েছে।

রূপকথার ষ্টাইল এই জন্যেই সর্বত্র এত অনবদ্য দেখা যায়।

এই সব সাহিত্য সামগ্রিক বলে চিরস্থায়ী হয়েছে; আবার চিরস্থায়ী ও সার্বজনিক হয়েছে বলে এত সম্পূর্ণ ভাবে নৈর্ব্যক্তিক হতে পেরেছে। বাইবেল, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কালের কাব্যে, সর্বদেশের রূপকথায় যে ষ্টাইল পাওয়া যায়, তার নৈর্ব্যক্তিকতা হচ্ছে বহু চিত্তের ঐক্যতানজাত নৈর্ব্যক্তিকতা। আর এক রকমের নৈর্ব্যক্তিকতা পাই সেই সব রচনার মধ্যে যা নিশ্চিতরূপে এক জনের দ্বারা গ্রথিত হলেও ব্যক্তিত্বের সকল সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করেছে। যেখানে ব্যক্তিত্ব সাময়িক ভাবে হলেও সম্পূর্ণ ভাবে নিজ বিরাটত্বের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। লেকঁং দ্য লীল তাঁর বিশ্ববিশ্রুত মার্শাই সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন (এইটাই তাঁর একমাত্র সার্থক রচনা), মার্শাইয়ের বৈপ্লবিক আবহাওয়ার মধ্যে সাময়িক ভাবে আত্মহারা হয়ে। হাওয়ায় যে কথাগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিল, অশরীরী আত্মার মত যেগুলোকে বোধ-করা যাচ্ছিল অথচ স্পষ্ট করে ধরা যাচ্ছিল না, দ্য লীল সেগুলোকে আত্মস্থ করে রূপ দিয়েছিলেন। এই অভিজাত কবিটির মধ্যে দিয়ে রূপ পেল ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত—যদিও ঐ দুই এক দিন ছাড়া সমস্ত জীবনে বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে দ্য লীলের সম্পর্ক ছিল সতীনের। বিপ্লবী ফরাসীর আত্মা এই কাউন্টটির অসতর্ক চিত্তের উপর চেপে বসে যা সৃষ্টি করিয়ে নিল তার জন্যে কৃতিত্ব কাকে দেব? লেকঁং দ্য লীলকে? না, মার্শাইয়ের কাফেতে কাফেতে যারা বিপ্লবের ঝঞ্ঝা-দোলায় আত্মহারা হয়ে দোল খাচ্ছিল, তাদিকে?

যাই হোক, ঘাড়ে চেপে সমাজ বা প্রকৃতি সব সময় সৃষ্টি করিয়ে নেয় না। চিত্ত ও প্রকৃতির মধ্যে পরস্পরকে খোঁজাখুঁজি চলেছে অনন্ত কাল—তাদের হঠাৎ চোখোচোখি হলেই রসসৃষ্টি হয় তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ষ্টাইল—শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল—শুধু চিত্তের দান নয়;—চিত্ত যাতে আনন্দ পেল, সেই বিষয়েরও দান। ষ্টাইল সম্পর্কে মূল নিয়ম হচ্ছে এই। আমরা বলেছি, সহজ ষ্টাইলে প্রকৃতিই যেন মুখর হয়ে ওঠে—বর্ণ রূপ রস গন্ধ যেন তাদের বাণীরূপ ধরে আসে। কিন্তু মানুষের কাছে প্রকৃতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দেখা দিতে পারে। মানব-প্রকৃতি আর মানবাতীত বাকী প্রকৃতি স্বতন্ত্র হতে পারে বলেই চিত্ত প্রকৃতির কোঠাতেই পড়লেও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্ভব।—মানুষের চেতনা, তার রসোপলব্ধি প্রভৃতি আসে এই দ্বন্দ্ব থেকেই। কিন্তু মানুষ যখন পুরোপুরি প্রকৃতির [illegible] তখন মানুষ তার পূর্ণ সত্তাকে [illegible]

দি রোপ ট্রিক

ভারতীয় দড়ির খেলা বা দি ইণ্ডিয়ান রোপ ট্রিকের কথা কে না শুনিয়াছেন ? বাদশাহ জাহাঙ্গীর পারস্য ভাষায় স্বরচিত পুস্তক 'জাহাঙ্গীর নামা'তে ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজত্বকালে কতিপয় বাঙ্গালী যাদুকর তাঁহার দরবারে আসিয়া নানাবিধ আশ্চর্যজনক ম্যাজিক দেখান, তন্মধ্যে ভারতীয় দড়ির খেলাটিও ছিল। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা

কালেও পৃথিবীর মায়াবাদ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া 'ভারতীয় দড়ির খেলা'র উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস-লিখিত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'তে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় প্রদর্শিত ভারতীয় দড়ির খেলার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই ভাবে যুগে যুগে দড়ির খেলা এ দেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। বিলাতের যাদুকরগণ এই খেলা কিছুতেই করিতে সক্ষম হন নাই। থার্সটন, কার্টার, চ্যাঙ, ডেভিড ডেভাণ্ট প্রভৃতি পৃথিবী-বিখ্যাত যাদুকরগণ ইহা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রঙ্গমঞ্চের উপর নানা ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ভাবে অর্থাৎ দিনেরবেলায় উন্মুক্ত ময়দানে কেহই এই খেলা করিতে পারেন নাই বলিয়া 'লণ্ডনের যাদুকর-সম্মিলনী' ঘোষণা করেন যে, "যদি কোন যাদুকর বিলাতে যাইয়া যাদুকর-সম্মিলনীর সম্মুখে এই খেলা দেখাইতে পারেন, তাঁহারা তাঁহাকে ৫০০০ হাজার এমন কি ৫০,০০০ হাজার গিনি পুরস্কার দিতে রাজী আছেন।" সেই দিন হইতেই পৃথিবীর নানা দেশে এই খেলা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। প্রত্যেকেই এই খেলা দেখাইতে উৎসুক। যাদুকরগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন ইহা স্বাভাবিক; এমন কি, আমেরিকার চিত্রতারকারাও এই খেলার মূলসূত্র উদ্ধারে মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছেন। এই সঙ্গে একটা ছবি দেওয়া হইল, ইহা ইতিপূর্ব্বে Treasure Islandএর Golden Gate আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এক্ষণে এই খেলার একটি অতি-আধুনিক উপায় বর্ণিত হইতেছে। ইহা আমেরিকার বিখ্যাত যাদুকর মর্টিমার (Mortimer the Magician) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। তিনি বলেন যে, [illegible] তীয় দড়ির খেলা পৃথিবী-বিখ্যাত এবং [illegible] রঙ্গমঞ্চে তিনি এই খেলাটি দেখাইয়াছেন বলিয়া ইহার নাম দিয়াছেন "The Night Club Hindu Rope Trick."

'ওয়ান টু-থ্রি' ষ্টেজের ড্রপসিন উঠিয়া গেল, দর্শকগণ দেখিতেছেন যে, যাদুকর একটি মোটা দড়ি, একটা বাঁশের ঝুড়ি ও একটা বাঁশী সহ বসিয়া আছেন। পর্দ্দা উঠিয়া যাইবামাত্র তিনি মোটা দড়িটা সর্ব্বসমক্ষে ফেলিয়া দিলেন, দড়িটা সেখানে পড়িয়া রহিল, তার পর সেই দড়িটা তিনি একটা প্রকাণ্ড বাঁশের অথবা বেতের ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন—কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিলেন, ম্যাজিকের বাঁশীটি একটু বাজাইলেন, তখন দড়িটা আপনা-আপনি উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিল। আন্দাজ ৮ ফুট উপরে উঠিয়া দড়িটা একেবারে শক্ত হইয়া গেল। তার পর যাদুকরের সহকারী সেই ঝুড়িটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দড়িটা বাহিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেই যাদুকর একটা প্রকাণ্ড পর্দ্দা দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, 'ওয়ান-টু-থ্রি'। কি আশ্চর্য্য! সঙ্গে সঙ্গে সেই সহকারী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন আর দড়িটা সর্ব্বসমক্ষে পুনরায় নরম হইয়া লুটাইয়া পড়িল। দর্শকগণ মনে করিলেন যে, যাদুকর সম্ভবতঃ নিজের কোন মায়া-মন্ত্র (?) প্রভাবেই সেই সহকারীকে অদৃশ্য করিলেন। কারণ, সে ঝুড়ির
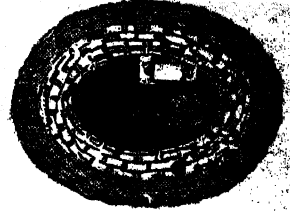
মধ্যে নাই। যাদুকর স্বয়ং ঝুড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঝুড়িটাকে লাথি মারিয়া, ও লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া দেখাইলেন, কেহই উহার ভিতরে থাকিতে পারে না। তার পর যাদুকর ঝুড়ির বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং একটা পর্দ্দা দ্বারা সেই ঝুড়িটাকে ঢাকিয়া দিয়া পুনরায় মন্ত্রপাঠ করিলেন ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁশী বাজাইলেন। কি আশ্চর্য্য! সহকারী পুনরায় সেই পর্দ্দার নীচে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

এক্ষণে এই খেলার মূল কৌশল দেওয়া যাইতেছে। সহকারীর উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চির অধিক হইবে না। ঝুড়িটা উচ্চতায় ৩৬ ইঞ্চি এবং ব্যাসে ৪২ ইঞ্চি হইবে। দড়িটা আসলে দড়ি নয়, দুইটি সিল্কের কাপড় সুন্দর ভাবে পাকাইয়া দড়ির ন্যায় করা হইয়াছে এবং সেলাই করিয়া লওয়া হইয়াছে যাহাতে খুলিয়া না যায়। এই ভাবে তৈয়ার করিলে রাত্রিতে আলো পড়িলে অতিশয় সুন্দর দেখাইবে। যাদুকর প্রথমে যে দড়িটা দেখান এবং পরে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দেন,—সেই দড়িটাই শক্ত হইয়া উপরে উঠে না। যেটা উপরে উঠে, উহা অনুরূপ বিশেষ প্রস্তুত অপর একটি দড়ি। চিত্রে দেখান হইয়াছে—কি ভাবে আন্দাজ ৩০ ইঞ্চ লম্বা চারি খণ্ড পিত্তলের 'পাইপ' দ্বারা টেলিস্কোপের ন্যায় একটি লম্বা 'রড' তৈয়ার করা হইয়াছে। জিনিষটি অনেকাংশে আমাদের ক্যামেরার 'ষ্ট্যাণ্ড'এর মত একটির ভিতরে অপরটি প্রবিষ্ট হয়। উহা এমন কৌশলে তৈয়ারী যে, একটি সরু শক্ত সুতা টানিলেই আপনা আপনি প্রায় ৮ ফুট উপরে উঠিবে এবং সুতাটি ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া দিলেই চট্ করিয়া সমস্ত পাইপ একটির [illegible] (collapse) নীচে নামিয়া পড়িবে। [illegible]

হাত দিয়ে টানিতে হয় না—ভিতরে একটা Phonograph Motor machine আছে, উহাই আপনা-আপনি ঘুরিয়া রডটিকে টানিয়া উপরে তুলিবে। যাদুকর দড়িটা ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিবার সময় স্বয়ং ঐ ফনোগ্রাফ মোটর যন্ত্র চালিত করিয়া দেন। তার পর দড়িটা শক্ত হইয়া উপরে উঠিলে সহকারী ঝুড়ির ভিতরে যাইয়া দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেই যাদুকর তাহাকে ঢাকিয়া ফেলেন। বলা বাহুল্য, এই দড়ি বাহিয়া কখনও উপরে উঠা যাইবে না। এইবার কাপড় ঢাকা দেওয়া মাত্র সেই সহকারী ঝুড়ির মধ্যে বসিয়া পড়ে এবং ভারতীয় ঝুড়ির খেলাতে (Indian Basket Trick) যে ভাবে অদৃশ্য হয় সেই ভাবে অদৃশ্য হইবে। ভারতীয় ঝুড়ির খেলা বারান্তরে আলোচনা করা

যাইবে। বাকী অংশ অতিশয় সহজ; যাদুকর ঝুড়ির মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া দেখাইয়া দিবেন উহার মধ্যে কিছুই বা কেহই নাই। তার পর কাপড় ঢাকা দিবামাত্র ঝুড়ির ভিতর হইতে সহকারী পুনরায় বাহির হইল। ঝুড়ির ভিতরে থাকিয়া সহকারীই নিজে সূতাটি ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া দিয়াছিলেন, কাজেই দড়িটা নরম হইয়া নীচে পড়িয়াছিল। প্রদত্ত চিত্র দেখিয়া ভালরূপে পাঠ করিলে এই খেলা সহজে বোধগম্য হইবে। ইহ যন্ত্রের খেলা, কাজেই যন্ত্র তৈয়ারীর কৌশল লক্ষ্য করিলে ইহার সমস্ত কৌশল সহজে বোধগম্য হইবে। রাত্রিতে লাল নীল 'কোকাসে'র আলোতে চক্চকে পোষাক-পরিহিত যাদুকর যখন রঙ্গিন পর্দার সম্মুখে এই খেলা দেখান, তখন ইহা অতিশয় সুন্দর দেখায়। আমেরিকার যাদুকরগণ এই ভাবেই এই খেলা দেখাইতেছেন। কিন্তু ভারতীয় যাদুকরগণ যাহারা এই খেলা দেখাইয়া থাকে, তাহারা ঐ অনন্ত যন্ত্রপাতির কথা জীবনেও শুনে নাই। তাহারা আর কেহই নহে—ঐ নগণ্য পথের বেদিয়ার দল। যাহারা বংশ-পরম্পরায় ভারতীয় যাদুবিদ্যা দেখাইয়া নিজেদের জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকে, তাহারা প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত ময়দানে চারি দিকে দর্শকগণের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের মধ্যেও নানারূপ অদ্ভুত আশ্চর্য্যজনক ও বিস্ময়কর খেলা প্রতিদিন দেখাইয়া থাকে। আমরা রঙ্গমঞ্চে যান্ত্রিক কৌশল ও অপূর্ব্ব আলোক-সম্পাতের খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হই, কিন্তু ঐ নগণ্য পথের বেদিয়াদের খেলা যে সে তুলনায় কত সুন্দর, কত আশ্চর্য্যজনক, তাহা কেহই বুঝে না। আলোচনার অভাবে আমাদের দেশের কত বিদ্যাই এই ভাবে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—দেশের সভ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এ দিকে না পড়িলে উহার উন্নতি হইবে কিরূপে? ভারতীয় যাদুবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণার এখনও অনেক অবসর আছে।

মনোজিৎ বসু

ওরে ভজা শোন মজা চট্ ক'রে ছুটে আয়,
কেসে কেসে হেসে হেসে এদিকে যে প্রাণ যায়!
আম-গাছে জাম ফলে, নিম-গাছে কুমড়ো,
সিম্-গাছে কিশ্‌মিশ্—বুঝলি কি ঝুমড়ো?
বেল থেকে তেল ঝরে, গম্ থেকে সরষে
গাব-গাছে ডাব ঝোলে কাঁদি কাঁদি জোরসে।
কলা-গাছে মূলা হয়, কুল-গাছে লঙ্কা—
ধান-গাছে তুলা হয়—শুনলি কি ডঙ্কা?
মিছে নয় বলি ঠিক, তাল-গাছে চাল্‌তে
ভুলে গেলে হবে তোর লাল্-বাতি জ্বাল্‌তে!
লাউ-গাছে ফুল-কপি মান-গাছে আনারস
ফুটি থেকে খেজুরের রস ঝরে টস্ টস্।
আতা-গাছে শসা হয় পুঁই-গাছে তরমুজ
ঝিঙে দোলে লেবু-গাছে লিচু-গাছে খরমুজ।
সব থেকে হাসি পায় পেঁপে-গাছে সজিনা
শুনে তুই বল্‌বি তো 'ও-কথাতে মজি না'?
আরে শোন্ হাঁদারাম, বলি তোরে গোপনে
মিছে নয়, এ তো আমি দেখি রোজ স্বপনে!

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

৬

মৌর্য্যের সব ছেলেরা বাপের কথায় রাজি হলেন—চন্দ্রগুপ্তের সব আপত্তি ভেসে গেল। বাপ আর ভাইদের খাবার থেকে বঞ্চিত ক'রে সেই খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা—আর চোখের সামনে বাপ-ভাইরা সব একে একে দিনের পর দিন না

খেয়ে, তেষ্টার জলটুকু পর্য্যন্ত গালে না দিয়ে অতি ভয়ানক মরণের কোলে ঢ'লে পড়বেন—এ করুণ, নিষ্ঠুর, শোচনীয়, মর্ম্মভেদী দৃশ্য মুখ বুজে দেখে সহ্য করে থাকা—এ যে জল্লাদেও পারে না। প্রথম দুই এক দিন চন্দ্রগুপ্তও বাপ-ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে উপোস করতে লাগলেন। তখন মৌর্য্য আর তাঁর অন্য ছেলেরা সব একসঙ্গে মিলে তাঁকে বোঝালেন—'দেখ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি পাগলামি কোরো না। তুমি খাও—নইলে প্রতিহিংসার ধুনী জ্বালিয়ে রাখবে কে?' তবু চন্দ্রগুপ্ত রাজি হ'ল না দেখে—বাপ আর ভাইয়েরা সকলে মিলে জোর ক'রে ধ'রে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। নিরুপায় চন্দ্রগুপ্ত তখন তাই নিয়তি বুঝে আর বাধা দিলেন না।

এর পর ক্রমশ: এক একটি ক'রে দিন যতই যেতে লাগল, ততই সে পাতাল-কারার কাহিনী করুণ মর্ম্মান্তিক হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল। দিন দশেক যেতে না যেতেই মরণের দূত আনাগোনা করতে লাগ্‌ল প্রথমটা চুপিসাড়ে—মৌর্য্যের কোন কোন ছেলে আর কারাগারের মাটির বিছানা ছেড়ে উঠল না—নিঃশব্দে মরণকে করল আলিঙ্গন। তার পর দিন আরও যতই এগুতে লাগ্‌ল—মহাকালের তাণ্ডবও ততই উদ্দাম হয়ে উঠল। ও-দিকে এক কোণে ব'সে চন্দ্রগুপ্ত পাথরের মূর্ত্তির মত। রোজ নিয়মমত খাবার খেয়ে যাচ্ছেন—মাপ ক'রে জল খেয়ে বুকফাটা তেষ্টা যতটা পারেন মেটাচ্ছেন—আর সে রসাতলের অন্ধকারকে আরও ঘন ক'রে জমিয়ে তুলে এক একটি প্রদীপের শিখা রাতের পর রাত ধরে জ্বলছে। ঘরের অন্য ধারে একের পর একটি ক'রে ভাইদের শব সাজান হচ্ছে। যে বুঝ্‌ছে তাঁর আর দেরী নেই, সেই গিয়ে সেই মড়ার সারের পাশে শুয়ে পড়ছে—আর উঠছে না; প্রথম প্রথম মরণের পথে আগুয়ান্ ভাইদের মুখে শেষ এক গণ্ডূষ ক'রে জল দেবার চেষ্টা করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু মৃত্যুর কোলে শুয়েও তাঁদের সে কি দৃঢ়তা! কেউ এক ফোঁটা জল অন্তিম সময়েও মুখে নিলে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিরেনব্বুই ভাই আর বাপ শেষ-নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। মৃত্যুর ঠিক আগে মৌর্য্যের মুখ থেকে শুধু দুটি কথা বেরিয়েছিল—'চন্দ্রগুপ্ত! প্রতিহিংসা'! আর তিনি কোন কথা বলেননি। চিরদিনের মত চোখ বুজেছিলেন। এমনই বীর এই সব তরুণের দল যে এমন ভাবে তিলে তিলে মরণের স্পর্শ পেয়েও তাঁদের কারুর মুখ থেকে একটুও কাতরানির শব্দ বেরোয়নি! চন্দ্রগুপ্ত প্রথম দু-এক ভাইএর মরণে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন; কিন্তু অন্য ভাইদের উত্তেজনায় তাঁকে বুক বাঁধতে হয়েছিল। তার পর ধীরে ধীরে তিনি পাথর ব'নে গেলেন। কলের পুতুলের মত খাওয়া-দাওয়া সারতেন প্রতিদিন—চোখে তাঁর না ছিল অশ্রু—না আস্‌ত ঘুম। অন্তরে আগুনের জ্বালা—বাইরে পাষাণের মত স্থির, ধীর, নিস্তব্ধ। মন তখন তাঁর একটি ভাবে ভরপুর—হয় প্রতিহিংসা, নয় মৃত্যু!

ও-ধারে নবনন্দ আর রাক্ষস, মৌর্য্য আর তাঁর ছেলেদের মেরে নিষ্কণ্টক হয়েছেন ভেবে মনের সুখে রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আন্দাজ মাস তিনেক পরে হঠাৎ এক দিন সিংহলের * রাজার কাছ থেকে একটা অদ্ভুত হেঁয়ালি এসে উপস্থিত হ'ল। এক জন লোক একটা পিঁজ্‌রার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সিংহ পুরে নিয়ে এসে নবনন্দের রাজসভায় হাজির। এক ভাই তখন সিংহাসনে—রাজা হবার পালা তাঁর সে বছরে। বাকি আট ভাই—চার চার জন ক'রে রাজার দু'পাশে মন্ত্রীর আসনে ব'সে। লোকটি এসে কায়দা ক'রে নমস্কার জানিয়ে বল্লে—'শুনুন মহারাজ! শুনুন মহারাজেরা! শুনুন মন্ত্রিগণ! শুনুন সকলেই! আমি হচ্ছি লঙ্কার রাজার দূত। আমাদের রাজা ম'শায় আপনাদের রাজসভায় এই সিংহটি উপহার পাঠিয়েছেন। এ উপহারটি নেবার কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে। যদি আপনাদের বুদ্ধি থাকে, তা হ'লে পিঁজরের দোর না খুলে বা পিঁজরে না ভেঙ্গে পশুরাজকে পিঁজরের ভেতর থেকে বের ক'রে নেন। এ যদি আপনারা পারেন, তা হ'লে আপনাদের সঙ্গে আমাদের প্রভুর বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। আর না পারলে আমাদের প্রভু নিশ্চয়ই এসে আপনাদের রাজ্য আক্রমণ করবেন।'

লোকটার এই রকম স্পর্দ্ধার কথা শুনে নবনন্দের ত মাথা ঘুরে গেল। এত-বড় একটা সিংহকে খাঁচা না খুলে বা না ভেঙ্গে বার করা যায় কি ক'রে! তার পর লড়াই লাগলে ত মহা বিপদ্! মৌর্য্য প্রধান সেনাপতি—আর তাঁর শূর-বীর একশ' ছেলে—সবাই প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসের মন্ত্রণায় শেষ হ'য়ে গিয়েছেন। এখন বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়ে কে! রাক্ষস লড়াই করতে ত আর জানেন না—কূট পরামর্শই না হয় দিতে পারেন! মন্ত্রীরা ত সবাই ভেবে আকুল! এমন কি অত-বড় যে কূটবুদ্ধি প্রধান মন্ত্রী রাক্ষস—তিনিও এর কোন উপায় ঠিক করতে না পেরে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইলেন। সকলেরই মনে হ'তে লাগল—সেনা নিয়ে যুদ্ধ না হয় পরে হবে! এখন আপাততঃ সিংহলরাজের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধে ত হেরে যেতে হচ্ছে—এ কি কম অপমানের কথা!

সিংহলরাজের দূতের সামনে বোকা ব'নে যাওয়ার চিন্তায় যখন সকলেই আকুল, তখন এক জনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। তিনি নবনন্দেরই এক মন্ত্রী—নাম তাঁর বিশিখ। তিনি বরাবরই মৌর্য্য আর তাঁর ছেলেদের মনে প্রাণে ভালবাস্‌তেন। এ দারুণ সঙ্কটের সময় মনের উচ্ছ্বাস আর চেপে রাখতে না পেরে তিনি হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন—'আচ্ছা! এ সময় মৌর্য্য কি তাঁর ছোট ছেলে চন্দ্রগুপ্ত যদি বেঁচে থাকতো। মৌর্য্য বেঁচে থাকলে লড়াইয়ের ভাবনাই হ'ত না। আর চন্দ্রগুপ্ত বেঁচে থাকলে বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্চয় এর কোন কিনারা ক'রে ফেল্‌তে পারত।

বিশিখের কথাটা অনেকের প্রাণের ভেতর গিয়ে বিঁধল। কেউ কেউ মুখ ফুটে বলেও ফেল্‌লেন—'সে পাট ত ঝাড়ে-মূলে চুকে গেছে—যা নেই তা নিয়ে আর মাথা ব্যথা কেন!' কিন্তু নবনন্দের প্রাণে কথাটা দিল দোলা। যদিও তাঁরা বুঝ্‌ছিলেন—বৃথা আশা! তিন মাস মানুষ না খেয়ে বেঁচে থাক্‌তে পারে না—তবু একসঙ্গে নয় ভাই আদেশ দিলেন মাটির নীচের সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলে মৌর্য্য আর তাঁর ছেলেদের খোঁজ করতে। সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পাতাল-কারায় পৌঁছে মন্ত্রীরা দেখ্‌লেন—পাশাপাশি একশ'টি কঙ্কাল পড়ে আছে—ইঁদুরে তাঁদের হাড়গুলো খালি রেখেছে—মাংস-চামড়া কিছু রাখেনি—নিঃশেষ ক'রে খেয়েছে—অথচ ঘরের অন্য ধারে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে মৌর্য্যের ছোট ছেলে চন্দ্রগুপ্ত নিষ্কম্প পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির-ধীর

---

* কারুর কারুর মতে ইনি বঙ্গদেশের রাজা। বঙ্গ—এখনকার পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিপুরা ইত্যাদি দেশ। আর সিংহল হচ্ছে লঙ্কাদ্বীপ।

ভাবে ব'সে রয়েছেন—চোখের পলক পড়ছে না—নাকেও নিশ্বাস বইছে কি না—সন্দেহ! তাড়াতাড়ি সকলে ছুটে কাছে গিয়ে দেখলেন—আশ্চর্য্য! চন্দ্রগুপ্ত জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন! খাবারের শেষ থালাটিও সেই দিনই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল—তাই কেউ বুঝতে পারলেন না—চন্দ্রগুপ্ত কি ক'রে প্রায় এই সাড়ে তিন মাস বেঁচে আছেন!

কি ভাবে তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়েছে এত দিন, অথচ আর সকলেই অনেক আগে কঙ্কালে পরিণত হয়েছেন—এর রহস্য কি—তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে কেউই সাহস করলেন না বটে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি দারুণ মর্ম্মান্তিক—তা বুঝতে কারুরই বাকী রইল না। এমন কি, রাক্ষসও মুখ তুলতে পারছিলেন না—চন্দ্রগুপ্তের মুখের সামনে। নবনন্দও মনে মনে বিলক্ষণ অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

যাই হোক্, চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু কোন রকম শোক বা দুঃখের ভাব প্রকাশ করলেন না। সকলে যখন তাঁকে বাইরে আসতে অনুরোধ জানালেন—তখন তিনি নীরবে সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাইরে বেরিয়ে এলেন—যেন তাঁর কিছুই হয়নি। তখন সকলের মনে সন্দেহ হ'ল—দারুণ শোকে তাঁর মাথা বিগড়ে যায়নি ত!

কিন্তু সিংহলরাজের দূতের সামনে তাঁকে নিয়ে গিয়ে যখন সিংহলরাজের দেওয়া উপহার হেঁয়ালি-সিংহটা তাঁকে দেখান হ'ল, তখন তিনি দূতের কথা শুনে আর বার কয়েক সিংহটার দিকে তাকিয়ে একটু না ভেবে বললেন—'আমায় একটা লোহার দাণ্ডা আগুনে তাতিয়ে লাল ক'রে এনে দিন।'

টকটকে লাল লোহার দাণ্ডা আসতেই তিনি তার একটা দিক্ ভিজে কাপড় জড়িয়ে ধ'রে তুললেন। আর লাল দিক্‌টা চেপে ধরলেন পিঁজরের শিকের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে একেবারে সিংহের মাথার উপর। রাজসভার সবাই চমকে উঠল—ভাবলে—এখনই হয়ত সিংহটা আগুনের আঁচে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গর্জ্জন ক'রে খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে সব কিছুই হ'ল না। আগুনের তাত লাগতেও সিংহটা একবারও একটুও নড়চড় করলে না—বরং গ'লে জলের মত হ'য়ে পিঁজরের শিকের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। তখন সবাই বুঝতে পারলেন যে—সেটা আসলে জীবন্ত সিংহই নয়—একটা মোমের গড়া পুতুল সিংহ মাত্র!

চন্দ্রগুপ্তের এই রকম উপস্থিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে সিংহলের রাজদূত তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার সুখ্যাতি করতে করতে দেশে ফিরে চ'লে গেল।

[ক্রমশঃ

ঘড়ি

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

বেশ সুন্দর একটি ঘড়ি, তবুও দেখলে বেশ পুরানো বলে মনে হয়। ঘড়িটি বৃদ্ধ অমরনাথের বড় সখের জিনিষ। এই ঘড়িছাড়া তিনির এক দণ্ডও চলে না। খাওয়া-দাওয়া সব কিছুই তিনির টাইম মত, তাই ঘড়িটি অমরনাথের পক্ষে এক কথায় বলতে গেলে অপরিহার্য্য।

ঘড়িটা এমন সুন্দর ভাবে তৈরী যে এলার্ম দিলেই টুং-টাং করে একটা অতি সুন্দর গৎ মিনিট পনেরো বাজিয়ে যায়। এই গৎটা শুনেই অমরনাথের ঘুম ভাঙে; রাত্রে এলার্ম দিয়ে রাখেন, আর সকালবেলা আটটার সময় ঘড়িটা গৎ বাজিয়ে তার প্রভুর ঘুম ভাঙায়। আজ পঞ্চাশ বছর যাবৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

ঘড়িটা অমরনাথ নিজেই নাড়াচাড়া করেন। সকালবেলা তিনি নিজেই রোজ চাবি দেন। অন্য কাউকে তিনি হাত দিতে দেন না। ছোট নাতি-নাত্‌নীদের সব কিছু আবদার, অনুরোধ তিনি হাসিমুখে সহ্য করেন, কিন্তু ঘড়িতে হাত দিয়েছো কি মরেছো, অমনি ভ্রূ যাবে কুঁচকে, আর সংগে সংগে আসবে বিরাট এক হুমকি।

এই ছোট টেবিল-ঘড়িটা অমরনাথের শিয়রের টেবিলের উপর সকলেই বরাবর দেখে আসছে। কোথাও যদি যান তার সংগে যাবে ঘড়িটা। উনি বলেন—"সব ছাড়তে পারি বাবা, কিন্তু এই ঘড়িটা ছেড়ে আমার এক দণ্ডও চলবে না, উহুঃ।

নাতীরা তামাসা করে বলে—"কি ঠাকুরদা, মরার পরেও আপনার ঘড়িটা সংগে নিয়ে যাবেন না কি?"

"হয়তো তাই, করতে হবে রে, বুঝলি দাদু;—ওকে সংগে করেই হয়তো আমায় নিয়ে যেতে হবে"—জবাব দেন তিনি।

দিন যায়। সংসারের কাজ এগোতে থাকে। বয়স বাড়ে—ঘড়ি আর অমরনাথ দুয়েরই। কিন্তু কাজ চলে ঠিক আগেকার মত। কিন্তু হঠাৎ বাদ সাধে, অমরনাথ পড়েন শক্ত অসুখে। বুড়ো শরীর তো—সহজেই কাবু করে ফেললো। দিন কয়েকের মধ্যে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

অচল হলে কি হয়, তিনির ঘড়ির ব্যবস্থা নিজের হাতেই এখনও। ওই অসুস্থ শরীর নিয়েই সময়মত চাবি দেন।

বড় বৌমা বলেন—"দেখুন বাবা, আপনার অসুস্থ শরীর নিয়ে এতো নাড়াচাড়া করবার কি দরকার? এমন আর কি, আমরাই তো চাবি দিয়ে দিতে পারি।"

অমরনাথ জবাব দেন—"ওইটি হবে না বৌমা, আমার মরণের দিন পর্য্যন্ত আমার ঘড়ি আমি হাতছাড়া করবো না"—কথা আর বেশী বলতে পারেন না। দুর্ব্বলতায় ঝিমিয়ে পড়েন, বড় বৌমাও আর কিছু বলতে সাহসী হন না।

যা বলেছিলেন, তাই সত্যি হলো। দিন চার পরে অমরনাথ মরে গেলেন—ঘড়িকে তিনি হাতছাড়া করেননি। মরণের দিন পর্য্যন্ত সকাল বেলা সময়-মত ঘড়িতে চাবি দিয়ে গিয়েছেন আর সে-ও বেজেছিলো ঠিক-মত আর শেষ বারের মত তার প্রভুকে গৎ বাজিয়ে শুনিয়েছিলো।

মৃত্যুর পরদিন, সকাল বেলা। অমরনাথের বড় ছেলে অমরনাথের অতি আদরের ঘড়িটাতে চাবি দিতে গেছেন, চাবি দিতে আরম্ভ করতেই 'খট্' করে একটা আওয়াজ হলো আর ঘড়ির স্প্রিংটা সবেগে এসে সজোরে দারুণ আঘাত করলো বড় ছেলের হাতে।

ওই দিন থেকেই ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেলো। অনেক চেষ্টা করেও বাজানো সম্ভব হয়নি।

বৃদ্ধ অমরনাথের কথাই সফল হলো।

স্বগ্রামে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

কুঞ্জলাল ঘোষ

বহু-বিস্তীর্ণ কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিঃশেষে ডুবিয়া থাকিয়াও আচার্য্যদেব কোন দিন তাঁহার নিভৃত পল্লীকে ভোলেন নাই। আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন: 'আমি বৎসরে দুই বার গ্রামে যাইতাম, শীতে ও গ্রীষ্মের অবকাশে। ইহার ফলে আমার মন সহরের অনিষ্টকর আবহাওয়া হইতে মুক্ত হইত। আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও শৈশবস্মৃতি-বিজড়িত গ্রামে গেলে যতটা সুখী হই এমন আর কিছুতেই হই না।'

এই সম্পর্কে ছোট একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। সে-বার আচার্য্যদেব সাতক্ষীরা ষ্টীমারে রাড়ুলী যাইতেছিলেন, ষ্টীমার গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইলে চাহিয়া দেখিলাম, আচার্য্যদেব মুগ্ধ নয়নে একাগ্রচিত্তে উপকূলবর্ত্তী দূরের গ্রামগুলির দিকে তাকাইয়া আছেন। আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন: "দেখ 'বঙ্গ আমার জননী আমার' বলে জীবনে অনেক বক্তৃতা দিয়েছি। কিন্তু যখনই 'আমার দেশ' এই কথাটি উচ্চারণ করেছি তখনই সকলের আগে আমার চোখের উপর ভেসে উঠেছে এই ছোট গ্রামখানির ছবি। আমার দেশের কথা বললেই সমস্ত বাংলা দেশকে ছাপিয়ে এই ছোট গ্রামখানির কথাই আমার বেশী মনে পড়ে।"

গ্রামের প্রতি এই সুতীব্র প্রীতির বশেই তিনি কোন দিন গ্রামকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মজীবনীতে উল্লিখিত 'শিক্ষায় অর্দ্ধশতাব্দী পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারগ্রস্ত ও গোড়ামীপূর্ণ' তাঁহার তৎকালীন স্বগ্রামের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা বাংলার সহস্র সহস্র গ্রামেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁহার প্রিয়পল্লীকে তিনি এই দুর্দ্দশার পঙ্ককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবার বাসনা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিতেন। তাই তাঁহাকে অতি তরুণ বয়স হইতেই গ্রামোন্নয়নকল্পে আত্মনিয়োগ করিতে দেখি। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যদেব বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর-বৎসরই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই তিনি গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তখন রাড়ুলী ও কাটিপাড়ায় কোন ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। ছিল একটি মাইনর স্কুল ও ছোট ছোট কতকগুলি পাঠশালা। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আচার্য্যদেব প্রতি বৎসর শীত ও গ্রীষ্মাবকাশে একবার ফিরিয়া গ্রামে আসিতেন। প্রায় আ-মৃত্যু তাঁহার এই নিয়ম তিনি বজায় রাখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ছুটীতে বাড়ী আসিয়া আচার্য্যদেবের কাজ ছিল রাড়ুলী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের পাঠশালার ছাত্রদের লইয়া তাঁহার দোতলার বৈঠকখানার ঘরে স্কুল বসান। এখানে জাতি-ধর্ম্মের কোন বিচার ছিল না। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের প্রশ্ন ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রেরই ছিল অবারিত দ্বার। যখনকার কথা বলিতেছি, তখনকার দিনে ইহার গুরুত্ব কম ছিল না। আজিকার দিনে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবন হইতে অস্পৃশ্যতা গোঁড়ামী ও জাতিভেদ প্রভৃতি কুসংস্কার ধীরে ধীরে বিদূরিত হইতেছে, কিন্তু সেই অনগ্রসর যুগেই গোঁড়া হিন্দুপরিবার-ভুক্ত রায়-পরিবার এই সব প্রাণহীন প্রথার অসারতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন

এবং রায়পরিবারের অনেকেই বস্তুতঃপক্ষে ইহা মানিতেন না। আচার্য্যদেবের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়ই ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী।

যে সমস্ত পাঠশালার কথা বলা হইয়াছে, সেগুলির অবস্থান ছিল স্বগ্রাম হইতে পাইকগাছা ও আশাশুনি থানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে আচার্য্যদেব স্বয়ং অনেক ক্ষেত্রে পাঠশালা পরিদর্শন করিতে যাইতেন। কিন্তু পরে তাহা সম্ভব হইত না বলিয়া আচার্য্যদেব এক একটি পাঠশালার জন্য এক একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে সমবেত ছাত্র ও শিক্ষকদের আহারাদি ও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল আচার্য্যদেবের গৃহে। দুপুরে আচার্য্যদেব ছাত্রদের পড়াইতেন, পড়া ধরিতেন ও নানা চিত্তাকর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন।

রাড়ুলীতে যে মাইনর স্কুলটি ছিল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যদেবের প্রচেষ্টায় তাহা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ঐ স্কুল প্রথমে আচার্য্যদেবের ঘরিবাটীতেই স্থাপিত হয়। কুড়ি বৎসর পরে উহা তাঁহার নিজস্ব পাকা বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। গ্রীষ্মাবকাশে দেশে আসিয়া আচার্য্যদেব প্রায়শঃ স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে ক্লাস লইতেন। তদানীন্তন শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা মুকুল হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে দেওয়া ও ছাত্রদের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'অমৃত বাজার পত্রিকা' পড়ান তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। এই সময় আমরা ঐ স্কুলের ছাত্র। ঐ সময় হইতে আমার আচার্য্যদেবের সান্নিধ্যে আসিবার যে সুযোগ হয় তাহা চির জীবন অবিচ্ছিন্ন ধারায় অব্যাহত ছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্রজীবনের শেষে ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে খুলনা দুর্ভিক্ষের সেবাকার্য্যে তাঁহার সহকর্ম্মী হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করায় এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে। সেই হইতে আচার্য্যদেব যখনই খুলনা আসিতেন প্রতিবারই আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। বাড়ী, বাগেরহাট ও নৈহাটী যাইবার পথে ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্রামকেন্দ্র।

যাহা হউক, স্বগ্রামে শিক্ষাপ্রসারের প্রসঙ্গেই ফিরিয়া আসা যাক। শিক্ষা-বিস্তারকল্পে আচার্য্যদেবের দান অবশ্য বাংলা দেশ চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। কিন্তু স্বগ্রামে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে

তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন এক দিক্ দিয়া তাহা অভিনব। তাঁহারই উদ্যমে রাড়ুলী গ্রামে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আর, কে, বি, কে, এডুকেশন সোসায়িটী নামে একটি ট্রাষ্ট সৃষ্টি হয়। এই ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য শিক্ষা-বিস্তারের স্থায়ী সংগঠন। ইহার প্রস্তাবনায় এ বিষয়ে লিখিত আছে: এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল রাড়ুলী ও চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামে উচ্চ ও নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন ও সম্ভব হইলে শিক্ষাবিস্তার উদ্দেশ্যে স্থাপিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা…

এই এডুকেশন সোসাইটীর উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষা-বিস্তারেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই। আচার্য্যদেব তাঁহার স্বভাব-সুলভ দূরদৃষ্টির বলে ইহার কর্ম্মক্ষেত্রকে অতিশয় বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন পল্লী-উন্নয়ন ও পল্লীসংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যতীত গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনা ফলবতী হইতে পারে না। তাই পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ও এডুকেশন সোসায়িটীর কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অবশ্য পৃথকরূপে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য পরিচালনা করিতে কাটিপাড়া গ্রামে আচার্য্যদেব 'কাটিপাড়া সেবা-শ্রম' (রেজিষ্টার্ড) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এবং উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হস্তে তাঁহার বেঙ্গল কেমিক্যালের এক হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার দান করেন। এডুকেশন ট্রাষ্টের পরিচালকবর্গের হস্তেও আচার্য্যদেব তাঁহার বেঙ্গল কেমিক্যালে দশ হাজার টাকার শেয়ার দান করেন। উহার বার্ষিক আয় এখন আনুমানিক দুই হাজার টাকা।

শুধু গ্রামকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নত করিয়া তোলা নহে, গ্রামের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার সহিতও তিনি ছিলেন সমভাবে জড়িত। ছোট-বড় সকল অধিবাসীদের সহিত মিশিতেন প্রাণখোলা সারল্যে —সকলেই যেন তাঁহার পরম প্রিয়জন। বয়স ও খ্যাতির ব্যবধান এখানে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত না। এক সময় দেখিয়াছি, আচার্য্যদেব নিজেই স্কুলের ছাত্রদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন নৌকায়—নিজেই টানিতেছেন দাঁড়। নৌকায় গান-বাজনাও চলিতেছে আচার্য্যদেবেরই উৎসাহে। এমনি সহজ ভাবেই তিনি মিশিতেন গ্রামের চাষাভূষা ও অন্ত্যজ অধিবাসীদের সহিত।

আত্মজীবনীতে তিনি নিজেও লিখিয়াছেন: এমনি ভাবে তাহাদের এক জন হইয়া চাষী-মজুর-কিষাণদের সহিত মিশিবার অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই খুলনা দুর্ভিক্ষের সেবাকার্য্য তাঁহার নিকট এত সহজ হইয়াছিল।

সমগ্র ভারত তাঁহাকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সংস্কারক ও বৈজ্ঞানিকরূপে জানিয়াছে। এই বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতির মাঝে আমাদের অতি-কাজের মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র যে কোন দিনই চাপা পড়িয়া যান নাই, স্বগ্রামে আচার্য্যদেবের পুণ্যস্মৃতির কথা স্মরণ করিতে আজ এই কথাই বারংবার মনে পড়িতেছে।

যোগসিদ্ধি

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যোগসাধনার পথের বিঘ্ন

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনা।
লব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।"

'ব্যাধি, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, বিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, লব্ধ ভূমিতে টিঁকিয়া থাকিতে না পারা অর্থাৎ সাধনা হইতে অপ্রকাশের মাঝে স্খলন, নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ'—এইগুলিই অন্তরায় বলে যোগবাশিষ্ঠ বলছেন। এগুলি তো বাধা বটেই কিন্তু আসল কথা এই যে, তোমার আমার যোগসাধনার বিঘ্ন ও তার কারণ তোমার আমার সত্তার মাঝেই অন্তর্নিহিত হয়ে আছে, তার অধিকাংশই তোমারই স্বভাবজ বা প্রকৃতিজাত। তোমারই মন প্রাণ দেহের একাংশ ঊর্দ্ধের শান্তি ও আনন্দকে—পরাজ্ঞান ও পরম মুক্তিকে চায়; আবার তোমারই সত্তার অপর অংশ সে জীবন চায় না, তারা মাটির সুখ-দুঃখময় ক্ষণিক জড়-ভোগকেই আকুল ক্ষুধায় চায়। এই অন্ধ অস্থির স্বভাবজ মাটির টান থেকেই ওঠে সন্দেহ, আলস্য, বিরতি, ভ্রান্তি আদি চিত্তবিক্ষেপ।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—'এই আত্মবস্তু বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়।' বলহীন অর্থে এখানে শুধু শারীরিক বল বোঝায় না, তা' যদি বোঝাতো তা' হলে গামা, কিক্কর সিং, স্যাণ্ডো আদি কুস্তিগীর পালোয়ানরাই সর্ব্বাগ্রে সেই পরম পদের অধিকারী হ'তো। মনের বল, প্রাণের অনাবিল উর্দ্ধমুখী শক্তি এবং সুস্থ সবল স্বচ্ছ অনলস দেহ এবং সর্ব্বোপরি আত্মশক্তি অর্থাৎ উজ্জ্বল স্বভাব-ভাস্বর প্রজ্ঞাই যোগপথের আসল সম্বল।

রোগ, মানস বা দৈহিক দুর্ব্বলতা, তামস জড়তা, সন্দিগ্ধ জড়বুদ্ধি, মলিন রজের বেগ ও তজ্জনিত দর্প, কুতর্কপ্রিয়তা ও অতিভোগ, মায়াপ্রবণতা এই সব হচ্ছে সাধনার বিঘ্ন। এ সব বিঘ্ন উত্তম, মধ্যম, অধম আদি সব মানব-আধারেই অল্প-বিস্তর আছে, তাই বলে এরা সকল ক্ষেত্রে দুর্লঙ্ঘ্য দুরপনেয় নয়। মোটের ওপর আমাদের প্রকৃতির এই সব ছিদ্র দিয়ে জগতের কৃষ্ণ শক্তি সব (malign forces) যোগার্থীকে স্থূলের দিকে টেনে রাখে; কারণ মানুষ মাটির ছেলে, অজ্ঞানের—মায়ার শিশু। অপরা-মায়ের কোল ছেড়ে সে পরা-জননীর কোলে যেতে চাইছে; মৃন্ময়ী মা তার মাটির শিশুকে সহজে ছাড়বে কেন? তাই মাধ্যাকর্ষণের টান কাটিয়ে যেমন এক খণ্ড শিলা সহজে আকাশে উঠতে পারে না, মাটি তাকে তার প্রতি স্থূলকণা দিয়ে অহরহঃ টানতে থাকে, স্থূল জৈব প্রকৃতিও তেমনি মানুষের মন প্রাণ দেহের অজস্র তন্তু দিয়ে তাকে অবিরাম বেগে টানছেই; সেই জন্য সহজ জীবধর্ম্মের অনুগামী হয়ে চলাই তার পক্ষে স্বাভাবিক, উর্দ্ধের শান্ত দীপ্ত পরমানন্দে ছন্দিত জীবন স্বাভাবিকও নয়, সহজও নয়। তবে যে জীবাধারে সাধন লোকেরও উপকরণ আছে, যে যুগপৎ পরা ও অপরা দুই জননীরই সন্তান, সে এক দিন এই অন্তর বুদ্ধির ভোগোপশান্তির বলে আলোর দিকে ফিরবেই ফিরবে।

যোগের বিঘ্নগুলির এক একটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার। ব্যাধি, বিশেষতঃ কোন জরাঘটিত বা ক্ষয়কারী ব্যাধি যোগ-সাধনার অন্তরায়। দেহই যোগের ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্র নিস্তেজ ও বিষণ্ণ থাকলে যোগশক্তি ধারণের সে অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তার উপর রোগ-যাতনা রোগীর সম্বিৎকে দেহস্তরে টেনে রাখে, ঊর্দ্ধে উঠতে দেয় না। রোগবিশেষ যোগের অন্তরায় বটে, কিন্তু আবার যোগ-সাধনার ফলে দেহে নিরাময়তা (ধন্বন্তরি বা curative principle) জেগে দুরারোগ্য ব্যাধিও সেরে যায়; শ্রীঅরবিন্দে সমর্পিত ও একাগ্র হয়ে শুয়ে থেকে থেকে আমি একাধিক যক্ষ্মা রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে দেখেছি—যে রোগীকে সকল চিকিৎসকে অসাধ্য বলে জবাব দিয়ে গেছে। দেহে যক্ষ্মা রোগ যার আছে তার আবার হয়তো এমন সংকল্পের অটুট বল আছে, এমন প্রজ্ঞাদীপ্ত বুদ্ধি ও সত্যের প্রতি অনুরাগ আছে যে, সে যোগে বসে উর্দ্ধের শান্তি ও শক্তিধারা তার প্রশান্ত আধারে আকর্ষণ করে এনে নিশ্চিত মৃত্যু এড়িয়ে বেঁচে উঠলো। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"—'মৃত্যু আমার চুলের মুঠি ধরে বসে আছে যে কোন মুহূর্ত্তে টেনে নিয়ে যেতে পারে' এই ভাব বা বোধ নিয়ে ধর্ম্ম সাধনা করবে', শাস্ত্রের এই উপদেশও কোন কোন রোগীকে নিরাময়ও করে তোলে। যোগশক্তিসম্পন্ন সাধকের স্পর্শে, নেত্রপাতে, সাহচর্য্যে, আশীর্ব্বাদে বা তাঁহার চালনায় যোগে প্রবৃত্ত হয়ে বহু কঠিন রোগীকে নিরাময় হতে দেখা গেছে, অনুসন্ধান করলে আজও বহু শিক্ষিত সুপরিচিত লোক এর চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছেন বলে সাক্ষ্য দেবেন।

দৈহিক দুর্ব্বলতাকে যোগের পরিপন্থী বলে সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু মানস-দুর্ব্বলতা কা'কে বলছি তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক। মনের বল বা সংকল্পের দৃঢ়তা যার নাই সে যোগ-সাধনা ততক্ষণই করে যতক্ষণ তা' সহজ ও সুখদ থাকে; যোগের প্রাথমিক চমকপ্রদ অনুভূতি ও আনন্দ ফুরিয়ে গিয়ে যখন সত্তার বা প্রকৃতির বাধাগুলি মাথা তুলে পথরোধ করে দাঁড়াতে আরম্ভ করে তখন লঘুচিত্ত দুর্ব্বলমনা মানুষ হাল ছেড়ে দেয়, কাজেই সাধনা তার সম্পূর্ণ হওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। এ ছাড়া কঠিন অনমনীয় (unresponsive) সংস্কারান্ধ মনকেও আর এক দিক্ দিয়ে দুর্ব্বল বলা চলে। মনের সে রকম সংস্কারান্ধ অচলায়তন খুব বড় পণ্ডিতের, দার্শনিকের, জ্ঞানীর (intellectual man) ও কুতার্কিকের অনেক ক্ষেত্রে থাকে। সে মন অভ্যস্ত চিন্তা ও সংস্কারের এবং বুদ্ধিবিচারের চাকার দাগে দাগেই ঘুরতে জানে, প্রজ্ঞার আলোটুকু প্রবেশের চিহ্নমাত্র সে পাষাণ-কঠিন মনে নাই। বুদ্ধিজীবী মনের এ পাষাণ-শিলা না গললে বা না ফাটলে এ জাতীয় পণ্ডিতমূর্খের যোগ হয় না। "A learned ignorance is the end of phylosophy and beginning of religion"—বুদ্ধির প্রদীপের ক্ষীণালোকে চলতে অভ্যস্ত জীব প্রজ্ঞার পরম সূর্য্যের দীপ্তির কাছে হয়ে থাকে অন্ধ। কঠিন rigid অনমনীয় মন সন্দেহের ঘর, আনুমানিক জ্ঞান থেকে অন্য আনুমানিক তথাকথিত যুক্তিসহ জ্ঞানে সে হাতড়ে চলে, ভূমা ও তুরীয়কে সে বুদ্ধির তরাজুতেই মাপতে চায়, প্রশান্ত হয়ে সত্যের সহজ আলোয় চোখ মেলতে। ধ্রুব intuitive প্রজ্ঞায় দীপ্ত হতে সে জানে না। এ সব ক্ষেত্রে মনই মনের আবরণ, প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মত অতিবুদ্ধি চলে আপন ছায়া ফেলে আপন অজ্ঞান ও অন্তরাল নিজেই সৃষ্টি করে করে। বিকশিত well-developed বিচারশীল মন বুদ্ধির যখন এত বাধা তখন ক্ষুদ্র অবিকশিত বা তামস জড় মনের পক্ষে উর্দ্ধগতি কত কঠিন তা' সহজেই অনুমেয়। তবে সুখের বিষয় এই যে, মানুষ শুধু মন নয়, তার হয়তো উদার বিপুল হৃদয় ও প্রাণ আছে, হয়তো আছে স্বচ্ছ সুন্দর প্রসাদ গুণযুক্ত যোগানুকূল দেহ। সত্তার এই তিন ধামের কোথায়ও অনুকূল উপাদান থাকলেই কালে সকল বাধা কেটে যায়, জীবনে যোগ জাগে।

সন্দেহ প্রমাদ ও আলস্য তামস জড়তা থেকে আসে। এই তামস জড়তা মনে থাকলে মন হয় অচল, গতিহীন, অন্ধ, সন্দিগ্ধ ও কুতার্কিক; প্রাণে থাকলে প্রাণের গতিস্তেও এই সব অপগুণ গজায়—প্রজ্ঞার প্রসন্ন দীপ্তি থাকে না! মলিন রজের বেগ যোগ-সাধনার একটি প্রবল বাধা। সে বেগ মানুষকে ভোগলোলুপ করে, দর্পান্ধ করে, অতিভোগের উদ্দামতা ও পরে তজ্জনিত অবসাদে চঞ্চল অবসন্ন সেরূপ আধার উর্দ্ধের আনন্দ ও শক্তির দিকে নিজেকে মুক্ত উন্মুখ রাখতে পারে না। মায়াপ্রবণতা যার প্রকৃতিতে অধিক সে হয় অতিমাত্রায় আত্মীয়বৎসল, স্নেহকাতর ও সে সংসারে সর্ব্বদাই থাকে জড়িত হয়ে।

এমনি ভাবে শাস্ত্রে যোগসাধনার পথে যতগুলি বাধার কথা আছে, তার কোনটিই সর্ব্বক্ষেত্রে দুরপনেয় বাধা নয়. তারা সাধারণতঃ অল্পবিস্তর অন্তরায়। উন্মাদের, অতিবৃদ্ধের ও অতিরোগীর যোগ নাই। আবার কিন্তু কোন কোন উন্মাদ রোগ যোগেই নিরাময় হয়; কোথায়ও বা কাহারও দেহে-মনে সহজাত যোগবৃত্তি থাকায় তাকে পাগলের মত মনে হয়। আমি জীবনে কয়েকটি এমন মানুষ দেখেছি যাকে সংসার বদ্ধপাগল বলছে, কিন্তু তার মধ্যে হয়তো আছে সূক্ষ্ম বা কারণ-জগতের দিকে টান, তাকে ঘিরে তাই চলে occult শক্তির খেলা। সংসারের আবেষ্টনের চাপে রুদ্ধ সেই খেলা যখন দুই বিপরীত-মুখী আকর্ষণের টানাপোড়েনে অধাতস্থ ও hysteric হয়ে থাকে, তখন তাকে উন্মাদ বলেই মনে হয়।

রূপোন্মত্ত অহংকারী অতিকামুক ভোগমূঢ় অশান্ত প্রাণবান্ মানুষ তখনকার অবস্থায় যোগে অনধিকারী। ভোগের দিকে—যশ অর্থ প্রতিষ্ঠা ও নারীর দিকে যার দুর্ব্বার লালসা তার সে অশান্ত গতি ভোগক্ষয়েই ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসবে, নিজস্ব ত্যাগ গোড়াতে তার পক্ষে পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ভোগাবসানে কথঞ্চিৎ প্রশান্ত নির্ম্মল প্রাণে জাগে সংসারে আংশিক বিরতি ও সত্যের দিকে আসে ঝোঁক। তখন কোন যোগীর সাহচর্য্যে বা স্পর্শে এই উদ্দাম প্রাণাগ্নির শিখাগুলি একবার সত্যমুখী হলে এই বিশাল প্রাণ হয় যোগের অপূর্ব্ব অনুকূল ক্ষেত্র। রজঃশক্তিই তাকে অধ্যাত্ম অনুশীলনে অসাধ্য সাধন করায়। তবে প্রচুর প্রাণশক্তির সঙ্গে নির্ম্মল প্রশান্ত বুদ্ধি না থাকলে সে ধূমায়িত রজে বার বার পথ ভুল হয়, রাজসিক মানুষ সহজলব্ধ যোগশক্তি নিয়ে গুরুগিরীর লাভজনক ব্যবসা করতে পারে, নিজেকে অবতার বা মূর্ত্ত ভগবান্ বলে শিষ্যমুখে প্রচার করে ভক্তসংগ্রহে ও মঠ-মন্দির রচনায় প্রতিষ্ঠার পথে চলে যেতে পারে, তার ফলে যোগ-সিদ্ধি তার কিছু অগ্রসর হয়েই থমকে থাকে—আরও ভোগের ফলে ভোগক্ষয় ও তজ্জনিত পরম বিরতির প্রতীক্ষায়।

তামস unresponsive রুদ্ধ ক্ষিতিধর্ম্মী প্রকৃতিও যোগের অনধিকারী। সে রকম আধারে বুদ্ধিও হয় জড়, প্রাণও হয় জড়,

মাটির static অচলত্বের তারা হচ্ছে অবতার, সব কিছুই তাদের মধ্যে এখনও মুকুলিত ও অস্ফুট; কোন রকম উন্নতিতে ও উর্দ্ধগতিতে তাদের স্বাভাবিক রুচি ও প্রেরণা নাই। এই তম বা জটল স্থিতি-পরায়ণতা মূক ও মূঢ় হয়ে না থেকে যদি কোন রকমে দীপ্ত হয়, সচেতন হয়, তা হলে সে উজ্জ্বলতম যোগীদেরও পরম বাঞ্ছিত সেই সমাহিত প্রশান্তিতে পরিণত হয়, বহু তপস্যায় বহু ভোগক্ষয়ে এবং ত্যাগাভ্যাসের পর একেবারে সিদ্ধির সিংহদ্বারে গিয়ে যে প্রশান্তিকে যোগীরা পায়। তাই সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের প্রকৃতির কোন অপূর্ণতা বা পঙ্গুতাই যোগের চরম বাধা নয়, সাময়িক বাধা মাত্র। ভাল-মন্দ সব কিছুই জীবনের উন্নতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পাথেয়, কারণ, তুমি আমি ও গোটা জীবজগৎ এগিয়েই চলেছি, সজ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক। আত্মানুভূতি আমাদের সত্তার গভীরে আশৈশব আছেই, তার পুঁজি দিন দিন বাড়ছে, অর্গল-গুলি সঞ্চিত জীবন-জলের বেগে একে একে স্বতঃই খুলছে, কারণ, এই আত্মানুভূতি আমাদের স্বভাব। মাটিতে জন্মে কেঁচো যেমন মাটি খেয়ে বাঁচে ও বাড়ে, সম্বিতের ও চৈতন্যের শিশু আমরা তেমনি উদীয়মান চেতনার আলোয় ফুটে চলেছি।

যোগপথে যখন উর্দ্ধের সূক্ষ্ম অনুভূতির দুয়ার ঈষৎ খুলে গিয়ে নানা চমৎকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি spiritual experiences হতে আরম্ভ হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সন্দেহ, অধীরতা ও দর্প। "বুঝি ভুল পথ ধরেছি, যা দেখছি, অনুভব করছি, এ সব হয়তো অলীক মনের খেয়াল," এই রকম সন্দেহবশে আমরা নূতন অভিজ্ঞতা থেকে সরে যাই, আলোর ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারটুকু আবার রুদ্ধ হয়ে আসে, সে সন্দেহ-বাত্যায় জ্ঞানের ও অনুভূতির ক্ষীণ দীপশিখা-টুকু যে কোন মুহূর্ত্তে নিবে যেতে পারে; কাজেই সন্দেহ, দ্বিধা, ভয় আনে self inhibition বা দূষিত নিরোধ, ফলে মানুষের বিকাশোন্মুখ সত্তা আবার চেপে গিয়ে মুকুলিত হয়ে যায়। মানুষের প্রকৃতিকে বিকৃত ও ছন্দহারা করতে এই জাতীয় নিরোধের মত এমন অপকারী আর কিছুই নাই, এর দ্বারা দেবতুল্য মানুষও পশু ও পিশাচে পরিণত হতে পারে।

যোগলব্ধ জ্ঞান বা শক্তিলাভের বশে অহঙ্কারে মত্ত হলেও সাধকের পতন ঘটে। অল্প লাভকে বড় বলে—চরম লাভ বলে ভ্রমের বশে লোককে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে চিত্ত চঞ্চল হয়। চিত্তেরই প্রশান্তির ফলে পাওয়া যোগ সম্পদ, সুতরাং শান্ত ভিত্তিটি নষ্ট হওয়ায় হারিয়ে যায়, তখনকার মত পিছনে সরে যায় যোগলব্ধ জ্ঞান। ভয়ের বা দর্পের বশে বহু সাধককে পাগল হতে দেখা গেছে। রাজসিক প্রকৃতিতে অনেক সময় আশু সিদ্ধির জন্য দুরন্ত লোভ ও ব্যাকুলতা জাগে, অধীর অশান্ত সাধক উপরের অনুভূতিকে টানাটানি করতে থাকে, তার ফলে strain বা কষ্ট হয়, দেহ-মন বা স্নায়ু সে অতি প্রয়াসজনিত বেগ ধারণ করতে না পেরে ভেঙ্গে পড়ে; এরই ফলে বহু ক্ষেত্রে ঘটে স্নায়বিক বিকৃতি—হিষ্টিরিয়া, পূর্ণ উন্মাদ রোগ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা জটিল ব্যাধি। হঠাৎ একটি উর্দ্ধের অনুপম অনুভূতি, আনন্দ, অখণ্ড মুক্তি ইত্যাদি পেয়ে নার্ভাস ভীরু সাধক যদি হঠাৎ বিচলিত হয় বা ভয় পায়, সে ভয়েরও তখন অনুরূপ কুফল হতে পারে। এই জন্য লব্ধ, সিদ্ধ ও জ্ঞানী যোগীর অধীনে থেকে যোগ সাধনা আরম্ভ করাই নির্বিঘ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর ব্যাকুলতার দ্বারা ভগবান লাভ করেছেন এই ধারণার বশে অনেকে অশান্ত অধীরতাকে ব্যাকুলতা বলে ভ্রমে পড়েন। তাঁরা এটা ভুলে যান যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মত ক'টি আধার জগতে আছে। উর্দ্ধের সত্যের সূক্ষ্ম দিত টান ও নিম্নের অধীরতা এক নয়, সত্যের টানে মন-প্রাণ যায় স্থির হয়ে ডুবে, কিন্তু চঞ্চল অধৈর্য্যে সাধনার ভিত্তি যায় টলে।

মানুষের প্রকৃতিতে এমন সব চোরা বালি বা দুর্ব্বল অংশ (weak links) আছে—প্রাণে, মনে, দেহে, স্নায়ুর ক্ষেত্রে, যে শক্তি, আনন্দ বা জ্ঞানের হঠাৎ প্রবল অবতরণ বেগকে ঐ দুর্ব্বল অংশ ধারণ করতে পারে না, বন্যার মুখে ক্ষীয়মাণ তটের মত সে দুর্ব্বল ভূমি ধ্বসে যায়; শিকলের দু'দিক্ ধরে প্রচণ্ড টান দিলে তার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অংশটাই ছিঁড়ে যায়। সবল পূর্ণ বিকশিত (harmoniously developed) মন প্রাণ দেহ যার আছে সে সুসংহত শক্তিমান্ (evenly balanced) পুরুষের পক্ষেই যোগ-সাধনা একেবারে নির্ব্বিঘ্ন। তা' হলেও কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আর্ত্ত, দুর্ব্বল, অসম্পূর্ণ মানুষকেও আশু ফললাভ করতে দেখা গেছে, কারণ, উর্দ্ধের শক্তির গতি হচ্ছে অচিন্তনীয়—বহু তপস্যা, মেধা ও শ্রুতিপাঠে যা' হয় না অনাবরণ সত্যের অমোঘ প্রকাশে সেই জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আপন অনুপম কৌশলে নিজেই তা' করে দেন। একেই আমরা বলি ভাগবত কৃপা, যারা তা' পায় তাদের বলি 'কৃপাসিদ্ধ'।

যোগ হচ্ছে জীবনের মত—বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মত, বসন্ত-স্পর্শের মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত বস্তু, আপন বেগে সে আপনি বিক-শিত হয়ে চলেছে। সেই পরম প্রবাহে নিজেকে হাত পা ছেড়ে ভাসিয়ে দেও, স্রোতে আত্মসমর্পণ করে নির্ভয়ে একান্ত নির্ভরে স্থির হয়ে থাক, স্রোত তোমায় অব্যর্থ গতিতে মহাসিন্ধু-সংগমে নিয়ে যাবে। স্থির সমর্পণে থাকো তাই পরমগতির সহজ পথ। অক্লান্ত অহংকারাশ্রিত চেষ্টায় যা' না হয়, আত্মনিবেদনের প্রশান্তির মাঝে তা' সূর্য্যকরস্নাত শতদল পদ্মের মত আপনি ফুটে পড়ে—আপন মধুগন্ধ-সুষমায়।

আসল কথা, মানব-প্রকৃতির সবটুকুই এক 'দিক্ দিয়ে এক অবস্থায় বাধা, আবার অবস্থান্তরে সেগুলিই স্থির উজ্জ্বল দীপ্ত হলে সাধনার অনুকূল উপাদানেই পরিণত হয়। জীবত্ব শিবত্বেরই যেন বিপরীত বা উল্টা দিকটি; অখণ্ড শিবত্বকে গুটিয়ে সংবরণ করেই জীব হয়—বৃহৎকে যদি ক্ষুদ্র হতে হয়, তা' হলে নিজের অখণ্ডত্ব বা প্রসারতাকে গুটিয়ে বিস্মৃতির মাঝে লুপ্ত করতে হয়। পাশবদ্ধ শিবই জীব, পাশ-মুক্ত জীবই শিব। যে মন, প্রাণ, চিত্ত, দেহ চঞ্চল বহির্মুখী হলে সে অবস্থায় যোগের বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়, আবার সেই একই চিত্ত ও দেহ প্রশান্ত সচেতন জ্ঞানোজ্জ্বল হলে যোগধর্ম্মের স্ফুরণের অনুকূল ক্ষেত্র ও উর্ব্বর ভূমি হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের সঙ্কল্পকৃত সাধনার ফলাফল হিসাবে দেখি বলেই আমরা বিঘ্ন খুঁজি। আসলে বলতে গেলে ঐশী ইচ্ছাই বিঘ্ন হয়ে দেখা দেয় সংকল্পকে দৃঢ় করবার জন্য—সিদ্ধিকে দুঃসাধ্য ও দুর্ল্লভ করবার জন্য, তোমারই সত্তার জীবধর্ম্ম জড়ানুগ গতি তোমাকে পরম পদ থেকে—গণ্ডী ভেঙ্গে বৃহৎ হওয়া থেকে সীমার মধ্যে টেনে রেখেছে। এই ভাবে আপাততঃ বাধারূপে প্রতীয়মান ঐশী ইচ্ছা তার জীবভাব—তার

সংরক্ষণ শীলতার বশে জড়ধর্ম্মের অচলতার বশে নানা বাধা সৃষ্টি করতে করতে জীবকে শক্তিমান্ করে চলে। পরা ও অপরা একই মহাশক্তির দুই দিক্, একই উদ্দেশ্যে তাদের যুগ্মখেলা। অপরা জননীই দেহী জীবের প্রকৃত জন্মদাত্রী, তাঁরই মায়া শক্তির বশে বিরাট শিব সত্তা নিজেকে সংহরণ করে গুটিয়ে আপনার দেশকালাতীত ভাবের অপহ্নব ঘটিয়ে নূতন দেশ ও কাল সৃষ্টি করে তাতে ক্ষুদ্র দৃশ্য হয়ে জাগে, নিজের অনন্তে ছড়ানো সত্তাবোধ একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীকৃত করে শিব সত্তা হয় দেহগত জীব—দেশকালের শিশু।

এই-ই হচ্ছে তার আবির্ভাবের কৌশল তার রূপায়ণের গূঢ় রহস্য। দেহী হয়ে অপরা জননীর কোলে জীব সত্তা শক্তিতে জ্ঞানে আনন্দে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করতে থাকে, যতক্ষণ সে বিকাশ তাকে সজ্ঞানে গণ্ডী ভেঙ্গে তার স্ব-স্বরূপে ফিরে নিয়ে যাবার মত উপযোগী চরম বিকাশ না হয়, ততক্ষণ অপরা মাতা তার কোলের শিশুকে ছাড়ে না, মহামায়ার পরারূপের কোলে ফিরে দেয় না। এই উর্দ্ধের দৃষ্টিতে দেখলে চোখের বিঘ্ন কোথায়, বিঘ্ন যে বিকাশেরই ধারা, সুদূরের্ভেরই ডাক, অসীমেরই আবাহন ও তার পরম কৌশল। পরমার্থ দৃষ্টি বাধা না হলেও এ বাধাকে বুঝতে হবে, কোথায় কোন্ উর্দ্ধগতি আটকাচ্ছে তা জ্ঞান নেত্রে দেখতে পেলেই সে আটক গলে যায়, জীবের শিবায়ন দ্রুত ও সজ্ঞান হয়; বন্ধনই নিয়ে চলে পরম মুক্তি সঙ্গমে।

"ক্রন্দসি ধরণি"

শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি বিনিদ্র নয়ন—
দাঁড়াইনু আসি বাতায়নে,
অতিদূর বনান্তরে কে যেন কাঁদিয়া ফেরে
অব্যক্ত রুদ্ধ অভিমানে।
মনে হয় জীবধাত্রী ব্যথিতা ধরণী—
দীর্ণ শীর্ণ বিষণ্ণ অন্তরে,
নিরুপায় বেদনায় লুকাইয়া মুখ—
রাতের আঁধারে কেঁদে ফেরে।
ঐশ্বর্য্যশালিনী ধরা, সন্তানে তাহার—
করিয়াছে লালিত যতনে,
অন্নহীন, বস্ত্রহীন রোগে শোকে হায়
আজ তারা ক্লিষ্ট অপমানে।
জীর্ণ আবরণে ঢাকে অর্দ্ধনগ্ন তনু—
তপ্ত অশ্রু ঝরেছে ধূলায়,
সন্তান-ক্রন্দন-রোলে হয়ে ব্যথাতুরা
বসুন্ধরা কাঁদে নিরুপায়।

অশ্রু-অর্ঘ্য

পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ

১৩ই আষাঢ় ভট্টপল্লীর বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। এরূপ অমায়িক, সরল ও সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তি আজ-কাল বিরল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি!

কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

'ইণ্ডাষ্ট্রী' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ই আষাঢ় পুরীতে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ঐ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া অবধি তিনি যোগ্যতা ও দূরদর্শিতার সহিত উহা সম্পাদন করিয়া আসেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'কমার্শিয়াল ইণ্ডিয়া' নামে আর একখানি পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সরকারী নিষেধে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রকাশ বন্ধ হয়। তাঁহার রচিত বহু পুস্তক ব্যবসায়ী-মহলে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। ভারতের সংবাদ পত্র সেবার উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল ও বহু দিন তিনি ভারতীয় সাংবাদিক-সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ২২শে আষাঢ় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল।

রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১শে জ্যৈষ্ঠ খ্যাতনামা চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের চিত্র ও নাট্য-জগতের বিলক্ষণ ক্ষতি হইল।

শ্রীতারানাথ রায়

রুশ-কৃপা।—

ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক শক্তি এখনও সোভিয়েট কৃপা-প্রার্থী। এ কথা সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, রুশিয়া জাপানকে প্রত্যক্ষ ভাবে আক্রমণ না করিলে এংলো-স্যাক্সন শক্তিদ্বয়ের পক্ষে জাপানকে কাবু করা মুস্কিল হইবে। প্রস্তাবিত বার্লিনের ত্রিশক্তি বৈঠকে এ সম্বন্ধে একটা বুঝা-পড়া হইবে, বলিয়া আশা করা যাইতেছে। জাপানের সহিত চুক্তি ঝালাইতে রুশিয়া সম্মত হয়

নাই, মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে সোভিয়েট সেন্সররা যেরূপ কড়াকড়ি করিতেছে তাহাতে অনেকে মনে করিতেছেন, গোপনে গোপনে রুশসৈন্য পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব্ব সীমান্তে পার করা হইতেছে।

রুশিয়ার দাবী—

রুশিয়া বর্ত্তমানে যেন তাহার পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্তগুলি সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত। তুরস্কের নিকট না কি সে কড়া দাবী করিয়াছে যে, ডার্ডানেলিস সম্বন্ধে মনট্রু কনভেনসনের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, সোভিয়েট য়ুনিয়নের সুবিধা মত তুরস্কের সীমান্ত পুনঃ সংগঠন করিতে হইবে, বলকানে রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনে তুরস্ককে সম্মত হইতে হইবে। তুরস্ক এ সম্বন্ধে না কি বৃটেনের পরামর্শ চাহিয়াছে। এই ভাবে সিরিয়া, ইরাণ, চীনা সীমান্ত এমন কি এলজিয়র্শে পর্য্যন্ত রুশ-প্রভাব বিস্তার করিবার দাবী সোভিয়েট নায়করা করিতেছে। রুশিয়া চাহে যে, তুর্কী ও রুশ ব্যতীত বিদেশী কোন রণতরী ডার্ডানেলিসে থাকিতে পারিবে না এবং ডার্ডানেলিস ও ইজিয়ান সাগর রক্ষার জন্ত তুর্ক-রুশ ঘাঁটী প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুরস্ক সরকারকে অধিকতর গণতান্ত্রিক ও জন-প্রতিনিধিমূলক করিবার দাবীও না কি রুশিয়া করিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরের তটবর্ত্তী দেশগুলিতে সোভিয়েট-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে প্রধানতঃ ইংরেজদের বিপদের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাঞ্জিয়ার, তুর্কী, ইরাণ ও সিরিয়ায় রুশিয়া যে কি চাহে তাহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিতে চেষ্টা করিব।

লণ্ডনপ্রবাসী পোলদের দুর্দ্দশা—

ইংরেজরা অবশেষে লণ্ডনে নির্ব্বাসিত তাহাদের আশ্রিত পোলদের পরিহার করিয়া রুশ-করধৃত পোল সরকারকে মানিয়া লইয়াছে। সুবিধাবাদী ইংরেজ এখন বলিতেছে—অনিবার্য্য ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া পোলরা দেশে ফিরিয়া যাউক। "If they recognise that Poland is more important than the Pilsudiski tradition and Russian friendship an indispensable condition of Polish freedom and harmonious development, they should find that elements already estabished in Poland and formerly considered hostile, will be glad to come to terms with them"। কিন্তু লণ্ডন-প্রবাসী পোলদের সাহায্যে ইংরেজের সোভিয়েট-বিরোধী প্রচার-প্রচেষ্টায় যে কাহিনী প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্বন্ধে ইংরেজরা বা তাহাদের করধৃত পোলরা কোন সাফাই প্রদান এ পর্য্যন্ত করে নাই।

বার্লিনে ত্রিশক্তি—
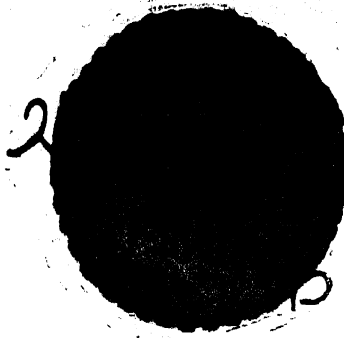
রুশরা অবশেষে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্তদের বার্লিনে প্রবেশ করিতে দিয়াছে, তবে রুশদের ব্যবহার না কি তেমন ভাল নহে। ইংরেজ সৈন্যদের যেখানে সেখানে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। এক জন ইংরেজ সেনাপতি বলিয়াছেন—"For some reason, which I myself do not know, there was mis-understanding between our own Government and that of our Russian Allies and no accomodation for troops under my command was provided."

চীন-জাপ যুদ্ধ—

৭ই জুলাই চীনা-জাপানী যুদ্ধের অষ্টম বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। চীনারা দাবী করিয়াছে যে, এই আট বছরে ২৫ লক্ষ জাপানীকে তাহারা হতাহত করিয়াছে (১৩ লক্ষ নিহত)। চীনা মরিয়াছে ইহার অপেক্ষাও অধিক। জেনারল চিয়াং কাইশেক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন—বর্ত্তমানে যুদ্ধের চরম অবস্থা উপস্থিত। আশা করিতেছি, মিত্র-সৈন্ত জাপ-দ্বীপে অবতরণ করিবে। জেনারল ষ্টিলওয়েলও বলিয়াছেন—The air war alone will not stop the Japaneese. We must meet him on his home land and kill him. কিন্তু মিত্রপক্ষের ১৪শ আর্ম্মির সেনাপতি লেঃ জেনারল সার উইলিয়াম শ্লিম এই অতি-উল্লাসে যোগ দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"All my experience has proved that the Japaneese fight to the very last. I think it is very unwise to calculate on anything less than a fight to the death, and all our preparations for the war with Japan must be made on this basis." মিত্রপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কায় জাপ-দ্বীপে জার্ম্মাণীর সিগফ্রিড লাইনের ন্তায় দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিবার জন্ত জাপানীরা দিবারাত্র শ্রম করিতেছে।

চীনে মিত্রশক্তি জাপানকে কি ভাবে পরাজিত করিতেছে তাহার পর্য্যাপ্ত সংবাদ বণ্টন করা হইতেছে না। এইটুকু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, ইন্দো-চীন সীমান্তে ও কোয়াংশি প্রদেশে প্রবল যুদ্ধ হইতেছে। চীনের অন্ততম উপকূল প্রদেশে চেকিয়াংএ মিত্রপক্ষের সৈন্ত অবতরণের সম্ভাবনা আছে আশঙ্কা করিয়া জাপানীরা সে অঞ্চল সুরক্ষিত করিতেছে।

আক্রান্ত জাপান—

জাপ-দ্বীপের উপর প্রায় প্রত্যহই মার্কিণ সুপার-ফোর্ট আক্রমণ চলিতেছে; ৩১শে মে পর্য্যন্ত মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণের ফলে

জাপানের ৫টি শিল্প-প্রধান সহরের প্রায় ৪১ লক্ষ জাপসৈন্য হতাহত হইয়াছে। ২৮শে আষাঢ় ১ হাজারের অধিক বিমান টোকিওর উপর প্রবল আক্রমণ করে।

আমেরিকান সামরিক কর্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন—যে দিন ইচ্ছা তাঁহারা অবাধে জাপান আক্রমণ করিতে পারেন।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম তৈলখনিগুলি এখনও জাপ-কবলমুক্ত হয় নাই। দক্ষিণ সুমাত্রা ও যাভায় এই সকল পেট্রোল-খনি অবস্থিত। বর্ত্তমানে মিত্রশক্তিগণ জাপানের এই তৈলসম্পদ্-সংগ্রহের পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা অনুমান করিতেছে যে, এইবার জাপানকে এই দ্বীপপুঞ্জের তৈল না পাইয়া কৃত্রিম পেট্রোলের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তবে ইহাও মনে করা হইতেছে যে, জাপান এই তৈলভাণ্ডারগুলি মিত্রশক্তির হাতে তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে মজুদ তৈল নষ্ট করিয়া দিবে।

ফরমোজার উপরেও অবিরাম বোমাবর্ষণ করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাণ্টনও বাদ যাইতেছে না।

চীনা-সমুদ্রে মার্কিণ নৌবহর কোরিয়ার দক্ষিণে জাপ নৌবহরকে আক্রমণ করিতেছে।

বোর্নিওতে মার্কিণ সৈন্যের অবতরণ-আক্রমণের ফলে ইতিমধ্যে প্রায় ৩ হাজার জাপসৈন্য নিহত হইয়াছে।

নিউগিনি ও সোলেমন দ্বীপে আক্রমণ মন্দ হইতেছে না। নিউগিনিতে বর্ত্তমানে ১০ হাজার এবং সোলেমন দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ১১ হাজার জাপানীর বাস। জাপান আশঙ্কা করিতেছে যে, সুমাত্রার ৩০০ মাইল উত্তরে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্ব দিকস্থ সমুদ্রে তাহারা যে মাইন স্থাপন করিয়াছিল মিত্রপক্ষীয় রণতরীগুলি সে সকল মাইন উত্তোলন করিতেছে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য—সিঙ্গাপুর ও মালয় আক্রমণ করা। ইতিমধ্যে না কি ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে এবং সম্ভবতঃ মালয় হইতে দলে দলে জাপসৈন্য উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে। সিঙ্গাপুর এবং যবদ্বীপ হইতেও বেসামরিক জাপানীদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইতেছে।

ব্রহ্মের সর্ব্বত্র এখন বর্ষা ও বন্যা প্রবল। ভূমি সর্ব্বত্র গভীর কর্দ্দমে আবৃত। ব্রহ্মের যুদ্ধ বর্ত্তমানে তাই প্রবল হইতে পারিতেছে না। ব্রহ্মে পেগুর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সিতাং নদী অতিক্রম করিয়া পশ্চিম-মুখী হইবার জন্য জাপানীরা প্রবল চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাপানীরা মৌলমিন হইতে অবিরাম সৈন্য ও রসদ প্রেরণ করিতেছে। এই দিকে জাপানীরা প্রবল আক্রমণও করিতেছে। এই আক্রমণ না কি—"more determind than in weeks past.

২৮শে আষাঢ় মিত্রপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে, পেগুর ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সিটাং নদীর বাঁক অঞ্চল হইতে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা সুশৃঙ্খল ভাবে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। জাপানীরা বর্ত্তমানে সিঙ্গাপুর হইতে ব্যাঙ্কক-মৌলমিন রেলপথ দিয়া এবং ফরাসী-ইন্দোচীন হইতে শাখা রেলপথ দিয়া পূর্ব্ব-ব্রহ্মে দ্রুত সমরোপকরণ সরবরাহ করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, শান পাহাড়ের নিকট বড় একটি যুদ্ধের আয়োজন জাপান করিতেছে।

কিন্তু সাহায্য অপরিহার্য্য—

চীনের সাম্যবাদীদের শত্রু ডিক্টেটর মার্শাল চিয়াং কাইশেকের তথা রুশ-বিদ্বেষী চুংকিং সরকারের পক্ষ হইতে সোভিয়েটতন্ত্রের সহিত যাচিয়া প্রেম করিবার জন্য চীনের নয়া প্রধান মন্ত্রী ডাঃ টি ভি সুং ষ্টালিনের সহিত দেখা করিয়াছেন (৩০শে মে)। ঐ সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার প্রধান মন্ত্রীও ষ্টালিনের নিকট আহূত হইয়াছেন। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া রুশিয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে রুশ-সাহায্য ক্রয় করিবার আয়োজন চলিতেছে। ডাঃ সুংকে হয়ত বহির্মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইবে। চীনারা আশা করিতেছে যে, বহির্মঙ্গোলিয়ার স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার সম্বন্ধে তুল্য অনুরোধ রুশিয়া করিয়া বসিবে। সিনকিয়াংএর রাষ্ট্রমর্য্যাদা সম্বন্ধেও রুশিয়ার সহিত চীনকে রফা করিতে হইবে। অনেকে ইহাও মনে করিতেছেন যে, জাপযুদ্ধে রুশিয়ার সাহায্যের মূল্যস্বরূপ মাত্র সিনকিয়াং, বহির্মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া নহে, কোরিয়ার উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে রুশিয়াকে দেওয়া হইবে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিবার মতন যে, প্রকৃত জাপবিরোধী চীনা কমুনিষ্টরা চীনের নবগঠিত পিপল্স পলিটিকাল কাউন্সিলে যোগদান করিতে সম্মত হয় নাই। তাহারা স্পষ্ট বলিয়াছে যে, এই কাউন্সিল "is packed with supporters of the Kuomintong and convened to promote civil war." অনেকে অনুমান করিতেছেন, চীনা কমুনিষ্টদের সহিত চিয়াং-পন্থীদের আপোষ-মিলনের ঘটকালী করিবার জন্য ডাঃ সুং রুশিয়াকে অনুরোধ করিবেন। এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, চীনা কমুনিষ্টরা বলিয়াছে—"had they not compelled the Generalissimo to vow resistance at all cost ; Japan might never have been opposed in her conquest of centrally administered China" জাপ-যুদ্ধে চীনা কমুনিষ্টদের সুসংগঠিত সামরিক সাহায্য মিত্রপক্ষের অপরিহার্য্য। এ জন্যও রুশিয়ার সহিত ভাব করিতে হইবে। কিন্তু বিখ্যাত মার্কিণ লেখক এডগার স্নো মত-প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমেরিকা যদি মার্শাল চিয়াং ও তাঁহার কুয়োমিনতাং দলকে সমর্থন করিতে থাকে আর রুশিয়া যদি ইয়েনানের চীনা কমুনিষ্ট সরকারকে সমর্থন করে, তাহা হইলে মহা সঙ্কটের উদ্ভব হইবে।

—★—

ক্রিকেট

এম, সি, সি, দলের ভারতে আগমন :— পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে খেলার মরশুম শুরু হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড-প্রবাসী অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের বাছাই খেলোয়াড় লইয়া ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট-প্রতিদ্বন্দ্বিতা খেলা হইতেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কর্ত্তৃপক্ষও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। যাহাতে আগামী শীত ঋতুতে এম. সি, সি, সম্প্রদায়ের একটি দল ভারতে আসিতে পারে, এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ডাঃ পি সুব্বারায়ণ এম, সি, সি, সভাপতি সার পেলহাম ওয়ার্ণারের সহিত বন্দোবস্ত করিতেছেন। মাদ্রাজ প্রাদেশিক কন্ট্রোল এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ সি, পি, জনষ্টন বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে আছেন। তাঁহাকে এই বিষয়ে ভারতের পক্ষে আলাপ-আলোচনা চালাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ এম, সি, সি, দল ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে করাচীতে আসিয়া পৌঁছিবে ও ভ্রাম্যমান দলটি ভারতে মোট নয়টি খেলায় যোগদান করিবে। তন্মধ্যে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে তিনটি টেষ্ট খেলাও অনুষ্ঠিত হইবে। কেবলমাত্র আন্তঃপ্রাদেশিক বা পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় অভ্যস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়গণ এইরূপ মিলন হইতে যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় ক্রিকেটদলের সিংহল সফর :—

বিগত ক্রিকেট-মরশুমের প্রায় শেষ সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট-দল সিংহল পর্য্যটন করে। গত বার কণ্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ রঙ্গরাওএর প্রতিশ্রুতি অনুসারে যাহাতে এবারেও অনুরূপ একটি দল সিংহলে পাঠানো যায়; সে জন্য মিঃ রঙ্গরাও ও ডাঃ সুব্বারায়ণ একমত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েক জন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ইতিমধ্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অন্যান্য খেলোয়াড়গণ আগামী ২১শে জুলাই কলিকাতায় বোর্ডের অধিবেশনে মনোনীত হইবে। মাদ্রাজ হইতে গোপালম, রামসিং, রঙ্গাচারী, পার্থসারথি ও জগন্নাথন; মহীশূর হইতে পালিয়া; হায়দ্রাবাদ হইতে গোলাম আমেদ; দক্ষিণ পাঞ্জাব হইতে অমরনাথ ও বলেন্দ্র সিং; হোলকার হইতে মুস্তাক আলী ও সি, এস, নাইডু ও বরোদা হইতে হাজারী আমন্ত্রিত হইয়াছেন। উক্ত দলের ম্যানেজার হইয়া যাইবেন মিঃ পঙ্কজ গুপ্ত। ভারতীয় দলের বিভিন্ন সফরের ম্যানেজার হিসাবে মিঃ গুপ্ত যে ভূয়োদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, এই দলে কোনরূপ অশান্তি, অসহযোগ বা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিবে না। গত বার বিশেষ শক্তিশালী ভারতীয় দলের আশাতীত বিপর্য্যয় ও নৈরাশ্যজনক পরিচয়ে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল এবং দলগত সংহতি যে অটুট ছিল না, এই বিষয়ে সকলেই সন্দেহ করিয়াছিল। প্রকাশ, ভারতীয় দল সিংহলে মোট পাঁচটি খেলায় যোগদান করিবে।

এম, ডি, ডি,

হকি

ল্যাগডেন্‌-স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস

বাঙ্গালার খেলা-জগতে পরলোকগত মিঃ আর, বি, ল্যাগডেনের নাম সুপরিচিত ছিল। ক্রিকেট ও হকী খেলোয়াড় হিসাবে যৌবনে তাঁহার নাম ছিল। খেলার মাঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও এই আজন্ম ক্রীড়াব্রতী খেলার জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে তিনি বাঙ্গালার খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিমান-দুর্ঘটনায় অকালে পরলোকগত তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙ্গালা হকি-কর্ত্তৃপক্ষ বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপ নামে একটি প্রতিযোগিতা চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গালার যে কোন দল ইহাতে যোগদান করিতে পারিবে এবং বাইটন প্রতিযোগিতা সুরু হইবার পূর্ব্বেই এই অনুষ্ঠানের পর্ব্ব শেষ করার ব্যবস্থা করা হইবে। হকি এসোসিয়েশন এই ভাবে মিঃ ল্যাগডেনের স্মৃতির প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলির বন্দোবস্ত করিয়াছে।

ফুটবল

লীগ প্রতিযোগিতার সমাধা-পর্ব্ব :—

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের খেলা প্রায় শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। দুই বার লীগ-বিজয়ী প্রবীণতম ভারতীয় দলে মোহনবাগান ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দল ইষ্ট-বেঙ্গল সমান সংখ্যক পয়েণ্ট পাইয়া একযোগে লীগের শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু মোহনবাগানের সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী এরিয়ান্সের নিকট পুনরায় এক গোলে পরাজিত হইয়াছে। ইহাতে মোহনবাগানের লীগজয়ের পথে যথেষ্ট বাধা পড়িল এবং ইষ্টবেঙ্গলের জয়ের পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল। তবে শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। দ্বিতীয়ার্দ্ধের লীগের খেলায় যে ভাবে যোগ্যতার সহিত ইষ্টবেঙ্গল প্রতিটি খেলায় দৃঢ়তা ও দক্ষতার আভাষ দিয়া বিজয়াভিযান চালাইয়াছে, তাহাতে তাহারা যে এ-বৎসর চরম সম্মানের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী খেলায় গত বৎসরের শীল্ডবিজয়ী বি এণ্ড এ রেলদলের বিরুদ্ধে যেরূপ চমকপ্রদ ক্রীড়া-নৈপুণ্য সহকারে মোহন-বাগান জয়ী হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পরন্তু, তিন বৎসর পর পর বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করার জন্য তাহাদের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় আপ্রাণ চেষ্টা করিবে বলিয়া মনে হয়। এই দ্বৈতযুদ্ধের ফলাফলের জন্য বাঙ্গালার অগণিত ক্রীড়ামোদী সাগ্রহ-প্রতীক্ষায় থাকিবে। ভবানীপুর প্রথমার্দ্ধের খেলায় শেষ পর্য্যন্ত লীগের শীর্ষস্থান আঁকড়াইয়া রাখে, কিন্তু বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় সুরু হয়। ক্যালকাটা ও এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে পর পর ড্র করার পরে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাহাদের অপরাজয়ের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। তাহাদের সুদক্ষ গোলরক্ষক ইস্‌মাইল

এই খেলায় আহত হওয়ায় দলের সমূহ ক্ষতি হয়। পরবর্ত্তী খেলায় গোলরক্ষকের অকৃতকার্য্যতায় তাহারা কালীঘাটের নিকট ২-০ গোলে পরাজিত হয় ও সামরিক দল তাহাদিগকে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করিতে বাধ্য করে। এই ভাবে মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করিয়া তাহারা লীগ-যুদ্ধে অনেকটা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে। তরুণ মহমেডান স্পোর্টিং এবার লীগে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকার পাইবার দাবী কোনও দিনই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। বহু বৎসর পরে ক্যালকাটা পুনরায় লীগ-তালিকায় সম্মানজনক স্থানে আসিবার মত কৃতিত্ব দেখাইতেছে। বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় লইয়াও গত বৎসরের শীল্ড-বিজয়ী ও মণ্টেমোরেন্সী কাপবিজয়ী বি, এণ্ড এ রেলদল লীগে মোটেই আশানুরূপ ফল দেখাইতে পারে নাই। অন্যান্য সব দলগুলির অবস্থা প্রায় একরূপ। পুলিশ ও ডালহৌসীর দুর্দ্দশার অন্ত নাই। শেষ স্থানের জন্য তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাইবে।

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

মোট ৩৮টি দলের যোগদান

এ বৎসর এরিয়ান্স তাঁবুতে আহূত আই এফ এ শীল্ড-প্রতিযোগিতায় তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মোট ৩৮টি দল আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আগামী ১৬ই জুলাই প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন হইবে এবং যদি সমস্ত খেলা যথাযথ অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে আগামী ৪ঠা আগষ্ট ক্যালকাটা মাঠে শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। বহিরাগত দলগুলির মধ্যে হায়দরাবাদ পুলিস ও বোম্বাই হইতে আগত ট্রেডস ইণ্ডিয়া ক্লাবের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। আশা করা যায় যে, এই দুইটি দল এ বৎসর শীল্ড-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিবে। স্থানীয় দলগুলির মধ্যে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, ক্যালকাটা প্রভৃতি বিশিষ্ট দলগুলিকে যে-ভাবে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিযোগিতাটি বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাওয়ার মেমোরিয়াল ফুটবল লীগ

লীগ-প্রতিযোগিতার অবসান

পাওয়ার মেমোরিয়াল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম ডিভিশনে মহঃ স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে।

দ্বিতীয় ডিভিশনে 'এ' গ্রুপে সেণ্ট লরেন্স সমস্ত খেলায় জয়ী হইয়া প্রথম স্থানের অধিকারী হইয়াছে। তাহাদের জয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন গোল হয় নাই। 'বি' গ্রুপে আর এ এফ মুইর জয়ী হওয়ায় দ্বিতীয় ডিভিশনের শীর্ষস্থানের জন্য এই দল দুইটি পুনরায় মিলিত হইবে।

পাওয়ার মেমোরিয়াল লীগ প্রবর্ত্তনকারিগণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জুনিয়ার আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ভারতীয় দল ২-১ গোলে পরাজিত হইয়াছে। খেলাটি ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দল অসংখ্য গোলের সুযোগ পাইয়াও জড়তার জন্য গোল করিতে পারে নাই। তাহাদের আক্রমণকারিগণের সমস্ত প্রয়াস প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক হাণ্টের দক্ষতায় পঙ্গু হইয়া যায়। বিজয়ী পক্ষে পাগলীজ, হাণ্ট ও রবসন এবং অন্য দিকে এন বসু, ডি চন্দ্র, আর সেন ও এন ব্যানার্জির খেলা ভাল হয়। খেলার শেষে সার এডমাণ্ড গিবসন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে প্রথম ডিভিশন পাওয়ার লীগের পুরস্কার মহঃ স্পোর্টিং ক্লাবকে দেন।

ইউরোপীয় :—হাণ্ট (ষ্টেলার্স) ; পাগলীজ (ইটালীকা) ও গ্রে (ই সি সিগন্যাল) ; মিচেল (ই সি সিগন্যাল), মিলবর্ণ (রোমার্স), ও জেপসন (সি এম ইউ) ; স্পেন্সার (সেণ্ট লরেন্স), রবসন (সেণ্ট লরেন্স), কুলাম (আর এন), ক্রইক স্যাক্স (আর এন) ও ওয়াউ (রোমার্স)।

ভারতীয় :—পি মুস্তাফী (কালীঘাট) ; এ ব্যানার্জি (অরোরা) ও এন বসু (মাড়বারী) ; ডি চন্দ্র (ইষ্টবেঙ্গল), আর সেন (ভবানীপুর) ও এন ব্যানার্জি (মোহনবাগান) ; এস মুখার্জি (এরিয়ান্স), ওয়াজেদ আলি (মহঃ স্পোর্টিং), এ হোসেন (সিটি), পি রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) ও এইচ দে (জর্জ্জ টেলিগ্রাফ)।

চ্যারিটী ম্যাচ

লীগ-প্রতিযোগিতার সকল খেলা অনুষ্ঠিত হইবে, আর কোনই চ্যারিটী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে না। এমন কি, আই এফ এ-এর পরিচালকমণ্ডলী "রবীন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল ফাণ্ডের" অর্থ সংগ্রহের জন্য যে চ্যারিটী ম্যাচের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাও শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে না, ইহাই ছিল সকলের ধারণা। কিন্তু বর্ত্তমানে সেইরূপ আশঙ্কা করিবার মত আর অবস্থা নাই। পুলিশ কমিশনার ও আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে দর্শকদের বসিবার স্থান লইয়া যে গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সন্তোষজনক সর্ত্তে মিট-মাট হইয়াছে। পুলিশ কমিশনার গ্যালারী ছাড়া মাঠে বসিবার অনুমতি দিয়াছেন ; এমন কি, বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যদের বসিবার স্থান লইয়া কণ্ট্রাক্টরের সহিত যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বিভিন্ন ক্লাব যাহাতে উপযুক্ত স্থান লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আই এফ এ-র পরিচালকগণ এই সকল সর্ত্তে যে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে। তাহারা খেলার মাঠের সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুরের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইবেন। আই এফ এ-র সভাপতি সার খাজা নাজিমুদ্দীন সিমলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই "ডেপুটেশন" প্রেরণ করা হইবে। চ্যারিটী ম্যাচসমূহ একেবারে বন্ধ রাখিলে অনেক দরিদ্র-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় বিবেচনা করিয়া আই এফ এ চ্যারিটী অনুষ্ঠানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। সেই জন্য পুনরায় পাঁচটি চ্যারিটী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ওয়েভেল প্ল্যান

পরিকল্পনা পেশ করিবার প্রারম্ভে লর্ড ওয়েভেল্ বলিয়াছেন—

"ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক অচলা অবস্থা দূরীকরণ ও সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের লক্ষ্যে ভারতে অগ্রগতি প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব-সমূহ আমি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট পেশ করিবার ভার পাইয়াছি। আমি বর্ত্তমান বক্তৃতায় প্রস্তাবগুলি ও তাহাদের অন্তর্গত আদর্শ আপনাদের নিকট ব্যাখ্যা করিব ও কি ভাবে ঐ প্রস্তাব-সমূহ আমি কার্য্যে পরিণত করিতে আশা করি তাহা বুঝাইয়া দিব।

কোন গঠনতান্ত্রিক মীমাংসা লাভ করিবার জন্য বা সেইরূপ মীমাংসা আরোপ করিয়া দিবার জন্য বর্ত্তমানে চেষ্টা করা হয় নাই।

ভারতের সমস্যায় সাম্প্রদায়িক সমস্যাই প্রধানতম বাধা বলিয়া বৃটিশ সরকারের আশা ছিল যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া লইবেন। বৃটিশ সরকারের সে আশা সফল হয় নাই। এ দিকে ভারতে বহু গ্রহণযোগ্য সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে ও বহু বিরাট সমস্যা-সমাধান প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ইহার জন্য সকল দলের নেতৃবৃন্দের মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

বৃটিশ সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থনে আমি সেই জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দকে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের অধিক প্রতিনিধিমূলক নূতন শাসন-পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে আমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

প্রস্তাবিত নূতন শাসন পরিষদে প্রধান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি থাকিবে এবং বর্ণ-হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রতিনিধির অনুপাত সমান থাকিবে।

এই শাসন পরিষদ গঠিত হইলে বর্ত্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইহা কার্য্যকরী হইবে। বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ব্যতীত ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিষদ হইবে। প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ-সদস্যরূপেই থাকিবেন। বৈদেশিক বিভাগ এত দিন বড়লাটের নিয়ন্ত্রণেই থাকিত। বৃটিশ-ভারতের স্বার্থ-সম্পর্কিত এই বিভাগেরই কার্য্যকলাপ পরিষদের এক জন ভারতীয় সদস্যের উপর দিবার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।"

বর্ত্তমানে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক মহা সঙ্কটের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবন কাটিতেছে, যে নিদারুণ দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া আমরা কায়ক্লেশে জীবনের দুর্ব্বিষহ বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছি, কংগ্রেস ক্ষমতা পাইয়া তাহার অপপ্রয়োগ না করিয়া যদি সেই সঙ্কট ও দুর্দ্দিনের কবল হইতে আমাদের মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে আনিতে পারে এবং সেই সময় যদি লীগ পরম নিশ্চিন্তে জিদ্ ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া কেবল পাকিস্তানী তাল ঠুকিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভারতের জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব, না লীগের প্রভাব বাড়িবে? জনসাধারণের মধ্যে যাহারা কাজ করিবে, প্রভাব তাহাদেরই বাড়িবে, অর্থাৎ কংগ্রেসের বাড়িবে, লীগের নহে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এই অসহযোগিতা লীগের রাজনৈতিক অপমৃত্যুরই কারণ হইবে।

লীগ-নেতৃবৃন্দ এই সহজ সত্যটি কেন বুঝিতেছেন না, তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগোচর। নিজেদের পায়ে তাঁহারা কেন এমন ভাবে কুঁড়াল মারিতেছেন? ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত লীগের জীবনেতিহাস বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায়, কংগ্রেসের গর্ভেই লীগের জন্ম হইয়াছে, লীগ যে রাজনৈতিক চেতনার জন্য আজ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতেছে, সেই চেতনা কি আশ্‌মান হইতে আসিয়াছে? কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের ফলেই সেই চেতনা মুসলিম জনসাধারণের মনে জাগিয়াছে এবং তাহারা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। লীগের আজ ইহাও বুঝা উচিত যে, কংগ্রেস আজ আর সেই পুরাতন "অখণ্ড ভারতের" নীতি সমর্থন করে না এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার কংগ্রেসও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী দিল্লীতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরোক্ষে লীগের দাবীকেই সমর্থন করা হইয়াছিল। প্রস্তাব এই মর্ম্মে গৃহীত হয়:—

"...the Committee cannot think in terms of compelling the people in any territorial unit in an Indian Union against their declared and established will...Each territorial uuit should have the fullest possible autonomy within the Union, consistently with a strong national State."

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের অভিমত ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রদেশ বা ভৌগোলিক অঞ্চলকে জোর করিয়া জুড়িয়া রাখা হইবে না। সেই প্রদেশ বা অঞ্চল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের মর্য্যাদা পাইবে। এই প্রস্তাবই ১৯৪২-এর ৭ই আগষ্ট বোম্বাই-এর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় অনুমোদিত হয়। কংগ্রেসের এই প্রস্তাব লীগের "পাকিস্তান" দাবীর সহিত বর্ণে বর্ণে না মিলিতে পারে, কিন্তু পাকিস্তান দাবীর মূলে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার লাভের প্রেরণা রহিয়াছে তাহা যদি সত্য ও খাঁটি হয়, তাহা হইলে ইহা লীগের নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, কংগ্রেস ধীরে ধীরে লীগের দাবীর যৌক্তিকতা মানিয়া লইতেছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় হয়ত "পাকিস্তান" দাবীর সহিত কংগ্রেসের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-সম্বলিত প্রস্তাবের বা নীতির পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা লইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার সময় এখন নাহ। স্থির

সাহেব নিজেও তো অনেক বার বলিয়াছেন যে, "পাকিস্তানের" পূর্ব্বে ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন, অথচ কি কারণে তিনি এই ভাবে একগুঁয়েমী করিয়া স্বাধীনতার ঘোড়ার আগে "পাকিস্তানী" ছ্যাকরা গাড়ীটি জুড়িয়া দিতেছেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। জিন্না সাহেবের বুঝা উচিত (এবং আজ না বুঝিলে বুঝিবার সুযোগ তিনি বহু দিনের জন্য হারাইবেন) যে, "পাকিস্তান" ডাউনিং ষ্ট্রীট অথবা আমেরীর "ইণ্ডিয়া অফিস" হইতে ভাল প্যাকিং বাক্সে করিয়া আসিবে না, আসিবে কংগ্রেসের সহিত রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে। অসহযোগিতা ভাল নীতি, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এক এক সময় অসহযোগিতা আত্মহত্যারই নামান্তর হয়। লীগ-নেতৃবৃন্দের আজ ইহা বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

লীগকে বাদ দিয়া অন্যান্য মুসলিম-গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলের সহিত সহযোগিতা করিয়া কংগ্রেস যদি আজ অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করে, তাহা হইলে দেশবাসী কংগ্রেসকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবে। তার পর অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি শত শত সমস্যার সমাধানের পথে কংগ্রেস যদি সকলের সহিত হাত মিলাইয়া অগ্রসর হয়, তাহা হইলে মুসলিম জনসাধারণও কংগ্রেসকে, তথা সেই গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন না করিয়া পারিবে না। লীগ অনেক পশ্চাতে অসহযোগিতা ও অকর্ম্মণ্যতার মরুভূমিতে পড়িয়া থাকিবে। সেই অবস্থায় আমাদের বিশ্বাস, লীগের মধ্যে ফাটল ধরিবে এবং শোচনীয় অদূরদর্শিতার জন্য হয়ত বর্ত্তমান লীগ-নেতাদের অনেককেই বিদায় লইতে হইবে। যদি তাহা হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক শুভদিনের ইঙ্গিত করিবে এবং আমরা সেই দিনের প্রত্যাশায় থাকিব।

আজাদ—ওয়েভেল

জিন্না সাহেব নিজের জিদে সম্মেলনটিকে বিফল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোন কথাই কাণে তুলিতেছেন না। প্রত্যেক বড় কাজের জন্য একটা জিদের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু জিদ যখন গোঁ হইয়া দাঁড়ায় তখনই বিপদ। হিতাহিত জ্ঞানের অভাব ঘটে। কংগ্রেস চেষ্টা করিতেছেন অচলকে সচল করিতে আর লীগ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন পরিকল্পনার দুইটি পা-ই ভাঙ্গিয়া দিতে।

এই মাত্র খবর পাওয়া গেল, যে জিন্নার হঠকারিতার জন্য ওয়েভেল-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রচেষ্টা নৈরাশ্যে পরিণত হইয়াছে।

লর্ড ওয়েভেল বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলেন যে, ইহা দুঃখের বিষয় যে, সম্মেলন ব্যর্থ হইল। উত্তরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, কংগ্রেসের সহযোগিতার অভাবে সম্মেলন ব্যর্থ হয় নাই। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

সিমলা সম্মেলনে যে পরিস্থিতি উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে বড়লাট নিজের পছন্দমত একটি নামের তালিকা নেতৃবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিতি করিতে পারেন। কিন্তু এই তালিকা যে কংগ্রেসের মনোমত হইবে সে সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছু নাই। ওয়েভেল-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কংগ্রেস যতই আগ্রহ প্রকাশ করুক, মিঃ জিন্নাকে অসন্তুষ্ট করিয়া বড়লাট কিছু করিবেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং আজ যদি বড়লাট নামের তালিকা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসকেই নিরাশ হইতে হইবে রাজাজীর আবেদন সত্ত্বেও; অথবা সম্মেলন ব্যর্থ হইল ইহাও তিনি ঘোষণা করিতে পারেন। অদ্যকার সম্মেলনে উহার কোনটাই না করিয়া সম্মেলনের অধিবেশন আরও কিছু দিন স্থগিত রাখারও তিনি ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইতিমধ্যে বৃটিশ নির্ব্বাচনের ফলাফলও প্রকাশিত হইবে এবং অতঃপর সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশনে বড়লাট ঘোষণা করিতে পারেন যে, ওয়েভেল-প্রস্তাব ব্যর্থ হইয়াছে। ওয়েভেল-প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়াই দেশের কাছে খুব মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় হইবে না। কিন্তু কংগ্রেসের আত্মসমর্পণের ফলে কংগ্রেসের জাতও যাইবে, পেটও ভরিবে না; অধিকন্তু সবার উপরে সাম্রাজ্যবাদই যে সত্য ইহাই প্রমাণিত হইবে। আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না কেবল মাত্র লীগের আপত্তির জন্য পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইয়া যায় কি করিয়া?

বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালার বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কোথায় ইহার শেষ, তাহা অনুমান করিতেও আশঙ্কায় শরীর শিহরিয়া উঠে। মিঃ ভেলোডির উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিতে পারা যায়, ছয় মাস চলিতে পারে, এইরূপ বস্ত্র-সংস্থান ঘরে আছে—এইরূপ লোকের সংখ্যা কলিকাতায় অনেক থাকিলেও পল্লী অঞ্চলে নাই। ছয় মাসেরও অনেক বেশী হইল মফঃস্বলে বস্ত্রের অভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু গত এক মাসের মধ্যে বস্ত্রদুর্ভিক্ষ তাহার চরম সীমার দিকে ক্রমে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মফঃস্বলের যে সামান্য সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রকৃত অবস্থার অতি সামান্য জানিতে পারা যায়। বহু নারী কাঁথা পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে। কাঁথাও আর জোটে না—এমন নারীর সংখ্যাও বোধ হয় কম নয়।

যে-দেশের নারী লজ্জাশীলতার জন্য খ্যাত, সে দেশে কাপড়ের অভাবে নারী আত্মহত্যা করিবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় না হইতে পারে, কিন্তু প্রতিকার করিবার কেহ নাই—ইহা কি সত্যই বিস্ময়ের বিষয় নহে?

গত মার্চ্চ মাসে মিঃ ভেলোডি বলিয়াছিলেন, কাপড়ের দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালায় হয় নাই, উহা অতিরঞ্জন মাত্র। গত অন্ন-দুর্ভিক্ষের সময়ও কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, দেশে চাউলের অভাব নাই; কিন্তু লোক যখন না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিল তখন উহাকে নাটকীয় অতিরঞ্জন বলিয়া উড়াইয়া দিতেও কি আমরা শুনি নাই? এবার মিঃ ভেলোডি কাপড়ের দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলা সত্ত্বেও সমগ্র দেশে চরম বস্ত্রাভাব দেখা দিয়াছে, বস্ত্রাভাবে নারীর আত্মহত্যা করিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, নানা স্থানে অর্দ্ধনগ্ন নরনারীর মিছিল পর্য্যন্ত বাহির হইতেছে; কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের নিশ্চিত ঔদাসীন্য দূর হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা কাপড়ের চোরাবাজার সৃষ্টি করিয়া বস্ত্রাভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। চোরাবাজার বন্ধ করিবার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বস্ত্র আমদানী, সরবরাহ এবং বণ্টনের সমস্ত ভারই স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পরেও পূরা তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। চোরাবাজার যদি বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কিন্তু লোকে কাপড় পাইতেছে না। মফঃস্বলের সর্ব্বস্থান হইতে একই সংবাদ আসিতেছে—লোকের বস্ত্রাভাবের তুলনায় কাপড়ের সরবরাহ অতি নগণ্য। সরবরাহ নগণ্য হইবার কি কৈফিয়ৎ সরকারের আছে, তাহা দেশবাসীকে তাঁহারা জানাইবেন কি? গত দুর্ভিক্ষের সময় যখন না খাইতে পাইয়া লোক মরিয়াছে, তখনও বিদেশে চাউল রপ্তানী বন্ধ হয় নাই। আজ সমগ্র দেশবাসী নাগা-সন্ন্যাসীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, কিন্তু বৎসরে ছয় শত কোটি গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী হওয়া বন্ধ হয় নাই।

কাপড়ের ব্যাপারেও ভারত গভর্ণমেণ্টকে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের উপর এবং বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর দায়িত্ব চাপাইতে আমরা দেখিয়াছি। এক দিকে দেশের ব্যবসায়ীদের অতি লোভের চোরাবাজার-সৃষ্টি, আর এক দিকে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও সরকারী অব্যবস্থা এবং বিদেশে বস্ত্র-রপ্তানী মিলিয়া প্রথমে করিল বস্ত্র-সঙ্কটের সৃষ্টি। কিন্তু বাঙ্গালার সমগ্র বস্ত্র-ব্যবসা সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করাতেও এখনও চোরাবাজার বন্ধ হয় নাই বলিয়া যেমন শোনা যাইতেছে, তেমনি সরকারের হাতে যে পরিমাণ কাপড় আছে, সরকার আজিও তাহা ন্যায়সঙ্গত ভাবে জনগণের মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন নাই। তাহা যদি না-ই পারেন, তাহা হইলে বস্ত্রাভাবে নারীর আত্মহত্যা নিবারণ করিবার মত বস্ত্রবণ্টনের ব্যবস্থাও কি সরকার করিতে পারেন না? এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। চোরাবাজারের প্রাবল্য বাঙ্গালাতেই বেশী। অন্ন-দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালাতেই হইয়াছিল। কাপড়ের দুর্ভিক্ষও হইয়াছে বাঙ্গালাতেই। সমগ্র ভারতে বাঙ্গালা দেশ এই কয়েকটি ব্যাপারে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ বস্ত্রাভাবে নারীর আত্মহত্যার কতকগুলি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও বস্ত্র-বণ্টন সম্বন্ধে সরকারের অধিকতর উদ্যোগী হওয়ার কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অন্ন-দুর্ভিক্ষের পরে আসিল মহামারীর প্রকোপ, তার পর আসিল কাপড়ের দুর্ভিক্ষ; কিন্তু বাঙ্গালা দেশকে মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাহাকেও দেখা যাইতেছে না।

বাঙ্গালীর অবস্থা

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসী এক বেতার-বক্তৃতায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এক বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় বাঙ্গালার অবস্থা বর্ত্তমানে মোটের উপর অনেকখানি ভাল হইয়াছে। গভর্ণর মিঃ কেসী মাঝে মাঝে আমাদিগকে বেতারযোগে তাহা জানাইয়া থাকেন। ইহার জন্য তিনি অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু সত্যই আমাদের অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে কি? তাঁহার আশা ও আশ্বাসপূর্ণ উক্তির ভিতর দিয়াই কি বাঙ্গালার শোচনীয় অবস্থা ফুটিয়া বাহির হইতেছে না? গভর্ণর তাঁহার এই বেতার-বক্তৃতাকে বাঙ্গালার গৃহস্থালীর বিবরণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, বাঙ্গালার অধিবাসীদের খাওয়া-পরার কথাই বিশেষ ভাবে এই বক্তৃতায় আলোচিত হইয়াছে। খাওয়ার ব্যাপারে দেখা যাইতেছে, লবণের অবস্থাটাই সন্তোষজনক বলিয়া গভর্ণর সোজাসুজি স্বীকার করিয়াছেন। চিনির অভাবটা যে স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কলিকাতায় তবু রেশন-ব্যবস্থায় কিছু চিনি পাওয়া যায়, কিন্তু মফঃস্বলে চিনি দেবদুর্লভ বস্তু বলিয়াই আমরা শুনিতে পাই। মফঃস্বলের লোকদের জন্য যে চিনি প্রেরিত হয়, তাহা দুর্নীতির ছিদ্রপথে কোন্ অতলস্পর্শী গহ্বরে প্রবেশ করে, জনসাধারণ পায় না কেন, মিঃ কেসী তাহা সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি?

দুধেরও আমাদের একান্ত অভাব। গত এক বৎসর ধরিয়া দুগ্ধাভাব দূর করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু মিঃ কেসীর গভর্ণমেণ্ট প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি? কি কলিকাতায়, কি মফস্বলে দুধের অভাব কি আমাদের বাড়িয়াই চলে নাই? বাঙ্গালা দেশের গাভীগুলি দুধ খুব কম দেয়, ইহা আমাদের কাছে নূতন কথা নয়। কিন্তু প্রতিকার করিবার কেহ আমাদের নাই, ইহাই প্রধান সমস্যা। দুধের পরেই মাছের কথা বলিব। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পাওয়া না গেলে সহর

অঞ্চলে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, এ-কথা তো এক বৎসর ধরিয়াই আমরা শুনিতেছি। কলিকাতায় তিন টাকা সের মাছ কিনিতে হয়, মফঃস্বলে মাছ তো পাওয়াই যায় না। শুধু বরফের অভাবই নয়, ধীবরদের জালের অভাবও যে মৎস্যাভাবের একটি প্রধান কারণ, গভর্ণর মিঃ কেসীর তাহা জানা না থাকিবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। গত দুর্ভিক্ষের ফলে ধীবরশ্রেণীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্গত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দুর্গত অবস্থা আজও দূর হয় নাই, ইহা সরকারী পুনঃ-সংস্থাপন-প্রচেষ্টার পক্ষে মোটেই গৌরবের বিষয় নহে। দুধ-মাছের অবস্থা তো দেখিলাম। আমাদের প্রধান খাদ্য ভাতের অবস্থা এইবার আলোচনা করিব।

গভর্ণর জানাইয়াছেন, চাউলের দিক্ দিয়া আমাদের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রয়োজনে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টকে দশ লক্ষ টন চাউল দিয়াছেন। সিংহলে যে চাউল প্রেরিত হইবে বা হইতেছে, তাহা কি ঐ দশ লক্ষ টনের অন্তর্গত? গভর্ণরের বেতার বক্তৃতা হইতে ঠিক বুঝা গেল না। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের দশ লক্ষাধিক টন চাউল ক্রয় করার কথা মিঃ কেসী বলিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টকে যে দশ লক্ষ টন চাউল দেওয়া হইয়াছে, উহা কি তাহার অতিরিক্ত? কি পরিমাণ চাউল সরকারী গুদামগুলিতে মজুত আছে, সে কথা স্পষ্ট করিয়া গভর্ণর আমাদিগকে জানাইয়া দিলে দেশবাসী নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। কারণ, নানা স্থান হইতে চাউলের দামবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গভর্ণরও নিশ্চয়ই এই সংবাদ অবগত আছেন। দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণর নিজেই বলিয়াছেন, আউস ধানের অবস্থা যদি ভাল হয়, তাহা হইলেই ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের বাকী কয়েকটা মাস আমরা নির্ব্বিঘ্নে পাড়ি দিতে পারিব। আউসের ফসলের অবস্থা এখন পর্য্যন্ত ভালই, সন্দেহ নাই। কিন্তু আকস্মিক ভাবে ফসল নষ্ট হওয়ার জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের যে ঘূর্ণীবাত্যায় ফসল নষ্ট হইয়াছিল এবং যাহাকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ বলা হয়, তাহা পূর্ব্বে কোন আবহাওয়াবিদ্ অনুমান করিতে পারেন নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ১০ লক্ষ টন চাউল ভারত গভর্ণমেণ্টকে দেওয়ার পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের বাকী কয়েক মাস সম্বন্ধে কতখানি ভরসা করা যায়? তার পর আমনের ফসল কিরূপ হইবে তাহা এখনই বলা অসম্ভব। গভর্ণর চাষের বলদের অভাবের কথা বলিয়াছেন। এই অভাবের জন্য আমনের আবাদ কতখানি ব্যাহত হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন হইলেও প্রতিকারের ব্যবস্থা এখনও বহু দূর পথ। সরকারী গুদামগুলি ভাল করিয়া নির্ম্মিত করার কথা গভর্ণর জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত চাউল ও আটা মিলিয়া কি পরিমাণ খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়াছে, তাহা তিনি জানান নাই।

সমগ্র পৃথিবীতে এবং সমগ্র ভারতে কাপড়ের অভাব হওয়ার কথা গভর্ণর বলিয়াছেন। এমন কি, বিলাতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেও তিনি ভুলেন নাই। কিন্তু বিলাতে বাঙ্গালার মত কাপড়ের অভাব হইলে গভর্ণমেণ্ট টিকিয়া থাকিতে পারিত কি? সমগ্র ভারতে কাপড়ের অভাব হইলেও শুধু বাঙ্গালাতেই কাপড়ের দুর্ভিক্ষ হয় কেন? চোরাবাজার না থাকিলেও কাপড়ের পরিস্থিতি ভাল হইত না—এ কথা স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা যে কাপড় পাইয়াছে, তাহা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা হইতেছে না কেন? পূজা পর্য্যন্ত কাপড়ের রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, গভর্ণর এই আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সমগ্র বাঙ্গালা দেশই যে দিগম্বর হইতে চলিয়াছে, তাহার প্রতিকার হইতেছে কোথায়? বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে, এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গত মঙ্গলবার সাংবাদিক-সম্মেলনে গভর্ণর বলিয়াছেন, এই সংবাদ তিনি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে না করিবার কারণ কি? ভারতের নারীরা এত লজ্জাশীলা যে, লজ্জা রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুকে বরণ করিতেও তাহারা দ্বিধা করে না। বাঙ্গালার গভর্ণর ভারতীয় নারীদের এই বৈশিষ্ট্য অবগত নহেন, ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। বাঙ্গালার গৃহস্থালীর—বাঙ্গালার অধিবাসীদের খাওয়া-পরার কথা গভর্ণরের বেতার বক্তৃতার আলোকেই আমরা আলোচনা করিলাম। খাওয়া এবং পরা কোন দিক দিয়াই আমাদের অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। বরং আমাদের বস্ত্রাভাব আমাদের গৃহস্থালীর অবস্থাকে আরও সঙ্কটপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। গভর্ণরের আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও আমাদের বর্ত্তমান যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, আমাদের গৃহস্থালীর অবস্থা যেমন শোচনীয়, অদূর ভবিষ্যতেও এই শোচনীয় অবস্থা দূর হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

বিক্রয়-কর বৃদ্ধির অজুহাত

একটি সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের বাজেটে রাজস্ব খাতে যে সাড়ে আট কোটি টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে, তাহা হ্রাস করিবার জন্য বিক্রয়-কর টাকা-প্রতি দুই পয়সা হইতে তিন পয়সা করা হইয়াছে।

নিমেয়ার-সিদ্ধান্ত দ্বারা বাঙ্গালার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে—এ-কথা সত্য; কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা দ্বারা প্রদেশের অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাও কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, বিক্রয়-কর ইতিপূর্ব্বেই দ্বিগুণ করা হইয়াছে, কৃষিজাত আয়-কর আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 'রেজিষ্ট্রেশন ফি' এবং 'প্রসেস ফি'ও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই সকল কর-বৃদ্ধির ফলে ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের আয় ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা সাড়ে সাত কোটি টাকা বেশী হইবে বলিয়া ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব বলিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ৯৩ ধারা বহাল হইয়াছে বলিয়া উহার কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। আর কোন প্রদেশে এত অধিক ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। অথচ আর সকল প্রদেশেই পুনর্গঠনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে, পারে নাই শুধু বাঙ্গালা। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে, কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের আয় হইয়াছিল ২৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। ইহা প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের আয়ের দ্বিগুণ। গত বৎসর (১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দ) বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব খাতে আয় হইয়াছিল (সংশোধিত হিসাবে) ৩৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। অথচ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের

ঘাটতি ও ঋণের পরিমাণ শুধু বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যয় বাবদ এই ঘাটতি ও ঋণ বৃদ্ধি হয় নাই। দেশবাসীর নিকট ইহা অজ্ঞাত নয় যে, ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দ এবং ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দ—এই দুই বৎসরে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ১৭ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা লোকসান হইবে বলিয়া বাজেটে অনুমান করা হইয়াছিল। বুঝা যাইতেছে, ৯৩ ধারার আমলেও খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ঘাটতি বহালই রহিয়াছে। বস্তুতঃ, সরকারী অব্যবস্থার জন্যই যে এই ঘাটতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অব্যবস্থার মধ্যে সরকারী গুদামে খাদ্যশস্য পচিয়া নষ্ট হওয়াও অন্যতম। খাদ্যশস্য পচিয়া কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, সরকার তাহার কোন হিসাব প্রকাশ করিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু এখনও প্রায়ই সরকারী গুদামে খাদ্যশস্য পচিয়া নষ্ট হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।

কিছু দিন পূর্ব্বে নোয়াখালির চৌমাহানীর সংবাদে ৩০ হাজার মণ গম পচিয়া যাওয়ার এবং কমলাঘাটেও কয়েক হাজার মণ গম পচিয়া নষ্ট হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শিলিগুড়ির এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য ৬ হাজার মণ আটা কয়েক জন ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে।

এই ভাবে খাদ্যশস্য পচিয়া নষ্ট হইয়া এবং অন্যান্য অব্যবস্থার জন্য যে ঘাটতি তাহা জনসাধারণ কেন বহন করিবে, এই প্রশ্ন তাহারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিক্রয়-কর টাকা-প্রতি তিন পয়সা করায় যে আয় বৃদ্ধি হইবে, তাহা দ্বারা ঘাটতির কতটুকু পূরণ হইবে তাহাও কি বিবেচনার বিষয় নহে? ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে বিক্রয়-করের হার বৃদ্ধি হইতে ১ কোটি টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছিল। বিক্রয়-করের হার দুই পয়সা হইতে তিন পয়সা করিলে না হয় আরও এক কোটি টাকা বেশী পাওয়া যাইবে। সাড়ে আট কোটি টাকা ঘাটতির মধ্যে এক কোটি টাকা সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। কিন্তু বিক্রয়-কর আরও এক পয়সা বৃদ্ধি করার দরুণ দরিদ্র লোকদের কষ্টের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইবে। বস্তুতঃ বিক্রয়-কর হইতে দীনতম দরিদ্রও রক্ষা পায় না। দুর্ম্মূল্যতা, দুষ্প্রাপ্যতা ও চোরাবাজার মিলিয়া দরিদ্রের প্রাণ কণ্ঠাগত করিয়া তুলিয়াছে। বিক্রয়-কর বৃদ্ধির ফলে তাহাদের ব্যয় আরও বাড়িয়া যাইবে, অথচ সরকারী ঘাটতিও পূরণ হইবে না।

বন্দী-মুক্তি

লর্ড ওয়াভেল সিমলা সম্মেলনের পূর্ব্বাহ্নেই বহু রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়া অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী-প্রমুখ বাঙ্গালা দেশের অন্যতম জনপ্রিয় নেতাদের মুক্তির কথাও বলিতেছি। ইঁহারা ভগ্নস্বাস্থ্য ও মন লইয়া আজও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রহিয়াছেন, অথচ নানাবিধ কঠিন সমস্যা-জর্জরিত বাঙ্গালা দেশে আজ ইঁহাদের উপস্থিতি, নেতৃত্ব ও নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী, বাঙ্গালার অন্যতম সাংবাদিক ও রাজনীতিক আজ কঠিন রোগে আক্রান্ত। তাঁহার জন্য সমগ্র দেশবাসী উদ্গ্রীব হইয়া আছে। বহু পূর্ব্বেই স্বাস্থ্যের জন্য অন্ততঃ তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত আমাদের আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও তাঁহার সম্পর্কে সরকার উদাসীন কেন আমরা বুঝিতেছি না। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ইঁহাদের অভিভাবকহীন পরিবারের মুখ চাহিয়া সরকার ইঁহাদের অবিলম্বে মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন।

অবশেষে আমরা আর এক দল রাজনৈতিক বন্দীদের কথাও এখানে বলিতেছি,—বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারের বহু পূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা নির্ব্বাসিত এবং বর্ত্তমানে জেলে বন্দী হইয়া রহিয়াছেন। এই বন্দীদের কথা আমাদের শাসকবর্গ স্বেচ্ছায় ভুলিয়া গিয়াছেন বলা চলে। যদি এই ইচ্ছাকৃত ভুল নিতান্ত প্রতিহিংসামূলক হয়, তাহা হইলে তাহা এখন মানবিক প্রতিহিংসার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারা এক দিন ভুল করিয়া সন্ত্রাসবাদের হঠকারিতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত যৌবনের রঙিন কল্পনায় এক দিন ইঁহারা মশগুল হইয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। স্বপ্ন দেখা নিশ্চয়ই তাঁহাদের অন্যায় হয় নাই, কিন্তু যে পথে তাঁহারা সেই স্বপ্নকে সার্থক করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে-পথ যে ভুল তাহা তাঁহারা পরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই ভুল তাঁহারা একাধিক বার দেশের নেতৃবৃন্দের নিকট ও সরকারের নিকট স্বীকার করিয়াছেন এবং সন্ত্রাসবাদে তাঁহাদের যে আদৌ আস্থা নাই, সে-কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন। অথচ কেহই তাঁহাদের এই আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। জেল-আইন অনুসারেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চৌদ্দ, পনের, ষোল এমন কি কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত কারাজীবন ভোগ করিয়াও তাঁহারা এখনও মুক্তি পান নাই। অনেকের একটানা জীবনের অর্দ্ধেক কারাগারে কাটিয়া গেল, কিন্তু আজও তাঁহারা মুক্তি পাইলেন না। ভুল মানুষ মাত্রেই করিয়া থাকে, ভুলের জন্য সে শাস্তিও পায় এবং অনুতপ্তও হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনে যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন, এ-কথাও মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল মুক্ত নেতৃবৃন্দই বলিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল যেমন তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও আদর্শের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠার কথা স্বীকার করিয়াছেন, তেমনই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বিভিন্ন বোমার ও ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তাদের কর্ম্মপন্থা মারাত্মক ভুল হইলেও কেহই তাঁহাদের আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও দেশপ্রেম অস্বীকার করিবেন না। আজ ভারতের যুগ-সন্ধিক্ষণে যদি সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সহিত তাঁহাদেরও আমরা মুক্ত করিয়া আনিতে না পারি তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী অন্ততঃ কখনই দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে আনন্দোৎসব করিবে না। এ কথা আজ বাঙ্গালার জনসাধারণেরও বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত।

স্বাধীনতা ভারী উগ্র

স্বাধীনতা নামক উগ্র বস্তুটি যে সকলের পক্ষে সহ্য করা কঠিন, এই মূল্যবান উপদেশটি বৃটিশ কর্ত্তাদের নিকট হইতে বহু কাল ধরিয়া আমরা শুনিয়া আসিতেছি।

সম্প্রতি সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে বৃটিশ উপনিবেশ-সচিব লর্ড ক্র্যাণবোর্ণও এইরূপ একটি মূল্যবান উপদেশ বাজে খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পরম বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়াছেন যে, যে সব দেশ আজ পরাধীন হইয়া আছে, তাহাদের শেষ লক্ষ্য হিসাবে স্বাধীনতা-টাকে বাদ দিতে আমি বলি না। তবে কি না ঔপনিবেশিক নীতি হিসাবে সকলের জন্যই নির্ব্বিচারে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিলে তাহা যে নিতান্ত অবাস্তব হইবে, তাহাই নহে, ইহাতে বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি একেবারে ভয়ঙ্কর ভাবে জখম হইবে। ইহার পরও যদি পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতার আবদার ধরে, তবে তাহা যে ভীষণ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ফিলিপাইনের পক্ষ হইতে জেনারেল রমুলো এই বেয়াড়া আবদারই শান্তি-সম্মেলনে করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া লর্ড ক্র্যাণবোর্ণ তাঁহাকে একটু পিঠ চাপড়ানোর ভঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছেন যে, ব্যাপারটা তিনি যত সহজ ও সরল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা মোটেই তত সরল নয়।

প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মতে "colonial empires have been welded into one vast machine in defence of liberty,"—অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা স্বাধীনতা রক্ষার এক বিরাট যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, এমন কেহ কি আছেন, যিনি এই চমৎকার যন্ত্রটিকে ধ্বংস করিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিতে চাহিবেন? প্রশ্নটা তিনি এমন ভাবেই করিয়াছেন যে, কেহ যদি সে কথা বলে, তবে তাহার মত বেরসিক আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু যাঁহারা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এই মুক্তিদাতার অভিনয়ের সহিত একান্ত-ভাবে পরিচিত, তাঁহাদের পক্ষে এই ভণ্ডামি দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অনুচর হিসাবে জেনারেল ডায়ার কি ভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আজও ভারতবাসীর মনের মধ্যে গাঁথা আছে। ওলন্দাজ প্রভুরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাভা ও সুমাত্রার অসভ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্য কিরূপ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে তাহার পরিচয় মিলিতে বিলম্ব হইবে না। আর সম্প্রতি নিলামে-ওঠা জমিদারীর জমিদার ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীরা কি ভাবে সিরিয়া ও লেবাননের মুক্তির জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, সে-কথা তো সংবাদপত্রেই জলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যলোভীরা বহু দিন হইতে এক চমৎকার 'থিওরি' বানাইয়া রাখিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য অনেকগুলি দেশকে একই শাসনে একতাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই না কি ইহারা শান্তিতে রহিয়াছে, নতুবা ইহারা কবে মারামারি ও মাথা-ফাটাফাটি করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিত তাহার ঠিক নাই। সুতরাং ইহাদের সাম্রাজ্যের প্রেমময় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখাই কর্ত্তাদের এক ও অদ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আসলে এই 'থিওরি'টি অর্দ্ধ-সত্য এবং সমস্ত অর্দ্ধ-সত্যের ন্যায়ই মারাত্মক। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য সমস্ত দেশই যে একই ধরণের শাসন-পদ্ধতির অধীনে আসা প্রয়োজন এবং বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সার্ব্বভৌম অধিকার রহিয়াছে, তাহার অবসান হওয়া দরকার, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে, তাহাই প্রশ্ন। পৃথিবীতে একটিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নাই, যাহার পক্ষে কামান-বন্দুকের জোরে এই কার্য্যসিদ্ধি করা সম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে, লর্ড ক্র্যাণবোর্ণের সাম্রাজ্যের গুণগান গাহিবার সমস্ত কেরামতীটাই একটা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। যখন লোকের পক্ষে এই সব অপদার্থ ওকালতি নীরবে হজম করার সম্ভাবনা ছিল, সে সব দিন কাটিয়া গিয়াছে। একমাত্র স্বার্থান্বেষী ভিন্ন আর সকলেই আজ এই সব গলিত-নখদন্ত জরদগবদের কথায় কর্ণপাত করিয়া সময় নষ্ট করা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং উপনিবেশের অধিবাসীরাও সুমিষ্ট কথায় না ভুলিয়া ইহাদের পাততাড়ি গুটাইবার পরামর্শ দিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছে যে, স্বাধীনতা না থাকিলে কখনও স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাপানের অত্যাচার হইতে মালয়, বর্ম্মা ইত্যাদি রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে National Peace Council-এ উপনিবেশ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহাতে আফ্রিকার পক্ষ হইতে মিঃ আর্ণল্ড ওয়ার্ড বলিয়াছিলেন, "আমরা স্যার আর্থার সল্টারকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, কালা আদমিরা নিজেদের শাসন করিতে যে অক্ষম, এ বিষয়ে কোন কিছু প্রমাণ তাঁহার আছে কি না। তিনি যদি বলেন, তাহারা বৃটিশ ধনিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য দেশ শাসন করিতে পারে না, তবে আমরা বলি, তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু যদি তিনি বলেন, তাহারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য দেশ শাসনে অক্ষম, তবে তাঁহার কথা ভুল।"

আজ সমস্ত পরাধীন জাতির অন্তরে এই এক কথাই ধ্বনিত হইতেছে।

বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন

গ্রেট বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনের ভোট গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যেই নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবে। এই নির্ব্বাচনে যদি বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল টোরী-দলের জয় হয়, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তর যুগে আমরা অন্ততঃ যে সাময়িক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রত্যাশা করিতেছি তাহার ভ্রূণহত্যা হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী থাকিবে। টোরী গুণনিধি মিঃ চার্চিল তাঁহার নির্ব্বাচনী বক্তৃতাগুলিতে যে পরিমাণ বিষোদ্গার করিয়াছেন, তাহার এক-সিকি অংশও যদি তিনি পুনরায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উদ্গার করেন, তাহা হইলে রণক্লান্ত বৃটিশ জনসাধারণ তাহা হজম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে কি না তাহা ভগবান কিছুই জানেন।

বৃটেনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলগুলির নীতি ও বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের মনে হয় টোরীদলের গুরুতর পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক কম। বর্ত্তমানে বৃটেনে রক্ষণশীল দলের জনপ্রিয়তা সর্ব্বাপেক্ষা কম হইলেও টোরীবিরোধী দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী, আস্থা ও ঐক্যের অভাব এত বেশী যে, কাহারও সর্ব্বপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্ব্বাচনে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। টোরী-বিরোধী দলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ দল হইতেছে বৃটিশ লেবর পার্টি বা শ্রমিক দল। শ্রমিকদল টোরী-বিরোধী ফ্রণ্ট গঠন করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। উপরন্তু রাজনৈতিক পারস্পরিক

বাংলার গভর্ণর মিঃ কেসী ও তাঁহার পত্নী গত ১০ই জুন হাওড়া হোমের নারী বিভাগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। হাওড়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হিল আই, সি, এস, এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মহামান্য গভর্ণরের সহিত দাতাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছেন।

দলাদলি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে, সেই হেতু নির্ব্বাচনে সর্ব্বপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনাও তাহাদের কমিয়া গিয়াছে।

নীতির দিক দিয়া উদারনৈতিক ও শ্রমিক-দলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সেই জন্যই আমাদের মনে হয়, এইবারকার নির্ব্বাচনের ফলে বৃটেনে "লিব-ল্যাব্ কোয়ালিশন" অর্থাৎ শ্রমিক-উদারনৈতিক দলের সম্মিলিত গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। ফলাফল এক রকম মন্দের ভাল বলিয়াই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই "লিব-ল্যাব কোয়ালিশন" ধোপে টিকিবে কি-না, তাহা বলা যায় না। লিবারল দল অবাধ বাণিজ্যের ওকালতি করিয়া থাকে; সুতরাং লেবার পার্টি যদি তাহার নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বনিয়াদী শিল্পগুলির রাষ্ট্রীকরণ আরম্ভ করে, তাহা [illegible] লিবারলদের আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকিবে। [illegible] দল যদি টোরীদের সহিত হাত মিলাইতে চায়, [illegible] রক্ষণশীলদের সামাজিক সংস্কার-সাধনের [illegible] ক[illegible] দিতে পারিবে না। উদারনৈতিক [illegible] তাহাদের পক্ষে কোন দলের [illegible]

সুতরাং বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল এইবার একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এই সমস্যার জন্য বৃটিশ শ্রমিক-দলের একদেশদর্শী, সঙ্কীর্ণ নীতিই সম্পূর্ণ দায়ী হইবে। টোরীদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কার্য্য-কলাপের কলঙ্কিত ইতিহাসের সুযোগ লইয়া এইবার বৃটিশ শ্রমিক-দল বহু দিনের জন্য এমন কি হয়ত চিরদিনের জন্যও, টোরীদের রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে বিদায় দিতে পারিত; তাহার জন্য শ্রমিক-দলের উচিত ছিল সমস্ত বামপন্থী টোরী-বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং সকলে মিলিয়া টোরীদের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু নেতৃত্ব গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা টোরী-বিরোধী দলগুলির যাবতীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা স্বেচ্ছায় দলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। টোরীদের সমস্যা তাই বৃটেনে থাকিয়াই যাইবে বলিয়া [illegible] এবং শ্রমিক-দল যদি উদারনৈতিক দলের সহিত [illegible] গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও [illegible] তাঁহাদের দোদুল্যমান তরী ভরাডুবি হইয়া

২৪শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৫২ [৪র্থ সংখ্যা

মানুষ চৈতন্যময় জীব। চৈতন্যের আলোকে সে দেখিতে পায়, সে বুঝিতে পারে সে কি চায়! মানুষ কি চায়, তাহা লইয়া আলোচনা বিচার-বিতর্কের সীমা-পরিসীমা নাই। আমি আজ নূতন করিয়া সেই আদিহীন, অন্তহীন প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করিব না। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বলিতে চাই যে, যুদ্ধের পর নানা পরিকল্পনা যখন লোকের উর্বর মস্তিষ্কে নিত্য-নূতন জন্মলাভ করিতেছে, তখন এই প্রশ্ন মনে না আসিয়া পারে না যে, আমরা সত্যই কি চাই! কারণ, যাহাই চাহি না কেন, তাহার জন্য চাই সাধনা এবং ইহা ধ্রুব সত্য যে, বিনা সাধনে কিছুই পাওয়া যায় না। চাহিলেই যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মানুষের কোনও অভাব থাকিত না।

যাহা কিছু আমরা চাই, তাহার সঙ্গে আমাদের কর্মের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ কর্ম করিয়াই আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে হয়, অন্য কোনও পন্থা নাই। যাহা লক্ষ্য, তাহাকেই বলে সাধ্য। আমাদের কর্মচেষ্টার যাহা প্রত্যাশিত ফল তাহাই সাধ্য-পদ-বাচ্য। 'স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত।' অর্থাৎ স্বর্গ যদি তোমার কাম্য বা লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তোমাকে অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং তাহার যে সকল আনুষঙ্গিক কর্ম, সে সমস্ত আচরণ করিতে হইবে। খানিকটা করিলাম আর খানিকটা বাকী রহিল, তাহা হইলে স্বর্গে গমন সম্ভব নয়,—[illegible] মধ্যপথে স্থিতি [illegible]

পারে। সুতরাং প্রথমে সাধ্য নির্ণয় করিয়া, কায়মনোবাক্যে সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধনা করিতে হইবে। এই যে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আমাদের চেষ্টা, ইহাকে আমরা বাংলায় বলি সাধনা, সংস্কৃতে সাধন কথাটিই বেশী ব্যবহৃত হয়। অ-সাধনে সিদ্ধির আশা করা বিড়ম্বনা। কারণ, ইহাই সাধারণ জাগতিক নিয়ম যে, সাধনার অনুপাতেই সিদ্ধি হইয়া থাকে।

এখন কথা এই যে, আমাদের অতীত ত গিয়াছে, ভবিষ্যতে আশা করিবার মত কিছু আছে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার সাধনায় আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাই হইল বিধি।

জগতের সকল মানুষ একই প্যাটার্ণে গঠিত নহে, সকল জাতির মানসিক গঠন একরূপ নহে। পূর্বে ঘরে অন্ন ছিল, বস্ত্রেরও কষ্ট ছিল না। এখন আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রথম প্রয়োজন এই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান। পৃথিবীর অসংখ্য জাতি অপরাপর জাতির সঙ্গে টেক্কা দিয়া ধনবৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির দিকে মন দিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাথমিক সমস্যা এখন অন্ন। বিশ্বের যাবতীয় জাতি সমস্ত জাগতিক শক্তিকে জাগাইয়া প্রচুর ধনাগমের নব নব পন্থা আবিষ্কার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আমাদের যদি কেহ বলিয়া দিতে পারে যে, আমাদের এই শস্যশালিনী বসুন্ধরার বক্ষ হইতে প্রয়োজনোপযোগী খাদ্য উৎপাদন করা যায় কিরূপে? ধনী হওয়ার প্রয়োজন আমাদের পক্ষে নিতান্ত গৌণ। আমরা শুধু খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া [illegible] পারিলেই ধন্য হই। সে
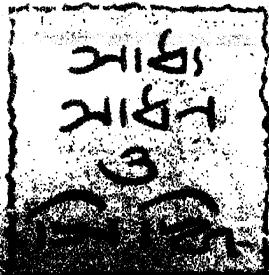
দিকে যথেষ্ট মনোযোগ কেহ দিতেছেন কি না, আমি জানি না। এই যে আমাদের অন্নাভাবক্লিষ্ট চল্লিশ কোটির উপর আরও বিদেশাগত কয়েক লক্ষের ভার চাপিয়াছে, তাহার জন্ম এখানে ওখানে চাষবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে, শস্য উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছে, পতিত জমি আবাদ করা হইতেছে, পশুপালনেরও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইতেছে; কিন্তু আগন্তুকদের জন্ম যাহা হইতেছে, এই নিরন্ন গরীব দেশবাসীর জন্ম কি তাহা হইতে পারে না?

কিন্তু সে চিন্তা আমাদের মনে স্থান পায় না। আমাদের বর্ত্তমানে সর্ববিধ চেষ্টা অবশ্য নিয়োজিত হইতেছে, যুদ্ধ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনের দিকে। ভাল কথা; কারণ, শান্তি সর্ববিধ উন্নতির মূল। এরূপ ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে স্বপ্নের মত তাহা নিমেষে টুটিয়া না যায়। কিন্তু এই যুদ্ধের কল্যাণে আমাদের নিজস্ব যে সমস্যা—যে সমস্যা সমস্ত ভারতবাসীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছে, তাহার কি কিছু সমাধান হয় না?

অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা আদিম হইলেও, ইহাই সব নহে। আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও কাম্য! এই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজন আমাদের পক্ষে বিলাসের বস্তু নহে। স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এক স্থলে বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য জগতে আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা একটি বিলাস মাত্র—a luxury of life. ভারতে যখন অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না, তখন কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সাধনাই ছিল মুখ্য প্রয়োজন। ভারতের দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, সেই আদর্শ বিকসিত হইয়াছিল। লাভ-লোকসানের ক্ষুদ্র সংকীর্ণ খতিয়ান ভারতের চিত্তে কখনও স্থান লাভ করে নাই। আমরা চাহিয়াছিলাম সেই লাভ, যাহার কাছে অন্য সব লাভই তুচ্ছ।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

পার্থিব সুখের সাধনা আমাদিগকে কর্ণধারবিহীন নৌকার মত ইতস্ততঃ ধাবিত করিতে পারে নাই। কারণ, আমরা খতাইয়া, হিসাব করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, 'নাল্পে সুখমস্তি।' যাহা নশ্বর, যাহা অস্থির, অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল, তাহার উপর আস্থা করিলে কেবল পস্তাইতেই হইবে। খণ্ড খণ্ড সুখ সুখই নয়, দুঃখেরই নামান্তর।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় এ সকল কথা কেহ কি ভাবিতেছেন? ভারতের অতীত ইতিহাসের যে মেরুদণ্ড, তাহাকে বর্জন করিয়া ভবিষ্যতের গঠনমূলক পরিকল্পনা আদৌ হইতে পারে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয় নয় কি? বিলাত বর্ত্তমান যুদ্ধে অবশ্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু আমাদেরও ক্ষতি কম হয় নাই। বিলাতের ক্ষতিপূরণ হইতে সামান্যই সময় লাগিবে, কিন্তু আমাদের ক্ষতি সহজে পূরণ হইবে না ইহা নিশ্চয়। এই যে অযুত লক্ষ নিযুত লোক বিনা অপরাধে প্রাণ দিল, তাহারা আর ফিরিবে না। না ফিরুক, কিন্তু যে দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি এই সে-দিন দেখিলাম, তাহার ছায়া অপসারিত হইতে বহু বিলম্ব আছে। আমাদের শিক্ষার উন্নতির জন্ম অনেক মনীষী পরিকল্পনা করিয়াছেন; কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু এই নিরক্ষর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে ঐ টাকার অঙ্কের শূন্যগুলিই সার হইবে না ত? ছেলেমেয়েদের বিনা-বেতনে পড়াইতে পারিলে খুবই ভাল হয়, কিন্তু গরীবের ছেলে-মেয়েরা কি খাইয়া পড়িতে আসিবে, তাহা না ভাবিলে ত সমস্যার সমাধান হইল না। গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে অশ্ব জুড়িয়া লাভ কি?

ভারতের ভাগ্য নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। রাষ্ট্রনেতারাও সে সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে রাজপুরুষগণও সে বিষয়ে যে ধ্যান দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। ভারতের সম্বন্ধে সাময়িক পরিস্থিতির প্রতিকারকল্পে যাহা করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু স্থায়ী গঠনের জন্ম ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, কোন্ দিক্ দিয়া সূর্য্যের আলোক আমাদের ভবনে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল সেই জানালাটি বন্ধ রাখিয়া যদি অন্য জানালা ধরিয়া টানাটানি করা যায়, তাহা হইলে সে আলোকের স্বর্ণাধারা আসিবে কোথা হইতে? ভারতবর্ষ এক দি[ন] যে মন্ত্র লইয়া উন্নতির অনেকগুলি স্তর পার হইয়া গিয়া ছিল, সে মন্ত্রের কৃচ্ছ্র-সাধনা হয় ত আজিকার দি[নে] সম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু খ্রীষ্টান-জগৎ যেম[ন] এখনও বর্ত্তমান সভ্যতার উৎকট আলোকেও ধর্ম্মে[র] নিশান আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, একবারে ছুঁড়িয়া ফে[লে] নাই, সেইরূপ এই মন্দিরের দেশ ভারতবর্ষকে একেবারে জড়বাদে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করি[লে] সিদ্ধি হওয়ার আশা কম। ভারতবর্ষ মন্দিরের দে[শ] সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ, রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের দে[শ] গঙ্গা যমুনা গোদাবরীর দেশ; ইহার স্বরূপ অন্যান্য দে[শ] হইতে সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে পৃথক্। হিন্দু[র] সংস্কৃতির মধ্যে যে বৈরাগ্যের আদর্শ আছে, যে ত্যাগপ[ূত] নিষ্ঠা আছে, অন্যত্র তাহার তুলনা আছে কি? [এই] আদর্শের সঙ্গে মুসলমানরা মিশাইলেন একতার আদ[র্শ] সাম্যের আদর্শ। ইংরেজেরা আনিয়াছেন বিজ্ঞা[নের] আলোক। এই সমস্ত মিলাইয়া যদি কোনও পরিক[ল্পনা] করা যায়, সম্ভবতঃ তাহাই হইবে ভবিষ্যৎ ভার[তের] সংস্কৃতির আদর্শ। ইহার কোনও একটিকে বাদ দি[য়া] বা আদর্শগুলিকে পৃথক্ করিয়া বণ্টন করিলে ভারতব[র্ষ] ভারতবর্ষ থাকিবে না, আর যাহাই হউক!

পরমা

বুদ্ধদেব বসু

তোমার তনিমার নব নীড়ে
একদা লভেছিনু অবনীরে।
নাহি যে পরিমাণ,
কেমনে করি পান
জীবন-মন্থন নবনীরে।

বেঁধেছি যত সুর বীণাতারে,
সে তব পরশের ঘনতারে
ছন্দে বন্দিয়া
রাখিতে বন্ধিয়া
আকুলা একেলার মনোহারে।

সে-সুখকোমলতা নবনীত
আজিকে হ'লো বুঝি অবসিত।
রহিলো প'ড়ে নীড়;
নিখিল-ঘরনীর
নীলিমা ছায়া-পথে অবারিত।

ছাড়ায়ে রভসের খরতারে
এসেছি পরশের পরপারে।
দেহ তো শুধু সীমা;
বিরহ-সুদূরিমা
লঙ্ঘে মিলনের মরতারে।

দু'জনে অনিকেত দু'জনেরে
একেলা একেলারে খুঁজে ফেরে।
আমার যে-আপন
করিছে সমাপন
প্রথম নীড়ে-শেখা কূজনেরে।

এ-বীণা নহে আর সুখ-রতা,
কোথা সে-পুলকিত মুখরতা।
অরবে উছলায়
এ-সুর যে-ছলায়
আকাশে ভাষা তার অবিরতা।

যেখানে ভালোবাসা রূপ নিতো
তাহারো পরে গান উপনীত।
কখনো জ্যোছনায়
মাধুরী-রচনায়
সহসা হবে প্রাণে স্বপনিত।

যদি·বা ভুলে যাও অতীতেরে
এ-গান জড়াবে না স্মৃতি-ঘেরে।
কেবল নিরজনে
লভিবে নিজ মনে
সুরের রথে চির-অতিথিরে।

বঁধু, এ-অভিসার অভিনব,
আঁধারে মিশে যায় ছবি তব।
মুছিয়া সব রূপ
এলো যে-অপরূপ
মন্ত্রে তারি আমি কবি তব।

আঁধার-তলে জ্বলে অনিমিখা
তুলনাহীনা তব কনীনিকা।
প্রভাতে প্রথমা সে,
নিশীথে পরমা সে,
মাটির দেহ-দীপে মণি-শিখা।

★

আমাদের দেশের বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের যে বিরোধ বাধিয়ে বসে আছেন তার মূল কথাটা এই যে, ব্রহ্মই নিত্য, আর সংসার অনিত্য। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার সঙ্গে-সঙ্গেই সংসারের কর্ম খসে পড়বেই। কিন্তু যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হোন না কেন, তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা দুটি ডাল-ভাত, না হয় 'শুখা চাপাটি' খেতেই হবে। তিনি কর্ম্ম ছাড়লে হবে কি, কর্ম্ম তো তাঁকে ছাড়ে না। আর কাজ যখন বাস্তবিকই খসে পড়ে না, তখন স্বীকার করতেই হবে যে যেখান থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি, সেই ভগবানের মধ্যেই কর্ম্মের বীজ নিহিত। 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।" "যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী" যাঁ থেকে প্রবৃত্তির উৎপত্তি, তাঁকে না ছাড়লে কর্ম্মও ছাড়া যায় না। জ্ঞানলাভের পর জীব যখন মুক্ত হয়, তখন তার স্বতন্ত্রবোধের সঙ্গে অহঙ্কারের কর্ম্ম ঘুচে যায়, কিন্তু ভগবানের শক্তি তখন তাকে আশ্রয় ক'রে কর্ম্মরূপে বাইরে ফুটে উঠে।

এই ভাবটাই তন্ত্রের ভুক্তি-মুক্তিবাদে প্রচার করা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের সাধক-সমাজে শঙ্করমতের প্রতিষ্ঠা কখনও ভাল করে হয়নি। এমন শস্যশ্যামলা সোণার দেশে প্রকৃতির পূজা না হওয়াই অস্বাভাবিক। ভগবান্ যে শুধু নির্গুণ আর নিরাকার, এ কথা স্বীকার করতে বাঙ্গালীর প্রাণ কেঁদে উঠে। পুরীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম যখন অনেক দিন ধরে বেদান্তের টীকা-টিপ্পনি ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে বুঝিয়ে দিলেন যে ব্রহ্ম নিরাকার, তখন শ্রীচৈতন্য শুধু জগতের দিকে দেখিয়ে বৃদ্ধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ব্রহ্ম যদি নিরাকার, তো এ সব আকার কার?" অমূর্ত্তই যে রূপের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে অনন্ত ভাবে আপনার লীলাকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন—এইটাই বাঙ্গালী শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েরই প্রাণের কথা। রূপকে সে বাদ দিতে চায় না, ছেঁটে ফেলতে চায় না। প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়ে সরে পড়তেও তার প্রবৃত্তি নেই।

নিত্যানন্দের পর থেকে বাংলায় শাক্ত আর বৈষ্ণব সাধনপ্রণালী সম্মিলিত করে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, তাদের সকলেরই মধ্যে জ্ঞান, প্রেম আর কর্ম্মের বেশ একটা সমন্বয়-চেষ্টা দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে কিন্তু সাধন-প্রণালীগুলি মেলাবার তেমন চেষ্টা দেখা যায় না। আমার এক বন্ধু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে এসে বলেছিলেন—"দেখ, দক্ষিণীরা যেমন তরকারী রাঁধবার সময় আলু, পটল, বেগুণ সব আলাদা আলাদা রাঁধে, একসঙ্গে মিশিয়ে একটা তরকারী করতে পারে না, ওদের সাধনপ্রণালী-গুলাও সেই রকম। এক একটি পন্থা যেন এক একটি air-tight compartment। ওদের দ্বারা ধর্ম্মের সমন্বয় হবে না।"

কথাটা ভেবে দেখবার যোগ্য বটে। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের, সংসারের সঙ্গে ভগবানের, কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে বিচার অনেক দিন থেকেই চলছে। সাংখ্যকার দুটোকে নিত্য বলে স্বীকার করলেও দুটোকে কেটে-ছেঁটে আলাদা করে দেবার ব্যবস্থাই দিয়ে গেছেন। শঙ্করের বেদান্ত প্রকৃতিকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতেই ব্যস্ত। বাংলার তন্ত্রই শুধু উভয়ের মৌলিক একত্ব স্বীকার করে সংসারের মধ্যে ভগবানের প্রতিষ্ঠায় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাংলার সাধকেরা প্রকৃতিকে পুরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন বলেই ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে পাননি। তাঁদের চেষ্টাতেই বাংলায় প্রকৃতি-পূজার প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাংলায় এসেছিলেন, তখন বোধ হয় একাই এসেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী তাঁর পাশে শ্রীরাধাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তবে তাঁকে ঘরে তুলে নিয়েছে। শুধু পাশে দাঁড় করিয়েছে বল্লে ভুল হবে। বাংলার কবি অরূপকে রূপের কাছে নত করে, কৃষ্ণকে রাধার পায়ে ধরিয়ে তবে ছেড়েছেন। শিব তো বাংলায় একেবারে মহাকালীর পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়েছেন।

আজ-কাল কেউ কেউ বলছেন যে, বাঙ্গালীর ছেলেরা না কি নিরীশ্বরবাদী materialist হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার এক এক সময় মনে হয়, ওটা আর কিছুই নয়—মহাত্মাজীর রামরাজ্যের বিরুদ্ধে reaction মাত্র। জানই তো, মা জানকীকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। মাতৃভক্ত বাঙ্গালী তাই রামচন্দ্রকে প্রণাম করলেও কখন প্রাণভরে ভালবাসতে পারলে না। রামের পূজা বাংলায় নেই বললেই হয়। আজকালকার বাঙ্গালী ছেলেদের ঐ যে materalism, ওটা প্রচ্ছন্ন MATER-ialism। ওটা জড়বাদ নয়—প্রকৃতিবাদ; অন্ধভাবে মায়েরই পূজা। যে দিন চক্ষু খুলবে, সে দিন তারা বিদেশীর কাছে শেখা—materialismএর ভিতর বাংলার চিরদিনের প্রকৃতি-পূজাই দেখতে পাবে।

বাঙ্গালীর ছেলেরা সর্ব্বদাই গোড়ার কথাটা ভাল করে বুঝে তবে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে চায়। মাঝে তাদের মনে যে সংশয়জনিত নৈষ্কর্ম্য দেখা দিয়েছিল সেটা শুধু প্রাণহীন রাজনীতিচর্চ্চার জের। কৌপীন পরা শিব, নেংটি পরা স্বরাজ, অনশনক্লিষ্ট পুণ্য—এ সব জিনিষে তাদের মন ভরে না। তারা চায় দেখতে মায়ের রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি। সংসারে তারা থাকতে চায় কৌপীনধারী বৈরাগীর বেশে নয়, মহামায়ার ঐশ্বর্য্যপুষ্ট রাজবেশে। তাই তারা এমন একটা দার্শনিক মতবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছে যা তাদের শক্তিমান্ করে তোলে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী পরের কাছে শোনা কথার ভিতর দিয়ে নিজেরই প্রাচীন সাধনাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে।

—ভারতবর্ষ—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভারত দেশটা দুনিয়ার ওঁচা।
দেখ যদি চোখ দিয়ে;
কি করে' প্রবাসী, ভাবি, হেথা আসি'
বেঁচে থাকে প্রাণ নিয়ে।

বাঘ, ভালুক ও সাপের রাজ্য,
বুনো হাতী, বুনো মোষ,
বাসিন্দা যত হীন বর্ব্বর,
পাহাড়ীরা রাক্ষস,—

ঘাস-পাতা খেয়ে দেহ ধরে তারা,
চাল ধান দিয়ে পরে,
কাপড় পরে না, উলঙ্গ নারী
আদ্ধেক না কি মরে!

তার পরে ফের ভূতের কাণ্ড,
নাম নিতে নাই যার,—
বেড়েই চলেছে—সাপ-বাঘ চেয়ে
ভীষণ সে জানোয়ার,

দৃষ্টির বিষে ভুলায়ে লোকের
বুকের রক্ত চোষে!
উৎপাতে তার পেরে ওঠা ভার
দেশের কপাল দোষে।

দয়ার দেবতা ভারতবন্ধু
বিদেশীয় মহাজন,
পরের দুঃখ কত আর সহে?
কেঁদে ওঠে তার মন।

একজোট হয়ে কর্ত্তারা সব
বাঁচাইতে দুর্ব্বলে
ভূত তাড়াবার লয় তারা ভার
ছলে-বলে-কৌশলে!

জন কয় ছাড়া দেশী অভাগারা
বুঝিতে পারে না কেহ,
সরিষার মাঝে বড় ভূত আছে,
করে তারা সন্দেহ।

একে সাপ-বাঘ তায় মহামারী—
ওলাওঠা, ম্যালেরিয়া,
তার পরে এই ভূত আর ওঝা—
বাঁচে লোক কি করিয়া?

রোজারও উপরে রোজা থাকে যদি
দুঃখীর ভগবান,
নিজ হাতে সে কি বাঁচাতে পারে না
চল্লিশ কোটি প্রাণ?

শিল্পী—সফীউদ্দিন আহমেদ্

সন্ধ্যার অন্ধকারে জৈনুদ্দিন সহরের গলিতে গলিতে সুন্দর মুখ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। আনারসের চালান নিয়ে ভিন্ন জেলা থেকে যে যুবক মহাজনটি খালের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়িয়েছে, তার ভিতরে ভিতরে রস যে টলমল করছে এ কথা মাত্র ঘণ্টাখানেকের আলাপেই টের পেয়েছে জৈনুদ্দিন। যুবক কাঞ্চন মিঞা এ ভরসাও দিয়েছে যে টাকা-পয়সার জন্য জৈনুদ্দিন যেন না ঘাবড়ায়। হেসে বলেছে, 'সাহেব, কৃপণ লোকে কি আর আনারস খেতে পারে? অনেক ফেলে ছড়িয়ে তবে না রস!'

সুতরাং রস সংগ্রহের ব্যাপারে জৈনুদ্দিন কিছু বিশেষ মনোযোগই দিয়েছে আজ। বেশ উৎসাহই লাগছে। টাকা-পয়সার কথা ছেড়ে দিলেও পরকে এ রসের কেবল জোগান দেওয়াতেও কম সুখ নেই।

গলিতে ঢুকতেই থানার এক সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেপাই মুচকি হেসে বলল, 'কি মিঞা, খবর কি? অমন করে কি খুঁজে বেড়াচ্ছ, কোন জহরৎ-টহরৎ হারাল না কি?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'আজ্ঞে বলেছেন ভালো হেঃ হেঃ হেঃ! জহরৎই খুঁজছি বটে।' সেপাই হাসল, 'কিন্তু জহরৎ পেলেই বা তোমার কি লাভ? দেবে তো অন্যকে। তুমি মিঞা কেবল নারকোলের ছোবড়া ছাড়িয়েই গেলে, ভিতরটা আর ভেঙ্গে দেখলে না। যাই হোক, জহরৎ-টহরৎ কিছু পেয়ে গেলে গরীবকে একেবারে ভুল না।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'আজ্ঞে তাই কি পারি? আপনাদের মেহেরবাণীতেই তো আছি।'

জৈনুদ্দিনের মনে পড়ল, আগে এই সব থানার লোকদের কি রকম ভয়টাই না সে করত। দূর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে তার বুক কাঁপত, কারো সঙ্গে রঙ্গ-পরিহাস করা তো দূরের কথা। কিন্তু এই বছর দেড়েকের অভিজ্ঞতায় এদের সঙ্গে ভাব রাখার কৌশলটা সে আয়ত্ত করে ফেলেছে, কোন ভয় আর তার নেই। জেলা সহরের গণ্যমান্য অনেক লোকের সঙ্গে তার গোপন আলাপ, এমন কি দোস্তী পর্য্যন্ত হয়েছে। সেই সব দিনের কথা জৈনুদ্দিন প্রায় ভুলেই গেছে—যখন ছত্রিশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে এই জেলা সহরের লঙ্গরখানার সামনে এসে তিন দিন মড়ার মত পড়েছিল। মাছের বাজারে এক ভদ্রলোকের পকেট কাটতে গিয়ে পাঁজরের একখানা হাড় যে প্রায় ভেঙ্গে যাওয়ার উদ্যোগ হয়েছিল, সে কথাটাও জৈনুদ্দিন তেমন করে মনে রাখতে পারেনি। কদাচিৎ এক-আধ সময় ব্যথাটা হয় তো একটু একটু এখনও লাগে, কিন্তু আর পাঁচ জনের মত সেই ইতিহাসটা জৈনুদ্দিনেরও আর সব সময় মনে পড়ে না।

জহরৎরা এর আগে সহরের কেবল কয়েকটা জায়গাতেই বাসা বেঁধে থাকত। কিন্তু কিছু কালের মধ্যে তারা প্রায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও গোপনে, কোথাও আধা-আধি,

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কোথাও পুরোপুরি। দেখতে দেখতে সহরের এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় এসে পড়ল, পছন্দ মত মুখ আর মেলে না। কাঞ্চন মিঞার প্রমোদের সামগ্রী তো নয় যেন নিজের জন্যই কনে খুঁজে বেড়াচ্ছে জৈনুদ্দিন। এত খুঁৎ-খুঁৎ!—এক সময় তার নিজেরই হাসি পেল।

রাস্তার দু'পাশের প্রত্যেকটি মুখের ওপর তীক্ষ্ণ চোখ ফেলতে ফেলতে হঠাৎ একখানি মুখে জৈনুদ্দিনের দৃষ্টি

একেবারে নিবদ্ধ হয়ে রইল। পলক যেন আর পড়তে চায় না। এ মুখ অত্যধিক সুন্দর নয়, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিচিত।

জৈনুদ্দিনকে চিনতে পেরে ফতেমারও হৃৎস্পন্দন যেন মুহূর্ত কালের জন্ত বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সপ্রতিভ ভাবে ফতেমা বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল, যেন জৈনুদ্দিনকে সে লক্ষ্যই করেনি।

জৈনুদ্দিন একবার ভাবল চলে যায়। কিন্তু চিনে যখন ফেলেছেই পালিয়ে কি লাভ? তাছাড়া ফতেমার সঙ্গে কথা বলবার একটা দুর্দম ইচ্ছা জৈনুদ্দিনকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলল। কিন্তু জৈনুদ্দিন এগিয়ে যেতেই ফতেমা মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করল।

জৈনুদ্দিন পিছন থেকে ডেকে বলল, 'শোন।'

ফতেমা ফিরে তাকাল, কঠিন স্বরে বলল, 'কি?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'এখানে এলে কবে? তুমি না শেষে বুড়া আবদুল খাঁর সঙ্গে নিকা বসেছিলে?'

ফতেমা তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'নিকা তো এক সময় তোমার সঙ্গেও বসেছিলাম মিঞা।'

জৈনুদ্দিন একটু কাল চুপ করে রইল, তার পর বলল, 'ভিতরে চল কথা আছে।'

ফতেমা রুক্ষ স্বরে বলল, 'না।'

'না কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ঘরে ঢুকে তোমার জিনিষপত্র লুটে নিয়ে পালাব, না?'

ফতেমা বলল, 'আর যাওয়ার সময় গলা টিপেও রেখে যেতে পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।'

জৈনুদ্দিন খানিকক্ষণ ক্রুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বটে! কিন্তু তোমার সাধ্যটাও তো বিবি বড় কম দেখছি না।'

ফতেমা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, জৈনুদ্দিন ব্যঙ্গ ক'রে বলল, 'আহাহা বিবি গোসা ক'রে নিজের ক্ষতি করছ কেন, তার চেয়ে আমিই যাচ্ছি', বলে জৈনুদ্দিন এবার সত্যই সরে গেল।

পাশের মেয়েটি বলল, 'ও ফতি, খদ্দেরকে ঝগড়া করে তাড়ালি কেন?'

ফতেমা বলল, 'তাড়াব না? ও যে এককালে আমার সোয়ামী ছিল রে।'

'তাই না কি? তা হ'লে তো আরো জমতো ভালো।'

ফতেমা অদ্ভুত একটু হাসল, 'হুঁ, তাতো জমতোই।'

জমাবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রেছিল জৈনুদ্দিন আজ নয়, আরো বছর সাতেক আগে। তার দাদা মৈনুদ্দিন ফতেমাকে বিয়ে ক'রে আনার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর জৈনুদ্দিনের চোখ পড়েছিল। ঘেটে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে যখন ফতেমা জল নিয়ে ফিরত সেই চোখ তাকে অনুসরণ করতে করতে আসত। ঢেঁকিতে যখন ধান ভানত ফতেমা, বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই চোখ তার চঞ্চল ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকত। কেবল নীরব দৃষ্টিতেই নয়, আড়ালে আবডালে পেয়ে ফতেমার কাছে ভাষা দিয়েও জৈনুদ্দিন নিজের সেই দৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে।

'ভাবী সাব, আমার চোখে ভারি সুন্দর লাগে তোমাকে।'

ফতেমা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, 'খবরটা তোমার মিঞা ভাইকে একবার দিয়ে দেখব।'

'ভাবী সাব, তোমার ভিতরটা কি কাঠ?'

'তোমার মিঞা ভাইকেই জিজ্ঞেস কোরো।'

কিন্তু মিঞা ভাইর দোহাই খুব বেশী দিন চলল না। পাঁচ বছরের মাথায় নিমুনিয়ায় মৈনুদ্দিনের মৃত্যু হ'ল। ফতেমার কোলে ছোট ছোট দু'টি ছেলেমেয়ে। মাসখানেক যেতে না যেতেই ফতেমার বাপ ইব্রাহিম কারিগর নিকা দেওয়ার জন্ত সম্বন্ধ দেখছে, জৈনুদ্দিন গিয়ে বলল, 'ভাবী সাব, মিঞা-ভাই তো ফাঁকি দিয়েই গেল। খোদার ইচ্ছার ওপর তো মানুষের আর জোর থাকে না! জোর জুলুম মানুষের আপন জনের ওপরই চলে। আর তোমার ময়না মজনুকে আমার চেয়ে কেউ কি বেশি ভাল বাসবে? শত হ'লেও এ যে রক্তের টান।'

কথার ভাব বুঝতে পেরে ফতেমা আরক্ত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল, 'নিকা বসবার আমার আর কোথাও ইচ্ছা নেই রাঙা মিঞা। ময়না আছে মজনু আছে, নিকার আমার আর দরকারই বা কি? তুমি যদি ভরসা দাও এই বাড়ীতেই আমি থাকতে পারি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তাই থাকো, তাই থাকো। তোমার বাড়ী তোমার ঘর, এ ছেড়ে তুমি যাবে কোথায়। কিন্তু পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে পারে। এই জন্তেই দু'-দশ টাকা ব্যয় ক'রে কেবল মোল্লা-মুন্সীদের মুখটা বন্ধ ক'রে রাখা!

ফতেমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবল। কেবল ঠাট্টা ইয়ার্কি নয় সাময়িক ইচ্ছাপূরণ নয়। জৈনুদ্দিন আইনসঙ্গত ভাবে নিজে যেচে তাকে বিয়ে করতে চাইছে। এই অনুরাগকে সন্দেহ করা যায় না, এই ভালোবাসার ওপর সারা জীবন নির্ভর ক'রে থাকতে সাধ যায়। এমন আপন-জন ক'জন মেলে সংসারে?

ফতেমা বলল, 'কিন্তু তোমার নিজেরও তো পরিবার আছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে রাঙা মিঞা।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'থাকলেই বা। আমার বাজানের কয় বিবি ছিল জানো? চার জন। পুরোপুরি এক হালি। শেষ রাত্তে উঠে আমার চার মা তাঁতখোলা

গিয়ে তানা কারাতে আরম্ভ করত। খট্ খট্ শব্দে আমার ঘুম যেত ভেঙে। বাজান হুঁকো টানতে টানতে বিবিজানদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন। আজকালও এক এক রাত্রে খোয়াবের মধ্যে সেই তানা কারাবার শব্দ শুনে আমি বিছানার ওপর উঠে বসি। তুমি যদি মেহেরবাণী কর বরু বিবি, তোমাদের নিয়ে আমি আগের সেই রকম ক'রে তাঁত খুলব। মেহের কারিগরের ছেলে আমি, আমার কি বাড়ী বাড়ী গিয়ে এমন জন-মজুরী পোষায়?'

ফতেমা জৈনুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ভারি যে সরম ক'রে মিঞা!'

জৈনুদ্দিন হেসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বিবিজান তুমি তো জানো না এই সরমের সময় তোমাকে আরো বেশি খাপসুরৎ ঠেকে।'

জৈনুদ্দিন যেন মত্ত হ'য়ে উঠল। নিত্য নতুন তার আদর জানাবার কায়দা, এত কায়দা মৈনুদ্দিনের কোন দিন মাথায় আসত না। নিত্য নতুন নামে ডাকে জৈনুদ্দিন, নিত্য নতুন ভাষায় ভালোবাসা জানায়। এত কথা কোন দিন মুখচোরা মৈনুদ্দিনের মুখে আসত না।

পাশের ঘরে সাকিনা ছেলে নিয়ে ছটফট্ করত। ফতেমাই শেষে দয়া ক'রে বলত, 'হয়েছে, হয়েছে, এবার ছোট বিবির ঘরে যাও দেখি একটু।'

কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই স্রোতের মুখ গেল ঘুরে। এক ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে জৈনুদ্দিন সর্ব্বস্বান্ত হোল। ভিটে মাটি পড়ল বন্ধক। যুদ্ধের দরুণ গৃহস্থালীর খরচা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তাঁত আর খোলা হোল না, তার বদলে দুই বউকে দুই ঢেঁকি পেতে দিল জৈনুদ্দিন। ফি হাটে ধান কিনে আনে, দুই বউকে পাল্লা দিয়ে চাল ভেনে দিতে হয়। সেই চাল বিক্রীর পয়সায় চলে সংসার। ক্রমে দেখা গেল, এদিক থেকে বরু বিবি কেবল পটের বিবি, কোন কাজের নয়। তার সময়ও লাগে বেশী, কাঁড়া চালে খুদও বেশী থাকে। সাকিনা তার চেয়ে অনেক শক্ত অনেক খাটুয়ে। ফলে সাকিনার ওপরই দরদটা বেশী গিয়ে পড়ে জৈনুদ্দিনের। তার জন্য মাজন আসে, তার ছেলের জন্য আসে আখ আর বাতাসা। দুবেলা গাইকে খোল জাব বেশী করে খাওয়াতে হয়। ফতেমা ছটফট্ করে কিন্তু সাকিনা কিছুমাত্র ভাগ দেয় না। স্বামীর ভাগ দিয়েছে আবার আরো?

বিনা চিকিৎসায় ফতেমার ছেলে মরে, জৈনুদ্দিন বলে, 'আমি কি করব? পয়সার কি গাছ আছে আমার যে ঝাঁকি দিলে ঝপ ঝপ করে পড়বে?'

তার পর এলো সেই দেশ-জোড়া দুর্ভিক্ষ। হাটেবাজারে ধান মিলে না, ফতেমা আর সাকিনা দু'জনেই বেকার। তবু সাকিনা আর তার ছেলে-মেয়ের ওপরই টান বেশী জৈনুদ্দিনের। শত হলেও সাকিনা তার বিয়ে করা বৌ, বজলু তার নিজের ছেলে, তার চেয়ে কি ফতেমা আর ময়না বেশী আপন? বজলু বাঁচলে তার নিজের নাম থাকবে, বংশ থাকবে। ময়না বাঁচলে হবে কোন্ ছাতু?

বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না। চেয়ে-চিন্তে যেখান থেকে যা পায় সব সাকিনা আর তার ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ায় জৈনুদ্দিন। শুকিয়ে শুকিয়ে ময়না অস্থিসার হয়, ফতেমার নড়ে বসবার শক্তি থাকে না; তবু জৈনুদ্দিনের ভ্রূক্ষেপ নেই।

এর পর ফতেমা আর সরম রাখতে পারে না। বলে, 'এ কি তোমার ব্যবহার মিঞা? আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? পায়ে ধরে চোদ্দ বার ক'রে সেধে নিকা করেছিলে মনে নেই?'

জৈনুদ্দিন জবাব দেয়, 'না নেই। কিন্তু এখন পায়ে ধরেই বলছি, রেহাই দে রেহাই দে আমাকে, মিঞাভাইকে খেয়েছিস, আমাকে আর খাসনে। গাঁয়ে আরো তো মুসলমান আছে তার ঘরে যা।'

শেষে মেয়েটাও যখন মরল, গড়িয়ে গড়িয়ে ফতেমা সোজা চলে এল বুড়ো আবদুল খাঁর বাড়ী। জৈনুদ্দিন কোন বাধা তো দিলই না। বরং খুসি হোল।

আবদুল খাঁ তার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বলল, 'নিকা তো তোমাকে করবই বিবি। গণ্ডা কয়েক ছেলে-মেয়ে শুদ্ধ দু-দু'জন বিবিকে যখন এই বাজারে পুষতে পারছি, তোমাকেও পারব। কিন্তু তার আগে চল একবার সহর থেকে ঘুরে আসি। খাসি আর মুরগীর চালান নিয়ে যেতে হবে, একা একা যেতে ভালো লাগছে না।'

আবদুল খাঁর চালানের নৌকায় উঠে বসবার সময় ফতেমার কানে গেল কলেরায় বজলু আর সাকিনা দু'জনেই শেষ হ'য়ে গেছে।

ফতেমা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই প্রার্থনা করল, 'হে খোদাতাল্লা, জৈনুদ্দিনও যেন আজ রাতে গোরে যায়।'

খানিক ঘোরাঘুরির পর জৈনুদ্দিন আবার এসে উপস্থিত হোল, ফতেমা অবাক্ হয়ে বলল, 'তোমার কি কোন সরম নেই মিঞা?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'সরমের কথা থাক। তোমার সাথে একটা কাজের কথা বলতে এসেছি বরু বিবি।'

'কাজের কথা? আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গেই। লাভ তোমারই! আমার আর কি।'

জৈনুদ্দিন নাছোড়বান্দা। অগত্যা তাকে একটু আড়ালে এনে ফতেমা তার প্রস্তাবটা শুনল এবং শুনে প্রথমটা থ' খেয়ে গেল। সে ভেবেছিল, কাকুতি মিনতি ক'রে জৈনুদ্দিন নিজেই আসতে চাইবে। কিন্তু অন্যের জন্ত যে সুপারিশ করবে জৈনুদ্দিন তা সে ধারণাই করতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে এমন পিশাচ হয়েছে জৈনু মিঞা—এমন পাকাপোক্ত শয়তান? কিন্তু সেই যদি পারে ফতেমাই বা কেন পারবে না, বিশেষতঃ লোকটিকে যখন শাঁসালো বলেই শোনা যাচ্ছে। লাভ ছেড়ে দিয়ে ফল কি?

কাঞ্চন মিঞা দু'-তিন দিন যাতায়াত করে। তার পর আসে আবার নুরুদ্দিন সাহেব, তার পর কাছারির কল্যাণ গাঙ্গুলি।

না, পিশাচ হলেও জৈনুদ্দিন একেবারে ডাহা চালবাজ নয়। তার আনা লোকগুলির সত্যি পয়সা আছে আর তারা পয়সা ব্যয় করতেও জানে।

ইতিমধ্যে বেশ একটু নতুন ধরণের অন্তরঙ্গতা জন্মেছে জৈনুদ্দিন আর ফতেমার মধ্যে। মাঝে মাঝে ডিমটা, মাছটা, আনাজটা হাতে ক'রে আনে জৈনুদ্দিন। ফতেমা গরমের দিনে সরবৎ করে দেয় ঠাণ্ডার দিনে চা খাওয়ায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে জৈনুদ্দিন বলে, 'গাঙ্গুলি ছোঁড়াটা কিন্তু কেমন যেন একটু বোকা বোকা নয়?'

ফতেমা হেসে ওঠে, 'ছাই জানো তুমি। আসলে বজ্জাতের ধাড়ী। এখানে এসে অনেকেই অমন ন্যাকা ন্যাকা ভাব করে। কিন্তু একটু টিপে দেখলেই আমরা সব টের পাই।'

জৈনুদ্দিন হেসে মাথা নাড়ে, 'তা ঠিক, তোমাদের ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।'

ফতেমা আবার বলে, 'তোমাদের নুরুদ্দিন কিন্তু ভারি ধার্ম্মিক। বলে, ফতেমা আমার একজন গুরুজনের নাম। আমি বলি তাতে কি, আমার আরো হাল্কা হাল্কা দু'-তিনটে নাম আছে আতরজান, দিলজান যা' খুশি বলে ডাকতে পার।' বলে ফতেমা মুখ টিপে হেসে জৈনুদ্দিনের দিকে তাকায়। যখন নিত্য নতুন নামে ডাকার বাতিক ছিল জৈনুদ্দিনের এ-সব সেই তখনকার নাম। জৈনুদ্দিন এবার গম্ভীর ভাবে বলে, 'আচ্ছা এখন উঠি বরু বিবি, বেশি সময় নিয়ে তোমার ক্ষতি ক'রে লাভ কি।'

ফতেমা বলে, 'এত তাড়াতাড়ি কেন? গোসা হোল নাকি মিঞার?'

জৈনুদ্দিন হেসে ওঠে, 'ক্ষেপেছ। গোসা হ'লে দু'জনেরই ক্ষতি।'

ফতেমার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। কেবল ক্ষতির ভয়েই কি জৈনুদ্দিন কোন দিন গোসা করে না, অভিমান করে না, হিংসা করে না? ক্ষতির ভয় কি মানুষকে এমন পাথর ক'রে ফেলে?

দিন কয়েক আগে ফতেমা সেদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'যা'ই বল, আজকাল তুমি কিন্তু একেবারে পয়গম্বর হ'য়ে গেছ মিঞা। তাবিজ-কবচ নিয়েছ না কি হাসেম ফকিরের কাছে?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে জৈনুদ্দিন বলেছিল, 'ময়রায় কি আর সন্দেশ খায় বিবি?'

ফতেমা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিল, 'তা ঠিক, সন্দেশ-বেচা পয়সা খেলে তো আর জাত যায় না।'

জৈনুদ্দিন এমন পাথর হোল কি ক'রে? তার চোখে রঙ নেই, হাসিতে রঙ নেই—পরিহাস ওপর ওপর যতই করুক জৈনুদ্দিন কোন দিন তাকে ছুঁয়ে পর্য্যন্ত দেখে না, অথচ সবাই বলে ফতেমা আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী হয়েছে। কল্যাণ বলে, 'তেমন করে সেজেগুজে বেরুলে তাকে না কি ঠিক কলেজে-পড়া মেয়েদের মত দেখায়। কিন্তু জৈনুদ্দিন তাকে ছোঁয় না। জৈনুদ্দিন তাকে ঘৃণা করে। এতখানি ঘৃণা করবার অধিকার কোথায় পেল সে, জৈনুদ্দিন কি তার চেয়ে কম পাপী? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজের অন্তরকেই ফতেমা জর্জ্জর করে তোলে, ক্ষুব্ধ হৃদয় কিছুতেই শান্ত হ'তে চায় না।

সেদিন আবার আর এক জন শাঁসালো লোকের সন্ধান আনল জৈনুদ্দিন। বলল, 'ভালো ক'রে সেজে-গুজে থেকো বরু বিবি। লোকটি কিন্তু ভারি সৌখীন।'

ফতেমা ম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু আমার যে ভারি মাথা ধরেছে। জ্বরই যেন এসে পড়ে পড়ে।'

জৈনুদ্দিন ব্যস্ত হ'য়ে বলল, 'তাই না কি? তবে আজ থাক, চুপ-চাপ শুয়ে থাক বিছানায়।'

কথার মধ্যে পুরান আন্তরিকতার সুর যেন আবার ফিরে এসেছে।

ফতেমা বলল, 'কিন্তু তুমি তো কথা দিয়ে এসেছ, কথার খেলাপ করলে ক্ষতি হবে না? তার চেয়ে নিয়েই এসো।'

জৈনুদ্দিন ধমক দিয়ে বলল, 'যা বলছি তাই কর। শুয়ে থাকো চুপ-চাপ। পয়সার লোভ বড় বেশী তোমাদের।'

ফতেমা মনে মনে খুসি হো'ল, কিন্তু খোঁচা দিতে ছাড়ল না।

'আর তোমাদেরই বুঝি কম?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তর্ক না ক'রে একটু শুয়ে থাক দেখি, মাথা কি দু'দিকেই ধরেছে, খুব বেশি?'

ফতেমা শুয়ে পড়ে বলল, 'খুব। যেন ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে।'

তা হ'লে এক কাজ কর। জলপটি দিয়ে রাখো মাথায়।'

ফতেমা কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল। জলপটির স্মৃতি তাকে আর এক যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

সেদিনও দারুণ মাথা ধরেছে ফতেমার। ছট্‌ফট্‌ করছে যন্ত্রণায়। হাট থেকে এসে শুনতে পেয়ে হাত ধোয়া নেই, পা ধোয়া নেই, জৈনুদ্দিন নিজে এসে তাড়াতাড়ি ভিজে নেকড়ার পটি বেঁধে দিল ফতেমার কপালে, তার পর শিয়রে বসে সুরু করল পাখা দিয়ে বাতাস করতে। সাকিনা ঠাট্টার ছলে অনেক বাঁকা বাঁকা কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল। বলল, 'জলজ্যান্ত এমন লম্বা-চওড়া পুরুষ মানুষটাকে ভেড়া ক'রে ফেললে কি ক'রে বরু বিবি, ধন্য তোমার যাদুর মহিমা।'

সেই যাদু এমন ক'রে ভেঙে গেল কি ক'রে? কেবল কি ফতেমাই তা ভেঙেছে?

জৈনুদ্দিন বলল, 'কি, শুয়েই আছ যে। যা বলছি তাই কর, নেকড়া ভিজিয়ে জলপটি দাও', ব'লে জৈনুদ্দিন আবার বিড়ি টানতে লাগল।

ফতেমা হঠাৎ একেবারে চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়েছে, হয়েছে। অত সোহাগে আর দরকার নেই আমার। ভারি দরদ দেখাতে এসেছ! দরদ যে কিসের জন্য তা কি আর বুঝি না? ভয় নেই মাথা-ধরায় মরে যাব না, কালই উঠতে পারব। কালই আনতে পারবে তোমার লোক।'

জৈনুদ্দিন অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এত রাত্রেও সহর ভরে বেশ লোক-জন চলাচল করছে। ক্রমেই বসতি বাড়ছে সহরের। দিনের পর দিন সহর ক্রমেই ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। দোকানে দোকানে চলছে বেচা-কেনা। জন কয়েক অল্পবয়সী মেয়ে-পুরুষ সেজে-গুজে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে চ'লেছে। তাদের হাসির শব্দ অনেকক্ষণ ধরে কানে লেগে রইল জৈনুদ্দিনের, চুলের আর শাড়ির গন্ধ বাতাসে ভেসে রইল বহুক্ষণ ধরে। সামনের বটগাছের তলাতেই ছিল লঙ্গরখানা। আর তার সম্মুখেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল জৈনুদ্দিন, ফৈজু আর কেষ্ট মণ্ডল। ফৈজু আর কেষ্ট মণ্ডল আর ওঠেনি। কিন্তু কে আর মনে করে রেখেছে তাদের কথা। ফৈজুর বিবি না কি আবার নিকা বসেছে। তার ছেলে-মেয়েও হয়েছে এর মধ্যে। গাঁয়ে আবার লোকজন ফিরে গিয়েছে। ধান-চাল আবার পাওয়া যাচ্ছে। দৈনিক মজুরির হার না কি গাঁয়েও অনেক বেড়ে গিয়েছে। দেড় টাকার কমে কেউ আর জন খাটে না। সহরে বসে বসেই সব খবর জৈনুদ্দিন পায়। সব খবরই তার কাছে এসে পৌঁছায়।

পরদিন বিকালের দিকে জৈনুদ্দিন আবার গেল ফতেমার কাছে। ফতেমা তখন সাজ-সজ্জা কেবল সুরু করেছে।

জৈনুদ্দিন বলল, 'গোসা ভেঙেছে বিবি সাহেব?'

ফতেমা বলল, 'না ভাঙলে তো দু'জনেরই ক্ষতি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু সাজ-গোছটা আজ একটু ভালো রকম হয় যেন। লোকটি কিন্তু ভারি সৌখীন। কোন খুঁত থাকে না যেন কোথাও।'

ফতেমা হেসে বলল, 'আচ্ছা, সে আর তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না।'

জৈনুদ্দিন পকেট থেকে ছোট একটা শিশি বার করল আর বোঁটাওয়ালা দুটো লাল গোলাপ।

ফতেমা অবাক্ হ'য়ে বলল, 'ও আবার কি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'গোলাপ দু'টো খোঁপায় গুঁজে নিয়ো। বেশ চমৎকার মানাবে। আর গন্ধটা একটু ছিটিয়ে নিও কাপড়-চোপড়ে। বেশ খোসবয় আছে। লোকটি ভারি সৌখীন কি না।'

ফতেমা হেসে বলল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। আজ একেবারে ডানাকাটা পরী হয়ে থাকব। কিছু ভেব না।'

জৈনুদ্দিন আবার ফিরে গেল।

খানিক বাদে গোল হ'য়ে চাঁদ উঠল আকাশে। কিছুক্ষণ জৈনুদ্দিন সহরের এ-পথে ও-পথে ঘুরে বেড়াল। এক বাড়ী থেকে চমৎকার রান্নার গন্ধ বেরুচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের কোলাহল, একটা জানালার ধারে স্বামি-স্ত্রীতে ফিস্ ফিস্ করে কি আলাপ করছে। তাদের দিকে চোখ পড়তেই জৈনুদ্দিন চোখ ফিরিয়ে নিল।

সন্ধ্যার খানিক পরেই জৈনুদ্দিনকে ফিরে আসতে দেখে ফতেমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও মা, এত সকাল যে? এই না বলেছিলে রাত হবে? কই, তোমার সেই সৌখীন লোক কোথায়?'

জৈনুদ্দিন মুহূর্ত্ত কাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফতেমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার নির্দ্দেশ মত ফতেমা আজ ভারি সুন্দর করে সেজেছে। খোঁপায় গুঁজেছে তারই দেওয়া রক্ত গোলাপ, শাড়িতে ছিটিয়েছে তারই আনা সুগন্ধি। আজকের বেশে ভারি অপরূপ মানিয়েছে ফতেমাকে। মনে পড়ল না এ সজ্জা কার জন্য।

জৈনুদ্দিন বলল, 'সে আছে একটু আড়ালে। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে নি চল।'

ফতেমা দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে অবাক্ হয়ে দেখল, তার পাতা বিছানার এক কোণে জৈনুদ্দিন বসে পড়েছে। সাধারণতঃ এ ভাবে জৈনুদ্দিন বসে না।

ফতেমা বলল, 'কি কথা?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'শোনই।'

ফতেমা আরও একটু কাছে সরে এসে বসল।

জৈনুদ্দিন ব্যাগ খুলে নতুন একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে ফতেমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হাতখানা নিজের মুঠির ভিতর চেপে ধরে বলল, 'সে যদি আজ নাই আসে, তোমার কি খুব মন পোড়বে বক্স বিবি ?'

সঙ্গে সঙ্গে ফতেমাকে জৈনুদ্দিন নিজের দিকে আরও একটু আকর্ষণ করল। ফতেমা একবার জৈনুদ্দিনের দিকে তাকালো, তার পর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদু হেসে নোটখানা ফের জৈনুদ্দিনের পকেটেই গুঁজে দিল।

জৈনুদ্দিন একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলল, 'কম হোল না কি ? আরো চাই তোমার ?'

ফতেমা অপূর্ব্ব মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাই না ? খরচ কত তার খেয়াল আছে মিঞার ? এত কাণ্ডের পর মোল্লা-মুনসীদের মুখ কি আর দু'-পাঁচ টাকায় বন্ধ হবে ভেবেছ ?'

নবীন ফ্রান্সের সমর-সঙ্গীত

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সাজ্জাদ জাহীর শুধু যে এক জন নামজাদা লেখক তাই নয়—নানা দেশের সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁর বিশেষ দখল আছে। সম্প্রতি 'Peoples war' কাগজে তিনি নবীন ফ্রান্সের সমর-সঙ্গীত সম্বন্ধে মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক উদ্‌ধৃতি ফ্রান্সের আর এক দিকে কাব্য-জগতে আলোকপাত করবে আশা করি। লেখক বলছেন—No one who saw France during defeat—and afterwards under the German yoke—can be surprised at the renaissance of lyric poetry in France today. Lyric verse in its most poignant form has ever been a child of sorrow. Only the lyric poet can adequately express periods of moral crisis, suffering and trial—whether individual or collective. "Of my deep sorrows, I make little songs" wrote Heine. The "little songs" of France today give us the heart-beat of a nation.

অর্থাৎ ফ্রান্সকে যিনি পরাজয়ের মধ্যে এবং পরবর্ত্তী কালে জারম্যান শাসনের অধীনে দেখেছেন তিনি আজকের দিনের ফ্রান্সের এই গীতিকাব্যের নব অভ্যুদয় দেখে বিস্মিত হবেন না ; দুঃখ থেকেই এই সুতীব্র গীতিকবিতাগুলির জন্ম। দেশের নৈতিক সঙ্কট, নির্য্যাতন ভোগ ও পরীক্ষার কালকে সুস্পষ্ট ও সম্যক্ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন একমাত্র গীতিকবিতার কবিরা। সে দুঃখ ব্যক্তিগত জীবনের গভীর দুঃখই হোক, আর সমগ্র জাতির সমষ্টিগত দুঃখই হোক। আজকের দিনের সমর-গীতির মধ্যে সমগ্র ফ্রান্সের অন্তর স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌ছে।

এই "Little Songs" সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফরাসী লেখক বলছেন—মনে পড়ে আমার ১৯৪০-এর ভয়াবহ দিনে ফরাসীদের ব্যথাতুর মুখগুলি। মনে পড়ে আমার সেদিনের সে দুঃস্বপ্নময় বিচ্ছিন্নতা,—মনে পড়ে অবিশ্বাস্য পরাজয়ের পর স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন সমগ্র ফরাসী দেশের কথা।

শোকে মুহ্যমান হয়ে এমনি স্তব্ধতার মধ্যে মানুষ ফিরে চায় যা' গেল তার মূল্য যাচাই করার জন্য—যে বিশ্বাস নিয়ে সে বেঁচে থাকবে আগামী কালে তাই খুঁজতে বেড়ায় সে এমনি স্তব্ধতার মধ্যে। মনে পড়ে বিদ্রোহের ঢেউ উঠল পাহাড়প্রমাণ, আর তারি সঙ্গে জন্ম হল নূতন বিশ্বাসের।

শত সহস্র মূক ফরাসী জনসাধারণের অন্তরের কথা ফুটে উঠল কবির কাব্যে। সেই কাব্যে মুখর হয়ে উঠল জনগণের ব্যথা, তাদের বিদ্রোহী মনের বিক্ষোভ ও আশা আকাঙ্ক্ষা। এই কবিদের মধ্যে অনেকেই ফরাসী কাব্যজগতে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত ছিলেন—তাদের সঙ্গে উদ্ভব হ'ল বহু নবীন কবির। প্রথম কবিদের মধ্যে অনেকেই নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করছেন ; যথা—Jules Supervielle—দূর থেকে তিনি ফ্রান্সের জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন :—

> I seek for France from far away
> With empty hands,
> I seek in empty space
> And at a great distance···

বহু দূর থেকে আজ খুঁজি ফ্রান্সকে—শূন্য হাতে, নির্জ্জন আবাসে—অনেক দূর থেকে।

অথবা—

> O Paris, open city
> Like a wound···

প্যারি, উন্মুক্ত নগরী অনাবৃত ক্ষতের মত।

অবরুদ্ধ ফ্রান্সে ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রতিরোধের কণ্ঠ। এ্যালজিয়ার্স (Algiers) থেকে প্রকাশিত Fontaine কাগজে এই সব লেখকরা শত্রুর সঙ্গে যে কোনো প্রকার সহযোগের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করবার আশ্রয় খুঁজে পেল। এদের লেখায় বিদ্রোহের অগ্নি আছে, আশার বাণী আছে, আর অকুণ্ঠ বিশ্বাসের পরিচয় আছে ফ্রান্সের ভাবী সৌভাগ্যের উপর। বহু বর্ণে রঞ্জিত কবিদের এই গীতিমালিকার ফুলগুলি বিপুল জনসংঘের সঙ্গে কবির কণ্ঠ একই ঝঙ্কারে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—একের কণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে বহুর অন্তরের কথায়—

> And my entire being yearns passionately
> for liberty,
> For liberty, dragged to earth and
> murdered···
>
> (Loys Masson)

আমার সমগ্র দেহ মনে আজ সুতীব্র ব্যাকুলতা স্বাধীনতার জন্ত,
যে স্বাধীনতাকে মাটিতে টেনে নামিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

অথবা—

There is not one almond-tree this spring
whose trunk is not caught in a chain,
Fetters of a slave, touching the soil,
from where revolts arise,
Standing erect, its blossom sings
a hymn to the spilt blood of man.
And its branches bend and form an arch
to the closed doors of the bastilles.
There is not one chestnut-tree
which does not feel
its chestnuts hardening like bullets,
Bullets against those bullets
Which were used to execute other men
under its very shadow……
There is not a single garden which is not
like a white sheet of anger,
Spread over the spirit of the Great Dead,
There is not a sea-gull, flying
Over the sea, which doesn't cry for liberty.
This spring, who can sing,
if he doesn't sing Justice ?
Which musician hands can play
over the waves of the organ,
If they have not blossomed
white with the foam of revolt ?

এ বসন্তে এমন একটি অ্যালমণ্ড গাছ নেই যার কাণ্ড শৃঙ্খলে পড়েনি বাঁধা; দাসত্বের শৃঙ্খল মাটি স্পর্শ করে লুটাচ্ছে—যে মাটি থেকে জেগে ওঠে বিদ্রোহ—মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই গাছ—ফুল ফুটাচ্ছে গানের—নরদেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত রক্তের এ গান, তার শাখা-প্রশাখা নুয়ে পড়ে—ব্যাষ্টাইলের অবরুদ্ধ দ্বারের উপর তোরণ রচনা করছে, আজকের দিনে প্রত্যেক চেষ্ট-নাট গাছ অনুভব করছে তার ফলগুলি যা কঠিন হয়ে যাচ্ছে বন্দুকের গুলীর মত—যে গুলীতে তারই ছায়ায় নিহত হয়েছে কত অজানা মানুষ; এমন বাগান আজ নেই এখানে, যা মৃত মহাত্মাদের উপর ছড়িয়ে দেয়নি তার শুভ্র আস্তরণ প্রতিহিংসার দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে ও বিক্ষোভে। সমুদ্রের উপর দিয়ে আজ এমন একটি পাখীও ওড়ে না যার কাকলিতে স্বাধীনতার আর্ত্তধ্বনি যায় না শোনা; এ বসন্তে যে গাইবে গান সে ন্যায়বিধানের গান না গেয়ে আর কোন গান সে গাইবে? বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি-তরঙ্গে আজ বিদ্রোহের ফেনায়িত ঢেউএর পর ঢেউ না তুলে কোন যন্ত্রী আজ বাজাবে তার যন্ত্র?

Gabriel Audisio—আর এক জন বিদ্রোহী কবি; তাঁর ঘোষণা আরো তীব্র—আরো ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচায়ক:

The living have some motive of their own,
the dead have their secrets to keep.
Those that are invisible shall come,
On smouldering ashes where
marching quietly,
They shall leave their foot-prints.

জীবিতদের আছে আপন আপন উদ্দেশ্য,—মৃতের কাছে রইল অনেক কিছু গুপ্ত;—যারা অদৃশ্য তারা আসবেই; ধূমায়িত ভস্মস্তূপের উপর ধীরে ধীরে পা ফেলে তারা আসবে—তাদের পায়ের চিহ্ন থাকবে অক্ষয় হয়ে।

পুরাতন লেখকদের মধ্যে সমর-কবি হিসাবে সব চাইতে বড় Louis Aragon—এঁর কবিতা. কড়া পাহারার প্রাচীর ভেদ করে বাহিরের জগতে এসে পৌচেছে। Armistice অর্থাৎ যুদ্ধ-বিরতির পর তাঁর দু'খানা বই বেরিয়েছে—Creve—Cocur—ফ্রান্সে প্রকাশ হতে না হতেই এখানি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে গ্রেট ব্রিটেনে,—Les Yeux d'Elsa,—মুদ্রিত হয়েছিল সুইটজারল্যাণ্ডে এবং শোনা যাচ্ছে এখানি শীঘ্রই লণ্ডনে প্রকাশিত হবে।

Aragonএর কবিতাগুলির ধাঁজ ও ভাব সেকালের ফরাসী গীতিকবিতার মত। ফরাসী ভাবুকতা ও অনুভূতির স্পষ্ট ছায়া দেখতে পাওয়া যায় এঁর কবিতার ভিতর। সাধারণ লোকদের যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে প্রস্তুত রাখলে তাদের মনে যে তীব্রতা ও বিক্ষোভ দেখতে পাওয়া যায়, আর একটি আসন্ন পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে আর একবার পৃথিবীর তরুণ প্রাণের নিষ্ঠুর উৎসর্গের আকাঙ্ক্ষায়—তেমনি তীব্রতা ও বিক্ষোভ ফুটে উঠেছে Aragonএর কবিতাগুলিতে।

…The night of the Medieval Age
Covers with a dark mantle this broken universe.

মধ্যযুগের রাত্রি
তিমিরাবরণ দিয়ে ঢেকে ফেলছে এই
শতধা ভগ্ন পৃথিবীকে।

সমস্ত বিপর্য্যয়ের মধ্যে—ব্যক্তিগত নিরানন্দের মধ্যে Aragon একমাত্র চিরন্তন বস্তু দেখতে পাচ্ছেন—তার পত্নীর প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা—অন্ধকারের মধ্যে সেই ভালবাসাই একমাত্র আলোর দিশারী।

Oh my love, oh, my love, you only exist,
At this hour of sad sunset for me
When I seen to lose all at once
the thread of my poetry
Of my wife and of joy………

হে আমার প্রেম, আমার ভাগ্যে এল সূর্য্যাস্তের দুঃখময় মুহূর্ত্ত—এখন শুধু তুমিই আছ বর্ত্তমান; যখন মনে হয় আমি আমার সব কিছু হারাতে বসেছি তখন তোমাকেই আমি আমার কাব্যের ও আমার প্রিয়তমার সঙ্গে, আমার জীবনের আনন্দের সঙ্গে তোমাকেই যোগসূত্ররূপে অবলম্বন করি।

তার পর এল কয়লার দেশ দিয়ে পশ্চাৎ অপসরণের পালা—যে কয়লার দেশে আছে ক্রোধ, আছে কয়লার কটু তিক্ত আস্বাদ। সেখানে যারা পালিয়ে যাচ্ছে—তাদের প্রতি

A handerkerchief of fire rays, Adien.

তার পর এল armistice—যুদ্ধ বিরতি :

My country is like a boat
Whose sailors have a bandoned it,
And I am like the king
More unhappy than unhappiness,
Who remains the king of his sorrows.
To live now is no more than a strategy,
Even the breeze can hardly dry tears,
It is necessary to hate all that I love
I have no more to give
The enslaver now rules···

আমার দেশ যেন একখানি নৌকা—তার মাঝিরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমি যেন সেই রাজা, যার দুঃখ—দুঃখের চেয়েই গভীরতর, যে থাকে তার দুঃখেরই রাজা হয়ে, বেঁচে থাকা এখন রণ-কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় ; বাতাসেও শুকায় না চোখের জল, এক দিন যে সব ভালবেসেছিলাম এখন ঘৃণা করতে হবে সেই সবকে ; আমার দিবার মত আর কিছু নেই, যে আমাদের দাস বানিয়েছে সেই করে আজ রাজত্ব।

কবি অতীতকে স্মরণ করছেন—পরাজয়ের তামসী রাত্রির কল্পনা করছেন—সঙ্গে নূতন যুগের নূতন প্রভাতের আগমনীও শুনাচ্ছেন—

There is a limit to suffering,
When Joan cames to vancouleurs ;
Ah, you may cut France to pieces,
That morning too was pale······

যন্ত্রণারও একটা সীমা আছে ; ফ্রান্সকে আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে কিন্তু যে প্রভাতে যোয়ান এসেছিল সে প্রভাতও ছিল এমনি মলিন।

তার পর থেকেই দেশের দুর্গতি তাঁর মনকে সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ব্যক্তিগত আনন্দ ও সুখ সম্ভোগের মধ্যে কবি আর কোনো দিন নিজেকে নিমগ্ন করতে পারেন না—

My love, I was in your arms
Outside, someone was humming
An old French song,
At last I now understand what is
wrong with me—
Its refrain was like a naked foot,
Stirring the green waters of silence.

হে আমার প্রেম, আমি ছিলাম তোমার বাহুপাশে—বাহিরে কে যেন গুন্ গুন্ করে গাইছিল একটা পুরান ফরাসী গান, অবশেষে আজ আমি বুঝেছি কোথায় করেছিলাম আমি ভুল ; সে গানের ধুয়াটা যেন ছিল একখানি অনাবৃত চরণ—নিস্তব্ধতার নীল জলে তাতে জাগছিল মৃদু চঞ্চলতা।

ব্যক্তিগত ভালবাসা ক্রমশঃ মিশে যায় দেশপ্রীতিতে, কবির পত্নী-প্রেম মহত্তর প্রেমের মধ্যে গভীর হয়ে ওঠে। প্রেম দুই ধারায় প্রবাহিত হতে চলে—একাঙ্গ হয়ে। কবি জাতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে।

I too have secrets, like half-mast flags,
They can question me endlessly
and ask who am I, what was I,
I remember only the sky only one
and only one queen,
Howsoever poor she may be, I
shall be only her train-bearer,
The only azure for me is my loyalty.

* * *

No one can take away from us
the song of the flute.

অর্দ্ধ-অবনত পতাকার মত আমারও আছে রহস্য,—তারা প্রশ্ন করবে আমায় অবিরাম—কে আমি, কি ছিলাম আমি। আমি স্মরণ করি আকাশকে, একমাত্র, কেবল একমাত্র এক রাণীকে ;—হোক না সে যত দরিদ্র, তবু আমি হব তার। আমার রাজ্যে সেই ত আমার একমাত্র তৃণশ্যামল ভূমি—বাঁশীর গান কেউ কি কেড়ে দিতে পারে আমাদের কাছ থেকে ?

Which rises century after century
from our threats,
The laurels are cut, but there are
other struggles,
Which shall grow with our sweet
marjorams and our rose-trees···
It does not matter if die before
The emergence of the sacred face
which will certainly again appear
one day,
Let us dance, O ! my friend let
us dance the capucine,
My fatherland is hunger, mesery and love !

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে গান উঠ্‌ছে আমাদের কণ্ঠ থেকে, আজ জয়মাল্য আমাদের ছিন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু আরো আছে সংগ্রাম—যে সংগ্রাম বেড়ে চলবে আমাদের সুগন্ধ গোলাপ ও মারজোরাম গাছের সঙ্গে। কি আসে যায় যদি পবিত্র মুখখানির আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমার হয় মৃত্যু ? একদিন নিশ্চয়ই হবে আবির্ভাব—তার আবির্ভাব। নাচো বন্ধুগণ নাচো, ক্ষুধা, দুর্গতি ও প্রীতি এই ত আমার দেশ।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, ফরাসী কবিতা তার পবিত্রতম ঐতিহ্যে ফিরে এসেছে, অন্যতম প্রেরণায় হয়ে উঠেছে সঞ্জীবিত। ফরাসী কবিদের গানে গানে, যে গানে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে জাতির জীবনের মহা নাটক, ফ্রান্স সমগ্র জগতের কাছে আত্মপ্রকাশ করে' দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার ভেদ করে ফ্রান্স আজ আবার নূতন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বেরিয়ে এসেছে,—ফ্রান্স বৃহত্তর ফ্রান্স যার অনমনীয় আত্মা একদা প্রসুপ্ত হয়ে পড়েছিল তার নিদারুণ দুঃখের দিনে।

সতীর দেহত্যাগ ও পীঠস্থানের উৎপত্তি

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী

১

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্রগণের অন্যতম দক্ষ প্রজাপতির সহিত মহাদেবের বৈরভাব এবং তৎকর্তৃক "দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের বর্ণনা" নানা পুরাণ এবং তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শিব দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংসসাৎ করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার এক নাম "ক্রতুধ্বংসী" হইয়াছে। পৌরাণিক আখ্যানগুলি অধিকাংশ নিম্নে বর্ণিত হইল:—বর্ত্তমান কল্পের আদিম বা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দক্ষ প্রজাপতির অনেকগুলি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি কন্যাগুলিকে বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা:, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, মরীচি, ধর্ম্ম, সোম এবং শিব প্রভৃতিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কোনও কোনও পুরাণের মতে শিবজায়া সতী দাক্ষায়ণীদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা; আবার কোনও কোনও পুরাণের মতে সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিলেন। সকলেই অবগত আছেন যে, শিব ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুরও পূজ্য এবং শিবের অপেক্ষা পূজ্যতর দেব আর কেহই নাই বলিয়া তাঁহার নাম দেবদেব বা মহাদেব হইয়াছে। সতীর সহিত বিবাহ-নিবন্ধন দক্ষ শিবের শ্বশুর, সুতরাং গুরু হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত অভিমান করিতেন এবং সেই অভিমানই শ্বশুর জামাতার মধ্যে ঘোরতর বৈরিতার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

২

একদা কোনও এক দেবসভায় সর্ব্বদেববরেণ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বশিষ্ঠাদি দেবর্ষি-মহর্ষিগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে প্রজাপতি দক্ষ সভা প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার সম্মান প্রদর্শনার্থ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেব ব্যতীত যাবতীয় দেবগণ, মহর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগণ এবং প্রজাপতিবৃন্দ স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। দক্ষ দেখিলেন যে, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও মরীচি প্রভৃতি তাঁহার জামাতৃগণ তাঁহার সম্মান রাখিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, অথচ শিব জামাতা হইয়াও তাঁহার সম্বন্ধের উপযুক্ত গৌরব রক্ষা করিলেন না। এই অতিশয় অভিমানে দক্ষের জ্ঞান অভিভূত হওয়ায় তিনি চরাচর-গুরু শিবের মাহাত্ম্য ভুলিয়া গেলেন এবং ক্রোধ তাঁহাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল। মূঢ়ত্বনিবন্ধন দক্ষ শিবকৃত (কল্পিত) অবমাননার প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিয়া সেই সভা অচিরে পরিত্যাগ করিলেন।

দক্ষ ভাবিলেন যে, এক অভূতপূর্ব্ব আড়ম্বরময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞে দেব-দানব-নাগ-যক্ষ-রাক্ষসজন্য, দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষিগণ হইতে নিখিল মনুষ্য-পশু-পক্ষী-তৃণ লতাদি যাবতীয় প্রাণীকে তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সহিত নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সকলের যথাযোগ্য আদর সংকার করিবেন, কেবল মাত্র সতীপতি শিবকে তাঁহার পত্নী-পরিজনাদি সহ উপেক্ষা সহকারে বর্জ্জন করিবেন। নির্ব্বোধ দক্ষ মনে করিলেন যে, এই প্রকার কর্ম্ম করিলেই তাঁহার উদ্ধত জামাতা মহাদেবকে তৎকৃত অবমাননার যথোচিত প্রতিশোধ প্রদান করা হইবে।

৩

অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু এবং শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ প্রাচীনত্বে এবং প্রামাণ্যে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে অগ্রগণ্য বলিয়া সুধীসমাজে গৃহীত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরাণে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে, রুদ্র দক্ষ প্রজাপতির অনিন্দিত দুহিতা সতীকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; সতী দক্ষের প্রতি কোপ বশতঃ স্বকীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া হিমবান্ পর্ব্বতের দুহিতৃরূপে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভগবান্ হর সতীর অনন্যা সেই হিমালয়-কন্যা উমাকে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৮ম অধ্যায়, ১২শ—১৪শ শ্লোক)।

৪

শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আখ্যান পাওয়া যায়। উক্ত স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্বশুর দক্ষের প্রতি জামাতা শিব যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই—এই কল্পনায় শিবের উপর দক্ষের ক্রোধ, দেবসভায় দক্ষ কর্ত্তৃক শিবনিন্দা, ভৃগু ঋষি শ্বশুর দক্ষের পক্ষ গ্রহণ করায় শিবানুচর নন্দী কর্ত্তৃক দক্ষের এবং শিবনিন্দক ব্রাহ্মণগণের প্রতি অভিশাপ প্রদান এবং ভৃগুকর্ত্তৃক নন্দীর প্রতি ও শিবভক্তগণের প্রতি প্রত্যভিশাপ প্রদানাদি বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী পাঁচটি অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞ, যজ্ঞে পত্নী-পরিবার সহ শিব ব্যতীত ত্রিভুবনের দেব-দানবাদি পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের নিমন্ত্রণ, যজ্ঞোৎসব শ্রবণে সমুৎসুকহৃদয়া সতীর শিববাক্য উপেক্ষাপূর্ব্বক পিতৃগৃহে গমন, তথায় পিতৃকৃত যথোচিত আদর সংকারলাভ না করায় তাঁহার রোষ ও পিতৃভৎর্সনা, অবশেষে শিবনিন্দক পিতা হইতে উৎপন্ন শরীর ত্যাগে প্রতিজ্ঞা এবং যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সমাধিজাত অগ্নিতে স্বকীয় শরীর দাহ, দেবীর তদবস্থা দর্শনে তাঁহার অনুচরসমূহের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগ, ভৃগু-মন্ত্র প্রভাবে যজ্ঞাগ্নিজাত ঋভব নামক দেব কর্ত্তৃক দেবীর সেই অনুচরগণের পরাভব, সতীর মৃত্যু-সংবাদে মহা রুদ্রের মহা ক্রোধসঞ্জাত কোটি কোটি মহা ভয়ঙ্কর গণের অধিপতি বীরভদ্র এবং ভয়ঙ্করী ভদ্রকালীর আবির্ভাব এবং তাঁহাদের সহিত শিবের যজ্ঞভূমিতে আগমন, যজ্ঞধ্বংস, বীরভদ্রাদি কর্ত্তৃক দক্ষের শিরশ্ছেদ ও দক্ষের ছিন্নমস্তক অনন্ত যজ্ঞকুণ্ডে ভস্মীভূত করিবার সমকালে পূষাদেবতার সমস্ত দন্ত, ভৃগুমুনির লম্বিত শ্মশ্রু, ভগদেবতার চক্ষুর্দ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণের হস্তপদাদির বিনাশ ও পরিশেষে রুদ্রকর্ত্তৃক যজ্ঞের কুণ্ডভস্মাদির বিবিধ বীভৎস কর্ম্মের অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। পরিশেষে ব্রহ্মাদি দেবগণের সানুনয় সান্ত্বনার প্রভাবে মহাদেবের কোপশান্তি এবং তাঁহার বরে দক্ষের প্রাণলাভ, পূষা ব্যতীত অন্যান্য দেবগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনঃপ্রাপ্তি এবং যজ্ঞের সম্পূর্ণতা সাধন হইয়াছিল। কেবল নন্দীর শাপপ্রযুক্ত এবং শিবনিন্দার ফলস্বরূপ দক্ষের স্বাভাবিক সুন্দর মস্তকের পরিবর্ত্তে ছাগমুণ্ড এবং ভৃগুমুনির জানাভিবিলম্বিত শোভন শ্মশ্রুজালের পরিবর্ত্তে ছাগশ্মশ্রু যোজিত ও চিরস্থায়ী হইয়াছিল। পূষাদেবতার দন্তগুলি আর নূতন হইল না, পরন্তু শিব আদেশ দিলেন যে, ভবিষ্যৎকালে যাজ্ঞিকেরা দন্তহীন পূষাদেবতার জন্য পুরোভাগের (পিষ্টকের আস্কে বা চিতুই পিঠের) পরিবর্ত্তে পিটুলি বাটার ব্যবস্থা করিবেন।

৫

যাহা হউক, শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই দীর্ঘবর্ণনা থাকিলেও শোকোন্মত্ত শিবকর্ত্তৃক সতীর শবদেহ স্কন্ধে বহন, বিষ্ণু বা কোনও অপর দেবতা কর্ত্তৃক উহার খণ্ডশঃ ছেদন এবং সেই ছিন্ন দেহখণ্ডগুলির পৃথিবীতে পতননিবন্ধন একপঞ্চাশৎ পীঠস্থানের উৎপত্তির কোনও প্রসঙ্গ নাই। আর উক্ত পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির মর্ম্ম অনুধাবন করিলে সুস্পষ্টই দেখা যায় যে, সমাধিজাত যোগানলে সতী স্বয়ং তাঁহার শরীরকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার শবদেহের অস্তিত্ব তাহার বহন অথবা ছেদনের প্রসঙ্গই এই পুরাণে থাকিতে পারে না; যথা, মৈত্রেয় উবাচ—

"ইত্যধ্বরে দক্ষমনূক্ত শত্রুহন্
ক্ষিতাবুদীচীং নিষসাদ শান্তবাক্।
স্পৃষ্ট্বা জলং পীতদুকূলসংবীতা,
নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ। ২৪
কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা
সোদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসিস্থিতং
কণ্ঠাদ্ভ্রুবো মধ্যমনিন্দিতাহনয়ৎ। ২৫
এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা,
মুহুঃসমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ।
জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী,
দধার গাত্রেষ্বনিলাগ্নিধারণাম্। ২৬
ততঃ স্বভর্ত্তুশ্চরণাম্বুজাসবং
জগদ্‌গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরম্।
দদর্শ দেহো হতকল্মষা সতী,
সদ্যঃ প্রজ্বাল সমাধিনাগ্নিনা। ২৭ চতুর্থ অধ্যায়

৬

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ প্রধানতঃ ভাগবত সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হওয়ায়, শিব এবং শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং সতীর দেহত্যাগ অথবা দক্ষযজ্ঞধ্বংস প্রভৃতির প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবেই লিখিত হইয়াছে। বায়ু এবং মৎস্য এই দুই প্রাচীন পুরাণে শিবশক্তির মাহাত্ম্য সবিস্তার পাওয়া যায়, অতএব এক্ষণে আমরা উক্ত উভয় পুরাণে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক আখ্যান সংক্ষিপ্তভাবে এস্থলে বিবৃত করিতেছি।

বায়ুপুরাণের (অনুষঙ্গপাদের) ত্রিংশ অধ্যায়ে চাক্ষুষ মন্বন্তরের দক্ষচরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথিত বিবরণের মত যজ্ঞমহোৎসবে দক্ষ, শিব এবং সতীকে উপেক্ষা করিয়া নিমন্ত্রণ না করায় সতী স্বয়ং পিতার যজ্ঞস্থলে আগমনপূর্ব্বক পিতাকে র্ভৎসনা করেন এবং দক্ষ প্রভৃত শিব নিন্দা সহকারে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। সতী স্বামীর এবং নিজের অবমাননায় ক্রুদ্ধা হইয়া পিতাকে বলেন :—"পিতঃ, আমি কায়মনোবাক্যদ্বারা কখনও কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি তুমি আমার নিন্দা করিতেছ, অতএব, আমি তোমার ঔরসজাত এই দেহ ত্যাগ করিব," এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যোগাসনে সমাহিতা হইয়া স্বকীয় মনে আগ্নেয়ী-ধারণা করিলেন। সেই আগ্নেয়ী-ধারণা হইতে সমুত্থিত বহ্নি তাঁহার অন্তর বায়ুদ্বারা সন্দীপ্ত এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যুগপৎ নিঃসৃত হইয়া তাঁহার শরীরকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। পুরাণের সেই বর্ণনা এইরূপ :—

ততৈবাথ সমাসীনা যুক্তাত্মানং সমাদধে।
ধারয়ামাস চাগ্নেয়ীং ধারণাং মনসাত্মনঃ।৫৪।
তত আগ্নেয়ী-সমুত্থেন বায়ুনা সমুদীরিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহ্নির্ভস্ম চকার তাম্।৫৫।

অতঃপর এই ঘোরতর দুঃসংবাদ শ্রবণে মহাদেব দক্ষের প্রতি রুষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎ বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণাদিরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন এরূপ লিখিত আছে; কিন্তু তৎকর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংসের বর্ণনা নাই। বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষ এবং বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন এবং জন্মান্তরীণ বৈরনিবন্ধন দক্ষ গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারের নিকট কনখ'ল নামক স্থানে পুনরায় এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং পূর্ব্ববৎ সেই মহোৎসবে ত্রিভুবনের যাবতীয় জীবের নিমন্ত্রণ করিয়া কেবলমাত্র অবমাননা করার উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক মহাদেবকে উপেক্ষা করেন। এই সময়ে মহাদেব হিমালয়ের গৃহে পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত উমা বা গৌরী নামে পরিচিতা দেবীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত মেরু পর্ব্বতের এক মনোহর শৃঙ্গে সুখে বসতি করিতেছিলেন। সেই উচ্চস্থান হইতে দেবী ইন্দ্রচন্দ্রাদি শত শত বৈমানিক দেবদেবীকে সুসজ্জভাবে কোনও স্থানে গমন করিতে দেখিয়া মহাদেবকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং মহাদেবের মুখে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠানের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের তথায় নিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মহাদেব-প্রদত্ত উত্তরে দেবীর মনে সন্তোষের পরিবর্ত্তে অসন্তোষের উৎপত্তি হয় এবং তিনি পতির শ্রেষ্ঠতা ও মাহাত্ম্যের উপর সংশয় প্রকাশ করেন। মহাদেব দেবীর সংশয় দূরীকরণার্থ তৎক্ষণাৎ অতিঘোররূপ ভয়ঙ্কর বীরভদ্রের সৃষ্টি করেন এবং দেবীর ক্রোধ হইতে ভয়ঙ্করী ভদ্রকালীর প্রাদুর্ভাব হয়।

দক্ষযজ্ঞধ্বংসসাৎ করিবার নিমিত্ত মহাদেব এবং মহাদেবীর আদেশপ্রাপ্ত হইয়া ভদ্রকালী এবং বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞকে সমূলে বিনষ্ট করিলেন। যজ্ঞ বিনাশের বর্ণনা শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুরূপই প্রদত্ত হইয়াছে এবং পরে সেই বিনষ্ট যজ্ঞকুণ্ড হইতে স্বয়ং মহাদেবের আবির্ভাব, দক্ষকর্ত্তৃক শিবের অষ্টসহস্র নামাত্মক স্তবপাঠ এবং সেই স্তবের ফলে সন্তুষ্ট শিবের প্রসাদে দক্ষের যজ্ঞফললাভ কথিত হইয়াছে। বায়ু পুরাণের আখ্যানের প্রথমাংশে দক্ষযজ্ঞধ্বংসের এবং দ্বিতীয়াংশে দেবীর দেহত্যাগের বর্ণনা নাই। এই পুরাণেও পীঠস্থানের উৎপত্তি অথবা অবস্থানের কোনও প্রসঙ্গ নাই।

৭

মৎস্য পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পিতৃবংশ বর্ণনার প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞে দেবীর দেহত্যাগের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং দক্ষের প্রার্থনাক্রমে দেবীর মুখে তাহার অষ্টোত্তর শত পুণ্যতীর্থের (পীঠের নহে) নাম কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা এইরূপ আরব্ধ হইয়াছে, যথা :—"দক্ষের অনুষ্ঠিত এক বিপুল যজ্ঞে শিবব্যতিরিক্ত যাবতীয় দেবদেবীর নিমন্ত্রণ হওয়ায় সতী সেই যজ্ঞভূমিতে আসিয়া

—শ্রাবণ-স্মরণী—

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

"I sought fit words to paint the blackest face of woe"—Sir Philip Sidney

বেলা শেষ, মেঘ ক'রে আসে
শ্রাবণ-আকাশে ;
আসন্ন রাত্রির ছায়া উন্মত হৃদয়ে।
সুদূরের ভবিষ্যের নির্দ্দেশ জানি না,
অনুভবে জানি
অশান্ত হৃদয়ে বাজে নবরাগে একখানি বীণা ;
বহায় গানের বন্যা, তীব্রতম সুর
প্রাণের প্রাচুর্য্যে ভরপুর,
অদম্য প্রেরণা আনে মনের দ্বীপের তীরে
সদ্যজাত পত্রপুষ্পপুটে ; শ্যামময় প্রান্তরেখা ঘিরে।
মনে হয় এই পরিচয়
এত রূপ এত রস বর্ণে গন্ধে ব্যাকুল বিস্ময়
পরিচিত পুরাতন নয় ;
শৈশবে কৈশোরে মন ছিল শুধু সূর্য্যরশ্মিপায়ী,
দেখেছে বিস্ময়ে শুধু
আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহতারকারে ;
প্রাণের গভীরে তার সে বিস্ময় হয়নি তো স্থায়ী,
সব স্মৃতি চিহ্নহীন, দুঃখহীন প্রাণের জোয়ারে।
শ্রাবণের ঘনমেঘে, বিদ্যুতের ভ্রূকুটি বিলাসে
ঝড়ো-হাওয়া স্ফীত দূর অরণ্যের অশান্ত মর্ম্মরে—
শীতের সোনালী রোদে, বসন্তের কোকিলের স্বরে
হেমন্তের ক্ষেতে, ঘন দুর্ব্বাদল শ্যামস্নিগ্ধ ঘাসে—
সে-বিস্ময় হয়নি তো স্থায়ী,
যৌবনের বেগ এলো, এলো এক নব্য মন্ত্রপায়ী।
হে আমার প্রাণময়ী প্রাণদাত্রী হে সুবর্ণ বীণা,
রক্তসন্ধ্যা স্বপ্নের ভেলায়
নিরালায়
প্রথম হয়েছে দেখা কি-না
সে-কথা এখন থাক্—
হৃদয়ের পলাশে-পলাশে আজ রক্তিম আগুন
শ্রাবণের রজনী করুণ,
তার ভাষা বিজন শরীরে রূপ পাক্।
যৌবনের বন্যা আসে, তারি সাথে আসে বিপর্য্যয়,
আসে ঢেউ দৈন্যবোধ পতনের ভয় ;
প্রদোষে পেয়েছি যারে গোধূলিতে হারাবার ভয়—
অকারণ নয়।
স্পন্দিত বীণার তারে নিগূঢ় পরশে তুলি নির্ম্মম ঝঙ্কার
সন্নত সেতার
কেঁপে-কেঁপে ওঠে—
লক্ষ সুরে উচ্চকিত লক্ষ তারা প্রাণের আকাশে,
লক্ষ কথা মৃত্তিকায় ফোটে।
বাহিরে গম্ভীর মেঘে বাতাসের অট্টরোল শুরু,
মেঘ ডাকে গুরু-গুরু—
সমুখে চোখের কাছে অর্দ্ধ নিমীলিত এক যুগ্ম চারু ভুরু
অরূপ মাধুর্য্যরসে ভরা ;
কাটে যতো কুজ্ঝটিকা, যৌবনের অসন্তোষ, অকালের জ
আত্মরতি এ-তো নয়, এ-তো নয় ত্রস্ত পলায়ন
দূর দ্বীপে দূর উপকূলে,
এ মুহূর্ত্ত বন্ধ্যা নয়, এখানে আসি না পথ ভুলে
নিষিদ্ধ মদিরা মুখে তুলে ;
সৃষ্টির প্রথম-হ'তে
এ তরঙ্গ সঞ্চরিল মিলন-মাঙ্গল্যহোমে সহস্রের স্রোতে
প্রবল বন্যার স্রোতে অশোক-মঞ্জরি
চমকিল দিবসশর্ব্বরী,
বনের মঞ্জীরধ্বনি নীলাকাশে সারাক্ষণ রহিল গুঞ্জরি'
বার বার ফিরে ফিরে
সে-সুর প্রত্যহ ডাকে বহু অতিথিরে
ফাগুনের গোধূলিতে, ধারাময় শ্রাবণের অমা-রজনীতে ;
সেই ব্যাকুলতা
আমারো হৃদয়ে আজ হে আমার নীলমণিলতা।
এনেছে মর্ম্মরধ্বনি প্রসন্ন পূর্ণতা।
সহস্র কর্ত্তব্যবোধ আমাকে সুদূর হ'তে ডাকে
অস্বীকার করিনি তো তাকে ;
কিন্তু আজ মন চায়
উদ্দীপ্ত ঝঙ্কারসুর উত্তোলিত নিজের বীণায়,
নিজ কেন্দ্র নির্ব্বিশেষে চিনে লই আগে—
অখণ্ড কর্ত্তব্যবোধ যাক্ পুরোভাগে॥

পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিতঃ, কি জন্য তুমি আমার স্বামীকে নিমন্ত্রণ কর নাই?" দক্ষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"তোমার পতি শূলপাণি যজ্ঞে নিমন্ত্রণ হইবার অযোগ্য, তিনি সংহারকর্ত্তা, সুতরাং অমঙ্গলময়।" সতী পিতার বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া বলিলেন—তোমা হইতে উৎপন্ন এই দেহ আমি পরিত্যাগ করিব ; আর তুমি ভবিষ্যৎ (মন্বন্তরে) কালে দশ পিতার এক পুত্ররূপে ক্ষত্রিয় জাতিতে উৎপন্ন হইবে এবং তোমার অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞেই রুদ্রহস্তে তোমার বিনাশ ঘটিবে।" এই অভিশাপ দিয়া সতী যোগাবলম্বনে আত্মদেহোত্থিত অগ্নির দ্বারা স্বকীয় শরীরকে দগ্ধ করিলেন। তখন দেব-দৈত্য-কিন্নর-গান্ধর্ব্ব-গুহ্যকাদি সকলেই 'একি হইল! একি হইল!' বলিয়া উঠিলেন। "সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষার বর্ণনা এইরূপ :—"

> ইত্যুক্ত্বা যোগমাস্থায় স্বদেহোদ্ভবতেজসা।
> নির্দহন্তী তদাত্মানং সদেবাসুরকিন্নরৈঃ।
> কিং কিমেতদিতি প্রোক্তা গন্ধর্ব্বগণগুহ্যকৈঃ। ১৬-১৭

এই পুরাণে মহাদেব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের বর্ণনা নাই। উক্ত যজ্ঞধ্বংস ভবিষ্যৎ (বৈবস্বত) মন্বন্তরে ঘটিবে ইত্যাকার অভিশাপ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই ধ্বংসের বর্ণনা প্রদত্ত হয় নাই। স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, মৎস্য পুরাণের এই প্রসঙ্গ বায়ু পুরাণের লিখিত প্রথমাংশে বর্ণিত আখ্যানের অনুরূপ।

বিভ্রাট বাধিল জল লইয়া।

মূল বিভ্রাট কলের জলে বা জলের কলে যেখানেই হো'ক প্রতিক্রিয়াটা ঘটিয়াছে ঘরে ঘরে। ভাঙা পাইপ লইয়া কর্পোরেশন জল জোগাইতে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, আর সংসার-প্রপীড়িতা বঙ্গনারীরা জলের অভাবে হিমসিম খাইতে খাইতে মন ভাঙিয়া ফেলিতেছেন।

ভাড়াটে আর বাড়ীওয়ালায়, উপরতলা ও নীচের তলায়, জায়ে জায়ে আর ননদ-ভাজে, সামান্য 'জল জল' করিয়া সৌহার্দ্য-বন্ধন ভাঙিয়া যাইবার জোগাড়। কে কতক্ষণ স্নানের ঘরে থাকিল, কে কতটা চৌবাচ্চার জল অন্যায় অপচয় করিল, তাহার হিসাব শুনিতে শুনিতে অস্থির কাক-চিল অবধি পাড়া ছাড়িয়া সুন্দরবনে গিয়াছে।

মাত্র কয় দিনের জলকষ্টে বাড়ীর মেয়েরাই রাস্তার "টিপুকল"-বিলাসিনীদের জাবা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। এই তো আজ সকালেই ছোট কাকীমার সঙ্গে সেজ জ্যাঠা মশাইয়ের তুমুল কলহ হইয়া গেল।

অবশ্য পরোক্ষে, কিন্তু প্রত্যক্ষের চাইতে কম সারালো এবং কম জোরালো নয়। জ্যেঠা মশাইয়ের মতে জল যখন ভগবানের চাইতেও দুষ্প্রাপ্য, তখন যখন-তখন চৌবাচ্চা ছাড়ার দরকার নাই। কিন্তু শুচিব্যাধিগ্রস্তা কাকীমার পক্ষে সে আদেশ মৃত্যুতুল্য।

"ভোড়া বাসি জলে নৈনেত্য" করা আর তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া একই কথা। কাজেই ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে লড়ালড়ি চলিবে এ আর বিচিত্র কি?

আমি দার্শনিক।

এ-সব তুচ্ছ কথায় কাণ দেওয়াকে নেহাৎ ছেলেমানুষী মনে হয়, সংসারের আর সকলকে নিতান্ত শিশু ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারি না। এদের সকলের চাইতে যে বেশ কিছু উর্দ্ধলোকে আমার বাসা সে কথা অস্বীকার করিয়া অনর্থক বিনয় প্রকাশে লাভ কি?

কাজেই যে কলহের কলকলানিতে বিরক্তচিত্ত দাদা অনাহারে অফিস চলিয়া গেলেন তাঁ'র তিক্ততা আমাকে স্পর্শও করিল না। "এই তো মানুষ এই তো সংসার" গোছের একটা "বড়ুয়া মার্কা" হাসি হাসিয়া পূবের জানালার সামনে ইজিচেয়ার টানিয়া দর্শনশাস্ত্র খুলিয়া বসিলাম।

বাড়ীতে লোক-সংখ্যা এত বেশী যে গোলমালের সময় আমার উপস্থিতি অনুপস্থিতি বা নীরবতা সরবতা কাহারও মনে রেখাপাত করে না। আমি যে 'কিছু নয়' এইটাই সাধারণতঃ সকলের মনোভাব।

বই লইয়া বসিয়াছি পাতা খুলি নাই, চোখের উপর হাতচাপা দিয়া পড়িয়া ভাবিতেছি...কি ভাবিতেছি কে জানে...বোধ হয় ভাবিতেছি...ইজিচেয়ার না থাকিলে দার্শনিকদের কী গতি হইত!

হঠাৎ একটি তীব্র স্বর কাণে আসিল..."আপনারা কি ভাবেন বাড়ীওলা হলেই যা খুশী করা যায়?"...দূরাগত বংশীধ্বনি নয় আমারই কাণের কাছে বজ্রধ্বনি।

চোখের ঢাকা খুলিয়া দেখি একটি মেয়ে।

অবশ্য মেয়ে ছাড়া—বাড়ী বহিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিতে আসার সৎসাহস আর কার থাকা সম্ভব? ছেলে তো নয়ই, ছেলের বাপেরই কি আছে?

আমার দার্শনিক মনোবৃত্তিতে অনেক কিছুই 'ইহাই নিয়ম' বলিয়া মানাইয়া লইলেও হঠাৎ যেন এটা একটা নিয়মছাড়া বা খাপছাড়া ব্যাপার মনে হইল। মেয়েটির চেহারা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—শুধু লক্ষ্য করিলাম...তার বিরাট খোলা চুলের রাশি।

স্নানের পরের স্নিগ্ধ আর্দ্র কেশদাম নয়—স্নানের আগের রুক্ষ ধূসর চুলের পাহাড়। মেঘের মত চুল বোধ করি একেই বলা চলে।...কিন্তু এত কথা ভাবিতে এক মুহূর্ত্তের বেশী সময় পাই নাই। পরক্ষণেই আরো একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন..."আপনারা কি চান আমরা উঠে যাই?"

এতক্ষণে বুঝিলাম তিনতলার ভাড়াটেদের মেয়ে।

কত দিন ভাড়া আসিয়াছে, কোন দিন নীচের তলায় নামে কি না, ভাড়াটে ভদ্রলোকের মেয়ে কি নাম্নী ভাইঝি কি ভাগ্নী, কিছুই জানি না, তবে এইটুকু বুঝিলাম পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই।

কার্য্য-কারণ

আশাপূর্ণা দেবী

দেখিলে মনে না রাখা হয়তো সম্ভব হইত না।

মেঘবরণ চুলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা কুঁচবরণ কন্যা, 'বার বার তিন বার' নীতির অনুসরণে হতাশ ভঙ্গিতে কহিল—"আপনি কি বোবা?"

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া ইঞ্জিচেয়ারের অলস ভঙ্গি ত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। বলিলাম—"বোবা ছিলাম না—"

"আমার ব্যাভারে বাক্য হরে গেছে—কেমন?"

"অসম্ভব নয়।"

"হুঁ। কিন্তু সকাল থেকে এক ফোঁটা জল না পেলে কী অবস্থা হয় জানেন?"

এইখানে বলা আবশ্যক দোতলা একতলার করুণা ভিন্ন তিনতলার ভাড়াটেদের জল পাওয়ার দ্বিতীয় পথ নাই।

গম্ভীর ভাবে একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া কহিলাম—"বসুন।"

"বসে গল্প করতে আসিনি আমি।"

"সে তো পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু গুছিয়ে ঝগড়া করতে হলেও তো কিছুক্ষণ সময়ের দরকার? অনর্থক দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবার—"

"আপনার ধারণা আমি কোমর বেঁধে কোঁদল করতে এসেছি?"

"তবে?"

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুধু এইটুকু বলিতে পারি।

"না ঝগড়া করা আমার পেশা নয়—শুধু জানতে এসেছি—স্নান করতে পাওয়া যাবে—না এই অবস্থায় কলেজ যেতে হবে? তিনদিন স্নান করতে পাইনি—" বলিয়া সেই কবিরা 'যাকে রুক্ষ আলুলায়িত কেশ' বলেন তাহারই একগোছা তুলিয়া ধরিয়া স্নানাভাবের নমুনা দেখাইল।

গুছাইয়া ভালো ভালো কথা কওয়ার অভ্যাস আমার নাই...বরাবরই কাটখোট্টা তবু উত্তরে যে কথাটি বলিলাম—নিজের কাণেই মন্দ লাগিল না।

ও-পক্ষ আবার তীক্ষ্ণ ও তীব্র হইয়া উঠিলেন।

"আমাকে কিসে ভালো দেখায় সে পরামর্শ নিতে আসিনি আপনার কাছে—জলের বিহিত কিছু করবেন কি উঠে যেতে বাধ্য করবেন আমাদের?"

"আমি কোন কিছু করবারই মালিক নই, আপনি ভুল লোকের কাছে এসেছেন। বাড়ীর ভেতর যান, দেখুন যদি কিছু করে উঠতে পারেন। তবে বাড়ীতেই তো এই নিয়ে মারামারি—" বলিতে গিয়া থামিলাম, কারণ পরচর্চ্চা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

মাথানাড়ার সঙ্গে মেঘের উপর 'ঢেউ খেলিয়া' গেল।

"পঞ্চাশ জনের কাছে এত্তালা দিয়ে আর্জ্জি পেশ করা আমার কর্ম্ম নয়, এই আজকেও এই অবস্থায় রইলাম, কাল যদি রীতিমত ব্যবস্থা না দেখি—"

কথার শেষটা বোধ করি ভাবা ছিল না—তাই থামিতে দেখিয়া আমি অসমাপ্ত কথাটার পূরণ করিয়া দিলাম—"লাঠালাঠি করবেন—কেমন?"

"দরকার হলে তা'ও করতে বাধ্য হবো—" বলিয়া চুলের ঢাল এবং ছাপা শাড়ীর আঁচল ঝলকাইয়া সবেগে প্রস্থান।

ঘটনাটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

আমার দ্বারা বিহিত করা সম্ভব নয়—এবং চেষ্টা করিবার চেষ্টা মাত্র করিব না তাও জানি, তবু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—দর্শনশাস্ত্রে মন বসিল না।...কিন্তু এত দেশ থাকিতে আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আসার হেতু কি? উপযুক্ত লোকের তো অভাব নাই বাড়ীতে? বড় বৌদির—বা ছোট কাকীমার সঙ্গে লাগিয়া গেলেই তো—

শেষ পর্য্যন্ত যে তথ্য আবিষ্কার করিলাম বা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম—এখন বলিতে চাহি না।

পরদিন।

পূবের জানালার সামনে ইজিচেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, হাতে বই আছে, কিন্তু বইতে চোখ নাই… ভাবিতেছি লাঠালাঠির আবশ্যক হইয়াছে কি না। এমনও হইতে পারে…আরও এক দিনের স্নানাভাবে চুল এবং মেজাজ দুই-ই আরও বেশী রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে… কাজেই কলহ-প্রবৃত্তি আরও প্রবল হওয়া অসম্ভব নয়।

আমি নির্ব্বিরোধী মানুষ, যেখানে এক কথার উপর দুই কথা হয় সেখানে এক সেকেণ্ডের উপর দুই সেকেণ্ড দাঁড়াই না…আমার হঠাৎ লাঠালাঠির ভয় ঘুচিয়া গেল কেন? বরং কোন ধরণের কথায় কি ধরণের উত্তর দিয়া ব্যাপারটা ঘোরালো করা যায় তাই চিন্তা করিতেছি!

নটা…দশটা…সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল, কলের জল নিশ্চয় ছুটি লইয়াছে অতএব আজ আর আশা নাই। দর্শন-শাস্ত্রে মন বসিল না…ভাবিলাম ফুটপাথে পায়চারী করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।

দশটা পঁয়তাল্লিশ…'এলোচুল' ওদিকের সিঁড়ি দিয়া সটান নামিয়া আসিলেন। প্রায় পথ হইতেই তিনতলার আলাদা সিঁড়ি। আজ অবশ্য "এলোচুল' এলো নয়, প্রকাণ্ড একটি মসৃণ কবরী।

কেন জানি না—বোধ করি হাড় জ্বালাইতেই বলিয়া উঠিলাম—"এই যে—স্নান করতে পেয়েছেন দেখছি?"

হাতের খাতা দুইখানি বাগাইয়া ধরিয়া পেন্সিলের তলায় একটি তীক্ষ্ণ দংশনের সঙ্গে জলন্ত প্রশ্ন—"লজ্জা করে না?"

"কই করছে না তো—আর কেনই বা করবে?"

"গঙ্গা-স্নান করে এসেছি আজ জানেন?"

"জানতাম না, জেনে সুখী হ'লাম। মেজাজ, মাথা এবং হিন্দুয়ানী সব দিক বজায় থাকলো।"

ক্রুদ্ধ কটাক্ষের সঙ্গে গট্ গট্ করিয়া প্রস্থান।

কয়েক দিন কাটিয়াছে।

কলের জল বা জলের কল আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। চৌবাচ্চায় জলের অভাব নাই। জায়ে-জায়ে ননদ-ভাজে শাশুড়ী-বৌয়ে ব্যবহারের সমতা ফিরিয়াছে, কাকেরা সুন্দর বন হইতে ফিরিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, কাজেই আশা করা যায় সেই কেশের রাশি বাসি থাকিতেছে না। কিন্তু? আরো দু'-চার দিন কর্পোরেশনের অক্ষমতা প্রমাণ হইলে ক্ষতি কি ছিল?

নূতন আর কি সুযোগ মিলিতে পারে?

পূবের জানলার সামনে বসিয়া বসিয়া হায়রাণ হইয়া পড়িয়াছি।

এক আছে ফুটপাথ। কিন্তু ঠিক দশটা পঁয়তাল্লিশে বৃষ্টি আসিলে?

গত তিন দিন একই সময় বৃষ্টি আসিতেছে।

দার্শনিকের শেষ আশ্রয় ইজিচেয়ারে পড়িয়া থাকা ভিন্ন সারা সকালটা কি করিতে পারি? বেলা একটার আগে ক্লাশ নাই যে।

আজ বৃষ্টি নাই, রোদও নাই, বাতাস আছে প্রচুর এবং আলোরও অপ্রাচুর্য্য নাই, এ রকম একটি দিন দৈব ঘটনার মত। এমন সুন্দর সকালটা ঠিক কি করা উচিত নির্ণয় করিতে পারিতেছি না—অথচ মনের মধ্যে কি যেন একটা অব্যক্ত বাসনা গুণ-গুণ করিয়া ফিরিতেছে…এমনি চমৎকার একটি মাহেন্দ্রক্ষণে হঠাৎ মা আসিয়া আমার দুর্ভেদ্য দুর্গে হানা দিলেন।…বোধ করি কথাগুলি ভাঁজিয়া আসিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিরস্কারের সুর…"হ্যাঁ রে, তোর তো সারা সকাল সময় থাকে এক দিন বাজারটা করে দিতে পারিস না?"

এ রকম আকস্মিক আক্রমণের জন্য অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম না—কিন্তু দীর্ঘ দিনের সাধনায় অপ্রস্তুত হওয়াটা ছাড়িয়াছি। অভ্যস্ত অবহেলার ভঙ্গিতেই উত্তর দিই… "না পারবার কি আছে? বাজার করাটা কী এমন শক্ত কাজ?"

"তবে করিস না যে?"

"দরকার মনে করি না—ও রকম বাজে কাজ করবার লোকের অভাব নেই বাড়ীতে।"

মা বিস্ময় প্রকাশের চরম নিদর্শনস্বরূপ গালে হাত দিয়া কহিলেন—"বাজার করাটা বাজে কাজ হ'ল? তা'হলে আসল কাজটা কী; তোর এই ইজিচেয়ারে পড়ে থাকা?"

মাকে অনেক দিন রাগানো হয় নাই…হঠাৎ উঠিয়া পড়িলাম, মার দুই কাঁধ ধরিয়া ইজিচেয়ারে বসাইয়া দিয়া বলিলাম—"চুপ করে বসে বসে আত্মচিন্তা করো দিকিন, দেখবে এর চেয়ে দরকারি কাজ আর নেই।"

বলা বাহুল্য, মা এক মিনিটও বসিলেন না, ছেলেমানুষের মত তিড়বিড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সক্ষোভে কহিলেন—"পোড়া কপাল! আমি নইলে আর আত্মচিন্তা করবে কে? বলে—'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল,' কিন্তু তুই বাবা ধন্যি ছেলে! এই বাড়ীশুদ্ধ লোকে সকাল বেলা কাজের জ্বালায় চোখে-কাণে দেখতে পাচ্ছে না আর তুই অম্লান বদনে বসে আছিস?"

গম্ভীর ভাবে কহিলাম—"ছেলেদের ম্লান মুখ দেখলেই মায়েদের বুক ফাটে জানি, আমার ভাগ্যে সবই উল্টো! যাক্। কিন্তু—বাড়ীশুদ্ধ লোকই যখন চোখে-কাণে দেখতে পাচ্ছে না—তখন এক জনেরও চোখ-কাণ খোলা থাকা দরকার নয় কি?"

"তোমার সঙ্গে কে কথায় পারবে বাছা? আচ্ছা যাই বলিস, এই যে সংসারে কুটোটুকু ভেঙে উপকার করিস না তোর লজ্জা করে না?"

নৈতি-সূচক মাথা নাড়িলাম।

"আশ্চয্যি! বড় বৌমা বলে মিথ্যে নয়—বিদ্যে-বুদ্ধি হলে কি হবে আক্কেল চরিত্ত কিছু হ'ল না।"

হাসিয়া বলিলাম—"তাই বল, বড় বৌমার জবানী এ সব? নইলে মা হঠাৎ এলেন—আমার ভেতর আক্কেল খুঁজতে—"

—"কেন তুই কি চিরদিন খোকা থাকবি? এই যে তোর দাদার এক ঘণ্টা আগে আপিস হয়েছে—তোর জ্যাঠা মশাইয়ের বাত চেগেছে, ছোট কাকার দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, গোপলার জ্বর, কে করে বাজার?"

"অগত্যা আমাকেই করতে হয়। তোমাদের সংসার-রঙ্গমঞ্চের যে এ রকম বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হচ্ছে তা তো জানতাম না।"

"তোর সব কথাতেই রঙ্গ! যাবি তো বড় বৌমার কাছে শুনে যা ভালো করে, কি কি আসবে—"

"ও-সব শোনাশুনির মধ্যে আমি নেই—বাজারে যা ভালো ভালো দেখবো—সব নিয়ে আসবো"—বলিয়া বাজারের থলি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম।

"কোথায় আছে" "কোথায় গেল" শব্দ আমার দু'চক্ষের বিষ, বাড়ীর মধ্যে যা আছে তা আছেই।

"ওই জন্যেই তো তোকে বলি না কিছু, 'যা হয় তা হয়' আনলে বড় বৌমা রেগে সংসার মাথায় করবে।"

"সংসারটা তো তিনি মাথায় করেই রেখেছেন—এ আর নতুন কথা কি!"

বলিয়া চটি জোড়াটা পায়ে গলাইতে গলাইতে পথে বাহির হইলাম।

বলা বাহুল্য, এটি বড় বৌদির নিজস্ব মত।...যাক্। কি করি—বা কিছু একটা করি গোছ মনোভাবই তো ছিল...না হয় এই সুন্দর সকালটাকে হত্যা করার ভারই নিলাম। বাছিয়া বাছিয়া দরদস্তুর করিয়া...ওজন দেখিয়া শাক মাছ কেনা কি সময়কে হত্যা করা নয়?

বাজার করা—মানে আহার্য্য বস্তুর সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ানো—আমার ধাতে সয় না।

"তেলের অভাবে রান্না চড়িতেছে না"—"অথবা কয়লার অভাবে উনানে আগুন পড়িতেছে না" এ হেন মর্ম্মান্তিক ব্যাপার লইয়া আমার কাণের কাছে ঢাক পিটাইলেও ইজিচেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার কল্পনাও করি না।

জানি এক বেলা অন্নাভাবে মানুষ মরে না—তাছাড়া নিশ্চিত জানি আমি না করিলেও কাজটা ঠিকই হইয়া যাইবে—আরো ভালো ভাবেই হইবে—তবে কেন আর 'ঝুটমুট' নিজের শক্তির অপচয় করি?

বৌদি অবশ্য বলেন—"পাতের গোড়ায় বাড়া ভাত পাইলে সকলেই অমন 'সিদ্ধ পুরুষ' বনিয়া থাকিতে পারে।" কিন্তু বৌদি কা'কে কি না বলেন?

কিন্তু পথে নামিয়াই যে প্রিণ্টেড শাড়ী ও "পেল্লায় খোঁপা"র দর্শন পাইব এ কথা কি দর্শন-শাস্ত্রে লেখা ছিল?...বাজারের থলি হাতে পথে দাঁড়াইয়া গল্প করিবার মত অভদ্র ইচ্ছা আমার না থাকিলেও প্রিণ্টেড শাড়ী নাছোড়বান্দা।

"বাজার যাচ্ছেন বুঝি?"

ফিরিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন উপায় কি? গম্ভীর ভাবে প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—"দেখে কি মনে হচ্ছে নেমন্তন্ন যাচ্ছি?"

"দেখে তো মনে হচ্ছে ফ্রণ্টে যাচ্ছেন, মনিষ্যিকে মনিষ্যি বলে গ্রাহ্যই নেই।"

"মনুষ্য কি না সেটা বিবেচনা করা দরকার?"

"তার মানে? বলতে চান কি? নিজেকে ছাড়া সকলকেই অমানুষ মনে করেন বুঝি?"

"ঠিক তাই বা বলি কি করে—তবে—"

থাক হয়েছে—দয়া করে মানুষ মনে না করলেও কিছু এসে যাবে না। সরুন, কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে আমার। যান প্রাণভরে কুমড়ো কাঁচকলা কিনুন গে।"

একবার ভাবিলাম বলি—ভদ্রে! কলেজের অহঙ্কারে মটমট করিবার হেতু কি? কলেজে তো আমিও নিত্যই যাই—তবে পড়িতে নয় পড়াইতে। কিন্তু ছিঃ, আমি যা তা'তো আছিই, অপরে আমাকে বাজারের থলিবাহক মাত্র ভাবিলে ক্ষতি কি?

"ইস্, গট্ গট্ করে চলেই যাচ্ছেন! আসল কথাটা বলা হ'ল না—আমরা উঠে যাচ্ছি বুঝলেন? টালিগঞ্জে বাড়ী দেখা হয়েছে আমাদের।"

—"এই-ই আপনার আসল কথা? কিন্তু এতে বেশী বিচলিত হবার কি আছে? বাড়ী তো আজকাল পড়তে পায় না, খালি হতে যা দেরী।"

—"উঃ, অহঙ্কারে একেবারে—"

মুখ ঘুরাইয়া সবেগে প্রস্থান।

অহঙ্কারের কথা অস্বীকার করি না। তবে মনে হইল, আর একটু পরে চটাইলে মন্দ হইত না।

ইতিমধ্যে সংসারে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে ছোট কাকীমার সানুনাসিক আক্ষেপ, অথবা বড় বৌদির তর্জ্জন-গর্জ্জন কাণে আসে। সেজ জ্যাঠা মশাই মাঝে মাঝে আমার এলাকায় আসিয়া সংসার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ করিতে থাকেন, আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন—এবং অবশেষে হতাশ চিত্তে—"আমাকে বলা ও দেয়ালকে বলায় যে কোনো প্রভেদ নাই" এই খবরটি জানাইয়া চলিয়া যান।

মোটের মাথায় সংসার-চক্র একই পথে চলিতেছে, ভিতরে ভিতরে কোনো চক্রান্ত হওয়া সম্ভব এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

খাইতে বসিয়াছি—দাদা আর আমি।

মা পাখা হাতে বাতাসের ছুতায় কাছে বসিয়া এটা-সেটা কথার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"তিনতলার গিন্নির সখ দেখেছিস ?"

দেখি নাই অবশ্য, দাদাও না, আমিও না। কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ দার্শনিকের ধর্ম্ম নয়, তাই নীরবে আহার করিয়া যাই। শুনিলাম দাদা বলিতেছেন—"কেন কি হ'ল হঠাৎ ? ছিটের শাড়ী না পাউডার ?"

"দূর ক্যাপা ছেলে, সে সখ নয়। সখ হচ্ছে—ওঁর ওই ধিঙ্গি নাতনীটিকে আমার বৌ করতে হবে।"

দাদা চকিত হইয়া বলিলেন—"কেন তোমার বৌকে কি—"

—"হয়েছে। কি শুনতে কি শুনিস ? বিয়ের যুগ্যি ছেলে আমার আর নেই না কি ? খোকার বৌ করতে চান।"

"ও, খোকা!" দাদা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন—"সন্নিসি ঠাকুরকে জামাই করার সখ হল হঠাৎ ?"

"সখ আবার হবে না কেন—ছেলে কি আমার ফেলনা ? কিন্তু আমি বাপু ও-মেয়েকে বৌ করছি না। যেমনি বাচাল, তেমনি ধিঙ্গি, তেমনি দজ্জাল !"

মাছের মুড়োটাকে অনেক কসরতে কায়দা করিয়া দাদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বেশ খানিকক্ষণ পরে বলেন—"কিন্তু মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়, বেশ ফর্সা আছে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ ফর্সা খুব—তবে ওই যা বললাম।"

বেশ যেন অনমনীয় মনোভাব।

আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করিল না, আমিও কাহাকেও কিছু প্রশ্ন করিলাম না। কিন্তু মা যে আমার বুদ্ধির উপরও টেক্কা মারিলেন—তা' কে জানিত ?

জানিলাম পরে।

কলেজের জন্য প্রস্তুত হইতেছি—হঠাৎ আসিয়া বিনা গৌরচন্দ্রিকায় বলিলেন—"দেখ খোকা, ওরা কিছুতেই ছাড়ছে না—আমি বাপু মত দিয়েছি।"

বলিলাম—"রোসো মা, যুদ্ধের আবহাওয়ায় তুমিও মিলিটারি হয়ে উঠো না। প্রথমতঃ কথা হচ্ছে—'ওরা' কারা ? দ্বিতীয় কথা—কি ছাড়ছে না ? তৃতীয়—কিসের মত ? তার পরে বাকীটা বোঝা যাবে।"

"আহা খোকা তো খোকা, মরে যাই"—পিছনে বড় বৌদিদি ছিলেন জানিতাম না। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন—"বোকো না কিছু জাকা ! 'ওরা' হচ্ছে তিনতলার ভাড়াটেরা, 'ছাড়ছে' না' তোমায় জামাই করবার ইচ্ছে—আর মা মত দিয়েছেন বিয়ের, হ'ল ? বাকীটা বুঝছো ?"

"না। কারণ ইচ্ছেটা ওঁদের একচেটে সম্পত্তি নয়। অপর পক্ষেরও ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকতে পারে।"

"তা তোর তো বাপু অনিচ্ছে নেই ?" মা মনোভাব ব্যক্ত করেন।

"কি করে বুঝলে ?"

"এই তো সে দিন বললাম তোদের দুই ভাইয়ের সামনে—কই কিছু আপত্তি করলি না তো ?"

"আমার মতামত চেয়েছিলে ?"

"তা চাইনি বটে—"

"তবে ? খামোকা ওপর-পড়া হয়ে আপত্তি করতে যাবার মানে হয় না কিছু ? করবো কেন ?"

—"মা ভেবেছিলেন মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।"

বললাম—"থাক্ বৌদি, তোমার বাংলাতেই রক্ষে নেই, দেবভাষাটা নিয়ে এখন টানাটানি নাই করলে ? কিন্তু মা, আমার যেন মনে হচ্ছে—আপত্তিটা তোমার দিক থেকে বেশ জোরালো ছিল ?"

—"তা সে যখন ছিল, ছিল। এখন ওরা ধরাধরি করছে—তা ছাড়া মেয়ে দেখতে খাসা। একটু বেহায়া—তা আর—"

"আর একটু বাচাল।" আমি যোগ করি।

"আজকালকার মেয়েরা সবই ওই—কি করবো ?"

"তা ছাড়া—সাংঘাতিক দজ্জাল।"

"ও সব শ্বশুর-ঘর করতে এলে ভালো হয়ে যাবে।"

"যেমন হয়েছে"—বলিয়া বড় বৌদির প্রতি একটি নিরীহ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলাম।

বৌদির রাগ করিয়া প্রস্থান।

মা বলিলেন—"তা'হলে ওই কথা থাকলো—ওদের বলছি তোর মত আছে।"

বলিলাম—"ক্ষেপেছ তুমি ? বিয়ে করবো কি বল ? সরো তো লক্ষী মেয়ে, আমার কলেজের বেলা হয়ে গেল।" বলিয়া স্তম্ভিত, ইতিকর্ত্তব্যজ্ঞানরহিত মাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

'বিবাহ' এবং 'আমি' দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষকে কোন দিন একত্রে ভাবিতেই চেষ্টা করি নাই; কাজেই মার কথাটা ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া কিছু মাথায় আসিল না।

অথচ ক্রমশঃই ভাবিয়া দেখিতেছি, মেয়েটাকে জব্দ করা দরকার। রীতিমত দরকার। তিনতলার ছাদ

হইতে পথচারী ভদ্রলোকের মাথায় প্রাণের জল ঢালিয়া দেওয়ার মত ব্যাপার শুনিয়াছেন কখনো ?

পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবীর অদৃষ্টে প্রায়শঃই এরূপ ঘটিতে থাকিলে দার্শনিক মহাপুরুষেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া অসম্ভব নয়। কেবল মাত্র "বড়ুয়া মার্কা" হাসি হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়া যাওয়া আর চলে না।

শুধুই কি জল ?

কাগজের টুকরা নয় ? সাদা কাগজ নয়…লেখা কাগজই…ওঃ ভারী যে অহঙ্কার! কিছুতেই দৃক্‌পাত নেই ?…

মাকে আসিয়া বলিলাম—"মা, সত্যিই যদি গ্যারাণ্টি দিতে পারো দজ্জাল মেয়ে সায়েস্তা করতে পারবে, তবে আমার—"

মা মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"তোর আপত্তির ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলাম কি না! অর্দ্ধেক বাজার হয়ে গেছে বিয়ের।"

আরো কয়েক দিন পরে। দিন নয় রাত্রে।

দরজা-জানলার ছিটকিনিগুলা ভালো ভাবে আটকাইয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। বিছানার অপরাংশ জুড়িয়া সেই ফাজিল-কেষ্ট মেয়েটা। বলিলাম—"তোমায় কেন বিয়ে করেছি জানো ? জব্দ করতে।"

ঘোমটার ভিতর হইতে তীব্র প্রতিবাদ…"বিয়ে তুমি আমায় করোনি…আমিই তোমায় করেছি। কেন করেছি জানো ?…বাজী জিততে।"

"বাজী ?"

"হ্যাঁ! তোমার ভাইজি ইলু বেট্ ফেলেছিল 'কাকা কক্‌খনো বিয়ে করবে না। কাকার পছন্দসই মেয়েই নেই পৃথিবীতে'—আমিও বেট্ ফেললাম—ইচ্ছে করলে আমিই বিয়ে করতে পারি—অনায়াসে। দেখলে তো পারলাম কি না ?"

"সে তো—আমি নেহাৎ' 'জীবে দয়া' হিসেবে করলাম তাই। দেখলাম আমাকে বিয়ে করবার জন্তে হেদিয়ে মরছিলে।"

"তার মানে ?"

"মানে স্পষ্ট। নইলে এত দেশ থাকতে—বা দেশে এত লোক থাকতে কলের জল নিয়ে কোঁদল করতে আমার লোক পেলে না আর ?"

ছায়া

শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক

আমাদের চলমান জীবনের পিছে পিছে
নিঃশব্দ চরণ ফেলে চুপিসারে একান্ত গোপনে
চ'লে আসে কোনো এক কায়াহীন ছায়া,
কোনো এক মায়াবীর দেহহীন মায়া।
তুমি কি ভুলেও কভু কোনো দিন
নির্জন একাকী পথে
আবছায়া গ্যাসের আলোর আশেপাশে
হঠাৎ পাওনি তার অদৃশ্য হস্তের
অদ্ভুত আশ্চর্য্য স্পর্শখানি ?
কভু কোনো সূর্য্য-ডোবা
রাঙা-রাঙা আকাশের বহু দূর সিন্ধু-ছোঁয়া তীরে
দেখনি তাহার ছবি আঁকা হয়
আকাশ বাতাস মাটী জলে ?
কভু কোনো রাত-জাগা হাওয়ার অলকে
পাও নাই অধীর ইসারা তার
তারার আলোয় ?
পাও নাই অবাক্ অচিন্ত্য এক প্রাণ
নিজেরি মাথার কাছে
তাহার কেশের ?
কভু কোনো দিক্-ভোলা রাতের পথের পারে
হঠাৎ সাঁকোর 'পরে এসে
দাঁড়ায়ে থমকি
নীচেকার কালো জলে
পাও নাই ঝিল্‌মিল্ কোনো এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত ?
শোনো নাই কোনো এক চকিত অস্ফুট বাণী
হৃদয়ের গভীর গহনে ?
জীবন জটিল হোক যতো পারে,
জটলার নিস্পৃহ কাহিনী
বুনে যাক চারি পাশে তার
যতো পারে কুজ্ঝটিকা-জাল,
মড়কের মাছি এসে
উজ্জ্বল প্রহরগুলি ক'রে যাক যতোই স্থবির,
স্থির জেনো সেই ছায়া সেই মায়াখানি
বেঁচে থাকে তেমনি অটুট,
তেমনি রঙীন চোখে স্বপ্ন দেখে নীল পাহাড়ের,
তেমনি নিঃশব্দ লঘু অদৃশ্য চরণ ফেলে
নেমে আসে সময় সুযোগ পেলে
এই দগ্ধ যন্ত্র-চূর্ণ জীবনেরি প্রান্তর গোড়ায় ;—
বিজলীর রেখার মতোন
অকস্মাৎ জ্বলিয়া জাগিয়া উঠে
মিশে যায় দূরের হাওয়ায়!

আধুনিক সাহিত্যের রক্ততিলক

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ইউরোপীয় সাহিত্যের উত্থান, উর্দ্ধিতগতি ও পতনের সহিত সমগ্র জগতের সাহিত্যের ওঠানাবার ইতিহাস ইদানীং নির্ভর করছে, কারণ সমগ্র বিশ্বে এ সাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। প্রাচ্যের কোন সাহিত্যই আজ একান্ত ভাবে এ সৃষ্টি হতে অসংলগ্ন ও একাকিত্বের অন্ধকূপে আত্মহারা হয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হচ্ছে না। অপর দিকে

টি, এস্ ইলিয়ট

ইউরোপীয় সাহিত্য ও কলা প্রাচ্য রসরাগের বৈচিত্র্যকেও নিজেদের অলঙ্করণে ব্যবহৃত করতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। কাজেই ইউরোপীয় সাহিত্যেও আমরা পাই এসিয়ার রূপচক্রের প্রতিবিম্ব। এ জন্য অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে একটা রসগত বন্ধন ধীরে ধীরে জমাট হয়ে আসছে।

প্রাথমিক মহাযুদ্ধের সমসাময়িক সাহিত্য ছিল অলস, অবসর ও আরামের আয়োজনে ভরপুর। সাহিত্যের এ যুগের যুবকরেরা তখন নিশ্চিন্ত মনে ধনতান্ত্রিক স্বাচ্ছন্দ্যে মামুলি কথা বলে যশস্বী হতে উৎসাহিত হ'ত। এ রকমের রচনা ক্রমশঃ মহাযুদ্ধের অবসানে একেবারে মূল্যহীন হয়ে যায়। নিম্নস্তরকে নিষ্পেষণ করে যে সভ্যতার রক্ত পুষ্ট হয়েছে, আন্তর্জাতিক আধিপত্যের সাহায্যে দুর্ব্বল জাতির ধনধান্য লুণ্ঠন করে যাদের বিলাসিতা পরু হয়েছে, তাদের মনোভঙ্গী যে অত্যন্ত ইতর এবং তাদের অধ্যাত্মপ্রসঙ্গও যে এক রকম প্রতারণা, এ কথা ধরা পড়তে দেরী হয়নি। Swinburne, Hardy'র জগৎ এ যুগে হয়ে যায় নিষ্প্রভ, অপ্রচুর ও রিক্ত। নূতন জগতের আবহাওয়ায় এ সব কবির সেকেলে ভঙ্গী খাপছাড়া হয়ে যায়। ফলে ওরা হয়ে পড়ে একঘরে ও বর্জ্জিত। নূতন যুগের উপযোগী কোন ভাবের উপাদান খুঁজে না পেয়ে এঁরা নিজেদের

সেসিল ডে-লুইস্

রসচক্রেই আবদ্ধ হয়ে যায়। কোন আলোচক এ প্রসঙ্গে বলেন: "From now on renunciation, rejection and escape are the commonest attitude of the poets." কর্ম্মহীনতা, রহস্যবাদিতা ও উদ্ভট সৌন্দর্য্যবাদের সীমান্তে এসে এ রকমের কবিরা ধীরে ধীরে অস্তাচলে ঢোকে।

বস্তুতঃ আধুনিক সাহিত্য এল একটা নূতন জাগরণে ও অভিনব অনুভূতির উর্দ্ধশির তরঙ্গে—তা সহজে জন্মায়নি। রক্তাক্ত আবহাওয়া, কর্দ্দমাক্ত জীবন ও সর্ব্বহারার জপমন্ত্র ইউরোপকে টুটি ধরে নিয়ে যায় সামান্তন্ত্রের গণ্ডীতে—বিলাস-ব্যসনের পর্য্যঙ্ক হ'তে। এ রকমের বাস্তবতা সুইনবার্ণ, হার্ডি বা টেনিসন কল্পনাও করেনি। সাম্রাজ্যবাদী কিপলিং ভাবের দাবাখেলায় এ অনুভূতির জটিল পাকচক্রকে নিজের কাব্যে ফলিত করতে সক্ষম হয়নি। শতাব্দীর সঞ্চিত অনৃত ও অত্যাচার বিসুভিয়সের অগ্নিরঙ্কার মত ভূগর্ভ হ'তে মাথা তুলে মৃত্যুর আতপত্র রচনা করে' ইউরোপের বিক্ষুব্ধ, দলিত ও সন্ত্রস্ত জনতাকে শিহরিত করেছে—নূতন সাহিত্য এ অবস্থারই মুকুর।

এ সময় পুরাতন আমলের কায়দা-দুরস্ত সব কবিরাই অনেকটা বেকার হয়ে পড়ে। কারণ, এই অঘটন ঘটন হল স্বপ্নবিলাসের ভিতর দিয়ে নয়—ডিনেমাইটের সহায়ে সঞ্চিত সমাজের ভিতরকার একটা নিদারুণ অগ্ন্যুদ্গারে। এতে পুড়ে যায় কল্পনার আসমানি আসবাব—গলিত হয়ে যায় রুদ্ধ চিন্তার কঠিন অষ্টধাতু! কবিবর হার্ডিকে এ সময়কার এক জন শীর্ষস্থানীয় জ্যোতিষ্ক বলতে হয়। তিনি ঢুকে গেলেন প্রাচীনতার অন্ধ বিবরে—সন্ত্রস্ত মূষিকের মত। কোন লেখক বলেছেন:—"Hardy lived entrenched behind his sombre defences enduring the siege perilous." সমস্ত Georsion কাব্য হয়ে গেল এ অবস্থায় বিবর্ণ ও ফ্যাকাসে এবং সহজেই সে সব বর্জ্জিত হল। এ প্রলয়ের ভিতর শুধু ইয়োট্‌স্‌-ই আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত নিজের নবীনতা ও সরসতা রক্ষা করে এসেছে।

প্রলয়ের পয়োধি জল ডুবিয়ে দিল পুরানো সংস্কারকে এক নিমেষে। অবনত, নিম্ন ও উচ্চ স্তরের বৈষম্যও নেশার মত ছুটে গেল মথিত নেশনবাদমত্ত দুন্দুভির মধ্যে। মাটির ভিতর দিকে দিকে পরিখা রচিত হ'ল। সারি সারি মানুষ পিঁপড়ের মত ঢুকল ও-সব রন্ধ্রের ভিতর এবং অবজ্ঞাত অদৃষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে গোলাবর্ষণে মত্ত হয়ে গেল। উভয় দিকে তরুণেরা হল এই মরণোৎসবের অগ্রদূত। কিসের জন্য এই যুদ্ধ, এর ফলই বা কি দাঁড়াবে—এ রকমের কথা হয়ে গেল ক্রমশঃ অস্পষ্ট। চারি দিকেই মৃত্যুর শাণিত খর্পর তুলল কাপালিকের মত মৃত্যুর পতাকা। যুবকেরা হয়ে গেল মায়ার বাঁক—কোন অনুভূতির যুক্তি বা মানবতার বদ্ধ ধোঁয়া এই

বিগলিত রক্তস্রোতকে রুদ্ধ করতে পারলে না। পঞ্চভূতের স্বাভাবিক স্পর্শও হয়ে গেল এদের পক্ষে দুর্মূল্য। কবি Housman মাটি, হাওয়া ও সূর্য্যকে অনুভব করাও একটা পরম সৌভাগ্য বলে এ সময় অনুভব করেছে :—

"I pace the earth and drink the air and feel the sun

Be still, be still my soul"

[A Shropshire Lad]

এ-সব এ সময় তরুণদের চোখেই পড়েনি। তারা দেখেছে—কবি Gibsonএর ভাষায়

"The great red eyes
burn us through and through
They glare upon me all night long
They never sleep"

[The Furnace]

বস্তুতঃ মাটির ভিতরকার এই জীবনযাত্রায় চিরকালের জন্য মানুষের ব্যক্তিত্বও ঘুচে যায়। ইউরোপের গর্ব্বের চরম প্রসূন ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবাদ বা personality। প্রদোষের এই ছায়াম্লান অন্ধকারে সবই হয়ে গেল "depersonalised"। হাসপাতালে কার্ডে লেখা নম্বরে মানুষ পরিচিত হ'তে লাগল— trenchএ এবং অন্যত্র identification disc বা পরিচয়ের নম্বর-লেখা চিহ্ন মানুষের নাম-ধাম ডুবিয়ে সকলকে একাকার করল। সব হ'ল কলের মানুষ, যন্ত্রচালিত পদার্থ—মানবত্বের কোন অধিকার তাতে আর ফলিত হ'ল না। সকলকেই রক্ততিলক পরে' অগ্রসর হ'তে হল একটা পঙ্গপালের মত মরণ-যজ্ঞের আহুতি জোগাতে। এই হয়েছিল জীবনের নূতন আবহাওয়া— মনুষ্যত্বের এক নূতন বেশভূষা। এর ভিতরকার মৃত্যুবরণও অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণার বোধ আয়োজনে সৃষ্টি করল ইউরোপের নব্য সাহিত্য। এ সাহিত্যকে নূতনত্বের জীবন্ত রক্ততিলকেই ভূষিত ও বন্দিত হ'তে হ'ল।

ইসানেশিও স্লোন

এ রকমের আবহাওয়ায় টেনিসনের আয়েস বা অস্কার ওয়াইল্ডের রম্যরতি বা aestheticism কি করে আশা করা যায়? যে লীলা-লালিত্য Lady Windermere's Fanএতে চলতি করা হয়েছে,—কৃত্রিম ও কারু নক্সা-খচিত সে রকমের রচনা এ সবের ধার দিয়েও যায়নি।

বস্তুতঃ কাব্যের আদর্শ এবং রীতিও এ অবস্থায় বদলে যায়। যাদের একটা প্রচণ্ড প্রলয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের বিনিয়ে বিনিয়ে সাধু ও সুপক্ব ভাষায় ভাবপ্রকাশ সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় সে যুগের কৃত্রিম রাগ-রাগিণীর চুলচেরা তালমান বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। তাই এ সময় দেখা দিল "vers libre" অর্থাৎ অসম ছন্দের ও লাইনের কবিতা। একরকমে এক বিস্তৃত ব্যাপক অনুভূতিকণিয় একটা বড় রকমের নক্সা আঁকতে হ'লে সব কিছুই হয়ে পড়বে টুকরো টুকরো. বিচ্ছিন্ন ও খাপছাড়া। আদি, মধ্য ও অন্তের

ডবলু, এচ, অডেন

বিরামগুলির নানা বহরও হয়ে গেল এলোমেলো। নব্য অসম ছন্দের রচনায় ইচ্ছা করেই এ সব প্রয়োগ হয়েছে।

আগেকার আয়েস ও প্রাচুর্য্যের পক্ষে যে তাল স্বাভাবিক ছিল— যুদ্ধোত্তর মানবিকতার পক্ষে তা হয়েছিল অসম্ভব। কবিবর Stephen Spender এক জায়গায় বলেছেন : "I feel as if I could not write again. Words seem to break in my mind like sticks when I put them down on paper—I cannot see how to spell some of them."

সব যখন ভেঙ্গে-চুরে ছারখার হয়, তখন সেকেলে ভাষার বা ভাবের জৌলুও হয়ে পড়ে একটা ঠাট্টার ব্যাপার। যেখানে পা যায় ভেঙ্গে, রাস্তা যায় তলিয়ে, সেখানে যেমন তালে তালে পা ফেলে হাঁটা বা নাচা দুটিই অসম্ভব—কাব্য-জগতে তেমনি ছন্দের লালিত্য হল অসম্ভব। অপর দিকে সব চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হল মনের তালের ভাঙ্গন—আগের দৃষ্টিভঙ্গীই গেল বদলে। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, তখনও কোন উচ্চতর সত্য পাওয়া গেল না। খোঁড়া, কাণা হাবা ও পাগলের সংখ্যা গেল বেড়ে—অথচ কোন মহত্তর পরিণতি এল না। ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র কোন দিক হ'তে দোহাই দিয়ে যুবকদের প্রাণের সুষমাকে আয়ত্ত করতে পারল না। কাব্য-জগতে এরূপ অবস্থার সহিত সঙ্গত করতে পত্তের পৌনঃপুনিক মিলনকে ত্যাজ্য হ'ল নিষ্ঠুর ভাবে।

অপর দিকে কবিতার প্রাচীন উপকরণ অর্থাৎ 'গোলাপ', 'চাঁদনি রাত' প্রভৃতিকে ছেড়ে যান্ত্রিক যুগের নব্য উপকরণে আধুনিক সাহিত্য সজ্জিত হ'তে লাগল। এমন কি, কবিতায় অর্থকে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য

ও অদ্ভুত করার ভিতর দিয়ে এক নূতন রূপবাদ প্রচারিত হ'তে দেখা গেল। এক জন প্রতীচ্য আলোচক বলছেন: "New poetry make abstract pattern with words intended to please by their incongruity in the manner of nonsense rhymes without rhymes or regular verses."

এ অবস্থায় আধুনিক কবিতায় নূতন নূতন উপাদান দেখা দেয়। আংশিক সাম্য যেমন 'stunes'এর 'stones'এর মিল, স্বরবর্ণের আংশিক সঙ্গতি যেমন bloodএর sunএর মিল; ভুল বা গরমিল—যেমন bloodএর সঙ্গে cloudএর, dropএর সঙ্গে upএর অনুপ্রাশ বিরতি যেখানে সেখানে এবং যখন তখন। কমা সেমিকোলন প্রভৃতি বর্জন, Capital অক্ষর ত্যাগ। বেতালের ব্যবস্থা হল তালের জায়গায়। এ সব জড়ো করলে পুরানো কাঠামো বা ছন্দোবদ্ধ কিছু আর থাকে না। ফলে তাই হয়েছে। কবিতার আকার হয়েছে স্বচ্ছ ও উচ্ছৃঙ্খল। বেতালেই আজ মনের কথা সাজান হচ্ছে। এলোমেলো ভাবে বলার কায়দাই হয়েছে উচ্চশ্রেণীর উপঢৌকন।

ষ্টিফেন স্পেন্ডার

যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ঘনতর ঘোরাল ভাবের কুয়াসার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। যৌথ সমাজ, সাম্যবাদ, গণবাদ প্রভৃতি খিচুড়ি পাকিয়েছে এবং সে সবকে চালাতে ইউরোপে Dictator বা সর্ব্ব-নিয়ন্তার আদর্শ পুষ্ট হয়েছে। পূর্ব্বতন মহাযুদ্ধের কোন আদর্শই পাত্তা পায়নি। একটা পরম ব্যর্থতা ছাড়া গোড়াকার মহাযুদ্ধ আর কিছুই দান করেনি। C. Seignobbos বলছেন: "It now recalled nothing to combatants but the perils, disgust or monotony of existence in the midst of the trenches, horrible wounds, deadly gases and long drawnout terror. To the mass of people it stood for anguish, privation and ruin."

[The revival of European civilisation]

চিন্তাক্ষেত্রে দেখতে পাই, ইংলণ্ডে মাথা তুলল অনেক রকমের উপাদান। ব্যর্থতার রুগ্ন বন্দর হতে মাথা তুলেছে টি, এস, ইলিয়টের ক্যাথিসিজম, জেমুইসের সাম্যবাদ ও ম্যাকনিসের সাম্যবাদের বিরোধ। মোট কথা, পাঁচমিশেলী চিন্তার বেপরোয়া জোড়াতালি। কোন উগ্র ও দুরাশী তত্ত্ব ইংলণ্ডে জমাট হয়নি।

ইলিয়টের মতে আধুনিক সভ্যতার সমস্ত উপাদানই হচ্ছে জটিল ও বিচিত্র; কবিতাও সে জন্য দুর্ব্বোধ্য হ'তে বাধ্য, সেটা কবিতার বাহাদুরি। কদর্য্যতা ঘাঁটাও ইলিয়টের পক্ষে অসম্ভব হয়নি:—

"The morning comes to consciousness
of faint stale smells of beer
From the saw dust trampelled street."

এই কবি কি ক'রে পুরানো ছন্দ ভেঙ্গে অসম তান সৃষ্টি করেছে তার নমুনা পাওয়া যাবে "Triumphal march" কবিতাতে। সেখানে এ শ্রেণীর ভঙ্গী আছে—

58,000 rifles and carbines
102,000 machine guns etc.

এ হ'ল কবিতাটির দু'টি লাইন। একে কোন পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। অপর দিকে D. H. Lawrenceএর কবিতায় কোথাও বা পাই অন্য রকমের পরিচিত সুষমা:—

Now I am
One bowl of kisses
Such as the tall
Slim vota resses
Of Egypt filled
For divines excesses [Mysteries]

এ কবি নূতনত্বের পক্ষপাতী—

The old dreams are beautiful
beloved soft tunes and sure
But worn out they hide no more
The wall they stood before

খৃষ্টফার ইসারউড

W. H. Auden এ যুগের প্রিয় কবি। Auden একটা বৃহত্তর মানবিকতার খণ পেয়েছিল যুদ্ধোত্তর জীবনযাত্রার খণ্ডতর হিসাবে। কবি এ অবসরে মনকে না গুটিয়ে খুলে দিয়েছিল চারি দিকে। আধুনিকতার এক অভিব্যক্তির পরিবেশ:—

"When words are one
Remember that in each direction
Love outsi ie ouf own election
Holds us in unseen connection
O trust that even—"

এ যুগ কৃত্রিম ভাব-বিলাসের নক্সা আঁকাকেও অনেক সময় গর্হিত মনে করেছে। বেকার সমস্যার গুরুতর প্রশ্ন বা মরণের দুঃসহ অবস্থা নিয়ে কবিতা লেখাকেও অন্যায় মনে করেছে। কারণ, কাব্যরচনা তামাসা বা খেলা নয়। বেকারদের সম্পর্কে কবি বলছে :—

"No I shall weave no tracery of
pen ornament
To make them bird upon my singing tree"

ডে-লুইস আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলিকে কবিতার উপমা হিসেবে ব্যবহার করে তৃপ্তি পায়। এ রকম ব্যাপার আধুনিক কবিতার অন্তর দিক দর্শনের সহায়তা করে :—

"Let us be off our steam
in deafening the dome
The needle in the gauge
points to a long banked range"

এ কবির কাব্য "Magnetic Mountain" নূতন যুগের রূপক স্থানীয়। রক্ততিলক পরে এ কবি নূতন যুগের প্রেরণায় অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত :—

"And if our blood alone
will meet this iron earth
Take it—It is well spent
easing a saviour's birth"

Stephen Spenderকে "lyricist of the new movement" বলা হয়েছে। এ কবি নূতনত্বের মন্দিরে সকল পুজারীকে আহ্বান করে আশ্বস্ত হয়েছে :—

"Oh young men Oh young comrades
it is too late now to stay in the house
your father's built"

এ সব আধুনিক কবিরাই এমনি করে' সভ্যতার নূতন পৃষ্ঠা রচনা করছে। জর্ম্মণীর অন্তরঙ্গ কবিরা (Expressionist) ব্যর্থতার রিক্ততা হ'তে ভাবের মণিরত্ন আহরণ করেছিল এক সময়, অতি আধুনিকতার এ হয়েছে অন্য দিক? আত্মার স্বচ্ছ পবিত্রতা রক্ষা করতে আধুনিক সভ্যতার রক্ত-পতাকা, গলিত প্রেরণা ও যান্ত্রিক আয়োজন যে পর্য্যাপ্ত নয় তা' শুধু নর্ডিক কবিরা অনুভব করেছে। কবি Rene Schickele বলছেন :—

"What I would have the world to be
I must be first myself
I must become a ray of light
Fleckless hand clean water
And a daked house
Held out to greet and to help"

রুশীয় সাহিত্য গেছে নূতন জীবনের উগ্র উচ্ছ্বাসের চরম সীমায়। কবি Mariennof বলছেন :—

রুশিয়ার আধুনিক সাহিত্যে frustration ব্যর্থতার কারণ খুব নেই, সমাজ ভাঙ্গার উগ্র উৎসাহ নেই এবং বিপ্লবের চিতানলের কঠিন কৃষ্ণলেখাও সেখানেও ছায়াপাত করছে না। প্রাক্-বিপ্লব যুগের অন্ধ নৈরাশ্যের পরিবর্তে সেখানে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড ভাবে জ্যোতিষ্ক মধ্যাহ্নমুখী সৌর-কিরণ। তৃপ্তির পরিপূর্ণ পেয়ালা হাতে করে সেখানে ভোগের আসর রচিত হয়েছে বহুমুখী জনতার। প্রাচীনতার অন্ধ আবেগের সহিত আধুনিকতার সমন্বয় সাধন হয়েছে Dictator-এর ভ্রূভঙ্গে এবং রসিকদের রস-সমন্বয়ে। এক সময় টলষ্টয় বলেছিল বিদ্রূপ করে—"Yes we will do anything for the poor man anything but get off his back." সে যুগ চলে গেছে। এখন রুশিয়ার জয়দৃপ্ত বাণীতে সমগ্র বিশ্ব সচকিত হচ্ছে—

ই, এম, ফরষ্টার

রুশিয়াই সমগ্র জগতের চোখে মধ্যমণি হয়ে আছে। তাই কবি Mariennof বলেছে :—

We we we are everywhere
Before the footlights in the centre of the stage

শুধু রুশিয়াতেই একটা পাওয়ার ও একটা বিরাট বিজয়ের সুর উঠেছে সমগ্র রক্তাক্ত অতীতের কণ্ঠলগ্ন উপবীতের মত। কবি Piotr Oreshinএর আনন্দ ফলিত হয়েছে কবিতায় :—

On the naked knees of the universe
I pour
The blue waters
Of my eternal triumph
Hosannas in the highest

রুশের তরুণরা আর নতশির বা কুব্জ হতে অভ্যস্ত নয়। কবি বলছে :—

"Yes sir the spine
is as straight as a telephone pole
Not in mine spine only but in the
spines of all Russians
For centuries hunched"

চমৎকার উক্তি—এ যেন হারিয়ে পাওয়ায় অসীম আনন্দ। এমনি করে ইউরোপের পূর্ব্ব হতে পশ্চিমে রক্ত-গঙ্গা-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে নূতন তৃষ্ণা ও অভিনব দৃষ্টি। সাহিত্যে এর রূপচিহ্ন মূর্ত্তিমান হয়েছে সকল দিক হতে, জয়-পরাজয়ের ভিতরে উঠেছে নূতন নূতন সুর।

রুশিয়ার অনুভূতি শুধু তন্ময়ে পর্য্যবসিত নয়। ম্লানচিত্তে মঙ্গোলীয় প্রেরণা প্রলয়ের উগ্রতম দামামা-নিনাদের প্রেরণা দিয়েছে। নিজেকে সামলিয়ে রুশচিত্ত আশ্বস্ত হয়নি—কোথাও বা আঘাত দিতে বদ্ধপরিকর এবং কোথাও বা বর্ব্বর উগ্রতায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। আধুনিক রুশীয় রচনায় এই প্রবৃত্তি উন্মোচিত হয়েছে। কবি Demian Beduyir কবিতা আধুনিক কালের ন্যা:—

You are the masters of the fate of the world
You workers, you are free free
The end is come, you rulers the end is come
Arise ye people Triumph
Onward ! Triumph ! march march
Onward, and shot on shot

অবশ্য রুশিয়ার প্রাচ্য-সম্পর্ক এক জায়গায় এ পথে দাঁড়ি টেনেছে। তাই আধুনিকতার উত্তাল উন্মাদনায়ও কবি Anna Akhmatova ধ্যান করেছে জীবনের অনন্ত দুঃখের সৌন্দর্য্যকে এবং তাকে অসীম করতে কবি অগ্রসর হয়েছে—শুধু বিজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হ'তে দেয়নি। কবি বলছেন—

Like a white stone
The ancient gods changed men to things
but left them
A consciousness that shouldered endlessly
That splendid sorrows night endure for ever
And you are changed into memory

এ প্রসঙ্গে Alexender Blockকে ভোলা অসম্ভব। নিম্নস্তরের বিপ্লবের এই প্রধান কবির উত্থান স্বপ্নের মাধুর্য্যে।

Dearer to me than every other
Are you my Russia, ever so

এমনি করে' য়ুরোপীয় আধুনিকতা ধরেছে বিচিত্র রূপ। ইংলণ্ড ও ফরাসীর বিচ্ছিন্ন ও অনির্দ্দিষ্ট শিথিল স্বপ্নসমুচ্চয় আমেরিকার নূতন যাত্রার অজানা আকুলতা, জর্ম্মণীর অধ্যাত্ম শ্মশানে পুঞ্জীভূত দগ্ধ অঙ্গার ও স্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ, রুশিয়ার বিজয় অনুভূতির ভিতর সুগুপ্ত অতীত হাহাকারের আগ্নেয় স্মৃতি—এ সব দানা বেঁধেছে সাহিত্যের সাধনকুঞ্জে। সৌন্দর্য্যের সুকুমার আবেশে এ সাহিত্যের সুরভি আজ দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছে। জয়ের ভিতর পরাজয়, আনন্দের ভিতর বিষাদ, জাতীয়তার ভিতর আন্তর্জাতিক প্রেরণা, সভ্যতার সীমান্তে এনেছে উর্ম্মি ও প্রত্যুর্ম্মির আলিঙ্গন ও সংগ্রাম। মানবিকতার বিরাট সিংহাসনে আজ একচ্ছত্র হয়ে কোন আদর্শের অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ভোজরাজের সিংহাসনের দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার মত প্রতিটি কণ্ঠ হ'তে একাধিপত্যের প্রতিবাদ মুখরিত হয়ে আজ সমগ্র আদর্শ-সংগ্রহকে করেছে অপ্রচুর, রিক্ত ও ভঙ্গুর। এ যুগে অসম তানের আখড়াই সৃষ্টি হচ্ছে—বেতালের প্রভুত্বই স্বীকৃত হচ্ছে। কাজেই পূর্ব্বতন শতাব্দীকে অস্বীকার করা ছাড়া প্রগতির আর অন্য পথ নেই। Ignatio Slone, fascicismএর উল্টো দিক থেকে এক অদ্ভুত রূপস্ব উপস্থিত করেছে Fontamara উপন্যাসে! এ যেন পিরামিডে শিরকে মাটির দিকে রেখে নীচের দিকটা আকাশের দিকে তুলে ধরার মত। Christopher Isherwood, "Mr Norris changes train" প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিয়েছে যে, আধুনিকের সংসার বিশ্বব্যাপী। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপ একই সূত্রে বাঁধাই হল আধুনিক বাস্তবতা। ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক যৌন-প্রসঙ্গ সাম্যবাদের মহড়ায় অংশ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরি এণ্ড গুণ্ডামী ও নষ্টামি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের আশে-পাশে এক সৌর-মণ্ডল রচনা করেছে এ উপন্যাসের নায়কের চারি দিকে। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় E. M. Forester পতিত ভারতবর্ষের নূতন ছবি এঁকেছে—"A passage to India." উপন্যাসে থাকলেও সহানুভূতিযুক্ত বলে একটু অভিনব। এগুলি আর সুদৃশ্য ও সুকুমার রচনা, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন চিন্তায় মণ্ডিত। আধুনিক যুগের চিন্তার দিগন্ত এমনি করে নানা ভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

মরণেরে করে পরাজয়—বিজ্ঞান

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

সোভিয়েট রাশিয়া আজ পৃথিবীর মধ্যে শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস, শক্তি, বুদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পৃথিবীর মধ্যে যে উৎকর্ষ দেখিয়েছে তা অনেকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি। আজকের রাশিয়ার যুদ্ধ-কৌশল, প্রচার-কৌশল, যুদ্ধের জন্যে নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি ও প্রাণিবিদ্যা সবেতেই এমন এক অভিনবত্ব আছে যা ইতঃপূর্ব্বে আর কোন দেশ দেখাতে পারেনি। মুমূর্ষুর দেহে রক্ত-সঞ্চারণ. কৃষি-বিজ্ঞানের—"ভার্গালিজেস্যান্" প্রভৃতি সোভিয়েট রাশিয়ার যেমন এক একটি অভিনব আবিষ্কার, তেমনি আজকের রুশ বৈজ্ঞানিকদের মৃতের দেহে প্রাণসঞ্চার এক অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এর মধ্যে অলৌকিকত্ব তেমন কিছু নেই; কেবল বিজ্ঞান-জ্ঞানের সুচিন্তিত প্রয়োগেই আজ এই নবীন বৈজ্ঞানিকরা এই বিস্ময়কর অসাধ্য সাধনে সাফল্যলাভ করেছে। আজকের রাশিয়া সব কিছুতেই যেমন তাক লাগায়, এতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মৃতের দেহে প্রাণসঞ্চারের উল্লেখ প্রায় সব দেশের উপাখ্যানেই কিছু কিছু মেলে, তবে সেগুলো নিছক কল্পনাপ্রসূত গল্প ব্যতীত আর কিছুই নয়। শরীর-বিজ্ঞানের কিছু উন্নতি হওয়ার পর থেকেই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়ে এবং যুগে যুগে অনেক বৈজ্ঞানিকই এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেন,—কিন্তু, শরীর-বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকায়, তাঁদের কেউই প্রায় সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেননি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু উর্ব্বর-মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিকের প্রাদুর্ভাব ঘটায় এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উন্নতি হওয়ায়,—বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখারই প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সমস্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান শরীর-বিজ্ঞানে ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অনেক নতুন তথ্য সরবরাহ ক'রে, এই বিভাগের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় যথেষ্ট সহায়তা করে। রক্ত-চলাচল এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান সুষ্ঠু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা সময় সময়,—মুমূর্ষু জীবজন্তু ও মানুষকে মৃত্যুর কবল হতে একেবারে রক্ষা করতে না পারলেও, মৃত্যুর সঙ্গে অন্ততঃ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করতে সাহায্য করতে পেরেছেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে মৃতের দেহে প্রাণ-সঞ্চারের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন,—তাঁদের মধ্যে—ইউরোপের "হেম্যান্‌স্", "টম্পসন", "বায়ারবম্" ও রাশিয়ার কুলিয়্যাব্‌কো (Kulyabko) ও ক্র্যাভ্‌কভ্ (Tkravkov)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমের দিকে জীব-জন্তুর ওপরই এ বিষয় গবেষণা চলে; মানুষের প্রাণের দাম অনেক, তা নিয়ে ত আর বাঁচন-মরণের সঙ্গে ব্যাপক ভাবে খেলা করা চলে না। তবে, হঠাৎ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় কোন লোক মারা গেলে সেখানে বে-ওয়ারিশ লাসটা নিয়ে অবশ্য গবেষণা চলে। এঁরাও সময় সময় তা করেছেন।

যখনই কোন জীবজন্তু বা মানুষের হৃৎস্পন্দন থেমে যায়, তখনই আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, তার মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু আজকের চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলে,—হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীব মরে না। আসল মৃত্যু আসে ধীরে ধীরে, হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার অনেক পরে। মৃত্যুর সঙ্গে সুদীর্ঘ কাল ধরে দলের পর দল বৈজ্ঞানিকরা যুদ্ধ করে এই অতি মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করেন। এই ক্ষুদ্র সত্যটির ওপর ভিত্তি করেই আজকের নব্য রাশিয়ার দুঃসাহসী বিজ্ঞানীরা মৃত্যুর মত মারাত্মক শত্রুকেও পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। হৃদ্‌যন্ত্র এবং শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যাওয়ার পরও দেহের অপরাপর অনেক যন্ত্র কর্ম্মঠ থাকে; জৈবমৃত্যু ঠিক হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে না। অবশ্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা মৃত্যু এবং প্রকৃত জৈবমৃত্যুর মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে তা অতি সংক্ষিপ্ত, তবুও ঐ সময়ের মধ্যে যত্নবান্ হয়ে বৈজ্ঞানিক উপায় প্রয়োগ করলে জীব বা মৃত ব্যক্তিকে বাঁচান সম্ভব।

বড় বড় অপারেশ্যানের সময় চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকদের মৃত্যুর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করতে যে সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়, তারই প্রয়োগে আজ এই অভিনব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রুশ বৈজ্ঞানিক কুলিয়্যাবকো ও ক্র্যাভ্‌কভ্ শ্বাস-রোগে মৃত একটি ক্ষুদ্র শিশুর মৃতদেহ পান এবং তাঁরা মৃত্যুর অনেকক্ষণ পরে এই শিশুর দেহে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হন। বিশ ঘণ্টা চেষ্টার পর শিশুটির হৃৎস্পন্দন ফিরে আসে। কৃত্রিম উপায় প্রয়োগ করে হৃদ্‌যন্ত্র চলে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হৃদ্‌যন্ত্র আবার বন্ধ হয়ে গিয়ে শিশুটির চির-মৃত্যু ঘটে। এর পর রাশিয়ায় এ রকম অনেক পরীক্ষাই চলে, তবে তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক থিওডোর অন্দ্রিভই প্রথম সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, মৃত্যুকে পরাজিত করে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। আজকের রুশ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে যাঁরা তাকে পরাজিত করার প্রক্রিয়া আয়ত্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যে "ভ্ল্যাডিমার নেগোভ্‌স্কি" "ইউস্‌টেলিয়া স্মরোর্গস্কি" "মেরিয়া গেইভ্‌স্কায়া", "মেরিয়া সাস্‌টার" "মেরিয়া টেলেকিভা," "আরকেডি ম্যাক্‌বিকেভ"এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রের মৃতদেহ নিয়ে যে বিপুল কাজ করে চলেছেন, নিত্য যে অজস্র মৃতের দেহে প্রাণসঞ্চার করে চলেছেন, তাতে সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিক দল তাঁদের কার্য্যকলাপের প্রতি বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছেন। এঁদের এই অলৌকিক গবেষণার ফল উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পাশ্চাত্ত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার বিবরণ থেকে যত দূর তথ্য পাওয়া যায়,—তা এইবার এখানে সংক্ষেপে পরিবেশন করছি। "ভ্ল্যাডিমার নেগোভ্‌স্কি" ও "আরকেডি ম্যাক্‌বিকেভ্" যে বর্ণনা প্রকাশ করেছেন তা' থেকে জানা যায়—একদল রুশ বৈজ্ঞানিক 'Central Institute of Neuro-surgery'তে এ বিষয়ে অধ্যাপক "Bierdenko"র পরিচালনায় আট বছর আগের এক শুভ মুহূর্ত্তে এঁরা শুরু করলেন গবেষণা। সদ্যমৃত এবং মুমূর্ষু রোগীদের ওপর এই সর্ব্বগ্রাসী নির্ম্মম শত্রুর বিরুদ্ধে সুরু হলো এঁদের অভিযান। কিন্তু নিত্যই ঘটতে লাগল পরাজয়। তার পর যুদ্ধ বাধল; যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চল হতে আসতে লাগল গবেষণার উপকরণ —সদ্যমৃত মানুষ নিয়ে চলল বহু প্রচেষ্টা; কৃতকার্য্যতার কোন লক্ষণই গেল না দেখা; তবুও উদ্যমী বৈজ্ঞানিক দল দুঃসাহসের ওপর ভর করে চললো একটির পর একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য অন্বেষণ করে।

অনুসন্ধিৎসার পর অনুসন্ধিৎসা যেতে লাগল বেড়ে, কিন্তু তবুও সাফল্যের কোন লক্ষণই গেল না দেখা। অবশেষে এঁরা বুঝলেন, একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁদের নির্ভুল হলেও আবার একটি বিষয়ে নিশ্চয় ঘটেছে ভুল এবং তারই ফলে তাঁদের বারে বারে হতে হচ্ছে অকৃতকার্য্য। তাঁরা বুঝলেন, কোন এক জনের পক্ষে এই জটিল দেহ-যন্ত্রের সমস্ত কলকব্জার কৌশল নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তাই তাঁরা তখন—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক নতুন গবেষকের দল গঠন করলেন। অস্ত্রোপচার-বিশেষজ্ঞ—Eustolia Smireusky, জৈব-রসায়ন-বিশেষজ্ঞ—Maria Shuster ও Maria Gayevskaya, শারীরিক বিকার-বিশেষজ্ঞ (specialist in Pathological Phiysiology)—Vladiims Negovsky, ঔষধ-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ—(Therapathist) Maria Pelicheva ও দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—Arkady Makarychev আরম্ভ করলেন একযোগে বিপুল গবেষণা। পৃথিবীর নানা দেশে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত গবেষণা ইতঃপূর্ব্বে হয়েছে,—তার বিবরণ সংগ্রহ করে সকলে পরম যত্নে সেগুলি পাঠ করে চললেন। কুকুরের ওপর চললো পরীক্ষা। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া চলতে লাগল মৃত্যুর সময় দেহ-যন্ত্রের কোথায় কি পরিবর্ত্তন ও বিকৃতি ঘটে, এই পরিবর্ত্তনগুলো কেমন করে শুধরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়,—সে দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হলো। পরীক্ষাধীন জীবগুলির দেহ হতে রক্ত বাহির করে নিয়ে ধীরে ধীরে তাদের মৃত্যুর কবলে ঠেলে দেওয়া হতে লাগল। তার পর যেই তাদের বাহ্যিক মৃত্যু ঘটতে লাগল অমনি তাঁরা তাদের দেহে বাহির হতে রক্তসঞ্চার করে আবার প্রাণসঞ্চারের পরীক্ষা সুরু করলেন। এই ভাবে ব্যাপক পরীক্ষা চললো। মৃতের দেহে অতি দ্রুত রক্ত-সঞ্চারণ করার জন্তে এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো এবং মৃতের দেহে প্রয়োগ করার জন্তে যকৃতের নির্য্যাস (Heparin extract) তৈরীরও একটি অতি সহজ উপায় আবিষ্কার করা হলো।

হেপারিণ রক্তকে জমে যেতে দেয় না; রক্ত বেশ তরল রাখে; তাই হেপারিণ প্রয়োগ করলে প্রথমতঃ রক্ত সংক্রমণে সুবিধে হয়; দ্বিতীয়তঃ তরল রক্ত মৃতদেহের হৃদ্‌যন্ত্র ও শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে খুব সহজে চলাচল করতে পারে। আড়াই শ' কুকুরের ওপর পরীক্ষা করে এঁরা মৃত্যুজনিত বৈকল্য সম্বন্ধে অজস্র তথ্য সংগ্রহ করলেন, তার পর নতুন যন্ত্রপাতি ও পূর্ব্বলব্ধ তথ্যের পুঁজি নিয়ে এঁরা অভিযানমূলক পরীক্ষায় পড়লেন নেবে। চারটি কুকুরের প্রাণনাশ ঘটালেন। মৃত্যুর পর শুরু হলো প্রাণ-সঞ্চারের পরীক্ষা। চারটি মৃত কুকুরই পুনর্জীবন লাভ করল। শুধু তারা বেঁচেই উঠল না—তারা সুস্থ সবল হয়ে উঠে সন্তান পর্য্যন্ত সৃষ্টি করে প্রমাণ দিল তাদের প্রকৃত জীবনীশক্তির।

এই কৃতকার্য্যতার পর সুরু হলো মানুষের মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের পরীক্ষা; সদ্যজাত মৃত শিশু বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যু হয়েছে এমন শিশু নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা চালিয়ে চললেন। এই রকম শিশুগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্বাসরোধ-জনিত-আক্ষেপে (Asphyxia) মারা যায়। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেও যখন বাঁচাতে পারতেন না, তখন ঐ সদ্যমৃত শিশুগুলি আসত এঁদের হাতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বৈজ্ঞানিকদল তাঁদের নবলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে, এদের বাঁচাতে সক্ষম হতেন, কিন্তু নানা কারণে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এরা আবার মারা যেত। হয়ত তাদের কারোর প্রসবের সময় অতিরিক্ত টানা-হেঁচড়ায় দেহের কোন অংশের পেশী বা স্নায়ুমণ্ডলী ছিন্ন হয়ে গেছে, কিম্বা কারোর হয়ত শ্বাসযন্ত্র পূর্ণতা লাভ করেনি, কিম্বা কারোর হৃদ্‌যন্ত্র হয়ত অস্বাভাবিক, এই রকম নানা কারণেই তারা মারা যায়। তবে এই সমস্ত পরীক্ষা থেকে বৈজ্ঞানিকরা স্থির সিদ্ধান্ত করলেন যে, যদি মৃতের দেহের সমস্ত যন্ত্রপাতি স্বাভাবিক থাকে এবং হঠাৎ কোন আকস্মিক আঘাতের ফলে রোগী সংজ্ঞাশূন্য হয়ে মারা যায়, কিংবা শ্বাসরোধে বা অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ে কেউ মারা যায়, এবং ঐ মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে এঁদের হাতে পড়ে, তাহলে আবার হয়ত তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করা যেতে পারে।

এর পর কর্ম্মীরা যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে; সঙ্গে রইল হৃদ্‌যন্ত্রে রক্তসঞ্চারী যন্ত্র, নির্দ্দিষ্ট চাপে রক্ত-সঞ্চারণের জন্তে পারদ-স্তম্ভ, অক্সিজেন-যুক্ত রক্তের পাত্রগুলিকে দেহের স্বাভাবিক তাপের সমান তাপে রাখার জন্তে "অটোক্লেভ" নামক যন্ত্র, "গ্লুকোস্", "য়্যাড্‌রেনেলাইন্" অতিরিক্ত রক্ত ও অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা। আর রইল কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্তে "আরটিফিসিয়াল রেসপিরেটার" নামক একটি অতি আধুনিক অভিনব শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র।

এঁরা প্রথমেই মৃত ব্যক্তির হৃদ্‌যন্ত্রে বাহির হতে রক্ত-সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। অক্সিজেন্-মিশ্রিত তপ্ত রক্ত "Mercury column"র চাপে অতি ধীরে ধীরে ধমনীর ভেতর দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে পরিচালিত করে দেন। হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্ত পেশীগুলি অতি ধীরে ধীরে এই রক্ত থেকে শক্তি সঞ্চয় করে আবার কর্ম্মঠ হয়ে উঠে হৃদ্‌যন্ত্রকে চালাতে সুরু করে। হৃদ্‌যন্ত্র বেশ ভাল ভাবে চলতে সুরু করলে আস্তে আস্তে পারদ-স্তম্ভের চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়, তার পর রক্তসঞ্চারী যন্ত্র সরিয়ে নিয়ে পিচকারির সাহায্যে শিরায় গ্লুকোস ও যকৃতের-নির্য্যাস প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে "রেসপিরেটার" যন্ত্র বাতাস সরবরাহ করে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে যায়। এই যন্ত্রটি একেবারে অভিনব। এর প্রণালীটি অনেকটা Blower বা হাপরের মত। এতে মুমূর্ষুর শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক স্বাভাবিক কালের মতই চলে। শ্বাস নিতে রোগীর কোন কষ্টই হয় না, তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই ফুসফুস্ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে!

এই বৈজ্ঞানিকরা মোট একান্ন জন মুমূর্ষুর চিকিৎসা করেন; এদের নানা ভাবে মৃত্যু ঘটে, কেউ ভীষণ আঘাত পেয়ে মারা যায়, কেউ সন্তে হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যায়, কাহারও অকস্মাৎ শ্বাস-যন্ত্র বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়, কেহ বা আবার অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ে দুর্ব্বল হয়ে মারা যায়। বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়েও কয়েক জন মারা যায়। এই একান্ন জন মৃতের মধ্যে এঁদের চিকিৎসায় তের জন সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য লাভ করে। বাইশ জন সম্পূর্ণ ভাবে চৈতন্যলাভ করে তিন দিন পর্য্যন্ত বাঁচে, কিন্তু পরে মারা যায়। আবার চোদ্দ জনের ওপর নানা রকম সাফল্য লাভ হয়। মাত্র দু'জনের উপরই এঁরা কোন সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এবার কয়েকটি দৃষ্টান্তের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :—

আইভ্যান্ নামে জনৈক সৈনিকের দেহে কৃত্রিম উপায়ে রক্ত-
[illegible] করা সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। হাসপাতালে তার মৃত্যু ঘটে।

যায়। মৃত্যুর কতক্ষণ পরে যে তাকে এঁরা পান তা ঠিক জানা যায় না। মিনিট কুড়ি চেষ্টার পর কোন ফল হলো না, অবশেষে তার বুক কেটে হার্ট "মেসেজিং" সুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল কৃত্রিম শ্বাস-যন্ত্রের ক্রিয়া ও রক্তের আধার থেকে শিরায় রক্ত-সরবরাহ। মিনিট চারেক পর তার হৃদ্‌যন্ত্র আবার চল্‌তে সুরু হলো,—প্রথম অতি ধীরে তার পর ক্রমে ক্রমে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হয়ে উঠল প্রায় স্বাভাবিক। এর পর তার বক্ষঃস্থল সেলাই করে দেওয়া হলো। কৃত্রিম শ্বাস-যন্ত্র অবশ্য চলতে লাগল, কারণ অতবড় ক্ষত ও অত রক্তক্ষয়ের ওপর আবার বুকে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, কাজেই দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস যে কোন মুহূর্ত্তে থেমে যেতে পারে। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটার পর রোগীর চেতনা ফিরে আসে, কিন্তু অত্যন্ত বেশী রক্তক্ষয় ও দেহে হিষ্টমিন্ (Histbmine) নামক বিষবস্তুর ক্রিয়ায় রোগী একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। জঙ্ঘার ভাঙ্গা হাড় কেটে বাদ দেওয়ার জন্যে অস্ত্রোপচার সুরু হলে দেখা গেল, ঐ আঘাতে রোগীর বস্তীর এক দিকের হাড় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, ডাক্তারেরা অপারেশ্যান্ হতে বিরত হলেও, তাঁরা অপর সব ক্রিয়াই চালিয়ে চল্‌লেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চিরতরে বন্ধ হয়।

ফিরিয়ানভ বলে জনৈক রাশিয়ানের বেলা ব্যাপারটি সত্যই বেশ বিস্ময়কর হয়েছিল। তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ডাক্তার তার মৃত্যু হয়েছে বলে রায় দিয়ে চলে গেলেন। এর পর এই মৃত ব্যক্তি মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারী বৈজ্ঞানিক দলের হাতে পড়ে। মৃত্যুর ঠিক সাড়ে তিন মিনিট কাল পরে এঁরা তার ওপর কাজ সুরু করেন। অতি দ্রুত যকৃতের নির্য্যাস ইন্‌জেক্‌শ্যান্, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ও পারদ-স্তম্ভের চাপে রক্ত সঞ্চারণ করার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ মাত্র মিনিট খানেক যেতে না যেতেই মৃতের হৃৎপিণ্ড আবার চল্‌তে সুরু করে। ডাক্তাররা চল্‌লেন মহা উদ্যমে কাজ করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মৃত চেতনা পেয়ে চোখ খুল্‌লো; এই চোখ চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে পেল পুনর্জীবন। ধীরে ধীরে উঠল সম্পূর্ণ সেরে। আজও সে বেঁচে আছে।

মৃত্যুর পর গোটা একটা জীবন ত বহু দূরের কথা, মৃতকে যদি মারা যাওয়ার পর মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যেও কোন মতে বাঁচান যায়, তাতেই মনুষ্য সমাজের যে কত কল্যাণ হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। একটা উইলের কেবল একটা স্বাক্ষরের জন্যে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হয়ত বেহাত হয়ে যাচ্ছে; একটি নাম উচ্চারণের জন্যে হয়ত একটা খাঁটি খুনী বেকসুর খালাস পাচ্ছে আর তার বদলে একটি একেবারে নির্দোষ লোককে ঝুলতে হচ্ছে ফাঁসীকাঠে। [illegible] কর পুনর্জীবন প্রাপ্তিরও মূল্য

পাঁচ-ছ' মিনিটের ভেতর মৃত
[illegible]আমরা সফল হতে পারি না।
[illegible] পরে মৃতকে হাতে পেয়েও
[illegible] উৎসাহজনক। এ বিষয়ে আরও
[illegible] হবে তা কেউই বলতে পারে
[illegible] থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার
[illegible] তুলতে পারলে সত্যই যে আমাদের কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হবে তার আর বক্তব্য নেই। আমাদের এই প্রচেষ্টা ও সাফল্য যদি এ বিষয়ে অপর বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে এবং তাঁদের এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারে আর এই প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে তাঁরা যদি মৃত বা মুমূর্ষুর দেহে প্রাণ সঞ্চারণের আমাদের চেয়েও উন্নত উপায় আবিষ্কার করতে পারেন, তাতে আমরা সত্যই বিশেষ আনন্দিত হব।"

এঁদের আগে যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকরা অপর উপায়ে মৃতের দেহে প্রাণ-সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন, 'করণেট্' পত্রিকায় তার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উদ্‌ধৃতাংশ এখানে দিচ্ছি। এ প্রসঙ্গে মৃত্যুর পর মানুষের বিচিত্র অনুভূতির ও অভিজ্ঞতারও কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

ইংলণ্ডের আলিস্থ জন্ প্যাকারিং নামক জনৈক ব্যক্তির দেহে অস্ত্রোপচার হচ্ছিল। এর যন্ত্রণাতেই লোকটি মারা যায়। মৃত্যুর সাড়ে চার মিনিট কাল পরে ডক্টর পি,, জি, মিল্‌স্ তার বক্ষঃস্থল কেটে হৃৎপিণ্ডটি "মেসেজ" করতে শুরু করেন; পুরো সাড়ে চার মিনিট দলন মলন করার পর তার হৃদ্‌যন্ত্র আবার চলতে শুরু হয়। মৃত্যুতে সে কেমন অনুভব করে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে,—"ক্ষণিক মৃত্যুর আবেশে আমি যা দেখি তাতে আমার অনুশোচনা হচ্ছে,—আমি আবার জীবিত হয়ে না উঠলেই আমার পক্ষে ভাল ছিল।··· মৃত্যুভয় বলে কিছু নেই।"

ওয়াশিংটনের ম্যাবারভিনস্থ Theodcre Prinz মোটরগাড়ী চাপা পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। কৃত্রিম উপায়ে হৃদ্‌যন্ত্র দলন মলন করে পাঁচ মিনিট পরে তাকে আবার বাঁচান হয়। মৃত্যুতে সে কি অনুভব করে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে—"মৃত্যুর পর আমার মনে হচ্ছিল—আমি যেন কোমল অন্ধকারের ওপর ভাস্‌ছি; সে পরম শান্তি ও আত্মতৃপ্তির রাজ্য······।"

ইংলণ্ডের ডেজী র‍্যালেন্ নাম্নী জনৈকা মহিলা হৃদ্‌রোগে মারা যান। ইন্‌জেক্‌শ্যান্ ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করায় তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র আবার চলতে শুরু হয়। তাঁর মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"মৃত্যুকালে আমি এক মৃদু ও অস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি শুনতে পাই। চারি দিকে এক বিরাট শান্তি ও নিস্তব্ধতা, আমার মনে হচ্ছিল আমি শূন্যে ঝুলছি···কোন যন্ত্রণা নেই···কোন ভয় নেই; কেবল শান্তি ও বিরাম।"

একটা কথা এখানে না বললে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে রাশিয়ার টেম্পারেচার। রাশিয়ার টেম্পারেচার সমস্ত মরণ

জিরো ডিগ্রী থেকে অনেক নীচে নেবে যায়। অনেক সময় মাইনাস ন'-দশ ডিগ্রীতে পড়ে যায়। এত নীচু টেম্পারেচারে ব্যাক্টেরিয়া একেবারে স্থাণুবৎ জড় হয়ে যায়; ব্যাকটেরিয়ার পচন-ক্রিয়া ঘটানর শক্তি একেবারে মন্দীভূত হয়ে যায়, তাই রাশিয়াতে শবদেহ অনেক সময় cold reservoirয়ে রাখার মত বহু ঘণ্টা যাবৎ বেশ তাজা ও অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ব্যাক্টেরিয়ার প্রকোপ মন্দীভূত হয়ে যাওয়ায় "Postmortem changes" আসতে এখানে অনেক দেরী লাগে। এই কারণেই রাশিয়ায় "ক্যাডেভার ট্র্যান্‌স্ফিউশ্যান্‌ সম্ভব হয়েছে। "ক্যাডেভার ট্র্যান্‌স্ফিউশ্যান্‌" হলো মৃতদেহ হতে জীবিতের দেহে রক্তসংক্রমণ-ক্রিয়া। এখানে কোন লোক মারা যাওয়ার কুড়ি ঘণ্টা পরেও তার শবদেহ হতে রক্ত নিয়ে অপর রোগীকে বাঁচান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু Tropical countryতে হলে এই কুড়ি ঘণ্টায় ব্যাক্টেরিয়ার কল্যাণে মৃতদেহ পচে একেবারে ফুলে উঠত এবং তার থেকে দুর্গন্ধ বেরুত। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও ব্যাক্টেরিয়ার নিষ্ক্রিয়তার জন্যেই রাশিয়ার কোন লোক মারা গেলে বহু ঘণ্টা যাবৎ তার দেহের সমস্ত যন্ত্রপাতি অবিকৃত থাকে এবং এই কারণেই এখানে মৃত্যুর অনেকক্ষণ পরেও মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার করা সম্ভব হয়। উষ্ণপ্রধান দেশে এ সুবিধে নেই।

এই সমস্ত বিবরণ থেকে আজ প্রমাণ হচ্ছে, মানুষের বিজ্ঞান আজ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু মৃত্যুকেও পরাস্ত করতে পেরেছে। "যমে-মানুষে টানাটানি"তে এত দিন যমই জয়ী হয়ে আসছিল। আজ এ "টাগ-অফ-ওয়ারে" মানুষ জিত্‌তে শুরু করেছে এবং যম হারতে শুরু করেছে। যমকে পরাস্ত করার উপায় যখন একবার আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন বুঝতে হবে এবার থেকে দিন দিন তার পরাভব বেড়েই চল্‌বে এবং মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ের পথে দিন দিন চলবে এগিয়ে।

শিক্ষা ও শান্তি

বিভিন্ন জাতিকে এক সূত্রে বাঁধতে হলে, বিশ্বব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠা করতে হলে বন্দুক-কামানে হবে না, চাই শিক্ষা—ব্যাপক ও গঠন-মূলক শিক্ষা। প্রথমেই ভাল ভাবে বুঝতে হবে। পরস্পরের সম্পর্ক-নির্ভরতা এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদান। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে তাদের অবনতির, ধ্বংসের কারণ—আর ভবিষ্যতের শিক্ষা গড়ে তুলতে হবে সেই কারণগুলি এড়িয়ে যাবার মত করে।

আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র কোন জাতির-ই নেই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী। উদ্দেশ্যও ভিন্ন। জগদ্‌ব্যাপী মিলন এই ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। উন্নত শিক্ষিত জাতি অনুন্নতকে দেখবে অবজ্ঞার চোখে। সীমাবদ্ধ-দৃষ্টিযুক্ত ঐতিহাসিক নিজের দেশের কথা নিয়েই বিভোর থাকবে। মিলনের জন্ম যে প্রচেষ্টা তা ব্যাহত হবে। পৃথিবীব্যাপী শান্তি কোন একটি জাতির উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের ওপর বোঝা-পড়ার ওপর। শিক্ষার উন্নতি না হলে এই বোঝা-পড়া কখনও সম্ভব হবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে জগদ্ব্যাপী সাম্য আনতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে জীবনযাত্রার মাপকাঠির সমতা। শিক্ষার উন্নতি হলে জীবনযাত্রা উন্নত হয়, জীবনযাত্রা উন্নত হলে শিক্ষার উন্নতি হয় বলা শক্ত। তবে এটা ঠিক যে, উভয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। জীবন-যাত্রা উন্নত হলেই লোকে বেশী জিনিষ কিনবে। ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প বেড়ে যাবে। ফলে অর্থ-সমাগম হবে, দেশ ধনী হয়ে উঠবে। লোকের অবস্থা সর্ব্বদিক্‌ দিয়ে উন্নত হবে। কিন্তু যদি সাম্যের অভাবে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহই হতে থাকে তা'হলে অর্থ যাবে খরচ হয়ে, দেশ হয়ে পড়বে দরিদ্র। অতএব দেখা যাচ্ছে উন্নতির মূলে রয়েছে শান্তি আর জগদ্ব্যাপী শান্তির গোড়ার কথা হচ্ছে সাম্য—অর্থের এবং শিক্ষার উভয় দিক্‌ দিয়েই।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি এক রকমের হতে পারে না। সকলেরই একটা নিজস্ব ধারা আছে। সেই ধারায় অগ্রসর হলে শিক্ষার স্ফূর্ত্তি শীঘ্র হয় আর তা থেকে বিচ্যুত হলে একটা না একটা গোলমাল হয়ে যাবেই। তবে সংস্কৃতির আদান-প্রদানে ফল ভাল হবেই। সব জিনিষই দোষ-গুণে মিশ্রিত—চাই নির্ব্বাচন-ক্ষমতা। দুধ আর জল আলাদা করতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ চলে না। নিজস্ব সংস্কৃতি সংস্কার অপরের হাতে দিতে কেহই রাজী হবে না। তবে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা করা যেতে পারে। নিয়ন্ত্রণ কিন্তু দেশের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে করতে হবে।

এই রকম এজেন্সীর প্রথম কাজ হবে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা ষ্ট্যাণ্ডার্ড এক করা। প্রত্যেক দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজের পরীক্ষা যেন এক ষ্ট্যাণ্ডার্ডে থাকে। তার পর দেশের সেন্সাস দেখে শিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আর সব চেয়ে প্রয়োজন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা মত শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারণ করা। যে দেশে অসুখ বেশী সেখানে ডাক্তারী পড়ার সুবিধা করে দিতে হবে। যে দেশ কৃষিপ্রধান সেখানে কৃষি-বিদ্যা, জলসেচ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ভাবে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করলে জাতীয় উন্নতি হবে আর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করার সুবিধা হবে।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে এই সমিতি গঠন করতে হবে। তাঁরা বছরে অন্ততঃ একবার একত্রিত হবেন। কার্য্যে রিপোর্ট মিলিয়ে উন্নতির পন্থা নির্দ্ধারণ করবেন, কেবল পরীক্ষা ষ্ট্যাণ্ডার্ড নহে শিক্ষা-সম্পর্কীয় খরচের ষ্ট্যাণ্ডার্ডও তাঁরাই ঠিক করবেন। এই সমিতি-গঠন শিক্ষার উন্নতির জন্যই হবে, সুতরাং সভ্য-নির্ব্বাচনে রাজনৈতিক প্রশ্ন তুললে চলবে না।

যে দেশের শিক্ষা-প্রণালী-নির্দ্ধারণ দেশের লোকের হাতে না, বিদেশীদের দয়ার উপর নির্ভর করে, সেখানে উন্নতি প্রায়ই হয় না, যতটুকু হয় তাও অত্যন্ত মন্থর গতিতে। স্বাধীনতা ব্যতীত কোন রূপ উন্নতিই সম্ভব নয়। তাই বিশ্বব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশ্বের সমস্ত জাতিকে স্বাধীনতা দান করতে হবে।

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাগরপারের কবি বায়রণের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। শৈশবে মাতা বর্ত্তমানেও যিনি পবিত্র সুন্দর মাতৃ-স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, কৈশোরের কবি-প্রতিভার নির্ম্মম বিরুদ্ধ সমালোচনায় যিনি তিক্ত অকরুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, যৌবনে যিনি সমাজ ও সংসারের অবহেলায় ও অনাদরে দেশত্যাগী হইয়া মানব-দ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন, যাঁহার অমর লেখনী হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল "চাইল্ড হেরল্ড" ও "ডন জোয়ান", সেই কন্দর্পসদৃশ রূপবান অথচ চিরবিষণ্ণ বিপ্লবী কবি বায়রণের বিরাট ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিব না ?

রোমান্স-প্রিয় বিপ্লবী কবি জর্জ গর্ডন নোয়েল বায়রণের জন্ম হইয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের এক বৎসর পূর্ব্বে—১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী—লণ্ডনের ক্যাভেণ্ডিশ স্কোয়ারে। তাঁহার পিতা জন বায়রণ ছিলেন পঞ্চম লর্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং এক জন সেনাধ্যক্ষ, মাতা ক্যাথেরিণ গর্ডন ছিলেন প্রচুর ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী এক স্কচ্ রমণী। অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও পিতা ছিলেন অত্যন্ত অমিতাচারী, অমিতব্যয়ী ও অসচ্চরিত্র, এবং মাতা ছিলেন কোপন-স্বভাবা ও কটুভাষিণী। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতাই সম্ভবতঃ কবি-জননীকে বিকৃত মনোভাবাপন্না করিয়া তুলিয়াছিল। এই তিক্ত এবং বিষাক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া বায়রণও তাহার প্রভাব-বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার চরিত্র গঠনে এবং কবি-প্রতিভায় এই তিক্ত আবেষ্টনী এবং বিষাক্ত মনোভাব এক দুরপনেয় রেখাপাত করিয়া গিয়াছে।

পিতার অমিতব্যয়িতার ফলে যখন সংসারে অর্থের অপ্রতুলতা ঘটিল, তখন মাতা বায়রণকে লইয়া এবারডিনের এক বাসায় মাত্র দেড় শত পাউণ্ড আয় সম্বল করিয়া পৃথক্ ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামীর আচরণ ক্যাথেরিণকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। মাতার সেই ব্যাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তি বায়রণের জীবনেও স্পর্শের প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। জীবনের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে বায়রণের একমাত্র শান্তির স্থল ছিল তাঁহার ধাত্রী মে গ্রে, যাহার স্নেহ-স্পর্শ তাঁহার মাতৃ-তাড়না জনিত বেদনার ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ লিপ্ত করিয়া দিয়াছে।

রূপের দেবতা বায়রণকে যেন আপনার মনের মতন করিয়া গড়িয়াছিলেন—অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় রূপ-লাবণ্যে তাঁহার পার্শ্বে কন্দর্পদেবকেও বোধ হয় নিষ্প্রভ মনে হইত। কুঞ্চিত কেশদাম, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল আয়ত দুইটি চক্ষু, এবং সর্ব্বোপরি সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি তাঁহাকে দেব-দুর্লভ সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া মদনমোহন রূপে গড়িয়াছিল। তিনি ছিলেন ভাস্কর-শিল্পীর আদর্শ মডেল। কিন্তু জগতে বুঝি কোন কিছু নিখুঁত হয় না—বুঝি perfection লাভ করা যায় না—তাই বায়রণের অমন সুন্দর সুঠামেও ছিল এক লজ্জাকর ত্রুটি। একটি পায়ে সামান্য দোষ ছিল—চলিবার সময় অল্প খোঁড়াইয়া চলিতে হইত। তবে এ ত্রুটি সহসা সাধারণের চোখে ধরা পড়িত না। ইহার জন্য খেলা-ধূলারও বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই; ক্রিকেট খেলায় ও সন্তরণে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তথাপি এই অঙ্গহানি তাঁহাকে সদা বিষণ্ণ করিয়া রাখিত। কথায় কথায় অঙ্গহানির উল্লেখ করিয়া তাঁহার জননীও তাঁহাকে কম মর্ম্মপীড়া—কম মনোবেদনা দেন নাই। নিষ্ঠুরা ক্যাথেরিণ আপন সন্তানকে এক দিন "lame beast" বা "খোঁড়া জানোয়ার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ প্রকৃতির বায়রণ সে কথা জীবনে ভোলেন নাই। তাই ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি "The Deformed Transformed" নামক নাটকে নিষ্ঠুরা জননী বার্থা এবং বিকলাঙ্গ পুত্র আরণল্ডের কথোপকথনের মধ্যে আপনার গভীর মনোবেদনাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

নাটকটির প্রথম দৃশ্যে দেখিতে পাই, জননী বার্থা কুব্জপৃষ্ঠ পুত্র আরণল্ডকে নিকটে আসিতে দেখিয়া ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিতেছে :

Out, hunchback!

দূর হ'রে বিকলাঙ্গ মোর কাছ হ'তে!

অপরাধীর ন্যায় কম্পিত কণ্ঠে আরণল্ড বলিয়াছে :
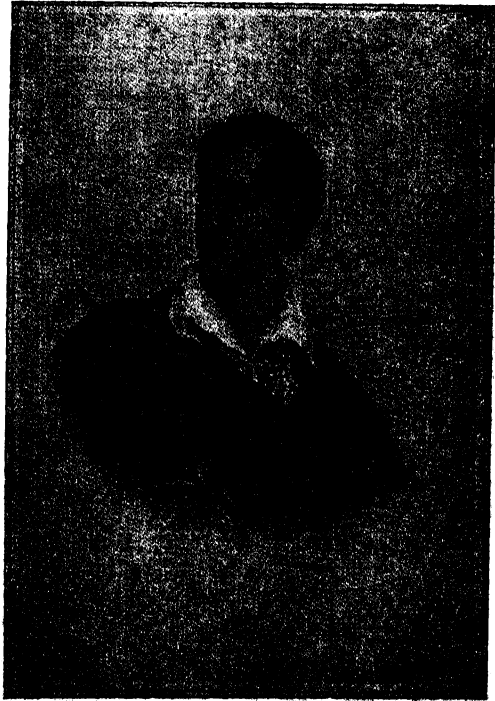
I was born so, mother !

এইরূপে আমি যে গো জন্মেছি জননি !

আরণল্ডের এ স্বরে কত বেদনা—কী গভীর কাতরোক্তি ! মাতা তথাপি ক্ষান্ত হয় নাই। বলিয়াছে :

Out,
Thou incubus ! Thou nightmare !
Of seven sons,
The sole abortion !

দূর হ' রে,
বক্ষে মোর ভারাক্রান্ত পাষাণ সমান !
সপ্ত পুত্র মাঝে শুধু তুই কু-সন্তান—
লজ্জাকর—মাতৃ-গর্ভ-গ্লানির আকর !

আর্ত্তস্বরে আরণল্ড বলিয়াছে :

Would that I had been so,
And never seen the light !

ছিল ভাল তাই যদি হ'তাম জননী—
কভু নাহি দেখিতাম ধরণীর আলো !

তার পর নিষ্ঠুরা মাতা আরো বলিয়াছে :

Call not thy brothers brethren ! call me not
Mother ; for if I brought thee forth, it was
As foolish hens at time hatch vipers, by
Sitting upon strange eggs,

ভ্রাতাগণে ভাই বলি ডাকিয়ো না আর।
মা বলে' ডেকো না মোরে। জেন শুধু মনে,
জন্ম আমি দেছি তোমা' শুধু সেইরূপে
যেরূপে অপর ডিমে উত্তাপ সঞ্চারি
কাল সর্পে জন্ম দেয় মূর্খ হংসী সবে।

ক্যাথেরিণ যে বায়রণের কাছে কত দূর তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বায়রণের এই মাতৃ-চিত্রাঙ্কণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মাতা সময়ে সময়ে সন্তানকে আদর করিলেও মাঝে মাঝে এমন তাড়না করিতেন যে সুধার মিষ্ট স্নিগ্ধতা অপেক্ষা গরলের তিক্ত তীব্রতায় বায়রণ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আশৈশব জননীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনিও মাকে ভালবাসিতে পারেন নাই। ইহা অপেক্ষা আর কী বড় দুর্ভাগ্য হইতে পারে ? মাতাকে দেখিয়া শৈশব হইতেই সমগ্র নারী জাতির সম্বন্ধে বায়রণ বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করিয়াছেন। নারীকে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন মোহময়ী ছলনাময়ী ভোগবিলাসিনীরূপে। শ্রীমতি এনি (Anne) নাম্নী এক তরুণীকে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন :

But woman is made to command and
deceive us—

আদেশ করিতে আর করিতে ছলনা
পুরুষেরে, সৃষ্ট হল বিধের ললনা—

নারীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভালবাসিয়াছিলেন। এ ভালবাসার মূলে ছিল রূপজ মোহ। তাই "Hours of Idleness" নামক পুস্তকে তিনি "Woman" নামক কবিতায় নারীকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন :

Woman ! experience might have told me
That all must love thee who behold thee ;
Surely experience might have taught
Thy firmest promises are naught ;
But, placed in all thy charms before me,
All I forget, but to adore thee.

* * *

Woman, that fair and fond deceiver,
How prompt are striplings to believe her !

* * *

How quick we credit every oath,
And hear her plight the willing troth !
Fondly we hope 't will last for aye,
When, lo ! she changes in a day.
This record will for ever stand,
"Woman, thy vows are traced in sand."

হায় রমণী ! মায়াবিনী ! অভিজ্ঞতা আমায় বলে,
যে দেখেছে সে-ই মজেছে তোমার রূপের গহন-তলে।
শপথ তোমার মিথ্যা অসার—হোক না তাহা তীব্রতম,—
যায় নে ভুলে, যাচ্ছে বলে অভিজ্ঞতা নিত্য মম।
তবু তুমি যখন মোরে বাঁধ' তোমার রূপের মায়ায়
সকল ভুলে মুখর হয়ে উঠি তোমার প্রশংসায়।

* * *

সোহাগময়ী চতুরা আর সুন্দরী সেই নারী জাতি
কেমন করে কিশোর ত্বরা রাখে তথায় আস্থা পাতি !

* * *

সকল কথাই কেমন ত্বরা সত্য বলে আমরা মানি,
মুগ্ধ চিত্তে শুনি তোমার বাক্যদানের মধুর বাণী।
মূর্খ মোরা, রইবে ভাবি চিরদিনই এম্নি ভাবে'।
হায় রে কপাল ! কে আর জানে একটি দিনেই বদলে যাবে !
চিরন্তনী শুধু তোমার বহুরূপী রূপের শিখা,
হায় ললনে ! শপথ তব বালির পরে রয়েছে লিখা !

বায়রণের রমণী-প্রীতি ও নারীর প্রতি আসক্তি ছিল অস্বাভাবিক প্রগাঢ়। হ্যারোর স্কুল ত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার তিনটি আত্মীয়া ভগ্নীকে ভালবাসিবার কথা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন নাই। ইহাদের মধ্যে আবার এনি নাম্নী এক বিবাহিতা কিশোরীর প্রতি পঞ্চদশ বর্ষ বালক বায়রণের আকর্ষণ ছিল তীব্রতম। রমণী-প্রীতি সম্বন্ধে বায়রণ "Childe Harold's Pilgrimage" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :

I love the fair face of the maid in her youth,
Her caresses shall lull me, her music shall
soothe ;···

আমি ভালবাসি [illegible] সুন্দর সেই মুখ,

বায়রণ তাঁহার প্রায় সকল কবিতাতেই নারীকে লালসাময়ীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। শুধু মনে হয় প্রাচ্য নারীর প্রতি তাঁহার কিছু শ্রদ্ধা ছিল। তবে শ্রদ্ধা অথবা ব্যঙ্গোক্তি তাহা সঠিক বলিতে পারি না। "Childe Harold's Pilgrimage" নামক কাব্যগ্রন্থের এক স্থানে প্রাচ্য রমণীর সম্বন্ধে বায়রণ লিখিয়াছেন :

Here woman's voice is never heard : apart,
And scarce permitted, guarded, veil'd, to move,
She yields to one her person and her heart,
Tamed to her cage, nor feels a wish to rove :
For, not unhappy in her master's love,
And joyful in a mother's gentlest cares···

রমণীর স্বর হেথা কভু নাহি শোনা যায়,
কচিৎ বা দেখা যায় গুণ্ঠন পাহারায়
সঁপিয়াছে দেহমন শুধু তার এক জনে.
পিঞ্জরে পোষ-মানা, সাধ নাহি বিচরণে।
স্বামি-প্রেমে অসুখী সে কভু নয় কভু নয়,
মা-হওয়ার গরবেতে বুক তার ভরি রয়।

কথা বলিতে বলিতে আলোচ্য বিষয় হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছি। বায়রণের পিতৃ-বিয়োগ হয় ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। তৎপরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পিতৃব্যপুত্রের মৃত্যু হয় এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম লর্ডের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে বংশ-উপাধি ও নিউষ্টেডের প্রাসাদ-ঐশ্বর্য্য বায়রণের হস্তগত হয়। এই সময়ে তিনি লর্ড কারলাইলের তত্ত্বাবধানে থাকেন। কিন্তু নিউষ্টেডের প্রাসাদ জীর্ণ হইয়া পড়ায় ও অর্থাদি জটিলরূপে জড়িত থাকায় কবি-জননী নিউষ্টেড পরিত্যাগ করিয়া নটিংহামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের জন্ম এক গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হ্যারোতে পাঠান হয় এবং তিনি সেখানে চার বৎসর অধ্যয়নের পর কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগদান করেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার বিদ্রোহী মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এবং ডক্টর বাট্লার প্রধান শিক্ষকপদে নির্ব্বাচিত হইলে তিনি প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনে সখ্য করিয়াছিলেন তিনি অনেকের সহিত, কিন্তু বীচার এবং পিগট্ ব্যতীত আর কাহারও সহিত তেমন অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেন নাই। একবার জনৈক বন্ধুর অনুযোগের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—

Oh ! yes, I will own we were dear to each other ;
The friendships of childhood, though fleeting are true ;
The love which you felt was the love of a brother
Nor less the affection I cherish'd for you.

*　*　*

But friendship can vary her gentle dominion
The attachment of years in a moment expires
Like love, too, she moves on a swift-waving pinion.
But glows not, like love, with unquenchable fires.

স্বীকার করি প্রিয় ছিলাম আমরা দুজন সহপাঠী ;
বাল্যকালের সখ্যতা সে ক্ষণস্থায়ী হলেও খাঁটী ;
ভায়ের মতন ভালবাসা আমার প্রতি ছিল তোমার
তোমার তরে প্রীতিও মোর ছিল না সে কম ত আর।

*　*　*

মধুর তাহার রাজ্য-বদল সখ্যতা যে করে শেষে ;
বর্ষব্যাপী অনুরাগের অবসানও এক নিমেষে ;
দ্রুত পাখা সঞ্চালনে ভালবাসার মতই গতি,
নাইকো শুধু ভালবাসার অনির্ব্বাণ দীপ্তি-জ্যোতি।

বায়রণের চির-সন্দিগ্ধ মনে বন্ধুত্বের প্রতি কোন দিনই আস্থা ছিল না। তথাপি আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার এক তরুণ বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে, নিষ্ঠার অভাবের মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির কারসাজি। কাল যাহাকে নিবিড় ভাবে ভালবাসিয়াছি আজ আর তাহাকে মনেই পড়ে না। এই যে আচারগত বৈষম্য ইহার অন্তরালে রহিয়াছে পরিবর্তনশীল প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

Few years have passe'd since thou and I
were firmest friends, at least in name,
And childhood's gay sincerity
Preserved our feelings long the same.

*　*　*　*

But now, like me, too well thou know'st
What trifles oft the heart recall
And those who once have loved the most
Too soon forget they loved at all.

*　*　*　*

And such the change the heart displays,
So frail is early friendship's reign
A month's brief lapse, perhaps a day's,
Will view thy mind estranged again.

*　*　*　*

If so, it never shall be mine
To mourn the loss of such a heart ;
The fault was Nature's fault, not thine,
Which made thee fickle as thou art.

তুমি আর আমি ছিনু প্রিয়সখা এই ত ক'দিন আগে
প্রিয়তম বলি শুধু অন্ততঃ লোক-চক্ষুতে লাগে।
বাল্যের সেই মধুর রলতা রেখেছিল বেঁধে দোঁহে—
বহু দিন ধরে দুজনে দোঁহরে বন্ধু-প্রীতির মোহে।

*　*　*　*

আজ তুমি জান, আমারি মতন, হৃদয় ফিরিতে চায়
তুচ্ছতম সে বিষয় হইতে যা ছিল স্বপ্নপ্রায়।
নিবিড় করিয়া এক দিন যত ভালবাসিয়াছে যারা
ভুলে যায় কভু ভাল যে বেসেছে তত সত্বর তারা।

* * * *

এ শুধু মনের পরিবর্ত্তন দিতেছে প্রকাশ করি',
কত ভঙ্গুর সখ্যতা যাহা জীবন-প্রভাতে গড়ি।
একটা মাসের একটু অ-দেখা, অথবা দিনের তরে,
অন্তর হতে স্নেহাস্পদরে আশ্রয়চ্যুত করে।

* * * *

তাই যদি হয় সে প্রেম হারায়ে, ফেলিব না কভু নীর
বন্ধু, তোমার দোষ কিছু নাই—দোষ শুধু প্রকৃতির
চঞ্চলমতি হে সখা তোমারে প্রকৃতিই করিয়াছে,
পরিবর্ত্তনে কাঁদিব না তাই—দুঃখ কী বলো আছে।

কি নারী কি পুরুষ, বায়রণ কাহাকেও ঘনিষ্ঠ ভাবে ভালবাসিতে পারেন নাই। এই ভালবাসার অভাবেই তাঁহার জীবনের শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে। বায়রণের ভালবাসা বলিতে পূতিগন্ধময় কামনাকেই বুঝায়। বায়রণ-চরিত্রের ইহাই প্রধান দুর্ব্বলতা।

[ক্রমশঃ

অপ্রাপ্ত

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ জীবনে কত প্রয়োজন ?
শুধু দুটি গুচ্ছ শস্য
আর
একান্ত নিবিড়-করে পাওয়া
কোন এক তরুণীর সস্নেহ নয়ন।
একখানি কুটিরের কোলে
তৃণনম্র কোমল প্রাঙ্গণ—
রাতের আকাশ আর ভোরের
রোদের হাসিটুকু

পরিচিতা মেয়ের মতন,
কিছু ধান
কিছু গান
এই ত' সামান্য প্রয়োজন।
এইটুকু শুধু প্রয়োজন,
কোন এক প্রশান্ত-কুটির
কোন এক নদীর দু-তীর
অবাধ আকাশ আর অগাধ জীবন।
চেয়েছি দেখিতে শুধু
দিনান্তের সন্ধ্যার আলোকে
প্রথম নক্ষত্রটিকে
ক্লান্তি ভারে তারাক্রান্ত চোখে।
এটুকুও মেলে না এখানে
মিল নেই ধানে আর গানে।
ইতর মরণ এসে দরিদ্র-জীবনে
এখানে কেবল করে কদর্য বিদ্রূপ
নদীর সে সুর নেই
পাখীরাও সব বোবা—চুপ।
মেটেনি স্বপন…
মেলেনি জীবন…

—উপন্যাস—

প্রতিভা বসু

মা তখনো ফেরেননি। শান্তি বোধ করলাম। মনে হ'লো এই অবকাশ আমার দরকার ছিলো। মণ্টু বললো, 'দিদি, আজকে কিন্তু আমি একটু চা খাবো।'

মা বাড়ি না-থাকলেই মণ্টুর এই এক আব্দার। আমার বাবার চা খেতে দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু মা চা জিনিষটা একদম বরদাস্ত করেন না। আজকে মণ্টু হঠাৎ যেন আমার বন্ধু হ'য়ে গেলো—মনে হ'লো ওর সঙ্গে ব'সে গল্প ক'রে অনায়াসে চা খাওয়া যায়—সঙ্গী পেয়ে আমি যেন খুশিই হলুম। চায়ের কথা ব'লে নিজের ঘরে এলুম। মনের মধ্যে যে-কথা এতক্ষণ চাপা ছিলো—একলা ঘরে সেটা আমার গলা চেপে ধরলো। কিছু দরকার ছিলো না তাঁর রাগ করবার। আর অত ফুটুনিই বা কেন? সে কি এটুকু বোঝে না যে তার কাছে আমি রাণী, আমি যে তাকে আমার সমান আসনে বসিয়েছি সেটা যে আমার দয়া, এ-কথা কি সে স্বীকার করে না? নিজের গরবে নিজেই ফুঁশতে লাগলাম একলা ঘরে। আর একটা অনির্দেশ্য যন্ত্রণা আমাকে দংশন করতে লাগলো নিষ্ঠুর ভাবে।

কাপড়-জামা ছেড়ে স্নান করতে গেলাম। কতক্ষণ যে সেখানে চুপ ক'রে ব'সেছিলাম জানি না—এক সময় দরজায় মণ্টুর করাঘাত শুনে চমকে উঠলুম। অন্যমনস্ক হ'য়ে কী ভাবছিলাম এতক্ষণ? আমার সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে কে ছিল! লজ্জা করতে লাগলো নিজের কাছেই নিজের, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও অনুভব করলুম যে, একবার মনোহারি দোকানে আমার না-গেলেই নয়। কেন তাঁকে দুঃখ দিলুম, কেন দিলুম তাকে অভিমান করবার অবকাশ, তাঁকে অপমান করবার আমার কী অধিকার আছে। আমি যাব তাঁর কাছে, ক্ষমা চাইব, স্বীকার করবো অপরাধ। মনে হ'তে লাগলো এক্ষুনি তাঁর কাছে না-গেলে আর যেন তাঁকে আমি পাবো না, আমার অপরাধ ক্ষালনের আর যেন সময় আমি পাবো না। ত্রস্তে স্নান সেরে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মণ্টুকে বললুম 'মণ্টু,—আমি একটু বেরুবো, এক্ষুনি বেরুবো—তুই চা খেয়ে নে।'

'তুমি খাবে না?'

'না, আমি এসে খাবো।'

মণ্টুর ভাবের ব্যতিক্রম হ'লো না—সে লাফাতে-লাফাতে নিচে নেমে গেলো। আমি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে সেজে (যা আমি কক্ষনো করি না) গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলুম। কিন্তু মনোহারি দোকানের সামনে গিয়ে আমি দুর্নিবার লজ্জায় ম'রে যেতে লাগলুম। মনে হলো ফিরে যাই—দোকানের দরজার একটা অংশ খোলা আর সমস্ত বন্ধ। গাড়ি থেকে নামতে-নামতে কেবল ভাবতে লাগলুম—যা গেলুম, না গেলুম কিন্তু পা আমার বাধা মানলো না। দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখলুম ওঁর মা ভিতরের দরজা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। চোখে চোখে পড়তেই তিনি হাসিমুখে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। 'এসো মা, এসো।'
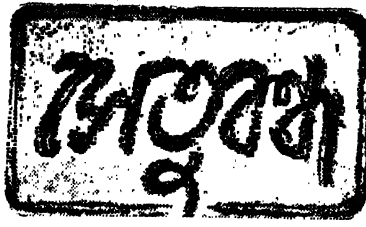
আমি পায়ের ধুলো নিলুম। বসলুম এসে ওঁর ঘরে—খাটের উপর, চেয়ারের উপর, মেঝেতে, কাগজে বইয়ে একেবারে ছড়াছড়ি। ওঁর মা তাই ঠেলে-ঠেলে আমাকে বসবার জায়গা ক'রে দিতে-দিতে বললেন, 'এমন অদ্ভুত ছেলে দেখিনি—কি নোংরাই করতে পারে।'

আমি বসলে আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'গেছে আজ সিনেমায়—এক বছরের মধ্যে ও তো যায়নি—আজ কী খেয়াল হ'লো। দোকান তো বন্ধ—সারাটা সময় সকাল থেকে কোথাও গেলো না, কিছু করলো না; কেবলি ছটফট ক'রে-ক'রে খেয়ে উঠে বলে, 'আমি সিনেমায় যাই।' 'বললাম, যা। কিন্তু এখন তো ফেরা উচিত।'

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'ফেরেননি?'

'কোথায় গিয়েছে! আমি তো জুতোর শব্দেই বাইরে দেখতে যাচ্ছিলাম—দেখলাম তুমি!'

'আশ্চর্য!—ফেরা উচিত ছিলো।'—আমি একটু উদ্বেগের সুরেই কথাটা বললুম।

আমার উদ্বেগে ভদ্রমহিলা ঈষৎ উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন, 'বাইরে থাকাটা ওর একেবারেই স্বভাব নয়। যা ওর বাড়িতে ব'সেই। বই নিয়েই তো আছে সারাক্ষণ—।'

আমি বললাম 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, এক্ষুনিই হয়তো এসে পড়বেন।'

'কী জানি, কলকাতার রাস্তা' উনি একটুখন চুপ ক'রে থেকে বললেন 'তুমি নিশ্চয়ই চা খাও।' 'খাই, কিন্তু এখন খাবো না'—ঘর অন্ধকার হ'য়ে এসেছিলো, উনি উঠে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দিতে-দিতে বললেন 'কেন? খাও না, আমার কিছু অসুবিধে হবে না।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—'আপনি একটুও ব্যস্ত হবেন না—আরেক দিন এসে নিশ্চয়ই আমি চা খেয়ে যাবো। আজ আমি যাই।'

'সে কী? এই মাত্রই তো এলে, বোসো একটু—খোকা এক্ষুনি আসবে।'

এ-কথায় আমি লজ্জিত বোধ করলুম। বললুম, 'আমি আপনাকে দেখতেই এসেছিলাম—কিছুক্ষণ থাকবারও আমার প্রবল ইচ্ছে কিন্তু আমার মা আজ সারাদিন বাড়ি নেই—ফিরে এসে আমাকে দেখতে না-পেলে হয়তো অস্থির হবেন।' উনিও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহ'লে আর আটকে রাখি কেমন ক'রে। আরেক দিন বেশি সময়ের জন্য এসো, কেমন?' আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

দোকানের আধখানা খোলা দরজায় পা দিতেই চোখোচোখি হ'য়ে গেল তার সঙ্গে। আমি ত্রস্তে বিনা সম্ভাষণেই সিঁড়ি টপকে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম, সেও একটি কথা না-ব'লে উঠে গেলো দোকানের মধ্যে। কিন্তু গ্রেপ্তার করলেন ওঁর মা, 'খোকা, ওকে চিনতে পারলি নে? অভিলাষের বৌ যে।'

খোকা ভাণ করলো, 'ও তাই নাকি'—ফিরে এসে—কখন এসেছিলেন।

আমি গাড়িতে উঠতে-উঠতে গম্ভীর হ'য়ে বললুম, 'এই খানিকক্ষণ'—

'যাচ্ছেন যে?'

'যাবো না?'

'আমি তো এইমাত্র এলুম।'

'আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত তো আসিনি।'

'তবে?'

'তবে আর কী!'

এ-কথার পরে সে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ গাড়ির দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো, তার পরে হাত ছেড়ে জোড়হাত ক'রে আমায় নমস্কার জানিয়ে বললো 'আচ্ছা।'

সে পিছন ফিরতেই আমি ডাকলাম, 'শুনুন।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। মুখ নিচু ক'রে বললুম, 'আমার উপর রাগ করেছেন না কি?'

'না তো।'

'তবে আমাদের সঙ্গে এলেন না কেন?'

'অন্ত কাজ ছিলো।'

'আমি জানি ছিলো না।'

মৃদু হেসে বললো 'আপনি জানেন ছিল না? আশ্চর্য তো! তবে সত্যি কথাই বলি—দেখুন, অভ্যেসই আমাদের অন্ত রকম।—এই আমাদের মতো দরিদ্রদের কথা বলছি আরকি—গাড়িতে ব'সে যেন ঠিক জুং পাই না—জনপথে মিশে ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে না এলে মনে হয় আমি যেন আর আমাতে নেই।'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে আমি আমার কথাতেই ফিরে বললুম, 'আমি জানি আপনার কোনো কাজ ছিলো না—কেবল আমাকে কষ্ট দেয়া।'

'কষ্ট! আপনাকে? আপনি তাতে কষ্ট পেয়েছিলেন?'—আমার মনে হ'লো কথা ক'টা বলতে ওঁর গলার স্বর যেন অপরূপ হ'য়ে উঠলো।

আমি বললাম 'কষ্টই তো।'—অকারণ অভিমানে আমার গলা ধ'রে এলো।

একটুখন আমার দিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, তার পর অত্যন্ত নিচু স্বরে বললো, 'আজকে আমি অভিলাষের একটা চিঠি পেয়েছি।'

'অভিলাষের চিঠি!' হঠাৎ আমি জেগে উঠলাম স্বপ্ন থেকে। আমি যেন ছিলাম না এই পৃথিবীতে—একটুখানি সময়ের জন্ত আমার মনে ছিলো না অভিলাষকে—মাকে বাবাকে—সংসারের আরো অনেক জটিলতাকে। আমার মুখ হয়তো বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছিলো। অস্ফুটে বললুম 'তাই না কি?'

'অভিলাষ এখনো—এত বয়স হ'য়েও বদলায়নি দেখলাম।'—মনের বিরক্তিকে যথাসম্ভব দমন ক'রে সে বললো।

আমি ক্রুতস্বরে বললাম, 'চিঠিখানা দেখাতে পারেন।'

'চিঠিখানা দেখতে চাওয়ার মধ্যে আমার অভদ্রতা কৌতূহল বুঝলাম, তবুও সে-ইচ্ছা আমি গোপন করতে পারলাম না। অভিলাষের ছাপ প্রভৃতি দিয়ে ভরা চিঠিখানার বক্তব্য কী তা একবার দেখবার জন্ত প্রাণ আমার ছটফট করতে লাগলো।

'চিঠিখানা আপনার পক্ষে তেমন গৌরবের নয়, তাছাড়া তাতে এমন কতগুলো কথা আছে যা আমাতে আর অভিলাষেই চিরদিন আবদ্ধ হ'য়ে থাকা ভালো।

আমি ঈষৎ ঝাঁঝ দিয়ে বললাম 'তাই নাকি!' হঠাৎ মণ্টুর গলা পেলুম 'দিদি।'

চমকে চোখ ফিরিয়ে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দেখলুম আমাদের ছোটো গাড়িটা ক্যাঁচ ক'রে থেমে গেলো সেখানে। গাড়ি ড্রাইভ করছেন আমার বাবা—তাঁর পাশে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে আবার মা, আর পিছনে মণ্টু।

আমার হাত-পা অবশ হয়ে এলো। ভয়ে আমি শব্দ বার করতে পারলুম না। অসহায় দৃষ্টিতে তাকালাম একবার ওঁর দিকে, পরক্ষণেই আমার বাবা অসাধারণ গম্ভীর মুখে নেমে এলেন আমার গাড়ির সামনে। ওঁকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে আমাকে বললেন 'এখানে কি করছো?'

প্রাণপণে গলার মধ্যে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রেও কথা বলতে পারলাম না, ভিতু চোখে তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে। বজ্রের মতো শব্দে তিনি বললেন 'বাড়ি চলো'—তাকিয়ে দেখলাম সে অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে পৃথিবীর এই সব সং দেখছে অবাক হ'য়ে।

দুই গাড়িতে ভাগাভাগি ক'রে চ'লে এলাম বাড়ি। এর পরেই আমার সত্যিকারের নির্যাতন শুরু হল মা বাবার কাছে। মাও যে এরকম নীচ হতে পারেন এ আমার ধারণা ছিলো না। স্ত্রীলোক যখন স্ত্রীলোকের উপর নিষ্ঠুর হয় তখন বোধ হয় মা-ও আর মা থাকে না।

বাড়ি এসেই মা বললেন, 'ও লোকটা কে?'

বললাম 'উনি অভিলাষের বন্ধু।'

'অভিলাষের বন্ধু, কিন্তু অভিলাষ তো নয়—তবে তোমার ওঁর কাছে কী দরকার।'

'দরকারের জন্ত নয়, হঠাৎ দেখা হ'লো।'

'সিনেমা থেকে এসেই তোমার হঠাৎ দেখা হবার পথে যাবার কী প্রয়োজন ছিলো?' বাবা ঢুকলেন ঘরে। গম্ভীর মুখে বললেন 'রুনি, আজ বাদে কাল তুমি একজন আই. সি. এসের স্ত্রী হচ্ছ, একজন মান্যলোকের পুত্রবধূ হচ্ছ, তোমার কি এ-সমস্ত রাস্তার লোকের সঙ্গে মেশামেশি মানায়? আর অভিলাষ যেখানে অনিচ্ছুক।'

অভিলাষের নাম শুনেই আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল। উদ্ধত-ভাবে বললাম 'অভিলাষের ইচ্ছায় আমার কী এসে যায়!'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মা বললেন 'নিশ্চয় এসে যায়। এই আজ থেকে আমি তোমাকে ব'লে দিলাম আমার অনুমতি ছাড়া তুমি এক পা বাড়ি থেকে বেরুবে না কোথাও।'

বাবা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

এর পরে মা আমার হাতে দু'খানা চিঠি দিয়ে বললেন, 'নাও, প'ড়ে ছাখো।'

দুখানা চিঠিই অভিলাষের। একখানা আমার নামের; সেখানা বন্ধই আছে, আরেকখানা খোলা চিঠি—মার। কী লিখেছে অভিলাষ এই চিঠিতে, কী বলতে চায় ও? ছিঁড়ে ফেললুম চিঠির মুখ। চিঠিখানা ইংরিজিতে।

'প্রিয় রুনি—

ভালো বাংলা আমার আসে না, কাজেই ইংরিজিতে লিখলুম। তাছাড়া বাংলা ভাষার জটিলতা আমার বিরক্তিকর লাগে। ইওরোপ থেকে ফিরে এসে অবধি তো এমনিতেই ভাজার মাছ হ'য়ে আছি। এ-দেশের ছেলেমেয়ে, তাদের হাব ভাব

চলন বলন এখনো আমাকে সমানেই টানছে। এ-দেশের কথা আর বলবো কী!

তোমাকে একটা কথা লিখি। তুমি আর কখনো সেই ষ্টেশনারি শপটাতে যেয়ো না। ও-লোকটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। অতিশয় ইতর এবং গ্রাম্য। আমি চাই না আমার স্ত্রী সে-সব সামান্য মানুষের সংস্পর্শে—যে কোনোও কারণে কখনোই আসে। তোমার সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য তুমি একজন আই. সি. এসের স্ত্রী। আমি আগামী সপ্তাহের শেষ তারিখে যাচ্ছি। আশা করি বিবাহের জন্য প্রস্তুত আছো। আমার চুম্বন নিও।'

স্কাউণ্ড্রেল!

চিঠিখানা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে পায়ের তলায় চেপে ধরলাম। বাংলা উনি জানেন না! ইংরিজিটা শিখলেন কবে? মার চিঠিখানা খুললুম।

'মাসীমা

ভেবেছিলাম এতসব কথা চিঠিতে না লিখে বলেই আসবো, কিন্তু সময় বা সুযোগের অভাবে সেটা হয়নি। রুনিকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি—সে ভীষণ জেদি মেয়ে—যদি বেঁকে যায় সোজা করা সহজসাধ্য হবে না, এজন্য একখানা বিস্তৃত চিঠি লেখা প্রয়োজন মনে হচ্ছে। নয়তো আমার সময়ের মূল্য এত কম নয় যে লম্বা লম্বা বাংলা চিঠি লিখে তা নষ্ট করা যায়।

আমি আপনাকে বলেছিলাম চৌরাস্তার মোড়ে যে-মনোহারি দোকানটি আছে রুনি সেখানে প্রায়ই যায় এবং সেই ইতর দোকানিটার সঙ্গে মেলামেশা করে। এর তুল্য অপমানকর ব্যাপার আমাদের সমাজে আর কী হ'তে পারে। রুনির এই অধঃপতনে আমি মর্মাহত। আপনাদের মতো সম্মানী ধনী এবং যোগ্য পিতামাতার সন্তান হ'য়ে রুনির এই রুচিবিকার বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। আমি প্রথম যেদিন লেকে বেড়াতে যাই সেদিন ফেরবার পথে ঐ দোকানে সিগারেট কিনতে নেমেছিলাম, রুনিকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেই যাচ্ছিলাম, কেননা আমাদের মতো ঘরের মেয়েদের পক্ষে এই সব বাজে দোকানে নেমে জিনিষ কেনা মানেই দশজনের সমান হ'য়ে যাওয়া। আমি মনে করি এতে ডিগনিটির যথেষ্ট হানি হয়। নেহাৎ প্রয়োজন না-হ'লে আমি নিজেও কখনো বাঙালির দোকানে কিছু কিনি না। কিন্তু রুনি আমার অনুমতির অপেক্ষা না-ক'রেই সোজা নেমে এলো দোকানে এবং অনর্থক কতগুলো বাজে রুমাল কিনলো।, আমি বারণ করতেই সে খেপে গিয়ে দাম না দিয়েই সমস্ত রুমাল নিয়ে গাড়িতে উঠে গেলো। আমার তথুনি সন্দেহ হয়েছিলো এদের পরিচয় কেবলমাত্র আজই না। পরে আমি ড্রাইভরের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম রুনি গাড়ি নিয়ে যখনি একা বেরোয় তখনি এই দোকানে আসে এবং ঘণ্টা দু'তিন থাকে।'

এই পর্যন্ত প'ড়ে আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম।

মণ্টুকে ডেকে আনলাম ঘরে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা কখন ফিরলেন মণ্টু?'

'তুমি বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই।'

'আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'হাঁ, এসে বললেন রুনি কই? আমি বললাম গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন গেলো। মা কিছু না-ব'লে চ'লে যাচ্ছিলেন ঘরে, এর মধ্যে রামদীন দু'খানা চিঠি দিয়ে গেল হাতে। একখানা চিঠি খুলে প'ড়েই মা রেগে অস্থির হ'য়ে গেলেন, আর তোমাকে বকতে লাগলেন। বাবা ফিরে আসতেই বাবাকে চিঠিটা দেখালেন, তারপর দু'জনে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি সঙ্গে গেলাম।'

'হুঁ। আচ্ছা, তুই যা—'

মণ্টু চ'লে গেলে আমি তথুনি কিছু করলাম না, কিন্তু একটু পরেই আমি বাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মা বাবা একসঙ্গেই ছিলেন সে ঘরে। মা গালে হাত দিয়ে ব'সে আছেন খাটের উপর, বাবা তাঁর পাশেই ইজি চেয়ারে ব'সে কথা বলছেন, আমার উপস্থিতি তাঁরা টের পেলেন না কিছুক্ষণের জন্য—আমি তাঁদের কথা বলতে শুনলাম—মা বলছেন রুনির যথেষ্ট বয়স হয়েছে, সে যদি তার নিজের ইচ্ছা খাটাতে চায়ই তাহ'লে আমার আর তোমার সাধ্যে কুলোবে না তাকে রোধ করা। বাবা হেসে উঠলেন। 'তুমি পাগল হয়েছো। এটুকু বুদ্ধি রুনিরও আছে যে একজন আই. সি. এস.এর স্ত্রী হবার মতো সৌভাগ্য খুব কম মেয়েরই হয়। এ সৌভাগ্য সে ঠেলবে না।'

'তা জানিনে, কিন্তু অভিলাষের উপর তার আর মন নেই।'

'মন আবার কী। ও-সব মন থাকা না থাকার কথাই ওঠে না এখানে।'

'রুনি যদি বলে 'আমি অভিলাষকে বিয়ে করব না'।'

'আমি বলবো আলবৎ করবে—করতেই হবে তোমাকে।' উত্তেজনায় বাবা ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলেন। আমি পিছন থেকে ডাকলাম 'বাবা।'

হঠাৎ যেন ঘরটা একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।

মা বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন দু-একবার, তারপর বাবা অত্যন্ত গম্ভীর ভাব বজায় রেখে বললেন 'কী দরকার।'

খানিকক্ষণের জন্য কথা বলতে পারলাম না, একসময় সমস্ত ভয় কাটিয়ে আমি স্পষ্ট স্বরে বললাম 'আমি অভিলাষকে বিয়ে করবো না।'

বজ্রপতনেও মানুষ এত বিহ্বল হয় না বোধ হয়। মা বাবা দুজনেই চমকে চোখ ফেরালেন আমার দিকে। একটু পরেই বাবা গর্জে উঠলেন। 'কিসের জন্যে?' মাথা নিচু ক'রে বললাম, কিসের জন্যে তা ব'লবো না কিন্তু বিয়ে তোমরা ভেঙে দাও।'

'কক্ষনো না'। হতভাগী, তোর চোখে কি সেই দোকানদারটাই বড়ো হ'য়ে উঠলো?'

"মানুষ হিশেবে সেই দোকানদার অভিলাষের অনেক উপরে—কিন্তু তার কথা এখানে ওঠে না। তবে এটুকু আমি তোমাদের বলতে পারি যে অভিলাষকে আমি কখনোই বিয়ে করবো না।'

'নিশ্চয়ই করবে, করতেই হবে, বিয়ে করার কর্তা তুমি নও, বিয়ে দেওয়ার কর্তা আমি। যাও এখান থেকে।'

বাবা অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়ালেন—আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্খলিতপদে চ'লে এলাম ঘরে। এসেই শুয়ে পড়লাম বিছানায়। মাথার শিরাগুলো দপ দপ করতে লাগলো। কী হ'লো বুঝতে পারলাম না ঠিক। আমি কি ভালোবাসি তাকে? নয়তো অভিলাষের উপর এ-বিদ্বেষ আমার এতদিন কোথায় ছিলো? তাকে আমি ভালোবাসিনি হয়তো, কিন্তু এতো ঘৃণাও তো ছিলো না।

পাচ্ছে, অর্থাৎ বস্তুজগৎ বা রূপজগৎ শিল্পীর মনে সামঞ্জস্যবোধ নামক চিন্ময় এবং ব্যক্তিগত রসচেতনাটিকে জাগিয়ে তুলেই ত আর লয় প্রাপ্ত হচ্ছে না। আবার যে সেটা রং ও রেখার মৃন্ময় ও প্রত্যক্ষ রূপের সাহায্যে চিত্রাকারে বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে; এবং রূপের আশ্রয় নিতে গেলেই রূপ-জগতের প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক, ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সাধারণ বস্তুরূপকে একবারে অস্বীকার করতে কিছুতেই পারা যায় না।

বক্তব্যটা নিতান্ত জটিল হয়ে পড়ছে বুঝতে পারছি; সুতরাং একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে জিনিষটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

এই ধরুন না কেন, কোন চিত্রশিল্পী একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন। ধরে নেওয়া যাক, সে দৃশ্যটির মধ্যে আছে একটি পল্লীবধূ, তার কাঁখে আছে একটি কলসী, তার সামনে এবং পশ্চাতে পড়ে রয়েছে আঁকা-বাঁকা ঘন পল্লবচ্ছায়াচ্ছন্ন নির্জ্জন পল্লীপথ; দূরে গাছ-পালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি পর্ণকুটীরের কতকাংশ,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধরুন, এই বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন রূপবস্তুগুলি শিল্পীর মনে জাগিয়ে তুললে রং ও রেখাগত একটি বিশেষ ও ব্যক্তিগত চিন্ময় সামঞ্জস্যবোধ, অর্থাৎ রং ও রেখাগত একটি বিশেষ রসচেতনা। এই রসচেতনাটি যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং মানসিক অর্থাৎ পুরাপুরি subjective সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিল্পীর কল্পনা ও বাসনা যদি ঐ মানসিক অবস্থায় পৌঁছেই থেমে যেত, তাহলে বলা যেত যে, তাঁর রেখা ও বর্ণঘটিত সৌন্দর্য্যবোধ বা সামঞ্জস্যবোধটা বস্তুনিরপেক্ষ একটা চিন্ময় রসচেতনা মাত্র। কিন্তু শিল্পীর কল্পনা বা বাসনা ত ঐ চিন্ময় অনুভূতির রাজ্যে গিয়েই তার যাত্রা শেষ করছে না; সেখান থেকে সে যে আবার নূতন করে যাত্রা সুরু করছে রূপজগতের প্রত্যক্ষ প্রকাশ-ক্ষেত্রে; অর্থাৎ রূপজগৎ থেকে যাত্রা করে যে চিন্ময়রাজ্যে সে অভিযান করেছিল, সেই অপ্রত্যক্ষ অশরীরী চিন্ময়রাজ্যের আনন্দবার্ত্তা রূপজগতে প্রচার করবার জন্য তাকে যে আবার প্রত্যক্ষ রূপজগতের রং ও রেখার শরীরী আকারকেই আশ্রয় করতে হচ্ছে।

ঐ পল্লীবধূ, ঐ ঘন পল্লবসমাচ্ছন্ন পল্লীপথ, ঐ পল্লবপ্রচ্ছন্ন পর্ণকুটীর প্রভৃতিকে আশ্রয় করেই ত শিল্পীর চিন্ময় রসানুভূতি চিত্রাকারে আবার আপনাকে প্রকাশিত করছে।

কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু এ প্রশ্নেরও উত্তর আছে। উত্তরটা হচ্ছে এই যে, শিল্পীর রসবাসনা মৃন্ময় রূপবস্তু থেকে চিন্ময় ভাবচেতনায় রূপান্তরিত হবার পর রং ও রেখার সহায়তায় আবার মৃন্ময় জগতের প্রত্যক্ষ বস্তুরূপ গ্রহণ করছে বটে, কিন্তু সে রূপ মৃন্ময় রূপ নয়, তা চিন্ময় রূপ।

কথাটা নিতান্ত অদ্ভুত শোনাচ্ছে বুঝতে পারছি। চিত্রকর তাঁর ছবিতে রূপের আশ্রয় নিচ্ছেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জগতের বস্তুগুলিকেই তাঁর চিত্রে রূপদান করছেন, অথচ তারা মৃন্ময়রূপ পাচ্ছে না, পাচ্ছে চিন্ময় রূপ, এ আবার কোন্ দেশী আজগুবি কথা।

কথাটা শুনতে সত্যই আজগুবি ঠেকে; কিন্তু আসলে তা নয়। কেন নয়, সেই কথাই এইবার বোঝাবার চেষ্টা করব।

তার পূর্ব্বে কিন্তু বস্তুরূপ ও প্রতীকরূপ বলতে কি বোঝায় এবং এই দুই শ্রেণীর রূপের মধ্যে বর্ণগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্যটা কোথায়, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন তা আর একটু অগ্রসর হলেই বুঝতে পারা যাবে।

বস্তুরূপ তাকেই বলে, যা মানুষের দৃষ্টিকে বস্তুর রং ও রেখাগত অস্তিত্বের বাহ্যিক প্রকাশ-রূপের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখে; আর প্রতীকরূপ তাকেই বলে, যা মানুষের দৃষ্টিকে বস্তু-জগতের রং ও রেখাগত অস্তিত্বের সাধারণ সংস্কারের বন্ধন থেকে দেয় মুক্তি।

একটা উদাহরণ দিয়ে জিনিষটাকে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। সীমন্তিনীর সীমন্তে সিন্দুর-রেখা দেখলেই আমাদের মনে স্বভাবতঃই একটা মহিমা-মিশ্রিত পবিত্রতার ভাব জেগে ওঠে। অথচ লাল রংটা সাধারণতঃ পবিত্রতাজ্ঞাপক নয়; রক্তবর্ণ বরং আমাদের মনে উত্তেজনা, উগ্রতা এবং নিষ্ঠুরতার ভাবই উদ্রিক্ত করে তোলে।

তবু যে সীমন্তিনীর সীমন্তের রক্তবর্ণ সিন্দুররেখা আমাদের মনে একটা সম্ভ্রম ও ভক্তিমিশ্রিত পবিত্রতার ভাব জাগিয়ে তোলে, তার কারণ ওখানে লাল রংটা আমাদের মনের কাছে তার প্রাকৃতিক স্বধর্ম্ম হারিয়ে একটা নূতন ভাবরূপ গ্রহণ করেছে। মানুষ ওখানে প্রকৃতির উপর মেরেছে টেক্কা।

এই যে প্রকৃতির উপর টেক্কা মারা; এই যে প্রকৃতির কড়া শাসনকে অমান্য করে নিজের সৃষ্টিকে উঁচিয়ে তোলা, এর পশ্চাতে রয়েছে মানব-সভ্যতার বহু কালের জমানো ইতিহাস।

সেই সুদূর অলক্ষ্য ইতিহাসের ধারাপ্রবাহ মানবচিত্তের গুহাতিগুহ অবচেতন স্তরে অস্পষ্ট স্মৃতিরূপে, সংস্কাররূপে অলক্ষিতে গোপনে প্রবাহিত হচ্ছে। সতী রমণীর সীমন্তের সিন্দুররেখা সেই অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ স্মৃতিপ্রবাহকে তোলে ঠিক সেই ভাবে বিক্ষুব্ধ করে, যেমন করে প্রবল ঝটিকা বিক্ষুব্ধ করে তোলে স্তিমিতস্রোত নদীবক্ষকে। সে তরঙ্গ-বিক্ষোভ সিন্দুররেখার নিজস্ব বস্তুগত প্রাকৃত বর্ণরূপের সাধারণ সংস্কারকে তৃণখণ্ডের মত অবহেলে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়;—তার আর দিশা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই হচ্ছে প্রতীকরূপের স্বধর্ম্ম। প্রতীকের রূপ আছে এবং অনেক স্থলেই সেটা বস্তুগত রং ও রেখার প্রাকৃত প্রকাশরূপকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে, কিন্তু সে প্রাকৃত রূপ নিজের প্রকৃতি নির্দ্ধারিত নির্দ্দিষ্ট বাঁধা-ধরা সাধারণ জাতিগত স্থূল, মৃন্ময় সত্তাটিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে না; তার পরিবর্ত্তে দৃষ্টিপথে এনে হাজির করে আর একটি সূক্ষ্মতর চিন্ময়রূপ, যার সঙ্গে বস্তুরূপের ঐক্যটা আকার বা বর্ণগত নয়, পুরাপুরি ব্যঞ্জনাগত বা ভাবগত। অপর পক্ষে বস্তুর যে প্রকৃত রূপ, তা প্রকৃতিদত্ত বর্ণ ও রেখার নির্দ্দিষ্ট পরিচয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

শিল্পী যখন তাঁর রসাবিষ্ট চিত্ত নিয়ে বস্তুজগতের পানে তাকান, তখন বিভিন্ন বস্তুর রং ও রেখা তাদের নিজেদের প্রকৃতিদত্ত আকৃতি ও রূপ হারিয়ে চিত্রকরের তৎকালীন মেজাজের দ্বারা সৃষ্ট বর্ণ ও রেখাপাত সামঞ্জস্য-বাসনার মধ্যে আত্মগোপন করে; অর্থাৎ বস্তুরূপ তখন প্রতীকরূপ গ্রহণ করে বসে, এবং চিত্রের ভিতর দিয়ে তারা যখন আবার বস্তুরূপে ফিরে আসে, তখন তারা হয়ে ওঠে প্রতীকধর্ম্মী।

প্রত্যেক বস্তু আমাদের কাছে যে আকার বা রূপ নিয়ে দেখা দেয়, সেটা হচ্ছে তার প্রয়োজনের রূপ, তার টিকে থাকার বা বেঁচে থাকার রূপ।

বাংলার সেন-রাজবংশ

শ্রীহরিচরণ বসু

আর্য-সভ্যতার স্বরূপ ও আর্যসমাজের প্রাচীন ইতিহাস বেদ-পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেই নিবদ্ধ আছে। যদিও পরবর্তী কালে পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা যুগে নানা কারণে বহুবিধ কৃত্রিমতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি যুক্তি দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান-পূর্ব্বক তৎসমুদায় হইতে প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করাও অসম্ভব নহে। পৌরাণিক যুগের পরবর্তী ইতিহাস অবগত হওয়া একরূপ অসম্ভবই ছিল; কিন্তু কিছু কাল যাবৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভূগর্ভ-প্রোথিত গ্রাম, নগর, দেবমূর্তি, দেবালয় প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া সুদূর অতীত কালের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতের নানা প্রদেশের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত বহুসংখ্যক শিলালিপি ও তাম্রশাসন-লিপি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেন। ফলে বিভিন্ন প্রদেশের বহু রাজবংশের বংশ-পরিচয়, ধর্মমত, শাসন-প্রণালী প্রভৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই সমুদয় শিলালিপি ও তাম্রশাসনলিপির অনুকৃতি ও অনুবাদ 'The Journal of the Royal Asiatic Society', 'Epigraphia Indica,' 'Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society' প্রভৃতিতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশ সম্পর্কীয় লিপিগুলি রাজসাহী—দিঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী রাজপরিবারের, বিশেষতঃ সুপণ্ডিত রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়-বাহাদুর, এম্, এ, মহোদয়ের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি' কর্ত্তৃক 'গৌড়রাজমালা', গৌড়লেখমালা', 'Inscription of Bengal' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ায়, বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপাসক ও সর্ব্বজনীন বৌদ্ধধর্মে একান্ত শ্রদ্ধাশীল পালসম্রাটগণ, তাঁহাদিগের প্রদত্ত কোনও শাসন-লিপিতেই তাঁহাদের জাতি বা বর্ণের বিন্দুমাত্র আভাস প্রদান করেন নাই। পরন্তু, তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণমন্ত্রী বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত কমৌলি-লিপি ও সন্ধ্যাকর নন্দী-প্রণীত 'রামচরিতম্' হইতে এবং রাজপুত রাজকন্যাগণের সহিত তাঁহাদিগের বিবাহাদি দ্বারা, তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় রাজপুত-ক্ষত্রিয় বলিয়া আমরা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারি।

অপর পক্ষে, বর্ণাশ্রম-ধর্মের পুনরভ্যুত্থান কালে, পালসম্রাটগণের প্রভাব লুপ্তপ্রায় হইলে বঙ্গদেশে যে সেনরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রদত্ত প্রত্যেক শাসন-লিপিতেই তাঁহারা যেন আকুল আগ্রহে তাঁহাদিগের জাতি, বর্ণ প্রভৃতি নানা ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে 'চন্দ্রবংশীয়' রাজপুত' বলিয়া অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু, মহারাজাধিরাজ বিজয় সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেওপাড়া লিপিতে সামন্তসেনকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম' বলিয়া উল্লেখ করায় প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণের পক্ষে যেন একটি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বিখ্যাত ওরিয়েণ্টালিষ্ট অধ্যাপক কিলহর্ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের শিরোমাল্য।" 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'র ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও সেনরাজগণের শাসনলিপি সমূহের (Inscriptions of Bengal) সম্পাদক স্বর্গীয় ননিগোপাল মজুমদার মহাশয় উক্ত পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন:—"In verse 5 of the present record, he (Samanta Sena) is celled 'Brahmakshatriya Kulasirodama' which epithet could not be correctly interpreted by Prof, Kielhorn. He translated it as 'the head-garland of the class of Brahmanas and Kshatriyas'. The correct interpretation of this expression was first suggested by Prof. D. R. Bhandarkar, whose translation 'the head-garland of Brahma-kshatri caste' was accepted by Vincent Smith. It thus appears that the Senas belonged to the Brahma-kshatri caste, a fact which is of considerable significance. He shows that no less than five royal families were designated 'Brahma-kshatri'. The term was applied to those who were Brahmanas first and became kshatriyas afterwards, i. e. those who exchanges their priestly profession for martial pursuits."

পঞ্চম শ্লোকে সামন্তসেনকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়শিরোদাম' বলা হইয়াছে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়জাতির শিরোমাল্য' বলিয়া ইহার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সেনবংশ 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' জাতি ছিলেন, এবং বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর আরও দেখাইয়াছেন যে, অন্যূন পাঁচটি রাজবংশ এইরূপে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তির পরিবর্তে সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

উল্লিখিত বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতগণের—যাঁহাদিগের অসাধারণ মনীষা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুচিন্তিত গবেষণার ফলে, নানা প্রদেশের পুরাতত্ত্ব সমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের অতীত গৌরব-কাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে বিন্দুমাত্র অনাস্থা প্রদর্শন করা নিতান্ত অশোভন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে বেদ-পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্র সমূহে বর্ণিত বিবরণ লোকসমাজে চির-প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সমীচীন নহে। অতএব, আমরা পূর্বোক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ব্বক আমাদের বক্তব্য নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

আলোচ্য শিলালিপিখানির প্রথম শ্লোকে পঞ্চানন শিবের এবং দ্বিতীয় শ্লোকে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের বন্দনা করিয়া হরি-হরের লীলা কীর্তন করা হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে চন্দ্রশেখর শিবের ললাটস্থ চন্দ্রদেবের মহিমা কীর্তন করিয়া, চতুর্থ শ্লোকে তদ্বংশে পরাশর-পুত্রের (ব্যাসদেবের) রচিত শ্লোক সমূহ (মহাভারত) যাঁহাদের গুণানুকীর্তনে পবিত্র হইয়াছে, সেই দাক্ষিণাত্যবাসী বীরসেন ও অন্যান্য রাজগণের জন্ম-কথা বলা হইয়াছে। যথা:—

"বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তি-মাধ্বীকধারাঃ
পারম্পর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসর-প্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥৪॥
তস্মিন্ সেনান্বয়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ।"

সেনরাজগণের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' আখ্যার শাস্ত্র ও ইতিহাস-সম্মত অর্থ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এক্ষণে, উক্ত শিলালিপিরই ১৬শ শ্লোকটিতে দেখিতেছি যে, মহারাজ বিজয়সেনের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

"গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীংস্তানমেন
প্রতিদিন-রণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥১৬॥"

বঙ্গার্থ :—তাঁহার কর্তৃক কত যুদ্ধনিরত রাজা প্রত্যহ হত বা পরাজিত হয়, তাহা কে গণনা করিবে? এই পৃথিবীতে তিনি (বিজয়সেন) কেবল চন্দ্রদেবেরই 'রাজা' আখ্যা সহ্য করেন; কারণ চন্দ্রদেবই তাঁহার আদিপুরুষ।

চব্বিশ পরগণান্তর্গত বারাকপুরে মহারাজ বিজয়সেনের প্রদত্ত আর একখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার প্রথম শ্লোকে শ্রীশ্রী৺ধূর্জটি—যাঁহার মস্তকস্থ গঙ্গাজলে খেলা করিতে করিতে কার্ত্তিকেয় ও গণেশ অর্ধচন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়া শৈবালমধ্যে শফরী মনে করিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন দেখিয়া, যিনি মৃদু হাস্য করিতেছিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হইয়াছে। তৎপরে, দ্বিতীয় শ্লোকে সেই লক্ষ্মীশ্বরের চক্ষুঃস্বরূপ ও পার্বতীনাথের শিরোভূষণ চন্দ্রদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তৃতীয় শ্লোকে তদ্বংশে রাজপুত্রগণের (রাজপুত) জন্ম বলা হইয়াছে। যথা :—

"তদ্বংশে রাজহংসচ্ছদ-বিশদ-যশঃকৌমুদীমুদ্গিরন্তঃ
[খেলন্তঃ ক্ষমাধরাণামুপরি কর-সমারোপ-সীমন্তিতাশাঃ।
সীমানঃ পুণ্যরাশেরমৃতময়-কলামণ্ডলা- ভোগবন্তঃ]
কুর্ব্বন্তশ্চন্দ্রলীলামবনিতল-ভূজো রাজপুত্রা বভূবুঃ ॥৩॥"

তৎপরে চতুর্থ শ্লোকে, সামন্তসেনকে 'ক্ষত্রিয়গণেরই শিরোভূষণ' বলা হইয়াছে। যথা :—

"তেষাং বংশে বভূব প্রভুরুভয়কুলপ্রৌঢ়িসম্পদ্গুণানা[মুত্তমঃ]
[সঃ] ক্ষত্রিয়াণামথন-জনমনশ্চাতকানাং পয়োদঃ।"

ইহার পর সপ্তম শ্লোকে বিজয়সেন কর্তৃক শূরবংশীয়া বিলাসদেবীকে বিবাহ করা, এবং অষ্টম শ্লোকে বল্লালসেনকে 'ক্ষত্রাণামাতপত্রং' অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়স্থল' বলা হইয়াছে। যথা :—

"অভবদ্বিলাসদেবী শূরকুলাম্ভোধি-কৌমুদী
তস্য নয়নযুগমঞ্জু-খঞ্জনবিহার-কেলিস্থলী মহিষী ॥৭॥
"ক্ষত্রাণামাতপত্রং কনকগিরি-শিরোবর্ত্তিমার্তণ্ডতেজাঃ
শশ্বদ্বিশ্বং বিলিম্পন্নজরশুভ্রনীকেনপূর্ব্বৈর্যশোভিঃ।
জাতস্তস্মাদমুষ্যামনিল-রজনীজানি-সৌন্দর্য্যসারঃ
শ্রীবল্লালসেনঃ স্মরভজনবিধা কামুকী কামকান্তঃ ॥৮॥"

মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক সম্পাদিত একখানি তাম্রলিপি বর্ধমান জেলান্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকটবর্ত্তী নৈহাটি গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকে অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের বর্ণনা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা, দ্বিতীয় শ্লোকে মহাদেবের ললাটস্থ চন্দ্রদেবের বর্ণনা ও তাঁহার বিজয় প্রার্থনা, এবং তৃতীয়টিতে সেই চন্দ্রদেবের বংশে রাজপুত্রগণের উৎপত্তি ও তাঁহাদিগের দ্বারা রাঢ়প্রদেশ অলঙ্কৃত হওয়া, তাঁহাদিগের অপূর্ব ন্যায়নিষ্ঠা, সদাচার ও শরণাগতকে আশ্রয়দান প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ আছে।

এই তাম্রশাসনলিপিতে সেনরাজগণের বংশ-পরিচয় ব্যতীত তাঁহাদিগের বঙ্গদেশীয় উপনিবেশের স্থান সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকায়, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের নিকট অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে। বস্তুতঃ, পালরাজগণের জাতি এবং বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের আদি উপনিবেশ সম্বন্ধে যেমন নানাবিধ মত প্রকাশ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইবার পর সেনরাজগণ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোনও ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ইহা হইতে কয়েকটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। যথা :—

"বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যা নিরূঢ়ি-
প্রৌঢ়াং রাঢ়া-মকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিত-বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥৩॥
"তেষাং বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট-পৃতনাং বোধিকল্পান্তসূর্য্যঃ
কীর্ত্তির্জ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্য-সিদ্ধি-প্রতিষ্ঠা-
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধি-করুণা-ধাম সামন্তসেনঃ ॥৪॥
"তস্মাদজনি বৃষধ্বজ-চরণাম্বুজ-ষট্‌পদো গুণাভরণঃ।
হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ-প্রলয়হেমন্তঃ ॥৫॥"

বঙ্গানুবাদ :—"তাঁহার (চন্দ্রদেবের) সুসমৃদ্ধ বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে রাঢ়প্রদেশ অপূর্ব্ব সদাচার ও মহত্ত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল, তাঁহারা সেই রাঢ়প্রদেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নিয়ত বিশ্বের কল্যাণ-কামনা ও আশ্রিত-বাৎসল্যের জন্য, তাঁহাদের যশঃ-তরঙ্গে দিগন্ত বিধৌত হইয়াছিল। ৩

"তাঁহাদের বংশে পরাক্রান্ত সামন্তসেন দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শত্রুগণের অপরিমেয় বাহিনীর নিকট প্রলয়কালীন মার্তণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মিত্রবর্গের নিকট উজ্জ্বল কৌমুদীচ্ছটায় মনোমুগ্ধকারী কুমুদিনীকুলের আনন্দ-হিল্লোল-বিধানকারী শরৎচন্দ্রের ন্যায়, এবং চিরানুগত মিত্রগণের মনোরাজ্যে বিজয়লাভের নিশ্চয়তাবিধানে পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি ধর্ম ও সদাচারের পথানুসরণ করিতেন, এবং তাঁহার হৃদয় অকপট অনুকম্পার আবাসস্থল ছিল। ৪

"তাঁহা (সামন্তসেন) হইতে হেমন্তসেন দেব জাত হইয়াছিলেন। তিনি বৃষধ্বজের চরণে মধুকরের ন্যায় আকৃষ্ট ও অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার গুণাবলী তাঁহার একমাত্র ভূষণ ছিল, এবং তিনি সরোবরের ন্যায় বিশাল অরাতিপুঞ্জের নিকট প্রলয়কালীন হেমন্তের ন্যায় ছিলেন। ৫।"

মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী মাধাইনগরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকে হর-গৌরীর বর্ণনা ও পঞ্চানন শিবের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা, দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষীরোদসমুদ্রোত্থিত চন্দ্রদেবের বর্ণনা এবং তৃতীয় শ্লোকে তদ্বংশজাত রাজগণ ত্রিভুবনবিজয়ী ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করিয়া, চতুর্থ শ্লোকে পুরাণ-প্রখ্যাত বীরসেনের (পুণ্যশ্লোক নলরাজার পিতার) বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়গণের কুল-শিরোদাম সামন্তসেনের জন্ম বলা হইয়াছে। যথা :—

"পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য বংশে
কর্ণাটঃ ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।"

ইহার ষষ্ঠ শ্লোকের শেষাংশ বিজয়সেন কর্তৃক প্রদত্ত দেওপাড়া-লিপির শেষাংশের অনুরূপ। যথা :—

"অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশিরস্মাৎ
সমরবিস্ময়রাণাং ভূভৃতামেকশেষঃ।
ইহ জগতি বিষেহে সেনবংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ।"

নবম শ্লোকে, মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক রাজপুত-রাজকন্যা চালুক্যবংশীয়া রামদেবীকে মহিষীরূপে প্রাপ্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা :—

"ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্ন-চালুক্যভূপালকুলেন্দুলেখা।
তস্য প্রিয়াভূদ্বহুমানভূমির্লক্ষ্মীঃ পৃথিব্যোরপি রামদেবী।"

এই শাসন-লিপিখানির অপর পৃষ্ঠায় গদ্যাংশে মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনকেও 'পরম-দীক্ষিত-পরম-ব্রহ্মক্ষত্রিয়-সুমেরু' বলা হইয়াছে। যথা :—"পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেব—পাদানুধ্যাত—শ্রীবিক্রমস্য বীরচক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম······সোমবংশ-প্রদীপ-রাজপ্রতাপ নারায়ণ—পরম দীক্ষিত-পরম ব্রহ্মক্ষত্রিয়-সুমেরু···শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব" ইত্যাদি।

মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রদত্ত রাণাঘাটের নিকটবর্তী আনুলিয়া গ্রামে একখানি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে একখানি এবং দিনাজপুর জেলান্তর্গত বালুরঘাট মহকুমার অধীন তর্পণদীঘি নামক সুবৃহৎ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারকালে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তিনখানি শাসনপত্রেরই প্রথম হইতে সপ্তম শ্লোকগুলি একই প্রকার; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে মহর্ষি অত্রির ধ্যান-প্রসূত ওষধিনাথের (চন্দ্রদেবের) বংশে সেনবংশের উদ্ভব বলা হইয়াছে। যথা :—

"আনন্দাম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুগ্ধপ্রবিচ্ছিদাত্যন্তিকী
কল্পান্তে হ তমোহতা রতিপতাবেকোহমেবেতি ধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়াত্ত্যাত্তপ্রকাশাজ্জগ-
জ্জ্যোত্রিধ্যান-পরম্পরা-পরিণতং জ্যোতিস্তদাত্তাং মুদে। ২।
সেবাবনম্র-নৃপকোটি-কিরীটরোচি-
রম্বুপ্লবংপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিবস্বরমূর্যো দ্বিষতামভূবন্
ভূমিভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে। ৩।"

সেনরাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত উল্লিখিত শাসনলিপিসমূহের উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টতঃই উপলব্ধ হইতেছে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই আপনাদিগকে মুক্তকণ্ঠে মহাভারতপ্রোক্ত চন্দ্রবংশীয় বীরসেনের বংশধর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা তাঁহাদিগকে রাজপুতশ্রেণীস্থ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে। সুতরাং 'ব্রহ্মবাদী স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ' অর্থে সেনবংশের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কারণ, মাধাইনগর-শাসনলিপিতে " সামন্তসেনকে—'কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম' বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা সেনরাজগণকে কর্ণাটপ্রদেশাগত ক্ষত্রিয় বলিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে। তৎপরে ঐ শাসনলিপিতেই বল্লালসেন কর্তৃক চালুক্যরাজকন্যা রামদেবীর পাণিগ্রহণ তাঁহাদিগকে 'রাজপুত ক্ষত্রিয়' বলিয়াই প্রমাণ করিতেছে। তাঁহাদিগের শাসনলিপি সমূহের একাধিক স্থলে 'রাজপুত্র' শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক শাসনলিপিরই প্রারম্ভে চন্দ্রদেবের মহিমা কীর্তনাদি দ্বারা আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপে চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে 'চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজপুত' ছিলেন তাহাও নিশ্চিতরূপে বুঝা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত, মাধাইনগর-লিপির চতুর্থ শ্লোকের 'পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য বংশে' সামন্তসেনের জন্ম এবং দেওপাড়া-লিপির চতুর্থ শ্লোকের শেষাংশেও পরাশরপুত্র (ব্যাসদেব) কর্তৃক বর্ণিত বংশ ইত্যাদিরূপ বর্ণনা দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায়, দেওপাড়া-লিপির 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুল-শিরোদাম' এবং মাধাই-নগর লিপির 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বিশেষণের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

সেনরাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় শাসনলিপির মধ্যে বিজয়-সেন কর্তৃক প্রদত্ত দেওপাড়া-শিলালিপিতে কেবলমাত্র সামন্তসেনকে এবং লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রদত্ত মাধাইনগর-শাসনলিপিতে কেবলমাত্র লক্ষ্মণসেনকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অথচ পূর্ব্বোক্ত লিপি দুইখানিতে এবং সেনরাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য শাসন-লিপিতে তাঁহাদিগের কথিত আদিপুরুষ মহাভারত-প্রসিদ্ধ বীরসেন হইতে আরম্ভ করিয়া হেমন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং তৎপরবর্তী কালে কেশবসেন, বিশ্বরূপসেন প্রভৃতির শৌর্য্য ও অন্যান্য অশেষ গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও কুত্রাপি তাঁহাদিগের কাহাকেও 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই,—সর্বত্রই 'চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং সামন্তসেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রকৃতিগত কোনও বৈশিষ্ট্যের জন্যই যে এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই বৈশিষ্ট্য যে কি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রাচীন কালের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রের রচয়িতাগণ পর্য্যন্ত ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দলালিত্য প্রভৃতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াও কোন কোন স্থলে এমন একটি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহার দ্বারা কোনও কোনও শ্লোক বা শ্লোকাংশের বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এইরূপ রচনাই তৎকালে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল। আলোচ্য শাসনলিপি সমূহে দ্ব্যর্থপ্রকাশক রচনার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পাল-সম্রাটগণের

আশ্রিত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত 'রামচরিতম্' এইরূপ রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দেওপাড়া-শিলালিপির রচয়িতা উমাপতি ধরও এক জন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত উক্ত প্রশস্তির ৩৫শ শ্লোকে তিনি নিম্নলিখিতরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন :—

"নির্ম্মিক্ত সেনকুলভূপতি—মৌক্তিকানা-
মগ্রস্থিতপ্রথনপক্ষলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধ-
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতি প্রশস্তিঃ।"

কিন্তু পদ-পদার্থ বিচারশুদ্ধ বুদ্ধি উমাপতি ধর, সুনির্ম্মল মুক্তাস্বরূপ সেনরাজকুলের দ্বারা অগ্রথিত সুকোমল মাল্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেও, তিনি চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজপুতক্ষত্রিয় সামন্তসেনকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম' বলিয়া যে গ্রন্থি রচনা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

যাহা হউক, কবিশিরোমণি জয়দেব গোস্বামীও তৎপ্রণীত 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের চতুর্থ শ্লোকের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ"। টীকাকার বলিতেছেন, "উমাপতিধরঃ (তন্নাম্না কবিঃ) বাচঃ (বাক্যানি) পল্লবয়তি (বিস্তারয়তি, সন্দর্ভে বাগাড়ম্বরং প্রদর্শয়তীত্যর্থঃ)।" সুতরাং স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে, কবি উমাপতি ধর যে প্রশস্তির ৫ম শ্লোকে সামন্তসেনকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়াছেন, সেই প্রশস্তিরই ১৬শ শ্লোকে তাঁহার পৌত্র বিজয়সেনকে "চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়" বলিবেন, তাঁহাকে এত বড় ভ্রান্ত মনে করিবার কারণ নাই। টীকাকারের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, ইহা তাঁহার শব্দাড়ম্বর মাত্র। পরন্তু, সামন্তসেনকে কবি কর্ত্তৃক 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করিবার আর কি কারণ থাকিতে পারে, তাহাও নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সামন্তসেনের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' আখ্যার সহিত 'ব্রহ্মবাদী' বিশেষণটি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, সামন্তসেনের ধর্ম্মপ্রাণতার জন্যই তাঁহাকে 'ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া অভিনন্দন করা হইয়াছে। যেমন, মহারাজ জনক ক্ষত্রিয় হইয়াও 'রাজর্ষি' নামে পরিচিত ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তপস্যাপ্রভাবে 'মহর্ষি'পদ লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, উক্ত দেওপাড়া-লিপিরই ৯ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাতীরস্থ ঋষিগণের তপোবন সমূহে, যেখানে সুবিখ্যাত মহর্ষিগণ পুনর্জ্জন্ম-ভীতির সহিত যুদ্ধ করিতেন, যাহা যজ্ঞধূমে আমোদিত থাকিত, যেখানে মৃগশিশুগণ করুণহৃদয়া ঋষিপত্নীগণের স্তন্যপান করিয়া তৃপ্ত হইত, যেখানে অগণিত শুক-পক্ষিগণের সমুদায় বেদ কণ্ঠস্থ ছিল, সামন্তসেন শেষ বয়সে সেই সকল আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা :—

"উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরসিতস্বিন্নবৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিত-ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেন সেব্যন্তশেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি। ৯।"

অর্থাৎ সামন্তসেন শেষ বয়সে, একরূপ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করতঃ ঋষিপদবাচ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, কবি তাঁহাকে 'ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

তৎপরে, মাধাইনগর-তাম্রশাসনলিপির রচয়িতা কবি উমাপতি ধরের অনুসরণ করিয়া লক্ষ্মণসেনকেও 'সোমবংশপ্রদীপ,' 'পরমদীক্ষিত পরমব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ স্থলেও 'পরমদীক্ষিত' ও 'পরমব্রহ্মক্ষত্রিয়' বিশেষণ দ্বারা লক্ষ্মণসেনকেও একান্ত ভাবে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহারাজ বিজয়সেন ও বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাসনলিপি সমূহে—'নমঃ শিবায়' বলিয়া প্রশস্তির আরম্ভ করা হইয়াছে; পরন্তু লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত চারিখানি লিপিরই প্রারম্ভে 'নমো নারায়ণায়' লিখিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করা যাইতেছে যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া (সম্ভবতঃ তাঁহার অন্যতম সভাসদ্ বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি জয়দেব গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া) ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। এ স্থলে তাঁহাকে 'পরম নারসিংহ' অর্থাৎ শ্রীশ্রীনৃসিংহ দেবের উপাসকও বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ, তাঁহার 'সোমবংশ-প্রদীপ' বিশেষণটি দ্বারা তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ দূরীভূত হইতেছে।

উপসংহারকালে, আরও একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত উমাপতি ধরই প্রথমে ক্ষত্রিয় সামন্তসেনকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলেন নাই। মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ নাভির তপস্যায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন,—'যস্য হ পাণ্ডবেয়! শ্লোকাবুদাহরন্তি—কো নু তৎকর্ম্ম রাজর্ষের্নাভেরন্বাচরেৎ পুমান্। অপত্যতামগাৎ যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্ম্মণা। ৬। ব্রহ্মণ্যোঽন্যঃ কুতো নাভের্বিপ্রা মঙ্গলপূজিতাঃ। যস্য বর্হিষি যজ্ঞেশং দর্শয়ামাসু-রোজসা। ৭। রাজর্ষি নাভির সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম করিতে আর কোন্ পুরুষ সমর্থ? তাঁহার পবিত্র কর্ম্মহেতু ভগবান্ হরি স্বয়ং পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই নাভি ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ্য বা ব্রহ্মবলশালী কে আছে? তাঁহার যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইয়া, মন্ত্রবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে দেখাইয়া দিলেন।

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১১

এ স্কুলে আসিয়া আর একটা ভূপেনের যে বড় লাভ হইল সে ঐ ছাত্র দুইটি—পদন্ ও সালেক।

সমস্ত স্কুলে, অন্ততঃ ভূপেন যতটা পড়াইত—তার মধ্যে, এই দু'টি ছেলেই শুধু তাহাকে সন্ধ্যার কথাটা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিত। হয়ত ঠিক অতটা শ্রদ্ধা ছিল না লেখাপড়ার উপর—কিন্তু আগ্রহ ছিল। তাছাড়া পড়া বুঝাইতে গিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস অংশ পড়াইবার সময় যখন অন্য সমস্ত ছাত্রের চোখই স্তিমিত বা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত, তখন মাত্র এই চারিটি চোখেই সে মনোযোগের আলো দেখিতে পাইত। তাহার অধ্যাপনার নূতন পদ্ধতির সহিতও এই দুইটি ছাত্রই প্রথম তাল রাখিয়া চলিতে শুরু করে। ইহাদের মধ্যে পদনের মাথাটা ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা কিন্তু তাহার আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল খুব বেশী, সে জন্য বুদ্ধির সামান্য অভাবটুকু সে অধ্যবসায়ের দ্বারা পুরাইয়া লইত। সালেকের স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল না বলিয়া পদনের সমান পরিশ্রম সে করিতে পারিত না বটে কিন্তু তাহার প্রয়োজনও হইত না, পড়াটা সহজেই তাহার মাথায় ঢুকিত। ফলে, পরীক্ষার সময় দুই জনেই কাছাকাছি থাকিত, এক জন অপরকে ফেলিয়া বেশী দূর যাইতে পারিত না।

গুরুরও যেমন ছাত্রকে চিনিয়া লইতে দেরি হয় না, ছাত্ররাও তেমনি সহজে গুরুকে চিনিতে পারে। এই ছেলে দুইটিও কয়েক দিনের মধ্যেই ভূপেনের অনুরক্ত হইয়া উঠিল। স্কুলে ফুটবল বা ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা ছিল না, বাহির হইতে যে সব ছেলেরা পড়িতে আসিত, ছুটির পর হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেই তাহাদের ব্যায়ামের কাজ সারা হইত; হোষ্টেলের ছেলেরা দুই-এক জন স্কুল হইতে ফিরিয়া ঘরেই বসিয়া থাকিত কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া গ্রাম্য-খেলায় অপরাহ্ণটা কাটাইত। পদন ছিল এই দলে কিন্তু সালেক ইহাদের সঙ্গে তেমন মিশিতে পারিত না, সে কোন দিন হয়ত নিজে নিজেই ঘুরিয়া বেড়াইত, কোন কোন দিন ইহাদের খেলার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিত। ভূপেন এখানে কয় দিন থাকিবার পর অন্যান্য মাষ্টার মহাশয়দের সংসর্গে যখন প্রায় হাঁফাইয়া উঠিল, তখন নিজেই যাচিয়া এই ছেলে দুইটিকে সঙ্গী করিয়া লইল। সকালে সে ইচ্ছা করিয়াই বিনা পারিশ্রমিকে এই ছেলে দুইটিকে পড়াইতে বসিত, কোন দিন বা নিজেদের হোষ্টেলের রোয়াকে, কোন দিন বা সালেকদের হোষ্টেলের দাওয়ায়। এখানে গোলমাল বেশী, সালেকদের ওখানে পড়ানোর দিক দিয়া অনেক সুবিধা, তবু ভূপেন ঠিক ভরসা করিয়া সব দিন ওখানে যাইতে পারিত না—কারণ সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, ভবদেব বাবু বা অন্য মাষ্টার মহাশয়রা কেহই ঠিক মুসলমান হোষ্টেলের ছোঁয়াচটা পছন্দ করেন না। তবে এক এক দিন যখন এখানকার গোলমাল অসহ্য হইয়া উঠিত তখন প্রায় মরিয়া হইয়াই সে সালেকদের দাওয়ায় গিয়া বসিত।

সকালে চলিত স্কুলের পড়া—পরীক্ষার প্রস্তুতি, আর বিকালে শুরু হইত সখের পড়া। ভূপেন ছাত্র দুইটিকে লইয়া জলযোগের পর বাহির হইয়া পড়িত মাঠে—ধূলি-ধূসর পায়ে হাঁটা-পথ ছাড়িয়া [illegible] ডাঙায়, কোন [illegible] দিয়া [illegible] আর একটি [illegible] জলের রেখা, [illegible] কোন দৃশ্যই নাই, [illegible] তবু ভূপেনের মন [illegible] জন[illegible]ন দেশে থাকিতে থাকি[illegible] সামান্য জলরেখাটির জন্যই তৃষিত [illegible]—তাই মধ্যে মধ্যে এখানে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু তবু এ বেড়ানোর মধ্যে ভ্রমণ বা ব্যায়ামটা বড় কথা নয়—[illegible]টাই আসল। সে এই সময়ে স্কুলের পড়া বাদ দিয়া যতটা সম্ভব মুখে মুখে বাহিরের জগতের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিত। দেশ-বিদেশের কথা, নানা জাতির ইতিহাস, ভাল ভাল বইয়ের গল্প, জননায়ক ও সাহিত্যিকদের জীবনী, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী—অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের সব বিভাগই তাহাদের গল্পের মধ্যে আলোচিত হইত। প্রথম প্রথম এ সমস্ত কথা উহারা অবাক হইয়া শুনিত শুধু, প্রশ্ন করিতে পারিত না। তাহাদের ইস্কুল, এই কয়টি পরিচিত গ্রাম এবং লোক-মুখে-শোনা কলিকাতা শহরের বাহিরে যে একটা বিরাট জগৎ পড়িয়া আছে, এ যেন তাহাদের কাছে বিশ্বাস করাই কঠিন। ক্রমে একটু একটু করিয়া বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিলে তাহারা সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে শুরু করিল, তাহাদের কৌতূহল ভরসা পাইয়া নূতন জগতে প্রবেশের পথ খুঁজিতে লাগিল।

ভূপেনও তাহাদের কাছে আশানুরূপ সাড়া পাইয়া উৎসাহ বোধ করিল। সে একটু একটু করিয়া এই ছেলে দুইটির কাছে তাহার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিতে লাগিল। এ যেন এক নূতন নেশা—সন্ধ্যার যোগ্যতা তাহাদের নাই সত্য কথা, তাহাকে এই সব গল্প বলিয়া যে আরাম পাওয়া যাইত তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব নয় তবু তাহার নিজের শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার এ একটা পথ ত বটে। ক্রমে তাহাদের এই বেড়াইবার সময় দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল, ফিরিতে রোজই প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষেরই আপত্তি থাকিত না। হাঁটা এবং বকা এই ডবল পরিশ্রমে ভূপেনের অন্ততঃ ক্লান্তি বোধ করিবার কথা কিন্তু সে-যেন ঘুরিয়া আসিবার পর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সুস্থই মনে করিত। সে যে শিক্ষকতা করিতেছে না—সামান্য কয়েকটা টাকা বেতনে দাসত্ব করিতেছে, এই কথাটা সে এই সময়েই কতকটা ভুলিয়া থাকিতে পারিত।

কিন্তু মাষ্টার মহাশয়রা তাহার এতটা বাড়াবাড়িকে মোটেই প্রীতির চোখে দেখিতেন না। যতীন বাবু প্রত্যহই রাত্রে অনুযোগ করিতেন, কী ক'রে যে মশাই ঐ দুটো পাড়াগেঁয়ে ভূতের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান তা বুঝি না। আমার ত এদের সঙ্গে কথা কইতে ঘেন্না করে।

কোন দিন বা বলিতেন, আর বকেনই বা কী ক'রে অত মশাই ?···ইস্কুলে বকতে হয় নিতান্ত পেটের দায়ে। মাইনে নিচ্ছি ঐ জন্য, না বকলে চলে না তাই—তার পরও আবার ঐ আহাম্মক ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে বকতে ইচ্ছে করে আপনার ? আশ্চর্য্য !

অপূর্ব্ব বাবুও এক দিন টিফিনের সময় কথাটা পাড়িলেন,

বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়ে ঐ ছেলে দুটোর সঙ্গে রোজ সকালে বিকেলে অতক্ষণ কাটান কি ক'রে মশাই? বিরক্ত বোধ হয় না?

ভূপেন এক কোণে বসিয়া কী একটা বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেছিল, (বইটা কয় দিন আগে ভবদেব বাবু দিয়াছেন, রোজই তাগাদা করেন পড়া হইয়াছে কি না) জবাব দিল, বিরক্ত বোধ করলে আর ও কাজ করব কেন বলুন। আমার ভালই লাগে।

রাধাকমল বাবু টিপ্পনি কাটিলেন, আসলে আমাদের সঙ্গ ওঁর ভাল লাগে না—আমাদের সঙ্গে গল্প করার চেয়ে ওদের সঙ্গে বক্-বক্ করাও ঢের ভাল, বুঝলেন না?

ভূপেন মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইল। কণ্ঠস্বরে নিরাসক্তি আনিয়া উত্তর দিল, তা কথাটা এক রকম মন্দ বলেননি পণ্ডিত মশাই। হাজার হোক ওরা ছেলে মানুষ, আমাদের মত কুটিলতা বা সাংসারিক জ্ঞান ত ওদের মধ্যে এখনও ঢোকেনি। ওদের সঙ্গে গল্প ক'রে এখনও আনন্দ পাওয়া যায়।

যতীন বাবু ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনি কি বলতে চান আমরা সবাই কুটিল?

শান্তকণ্ঠে ভূপেন জবাব দিল, শুধু আপনারা নন, আমরা সবাই কি অল্পবিস্তর সোফেষ্টিকেটেড হতে বাধ্য হইনি, সংসারের ঘূর্ণিতে পড়ে?

যতীন বাবু তাহার কথাটার ঠিক জবাব না দিয়া বলিলেন, যতই সরল হোক মশাই, ঐ পাড়াগেঁয়ে ভূত দুটোর সঙ্গে দিন-রাত বকার কথা আমি অন্ততঃ ভাবতেই পারতুম না।

ভূপেন বইটাতেই চোখ রাখিয়া কহিল, আমাদের শহরে বাড়ী, মুখ-বদল হিসেবে পাড়াগাঁয়ের লোক ভালই লাগে। তা ছাড়া আপনারা এসেছেন চাকরী করতে, আমি এসেছি পড়াতে, পড়ানোই আমার সখ। ভাল ছেলে পেলে আমার খুশী হবারই কথা।···চাকরী করার দরকার হ'লে আমি এত দিন কলকাতার অফিসে পাকা হয়ে যেতে পারতুম।

অপূর্ব্ব বাবু মুখটা বিকৃত করিয়া কহিলেন, সখ ক'রে আবার কেউ পড়াতে আসে, আশ্চর্য্য!

সে দিনের মত কথাটা সেখানেই চাপা পড়িয়া গেল, যদিচ আপোস-আলোচনায় এইটাই সাব্যস্ত হইল যে, নিরতিশয় দম্ভ-হেতু ভূপেন ইচ্ছা করিয়াই মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গ এড়াইয়া চলে, আর সেই জন্যই ঐ ছোঁড়া দুইটাকে লইয়া সময় কাটায়।

কিন্তু প্রসঙ্গটার ঐখানেই শেষ হইল না। স্বয়ং ভবদেব বাবু এক দিন তাহাকে ডাকিয়া কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, ভূপেন বাবু, ওদের নিয়ে অত রাত অবধি কোথায় বেড়ান?···সাপখোপের দেশ মশাই, অত রাত না করাই ভাল।

ভূপেন সবিনয়ে কহিল, তা অবশ্য বটে, তবে শীতকাল, সাপের ভয় বিশেষ নেই শুনেছি।

নীরবে বার-দুই মালাটা ঘুরাইয়া লইয়া ভবদেব বাবু পুনশ্চ কহিলেন, তা ছাড়া, অপূর্ব্ব বাবু বলছিলেন যে, অত রাত ক'রে বেড়ায় বলে ছেলে দুটির না কি পড়ারও অসুবিধা হচ্ছে, ফিরে এসে হাত-পা ধুয়ে বই নিয়ে বসতে না বসতেই খাবার ঘণ্টা পড়ে—খেয়ে এসেই ঘুমোয়। পরীক্ষার সময় এগিয়ে এল, এখন একটু না পড়লে পেরে উঠবে না, বুঝলেন না?

ভূপেন অতিকষ্টে রাগ দমন করিয়া কহিল, সে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ত আমিই করেছি মাষ্টার মশাই, আমি নিজে ওদের রোজ পড়াই। বেড়াতে যে যাই, সে সময়টুকুও আমি অপব্যয় হ'তে দিইনে, মুখে মুখে পড়ানোই চলে। আমার ক্লাসগুলোর মধ্যে ঐ ছেলে দুটোর সম্বন্ধেই যা কিছু ভরসা রাখি—ওরা যদি তৈরি হয়ে ভবিষ্যতে ভাল রেজাল্ট্ করে তাহ'লে আপনারই সুনাম।

ভবদেব বাবু কহিলেন, তা ঠিক। তবে কি জানেন, আমি বুঝি ও-সব ঝামেলায় যাবার দরকার কি? যেটুকু না করলে নয় সেইটুকুই করা—সময় যদি সব নষ্টই করলুম ত নিজের কাজ কখন সারব বলুন।···একে ত সময় নেই—তার ওপর—। যাক্ আপনি যদি বোঝেন যে ওদের ক্ষতি হবে না, তাহলে অবশ্য অন্য কথা—জয় রাধে। জয় রাধে। রাসপঞ্চাধ্যায় পড়ছেন বেশ মন দিয়ে? ওটা শেষ হ'লে আর একটা বই দেব আপনাকে—

তার পর যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই কহিলেন, একটু সকাল ক'রে ফিরলে আপনার নিজের পড়াশুনোরও ত সুবিধা হয়।

ভূপেন কী একটা উত্তর দিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। বোধ করি এ বিষয় লইয়া যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করিতে তাহার ঘৃণা বোধই হইল। কেন যে ইহাদের এই অহেতুক আক্রমণ তাহা বোঝা না গেলেও তাহার বিরুদ্ধে যে বড় একটা দল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই তাহারা ফেরে, সেটা ভবদেব বাবু দালানে বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে প্রত্যহই দেখেন অথচ তিনি অপূর্ব্ব বাবুর কথায় প্রতিবাদ না করিয়া তাহাকেই সে অনুযোগ শুনাইতে বসিলেন। খাবার ঘণ্টা পড়ে ঠিক নটায়—অর্থাৎ সাড়ে সাতটায় ফিরিলেও দেড় ঘণ্টা সময় হাতে থাকার কথা এবং পদন অন্ততঃ যে সে দেড় ঘণ্টার অপব্যয় করে না তাহা সকলেই জানে। কিন্তু এ-সব কোন যুক্তি তাহার দিতে প্রবৃত্তি হইল না—সে নিঃশব্দে খানিকটা বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

তবে ইহার পর সে ইচ্ছা করিয়াই সালেকদের সহিত বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ করিল। ছুটির পর অধিকাংশ দিন সে বিজয় বাবুর সহিত তাঁহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আগাইয়া যাইত। কল্যাণীর সহিত বহু বিবাদ করিবার পর সে নিজের জন্যও দুগ্ধহীন চায়ের ব্যবস্থা পাকা করিয়া লইয়াছিল, মুড়ী ও সেই চা খাইয়া বিজয় বাবুর সহিত গল্প করিয়া, সে যখন ফিরিত তখন তাহার শুধু ভ্রমণের কাজটাই সারা হইত না—যথার্থ ভদ্র ও ভগবদ্ভক্ত লোকের সংসর্গ করার ফলে মনটাও সুস্থ বোধ হইত।

পদনদের সহিত বেড়ানো বন্ধ করিলেও আসল কাজটা সে ভোলে নাই। সন্ধ্যার পর হোষ্টেলে ফিরিয়া সে সকালের মতই পদনদের লইয়া আবার পড়াইতে বসিত, তবে এ সময়টা ইচ্ছা করিয়াই সামনে বই খুলিয়া রাখিয়া গল্প করিত—সাধারণ জ্ঞানের গল্প। পড়ার বইএর সঙ্গে সে সময় সম্পর্ক থাকিত খুব কম।··· অপূর্ব্ব বাবুর দল এটাকেও তাঁহাদের প্রতি ভূপেনের তাচ্ছিল্যের আর এক দফা নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইয়া মনে মনে বিষম চটিয়া গেলেন কিন্তু এ ব্যবস্থাটা বন্ধ করিবার আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনের হুড়াহুড়ি। এ ব্যাপারটার মধ্যে যে এতটা কদর্য্যতা আছে, তাহা ভূপেন আগে কল্পনাও করে নাই। মাষ্টার মহাশয়দের কথাবার্ত্তার মধ্যে এমনি একটা ইঙ্গিত সে মধ্যে মধ্যে পাইয়াছে বটে কিন্তু তখন এতটা বোঝা সম্ভব ছিল না। ছেলেবেলায় নিজে যখন ইস্কুলে পড়িত তখন এ-সব লক্ষ্য করিবার কথা নয়, বছরের শেষে একটা পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা পাওয়া যায় এবং কতকগুলি চক্‌চকে নূতন বই হাতে আসে—এইটুকুই শুধু জানিত। এখন যতই ব্যাপারটা দেখিতে লাগিল ততই ঘৃণায় মন রি-রি করিয়া উঠিল। • বিভিন্ন প্রকাশকদের প্রচারক বা ক্যান্‌ভাসারের দল পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা লইয়া দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, যে কাজে আসিয়াছে সেটাও ভদ্র ও সুচারু ভাবে সম্পন্ন করিবার দক্ষতা অনেকের নাই, লোভ ও স্বার্থপরতার যে মাত্রা ও সীমা আছে সে কথাটা ইহাদের অভিধানের বাহিরে। অবশ্য ইহাদের উপর রাগ বা ঘৃণা করা অন্যায়, সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র, বৎসরের শেষে এই কয়টা কাঁচা টাকার মুখ চাহিয়া থাকে সারা বছর, মাহিনা ও রাহাখরচের উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ চুরী) মিলিয়া বেশীর ভাগ ক্যান্‌ভাসারেরই পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশী থাকে না। এই সামান্য টাকার লোভে ভাল বা বুদ্ধিমান লোক যে কেহ আসে না তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই খাওয়া ও শোওয়ার কাজটা হোষ্টেলে হোষ্টেলে সারিয়া দৈনিক আট আনা দশ আনা বাঁচান। মাষ্টার মহাশয়রা এই অবাঞ্ছিত অতিথিদের ঠিক প্রীতির চোখে না দেখিলেও চক্ষুলজ্জা এড়াইতে পারেন না—আশ্রয় ও আহার দিতে বাধ্য হন।

আসেও এক-একটি অদ্ভুত জীব—কেহ কেহ একেবারে একবস্ত্রে বাহির হয়, মুটে ভাড়া দিবার ভয়ে বইয়ের ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই আনে না। এমন কি দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত না। কেহ বা বইয়ের সঙ্গেই একখানি ময়লা কাপড় ও তেলচিটে গামছা ঐ অদ্বিতীয় স্যুটকেসে ভরিয়া লইয়া আসে। একটি ক্যান্‌ভাসার ঢাকা হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে তিন সপ্তাহ পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—তাহার সহিত আলাপ করিয়া ভূপেন, জানিল, সে তিন সপ্তাহের মধ্যে কাপড়-জামা ত ছাড়েই নাই—স্নানও করে নাই। ম্যালেরিয়ার ভয়ে জল গায়েও ঢালে না, পেটেও না। 'স্রেফ চা খেয়ে আছি মশাই, এই একুশ দিন!' বলিয়া সে সগর্ব্বে ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ফলে সাদা জিনের কোট এবং কালো মাথার চুল দুই-ই বীরভূমের লাল ধূলির রং-এ সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছে।

কিন্তু শুধু যদি এই সব ক্যানভাসারের দল নিজেদের বই-এর জন্য আসিয়া ধরপাকড় করিত বা হেড-মাষ্টার মহাশয়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা করিত ত ভূপেনের অতটা অসহ্য বোধ হইত না। স্কুলের কমিটি-মেম্বাররা প্রায় সকলেই থাকেন কলিকাতাতে। গ্রামের যে-সব ভদ্রলোকেরা লেখপড়া শিখিয়া কলকাতাতে ওকালতী, ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারীং ব্যবসা করেন—অন্ততঃপক্ষে অধ্যাপনা বা সরকারী চাকুরী—তাঁহাদেরই, অনেক সময়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, ধরিয়া স্কুল-কমিটির মেম্বার করা হয়। সারা বছরে তাঁহাদের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা প্রায় সকলেই বিভিন্ন প্রকাশক ও পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের অনুরোধে কতন হেডমাষ্টার ও সেক্রেটারীর কাছে এক-দুই কিম্বা ততোধিক বই-এর [illegible] সুপারিশ করিয়া দীর্ঘ চিঠি লেখেন। শুধু তাই নয়, যে সময়ে মেম্বারদের খুব জরুরী কমিটি-মিটিং-এ যোগ দিবারও সময় হয় না, তাঁহারা, হয়ত-বা পরিচিত প্রকাশকদের অর্থেই, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের সভাটিতে হাজির হন—এবং অনেক সময়ে ঝগড়া-বিবাদ করিয়াও নিজেদের জিদ্ বজায় রাখেন। আগে হেডমাষ্টার ও শিক্ষক মহাশয়দের উপরই এ-ভার সম্পূর্ণ ছিল; কিন্তু তাঁহারা না কি এই সব ক্যান্‌ভাসারদের অনুরোধে অনেক সময়ে ভাল বই-এর উপর ঠিক সুবিচার না করিয়া 'খাতিরে'রই প্রাধান্য দেন—সেই জন্য, সেই অনাচার বাঁচাইবার জন্যই মেম্বাররা স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারাই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের ও হেডমাষ্টার মহাশয়দের সাহায্য লইয়া পাঠ্যপুস্তকের সর্ব্বশেষ নির্ব্বাচন করিবেন। ফলে, যাঁহারা সারা বছর ধরিয়া ছেলেদের পড়ান, তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা কিছুমাত্র বিবেচিত না হইয়া পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত হয়। হয় ত বা উকীলের অনুরোধে স্বাস্থ্য, ডাক্তারের অনুরোধে ইতিহাস, এবং ইঞ্জিনিয়ারের অনুরোধে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত বই নির্ব্বাচিত হয়। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন (ভূপেনের কাছে কথাটা স্পর্দ্ধা বলিয়াই মনে হইল) যে, বইগুলি তাঁহারা আদ্যোপান্ত পড়িয়াই সুপারিশ করিতেছেন!

তবু ভূপেনের অনেক শিক্ষা বাকী ছিল। এক দিন কথাটা উঠিতে পণ্ডিত মহাশয় বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, এদের শুধু দোষ দিলে চলবে কেন ভায়া। মাষ্টার মশাইদের হাতে ভার থাকলেই কি আর ভাল বই বেছে বই ধরানো হ'ত মনে করো? আমার শালা কলকাতার এক মস্ত ইস্কুলে হেডপণ্ডিতি করে, সেখানে কমিটির অত জুলুম চলে না, মাষ্টার মশাইদের, বিশেষ করে হেডমাষ্টারের খুব হাত আছে কিন্তু সেখানেও কী হয় জানো? হেডমাষ্টার, জয়েণ্ট হেডমাষ্টার সকলেরই দু'-একখানা ক'রে পাঠ্য-পুস্তক আছে, তাঁরা সেইগুলো নিয়ে বদ্‌লা-বদ্‌লি করেন। মানে, ধরো আমার আছে ক্লাস থ্রি একখানা বাংলা বই, তোমার আছে ফাইভ-সিক্সের ইতিহাস, আমি তোমার বইটা ধরাবো যদি তুমি আমার বইটা ধরাও। বুঝলে ব্যাপারটা? এর ওপরই বই ধরানো হয় সেখানে, ভাল-মন্দ কিছু বিচার করা হয় না!

যত শোনে ভূপেনের মন তত হতাশায় ভরিয়া আসে। শিক্ষাদানের এই পুণ্য-ক্ষেত্রে হয়ত আরও কত অনাচার চলে—যা সে এখনও শোনে নাই। কিন্তু এখনই যে তার প্রায় দম বন্ধ হইয়া আসিল। কেমন করিয়া সে এখানে টিকিয়া থাকিবে। মনে পড়ে সন্ধ্যা আর মোহিত বাবুর কথা—হায় রে! শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য লইয়া কত বড় বড় কথাই তাঁহারা আলোচনা করেন—কোথায় তাহার ভিত্তি যদি জানিতেন!...

এক দিন, তখন প্রায় স্কুল বন্ধের সময় হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার এক নাম-করা অর্থপুস্তক-ব্যবসায়ীর লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভাঙ্গা-হাট, ইস্কুলের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, যেটুকু কাজ বাকী আছে সেটুকু অফিস ঘরেই চলে—মাষ্টার মহাশয়দের হাজিরা দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোন দায়িত্ব নাই। ভূপেন সকাল করিয়া হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়াছে—বাড়ীতে একটা চিঠি লেখা দরকার, সেটা সারিয়া একেবারে বাহির হইবে

এই ইচ্ছা। বিজয় বাবুর বাড়ী সেদিন সন্ধ্যার অনেক আগেই যাওয়ার কথা, কল্যাণী কী সব পিঠা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার বিশেষ নিমন্ত্রণ। কয়েক দিন আগে একটা ইংরাজী বইয়ের গল্প সে কল্যাণী ও তাহার ভাইদের বলিতে শুরু করিয়াছিল সেটা শেষ হয় নাই বলিয়া বিজয় বাবুর বড় ছেলেটির কড়া তাগাদা আছে, সেটার জন্যও খানিকটা সময় লাগিবে। এধারে তিনটার মধ্যে চিঠি ডাকে না দিলে আজ যাইবে না—সবটা জড়াইয়া তাহার তাড়াই ছিল। সুতরাং সহসা যতীন বাবুর সঙ্গে একটি অপরিচিত 'ক্যান্‌ভাসার'-মার্কা ভদ্রলোককে ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিরক্তিতে তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তবু সে কোন প্রশ্ন না করিয়া শুধু যতীন বাবুকে বলিল, আসুন।

যতীন বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন। কহিলেন, এই ইনি ভাই একটু আপনার কাছেই এসেছেন।

আমার কাছে? কেন বলুন ত?—বিস্মিত ভূপেন প্রশ্ন করিল।

সে ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া বিনা নিমন্ত্রণেই ভূপেনের বিছানায় বসিলেন, তাহার পর ব্যাগটা খুলিয়া মোটা মোটা খান্‌ দুই অভিধান বাহির করিয়া কহিলেন, আমাদের মালিক এইগুলো আপনাকে পাঠিয়েছেন।

আরও বিস্মিত হইয়া ভূপেন প্রশ্ন করিল, আমাকে?···আপনি কোত্থেকে আসছেন বলুন ত?

সে ভদ্রলোক তাঁহার ফার্ম্মের নাম করিলেন। ভূপেন কহিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত আমার পরিচয় নেই, তিনি শুধু শুধু আমাকে উপহার পাঠাবেন কেন? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে—

ক্যান্‌ভাসারটি ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, আপনাকে, মানে আপনার নাম কি আর তিনি জানেন। তবে—মানে ঐ ক্লাস এইট-নাইনে আপনিই ত ইংরেজী পড়ান?

এবার ভূপেন একটু অসহিষ্ণু ভাবেই কহিল, ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি, আমাকে কি করতে হবে?

না, না, করতে কিছুই হবে না—তবে এই ছেলেদের যদি দরকার হয়, মানে—মানের বই বা অভিধান ওদের দরকার ত হয়ই—সেই সময় যদি আমাদের কথাটা একটু বলে দেন। বই আমাদের খুবই ভাল, সে স্যার আপনি ত উল্টে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আপনাকে আর কি বলব—মানে—

ভূপেন বাধা দিয়া কহিল, মানে ঘুষ, এই ত?

ছি ছি, এ কী বলছেন স্যার। ঘুষ নয়, তবে—যদি দরকার হয় বুঝলেন না, বইটা দেখা না থাকলে ত আর আপনি বলতে পারবেন না—

ভূপেন কহিল, মানের বইএর চলন ইস্কুল থেকে ওঠাব, এই আমার সাধনা। আর অভিধানের কথা, সে যদি ছেলেরা আমাকে কখনও প্রশ্ন করে, লাইব্রেরীতে সব অভিধানই আছে, দেখে যেটা ভাল মনে হয় সেইটার কথাই বলে দেব। সুতরাং আপনার ও অভিধান কোনই দরকারে লাগবে না। আপনি ও নিয়ে যান—

ভদ্রলোক যেন বিষম অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, না স্যার, আপনার নাম করে নিয়ে এসেছি যখন তখন ও অনুরোধ আর করবেন না। রেখে দিন বাড়ীর ছেলেপুলেদের ত কাজে লাগবে, না হয় আমাদেরটা রেকমেণ্ড নাই করলেন।

ছেলেপুলেদের দরকার লাগলে আমি কিনে দিতে পারব। শুধু শুধু অপরিচিত লোকের দান নেওয়া আমি পছন্দ করি না, ও আপনি নিয়ে যান—

যতীন বাবু অনেক আশা করিয়া ভদ্রলোককে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, ভূপেনের দুইখানা অভিধানের একখানিতে ভাগ বসানো ত যাইবেই, চাই কি উহার কাছ হইতেও ভাইপোর নাম করিয়া একটা বাগানো যাইতে পারে। এখন সব যায় দেখিয়া তিনি ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া একবার চোখ টিপিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, রেখে দাও না ভায়া, ভদ্রলোক তোমার নাম করে বার করলেন বই দুটো, ফিরিয়ে দিলে অপমান বোধ করবেন হয়ত।

ভূপেন ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে কহিল, কিন্তু নিলে আমি নিজে ঢের বেশী অপমানিত বোধ করব যে! দোহাই আপনার যতীন বাবু, এ-সব ব্যাপার আপনাদের ভাল লাগে, আপনারাই নিয়ে থাকবেন, এ ঝামেলা আর আমার কাছে টেনে আনবেন না। আপনি কিছু মনে করবেন না, মোদ্দা আপনার ঘুষ আমি নিতে পারব না। আপনি ও নিয়ে যান—

ভদ্রলোক আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভূপেন বাধা দিয়া কহিল, আপনি যতই বোঝাবার চেষ্টা করুন যে ওটা ঘুষ নয় কিছুতেই পেরে উঠবেন না। তাছাড়া আপনি নিজেও বেশ জানেন যে ওটা ঘুষই। আপনি যদি ওগুলো জোর করে রেখে যান তাহলে যদি বা এমনি কোন দিন ভাল-মন্দ বিচারে আপনাদের বই রেকমেণ্ড করবার সম্ভাবনা থাকত, এখন আর থাকবে না। আমি আপনাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাব—

এ কথার পরে আর তিনি বই রাখিয়া যাইতে সাহস পাইলেন না—পুনশ্চ ব্যাগে পুরিয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় শুষ্ক হাসি হাসিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, তাহলে আসি স্যার—একটু দেখবেন গরীবদের—আসুন যতীন বাবু।

যতীন বাবু ক্ষোভ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া চাপা-গলায় বলিয়া ফেলিলেন, মাইনে ত পান তেতাল্লিশ টাকা, অত তেজ কিসের বুঝি না। পৈত্রিক বোধ হয় কিছু আছে। দুটো বই মিলিয়ে বারো টাকা দাম, অনায়াসে আটটা টাকায় বেচা যেত। আরে আমাদের ত আর উপরি কিছু নেই,—ঐগুলোই উপরি। যত সব আহাম্মক।

তিনি মুখ কালি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ভূপেনেরও আর চিঠি লেখা হইল না, যেটুকু লেখা হইয়াছিল প্যাডের মধ্যে চাপা দিয়া রাখিয়া সে কোনও মতে জামাটা গায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যতীন বাবুর শেষ কথাটায় আর একটা কথাও তাহার মনে পড়িয়া গেল। নমুনা-কপি পাঠ্যপুস্তকে অফিস-ঘর ভরিয়া গিয়াছে। এতগুলি বই কি হইবে প্রশ্ন করায় অপূর্ব্ব বাবু বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কেন বিক্রী হবে। দেখুন না দুদিন পরেই পুরোনো বইওলারা আসতে শুরু করবে। যা দাম তার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

ভূপেন অবাক্ হইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু এতে ত' প্রকাশকদের ক্ষতি। তার চেয়ে বই না রাখলেই হয়।

'অত সাধু হলে চলে না ভায়া, ঐটেই আমাদের উপরি।' অপূর্ব্ব বাবু জবাব দিয়াছিলেন। সেই কথাটাও এখন মনে পড়িয়া [illegible] ভূপেনের ভিতরটা কেমন যেন রিম্-রিম্ করিয়া

উঠিল। সে যেন এই অস্বস্তিকর চিন্তাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্যই গতিটা আরও বাড়াইয়া দিল। বিজয় বাবু ও কল্যাণীর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। একজোড়া স্নেহকোমল চক্ষুর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাহার পথ চাহিয়া আছে—সেখানে দারিদ্র্য থাকিতে পারে, নীচতা নাই—আতিথ্য সেখানে আড়ম্বরহীন কিন্তু আন্তরিক। সেই স্নিগ্ধ মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে পৌঁছিতে না পারা পর্য্যন্ত যেন শান্তি নাই।

১২

বড়দিনের ছুটিতে ভূপেন বাড়ী যাইবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিল কিন্তু বিশ-একুশ তারিখ নাগাদ হোষ্টেল একেবারে ফাঁকা হইয়া আসিলে সে একটু দ্বিধায় পড়িল। তবু হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সে থাকিয়াই যাইত যদি না সহসা, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে শান্তির চিঠির সহিত মোহিত বাবুর একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইত।

ভূপেন এখানে আসিবার আগে বাড়ীর লোকদের প্রত্যেককে সাবধান করিয়া দিয়া আসিয়াছিল যে তাহার ঠিকানা যেন কাহাকেও দেওয়া না হয়। সন্ধ্যারা তাহার ঠিকানা খোঁজ করিয়া তাহাকে চিঠি দিবার চেষ্টা করিবে তাহা সে জানিত, কিন্তু সেইটাতেই ছিল তাহার আপত্তি। কালের ব্যবধানে এক দিন হয়ত সে তাহার বেদনা, তাহার আশাভঙ্গের গ্লানি ভুলিয়া যাইতে পারিবে, বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে, কিন্তু সন্ধ্যাদের সহিত যোগাযোগ থাকিলে সে বিস্মৃতি আর সম্ভব নয়, তাহারা যখন ছাঁটিয়াই ফেলিয়াছে তাহাকে, তখন কী অধিকার আছে তাহাদের মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া শান্তিভঙ্গ করার? তাহারা ধনী, তাহাদের সহিত ভূপেনের জীবনের কোথাও সমতা নাই—কী প্রয়োজন মিছামিছি অকারণ নিষ্ফল সম্পর্ক রাখায়। তাহারা তাহাদের নিজ কক্ষপথে সুখে ঘুরিয়া বেড়াক—ভূপেনের মনে কোন ক্ষোভ, কোন ঈর্ষা নাই। উপগ্রহের অধিকার সে চায় না, সে মর্য্যাদাকে সে অপমান বলিয়াই মনে করে।

তাহার অনুমান যে মিথ্যা নয় তা সে ইতিমধ্যে শান্তির পত্রে কয়েক বারই জানিয়াছে। ও-বাড়ীর দারোয়ান বার বার তাহার ঠিকানা জানিতে আসিয়াছিল, বার বার তাহারা মিথ্যা বলিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। শেষ কালে বুঝি উপেন বাবু বলিয়াই দিয়াছিলেন, বাবুকে বলো, ছেলে কাউকে ঠিকানা দিতে বারণ করেছে।

তাহার পর আর কেহ খোঁজ করিতে আসে নাই। ভূপেন তার পর হইতে বাড়ীর প্রত্যেক চিঠিখানি খুলিবার সময়ই মনে করিয়াছিল যে, তবু হয়ত সন্ধ্যারা হাল ছাড়ে নাই, তবুও আবার লোক পাঠাইয়াছে কিন্তু আর কোন চিঠিতেই সে কথার উল্লেখ না পাইয়া নিশ্চিন্তও হইয়াছে যেমন—কোথায় যেন একটু ক্ষুণ্ণও হইয়াছে। মনে হইয়াছে যে, এই তাহাদের ভূপেনের সংবাদের জন্য আকুলতা! সন্ধ্যা ত নিজে আসিয়া জোর করিয়া ঠিকানা জানিয়া যাইতে পারিত। সে আসিলে কি আর কেহ 'না' বলিত! পরক্ষণেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছে, এ অবশ্য ভালই হইল, ও জের না রাখাই ভাল। সে যাহা চাহিয়াছিল তাহাই হইয়াছে, জীবনের দুটা স্রোত এতই দূরে যে, সে ব্যবধানে সেতু রচনা করিতে যাওয়াই মূর্খতা!

তাই, আজ এত দিন পরে হঠাৎ মোহিত বাবুর চিঠি পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু আগে খুলিল বোনের চিঠিই—। শান্তি এ-কথা সে-কথার পর একেবারে শেষের দিকে লিখিয়াছে সন্ধ্যার কথা।—হ্যাঁ, তোমার ছাত্রী সন্ধ্যা যে হঠাৎ সেদিন এসে হাজির হয়েছিল। ওদের দারোয়ান বার কতক তোমার ঠিকানা জেনে গেছে বটে, কিন্তু কর্ত্তা বা তোমার ছাত্রী এত দিন কেউ আসেনি। আমি ওকে কখনও দেখিনি, তুমিও কোন দিন ওর কোন বর্ণনা দাওনি, কিন্তু তবু সেদিন দেখেই চিনতে পারলুম। বেশ মেয়েটি, সত্যি! মুখখানি বড় মিষ্টি না? আহা, ওর অবস্থা বড় করুণ। কথাটা কিছু ভাঙ্গল না, কিন্তু ভাবে বুঝলুম যে তুমি কোন কারণে ওদের ওপর রাগ করেছ, আর সে দোষটা তাদেরই। তাই জোর করবার সাহস নেই, শুধু খবরটা কোন মতে পাবার জন্য সে কী ব্যাকুলতা! শেষে বলে কি জানো? বলে, 'ভাই, বড়দিনের ছুটিতে মাষ্টারমশাই আসবেন ত? আচ্ছা তিনি যদি আমার মুখ না দেখেন, যখন দুপুরবেলা ঘুমিয়ে থাকবেন চুপি চুপি এসে দেখে যাবো, কেমন? কত কাল দেখিনি ভাই, কেবলই মনে হয় এত দিনে কেমন দেখতে হয়েছেন কে জানে।' আহা বেচারী! একবার নিজেই বললে 'আমাকে কি আর এত কাল মনে আছে? কে জানে!' তার পরই আবার জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই মনে আছে। দেখো ভাই, তোমার দাদা কখনও আমাকে ভুলতে পারবেন না, আমি কি তাঁকে কম জ্বালাতন করেছি। অন্ততঃ সে জন্যও ত আমাকে মনে থাকবে কি বলো?' গলা জড়িয়ে ধরে আমার সঙ্গে কত গল্পই করলে, যেন কত কালের চেনা। অত ত বড়লোক, কিন্তু এতটুকু দেমাক্ নেই, না?···এসেছিল একখানা সাদা সাড়ী পরে—মা গো! সোমারস্তি গায়ে নেই। ওর দাদু কিনে দায় না, না ও পরে না?···তা তুমি এসে একবার ওর সঙ্গে দেখা ক'রো, কেমন? লক্ষ্মীটি!···আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ওরা যদি অত বড়লোক না হ'ত ত আমার বৌদি করতুম!···" ইত্যাদি।

বহু, বহু দিনের পর যেন আবার সেই পাষাণ-ভারটা বুকের মধ্যে অনুভব করিল ভূপেন। শুধু সে কষ্ট পাইয়াছে, সে আঘাত পাইয়াছে, বেদনা বোধ করিবার, নিজেকে অপমানিত বোধ করিবার কারণ একমাত্র তারই ঘটিয়াছে—এত দিন এইটাই ছিল তাহার বড় সান্ত্বনা—আজ এত দিন পরে সন্ধ্যার আকুলতার এই কাহিনী তাহার সেই সান্ত্বনা ও অভিমানের মূলে যেন বড় একটা আঘাত করিল। তাহা হইলে সন্ধ্যাই শুধু তাহার আত্মার সহিত জড়াইয়া যায় নাই, সন্ধ্যার মনে তাহারও একটা মূল্যবান আসন আছে।···আর তাহার অভাবে সেও কষ্ট পাইতেছে! মনে মনে শান্তির কথাটার প্রতিধ্বনি করিয়াই সে যেন বলিল, আহা বেচারী! আমার তবু এখানে কাজ-কর্ম্ম আছে, ছাত্ররা আছে, বিজয় বাবু আছেন, কিন্তু তার দিন কী করে কাটছে কে জানে! পড়াশুনো হয়ত বন্ধই হয়ে গেছে। অন্য মাষ্টার এলে কি আর আমার মত যত্ন নিয়ে পড়াবে? মনে ত হয় না।

অনেকক্ষণ পরে সে মোহিত বাবুর চিঠিটা খুলিল, তিনি বাড়ীর ঠিকানাতেই চিঠি দিয়াছেন, সেই চিঠি ঠিকানা বদলাইয়া আসিয়াছে এখানে। মোহিত বাবু লিখিয়াছেন—

কল্যাণীয়েষু—

বাবা ভূপেন, তোমার খবর জানি না, তবে শুনলুম যে, তুমি মাষ্টারী করছ কোথায় মফস্বলে। বাল্যোবস্থায়

পল্লীগ্রামের স্কুল, মাইনে কম এবং কাজ বেশী—তা ছাড়া ম্যালেরিয়ার ভয় ত আছেই। তুমি যে অভিমান করে এমন কাজ করবে তা ভাবিনি। এর জন্য নিজেকেই যেন সর্ব্বদা অপরাধী মনে করি। তুমি যে আমাকে বুঝতে পারোনি এবং ক্ষমা করোনি এ তারই প্রমাণ। যাক্—তবু আমি অভিযোগ করব না। কারণ অন্যায় আমারই হয়ত। সন্ধ্যা নিজেই পড়াশুনো করে, কী করে তা আমি জানি না, কারণ আমার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে হঠাৎ—আমি আর কিছুই দেখতে পারি না। অন্য মাষ্টার রাখতে চেয়েছিলুম সে রাজী হয়নি—সাধারণ প্রাইভেট টিউটর তার পছন্দ হবে না জানি বলেই আমিও জোর করিনি। ও একটু মন-মরা হয়েই থাকে বুঝতে পারি, তার ফলে এ ক'মাসে একটু যেন রোগাও হয়ে গেছে, কিন্তু আমি নিরুপায়। ভাল করলুম কি মন্দ করলুম এ কথাটা যেন ভেবে দেখবারও সাহস নেই—কেন না যদি বিবেক বলে যে মন্দই করলুম, তখন হয়ত কর্ত্তার মৃত্যুশয্যায় করা শপথ আমাকে ভাঙ্গতে হবে। যা করেছি তার মুখ চেয়েই করেছি, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। যাক্—তোমার কাছে আমার একটি অনুনয় আছে, রাখবে বলেই আশা করি—বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসে একবার অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করবে—জরুরী দরকার আছে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি, আর সময় নেই।···তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি—

সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে, সে মন-মরা হইয়া থাকে। আর সমস্ত কথা ছাপাইয়া এই কথাটা বার বার তাহার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। বেচারী সন্ধ্যা! সেই প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া সে-দিন পর্য্যন্ত তাহার আচরণ, তাহার কথাবার্ত্তার প্রতিটি খুঁটিনাটি ভূপেনের মনে পড়িতে লাগিল। এমন শ্রদ্ধা বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোন ছাত্র-ছাত্রী কোন গুরুকে করে নাই, সে দিক্ দিয়া ভূপেনের জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে, সার্থক হইয়া গিয়াছে, আজ আর তার কোন ক্ষোভ নাই। বরং এই নির্জ্জন বিদেশে তাহার কথা স্মরণ করিয়াই দুই চক্ষু বার বার সজল হইয়া উঠিল। শিক্ষার এত অনুরাগ, এত নিষ্ঠা সবই হয়ত বেচারীর ব্যর্থ হইতে চলিল। অথচ ভূপেনের কত আশাই ছিল, প্রাচীন কালের ব্রহ্মবাদিনী ঋষিকন্যাদের মত এই মেয়েটি এক দিন তাহার পাণ্ডিত্য লইয়া পৃথিবীর সামনে দাঁড়াইবে আর সেই সুদুর্ল্লভ সম্মানের অংশ পাইয়া, উহার গুরুর মর্য্যাদা পাইয়া সে-ও ধন্য ও কৃতার্থ হইবে—এই ছিল তাহার অন্তরের গোপনতম স্বপ্ন।···মানুষের অতি স্থূল দেহের প্রশ্ন, সাধারণ নর-নারীর অতি সাধারণ মোহের প্রশ্নই কি না বড় হইয়া তাহার এত বড় আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিল! এ ক্ষোভ ভূপেনের ঘুচিবে না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর ভূপেন উঠিয়া পড়িল। না, কলিকাতায় সে যাইবে এবং আজই। কোন মতে জামাটা গলাইয়া বাহিরে আসিল—অপূর্ব্ব বাবু নাই, কোথা গিয়াছেন। ভবদেব বাবু আছেন আর আছেন অক্ষয় বাবু। নূতন হেড মাষ্টার কলিকাতার সমস্ত বলিয়াই ভবদেব বাবু এখনও যাইতে পারেন নাই—বড়দিনের দিন যাইবেন, এইরূপ কথা আছে। সে তাঁহার কাছে গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, ও, আপনি তা'হ'লে যাচ্ছেন, এ আমি জানতুম—হোটেল খালি হয়ে গেলে আর মন টেঁকে না এখানে।···যাক্—ভালই হ'ল, আমার একখানা বই একটু খোঁজ করবেন ওখানে? শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের লেখা; অনেক আগে ছাপা হয়েছিল, এখন না কি আর পাওয়া যাচ্ছে না। একটু যদি পুরোনো বইএর দোকানে টোকানে খোঁজ করেন—চার টাকা পাঁচ টাকা যা দাম হয় নেবেন। বরং এই পাঁচটা টাকা রাখুন আপনার কাছে।

ভূপেন তাড়াতাড়ি কহিল, না, না ও টাকা এখন থাক্—বই যদি পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই আনব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।···আর সেই যুকাননের যে বইটা এবার আনাবেন বলেছিলেন, সেটা দেখ্‌ব না কি?

ভবদেব বাবু যেন একটু দ্বিধায় পড়িলেন। একটুখানি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, ওটা, ওটা বরং এ-যাত্রা থাক্। এবার যদি কিছু বাঁচাতে পারি বরং সেই গরমের ছুটিতে, আরও দু-একখানা এডুকেশন সিষ্টেমের বই পারিত একসঙ্গে কিনব।···মোদ্দা এটা যেন ভুলবেন না—আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়ান, আমি নামটা লিখে দিই—

তিনি ভূপেনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় রাস্তায় আসিয়া নাম-লেখা চিরকুটটা দিয়া গেলেন। এ বইটিও যে ইস্কুলের টাকাতেই কেনা হইবে, ভূপেন তাহা জানে অথচ অত্যন্ত দরকারী বই কিনিবার সময়ও ভবদেব বাবু কত না ইতস্ততঃ করেন!

আর একটা বিদায় নেওয়া বাকী আছে—সে বিজয় বাবুদের কাছে। ভূপেন হিসাব করিয়া দেখিল যে, দুই ঘণ্টার মধ্যে হোটেলে ফিরিয়া আসিতে না পারিলে পাঁচটার ট্রেণ কোন মতেই ধরা যাইবে না। সুতরাং খুবই জোরে পা চালাইতে হইবে। যাতায়াতেই প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় চলিয়া যায়, তার উপর বিজয় বাবুর বাড়ী একবার গিয়া পড়িলে উঠিয়া আসা শক্ত, এমন করিয়া সকলে মিলিয়া যদি অনুরোধ করেন আর একটু বসিবার জন্য, কোন্ মতেই তখন ওঠা যায় না! বিশেষতঃ কল্যাণী, প্রতিদিনই একরকম জোর করিয়া তাহাকে চলিয়া আসিতে হয়, কোন দিন সে সহজে অনুমতি দেয় না।

আজও, তাহার কলিকাতায় যাইবার সংবাদটা শুনিবামাত্র সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিলেন। কল্যাণী কহিল, বা-রে, আমি ক'দিনে কত কি সব পিঠে তৈরী করব প্ল্যান এঁটে রেখেছি, আর আপনি অমনি না বলা-কওয়া বাড়ী চললেন? সে হবে না। এখন দু'-তিন দিন ত নয়ই—

বিজয় বাবু সস্নেহ ধমক্ দিয়া কহিলেন, তাই বলে ও বেচারী বাড়ী যাবে না! সেখানে ওর মা-বাবা ভাই-বোন্ ওর পথ চেয়ে নেই? তারা বুঝি কেউ নয়? না, যাওয়াটাই বরং অন্যায় হ'ত।

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কল্যাণী কহিল, আমি কি তাই বলেছি? উনি আগে বললেন কেন যে যাবেন না? তাই ত আমি আশা ক'রে সব আয়োজন করলুম—

ভূপেন কহিল, তুমি দুঃখ করছ কেন ভাই, আমি পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই ফিরে আসব ত, স্কুল খোলবার আগে এসে পৌঁছব—তখন বরং খাইয়ো দাওয়া; দু'দিন না হয় ফুরসৎ থাক্ না।

বিজয় বাবুও খুশী হইয়া কহিলেন, সেই ভাল কথা। এ ক'দিন না হয় বন্ধ থাক্।

কিন্তু কল্যাণীর মনের মেঘ কাটিল না। সে কহিল, হ্যাঁ, তাই না কি হয়! সব ঠিক-ঠাক্—এখন না কি বন্ধ রাখা যায়।

তার পরই কি ভাবিয়া কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া কহিল, আচ্ছা, সে যাই হোক্—এখনও ত দেরি আছে, দেখি, এর মধ্যেই কিছু করা যায় কি না।

হাত-ঘড়িটা দেখিয়া ভূপেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ও কি, এখন হবে না কল্যাণী, এক ঘণ্টা সময়ও পুরো নেই। এখন থাক্, বুঝলে? মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই— ফিরে এসে হবেখন্—এই কল্যাণী—

কিন্তু কল্যাণী ততক্ষণে রান্নাঘরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। আর করিলও সে অসাধ্য-সাধন। এক ঘণ্টা পার হইবার আগেই কী একটা খাবার প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে এইগুলি প্রস্তুত করিতে তাহাকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তা তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল, ছুটাছুটিতে মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এই শীতেও ললাটের প্রান্তে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া গিয়াছে।

জলযোগ শেষ করিয়াই ভূপেন উঠিয়া পড়িল। ছোট ছেলেমেয়েগুলির কাছে বিদায় লইয়া বিজয় বাবুকে প্রণাম করিয়া কল্যাণীর দিকে তাকাইতেই সে সহসা বলিয়া উঠিল, চলুন, আপনাকে ঐ মোড়টা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

ভূপেন খুশী হইয়া কহিল, সেই ভাল, চলো।

সব চেয়ে ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া কল্যাণী তাহার পিছু পিছু অনেকখানি পথ কিন্তু নিঃশব্দেই আসিল। তার পর হঠাৎ এক সময়ে কহিল, আচ্ছা, এইবার আপনি যান, আমি ফিরি।

তার পর গলায় আঁচল দিয়া পথের উপরই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া যেন কোন মতে প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল, আবার আসবেন ত?

ভূপেন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে। সে কহিল, কেন, সন্দেহ আছে না কি? না আসবার কি আছে?

যদি—যদি ভাল চাকরী পান অন্ত কোথাও?

অস্ফুট স্বরে প্রশ্নটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া কপোল বাহিয়া অজস্র জল ঝরিয়া পড়িল।

সে-দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত ভূপেনের কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। সে কল্যাণীর একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া ঈষৎ চাপ দিয়া গাঢ়কণ্ঠে কহিল, আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব কল্যাণী, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বোধ হয় নিজের দুর্ব্বলতায় কল্যাণী নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল—সে ভূপেনের হাতের মধ্য হইতে হাতটা টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাড়ীর রাস্তা ধরিল ...

কল্যাণীর এ ব্যবহার যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনি অভাবনীয়। দুই মাসের যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতায় বিজয় বাবুর পরিবারের সকলের প্রতিই সে আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য কথা, তাঁহারাও সকলে তাহাকে স্নেহ করেন, কিন্তু সে সম্পর্ক যে কোন দিন সাধারণ প্রীতির স্তর হইতে অন্তরঙ্গতর হইতে পারে—এ-কথা ভূপেন এক দিনও ভাবিয়া দেখে নাই। বিজয় বাবু লোকটি ভাল, ছেলেমেয়েগুলিও ভদ্র ও মিষ্ট স্বভাবের, এই জন্তই একটা আকর্ষণ ছিল ভূপেনের! কিন্তু—। অবশ্য এটা কল্যাণীর স্নেহ-কোমল হৃদয়ের অত্যন্ত স্বাভাবিক বিকাশ হইতে পাবে আর সেইটাই বেশী সম্ভব, ভূপেন নিজেকে বার বার এই কথাটাই বুঝাইল। কল্যাণীর এত দিনের ব্যবহারে কখনও এমন কোন বিশেষ সুর বাজে নাই যে আজ অন্ত কথা ধারণা করা যায়।...
তবু, ফিরিবার পথে সারাটা সময় সেই কিশোরী মেয়েটির কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহাকে উন্মনা করিয়া রাখিল।

[ক্রমশঃ
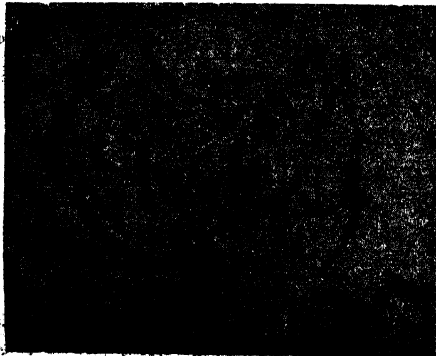
অনুবাদ সাহিত্য

শুভেন্দু ঘোষ

ইংরেজি এমন কি হিন্দীর তুলনায় বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের পরিমাণ খুব কম। অনেকে মনে করেন সেটা আমাদের শক্তিমত্তার লক্ষণ ; মৌলিক রচনা করবার মত প্রতিভা হিন্দীভাষীদের মধ্যে বেশী নাই, সুতরাং তারা অনুবাদের আশ্রয় নেয় ; —এই হল তাঁদের ধারণা। কিন্তু ইংরেজিতে এত অনুবাদ কেন ? ও ভাষাটায় প্রতিভার অভাব আজও হয়নি, এটা খুবই স্পষ্ট। শুধু ইংরেজি নয়, চীনা, রুশ, ফরাসী, জার্মাণ প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের বহর খুব কম নয় ; সাধারণ্যে তার আদরও যথেষ্ট।

আর এক কথা ; আমরা জানি, ইংরেজদের বড় লেখকদের মধ্যে অনেকেই—প্রিষ্টলি, হাক্সলি, ওয়েলস্, স্পেণ্ডার ইত্যাদি আধুনিক কালের প্রথিতযশা লেখকরাও মধ্যে মধ্যে অনুবাদের কাজ করে থাকেন ; এতে তাঁদের মৌলিক প্রতিভার অভাব সূচিত হয় না ; তাঁদের রসগ্রাহিতা ও বাস্তববুদ্ধির অস্তিত্বই প্রমাণ হয়।

আর এক কথা, অবিরত মৌলিক সাহিত্য রচনা করে যাওয়ার মত সামর্থ্য কোন প্রতিভারই থাকে কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এ কথা স্বীকার না করে উপায় নাই যে, রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয়, বিরাট প্রতিভাকেও মধ্যে মধ্যে সাহিত্যিক জাবর কাটতে হয়েছে। তিনিও মধ্যে মধ্যে অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন। সুতরাং, আমাদের বাংলা লেখকদের মধ্যে কেউ যদি বলেন, নিজের কথা লিখেই সময় পাই না, আবার অনুবাদ ! তাহলে সেটাকে অগ্রাহ্য করলে বড় দোষ হয় না।

বস্তুতঃ, অনুবাদ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই মনে একটা ভুল ধারণা আছে ; লোকের ধারণা, এক ভাষার কথা আর এক ভাষায় বলা,—এই তো ! দুটো ভাষা জানলেই তা করা যায়।

তা মোটেই করা যায় না। ভাষা দুটোর ব্যাকরণ ও অভিধান নির্ভুলভাবে জানা থাকলেও যায় না। যে দুটো জাতের ভাষা ওগুলো, তাদের সংস্কৃতিও আয়ত্ত করার প্রয়োজন আছে।

বিগত শতাব্দী পর্যন্ত, মোটামুটি বলতে গেলে, বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে হয় সংস্কৃত নয় আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে। হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলমানী সংস্কৃতি আমাদের জাতের মোটামুটি আয়ত্ত হয়ে পড়েছিল বলে অনুবাদ করাটা তত শক্ত হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত মনোভাব প্রভৃতি, সংস্কৃত সাহিত্যের উপমা এমন কি বাক-ভঙ্গীও আমাদের বিশেষ পরিচিত। দীর্ঘ সংশ্রবের ফলে ফারসী আরবী সাহিত্যের মনোভাব প্রভৃতিও আমাদের অচেনা নয়। কিন্তু মুস্কিল হল, যখন থেকে আমরা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা আরম্ভ করলাম। ইংরেজ-জীবনের অনেক কিছু আমাদের অজানা। তাদের সংস্কৃতি আমরা আজও ঠিক-মত আয়ত্ব করতে পারিনি। আমাদের 'অভিমান' প্রভৃতি বাঙালীসুলভ হৃদয়-বৃত্তি আমরা যেমন ইংরেজদের বোঝাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাই, ইংরেজদের অনেক সূক্ষ্ম অন্তর-ভাবের তেমনি আমরা ঠিকমত কিনারা পাই না। তা ছাড়া, উপমা, allusion প্রভৃতিও আছে। বাংলা 'ওরা দুটিতে যেন রাম-লক্ষ্মণ' বললে কি বোঝায় কোনো ইংরেজকে তা অল্প কথায় বলা অসম্ভব, ইংরেজি অনেক allusionও তেমনি বাংলায় ধরা অত্যন্ত শক্ত—তার বিদেশী রূপ রেখে দেওয়ার রীতি চলছে কিন্তু তাতে বাঙালী পাঠকের মন ভরছে বা মূলের রস পাওয়া যাচ্ছে, এ কথা মোটেই বলা চলে না। বস্তুতঃ, ইংরেজি বা অমনি পরদেশী কোনো সাহিত্যের রস-পরিবেষণ করার অর্থ হল সাধারণ পাঠকের নিকট মোটামুটি অপরিচিত একটা জগতের কথা তার কাছে ফুটিয়ে ধরা। সংস্কৃত সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ করা আর পাশ্চাত্ত্য কোনো সাহিত্য থেকে অনুবাদ করা মোটেই এক কথা নয়। প্রথম ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্যের যোগ আছে, দ্বিতীয়তে তা নাই।

অবশ্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভেদটাকে খুব বড় করে ধরার কোনো অর্থ হয় না। মানুষের মৌলিক অনুভূতিগুলো সব দেশেই বোধ হয় এক রকম বোধ হয় সব যুগেও। সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে ; এক স্তরের সভ্যতার মানুষ উচ্চ স্তরের সভ্যতার মানুষের চিত্তবৃত্তির সবটা বুঝে উঠতে পারে না। সামন্তযুগীয় লোকদের পক্ষে সোভিয়েট নরনারীর প্রেম বোঝা শক্ত হওয়ারই কথা। মানুষের পক্ষে তার অতীত বোঝা যত সহজ, ভবিষ্যৎ বোঝা তত সহজ তো নয়,—কাজেই, আমরা মহাভারতীয় যুগের মনোবৃত্তিগুলো বুঝতে পারলেও—তাও পারি, যদি আমাদের কল্পনা শক্তির জোর থাকে, নইলে নিত্যস্মরণীয় নারীদের সাহ্যকার মাহমা আমরা ক'জন বুঝি ?—ভবিষ্য কালের মনোবৃত্তি,—যা সোভিয়েট দেশের লোকদের মনোবৃত্তিতে সূচিত হচ্ছে,—আমরা ভালো করে বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু এ যে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি।

আমরা বলতে চাই, মানুষের মৌলিক ও গভীরতম অনুভূতিগুলো সব দেশেই এবং সব যুগেই প্রায় এক রকম। আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে দেশকালনির্বিশেষে এক রকম হয়, তার তো প্রচুর প্রমাণ আছে। এখন, যেহেতু মানুষের মৌলিক ও গভীর অনুভূতিগুলো এক রকমের, সেই হেতু বড় সাহিত্যের—যাতে গভীর ও মৌলিক রসানুভূতিরই প্রকাশ থাকে—অনুবাদ সম্ভব।

ওপরের আলোচনা হতে বুঝতে পারছি, বড় সাহিত্যের—বস্তুতঃ সব রকম সাহিত্যের—অনুবাদ করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন মূল সাহিত্যের রস আয়ত্ত করে সেই রস পুনঃপ্রকাশ করা। বস্তুতঃ, সাহিত্যের সার্থক অনুবাদমাত্রই হচ্ছে নূতন সৃষ্টি।

সাহিত্য-অনুবাদকের দায়িত্ব অনেক ; প্রথমতঃ, তাঁকে এক জন বিভিন্ন ভাষার রসকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁকে সেই রসটা ফুটিয়ে তুলতে হয় নিজ ভাষায়, যথাসম্ভব মূল রূপের আদর্শে। শুধু তথ্যকে—সে বৈজ্ঞানিক তথ্য হোক ঐতিহাসিক তথ্য হোক্ বা আর কিছু হোক্—এক ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করা হচ্ছে সহজ, কিন্তু সাহিত্য তো তথ্যপ্রধান নয়, তা হচ্ছে রস-প্রধান।

এখানে একটা কথা মনে পড়ে গেল। ডারুইনের 'অরিজিন অব্ স্পীসিজ' বইটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বই ; কিন্তু তার মধ্যেও দুই-এক জায়গায় যে কবিত্ব রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, কোন সাধারণ অনুবাদকের সাধ্য নাই তা অনুবাদেও অক্ষুণ্ণ রাখে। (এই বৈজ্ঞানিক classicখানার গুজরাতী অনুবাদ আছে, বাংলা অনুবাদ নাই ; এটা বাংলা ভাষার পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়।)

সাহিত্যের মূল আশ্রয় হল ষ্টাইল, কারণ তার রসের আবেদন প্রচ্ছন্ন থাকে ঐ ষ্টাইলের মধ্যে। ষ্টাইল তো ভাষার ব্যাপার নয়, তাই সাহিত্যের অনুবাদ কখনই শুধু ভাষান্তর করা মাত্র নয়—তা হচ্ছে নূতন সৃষ্টি। সার্থক অনুবাদ মৌলিক রচনার মতই শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।

প্রস্তাবিত হিন্দুকোড

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

এখন কথা হইতেছে যে, পুত্র ও কন্যা উভয়ই সন্তান—পিতৃ-মাতৃ নির্বিশেষে উৎপন্ন, তাহার মধ্যে এরূপ পার্থক্য কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—যদী (যদ্যপি) মাতরঃ (পিতা ও মাতা) বহ্নিং (পুত্র ও কন্যাকে) জনয়ন্ত (জন্মাইয়াছেন) (তথাপি তাহাদিগের মধ্যে) অন্যঃ (পুংলক্ষণ সন্তান) সুকৃতোঃ (শোভনকর্ম্ম পিণ্ডদানাদির) কর্ত্তা (অনুষ্ঠাতা) অন্যঃ (স্ত্রীলক্ষণ সন্তান) ঋন্ধন্ (বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা শোভিত হইয়া থাকে) পিণ্ডদানাদিকর্তৃত্বাৎ পুত্রো দায়ার্হঃ, দুহিতা তথা নেতি ন দায়ার্হা সা তু কেবলং পরস্মৈ দীয়তে—অর্থাৎ পুত্র পিণ্ডদানাদি কার্য্য করে বলিয়া পুত্র দায়ভাগী হইয়া থাকে, কন্যা সেরূপ নহে, এজন্য দায়াধিকারিণী নহে, তাহাকে কেবলমাত্র পরহস্তে দান করা হয়। ইহার পর সায়ণাচার্য্য নিরুক্ত গ্রন্থ হইতে তাঁহার ব্যাখ্যার সমর্থনকল্পে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন।

এই ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটির ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে—অপুত্রক পিতার কন্যা যে উত্তরাধিকারিণী হয় তাহার কারণ, পুত্রিকাপুত্র হইতে উভয় কুলের পিণ্ডদান অব্যাহত থাকে, এরূপ অর্থই সুপরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে যে পুত্রিকাপুত্রের বিধান দেখা যায়, তাহার মূলে এই ঋক্ মন্ত্র।

অন্যত্র ঋগ্বেদে (দ্বিতীয় অষ্টক প্রথম অধ্যায় অষ্টম বর্গের ৭ মন্ত্রে) দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে,—'অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচী' সায়ণের ব্যাখ্যা 'অভ্রাতেব' ভ্রাতৃরহিতের 'পুংসঃ' পিত্রাদীন্ 'প্রতীচী' স্বকীয় স্থানাৎ প্রতিনিবৃত্তিমুখী সতী 'এতি' গচ্ছতি, যথা লোকে ভ্রাতৃরহিতা যোষিৎ স্বোচিতবাসোঽলঙ্কারাদিলাভায় পিতৃনেতি। যদ্বা সতি স্বভ্রাতরি স এব পিতুঃ পিণ্ডদানাদিকং সন্তানকৃত্যং করোতি, তদভাবাৎ স্বয়মেব তৎকর্ত্তুং পিত্রাদীন্ গচ্ছতি। তদ্বদিয়মুষা অপি ইত্যাদি।

ভ্রাতৃহীনা যেমন নিজস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পিতার নিকট আগমন করে। যেমন ভ্রাতৃরহিতা নারী উচিত বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির জন্য পিতার নিকটে আসে। অথবা যেমন নিজ ভ্রাতা থাকিলে সেই পিতার পিণ্ডদানাদিরূপ সন্তানের কার্য্য করিত, তাহার অভাবে সে যেমন পিতার উক্ত কার্য্য করিতে পিতৃগৃহে আগমন করে—সেইরূপ উষাও সূর্য্যের অভিমুখে আসিতেছেন ইত্যাদি।

এই শ্রুতির অর্থানুসরণে—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রে—যাস্ক-প্রণীত নিরুক্তে, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে—মিতাক্ষরা দায়ভাগ প্রভৃতি সমস্ত নিবন্ধে—একবাক্যে কন্যাসত্ত্বেও পুত্রেরই উত্তরাধিকার নিরূপিত হইয়াছে। হিন্দুসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই পুত্রধারায় পিতৃ-সম্পত্তির অনুবর্ত্তন। আজ 'হিন্দুকোড' এই সংস্কৃতিকে ভারত হইতে নির্বাসিত করিবার জন্য উদ্যত। ইহার সমর্থনে অতুল বাবু যে সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিতেছি—

(১) দায়বিধি বৈদিকবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে;

(২) দায়বিধি ব্যবহার অধ্যায়ের অন্তর্গত।

(৩) ব্যবহার অধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও ধর্ম্ম বা রিলিজিয়নের মধ্যে পড়ে না।

(৪) ধর্ম্ম তাহাকেই বলে, যাহা কর্ত্তব্যতা মাত্র প্রকাশক।

(৫) সুতরাং দায়বিধিকে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়—ইহাই শাস্ত্রবেত্তাগণের মত।

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,—

(১) দায়বিধির মৌলিক তত্ত্বগুলি বৈদিক বিধানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনটি ঋক্ মন্ত্রের সন্ধান পূর্ব্বে দিয়াছি, আরও বহু মন্ত্র আছে।

(২) দায়বিধি ব্যবহার অধ্যায়ের অন্তর্গত, ইহা কেবলমাত্র যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেই দেখা যায়। মনুতে দায়বিধি নবম অধ্যায়ে ও ব্যবহারবিধি অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হওয়ায় ইহা যে পৃথক্ তাহা প্রতীত হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য দায়তত্ত্ব ও ব্যবহারতত্ত্ব পৃথক্ করিয়াছেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে—'ধর্ম্মস্থীয়ম্' নামক একটি অধিকরণে—৫৭.৫৮ প্রকরণে 'ব্যবহারস্থাপনা ও বিবাদপদনিবন্ধঃ,' ৫৯ প্রকরণে 'বিবাহসংযুক্তে বিবাহধর্ম্মঃ' 'স্ত্রীধনকল্প আধিবেদনিকম্'। অতঃপর ৬২ প্রকরণে দায়বিভাগে দায়ক্রমঃ, সুতরাং এখানেও দেখা যাইতেছে—ব্যবহারের সহিত দায়ের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকারান্তরে—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আচারাধ্যায়ের অন্তিম প্রকরণে 'রাজধর্ম্মপ্রকরণম্' উক্ত হইয়াছে। সুতরাং আচারধর্ম্মের মধ্যে রাজধর্ম্ম পড়িল। আর ব্যবহার হইল অ-ধর্ম্ম, ইহা বিচিত্র সিদ্ধান্ত নহে কি?

(৩) বস্তুতঃ, হিন্দুর ধর্ম্ম-স্বরূপ যে রিলিজিয়ন নহে, ইহা অতুল বাবু না জানেন এমন নহে, তথাপি উকীলের তর্ক-যুক্তি দ্বারা তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও রিলিজিয়ন সমার্থবাচক। তিনি ব্যবহারস্মৃতিকে ধর্ম্মের গণ্ডী হইতে বাহির করিবার জন্য মেধাতিথির যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যে বিকৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাই লজ্জার কথা। তাঁহার উদ্ধৃত অংশ যথা,—'ধর্ম্মশব্দঃ কর্ত্তব্যতাবচনঃ।' ধর্ম্মশব্দঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যয়োর্বিধিপ্রতিষেধয়োদৃ ষ্টপ্রয়োগঃ।' এরূপ পাঠই নাই। প্রকৃত পাঠ এই যে,—'ধর্ম্মশব্দঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যয়োর্বিধিপ্রতিষেধয়োরদৃষ্টার্থয়োস্তদ্বিষয়ায়াঞ্চ ক্রিয়ায়াং দৃষ্টপ্রয়োগস্তস্য তু বিদুভয়ং পদার্থ উতান্যতরত্র গৌণ ইতি নায়ং বিচারঃ ক্রিয়তে'। ইহার অর্থ হইল এই যে, 'কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য বিধি ও নিষেধরূপ অদৃষ্টার্থে এবং বিধিনিষেধবিষয়ক কর্ম্মেও ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, ধর্ম্মশব্দের উভয়ই প্রতিপাদ্য অথবা অন্যতরার্থে গৌণ—এ বিচার এখানে করা হইতেছে না।'

ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে,—ধর্ম্মশব্দে অদৃষ্ট ও অদৃষ্টজনক কর্ম্ম উভয়কেই বুঝায়। নন-রিলিজিয়ন ধর্ম্মের কোন প্রমাণ

এখানে দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে বিচার্য্য—ব্যবহারশাস্ত্রের সহিত এই ধর্ম্মের (রিলিজিয়ন্‌এর) কোন সম্বন্ধ আছে কি না? অতুল বাবু বলেন যে,—'ব্যবহার লৌকিক, সুতরাং ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।' এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ব্যবহার লৌকিক হইলেও ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এবং সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়াছে। "একই বস্তুতে দুই ব্যক্তির পরস্পরবিরুদ্ধ স্বত্বের দাবীর নাম ব্যবহার—যেমন, যদি এক জন লোক বলে, এ শস্যক্ষেত্র আমার ও অন্য লোক বলে, ঐ শস্যক্ষেত্র তার, তা হ'লে তাকে বলে ব্যবহার"—অতুল বাবু মিতাক্ষরার এই উক্তিটুকু অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু তাহার পর মিতাক্ষরায় কি লিখিত হইয়াছে তাহা দেখাইতেছি—নৃপ ইতি ন ক্ষত্রিয়মাত্রস্যায়ং ধর্ম্মঃ কিন্তু প্রজাপালনাধিকৃতস্যান্যস্যাপীতি দর্শয়তি। পশ্যেদিতি পূর্ব্বোক্তস্যানুবাদো ধর্ম্মবিশেষবিধানার্থঃ। বিদ্বদ্ভির্বেদব্যাকরণাদিধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞৈঃ। * * * অদর্শনে অন্যথাদর্শনে বা রাজ্ঞো দোষো ন ব্রাহ্মণানাম্। যথাহ মনুঃ—'অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্। অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চৈব গচ্ছতি'। ইতি। কথম্? ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ নার্থশাস্ত্রানুসারেণ। দেশাদিসময়ধর্ম্মস্যাপি ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরুদ্ধস্য ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ত্বান্ন পৃথগুপাদানম্। তথাচ বক্ষ্যতি—নিজধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ। সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ। ইহার অর্থ এই যে,—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ব্যবহারাধ্যায়ের প্রারম্ভে—ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্ বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ। এই শ্লোকটি আছে। এখানে নৃপ শব্দের সার্থক্য এই যে,—ব্যবহারদর্শন ক্ষত্রিয় মাত্রের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু প্রজাপালনে অধিকারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তিরও ইহা ধর্ম্ম। "পশ্যেৎ"—ইহা পূর্ব্বোক্ত রাজধর্ম্মের যে বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনুবাদ; সুতরাং ইহা দ্বারা ধর্ম্মবিশেষের বিধান করা হইতেছে। বেদ, ব্যাকরণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত রাজা ব্যবহার দর্শন করিবেন। রাজা যদি ব্যবহার দর্শন না করেন বা যথার্থ ভাবে দর্শন না করেন, তাহা হইলে তাহার জন্য দোষী হইবেন রাজা—ব্রাহ্মণগণ নহেন। এই জন্য মনু বলিয়াছেন,—রাজা যদি অদণ্ডনীয়কে দণ্ড দেন বা দণ্ডনীয়কে দণ্ড না দেন—তাহা হইলে অত্যন্ত অযশোভাগী এবং নরকগামী হইয়া থাকেন। রাজা ব্যবহার দর্শন করিবেন—কি প্রণালীতে? ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে—অর্থশাস্ত্রানুসারে নহে। দেশবিশেষে বা দেবসংস্থান বিশেষে যে সকল বিশেষ আচার আছে (special custom)—তাহার ত' কোন উল্লেখ এখানে হইল না—তাই মিতাক্ষরাকার বলিতেছেন যে, সেই পারিভাষিক আচার ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরোধী বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যেই তাহার গণনা হইয়াছে, এ জন্য পৃথক্ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা পরে বলা হইবে যে,—নিজ ধর্ম্মের অবিরোধে যাহার যে কোন বিশেষ নিয়মাচার থাকে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে এবং রাজকৃত সেইরূপ ধর্ম্মও পালনীয়।

আবার উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় মিতাক্ষরাকার বলিতেছেন যে,—শ্রৌত ও স্মার্ত্তধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া যে বিশেষ আচার—ধর্ম্ম—যেমন গোচারণ, জলরক্ষণ, (জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি) দেবগৃহ-পরিরক্ষা প্রভৃতিও যত্নের সহিত পালনীয়। ঐরূপ রাজাও নিজ ধর্ম্মের অবিরোধে কোন নিয়ম করিলে যেমন—অত পথিক সকলেই ভোজন পাইবে, আমাদের শত্রুমণ্ডলে অশ্বাদি পাঠাইবে না—ইত্যাদিও (নিয়ম) প্রতিপালনীয়।

ব্যবহারের সহিত ওতপ্রোত ভাবে ধর্ম্ম জড়িত, ইহা যে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন। ব্যবহারের পরিচালনা—ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে করিবার বিধি দেখিলে এবং তাহার ফল আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে,—বিবাদগ্রস্ত বস্তু তাহার প্রকৃত স্বামীকে প্রদান করিলেই রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত হইবে, তজ্জন্য যেরূপ সাবধানতা সহ ব্যবহার দর্শন করিতে হয়, তাহা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিবে এবং তাহার ফল—অধর্ম্ম বা নরক। ব্যবহার যদি কেবলমাত্র লৌকিক ব্যাপার হইত, তাহা হইলে নরকের ভয় দেখান হয় কেন? যে কোন ভাবে তাহা নির্ব্বাহিত করিলেও চলিত। এক কোদাল মাটী এদিকে পড়িল বা ওদিকে পড়িল, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না। এ জন্য ভগবান্ মনু ব্যবহার স্মৃতির মধ্যেই তারস্বরে সাবধান করিয়া দিয়াছেন,—(৮ অধ্যায়ের ১২।১৪।১৫।১৬।১৭)

যত্র ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ॥
ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥

ধর্ম্ম যদি অধর্ম্মের দ্বারা, সত্য যদি মিথ্যা দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয় আর অন্য দর্শকগণ উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে সেখানে সভার সকলেই পাপভাগী হইবেন। বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী, বিচারক সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম করিবেন। ধর্ম্ম হত হইলে তাহাই ঘাতকরূপে আসেন, ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে তাহাই রক্ষকরূপ থাকেন সুতরাং ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিও না। এ বিষয়ে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিব না। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, বিবাদার্থ (মামলা মোকদ্দমা) হইল চতুষ্পাদ,—এক পাদে ধর্ম্ম, দ্বিতীয় পাদে ব্যবহার, তৃতীয় পাদে চরিত্র ও চতুর্থ পাদে আছে রাজশাসন। হিন্দুশাস্ত্রে আদালতের নাম ধর্ম্মাধিকরণ এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের ফল অধর্ম্ম বা নরক, ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

যদি ব্যবহার স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের গণ্ডীর বাহিরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু হইত, তাহা হইলে, অর্থশাস্ত্র বা ব্যবহারশাস্ত্র সহ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ হইলে অর্থশাস্ত্রকে দুর্ব্বল এবং পরিত্যাজ্য বলিয়া সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সমকণ্ঠে প্রকাশ করিতেন না। এ কথার আলোচনা করিতে অতুল বাবু সাহস পান নাই। নারদ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র সহ যাহাতে বিরোধ না হয়, এরূপ নিপুণ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবহার পদ্ধতি পরিচালনা করিবে। আর যদি ধর্ম্মশাস্ত্রসহ অর্থশাস্ত্রে বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে অর্থশাস্ত্রের উক্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে কার্য্য করিবে। যাজ্ঞবল্ক্য জানাইয়াছেন যে,—ইহাই মর্য্যাদা, হিন্দুসংস্কৃতির ইহাই স্বরূপ যে—ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধে—ধর্ম্মশাস্ত্রই বলবৎ।

(৪) সুতরাং ধর্ম্মশব্দের অর্থ—যাহা বিধিবিষয় তাহা কর্ত্তব্য ও যাহা নিষিদ্ধ বিষয় তাহা অকর্ত্তব্য—এ অর্থ গ্রহণে লোকযাত্রার পথে কোথায় ব্যাঘাত হইতেছে, তাহাই অতুল বাবুর দেখান উচিত ছিল লৌকিক বিষয়ে পরিণামে এ মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারা যায় না, হা

হাতে ফল পাইবার আশায় অনুষ্ঠিত কার্য্য বিধিপূর্ব্বক করার ত্রুটিতে বিপরীত ফল প্রসব করে, এ জন্য শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। আজ যদি বিজ্ঞানের উপর ধর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ অসামরিক লোকক্ষয় এবং এই বিশ্বব্যাপী শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিতেই পারিত না। মানুষ ভাবের প্রেরণায় যখন ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়, ধ্বংসের অনুকূল যুক্তি-তর্কেরও অভাব হয় না, সে তখন কেবল স্বার্থই দেখিতে পায়, এ জন্য তখন তাহার গন্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য শাস্ত্রনির্দ্দেশ আবশ্যক হইয়া থাকে।

মেইন সাহেব হিন্দু জাতিকে ধর্ম্মপ্রাণ বলায় অতুল বাবু সভ্যতার অনেক স্তরে না কি নামিয়া গিয়াছেন! এবং ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে—সেই সমাজই না কি সভ্যতার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। যেমন পাশ্চাত্ত্য সমাজ। আজ পাশ্চাত্ত্য দেশ তাহাদের সভ্যতার চরম ও পরম পরিণতিতে আতঙ্কিত হইয়া ভারতের দিকে চাহিতেছে—আর অতুল বাবু সেই পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। মেইন সাহেবকে একটু গালি দিয়াছেন অথচ—সাহেবদের সমস্ত সভ্যতাটুকু ধার করিয়া হিন্দুকোডের মূলধন করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন!

ধর্ম্ম যদি কর্ত্তব্যতাপ্রকাশক হয়, তাহা কেবল মাত্র আচার ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইবে কেন? 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্'—সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না—এই যে উপনিষদ্ বাণী—ইহা কি আচারধর্ম্ম না ননরিলিজিয়স্ ধর্ম্ম?

মনু ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন—সে ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নহে? বস্তুতঃ ধর্ম্মের মধ্যেও যে দৃষ্ট ফল আছে, তাহা শাস্ত্রেই উক্ত আছে। দৃষ্ট ফলের সঙ্গেও দৃষ্ট ফলও যুক্ত থাকে, ইহা বহু-সম্মত সিদ্ধান্ত।

(৫) কিন্তু দৃষ্টফলক শাস্ত্রও যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনীয়, এ কথা শাস্ত্রে কোথায়ও উক্ত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত একটি বচনও দেখি নাই—যাহাতে বলা হইয়াছে যে,—শাস্ত্রীয় বিধি যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনীয়। কলিধর্ম্মে বা যুগবিশেষে ধর্ম্মবিশেষ গ্রহণীয় বলিলেই যে,—যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন ইহা দ্বারা বুঝিতে হয়, তাহা আমাদের বোধে আসে না। যেমন দিবাকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য পৃথক্, তেমনি যুগভেদে যুগধর্ম্ম পৃথক্। ইহাই "যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য—তাহার পরাশর মাধবভাষ্যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"এতেন ধর্ম্মস্য প্রকারান্তরমাচষ্টে নতু স্বরূপান্তরম্"—ধর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, প্রকার ভেদ হইতে পারে মাত্র। ধর্ম্ম স্বরূপ কি এবং তাহার নিরূপণও অত্যন্ত দুঃসাধ্য, এজন্য উপায় হইতেছে যে, স্পষ্ট শ্রুতিদ্বারা যাহা অভিহিত, তাহা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণীয়। শ্রুতির পরই স্মৃতির প্রামাণ্য, স্মৃতির অনন্তর অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির স্থান। অতুল বাবু যে ব্যবহারের উপর এত জোর দিয়াছেন, সেই ব্যবহারও প্রমাণরূপে গণনীয় হয়,—যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ হয়। যেখানে শাস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইবে, সেখানে ব্যবহার-সিদ্ধ শাস্ত্রবচনই প্রমাণ হইবে। শাস্ত্র—'অর্থহীন গোঁড়ামীর' প্রশ্রয় দেন না, এজন্য শাস্ত্রসহ যুক্তির অবতারণাও আবশ্যক। জীমূতবাহন—কন্যা সত্ত্বে পুত্রের দায়াধিকার প্রসঙ্গে সেই শাস্ত্র-সমন্বিত যুক্তির অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। অতুল বাবু এখানে জীমূতবাহনকে এক দল, সম্প্রদায়পন্থী যুক্তিবাদী খাড়া করাইতে চেষ্টা করাইয়াছেন এবং সেই যুক্তির আবিষ্কর্ত্তা 'প্রভোত'কে টানিয়া আনিয়াছেন। এ সকল কথা অত্যন্ত হাস্যকর। জীমূতবাহন—মনু প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপর ন্যায়-যুক্তির প্রয়োগ করিয়া শাস্ত্রার্থ বিষয়ে যে বৈমত্য বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা বিদূরিত করিয়াছেন, নূতন কিছু করেন নাই, এই নীতি সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়া থাকে।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

এই দুইটি শ্লোকার্থ যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ন্যায় যুক্তি প্রসঙ্গেই মীমাংসাশাস্ত্রের অবতারণা। মীমাংসা পদ্ধতি—'অর্থহীন গোঁড়ামি'র খণ্ডনের জন্যই চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অতুল বাবু ব্যবহারকেই যদি প্রমাণরূপে গণ্য করেন, উত্তম কথা, সেই ব্যবহার দ্বারাও কন্যাসত্ত্বে পুত্রের উত্তরাধিকার সিদ্ধ হয়।

নারদ বলিয়াছেন,—ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ। ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে॥ যদি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বয়ের বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে তন্মধ্যে যাহা যুক্তিসিদ্ধ হইবে, তাহা গ্রাহ্য। যুক্তি অপেক্ষাও ব্যবহার বলবান্—সেই ব্যবহার দ্বারাও ধর্ম্ম অবধারিত হয়। সুতরাং যুক্তি ও ব্যবহার—উভয় প্রণালী গ্রহণ করিলেও হিন্দুকোড যে ভাবে দায়বিধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সমর্থিত হইতে পারে না।

অতুল বাবু—পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতগণের বড় তোয়াজ করিয়াছেন, কেন না, তাঁহারা স্বহস্তে রাষ্ট্রশাসন পরিচালনা করিতেন, কাজেই তাঁহারা দায়বিধিকে অপরিবর্ত্তনীয় মনে করেন নাই বা করিতেই পারেন না। এ সকল কথার যদি কোন ভিত্তি থাকিত, তাহা হইলে অতুল বাবুর মত আমরাও হিন্দুকোড সমর্থনে প্রস্তুত হইতাম। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ॥

(রাজধর্ম্ম প্র-৩৪৩)

ইহার টীকায় মিতাক্ষরা বলিতেছেন,—"কিং চ যদা পরদেশো বশমুপাগতস্তদা ন স্বদেশাচারাদিসংকরঃ কার্য্যঃ কিন্তু যস্মিন্ দেশে যঃ আচারঃ কুলস্থিতির্ব্যবহারো বা যথৈব প্রাগাসীত্তথৈবাসৌ পরিপালনীয়ো যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধো ন ভবতি।"

যখন পরদেশ (বিজেতা অন্য রাজার) বশতাপন্ন হইবে, তখন বিজেতার দেশাচার বিজিত দেশে প্রচার করিবে না, কিন্তু যে দেশে যে আচার, কুলস্থিতি ও ব্যবহার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত—সেই দেশে সে সমস্তই রক্ষা করিতে হইবে। কাত্যায়ন দায়ভাগ বিষয়ে বলিয়াছেন,—

দেশস্য জাতেঃ সঙ্ঘস্য ধর্ম্মো গ্রামস্য যো ভবেৎ।
উদিতঃ স্যাৎ স তেনৈব দায়ভাগং প্রকল্পয়েৎ॥

ভৃগুরাহেতি শেষঃ।

দেশ, জাতি, সঙ্ঘ বা গ্রামে যেরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত, সেই ধর্ম্মানুসারেই দায়ধর্ম্ম পরিকল্পনা করিবে। ইহা ভৃগুর উক্তি।

বরিষ্ঠজন যদি 'অর্থহীন গোঁড়ামী'র কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে না

পারে, তাহা হইলেও চাণক্য—যিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা—রাষ্ট্র-শাসনের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তিনি কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক—

দেশস্য জাত্যা সঙ্ঘস্য ধর্ম্মো গ্রামস্য বাপি যঃ।
উচিতস্তস্য তেনৈব দায়ধর্ম্মং প্রকল্পয়েৎ॥

দেশ, জাতি, সঙ্ঘ অথবা গ্রামের যে ধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত সেই ধর্ম্ম দ্বারা দায়ধর্ম্ম বিধান করিবে। সংস্কৃতে 'উচিত' শব্দের অর্থ 'অভ্যস্ত' ইহা বলাই বাহুল্য। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে,—"পুত্রবতঃ পুত্রা দুহিতরো বা ধর্ম্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু জাতাঃ" ধর্ম্ম্য বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণ—পুত্রবানের (আর্য্যাবর্ত্তে) দায়াধিকারী হইবে, (দাক্ষিণাত্যে) কন্যাগণ উত্তরাধিকারিণী হইবেন। নিরুক্ত-কারও এইজন্য বলিয়াছেন—"তস্মাৎ পুমান্ দায়াদোঽদায়াদা স্ত্রীতি বিজ্ঞায়তে।" 'কন্যাগণ কোন দেশ বিশেষে দায়াধিকারিণী হইয়া থাকে এজন্য 'দুহিতরো বা' ইহা কৌটিল্য বলিয়াছেন।

আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ নিয়ম হইল—পুরুষ দায়াধিকারী, স্ত্রীলোক নহে। ইহার মূলে কয়েকটি শ্রুতি আছে—বৌধায়ন এই শ্রুতি ধরিয়াছেন,—ন দায়ং নিরিন্দ্রিয়া অদায়াশ্চ স্ত্রিয়ো মতাঃ, জীমূতবাহন—এই শ্রুতির উপরই নির্ভর করিয়া নারীদিগের স্বত্ব যে সীমাবদ্ধ, তাহা দেখাইয়াছেন। 'তস্মাৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীরপি' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৫।৮।২) যৎস্থালীং রিক্তস্তি ন দারুময়ং তস্মাৎ পুমান্ দায়াদঃ স্ত্র্যদায়াদা। অথ যৎস্থালীং পরাস্তন্তি ন দারুময়ং তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি ন পুমাংসম্। (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪।৬।৭) আরও শ্রুতি আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। মিতাক্ষরাকার—নারীদিগের স্বত্ব যে পূর্ণস্বত্ব হইবে, ইহা কোথায়ও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, ইহা অতুলবাবুর স্বকপোল কল্পিত বাণী। বরং নারীদিগের পারতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন—এবং পারতন্ত্র্যমূলে স্বত্বগ্রহণের অধিকার নারীদের আছে, ইহাই তাঁহার উক্তি। 'স্বত্ব পারতন্ত্র্যবচনং' 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' ইত্যাদি তদস্ব পারতন্ত্র্যম্, স্বত্বস্বীকারে তু কো বিরোধঃ। ইত্যাদি। এই পারতন্ত্র্য কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা স্পষ্টবিশ্লেষণ নাই। ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে পেশোয়াদের আমলেও যে নারীদের পূর্ণ স্বত্ব দেওয়া হইত না, ইহার নজীর আছে। অতুল বাবু বলিয়াছেন যে, প্রিভি কাউন্সিল নারীর নির্ব্যূঢ়স্বত্ব না দেওয়াতেই ভারতে নারীস্বত্ব খর্ব হইয়াছে—ইহা অতিরঞ্জিত কথা। জীমূতবাহন ত' ইংরাজশাসনের পূর্ববর্ত্তী—তিনি শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ দিয়াছেন যে—"স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ" পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহ এবং এই মহাভারত বচনের উপর নারীদিগের জীবনস্বত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, ইহা কাহারও স্বেচ্ছাকল্পিত নহে। অতুলবাবু বলিয়াছেন যে, 'হিন্দু আইনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আজ কাল ইংরেজের আদালতে যে ব্যবহার বিধি চলিতেছে, তাহাতে 'হিন্দুধর্ম্ম গেল' বলিয়া অতি-বড় সনাতনীও মনে করে না।' ইহার উত্তরে এইটুকু বলিব—এখানে সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের কথা উঠে না, উঠে রাজ-ধর্ম্মের কথা—প্রজাধর্ম্মের কথা, ধর্ম্মাধিকরণে অধিকারীদের কথা—সাক্ষীদিগের কথা, সুতরাং তাহাতে বর্ত্তমান বিচারপদ্ধতিতে—রাজধর্ম্ম প্রজাধর্ম্ম, সাক্ষিগণের ধর্ম্ম, সভাসদ্গণের ধর্ম্ম অব্যাহত আছে—ইহা অতিবড় সংস্কারীকেও বলিতে শুনি নাই, এবং এই সকল ধর্ম্ম শব্দে বিধিবোধিত কর্ত্তব্যই বুঝাইতেছে।

—অন্ধ—

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অন্ধ আমি হে অন্ধ,
বন্দী আমার—এ তনু কারার
সিংহ-দুয়ার বন্ধ।
প্রবেশ নিষেধ রবি ও শশীর,
চারি দিকে ঘন গণ্ডী মসীর,
হেথায় আলোক রূপ ও রঙের
নাহি প্রবেশের রন্ধ্র।

ব্যথিত চিত্তবৃত্তি
ভাবে কি নিবিড় যবনিকা-ঢাকা
রূপময়ী এই পৃথ্বী।
যুগের যুগের কীর্ত্তিকলাপ,
নূতনের ভাতি, অতীতের ছাপ,
কিছুই দেখার নাহি অধিকার
এমনি কপাল মন্দ।

যাহারা ভাগ্যবন্ত
হেরে সমারোহে শোভাযাত্রীর
রূপের নাহিক অন্ত।
নিকটে বিপুল আলো-পারাবার
আমি রে যাত্রী কালো দরিয়ার।
পশে কানে দূর সপ্ত ডিঙার
দাঁড়-পতনের ছন্দ।

কি পুলক, প্রেমানন্দ,
ভেসে আসে যবে বিচিত্র সুর
দূর বনফুল-গন্ধ।
শুনি কর্কশ কঠিন এ ক্ষিতি
মোর কাছে এ যে গন্ধ ও গীতি,
না জানিয়া পান-পাত্র কেমন
পান করি মকরন্দ।

কাড়িয়া লয়েছ দৃষ্টি,
হে সৃষ্টিধর দেখিতে দিলে না
সুন্দর তব সৃষ্টি।
তব মহিমার বহিঃপ্রকাশ
দেখিতে দিলে না মোরে অবকাশ,
জানালে জগৎ জগদীশ একই
আর নাই মোর সন্দ।

বুঝিলে ইহার অর্থ,
শুধু ছোট ছুটা অবশ গোলক
জীবন করিবে ব্যর্থ?
আঁধারকে আমি সাথী বলে গণি'
শুনাও মধুর বংশীধ্বনি,
দরশন নয়—পরশন দিয়ে
ঘুচাও সকল দ্বন্দ্ব।

বাল্মীকি ও কালিদাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

প্রকৃতপক্ষেই আমরা দেখিতে পাই, পার্বত্য বনদেশে বাস করিয়া রাম-সীতা কখনই নির্বাসন-ক্লেশ ভোগ করে নাই,—বনে তাহারা সর্বপ্রকারে রাজ্যসুখই ভোগ করিতেছিল। চিত্রকূট পর্বতে আসিয়া রামচন্দ্র সীতাকে যেখানে চিত্রকূটের শোভা দেখাইতেছিল সেখানে রামের পার্শ্বে সীতা যেন নন্দনবনে ক্রীড়ারত ইন্দ্র এবং শচী।

ভার্য্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ। (অযো—৯৪।২)

এই চিত্রকূটের চারি দিকে চাহিয়া রাম সীতাকে বলিয়াছিল—

> ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনা ভবঃ।
> মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।
>
> *　　　*　　　*
>
> যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্ধমনিন্দিতে।
> লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধক্ষ্যতি।
>
> (ঐ ৯৪।৩।১৫)

'ভদ্রে সীতা, রাজ্য হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়াছি, বা সুহৃদ্‌গণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইহার কিছুই আজ আর এই রমণীয় চিত্রকূট পর্বত দর্শনে আমার মনকে ক্লিষ্ট করিতেছে না। হে অনিন্দিতে, এখানে তোমাকে এবং লক্ষ্মণের সহিত যদি অনেক বৎসরও বাস করি তাহাতেও শোক আমাকে দগ্ধ করিবে না।' এই চিত্রকূট পর্বতের অদূরে স্বচ্ছসলিলে প্রবহমানা মন্দাকিনী নদীকে দেখিয়াও রাম বলিয়াছিল,—

> দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে।
> অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ।
>
> *　　　*　　　*
>
> সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্।
> কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি।
> ত্বং পৌরজনবৎ ব্যালানযোধ্যামিব পর্বতম্।
> মন্যস্ব বনিতে নিত্যং সরযূবদিমাং নদীম্।

'চিত্রকূট পর্বত এবং মন্দাকিনীর দর্শন এবং তাহার সহিত তোমার দর্শনের দ্বারা এখানে আমি পুরীতে বাস অপেক্ষা অধিক মনে করিতেছি।···হে সীতা, সখী যেমন সখীর ভিতরে আত্মনিমজ্জন করে তুমি তেমন করিয়া এই মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন কর; এই নদী রক্তকমল এবং শ্বেত কমলগুলিকে বিক্ষোভের দ্বারা নিমজ্জিত করিতেছে। এই পার্বত্যদেশের সকল জীবজন্তুকে তুমি পৌরজনগণের ন্যায় মনে করিও, এই পর্বতকে অযোধ্যা বলিয়া মনে করিও, আর এই নদীকেই সরযূ নদী বলিয়া মনে করিও।'

রাবণ যে দিন ছদ্ম পরিব্রাজকবেশে সীতাহরণ মানসে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়াছিল সে দিন ক্রূরকর্মা রাবণকে দেখিয়া সমস্ত বনই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বনের বৃক্ষগুলি ভয়ে আর শাখাবাহু কম্পিত করিল না, সমীরণ প্রবাহিত হইল না;—সেই রক্তলোচন রাক্ষসকে দেখিয়া শীঘ্রস্রোতা গোদাবরী নদীও ভয়ে স্তিমিত ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল।—

> তমুগ্রং পাপকর্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ।
> সন্দর্শ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ।
> শীঘ্রস্রোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীক্ষন্তং রক্তলোচনম্।
> স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াদ্‌গোদাবরী নদী। (আর ৪৬।৭-৮)

রাম স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে—লক্ষ্মণ তাহারই অনুগমন করিয়াছে; সুতরাং সীতাকে একাকিনী অসহায়া দেখিয়া সমস্ত বন ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ কর্তৃক যখন হৃতা হয় তখন সীতাও এই অরণ্য-প্রকৃতিকেই তাহার একমাত্র সহায় বলিয়া জানিয়াছিল, তাই সে করজোড়ে বনের প্রতিটি বৃক্ষ-লতা, গোদাবরী নদী, সকল বনদেবতা পশুপক্ষীর নিকট তাহার করুণ নিবেদন জানাইতে জানাইতে যাইতেছিল।—

> আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
> ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।
> হংসসারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
> ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।
> দৈবতানি চ যান্ত্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
> নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্।
> যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
> সর্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ।
> হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
> বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি শংসত।
>
> (আরণ্য—৪৯।৩০-৩৪)

'হে জনস্থান, হে পুষ্পিত কর্ণিকার সমূহ, তোমাদের সকলকে ডাকিয়া জানাইতেছি, তোমরা ক্ষিপ্রগতি রামকে সংবাদ দাও যে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

হংস-সারস-সমাকুল গোদাবরী নদীকে বন্দনা করিতেছি, শীঘ্র তুমি রামকে সংবাদ দাও. রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ এই বনস্থলীতে যত বনদেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করিতেছি, অপহৃতা আমার কথা তাঁহারা যেন আমার ভর্তাকে জানান। এখানে বিবিধ যত জীব-জন্তু রহিয়াছে সেই মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই আমি শরণ লইতেছি; তাহারা সকলেই যেন আমার ভর্তার নিকট তাঁহার প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী হ্রিয়মাণা প্রিয়ার সংবাদ জানায়, আরও যেন জানায় যে, রাবণ বিবশা সীতাকেই হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

আরণ্য বিশ্বপ্রকৃতি সীতার এই আর্ত আবেদনে যে সাড়া দিয়াছিল না তাহা নহে। যখন সীতার অগ্নিবর্ণ আভরণগুলি গগনচ্যুত ক্ষীণতারকার মতন ভূতলে সশব্দে ছড়াইয়া পড়িতেছিল,—যখন সীতার স্তনভ্রষ্ট হার গঙ্গার ধারার ন্যায় আকাশ হইতে বহিয়া পড়িতেছিল, তখন—

> উৎপাতবাতাভিহতা নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
> মাভৈরিতি বিধূতাগ্রা ব্যাজহ্রুরিব পাদপাঃ।
> নলিন্যো ধ্বস্তকমলাস্ত্রস্তমীনজলেচরাঃ।
> সখীমিব গতোৎসাহাং শোচন্তীব স্ম মৈথিলীম্।
> সমন্তাদভিসম্পত্য সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিজাঃ।
> অন্বধাবংস্তদা রোষাৎ সীতাচ্ছায়ানুগামিনঃ।
> জলপ্রপাতাস্রমুখাঃ শৃঙ্গৈরুচ্ছ্রিতবাহুভিঃ।
> সীতায়াং হ্রিয়মাণায়াং বিক্রোশন্তীব পর্বতাঃ।

ম্রিয়মাণান্তু বৈদেহীং দৃষ্ট্বা দীনো দিবাকরঃ।
প্রবিধ্বস্তপ্রভঃ শ্রীমানাসীৎ পাণ্ডুরমণ্ডলঃ।
নাস্তি ধর্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জ্জবং নানৃশংসতা।
যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ।
ইতি ভূতানি সর্ব্বাণি গণশঃ পর্য্যদেবয়ন্।
বিত্রস্তকা দীনমুখা রুরুদুর্ম্মৃগপোতকাঃ। (ঐ-৫২।৩৪-৪০)

নানা পক্ষিসমাকুল আরণ্য বৃক্ষগুলি ঊর্দ্ধগামী বাতাসের দ্বারা অভিহত হইয়া অগ্রভাগ বিকম্পিত করিয়া যেন বলিতেছিল—সীতা, আমরা এখানে রহিয়াছি, তোমার কোন ভয় নাই; ধ্বস্তকমল সরোবরের মীন প্রভৃতি জলেচরগুলি ত্রস্ত হইয়া উঠিল,—সরোবরগুলি যেন গতোৎসাহা সখী সীতার জন্যই শোক করিতেছিল। সিংহ-ব্যাঘ্র মৃগ প্রভৃতি পশুগুলি এবং বনের পাখীগুলি চারি দিক্ হইতে রাবণকে অভিসম্পাত করিতে করিতে রোষে সীতার ছায়া অনুসরণ করিয়া পিছে পিছে ধাবিত হইতে লাগিল; জলপ্রপাতে অশ্রুমুখ হইয়া শৃঙ্গবাহুগুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া পর্বতগুলি সীতা অপহৃতা হইতেছে দেখিয়া আক্রোশে আস্ফালন করিতেছিল; ধ্বস্তপ্রভ সূর্য পাণ্ডুরমণ্ডলে দীন হইয়া রহিল; যেখানে রামের সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যায় সেখানে ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই;—কোথায় সত্য? চরিত্রের ঋজুতা বা অনৃশংসতা বলিয়াও কোন জিনিষ নাই,—এই কথা বলিয়া বনের সকল প্রাণীকে ব্যথিত করিয়া বিত্রস্ত বালমৃগগুলি দীনমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র যখন মারীচ বধ করিয়া লক্ষ্মণসহ তাহাদের পর্ণশালায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল—

দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতাং তদা।
শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব॥
রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ ম্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্।
শ্রিয়া বিহীনং বিধ্বস্তং সন্ত্যক্তং বনদৈবতৈঃ॥

সীতা-বিরহিতা পর্ণশালা হেমন্তের শ্রীহীন ধ্বস্ত সরোবরের মত পড়িয়া আছে; চারি দিকে বৃক্ষগুলি রোদন করিতেছে, বনের পুষ্প, পশু, পাখী সকলই ম্লান হইয়াছে; সকলই যেন শ্রীহীন—বিধ্বস্ত,—বনদেবতাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। রামচন্দ্র শোকে উন্মত্ত হইয়া পর্বত হইতে পর্বত বন—হইতে বনে—নদী হইতে নদীতে ধাবিত হইয়া সীতার উদ্দেশ করিতে লাগিল। পাশের কদম্ববৃক্ষকে ডাকিয়া রাম সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিল—কদম্ব যদি কদম্বপ্রিয়া শুভাননা সীতেকে দেখিয়া থাকে; বিল্বকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে স্নিগ্ধপল্লবসঙ্কাশা পীতকৌষেয়বাসিনী বিল্বোপমস্তনী সীতাকে দেখিয়াছে কি না; অর্জ্জুনবৃক্ষকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অর্জ্জুনপ্রিয়া তন্বী সীতা বাঁচিয়া আছে কি না; এইরূপে মরুবক, বকুল, অশোক, তাল, জম্বু প্রভৃতি সকল বৃক্ষের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়াই রাম সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কর্ণিকারকে ডাকিয়াও খোঁজ লইল—যদি সে কর্ণিকারপ্রিয়া সীতাকে দেখিয়া থাকে।

অস্তি কাচিৎ ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বনপ্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্॥
স্নিগ্ধপল্লবসঙ্কাশাং পীতকৌষেয়বাসিনীম্।
শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী॥

অথবার্জ্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জ্জুনপ্রিয়াম্।
জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতি বা ন বা॥
ককুভঃ ককুভোরুং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্।
লতাপল্লবপুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ।
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি।
এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলকপ্রিয়াম্।
অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্।
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্।
যদি তাল ত্বয়া দৃষ্টা পক্বতালোপমস্তনী।
কথয়স্ব বরারোহাং কারুণ্যং যদি তে ময়ি।
যদি দৃষ্টা ত্বয়া জম্বো জাম্বুনদসমপ্রভা।
প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশঙ্কং কথয়স্ব মে॥
অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্।
কর্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া॥
(আরণ্য—৬০।১২-২০)

বৃক্ষলতাগুল্মের নিকট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্ধান লইবার পর রামচন্দ্র বনের পশুগণের নিকটেও একে একে সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। হরিণকে রাম জিজ্ঞাসা করিল, যদি হরিণনয়নী সীতাকে সে হরিণীর সহিত দেখিয়া থাকে; বনের করীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যদি সে করিণীর সহিত সীতাকে দেখিয়া থাকে; বনের শার্দ্দূলও এ সময়ে রামচন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়াছিল।

অথবা মৃগশাবাক্ষীং মৃগ জানাসি মৈথিলীম্।
মৃগবিপ্রেক্ষণী কান্তা মৃগীভিঃ সহিতা ভবেৎ॥
গজ সা গজনাসোরুর্যদি দৃষ্টা ত্বয়া ভবেৎ।
তাং মন্যে বিদিতাং তুভ্যমাখ্যাহি বরবারণ॥
শার্দ্দূল যদি সা দৃষ্টা প্রিয়া চন্দ্রনিভাননা।
মৈথিলী মম বিস্রব্ধঃ কথয়স্ব ন তে ভয়ম্। (ঐ-২৩-২৫)

শুধু বনের তরুলতা পশুপক্ষীর নিকটেই নহে, আকাশের সূর্য, সর্বলোকভ্রমণকারী বায়ুর নিকটেও রামচন্দ্র সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ
লোকস্য সত্যানৃতকর্মসাক্ষিন্।
মম প্রিয়া সা ক্ব গতা হৃতা বা
শংসস্ব মে শোকহতস্য সর্বম্।
লোকেষু সর্বেষু ন বাস্তি কিঞ্চিৎ
যৎ তেন নিত্যং বিদিতা ভবেৎ তৎ।
শংসস্ব বায়ো কুলপালিনীং তাং
মৃতা হৃতা বা পথি বর্ত্ততে বা। (ঐ-৬৩।১৬-১৭)

'হে আদিত্য, তুমি বিশ্বলোকে যাহা কিছু কৃত এবং যাহা কিছু অকৃত সকলই অবগত আছ; বিশ্বলোকের সকল সত্যকর্ম্ম এবং অসত্যকর্ম্মের তুমিই সাক্ষী; আমার সেই প্রিয়া কোথায় গিয়াছে—অথবা হৃত হইয়াছে শোকহত আমাকে সকল খুলিয়া বল। হে বায়ু, সর্বলোকে এমন কিছু নাই যাহা তোমা কর্ত্তৃক নিত্য জ্ঞাত হইতেছে না; তুমি সেই কুলপালিনীর সন্ধান আমাকে বল,—সে মরিয়াছে—অথবা হৃত হইয়াছে—অথবা পথে অবস্থান করিতেছে।'

মূক বিশ্বপ্রকৃতি রামচন্দ্রের এই আর্তিতে গভীর সমবেদনার সহিত সাড়া দিয়াছিল। রাম-লক্ষ্মণ যখন কোথায়ও সীতার কোন সন্ধান না পাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতেছিল তখন হঠাৎ বনের মৃগগুলির দিকে চোখ পড়াতে রাম লক্ষ্মণকে বলিল ;—

এতে মহামৃগা বীর মামীক্ষন্তে পুনঃ পুনঃ।
বক্তুকামা ইব হি মে ইঙ্গিতান্যুপলক্ষয়ে। (ঐ-৬৪।১০-১১)

'হে বীর, এই মহামৃগগুলি আমাকে বার বার চাহিয়া দেখিতেছে, ইহাদের ইঙ্গিতে আমার মনে হইতেছে, ইহারা আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছে।' তখন—

তাংস্তু দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রো রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
ক্ব সীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাষ্পসংরুদ্ধয়া গিরা। (ঐ ১৬-১৭)

'তাহাদিগকে দেখিয়া নরব্যাঘ্র রাম তাহাদের ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তর দিল; তাহাদের দিকে তাকাইয়া বাষ্পসংরুদ্ধ বাক্যে সে জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় সীতা?' রামের সেই প্রশ্নের উত্তর মৃগগণ বাক্যে দিল না বটে, কিন্তু—

এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ।
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তো নভঃস্থলম্।
মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত। (ঐ ১৭-১৮)

'নরেন্দ্র রাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মৃগগণ সহসা উঠিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া সকলে আকাশের দিকে দেখাইতে লাগিল,—যে দিকে হ্রিয়মাণা সেই সীতা গমন করিয়াছিল।' রাম সক্রোশে যখন পর্বতের নিকট সীতার বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তখন সেই পর্বতও তাহার উন্নত শির তুলিয়া দক্ষিণদিকে তাকাইয়া যেন সীতাকেই দেখিতে লাগিল; এইরূপে পর্বত আভাসে-ইঙ্গিতে চক্ষু-ইসারায় সীতার সন্ধান বলিল, সাক্ষাতে সীতাকে দেখাইতে পারিল না।

দর্শয়ন্নিব তাং সীতাং নাদর্শয়ত রাঘবে। (ঐ ৩২)

কবিগুরু বাল্মীকির এই সকল বর্ণনা মনে রাখিয়াই বোধ হয় কালিদাস 'রঘুবংশে' রামের মুখে বলাইয়াছেন,—

ত্বং রক্ষসা ভীরু যতোঽপনীতা
তং মার্গমেতা কৃপয়া লতা মে।
অদর্শয়ন্ বক্তুমশক্নুবত্যঃ
শাখাভিরাবর্জিতপল্লবাভিঃ।
মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুর নির্ব্যপেক্ষা-
স্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্মাম্।
ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণস্যা—
মুৎপক্ষ্মরাজীনি বিলোচনানি। (১৩।২৪-২৫)

'হে ভীরু, তোমাকে রাক্ষস যে পথ দিয়া হরণ করিয়াছে সেই পথের কথা বলিতে অশক্ত হইলেও এই লতাগুলি কৃপা করিয়া আনম্রপল্লব শাখাদ্বারা (ইঙ্গিতে) আমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। মৃগগণও কুশাঙ্কুরের প্রতি স্পৃহাহীন হইয়া পক্ষ্মপংক্তি উন্মোচন পূর্বক নয়নের দ্বারা বার বার দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া তোমার গমনপথের সংবাদে অজ্ঞ আমাকে সম্বোধিত করিতেছিল।'

কালিদাসের শকুন্তলা-নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দেখিতে পাই, প্রিয়ংবদা যখন দুঃখ করিতেছিল যে, শকুন্তলার আভরণীয় রূপকে অলঙ্কৃত করা যাইতেছিল না তখন সহসা ঋষিকুমারদ্বয় প্রবেশ করিয়া শকুন্তলাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য নানাপ্রকার আভরণ দান করিল। আর্যা গৌতমী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা কি তাত কাশ্যপের মানসী সিদ্ধি? দ্বিতীয় ঋষিপুত্র উত্তর করিল,—'তাহা নয়; তাত কাশ্যপ আমাদিগকে শকুন্তলার জন্য বনস্পতিগুলি হইতে কুসুম আহরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন; তারপরে—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈর-
দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ।

'কোন তরু ইন্দুপাণ্ডু মাঙ্গল্য ক্ষৌমবসন বাহির করিয়া দিল, কোন তরু চরণোপরাগ সুভগ লাক্ষারস ক্ষরিত করিল, অন্যান্য তরুগণ আপর্বভাগোত্থিত বনদেবতা-করতলের দ্বারা কিশলয়োদ্ভেদের প্রতিযোগিতায় নানা প্রকারের অন্যান্য আভরণ দান করিয়াছে।'

বাল্মীকির রামায়ণেও দেখিতে পাই, ভরত যখন রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গিয়াছিল তখন ভরদ্বাজমুনি ভরতকে আতিথ্য দান করিয়াছিলেন। এইরূপ মান্য অতিথির সৎকারের জন্য ভরদ্বাজ মুনি সকল নদী এবং বনের নিকটই আহার্য, পেয় এবং ভূষণ যাচ্‌ঞা করিয়াছিলেন।

প্রাক্‌স্রোতসশ্চ যা নদ্যস্তির্যক্‌স্রোতস এব চ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ সমায়ান্ত্বদ্য সর্বশঃ।
অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুরামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাম্।
অপরাশ্চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ডরসোপমম্।
... ...
বনং কুরুষু যদ্দিব্যং বাসোভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎ কৌবেরমিহৈব তু।
... ...
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপপ্রচ্যুতানি চ।

(অযো—৯১।১৪-১৫, ১৯,২১)

বাল্মীকি রামায়ণের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত সকল বর্ণনা পাঠ করিলে একটা জিনিস স্বতঃই মনে হইবে, ইহা নিছক কবি-জনোচিত আলঙ্কারিক বর্ণনা নহে; ইহার পশ্চাতে কবি-চিত্তের একটা দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাস রহিয়াছে। কালিদাসের ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণনায় স্থানে স্থানে আলঙ্কারিক বর্ণনার কথা মনে হইলেও বাল্মীকি-রামায়ণের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিলাইয়া এই বর্ণনাগুলি পড়িলে মনে হইবে, সমগ্র কাব্যে যে যুগের জীবনকে প্রতিফলিত করা হইয়াছে এই প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলির পশ্চাতেও সেই যুগের একটা আদিম সহজ সরল বিশ্বাস দাঁড়াইয়া আছে। সে বিশ্বাসটি এই যে, চারিদিকের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটার কোন অংশই যেন একেবারে জড় অচেতন নহে, সকলের ভিতরে একটা সূক্ষ্ম অলৌকিক প্রাণস্পন্দন এবং চেতনা রহিয়াছে। ঊর্ধ্বের আকাশ, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারকা,—অন্তরীক্ষের বায়ু—নিম্নে পৃথিবীর বুকে বৎসর-মাস-দিবসের সুনিয়ত আবর্তন, ষড়্‌ঋতুর আসা যাওয়া—সকল পর্বত অরণ্য, নদ-নদী, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী—ইহার সকলের ভিতরে যে চেতনা সত্তা রহিয়াছে মানুষের সহিত তাহার মঙ্গলময় গভীর আত্মীয়তা রহিয়াছে। এই সরল বিশ্বাসটি স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে বনে গমনোদ্যত রাম সম্বন্ধে জননী কৌশল্যার প্রার্থনা-বাণীতে। কৌশল্যা এক দিকে যেমন বলিতেছেন,—

যং পালয়সি ধর্ম্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেম্বায়তনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ॥
যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা॥
পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ॥
(অযো—২৫।৩-৬)

প্রীতি দ্বারা এবং নিয়মের দ্বারা তুমি যে ধর্ম্মকে পালন করিতেছ, হে রাঘবশার্দূল, সেই ধর্ম্মই তোমাকে বনে রক্ষা করুক। দেবায়তনে যাঁহাদিগকে প্রণাম কর, হে পুত্র, তাঁহারা মহর্ষিগণের সহিত বনে তোমাকে রক্ষা করুন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র তোমাকে যে-সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, গুণসমুদিত তোমাকে তাহারা রক্ষা করুক। পিতৃশুশ্রূষা মাতৃশুশ্রূষা এবং সত্যের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া হে মহাবাহো, তুমি চিরজীবী হইয়া থাক।' কৌশল্যার এই সকল প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই,—

সমিৎকুশপবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষা ক্ষুপা হ্রদাঃ॥
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম।
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ॥
... ...
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্ব্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্ত্তাশ্চ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে সদা॥
... ...
স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ।
শৈলাঃ সর্ব্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ॥
দ্যৌরন্তরিক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ॥
(ঐ ৭-৮, ১০, ১৩-১৪)

'সমিৎকুশ পবিত্র আয়তনগুলি, যজ্ঞের বেদী এবং বিপ্রগণের স্থণ্ডিল ভূমি,—শৈল, বনস্পতি, হ্রস্বশাখাযুক্ত তরুগুলি, হ্রদ—সকলে তোমাকে রক্ষা করুক; পতঙ্গ, সর্প, সিংহ প্রভৃতি হে নরোত্তম, তোমাকে রক্ষা করুক। সাধ্যগণ, মরুদ্গণ বনের মহর্ষিগণের সহিত তোমার স্বস্তিবিধান করুন।···ছয় ঋতু, সকল মাস, সংবৎসর, রজনী দিন—এমন কি প্রতিটি মুহূর্ত্তও তোমার স্বস্তিবিধান করুক। পর্ব্বতসমূহ, সকল সমুদ্র—সমুদ্রাধিপতি বরুণ, দ্যৌ, অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, সমস্ত চরাচর, সকল নক্ষত্র এবং গ্রহগুলি সকল দৈবশক্তির সহিত আমাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বনে সর্ব্বদাই জন্য তোমাকে রক্ষা করুক।'

বাল্মীকি-কালিদাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টির ভিতর দিয়া আমরা ভারতীয় মনের একটি বিশেষ পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি। যে সরল বিশ্বাসী মনের পরিচয় রহিয়াছে সমস্ত বেদের পাতায় পাতায় বাল্মীকি এবং কালিদাসের কাব্যে পাইতেছি সেই মনেরই বিশেষ বিশেষ যুগানুরূপ পরিণতি। বৈদিক কবিগণ বিশ্বসৃষ্টির কোন অংশকেই একান্ত জড় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়াই যেন একটি অখণ্ড দৈবশক্তি নিজেকে বহু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। বৈদিকযুগে অবশ্য এই এক শক্তিকেই বহু প্রকাশের ভিতর দিয়া বৈদিক কবি ঋষিগণ বহু দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই বহুর ভিতরে বহুভাবে প্রকাশিত দৈবশক্তির একত্ব আসিয়া স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে আরণ্যক এবং উপনিষদের যুগে। বৈদিক প্রার্থনাগুলির ভিতরে আমরা দেখিতে পাইব, এক দিকে যেমন ইন্দ্র, বরুণ, উষা, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেবতাগণের বর্ণনা এবং তাঁহাদের নিকটে প্রার্থনা রহিয়াছে,—তেমনই প্রার্থনা রহিয়াছে জল, বায়ু, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, বনস্পতি, ওষধি, দিন-রাত্রি, সংবৎসর প্রভৃতি সকলের নিকটে। ঋক্‌সংহিতার ভিতরে দেখিতে পাই, কবি জলের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন,—

অপো দেবীরুপহ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ
সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্ত্বং হবিঃ॥ (১।২৩।১৮)

'জলরূপ দেবীকে আহ্বান করিতেছি—যেখানে আমাদের গরুগুলি পান করে; এই সিন্ধুদিগের জন্য আমাদের হবি বিধান করা কর্ত্তব্য।'

অপ্‌স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।
দেবা ভবত বাজিনঃ
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে।
ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্॥
(১।২৩।১৯-২২

'জলের মধ্যে অমৃত, জলের মধ্যে ঔষধ; অতএব জলের প্রশস্তির জন্য হে দেবস্বরূপ ঋত্বিক্‌গণ, আপনারা সত্বর হউন। জলের মধ্যে সকল ঔষধ আছে, জলের মধ্যে বিশ্বের সুখকর অগ্নি আছে, ইহা আমাকে সোমদেব বলিয়াছেন; সুতরাং জলই 'বিশ্বভেষজী'—অর্থাৎ সকল ভেষজের আধার। হে জল সমূহ, আপনারা আমার শরীরের নিমিত্ত রোগনাশক ঔষধকে পূরণ (অর্থাৎ ধর্দ্ধন) করুন, এবং আমরা যেমন নীরোগ হইয়া চিরকাল সূর্য্যকে দেখি। হে জল সমূহ, আমাতে যাহা কিছু পাপ আছে, অথবা আমি বুদ্ধি পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে যে দ্রোহ করিয়াছি, অথবা যে শাপ দিয়াছি, যাহা কিছু অসত্য বলিয়াছি তাহা সকল তোমার প্রবাহের দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যাও।'

ঋগ্‌বেদের ভিতরে বহু স্থানে দেখিতে পাই, ঋষি নদীর নিকট স্তবের দ্বারা প্রার্থনা জানাইতেছেন।—

উত ত্যে নঃ পর্ব্বতাসঃ সুশস্তয়ঃ সুদীতয়ো নদ্যস্ত্রামণে ভুবন্।
(৫।৪৬।৬)

'উৎকৃষ্ট স্তবার্হ পর্ব্বত সকল এবং দানশীল নদীগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভি-
র্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।
দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো
ঘৃতবৎপয়ো মধুমন্নো অর্চত॥ (১০।৬৪।৯)

'সরস্বতী, সরযূ, সিন্ধু—এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী-নদী (আমাদিগকে) রক্ষা করিতে আসুন। জলপ্রেরণকারিণী জননীস্বরূপা এই সকল দেবী আমাদিগকে ঘৃতবৎ এবং মধুমৎ জল অর্পণ করুন।' (রঃ দঃ)

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তটি সম্পূর্ণই নদীর স্তব; সেখানেও বলা হইয়াছে,—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী
শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া-
র্জীকীয়ে শৃণু হ্যা সুষোময়া। (১০।৭৫।৫)

'হে গঙ্গা! হে যমুনা, সরস্বতি, শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগত মরুৎবৃধা নদি! হে বিতস্তা ও সুসোমা-সংগত আর্জীকীয়া নদী! তোমরা শ্রবণ কর।' (রঃ দঃ)

মাতৃস্থানীয়া নদীদের সহিত মানুষের আত্মীয়তা মধুর হইয়া উঠিয়াছে। বিপাশা (বিপাশ্) শতদ্রু (শুতুদ্রি) নদীদ্বয়ের সহিত বিশ্বামিত্র ঋষির কথোপকথনে এই জলবতী বিপাশা ও শতদ্রু নদীদ্বয় শৈলের উৎসঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া সাগরসঙ্গমে গমনাভিলাষিণী হইয়া অশ্বশালা হইতে বিমুক্ত অশ্বদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধা করত—শুভ্র দুইটি গাভীর ন্যায়—বৎসলেহনাভিলাষিণী (গাভীদ্বয়ের) ন্যায়—বেগে প্রবাহিত হইতেছিল (৩।৩৩।১)। বিশ্বামিত্র ঋষি পিজবনের পুত্র সুদাস রাজার যজ্ঞ করাইয়া ধন-গবাদিসহ ফিরিতেছিলেন; জলভারে স্ফীত নদীদ্বয়কে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে
অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে
অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে।
অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমামযাসং
বিপাশমুর্বীং সুভগামগন্ম।
বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে
সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তী। (৩।৩৩।২-৩)

'ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার (ইন্দ্রের) প্রার্থনা রক্ষা করিবার জন্য তোমরা রথিদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ। তোমরা একযোগে প্রবাহিত হইয়া, তরঙ্গদ্বারা (পরিসর প্রদেশে) বর্ধিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট গমন করিয়া শোভা পাইতেছ। আমি মাতৃসমা সিন্ধুর (শতদ্রুর) নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, মহতী সৌভাগ্যবতী বিপাশা নদীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মাতৃদ্বয় বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় একই স্থান (সমুদ্র) লক্ষ্য করিয়া সঞ্চারমাণা।'

বিশ্বামিত্রের এই সকল স্তবস্তুতি শুনিয়া নদীদ্বয় বুঝিতে পারিল, ঋষির নিশ্চয়ই বিশেষ কোন প্রার্থনা রহিয়াছে; তাহারা বলিয়া উঠিল,—

এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা
অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।
ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ
কিংযুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি। (৩।৩৩।৪)

'আমরা এই জলদ্বারা বর্ধিত হইয়া দেবকৃত স্থানের অভিমুখে গমন করিতেছি। গমনে প্রবৃত্ত আমাদের এই উদ্যোগ নিবৃত্ত হইবার নহে; কি ইচ্ছা করিয়া এই বিপ্র বার বার নদীদিগকে আহ্বান করিতেছে?'

তখন বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন,—

রমধ্বং মে বচসে সোম্যায়
ঋতাবরীরুপ মুহূর্তমেবৈঃ।
প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষা
বস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ। (৩।৩৩।৫)

'হে জলবতী নদীদ্বয়, আমার সোমসম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্তের জন্য গমন হইতে বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রসাদাভিলাষে মহতী স্তুতিদ্বারা নদীকে আমার উদ্দেশে আহ্বান করিতেছি।'

নদীদ্বয় বলিল,—'নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে খনন করিয়াছেন,—জগৎপ্রেরক সুহস্ত দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন,—তাঁহার আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হইয়া গমন করিতেছি।' (৩।৩৩।৬)।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—'ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বীরকর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন (অবরোধকারীদিগকে) বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। গমনাভিলাষে জল সমূহ আগমন করিয়াছিল।' (৩।৩৩।৭)।

নদীদ্বয় বলিল,—'হে স্তোতা, তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করিতেছ, তাহা বিস্মৃত হইও না; ভবিষ্যৎ যজ্ঞদিবসে তুমি উক্থ রচনা করিয়া আমাদিগকে সেবা করিও। আমরা তোমাকে সেবা করিতেছি, আমাদিগকে পুরুষের ন্যায় (প্রগল্‌ভ) করিও না।' (৩।৩৩।৮)

নদীদ্বয়কে কিঞ্চিৎ প্রসন্নমনা দেখিয়া বিশ্বামিত্র মুনি তখন তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন,—

ও ষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত
যযৌ বো দূরাদনসা রথেন।
নি ষূ নমধ্বং ভবতা সুপারা
অধো অক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ। (৩।৩৩।৯)

'হে ভগিনীদ্বয়, স্তবকারী আমার কথা শোন,—আমি অতি দূর হইতে অশ্ব ও রথ লইয়া তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি; তোমরা সু-অবনত হও, সুপারা হও (অর্থাৎ আমি যেন অনায়াসে অশ্বরথাদি লইয়া ওপারে যাইতে পারি),—হে নদীদ্বয়, তোমরা স্রোতের জল লইয়া রথচক্রের অক্ষের অধোদেশে গমন কর।'

তখন নদীদ্বয় বলিল,—

আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি
যযাথ দূরাদনসা রথেন।
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা
মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে। (৩।৩৩।১০)

'হে স্তোতা, আমরা তোমার কথা শুনিব, অশ্ব এবং রথের সহিত গমন কর; তুমি দূর হইতে আসিয়াছ,—সুতরাং আমরা তোমার জন্য অবনত হইতেছি; স্তন পান করাইবার জন্য মায়েরা যেমন অবনত হইতেছি,—যুবতি যেরূপ মনুষ্যদিগকে আলিঙ্গন করার

সেইরূপ অবনত হইতেছি।" এখানকার 'পীপ্যানেব যোষা' এই একটি উপমার ভিতর দিয়া বৈদিক কবির ভাবদৃষ্টি একটি অপূর্ব প্রকাশ লাভ করিয়াছে। মা যেমন শিশুকে স্তন পান করাইবার জন্য অবনত হয়,—সে অবনতির ভিতরে যেমন কোন অপমান নাই, রহিয়াছে মাতৃত্বের অসীম গৌরব, নদীদ্বয়ও স্তবকারী বিশ্বামিত্রের নিকটে ঠিক তেমন করিয়াই অবনত হইবে।

বেদ পড়িলে অনেক স্থানে মনে হয়, কুলুকুলুনাদিনী নদীদিগের সত্যই একটা ভাষা রহিয়াছে—তাহাদের একটা বলিবার কথা রহিয়াছে; বেদের কবি যেন নদীর এই ভাষা কিছু কিছু জানিতেন। এক স্থানে দেখিতে পাই, কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

এতা অর্ষন্ত্যললাভবন্তী-
র্ঋতাবরীরিব সংক্রোশমানাঃ।
এতা বি পৃচ্ছ কিমিদং ভনন্তি
কমাপো অদ্রিং পরিধিং রুজন্তি॥ (৪।১৮।৬)

'অল-লা' এইরূপ শব্দ করিতে করিতে এই জলবতী (নদীগণ) হর্ষযুক্ত শব্দ করত গমন করিতেছে। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহারা কি বলিতেছে। জল সমূহ আবরক কোন্ মেঘকে ভেদ করে?'

ঋষি-কবিগণ রাত্রির নিকটেও আহ্বান জানাইয়াছেন,—'হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেসিনীং'—জগতের উপবেশনস্থল রাত্রিকে আহ্বান করিতেছি। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তে অতি মনোহর রাত্রির স্তব দেখিতে পাই,—রাত্রি আসিয়া চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, নক্ষত্র সমূহের দ্বারা অশেষ শোভা সম্পাদন করিয়াছে,—যাহারা নিম্নে থাকে এবং যাহারা ঊর্ধ্বে থাকে, রাত্রি তাহাদের সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; গ্রাম সমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে,—পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ—সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে। এই রাত্রির নিকট ঋষিকবি প্রার্থনা করিতেছেন,—

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ॥

*   *   *

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব॥

*   *   *

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥ (১০।১২৭।৪, ৬, ৮)

'পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভকরী হউন।... হে রাত্রি, বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও; চৌরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও।... হে আকাশের কন্যা রাত্রি! তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।' (ঋঃ দঃ) (১)

বেদের ভিতরে বহু স্থানেই দ্যাবাপৃথিবী—অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর নিকট স্তব এবং প্রার্থনা দেখিতে পাই। প্রায় সর্বত্রই এই দ্যাবা-পৃথিবী প্রাণিগণের পিতামাতারূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক স্থানে বলা হইয়াছে—

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥

*   *   *

ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা
অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্ দুরিতাদভীকে
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥ (১।১৮৫।২,১০)

'পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবা-পৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণিসমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবি! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।... আমি প্রজ্ঞাবান্, আমি দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশে চারি দিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি, পিতা-মাতা নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্বদা নিকটেই রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন।' (ঋঃ দঃ)

দশম মণ্ডলের ১৪৬ সূক্তে যে অরণ্যানীর বর্ণনা ও স্তব রহিয়াছে সে বর্ণনার সহিত কবির অন্তরঙ্গতা লক্ষণীয়। প্রথমেই কবি বলিতেছেন,—

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী॥
(১০।১৪৬।১)

'হে অরণ্যানি! হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান হইয়া যাও (অর্থাৎ কত দূর চলিয়াছ, স্থির করা যায় না)। তুমি গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় করে না?" (ঋঃ দঃ) এই অরণ্যানীর ভিতরে মাঝে মাঝে যে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত সে যুগের কবির তাহার সহিত পরিচয় রহিয়াছে। ভয়বিহ্বল কবির মনে প্রকৃতির এই রুদ্ররূপের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহ দেখা যায়!—

যদযুক্‌থা অরুষা রোহিতা রথে বাতজূতা
বৃষভস্যেব তে রবঃ।
আদিন্বসি বনিনো ধূমকেতুনাগ্নে সখ্যে
মা রিষামা বয়ং তব॥
অধ স্বনাদুত বিভ্যুঃ পতত্রিণো
দ্রপ্সা যত্তে যবসাদো ব্যস্থিরন্।
সুগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যোঽগ্নে
সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ (১।৯৪।১০-১১)

'হে অগ্নি, যখন তোমার রোচমান লোহিত এবং বায়ুগতি অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত কর, তখন তোমার রব বৃষভের ন্যায় হয়; তাহার পর বনভূমির বৃক্ষ সকলকে ধূমরূপ কেতুর দ্বারা আচ্ছন্ন কর। তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হই না। হে অগ্নি, অনন্তর ... ... করিতে ... তোমার গভীর শব্দ শুনিয়া

---

(১) যাং দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীং।
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী।
(অথর্ববেদ-সংহিতা, ৩।১০।২)

আরও দ্রঃ—অথর্ববেদ-সংহিতা, (১৯।৪৭।১-২, ১৯।৫০।২, ৫, ৮)

পশিগণ ভীত হয়, তোমার জ্বালায় এক দেশ অরণ্যের তৃণগুলির ভক্ষক হইয়া তখন বিবিধ প্রকারে অবস্থিতি করে, তখন তোমার এবং তোমার রথের পথ সুগম হয়। তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হই না।'

চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে 'ক্ষেত্রপতি' দেবতার স্তব দেখিতে পাই। ইনি শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ইঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া কবি বলিতেছেন,—

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো
　　　মধুমন্নো ভবন্ত্বন্তরিক্ষং।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্ব—
　　　রিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম।
শুনং বাহা শুনং নরঃ
　　　শুনং কৃষতু লাঙ্গলং।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং
　　　শুনমষ্ট্রামুদিংগয়।
শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ
শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং। (৩-৪,৮)

'ওষধী সমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব। বলীবর্দ সমূহ সুখে (বহন করুক), মনুষ্যগণ সুখে (কার্য্য করুক), লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক, এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।···ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জন্য মধুর জল দ্বারা (পৃথিবী সিক্ত করুন)। হে শুনাসীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।' (রঃ দঃ)

এই সকল প্রার্থনারই পূর্ণতম রূপ দেখিতে পাই নিম্নোক্ত প্রার্থনায়—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসঃ।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

'বাতাস সকল ঋতুতেই মধু বহন করে, নদীসকল মধু ক্ষরণ করে, আমাদের ওষধিগুলি মধুময় হউক; রাত্রি মধুময় হউক, উষা মধুময় হউক। পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক, আমাদের পিতা ও দ্যুলোক মধুময় হউক; আমাদের বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য মধুমান্ হউক—আমাদের গোরুগুলিও মধুময় হউক।'

বিশ্বসৃষ্টির পানে তাকাইয়া বেদের ঋষি সকলের নিকটেই প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ
সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্বন্তরিক্ষং।
শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো
ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতি শৃণোতু
যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রং। (৩।৫৪।১১-২০)

'পৃথিবী, দ্যুলোক, জলসমূহ, সূর্য ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরিক্ষ আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করুন। অভীষ্টবর্ষী (মরুৎগণ) এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্য দ্বারা হৃষ্ট হইয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, মরুৎগণ আমাদিগকে কল্যাণকর সুখ দান করুন।' (রঃ দঃ)

প্রৈব স্তোমঃ পৃথিবীমন্তরিক্ষং
বনস্পতীঁ রোষধী রায়ে অশ্যাঃ।
দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং
মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ। (৫।৪২।১৬)

'ধনের নিমিত্ত সংস্কৃত এই স্তোত্র পৃথিবী, স্বর্গ, বৃক্ষ, ওষধিবর্গের নিকট উপস্থিত হউক; আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হই; মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহ বুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন।' (রঃ দঃ)

অবন্তু মামুষসো জায়মানা
অবন্তু মা সিন্ধবঃ পিন্বমানাঃ।
অবন্তু মা পর্বতাসো ধ্রুবাসো-
বন্তু মা পিতরো দেবহূতৌ।
　···　　　···　　　···
পর্জন্যো ওষধীভির্ময়োভু
রগ্নিঃ সুশংসঃ সুহবঃ পিতেব। (৬।৫২।৪,৬)

'জায়মানা উষা আমাদিগকে রক্ষা করুন, স্ফীত সিন্ধুগুলি আমাকে রক্ষা করুক, নিশ্চল পর্বতগণ আমাকে রক্ষা করুক।··· ওষধিগণের সহিত পর্জন্য যেন আমাদিগের সুখদাতা হন, অগ্নি যেন পিতার ন্যায় অনায়াসে স্তুত্য ও আহ্বানযোগ্য হন।' বেদের কতকগুলি সূক্ত এই সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত বিশ্বদেবতাগণের স্তুতিতে মুখরিত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্র সেন

জানালায় আনমনে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চন।

এ পাড়ায় সে কাঞ্চন নামেই পরিচিত। তা'র আগেকার জীবনে আর একটা নাম ছিল। সে নামে তাকে আর কেউ ডাকে না।

কাঞ্চন ভুলে গেছে সে নাম। সেই নামের সঙ্গে যেন তারও হয়েছে মৃত্যু। তার অতীত জীবনের চিতা-ভস্মের উপর নূতন জীবন নিয়ে এসে নূতন নামে দাঁড়িয়েছে কাঞ্চন।

অপরাহ্ণের নিস্তেজ, পড়ন্ত রোদের এক ঝলক এসে পড়েছে কাঞ্চনের মুখে, তাতে আরও করুণ, বিষণ্ণতর দেখাচ্ছে তার মুখখানি।

কয়েক দিন ক্রমাগত অজস্র অবিরল বৃষ্টির পর বিকালের দিকে রোদ উঠেছে আজ। নরম, মিঠে রোদ। আলো আছে, তাপ নেই এ রোদে। হাল্কা ঘুমের স্বপ্নময় কোমল আমেজ-মাখানো যেন।

কলকাতায় এমন একটা পল্লী, যে পল্লীর নাম করতেও শরীরটা কুঁচকে যায়। তারই একটা পুরানো বাড়ীর জানালায় দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চন। জৌলুসহীন, জীর্ণ, বাড়ীটার বাইরের চেহারা। পলাস্তারার আস্তরণ খসে খসে', ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গেছে অনেক দিন। বেরিয়ে-পড়া ইটওয়ালা জানালাগুলি মুখ-থুবড়ানো বুড়ীদের দাঁতের হাসির মতোই বীভৎস। ভিতরটা চুণকাম, রং আর বার্ণিশের প্রলেপে ঝক্‌ঝকে। তক্‌তকে দামী আসবাব। সোফা, কৌচ—আধুনিক সেটিতে সাজানো। মেঝেতে কাশ্মীরী গালিচা। দেয়ালে গিল্টী-করা বিলিতি ফ্রেমে বড় বড় ছবি,—নিরাবরণ যৌবন-বিলাসের উদগ্র উত্তেজনায় উজ্জ্বল।

ভিতরের উঠানে জায়গায় জায়গায় উঠে গিয়েছে সিমেন্ট। এক একটা অগভীর গর্ত দেখা দিয়েছে কদর্য্য ক্ষতের মতো। নীল শেওলায় ঢাকা গর্তগুলিতে জমে' আছে বৃষ্টির জল। এক রকমের ছোট ছোট উড়ন্ত পোকার ঝাঁক ঘুরে' বেড়াচ্ছে সেই জলের ওপর।

কাঞ্চন চেয়ে আছে বৃষ্টির জলে-ভরা গর্তগুলির দিকে। শূন্য, উদাস, অপলক দৃষ্টি। উঠানের পঙ্কিল পরিবেশের সঙ্গে এই পল্লীর,—বিশেষ করে' কাঞ্চনের জীবনের মিল আছে যেন।

ভিজে বাতাসের শীতল স্পর্শ শির শির করছে তার সারা দেহে। একটা বিষণ্ণ, ব্যাকুল আর্দ্র তার সঙ্গে কি যেন প্রবল আলোড়ন চলেছে তার মনে।

এমনই আলোড়ন সর্বদা জাগে কাঞ্চনের মনে। অতীত স্মৃতির রোমন্থন করাই এখন তার একমাত্র কাজ। ভবিষ্যতের দিকে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে,—একেবারে মুছে গেছে যেন। বাইরের জগৎ থেকে তার দৃষ্টির মোড় ঘুরে' গেছে, ভিতরের দিকে,—মনের পর্দায় ফেলে-আসা জীবনের ছোট-খাটো সুখ-দুঃখের শত রকমের যে সমস্ত টুকরো টুকরো কথা ও ঘটনা অহরহঃ চলমান চিত্রের মতো ফুটে ওঠে, তার দিকে তার দৃষ্টি হয়ে উঠেছে প্রখর।

বর্তমান জীবনের একটুও বৈচিত্র্য নেই তার কাছে। এই জীবন-পরিণতির প্রতি সে হয়ে উঠেছে বিতৃষ্ণ। তার জীবনের শ্মশান-ভূমির ওপর আজ চলেছে প্রেতের উৎসব।

কত কথাই না তার মনে পড়ে···

তার ছোট ভাইটি কত বড় হয়েছে আজ? আজও সে তেমনি দুষ্টু আছে কি না? স্কুলে যাওয়ার সময় দিদি তার জামা-কাপড়-চোপড়

না পরিয়ে দিলে হ'ত না। দিদি না খাইয়ে দিলে তার পেটই ভরত না। কাঞ্চন চলে আসার পর সে না জানি কত 'দিদি' 'দিদি' বলে কেঁদেছে,—পাড়ার সকল জায়গায় তাকে ডেকে ডেকে খুঁজেছে। তাকে না পেয়ে কত না অভিমান হয়েছে তার! দিদির হাতে না খেয়ে আর কোন দিনই হয়তো তার পেট ভরেনি এবং আজও হয়তো ভরছে না।···

উঃ, সে আজকের কথা নয়, পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেছে এরি মধ্যে। এই পাঁচ বছর আগে সে ফেলে এসেছে তার বাবা-মাকে। এত দিনও কি বেঁচে আছেন তাঁরা?—না, তার দেওয়া আঘাত সামলাতে না পেরে, ধ্বসে' ধ্বসে' মারা গেছেন? উঃ তাই যদি হয়ে থাকে, তা হ'লে ছোট ভাইটিকে কে দেখ্‌ছে? কার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে? কে তাকে দু'টি খেতে দিচ্ছে? হয়তো দু'টি ভাতের জন্যে সে ফিরছে দোরে দোরে···। নাঃ, আর ভাবতে পারে না কাঞ্চন। কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে যায় তার মাথার মধ্যে। খেই হারিয়ে ফেলে সে। যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠেছে সে, এমনই প্রাণান্তকর অস্বস্তিতে তার বুকটা ধড়ফড় করে।

বর্তমান অত্যন্ত অসহ্য কাঞ্চনের কাছে। বর্তমান জীবনের প্রতিদিনের সুতীব্র ধিক্কার জর্জরিত করে তুলছে তাকে। তাই সে ফিরে যেতে চায়, আশ্রয় নিতে চায় অতীতের ছোট-বড় নানা রকমের সুখ-দুঃখের কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু অতীত জীবনের স্মৃতির এই রোমন্থনও তার মনে সান্ত্বনার বদলে জ্বেলে দেয় অনুতাপের আগুন,—ধিক্কারের আকাশ ছোঁয়া প্রচণ্ড জ্বালা।

অতীত, বর্তমান—কোন দিক থেকেই সান্ত্বনা নেই কাঞ্চনের। ভিতরে-বাইরে শিখা-হীন, নিরবয়ব আগুনের জ্বালা হু হু করে জ্বলে দুঃসহ দাহ নিয়ে। সে দাহের জ্বালা থেকে পরিত্রাণ নেই, একটু জুড়িয়ে হাঁফ ছাড়বার মতো আশ্রয় নেই তার।

পলাশপুরের দিগন্ত-জোড়া, উদার অবাধ নীলে ঢাকা আকাশের জন্য ছটফট করে কাঞ্চনের মন। বাড়ীর সামনে নদীর ওপারের সেই ধানক্ষেতের অথই সবুজের দোলা যেন আজো তার মনের কিনারায় এসে লাগে। কোমল ধানের চারাগুলোর শীতল স্পর্শ মাখা হাওয়া লাগলে বোধ হয় জুড়িয়ে যেত তার দেহ-মন! কিন্তু সে পথ তার কাছে চির দিনের মতো রুদ্ধ। যে অতীত তার কাছে দেখা দেয় অনুতাপের আগুন আর বেদনার দাহ নিয়ে, তবু সেই অতীতেই ফিরে যায় সে। ভয়াবহ দুঃসহ বর্তমানকে ভুল্‌তে তা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, আশ্রয় নেই তার।

কাঞ্চনের মনে পড়ে বাড়ীর সিঁদুরে আমগাছটির কথা। ঘরের চাল ঘেঁষে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে চার ধারে ডালপালা ছড়িয়ে। আজো হয়তো তেমনি বউল আসে সিঁদুরে আমগাছে আর তেমনি একটানা গুঞ্জনে মেতে ওঠে ছোট ছোট মৌমাছির ঝাঁক। গাছের তলাটা ঝরা বউল আর মধুতে ঢেকে যায় একেবারে।···

বড়-ঘরের দাওয়ার কোণ ঘেঁষে ছোট্ট একটা ফুলের বাগান করেছিল কাঞ্চন। সে বাগানের চিহ্নমাত্রও বোধ হয় নেই এত দিনে। সন্ধ্যা-মালতী আর দোপাটী ফুলের কত অজস্র চারাই না আপনা থেকে গজাত সেখানে! চারাগুলি উঠিয়ে লাইন বেঁধে লাগিয়ে দিত সে। অনাদরে আর হয় ত ফুলের চারা গজায় না। অযত্নে অবহেলায় কোন ফুলের গাছই হয়তো আর নেই তার বাগানে। সেখানে কেবল জন্মেছে বুনো ঘাসগাছা আর ঘাসের জঙ্গল।···

তার অতি আদরের টিয়ে পাখীটা হয়তো মরে গেছে এত দিন। ঝড়ে ভেঙে-পড়া নারকেল গাছের গর্ত থেকে সে পেয়েছিল টিয়ে পাখীর ছোট্ট একটা ছানা। ডিম থেকে ফুটে বেরোন একেবারে কচি ছানা। মায়ের মতো যত্ন আর স্নেহ দিয়ে সে বড় করেছিল বাচ্চাটিকে, সবুজ কোমল মখমলের মতো পালক গজিয়েছিল তার ডানায়। তাই দেখে কতই না আনন্দ হয়েছিল কাঞ্চনের।···

তাদের কাজলী গাইটা-ই বা কেমন আছে কে জানে? তার বাছুর হ'লে কাঞ্চন তার নাম রেখেছিল মঙ্গলী। মঙ্গলীরও হয়তো এত দিনে বাছুর হয়েছে, সে-ও হয়তো দুধ দিতে আরম্ভ করেছে এত দিন।···

কাঞ্চনের আর মনে পড়ে অনুপমকে। তার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালবাসা যে পুরুষের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল, সেই অনুপম,—তার যৌবন, আর জীবন দস্যুর মতো লুঠ করেছিল আর তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল, যে নিষ্ঠুর প্রতারক অনুপম।···

সে দিনটা আজও মনে আছে কাঞ্চনের, যে দিন অনুপমের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল তার।

কি কুক্ষণেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, এ ভুল বুঝতে বেশী দেরী হয়নি কাঞ্চনের। আর, সেই ভুলের দাম তাকে দিয়ে যেতে হবে সারা জীবন।

তার বন্ধু মঞ্জুলার বিয়েতে কলকাতা থেকে গিয়েছিল বরযাত্রীর দল। অনুপমও গিয়েছিল তাদের সঙ্গে।···

বাঁশীর সুরে বিয়ের বাসরে কেমন যেন নেশা লাগে অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের মনে। ফুল, চন্দন, নূতন শাড়ী-কাপড়, এসেন্স, স্নো ইত্যাদির বহু বিচিত্র গন্ধ মিলে কেমন যেন একটা বিহ্বলতা ভেসে বেড়ায় বাতাসে, যার মাদকতায় অবাস্তব উদ্‌ভ্রান্তিতে মেতে ওঠে তাদেরই মন, বিবাহিত জীবন যাদের কাছে অনাস্বাদিত এবং যারা তার জন্যে লোলুপ।

সে দিন এমনি লুব্ধতায় প্রশ্রিত হয়ে উঠেছিল কাঞ্চনের মন। তার চোখে লেগেছিল কিসের যেন একটা রং। এই রংয়ের অঞ্জন পরে সে দেখেছিল অনুপমকে। অনুপমের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হতেই সে নামিয়ে নিয়েছিল তার চোখ দুটি। অপরিসীম লজ্জায় লাল হয়ে আলা করে উঠেছিল তার গাল দুটি। এর পর যত বারই সে মুখ তুলেছে, তত বারই অনুপমের চোখের সঙ্গে চোখ মিলেছে তার। সে দৃষ্টিতে যেন ছিল চুম্বকের অমোঘ আকর্ষণ। ক্ষুধার্ত অজগরের হিংস্র উজ্জ্বল, লোলুপ আর দুর্বার দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়ে যেন ধরা দিয়েছিল অসহায় হরিণী। বিয়ের শেষে গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে এল কাঞ্চন। সারারাত্রি ঘুম এল না তার দুটি চোখে, ছটফট করে রাত্রি কেটে গেল। কি যেন এক সর্বনাশা আকর্ষণে তাকে আকৃষ্ট করছিল অনুপমের লালস লোলুপ চোখ দুটি।

পরদিন। সকাল হ'তেই সে ছুটে গেল মঞ্জুলাদের বাড়ী। বাসর-শয্যায় তখনও বসে মঞ্জুলা আর তার বর প্রতিবেশী মেয়েদের আড্ডায় অনুষ্ঠানের অপেক্ষায়। সেখানে এসে জুটেছে অনুপম—মঞ্জুলার কাছে জীবনের স্মরণীয় রাত্রিটির ইতিহাস শুনতে।

লজ্জায় ঘেমে উঠল কাঞ্চন। বিয়ের সভায় গ্যাসের আলোতে যাঁকে সে দেখেছিল দূর থেকে, আজ তাকে সে দিনের আলোতে দেখছে একেবারে চোখের সামনে মুখোমুখি। লজ্জাপীড়িত, সঙ্কোচে আড়ষ্ট পা-দু'খানিকে টেনে নিয়ে ফিরে' আসার উপক্রম করছিল কাঞ্চন। কিন্তু তাকে ডেকে ফেরাল অনুপম :—এই যে আসুন। আমি এসেছি বন্ধুর কাছে গত রাত্রির কুশল-প্রশ্ন করতে। আপনিও আপনার বন্ধুকে নিশ্চয়ই তা করতে পারেন।

কোন উত্তর দিতে পারল না কাঞ্চন। ধীরে ধীরে গিয়ে মঞ্জুলার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো নত মুখে।

উচ্ছ্বসিত, প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল অনুপম। বন্ধু, আর বন্ধু-পত্নীকে ছেড়ে' সে মুখর হ'য়ে উঠল কাঞ্চনকে নিয়ে। শত রকমের হাস্য-পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ শ্লেষে বিব্রত করে তুলল তাকে।

লজ্জা-সঙ্কোচের জড়তা কাটিয়ে উত্তর দিতে হ'ল কাঞ্চনকেও। এমনি করে' অনুপমের সঙ্গে আলাপ সুরু হ'ল কাঞ্চনের। তার সারা দিন কাটল বিয়ে-বাড়ীতে—মঞ্জুলার সখিত্বের অনুরোধে নয়,—অনুপমের আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গলাভের আশায়। সন্ধ্যার সময় বিদায় নেবার উপলক্ষে প্রেম-নিবেদন করল অনুপম। অজানা পুলকের আবেগে থর থর কেঁপে উঠল কাঞ্চনের সারা দেহ। তখন একটি কথাও বলতে পারল না সে। কিন্তু তার গাল দুটির পুলকাঞ্চিত লজ্জার আরক্তিম আভা নিঃসন্দেহে জানিয়ে দিল এই প্রেম-নিবেদনে তার মৌন স্বীকৃতি।

এর পর কাঞ্চনের কয়েক মাস কেটে গেল একটা রঙীন স্বপ্নের মাদকতার ভিতর দিয়ে। রূপে, রসে, ছন্দে তার দেহে যে যৌবনের আবির্ভাব হয়েছিল, তা'তে যেন এত দিন কোন চেতনা ছিল না, উন্মাদনা ছিল না কলরব ছিল না,—একটা শান্ত নিস্পন্দ রূপায়ণের ভিতর দিয়ে তার যৌবন-শ্রী পরিপূর্ণতার দিকে দল মেলে চলেছিল শুধু। কিন্তু আজ তার যৌবন-শ্রী অনুপমের যাদু-স্পর্শে জেগে উঠেছে কল-গুঞ্জনে, মুখর প্রগলভতায়। আজ আয়নাতে মুখ দেখে তার নিজের মনেই বিভ্রম জাগে। রূপে-রেখায়, নিটোল পরিপূর্ণতায় কঠিন-কোমল বন্ধুরতায় ভরে' উঠেছে তার দেহ।

অনুপমের প্রণয়-আবেদন তার দেহে-মনে এনে দিয়েছে দুরন্ত যৌবনের জাগরণ। তার যৌবন এখন চায় রূপ আর রসের বিলাসে পূর্ণ অভিব্যক্তি।

প্রতি সপ্তাহে একখানা করে অনুপমের চিঠি আসে কাঞ্চনের কাছে। রঙীন খামে, রঙীন কাগজে সুদীর্ঘ চিঠি। রঙীন যৌবনের রসভরা লিপি,—ছত্রে ছত্রে তার প্রণয়-আবেদন আর হৃদয়াবেগ।

প্রথম প্রথম বাপ-মা জিজ্ঞাসা করতেন :—কার চিঠি এল রে?

বিব্রত সুরে কাঞ্চন উত্তর দিত :—মঞ্জুলা লিখেছে শ্বশুর-বাড়ী থেকে।

—কেমন আছে তারা?

—ভাল আছে।

সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইত কাঞ্চন।

এর পর তাঁরা চিঠি-আসাতে খোঁজ-খবর নেওয়ার দরকার আর [illegible]। কখন চিঠি আসে, আর কখন তার উত্তর যায়, তা'-ও তাঁদের নজরে আসত না। ডাক-টিকেট অথবা ঠিকানা-লেখা খাম চিঠির মধ্যেই থাকত।

কেমন যেন একটা নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল কাঞ্চনের মন। এক দিন চিঠি আসতে দেরী হ'লে সে ছটফট করে, চিঠির আশায় পিয়নের জন্য অধীর অপেক্ষায় বাড়ীর সদর দরজায় পায়চারি করে' তার সময় কাটে।

চিঠি পেলে অমনি ছুটে গিয়ে কোথায় আড়ালে লুকিয়ে গোপনে চিঠিখানা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবে,—তা'রি জন্যে ছটফট করে।

মঞ্জুলাকে নিয়ে তার স্বামী অবনীশ এল শ্বশুর-বাড়ীতে। তাদের সঙ্গে এল অনুপমও, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর শ্বশুর-বাড়ীতে বেড়াতে।

কাঞ্চনের জন্যে অনুপম নিয়ে এল ক'খানা ভাল রঙীন সাড়ী, সেমিজ, ব্লাউস্, সাবান, স্নো, পাউডার আর গন্ধ-তেল। স্যুটকেস্ খুলে অনুপম জিনিষগুলি একে একে বার করে দিল কাঞ্চনকে।

প্রথমে জিনিষগুলি নিতে চায়নি কাঞ্চন। অপরিমিত কুণ্ঠায় দূরে সরে দাঁড়িয়ে রইলো। জিনিষগুলি অনুপম অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে উঠিয়ে রাখতে যাচ্ছিল স্যুটকেসে। অমনি কাঞ্চন এক রকম জোর করেই সেগুলি নিল টেনে। পরম কৃতার্থতার হাসির চমক খেলে গেল অনুপমের চোখে-মুখে।

বাড়ীতে এসে কাঞ্চনকে বলতে হ'ল, মঞ্জুলা শ্বশুরবাড়ীতে এত জিনিষ পেয়েছে যে, তা তার দুটি বড় বড় ট্রাঙ্ক আর দু'টি স্যুটকেসেও ধরে না। কিছুরই অভাব নেই তার। তাই তার উপহার-পাওয়া জিনিষগুলি থেকে নিতান্ত ভালবেসেই এই ক'টি জিনিষ সে দিয়েছে কাঞ্চনকে।

অনুপমের এবারে বেড়াতে আসার উদ্দেশ্য বুঝল কাঞ্চন। সন্ধ্যার পর ও-দিকের একটি ঘরে জামাই নিয়ে আনন্দ-কোলাহলে মুখর আর ব্যস্ত সবাই। এ-ঘরে কেবল অনুপম আর কাঞ্চন।

অফুরন্ত কথার উদ্দাম স্রোতে নিজে ভেসে যাচ্ছে অনুপম, আর তার সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে কাঞ্চনের মনকেও। রামধনু-রঙা কল্পনায় প্রশ্রিত হয়ে উঠেছে দু'জনারই মন। অনুপম কাঞ্চনকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে বসল। সুবিশিষ্ট পাত্র হিসাবে অনুপমের তুলনা নেই। রূপে-গুণে অমন পাত্র যার মেলে, তার তো নিতান্ত ভাগ্যের জোর বলতে হবে। তার পর কুবেরলাল-ধনপতিলাল এণ্ড কোম্পানীর মতো অত বড় মাড়োয়ারী ফার্ম অনুপমের মুঠোর মধ্যে। ফার্মের মালিক অনুপমের কথায় ওঠে, বসে। কাজেই অনুপমের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে তার সৌভাগ্য তো ঈর্ষার যোগ্য।

এ সব কথা ভেবে দেখল এক মুহূর্তের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে সে আরো ভাবল, এ বিয়েতে যে বাধা সব চেয়ে বড়, তার কথা। এক জাত না হ'লে, পাল্টি ঘর না হ'লে বিয়ে দেবেন না তার বাপ-মা। অথচ এত-সব দেশ-ভক্তি, জাত-বৈষম্য, রুচি-বিচ্যুতির কথা চুকিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্যও নেই তাঁদের।

উদ্দীপ্ত হ'য়ে বলে যেতে লাগল অনুপম, জাতের প্রশ্ন এ-যুগে একেবারে অচল। ও-সব চলত মধ্যযুগে। বিংশ শতাব্দীর [illegible] এ-সব চলবে না। এই সব মধ্যযুগীয় রীতি-নীতির জন্যেই সমাজের এত ক্ষতি হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের এই সবার [illegible] বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত। এ যুগ হচ্ছে

বিদ্রোহের যুগ। শান্তশিষ্ট ভাবে, অম্লান বদনে, নীরবে অত্যাচার আর অনিয়ম মেনে চলার যুগ এ নয়। তাই এ যুগে চলেছে উচ্চের বিরুদ্ধে নীচের বিদ্রোহ, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মজুরের বিদ্রোহ, শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের বিদ্রোহ। প্রতিবাদ জানাতে হ'বে, বিদ্রোহ করতেই হ'বে। অসহায় ভাবে অন্যায় সয়ে যাওয়া পাপ। ইত্যাদি।

বিদ্রোহ-স্পৃহার ছোঁয়াচ লাগল কাঞ্চনের মনেও। কিন্তু পর-ক্ষণেই মনে পড়ল বাপ-মায়ের অসহায় স্নেহ-করুণ মুখ, আর পরম স্নেহভাজন ছোট ভাইটির কথা।

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'ল, এই বিয়েতে কাঞ্চন তার বাপ-মায়ের মত নেবে। তাঁদের মতামত অনুসারে তারা তাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করবে।

অনুপম চলে গেল কলকাতায়। ক'দিন বাদে কাঞ্চন অনুপমের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা ভাবে যাচাই করল তার বাপ-মায়ের মত। কোন আশার আলোক দেখতে পেল না কাঞ্চন। তার বাপ-মা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করলেন। এঁদের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে অনুপমের কথাগুলি ঝঙ্কার দিচ্ছিল কাঞ্চনের মনে। কিন্তু মুখ ফুটে' কোন কথাই বল্‌তে পারল না সে।

অবশেষে তার বাপ-মায়ের অমতের কথা অনুপমকে লিখে' জানাল কাঞ্চন।

তার উত্তরে অনুপম সংক্ষেপে শুধু লিখল, যদি বাপ-মায়ের আবেষ্টন ছেড়ে কাঞ্চন আস্‌তে পারে, তবে অনুপম তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে পরম সমাদরে রাখবে। নতুবা সে যেন অনুপমকে ভুলে যায় একটা দুঃস্বপ্নের মতো এবং সে যেন আর চিঠিপত্র না লেখে। কারণ, এই মিথ্যা অভিনয়ের কোন মূল্য নেই সত্যিকারের জীবনে।

উভয়-সঙ্কটে পড়ে চোখে অন্ধকার দেখল কাঞ্চন। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। কিছুই স্থির করতে পারল না সে। এ-দিকে অনুপমের চিঠি আসাও বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত পৃথিবী বর্ণ-গন্ধহীন বিস্বাদ বলে মনে হতে লাগ্‌ল কাঞ্চনের কাছে।

অবশেষে কাঞ্চন লিখল অনুপমকে, তাকে পাওয়ার জন্যে পৃথিবীর সব কিছুই ছাড়তে প্রস্তুত আছে সে। নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে এল অনুপম। তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হ'ল কাঞ্চন।

এ-সব কথা মনে করে' কাঞ্চনের মনে আজও যেন কেমন একটা অনুভূতি জাগে। কি যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সে কথা মনে করে আজও কেমন যেন একটা ভীতি-মিশ্রিত পুলকের আবেশে তার সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগে।

সে-দিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে কাঞ্চনের মনে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দু'মাইল পথ পায়ে হেঁটে, অনুপমের সঙ্গে সে ট্রেণে এসে উঠেছিল। ট্রেণ না ছাড়া পর্য্যন্ত তার কেবলই মনে হয়েছিল, এই বুঝি কেউ এসে তাকে ধরে ফেল্‌বে, একটা হৈ-চৈ বেধে যাবে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে করতে তবে ট্রেণ ছাড়ল। ট্রেণ ছাড়লেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌বার উপায় কই? যদি পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! সে জন্য অনভ্যস্ত মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে আস্‌তে হয়েছিল তাকে।

কলকাতায় এসে সে উঠল ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ীতে, সহরের এক কোণে। অনুপম তার সীঁথিতে সিঁদুর ছুঁইয়ে দিল। হাতে লোহা আর শাঁখা উঠতেও কসুর করল না।

কয়েক মাস পর।

—নাঃ। এ বাড়ীতে আর থাকা চল্‌বে না। বাড়ীওয়ালা অন্ততঃ দু'মাসের ভাড়া আগাম চায়। যত সব চশমখোরের দল। এক দিন এসে বলল অনুপম।

তার পর তারা উঠে গেল অন্য বাসায়। এই বাসায় এসে কেমন যেন সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল কাঞ্চনের মনে। পল্লীটা ভাল বলে মনে হল না তার। চারি দিকের অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় তিক্ততার ভরে উঠল তার মন।

উভয়ের সম্মতির উপরই প্রতিষ্ঠিত তাদের এই মিলিত জীবন। কিন্তু তবু ভরসা পায় না কাঞ্চন। নারী ও পুরুষের যে মিলনে সমাজের স্বীকৃতি নেই, সমর্থন নেই, তার উপর জোর করে' ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না সে। সমাজের আবেষ্টন থেকে যখন তারা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আইনের সম্মতির উপরই দাঁড়াতে হবে তাদের। কিন্তু সে দিকে কোন উৎসাহ দেখা যায় না অনুপমের।

এই বাসায় এসে রেজেষ্ট্রীর জন্যে বড় অধীর হয়ে পড়ল কাঞ্চন। অনুপম জিজ্ঞাসা করে:—তোমার এত অবিশ্বাস কেন বল তো? আমার ভালবাসার উপর একটুও ভরসা নেই তোমার? বিয়েটা কি কেবলই আচার আর অনুষ্ঠান? হৃদয়ের কি কোন মূল্যই নেই তাতে?

—ভরসার কথা নয়। কাঞ্চন বলে: আইনের চোখে যা করা দরকার তা করে ফেলাই ভাল। আমাদের ভিতরে কোন অবিশ্বাসের কথা নয়। কিন্তু আমাদের যে সব সন্তান হবে, তাদের ভবিষ্যতের দিক থেকেও এর প্রয়োজন আছে বই কি।

বেশী দিন গেল না। এই নিয়ে এক দিন সকালে কথা-কাটাকাটি থেকে, একটু ঝগড়াই হয়ে গেল অনুপম আর কাঞ্চনের মধ্যে। সে দিন সারাদিন কেটে গেল, অনুপম ফিরল না। এমনি করে সে দিন, তার পরের দিন, আরো কত দিন কেটে গেল, অনুপম আর ফিরল না। চোখে অন্ধকার দেখল কাঞ্চন, একা-একা আনমনে সে ভাবে, হয়তো রেজেষ্ট্রী করবার জন্যে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে' তোলা সঙ্গত হয় নাই। সেই জন্যে বিরক্ত হ'য়ে হয়তো সে চলে গেছে। আবার সে ভাবে, তাকে এমনি ভাবে প্রতারিত করবার উদ্দেশ্যেই হয়তো তাকে এনেছিল অনুপম। কিন্তু এতেই বা তার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? কিছুই ভেবে পায় না কাঞ্চন।

কলকাতার মত সহরে কাঞ্চন একেবারে নতুন। একটা বাড়ীতে সে একেবারে একা। হাতের সম্বল যা কিছু ছিল, তা-ও ফুরিয়ে গেল। বিব্রত হ'য়ে পড়ল সে।

এমন সময় এক দিন উদরের বিশাল পরিধি, গোলাকৃতি দেহের ওপর ক্ষুদ্র একটি মাথা এবং সেই ক্ষুদ্র মাথার উপর ততোধিক ক্ষুদ্র এক পাগড়ী নিয়ে আবির্ভাব হ'ল এক ব্যক্তির। নিজের পরিচয় দিয়ে সে বল্‌ল—তার নাম ধনপতিলাল।

কাঞ্চনের শরীরের সমস্ত রক্ত চন্ চন্ করে উঠে গেল মাথায়। এই ব্যক্তিই তা' হলে কুবেরলাল ধনপতিলাল এণ্ড কোম্পানীর মালিক ধনপতিলাল? কেমন যেন সংশয়, আর ত্রাসের তাড়নায় আর অপরিসীম উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল কাঞ্চনের সারা দেহ।

অনুপমের পরিত্যক্ত স্থানে এসে জুড়ে বস্‌ল ধনপতিলাল। বিদ্রোহী হয়ে উঠল, বিরক্তিতে ভরে গেল কাঞ্চনের মন। কিন্তু ধনপতিলালকে সইতেই হ'ল। কল্‌কাতায় থাকতে হলে অর্থের প্রয়োজন আছে। বাপ-মায়ের কাছে যে সে ফিরে যাবে, সে পথও রুদ্ধ। কাজেই কাঞ্চনকে মেনে নিতে হ'ল এই কদর্য্য জীবন।

মন হু হু করে' পুড়ে' ছাই হ'য়ে যায় কাঞ্চনের। এরি জন্তে বুঝি অনুপম তাকে বিদ্রোহী হ'তে বলেছিল? এরি জন্তে সে আউড়েছিল বড় বড় কথা? কাঞ্চন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে' ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যায়। কিন্তু কোন উপায় নেই। আবার অসহায় ভাবেই সে অদৃষ্টের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে।

প্রায় রোজই সন্ধ্যা বেলায় ধনপতিলাল আসেন কাঞ্চনের কাছে। আসেন নিজের মোটরে চড়ে। যতক্ষণ তিনি থাকেন, ততক্ষণ মোটরখানা দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ওপর। এ রকম আরও কয়েক-খানা মোটর দাঁড়িয়ে থাকে এই পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায়।

পুরুষের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহই জাগে কাঞ্চনের মনে। তার মনে হয়, স্বার্থপর, লালসা-কাতর পুরুষের দল এমনি ছলনার জালে আবদ্ধ করে' শিকার করছে কত নারীকে, তার পর তার নিপীড়িত যৌবন নিয়ে চলেছে নির্ম্মম দস্যুবৃত্তি। কাঞ্চনের মনে হয়, অনুপম, ধনপতিলাল—এরাই যেন সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতীক, প্রতিনিধি। মানুষের মিছিলে এরাই চলেছে ভদ্র-জীবনের মুখোস পরে'।

লোভী পুরুষ, প্রতারক পুরুষ, নিষ্ঠুর পুরুষ। অর্থের সুযোগ নিয়ে এই লোভ, এই নিষ্ঠুরতা হ'য়ে ওঠে দুর্নিবার, হিংস্র, নিরঙ্কুশ। ধনী পুরুষের পাপের রথ চলে অব্যাহত গতিতে। তাকে আটকাবার শক্তি নেই। স্বয়ং ভগবানও বুঝি তাদের কাছে অসহায়। কাঞ্চনের মনে হয়, এই পুরুষ জাতিই পৃথিবীতে এনেছে ব্যাভিচার, অন্যায়, অত্যাচার, অনিয়ম, অপরকে বঞ্চনা করে' নিজে ভোগ করবার জঘন্য কামনা। ধনী ক্ষমতাশালী পুরুষের পরুষ আকাঙ্ক্ষার যূপ-কাষ্ঠে আত্মবলি দেয় নারীর যৌবন, আর অসহায় পুরুষের শক্তি-সামর্থ্য। এদের রূপের তৃষ্ণা মেটায় নারীর যৌবন আর অর্থের আকাঙ্ক্ষা-বহ্নিতে পুড়ে ছাই হয় পুরুষের শক্তিমান্ দেহ। এরা শোষক, নির্ব্বিচারে শোষণ করাই এদের রীতি।

এই বাড়ীতে পাঁচ বছর কেটে গেল কাঞ্চনের। মাঝে-মাঝে বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে কাঞ্চনের মন। তার সময় সময় মনে হয়, এক লাথিতে তার এই তাসের ঘর ভেঙে দিয়ে নেমে পড়ে রাস্তায়। তার পর কপালে যা' আছে তা ঘটুক। কেবলমাত্র পুরুষের ভোগবৃত্তির উপকরণ হয়ে ঘষে'-মেজে, সেজে'-গুজে এমনি করে' খাঁচায় পোষা পাখী হয়ে থাকা তার পক্ষে অসহ্য।

এমনি ভাবে পাঁচ বছর কেটেছে তার। উঃ, পাঁচ-পাঁচটি বছর। একই জীবনের পুনরাবৃত্তি করে' তাকে কাটাতে হয়েছে পাঁচটি বছর। আরও কত বছর এমনি ভাবে কেটে' যা'বে, কে জানে?

কয়েক দিন ধরেই চলেছিল অবিরল ধারে অজস্র বর্ষণ। এই বাদলা হাওয়ায় কাঞ্চনের সুরু হয়েছে [illegible]। আজ বিকালের দিকে জ্বর উঠেছে। কিন্তু কাঞ্চনের মনের আর্দ্র-বিষণ্ণতা —কাটেনি এখনও।

সে দিন [illegible] ধনপতিলাল এণ্ড কোম্পানীর কারখানার ফোরম্যান, এবং আরও অনেক শ্রমিক এসেছিল কাঞ্চনের কাছে। মাঝে মাঝে আসে তারা। তাদের মুখে ঐ এক কথা:—মা, আপনি বাবুকে বলুন, তা হলেই তিনি আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দেবেন। যুদ্ধের বাজার, বড় কষ্ট পাচ্ছি আমরা। এদের মুখে মা-ডাক শুনে কেমন একটা মমতার আবেশ জাগে কাঞ্চনের মনে। ঘুমিয়ে-পড়া একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে আকুল করে তাকে। কাঞ্চনের হাসি পায়। কত অজ্ঞ তারা। যে পুরুষ ধনের সুযোগ নিয়ে নারীকে মুঠির মধ্যে রেখেছে ভোগ-লালসা চরিতার্থ করবার জন্তে, সে পুরুষ পরের কল্যাণ-কামনায় কখনও হতে পারে না মুক্তহস্ত। এদের কাতর-কাকুতি থেকে থেকে আজ উতলা করে তুলছে কাঞ্চনের মন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এই পাড়ার ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। কেউ কেউ গিয়ে দাঁড়িয়েছে নীচে রাস্তায়, কেউ কেউ বা দরজার কাছে, কেউ কেউ বা ওপরে চেয়ারে এমন ভঙ্গীতে বসে আছে, যাতে আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাদের মুখ, আর তা বিভ্রম জাগায় লালসা-কাতর পুরুষের মনে।

কোথায় যেন দ্রুত তালে তবলা বাজছে, আর তার সঙ্গে থেকে থেকে উচ্চ কণ্ঠের হাসি আর বিকট চীৎকার ভেসে আসছে ক্ষণে ক্ষণে।

কাঞ্চন জানালায় দাঁড়িয়ে আছে আনমনে। কামিনী ঝি এসে জানাল:—দিদিমণি, বাবু এসেছে।

কাঞ্চন বলল—বলে দে, আজ চলে যেতে, আমার শরীর ভাল নেই।

কামিনী ঝি খানিকক্ষণ পরে ঘুরে এসে আবার বলল—না গো দিদিমণি, আমার কথা তেনার পেত্যয় হচ্ছে না। তুমি গিয়ে বলে এসো গে।

যেতে হ'ল কাঞ্চনকে।

—কি গো কাঞ্চনকুমারী, তোমার না কি শরীর ভাল নেই? জড়তারুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল।

—হ্যাঁ। তাই আজ যেতে বল্‌ছিলাম।

—তা যেন তুমি বল্‌লে। কিন্তু এমন সন্ধ্যেটা মাটি হতে দিই কি করে' বল দেখিনি?

—তাই বলে আমার শরীর ভাল, কি মন্দ, তা বিবেচনার যোগ্য হ'বে না? আমাকে নীরবে সয়ে যেতে হবে সব অত্যাচার। তা কখনও হ'তে পারে না, হ'তে দেব না।

—তা', তোমাকে আমি রাণীর হালে রেখেছি, আমার খুশী-মাফিক...

—ও তাই আপনার খুশীমাফিক আমাকে চল্‌তে হবে? কে আপনাকে বলেছিল আমাকে এমন রাণীর হালে রাখতে? কত দিন আমি বলেছি, আজও বলছি, দিন আমাকে ছেড়ে, আমার পথ আমি দেখব। আমি চাই না, চাই না এই রাণীর হাল।... দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে' কেঁদে উঠ্‌ল কাঞ্চন।

জড়িত কণ্ঠে বল্‌ল ধনপতিলাল:—ওঃ, তাই না কি? বড় তাঁব হয়েছে, দেখছি আজ-কাল। জুটেছে না কি আর কেউ?... বলে সোফা থেকে উঠে টলতে টলতে একটা কদর্য্য লালসায় কাতর হ'য়ে উঠে দাঁড়াল ধনপতিলাল।

টল-মল করে পা বাড়াবার উপক্রম করতেই কাঞ্চন টেবিলের উপর থেকে একটা সোডার বোতল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল ধনপতিলালের দিকে। বোতল ভেঙ্গে এক টুক্‌রো বড় কাচ ছুটে' গিয়ে বিঁধল ধনপতিলালের কপালের ডান পাশে। ফিন্‌কি দিয়ে ছুটতে লাগল রক্তের ধারা।

কয়েক দিন পর। ধনপতিলাল কাঞ্চনের ওখানে আর যায় না। কারখানায়ও আর যেতে পারে না সে। মাথায় অসহ্য বেদনা আর প্রচণ্ড জ্বরে শয্যাগত।

তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কারখানায় চলেছে গোলমাল। সে দিন তার কানে গেল সেই গোলমালের কথা। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে মোটরে উঠে চলল ধনপতিলাল কারখানার দিকে। দু'মাসের মধ্যে ছ'-ছ'টা মিলিটারি কনট্রাক্টের যে ডেলিভারি দিতেই হ'বে।

বিদ্যুদ্‌গতিতে চলেছে মোটর। কারখানার দিক্ থেকে কলরব আর বিক্ষোভ ভেসে আসছে হাওয়ায়। আর একটু এগুতেই দেখা গেল, কারখানা থেকে দলে দলে বেরুচ্ছে শ্রমিকের দল শোভাযাত্রা করে, নানা পোষ্টার-প্ল্যাকার্ড, আর পতাকা হাতে নিয়ে। তাদের এত দিনকার বাঁধভাঙ্গা চীৎকারে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে দিক্‌দিগন্ত।

হঠাৎ মোটর থেমে গেল ধনপতিলালের। এ কি! সকলের আগে চলেছে কাঞ্চন। কী যেন এক অপূর্ব্ব মহিমায় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে তার মুখখানি। সব চেয়ে বড় পতাকাটি হাতে নিয়ে সকলের আগে সে গান গেয়ে চলেছে আর তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে চলেছে শত শত দৃপ্ত কণ্ঠ—"ঝাণ্ডা উঁচা রহে হমারা।"

চীন উপকূলে জাপ

চীনের প্রায় একশ' ভাগের ২১ ভাগ এখন জাপানীদের কবজে—মাঞ্চুরিয়ার সমস্তটা, মঙ্গোলিয়ার কিছু অংশ হোপের শান্সি-শান্টুং, আনহুই ও কিয়াংশুর সমুদ্রতীর এবং হোনান, হুপে, হুনান, কিয়াংসি, চেকিয়াং, ফুকিয়েন এবং কোয়াংটাং প্রদেশ

চীনের দক্ষিণ কূলে অবস্থিত হংকং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপানীদের হস্তগত হয়। জাপ-আক্রমণের ভয়ে হংকংএর অধিবাসীরা বড় বড় গুদামে নিজেদের মাল-পত্তর গাদা করেছিল। অনায়াসে দু'-তিন বছর চলতে পারত—এত। হংকং জিতে নিয়েই জাপানীরা সে সব জিনিষ নিজেদের দেশে চালান করে দিলে।

হংকংএর হোটেলে জাপানীরা বিভিন্ন দেশ থেকে লোক-জন আনিয়ে দিব্যি জাপানী ফ্যাশানে হোটেল চালাতে লেগে গেল। খাওয়া-দাওয়ার যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

জাপানী বিচারকদের এনে আদালত সৃষ্টি করা হল। জুরী দিয়ে বিচার উঠে গেল। জাপানী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হল। রেডিও ব্রডকাষ্ট জাপানী ভাষায় চলতে লাগল।

হংকংএর বিখ্যাত রাস্তা 'কুইন্স রোড', 'ভিক্টোরিয়া পীক' প্রভৃতির জাপানী নামকরণ করা হয়েছে। জাপানীরা যখন র‍্যাপি ডালি রেসট্রাক আবার খুললে, তখন নামকরা ঘোড়াগুলোর পর্য্যন্ত জাপানী নাম দেওয়া হল।

নিজেদের বসবাসের সুবিধার জন্য জাপানীরা বহু হংকং-বাসিন্দাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। যানবাহনের অনেক সুবিধা হল। ট্রাম, ফেরি, বাস নিয়মিত ভাবে চলাচল করতে লাগল।

পিপিংএর নিকট মিং সম্রাট্‌গণের সমাধি-স্থানের উপর এক-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট অশ্বের প্রস্তর-মূর্ত্তি

উত্তর চীনে সিনিষ্ট রেল-ষ্টেশনে ২ জন জাপানী একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে কপট অভিবাদন জানাইতেছে
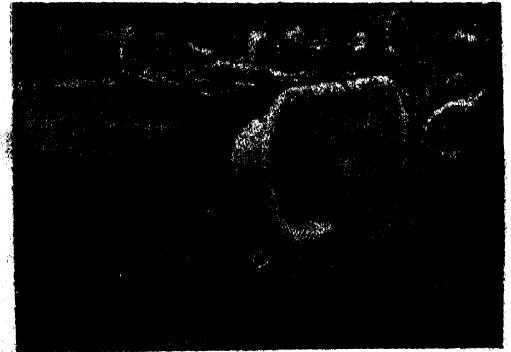
সাংহাইএ কোন বাড়ীর জন্য বাথ-রুমের সরঞ্জাম লইয়া যাওয়া হইতেছে

মার্কিণ সুপারফোর্ট্রেস বিমানের চীনস্থিত ঘাঁটী ; চীনা শ্রমিকরা ঘাঁটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিতেছে
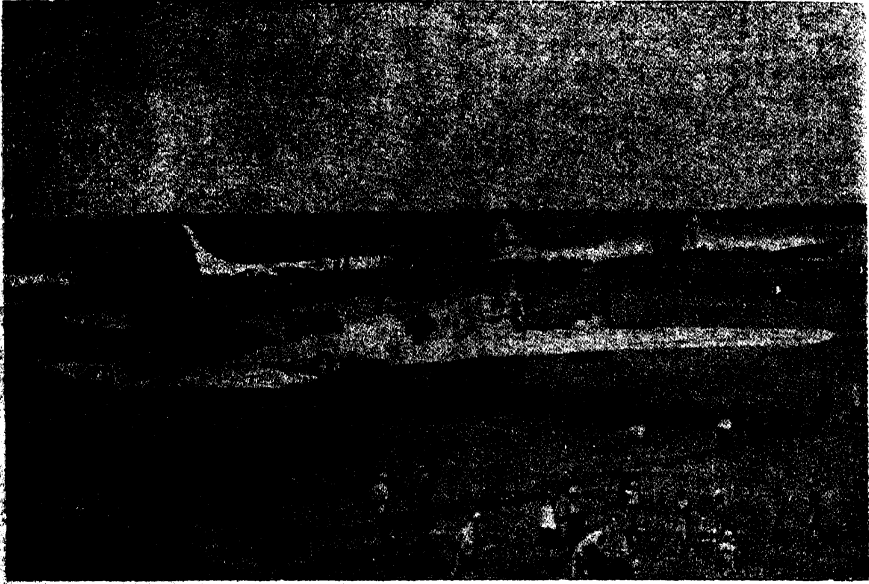
কাউলুন-হংকং ফেরী-পথ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। ডিনামাইট দিয়ে টানেল তৈরী করে কাউলুন-ক্যান্টন রেলপথ আবার নতুন করে চালু করলে। মোটর-বাস থেকে এঞ্জিন খুলে কাঠের নৌকাতে ফিট করে মোটর বোট তৈরী করছে। কাউলুনের নিকটবর্ত্তী কৈটক বিমানঘাঁটী সরিয়ে নিয়ে চীন-জাপান বিমান-পথ কার্য্যকরী করে তুললে। এক কথায়, বোমায় ধ্বংসপ্রায় হংকং আবার সম্পূর্ণ কাযকের যোগ্য করে তুলল।

হংকং এখন জাপানী গভর্ণর দ্বারা শাসিত। ব্যবসাক্ষেত্রে, পুলিশ বিভাগে, জনস্বাস্থ্য ও ডাক বিভাগে সর্ব্বত্রই জাপানী। তা ছাড়া যানবাহন, বৈদ্যুতিক শক্তি, ও পানীয় জল সরবরাহ বিভাগ, বাস, ট্রাম, ফেরি ইত্যাদি সবই জাপানীদের হাতে।

চীনাদের জাপানীরা বলে, "আমরা একই জাতি। বৃটিশদের চেয়ে আমাদের অধীনে তোমরা ভালই থাকবে।"

মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীরা চেষ্টা করছে চীনাদের জাপ-ভাবাপন্ন করে তুলতে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে টোকিও সরকার সেখানে বড় বড় ব্যবসাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে একটা আইন পাশ করে। তাতে করে প্রায় সব চীনা এবং অন্যান্য বিদেশী একেবারে ব্যবসাক্ষেত্র থেকে বাদ পড়ে যায়। এই আইনকে বলে আমের

ষ্টেট কোম্পানী সৃষ্টি হয়েছে—জাপানীদের মনোপলি, মিৎস্যুই, মিৎসুবিশি, সুমিটোমো, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ, ওরিয়েন্টাল

হংকং-এ কোন ব্যবসায়ী বাড়ীর প্রাচীর-গাত্রে পোষাকের ছবি সহ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন
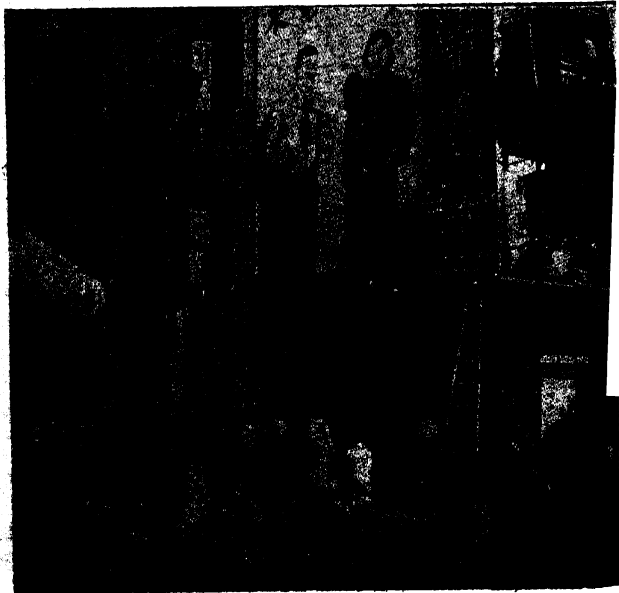
ডেভলপমেণ্ট কোম্পানী ইত্যাদি। লবণ, তামাক, সিনেমা, চাউল, কয়লার খনি, বৈদ্যুতিক ও মোটরের কারখানা, জীবন-বীমা, পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ, মদ, আফিম সমস্ত জাপানীদের একচেটিয়া।

মাঞ্চুরিয়ার সয়াবীন ব্যবসা বহু দিন ধরে ছিল চীনাদের হাতে। আজ সেটা জাপানীদের সয়াবীন কণ্ট্রোল কোম্পানীর করায়ত্ত।

যুদ্ধের জন্ত এখান থেকে জাপানীরা কয়লা এবং লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাচ্ছে। অনেক নতুন রেলপথ তৈরী হয়েছে, প্রায় সোভিয়েটের সীমান্ত পর্য্যন্ত। জাপদের এটা সুশিক্ষিত সৈন্যদলের খুব বড় ঘাঁটি। রুশ-ভল্লুকের গতিবিধি লক্ষ্য করাই তাদের কাজ।

মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে চীনের বিখ্যাত বন্দর শান-হাইক-ওয়ান। এই জায়গাটা হাতে পেয়ে জাপানীদের খুবই সুবিধা হয়েছে। চীনের

সাংহাইএর ফরাসী অঞ্চলে স্ত্রী ও কন্যা সহ এক জন চীনা ব্যবসায়ী

জগদ্‌বিখ্যাত প্রাচীর যেখানে সমুদ্রে এসে পড়েছে ঠিক সেই জায়গাটায় এই বন্দর অবস্থিত।

তিয়েনশিন চীনাদের অতি প্রাচীন ব্যবসা-কেন্দ্র। এখান থেকে আমেরিকায় চালান যেত পশম, রেড়ির তেল, ডিম, ছাগলের চামড়া, চীনা রাগ (কম্বল) ইত্যাদি। আর আমেরিকা থেকে সেখানে যেত কাগজ, বই, কেরোসিন তেল, আটা, চিনি, সিগারেট, মোটরগাড়ী, ঘড়ি, রেডিও, ঔষধ-পত্র ইত্যাদি।

তিয়েনশিনে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্ত আটটি জাতিকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল—বৃটিশ, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী, বেলজিয়াম, রুশ, জার্মাণ, অষ্ট্রোহাঙ্গারীয়ান। পরে আমেরিকাকেও সে অধিকার দেওয়া হয়।

কূট রাজনীতিক কারণে তিয়েনশিন ইতিহাসে বিখ্যাত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এখানে বহু মাসব্যাপী বৈঠক হলে। নাম ছিল—'Stripping and searching incident.'

জাপানীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কয়েক জন চীনা তিয়েনশিনের ইংরেজী এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। জাপানীরা তাদের সমর্পণ করতে বলে। ইংরেজরা আপত্তি করে। ফলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়।

চীফু এক সময় মার্কিণ বন্দর ছিল। বহু মার্কিণ সেখানে এসে দিব্য বসবাস করছিল। কাছেই ওয়েহাইওয়ে। বৃটিশদের কলোনী। দুই শ্বেতাঙ্গ জাতি সেখানে খুবই সুখে ছিল। জলপথে যাতায়াত

হংকংএ ২ জন সুন্দরী দোকান হইতে সৌখীন জিনিষ-পত্র কিনিয়া রিক্‌সা চাপিতে যাইতেছে
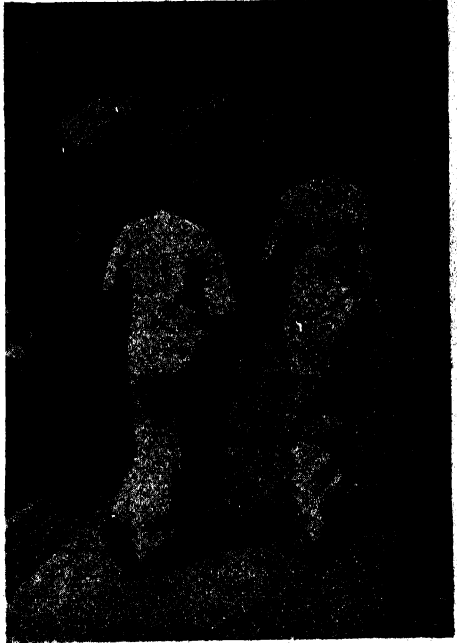
সাত-আট ঘণ্টা যথেষ্ট। আবার মোটর-পথও তৈরী করেছিল। এখন সে সবই জাপানীদের হাতে।

চীন সমুদ্র-উপকূলে সাংহাই জগদ্বিখ্যাত। জনসংখ্যা প্রায় ৩,৫০০,০০০। সব জাতের লোকই দেখা যায় সেখানকার পথে-ঘাটে, সর্ব্বত্র।

মার্কিণ ব্যবসায়ের এটা খুব বড় কেন্দ্র ছিল। চীনাদের নিজেদের যা কিছু কাজকর্ম্ম সব এইখান থেকেই পরিচালিত হ'ত। শাল বন্দর হস্তগত করবার আগেই জাপরা এখানে আড্ডা জমাতে শুরু করেছিল। এখন সম্পূর্ণ জাপানীদের হাতে।

জাপদের আগে সাংহাই জার্ম্মাণ নাৎসীদের কার্য্য-কেন্দ্র ছিল। মার্কিণদের তারা সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দিব্য নিজেদের বসবাসের

ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ রোজগার করছিল, কিন্তু জাপদের আগমনে সব বন্ধ হয়ে গেছে।

চীনে তেল খুব অল্পই উৎপন্ন হয়। প্রায় সব তেলই বিদেশ থেকে আসে। এখানকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েল কোম্পানী বিখ্যাত। বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক ভরা তেল। সব এখন জাপদের দখলে।

চীনের সমুদ্র-উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে সব জাপানী মুদ্রার সাহায্যে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনে মাত্র ৭,৫০০ মাইল রেলপথ ছিল। মিত্র-পক্ষ অনেক নতুন রেল-লাইন পেতেছিল। তার মধ্যে পেপিং—হ্যাঙ্কো—ক্যাণ্টন লাইনস্ সব চেয়ে বিখ্যাত। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাপানীরা এ সব দখল করে। তার পর জাপানীরা যুদ্ধ প্রয়োজনে অনেক রেল-লাইন পেতেছে।

চা এবং লেসের জন্ত নিংপো বিখ্যাত। চেকিয়াং প্রদেশে চা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নিংপো থেকে বিদেশে চালান যায়। টুপীর ব্যবসাও এখানে খুব হয়। আমেরিকার সে সব টুপীর কি দাম! আজও সেই সব ব্যবসা আছে, কিন্তু অর্থ যাচ্ছে জাপানীদের পকেটে।

যুদ্ধের ফলে জাপানীরা পেয়েছে—ফিলিপিনোর শণ (দড়ি) চাল, চিনি, সোনা; ইষ্ট-ইণ্ডিয়ার তেল, রবার, মালয়ের এবং বর্মার টিন, চাল, রবার—আর শ্রমিক। চীনা উপকূলে পেল—জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা, কয়লা, লোহা, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক শক্তি, যান বাহনের সরঞ্জাম, মোটর, ষ্টীমার, লক্ষ আরও কত কি!

হাতে পেয়ে জাপানী পুরোপুরি ভাবে এগুলো কাজে লাগিয়েছে, ফলে তাদের শক্তিও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দু'টি মাছি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ঠাকুর-ঘরের মাছি উড়ে এল
ভোগারতি যবে শেষ হয়ে গেল
আসিয়া বসিল খুসি-ভরা অন্তরে—
আরেকটি মাছি আসিয়া জুটিল
নর্দ্দামা হ'তে তখনি উঠিল
কহিল, "বন্ধু, কহি সংশয় ভরে—
তুমিও যে মাছি আমিও তো তাই,—
তথাপি দু'জনে ভেদ কেন ভাই?
তোমার অঙ্গ সুরভিতে ভরপুর—
আমার কি দোষ কেন জানি না কো—
কাছে গেলে কেহ বলে না কো থাকো,
হাত-নাড়া দিয়ে সবে করে 'দূর দূর'!"
ঠাকুর-ঘরের মাছিটি কহিল,
"দুঃখ কোরো না ভাই—
তুমিও যে মাছি আমিও সে মাছি
ভেদ কোনো কিছু নাই;
পূজার গন্ধ, গায়ে চন্দন,—
পাখায় সুরভি ধূপ,—
দেবতার পদতলে—
পূযের গন্ধে করি ভন্ ভন্—
শোণিত-লিপ্ত রূপ
ঘৃণা করে সকলে।
তুমিও যে মাছি, আমিও সে মাছি,
বুঝিয়াছি দেখে শুনে,—
কভু সমাদর, কভু অনাদর,
সংসর্গের গুণে।"

শাকপাতার খাদ্যগুণ

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য

আমরা যখন নানাবিধ খাদ্যের পুষ্টিকরতা নিয়ে বিচার করতে থাকি, তখন একটা প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে জাগে,—যে-সকল জীব স্বচ্ছন্দবনজাত গাছপালা ছাড়া আর কিছুই খায় না, তাদের শরীরের পুষ্টি কেমন করে হয়! পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে এমন অনেক বলশালী জীব আছে, যারা যুগের পর যুগ ধরে কেবল গাছের পাতা ও মাঠের ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ ক'রে আসছে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদের অন্য কোনো খাদ্যের প্রয়োজন হয়নি, এবং তাতে তাদের শক্তিরও কোনো হ্রাস হয়নি। হাতীরা কেবল গাছপালা প্রভৃতি খেয়েই জীবন ধারণ করে, তারা আমাদের চেয়ে বহু গুণে বলবান তো বটেই, এমন কি, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী জীবের চেয়েও বলবান্। উত্তর আমেরিকার বাইসন বা বন্য মহিষের কথা অনেকেই শুনেছেন. তাদের মতো শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ জীব না কি জগতে নেই, অথচ তারা খায় কেবল ঘাস ও পাতা। যে ঘোড়ার শক্তিকে আদর্শ ধরে আমরা এঞ্জিনের শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করি, সেই ঘোড়া পূর্বকালে কেবল বনের ঘাস খেয়েই তাদের শক্তি সংরক্ষণ করতো, ইদানীং মানুষের গৃহপালিত হবার পর থেকেই তারা দানা প্রভৃতি খেতে শিখেছে। এই সকল উদ্ভিদ্‌চারী পশুদের মধ্যে আবার নানা বিভাগ আছে, কোনোটি বা কেবল তৃণচারী, কোনোটি বা পল্লবচারী, কোনোটি বা উভচারী। গরু এবং ঘোড়া ঘাস ছাড়া সাধারণতঃ গাছের পাতা খায় না। তাদের পক্ষে দূর্বা ঘাস খেতে সুস্বাদু, কারণ, তাতে ট্যানিন প্রভৃতি কটু-কষায় পদার্থ নেই। গাছের পাতায় ট্যানিন ও গ্লুকোসাইড থাকার দরুণ তার আস্বাদ কিছু কটু-কষায় প্রকৃতির হয়, কিন্তু হাতী, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, জিরাফ প্রভৃতি জন্তুরা এই আস্বাদটাই বেশী পছন্দ করে। সে যাই হোক, এই সকল বৃহৎকায় উচ্চ স্তরের জন্তুগুলি প্রাণ ধারণের জন্য একান্ত ভাবে শুধু ঘাসপাতার উপরেই নির্ভর করে, এ ছাড়া অন্য কোনো রকম খাদ্যে তাদের স্পৃহা নেই এবং প্রয়োজনও নেই।

মানুষেরাও যে শাক-পাতা একেবারেই খায় না এমন নয়! বাংলা সাহিত্যের পরশুরাম বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন যে, নির্বিরোধী ভারতবাসী এবার থেকে ঘাস খেতে শুরু করো। কিন্তু ঘাস আর পাতাও যে মানুষ খেয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শোনা যায়, পেপাইরাস নামে এক রকম লম্বা লম্বা ঘাস ছিল যার থেকে কাগজ তৈরি হতো, প্রাচীন যুগের মিশরীরা সেই ঘাসের ডগা চিবিয়ে চিবিয়ে তার রস খেতো। ঘাসের শীষের রস যে মিষ্ট ও সুস্বাদু তা অনেক সময় অন্যমনস্কে ও খেলাচ্ছলে আমরা নিজেরাও চিবিয়ে দেখেছি। এ ছাড়া ইতিহাসেও পড়েছি যে, রাণা প্রতাপ প্রভৃতি বীর যোদ্ধারা বাধ্য হয়ে অনেক সময় ঘাসের রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। আর দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ যে গাছের পাতা খেয়ে প্রাণ বাঁচায় এ কথা আমরা প্রায়ই শুনি। সহজ অবস্থাতেও অনেক দেশের লোক কাঁচা শাক-পাতা খায়। অতলান্তিক মহাসমুদ্রের উপকূলের অধিবাসীরা অনেকে আইরিশ মস্ (শৈবাল) কাঁচাই খায়। আমরা যে আখের রস চিবিয়ে খাই সে-ও এক রকম লম্বা ধরণের ঘাস ছাড়া কিছুই নয়। ধান যব গম প্রভৃতির চারা গাছের শীষ বের করে চিবিয়ে দেখলে তাতেও কিছু মিষ্ট রস পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক জন বৈজ্ঞানিক এক প্রকার যবের (ওট্) চারা গাছ নিয়ে তার থেকেই ময়দা প্রস্তুত করেছিলেন। কচি কচি চারা গাছগুলি কৃত্রিম উপায়ে শুকিয়ে খুব মিহি ভাবে চূর্ণ ক'রে তার থেকে এক রকম সবুজ ময়দা হয়েছিল যা খেতেও সুস্বাদু অথচ খুব পুষ্টিকারক। আমাদের দেশেও এক জন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ঘাস থেকে রুটি প্রস্তুত করেছিলেন, তা না কি নেহাৎ অখাদ্য হয়নি।

উদ্ভিদের সবুজ পাতাগুলিতে যে পরিপূর্ণ খাদ্যগুণ আছে, এই সত্যটুকু আদি-যুগের বুদ্ধিমান্ মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান আবিষ্কার। শস্যের মধ্যে খাদ্যগুণের কথা আবিষ্কার হয়েছে সম্ভবতঃ তার অনেক পরে। শস্য আদি-যুগের মানুষের মৌলিক খাদ্য ছিল না, এটা পরবর্তী যুগের মানুষের আকস্মিক আবিষ্কার। শস্যের সৃষ্টি মূলতঃ মানুষের জন্যে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে শস্য সৃষ্টি করাতে প্রকৃতির মূল উদ্দেশ্য ছিল—যাতে ওর মধ্যে ভবিষ্যৎ গাছটির বীজ রক্ষা করা যেতে পারে আর ভবিষ্যৎ চারাটির জন্য কিছু খাদ্যসঞ্চয় তার মধ্যে দেওয়া যেতে পারে। এই জন্যই দেখা যায় যে, কেবল তার প্রজনন-কেন্দ্রস্থ কোষের মধ্যেই যা কিছু মূল্যবান খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে, কিন্তু তার সকল অংশে তা থাকে না। আরো দেখা যায় যে, শস্যের মধ্যে শুধু ভিটামিন ও কার্বোহাইড্রেট পদার্থই অধিক, যা উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষেই বিশেষ দরকার। প্রাণীদের পক্ষে যে প্রোটিন বস্তু নিতান্তই দরকার, তা শস্যের মধ্যে খুব কম।

গাছের অন্যান্য অংশের তুলনায় কেবল যে পল্লবের অংশটুকু, তাই-ই প্রাণীদের পক্ষে এক পরিপূর্ণ গুণবিশিষ্ট খাদ্য, এ কথা এখন বৈজ্ঞানিক বিচারেও প্রমাণিত। বস্তুতঃ, গাছের পাতায় পাতায় যে খাদ্যগুণ আছে, তা গাছের ডালেও নেই, মূলেও নেই, বীজেও নেই, কন্দেও নেই, ফুলেও নেই, ফলেও নেই। এক একটি গাছের এই সকল বিশিষ্ট অংশে কোনো কোনো পর্য্যায়ের খাদ্যবস্তু অধিক মাত্রায় সঞ্চিত থাকতে পারে, কিন্তু সকল প্রকার প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর একত্রিত সমন্বয় গাছের কোনো অংশেই পাওয়া যায় না,—কেবল পাওয়া যায় পাতায়। প্রাণধারণের হিসাবে এই কথাটি বড়ো কম কথা নয়। এ-কথার অর্থ এই যে, জীবনরক্ষার জন্য যত কিছু প্রকারের মৌলিক খাদ্যবস্তু আমাদের দরকার, একমাত্র গাছের পাতার মধ্যে তার সব কিছুই আছে। অর্থাৎ ওর মধ্যে যাবতীয় সকল প্রকারেরই ভিটামিন আছে, প্রোটিন আছে, কার্বোহাইড্রেট আছে, ফ্যাট আছে, ধাতব লবণাদি আছে,—কোনো কিছুই বাদ নেই। মাত্রায় হয়তো অল্প থাকতে পারে, কিন্তু সকল জিনিষই কিছু না কিছু পরিমাণে নিশ্চিত আছে। এর কারণ, পাতার ভিতরকার নবীন কোষগুলি অতি সতেজ ও নিত্যক্রিয়াশীল, তার মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট প্রভৃতি খাদ্যবস্তু বিভিন্নরূপ প্রাকৃতিক সঞ্চয় থেকে অনবরতই সংশ্লেষিত হ'তে থাকে। এই কারণে সকল পর্য্যায়ের মৌলিক খাদ্যবস্তুগুলি গাছের পল্লবে স্বভাবতঃই সুসমঞ্জস ভাবে বর্তমান, আর সেই জন্যেই যে-সকল প্রাণী ঘাসপাতা খায় তাদের পক্ষে ওর দ্বারাই খাদ্যের সকল প্রয়োজন মিটে যায়।

ঐ সকল তৃণপল্লবভোজী প্রাণীদের তুলনায় আমাদের খাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাই আমাদের বহুবিধ খাদ্যের দ্বারা জীবনের

প্রয়োজন মেটাতে হয়। আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত কিংবা রুটি। ভাতে বা রুটিতে কার্ব্বোহাইড্রেট যথেষ্ট আছে, কিন্তু ফ্যাট নেই। সুতরাং ফ্যাটের জন্যে ওর সঙ্গে অধিকন্তু কিছু ঘি, মাখন বা তেল খাওয়া দরকার হয়। ভাতে বা রুটিতে প্রোটিনও খুব অল্প থাকে, সুতরাং সেই অভাবটি মেটাবার জন্যে আবার ওর সঙ্গে ডাল প্রভৃতি খেতে হয়, এবং তাতেও যথেষ্ট হয় না, সুতরাং মাছ-মাংসও খেতে হয় অথবা কিছু দুধ খেতে হয়। ভাতে রুটিতে ভিটামিন 'এ' নেই, সুতরাং তার জন্যও আমাদের দুধ খেতে হয়, ঘি-মাখন খেতে হয়, তৈলাক্ত মাছ প্রভৃতি খেতে হয়। তার পর ভাতে রুটিতে ভিটামিন 'সি' নেই, সুতরাং তার অভাব পূরণের জন্য আমাদের নানাবিধ তরি-তরকারি আর ফল-মূলাদিও খেতে হয়। ভিটামিন 'ডি'-ও ভাত-রুটিতে নেই, সুতরাং তার জন্যও আমাদের দুধ, ঘি, মাছ প্রভৃতি খেতে হয়। এ-ছাড়া ক্যালসিয়ম, সোডিয়ম, লৌহ, ক্লোরিন প্রভৃতি ধাতব পদার্থও ভাত-রুটিতে নেই ; সেই জন্য আমাদের ওর সঙ্গে নুণ, মশলা ও তরি-তরকারি প্রভৃতি অনেক জিনিষের দরকার হয়। অতএব ভাত-রুটির সঙ্গে আমরা অনেক জিনিষ খাই। কিন্তু এত রকমের খাদ্য খেয়েও আমাদের সকল সময় সকল অভাবের পূরণ হয় না, তখন আবার কৃত্রিম উপায়ে ঔষধাদির দ্বারা সে অভাব পূরণ করে নিতে হয়।

আমরা যে শাক-পাতা খাওয়া একেবারেই পরিত্যাগ করেছি তা নয়। এখনও আমাদের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের শাক ও ডাঁটা অর্থাৎ পাতা ও ডালপালা আমরা খেয়ে থাকি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা কাঁচা খাওয়ার অভ্যাস বহু কাল থেকে ছেড়ে দিয়েছি, বর্ত্তমানে আমরা সেগুলোকে রন্ধন করে খাই। এতে তার কিছু কিছু খাদ্যগুণ যে নষ্ট হ'য়ে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরা তাই এখন ঐ-জাতীয় খাদ্য কিছু পরিমাণে কাঁচা খেতে আরম্ভ করেছে। পালং, লেটুস, বাঁধাকপি, টোমাটো পেঁয়াজ প্রভৃতিকে তারা কুচি কুচি ক'রে কেটে স্যালাড ক'রে কাঁচাই খায়। আমরাও অনেক সময় ঔষধ মনে ক'রে অনেক রকম কাঁচা পাতার রস খেয়ে দেখেছি যে তাতে উপকার হয়। অনেকে বেলপাতার রস খেয়ে তাতে বেশ উপকার বোধ করে। অনেকে শিউলি পাতার রস খায়। এগুলি যে ঠিক ঔষধ হিসাবেই উপকার করে তা নয়, শরীরে ভিটামিন প্রভৃতি যে সকল বস্তুর অভাব ঘটেছিল তারই পূরণের দ্বারা উপকার করে। সকলেই জানেন, দুর্ব্বা ঘাসের রসে রক্তপাত নিবারণ করে, তার কারণ আর কিছুই নয়, ওতে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণেই আছে।

জগতের অনেক বৃহৎ আকারের প্রাণী কেবল নিরামিষ খেয়েই জীবন ধারণ ক'রে থাকে। মানুষের পক্ষেও যে সেটা অসম্ভব হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু তা করতে হ'লে মানুষের পক্ষে শাকপাতা জাতীয় খাদ্যবস্তুগুলি প্রচুর পরিমাণেই খাওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, ঐগুলি যতটা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায় ততই উত্তম। আমরা যেমন ভাবে জেলে পুড়িয়ে তার অনেক গুণ নষ্ট করে দিয়ে কেবল আস্বাদটুকু পাবার জন্য খাই, তেমন ভাবে খেয়ে বিশেষ লাভ হয় না। পালং শাক, কলমি শাক, নটে শাক, নিমপাতা, পলতা প্রভৃতি জেলে খেতে খুব উপাদেয়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে না জেলে অন্ততঃ আধ-জালা করেই খাওয়া উচিত। কিন্তু তার চেয়ে ইউরোপীয়দের মতো সুস্বাদু শাক-পাতার স্যালাড প্রস্তুত করে খাওয়াই সকলের চেয়ে উচিত ব্যবস্থা। বিহার অঞ্চলের লোকেরা কাঁচা পুদিনার চাটনি ক'রে খায়, আমরা সেটাও অভ্যাস করতে পারি।

অনেকে বলেন, নিরামিষ খাদ্যে যে প্রোটিন বস্তুর অভাব থাকে, তা পূরণ করতে নানাবিধ ডাল, শুঁটি ও বরবটি, এবং বাদাম আখরোট প্রভৃতি মেওয়া রয়েছে, তাই খেলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু ঐগুলিতে থাকে দুর্বল জাতের প্রোটিন, খেতে হ'লে তা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে খেলেই তবে তার দ্বারা অভাব মিটতে পারে, তাতে উদরকে পীড়ন করা হয়। তবে কাঁচা শাক-পাতার দ্বারা সে অভাব মিটতে পারে ; কারণ, তার মধ্যে যে প্রোটিনাদি পদার্থ থাকে সেগুলি সম্পূর্ণ, তার ক্ষতিপূরণের গুণ যথেষ্টই আছে, কেবল কিছু অধিক পরিমাণে খেতে অভ্যাস করতে পারলে ওর দ্বারা যথেষ্টই কাজ হয়।

যাঁরা আমিষও খাবেন না, শাক-পাতাও খাবেন না, তাঁদের দুধ ছাড়া কোনো গতি নেই। নিরামিষভোজী প্রাণীরা জন্মাবার পরে আগে দুধ খায়, তার পরে দুধ ছেড়ে দিয়ে গাছ-পাতা খায়। গাছ-পাতা খাওয়া ছাড়লে তাদের আবার দুধই খেতে হবে, নতুবা আর প্রোটিন কোথায় পাবে ? কেউ কেউ আমিষও খাবেন না, শাক-পাতাও খাবেন না, দুধও খাবেন না,—কিন্তু প্রোটিনের জন্য ডিম খেতে রাজি আছেন। অবশ্য ডিমে যথেষ্টই প্রোটিন আছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ডিমে ক্যালসিয়মের ভাগ খুবই কম, সুতরাং ঐ অভাবটি মেটাবার জন্য হয় তাকে কিছু দুধ খেতে হবে, নতুবা কতক পরিমাণ শাক-পাতাও খেতে হবে। দুধে এবং শাক-পাতায় যেমন ক্যালসিয়ম আছে, এমন আর কোন খাদ্যেই নেই।

আমিষকে বর্জ্জন করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন নয়। কিন্তু আমিষ বর্জ্জন করলে আমরা দুধ বর্জ্জন করতে পারি না, দুধ বর্জ্জন করলে আমরা শাক-পাতা বর্জ্জন করতে পারি না। শাক-পাতা নিরামিষাশী জীবের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক খাদ্য। আর যেহেতু আমরা অর্দ্ধেক মাংসাশী ও অর্দ্ধেক নিরামিষাশী, সেই-হেতু আমাদের শাক-পাতাও কতক পরিমাণে খেতেই হবে। আর যদি আমরা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হ'তে চাই তাই'লে শাক-পাতা আমাদের প্রচুর পরিমাণেই খেতে হবে, এবং তার উপরেই অনেকটা নির্ভর করতে হবে।

ব্যায়াম-চর্চ্চা

শ্রীউমেশ মল্লিক

সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ দেহলাভে মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার চিরন্তন শাশ্বত। বর্ত্তমান পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের প্রথম এবং প্রধান সোপানই হ'ল দেশে ব্যায়াম-চর্চ্চার ব্যাপক ভাবে প্রচার করা। সভ্যতার বর্ত্তিকা হস্তে গ্রীস দেশ যে দিন জগৎ-সভা আলোকিত করে তোলে সে দিনের দেশবাসীদের বিগ্রহের সম্মুখে শ্রদ্ধাশীল দেহভঙ্গিমায় প্রণাই বস্তুবিহীন ব্যায়ামের সূচনায় বোধ হয় প্রথম নিদর্শন। পূর্ব্বের এই দেহভঙ্গিমা বর্ত্তমানে সহজ সরল

আড়ম্বরহীন ব্যায়াম-পদ্ধতিতে পরিবর্জিত। এই যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম উন্নত স্বাস্থ্যলাভের সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ।

আমাদের দেহ মাংসপেশীর সমষ্টিবিশেষ। সুদৃঢ় মাংসপেশী লাভে একাগ্রতা সহকারে ব্যায়ামের বিশেষ প্রয়োজন! ব্যায়াম-চর্চ্চার সাহায্যে দেহ গঠনে একাগ্রতা অপরিহার্য্য। যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম-চর্চ্চায় একাগ্রতা সহকারে ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হলে অতি অল্প সময়ে ব্যায়ামজনিত নির্দ্দিষ্ট মাংসপেশীর রক্তকণিকা রক্তচলাচলে চঞ্চল হয়ে মাংসপেশীটিকে স্ফীত করে তোলবার সুযোগ পায়। যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম ব্যক্তিবিশেষকে নির্দ্দিষ্ট মাংসপেশীটির উপর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবার সাহায্য করে। এই সুযোগে দেহস্থ রক্ত পরিশোধিত হয়ে শিরা-উপশিরার মধ্যে প্রবাহিত হয়। ফলে দেহ সুস্থ সতেজ এবং স্বাস্থ্যবান্ হয়ে ওঠে। নিত্যনৈমিত্তিক এরূপ ভাবে দেহগঠনের প্রচেষ্টার ফলে ব্যায়াম-চর্চ্চার সময় মনে একাগ্রতা রক্ষা করাও সহজ ও সোজা হয়।

কিন্তু যন্ত্রসহ ব্যায়ামে ব্যক্তিবিশেষের মনে যন্ত্রটিকে দৃঢ় ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করবার আগ্রহে একাগ্রতার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে থাকে। কোন গুরুভার বারবেল সহযোগে ব্যায়ামের সময়ে ব্যক্তিবিশেষ বারবেলের লৌহদণ্ডের মধ্যভাগটি দৃঢ় ভাবে ধরে রাখবার চেষ্টা করে। নির্দ্দিষ্ট মাংসপেশীর পরিবর্ত্তে সে সময়ে লৌহদণ্ডটিকে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখবার আগ্রহে ব্যায়ামচর্চ্চার সময় মাংসপেশীটির ওপর তত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে। যে জন্য জগদ্‌বিখ্যাত স্যাণ্ডোর "গ্রীপ ডাম্বেল" বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামপ্রণালী হলেও অধুনা অনেকেই স্যাণ্ডোর গ্রীপ ডাম্বেলের পক্ষপাতিত্ব করেন না। কিন্তু যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামে এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেন না, নির্দ্দিষ্ট মাংসপেশীটির ওপর মনঃসংযোগ দেওয়া পূর্ণমাত্রায় সহজ হয়ে থাকে।

ব্যায়ামচর্চ্চার দ্বারা "দেহ-লাভে" শ্বাস-ক্রিয়ার প্রভাব সর্ব্ববাদি-সম্মত। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে কয়েকটি মাংসপেশী, যথা— পেক্টরালিস, ওব্লিকাস এবং ডেমিলিস প্রভৃতি বুকের এবং উদরের মাংসপেশীর ব্যায়ামে শ্বাস-ক্রিয়ার উপযুক্ত প্রক্রিয়া এ বিষয়ে উন্নতি লাভে সহায়তা করে। যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামচর্চ্চায় শ্বাস-ক্রিয়ার কোন গুরুতর গোলযোগের সৃষ্টি হয় না।

যন্ত্রসহ ব্যায়াম-পদ্ধতিতে উদরের মাংসপেশী এবং বক্ষদেশের মাংসপেশীর শ্বাসক্রিয়ার সমতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভালো যে, উদরের মাংসপেশীর উন্নতিকল্পে ব্যায়ামে উদরের সমস্ত বায়ু যেন নিঃশেষিত হয়ে থাকে। এই বিধি-নিষেধের কথা ব্যায়াম-কালীন বিস্মৃত হলে ফললাভে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকাও অস্বাভাবিক নয়। তবে এ কথা বলে রাখা ভাল যে, কোষ্ঠকাঠিন্য হলে উদরে বায়ুর সাহায্যে ব্যায়াম করা উচিত।

যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামে উদরের ব্যায়ামচর্চ্চা করা সহজসাধ্য হয়, কিন্তু যন্ত্রসহ ব্যায়ামে বিধি-নিষেধ মেনে চলা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামের সহযোগিতায় দেহলাভে দেহের কোন ক্ষয় ও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। উপরন্তু নিয়মিতরূপে ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে নিখুঁত সৌন্দর্য্যলাভে যথেষ্ট সহায়তা হয়ে থাকে। প্রতি মাংসপেশীটিতে বিশেষ ভাবে মনঃসংযোগের ফলে মাংসপেশী-গুলার বাহিরের গঠনাকৃতিতে কোন বিকৃতি দেখা যায় না। দেহটি সুষ্ঠাম বাঁধা হয়ে যথেষ্ট দেহসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কিন্তু যন্ত্রসহ ব্যায়ামে দেহ-যন্ত্রের ক্ষতি হবার যথেষ্ট সন্দেহ থাকে,—বিশেষ করে যাঁরা গুরুভার বারবেল সহযোগে ব্যায়াম করেন। ব্যবহার করার রীতির গরমিলে যন্ত্রসহ ব্যায়াম অসামঞ্জস্য অস্বাস্থ্য এবং বিকলাঙ্গতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও যন্ত্রসহ ব্যায়ামে যথা-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে না করলে দেহের ক্ষতি হয়ে থাকে। যন্ত্রসহ ব্যায়ামে কোন্ যন্ত্র কোন্ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রযোজ্য, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং ক্রমে ক্রমে কোন্ যন্ত্রের পর কোন্ যন্ত্র কি ভাবে ব্যবহার করে অগ্রসর হওয়া উচিত, এ বিষয়ে স্থির করাও সমস্যার বিষয়। যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামে এ সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়ার কোনই কারণ থাকে না।

দৈহিক শক্তি লাভে যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম বিশেষ সাহায্য করে। কুস্তিগীরদের দৈহিক ক্ষমতা এ কথার প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা চলে। তবে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত। অনেকে কুস্তিকে ঠিক যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামের পর্য্যায়ে স্থান দেন না। তাঁদের অভিমত কুস্তি করার সময় এক জনকে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। অপরের ইচ্ছাধীনে থাকায় তাদের মতে কুস্তি যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামও নয়, যন্ত্রসহ ব্যায়ামেরও পর্য্যায়ভুক্ত নয়। আবার অনেকের মতে কুস্তি যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম। কেন না, কোন প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে যখন ব্যায়ামচর্চ্চা করা হয় না, তখন কুস্তি যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম ছাড়া আর কি? যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামের পদ্ধতি যন্ত্রসহ ব্যায়াম অপেক্ষা সহজসাধ্য।

স্ত্রী এবং পুরুষদের কতকগুলি যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামের উল্লেখ করা গেল।

নিম্নে মেয়েদের কতকগুলি ব্যায়াম :—

১। সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে জোড়হাত অবস্থায় হাত দুটি সামনে প্রসারিত করে দাঁড়ান। গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণ করে হাত দুটি পশ্চাদ্‌ভাগে যত দূর আনা সম্ভব নিয়ে যাওয়া হউক। পূর্ব্বের অবস্থায় আসার সময় ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করাই বিধেয়। হাত দুটিকে পিছনে আনার সময় দেহবল্লরী যাতে "কুঁজো" না হয়ে যায় সে দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

২। সোজা ভাবে দাঁড়ান। হাত দুটি জোড় অবস্থায় মাথার ঊর্দ্ধে রাখুন। দেহের নিম্নাংশটি পাথরের মত শক্ত করে রেখে অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলির সাহায্যে ভূমি স্পর্শ করবার চেষ্টা করুন। ভূমি স্পর্শ করবার সময় নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়িয়ে আবার শ্বাস গ্রহণ করুন।

৩। দেহের নিম্নাংশটি দৃঢ় ভাবে শক্ত রেখে হাত দুটি জোড় অবস্থায় রেখে একবার দেহের উপরের অংশটি ডান ধারে হেলান আবার পূর্ব্বাবস্থায় এসে দেহের উপরের অংশটি বাঁ ধারে হেলান। স্মরণ রাখতে হবে, দেহের নীচের অংশের যেন কোন পরিবর্ত্তন না হয়।

৪। সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাত দুটিকে দেহের দু'পাশে ঝুলতে দিন। এবার শ্বাস গ্রহণ করে হাত দু'টিকে মাথার ঊর্দ্ধে স্পর্শ করতে দিন। প্রশ্বাস ত্যাগ করার সময় ধীরে ধীরে হাত দুটিকে পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরে আসতে দিন।

৫। মেয়েদের বৈঠক বা squalling শুনেই অনেকে হাস্য সম্বরণ করতে পারবেন না। কিন্তু পুরুষদের এবং মেয়েদের বৈঠকে

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈষম্য থাকায় বিভিন্ন প্রকারের। মেয়েদের বৈঠক দেবার সময় সর্ব্বপ্রথম দুটি পায়ের মধ্যে যাতে মাত্র ১ ফুট ব্যবধান থাকে সে বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখা উচিত। মেয়েদের আর একটি বিষয়ে পুরুষদের থেকে ব্যায়াম করার (বৈঠকের) পার্থক্য দেখা যায় এবং সেই ব্যায়ামের বিভিন্নতাই ব্যায়ামের মুখ্য ব্যায়াম-পদ্ধতি। পায়ের পাতার উপর দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে পা দুটিকে বাঁকাতে হবে। ধীরে ধীরে বসে পায়ের পাতার উপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। বৈঠক দেবার সময় ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। ওঠবার সময় শ্বাস গ্রহণ করতে হবে।

এ ছাড়া স্ত্রীজাতির মাংসপেশীর আকার পুরুষদের থেকে বিভিন্ন বলেই ব্যায়ামের পদ্ধতিরও বিভিন্নতা আছে। মেয়েদের ব্যায়ামে দেহ মাংসপেশীবহুল হবার আশঙ্কা তো থাকেই না বরং চর্ম্মের স্থিতি-স্থাপকতায়, কোমলতায় ও কমনীয়তায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাংসপেশী-গুলো দৃঢ় ভাবে সম্বদ্ধ হয়ে গড়ে উঠে।

পুরুষদের কয়েকটি যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম :—

দেশীয় ডন্ এবং দেশীয় বৈঠক যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যায়াম। যদি কোন ব্যায়ামচর্চ্চাবিদ্ কেবল-মাত্র নিখুঁত ভাবে ডন্ এবং বৈঠক করেন, তা হ'লে তার আর অন্য কোন ব্যায়াম করবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ ব্যায়ামে অনুরাগী ছাত্রগণ বৈঠক দেওয়ার পক্ষপাতী নন। ফলে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পরিপুষ্ট হলেও দৈহিক শক্তির প্রধান লক্ষ্যস্থলটির শিথিল মাংসপেশীগুলি পা দুটিকে দুর্ব্বল করে রাখে। যাঁরা স্থূল তাঁদের এই সহজ পদ্ধতিতে বৈঠক করায় উদরের চর্ব্বি হ্রাস পায়। ডন্ ও বৈঠক সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম করার পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই পূর্ব্বে গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের ব্যায়াম করা আবশ্যক। দেহকে পরে ব্যায়ামচর্চ্চার উপযোগী করে তোলবার জন্য যন্ত্রবিহীন ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্ববাদিসম্মত।

পরিক্রমা

সুনীল ঘোষ

অফিসে হাজিরা দি' ; কাজ করি ঘড়ির কাঁটায় ;
বিজলী-পাখার নিচে কপালেতে ঘাম উঠে জ'মে ,
শঙ্কিত দুপুর হেথা জানালায় উঁকি দিয়ে যায়—
নিঝুম আরণ্য-বুকে কত স্বপ্ন নিরালায় কাঁপে।
বাতাবী গাছের ডালে আর বুঝি পড়ে নাক' ঢিল ;
অতীতের মূর্ত্ত স্মৃতি আজ শুধু ফিকে হয়ে আসে !

ঘড়িতে পাঁচটা বাজে ; তাড়াতাড়ি খাতা ছেড়ে উঠি ;
লাভের হিসাব ঢাকা সুবিরাট লেজারের বুকে ;
ট্রাম চলে ; বাস চলে ; চারি দিকে জেগে ওঠে সাড়া ;
উতলা দীঘির বুকে ছোট ঢেউ আজো খেলা করে।

পাশের বৃদ্ধেরে দেখি—এক-মনে হিজিবিজি কাটে
শাদায় কালোয় [illegible]—জীবনের হিসেবি খতেন ;
মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত ধরি বাঁচিবার এ-বড় আয়াস
সময়ের যাদুঘরে জোড়াতালি ছিন্ন বাস সম
পুঞ্জীভূত অবসাদ ব্যথাতুর ব্যর্থ হাহাকারে।

তবুও সময় কাটে ; বয়ে যায় জীবনের ভেলা—
এক-বুক ঘোলা জলে কালি মেখে আজো করি খেলা !

বিজ্ঞান-জগৎ

বাতাসের শক্তি

পি, এস

বায়ুর প্রবাহকে আমরা বাতাস বলিতেছি। বায়ু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বেগে বহিয়া থাকে। ইহার কর্ম্মশক্তিকে অতি সহজে পাইলের সাহায্যে কল চালাইতে লাগানো যায়। জলের উপর নৌকা চালানোই বোধ হয় ইহার সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার; পরে স্থলেও ইহা হাওয়া-কল (wind-mill) ঘুরাইতে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, হাওয়া-কল স্টীমার প্রভৃতি কলকব্জা না হইলে চলে না; কিন্তু নৌকা চালাইতে কেবল পাইলের দড়ি ও কাপড় হইলেই হয়। ভারতবর্ষ ও চীনে অতি প্রাচীন কাল হইতে পাইলের সাহায্যে নৌচালন হইত, ইংলণ্ডে তখন বৃটনরা ভেলা, ডোঙ্গা, সালতি বা চামড়ার ছোট নৌকা মাত্র চালাইত। বাতাসের শক্তি কল চালাইতে সর্ব্বপ্রথম ১২শ শতকে ব্যবহৃত হয়। পর্ব্বত ও বনহীন সমতল দেশগুলিই এই শক্তির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হইবার কারণ এই যে, এইরূপ দেশে বায়ুপ্রবাহ রোধ করিবার কিছুই থাকে না। এই জন্যই হলণ্ডে হাওয়া-কল সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। বায়ু যেখানে অবাধে প্রবাহিত হইতে পারে, এমন একটি স্থান নির্ব্বাচনের পর পাইলগুলি এমন ভাবে খাটানো আবশ্যক যাহাতে বায়ু-প্রবাহের দিক-পরিবর্ত্তন হইলে সেগুলিকে সহজেই ঘুরাইয়া তাহাদের উপর বায়ুপ্রবাহের চাপ সমান রাখা যায়। এই জন্য হাওয়া-কল এমন ভাবে তৈয়ার করা হয় যে, সমগ্র কলটি বা তাহার উপরিভাগের পাইলগুলি সহজে যে দিকে খুসী ফিরাইতে পারা যায়। প্রথম প্রথম ইহা হাতে করা হইত। ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হইত, কারণ, পাইলগুলি থামাইয়া ইহা করিতে হইত। পরে ইহার উন্নতিকল্পে ইহার সঙ্গে একটি সেকেণ্ডারী অক্ষ হাওয়া-কল জুড়িয়া দেওয়া হয়. ইহার মেরুদণ্ড (axis) প্রধান পাইলগুলির সহিত সমকোণে বসানো থাকিত (at the angles to the main sails)। বাতাসের দিক বদলাইলে এটি প্রধান চাকাকে ঘুরাইয়া ঠিক জায়গায় আনিয়া দিত।

৫০ ফুট বা ততোধিক বেধযুক্ত পাইলের সাহায্যে ঘূর্ণিত হাওয়া-কলে যথেষ্ট শক্তি উৎপাদিত হইত। তথাপি হাওয়া-কল কেবল আটা ভাজা ও জল পাম্প করা ছাড়া আর কোন শিল্প কাজে ব্যবহার হয় নাই। কারণ, হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ১০ মাইলের কম হইলে যে কল বন্ধ হইয়া যায়, অন্য সমস্ত কাজ তাহাতে করিলে পোষাইত না। ষ্টীম-ইঞ্জিনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলেই হাওয়া-কলের তিরোভাব হয়। হাওয়া-কলে শক্তির উৎস বেদামী হইলেও ইহাতে কাজ বড় ভাল চলিত না; কারণ হাওয়া কমিলেই কল বন্ধ হইত। তথাপি নূতন অবস্থায় উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগের বিশাল সমতল ক্ষেত্রগুলিতে এগুলি নূতন করিয়া ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ, এখানে কয়লা বা কাঠ পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল কিন্তু হাওয়া বেশ জোরে নিয়মিত বহিত। এখানে মার্কিণ কৃষকরা জল পাম্প করিবার জন্য হাওয়া-কলে ৪টি বৃহৎ পাইলের বদলে অনেকগুলি ছোট ছোট পাইল ব্যবহার করিত। তবে ছোট পেট্রোল ইঞ্জিনের আবিষ্কারের ফলে এগুলিও বাতিল হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃতি দেবী বায়ুপ্রবাহে সর্ব্বাধিক পরিচালন শক্তি দিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি এখনও ইহাকে কাজে লাগানো যায় নাই। এই শক্তির ব্যবহার ভাবী আবিষ্কারকদের জন্য থাকিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যে বায়ু-প্রবাহের শক্তি বিদ্যুৎ-প্রবাহে পরিণত করিয়া ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা সম্ভবপর হওয়ায় নিয়মিত ভাবে কল-কারখানার কাজ চালানো হাওয়া-কলের পক্ষে অধিকতর সম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বে হাওয়া-কলের পাইল নৌকার পাইলের মত গুটাইয়া বা ছড়াইয়া কলের শক্তির সমতা রক্ষা করা হইত। এখন ডাইনামো ও ব্যাটারীর সাহায্যে সহজেই এই সাম্য রক্ষিত হয়।

আজ-কালের হাওয়া-কলগুলি এরোপ্লেনের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। এরোপ্লেনের খুব হাল্কা প্রোপেলার এখন হাওয়া-কলের ভারী বড় বড় পাইলের এমন কি বহু পক্ষ-চক্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। এরোপ্লেনের প্রোপেলার ঘুরিবার সময় বাতাসের সৃষ্টি করে, ঠিক একই কারণে জোর বাতাসে প্রোপেলারকেও ঘোরায়। অতএব এরোপ্লেনের বায়ু-স্ক্রুপ (airscrews)গুলি হইতে হাওয়া-কল তৈয়ারীর পরিকল্পনায় অনেক সাহায্য হইয়াছে। বিশেষ যখন হাওয়া-কলের ছোটত্বেই সুবিধা অধিক, ১০টি ছোট হাওয়া-কল একুনে উহাদের সমান আয়তনের পাইলবিশিষ্ট একটি বড় হাওয়া-কল অপেক্ষা একই হাওয়ায় অনেক অধিক শক্তিশালী হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে হাওয়া-কলের ডাইনামো পাইলগুলির অতি নিকটে একটা ইস্পাতের টাওয়ারের উপরিভাগে বসানো হয়। এই টাওয়ারের উচ্চতা স্থানীয় বায়ু-প্রতিরোধকগুলির উপর নির্ভর করে। ইহাতে চাকা ও প্যানিয়ন সাহায্যে শক্তি পরিচালনের অপচয় নিবারণ হয়। একটি ক্ষুদ্র হালের সাহায্যে পাইলগুলির মুখ সর্ব্বদা বায়ু-প্রবাহের ঠিক বিপরীত মুখে রক্ষিত হয়। হাওয়া এই হালের পাশে লাগে। এইরূপ ছোট ছোট হাওয়া-কল এখন হাজার হাজার তৈয়ারী হয়। এগুলি বিদ্যুৎ সরবরাহের বাহিরে সুদূর কৃষি-বাটিকায় ও খরচ কম বলিয়া যেখানে বিদ্যুৎ কিনিতে পাওয়া যায়, সেরূপ অনেক স্থলেও ব্যবহৃত হয়। খুব ছোট একটি

হাওয়া-কল ১ ডজন মাঝারি আলোক জ্বালাইতে পারে। এগুলি কিন্তু বড় কল চালাইবার বা তাপ উৎপাদনের উপযোগী নয়। ১২ ভোল্ট ডাইনামো চালাইয়া ২।১টা আলো জ্বালাইবার মত আরও ছোট এক রকম হাওয়া-কল আছে। এগুলি এত হাল্কা যে, ইহাদের ইস্পাতের টাওয়ারগুলি সাধারণ ছাদের উপর তৈয়ারী করা হয়। ইহার কলকজ্জায় আপনা-আপনি তেল দিবার ব্যবস্থা আছে; কেবল ইহার বিদ্যুৎ জমা রাখিবার ব্যাটারীগুলিকে দেখা-শোনা আবশ্যক হয়। এগুলিও যে কোন সুবিধামত স্থানেই রাখা যাইতে পারে। এই হাওয়া-কলগুলির আবিষ্কারক জন ও গের্হার্ড আল্বের্স (John & Gerhard Albers)। ইঁহারা আইওয়ায় এক সুদূর কৃষি-বাটিকায় বাস করিতেন, এখান হইতে আপনাদের রেডিওর ব্যাটারীগুলি চার্জ্জ করিতে বহু দূর যাওয়ার অসুবিধা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইঁহারা নানা প্রকার পাইল লইয়া পরীক্ষার পর অবশেষে খুব কাজের মত একটি প্রোপেলার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। অধিকন্তু, ইঁহারা এই প্রকার হাওয়া-কল হাজারে হাজারে তৈয়ার করিবার যন্ত্রও তৈয়ার করিয়াছিলেন। আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দশ লক্ষ লোক এগুলির সাহায্যে রেডিও ব্যাটারী, আলো ও ছোট ছোট যন্ত্রাদি চালাইবার মত বিদ্যুৎ তৈয়ার করিয়া লইতে সক্ষম হইতেছেন। ক্রমে এই নূতন ধরণের হাওয়া-কল বেশী বেশী ব্যবহৃত হইবে বলিয়াই বোধ হয়। যদিও এগুলিকে দেখিয়া পুরাতন হাওয়া-কলওয়ালারা হাওয়া-কল বলিয়া চিনিতেই পারিবে না। কুইন্সল্যাণ্ডে বৎসরের সময়বিশেষে পথহীন সুদূর প্রদেশে অবস্থিত ছোট ছোট পল্লীর অধিবাসীরা বিমানযোগে ডাক্তার আনিবার জন্য বেতারের সাহায্য লইয়া থাকে। এই বেতার যন্ত্রগুলি চালাইতে তাহারা চক্রহীন সাইকেলের পেডালের সহিত ডাইনামো জুড়িয়া ঘুরাইয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। এই হাওয়া-কল ইহাদের বিশেষ কাজে আসিবে বলিয়া বোধ হয়। হাওয়া-কলের সুবিধা এই যে, একবার বসাইবার খরচ যোগাড় করিতে পারিলেই হয়। শক্তি উৎপাদনের জন্য খরচ কিছুই নয় বলিলেও চলে। হাওয়া-কলের সাহায্যে জমি গরম করিয়া বৎসরে এক ফসলের স্থানে ৩।৪ ফসল উঠাইবার চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে মধ্যে মধ্যে হাওয়া বন্ধ হইলেও ক্ষতি নাই; কারণ উৎপাদিত তাপ ভূমিতে সংরক্ষিত হইবে। আণ্টার্টিক প্রদেশে হাওয়া-কল বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সেখানে সর্ব্বদাই প্রবল বায়ু প্রায় সমান বেগে প্রবাহিত। ইহার বেগ প্রায় কখনও ঘণ্টায় ৫০ মাইলের কম হয় না এবং ইহা প্রায়ই অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। বরফে আটকানো জাহাজে হাওয়া-কলের সাহায্যে ন্যানসেনের বিদ্যুৎ তৈয়ার করিবার বিবরণ পাঠ করিয়াই আলবের্স ভ্রাতৃদ্বয় কাজের মত হাওয়া-কল তৈয়ারীর চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহুল পরিমাণে সুবৃহৎ হাওয়া-কল তৈয়ার করিয়া মেরুপ্রদেশের ভীষণ শীতের হাত হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। বিদ্যুৎ সাহায্যে তাপ, কৃত্রিম সূর্য্যালোক, বহির্বেগুনি রশ্মি, গরম জল প্রভৃতি যাহা কিছু সভ্য সমাজে আবশ্যক সমস্তই প্রস্তুত হইতে পারে। পৃথিবীর অন্য সব স্থানের কয়লা প্রভৃতি আবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ ফুরাইয়া গেলে এখানে খনকেরা হাওয়ার দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে আরামে কাজ করিতে পারিবে। আরও পরে হয়তো আণ্টার্টিক প্রদেশ বাতাসের সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ-শক্তির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে। তবে তার আগে বেতারে কম খরচে বহু দূরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠাইবার উপায় আবিষ্কার করা চাই। কারণ, আণ্টার্টিক প্রদেশ হইতে নিকটতম স্থানের দূরত্ব অন্ততঃ ৬০০ মাইল। এমন কি, তাহারও আগে বৈমানিকদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের ফলে হয়তো বাতাসের শক্তির গুরুত্ব আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। ১০০০ হইতে ১৫০০ ফুট উচ্চে বায়ুপ্রবাহ মাটির উপর অপেক্ষা অধিক বেশী জোরে ও নিয়মিত ভাবে বহিয়া থাকে। হের হোনেফ নামক জনৈক জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার ১০০০ ফুট উচ্চ ইস্পাতের টাওয়ারের উপর হাওয়া-কল বসাইবার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন; ইহাতে টাওয়ারটির ভিত্তির ব্যাস ৫০০ ফুট কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার হিসাবে ইহাতে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর খরচে ৬০,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন সম্ভব, দেখানো হইয়াছে। হোনেফ ৮৫০ ফুট উচু বেতার-মাস্তল তৈয়ার করিয়াছেন অতএব তাঁহার পরিকল্পনা একেবারে ফেলিয়া দিবার নহে। টাওয়ার তৈয়ারীর মতলবটিও তাঁহার উল্লেখযোগ্য। তিনি এটি উপরের দিক্ হইতে তৈয়ার করিতে চান। প্রথমে সকলের উপরেরটি তৈয়ার করিয়া শক্তিশালী জ্যাকের (Jack) সাহায্যে উপরে তুলিয়া পরে ইহার নিচের অংশের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইবে—পরে ক্রমশঃ পর পর একটি একটি করিয়া নিচের অংশ জুড়িয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করা হইবে। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ ৬০০০ টাওয়ার তৈয়ার করিলেই জার্ম্মাণীর যাবতীয় শক্তি, তাপ ও আলোর চাহিদা মিটিবে।

[কথানাট্য]

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মিঃ চৌধুরীর 'ড্রয়িংরুম'। এক প্রান্তে 'ইজ্‌লে'র সামনে ব'সে, তাঁর স্ত্রী প্রতিমা শ্রীদুর্গার একখানি ছবি আঁকছেন। (মিঃ চৌধুরীর প্রবেশ—পরনে বিলাতী পোষাক, মুখে চুরোট—বয়সে তিনি যুবক)

প্রতিমা। ওগো মশাই, তোমার চুরোটের ধোঁয়াকে অনুগ্রহ ক'রে আমার দিকে আসতে মানা ক'রে দাও।

চৌধুরী। কেন বল দেখি? জ্যান্তো মানুষের চুরোটের গন্ধ পেলে ছবির নিষ্প্রাণ দুর্গা রাগ করবেন না কি?

প্রতিমা। তুমি ভুলে যাচ্ছ, ছবিখানা আঁকছেন একটি জীবন্ত মহিলা। চুরোটের ধোঁয়ায় তিনি কেসে ফেলতে পারেন।

চৌধুরী। আশ্চর্য্য! বিংশ শতাব্দীর মহিলা প্রতিমা চৌধুরী, চুরোটের গন্ধ তাঁর সহ্য হয় না!

প্রতিমা। বিংশ শতাব্দীর মেয়ে প্রতিমা আঁকছে প্রাগৈতিহাসিক দুর্গা-প্রতিমার ছবি, এটা কি তার চেয়েও আশ্চর্য্য নয়?

চৌধুরী। আমি তা মনে করি না। নব্য মেয়েদেয় মধ্যে একটা ফ্যাসান হয়েছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাওয়া। কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে আমি, বিলাত-ফেরৎ মেয়েকেও আবিষ্কার করেছি।

প্রতিমা। তোমার আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য বটে। কিন্তু ও আলোচনা ছেড়ে এখন বল দেখি, আমার আঁকা কেমন হচ্ছে?

চৌধুরী। চমৎকার! একেবারে প্রথম শ্রেণীর!

প্রতিমা। মেয়েদের সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা আধুনিক পুরুষদের একটা মস্ত-বড় বদ-অভ্যাস!

চৌধুরী। তার কারণ আধুনিক নারীরা যথার্থ সমালোচনা সহ্য করতে পারে না।

প্রতিমা। তোমার কাছ থেকে আমি আধুনিক স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে অমূল্য জ্ঞান সঞ্চয় করতে চাই না। আমি কেবল জানতে চাই, ছবিখানা কেমন হচ্ছে?

চৌধুরী। তোমাকে প্রথম শ্রেণীর 'সার্টিফিকেট' দিলেও তুমি তো বিশ্বাস করবে না! সত্যি, দুর্গাদেবীর মুখখানি হয়েছে ভারি মিষ্টি।

প্রতিমা। হ্যাঁ, তোমার ও-কথা মানতে রাজি আছি। সিংহের মূর্ত্তিটাও হয়তো নিতান্ত মন্দ হয়নি। কিন্তু অসুরের মূর্ত্তিটাকে আমি কিছুতেই আয়ত্ত আনতে পারছি না।

চৌধুরী। ওটা স্বাভাবিক। 'বিউটি'র সঙ্গে 'বিষ্ট'-এর সম্পর্ক না থাকাই উচিত।

প্রতিমা। না গো না, ঠাট্টা নয়। অসুরকে আমি 'বিষ্ট'-রূপে কল্পনা করতে চাই না—আমি দেখাতে চাই এক মহা তেজী, মহা বলী 'সুপারম্যান'-রূপে। আজ সারা দিন ধ'রে অসুরের নানা রূপ ধ্যান করলুম, কিন্তু কিছুই মনে লাগছে না।

চৌধুরী। তাহ'লে আপাতত দানবের ধ্যান ছেড়ে মানবের দেশে ফিরে এস। একটা খবর আছে।

প্রতিমা। প্রকাশ কর।

চৌধুরী। সেই যাদুকরের সন্ধান পেয়েছি।

প্রতিমা। (বিস্মিত স্বরে) যাদুকর!

চৌধুরী। হ্যাঁ গো, যাদুকর নয়তো কি? সেই যে কাগজে কাগজে যাঁর অদ্ভুত যোগবলের কথা নিয়ে মহা আন্দোলন প'ড়ে গেছে, সেই যে যিনি য়ুরোপ-আমেরিকা জয় ক'রে দেশে ফিরে এসেছেন, আর যাঁকে দেখবার জন্যে তোমার আগ্রহের সীমা নেই!

প্রতিমা। ও, তুমি বুঝি স্বামী সুধানন্দের কথা বলছ? তা তিনি যাদুকর হ'তে যাবেন কেন?

চৌধুরী। স্বদেশী ভাষায় যদি তোমার আপত্তি থাকে, তাহ'লে তাঁকে আমি 'ম্যাজিসিয়ান' ব'লেই ডাকব।

প্রতিমা। তাহ'লেও ভুল হবে। যোগবলের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্পর্ক কি?

চৌধুরী। আধুনিক যুগে যা-কিছু অলৌকিক, তাকেই আমি ম্যাজিক ব'লে বিশ্বাস করি!

প্রতিমা। তোমার বিশ্বাস নিয়ে যে পৃথিবী চল্‌ছে না, এইটেই তার সৌভাগ্য।

চৌধুরী। মানলুম। এখন শোনো। তোমাদের ঐ যাদুকর আজ আমাদের এখানে আসছেন।

প্রতিমা। (সাগ্রহে) আসছেন? কখন?

চৌধুরী। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সেন আর দত্তের সঙ্গে তাঁর এখানে আসবার কথা।

প্রতিমা। (ব্যস্ত ভাবে) তাহ'লে আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে আসি। তুমি তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান

চৌধুরী। (হাস্য ক'রে)। ম্যাজিককে বলবে যোগবল, যাদুকরকে বলবে যোগী! নাঃ, মেয়েদের নিয়ে আর পারা গেল না! আবার ব'লে গেলেন, অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে! ব্যবস্থা আর কি করব, স্বামীজীর জন্যে দরকার হবে হয়তো এক ঘটি গঙ্গাজল আর একখানা পশমের আসন! বেয়ারা!

বেয়ারা। হুজুর!

চৌধুরী। ঐ কোণ থেকে কৌচখানা সরিয়ে, ওখানে গঙ্গাজল ছিটিয়ে একখানা পশমের আসন পেতে রাখ্! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলি যে? যা শিগ্‌গির!

[বেয়ারার প্রস্থান।

সায়েবের হিন্দুত্ব দেখে বেটা বোধ করি চম্‌কে গেল! আমার 'ড্রয়িং-রুমে' এমন ব্যবস্থা কখনো দেখেনি তো!

(অল্পক্ষণের জন্যে নীরবতা)

আরে, আরে, এস দত্ত! এস সেন! আসুন স্বামীজী, প্রণাম।

স্বামীজী। মঙ্গল হোক্!

(বেয়ারার প্রবেশ)

বেয়ারা। হুজুর, গঙ্গাজল আর আসন—

দত্ত। কি হে চৌধুরী, গঙ্গাজল আর আসন কেন?

চৌধুরী। স্বামীজী তো সোফা-কৌচে বসবেন না, তাই—

স্বামী। আমার সম্বন্ধে আপনার উচ্চ ধারণা দেখে লজ্জিত হচ্ছি। কিন্তু গঙ্গাজল আর কুশাসনের উপরে যাঁদের দাবি, আমি সে-শ্রেণীর মানুষ নই! ও-সব নিয়ে যেতে বলুন, আমি এই চেয়ারে বসলুম।

চৌধুরী। মাপ করবেন, আপনি যে এমন আধুনিক স্বামীজী সেটা আমি ভাবতে পারিনি।

সেন। মিসেস চৌধুরী কোথায়?

চৌধুরী। আপাতত সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। কঠিন মার্বেলের উপরে তাঁর কোমল 'স্লিপারে'র মধুর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না?

(স্লিপারের শব্দ। প্রতিমার প্রবেশ)

প্রতিমা। (স্বামী সুধানন্দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল)

স্বামী। (ব্যস্তভাবে) পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরো না মা, আমি তোমারই মতন সাধারণ মানুষ!

প্রতিমা। আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলুম।

স্বামী। বাছা, উঠে ঐ কৌচের উপরে বোসো। তোমার মুখে আমি অদৃশ্য জগৎ দেখছি।

দত্ত। (সবিস্ময়ে) অদৃশ্য জগৎ!

স্বামী। হ্যাঁ মিঃ দত্ত। যে জগৎ পৃথিবীর চোখে অদৃশ্য!

সেন। আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না স্বামীজী!

চৌধুরী। পারবে না সেন, পারবে না অর্থ বুঝতে। ম্যাজিকের মধ্যে অর্থ নেই!

স্বামী। ঠিক বলেছেন। কিন্তু ম্যাজিক কাকে বলে মিঃ চৌধুরী?

চৌধুরী। যা কিছু অসাধারণ—অর্থাৎ অলৌকিক, তাকেই আমি ম্যাজিক ব'লে মনে করি।

স্বামী। একশো বছর আগে আপনি বৈদ্যুতিক আলো আর পাখার ধারণা করতে পারতেন?

চৌধুরী। না।

স্বামী। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার, উড়ো-জাহাজ, ডুবো-জাহাজ, টেলি-ভিসন, ফোনোগ্রাফ, জীবন্ত সবাক ছবি—কিছু কাল আগেও মানুষ কি এ-সবের কল্পনা করতে পেরেছিল?

চৌধুরী। না।

স্বামী। কিন্তু উনিশ শতাব্দীর লোকরাও তো এ-সব ব্যাপারের কথা শুনলে অলৌকিক বা ম্যাজিক ব'লে মনে করতে পারত?

প্রতিমা। ওঁর কথায় আপনি বিরক্ত হবেন না স্বামীজী, উনি যোগবলকেও ম্যাজিক ব'লে মনে করেন।

দত্ত। চৌধুরীর মত হচ্ছে, য়ুরোপের আধুনিক বিজ্ঞান এখনো যা স্বীকার করেনি, তার মধ্যে কোন সত্য নেই।

সেন। চৌধুরী কোন কথা বিশ্বাস করবার আগে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে চায়।

স্বামী। তাহ'লে ওঁর মনকে আমি সত্যিকার বৈজ্ঞানিক মন ব'লে স্বীকার করি। আসল কথা কি জানেন? কল্পনাই হচ্ছে বাস্তব! কবির আর চিত্রকরের কল্পনা অনেক শতাব্দীর আগেই উড়ো-জাহাজ, ডুবো-জাহাজ আর আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি অনেক-কিছুরই কল্পনা করতে পেরেছিল। কিন্তু সে-সব বাস্তব হয়েছে আধুনিক যুগেই। বৈজ্ঞানিকদের অক্ষমতার জন্যেই এত দিন ওগুলি বাস্তবে পরিণত হ'তে পারেনি। কল্পনা হচ্ছে ধ্যান। সত্য-দ্রষ্টার ধ্যানে যা ধরা পড়ে, তাকে বাস্তব ব'লে স্বীকার করতেই হবে।

চৌধুরী। তাহ'লে স্বামীজী, আমি একটি কথা বলতে চাই। কল্পনাই যদি সত্য হয়, তাহ'লে আপনি কি আমার স্ত্রীর কল্পনা বা ধ্যানকে বাস্তবে পরিণত করতে পারেন?

স্বামী। হ্যাঁ মা, তুমি কি ধ্যানে কিছু দেখেছ?

প্রতিমা। (লজ্জিত স্বরে) ওঁর কথা ছেড়ে দিন। আমার কল্পনায় কোন বস্তু নেই। আমি আজ অসম্ভব সব মূর্তির কল্পনা করেছি। আমি আজ—

চৌধুরী। (তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে) তুমি আজ কি কল্পনা করেছ, তা প্রকাশ করবার দরকার নেই। যা সত্য, যা বাস্তব, তা সবাই দেখতে পায়। তোমার কল্পনা যদি সত্য হয়, তবে কেবল স্বামীজী নন, আমরা সবাই তাকে দেখতে পাব।

স্বামী। মিঃ চৌধুরী, প্রতিমা দেবী বলছেন আজ তিনি নানা অসম্ভব মূর্তির কল্পনা করেছেন। আমার মতে, মানুষ যা কল্পনা করতে পারে, তা অসম্ভব নয়। আপনি কি প্রতিমা দেবীর কল্পনাকে স্বচক্ষে দেখতে চান?

চৌধুরী। (দৃঢ় স্বরে) নিশ্চয়! দেখি, আপনার যাদু-বিদ্যার দৌড় কত দূর!

স্বামী। (শান্ত স্বরে) মিঃ চৌধুরী, আমাকে যাদুকর ব'লে ভ্রম করছেন কেন? প্রতিমা দেবী ধ্যান-নেত্রে যা দেখেছেন, তার মধ্যে আমার কোনই বাহাদুরি নেই। কিন্তু একটি কথা মনে রাখবেন। সে ধ্যান জাগ্রত, তা বিপজ্জনক হ'তেও পারে।

প্রতিমা। (ব্যস্ত কণ্ঠে) স্বামীজী, স্বামীজী,—আমার ধ্যান বিপদ্‌জনক! আমার ধ্যান ভয়ানক। আমি কি সব মূর্ত্তি দেখেছি জানেন—?

চৌধুরী। (বাধা দিয়ে) প্রতিমা, আবার!···দেখুন স্বামীজী, কল্পনা হচ্ছে কল্পনা,—বাস্তব জীবনে তা কোন দিনই বিপদ্‌জনক বা ভয়ানক হ'তে পারে না।

স্বামী। আপনার মত যে ভুল, এখনি তার প্রমাণ দেওয়া যায়।

চৌধুরী। বেশ তো, প্রমাণ দিন না!

দত্ত। চৌধুরী, স্বামীজীর সঙ্গে তুমি যে-ভাবে কথা কইছ, সেটা আমি সমর্থন করি না।

চৌধুরী। দত্ত, আমি তো ওঁকে অপমান করতে চাই না! আমি কেবল দেখতে চাই যে—

স্বামী। আমি যাদুকর কি না? কিন্তু মিঃ চৌধুরী, প্রতিমা দেবীর কল্পনা সত্য ব'লেই আমি স্বীকার করছি, এর মধ্যে আমার যাদুবিদ্যার কোনই বাহাদুরি নেই। মানুষ যে-কল্পনাকে মনের মধ্যে অনুভব করতে পারে, তার চেয়ে বাস্তব আর কিছুই নেই।

চৌধুরী। বেশ তো, আপনি সেই প্রমাণ দেখিয়ে আমার একটা মস্ত ভ্রম দূর করুন না!

স্বামী। কিন্তু প্রতিমা দেবীর কল্পনা সত্য সত্যই যদি বিপদ্‌জনক হয়?

চৌধুরী। সে জন্তে আমি আপনাকে দায়ী করব না।

সেন। চৌধুরী, স্বামীজীর শক্তি তুমি জানো না। এখনো বলছি, সাবধান হও!

চৌধুরী। (উচ্চ স্বরে হাস্ত ক'রে) সেন, তোমরা আমাকে হাসালে দেখছি! প্রতিমা দেবী প্রাগৈতিহাসিক যুগের দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। মনে রেখো, এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী।

প্রতিমা। স্বামীজী, আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করছি। কিন্তু আজ সারাদিন ধ'রে আমি—

চৌধুরী। (কঠোর স্বরে) প্রতিমা, তুমি চুপ কর। স্বামীজী, দয়া ক'রে আপনি প্রতিমার কল্পনা আমার চোখের সামনে বাস্তব রূপে দেখান।

স্বামী। (গম্ভীর স্বরে) বেশ, তাই হবে। মানুষ যা চিন্তা করে, তার চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কিন্তু এই সত্যকে দেখাতে গিয়ে যদি কোন বিপদ্ হয়, তার জন্তে আমি দায়ী নই!

চৌধুরী। আমি তো বলছি, এজন্তে দায়ী হব আমি!

প্রতিমা। (কাতর স্বরে) ওগো, তুমি কী বলছ!

চৌধুরী। (ক্রুদ্ধ স্বরে) প্রতিমা, আবার বলছি—তুমি চুপ কর। আসুন স্বামীজী, বাস্তব কল্পনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্তে আমি একেবারেই প্রস্তুত!

স্বামী। (শান্ত ভাবে) শুনুন মিঃ চৌধুরী! ব্যাপারটাকে একবার গুছিয়ে' আরো ভালো ক'রে বলি। এটা ভোজবাজির বা ম্যাজিকের কথা নয়, একেবারে বিজ্ঞানেরই কথা। মানুষের কথা যে ইথারের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, বেতারের আবিষ্কারের পর এটা আপনারা মানছেন। মানুষের চিন্তা বা কল্পনাও ব্যর্থ হয় না। ইথারের মধ্যে তাও তরঙ্গ বা রূপ সৃষ্টি করতে পারে। ইথারের মধ্যে যার অস্তিত্ব আছে, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চোখের সামনে তাকে দেখতে পাওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়।

চৌধুরী। আমি এখন মনের ভিতরে যে কল্পনাকে দেখছি, আপনিও তাকে দেখতে পাচ্ছেন কি?

স্বামী। দেখবার চেষ্টা করলেই দেখতে পারি।

চৌধুরী। (অট্টহাস্ত ক'রে) দয়া ক'রে একবার চেষ্টা করুন না!

স্বামী। (অল্পক্ষণ মৌন থেকে) আপনার মনের ভিতরে যে মূর্ত্তিকে দেখলুম, বাইরেও তাকে আর দেখতে চাইবেন না!

চৌধুরী। (অবিশ্বাসের স্বরে) আপনি আমার মনের মূর্ত্তিকে দেখতে পেয়েছেন?

স্বামী। পেয়েছি।

চৌধুরী। বলুন তবে, কে সে?

স্বামী। আপনি এখন মহিষাসুরের ধ্যান করছেন।

দত্ত। (সবিস্ময়ে) মহিষাসুর!

সেন। চৌধুরী, চুপ ক'রে রইলে যে? বল, স্বামীজীর অনুমান সত্য কি না।

চৌধুরী। (হতভম্বের মত) ওঁর অনুমান সত্য।

স্বামী। প্রতিমা দেবীর মনের ভিতরেও আমি ঐ মূর্ত্তিকে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু অন্য রূপে। প্রতিমা দেবীর কল্পনা মিঃ চৌধুরীর কল্পনার মত হিংস্র আর ভয়ানক নয়।

চৌধুরী। (বিপুল বিস্ময়ে) স্বামীজী, স্বামীজী! আপনি সত্যই যাদুকর!

স্বামী। যাদুকর কথাটা আমি ঘৃণা করি।

চৌধুরী। আমাকে ক্ষমা করবেন।

প্রতিমা। হ্যাঁ স্বামীজী, আজ সারা দিন আমি মহিষাসুরের নানা রূপ কল্পনা করেছি, কিন্তু কোন রূপই আমার মনের মত হচ্ছে না।

স্বামী। হঠাৎ এই অদ্ভুত কল্পনার কারণ কি?

প্রতিমা। আমি মহিষমর্দ্দিনীর একখানি ছবি আঁকছি। কিন্তু, মহিষাসুরের আসল চেহারা ধরতে পারছি না।

স্বামী। কিন্তু মিঃ চৌধুরীর পরিকল্পনায় কোন অস্পষ্টতা নেই। দুর্গা-প্রতিমার মধ্যে আমরা যে অসুরকে দেখি, ওঁর মনের মধ্যে দেখলুম তারই নিষ্ঠুর, ক্রুদ্ধ, পাশবিক মূর্ত্তি। যেন ওঁর মনের ভিতর থেকে একবার বেরুতে পারলেই সে ত্রিভুবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে!

চৌধুরী। স্বামীজী, আমি তো তাকে আমার মনের বাইরেই দেখতে চাই!

দত্ত। (সচমকে) কি বলছ তুমি হে?

সেন। চৌধুরী পাগলের মত কথা বলছে, স্বামীজীকে ও চেনে না!

চৌধুরী। পাগল আমি হইনি সেন, পাগল হয়েছ তোমরাই। আমি বিশ্বাস করি না দুর্গা আর মহিষাসুরের রূপকথা। আর মহিষাসুরের অস্তিত্ব থাকলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগেই তার মৃত্যু হয়েছে, তার প্রেতাত্মা হাজার হাজার বছর ঠেলে বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় এসে আর সিংহনাদ করতে পারবে না।

স্বামী। মিঃ চৌধুরী, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে বিশেষ এক এক রকম চিন্তার স্রষ্টা—অর্থাৎ কেউ স্রষ্টিরা, কেউ

দত্ত। স্বামীজী, আমার হাত-পা ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপছে। কর্মেছি শেষটা যেন ট্রাজেডি হয়ে না দাঁড়ায়।

সেন। যা দেখেছি যা শুনেছি তাই-ই যথেষ্ট। এইখানেই যবনিকা পড়লে আমি খুসি হব।

প্রতিমা। আর আমি কিছু দেখতে চাই না স্বামীজী।

স্বামী। মনের কালো চিন্তার মূর্ত্তি যখন বাস্তব রূপে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন দেখতে না চাইলেও ওর কবল থেকে আর আমরা মুক্তি পাব না।

চৌধুরী। কেন আর বাজে কথা বাড়াচ্ছেন স্বামীজী? এখন হার মেনে এ প্রহসন বন্ধ করুন।

স্বামী। প্রহসন?

চৌধুরী। তা নয় তো কি?

দত্ত। (চম্‌কে) ও কী! ও কিসের আওয়াজ?

(অস্পষ্ট হুঙ্কারের মতন শব্দ শোনা গেল)

চৌধুরী। রাস্তায় কে শব্দ করছে।

স্বামীজী। রাস্তায় নয় মিঃ চৌধুরী, ও শব্দ আসছে আপনারই বৈঠকখানার ভিতর থেকে।

চৌধুরী। অসম্ভব। ড্রয়িং-রুমে কেউ নেই। ও বাইরের শব্দ।

প্রতিমা। (সভয়ে বিরক্তির স্বরে) হ্যাঁ গা, তুমি কি গায়ের জোরে সব কথাই উড়িয়ে দেবে? হ্যাঁ, ও শব্দ আসছে আমাদেরই ড্রয়িং-রুম থেকে।

চৌধুরী। হ'তেই পারে না।

সেন। শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

(স্পষ্ট হুঙ্কারের পর ক্রম-বর্দ্ধমান হুঙ্কারের শব্দ—ক্রমে তা যেন গম্ভীর সিংহ-গর্জ্জনে পরিণত হ'ল)

স্বামী। মহিষাসুরের হুঙ্কার! মানুষের যে ভীষণ কল্পনা শত শত যুগ ধ'রে মৃত্যুময় অন্ধকারে নিদ্রিত ছিল, আমাদেরই অবিশ্বাসী নির্ব্বুদ্ধিতায় আজ আবার হ'ল তার জাগরণ।

প্রতিমা। এ কি করলেন স্বামীজী, এ কি করলেন।

স্বামী। হ্যাঁ মা, আমার অন্যায় স্বীকার করছি। আমি না ইচ্ছা করলে হয় তো এটা সম্ভব হ'ত না—তোমাদের ইচ্ছাশক্তি তো আমার মতন সবল নয়। কিন্তু কি করব মা, তোমার অবিশ্বাসী স্বামী যে বার বার আমাকে উত্তেজিত করলেন।

চৌধুরী। আমি এখনো কিছু বিশ্বাস করছি না। যাদুকররা অনেক রকম টি্ক্ জানে, চোখের সামনে মানুষ উড়িয়ে দেয়।

প্রতিমা। ওগো, স্বামীজীকে তুমি আর উত্তেজিত কোরো না।

চৌধুরী। উনি আরো উত্তেজিত হ'লেও আমার কিছুই করতে পারবেন না। এটা বিংশ শতাব্দী।

(বিষম হুঙ্কারে চারি দিক যেন ফেটে গেল। চতুর্দ্দিক্ থেকে ভৃত্য ও দারবানেরা কোলাহল তুলে ছুটে এল, তাদের ব্যস্ত পায়ের শব্দ)

চৌধুরী। (চীৎকার ক'রে) এই! তোরা সব এখান থেকে চ'লে যা! এ-সব কিছু না—যাদুকরের ভেল্‌কি।

(ভৃত্য ও দারবানদের গোলমাল ও পায়ের শব্দ থেমে গেল)

স্বামী। ওরা তো মনিবের ধমকে চুপ করলে, কিন্তু মহিষাসুরের হুঙ্কার বন্ধ করবে কে?

চৌধুরী। আপনি নিজে। ভেল্‌কির এতটা বাড়াবাড়ি আর ভালো লাগছে না, পাড়ার লোকে আমাদের পাগল মনে করবে। ঐ বীভৎস চীৎকার বন্ধ করুন।

স্বামী। এখন আর ও-চীৎকার থামাবার সাধ্য আমার নেই। ঐ পৈশাচিক শক্তি এখন আমার মনের কারাগার ছেড়ে বাইরের জগতে এসে পড়েছে! এখন আমিও ওকে ভয় করি।

চৌধুরী। তাহ'লে ঘরের দরজা খুলে আমিই দেখব, ভিতরে সত্যই কেউ আছে কি না!

স্বামী। (ব্যস্ত স্বরে) পাগল! কোথা যান?

প্রতিমা। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ওগো, তুমি ওখানে যেও না গো!

চৌধুরী। তুমি কি বুঝতে পারছ না প্রতিমা, পাড়ার লোক এখনি পুলিস ডাকবে?

প্রতিমা। কি হবে স্বামীজী?

স্বামী। মা, আমি শক্তিহীন। মহিষাসুর জাগ্রত হয়েছে, শত শত শতাব্দীর অপরিতৃপ্ত ক্ষুধার তাড়নায় সে এখন সিংহনাদ করছে, এর পরিণাম কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

(দরজায় ভীষণ খড়্গাঘাতের শব্দ)

দত্ত। শোনো চৌধুরী, শোনো!

সেন। ভিতর থেকে দরজার উপরে ঝন্-ঝন্ ক'রে কি বেজে উঠল?

স্বামী। মহিষাসুরের খড়্গ! দরজা ভেঙে ও বাইরে আসতে চায়! ঐ তুচ্ছ দরজা ওর খড়্গের আঘাত কতক্ষণ সহ্য করবে? মহিষাসুর এখনি বাইরে আসবেই।

দত্ত। দরজার পিছনে কি আছে জানি না, কিন্তু এখন আমাদের কি করা উচিত?

সেন। তীরবেগে পলায়ন।

স্বামী। পালিয়ে কোথায় যাবেন? আমাদের সকলের মন একসঙ্গে ঐ মূর্ত্তির জন্ম দিয়েছে, এখন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গেলেও ওর কবল থেকে আমরা কেউ রক্ষা পাব না। ও আমাদেরই পিছনে পিছনে ছুটে আসবে—আমাদের খুঁজে বার করবেই।

দত্ত। সর্ব্বনাশ!

সেন। অবিশ্বাসী চৌধুরীর একগুঁয়েমির জন্যেই আজ আমরা এই বিপদে পড়লুম! কি হে চৌধুরী, এখন আর তোমার সাড়া নেই কেন?

স্বামী। মিঃ চৌধুরী, মহিষাসুরকে মানুন আর না মানুন, কিন্তু ঐ ঘরের ভিতরে যে একটা অপার্থিব মারাত্মক শক্তির আবির্ভাব হয়েছে, এটা এখন মানতে রাজি আছেন কি?

চৌধুরী। (নীরব ও স্তম্ভিত)।

স্বামী। যা জানেন না, তাকে জানবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে আর কখনো উড়িয়ে দেবেন না।

দত্ত। ঐ যাঃ! দাঁড়ান, দরজার বাকিটা যে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ঘরের ভিতরকার আপদ যে এখনি বাইরে বেরিয়ে পড়বে।

সেন। দত্ত, পালিয়ে মাথা বাঁচাতে পারব কি না জানি না, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও আমি মরতে রাজি নই। (পলায়ন)

প্রতিমা। একটা উপায় করুন স্বামীজী।

দত্ত। দরজার আরো খানিকটা উড়ে গেল! স্বামীজী, আজ আমিও বিদায় নিলুম! (পলায়ন)

চৌধুরী (হতভম্ব স্বরে) এও কি সম্ভব? আমি কি জেগে আছি? না দুঃস্বপ্ন দেখছি?

(অসম্ভব হেঁড়ে-গলায় ঘরের ভিতর থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল—"ক্ষুধা—ক্ষুধা! মহা ক্ষুধায় আমার অন্তরাত্মা ছট্‌ফট্ করছে! আমি বিশ্বকে গ্রাস করব—আমি বিশ্বকে গ্রাস করব!" দ্বারে আবার অস্ত্রাঘাতের পর অস্ত্রাঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে সিংহনাদের পর সিংহনাদ! ভৃত্য ও দ্বারবানেরা আর মিঃ চৌধুরীরও আদেশ না মেনে চতুর্দ্দিকে আবার সভয় কোলাহল তুললে!)

স্বামী। (উচ্চ কণ্ঠে) জানি মহিষাসুর, তোমাকে আমরা জানি, কারণ মানুষের ধ্যানেই তোমার জন্ম! কিন্তু তোমাকে আমরা ভয় করি না!

(হেঁড়ে-গলা হা-হা রবে অট্টহাস্য ক'রে বললে—"স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে আমাকে ভয় করে না কে? ওরে, যে আমাকে কল্পনা করে, তাকেই আমার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে হবে!" আবার হুঙ্কার ও দ্বারে অস্ত্রাঘাত!)

চৌধুরী। প্রভু! স্বামীজী! রক্ষা করুন!

স্বামী। আমার পা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান মিঃ চৌধুরী! আজ বুঝলেন, অবিশ্বাসই সব বিপদের মূল?···এখন শুনুন! এখানে আসবার সময়ে দেখলুম, আপনাদের পাড়ায় একটি মন্দির আছে।

চৌধুরী। হ্যাঁ স্বামীজী, সিংহবাহিনীর মন্দির।

স্বামী। এখন সেখানে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনই উপায় নেই!

চৌধুরী। (সবিস্ময়ে) সিংহবাহিনীর মন্দিরে!

স্বামী। (অধীর স্বরে) হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেইখানে! আর কোন প্রশ্ন করবেন না! দেখুন, দত্ত আর সেন পালিয়ে গেছে, প্রতিমা দেবী প্রায় অচেতনের মত মাটিতে ব'সে প'ড়েছেন, ওদিকে দরজা ভেঙে পড়ল ব'লে! প্রতিমা দেবীকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়ে চলুন সিংহবাহিনীর মন্দিরে!

সিংহবাহিনীর মন্দির

(কিছুক্ষণের নীরবতা)

স্বামী। মিঃ চৌধুরী, এই সিংহবাহিনীর মন্দির। একেবারে দেবীর কাছে চলুন।

পুরোহিত। ও কি, কে আপনারা? ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

স্বামী। পুরুত-মশাই, আমরা দেবীর আশ্রয় নিতে এসেছি!

পুরোহিত। আ-হা-হা-হা, করেন কি—করেন কি? দেবীকে স্পর্শ করবেন না!

স্বামী। হ্যাঁ, আমরা দেবীকে স্পর্শই করব! মা প্রতিমা, তুমি এখন একটু সামলে নিয়েছ তো? আচ্ছা, তুমি দেবীর এক চরণ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকো! মিঃ চৌধুরী, আপনি ধরুন দেবীর আর এক চরণ!

পুরোহিত। কি আশ্চর্য্য, আপনারা পাগল হয়ে গেছেন না কি? এমন ব্যাপার তো কখনো দেখিনি!

স্বামী। পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা এখনো আপনার দেখা হয়নি! আমরা এখন এই ভাবেই থাকব, আপনার কোন বাধাই মানব না!

পুরোহিত। জানেন, এটা ইংরেজ রাজত্ব? খবর দিলে এখনি পুলিস এসে পড়বে?

স্বামী। পুরুত-মশাই, খবর দিলে হিন্দু আর মোগল রাজত্বেও পুলিস এসে পড়ত! কিন্তু মুস্কিল কি জানেন? পুলিস আসবার আগেই এখানে মহিষাসুর এসে পড়বে।

পুরোহিত। (চকিত স্বরে) কি বললেন? কে এসে পড়বে?

স্বামী। মহিষাসুর। সিংহবাহিনী এক দিন যাকে বধ করেছিলেন। আপনি কি এ-কথা জানেন না?

পুরোহিত। (হতভম্ব ভাবে) জানি। কিন্তু—কিন্তু—

স্বামী। কিন্তু সেই মহিষাসুরকেই আবার আমরা জ্যান্তো ক'রে তুলেছি। ও কি, অমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে আছেন যে? জানেন পুরুত-মশাই, মানুষের মনের মধ্যে চিরদিনই চলছে দেবাসুরের যুদ্ধ। মানুষ কখনো দেবতাকে জয়ী করে, কখনো করে অসুরকে। দেবতা আর দানব হচ্ছে মানুষেরই মনের ধ্যানের সৃষ্টি। কিন্তু আজ আমরা ভুল ক'রে সৃষ্টি করছি দানবকে। বুঝেছেন?

পুরোহিত। বুঝেছি। আপনারা হয় বদ্ধ-পাগল, নয় বদ্ধ মাতাল। চললুম আমি পুলিস ডাকতে।

স্বামী। কিন্তু বলেছি তো, পুলিসের আগেই চিরদিনই দানব এসে পড়ে? দানব না এলে পুলিসের দরকার হয় না। ঐ শুনুন, রাজপথে কোলাহল! মহিষাসুর আসছে!

(আচম্বিতে রাজপথ থেকে বিপুল জনতার কোলাহল, দ্রুত-চালিত ও যেন ভীত মোটর-গাড়ীর এবং ঘন ঘন 'হর্ণে'র শব্দ ভেসে এল এবং নানা কণ্ঠে শোনা গেল—"ভূত—ভূত!"—"দৈত্য! রাক্ষস!"—"পালা, পালা!" "ঐ এসে পড়ল!"—"ওরে এই দিকে! এই দিকে!"—"ওরে বাপ রে, ম'রে গেলুম রে!" প্রভৃতি চীৎকার ও আর্ত্তনাদ!)

পুরোহিত। (সভয়ে) অত গোলমাল কেন? পথে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধল না কি?

স্বামী। মহিষাসুর আসছে!

পুরোহিত। থামুন মশাই, এখন আপনার পাগলামি ভালো লাগছে না!

(হঠাৎ আর সমস্ত গোলমালের উপরে জেগে উঠল বিকট ও রোমহর্ষণকর এক কণ্ঠস্বর—"কে রে, কে রে, আমার এত কালের ঘুম ভাঙালে কে রে! ক্ষুধা! ক্ষুধা! বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা!")

পুরোহিত। (আর্ত্ত স্বরে) হা ভগবান! ও কে, ও কে?

স্বামী। দেখুন মিঃ চৌধুরী! ঐ আপনার মহিষাসুর! জাগ্রত! জীবন্ত! মূর্ত্তিমান! স্বচক্ষে ওকে দেখে চিনতে পারছেন কি?

প্রতিমা। (কাতর ও আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে) স্বামীজী! স্বামীজী!

স্বামী। কোন ভয় নেই মা! দেখুন মিঃ চৌধুরী, মানুষের কল্পনা মূর্ত্তি ধরে কি না? পথের বৈদ্যুতিক আলোকে দেখুন ওর বুভুক্ষু অগ্নিপূর্ণ চক্ষু, আসুরিক শক্তিতে প্রচণ্ড সুদীর্ঘ

কৃষ্ণবর্ণ দেহ, রক্তবস্ত্রধারী বিভীষণ ভৈরব মূর্ত্তি, শোণিতাক্ত প্রকাণ্ড অনস্ত তরবারি,—ওর পদাঘাতে পৃথিবীর বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে !

(মহিষাসুর যেন মত্ত হস্তীর মত পদশব্দ তুলে এগিয়ে আসতে লাগল)

প্রতিমা। স্বামীজী ! স্বামীজী ! ও যে এদিকেই আসছে !

স্বামী। তাই তো আসবে মা, ওকে প্রসব করেছে যে আমাদেরই মন ! কিন্তু নির্ভয় হও ! সিংহবাহিনী আর মহিষাসুর দুই-ই যে আমাদের চিন্তার, আমাদের ধ্যানের সৃষ্টি ! আমাদের ধ্যান যখন সিংহবাহিনীকেই জয়ী করেছে, তখন এই দেবীমূর্ত্তির সামনে আজ আবার ওর কী অবস্থা হয় দেখ !

(ধুপ-ধুপ ভারি পদশব্দের সঙ্গে শোনা গেল—"পেয়েছি—পেয়েছি ! হা রে রে রে রে রে !" পর-মুহূর্ত্তেই সেই হুঙ্কার পরিণত হ'ল কান-ফাটানো বীভৎস এক আর্ত্তনাদে ! সেই পৈশাচিক অথচ আর্ত্ত কণ্ঠ চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—"অ্যাঁ—অ্যাঁ, সিংহবাহিনী—সিংহবাহিনী ! ও হো-হো-হো ! চোখ যে ঝলসে গেল !" আর্ত্তনাদের পর আর্ত্তনাদ ! ক্রমে ক্রমে আর্ত্তনাদ ক্ষীণ—আরো ক্ষীণ হয়ে এল !)

স্বামী। (উৎফুল্ল কণ্ঠে) জয়, মানুষের ধ্যানের জয় ! দেখ—দেখ, মহিষাসুরের বিপুল মূর্ত্তি ধীরে ধীরে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে ! এরি মধ্যে মূর্ত্তি কতটা অস্পষ্ট হয়ে গেল দেখ !

প্রতিমা। (আনন্দিত স্বরে) স্বামীজী, যেখানে মহিষাসুর ছিল এখন সেখানে রয়েছে খালি খানিকটা কালো ধোঁয়া ! কিন্তু সেই ধোঁয়ার ভিতরে এখনো ওর দুই চোখের আগুন ধক্-ধক্ করছে !

স্বামী। সে-আগুনও নিবে গেল, কালো ধোঁয়াও অদৃশ্য ! মিঃ চৌধুরী, এখন আপনার মত কি বলুন ?

চৌধুরী। স্বীকার করছি, আমি বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু আপনি কি সিংহবাহিনী আর মহিষাসুরের যুদ্ধ-কাহিনীকে সত্য-সত্যই ইতিহাস ব'লে মনে করেন ?

স্বামী। আমি ঐতিহাসিক নই, আমার কাছে রূপকথারও মূল্য কম নয়। আমার মত হচ্ছে, মানুষ ধ্যানদৃষ্টিতে এক দিন যা দেখেছে তার মধ্যে থাকে চিরন্তন সত্য। আমরা যে দেহকে, যে পৃথিবীকে বাস্তব ব'লে জানি, দার্শনিকের কাছে তা-ও মায়া বা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল কথা কি জানেন মিঃ চৌধুরী, মানুষের চিন্তা হচ্ছে একটা মৃত্যুহীন বস্তু।

চৌধুরী। (কৌতুক-হাস্য ক'রে) প্রথমটা আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।

স্বামী। কি বুঝেছেন ?

চৌধুরী। আপনি mass-hypnotism জানেন, যার প্রভাবে হাজার হাজার লোকও অলীক বস্তুকে সত্যের মত চোখের সামনে স্পষ্ট দেখে। বিলাতী যাদুকরেরা এই mass-hypnotismএর ভেলকিতে সভাশুদ্ধ লোকের তাগ লাগিয়ে দেয়। ওরই গুণে যে Indian rope-trick বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে, এ-কথা আজ সকলেই জানে।

স্বামী। মিঃ চৌধুরী, আপনার পরম আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন যোগবলকে অস্বীকার করবার একটা ওজর খুঁজে পেয়েছে দেখে আমি খুসি হয়েছি। কিন্তু এখনো কি আপনি 'হিপনোটাইজড্' হয়ে আছেন ?

চৌধুরী। (দৃঢ় স্বরে) নিশ্চয়ই নয় !

স্বামী। তাহ'লে দু পা এগিয়ে গিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন দেখি।

চৌধুরী। (এগিয়ে গিয়ে, সবিস্ময়ে) এ কি ! এখানে এত রক্ত কেন ?

স্বামী। মহিষাসুরের খাঁড়ার রক্ত !

মহামুনি-শ্রীভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬

মূলঃ—উহ-প্রত্যূহ-সংযুক্ত, নানা শিল্প-প্রযুক্ত। ৮১।

সঙ্কেত :—দারুকর্ম্ম কিরূপ হওয়া উচিত; তাহারই বিস্তৃত বিবরণ ৮১ হইতে ৮৫ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

উহ-প্রত্যূহ-সংযুক্ত ইত্যাদি পদগুলি 'দারুকর্ম্মে'র বিশেষণ। উহ —অভিনবগুপ্ত 'ষড়্দারুক'-পদের ব্যাখ্যাকালেই উহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। স্তম্ভের শিরোদেশ হইতে দূরে নির্গত কাষ্ঠখণ্ডের নাম উহ। স্তম্ভের মাথায় কড়ির একটা প্রান্ত বা মধ্যভাগ বসাইলে —সেই কড়িকাঠকে 'উহ' বলা চলে। প্রত্যূহ—ঐ উহ হইতে নির্গত ছোট ছোট কাষ্ঠ খণ্ড (বা 'তুলা')—ঐগুলি শূন্যে বাহির হইয়া থাকে—অনেকটা কড়িকাঠের উপর স্থাপিত বরগার ন্যায়। উহপ্রত্যূহ (অর্থাৎ কাঠের কড়ি-বরগা) দিয়া প্রথমে দারুকর্ম্মের একটা ফ্রেম তৈয়ারী করিতে হইবে—ইহাই বোধ হয় এস্থলে মুখ্য বক্তব্য।

মূল :—নানা-সঞ্জবন-বিশিষ্ট, বহু ব্যালোপশোভিত ; আর বিবিধ শালভঞ্জিকা ইহাতে নিবদ্ধ থাকা উচিত। ৮২।

সঙ্কেত :—সঞ্জবন—চতুষ্কোণ—quadrangle ; ইহার অন্য অর্থও সম্ভব—চারিধারে চারিটি বাড়ী—মাঝে একটি সাধারণ প্রাঙ্গণ। সে অর্থ এ স্থলে প্রযোজ্য নহে, যদিও অমরকোষে সঞ্জবন অর্থে চতুঃশাল বলা হইয়াছে। এ স্থলে সঞ্জবন অর্থে চতুষ্কোণ অর্থই মাত্র সম্ভব। ব্যাল—সর্প, শ্বাপদ ইত্যাদি। দারুকর্ম্মে সর্প ও হিংস্র পশু প্রভৃতির চিত্র থাকিবে—ইহাই বুঝাইতেছে। শালভঞ্জিকা—সালভঞ্জিকা—দুই প্রকার বানানই সম্ভব। ইহার অর্থ—কাষ্ঠময়ী কান্তাপ্রকৃতি (নারীমূর্ত্তি)। এই সকল আকৃতি-দ্বারা দারু-কর্ম্ম শোভিত থাকিবে।

মূল :—নির্ব্যূহ-কুহর-যুক্ত, নানা (আকৃতিতে) গ্রথিত বেদিকা-বিশিষ্ট—। ৮৩।

সঙ্কেত :—নির্ব্যূহ—শব্দটি পাওয়া যায় না—পাওয়া যায়—'নির্য্যূহ'। নির্য্যূহ—(১) গৃহের উপরিস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বা শেখর (pinnacle, turret) ; (২) দ্বার, ও (৩) নাগদন্তক অর্থাৎ—ভিত্তিগাত্রে বসান কীলক (বা পেরেক)—দেওয়ালের গায়ে পেরেক বা ব্র্যাকেট, (৪) পারাবতগণের আশ্রয় স্থান—এ অর্থ এ স্থলে গ্রাহ্য নহে—কারণ উহা পরে বলা হইবে। কুহর—ছিদ্র। দারুকর্ম্মে পেরেক লাগাইবার নিমিত্ত ছিদ্র থাকিবে—ইহাই সম্ভবতঃ অর্থ। নানা আকৃতির বেদী ইহার সঙ্গে গাঁথা থাকিবে—ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য্য।

মূল :—নানা বিন্যাস-সংযুক্ত, যন্ত্র-জাল-গবাক্ষ-বিশিষ্ট, সুপীঠ-ধারণা-যুক্ত, কপোতালী-সমাকুল। ৮৪।

সঙ্কেত :—বিন্যাস—সমাবেশ, arrangement, যন্ত্রজাল—যন্ত্রচিত্রাণি জালানি" (অ: ভা: পৃ: ৬৪) ইহার অর্থ যন্ত্রচিত্রাকৃতি জাল অর্থাৎ জানালা; কিংবা এরূপ অর্থও হইতে পারে—বিচিত্র-যন্ত্রযুক্ত জাল; পাঠান্তর—চিত্রজাল; জাল—চৌকা বা আটকোণা ছিদ্র—জানালার স্থানীয়। গবাক্ষ—গোল ছিদ্র। সুপীঠ-ধারণাযুক্ত সুন্দর পীঠ-স্তম্ভোপরি নিবিষ্ট, তাহার উপর ধারণী (অর্থাৎ তুলা—বরগার ন্যায়)—ইহাই অভিনবের মত। থামের উপর পীঠ, তাহার উপর বরগা স্থাপিত—ইহাই অর্থ। কপোতালী—বিটঙ্কপালী—পারাবতগণের আশ্রয় স্থান।

মূল :—নানা কুট্টিমে বিন্যস্ত স্তম্ভসমূহ-দ্বারা উপশোভিত—(দারুকর্ম্ম প্রযোজিত করিতে হইবে)।

এইরূপে কাষ্ঠবিধি করিয়া ভিত্তি-কর্ম্ম-প্রয়োগ করিতে হইবে।৮৫।

সঙ্কেত :—৮১ শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে ৮৫ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত অংশে যে সকল বিশেষণ আছে সেগুলি ৮১ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে প্রযুক্ত 'দারুকর্ম্ম' ("দারুকর্ম্ম প্রযোজয়েৎ"—দারুকর্ম্মের প্রয়োগ করিতে হইবে) পদের বিশেষণ।

কুট্টিম—বাঁধান মেঝে। নানা কুট্টিম—রঙ্গশিরঃ, রঙ্গপীঠ, মত্তবারণীদ্বয়—এই চারিটি স্থানে চারিটি মেঝে ত আছেই। স্তম্ভসমূহ—সর্ব্বত্র শ্বেত-রক্ত-পীত-নীল ভেদে চারি বর্ণের স্তম্ভসমূহ স্থাপনীয়।

কাষ্ঠবিধি—দারুকর্ম্ম—কাঠের কাজ। এই কাষ্ঠবিধিই রঙ্গপীঠের পশ্চাতে থাকিত। উহা নানারূপ শিল্প-কলার নিদর্শন, নানাবিধ নর-নারী-মূর্ত্তি, পশুপক্ষীর আকৃতি, গবাক্ষ, বেদী প্রভৃতি সংযুক্ত থাকিত। উহাই একাধারে অঙ্কিত দৃশ্যপট (flat scene) ও স্থাপি দৃশ্যাদির (set scene) কার্য্য করিত।

মূল :—স্তম্ভ অথবা নাগদন্ত অথবা বাতায়ন, কোণ অথবা প্রতিদ্বার—দ্বারবিদ্ধ করিবে না। ৮৬।

সঙ্কেত :—নাগদন্ত—স্তম্ভের উর্দ্ধে ও নীচে ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন শঙ্কু (পেরেক—peg); কেহ কেহ বলেন—শালভঞ্জিকা বা পুত্তলিকা ধারণের নিমিত্ত গজমুখ (অর্থাৎ গজমুখাকৃতি ব্র্যাকেট)। কোণ—ভিত্তি-কোণ, পাঠান্তর—কার্ণিস। প্রতিদ্বার—অবান্তর দ্বার—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—উত্তরে ও দক্ষিণে—এই দুইটি প্রধান দ্বার। প্রতিদ্বার—প্রধান দ্বার ব্যতিরিক্ত ছোট ছোট দ্বার। দ্বার-বিদ্ধ—পরস্পর সম্মুখীভূত মধ্য অর্থাৎ ঋজু ঋজু। ছোট ছোট দোর, জানালা, স্তম্ভ, পেরেক, কোনটাই ঋজু-ঋজু করা উচিত নয়। গৃহের দোর-জানালা ঋজু ঋজু হইলে হাওয়া খেলে ভাল; ফলে গৃহমধ্যে উচ্চারিত স্বর বায়ুবেগে ঋজু-ঋজু দ্বার-বাতায়ন-পথে বাহিরে নির্গত হইয়া যায়। ঋজু ঋজু না হইলে স্বর গৃহমধ্যে অনুরণিত হইতে পারে—বহির্নির্গম পথ না পাইয়া স্বর অনেকক্ষণ গৃহমধ্যে খেলিয়া বেড়াইতে পারে; স্তম্ভ বা পেরেক (ব্র্যাকেট) গুলি ঋজু-ঋজু না করার উদ্দেশ্য—বৈচিত্র্য-সম্পাদন।

মূল :—নাট্যমণ্ডপ শৈলগুহাকৃতি ও দ্বিভূমি, অল্প-বাতায়ন-যুক্ত, নির্বাত আর ধীর-শব্দযুক্ত করিতে হইবে। ৮৭।

সঙ্কেত :—দ্বিভূমি—দোতলা—ইহার অর্থ লইয়া নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে।—(১) রঙ্গপীঠের নীচে একটি মেঝে—একতলা, আর পীঠের উপরের মেঝে আর একতলা—এই দুই তলা। (২) রঙ্গপীঠের মেঝে—একতলা-আর উহা হইতে বাহিরে যাইবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত মত্তবারণীর মেঝে আর একতলা—মোট দোতলা—দেবমন্দির অট্টালিকাতেও এরূপ দোতলা দেখা যায় (ইঁহাদের মতে—রঙ্গপীঠ ও মত্তবারণীর উচ্চতা ভিন্ন)। (৩) রঙ্গমণ্ডপোপরি আর একটি মণ্ডপ নিবেশনীয়—তাহা হইলে দুইটি মণ্ডপের দুই তলা। (৪) কেহ কেহ অকার-প্রশ্লেষ করিয়া অদ্বিভূমি' পাঠ করিয়া থাকেন। পাঠ আছে—"কার্য্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমি-নাট্যমণ্ডপঃ"—'গুহাকারো দ্বিভূমিঃ'—ইহাতেও যেরূপ সন্ধি হইবে,—'গুহাকারোঽদ্বিভূমি': (অকার প্রশ্লেষ করিয়াও) সেইরূপ সন্ধি হইবে। (৫) কিন্তু অভিনব বলেন—ইহার অর্থ অন্যরূপ। এস্থলে 'নাট্যমণ্ডপ' পাঠ আছে। 'নাট্যমণ্ডপ' বলিতে সমগ্র রঙ্গগৃহকেই বুঝায়—রঙ্গপীঠ-মাত্রকে নহে। এখানে নাট্যমণ্ডপ বলিতে বুঝাইতেছে—প্রেক্ষকবৃন্দের উপবেশন-স্থানটুকু মাত্র (auditorium);—উহা হইবে শৈলগুহাকার—তাহা হইলে শব্দ-সঞ্চার ও শব্দের অনুরণন, প্রতিধ্বনি উহার মধ্যে খুব উত্তমরূপে হইতে পারিবে। এই প্রেক্ষকাসনাংশ (auditorium) হইবে দ্বিভূমি। সাধারণতঃ, 'দ্বিভূমি' শব্দটি শুনিলেই মনে হয় auditorium বুঝি দোতলা হইবে; কিন্তু অভিনব ইহার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—উপাধ্যায়গণ—বীপ্সাগর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—দুই দুইটি অর্থাৎ ক্রম-নিম্নোন্নত মেঝে (ভূমি) যথায়, তাহাই 'দ্বিভূমি'। রঙ্গপীঠের নিকটস্থ মণ্ডপের মেঝে হইবে খুব নিম্ন (রঙ্গপীঠ উহা হইতে দেড় হাত উচ্চ—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্লোক ৭০-৭১)। রঙ্গপীঠের নিকট হইতে যত দূরে যাওয়া যাইবে ততই নাট্যমণ্ডপের মেঝে ক্রমোন্নত হইতে থাকিবে—রঙ্গপীঠের ঠিক বিপরীত-দিকে যে দ্বার থাকিবে, তাহার নিকটে মেঝে হইবে রঙ্গপীঠের সমান উচ্চ—অর্থাৎ রঙ্গপীঠের নিকট হইতে বিপরীত দিকে প্রেক্ষাগৃহের দ্বার পর্য্যন্ত প্রেক্ষাগৃহের মেঝে গ্যালারির মেঝের মত ক্রম-নিম্নোন্নত হইবে—ইহার সর্ব্বনিম্নাংশ (পীঠপ্রান্ত) হইতে সর্ব্বোচ্চ অংশের (দ্বারপ্রান্তের) উচ্চতা হইবে পীঠের উচ্চতার তুল্য (অর্থাৎ দেড় হাত)—এক কথায় প্রেক্ষাগৃহের মেঝের দেড় হাত incline হইবে। অভিনব বলিয়াছেন—এইরূপ হইলে সামাজিকগণের (অর্থাৎ দর্শকগণের) পরস্পর আচ্ছাদন হইতে পারিবে না (অর্থাৎ পিছনের দর্শকগণের দৃষ্টি সম্মুখের দর্শকগণের দেহে আর আড়াল পড়িবে না)।—"দ্বে দ্বে ভূমী যত্র নিম্নোন্নতে. ততোঽপ্যুন্নতা। ইতি নিম্নোন্নতক্রমেণ রঙ্গপীঠনিকটাৎ প্রভৃতি দ্বারপর্য্যন্তং যাবদ্রঙ্গপীঠোৎসেধতুল্যোৎসেধা ভবতি। এবং হি পরস্পরানাচ্ছাদনং সামাজিকানাম্"—অ: ভা:, পৃ: ৬৫। মন্দবাতায়নোপেত—'মন্দ' অর্থে অল্প বা ক্ষুদ্র। অধিক ও বৃহৎ বাতায়ন প্রেক্ষাগৃহে থাকিলে বায়ুপ্রবাহে স্বর উড়াইয়া লইয়া যায়—গৃহমধ্যে স্বর খেলিতে পায় না। নির্বাত—বায়ুশূন্য—অধিক বায়ুসঞ্চার হইলে উত্তমরূপে শব্দ বা স্বর শ্রবণের বাধা জন্মে। ধীরশব্দবান্—ধীর অর্থে স্থির—অভিনব করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলে উহাতে শব্দ স্থিরতা লাভ করে। এই বিবরণ পাঠে বেশ বুঝা যায়—মহর্ষির শব্দসঞ্চার-বিজ্ঞান (acoustics) কতদূর আয়ত্ত ছিল।

মূল :—অতএব কর্ম্মিগণ-কর্ত্তৃক নাট্যমণ্ডপ নিবাত কর্ত্তব্য—

[পক্ষান্তরে মণ্ডপ যদি বিপ্রকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উচ্চরিত-স্বর পাঠ্য অনতিব্যক্ত-ধর্ম্মহেতু অত্যন্ত বিস্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।]

যাহাতে কুতপের গম্ভীর-স্বরতা হইবে। ৮৮—৮৯।

সঙ্কেত :—[......] ব্র্যাকেটের মধ্যবর্ত্তী অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়,—এই কারণে বরোদা-সংস্করণে উহা ব্রাকেট-মধ্যে ছাপা হইয়াছে; আর কাশী-সংস্করণে উহা মোটেই দৃষ্ট হয় না, বরোদা-সংস্করণে ১১ শ্লোকের সহিত এই শ্লোকটির সাম্য রহিয়াছে। আর এক কথা—"তস্মান্নিবাত: কর্ত্তব্য: কর্ত্তৃভির্নাট্যমণ্ডপ:" (অতএব কর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক নাট্যমণ্ডপ নির্বাত কর্ত্তব্য) এই অংশের সহিত—"গম্ভীর-স্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি" (যাহাতে কুতপের গম্ভীর-স্বরতা হইবে) এই অংশের অন্বয় সম্ভব। মধ্যে বন্ধনীস্থ অংশের সন্নিবেশে অন্বয় ও অর্থসঙ্গতি কিছুই হয় না।

নিবাত—নির্ব্বাত—বায়ুশূন্য; বায়ু-চলাচল অধিক হইলে স্বর-গাম্ভীর্য্য হইতে পারে না—স্বর উড়িয়া যায়। কুতপ—গায়ন-বাদনসমূহ—অর্কেষ্ট্রা। গম্ভীরস্বরতা—অর্কেষ্ট্রার ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য। পাঠান্তর—গাম্ভীর্য্যং সুস্বরত্বং চ; সগাম্ভীর্য্যাদবৈস্বর্য্যং। গাম্ভীর্য্যং সুস্বরত্বঞ্চ কুতপস্য ভবেদিতি—কাশী-সংস্করণের পাঠ।

মধ্যস্থ প্রক্ষিপ্ত অংশের অর্থ—২২ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য (মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৫১)। সে শ্লোকে পাঠ ধরা হইয়াছে অনি:সরণধর্ম্মত্বাৎ অর্থাৎ—অনুরণনাত্মক মধুর শব্দান্তরের অভাবহেতু পাঠ্য বিস্বর হয়; আর এখানে পাঠ—অনভিব্যক্তবর্ণত্বাৎ—পাঠ্যের বর্ণগুলি অভিব্যক্ত না হওয়ায় অর্থাৎ—পাঠ্যের বর্ণগুলি অস্পষ্ট শ্রুত হওয়ায় পাঠ্য বিস্বর হইয়া উঠে।

মূল :—ভিত্তি-কর্ম্ম-বিধি করিয়া ভিত্তিলেপ প্রদান করাইতে হইবে। তাহার বাহিরে সুধাকর্ম্ম প্রযত্ন-সহকারে বিধেয়। ৯০।

সঙ্কেত :—ভিত্তিলেপ—শঙ্খ-বালুকা-শুক্তিকাচূর্ণ-মিশ্র প্রলেপ—অর্থাৎ চূণ ও বালির লেপ—বালিকাম। সুধাকর্ম্ম তথৈবাস্য কুর্য্যাদ্বাহ্যং প্রযত্নত:—কাশীর পাঠ; সুধাকর্ম্ম বহিস্তস্য বিধাতব্যং প্রযত্নত: (বরোদা)।

মূল :—অনন্তর ভিত্তিসমূহ সর্ব্বদিকে বিলিপ্ত ও পরিমৃষ্ট, সমীকৃত ও শোভাযুক্ত হইলে চিত্রকর্ম্মের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ১১।

সঙ্কেত :—ভিত্তি-দেওয়াল। বিলিপ্ত—যাহাতে ভিত্তিলেপ ও সুধাকর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। পরিমৃষ্ট—উত্তমরূপে মার্জ্জিত—চূণকাম করিবার পরও তাহাতে পালিস দিয়া চকচক করা হইলে পর—এই পরিমার্জ্জন হয়ত অনেকটা পঙ্কের কাজ করার অনুরূপ ছিল। এ যুগের ডিসটেম্পার করার সঙ্গেও তুলনা করা চলে। সমা—যাহাতে ভিত্তিলেপাদি উঁচু নীচু (এবড়ো খেবড়ো ভাবে না থাকে)। জাতশোভা—ভিত্তিলেপ, সুধাকর্ম্ম, সমীকরণ, পরিমার্জ্জন—ইত্যাদির পর ভিত্তির শোভা স্বভাবত:ই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাহার পর সেই পালিশ-করা দেওয়ালে ছবি আঁকিবার বিধি। চিত্রকর্ম্ম—ইহাই সে যুগের বিখ্যাত 'ফ্রেস্‌কো' যাহা আজিও শিল্পিগণের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

মূল :—আর চিত্রকর্ম্মে পুরুষগণ ও স্ত্রীগণ চতুর্দ্দিকে অঙ্কনীয়; লতাবন্ধ সমূহ কর্ত্তব্য; ও আত্মভোগজ চরিত (অঙ্কনীয়)। ১২।

সঙ্কেত :—কিরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। (১) পুরুষ ও স্ত্রীগণের চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। লতাবন্ধ—অভিনব বলিয়াছেন, 'দ্রমিড়াভিনয়সন্নিবেশ'—লতাবন্ধের অর্থ। দ্রমিড়াভিনয় কিরূপ পদার্থ বুঝা গেল না। দ্রমিড়—দ্রাবিড় বুঝাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট অভিনয়-পদ্ধতির চিত্র অঙ্কনীয়, এরূপ অর্থ করণীয় কি না সুধীগণের বিচার্য্য। অভিনব স্বয়ং এ বিষয়ে নি:সন্দেহ ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয়; এ কারণে তিনি অন্য অর্থেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—মালতী প্রভৃতি লতার চিত্র; অথবা বাহু-বেষ্টনীর বৈচিত্র্য-প্রকার; অথবা চতুর্থ অধ্যায়ে যে সকল নৃত্যাশ্রিত পিণ্ডীবন্ধের (dance-figure) কথা বলা হইবে সেই সকল পিণ্ডীবন্ধও 'লতাবন্ধ' শব্দের অর্থ হইতে পারে। তাহা হইলে লতাবন্ধ বলিতে বুঝাইতেছে—(১) দ্রমিড়-অভিনয়-সন্নিবেশ, (২) মালতী প্রভৃতি লতার বিচিত্র সন্নিবেশ, (৩) বাহুযুগলগুলির বিচিত্র বন্ধন-সন্নিবেশ, (৪) নৃত্যকালীন বিবিধ অঙ্গভঙ্গীর সমাবেশ।

চরিতং চাত্মভোগজম্ (মূল)—'চরিত' শব্দের অর্থ আচরিত—আচরণ। আত্মভোগজ—নিজ-ভোগ-জনিত। নিজ—ভোগার্থ যে সকল আচরণ করা হয়, তাহাদের চিত্রও ভিত্তিগাত্রে নিবেশনীয়।

মূল :—নাট্যগৃহ প্রয়োক্তৃবর্গ-কর্ত্তৃক এইভাবে বিকৃষ্ট কর্ত্তব্য। পুনরায় চতুরস্রের লক্ষণ বলিব। ১৩।

সঙ্কেত :—বিকৃষ্ট নাট্যগৃহের সবিস্তর বিবরণ এই খানেই শেষ হইল। চতুরস্র বলিতে সমচতুরস্র (square) বুঝাইতেছে বিকৃষ্টের লক্ষণ হইতেই যদিও সমচতুরস্রের স্বরূপ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তথাপি স্পষ্টভাবে উহার বিবরণ মহর্ষি দিতেছেন পুনরায়—বিকৃষ্টের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহা চতুরস্রেও লাগা যাইতে পারে—এই কারণে বিকৃষ্ট-লক্ষণ স্বয়ং সম্পূর্ণ, আর চতুরস্র লক্ষণ তাহার উপর নির্ভর করিলেও স্পষ্টার্থ উহার পুনরুক্তি করা যাইতেছে—'পুনরায়' শব্দের উহাই তাৎপর্য্য। পুনরেব অত:—পা—কাশীর পাঠ।

মূল :—আর পক্ষান্তরে শুভভূমি-বিভাগস্থ নাট্যমণ্ডপ নাট্যজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক দ্বাত্রিংশৎ হস্তই চারিদিকে কর্ত্তব্য। ১৪।

সঙ্কেত :—সমন্তত: (মূল) চারিদিকে—প্রত্যেক দিকেরই পরিমাণ বত্রিশ হাত—ইহা কনিষ্ঠ পরিমাণের চতুরস্র নাট্যগৃহ। শুভভূমিবিভাগেচ্ছু—শুভভূমির বিবরণ এই অধ্যায়েরই ৩০—৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য (মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫২)। বিভাগ—বিকৃষ্টের বিভাগ ৩১—৪১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। চতুরস্রের বিভাগ এই প্রসঙ্গে টীকাকার স্পষ্ট ভাবায় বলিবেন।

মূল :—বিকৃষ্টে যে বিধি, লক্ষণ ও মঙ্গল-সমূহ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অশেষরূপে সেগুলি (সবই) চতুরস্রেও করিতে হইবে। ১৫।

মূল :—চতুরস্রকে সম করিয়া ও সূত্র-দ্বারা প্রবিভক্ত করিয়া সর্ব্বদিকে বাহিরে ইষ্টকাশ্লিষ্ট দৃঢ় ভিত্তি করণীয়। ১৬।

সঙ্কেত :—বহির্ভাগে যদি ভিত্তি রহিল তাহা হইলে অন্তরে কি থাকিতে পারে তাহার উত্তর পরবর্ত্তী শ্লোকে দিতেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কুক, বার্ত্তিককার প্রভৃতির মত অভিনব উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমরা সে সকল মতের বিবরণ প্রদান করিব।

[ক্রমশ:
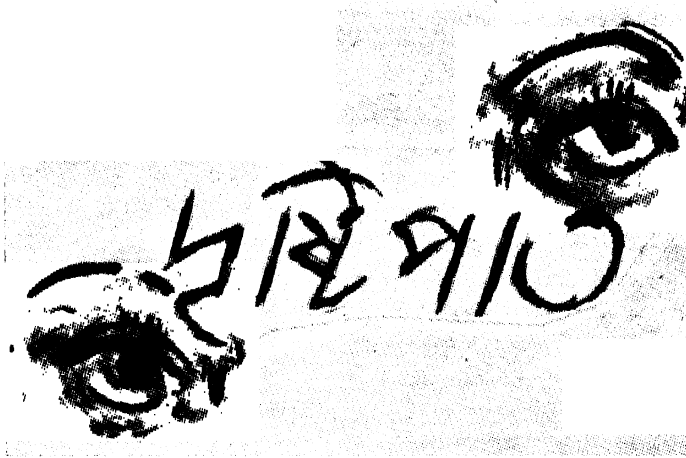
যাযাবর

এই রচনাটির একটু ভূমিকা আবশ্যক।

১৯৩৭ সালে একটি বাঙ্গালী যুবক লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যায়। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরে গাওয়ার ষ্ট্রীটের ভারতীয় আবাসটি জার্ম্মেন বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাঁহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পাঠান। লণ্ডনে অবস্থান কালে ঐ পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত।

দিল্লীতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে কতকগুলি পত্র লেখে। বর্ত্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সঙ্কলিত। পত্রলেখক ও পত্রাধিকারিণীর একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত পত্রগুলির আর কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, যদিও পত্রে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নাম-ধামের পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়াছে।

এই স্বল্প-পরিসর পত্র-রচনার মধ্যে লেখকের যে সাহিত্যিক প্রতিভার আভাস আছে হয়তো উত্তরকালে বিস্তৃততর সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে একদা তাহা যথার্থ পরিণতি লাভ করিতে পারিত। গভীর পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল পূর্ব্বে আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার অকাল-মৃত্যু সেই সম্ভাবনার উপরে নিশ্চিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

—সম্পাদক।

এক

পাঁচ ঘণ্টা আকাশ-চারণের পরে উইলিংডন এয়ারপোর্টে ভূমি স্পর্শ করা গেল। বিমানঘাঁটিটি আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু গুরুত্বে প্রধান। পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে, যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিণ ও চৈনিক সমর-বিশারদের এটা আগমন ও নিষ্ক্রমণের পাদপীঠ। প্রাত্যহিক পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে এর বহুল উল্লেখ।

আমাদের বাহনটি ডগ্‌লাস্ ডাবল এঞ্জিন জাতীয়। খেচর কুলপঞ্জীতে ফ্লাইং ফোর্ট্রেস ও লিবারেটার প্লেনের পরেই স্থান। নিকষ না হলেও ভঙ্গ-কুলীন বলা যেতে পারে। এর আকার বিশাল, গর্জ্জন বিপুল ও গতি বিদ্যুৎপ্রায়। পুরাণে পুষ্পক রথের কথা আছে। তাতে চেপে স্বর্গে যাওয়া যেত! আধুনিক বিমান-রথের গন্তব্যস্থল মর্ত্ত্যলোক। কিন্তু সারথি নিপুণ না হলে যে-কোন মূহূর্ত্তে রথীদের স্বর্গপ্রাপ্তি বিচিত্র নয়।

বিমানঘাঁটির কর্ম্মকর্ত্তা বাঙ্গালী। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ এবং ব্যবহারে অমায়িক। এঁর স্ত্রী মণিকা মিত্রের সৌন্দর্য্য-খ্যাতি নয়াদিল্লীর অনেক বঙ্গ-ললনার মর্ম্মবেদনার কারণ।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে নামতে হয়। বিস্ময়কর এক অনুভূতি। এই তো সকাল বেলায় ছিলেম কলকাতায়। দমদমের পথে গ্যাসের আলোগুলি সব তখনও নেভেনি। ফুটপাথে খাটিয়ার উপরে আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানী দোকানদারেরা নিদ্রামগ্ন। কর্পোরেশনের উড়ে কুলীরা জলের পাইপ থেকে গঙ্গোদকের দ্বারা রাজধানীর বহুজনমর্দ্দিত পথগুলির ক্লেদমুক্তির আয়োজনে ধাবমান। সাইকেলের হাণ্ডেলে স্তূপীকৃত খবরের কাগজ চাপিয়ে হকারেরা যাচ্ছে এ-দুয়ার থেকে ও-দুয়ার। সদ্যগত রজনীর সুষুপ্তির রেশ ধরণীর বুক থেকে তখনও নিঃশেষে মুছে যায়নি। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডিত চাঁদ দূরবর্ত্তী তরুশ্রেণীর শীর্ষে রুগ্না রমণীর নিষ্প্রভ মুখের মতো দ্যুতিহীন। মিটি মিটি করে জ্বলছে গুটিকয়েক লুপ্তপ্রায় তারা। পথের পাশে গাছের ডালে ডালে পাখীদের কাকলী সুরু হয়েছে ধীরে ধীরে। দমদম বিমান-ঘাঁটির অদূরবর্ত্তী পাটকলের উত্তুঙ্গ চিমনীটা আকাশের পটে আঁকা আবছা ছবির মত দেখাচ্ছে। বিমান কোম্পানীর সাদা ধবধবে ইউনিফর্ম-পরিহিত শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরা টিকিট পরীক্ষা ও মাল ওজন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত। বাগানের রাস্তা দিয়ে চলেছে সারিবন্দী মন্থরগতি গরুর গাড়ী, বাতাসে ভেসে আসছে তাদের তৈলহীন চাকার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ।

দেড়টা বাজতেই নয়াদিল্লী। মাঝে শুধু বামরোলীতে প্রায় ঘণ্টা খানেকের বিশ্রাম—প্রাতরাশের প্রয়োজনে। ব্যবস্থা থাকলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর পুনরায় দিল্লী থেকে সন্ধ্যা নাগাদ কলকাতায় ফিরে মেট্রোতে সিনেমা দেখা যায়। রেলযোগে প্রায় দেড় দিনের

পথ। দূরকে নিকট এবং দুর্গমকে সহজাধিগম্য করেছে যে বিজ্ঞান, তার জয় হোক।

মনে আছে শৈশবের কথা। দুপুরে গৃহকর্তারা কর্মস্থলে। আহারাদির পর প্রাত্যহিক দিবানিদ্রার অব্যর্থ অষুধ বঙ্কিমের উপন্যাস হাতে মা পাশের ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শয়ান। তাঁর সেই স্বল্পায়ু বিশ্রামক্ষণটি যাতে চপল-স্বভাব বালকের সশব্দ দৌরাত্ম্যে খণ্ডিত না হয় সে জন্য পিতামহী নাতিকে নিয়ে বসেছেন। বৃদ্ধা তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুর উপরে নিকেলের চশমা জোড়াটা এঁটে মৃদু স্বরে পড়ছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। খানিকক্ষণ এ-পাশ, ও-পাশ উসখুশ করে মাথার বালিশটা নিয়ে লোফালুফির পর হঠাৎ এক সময়ে কানে আসতো—

রাবণ বসিল চড়ি পুষ্পক রথেতে।
বিদ্যুতের সম গতি আকাশ পথেতে।

অমনি স্তব্ধ, উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম। অরণ্য, পর্ব্বত, সাগরসঙ্গম অতিক্রম করে রথ চলেছে শূন্যপথে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো, দূর হতে দূরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। মধ্যাহ্ন দিনের কর্ম্মহীন অলস প্রহরগুলি শিশু-মনের নিরঙ্কুশ কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। দশাননের সৌভাগ্যে ঈর্ষা জন্মিত—এক লক্ষ পুত্র ও ততোধিক পৌত্র-সংখ্যার জন্য নয়, তার যদৃচ্ছা আকাশ-ভ্রমণের ক্ষমতার জন্য। সে-দিনের বৃদ্ধা পিতামহী তাঁর ভক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে দীর্ঘকাল গত হয়েছেন। তাঁরই নাতি-নাতিনীরা যে অদূর ভবিষ্যতে লঙ্কাধিপতির সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে কথা কল্পনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দণ্ডকারণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কা নিকষাতনয় কয় দণ্ডে পৌঁছেছিলেন তার উল্লেখ কৃত্তিবাসে নেই, কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লী,—ন' শ' তিন মাইল পথ—আমরা সাত ঘণ্টায় অতিক্রম করেছি। এতে উত্তেজনা আছে, কিন্তু উপভোগ নেই। কমলালেবুর বদলে ভাইটামিন 'সি' ট্যাবলেট খাওয়ার মতো। প্রাক্‌বিমান যুগে পথ অতিক্রমণটাই ভ্রমণের একমাত্র বিষয় ছিল না, নানা জনের সংস্পর্শে আসবার একটা সুপরিসর অবকাশ তাতে মিলত। মন্দগতি গরুর গাড়ীর কথা থাক, রেল-ভ্রমণেও মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা যোগাযোগ ঘটে, বিমান-যাত্রায় তার সম্ভাবনা মাত্র নেই। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবর্ষেও বিমান-চলাচল বহুলতর হবে। রাত ন'টায় গ্রেট ইষ্টার্ণে ডিনারের পর দমদমে প্লেনে উঠে পরিপাটি নিদ্রা দিলে পরদিন সকালে বোম্বের তাজে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া যাবে। সে-দিন না থাকবে ঘুষ অথবা ঘুষির জোরে টিকিট কেনার হাঙ্গামা, না থাকবে কুলীর কলহ বা সহযাত্রীর কোলাহল। জানালার কাছে "চা—গ্রাম" হেঁকে কেউ ঘুম ভাঙাবে না, পানি-পাঁড়ে তার বালতি থেকে তৃষ্ণার্ত যাত্রীর অঞ্জলি ভরে দেবে না, এবং টিনের চালার ঘুমটি ঘরের কটক আটকে স্টেশনমাষ্টার সবুজ নিশান দেখিয়ে গাড়ী পাশ করে তারও আর দর্শন মিলবে না। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।

বিমানঘাঁটির বাইরে এসে দেখা গেল যানবাহনের চিহ্ন মাত্র নেই। বেলা প্রায় দেড়টা। মার্চ্চের রৌদ্রদগ্ধ আকাশ পাণ্ডুর এবং বাতাস প্রচুর ধূলিসমাকীর্ণ। সামনে এ্যাসফালটমের রাস্তা জনবিরল। রুক্ষ প্রান্তরের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঊর্দ্ধ অধঃ—যে দিকে যত দূর দৃষ্টি চলে, উত্তপ্ত বাতাসের একটা কম্পমান নিবাস ছাড়া আর কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নয়। রুদ্র বৈশাখ কথাটা এত কাল রবি ঠাকুরের কাব্যে পড়া ছিল; কিন্তু "লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর" বলতে সত্যি যে কী বোঝায় দিল্লীর নিদাঘ-মধ্যাহ্নে তারই খানিকটা আভাস পাওয়া গেল। সহযাত্রীরা সাত জন বিদেশীয়। তাদের খাকী অঙ্গাবরণে যথাযথ সামরিক গোত্র নির্দ্দেশ। ত্রিপল-ঢাকা বৃহদাকার এক মোটর লরীতে মাল ও মালিকেরা একই সঙ্গে বোঝাই হয়ে অন্তর্হিত হলো।

হোটেলে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সুতরাং গন্তব্য স্থল অজ্ঞাত, পথ অপরিচিত অথচ ভরসা একমাত্র নিজের আদি ও অকৃত্রিম চরণযুগল। তাকেই শরণ করে পথে বিচরণ সুরু করব কি না ভাবছিলাম।

আপনি কোথায় যাবেন, চলুন, নামিয়ে দিচ্ছি।

গভীর রাত্রিতে নিশি ডাকে বলেই তো শুনেছি। তবে কি দিনেও—। না; পিছনে তাকিয়ে দেখি, নিজের মোটরের দোর খুলে দাঁড়িয়ে আছেন একমাত্র বেসামরিক যাত্রি-সহচর এ, এস, বোখারী,—ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের ফুয়েরার।

রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নের নিরুপায় পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হলো, স্বয়ং উর্ব্বশী "লহ লহ জীবন-বল্লভ" বলে পায়ে লুটিয়ে পড়লেও বোধ হয় এত খুশী হতেম না।

সংবাদপত্র ও বেতার-জগতে বোখারী সাহেবের নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই সমপরিমাণ—যদিও সরকারী সুখ্যাতির সোপানে সোপানে দুর্গম প্রমোশানের শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আজ তিনি সর্ব্বাধিনায়ক। বেতার-পূর্ব্ব জীবনে তিনি ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ছদ্মনামে রস-রচনা দ্বারা উর্দূ সাহিত্যেও একদা তিনি বহুবিস্তৃত খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। ভদ্রলোক অসাধারণ বাক্‌পটু এবং পরিহাসরসিক। লাওনেল ফিলডেন তাকে অধ্যাপনার ক্ষেত্র থেকে বেতার-জগতে আমদানী করেন। কলেজের লেকচার-রুম থেকে রেডিওর ষ্টুডিও। এদিক দিয়ে বাংলা দেশের শিশির ভাদুড়ীর তিনি সগোত্র। শুধু তিনি একাই নন, তাঁর অনুজ জেড, এ বোখারীও ফিলডেনের অনুগ্রহ-প্রচ্ছায় অল ইণ্ডিয়া রেডিওর অঙ্গনে বাসা বেঁধেছিলেন। আশ্চর্য্য নয় যে, এক-কালে ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের কৌতুক-আখ্যা ছিল —ইণ্ডিয়ান বি, বি, সি,—বোখারী ব্রাদার্স কর্পোরেশান।

নয়াদিল্লীর রাস্তাগুলি নয়নাভিরাম। ঋজু, প্রশস্ত এবং ছায়াচ্ছন্ন। মসৃণ পীচের আস্তরণ, ডাষ্টবিন থেকে উপচীয়মান জঞ্জালস্তূপের দ্বারা পঙ্কিল নয়। যান-বাহনের সংখ্যা পরিমিত; পদাতিকদের পক্ষে অনেকটা নিরাপদ। ভারতের অন্যান্য সহরের ন্যায় সতত সঞ্চরমাণ নির্ভীক বৃষভকুল এখানকার রাজপথে দৃশ্যমান নয় এবং পথিপার্শ্বের কোন গৃহের অলিন্দ থেকে অকস্মাৎ তাম্বুলরাগ কিম্বা তার চাইতেও মারাত্মক কিছু নিরীহ পথচারীদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। মাঝে মাঝে গোলাকৃতি ক্ষুদ্রাকার পার্ক, সেখান থেকে সাইকেলের চাকার স্পোকের মতো একাধিক পথ নানা দিকে প্রসারিত। পার্কগুলির নাম প্লেস, আকৃতি একই। উইণ্ডসর প্লেসের সঙ্গে ইয়র্ক প্লেসের তফাৎ যা সে শুধু নামে। সবগুলিই সযত্নে রচিত এবং রক্ষিত। রাস্তার পরিচয় আমলাতান্ত্রিক। সরকারী দপ্তরখানার পূর্ব্বতন বহু ইংরেজ কর্ম্মচারীদের নাম পথের প্রান্তসীমায় প্রস্তরীভূত হয়ে শোভিত। মোগল বাদশাহ বাবরের চাইতে চীফ

কমিশনার নিকলসন সাহেবের নামের গুরুত্ব এখানে অধিক। তাই সুরজাহান লেন অপেক্ষা বেয়ার্ড রোড অধিকতর বিশিষ্ট। বোঝা গেল, নয়াদিল্লীর নগরপালদের আর যাই থাক, বিনয়ের অপবাদ নেই। প্রসঙ্গতঃ এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, একটি রাস্তার নামকরণ রবীন্দ্রনাথের নামে. তাঁর জীবদ্দশায়ই হয়েছে, কবির নিজ জন্মস্থানে আজও যা সম্ভব হয়নি। গাঁয়ের যোগীর পক্ষে ভিখ্ পাওয়া কঠিনই বটে।

বোখারী সাহেব যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তার নাম কুইনস্‌ওয়ে। নামটি ভালো। বাংলা রাণীর দীঘির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নাম নিয়ে কবিত্ব করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়; ক্ষুৎ, পিপাসা ও ক্লান্তি নামক যে কয়টি অসুবিধাজনক অবস্থা মানবদেহকে বিব্রত করে থাকে আপাততঃ তাদের নিরসন প্রয়োজন।

যুদ্ধের হিড়িকে গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানার বিস্তার ঘটেছে অভাবনীয় বেগে; কেরাণী, দপ্তরী, সাহেব-সুবায় সহরের ঘরবাড়ী পরিপূর্ণ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে আছে সেক্রেটারিয়েটের বহু তিন হাজারী, চার হাজারী মনসবদার। নানা দিগ্‌দেশ থেকে এসেছে খবরের কাগজের রিপোর্টার। হোটেল, বোর্ডিং সর্ব্বত্রই এক রব—'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ বাড়ী।' প্রচুর দক্ষিণা কবুল করেও সাত দিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় একটা মাথা রাখবার স্থান সংগ্রহ করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"বহু দিন মনে ছিল আশা; রহিব আপন মনে, ধরণীর এক কোণে, ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা।" অনুমান হয়, কবি এককালে দিল্লীতে ছিলেন।

যিনি আতিথ্য দিলেন, তিনি একটা বেসরকারী কোম্পানীর স্থানীয় কর্ণধার। সাধারণ কর্ম্মিরূপে দিল্লীতে এসেছিলেন, নিজের কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীকে এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নয়াদিল্লী সহরটা সৃষ্টি হয়েছে সরকারী প্রয়োজনে; কপালে তার জয়পত্র আঁটা On His Majesty's Service। জামসেদপুরকে যদি বলি ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল টাউন তবে নয়াদিল্লীকে বলা যেতে পারে Governmental। সহরের জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে সেক্রেটারীয়েটকে কেন্দ্র করে। চাপরাসী, দপ্তরী, কেরাণী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আকীর্ণ এই সহরে বেসরকারী ব্যক্তিদের কলকে পাওয়া ভার। এখানকার সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস থাকে ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতার মধ্যে। যে অল্পসংখ্যক বেসরকারী লোক এখানকার সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী-প্রভাবান্বিত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন তাঁরা যথার্থই শ্রদ্ধার যোগ্য। আমার হোষ্ট সেন মহাশয় স্থানীয় সঙ্কট-ত্রাণ সমিতির সভাপতি, কালীবাড়ীর সম্পাদক, বাঙ্গালী ক্লাবের কর্ম্মকর্ত্তা এবং আরও একাধিক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য।

ভদ্রলোকের আলমারীতে সারিবাঁধা সবুজপত্রের বাঁধানো খণ্ড দেখে বোঝা যায় তাঁর রুচি। ভোজনপর্ব্বে সেটা অধিকতর পরিস্ফুট হলো। ভাজা, ডাল, তরকারী, মাছ ও একটু দৈ সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারের যা আহার—অতিথির জন্য সেই ব্যবস্থা। অপরাহ্নে নারকেলের কুঁচি সহযোগে চিঁড়ে-ভাজা। চায়ের সঙ্গে পান্তুয়া-রসগোল্লার সমারোহ এবং ভাতের সঙ্গে চপ-কাটলেটের বাহুল্য দ্বারা প্রত্যহই অতিথিকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা নেই যে, এ গৃহে সে এক জন বহিরাগত আগন্তুক মাত্র। তাঁর দীর্ঘীকৃত উপস্থিতি গৃহস্বামীর আনন্দ বর্দ্ধন করে না। সহজ হওয়ার মধ্যে আছে কালচারের পরিচয়;—আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভ। সে দম্ভ কখনও অর্থের, কখনও বা বিত্তের, কখনও বা প্রতিপত্তির।

[ক্রমশঃ ।

কেনা-বেচার ইতিহাস

অধীরকুমার রাহা

দুটো পয়সা দিয়ে মা বললেন: যা ত রে অন্থু, দোকান থেকে কিনে আন দু পয়সার পান।

অন্থু অমনি ছুটে গেল পানের দোকানে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অন্থুর মার পান এসে হাজির।

বাড়ীতে পুরোনো শিশি-বোতলের স্তূপ জমেছে। বাবা বললেন: কেন আর এগুলোকে জায়গা জুড়ে রাখা। বিদায় করে দিলেই হয় এগুলো!

সে-দিনই দুপুরে অন্থু পুরোনো শিশি-বোতল-ওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দিলে সেগুলি!

সংসারে নিত্যই আমরা এমনি কত জিনিষ কিনছি বেচছি। এই কেনা-বেচার ব্যাপারটা আমাদের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হলেও কিন্তু এর পেছনে যে একটা মজার ইতিহাস আছে, তা তোমরা ভেবে দেখেছ কি? বস্তুতঃ পক্ষে, এ ইতিহাস মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড় স্তর; আজ অবশ্য চাল-ডাল, জামা-কাপড় থেকে আরম্ভ করে পান-চুণ আলপিন পর্য্যন্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্ত জিনিষই হাতের কাছে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলে ভেব না, এই বেচা-কেনার ব্যাপারটা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ছিল। তা মোটেও নয়। আসলে এই কেনা-বেচার ব্যাপারটা শিখতে মানুষের অনেক দিন সময় লেগেছে। কি করে এই কেনা-বেচার কৌশল সৃষ্টি হল এবং কেন হল তাই আজ তোমাদের বলছি।

আশা করি, এ কথা তোমরা সকলেই জান যে, আজকের মানুষ সভ্যতার যে স্তরে এসে পৌঁছেচে, চিরকালই সে তেমন ছিল না। ধীরে ধীরে বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ এ স্তরে উপনীত হয়েছে। এমন এক দিন ছিল যখন মানুষ ছিল বন্য, বর্ব্বর ও যাযাবর। তীর-ধনু হাতে বনে বনে শিকার ও শল্যমাংস আহার এই ছিল তার জীবন। ক্রমে মানুষ দেখলে এমনি ভবঘুরে জীবনের চেয়ে কোথায়ও স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে পারলেই বেশ ভালো হয়। কিন্তু স্থায়ী জীবন-যাপনের সুযোগ মানুষের সে দিনই এল, যে দিন মানুষ শিখলে চাষ করতে। অসভ্য মানুষ প্রথম যখন আবিষ্কার করলে কৃষিকর্ম্ম সে দিন তাদের চাষের প্রণালী কিন্তু আজকের মত ছিল না। তখনকার মানুষগুলি একত্র দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত খাবারের খোঁজে। শিকার যা জুটত নির্ব্বিচারে তা তারা সকলের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে খেত। ধনু ছেড়ে যখন এই মানুষগুলি শিখলে ধরতে হল, তখনও কিন্তু তাদের এ স্বভাব গেল না। শিকারের মত সবাই মিলে ক্ষেতে কাজ করত। ফসল যা ফলত সকলের আহার্য্যরূপেই তা ব্যয়িত হত। আমার ক্ষেত, আমার ফসল এ প্রশ্নবোধ তখনও মানুষের মধ্যে জন্মায় নাই। তখন মানুষ যা উৎপাদন করত, তার উদ্দেশ্য ছিল সকলে মিলে সে ভোগ করা। এমনি ভাবে কিছু দিন চলল। ইতিমধ্যে মানুষ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেললে। সে দেখলে, এই আহার্য্য উৎপাদন ব্যাপারে সে তার নিজের দু'হাতের শক্তি ব্যতীত বাইরের অন্য শক্তিকেও বেশ সহজেই কাজে লাগাতে পারে। তাতে শ্রমেরও লাঘব হয়, আর সৃষ্টিরও ক্ষমতা বেড়ে যায়। এই ভাবে মানুষ ক্রমে শিখলে পশুশ্রমকে কাজে লাগাতে। তার পর শিখলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমক্ষমতাকে বাড়াতে। পূর্ব্বে মানুষ যখন গোষ্ঠীগত ভাবে শ্রম করে যে দ্রব্যাদি উৎপাদন করত তাতে কারও একার দাবী টিকত না। সকলেই তা সমানে ভোগ করত। কিন্তু শ্রমকার্য্যে পশু ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখবার পর ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের কাজ করার সুবিধা হল। এমনি ভাবে আলাদা কাজ করে যে সব জিনিষ সৃষ্টি হতে লাগল তার মালিকও হল ব্যক্তিবিশেষে। এই ভাবে সৃষ্টি হল মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই ভাবে গড়ে উঠল নিজের নিজের জমীতে নিজের জন্য উৎপাদন। তোমার আমার বোধ। এই সময়ও মানুষ যা সৃষ্টি করত তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেরাই তা ভোগ করবার। কিন্তু যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখায় মানুষের একটা লাভ হয়েছিল এই যে, এক জন মানুষ তার নিজের চেষ্টায় যা উৎপাদন করতে লাগল তা তার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। সমস্যা দাঁড়াল, এই বাড়তি জিনিষগুলি নিয়ে মানুষ কি করবে? এত কষ্ট করে যা তৈরী করা হয়েছে তা ত আর বিলিয়ে দেওয়া চলে না! সব চেয়ে ভালো হয় অন্য কারও সঙ্গে এগুলি বদলাবদলী করে নেওয়া। এই বদলাবদলীর ব্যাপারকে আমরা বিনিময় বলতে পারি। এই ভাবে উৎপন্ন পণ্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা যখন মানুষ শিখলে সভ্যতার পথে সে তখন এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। তখন মানুষ নিজের ভোগের জন্য ছাড়াও বিনিময়ের জন্য পণ্যোৎপাদন করতে লাগল।

এই ভাবে কিছু দিন চললেও পরে কিন্তু মুস্কিল দেখা দিল। কেন না, ইতিমধ্যে মানুষ আরও কিছুটা সভ্য হয়েছে। নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই নিজে উৎপাদন করা ছেড়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে আলাদা আলাদা পেশা। তার ফলে সৃষ্টি হল বিভিন্ন শ্রেণী আর বর্ণ। জুতি তৈরী করতে

লাগল কাপড়, কুমোর গড়তে লাগল হাঁড়ী, কামার বানাতে লাগল লাঙল, কৃষক বুনতে থাকল শস্য। এরা প্রত্যেকেই প্রস্তুত করতে লাগল পণ্য—পণ্য বিনিময়ের জন্য। নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে তারা সংগ্রহ করে নেবে অন্যের উৎপন্ন নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। মানুষ যতই সভ্য হতে লাগল, জীবনযাত্রার সে ততই শিখতে লাগল নূতন নূতন উপকরণের ব্যবহার। কিন্তু বিনিময়-প্রথায় সেগুলি আহরণের জটিলতা দেখা দিল খুবই। মনে কর, কোন তাঁতি বুনেছে একখানা কাপড়, তার বদলে তার চাই ৫ সের চাল, এক কাহণ সুপুরি আর একটা মাকু। এতগুলি জিনিষ কারও কাছে এক সঙ্গে পাওয়া যাবে না, গেলেও সে তাঁতির একখানা কাপড়ের বদলে সেগুলি যে দিতে রাজী হবে তার স্থিরতা কি? তা-ছাড়া রয়েছে সঞ্চয়ের প্রশ্ন। মানুষ চিরকালই কর্মক্ষম থাকে না। যদি ভবিষ্যতের জন্য তাকে সঞ্চয় করতে হয় তবে তা সে করবে কি করে? তার উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রী সে স্তূপীকৃত করে রাখতে পারে না, কারণ সেগুলি পচনশীল। এই সব নানা কারণে মানুষ অনুভব করতে লাগল এমন একটা জিনিষের—যাতে বিনিময়ের কাজও চলবে আবার সঞ্চয়ের কাজও চলবে। এই প্রয়োজন মেটাতেই সৃষ্টি হল মুদ্রার। মুদ্রা-সৃষ্টিতে একটা সুবিধা হল এই যে, পূর্ব্বে যেমন পণ্যের সঙ্গে পণ্যের, এখন তার বদলে সুরু হল পণ্যের সঙ্গে মুদ্রার বিনিময় এবং মুদ্রার সঙ্গে পণ্যের বিনিময়। যে তাঁতি একখানা কাপড়ের বিনিময়ে চায় পাঁচ সের চাল, এক কাহণ সুপুরি আর একটা মাকু তার পক্ষে তখন সেটা সংগ্রহ করা খুবই সহজ হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ সে তখন যার দরকার কাপড় তার সঙ্গে মুদ্রার বদলে বিনিময় করে নিল কাপড়খানা। সেই মুদ্রাই আবার সে বিনিময় করে নিল যাদের রয়েছে সুপুরি ও মাকু—তাদের সঙ্গে। এমনি ভাবে সে পেয়ে গেল তার প্রয়োজনীয় বস্তু। এই বদলাবদলি তখন আর ঠিক বিনিময় রইল না। আরম্ভ হল কেনা-বেচা।

এই ভাবেই হল কেনা-বেচার সূত্রপাত। এই কেনা-বেচার স্তরে আসতে কিন্তু অসভ্য মানুষের লেগেছিল হাজার হাজার বছর সময়। কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কার ও কেনা-বেচার সূত্রপাতে মানুষের অগ্রগতি হয়ে পড়ল দ্রুততর। সে সব কথা তোমরা বড় হয়ে পড়বে। দেখবে, গল্প উপন্যাসের চেয়ে তা অনেক রোমাঞ্চকর।

পৃথিবীর প্রথম টেলিগ্রাম

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

টেলিগ্রাম পাঠানো আজ তোমাদের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু ইতিহাসটা জানো কি? একশো বছরেরও বেশী। টেলিগ্রামের আবিষ্কার ক'রে নিউ ইয়র্কের প্রোফেসর মর্স (Morse) চুপ্ ক'রে বসেছিলেন। তাঁর অনেক টাকার দরকার। সে টাকা দেয় কে? লোকে ত তারে খবরাখবর যাওয়ার কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়। বলে, আচ্ছা আজগুবি গুজব! লোকটা পাগল না কি?

কংগ্রেস ছাড়া অত টাকা কে দিতে পারবে? কম ত নয়, তিরিশ হাজার ডলার।

যাহ্, অনেক ধ্যাধরি ক'রে প্রোফেসর কংগ্রেসে তোলা হল। কিন্তু বিল সমর্থন করার সময়ে মুস্কিল। চার জন পক্ষে, চার জন বিপক্ষে। গভর্ণর ওয়ালেশের ভোট যে দিকে পড়বে সে দিকেরই জিত। তিনি জান্তেন, সেনেট-চেম্বারের পাশের ঘর থেকে নীচের ঘর অবধি তার চালিয়ে প্রোফেসর তাঁর এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছেন। অধিবেশনের মাঝখানেই তিনি বললেন, 'আমি স্বচক্ষে দেখে এসে তার পর ভোট দোব। আসছি।'

সে ঘরে তখন ভয়ানক ভিড়। অনেক লোক মজা দেখতে জমেছে। যে লোকটি কলের কাছে ব'সেছিল তাকে গভর্ণর একটি প্রশ্ন লিখে দিলেন। প্রশ্নটি পাঠানো হল নীচের ঘরে প্রোফেসর মর্সের কাছে। তিনি তক্ষুনি ঠিক্ ঠিক্ জবাব দিলেন। আর একটা প্রশ্ন। আবার ঠিক্ জবাব। জনতা অপারেটরকে বল্‌তে লাগলো, 'প'ড়ে শোনাও, প'ড়ে শোনাও!'

গভর্ণরের বিশ্বাস হল, জিনিষটা একেবারে বাজে নয়। তিনি পরিষদ্-কক্ষে ঢুকে বিলের পক্ষে ভোট দিলেন।

কিন্তু বিল সমর্থন করলেই ত হল না। পাশ হয়ে টাকা পাওয়া অনেক পরের কথা।

সে দিন সে বছরের শেষ অধিবেশন কংগ্রেসের। প্রোফেসরের বিষয়টার নম্বর ছিল ১২০। গ্যালারীতে উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহল নিয়ে ব'সে ব'সে উনি ক্লান্ত। অনেক রাত্রে বিরক্ত হয়ে উনি বাড়ী ফিরে গেলেন। বুঝলেন, এ যাত্রা আর হল না। পরদিন নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবেন স্থির করলেন। আবার তূলি নিয়ে ছবি আঁকবেন সঙ্কল্প করলেন। যদি দূর ভবিষ্যতে কখনো কংগ্রেসের দয়া হয়।

সকালের প্রাতরাশের টেবিলে ব'সে খবর পেলেন একটি মহিলা তাঁর দর্শনপ্রার্থী। আন্‌তে বললেন ডেকে।

সুন্দরী মেয়ে। মিস্ এল্‌স্‌ওয়ার্থ। এসেই বললে—'অভিনন্দন গ্রহণ করুন প্রোফেসর।'

'কিসের অভিনন্দন?'

'৩০ হাজার ডলারের বিল যে পাশ হ'ল।'

'কখন্ হ'ল? আমি ত বল্‌তে গেলে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত ছিলাম।'

'আমার বাবা একেবারে শেষ অবধি ছিলেন। সব শেষে আপনার বিল ধরা হয়েছিল। তিনিই আমাকে সুখবরটি দিতে পাঠালেন।'

প্রোফেসর অভিভূত হয়ে পড়লেন।

বললেন—'লাইন তৈরী হোক্। তুমিই তার প্রথম বাণী দেবে।'

ওয়াশিংটন থেকে বালটিমোর পর্য্যন্ত তারের যোগাযোগের ব্যবস্থা হল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল মাটির নীচে দিয়ে তার নিয়ে যাওয়া হবে। কয়েক হাজার টাকা তার জন্যে খরচ হয়ে গেল। বৃথা। তার পর দেখা গেল, খুঁটির ওপর দিয়েই নিয়ে যাওয়া নিরাপদ্। যে প্রথা এখনো পর্য্যন্ত চ'লে আসছে। ১৮৪৪ সালের মে মাস। বৈদ্যুতিক তার ওয়াশিংটন আর বালটিমোর দুটি দূর ব্যবধানের নগরীকে যখন সংযুক্ত করেছে, তখন প্রোফেসর মর্স তারের ওধার থেকে মিস্ এল্‌স্‌ওয়ার্থকে অনুরোধ ক'রে পাঠালেন, তার বাণী দিতে। সে পাঠালো—

WHAT HATH GOD WROUGHT!—ঈশ্বর কী সৃষ্টি করেছেন! একশো বছর আগেকার পৃথিবীর এই প্রথম টেলিগ্রামখানি Conn[illegible] Hartford মিউজিয়মে আজো আছে।

[illegible] গেল, তারে তারে কথা বলা চলে। ঠিক একশো [illegible]

যাদুকর পি, সি, সরকার

—ফিতা কাটিয়া জোড়া দেওয়া—

আলোচ্য সংখ্যার আমার পাঠক-পাঠিকাদিগকে ফিতা কাটিয়া জোড়া দেওয়ার খেলাটি শিখাইব। এই ধরণের খেলা আমি অদ্যাপি রঙ্গমঞ্চে বেশ সাফল্যের সহিত প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছি এবং এই খেলাটিও জীবনে আমি বহু বার দেখাইয়াছি। কোন জিনিষ কাটিয়া ছিঁড়িয়া বা পুড়িয়া পুনরায় নূতন দেখাইতে হইলে সাধারণতঃ সেই জিনিষের 'ডবল' রাখিতে হয়। যে রুমালটি পুড়াইয়া দেওয়া হয় সেটি কিছুতেই পুনরায় নূতন করা যাইবে না—অনুরূপ অপর একটিকে কৌশলে বাহির করিতে হয়। সেই ভাবে কোন কাগজখণ্ড ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া জোড়া লাগাইতে হইলে অনুরূপ আকৃতির অপর এক খণ্ড বাহির করিয়া দর্শকদিগকে দেখাইতে হয়। এই ভাবে ফিতা কাটিয়া জোড়া লাগাইতে হইলেও যে ফিতাটি কাটা হয় সেটির
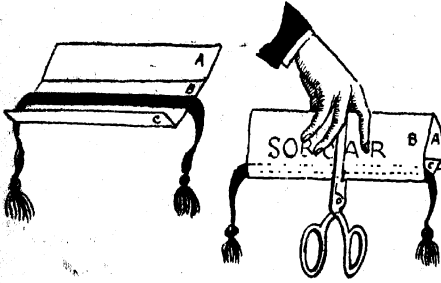
পরিবর্ত্তে অপর একটি বাহির করিয়া দেখাইতে হয়। কিন্তু আলোচ্য খেলাটিতে সেরূপ কোনই অসুবিধা নাই। অর্থাৎ একই খণ্ড ফিতা দ্বারা এক ব্যক্তি সারাজীবন এই ফিতা কাটিয়া জোড়া দেওয়া খেলাটি দেখাইতে পারিবেন। এই জন্ত এই খেলাটি এই জাতীয় খেলা সমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই খেলাটি বিশেষ আদরণীয় হইবে। কারণ, ইহাতে যন্ত্রপাতিরও হাঙ্গামা নাই। এক খণ্ড সাধারণ কাগজ, একটি ফিতা এবং একটি বড় কাঁচি হইলেই যথেষ্ট। চুল বাঁধার ফিতা ও কাঁচি প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই আছে এবং এক খণ্ড সাধারণ কাগজের অভাবও হইবে না; সুতরাং যে কেহ যখন ইচ্ছা এই খেলাটি দেখাইতে পারিবেন।

যাদুকর প্রথমতঃ কয়েক ফুট লম্বা একটি সাধারণ রঙিন সূতা বা সরু সিল্কের ফিতা দর্শকদিগকে দেখাইলেন। ব্যবসায়ী যাদুকরগণ ফিতাটির দুই প্রান্তে (tassel) ঝালর লাগাইয়া ফিতাটিকে বাহারী করিয়া লইতে পারেন। আমি আমার ফিতার [illegible] কুবিকর্ণ ফিতার উপর আমার অনুরূপভাবে 'ট্যাসেল' লাগাইয়া [illegible] অনুসার। [illegible] ঐ ইঞ্চি চওড়া এবং এক ফুট লম্বা এক খণ্ড [illegible]

হইল এবং তাহাকে প্রথম চিত্রের ন্যায় তিনটি ভাঁজ করিয়া তদুপরি ফিতাটি লম্বালম্বি রাখা হইল। তাহাতে মনে হইল, যেন কাগজের 'চ্যাপ্টা চোঙ' (flat tube) এর মধ্যে একটি সাধারণ ফিতা রাখা হইয়াছে যাহার দুই প্রান্ত দুই দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে (দ্বিতীয় চিত্রের ন্যায়); এইবার যাদুকর একটি কাঁচি দ্বারা ঐ ফিতাযুক্ত কাগজের চোঙটি মধ্যস্থলে আড়াআড়ি ভাবে কাটিয়া দিলেন, সকলেই দেখিলেন যে, ফিতা সমেত কাগজ খণ্ড দুই ভাগ হইয়া গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তৃতীয় চিত্রে দেখান হইয়াছে যে, কাগজটি দুই খণ্ড হইলেও ফিতাটি পূর্ব্ববৎ আস্তই আছে। সকলেই এতদ্দর্শনে বিশেষ বিস্মিত হইবেন।

এইবার খেলাটির মূল কৌশল প্রকাশ করা যাইতেছে। চিত্রে দেখান হইয়াছে, যে কাগজের তিনটি ভাঁজ A B এবং C পরস্পর সমান নহে, B অংশ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, A অংশ তদপেক্ষা ছোট এবং C
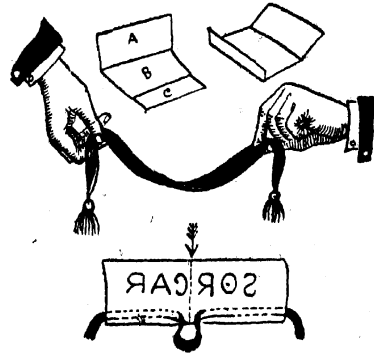
অংশ নিরতিশয় ছোট। কাগজের B অংশে যাদুকরের নাম মনে করুন Sorcar লেখা আছে। ঐটি দর্শকদিগের সম্মুখে ধরিলেই কাগজের চোঙের জোড়া মুখ দর্শকদের নজরের বাহিরে পড়িল। যাদুকর ঐ জোড়া মুখ দিয়া কৌশলে ফিতাটির কিছু অংশ টানিয়া বাহির করিলে ছোট একটি 'লুপ' (loop) পাওয়া যাইবে। চতুর্থ চিত্রে ঐ লুপটি দেখান হইয়াছে এবং তার পর কাঁচি দিয়া তীর চিহ্নিত স্থানে কাটিলেই হইল। কাগজের পশ্চাৎস্থিত ঐ 'লুপ'টি দর্শকগণ কখনও দেখিবেন না, কাজেই তাঁহাদের বরাবরই ধারণা থাকিবে যে, ফিতাসহ কাগজই দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু আসলে ফিতা কাটাই হইল না। ম্যাজিকে ইহাই মজা! উপযুক্ত প্রদর্শনভঙ্গীর সহিত দেখাইতে পারিলে এরূপ সহজ অথচ সুন্দর খেলা খুব কমই পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে, দর্শকগণ এই খেলাতে অতি সহজেই অবাক্ হইয়া যান।

—পৃথিবীর বয়স—

শ্রীদেবব্রত চন্দ্র

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বহু অলৌকিক তত্ত্ব, বহু রহস্য, বিজ্ঞান আজ ব্যাখ্যা করলেও পৃথিবীর বয়স কত? এ বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেনি। যে পৃথিবীতে মানুষের বাস, যার [illegible]তে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়, যার খনিজ সম্পদ নিয়েই বিজ্ঞানের [illegible] বয়স সম্বন্ধে কিছু না জানা [illegible] নয় কি?

বৈজ্ঞানিক গবেষকরা পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে শতাব্দী ধরে পরীক্ষা করে কৃতজ্ঞতার কাজ করেছেন।

পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা হয়েছে। পদার্থবিত্তা, জ্যোতিঃবিত্তা, জীববিত্তা প্রভৃতি স্ব স্ব পরীক্ষার দ্বারা পৃথিবীর বয়স জানতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ফল যা পাওয়া গেছে তাতে একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিল নেই। তাই কোন একটা বিশেষ পরীক্ষালব্ধ ফলকে আদর্শ বা ফল বলতে পারা যায় না।

এখন দেখা যাক্, পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষায় কে কি বলেছেন।

আর্চবিশপ উসের প্রথমে পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে বলেন। তিনি বলেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চার হাজার চার বছর পূর্ব্বে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। উসেরের এই রকম তারিখ একদম অচল। কেন না, এই সময়ে মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস পাওয়া যায়, তা'ছাড়া উসেরের মত বিজ্ঞানসম্মত নয়।

তোমরা জানো—সূর্য্য তাপ বিকিরণ করতে করতে প্রতিনিয়ত সঙ্কুচিত হচ্ছে।

হেল্মহল্টজের চোখে এটা প্রথমে ধরা পড়ে। তিনি বলেন যে, সূর্য্যের তাপের সমতা রক্ষা হচ্ছে কেবল সূর্য্যের সঙ্কোচনের ফলে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কেল্‌ভিন্ এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে বহু পরীক্ষা করেন এবং বলেন যে, সূর্য্যের বয়স প্রায় তিন কোটি বছর। এর থেকে তিনি অনুমান করে বলেন যে, পৃথিবীর বয়স সূর্য্যের বয়সের প্রায় কাছাকাছি ধরা যেতে পারে।

এর পর ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের পরীক্ষাও বয়স জানতে সাহায্য করে, কতকগুলো প্রস্তরের গঠন-প্রণালী দেখে ফিলিপস বলেন যে, পৃথিবীর বয়স ৪ কোটি বছরের বেশী তো কম নয়। আর্কিবল্ড গিকী ফিলিপসের পথ অনুসরণ করে আরও পরীক্ষা করেন। তাঁর হিসেবে পৃথিবীর বয়স হয় দশ কোটি বছর।

গিকীর তিন বছর আগে (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) পোল্টন জীববিত্তার পরীক্ষা থেকে বলেন, উদ্ভিদ্ আর প্রাণীদের দেহ-গঠন-প্রণালী বর্ত্তমান স্তরে আসতে পঞ্চাশ কোটি বছর লেগেছে।

এর পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সোলাস এক অদ্ভুত উপায়ে পৃথিবীর বয়স বার করেন। বছরের পর বছর সমুদ্রের লবণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। সোলাস পরীক্ষা করে বলেন যে, বর্ত্তমানে সমুদ্রে যে পরিমাণে লবণাক্ত হয়েছে সে পরিমাণে লবণাক্ত হতে পনের কোটি বছরের দরকার।

এ ছাড়া রেডিয়াম সম্বন্ধে আধুনিক অনেক পরীক্ষায় পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে জানা গেছে। রেডিয়াম তোমরা জান, সব চেয়ে মূল্যবান্ মৌলিক পদার্থ। এর একটা স্বভাব হোল যে, এ বেশী দিন নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখতে না পেরে বদলে অন্য পদার্থ হয়ে যায়।

রেডিয়ামের মত ইউরেনিয়ামও একই ব্যবহার করে। যখন কোন খনিজ ইউরেনিয়াম যুক্ত হয় তখন হিলিয়াম গ্যাস বার হয় আর ইউরেনিয়াম তার ধর্ম্ম-বদলাতে থাকে এবং শেষে এক প্রকার সীসেতে রূপান্তরিত হয়। বৈজ্ঞানিকরা নানান খনিজ দ্রব্য দেখে গবেষণা করে বার করেছেন খাঁটী ইউরেনিয়ামের 'সীসে'র রূপান্তরিত হতে কত সময় লাগে। এই উপায়ের দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, পৃথিবীর বয়স দেড়শ' কোটি বছর।

কিছু দিন আগে রাথারফোর্ড একটা পরীক্ষায় বলেন যে, পৃথিবীর বয়স তিনশ' চল্লিশ কোটি বছর।

যত দিন যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিকদের হিসেবে পৃথিবীর বয়সও বেড়ে যাচ্ছে। ষাট বছর আগের বৈজ্ঞানিকদের হিসেব আর আধুনিক কালের হিসেব পরীক্ষা করলে দেখা যায়, আধুনিক মতে পৃথিবীর বয়স পূর্ব্বের বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে প্রায় দুশ' গুণ বেশী। এখনও বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর বয়সের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছতে পারেননি তাই এখনও গবেষণা চলছে। জানি না, ষাট বছর বাদে আবার হয়ত এমন হিসেব মিলবে যে, তখন আধুনিক কালের হিসেব তখনকার বৈজ্ঞানিকদের কাছে হাসির খোরাক হবে।

শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়

শুনবে দাদু সোনার যাদু একটু বোসো মন দিয়ে,
ভায়ার সনে ভাব জমাতে বৃদ্ধ দাদুর ফন্দী এ।
সে দিন হঠাৎ খোসমেজাজী ফুর্ত্তিবাজের চূড়ান্ত
ভাঁড়ার ঘরে ঠাকুর হয়ে কইলো সবই বাড়ন্ত!
চশমাটাকে লটুকে নাকে কামড় দিলুম সন্দেশে—
গরম চায়ের দেওর-পোয়ের বন্ধু-বাড়ী সেই দেশে—
হঠাৎ দেখি বাঃ রে এ কি! নাচ্‌চে সবে উত্তালে,
সোঁদর বনের ভোঁদড় বোনের সেতার বাজে সাত তালে।
বিল্লী কুনো ঝিল্লী বুনো ম্যাঁও ঝিঁ ঝিতে ভরচে বন
সিংহী মামার জুতায় চামার পালিশ লাগায় সারা ক্ষণ।
নাকাড়া ঢোলুক নেকড়ে ভালুক বাজায় ডুডুম তাক ধিয়া।
মাথায় সিঁদুর নেংটী ইঁদুর বেঙের সনে তার বিয়া।
বাঘের পিসে বেঘোর দিশে খটকা লেগে পটকাতে,
তুবড়ী-বাজী বাপ রে পাজী পেটের পিলে চমকাতে।
সিঙ্গি নাচে খিঙ্গী প্যাচে রুই কাৎলা মাগুর কই,
ট্যাংরা পুঁটী খ্যাংরা ঝুঁটী পাপড় এবং দিচ্ছে দই।
খোস-মেজাজে মোষ যে সাজে নাড়চে তালে বক্র শিং,
সদ্-মেজাজী চিংড়ী দিদি কাঁসর বাজায় টিঙ্গা টিং।
মস্ত ভাঁড় ব্যস্ত ষাঁড় কুড়োয় তাতে পান্তুয়া,
সবাই মিলে হট্টগোলে চিবাই এলাচ পান-গুয়া।
মোদ্দা কথা কারুর সাথে রইলো না কার বিসংবাদ
এমনি দিনে 'জল-ভে' কিনে দেখতে ভায়া যায় না স্বাদ?

—বিষ্ণুগুপ্ত—

শ্রীরবি নর্ত্তক

৭

সিংহলের রাজদূত বিদায় নেবার পর নবনন্দের রাজসভাতেও চন্দ্রগুপ্তের নামে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। নবনন্দেরা আগেকার শত্রুতার কথা ভুলে যাবার অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে পরম সমাদরে রাজসভায় স্থান দিলেন। চন্দ্রগুপ্তের ওপর রাজ্যের যত অন্নসত্র পরিদর্শনের ভার পড়ল। তিনি তখন মনে মনে ম্লান হাসি হাসলেন—হা অদৃষ্ট! যার বাপ আর নিরেনব্বই ভাই না খেয়ে মরেছেন, সে সে আজ নিরন্নকে অন্ন যোগাবার ভার পেয়েছে—এরই নাম প্রকৃতির পরিহাস! কিন্তু হাস্‌তে গিয়েই তাঁর মনের আগুন দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল—প্রতিহিংসা! কিন্তু তখন আর তাঁর বিশেষ কিছু করবার ছিল না। তাই বুকের ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে যেতে থাক্‌লেও তিনি মনের আগুন মনেই চেপে রইলেন। এর মাঝে ঘট্‌ল এক নতুন ঘটনা।

* * *

বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বীনগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন—তাঁর নাম অগ্নিশিখ, আর তাঁর স্ত্রীর নাম—বসুদত্তা। বররুচি ব'লে তাঁদের একটি ছেলে হয়েছিল—এ ছেলেটির আর একটি নাম কাত্যায়ন। বররুচি বা কাত্যায়ন আসলে ছিলেন মহাদেবের এক জন অনুচর। ভগবতী পার্ব্বতীর শাপে মর্ত্ত্যে এসে বররুচি হ'য়ে জন্মেছিলেন। বররুচি ছিলেন শ্রুতিধর—অর্থাৎ একবার কোন কথা শুন্‌লে বা কোন কাজ দেখ্‌লে তখনই হুবহু তা বল্‌তে বা করতে পারতেন। তিনি যখন খুব ছেলেমানুষ, তখন এক দিন তাঁদের বাড়ীতে দুজন অতিথি আসেন। তাঁদের এক জনের নাম ইন্দ্রদত্ত, আর এক জনের নাম ব্যাড়ি। দুজনে খুড়তুত জাস্‌তুতো ভাই। তাঁরা স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন যে, পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ নামে এক জন মহাপণ্ডিত ও সাধক আছেন, তাঁর শিষ্য হ'তে পারলে তাঁরা সব শাস্ত্রে পণ্ডিত হ'তে পারবেন। পাটলিপুত্রে গিয়ে তাঁরা লোকের মুখে শুনতে পেলেন যে, বর্ষ নামে এক ব্রাহ্মণ নগরে আছেন বটে, কিন্তু তিনি মহামূর্খ—পণ্ডিত নন মোটেই—এ জন্যে বাড়ীর ভেতর থেকে কোন সময়ই বেরোন না। আশ্চর্য্য ভেবে তাঁরা খোঁজ করতে করতে গিয়ে উঠ্‌লেন বর্ষের বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লেন, তাঁরা—ব্রাহ্মণ বর্ষ ধ্যানে মগ্ন। তাঁর স্ত্রী দুই বন্ধুকে বল্‌লেন—'এই নগরে শঙ্কর স্বামী ব'লে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁর দুই ছেলে; বড় বর্ষ—আমার স্বামী, আর ছোট আমার দেওর উপবর্ষ। আমার স্বামী ছিলেন মূর্খ, আর দেওর খুব পণ্ডিত। কিন্তু আমার দেওর আর তাঁর স্ত্রী আমার মূর্খ স্বামীকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করতেন—আমার তা ভাল লাগ্‌ত না। আমি কেবল স্বামীকে বল্‌তাম—ছোট ভাই এর অন্নদাস হ'য়ে থাকা কি ভাল? আমারই গঞ্জনায় আমার স্বামী বনে গিয়ে কার্ত্তিক ঠাকুরের তপস্যা ক'রে বর পেয়ে এখন খুব পণ্ডিত হয়েছেন। কিন্তু দেবতার আদেশ এই যে—'শ্রুতিধর ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকে বিদ্যা দিও না'। তাই—আপনাদের বলছি—আপনারা একটি শ্রুতিধর বামুনের ছেলে খুঁজে নিয়ে আসুন, তাহ'লে আমার স্বামীর কাছে সব শাস্ত্র শিখতে পারবেন।'

বর্ষের স্ত্রীর এই কথা শুনে ইন্দ্রদত্ত আর ব্যাড়ি বেরিয়েছিলেন শ্রুতিধর ব্রাহ্মণ খুঁজতে। কৌশাম্বীতে অগ্নিশিখের ছেলে বররুচিকে শ্রুতিধর দেখে তাঁরা ছেলেটিকে চেয়ে নিলেন তার মার কাছ থেকে। বররুচির মাও বল্‌লেন—'এ ছেলেটির জন্মের সময় দৈববাণী হয়েছিল যে—এ ছেলে হবে শ্রুতিধর আর এক জন মহাপণ্ডিতের শিষ্য হ'য়ে জগতে বিখ্যাত হবে। সে দৈববাণী এখন ফল্‌বার সময় হয়েছে বুঝছি। তাই আমার ছেলে তোমাদের হাতে সঁপে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। বড় ছেলেমানুষ—নিজেদের ছোট ভাই এর মত ওকে পালন কোরো।'

ইন্দ্রদত্ত আর ব্যাড়ি রাজি হ'য়ে বররুচিকে নিয়ে গেলেন পাটলিপুত্রে বর্ষের কাছে। সেখানে বর্ষের কৃপায় একবার শুনেই শ্রুতিধর বররুচি সব শাস্ত্রে পণ্ডিত হলেন। আর তাঁর কাছে শুনে ব্যাড়ি ও ব্যাড়ির কাছে শুনে ইন্দ্রদত্তও হলেন পণ্ডিত। তিন পণ্ডিত শিষ্যের কথা ক্রমশঃ নগরে ছড়িয়ে পড়ল। তখন নন্দ-রাজারা পাটলিপুত্রে রাজ্য করছেন। তাঁরা বর্ষের জন্যে অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন।

এই ভাবে দিন যায়। বর্ষের ছোট ভাই উপবর্ষের পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল, নাম তার উপকোশা। তার সঙ্গে বররুচির বিয়েও হয়ে গেল। বেশ সুখেই দিন কাট্‌ছিল সবার। কিন্তু মানুষের দিন ত সমান যায় না।

পাণিনি নামে বর্ষের এক শিষ্য জুটেছিলেন। পাণিনি প্রথমে ছিলেন বড়ই বোকা। কোন রকমেই লেখাপড়া শিখতে না পেরে তিনি গুরুপত্নীর সেবা করতে লাগলেন। বর্ষের স্ত্রী তাঁর সেবায় খুব খুসী হ'য়ে তাঁকে বললেন—'বাছা! তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি নেই—তা তুমি এক কাজ কর—হিমালয়ে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা কর, যেন তিনি তোমাকে জ্ঞান দেন'। এই কথা শুনে পাণিনি চলে গেলেন হিমালয়ে—সেখানে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে তিনি 'মাহেশ্বর' ব্যাকরণের সূত্র পেলেন। এই ভাবে পণ্ডিত হয়ে ফিরে এসে তিনি বররুচিকে বিচারে আহ্বান করলেন। বিচারে সাত দিন-রাত কেটে গেল। আট-দিনের দিন বররুচি প্রায় জেতেন জেতেন—পাণিনি হারেন হারেন হয়েছেন—এমন সময় শূন্য থেকে অলক্ষিতে মহাদেব গর্জ্জন ক'রে উঠলেন। তাঁর সেই ভয়ানক হুঙ্কারে বররুচি, ব্যাড়ি, ইন্দ্রদত্ত সকলেরই বুদ্ধি লোপ পেলে। তাঁরা যে ঐন্দ্র-ব্যাকরণ শিখেছিলেন—সে সবই এক সঙ্গে সবাই গেলেন ভুলে। পাণিনিরই হ'ল জয়-জয়কার।

এই ঘটনায় বররুচির মনে বড় লজ্জা হল। তিনিও তপস্যা করতে চলে গেলেন হিমালয়ে। খুব জোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করায় তিনি বর দিলেন—'বৎস বররুচি! তুমি খুব পণ্ডিত হবে—এই বর দিচ্ছি। তবে পাণিনিকে আমি যে ব্যাকরণ শিখিয়েছি, তুমিও এখন হইতে সেই ব্যাকরণে পণ্ডিত হবে। তুমি ফিরে গিয়ে পাণিনির ব্যাকরণেরই প্রচার কর'।

তখন বররুচি ফিরে এসে পাণিনির শিষ্য হ'য়ে পাণিনি ব্যাকরণের প্রচার করতে লাগলেন। এদিকে ব্যাড়ি আর ইন্দ্রদত্ত গুরুদক্ষিণা দেবার জন্যে বর্ষের অনুমতি চাওয়ায় তিনি গুরুদক্ষিণা নিতে চাইলেন না। তবুও ব্যাড়ি আর ইন্দ্রদত্ত দুজনে জিদ করতে লাগ্‌লেন। তখন একটু বিরক্ত হয়েই এক কোটি সোনার টাকা দক্ষিণা চাইলেন।

ব্যাড়ি আর ইন্দ্রদত্ত তাতেই হ'লেন রাজি। টাকা জোগাড়ের জন্তে তিন ভাই চললেন নন্দ রাজাদের বাড়ী। বররুচিও সঙ্গে গেলেন। বররুচির স্ত্রী উপকোশাকে নন্দ রাজারা 'ধর্ম্মবোন্' বলতেন। তাই ভরসা ছিল যে, টাকাটা বররুচি যদি চান, তাহলে নন্দেরা ফিরিয়ে দেবেন না।

নন্দদের মধ্যে যিনি সে বছরে রাজা হবার পালা ভোগ করছিলেন, তিনি সে সময় ছিলেন অযোধ্যায়। তিন বন্ধুতে অযোধ্যায় গিয়ে দেখ্‌লেন—শিবিরে রাজা ছিলেন—হঠাৎ একটু আগে তিনি মারা গেছেন—চারিদিকে হৈ-হৈ প'ড়ে গেছে।

ইন্দ্রদত্তের ছিল হঠযোগ জানা। তার বলে তিনি পরের শরীরে ঢুকতে জান্‌তেন। তিনি তখন দুই-বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ আঁটলেন—'দেখ! আমি আমার নিজের দেহটা ছেড়ে রেখে রাজার দেহে গিয়ে ঢুকি—তাহ'লে রাজা এখনই আবার বেঁচে উঠ্‌বেন। তখন বররুচি গিয়ে টাকা চাইবেন—আমি তা দিয়ে দোব। তার পর আমার নিজের দেহে আবার ফিরে আস্‌ব। কিন্তু, খুব সাবধানে আমার মরা দেহটা তোমরা দুজনে রক্ষা কোরো। কারণ, কোন ক্রমে তা নষ্ট হ'লে আর আমি ইন্দ্রদত্ত হ'তে পারব না—নন্দ রাজাই থেকে যেতে হবে'।

এই পরামর্শ এঁটে একটা ভাঙ্গা মন্দিরে তিন জনে আস্তানা নিলেন সন্ন্যাসীর বেশে। তার পর যেমন লোকে পোষাক ছাড়ে, ঠিক সেই ভাবে নিজের দেহ ছেড়ে রেখে ইন্দ্রদত্ত গিয়ে ঢুক্‌লেন মরা রাজা নন্দের শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে মরা রাজা প্রাণ পেয়ে যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠবার মতই উঠে বস্‌লেন। রাজার শিবিরে খুব আনন্দের কোলাহল প'ড়ে গেল। সবাই ভাব্‌লে—রাজা হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন, সত্যি মরেননি। যাই হোক, রাজা সুস্থ হ'য়ে দান-ধ্যান করতে লাগ্‌লেন।

এই অবসরে বররুচি আর ব্যাড়ি রাজার কাছে গিয়ে এক কোটি সোণার টাকা চাইলেন। রাজার দেহ থেকে ইন্দ্রদত্তও ডেকে পাঠালেন তাঁর মন্ত্রী শকটালকে। বল্‌লেন 'মন্ত্রিবর! এই ব্রাহ্মণ বররুচির স্ত্রী আমার ধর্ম্ম-বোন্ হ'ন সম্পর্কে। এঁকে এক কোটি সোণার টাকা এখনি দিয়ে দিন'।

মন্ত্রী শকটাল ছিলেন অতি বুদ্ধিমান্। তিনি ভাব্‌তে লাগলেন—'এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এই রাজা ম'লেন—আবার এই বাঁচলেন—সঙ্গে সঙ্গে এক কোটি সোণার টাকা দান। না—এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে'। এই ভেবে তিনি মুখ ফুটে বল্‌লেন—'যে আজ্ঞা মহারাজ! তবে অত টাকা ত এখন সঙ্গে নেই। এঁরা একটু অপেক্ষা করুন—আমি দিন কয়েকের মধ্যেই রাজধানী থেকে টাকা আনিয়ে দিচ্ছি'।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাতেই রাজি হ'তে হ'ল। তখন শকটাল ভাবলেন—যাই হোক্ না কেন, রাজার ওপর খুব কড়া নজর রাখতে হবে আমায়। আর দেখি, যদি কোন যোগীর মরা দেহ কোথাও পাওয়া যায়—তা হ'লে সেটা নষ্ট করতে হবে। এ রাজা আমার আসল রাজাই হোন, আর কোন যোগীর আত্মা এঁর দেহে ঢুকে থাক্ না কেন—এখন সে রহস্য ফাঁস্ করব না। কারণ, সত্যি রাজা মরার খবর রটলে অনেক গণ্ডগোল বাধতে পারে। আপাততঃ বরং এই রাজাকেই রাজা হ'য়ে থাকা যাক্'।

এই ভেবে তিনি রাজার চরদের আদেশ দিলেন—অযোধ্যার সব গুপ্ত জায়গা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে—আর যদি কোথাও কোন মরা দেহ পাওয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে তা পুড়িয়ে ফেল্‌বার আদেশও দেওয়া রইল।

চরেরা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে সেই ভাঙ্গা মন্দিরে ইন্দ্রদত্তের মরা দেহ বার ক'রে ফেললে। ব্যাড়ি আর বররুচি অনেক আপত্তি করলেন—'এ মরা দেহ নয়' এক জন যোগীর দেহ—তিনি যোগসমাধিতে রয়েছেন—এ তোমরা ছুঁয়ো না।' কিন্তু চরেরা কোন বারণ মানলো না। পরীক্ষায় মরা দেহ বুঝে তারা তখনই গিয়ে তা পুড়িয়ে ফেললে।

তখন ব্যাড়ি কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে রাজার কাছে নালিশ জানালেন—'মহারাজ! আপনার মন্ত্রীর আদেশে চরেরা গিয়ে আমাদের বন্ধু এক যোগমগ্ন জীবিত ব্রাহ্মণকে মরা ভেবে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলেছে'।

রাজা বুঝলেন—মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আর তাঁর ইন্দ্রদত্ত হবার উপায় নেই। তিনি মনে মনে শকটালকে ধিক্কার দিতে থাকলেন—আর করবেন কি! ক্রমশঃ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্দ্দম পান খান খোকদা নন্দী
সকলের পরিচিত বেওয়ারীশ ঠান্‌দি।

যত পান তত খান জর্দ্দা ও দোক্তা,
কিমামে কম্‌তি নেই, গুণ্ডিও ভোক্তা।

বলে, "পান 'পাণ' মোর, ছাড়তে না পারি তাই
পান বিনে এই 'পাণ' শুধু করে আই-ঢাই।

তাই আমি মনে-'পাণে' খাঁটি পান-ভক্ত,
তোমরা বল্‌তে পারো দিদি পানাসক্ত।"

এক দিন গোটা তিন পান পুরে মুখেতে
'পাণ' করে আন্-চান্ হিক্কার ঝোঁকেতে

বুক করে ধড়্‌ফড়্, চোখে দেখে অন্ধ
পান চেয়ে 'পাণ' গেল পথ্যা বা মন্দ।

—গল্পের চেয়েও বেশী—

শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত

আমেরিকা আবিষ্কৃত হবার পরের কথা।

কলম্বাস এবং আরো অনেকে ডিনার টেবিলের চার পাশে বসে তর্কের তুফান তুলেছেন।

এক জন হঠাৎ বলে উঠলেন—কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছে—এ এমন কী বাহাদুরীর কথা!—বলে একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন সকলের ওপর—আমেরিকা কলম্বাস আবিষ্কার না করলেও কেউ না কেউ করতোই—অনাবিষ্কৃত থাকতো না।

সত্যি তো। সবাই কথাটা মেনে নিলেন—কলম্বাস আহত না হয়ে শুধু মুচকি হাসছিলেন—ঠিকই তো—আমি আবিষ্কার না করলে কেউ না কেউ করতোই—তবে সবাই সব কাজ পারে না হে—ভগবানের আশীর্ব্বাদ চাই।

—আরে রেখে দাও তোমার ভগবান্—আপত্তি তুললেন এক জন।

কলম্বাস হেসে একটা ডিম বের করলেন—এই যে ডিমটা দেখছো—দেখি এটাকে খাড়া করে কে বসিয়ে রাখতে পারে?

একে একে সবাই চেষ্টা করলেন। আরে দূর, ডিম কী কখনো দাঁড় করানো যায়? বিরক্ত হয়ে কেউ কেউ বলেন।

তখন কলম্বাস হেসে টুক করে একটু ঠুকে দিয়ে ডিমটা দাঁড় করিয়ে রাখেন। বন্ধুগণ, এ কাজটাও অতি সহজ কিন্তু তোমরা কেউ পারলে না; তেমনি আমেরিকা আবিষ্কার করাও সহজ—তবে সবাই কী পারে সব কাজ!

জবাব শুনে সবার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে—কলম্বাসের কাছে ক্ষমা চান তাঁরা।

খুকু ও পাখী

গান

কল্পনা দেবী

খুকু—আয় পাখী! গান গাবি আয় আয় তু,
আদর জানাই তোরে আতু আতু!
পাখী—পু-উ-উ-উ.........
খুকু—সোণার খাঁচায় তোর বাঁধব বাসা,
শ্যামা ঘাসে পেতে দেব' বিছানা খাসা;
গান গেয়ে সুখে তুই ঘুমাবি যাদু!
আয় আয় তু!—
পাখী—পু-উ-উ-উ..........
খুকু—পোষমানা পাখী হবি বাহির ভুলে'
সকল জগৎ নিরি বুকেতে তুলে'
ভাবের জোয়ারে প্রাণ থাকু-পাকু......
আয় আয় তু......

—সান্ত্বনা—

মায়া সেন

বছর তিনেক হ'ল গ্রামটি শত্রুকবলিত হয়ে আছে। মিত্রপক্ষীয়দের এতে ক্ষতি হয়েছে বিস্তর; বহু কলকারখানা ছিল এতে। শত্রুপক্ষীয় গৌরব-রবি আজ অস্তমিত হওয়ার উপক্রম করছে, সেই অমিত বিক্রম আর নেই বললেই হয়। ওদিকে রুশীয় সৈন্যের আক্রমণে তারা একেবারে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে, এই ত সুযোগ! পর্য্যবেক্ষক বিমান গিয়ে দেখে এসেছে গ্রামটাকে—কোথায় শত্রুদের ঘাঁটি, কত সৈন্য......। কতগুলো বোমারু গিয়ে শত্রু-ঘাঁটির ওপর বোমাও ফেলে এসেছে। এখন গিয়ে দখল করে ফেলতে পারলেই হয়।

যুদ্ধের প্রায় ছ বছর হতে চললো। শুধু শত্রুপক্ষ কেন, সকলেই আজ শ্রান্ত, অবসন্ন। মনের অপরিমেয় বলই তাদের আজও চালনা করছে। সৈন্য, রসদ সবই ত কমে আসছে। জেনারেল 'এক্স'-এর অধীনে যে কয়টি সৈন্যদল ছিল একটি ছাড়া তারা সবাই অন্য কাজে নিযুক্ত, সে দলে আবার তেমন ভাল সৈন্যও নেই, অথচ আজ রাত্রের মধ্যে কাজটা সেরে ফেলতে পারলেই ভাল হ'ত। হৃতবল হলেও জার্ম্মাণ সৈন্যের দুর্দ্ধর্ষতার কথা তাঁর ত' অজানা নেই! জেনারেল ভাবতে লাগলেন। ...... না চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, তাছাড়া ভাগ্যলক্ষ্মী ত' ওদের প্রায় ত্যাগ করেছেন।

তিনি সৈন্যদের কাছে গিয়ে সব বললেন। কোনও যায়গা দখল করতে হ'লে রাত্রির অন্ধকারে অথবা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে চারদিক্ ধূমাচ্ছন্ন করে আক্রমণকারীদের শত্রুঘাঁটির মধ্যে পড়তে হয়। যে আগে থাকে তারই সব চেয়ে বিপদ্...

'আমি কাউকে জোর করতে চাই না, তোমাদের মধ্যে কে অগ্রগামী হতে পারবে বোধ হয়—তোমরা ভেবে দেখ।

হয় মৃত্যু নয় বিজয়-গৌরব—সবাই ভাবতে লাগল। বাঙ্গালী সৈনিক প্রণব রায়ও তার মধ্যে ছিল। এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় তার হৃদয় স্পন্দিত হয়ে উঠল। ভেসে উঠল তার চোখের সামনে মায়ের স্নেহমাখা দীপ্ত মুখখানি, তাদের শান্তিপূর্ণ ছোট্ট গৃহকোণটুকু না, না, হয়ত অন্য কেউ বলে ফেলবে; প্রণব আর কিছু না ভেবে বলে উঠল, আমি পারব জেনারেল, আমায় যদি অনুমতি দেন আমি ওদের চালিয়ে নেব।'

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে জেনারেল বললেন, 'তুমি? তুমি ভারতীয়—তার মধ্যে তুমি না আবার বাঙ্গালী? না, না, তুমি দুঃখিত হয়ো না রায়! এতটা অবিবেচনার কাজ করা আমার উচিত হ'বে না।'

'আমায় সুযোগ দিন, জেনারেল,' প্রণব দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'বাঙ্গালী বলে আমাদের এমনি করে যদি চেপে রাখেন, তবে আমরা কি করে প্রমাণ করব যে আমাদেরও সাহস থাকতে পারে, আমরাও বীরোচিত কাজ করতে পারি!'

'তোমরা যে তেমন করে এগিয়ে আস না, রায়! আচ্ছা যাক্, তোমার যখন এত আগ্রহ, তখন আমি তোমায় অনুমতি দিলাম। কিন্তু ভুলে যেয়ো না... তোমার কাজের ওপর নির্ভর করছে এতগুলো

লোকের প্রাণ, তোমার ও আমার সম্মান। মনে রেখো, জার্মাণ সৈন্য অতি ভয়ঙ্কর, এখনও তাদের যা আছে, তা কম নয়।'

দ্বিধাহীন অকম্পিত স্বরে প্রণব উত্তর করল, "আমার মনে আছে জেনারেল!"

* * * *

প্রণবের অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে, বাঙ্গালীর মনে রাখতে সে পেরেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে অক্ষত অবস্থায় ফিরতে পারেনি। তার দুটো হাত, একটা পা বন্দুকের গুলীতে উড়ে গিয়েছে। আহত সৈনিকদের জন্ম নির্দ্দিষ্ট হাসপাতালে সে শুয়েছিল। বাইরে প্রচণ্ড দুর্য্যোগ চলছে···একে ব্ল্যাক-আউটের জন্ম সমস্ত বাতি নিভান, তার ওপর এই প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝাপাত···প্রণবের বিনিদ্র চোখ দুটি একটু আলোর জন্ম আকুল হয়ে উঠল। সে অন্ধ হয়ে যায়নি ত'? প্রণব শিউরে উঠল···না, না, এখনও ত' রাত আছে। অন্ধ হয়েছে তার পাশের সৈনিক রিচার্ড; তার ঠিক মনে আছে যে দিনের বেলা, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও সে দেখতে পেয়েছে; বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিনা কারণে মানুষ কি আর অন্ধ হ'তে পারে? আচ্ছা, অন্ধ ভাল না হস্তহীন খোঁড়া ভাল? কোন্‌টা বেশী বাঞ্ছনীয়? প্রণব মনে মনে ভাবতে লাগল।

* * * *

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়েছে—প্রকৃতি দেবীও শান্ত হয়েছেন। সাত দিন অনবরত শুয়ে থেকে সৈনিক প্রণব ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। নার্সকে বলে-কয়ে তাই আজ একটু উঠে বসতে পেরেছে। শরীরের নিদারুণ ব্যথাগুলিও আজ একটু কম।—বাব্বাঃ, রাতটা কি ভয়ঙ্কর, সন্ধ্যে হলেই তার যেন আতঙ্ক হয়। এখানে আসা অবধি তার ঘুমই আসতে চায় না—খালি এটা-ওটা মনে হয়।

'রয়, মিঃ রয়!'

'কে, রিচার্ড, আমায় কিছু বলছ?'

'তুমি কেমন আছ—আজ? তোমার হাত দুটো না কি নেই, পা'ও না কি সারবে না।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রণব বলল, 'না বন্ধু, এ জন্মের মত হাত দুটো আমার গিয়েছে, ভাল ভাবে হাঁটতেও আমি আর পারব না।'

অপরিসীম ব্যথায় রিচার্ড অভিভূত হয়ে পড়ল।

'সত্যি বন্ধু, তোমার জন্ম আমার বড় কষ্ট হয়। কি-ই বা সান্ত্বনা দেব তোমায়! এই পঙ্গু দেহ নিয়ে সারাটা জীবন কি করে যে কাটাবে?'

উদাস দৃষ্টিতে প্রণব চেয়ে রইল। সত্যি, রিচার্ড ঠিকই বলেছে। শরীর সুস্থ হলেই এরা ছেড়ে দেবে···তার পর, ঘরে আছেন বিধবা মা, তিনটি ছোট বোন—সকলের কাছেই হয়ত সে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। আত্মহত্যা করবে না কি? অভীষ্ট সিদ্ধি ত' হয়েছে! বাঙ্গালীর সম্মান সে রাখতে পেরেছে···তার জীবনের আর কি দরকার? না, না, ছি ছি! প্রণবের অন্তরের সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠল। আত্মহত্যা ভীরুর কাজ। মায়ের শান্ত, দৃপ্ত মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তাঁর শিক্ষার অপমান প্রণব করতে পারবে না। অকম্পিত কণ্ঠে বলল,—'তা ঠিক। কিন্তু কিছুই ত' করবার নেই, সবই সহ্য করতে হ'বে।—তোমার নিজেরও ত' কম ক্ষতি হয়নি বন্ধু! চোখ দুটো তোমার চিরকালের জন্ম গিয়েছে। অন্ধকার চিরদিন তোমায় আচ্ছন্ন করে রাখবে। এ দুর্ভাগ্য সহ্য করে—ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে যেন আমরা পারি—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।'

'আমার অমূল্য রত্ন চোখ দুটি গিয়েছে সত্যি, কিন্তু আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারি যে, আমার দেশের জন্মই আমি তা হারিয়েছি। কত অসংখ্য লোক প্রাণ দিচ্ছে, আমার না হয় চোখই গেল, কিন্তু তুমি কি করে সান্ত্বনা পাবে বন্ধু!'

রিচার্ডের কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সহানুভূতিতে ভরা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রণব বলল, 'সত্যি রিচার্ড, তোমাদের মধ্যে যে কেউ কেউ এমনি দরদ, এমনি অনুভূতি দিয়ে আমাদের কথা ভাবে তা আমি আগে ভাবিনি। তোমাদের অন্তরের এই যে পরিচয় পেলাম, এ কিন্তু আমার পক্ষে কম লাভ নয়। তবে হ্যাঁ, তুমি যা ভেবে সান্ত্বনা পাবে আমার সে সম্বল নেই,—আমি পরের জন্মই যুদ্ধ করতে এসেছি, কিন্তু কেন জানো?'

'কেন রয়?'

'কারণ, আমাদের শক্তি অর্জ্জন করতে হ'বে। হোক্ পরের জন্ম যুদ্ধ। তবু যুদ্ধ করতে এসে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব যা ঘরে বসে হয় না। আমি বুঝেছি, রিচার্ড, দুর্ব্বলের কাতর আবেদনে দেশ স্বাধীন হয় না। আমাদের সক্ষম হতে হবে। শুধু যুদ্ধে যোগ দিয়ে নয়, সব দিকেই আমাদের জড়তা ত্যাগ করতে হ'বে। তখন ভাগ্যলক্ষ্মী আপনি এসে আমাদের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবেন।'

'তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু!'

শিশু-চিত্র

শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

সাধারণতঃ দেখতে পাবে ছবি আঁকা তোমাদের কাছে সব চাইতে ভাল লাগে।

ছবি আঁকতে না পারলেও, তোমরা ছবি আঁকবার যে চেষ্টা কর সেটা অস্বীকার করতে পারবে না নিশ্চয়ই?

ছবি আঁকাটা সকলেরই একটু জানা দরকার, তবে ছবি এঁকে সকলেই যে বড় শিল্পী হবে এমন আশা করা যায় না। তবে শিশুকাল থেকেই চিত্রচর্চ্চায় রুচি থাকলে ভবিষ্যতে তোমরা যে কোন কাজই কর না কেন প্রত্যেক কাজের ভেতরই একটা ছন্দ থাকবে যা শিল্প-বোধ না থাকলে হওয়া অসম্ভব। শুধু কি শিল্পী হলেই ছবি আঁকতে হবে?

ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার কিংবা বৈজ্ঞানিক যা-ই হও না কেন, তখনও তোমাকে ছবি আঁকতে হবে। এখন ভেবে দেখ, প্রত্যেক বড় বড় কাজেই ছবি আঁকার দরকার আছে। সে জন্ম তোমাদের প্রত্যেককেই কিছু কিছু ছবি আঁকা শিখে রাখা দরকার নয় কি?

সাধারণতঃ দেখতে পাবে, তোমাদের ইস্কুলে ভূগোলের ক্লাসে

ব্যাপ এঁকে দেবার জন্ত অনেকে তাদের বন্ধুদের কাছে তোষামোদ করে থাকে। কিন্তু এর দরকার কি? তুমি যদি সামান্ত ছবি আঁকতে শেখ তা'হলেই তো তোমার কাছে এই শক্ত ব্যাপার সহজ হয়ে দাঁড়াবে।

কিছু কাল ধরে কলকাতায় কিশোর চিত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান, কিশোর আলেখ্য-সম্মেলনের চিত্র-প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা দেখে মনে হয়, প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদিগের অধিকাংশের মধ্যেই ভবিষ্যতে শিল্পী হবার প্রকৃত শক্তি রয়েছে।

কিন্তু এখন থেকে তার যত্ন না করলে ভবিষ্যতে ছবি আঁকবার এ শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

ছবি আঁকবার জন্ত দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করে রাখবে তা হলে আর পড়াশোনায় কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু কখনও কোন ছবি দেখে নকল করবার চেষ্টা কোর না। তাতে ভবিষ্যতে তোমার ছবি আঁকবার চিন্তাশক্তি কমে আসবে, এবং তোমার ছবিতে কোন মৌলিকত্ব থাকবে না। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি আর শিল্পী হতে পারবে না, সব সময়ই চেষ্টা করবে একটা ছবির জন্ম দিতে।

আমাকে শিল্পী মুকুল দে বলেছিলেন—"ধর, একটা ফুল কিংবা পাতা নিয়ে সেটাকে এঁকে ফুল কিংবা পাতাটির যেখানে যে রং আছে ঠিক সেখানে সেই রং লাগাবার চেষ্টা করবে।"

অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা সত্যি জিনিষ দেখে, আঁকবার চেষ্টা করলে চিত্রশিক্ষায় অনেক এগিয়ে যেতে পারবে।

এতে ছবি আঁকবার মৌলিকত্ব শক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেড়ে যাবে।

অনেকে ছবি আঁকে রং ছাড়া কিন্তু যথাসম্ভব চেষ্টা করবে রং দিয়ে ছবি আঁকতে। তাতে ধীরে ধীরে ছবিতে রং দেবার ক্ষমতা পেয়ে যাবে। এ জিনিষটা অনেকেই এড়িয়ে চলে কিন্তু ভাল রংএর কাজ একটা মস্ত সুরুচির পরিচায়কের প্রমাণ। কোথায় কোন্ রংটা লাগিয়ে ছবিটির রূপ দেওয়া যেতে পারে, তা রঙ্গীন ছবি আঁকতে আঁকতেই এ ক্ষমতা লাভ করবে।

শাসন

দিলীপ দে চৌধুরী

খুকু তুমি দুষ্টু বেজায় হচ্ছো দিনে দিনে,
করলে অমন কিছু তোমায় দোব না আর কিনে।
চুলের ফিতে, রঙীন জামা কিম্বা খেলার গাড়ী
পাবে নাকো অমন করে করলে মারামারি।
দুধ খেতে কি কাঁদতে আছে? হাত-পা ছোঁড়ে কারা?
ছিঁচ্-কাঁদুনে, অবাধ্য আর দুষ্টু মেয়ে যারা।
জল দেখলে দৌড়ে পালাও, ডাকলে আসো নাকো,
ফর্সা জামা পরিয়ে দিলে ধুলো-কাদায় মাখো।
খাবার সময় খেলবে তুমি, পড়ার সময় ঘুম,
দুপুর রোদে যত তোমার দৌড়ঝাঁপের ধুম!
এটা ওটা সংসারের এই নানান রকম কাজে,
তোমায় আমি সকল সময় দেখতে পারি না যে—
তাই ব'লে কি তুমি অমন দুষ্টু মেয়ে হবে?
আদর তো নয় এবার থেকে মারবো দেখো তবে।
কানটি ধ'রে শিগ্গী ব'লো; ক'রবো এমন না গো,
দোষ ক'রেছি, লক্ষ্মী হবো সত্যি এবার মা গো।
কয় না কথা, দেয় না সাড়া, কিছুই নাহি বোঝে,
বুঝবে কেন? মানুষ তো নয়? আদুর পুতুল ও যে।

আই, এফ, এ, শীল্ড-প্রতিযোগিতার অবসানে কলিকাতার টবল-মরশুম প্রায় শেষ হইয়াছে। ফুটবল খেলা বাঙালীর প্রায় জাতীয় খেলা হইয়া পড়িয়াছে। ফুটবল খেলার চেনার সঙ্গে সঙ্গে ময়দানে যেন সারা লিকাতায় সাড়া পড়িয়া যায়। শুধু জধানীর নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে এই ৎসাহ সীমাবদ্ধ থাকে না। বাঙলার তি পল্লীতেই প্রায় এই খেলার প্রচলন াছে। বাস্তবিক, ভারতীয় ক্রীড়া-জগতে টবলে বাঙলা অগ্রণী ছিল। আন্তঃপ্রাদেশিক খেলায় বাঙলার শ্রেষ্ঠত্ব একাধিকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী াজ পতনের মুখে। সর্ব্ববিষয়ে অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ফুটবল-প্রতিভা ম্লান হইতে বসিয়াছে। বিগত ৎসর আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল-প্রতিযোগিতায় দিল্লীর নিকট পরাজয়ে বাঙলার উন্নতশির নত হইয়া ড়িয়াছে।

এম, ডি, ডি,

আই, এফ, এ, শীল্ড বাঙলার তথা সারা ভারতের মধ্যে গৌরবময় শ্রেষ্ঠতম প্রতিযোগিতা। ফুটবলের পীঠস্থান বাঙলায় এই অনুষ্ঠানে ারতের বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ দল বিভিন্ন সময়ে যোগদান করিয়াছে। ভারতে বস্থানকারী শ্রেষ্ঠ সামরিক দলগুলি এই প্রতিযোগিতার সৌষ্ঠব দ্ধি করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান দ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহু শক্তিশালী সামরিক দলের যোগদানে ই নিখিল ভারতীয় ফুটবল-প্রতিযোগিতায় অপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার রিচয় পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ফুটবলের পতনোন্মুখ যুগের পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহা মর্ম্মান্তিক। সামরিক ম্প্রদায়ের যুদ্ধ-ব্যপদেশে ব্যস্ততায় ঠিকমত দল সংগ্রহ করা ক বিরাট সমস্যা। কিন্তু বেসামরিক ফুটবলওয়ালাদের দুর্দ্দশার ন্ত নাই। ফুটবলের তীর্থক্ষেত্র বাঙলা আজ নূতন আলোকের ন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে অন্বেষণে ব্যস্ত। বাঙলার শ্রেষ্ঠতম লগুলি অবাঙালী খেলোয়াড়ে পরিপুষ্ট। খেলোয়াড় আমদানী াপার সকল সময়ে অশোভন বা অহিতকর না হইলেও স্থানীয় র্থাৎ বাঙালী-প্রতিভার উন্মেষের অন্যতম প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। ই যন্ত্রতন্ত্রের যুগে নিছক ক্লাব-প্রীতি দেখাইয়া বরাবর আনুগত্য জায় রাখিবার মত দাক্ষিণ্য বা খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির অভাব ধিকাংশ খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রকট। বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তনের ঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়গণের মধ্যেও বাঁধাবাধির অভাব দেখা গিয়াছে। াধীন ও পেশাদারী খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা হু বার বিভিন্ন ভাবে হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ক্লাব-কর্ত্তৃপক্ষের ধ্যে 'চুপিসারে' অর্থের বিনিময়ে খেলোয়াড় ভাঙ্গাইয়া লইতে শুনা ায়। অবশ্য তাঁহারা সৌখিনী আইনের শৃঙ্খলা কোন রকমে ভঙ্গ রেন না। আবার শুনা যায়, মাঠের বাহিরেও না কি খেলোয়াড়গণকে প্রভাবিত করার অনেক কারণ আজকাল ঘটিতেছে। এ অবের মূলোৎপাটন না করিতে পারিলে বাঙালী ফুটবলার পরিত্রাণ নাই। বাঙলা আজ সারা ভারতের খেলোয়াড়দের আকর্ষণের স্থান, কিন্তু বাঙালী খেলোয়াড়দের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের পর্দ্দায় আর এক দফা কালো ছায়া পড়িতেছে। বাঙালী ফুটবল-সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার দায়িত্ব বাঙলার বিভিন্ন খ্যাতনামা দলের কর্ত্তৃপক্ষের। খেলোয়াড়গণের উপযুক্ত অনুশীলনের সুব্যবস্থা, কড়া নজরের মধ্যে রাখিয়া শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে সজাগ থাকিয়া বাঙলার নিজস্ব তরুণ খেলোয়াড়গণকে অনুপ্রেরণার সুযোগ দিলে বাঙালী খেলোয়াড়গণের নব জীবনের আশা করা যাইতে পারে।

উপযুক্ত প্রতিযোগীর অভাবে আই, এফ, এ, কর্ত্তৃপক্ষ এবার অবাঞ্ছিত দলগুলির যোগদান ব্যাপারে বাধা দেয়। মোট ৩৮টি দল লইয়া এই প্রতিযোগিতার ক্রীড়া-সূচি প্রস্তুত হয়। বহিরাগত দলগুলির মধ্যে বোম্বাই হইতে আগত ট্রেডস্-ইণ্ডিয়া ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডে ক্যালকাটার নিকট পরাজিত হয়। বিজিত দল ত্রিবান্দ্রমে নিখিল ভারতীয় ফুটবল-প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। কিন্তু আই, এফ, এ, শীল্ডে তাহাদের পরিচয় খুব আশাপ্রদ হয় নাই। ঢাকুরাম ও টমাস উক্ত দলের দুই জন খ্যাতনামা খেলোয়াড়। হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলটি অন্যতম শক্তিশালী আগন্তুক দল। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইষ্টবেঙ্গলের সহিত দুই দিন অতিরিক্ত সময় খেলিয়াও তাহারা গোলশূন্য ভাবে খেলা শেষ করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা ২—০ গোলে পরাজিত হয়।

গোলরক্ষক এরিপ ও ব্যাকে স্যু ভাল যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করে। বেরিলী হইতে আগত সামরী হিরোজ দল, গয়ার আনন্দ স্পোর্টিং ও লাহোরের সম্মিলিত জেলা দল একেবারে হতাশ করে। বাঙলার মফঃস্বল হইতে আগত দলগুলির মধ্যে বগুড়া এরিয়ান্সকে পরাজিত করে এবং চতুর্থ রাউণ্ডে ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। শীল্ডের চরম পর্য্যায়ে বাঙলার দুইটি জনপ্রিয় দল মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল মিলিত হয়। দীর্ঘ ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে দুর্দ্ধর্ষ সামরিক ও ইউরোপীয় দলগুলির বিরুদ্ধে খেলিয়া মোহনবাগান ১৯১১ সালে আই এফ, এ, শীল্ড জয় করিয়া ভারতীয় খেলা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করে। তদবধি বাঙলার জনসাধারণের নিকট তাহাদের আসন শাশ্বত। কিন্তু প্রবীণতম এই দলটি তাহার পর হইতে বহু বার অগণিত সমর্থকগণকে নিদারুণ ভাবে হতাশ করিয়াছে। এ বৎসর তাহারা শেষ খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের নিকট মাত্র ১ গোলে পরাজিত হইয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দল উপর্য্যুপরি চার বৎসর শীল্ডে খেলিয়া দুই বার শীল্ডবিজয়ী হইয়া নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শীল্ডে দুই দলের অতীত ইতিহাস :

ইষ্টবেঙ্গল :—১৯৪২ : মহঃ স্পোর্টিং (১) : ইষ্টবেঙ্গল (০)
১৯৪৩ : ইষ্টবেঙ্গল (৩) : পুলিশ (০)

১৯৪৪ : বি-এণ্ড এ রেলওয়ে (২) : ইষ্টবেঙ্গল (০)

মোহনবাগান :

১৯১১ : মোহনবাগান (২) : ইষ্টইয়র্ক (১)

১৯২৩ : ক্যালকাটা (৩) : মোহনবাগান (০)

১৯৪০ : এরিয়ান্স (৪) : মোহনবাগান (১)

দুই দলের শীল্ড-অভিযান :—

ইষ্টবেঙ্গল :

দ্বিতীয় রাউণ্ড : বরিশাল ২—০ গোলে পরাজিত

তৃতীয় রাউণ্ড : হায়দ্রাবাদ পুলিশ ০—০, ০—০, ২—০ গোলে পরাজিত

চতুর্থ রাউণ্ড : বগুড়া টাউন ৩—১ গোলে পরাজিত

সেমিফাইন্যাল : কালীঘাট ২—১ গোলে পরাজিত

মোহনবাগান :

দ্বিতীয় রাউণ্ড : বি-এণ্ড-এ রেল দল ২—০ গোলে পরাজিত

তৃতীয় রাউণ্ড : ঢাকা উয়ারী ১—০ গোলে পরাজিত

চতুর্থ রাউণ্ড : ভবানীপুর ২—০ গোলে পরাজিত

সেমিফাইন্যাল : ক্যালকাটা ১—০ গোলে পরাজিত।

মোহনবাগান তৃতীয় রাউণ্ডে উয়ারীর বিরুদ্ধে ও সেমিফাইন্যালে ক্যালকাটার সহিত চারিটি খেলে। এ যাবৎ মোহনবাগান ও উয়ারী শীল্ডে আরও দুই বার মিলিত হইয়াছে।

১৯১১ : ১ম রাউণ্ড : উয়ারী (২) : মোহনবাগান (১)
(বর্দ্ধন, জে, রায়) (আর গাঙ্গুলী)

১৯২৩ : ৩য় রাউণ্ড : মোহনবাগান (২) : উয়ারী (১)
(ইউ, কুমার, রহমণ) (বর্দ্ধন)

ক্যালকাটার সহিত মোহনবাগান ইতিপূর্ব্বে চার বার শীল্ডে মিলিত হইয়া পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। এই জয়লাভে তাহারা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী খেলাগুলির ফলাফল :

১৯২১ : দ্বিতীয় রাউণ্ড ক্যালকাটা (৫) মোহনবাগান (০)

১৯২২ : প্রথম রাউণ্ড ক্যালকাটা (১) মোহনবাগান (০)

১৯২৩ : ফাইন্যাল ক্যালকাটা (৩) মোহনবাগান (০)

১৯৩৬ : সেমি-ফাইন্যাল ক্যালকাটা (১) মোহনবাগান (০)

আলোচ্য বৎসরের চূড়ান্ত মীমাংসার খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের চতুর খেলোয়াড় জয়নির্দ্ধারক গোলটি করিয়া ভিজ দলকে জয়-ভূষিত করে। এই খেলার সূচনায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলোয়াড়গণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দুই মিনিট কাল নীরবতা পালন করিয়া ৯ই আগষ্ট দিবসের মর্য্যাদা রক্ষা করে। খেলোয়াড়গণের এই জাতীয়তাবোধ সত্যই প্রশংসার্হ।

ফুটবল লীগ :—

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের সমস্ত খেলা শেষ না হইলেও শ্রেষ্ঠত্বের শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দল যুগপৎ শীল্ড ও লীগে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া মহঃ স্পোর্টিংএর রেকর্ডের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। ১৯৩৬ ও ১৯৪১ সালে মহঃ স্পোর্টিং অনুরূপ গৌরবের অধিকারী হয়। লীগে শীর্ষস্থান অধিকার করার গৌরব ইতিপূর্ব্বে ইষ্টবেঙ্গল ১৯৪২ সালে অর্জন করে। উপর্যুপরি দুই বৎসর লীগ-বিজয়ী মোহনবাগানের অপেক্ষা এক পয়েণ্ট অগ্রগামী হইয়া তাহারা মোহনবাগানের একাদিক্রমে তৃতীয় বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা ব্যর্থ করিয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের এই যুগপৎ সাফল্যের জন্য আমরা তাহাদের ক্লাব-কর্ত্তৃপক্ষ ও সুযোগ্য অধিনায়ক পি, চক্রবর্ত্তীকে অভিনন্দিত করিতেছি। পি, চক্রবর্ত্তীর সুনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে খেলিয়া ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়গণ তাহাদের ফুটবল-ইতিহাসে অভিনব সাফল্যের রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের এই কৃতিত্বের মূলে পি, চক্রবর্ত্তী ব্যতীত মহাবীর, কাইজার, নায়ার, ডি চন্দ্র, পাগসলী, আপ্পারাও ও টি করের অবদান অতুলনীয়। আপ্পারাওএর ন্যায় শ্রমশীল ও কুশলী খেলোয়াড়কে না পাইলে তাহাদের আক্রমণ বিভাগের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইত। আপ্পার আক্রমণ-পরিচালনার কৌশল, টি করের দ্রুতগতি, নায়ারের তীব্র সট্ ও পাগসলীর গোল-সম্মুখে তৎপরতার ফলে ইষ্টবেঙ্গল সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক গোল করিয়া লীগে জয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের চ্যাম্পিয়ানসিপ বজায় রাখিতে পারে নাই। লীগের প্রান্তভাগে এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে পরাজয় তাহাদের এই বিপর্য্যয়ের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কয়েকটি খেলায় পর পর তাহারা ড্র করিয়া মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করে। ডি, সেন, এস, দাস, এস, মান্না, টি, আও ও এ, দের সমন্বয়ে তাহাদের রক্ষণ বিভাগ দুর্ভেদ্য ব্যূহের সৃষ্টি করে। শরৎ দাসের অপূর্ব্ব চাতুর্য্য ও টি, আও-এর অনমনীয় দৃঢ়তায় তাহাদিগকে বহু বার অবধারিত লাঞ্ছনার হাত হইতে রেহাই দিয়াছে। পুরোভাগের খেলোয়াড়গণের খেলায় অনিশ্চয়তার ছাপ পড়িয়াছে। খ্যাতনামা নিখিল ভারতীয় খেলোয়াড়দ্বয়ের মধ্যে বুচী দেশমুখ অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্বের সন্ধান দিলেও কোনরূপ অভাবনীয় চাতুর্য্যের পরিচয় দেয় নাই। দেশমুখের ন্যায় খেলোয়াড়ের আমাদের স্থানীয় ফুটবল-মহলে বোধ হয় অভাব নাই। তাহাদের রাইট-আউট নির্ম্মল চাটার্জ্জীর পায়ের কায়দা ও ক্ষিপ্রতা প্রশংসনীয়। এই যাদুকর খেলোয়াড়টি সময়ে সময়ে অযথা বল লইয়া দেরী করায় প্রতিপক্ষ রক্ষণ-বিভাগকে বাধা দেওয়ার সুযোগ দেয়। ক্লাব-পরিচালকগণের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাহারা এবার উভয় প্রতিযোগিতায় বঞ্চিত হইয়াছে। বাঙলার প্রবীণতম দলের ভাণ্ডার যে অন্তঃসারশূন্য, তাহা লীগের খেলায় সপ্রমাণ হইয়াছে। নিয়মিত খেলোয়াড়ের মধ্যে এক জন কেহ আহত হইলে তাহার স্থানে নূতন খেলোয়াড় দিবার মত অবস্থা তাঁহাদের নাই। খেলোয়াড় সংগ্রহ ব্যাপারে তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দৌড়াদৌড়ি না করিয়া বাঙলার তরুণ ও নবীন খেলোয়াড়গণকে প্রভূত অনুশীলনের সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে তাঁহারা লাভবান হইবেন।

লীগের প্রথম দফায় ভবানীপুর দল শীর্ষ স্থানে থাকে। ইসমাইল, তাজ মহম্মদ ও ডি, পালের দৃঢ়তায় তাহাদের এই অগ্রগতি সম্ভব হয়। শেষার্দ্ধে ইসমাইলের আহতাবস্থায় তাহাদের বিপর্য্যয় ঘটে। লীগের শেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তাহারা পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত না করিয়া অগণিত দর্শকগণকে হতাশ করে। ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এই খেলায় তাহারা ২—০ গোলে পরাজিত হয়। লীগে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়গণের মধ্যে ক্যালকাটার রাইট, টুইলজস, লী, ক্রস, মহঃ স্পোর্টিংএর করিম নওয়াজ, সুবজান ও সেকেন্দার, সামরিক দল ই, সি, [illegible] [illegible] বিলাতী খেলোয়াড় [illegible] উল্লেখযোগ্য।

কোকিল
শিল্পী অবনী সেন

কুরুক্ষেত্রের পর—

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমরের অবসান হইল। জার্ম্মানী আত্ম-সমর্পণ করিয়া আত্মবিলোপ করিয়াছে। জাপান আত্ম-সমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। মহাযুদ্ধের মহাব্যাধির মহাকায় বীজাণুরূপে যে সকল সমররথী মানব সমাজ-দেহকে বিক্ষত, পঙ্গু ও অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা কিন্তু নষ্ট হয় নাই। ব্যাধির বীজ আজিও সজীব। দেশে দেশে অর্থ-নৈতিক ও মনোবৈজ্ঞানিক সর্ব্বনাশ ও ক্লৈব্যের যে সঞ্চার হইয়াছে তাহার ফলে বিশ্ব নূতন কি আকার ধারণ করিবে তাহা ভবিতব্যই জানে। তবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, গণ-প্রভাবে—শূদ্র প্রভাবে—স্বতসর্ব্বস্ব মরিয়া জনগণের প্রাণমাত্র রক্ষার অদম্য প্রচেষ্টার এক অভূতপূর্ব্ব নব বিপ্লব যেন আসন্ন।

শ্রীতারানাথ রায়

সাম্রাজ্যবাদী প্রলয়—

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তৎকালীন প্রসিদ্ধ কূটনীতি-বিশারদ ডেনোসো কর্টিস্ মাদ্রিদের প্রতিনিধি পরিষদে যে ভবিষ্য-দ্বাণী করেন, শত বৎসর পর দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের আপাত দৃশ্য অবসানে তাহা যথাযথ উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি য়ুরোপকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"Your orators will not save you, yours arts will be of no help to you, yours armies will hasten yours destruction, even despotism will betray your high hopes, You will find no despot. You will accomplish your own ruin and will be other Englands fleet will ... tremendous British Empire will fa.l and the crash of its fall and its prolonged cry of agony will ring from pole to pole."

এটমিক বোমা—
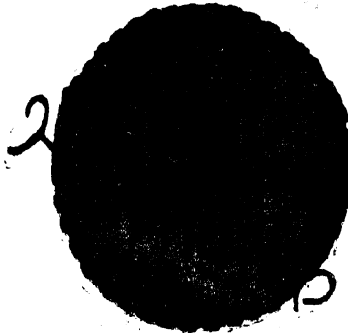
এটমিক বোমা কুরুক্ষেত্রের শেষ পাশুপত। সম্ভবতঃ এই ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াই রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে সাহসী হয়। সম্ভবতঃ বৃটেন মার্কিণ আয়োজনের আভাস পূর্ব্বে হইতে পায় নাই।

বিলাতের 'ডেলি হেরাণ্ড' পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা বলিতে চাহিয়াছেন—"Russian action was a sequence to the use of atomie bomb which made it virtualy certain that Japan could not continue resistance much longer whether or not Russia took part in the war"—বোমা-প্রতিরোধের শক্তি জাপানের আর হইবে না, এ কথা বুঝিয়াই রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে, আর প্রতিরোধ অসম্ভব বুঝিয়াই, জাপান তাহার চিরমিত্র বৃটেনের সহিত পুনঃ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহে। জাপান বৃটেনকে দাগা দিয়াছে, এখন বৃটেন জাপানকে ক্ষমা করিতে চাহে না। কিন্তু এক দিকে এটমিক বোমার অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে শক্তিশালী, আমেরিকা—মাত্র বৃটেনের নহে, য়ুরোপীয় সকল দুর্ব্বল জাতির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা আমেরিকাকে—বৃটেনের চিরশত্রু—বৃটেনের চিরকালের

... গিয়াছে যে, য়ুরোপে সোভিয়েট-
...গুকে যেমন রুশিয়ার তাঁবেদার করিতে
...খানে এশিয়ায় মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়াকেও তাহাই করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এক দিন ইংরেজরাই চীনের দাবীর বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে জাপানকে সমর্থন করিয়াছিল। সে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন মাঞ্চুরিয়া অধিকার প্রসঙ্গে মাত্র 'লণ্ডন টাইমসে'র নহে, তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব সার জন সাইমনেরও মনোভাব ছিল—"She (Japan) legitimately acquired economic rights that were illegitimately obstructed by the Chinese." পরে মাঞ্চুরিয়া লইয়া যখন চীনে জাপানে যুদ্ধ হয়, তখন আমেরিকা জাপানের তীব্রতম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। লীগ অব নেশনের ভিতরে এবং বাহিরে বৃটেনও একই মনোভাবের পরিচয় দেয়। পৃথিবীর এই দুই শক্তি-শ্রেষ্ঠের রোষ নিষ্ফল করিবার জন্য জাপান সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মিত্রতা করে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জাপ মেজর জেনারল ইতো অভিমত প্রকাশ করেন—"We have the idea of associating with the U. S. S. R. in the hope of overthrowing the two proud Anglo-Saxon Powers.···If Russia should manifest a desire to extend her influence towards the Indian Ocean, Japan should help her."

রুশিয়া জাপানের সহিত একযোগে এই এংলো-স্যাক্সন নিধন-যজ্ঞের আয়োজন এখনও চালাইয়া যাইবে কি না, তাহা রণক্লান্তি দূর না হইলে বলা যাইবে না।

যুদ্ধক্রান্তদের দাবী—

পটসডামে বিশ্ব-রাজনীতির ত্রিমূর্ত্তি ষ্টালিন, ট্রুম্যান ও চার্চিল (পরে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মিঃ এট্লী) জাপানের কেন সন্ধি প্রস্তাবেরই উত্তরে জানান—

১—দুনিয়া গ্রাস করিবার পরিকল্পনায় যাহারা জাপানকে যে রণনীতিতে [illegible] জাতিকে প্রতারিত ও বিপথগামী করিয়াছে, সেই [illegible]

... জাপানীদের যোগ দিতে দেওয়া হইবে

—এ সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইলে এবং জাপ জাতির স্বাধীন ইচ্ছানুগ শান্তিকামী গণপ্রতিনিধি-মূলক শাসনতন্ত্র স্থাপিত হইলেই মিত্রপক্ষের সৈন্যগণ জাপান ত্যাগ করিবে।

সর্ত্তাধীন আত্মসমর্পণ—

পটসডামের সর্ত্ত জাপান মানিয়া লইয়া বলিয়াছে—বিশ্বশান্তি তথা অতি শীঘ্র যুদ্ধবিরোধের অবসান ও মানব জাতিকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রুশিয়ার মারফত পূর্ব্ব হইতেই জাপান সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিল এবং বর্ত্তমানেও পটসডামে চীনা-ইঙ্গ-মার্কিণ ঘোষণা (যাহাতে রুশিয়া পরে সম্মতি প্রদান করে) এই সর্ত্তে মানিয়া লইতেছে যে, জাপ সম্রাটের সার্ব্বভৌম মর্য্যাদার যেন কোন হানি না হয়। এ হানির উদ্দেশ্য রাশিয়ার ত নাই-ই। জাপানের প্রতি বৃটেনের মমতাও নূতন নহে। জার্ম্মানী বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি জাপান করিলেও বৃটেন জাপানকে জার্ম্মানীর মত শাস্তি দিতে চাহে নাই। পটসডামের দাবী ছিল, জাপানকে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু ঘোষণায় জাপ-সম্রাটের কোন উল্লেখ নাই, তাঁহার মসনদ ত্যাগেরও দাবী নাই। সর্ত্ত-রচয়িতারা জানিতেন যে, সম্রাটকে অপসারিত করিলে জাপানের শেষ সৈন্যটি পর্য্যন্ত বাধা দিবে, কিন্তু হিরোহিতোর মর্য্যাদা অটুট রাখিলে, তিনিই যুদ্ধ থামাইবেন।

রুশিয়া বরাবরই জাপানকে সমর্থন না করিলেও তাহার বিরুদ্ধে যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু পটসডামের পর সে মত বদলাইল। সে মাত্র জাপানকে আক্রমণ করিতেই সম্মত হয় নাই, সাইবেরিয়াতে মিত্রপক্ষকে বিমানঘাঁটি স্থাপন করিতে দিতেও সম্মত হয়। রুশিয়া আমেরিকার নিকট মোটা রকমের একটা ঋণ চাহে—সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানও অনুরোধ করেন জাপানের বিরুদ্ধে ঘোষণা কর যুদ্ধ।

জাপানের বিরুদ্ধে রুশিয়ার এই যুদ্ধ ঘোষণার সকল কথা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। চীনের কটাহে যে আন্তর্জ্জাতিক খিচুড়ী পাক হইতেছে তাহা না নামিলে পূর্ব্ব-এশিয়ার তথা ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরাধীন জাতিগুলির সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে না।

মাসিক
বসুমতী
ভাদ্র,
১৩৫২

কোকিল
শিল্পী
অবনী সেন

মা

শিল্পী—কমল চট্টোপাধ্যায়

২৪শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৫২ [৫ম সংখ্যা

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বাংলা দেশে "কবিগান" সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হইতে ক্ষা পাইয়াছে কেবলমাত্র কবিবর শ্বরচন্দ্র গুপ্তের চেষ্টায়। তিনি নজে এক দিকে যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ঙ্গলাল, মনোমোহন বসু প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর নব্যতন্ত্রের শখকদের গুরু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই রাতন বিস্মৃত ও বিলুপ্ত "কবি"-সম্প্রদায়ের শেষ প্রতিনিধিও ছিলেন। তাঁহার কালে ও পরে পাঁচালীর মাধ্যমে দাশরথি রায়, রসিক রায়, ব্রজমোহন রায়; কৃষ্ণযাত্রার মাধ্যমে কৃষ্ণকমল গাস্বামী ও গোবিন্দ অধিকারী এবং তরজা হাফআখড়াইয়ের ধ্য দিয়া রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু ও অমৃতলাল বসু প্রভৃতি যদিও কিছুকাল কবিগানের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, কন্তু আসলে এই লোক-সাহিত্যের প্রাণশক্তি তখন প্রায় লোপ াইয়াছিল। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবেরও বহু পূর্ব্বে বহু খাতে বভক্ত হইয়া এই ধারা শুষ্ক ও কর্দমাক্ত অস্তিত্ব মাত্র বজায় রাখিয়া-ছিল। স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্তই এগুলির পরিচয় সংগ্রহ ও প্রচার করিয়া হাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আজ যে আমরা রাম বসু, হরু ঠাকুর, গোজলা গুঁই, ভবানী বেণে, নিতে বৈরাগী প্রভৃতির নাম শুনি ও ইঁহাদের রচিত সখীসংবাদ, মাথুর প্রভৃতি পদের রসমাধুর্য্যে মুগ্ধ হই, তাহার মূলে ঈশ্বর গুপ্তেরই সুসদিচ্ছা ও উদ্যম। তিনিই বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া নানা অসুবিধার মধ্যে বাংলা দেশের বহু দুরধিগম্য স্থানে স্থলপথে ও জল-পথে গমন করিয়া এই সকল কবির জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করেন বং ধারাবাহিক ভাবে তৎসম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ তাহা প্রকাশ করেন। এখন পর্য্যন্ত এগুলি মাত্রই আমাদের উপজীব্য হইয়া আছে, পরবর্ত্তী কালে ইহার অধিক উপকরণ আর বিশেষ কিছুই গৃহীত হয় নাই।

যত দূর জানা যায়, বাংলা সাহিত্যের জন্ম গানে। চর্য্যাপদগুলি ই সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন—এগুলি গীত হইত। চণ্ডীদাসের প্রচারিত হইত। তাহার পর শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপুরাণ, মনসামঙ্গল, পদ্মপুরাণ, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি পুরাণ ও মঙ্গল-কাব্যগুলি, এগুলিও পালাগানরূপে গীত হইত। এই ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত চলে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল শেষ উল্লেখযোগ্য মঙ্গলগান। বঙ্গ-দেশে ইংরেজ সমাগমের প্রায় কাছাকাছি কালে পলাশীর যুদ্ধের তিন-চার বৎসরের মধ্যেই ইহা রচিত ও বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। মধ্যে বাংলা কাব্যের অনুবাদশাখা ও চরিতশাখা (শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া) প্রাধান্য লাভ করিলেও পদাবলী ও পালাগানেই বাঙ্গালীর বিশেষ মতি ছিল। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে তাঁহার কাব্যরসে মাতাইয়া দিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলিকে প্রায় পঙ্গু করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুকাল ধরিয়া বাঙালী কবিরা তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অসংখ্য অক্ষম অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ফলে সত্যকার কাব্য-সাহিত্যের মৃত্যু ঘটে। রাজসভা, চণ্ডীমণ্ডপ এবং সদর যখন এই জাতীয় আদিরসাত্মক সম্ভোগ-কাব্যে কলুষিত, বাঙালীর স্বাভাবিক সঙ্গীতপ্রিয়তা তখন বাধ্য হইয়াই খিড়কি আশ্রয় করে। ইহার ফলেই তথাকথিত কবিসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং কবিগান জন্মলাভ করে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া কবিগান বাংলা দেশে বিস্তর প্রচলিত ছিল। গোড়ার পঞ্চাশ বৎসর ইহার সম্যক্ আদরও ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষে হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি প্রভৃতির সাহায্যে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার লাভ করিলে কবিগানের প্রসার কমিয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্যের রসে মশগুল হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে "ইয়ংবেঙ্গল" বলিয়া উল্লিখিত সেকালের তরুণ সম্প্রদায় এই জাতীয় গানগুলিকে বর্ব্বরোচিত মনে করিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। ফলে কবিগানের প্রচার ও প্রভাব এমনই কমিয়া যায় যে, ঈশ্বর গুপ্তকে বিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে যত্ন করিয়া সেগুলিকে টানিয়া

উদ্ভব হইলেও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পরেই ইহা বিশেষ প্রসার লাভ করে।

কবিগানের নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বাংলা দেশে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তর্জ্জা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফআখড়াই, ফুলআখড়াই, দাঁড়াকবিগান, বসাকবিগান, চপ, কীর্ত্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কগীতি প্রভৃতি নানা বিচিত্র-নামা বস্তুর সংমিশ্রণে "কবিগান" জন্মলাভ করে। "কবি" অর্থে এখানে অশিক্ষিতপটু স্বভাবকবি—তাঁদের রচনা ও সঙ্গীত বিভিন্ন নামে পরিচিত কবিগানের বিভিন্ন শাখা। শেষ পর্য্যন্ত ইহা বিতণ্ডামূলক সঙ্গীত-সংগ্রামে পর্য্যবসিত হয় এবং তর্জ্জা, হাফআখড়াই ও পাঁচালী নামে সমধিক প্রচলিত হয়। নিধুবাবুর টপ্পা, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি কবিগানের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রচলিত রূপ। যাঁহারা এ-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পড়িতে হইবে :—

১। 'হাফআখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামের ইতিহাস'
—গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

২। 'গীতরত্নগ্রন্থ অর্থাৎ ৺রামনিধি গুপ্ত-রচিত কবিতা সমূহ'
২য় সংস্করণ, ১২৬৩ সাল।

৩। 'মনোমোহন গীতাবলী'—মনোমোহন বসু রচিত কবি,
হাফআখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি গান, ১২৯৩ সাল।

৪। 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ'—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা
সঙ্কলিত, ১২৮৪ সাল।

৫। 'গুপ্তরত্নোদ্ধার'—প্রাচীন কবি-সঙ্গীত-সংগ্রহ,
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, ১৩০১ সাল।

বর্ত্তমান স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে কবিগানের সকল বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। যাঁহারা "কবি' নামে সম্যক্ পরিচিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের রচিত সঙ্গীত কেবল কবিগান আখ্যা লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদেরই রচনার কিছু পরিচয় দিতেছি।

ইঁহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সর্ব্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ইঁহাদের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় অল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।···

ইংরেজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে [কলিকাতা] পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক্ সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘুস্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁশি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হারজিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্ ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্ ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।"

—রবীন্দ্রনাথ, 'লোকসাহিত্য'

কিন্তু "সর্ব্বসাধারণ" নামক নূতন রাজার মনোরঞ্জনার্থ হইলেও কয়েকজন কবির প্রতিভাগুণে বিভিন্ন শাখার কবিগানেও সাহিত্যরস সৃষ্ট হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এই সকল কবি ও তাঁহাদের রচনাকে স্থান দিতে অস্বীকার করা চলে না। ইহাদের মধ্যে গোজলা গুঁই প্রাচীনতম হইলেও রাম বসু, হরু ঠাকুর, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ও শ্রীধর কথক প্রধানতম। দাশরথি রায়েরও কবি-প্রতিভা স্বীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর মাস-পয়লার কাগজে এই সকল কবির জীবনী ও গান প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকল কবিওয়ালা সম্বন্ধে আলোচনা করার বাসনা তাঁহার ছিল, কিন্তু তিনি মাত্র কয়েক জনের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। যথা—

রামনিধি গুপ্ত	১ শ্রাবণ ১২৬১
রাম বসু	১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
হরু ঠাকুর	১ পৌষ ১২৬১

রাসু, নৃসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস ১ মাঘ ১২৬১

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই, এবং সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপন আপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই, সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন। আমি একপ্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়া শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি···"

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত,' "ভূমিকা" পৃঃ ৩

কবিগানগুলি গীত হইবার জন্য রচিত হইত, বস্তুতঃ সঙ্গীতেই এগুলির যথার্থ রসোপলব্ধি হইতে পারে। গানের যেমন অস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি বিভাগ থাকে, কবিগানেরও সেইরূপ চিতেন, পরচিতেন, ফুকো, মেলতা, মহড়া, খাদ, অন্তরা প্রভৃতি নানা বিভাগ ছিল। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই বিভাগের আজ কোনই

সার্থকতা নাই। আমরা এখানে যে গানগুলি উদ্ধৃত করিব, সেগুলিতে এই বিভাগের উল্লেখ করিব না।

কাহারও কাহারও মতে গোজলা গুঁই কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রাচীনতম। আন্দাজ করা হইয়া থাকে যে, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৬১ সালের মাস-পয়লার 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর ১লা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় গোজলা গুঁই সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত এইরূপ লিখিয়াছেন :

"১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল "গোজলা গুঁই" নামক এক ব্যক্তি "পেশাদারি" দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন। ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগিতা হইত তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তৎকালে "টিকেরার" বাদ্যে সঙ্গত হইত। "লালুনন্দলাল, রঘু ও রামজী" এই তিন জন কবিওয়ালা উক্ত "গোজলা গুঁই" প্রভৃতির সংগীতশিষ্য ছিলেন। রঘুর নিবাস ফরাসডাঙ্গায়, তিনি তন্তুবায় কুলে জন্মগ্রহণ করেন, গান ও সুর করিতে ভাল পারিতেন। লালু-নন্দলাল ও রামজীর বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। এই তিন জন পুরাতন কবিওয়ালা, ইঁহাদিগের সময়ে "কাড়ার" বাদ্যে সঙ্গত হইত। হরু ঠাকুর প্রভৃতির সময়ে "ঘোড়খাই" তৎপরে "ঢোলে"র সঙ্গত আরম্ভ হইল।"

সম্ভবত: গোজলা গুঁইই কবি-গানের আদি স্রষ্টা। গুপ্তকবি বহু ক্লেশে ইহার একটি মাত্র পদ (সম্ভবত: খণ্ডিত) আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা এই—

এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসে নিরাশ করো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ।
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

— কবিগানের প্রাচীনতম পদ হইলেও ইহা যে কাব্যাংশে নিকৃষ্ট নহে, পরবর্তী কালের গানের সহিত তুলনায় স্পষ্টই তাহা প্রমাণিত হয়।

গোজলা গুঁইয়ের আর একটি পদের মাত্র দুইটি পংক্তি পাওয়া গিয়াছে :

প্রাণ তোরে হেরিলে, দুখো দূরে গেলো মোর।
বিরহ অনলো, হইলো শীতলো, জুড়ালো প্রাণো চকোর।

লালুনন্দলালেরও একটি মাত্র পদ গুপ্তকবি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা:

হোলো এই সুখ লাভো পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে।
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি, পাতালো কত দূর।
শেষে এই হোলো, কাণ্ডারি পালালো
তরণী লাগিলো ভাসিতে।

ধনো প্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে শরণো লইলাম যার।
তবু তার মন্ পাওয়া সখি, আমারো হোলো ভার।
না পুরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, মিছে পরিবাদো জগতে।

গোজলা গুঁইয়ের অন্যতম শিষ্য রঘুর শিষ্যদের মধ্যে হরু ঠাকুর প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি এবং রাম বসু কবিওয়ালাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ব্যতীত আর কেহ তাঁহাদের মত বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামজীর শিষ্য ভবানী বেণে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং লালু-নন্দলালের শিষ্য নিতে বৈষ্ণবেরও খ্যাতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। লালুনন্দলালের সমসাময়িক কৃষ্ণ চর্মকার বা কেষ্টা মুচিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র খণ্ডিত পদ পাওয়া গিয়াছে। অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন-হিসাবে এখানে তাহা ('সংবাদ প্রভাকর' হইতে) উদ্ধৃত হইল :

হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে।
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।
শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,
রাখালের বেশ এখন কোথা লুকালে।
মাতুলো বধিলে, প্রতুলো করিলে, গোপগোপী কুলে
অকূলে ভাসায়ে দিলে।

ব্রাহ্মণ হরু ঠাকুর কবিতা-দ্বন্দ্বে মাঝে মাঝে ইহার নিকট পরাজিত হইতেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরবর্ত্তী কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে হরু ঠাকুর ও রাম বসু প্রধান, কিন্তু রাসু ও নৃসিংহ এবং নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর খ্যাতিও কম নয়। রাম বসুর গুরু ভবানী বেণে শিষ্যের যশো-গৌরবে অপেক্ষাকৃত ম্লান হইয়াছেন। যত দূর অনুমিত হয়, ১৭৩৪ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ রাসুর এবং ১৭৩৮ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ নৃসিংহের জীবিতকাল। হরু ঠাকুর নৃসিংহের সমবয়সী ছিলেন (১৭৩৮-১৮১২)। চন্দননগর সন্নিহিত গোঁদলপাড়ায় কায়স্থ পরিবারে রাসু ও নৃসিংহ এই ভ্রাতৃদ্বয়ের নিবাস ছিল। পদগুলি উভয় ভ্রাতার নামেই চলে, রচনায় কাহার কৃতিত্ব কতখানি বলা কঠিন। ইঁহারা শৈশবে মাতুলালয়ে চুঁচুড়ায় পাদরীদের স্কুলে সামান্য শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় হরু ঠাকুরের গুরু রঘুর উপদেশ ও সাহচর্য্য লাভ করিয়া কবিগান সম্পর্কে ইঁহাদের কিছু জ্ঞান জন্মে, তাঁহারা ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় চন্দননগরে কবির দল খোলেন। এই দুই ভায়ের দল সমগ্র দেশে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। দুই ভ্রাতার সম্মিলিত রচনায় কবিত্ব স্থানে স্থানে সত্যই চমৎকার। উদ্ধৃত করিতেছি। প্রসঙ্গত ইহাও বলা আবশ্যক যে, ইঁহাদের রচনা ছয়টি মাত্র গান আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে—সেগুলি সখী-সংবাদ ও বিরহ-বিষয়ক।

১। ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে,
আঁখি হাসে পরাণ পোড়ে আগুনে।
কি দোষ বুঝিলে রাধারে তেজিলে,
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে।
* * *
শ্যাম, প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইল
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোখুরের জল জগৎ ব্যাপিল
সাগর শুকালো তপনে।

২। কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণ হয় দিব্যজ্ঞান
হেন প্রেমধন উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে মনের বিরাগে
প্রীতিপ্রয়াগে মুড়াব মাথা।

কলিকাতার সিমলা পল্লীতে ১১৪৫ সালে (১৭৩৮ খৃ) ব্রাহ্মণ পরিবারে হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি বা হরু ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শোভা-বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হরু ঠাকুর নানা দল ও সম্প্রদায়ের জন্য অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার রচনা অধিক পরিমাণেই আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

গুরু রঘু তাঁতির প্রতি ইনি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং নিজের অনেক গান গুরুর ভণিতায় প্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণবশত এবং কতকটা অবস্থা-বৈগুণ্যেও বটে, হরু ঠাকুরের শিক্ষা পাঠশালার অধিক অগ্রসর হয় নাই। এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি কিছু কাল উন্মার্গগামী হইয়া নিতান্ত অলস জীবন যাপন করেন, পরে একদল "উড়নচণ্ডে"র সঙ্গে মিশিয়া কবিগানের শখের দল খোলেন। এই অবস্থাতেই তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হয় এবং তিনি মৃত ও বিস্মৃত কবিওয়ালা-সমাজে চিরস্থায়ী যশ অর্জ্জন করেন। শখের দলই পরে পেশাদারী দলে পরিণত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের মতে হরু ঠাকুর কবিগানের নানাবিধ শাখার সঙ্গীত রচনায় সমান পটু ছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার সখীসংবাদ ও বিরহের পদ গুলিই পাইয়াছি। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ পঁয়তাল্লিশটি গান মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহের জন্য মূলতঃ গুপ্তকবিই দায়ী। এই সংগ্রহ দৃষ্টে বলা যায় যে, এগুলি এ যুগের পাঠককেও মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা রাখে। দুই-একটি নমুনা দিতেছি। সখীসংবাদ হইতে—

সখি রে রসের অলসে।
গত দিবসের রজনী শেষে।
অচেতন হয়ে সুখ আবেশে।
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে, শ্যামেরে হারায়ে
কেঁদেছিলাম কত হুতাশে।
যে বিচ্ছেদ ডরে পরাণ শিহরে,
তাই ঘটেছিল, সই।
অমনি কম্পান্বিত হৃদি, হেরে শ্যামনিধি
হৃদে মিল বিধি কি দোষে।

বিরহ হইতে—

১। হায়! হৃদয় মাঝারে লুকায়ে
সদা রাখি প্রেমরতনে।
কি জানি কেমনে সখা, তথাপি লোকে জানে।
হায়! পীরিতের কিবা সৌরভ আছে,
সে সৌরভ মম অঙ্গে রয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাস
ব্যাপিল ভুবনময়।

২। পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি, বলি তোমাকে।
শুনেছ কখন জলন্ত আগুন
বসনে বন্ধন রাখে।
প্রতিপদের চাঁদ হরিবে বিষাদ,
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিত প্রকাশ,
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে।

রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এ হরু ঠাকুরের একটি পদ সঙ্কলন করিয়াছেন। সেটি এই:

তুমি কার প্রাণ দেহ শূন্য করি এলে,
হেরে যে রূপ বাসনা করে।
করি পরিত্যাগ আপন প্রাণ
সেইখানে রাখি তোমারে।
পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিত করিলে বসুমতী
কাল হয় যেন তেমতি,
নয়ন-কটাক্ষে কুমুদ প্রকাশ
পাইত হে তব অধরে।

এই সকল রচনায় ছন্দের দোষ আছে, ভাব সম্পূর্ণতা পায় নাই, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, এগুলির মধ্যে এমন একটা রস-সম্পদ্ লুকাইয়া আছে যাহা সাধারণকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিমুগ্ধ রাখিয়াছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য-বিচারে এগুলিকে উপেক্ষা করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

কবিওয়ালা নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (নিতে বৈরাগী, নিতে বৈষ্ণব) ১১৫৮ সালে (১৭৫১ খৃঃ) চুঁচুড়ার দক্ষিণে চন্দননগরে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সামান্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও ইনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে ভাল রচনা করিতে পারিতেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ সত্তর বৎসর কাল ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি কাহারও কাহারও কাছে এমনই সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। ইঁহার সখীসংবাদ ও বিরহের অনেক অপূর্ব্ব পদ আছে। একটি মাত্র নমুনা দিতেছি:

আমার মন চাহে যারে তাহার রূপ নিরখিতে ভালবাসি।
যেবা যার প্রাণপ্রেয়সী।
নয়নচকোর পিয়ে সুধা যার
সেই জন তার শরদশশী।
তব বিধুমুখ হেরিয়ে আমার ঘুচিল মনের তিমিররাশি।
যে হয় অন্তরে কহিব কাহারে সুখসিন্ধুনীরে অমনি ভাসি।

হায়, কালকজেয় দেখিতে ভ্রমর তাহে ষট্‌পদ কুৎসিত অতি।
এ-তিন ভুবনে সকলেতে জানে নলিনীর মন তাহার প্রতি।

রাম বসু বা রামমোহন-বসু কবিসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার বহু পদ সম্পূর্ণ অথবা খণ্ডিত আকারে আমাদের কাল পর্য্যন্ত মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, রাম বসুর কালাতীত প্রতিভা ছিল। রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবু টপ্পাগানে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, রাম বসু কবিগানে সেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন: "যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, তেমনি কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু।"

কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে শালিখা গ্রামে সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থ পরিবারে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে (১১৯৩ সালে) রামমোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামলোচন। গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া বারো বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিসামহাশয় জোড়াসাঁকো পল্লীর সুবিখ্যাত বারাণসী ঘোষের বাড়ীতে প্রেরিত হন এবং সেখানে থাকিতে থাকিতে সামান্য ইংরেজী শিখিয়া কেরানীগিরি কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই কবিতাদেবী তাঁহার স্কন্ধে ভর করায় কাজকর্ম্মে তাঁহার মন বসে না। অল্প দিন কাজ করিয়াই তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন এবং গান রচনায় প্রবৃত্ত হন। মুখে মুখে প্রচারিত তাঁহার গানের সুখ্যাতি শুনিয়া ভবানী বেণে, নীলুঠাকুর, মোহন সরকার ও ঠাকুর দাস সিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কের দল গানের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতে লাগিলেন। তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতেন না। পরে তিনি স্বয়ং দল গঠন করেন এবং এই দল "রাম বসুর দল" নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়।

রাম বসু মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১২৩৫-৩৬ বঙ্গাব্দে আন্দাজ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের ভদ্রসন্তানেরা যে "নল-দময়ন্তী" যাত্রার দল খুলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন, কথিত আছে "রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।"*

রাম বসু কবিগানের সকল বিভাগের কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন, তবে তাঁহার আগমনী, সখীসংবাদ ও বিরহ গান সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার গানের মাঝে মাঝে এক-আধটি পংক্তি এমন অপূর্ব্ব যে, তাহা পাঠে তাঁহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সংশয় থাকে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সন্দেহ হয় যে, তিনি অত্যন্ত অসাবধান ও অসতর্ক ভাবে রচনা করিতেন, অতি-ভালর সঙ্গে অতি-মন্দের সমাবেশ এই কারণেই ঘটিতে পারিয়াছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন—

Coming as it does, at the end of this flourishing period of Kabi-poetry, Ram Basu's songs at once represents the maturity as well as the decline of that species.

—History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, p 370

* সংবাদ প্রভাকর, ৫০৩৮ সংখ্যা, শনিবার, ১ আশ্বিন, ১২৬১ সাল।

শিল্পী—অনিল সেন

সুতরাং রাম বসুর যে রচনাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই কবিগানের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। খাঁটি কবিগান বলিতে যাহা বুঝায়, রাম বসুর সঙ্গেই তাহার সমাপ্তি ঘটে। নিধু বাবুর হাতে টপ্পা, দাশরথির হাতে পাঁচালী এবং ঈশ্বর গুপ্তের হাতে সমসাময়িক বিষয় সংক্রান্ত ব্যঙ্গ কবিতায় কবিগান ইহার পর সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার পরিগ্রহ করে। কবিগান-প্রসঙ্গে সেগুলির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

আগমনী বা সপ্তমী হইতে—

আশা বাক্যে আমার পাপ প্রাণ, রহে বল কত দিন।
দিনের দিন তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সংবৎসরে তাকে আন্‌তে তো যেতে হয়।
যেন মাহীনা কন্যে তিন দিনের জন্যে এল হে হিমালয়।
দুখে করি হাহারব ছিলেম যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে।
তবে নাকি উমার তত্ত্ব করেছিলে,
গিরিরাজ, ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে।

সখীসংবাদ হইতে—

১। মান করে মান রাখতে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই,
সেই দিকেই দেখতে পাই,
সজল আঁখি জলধরবরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা,
কৃষ্ণপ্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালরূপ সদা
হৃদয়-মাঝে শ্যাম বিরাজে
বহে প্রেমধারা দুনয়নে।

২। জলে কি জলে কি দোলে দেখগো সখি
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিনে স্থির নির্ণয় করিতে।
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি নির্ম্মল যমুনাজলেতে।

৩। জলে জলে কি গো সখি।
অপরূপ রূপ দেখি, দেখো সই নিরখি।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব-ভঙ্গি প্রায়
মায়া করে ছায়ারূপে সে কালা এসেছে কি।
আচম্বিতে আলো কেন যমুনার জল।
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল।
তীরের ছায়া নীরে লেগে হোল বা এমন,
চকিতে দেখিতে আমার জুড়াল দু'টি আঁখি।
আজ্ সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়,
নীরমাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়।
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী।

বিরহ হইতে—

১। মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে
নিলজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক্ থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না।

২। ঘর আমার নাই ঘরে।
মদন, কর দিব কি তোমার করে।
ভূমিশূন্য রাজা তুমি, পতিশূন্য সতী আমি
আমার স্বামিগৃহ শূন্য, কাল কাটালেম পরে পরে।
সর সর পঞ্চশর হে, ডর করি নে তোমারে।
আমার জীবনশূন্য এ জীবন।
ঋতুরাজ হে, শূন্য গৃহে সৈন্য লয়ে কি কারণ।

৩। বালিকা ছিলাম, ছিলাম ভাল ছিলাম,
সই—ছিল না সুখ অভিলাষ।
পতি চিনতাম না, ও রস জানতাম না,
হৃদপদ্ম ছিল অপ্রকাশ।

জনসাধারণের নিকট রসনিবেদনের জন্য এককালে কবিগানের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর যুগের পরিবর্ত্তনে তাহাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে "তাহাদের আনন্দবিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য এবং আবশ্যকসাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। এখনকার দিনে খবরের কাগজ এবং নাট্যশালাগুলি শেষোক্ত প্রয়োজন সাধন করিতেছে।" কালের প্রয়োজনে যে কবিগান একদিন বাংলা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার মধ্য হইতেও স্থায়ী সাহিত্যের নিদর্শন কিছু কিছু মিলিতে পারে। এযুগের পাঠকদের দৃষ্টি সেই বিস্মৃত রচনাসম্ভারের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই আমাদের এই সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা।

['সাহিত্য প্রদ্বিকা'র সৌজন্যে

আর এ রোগ কি শুধু বর্গীদের? বাংলা, মাদ্রাজ, হিন্দুস্থান—এক চেয়ে আর সরেশ। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ্। আলমোড়ায় এক সাধুদের মঠে একবার বসে আছি, এমন সময় এক পাদরী সাহেব তাঁর কতকগুলি দেশী শিষ্য সমেত সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের মধ্যে একটি ১৪।১৫ বৎসরের ছেলে ছিল। সে যে কি মোহে পড়ে খ্রীষ্টান হয়েছে, তা জানবার জন্যে আমার ভারি কৌতূহল হলো। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করলুম —"বাবা, তোমার বাড়ীতে কি মা-বাপ নেই? তুমি ধর্ম্মের কি বুঝেছ যে হিন্দুধর্ম্মকে মিথ্যা ব'লে ছাড়তে গেলে?" ছেলেটি একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—"ধর্ম্মের আমি কিছুই জানিনে। আমার মা-বাপই আমাকে খ্রীষ্টান করে দিয়েছে। প্রায় বছর দুই হোলো আমি একবার বড়দিনের সময় পাদরী সাহেবদের আড্ডায় বেড়াতে যাই। পাদরী সাহেবরা আমায় আদর করে খাবার খেতে দেন। খেয়ে দেয়ে আমি বাড়ী ফিরে এসে মাকে বল্‌লুম—'মা, আমি পাদরী সাহেবদের বাড়ী খানা খেয়ে এসেছি।' মা শুনে কাঁদতে লাগলেন। বাবা বল্‌লেন, আমার না কি ধর্ম্ম চলে গেছে। কাজেই আমায় আর বাড়ীতে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। বাড়ী থেকে তাড়া খেয়ে আর যাই কোথায়? সেই অবধি পাদরী সাহেবদের সঙ্গেই আছি।"

দেশাচারের ভয়ে যে সমাজে মা-বাপের মন থেকেও দয়া মায়া স্নেহ মমতা শুকিয়ে গেছে, সে সমাজ সজীব না মরা? মরা বল্‌লে আবার বন্ধুরা চোটে যান। বলেন যে সমাজকে অমন ব্যাং খোঁচানি না ক'রে খুব সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাল করতে হয়। তাঁরা এ কথা ভেবে দেখেন না যে, যাদুর গায়ে হাত বুলোবার সময় আর নেই। এ'তো বুদ্ধির অভাব নয়, এ যে প্রাণের অভাব। যারা জ্ঞানপাপী তাদের বুঝিয়ে কিছু হবে না। দুঃখ-যন্ত্রণার তাপে গলিয়ে তাদের নূতন ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। পুরানো বচনের বনিয়াদ উপড়ে ফেলে সত্য, সনাতন ধর্ম্মের নূতন সমাজ গড়তে হবে। এখন যা আছে সে তো ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের ভ্যাংচানি। নিজেদের ক্ষুদে ক্ষুদে স্বার্থের পুঁটুলির উপর বড় বড় নামের ছাপ মেরে ধর্ম্মের বাজারে ভাল মাল বলে চালান করবার চেষ্টা। হায় রে! ভগবান কি এমনই বোকা যে, দুটো সংস্কৃত বচনে ভুলে গিয়ে আমাদের রেহাই দেবেন? তাই যদি হতো তো এই হাজার বছর ধরে আমাদের সমাজের পিঠে ক্রমাগত গুঁতো-বৃষ্টি হচ্ছে কেন? শাস্ত্রে লেখে ধর্ম্মের ফল সুখ। আমরা যদি এত বড় ধার্ম্মিক তো আমাদের লাঞ্ছনা আর দুঃখ ভোগের নিবৃত্তি নেই কেন? জগতের সবাই দু'পায়ে হাঁটে, আর আমরাই শুধু কেঁচো, কৃমির মতো বুকে হেঁটে মরছি কেন? পরকালের সুখের জন্য? যে ভগবান ইহকালে আমাদের জন্যে কেবল ঝাঁটা আর লাথির ব্যবস্থা করেছেন, তিনি যে পরকালে আমাদের জন্যে মেঠাই মোণ্ডার ব্যবস্থা করে দেবেন, একথা সংস্কৃত অক্ষরে ছাপার পুঁথিতে দেখলেও যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না!

আমাদের দেশের ছেলেরা তাই দোটানায় পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। যে সব আচার অনুষ্ঠান সনাতন ধর্ম্মের মুখোস পরে আমাদের বুকের উপর বসে গলা টিপে দম বন্ধ করবার জোগাড় করে তুলেছে, সেগুলির মধ্যে যে সনাতনত্বের একান্ত অভাব, এ কথা স্পষ্ট ক'রে বলবার সময় এসেছে। ধর্ম্ম যে শুধু কতকগুলো মরা আচারের অনুষ্ঠান মাত্র নয়, সাড়ে সতের কাহন কড়ি দিয়ে যে তা' ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না, ধর্ম্মের চাপে মানুষের যে আধমরা বা আড়ষ্ট হয়ে উঠা একান্ত আবশ্যক নয়, এ কথা যত দিন না লোকে বুঝবে তত দিন আমাদের জীবনে যে কেমন ক'রে ধর্ম্ম ফুটে উঠবে তা তো বুঝতে পারিনে। পদি পিসির ধর্ম্ম দিয়ে যারা ছেলেদের পেট ভরাতে চান, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বচ্ছন্দ গতির মধ্যে যাঁরা অসাত্ত্বিকতার গন্ধ পেয়ে আঁতকে উঠেন, শূদ্রস্পৃষ্ট হলে যাঁরা ভগবানকে পর্য্যন্ত পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করে তবে জাতে তুলে নেন, তাঁরা যে ধর্ম্মমন্দিরের পাহারাওয়ালার ব্যবসা সহজে ছাড়বেন, তা তো মনে হয় না! তবে আশা এই, ভগবানের একটি নাম দর্পহারী। মানুষ আপনার চারি দিকে যে অহঙ্কারের বেড়া দিয়ে রেখেছে, এক দিন না এক দিন তিনি তা ভেঙ্গে উপড়ে ফেলে দেবেন। সারা জগৎ জুড়ে ভাঙ্গনের মড়মড়ানি শোনা যাচ্ছে। শুধু কি আমাদের দেশটাই বাদ পড়বে?

যা' জরাজীর্ণ, যা ভাঙ্গবে, তাকে জোর করে ধরে রাখবে কে? তাই আমি মহাকালের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে বলি—

"ভীম, রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙ্গন-ভরা চরণ"

— ★ —

—উপন্যাস—

প্রতিভা বসু

৫

দু'দিন চুপচাপ কাটালাম, আমিও কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলিনি, তাঁরাও আমাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চললেন। কিন্তু মন অস্থির হ'লো তৃতীয় দিন—হঠাৎ একখানা চিঠি পেলাম অভিলাষের বাবার—আমাকে লেখা নয়—চিঠিখানা বাবার নামেই এসেছে। আমার হাতে সে চিঠি পড়লো। আমি সে-চিঠি আর তাঁদের হাতে না-দিয়ে সোজা নিয়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলাম। বাবার টেলিগ্রামের উত্তর সেখানা।
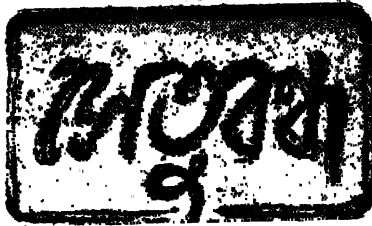
'বিজয়,

তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক্ হলাম। হঠাৎ এত কী জরুরি দরকার হ'লো যে টেলিগ্রামেই এত কথা লিখেছ? আজ অভির চিঠিও পেলাম—সেও খুব অস্থির হ'য়ে পড়েছে বিয়ের জন্য। তোমরা সকলেই খুব বিচলিত। কেন বলো তো?

যাই হোক্—তোমার কথার জবাবটা আমি দিচ্ছি। অভি যে রেজিস্ট্রি ক'রে বিবাহ করবে এ-খবর পেয়ে আমি সুখী হইনি। তোমার টেলিগ্রামে জানলাম, তুমিও তা চাও না, অতএব মাঝে চৈত্র ফেলে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই তুমি হিন্দুমতে বিবাহ সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক। উত্তম কথা—আমি ত প্রস্তুতই সর্বদা—তবে বর্তমানে আমার একটু টানাটানির সময় পড়েছে, হাজার দশেক টাকা তুমি আমাকে অবশ্যই দেবে। অভি লিখেছে বলতে তার লজ্জা করে—কিন্তু তার ইচ্ছে—আমাদের বালিগঞ্জেও যে একখণ্ড জমি কেনা আছে তার উপর তুমি ছোটোখাটো একখানা বাড়ি তাকে তুলে দাও—আর ও-জমি তুমি আমার থেকে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে জামাইকে যৌতুক দাও। তোমারই জামাই—তোমারই মেয়ে—আমি আর কী বলব। গহনা টহনা যেমন তোমার খুশি দিয়ো, তবে সবই সোনার দিয়ো—আজকালকার পাথর বসানো জিনিসগুলো কোনো কাজের নয়। একশো ভরির নীচে সোনা যেন না হয়।

আমার কোনোই দাবী-দাওয়া নেই। এটুকু মাত্র ইচ্ছা, আশা করি তা পূরণ করতে তোমার তিলমাত্র অসুবিধা হবে না। আমি তিন দশেকের মধ্যে একবার যাবো, কন্যা আশীর্বাদ ক'রে আসবো তখন।'

চিঠিখানা প'ড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মানুষের ইতরতারও তো একটা সীমা থাকা দরকার। ভদ্রলোক তাঁর উপযুক্ত পুত্রই তৈরি করেছেন। একখানা বাড়ি, একশো ভরি সোনা, দশ হাজার টাকা নগদ—ছেলে বিয়ে দিয়ে তিনি লক্ষপতি হতে চান দেখছি। সবেগে মার কাছে গিয়ে চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। মা চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, 'রুনি, তুমি খুলেছো এই চিঠি?'

হঠাৎ আমার খেয়াল হ'লো যে এটা বাবার চিঠি, এটা খোলা আমার নিতান্তই অন্যায় হয়েছে। মাথা পেতে অপরাধ নিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ-মা, হঠাৎ খুলে ফেলেছিলুম।'

গম্ভীর মুখে মা বললেন, 'দরকার বোধ করলে বোধ হয় এ-চিঠি তুমি লুকিয়ে ফেলতে?'

চুপ ক'রে রইলাম।

দুপুরবেলা শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। ক'দিন থেকেই এটা আমার মাথায় ঢুকেছে। দরকার পেলে সত্যিই আমি নেব, আমি এখন মেজর—জোর কখনোই খাটবে না আমার উপর, এ আমি জানি। অশান্তি হবে—হয়তো তাঁরা আমাকে ত্যাগ করবেন, কিন্তু কম অশান্তিতে তো আমি নেই—অভিলাষকে বিয়ে করতে হবে এই চিন্তা আমার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে—মা বাবার এই মনোবৃত্তিও তো আমাকে কম যন্ত্রণা দিচ্ছে না—তার চেয়ে এই বেশ—স্বাধীন হবো, মফস্বলে চাকরি নিয়ে দূরে থাকবো—হঠাৎ একটু তন্দ্রা এসেছিলো, মণ্টুর ডাকে চমকে উঠলাম।

'দিদি ঘুমুচ্ছ?'

'না, কেন রে?'

'তোমার চিঠি।'

উদ্গ্রীব হ'য়ে চিঠির খামের উপরকার লেখায় চোখ বুলোলাম। বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠলো যেন—এ লেখা আমি চিনি না, কিন্তু তবু বুঝলাম এ-লেখা তাঁর। মণ্টুর মুখের দিকে তাকাতেই ও বললো, শ্যামল-দা দিলেন—আমি রোজ যাই কিনা।'

'তুই' রোজ যাস্?

'রোজ যাই, শ্যামলদার মা আমাকে কত খেতে দেন—আর শ্যামলদা—ওঃ ওয়ানডারফুল। আমাদের ইস্কুলের হারানদা বলে যে তার দাদার মত আর হতে হয় না—দেখিয়ে দিয়েছি ওকে—'

আমি গোগ্রাসে মণ্টুর কথা শুনতে লাগলাম। মনে হলো, কতকাল তাঁর খবর শুনিনি, তাঁকে দেখিনি, মণ্টুর আজে-বাজে কথা যে এত কাজের হ'তে পারে তা উপলব্ধি ক'রে ওকে আদর না ক'রে পারলাম না। তারপর ও যেতেই চিঠি খুলে পড়তে লাগলুম:

'প্রীতিভাজনাসু—

প্রথমেই বলে রাখি যে শ্রদ্ধাস্পদাসু 'সম্বোধন না-করবার জন্য আমার অপরাধ নেবেন না; কেননা, আপনাকে আমি আমার বন্ধু হিসেবেই চিঠি লিখছি, অভিলাষের স্ত্রী ব'লে নয়।

আপনি ক'দিন আসেন না, বলাই বাহুল্য, আমার পক্ষে সেটা সুখের হয়নি। মণ্টু বলছে আমার উপরে আপনারা কেউ তুষ্ট নন্—(আপনিও কি?) কিন্তু সে কথা থাক্—আপনার রোববার সিনেমায় যাবেন? মণ্টু ভয়ানক ব্যাকুল হয়েছে এবং ওর গরজের সঙ্গে আমার গরজও দেখছি ঠিক সমান তালেই চলেছে। সেই ইংরিজি ফিল্মটার কথা আপনাকে বলেছিলাম সেদিন—হাইকোর্টসের বাজনা আছে। যাবেন? যদি যান তবে মণ্টুকে বলে পাঠাবেন। আমি আগে গিয়ে টিকিট কিনে আসবো।

নমস্কার।

শ্যামল'

হিসেব করলুম আজ শুক্রবার—যদি আসতে এখনো অনেক ঘণ্টা, মিনিট, দণ্ড, পল অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কী করা যায়। মণ্টুকে দিয়ে অত্যন্ত সংগোপনে চিঠি লিখে পাঠালুম। ছোট্ট চিঠি—কেবলমাত্র আমার সম্মতি জানানো, কিন্তু তারই পুলক দিয়ে

লিখলুম 'জবাব দেবেন'। এ কথাটা লিখে নিজেরই খারাপ লাগলো—লজ্জা করলো কিন্তু কালকের দিনটা আমার কাটবে কেমন ক'রে?

মণ্টু চোস্ত ছেলে—মা-বাপের নিষেধ ভাঙবার জন্তই ওর জন্ম বোধ হয়। সর্বদাই ও গোপনে ওঁদের অগ্রাহ্য করছে এটা লক্ষ্য করে কতবার শাস্তি দিয়েছি আগে। আমার বাবার কঠোরভাবে বারণ ছিল যে-কোনো লোকের সঙ্গে মেশা, এবং বাংলা স্কুলে দিলে পাছে সে নিষ্ঠা না থাকে এজন্ত অনেক বয়েস অবধি বাড়িতে রাখা হয়েছে গভর্নেসের কাছে, কিন্তু কেঁদে কেটে যে করে পারুক ভর্তি ও শেষটায় হোলোই। বাবা চাকর-বাকরদের সঙ্গে কখনো স্বাভাবিক সুরে কথা বলেন না, সর্বদাই এটা তিনি ওদের জানতে দেন যে তিনি মনিব—মণ্টু ঠিক তার উল্টো—তার যত মেলামেশা আবদার চাকরদের সঙ্গে! ছোটো ছেলে বলে মার উপর অজস্র আবদার ছিল ওর, কাজেই সর্বদাই ও নিজের ইচ্ছামত চলতে পেরেছে; এমনকি ওর জ্বালায় আজকাল টিনে ভরা মুড়ি পর্যন্ত ঘরে থাকে যেটা আমাদের সমকক্ষ কেউ দেখলে আমার বাবার আর মুখ থাকবে না। অভিলাষ এলে এজন্তে মণ্টুকে সামলানো ওঁদের এক কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়। এই এখনো—যেই মণ্টু বুঝেছে মনোহারি দোকানের দোকানদারের সঙ্গে মেশা ওর বারণ, অমনি লুকিয়ে ঠিক সেটাই করতে আরম্ভ করেছে।

সন্ধেবেলা মণ্টুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বুক কাঁপতে লাগলো। পকেট থেকে ও বার করলো চিঠি, তারপর আস্তে-আস্তে বললো, 'দিদি, মা আমাকে বকছিলেন জানো?'

'কেন?'

'ঠিক ধরেছেন আমি শ্যামলদার কাছে যাই।'

'তাতে কী?'—আমি ভাণ করলুম।

'ও মা, তুমি জান না—সেদিন কী রকম রাগ করলেন তোমার উপর। সব সময় তো বলেন দোকানদারটাই যত নষ্টের গোড়া।'

'তাহ'লে তুই যাস্ কেন?'

'যাব না? নিশ্চই যাবো। শ্যামলদার মতো আমি কাউকে ভালোবাসি না—জানো, স্বাধীনতা মানুষের জন্ম অধিকার।'

মণ্টুর কথায় আমি হেসে ফেললুম। বললুম, 'এই বুঝি তোর শ্যামলদার শিক্ষা।'

মৃদু হেসে মণ্টু পালিয়ে গেল। আমি চিঠির মুখ খুললাম।

'প্রীতিভাজনাসু,

চিঠির জবাব দিতে আদেশ করেছেন কিন্তু কিসের জবাব তা জানিনে। আমাকে কি এরকম প্রশ্রয় দেয়া উচিত?

রবিবার ম্যাটিনি শোতেই আসবেন।

শ্যামল।'

চিঠিখানা মুড়ে বাক্সে ভ'রে ফেললাম। তারপর এলাম মার ঘরে। মা মণ্টুর জন্ত পশমের জাম্পার বুনছিলেন—গা ঘেঁসে ব'সে (অনেকদিন এরকম বসিনি) বললাম, 'কী রকম বোনা দিচ্ছো মা—দাও না আমি বুনি।'

মা আমার ভঙ্গি দেখে অবাক্ হলেন; খুশিও বোধ হয় হলেন, বললেন 'তুই তো বোনা-টোনা ছেড়েই দিয়েছিস্—বাস্কেট প্যাটার্ন জানিস্ না?'

'কী জেন, মনে পড়ছে না—দেখিয়ে দাও তো।'

মা উৎসাহিত হ'য়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন, আমি বুনতে লাগলাম। বুনতে-বুনতে এ-কথা ও-কথার পরে বললাম 'মা, চলো না কাল ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে আসি।'

'যাবি তুই?'—আমাকে উজ্জীবিত হ'তে দেখে মার সত্যিকার আনন্দ হল। সত্যিই তো উনি চান না আমি দুঃখ পাই—হঠাৎ আমাকে স্বাভাবিক হতে দেখে মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মার।

আমি বললাম 'ভারি ইচ্ছে করছে যেতে—কাগজে দেখলাম লাইটহাউসে Theiy shall have music বলে একটা ছবি হচ্ছে—হাইফেৎস্ ব'লে একজন বিখ্যাত বেহালা-বাজিয়ের বাজনা আছে—যাবে?'

'আমি?'—মা মাথা নাড়লেন—'আমি যাব না। তুই আর মণ্টু যা—তোর বাবা বরং যাক আমি তো আর ইংরিজি মিংরিজি বুঝিনে।'

'না মা—সেই ভালো, আমি আর মণ্টুই যাব। সত্যি একা-একা চলাফেরার একটু অভ্যেস্ হওয়া দরকার।'

'তাই ভালো। তোর বাবার আবার ছবিতে যা বিরক্তি।'

পরের দিন দুটো বাজতেই বেরুলাম গাড়ি নিয়ে। মা বললেন, 'সে কী! এত আগেই যাবার কী দরকার? শো'তো তিনটেতে।'

'না মা, আজ-কাল সময় বদলেছে—আড়াইটেতেই আরম্ভ হয়—আবার টিকিট-ফিকিট কাটা আছে।'

প্রথমেই গেলাম দোকানে। গাড়ি থেকে নামতেই দেখলাম বেরিয়ে আসছে আমাকে দেখে। খুশি হয়ে বললো, 'আসুন আসুন, কী আশ্চর্য।'

'কেন, আশ্চর্য কিসের?'

'আশ্চর্য নয়? মেঘ না চাইতেই জল। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে বলুন তো?'

'ঠাট্টা করছেন?' মুখের ভাব ঈষৎ গম্ভীর করবার চেষ্টা করলাম।

'সত্যি কথা বলা তো আমার পক্ষে বাস্তবিকই অশোভন, কিন্তু কী করা যায় বলুন তো? মনের চাপ এত বেড়েছে যে কিছু উদ্‌গিরণ না করে আর আমি থাকতে পারছি না।'

চোখে চেয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে হেসে বললাম 'আচ্ছা, আচ্ছা, আর আমাকে খুশি না-করলেও চলবে—চলুন তো একবার চট্ করে মার সঙ্গে দেখা ক'রে নিই।'

বুঝতে পারলাম, খুশিতে ও অধীর হয়েছে এবং এ-কয়দিনের অদর্শনে যেন আমরা পরস্পর অত্যন্ত কাছে এগিয়ে এসেছি। আমার সমস্ত শরীরে মনে যেন এক অভূতপূর্ব আনন্দ চলাফেরা করতে লাগলো। মণ্টুকে কাছে জড়িয়ে ও আগে চললো, আমি ওঁর পিছনে পিছনে ভিতরে এসে দাঁড়ালাম ওর মার কাছে।

আবার সেই ঠাণ্ডা আর অগোছালো ঘর। সমস্ত ঘরময় শান্তি—ঘরে পা রেখেই মন ভ'রে গেলো প্রশান্তিতে।

ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন মেঝেতে আঁচল পেতে। রুক্ষ একরাশ চুল মেঝেতে ছড়ানো ছিটোনো—ঐ আবছা অন্ধকারে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখালো, আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই সস্নেহে জড়িয়ে নিলেন কাছে, ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'মাকে আর মনে পড়ে না? আমার মণ্টু কিন্তু তোমার চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসে।'

আমি হেসে বললুম 'না মা—মণ্টু ছেলেমানুষ কিনা—তাই মণ্টুর প্রকাশটা উগ্র—আমার তো বয়েস হয়েছে, আমি ভিতরে রাখতে শিখেছি এবং ওজনে তা মণ্টুর চেয়ে অনেক বেশি।'

'কক্ষনো না, মাসিমা, আমি তোমাকে বেশি ভালবাসি। তুমিই বলো তো।'

'হ্যাঁ রে পাগলা'—ভদ্রমহিলা মণ্টুকে শান্ত করলেন।

উনি ফোড়ন কাটলেন, 'এত প্রশান্তিও বড় বিশ্বাসযোগ্য নয়, সব জিনিষেরই একটা প্রকাশ আছে, আর সেই প্রকাশটাই তার আসল রূপ।'

আমি জবাব দিলুম না—তাকালাম একবার চোখ তুলে। কী সুন্দর, কী উজ্জ্বল যে ওঁর চোখ, কেমন ক'রে বোঝাবো ?

মণ্টু তাড়া দিলো, 'চলুন এবার, সময় হ'য়ে গেল না ?' নেহাৎ নির্লিপ্তের ভঙ্গি ক'রে বললো 'কিসের সময় ?' বাঃ, বেশ মানুষ ! না, চলুন, চলুন—দিদি এসো। ঝড়ের মতো আমাদের সব্বাইকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। মা-ও এলেন সঙ্গে-সঙ্গে—আমাদের বিদায় দিতে।

গাড়িতে উঠে আমি বললাম 'আপনার মা জানতেন যে আমিও যাচ্ছি ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার কিন্তু ভারি লজ্জা করছে।'

'কেন ?'

কেনর জবাব আমি দিতে পারলাম না, বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

ও মণ্টুকে বললো, 'আচ্ছা মণ্টু, আজ যদি সিনেমায় না গিয়ে বাড়ি ব'সেই আড্ডা করতাম তাহলে কি তুমি রাগ করতে ?'

'রাগ করবো না ?' মণ্টু একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

'আমার কিন্তু ইচ্ছে করছিলো না আসতে ?'

'খুব আশ্চর্য ! আমার তো বাড়ির বাইরে আসতে পারলেই সবচেয়ে ভালো লাগে—মা বাবার ভয়েই তো শুধু নিয়ম ক'রে বেরুতে হয়।'

'তাই নাকি ? তাহ'লে বড়ো হয়ে নিশ্চয়ই তুমি পর্যটক হবে।'

'পর্যটক ? পদব্রজে পরিভ্রমণ ? ওঃ; ওয়ানডারফুল !' আমি ধমকে উঠলাম 'চুপ কর তো তুই মণ্টু।' মণ্টুর উচ্ছ্বাসটা একটু প্রতিহত হ'লো। ও চুপ করতেই আমি বললুম 'উপায় তো এখনো আছে—ইচ্ছে না করলে তো এখনো না গেলে চলে।'

'ওরে বাবা—মণ্টু কি হবে আমার মুখ দেখবে নাকি ?'

'তাই ব'লে অনিচ্ছায় কাজ করবারও কোনো মানে হয় না। আপনি যান না বাড়িতে—আমি কি মণ্টুকে নিয়ে একা যেতে পারিনে ?' আমি অভিমানের অভিনয় করবার লোভ সামলাতে না পেরে ওর কথাকে ভুল বোঝবার ভাণ ক'রে বললুম—এর উত্তরে ও যা বললো, ততটা আমি আশা করিনি, মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনাকে বাদ দিয়ে কোন আনন্দের কথা গেলো একমাসের মধ্যেও মনে হয়নি আমার।'

গভীর একটা উত্তেজনায় আমার কান গরম হ'য়ে উঠলো—মনে হ'লো, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন আশ্রয় নিয়েছে আমার মুখে। এর পরে সিনেমা-গৃহে আসা পর্যন্ত আমাদের আর একটি কথাও হল না। ভিতরে গিয়ে দৈবক্রমে আমাদের পাশাপাশি বসা হ'য়ে গেল—সর্বদাই মাঝখানে আমরা মণ্টুকেই শিখণ্ডী রেখেছি—যদিও এই লজ্জা এই সংকোচ এই আমার প্রথম, কেননা কত দিন কত কারণে কত পুরুষমানুষের পাশে আমি বসেছি এবং পাশাপাশি যে বসেছি, এই চেতনাও আমার কখনো ছিলো না। জায়গা হয়েছে বসেছি—পাশে পুরুষ কি স্ত্রীলোক এই ভেবে কোনো উৎকণ্ঠার যে প্রয়োজন থাকতে পারে এটা আমার বোধগম্য হয়নি কখনো। কিন্তু আজ পাশাপাশি ব'সে আমি ওঁর অস্তিত্ব আমার শরীরের প্রতিটি অণু পরমাণুতে উপলব্ধি ক'রে শিহরিত হ'তে লাগলাম। দুইটি চেয়ারের মাঝখানের হাতলটিতে একবার ওর হাতের উপর অজান্তে আমি হাত রাখতেই ও চমকে উঠলো—আমি লজ্জায় ম'রে গেলুম, কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে পারলুম না কোনো—নিঃশব্দে ত্রস্তে হাত তুলে নিতেই ও বললো, 'কী হলো ? রাখুন না আপনি হাত—সুবিধে পাবেন।'

'না, না।'

'বাঃ, না না কেন। আমি হাত তুলে নিচ্ছি—আমি বরং মণ্টুর সঙ্গে শেয়ার করি।'

'না, আমার দরকার নেই কোনো।' এই একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ও ভয়ানক ছেলেমানুষী করতে লাগলো—অবশেষে বহু কথা-কাটাকাটির পরে আমি হাত রাখলাম সেখানে এবং একটু পরেই ওর বলিষ্ঠ উষ্ণ হাতের স্পর্শে আমার হাত অবশ হ'য়ে এলো !

[ক্রমশঃ।

—দাহ—

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন্ত অঙ্গার ওই দেখা যায় পৃথিবীর মাটির উপর
বিলাতী বয়লারে পোড়া বাংলা কালো প্রেতের মতন।
দেহ, রক্ত, হাড়, চর্বি, কয়লার চেয়ে কম দামী,
বিলাতী বয়লারে আজ কয়লার প্রচুর প্রয়োজন।

বেগুনী টেম্পার ষ্টীলে আকাশের চাঁদ গলে পড়ে,
জলন্ত মাংসের তাপে তারা পুড়ে ছাই হবে ঠিক ;—
কয়লারে বুক কেঁপে খান্ খান্ হয়ে যায় যদি
টেম্পার ষ্টীলের বুক ভরে যাবে রক্তের [illegible]।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৭

মূল :—তথায় অভ্যন্তরে প্রযোক্তৃগণ-কর্ত্তৃক মণ্ডপধারণে প্রশস্ত, রঙ্গপীঠোপরি স্থিত দশটি স্তম্ভ করণীয়। ১৭।

সঙ্কেত :—বরোদার পাঠ—রঙ্গপীঠোপরি স্থিতাঃ। কাশীর পাঠ—রঙ্গপীঠে যথাদিশম্। আমাদের মনে হয়, কাশীর পাঠটি ভাল। কারণ, রঙ্গপীঠোপরিস্থিত যে সকল স্তম্ভ তাহারা মণ্ডপধারণে প্রশস্ত হইবে কিরূপে? অতএব, 'যথাদিশম্' পাঠ ধরিলে—অভিনবের ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য হয়।

অভিনব নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন :—যদি কনিষ্ঠ পরিমাণের চতুরস্র নাট্যগৃহ হয়, তাহার প্রত্যেক দিকের পরিমাণ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত (৩২—৩২ হাত)। প্রত্যেক দিকে আটভাগ করিলে, সমগ্র ক্ষেত্রটি চতুঃষষ্টি ভাগে বিভক্ত হয়—ঠিক চতুরঙ্গ-ফলকের (দাবা-ব'ড়ের ছকের) মত। উহার মাঝের চারিটি ঘর—চারিদিকে আট হাত পরিমাণ—(৮—৮ হাত)—রঙ্গপীঠ। উহার পশ্চিম দিকে—পূর্ব্ব-পশ্চিমে বার হাত ও উত্তর-দক্ষিণে বত্রিশ হাত ক্ষেত্র অবশিষ্ট রহিল। রঙ্গপীঠের পরিমাণ অষ্টহস্ত সমচতুরস্র। রঙ্গপীঠের নিকটগত পূর্ব্ব-পশ্চিমে চার হাত ও বিস্তারে (উত্তর-দক্ষিণে) বত্রিশ হাত পরিমিত ক্ষেত্র—রঙ্গশিরঃ; বিকৃষ্টে যেমন এস্থলেও সেইরূপ ষড়্-দারুসন্নিবেশ কর্ত্তব্য। তাহারও পশ্চিমে—পূর্ব্ব-পশ্চিমে অষ্ট হস্ত ও উত্তর-দক্ষিণে বত্রিশ হস্ত—নেপথ্য। পূর্ব্বোক্ত ছয় খণ্ড কাষ্ঠ যাহা রঙ্গশীর্ষ-ব্যবধান—তাহার স্তম্ভগুলি ব্যতীত আরও দশটি স্তম্ভ স্থাপনীয়! চারি কোণে চারিটি। আগ্নেয় স্তম্ভ হইতে চারিহস্ত দূরে দক্ষিণ দিকে একটি স্তম্ভ। ঐরূপে নৈর্ঋত স্তম্ভ হইতে চারিহস্ত দূরে দক্ষিণে আর একটি স্তম্ভ। অতএব, দক্ষিণ দিকে দুইটি স্তম্ভ। ঐরূপ উত্তরেও দুইটি স্তম্ভ। পূর্ব্ব দিকে ঐশান অর্থাৎ ঈশানকোণ-স্তম্ভ হইতে চারিহস্ত দূরে একটি ও অগ্নিকোণ-গত স্তম্ভ হইতে চারিহস্ত দূরে অপর একটি—এই দুইটি স্তম্ভ। তিন দিকে জোড়া জোড়া করিয়া ছয়টি স্তম্ভ।. পশ্চিম দিকে ত নেপথ্য—এ কারণে সে দিক্ বাদ দিয়া অবশিষ্ট তিন দিক্ ধরা হইয়াছে। আর চারি কোণে চারিটি স্তম্ভ—মোট দশটি। এই ত হইল মণ্ডপের স্তম্ভ-নিবেশন-বিধি। স্তম্ভগুলির বাহিরে সামাজিক (দর্শক) গণের আসন কর্ত্তব্য। রঙ্গপীঠের দক্ষিণে নিবেশিত স্তম্ভদ্বয় হইতে চারি হস্ত অন্তরে—পরস্পর অষ্টহস্ত অন্তর—দুইটি স্তম্ভ; আর আগ্নেয় স্তম্ভের সম্মুখে যে পূর্ব্ব স্তম্ভ তাহা হইতে চতুর্হস্ত অন্তরে একটি দক্ষিণ স্তম্ভ। পূর্ব্বস্থাপিত দক্ষিণস্তম্ভগুলি ও দক্ষিণ ভিত্তির মাঝে তিনটি স্তম্ভ। এরূপ উত্তরেও তিনটি। মোট ছয়টি স্তম্ভ—এই ছয়টি অতিরিক্ত স্তম্ভের কথা পরে (১০০ শ্লোকে) বলা হইবে। ইহা ব্যতীত আরও আটটি স্তম্ভের কথা বলা হইয়াছে (১০১ শ্লোক)। দক্ষিণ ভিত্তির উত্তরে পূর্ব্বস্থাপিত স্তম্ভ ও ভিত্তির চারি হাত অন্তরে একটি স্তম্ভ। এইরূপ উত্তর ভিত্তির দক্ষিণ দিকে একটি। পূর্ব্বভিত্তি হইতে চারি হাত অন্তর—রঙ্গভাগদ্বয়ানুসারে দুইটি, তাহাদিগের নিকট হইতেও চারি হস্ত অন্তরে দুইটি—এই আটটি (গণনায় অবশ্য ছয়টি হয়;—আর এ স্তম্ভ-নিবেশ দুর্ব্বোধ)। এই সকল স্তম্ভ হস্তপ্রমাণ তুলার ধারক (তুলা—বরগা-জাতীয় পদার্থ—[illegible])। ইহাই চতুরস্রের স্তম্ভবিধি। বিকৃষ্টে ও ত্র্যস্রে ইহারই অনুরূপ স্তম্ভনিবেশ কর্ত্তব্য—স্ববুদ্ধি-দ্বারা উহাদিগের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—ইহাই শ্রীশঙ্কুক প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিক-সম্প্রদায়ের অভিমত।

অতঃপর বার্ত্তিককারের মত অভিনব উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককারের রচিত কারিকাগুলি এতই খণ্ডিত যে, উহাদিগের কোনরূপ অর্থ করাই দুর্ঘট। তথাপি যথাদৃষ্ট অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

অন্তে নেপথ্যগৃহ, দুইটি স্তম্ভ, চারিটি পীঠ……আর চারিটি—এই হইল দশটি (মধ্যের অংশ ত্রুটিত—অতএব বুঝিবার উপায় নাই।) ভিত্তি (ভিত বা দেওয়াল) আর স্তম্ভগুলির মধ্যে ব্যবধান হইবে আট হস্ত। (ইহার পরের দুইটি চরণের কোন অর্থ বুঝা যায় না—এমনই অশুদ্ধ পাঠ।) পীঠগত চারিটি—পিছনে ও অগ্রে—দুই দুইটি করিয়া। ছয়টি মধ্যে কর্ত্তব্য—ইহাই শাস্ত্র (নির্দ্দেশ)……পীঠগত—পশ্চাতে ও অগ্রে যে দুই দুইটি—তাহাদিগের উপরে আরও আটটি নিবেশনীয়। উহারা উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় সমস্ত রঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। রঙ্গের চারিদিকে সোপানাকৃতি পীঠ (গ্যালারি) নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। (ইহার পরের দুই চরণ অত্যন্ত ত্রুটিত—অর্থবোধ হয় না।)

বার্ত্তিককারের এই সকল খণ্ডিত কারিকার কোন একটা সঙ্গত অর্থ করা যায় না।

অভিনব বলিয়াছেন যে, এইরূপ বহু মতবাদ আছে—গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে সেগুলি তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। না করিয়া ভালই করিয়াছেন। অতঃপর তিনি নিজ উপাধ্যায়ের উপদেশানুযায়ী স্বকীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহারও মধ্যে মধ্যে অংশ ত্রুটিত হওয়ায় সমগ্র অংশ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না—তবে মোটামুটি স্তম্ভ-নিবেশের প্রক্রিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

সমগ্র প্রেক্ষামণ্ডপ—ত্রিধা বিভক্ত—ইহাই কল্পনা করিতে হইবে। ত্রিধা বিভাগ যথা—অধোভূমি (অর্থাৎ—মেঝে), রঙ্গপীঠ (বা রঙ্গমঞ্চ), ও রঙ্গ (রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্য ইত্যাদি)। এই তিনটি স্থানে স্তম্ভবিন্যাসের তিন প্রকার বিধি তিন বারে কথিত হইয়াছে—(যথাক্রমে দশ, ছয় ও আট।).

অধোভূমি বা মেঝেতে কয়টি স্তম্ভ হইবে—তৎপ্রসঙ্গে মহর্ষি বলিতেছেন—তত্রাভ্যন্তরতঃ কার্য্যা—ইত্যাদি। অভ্যন্তর—অধোভূমি। এই কারণে এই প্রসঙ্গে 'রঙ্গপীঠোপরি স্থিতাঃ দশস্তম্ভাঃ'—এ পাঠ লাগে না। রঙ্গপীঠের উপর সে স্তম্ভ তাহা অধোভূমিগত হইবে কি প্রকারে? এই কারণে—নিম্নোক্ত পাঠগুলি ভাল মনে হয়—"তত্রাভ্যন্তরতঃ কার্য্যং রঙ্গপীঠং যথাবিধি। যথা প্রযোক্তৃভিঃ স্তম্ভাঃ শুভা মণ্ডপধারিণঃ"। অথবা—"তত্রাভ্যন্তরতঃ কার্য্যং রঙ্গপীঠে যথাদিশম্ (কিংবা যথাদৃঢ়ম্)।…শাস্তা (শস্তা) মণ্ডপধারণে (কিংবা মণ্ডপরক্ষণে)"। ইত্যাদি।

যাহা হউক; এই টুকু বুঝা যাইতেছে যে, নেপথ্য-রঙ্গ পীঠাতিরিক্ত স্থান—যথায় দর্শকগণ বসিবেন (auditorium)—দশটি স্তম্ভযুক্ত হইবে। আর রঙ্গপীঠ স্বয়ং ছয়টি স্তম্ভবিশিষ্ট ও রঙ্গশীর্ষ—অষ্টস্তম্ভান্বিত হইবে—এইরূপ স্তম্ভ-বিভাগ করিতে হইবে—ইহাই আচার্য্য অভিনবগুপ্তের অভিপ্রায়—ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। স্তম্ভ কি? সমগ্র রঙ্গমণ্ডপের মধ্যে মধ্যে স্তম্ভনিবেশ কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে মণ্ডপের ছাদ কিসের উপর থাকিবে—মধ্যে মধ্যে স্তম্ভ দিয়া

ছাদটিকে দৃঢ় করার ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে স্তম্ভগুলি যাহাতে কেবল খুঁটিতে পর্য্যবসিত না হয়, সে কারণে সেই স্তম্ভগুলিতে নানারূপ কারুকার্য্যের কথা পরে বলা হইবে (শ্লোক ১০২)।

যাহা হউক, বুঝা গেল যে, অধোভূমিতে দশ স্তম্ভ। ইহার পর অভিনবগুপ্তের টীকার কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না যে কিরূপে দশটি স্তম্ভের নিবেশ কর্ত্তব্য। আমরা যতটুকু পাইয়াছি তাহারই যথাযথ অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।—

বিস্তারে দ্বাদশহস্ত পরিমাণ এইরূপ···(ইহার পর খণ্ডিত অংশ) —(এই অংশ লুপ্ত হওয়ায় স্তম্ভস্থাপনের রীতি অবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।) দুইটি স্তম্ভ ভিত্তিদ্বয় হইতে দ্বাদশ হস্ত অন্তর ও পরস্পর অষ্ট হস্ত অন্তর করিয়া এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যে দ্বারবিদ্ধতা না হয় (অর্থাৎ পরস্পর মুখামুখি ঋজু-ঋজু না হয় ;— ঋজু-ঋজু হইলে দৃষ্টি-ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এইরূপে পাঁচটি তুলার প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া দশটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভ ব্যতিরিক্ত যে ভূমি, তাহাতে দর্শকগণের আসন স্থাপনীয়—ইহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইবে—স্তম্ভ সমূহের বাহিরে সোপানাকৃতি পীঠক ইত্যাদি— (শ্লোক ৯৮)।

অভিনবগুপ্তের অভিমত হইতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, দর্শকগণের বসিবার অংশে পাঁচটি বরগা (প্রত্যেকটি সম্ভবতঃ বার হাত লম্বা)। উহাদিগের প্রত্যেকের তলায় দুইটি করিয়া স্তম্ভ— জোড়া জোড়া স্তম্ভগুলি দুই দিকের ভিত্তি (দেওয়াল) হইতে বার হাত করিয়া ব্যবধানে স্থাপিত—আর প্রতি জোড়া স্তম্ভের মধ্যে ব্যবধান আট হাত। এরূপ ভাবে স্তম্ভ স্থাপিত হইবে যে, উহারা মুখামুখি বা ঋজু-ঋজু নহে—তাহার ফলে—দর্শকগণের দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না।—ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট বোধ হয় না। *

মূল :—স্তম্ভসমূহের বাহিরে সোপানাকৃতি পীঠ—প্রেক্ষকগণের নিবেশন ভূমিভাগ হইতে উত্থিত, হস্তপ্রমাণ-উচ্চ ইষ্টক ও দারু দ্বারা নির্ম্মাতব্য। ৯৮—৯৯।

সঙ্কেত :—প্রেক্ষক-নিবেশন—দর্শকদিগের বসিবার স্থান। উহা ইট ও কাঠের তৈয়ারী। আর উহা সিঁড়ির আকারে রচিত— সম্মুখের আসনগুলি নিম্ন—পশ্চাতের গুলি ক্রমোচ্চ—পিছনের প্রত্যেক সারিটি তাহার ঠিক সম্মুখের সারি হইতে কিছু উচ্চ। ইহাই— সেকালের দর্শকগণের বসিবার আসন—বর্ত্তমানের আসন-রচনাও— ঠিক এই ভাবে করা হইয়া থাকে—গ্যালারি-নির্ম্মাণের পদ্ধতিতে। কতটা উচ্চতা হইবে—তাহা বলা হইয়াছে—হস্তপ্রমাণ উৎসেধ (অর্থাৎ উচ্চতা)। কোন্ স্থান হইতে উচ্চ ?—উত্তর—ভূমি-ভাগ হইতে উত্থিত, অর্থাৎ অধোভূমিতল (মেঝে) হইতে এক হাত পরিমাণ করিয়া উচ্চ হইবে আসনগুলি।

মূল :—রঙ্গপীঠ অবলোকনের যোগ্যরূপে আসন-সংক্রান্ত বিধান কর্ত্তব্য। ৯৯।

সঙ্কেত :—যাহাতে রঙ্গপীঠ দেখা যায়—এরূপ ভাবে দর্শকগণের আসন-রচনা করা উচিত।

মূল :—আবার মধ্যে পুনরায় দিগ্‌বিভাগানুযায়ী, মণ্ডপধারণ (যোগ্য) দৃঢ় অন্য ছয়টি স্তম্ভ তত্ত্বিৎ যথাবিধি স্থাপন করিবেন। ।১০০।

সঙ্কেত :—ষড়স্তানন্তরে চৈব পুনঃ স্তম্ভান্ যথাদিশম্ (বরোদা) ষড়স্তান্ সুন্দরান্ দত্বাং······(কাশী); ষড়স্তান্ সান্তরান্ দত্তাং (পাঠান্তর)। বিধিনা স্থাপয়েৎ তত্ত্বজ্ঞঃ (বরোদা); প্রাজ্ঞঃ (কাশী)। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—এই ছয়টি স্তম্ভ রঙ্গপীঠে ন্যস্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগের স্থাপন-প্রক্রিয়া অভিনব পরে বলিবেন।

মূল :—আবার তাহাদিগের উপরেও পুনর্ব্বার আটটি স্তম্ভের কল্পনা করিবে। অতঃপর বিদ্ধাস্থ ও অষ্টহস্ত পীঠ তাহাদিগের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। ১০১।

সঙ্কেত :—বিদ্ধান্তমষ্টহস্তঞ্চ পীঠং তেষু ততো ন্যসেৎ (বরোদা); সংস্থাপ্যং চ পুনঃ পীঠমষ্টহস্তপ্রমাণতঃ (কাশী)।

মূল :—তদ্বিধিজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক মণ্ডপধারণে (সমর্থ) স্তম্ভসমূহ প্রদাতব্য ;—উহারা ধারণী-ধারণ ও শালস্ত্রী-কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইবে। ১০২।

সঙ্কেত :—ধারণী—অভিনবগুপ্ত অর্থ করিয়াছেন—'তুলা' অর্থাৎ কড়ি বা বরগার মত কোন জিনিষ। ধারণী-ধারণ—ধারণী ধারণে সমর্থ—স্তম্ভের মাথায় কড়ি-বরগা বসান হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য। শালস্ত্রী—শালভঞ্জিকা—কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা—গৃহশোভার্থ ব্যবহৃত হয়।

অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার সারার্থ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

১০০ শ্লোকে যে অন্য ছয়টি স্তম্ভের কথা বলা হইয়াছে, ঐ স্তম্ভগুলি রঙ্গপীঠগত স্তম্ভ। ১০১ শ্লোকে যে বলা হইয়াছে—আবার তাহাদিগের উপরের আটটি স্তম্ভ স্থাপিত হইবে। 'তাহাদিগের উপরে' বলিতে—'পূর্ব্বোক্ত ষট্ স্তম্ভের উপরে'—এরূপ অর্থ যেন কেহ না করেন। 'উপরি' (মূল)—উপরে—উপর দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিক্ ঘেঁসিয়া। রঙ্গপীঠ যাহার মুখ-স্থানীয় সেই নেপথ্যগৃহের বারুণ কোণে (অর্থাৎ পশ্চিমে)—ইহাই অভিনবের সিদ্ধান্ত।

উপরি বলিবার আরও একটু উদ্দেশ্য আছে ; চতুরস্রে রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশিরঃ সমতল হইলেও বিকৃষ্ট রঙ্গগৃহে রঙ্গশিরঃ রঙ্গপীঠ হইতে উচ্চ ; এই কারণেও 'উপরে' শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই কারণেই নেপথ্য হইতে রঙ্গপীঠে পাত্র-প্রবেশের একটি নাম—'রঙ্গাবতরণ' বা রঙ্গপীঠে (রঙ্গশিরঃ হইতে) অবতরণ।

তাহা হইলে মোট সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল এই যে—(১) প্রথমতঃ দশটি স্তম্ভ (৯৭ শ্লোক)—প্রেক্ষকস্থানে (auditorium); (২) দ্বিতীয়তঃ ছয়টি স্তম্ভ (১০০ শ্লোক)—রঙ্গপীঠে (stage); ও (৩) তৃতীয়তঃ আটটি স্তম্ভ (১০১ শ্লোক)—নেপথ্যগৃহ রঙ্গপীঠ ইত্যাদি স্থানে।

ইহাই চতুরস্র-রঙ্গে স্তম্ভ-নিয়ম।

[ক্রমশঃ

★

জগদীশ গুপ্ত

সুজাতপুরের অক্ষয়ানন্দ তাঁর পুত্রবধূকে, অর্থাৎ তাঁর পুত্র অমৃতানন্দের স্ত্রীকে আনিতে গেছেন। পুত্রবধূ মায়া স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া চলিয়া গেছে ; এবং তাহার বীতশ্রদ্ধতার কথা সে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া গেছে।

অল্প দিন হইল বিবাহ হইয়াছে, মাস তিনেকও হয় নাই—ইহারই ভিতর এত কাণ্ড!

পুত্র অমৃতকে সৎপথে আনিতে অক্ষয় তার বিবাহ দিয়াছেন সুন্দরী মায়ার সঙ্গে। অমৃতের স্ত্রী মায়ার রূপ নিখুঁত ; চন্দ্রের মতো অশেষ তার দেহের লাবণ্য, অঙ্গের প্রভা ; মুখের শ্রী আর গঠন-সুষমা অতুলনীয়। অত্যন্ত সচেতন মনে সে রূপ বেশীক্ষণ দেখা যায় না।

ফাল্গুনের শুভ গোধূলি-লগ্নে বিবাহ—উভয় পক্ষই ধনী, এবং জাঁক খুব—

কিন্তু সকল শোভা উৎসব হাসি আনন্দের অনতিক্রম্য ঊর্দ্ধলোকে স্থান পাইয়াছিল বধূ মায়া, তার রূপের জ্যোতিঃসিংহাসনে। সম্প্রদানের পর কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত জয়রাম স্মৃতিতীর্থ "মাকে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন" বলিয়া অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিতেই সভা থমকিয়া গিয়াছিল—এত কলরব চঞ্চলতা এক নিমেষে নিঃশব্দ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল ; এত সজ্জা এত আয়োজন এত বর্ণ এত স্পন্দন অনিন্দনীয়তা অতিক্রম করিয়া সভার সম্মুখে বিরাজ করিয়াছিল আনত-আননা কন্যার মুখের সেই পেলব পুলকশ্রীটি—তাহা অনুপম। ক্ষণেকের জন্য সকলেরই মনে হইয়াছিল, এই কন্যা ভুবনমোহিনী কমলার অবিরামবাহী আশীর্ব্বাদের যে বিত্ত মুখশ্রীতে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাই আমরা নতশিরে গ্রহণ করিলাম···

তার পর বোধ হয় সেই রূপের সূত্রেই কৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে আশীর্ব্বাদ উত্থিত হইয়াছিল : "বধূ, তুমি সুখে থাকো"···তার পর আরো মনে হইয়াছিল, যাহার আচরণে এই রূপের উপর ছায়া পড়িবে তাহার অপরাধ হইবে ক্ষমার অযোগ্য।

অমৃত বলিতে লাগিল, তোমার সঙ্গে না কি আমি বেইজ্জত ক'রে এসেছি, লোকে তাই বকছে হি, হি, হি

সেদিনকার সেই বিস্মিত স্মৃতিটি, একটা আঘাতের মতো, অনেকের মন হইতে আজও মুছিয়া যায় নাই।

কিন্তু অমৃত তার মর্য্যাদা রাখিল না—সে যেন বিকৃত-মস্তিষ্ক! পৃথিবীর জীবনের জীবন যে রূপ, সেই রূপের নাগাল পাইয়াও সে যেন উন্মীলিত চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে না···

বন্ধুরা মনে মনে ভাবি ক্ষুণ্ণ হয়—

কল্পনায় নিজেকে মায়ার মত সুন্দরীর প্রিয়তমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঈর্ষায় তাহাদের অনন্ত গাত্রদাহ ধরিয়া যায়। অমৃতের তরফ হইতে স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা প্রবল উল্লাস আর উচ্ছ্বাস দেখিবার আশা লইয়া কথাটা তারা তোলে···

কিন্তু অমৃত বলে,—ও আর কত দিন। পানসে পুরনো হল' বলে'।···আরো বলে,—ভালবাসা আদায় করা, আর, তা-ই নিয়ে মাথা ঘামানো আর ওলট-পালট হওয়া আমার ধাতে মেজাজে পোষায় না।

শুনিয়া বন্ধুবর্গের মনে হয়, মায়া তার স্বামীর নীরস ধর্ম্ম আর অনুভবহীন বর্ব্বরারণ্যে নির্ব্বাসিতা হইয়াছে। তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া ও-প্রসঙ্গ ত্যাগ করে; কারো কারো নিশ্বাসই পড়ে।

মায়ার আগমনে অক্ষয়ানন্দের অন্তঃপুরের শ্রী ফিরিয়া গেছে। অপরিচ্ছন্নতা আগেও ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু তাহারও অতিরিক্ত একটা স্থানে সবারই অন্তরসত্তার অস্বচ্ছতা কাটিয়া যেন শরৎ-জ্যোৎস্নায় আগমনীর একটা সুনির্ম্মল মিষ্ট সুর সেখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। মায়ার সর্ব্বাঙ্গে শরৎ-লক্ষ্মীর ঝলমল [illegible] রূপ—অতুল আলোক আর ভরণাভরণের সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া সে যেন জগদ্ধাত্রীর মতো পূজার পাত্রী।

শাশুড়ী কল্যাণীর ইচ্ছা করে, বধূকে তিনি বুকে করিয়া রাখেন; বলেন,—"বউমা আমার লক্ষ্মী"···

কথাটা সত্য—শুধু রূপে নয়, গুণেও। মায়া তার মুখের হাসি কি হাতের স্পর্শ দিলেই তুচ্ছতম বাক্যটি আর বস্তুটি সম্পদে স্বাদে বর্ণে রমণীয় হইয়া ওঠে, তাহাতে সন্দেহ কাহারো নাই।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ার সঙ্গে এক থালায় ভাত খাইবার জন্য ঝগড়া করে। মায়া ভাতে হাত দিলেই ভাতের স্বাদ না কি ভালো হয়!

তাহাকে লইয়া এম্‌নি কাড়াকাড়ি।

কিন্তু অমৃত সে-সব কিছু বোঝে না, সে-সবের তোয়াক্কাও রাখে না।

মনের কোন্ কথাটা আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বেশি করিয়া ফোটে, কোন্ কথাটার জবাব দিতে যাইয়া সেই কথাটাই ভুলিয়া যাইতে হয়; কোথায় অকারণ কথাটাই গোপন কারণে ভরপুর হইয়া দেখা দেয়—এ-সব সূক্ষ্ম রুচি নিগূঢ় ব্যাপার [illegible] [illegible] মতো, অমৃতানন্দের অন্তর-লোকের একেবারে বাহিরে; [illegible] যেমন [illegible] নাই, তেমনি [illegible] নাই— [illegible] এত স্থূল যে তার তুলনা নাই···

[illegible] থাকে—কেবল তার [illegible]

দু'টি শয্যার প্রান্তে দেখা যায়; কিন্তু তার পা দু'খানির দিকে অমৃত একবার চাহিয়াও দেখে না; কোনো সূত্রেই এ-কথাটি তার মনে পড়ে না যে, ঐ আবরণের নিয়ে যে নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া আছে, মনে মনে সে চুপ করিয়া নাই—থমিতে হীরার মতো তার সুকুমার হৃদয় আধারে অতি উজ্জ্বল কত স্বপ্নের মুহুর্মুহুঃ উদ্গম, আর, স্বপ্নে স্বপ্নে কত আলিঙ্গন ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই···

প্রভাত হইতে এখন পর্য্যন্ত মনে মনে সে কত প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়া, তার কত উত্তর সাজাইয়া সাজাইয়া, ভাঙিয়া আবার গড়িয়া, কত হাসি হাসিয়াছে···আর, সেই প্রশ্নোত্তরের জটিল গ্রন্থিমালার দিকে চাহিয়াই তার মন দু'চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে···

অমৃতের মনে আসে না, সে তাহারই প্রিয়তম। প্রিয়তমার অভিসারের পদধ্বনি তার কানে পৌঁছায় না। মায়া দিবাস্বপ্নে অভিসারে যাত্রা করিয়া নীরব নিভৃত নিশীথে তার একান্ত সন্নিকটে আগমন করে—কুঞ্জে কুঞ্জে সে কুসুম বিকসিত দেখে···

কল্পনায় অমৃত তা' দেখিতে পায় না—প্রতীক্ষার আর প্রত্যাশার মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিবার মতো সূক্ষ্ম রসবোধ তার নাই···

সে কত স্থূল, আর কত নিরঙ্কুশ অমৃত তাহা এক দিন বুঝাইয়া দিল।

মায়া স্বামীর রকম, অর্থাৎ অর্থহীন বাগাড়ম্বর আর শুষ্ক প্রসঙ্গে সজীবতা দেখিয়া কেবল বিস্মিতই হয় নাই, অতৃপ্তি বোধ করিতেছিল; এমন সময় এক দিন স্বামীর বিদ্যা-বুদ্ধি অর্থাৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়া গেল।

অমৃত বলিল,—তোমার দাদা বিদ্যে জাহির করার আর স্থান পেলেন না; বিদ্যে ফলিয়ে ইংরিজিতে চিঠি লিখেছেন আমাকে। আরে ইংরিজি আমরাও জানি। বলিয়া সিগারেট ধরাইল।

স্বামী ইংরেজী জানেন এ সুসংবাদে সুখ বোধ করিবার বয়স মায়ার হইলেও, কেবল সেই সুখটিকেই অনন্যশরণ হইয়া উপভোগ করিবার সময় সেটা নয়। নিজের ইংরেজি জানার খবরটা এত আক্রোশ সহকারে দিবারই বা মানে কি! কারণ না বুঝিতে পারিয়া মায়ার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল···

সে ত' জানে না যে, 'ইংরিজি জানা' এই কথাটি ইংরেজি জানা না-জানা উপলক্ষে অত্যন্ত অপদস্থ হইয়াছে, আজই। আড়ম্বর করিয়া সে শ্যালকের পত্র লইয়া বন্ধুবর্গকে দেখাইতে গিয়াছিল—তখন নব-কুটুম্ব কর্তৃক বিদ্যা জাহিরের ধৃষ্টতায় অমৃতের অসন্তোষের কারণ ঘটে নাই, বরং পত্রলেখক নিজের লোক বলিয়া সে গর্ব্বই অনুভব করিয়াছিল···

কিন্তু কে জানিত, বন্ধুরা ইংরেজি পত্র দেখিয়া বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাদের সমক্ষে সেই পত্র পড়িতে এবং ব্যাখ্যা করিতে তাহাকেই বলিবে, এবং সে তাহা পারিবে না।

তাহা সে পারিল না দেখিয়া বন্ধুরা জানিতে চাহিয়াছিল,—কি বলেছিলি শ্বশুরবাড়ীতে?

—কিসের কথা?

—ইংরেজি জানার কথা।

—কিছুই বলিনি।

—তবে তারা লোক এ-ব্যাপার করলেন কেন

—তা [illegible] জানেন।

—তবে ফেরত পাঠিয়ে দে এ-চিঠি তাঁর কাছে ; আর, লিখে দে ; "গোটা গোটা অক্ষরে বাংলা করে পাঠাও"—

ঐটুকু শুনিয়াই এবং বাকি বক্তব্য না শুনিয়াই অমৃত শ্যালকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবং কৃতবিত্ত আপনার লোক হইয়াও শ্যালকের প্রতি তার মার্জনার ভাব এখন পর্য্যন্ত নাই।

মায়ার সঙ্গে উগ্রতর বা কালোপযোগী কথা তার বিশেষ কিছু হয় নাই ; সুতরাং গণপতির উপর রাগ করিয়া গণপতির ভগিনীকে ইংরেজি-জানার কথাটা সে জোরের সঙ্গেই জানাইয়া দিয়া মন হল্‌কা করিল।

তার পর খানিক্ হুশ-হুশ করিয়া সিগারেট টানিয়া অমৃত অনতিপুরাতন স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে এবার অন্য কথা আনিয়া ফেলিল ; কথাটা সুখদ ; কাজেই এবার সে হাসিল, আর বলিল,—বাসর-ঘরে তোমার ঠিক্ বাঁ পাশেই যে-মেয়েটি বসে ছিল সে কে ?

খবর হিসাবে মায়া বলিল,—আমার সই।

উৎফুল্ল কণ্ঠে অমৃত বলিল,—তা হলে ত' আমারও সই ! সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

মায়া বুঝিল না, কিন্তু সইয়ের যার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে ঈর্ষাপরবশ হইয়া অমৃত তাহারই উদ্দেশে বলিল,—শালা।···বলিয়া একটু হাসিল—তার পর জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বড় না ছোট ?

—সে আর আমি দু'মাসের ছোট-বড়। সে-ই বড়।

অমৃত আর প্রশ্ন করিল না ; বলিল,—বেশ চোখ দু'টি।

ইন্দিরার চোখ দু'টি বাস্তবিকই ভাল।

গল্পচ্ছলে বা প্রশংসাচ্ছলে ভাল চোখকে ভালো বলা অবৈধ না-ও হইতে পারে—সে-চোখ পরস্ত্রীর হইলেও। কিন্তু অমৃতানন্দের কণ্ঠস্বরে কি যেন ছিল, মায়ার চোখ তাহাতেই সজল হইয়া উঠিতে চাহিল। মায়া স্বামীর মুখ দেখিতে পায় নাই, কল্পনায় পরস্ত্রীর দেহ ঘনিষ্ঠতার সহিত স্পর্শ করিতে থাকিলে মুখের চেহারা কেমন হয় তাহা মায়ার চোখে পড়িল না ; কিন্তু যে-সুরে চোখের প্রশংসা উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট—যে-সুরে যেন প্রাণ আছে, আর, সে-প্রাণ তৃষ্ণাতুর···

মায়ার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল তাহা সে-ই জানে—কথা কহিবার সামর্থ্য তার রহিল না।

উত্তর যে পায় নাই তাহা অমৃতের মনেও হয় না—সে বিভোর হইয়া ভাবে সেই মেয়েটির কথা—হাসি-কৌতুকে ঝলমল, আর, চমৎকার তার চক্ষু দু'টি। মায়ার বর্ণ উজ্জ্বল বেশী, তাহাতে অসাধারণত্ব কিছু আছে বলিয়া অমৃতের মনে হয় না ; কিন্তু ইন্দিরার চক্ষু দু'টি অতি কোমল, চল-চল—এমন অসাধারণ যে, এই শহরে কই, তেমনটি ত দেখা যায় না। অমৃতের ক্ষোভ জন্মে। এ, অর্থাৎ মায়া ত' আছেই, কিন্তু সে কেন একেবারেই পরের হইয়া গেল ! অমৃতের জীবনে বিতৃষ্ণা ধরিয়া যায়, মনে হয়, তাহাকে এখনই যদি কেহ জবাই করে তবে দুঃখ নাই।

—বাসরে কি গল্প হ'ল বউয়ের সঙ্গে বল্। বলিয়া সুধীর, সত্যেন, ইত্যাদি সবাই অমৃতকে ধরিয়া বসে।

অমৃত ভ্রূভঙ্গী করে, বলে,—কথায় জবাবই পাইনে তা গল্প কি করব।

সুধীর হাসিয়া বলে,—কি কথার জবাব পাস্‌নি ?

অমৃত তখন সেই মেয়েটির কথা বলে—যে তার স্ত্রীর সই, আর যার নাম ইন্দিরা, আর যার চোখের কথা ভোলা যাইতেছে না··· অমৃত তার মনের কথা এমন করিয়া লালসা দিয়া ফলাইয়া গলা ভরিয়া বলে যেন মায়ার সঙ্গে বিবাহ না হইয়া সেই মেয়েটির সঙ্গে হইলেই আক্ষেপের কিছু থাকিত না এবং আরো যা ইঙ্গিত করে তা না বলাই উচিত···

শুনিয়া সত্যেন বলে, পাঁঠা।

—কেন, কেন, পাঁঠা বল্‌ছ' কেন ?

—বুদ্ধিতে আর আঁটিসনে। ওরে নির্বোধ, ওদের প্রাণে কি ও-কথা সয়। তুই ও-কথা তুললি কেমন করে ?

—ক্ষমতা থাকলেই পারা যায়। বলিয়া অমৃত এমন শক্তিশালী ভাব ধারণ করে যেন গ্রাহ্য করিবার মতো বিরুদ্ধ পক্ষ সংসারে নাই।

কিন্তু অমৃত একেবারে তাজ্জব হইয়া গেল, তার পরদিনই ; ঘুণাক্ষরেও সে ভাবে নাই যে, তাহার কেবল ঐ কথাটাতেই সমগ্র পাড়াটা দু'বাহু তুলিয়া একেবারে নাচিয়া উঠিবে।

অমৃতর বন্ধু সুধীরও নব-বিবাহিত ; নব এই হিসাবে যে, বিবাহ করা উচিত হইয়াছে কি না এ-প্রশ্ন এখনো তার মনে ওঠে নাই ; আর, সে অপরার চোখে এমন কিছু দেখে নাই যে, স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া অপরূপনয়নাকে সম্মুখে বসাইয়া রাখিবে। অমৃত স্ত্রী পাইয়াছে অদ্বিতীয়া সুন্দরী ; তদুপরি চোখের দরুণ স্ত্রীর সইকে [illegible] লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অমৃতর পক্ষে বাতুলতা না হোক্, মানুষের পক্ষে গল্পের বিষয় বটে।

সুধীর বলিল,—আমাদের বন্ধুটি বড় রসিক লোক।

—কার কথা বল্‌ছ' ?

—অমৃতর কথা। বাসর-ঘরে তার স্ত্রীর সইকে সে দেখে' এসেছে। বলিয়া সুধীর হাসিল।

দেখাতেই যে কাহিনী শেষ হইয়া যায় নাই অঞ্জা তাহা বুঝিল ; বলিল,—বল্‌ছিলেন না কি ?

—হ্যাঁ।

—তার পর ?

—তার পর আর কি। মন পড়ে' আছে সেখানে। অমৃত মন খুইয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

এই কথারই প্রতিধ্বনি লইয়া সুধীরের স্ত্রী অঞ্জা আসিল মায়ার কাছে—

কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, সইটা কে, ভাই ?

প্রশ্নটি শুধুই কৌতুক—

কিন্তু মায়া চম্‌কিয়া মুখ টানিয়া লইল। অঞ্জার ঐ তরল প্রশ্নে অনাবশ্যক কৌতূহল, অর্থাৎ অনধিকারের অপরাধ হয়তো ছিল ; কিন্তু সেটা তেমন মর্ম্মান্তিক নয় ; মর্ম্মান্তিক অবস্থায় ছিল মায়ার মন ; তার মন পূর্ব্ব হইতেই ঐ সম্পর্কে বেদনায় ভারাক্রান্ত ছিল বলিয়াই কৌতুকটা সে সহ্য করিতে পারিল না।···কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে

—পরিহাস কৌতূহল হাসি-টিটকারির সৃষ্টি করিয়াছে ; এ-সব চিন্তা কঠিনই বটে ; আর, কঠিনতর কথা ইহাই যে, তার সইয়ের কথা বলিয়া বেড়াইয়াছেন তার স্বামী নিজে—স্ত্রীর সইয়ের প্রতি লুব্ধতায় কুৎসিত উক্তি করিয়া আপন স্ত্রীকেই তিনি অপমান করিয়াছেন···

তার উপর, এই কথার সঙ্গে সে এমন ভাবে বিজড়িত যেন তাহাকে অধঃস্থলে নামাইয়া দিয়া স্বামী তাহাকে লাঞ্ছিত করিতেই চান্—

মায়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল—

এবং সঙ্কট তৎক্ষণাৎ গুরুতর হইয়া উঠিল এই কারণে যে, মায়ার এই অশ্রু-সঙ্কটের সময় শাশুড়ী কল্যাণী ঘটনা-স্থলে আসিয়া দেখা দিলেন, এবং জানিতে চাহিলেন, বধূর এই অশ্রুপাতের কারণ কি ?

জানিতে চাহিয়া তিনি অম্বাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—

অম্বা থতমত খাইয়া প্রথমে কিছুই বলিতে পারিল না ; কিন্তু কল্যাণী তাহাকে ছাড়িলেন না ; এবং তাঁহারই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর [illegible]য় উত্তর-পরম্পরায় অম্বা সমুদয় কাহিনী উদ্ঘাটিত করিয়া [illegible]

শুনিয়া কল্যাণীর ধৈর্য্যচ্যুতি এবং কণ্ঠনিনাদ একই সঙ্গে না জানিয়া পারে নাই ; অবশ্য অম্বাকে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কিছু বলিলেন না ; সাধারণ ভাবে জানিতে চাহিলেন, পাড়ার বউ-ঝিদের পরের ব্যথায় এই মাথা টিপ্‌টিপ্‌ কিসের জন্য ? নিজের নিজের কর্ম্ম লইয়া স্ব স্ব স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করাই কি তাহাদের কর্ত্তব্য নহে ? এবং তাহার ব্যতিক্রম কি অতিশয় ঘৃণ্য নির্লজ্জতা নহে ?

এমনি আরও কত প্রশ্ন কল্যাণী করিলেন ; কিন্তু তার একটিরও সদুত্তর না থাকায় অম্বা চুপ করিয়া রহিল ; এবং সুবিধা বুঝিয়া যখন সে- গাত্রোত্থান করিল, তখন মায়া লজ্জার উপর লজ্জা পাইয়া মুখ তুলিতে পারিতেছে না ; আর পুত্র বধূর সমক্ষে নিজের স্বরূপ উন্মোচিত করিতেছে দেখিয়া কল্যাণীর মনস্তাপের অন্ত নাই।

পরমা সুন্দরী নূতন একটি বউয়ের বরূপ হিসাবে অমৃত মানুষের কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল—স্ত্রী-পুরুষ অনেকেরই ; সেই নূতন বউ নির্য্যাতিতা হইয়াছে শুনিয়া অনুকম্পা বশতঃ প্রবীণা প্রতিবেশিনী কেহ কেহ দেখা করিতে আসিলেন—

হরিপ্রিয়া আসিলেন ; কল্যাণীকে খুব গোপনে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—কথাটা বলতেও পারি নে, না বলেও পারি নে ; সত্যি কি মিথ্যে তা' ঈশ্বর জানেন। শুনলাম, ছেলে না কি বাসর-ঘরে কাকে দেখে ভালবেসেছে ?—বলিতে বলিতে হরিপ্রিয়ার মুখমণ্ডল দুর্ভাবনায় কালো হইয়া উঠিল।

কল্যাণী বলিলেন,—তোমার সে-কথায় কাজ কি দিদি ? আর, ছেলে কা'কে ভালবেসেছে তা-ই বা তুমি জানলে কি করে। বউকে সে শুধিয়েছিল তার সইয়ের কথা।

অমৃতকে না চেনে এমন মানুষ এ-দিকে নাই। সুতরাং হরিপ্রিয়া মনে মনে হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সে-কথায় সায় দিলেন ; বলিলেন,—আমিও ত' তা-ই বলি। অমৃত ত' তেমন ছেলে নয়। কিন্তু লোকে যে বড়ো বলছে, বোন্ ; বড়ো কুৎসা করছে !

—বললে কি আর করব' বলো ? তুমিও ত' লোকেরই [illegible] জন। অমৃত তেমন ছেলে নয় যদি জানো [illegible] [illegible] না [illegible] মুখ[illegible], তুমি চুপ করে' থাকলেই পারতে।

হরিপ্রিয়াকে ঐ ভাবে বিদায় করা হইল। সন্ধ্যার পর আসিলেন কাত্যায়নী। তাঁহাকেও কল্যাণী ঐ ভাবেই বিদায় করিলেন, আর, ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন—

ছেলে তাঁদের বুকেই বাস করে ; তাকে তাঁরা জানেন ; তাহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা শোকাশ্রু মোচন করিয়াছেন—তাহাকে সৎপথে আনিতে তাহার বিবাহ দিয়াছেন ; কিন্তু এমন করিয়া চারি দিক্ আঁধার করিয়া সে যেন আগে কখনো কষ্টদায়ক হইয়া ওঠে নাই। মাতৃ-হৃদয়কে সন্তান আচ্ছন্ন করিয়াই থাকে—স্বচ্ছ উজ্জ্বল অমৃতময় সে অনুভূতি ; প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম দান, অনুভব করিতেই হইবে। কিন্তু আজ সে যেন নিশ্বাসে উদ্‌গীরিত বিষে দৃষ্টিকে অন্ধ, আর অন্তরের সমস্ত মুখরতা ও তন্ময়তাকে নিরোধ করিয়া অস্বাভাবিক জড়বস্তুর মতো চাপিয়া বসিয়াছে···

তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। তিনি জননী—তাঁর তা' নাই ; কিন্তু বধূটি ! ছেলেকে বধূ চিনিয়া ফেলিলে কি দশা তার আর এই সংসারের হইবে, এবং কেমন করিয়া তাহাকে নিরাপদে অন্তরালে রাখিবেন, এ চিন্তায় বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁর অন্তর নিয়ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে···

কিন্তু আজ আর ঢাকিবার কিছু বোধ হয় নাই—

কল্যাণীর চোখে জল আসিল।

বধূর জীবনের এই সবে উষা—হৃৎকমল স্ফুটনোন্মুখ ; জীবনের যত হর্ষ, আলো, মধু সবই এখন অনাগতের গর্ভে লুক্কাইত। কিন্তু যে একটি পরম শুভ মুহূর্ত্তে আত্মসমর্পণের পূর্ণতায়, সমগ্রতায়, আর রসপ্রবাহে প্রাণ তার নিজস্ব লোকে বিকসিত হইয়া ওঠে, সেই মুহূর্ত্তকে ধরা দিতে আসিয়াই পলায়ন করিয়াছে, যাহার উপর চির-সুন্দর আর চির-তন্ময় সুখের সৌধ গঠিত হইয়া ওঠে, সেই মুহূর্ত্তটি সেই জিনিষ ; কিন্তু সেই অমূল্য অমর মুহূর্ত্তটির সশঙ্ক সচকিত পলায়নের নিরাশ্বাস বেদনার একটি পিণ্ড বধূর বুকের চারি প্রান্ত জুড়িয়া বসিয়াছে···এই পরম সত্যটি সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া কল্যাণী অনুভব করিতে লাগিলেন—তাঁর নারী-হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

কিন্তু আরো ব্যাপার ঘটিল আরো পরে। হরিপ্রিয়া, কাত্যায়নী, প্রভৃতি কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়ার পর মূল কথাটা ক্রমশঃ অধিকতর পল্লবিত এবং পত্রোল্লাসে অধিকতর রম্য হইয়া রটিতে রটিতে এই রূপের কমনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল।

অমৃত বাসর-ঘরে পরের মেয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল ; তাহার ফলে সে প্রহার খাইতই, কিন্তু নিতান্তই বাসর-ঘরের জামাই, আর, সেই মেয়ের বাবা তার শ্বশুরের বিশেষ বন্ধু বলিয়াই বাঁচিয়া গেছে। সেই মেয়েটির ধারালো নখের দাগ অমৃতের ডান হাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে—ইত্যাদি।

অকস্মাৎ [illegible] ঘটনা অস্বীকার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন ; তাঁর দুঃখেরও অবধি রহিল না ; কিন্তু অমৃতের সবই বিপরীত ; গ্লানিকর এ অবস্থায় অপর লোকের বোধ হয় মাথা হেঁট হইয়া যাইত —কিন্তু অমৃতের পুলক স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল—

বলে, "এই দেখ তার কামড়ের দাগ"—বলিয়া সে-কাজের একটা

কাটা দাগ মানুষকে ডাকিয়া দেখায়, আর দাঁত মেলিয়া হা হা করিয়া হাসে।

পাড়ার বনেদি ঠান্‌দিকেও দাগটা সে দেখাইল—

ঠান্‌দি বলিলেন, দূর শালা বেহায়া।

অমৃত বলিল,—তুমি ত' বেটাছেলে নও; বেহায়াপনার মজা তুমি বুঝবে কি?—বলিয়া চোখ ঠারিল, যেন অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যাবতীয় বেহায়াপনার গৌরব তার অদৃষ্টের হিসাবের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে; আর, ভবিষ্যতের কাছেও এই গৌরবের সমর্থন তার প্রাপ্য।

খাটে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে অমৃত বলিল,—একটা পান দাও দিকি। তুমি পান সাজো বেশ।

মায়া তখন পানই সাজিতেছিল—মাথা হেঁট করিয়া তখনই সে পানের দিকে তাকাইয়া সন্তসাজা পানে একটি লবঙ্গ গুঁজিয়া দিল। —একটি রৌদ্ররেখা ঊর্দ্ধের ক্ষুদ্র একটি ছিদ্রপথে অবতরণ করিয়া মায়ার কানের দুলের উপর পড়িয়াছে; দুলের মৃদু মৃদু আন্দোলনে অপরূপ রৌদ্রদ্যুতি মুহুর্ম্মুহুঃ ছিটকাইয়া চলিয়াছে…

অমৃত বলিল,—চমৎকার! দাও একটা পান।

মায়া খিলিটি হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া অমৃতের হাতে দিল; খপ করিয়া খিলিটি গালে পুরিয়া অমৃত বলিল,—শুনছ সব লোকের কথা?

নূতন বউয়ের সর্ব্বদাই ভয়, পাছে লোকে কিছু বলে; মনে মনে সে চমকাইয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, লোকের কথা তাহার সম্পর্কে নয়।

অমৃত বলিতে লাগিল,—তোমার সইকে না কি আমি বেইজ্জত করে' এসেছি—লোকে তা'-ই বলছে। হি হি হি…

অমৃত মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হি হি করিয়া অকাতরে অনর্গল হাসিতে লাগিল; মায়া তার নিবিড়কৃষ্ণ চক্ষু দু'টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—অপার লজ্জায় আর বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সম্বিৎ তার স্বামীকে এবং তার নিজেকেও অতিক্রম করিয়া কোন্ শূন্যে নিরুদ্দেশ হইল তাহা কেউ জানে না…

অমৃত বলিতে শুরু করিল,—মাইরি, লোকের আক্কেল দেখ! বিয়ের রেতে—

কিন্তু হঠাৎ বাধা পাইয়া তাহাকে কথা বন্ধ করিতে হইল; মায়া বসিয়া পড়িয়া দু'হাত দিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—চুপ করো, তোমার পায়ে ধরছি।—বলিয়া মায়া যখন কাঁদিয়া ফেলিল তখনও অমৃত হাসিতেছে। তাহার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই নিছক্ হাসি-মস্করা তামাসার কথা—কথাটার শেল কোথায় তাহা তার জানা নাই।

কল্যাণীর অনুমান ঠিক্—মায়ার হৃদয় নিরাশ্বাসে বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেছে; কিন্তু সেই বেদনার বশেও যে-কথাটা তার মনে হয় নাই তা' মনে হইল সেই দিনই সন্ধ্যার পর।

কল্যাণী রান্নের রান্না চাপাইয়াছেন; মায়াকে তিনি কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন; সে তাঁর হাতের কাছে বসিয়া 'মাল-মসলা' যোগাইয়া দিতেছে।

—আর একটু নুণ দিই? ধনে'-বাটা এইটুকুতেই হবে? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী মায়াকে প্রকারান্তরে শিক্ষা দিতেছেন—

এমন সময় উঠান হইতে কে যেন ডাকিল, মা?

অপরিচিত নারী-কণ্ঠের ডাক শুনিয়া কল্যাণী উনুনের জাল কমাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। চাঁদের অল্প আলোকে আবছায়া মূর্ত্তিটি দাঁড়াইয়াছিল—

কল্যাণী তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—কে তুমি?

মেয়েটি বলিল,—আমায় তোমরা চেন না মা, আমি বাগ্‌দী-পাড়ার। বলিয়া মেয়েটি আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

মায়া আসিয়া শাশুড়ীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল—

মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতেই জিজ্ঞাসা করিল,—এ বউটি কে?

কল্যাণী বলিলেন,—আমার বেটার বৌ।

তার পর তিন জনই নিঃশব্দ, অকারণে সময় নষ্ট হইতেছে বলিয়া কল্যাণী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁর আঁচ বহিয়া যাইতেছে—

বলিলেন,—খামকা এসে কাঁদতে বস্‌লে—কি হয়েছে তোমার? এখানে কেন?

মেয়েটি বলিল,—আমি আর বাঁচি নে, মা; আমায় বাঁচাও।

অকস্মাৎ বিভ্রম বিস্ময় দূর হইয়া কল্যাণীর আত্মা ধড়ফড় করিয়া উঠিল; যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল—তাহারই খর আলোকে তিনি সব দেখিলেন; কি কারণে মেয়েটি এমন অসময়ে, এবং এত বাড়ী থাকিতে কেন তাঁহারই বাড়ীতে কাঁদিয়া পড়িয়াছে তাহা জানিতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুল হইল না; বুঝিতে পারিয়াই তিনি মায়াকে একবার চোখের কোণে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ অতিশয় ক্রোধের অভিনয় করিলেন; চীৎকার করিয়া বলিলেন,—এ বালাই আমার দুয়োরে মরতে এল কেন! চলে যা, চলে যা।—বলিয়া তিনি এমন দ্রুত-বেগে হাত নাড়িতে লাগিলেন যেন হাতের হাওয়া দিয়াই মেয়েটিকে উড়াইয়া দিতে চান্।

এখানে আসাও ভুল হইয়াছে মনে করিয়া মেয়েটি বলিল, "যাই"। বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল; এবং সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই যে কাণ্ডটা চক্ষের নিমিষে ঘটিয়া গেল, কল্যাণী তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও প্রস্তুত ছিলেন না—মেয়েটিও না; মায়া ছুটিয়া যাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল; বলিল,—তুমি যা' বল্‌তে এসেছিলে আমায় বলে' যাও।

মেয়েটি অবাক্ হইয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল…

—বল। বলিয়া মায়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

—না। বলিয়াই সেই মেয়েটি উঠানের মাটিতে বসিয়া পড়িয়া এমন করিয়া কাঁদিতে লাগিল যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সে তাহার পরমায়ু নিঃশেষিত করিয়া দিতে চায়…

কল্যাণী প্রাণের দুরন্ত আবেগে মায়াকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলেন,—বউমা, এস।—এবং এমন জ্বলন্ত ভাবে ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন যেন অস্পষ্ট আলোকেও মায়ার তা' চোখে পড়ে, এবং সে ভয় পায়—

কিন্তু তাঁর আশা আর উত্তম নিষ্ফল হইল; মৃদু কণ্ঠে মায়া বলিল,—যাই, মা। কথাটা শুনে যাই। আপনার ঢাকতে যাওয়া বৃথা; আমি বুঝেছি সব; তবু শুনি।

রাগ না করিয়া, না চেঁচাইয়া, কত দৃঢ় অবিচল হওয়া যায়, আর,

অন্তরকে বিচলিত করা যায়, মায়ার শান্ত কণ্ঠস্বরে তাহারই মুখোমুখি সাক্ষাৎ পাইয়া কল্যাণী সরিয়া দাঁড়াইলেন; আর, তাঁর ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাগদীপাড়ার যে মেয়েটি 'মা' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, টুঁটি ছিড়িয়া দিয়া তার কথা বলার ক্ষমতাই নষ্ট করিয়া দেন।

তার পর উঠানে বসিয়া ভুবন মায়ার কাছে সব কথাই বলিল —নিজের জন্ম-কলঙ্কটা পর্য্যন্ত সে গোপন করিল না; ঐ কলঙ্কটাই অত্যাচারের সুযোগ দিয়াছে—

এবং অন্যান্য সব কথাই সে বলিল…

তাহাদের পাড়ায় গিয়া অমৃতের আচরণ, তার কতগুলি প্রেয়সী সেথানে আছে; তার প্রতি অমৃতের লোভ; খঞ্জ অকর্ম্মণ্য স্বামীর অগাধ নির্লিপ্ততা; তার প্রত্যাখ্যান; তার পর পাড়ারই মেয়েদের ষড়যন্ত্রে তাহাকে কৌশলে ঘরে আবদ্ধ করা; অমৃতের আগমন; অমৃতকে মারিয়া ধরিয়া তাহার পলায়ন—এবং তার পর অভিযোগ লইয়া এখানে আসা—

ভুবনের একান্ত সন্নিকটে আর একেবারে সম্মুখে বসিয়া আর নির্নিমেষ চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া সব শুনিল; কল্যাণী অদূরে দাঁড়াইয়া বোধ হয় কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না—

মায়া তার পরও বসিয়াই রহিল।

কল্যাণী নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, কাঠের জাল জল হইয়া গেছে।

ভুবন বলিল,—এখন আসি। তুমি ক্যানে শুন্‌লে, বউ!—বলিয়া মায়ার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে-ও কিছুক্ষণ আবিষ্টের মতো অবশ হইয়া রহিল…

মায়া বলিল,—শুনলাম ভালই হ'ল। আচ্ছা এস এখন।

ভুবন চলিয়া গেল।

কল্যাণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন, —বউমা, চান্ করো। বাগদী-মাগীকে ছুঁয়েচ।

মায়া বলিল,—"করি।"—তার পর তার মনে হইল বলে, জননি, কত বার কত জলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? কিন্তু বলিল না; বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।

ইহার পর বাড়ীর আবহাওয়া থমথম্ করিতে লাগিল; এবং সাংঘাতিক ব্যাপার যা' ঘটিল তাহা এই যে, বলির পরই জীবটির মুণ্ড আর দেহ যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এই পরিবারের ভিতর হইতে ঠিক তেমনি ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়া যাইয়া শয্যার আশ্রয় লইল; কল্যাণী ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই স্বরচিত অন্ধকারে যেন নিজেকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—

অক্ষয়ানন্দ পশ্চাৎ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া অনেকখানি বাতাস টানিয়া লইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন মাত্র।

ভুবন নালিশ করিতে তাদের বাড়ীতে গিয়াছে শুনিয়া সে-রাত্রে অমৃত বাড়ী আসিল না, অবশ্য বাড়ীর কাহারো জন্য নহে, বাড়ী বলিয়া সুখের একটা বিঘ্ন রহিয়াছে এই বাপে। তার পরের দিনও তার পাত্তা পাওয়া গেল না—

তৃতীয় দিনে যখন সে দেখা দিল তখন ব্যাপার অনেক চুকিয়া গেছে, অর্থাৎ মায়া তখন পিত্রালয়ে। পুরা দু'টি দিন মায়া জলস্পর্শ করে নাই; প্রাণী একটা অনাহারে সম্মুখেই শেষ হয় দেখিয়া অক্ষয় তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অমৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিল,—বাপ্‌স্! রাগ কি!

অসহায় মনের ঘূর্ণিত অবস্থায় অক্ষয়ানন্দ বধূকেই দোষী করিলেন —তাঁহাকে নিদারুণ অপদস্থ এবং লোকসমক্ষে হেয় সে করিয়াছে।… বধূর জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া তাহাকে তাহার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, তখন তাহাকে আপদ মনে করিতে তাঁর বাধিল না। নিজেই গরজ করিয়া তাড়াতাড়ি মায়াকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মায়াই তাঁহাদের যেন পায়ে ঠেলিয়া গেল; অন্নজল গ্রহণ বিষয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী এবং প্রতিবেশিগণের প্রবোধ ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করায় মধ্যে তিনি বধূর অপরিসীম যথেচ্ছাচারিতা এবং স্পর্দ্ধা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের প্রতিও বধূর অশ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের মানহানি করিবার ক্লেশজনক প্রবণতাও লক্ষিত হইল—

কেলেঙ্কারী করিয়া সে গেছে—একটু সহ্য করিয়া থাকিলে তাঁর মুখ রক্ষা হইত…

অক্ষয়ানন্দ ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু কল্যাণী তা' হইলেন না— বধূটির স্মৃতি তাঁর মনের আকাশ প্লাবিত করিয়া বড় উজ্জ্বল হইয়া আছে…তার আচরণে তিলমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি কি বিকৃত ভাব কোন দিন তিনি পান নাই, পদে পদে পরিচয় পাইয়াছেন অতিশয় ভদ্র শ্রীল কোমল একটি অন্তরের, ভুলচুক দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অপরাধ নয়; অস্পষ্টতা, মনে মুখে দুই কখনো দেখেন নাই; বাধা তিনি পান নাই—বধূর বধূত্বে নিরাশ তিনি হন নাই…মনে মনে সহস্র বার চমকিয়া তিনি দাঁতে জিব কাটিয়াছেন; ছেলের স্বরূপটি বধূর চোখের আড়ালে রাখিবার চেষ্টায় তাঁর অহোরাত্র বিশ্রাম ছিল না, মন অনুক্ষণ টন্‌টন্ করিত; সে ক্লেশ অল্প নয়, ভুলিবার নয়।…কল্যাণী ইহাও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর নারীত্ব কেবল পাতিব্রত্য রক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, চিরকাল একটা সম্মান চাহিয়া ফিরিয়াছে—নির্ম্মলতার সম্মান, স্বাতন্ত্র্যের সম্মান, বাগ্‌ভেল্‌কি নয়, ভাল নয়; ভীতি লালসা লোভ ধর্ম্ম কাল অনুগ্রহ নিন্দা প্রশংসা নিরপেক্ষ সম্মান—সমানের প্রতি সমানের সম্মান—মাধুর্য্যময় রসমূর্ত্তির প্রতি রসিকের সম্মান…

কিন্তু এই বধূ মায়া বড় অসম্মানিত হইয়া গেছে—খুবই আঘাত সে পাইয়াছে।

কিছু দিন পরে ঘটনার আবর্ত্ত নিস্তেজ হইয়া গেলে অক্ষয়ানন্দের এক দিন মনে হইল, পুত্রের পিতা হিসাবে তিনি যতটা অসহায়, বধূর কাছে ঠিক ততটাই অপরাধী। তাঁর আরো মনে হইতে লাগিল, বধূ তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া যত দিন দূরে দূরে থাকিবে, তাঁহার অপরাধের মাত্রা তত বাড়িবে। বধূকে তিনি স্নেহ করেন, ইহাও মিথ্যা নয়।

সুতরাং তাহাকে আনিতে তিনি রওনা হইয়া গেলেন; কল্যাণী বাধা দিলেন না। মায়াকে তিনি চিনিয়াছিলেন—ডাক দিলেই আসিবার মেয়ে সে নয়। আত্মপ্রীতি বেশি থাকিলে তিনি বোধ হয় অভিমান করিতেন; কিন্তু বধূকে পুত্রের স্ত্রী হিসাবে তিনি

নিজের স্থান-মর্য্যাদার বাহিরে আনিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিলেন না—পুরুষের স্ত্রী হিসাবে প্রত্যেক নারীর যে সংস্থাপন ঘটে তাহা একই—সর্ব্ব ক্ষেত্রেই তাহা একই নিয়মের অধীন।

বৈবাহিক রসিকলাল অক্ষয়ের বাল্যবন্ধু, সে একটা মস্ত সুবিধা; তার সম্মুখে অতিরিক্ত চক্ষু-লজ্জা পাইতে হইবে না বলিয়াই অক্ষয়ের মনে হইল; কিন্তু যাইতেছেন বলিয়া সংবাদ তিনি দেন নাই, কারণ, রসিক উৎকৃষ্ট নিরীহ ব্যক্তি হইলেও ক্রূরস্বভাব পরামর্শদাতার অভাব নাই। বাল্যবন্ধু বলিয়াই রসিক বিবাহের পূর্ব্বে খোঁজ-খবর লন নাই—ভদ্র-সন্তানের স্বভাব ভদ্রই হইবে, এই বিশ্বাসও তাঁর ছিল…

কিন্তু শিক্ষা পাইয়া তার মেজাজ এখন যেমনই হউক, তাহাকে ঠাণ্ডা করা যাইতে পারিবে মনে করিয়া অক্ষয় নিজের উপর নির্ভরশীল হইয়া যাত্রা করিলেন।

অভ্যর্থনা যথারীতি লাভ করিয়া অক্ষয় পরিতৃপ্ত হইলেন।

প্রচুর আহারের পর খানিক নিদ্রা উপভোগ করিয়া বৈকালের দিকে অক্ষয় বলিলেন,—চলো বাড়ীর ভেতর শুনে' আসি। তোমার ত' মতামত কিছুই নেই দেখ্‌ছি! কা'ল ১৮ই, দিন ভাল আছে। কা'লই যেতে চাই।

বৈবাহিকদ্বয়ের মিষ্টালাপ শুনিয়া আর শিষ্টাচার দেখিয়া ইহা বুঝাই যাইতেছে না যে, মাঝখান দিয়া এমন দুঃসহ একটা দুর্য্যোগ বহিয়া গেছে।

কা'লই যাইবার কথায় রসিক বলিলেন,—এলে, দু'দিন থাকো।

অক্ষয় রহস্য করিয়া বলিতে পারিতেন, "যে-রকম অমৃতোপম আহারের জুৎ তোমার বাড়ীতে, তা'তে দু'দিন কেন দু'মাস থাকতে পারি।" কিন্তু তিনি তা' বলিতে পারিলেন না—অনিশ্চয়তার একটা কম্পনশীল আবহাওয়ায় পড়িয়া তিনি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছেন—মন ভালো লাগিতেছে না—রসিক কেমন যেন নির্লিপ্ত—অবান্তর ঢের কথা বলিয়াছে, কিন্তু মেয়ে-জামাইয়ের কথা তোলেন নাই—

বলিলেন,—সে আর এক যাত্রায়। চলো।

রসিক এবং তাঁর পশ্চাৎ অক্ষয় আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন—অক্ষয় দু'পা আগাইয়া গেলেন; ডাকিলেন, বউমা, শোনো।

মায়া আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিতে লাগিলেন,—বড় আনন্দ পেলাম, মা, তোমাকে দেখে'। তুমি চলে' আসার পর থেকে আমি আর তোমার শাশুড়ী যে কত কষ্ট পেয়েছি তা' ভগবান্ জানেন। তার পর একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া, অর্থাৎ দুঃখ যে সত্য এবং এখনো যে আছে তাহারই প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, অক্ষয় বলিলেন,—তার পর ভাবলাম, মায়ের আমার যেমন রূপ, তেমনি গুণ; রাগ করে' সে থাকবে ক'দিন! বেটি আসবেই আবার এই ছেলেটাকে মানুষ করতে…

লঘু স্বরে আদরের ঐ কথাগুলি বলিয়া অক্ষয় আড়ালে যেখানে বেয়ান অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে একবার এবং বেয়াইয়ের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। এদিক্ অদৃশ্য—এদিকে বেয়াইয়ের মুখে কোনো ভাবই লক্ষণযুক্ত নয়—সে যেন নিঃস্বার্থ তৃতীয় ব্যক্তির মতো বাক্যহীন হইয়া অভিনয় দেখিতেছে…

এই নিরাসক্ত স্তিমিত মতি-গতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অক্ষয়ের হঠাৎ মনে হইল, তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া সবাই পরিত্যাগ করিয়া গেছে; তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়; তাঁর একমাত্র অবলম্বন ঐ মেয়েটি; ওরা পর, বধূ আপনার জন; সে-ই যদি করুণা করে…

রসিক তখন কথা কহিলেন; বলিলেন,—আমাদের বক্তব্য মাত্র এইটুকু যে, মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াব না। সে যদি যেতে চায় ভালো—যদি না যেতে চায় তা'তেও আমাদের আপত্তি নেই।

কান পাতিয়া অক্ষয় ঐ কথাগুলি শুনিলেন; তার পর হাতের উল্টা দিক্ দিয়া অকারণেই কপালটা একবার মুছিয়া লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—বউমা, কা'লই যাবো।

মায়া বলিল,—আমি যাবো না।

যেন তীর আসিয়া বুকে বিঁধিল—সে কি?—বলিয়া ঐ দু'টি একাক্ষরিক শব্দে অক্ষয় যে বেদনা আর বিস্ময় নিনাদিত করিয়া তুলিলেন তাহার বর্ণনা নাই।

মায়া বলিল,—তিনি যে দিন ভালো হবেন, সেই দিন এসে আমায় নিয়ে যাবেন, তার পূর্ব্বে নয়। গিয়ে আপনার বাড়ীতে দাসী হ'য়ে থাকব', বউ হ'য়ে নয়।—বলিয়া মায়া বিদায় লইতে গেলে, অর্থাৎ হেঁট হইয়া পদধূলি লইতে গেলে, অক্ষয় লাফাইয়া পিছাইয়া গেলেন: বলিলেন,—উঁহু।

আর পদধূলি দিতেই তিনি রাজি নন্।

মায়া ধীরে ধীরে যাইয়া ঘরে উঠিল্য গেল; এবং অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রসিকের মমতাই জন্মিল; বলিলেন,—এস।

অক্ষয় চলিতে লাগিলেন, কিন্তু যেন বেহুঁশ অবস্থায়। তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন বলিলে কিছুই বলা হয় না. তিনি আশাহত হইয়াছেন বলিলেও অল্প বলা হয়; তিনি আজন্ম যে সংস্কারটিকে দম্ভের সঙ্গে লালন করিয়া প্রাণের সঙ্গে আর সত্তার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইয়াছিলেন সে-ই যেন মুমূর্ষু হইয়া উঠিল; সে-ই যেন তাঁর বুকের ভিতর লুটাইয়া লুটাইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল; তিনি যে পুরুষ,—পুত্রের পিতা, বধূর শ্বশুর, স্ত্রীর স্বামী, আর মনুষ্যসমাজে বাস করেন, এই গর্ব্ব-গৌরব আর আনন্দ ধূলিসাৎ হইয়া ত' গেলই—তিনি যে মানুষ এই জ্ঞানটাই অসহ্য উত্তপ্ত একটা নিশ্বাসে পুড়িয়া এক নিমিষে যেন ছাই হইয়া গেল।

উপরে গিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। অক্ষয় তাহা স্পর্শ করিলেন না।

রসিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি, ভাই, নিরুপায়।"

অক্ষয় কথা কহিলেন না।—তার পর রসিক তাঁর প্রস্থানের উদ্যোগের দিকে ম্লান চক্ষে চাহিয়া রহিলেন—থাকিতে থাকিতে এক সময় বলিয়া উঠিলেন, "এ-বেলাটা থেকে যাও, ভাই।"

অক্ষয় কেবল বলিলেন,—না।

অক্ষয় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুটুম্ব-গৃহ হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্ত্তন করে, এবং অজ্ঞাত স্থান হইতেও করে; সর্ব্বনাশের পর শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে; সর্ব্বস্ব পরের হাতে তুলিয়া দিয়া আদালত হইতে করে; তবু তারা যেন স্বাভাবিক একটা সীমার বাহিরে যায় না—অপমানের দুয়ারে মনুষ্যত্ব রাখিয়া দিয়া তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে না—কিন্তু তিনি করিয়াছেন তা'ই।

অক্ষয় আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন—সেইখানেই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

ভৃত্য তাঁর আগমনবার্ত্তা অন্তঃপুরে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল; সে-ই তামাক সাজিয়া আনিয়া খবর দিল,—বাবু, মা ডাকছেন।

—যাই। বলিয়া অক্ষয় উঠিলেন, এবং পা বাড়াইয়াই অনুভব করিলেন, পা চলিতে চাহিতেছে না···

—কি হ'ল ?—কল্যাণী অনাবশ্যক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।··· অক্ষয় স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না এবং তার পরই স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া শয়নকক্ষের দিকে চলিতে লাগিলেন ···খানিক দূর যাইয়া বলিলেন,—বউমা এল না।

কল্যাণী বলিলেন,—আসবে বলে' আমি আশাও করিনি।

অক্ষয় দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—তুমি দেখছি বউয়ের দিকে। কিন্তু আমাকে যে অপমানটা হতে হ'ল তার দাম দেয় কে ?

—কার জন্তে হ'তে হ'ল ? তোমার ছেলে যে তোমাকে আমাকে উঠতে বসতে অপমান করছে তার দাম চাইবে তুমি কার কাছে ?

নিদারুণ অভিমানে অক্ষয় বলিলেন,—আমি মরব'। বলিয়া তিনি ঘরে উঠিয়া গেলেন।

স্বামীর কুশল-সমাচার লইতে কল্যাণী সেখানে আসিলেন; দেখিলেন, তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এবং সত্যই তাঁহাকে ভারী নিৰ্জ্জীব দেখাইতেছে···জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার শরীর ভাল আছে ত' ?

—আছে বই কি।

—কি হ'ল সেখানে ?

—পুতুল-নাচ! বউমা বললে, "আমি যাবো না।"

—তার বাপ-মা রাজী ছিল ?

—জানি নে ঠিক। ছিল বোধ হয়!

—মন খারাপ করে' থেক না। বুঝে' দেখ সমস্তটা। আমার মন ত' কিছুই খারাপ লাগছে না।

—তুমি বোধ হয় সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর অংশ—অল্পে টলো না।—বলিয়া অক্ষয় মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এই অনাবশ্যক বিদ্রূপে কল্যাণী একটু হাসিলেন মাত্র।

অক্ষয়ের এই দুঃখই সকলের বড় হইয়া উঠিল যে, তাঁহার অন্তরের নিশ্বাসটি কেবল তাঁহারই কাছে যেমন সত্য তেমনি মর্ম্মান্তিক হইয়া রহিল—পৃথিবীর আর কেহই তাহাকে জানিতে চাহিল না, এমন কি স্ত্রীও না।···পুত্রবধূকে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী মনে করেন, এ-কথাটি অত্যন্ত জাগ্রত কথা; তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন—এত স্নেহ করেন যে, বউমা মাটিতে পা দেয় এ-ইচ্ছা তাঁর নয়। পুত্রবধূ করিয়া যাহাকে গৃহে আনিবেন, পুত্রকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার একটি আদর্শ তিনি নিজের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন বহু দিন পূর্ব্বেই; মায়াকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া এক দিকে তাঁহার কন্যা-সন্তানাকাঙ্ক্ষার এবং অন্য দিকে তাঁহার আদর্শের প্রতি লুব্ধতার পরিতৃপ্তি ঘটিয়াছিল —এ-সব কথা তিনি ভাবে আভাসে প্রকাশই করিয়াছেন; শুধু কেহই তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই—বধূ পারে নাই, স্ত্রী পারে নাই।

অক্ষয় যন্ত্রণায় ঝিমাইতে লাগিলেন, এবং সকলের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া রহিলেন।

কিন্তু কল্যাণী বুঝিলেন অন্য রকম—বধূ না আসায় ক্ষুব্ধ হইবার কারণ তিনি দেখিতে পাইলেন না, বরং একটা নিষ্কৃতির সুখেই তিনি মায়াকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুত্রকে তিনি বহু পূর্ব্বেই নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন; সে এমনি' যে, পারিবারিক মান-মর্য্যাদার বিচার এবং রক্ষার চেষ্টা যেন তাহাকে বাদ দিয়াই করিতে হইবে। কল্যাণীর মনে হইল, এ-হিসাবেও বধূ ঠিক কাজই করিয়াছে—আসা তার উচিত হইত না। সে আসিলে তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা ইতরতার স্তরে সবাইকে নামিয়া যাইতে হইত যাহার ভিতর হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার সাধ্য কাহারো নাই। তাঁহারা ভদ্র আখ্যার বহির্ভূত হইয়া যান নাই—বধূ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে। বধূ তার স্বামীকে, তাঁহাদের পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছে—সমাজে অপাংক্তেয় হইবার ভয় তাহাতে নাই; যদি তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় করিবার বুদ্ধি সমাজের মস্তিষ্কে কখনো জাগ্রত হয় তবে তাহা পুত্রের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়াই হইবে, বধূর ব্যবহারে নয়। অতএব সতী মেয়ে চিরজীবিনী হো'ক।

বলা বাহুল্য, অক্ষয়ের মর্ম্মবেদনার কথা জানাজানি হইয়া গেছে। বউ আসে নাই, অক্ষয়ের এই দুঃখে অনুকম্পা জ্ঞাপন এবং সুপরামর্শ দান প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য, ইহা অনেকেই উপলব্ধি করিলেন; এবং বৈকালের দিকে কয়েক জন দেখা দিলেন।

অক্ষয় কাহারো নিন্দা করিলেন না; তিনি কেবল আক্ষেপ করিলেন ইহাই বলিয়া যে, মানুষের ইয়ত্তা পাওয়া সত্যই কঠিন; পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণই তাঁর অদৃষ্টের কঠিনতম দুঃখ, এবং যত বিড়ম্বনার হেতু; তিনি সত্বরই মারা যাইবেন।

শুনিয়া অনেকেই যা' বলিলেন তার সুর আর ভাব একই প্রকার এবং সময়োপযোগী, এবং অবস্থাগত ব্যবস্থামূলক; কেবল অক্রূর দত্তে ব্যতিক্রম দেখা দিল; অক্রূর বলিলেন,—তোমার উচিত ছিল এমন ঘরে বিয়ে দেয়া যারা কিছু বোঝে না, অনুভব করে না।—সমান ঘর মানে এ নয় যে, আর্থিক অবস্থা একই রকম—চুনি[illegible], প্রকর্ষগত সামঞ্জস্য থাকা চাই। তোমার ছেলে তোমাকে নামিয়ে এনেছে ঢের। তার বিষয়ে যা' শুনি তার সিকিও যদি সত্য হয় তবে তার মারফৎ কোনো ভদ্র-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন দূরের কথা, তাকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করাই কঠিন! বিবাহ স্থির করেছিলে তুমি খুব গোপনে। কথাবার্ত্তায় সময় আমি উপস্থিত থাকলে বাধা দিতাম।

শুনিয়া কথাগুলি অক্ষয়ের বড় কঠিন মনে হইল। কথাগুলি দয়ার্দ্র নয়, কিন্তু সত্যে উজ্জ্বল—অক্ষয়ের সহ্য হইল না—তিনি কাতরোক্তি করিলেন; বলিলেন,—আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিও না।

—তবে ছেলেকে ত্যাগ করো, আর বউয়ের আশা ত্যাগ করো। বৈবাহিকের গৃহে তোমার অপমান হয়েছে যদি মনে হ'য়ে থাকে, তবে তার জন্তে দায়ী করো নিজেকে।—বলিয়া অক্রূর দত্ত উঠিলেন।

অক্ষয় যেন কাহারো সঙ্গে কলহ করিতে উদ্যত হইয়া অন্য ভাবে আর দ্রুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—আবার—আবার বিয়ে দিব ছেলের।

হীনমন্যতা

চিত্রগুপ্ত

'ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স' (Inferiority complex) কথাটা আজ-কাল খুবই চালু হ'য়ে গেছে। ট্রেণে, ট্রামে, াসে, চায়ের দোকানে, ফুটবল-খেলার মাঠে সর্ব্বত্রই আজ-কাল াকের মুখে কথাটা শুনতে পাওয়া যায়। কাজেই এ সম্বন্ধে একটু ালোচনা করলে সেটা বোধ হয় মন্দ হবে না।

ক'লকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের প্রকাশিত পরিভাষার বইতে কথাটার ্রতিশব্দ দেওয়া হ'য়েছে 'হীনতা ভাব'। কিন্তু কথাটার ব্যবহার থনো আমার চোখে-কাণে পড়েনি। সেই জন্ম প্রধানত: অপরিচয় া অল্প পরিচয়ের ভয়ে শিরোনামায় কথাটা বসাতে উৎসাহ পেলুম া। যাঁরা বিশ্ববিত্তালয়ের নির্দ্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহারের একান্ত াক্ষপাতী, তাঁদের কাছে এজন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যাই হোক, এই হীনমন্তা বা হীনতা ভাব—শাদা কথায় যার ানে হ'চ্ছে, নিজেকে ছোটো ব'লে ভাবা বা 'ছোটো চোখে' দেখা— মনোভাবটা মানুষের জন্মগত জিনিষ নয়। Individual sychology মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এ্যাড্‌লার (Alfred Adler) অন্তত: তাই বলেন। তিনি বলেন, সামাজিক এবং পারিবারিক যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ লালিত-পালিত হয়, তার বিভিন্ন রকমের প্রভাবের ফলেই আলাদা আলাদা রকমের স্বভাব-চরিত্র, ব্যক্তিগত ধরণ-ধারণ ও মানুষ, সমাজ, পরিবার এবং নিজের প্রতি তার সেই ধরণের মনোভাবটি গ'ড়ে ওঠে।

এ্যাড্‌লার বলেন, সব মানুষই জন্মের পর এক সময়ে আবিষ্কার করে যে, কোনো না কোনো একটা বিষয়ে তার কিছু না কিছু অভাব বা অসম্পূর্ণতা আছেই, যার জন্মে তাকে সে দিক্ দিয়ে অন্ত মানুষদের তুলনায় খানিকটা পেছিয়ে পড়্তেই হয়। অথচ স্বাভাবিক জীব-ধর্ম্মবশেই সেটা তার বরদাস্ত হবার নয়, তাই সে সেই অভাব বা অসম্পূর্ণতাটার পূরণ ক'রে বড় হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করে—সে দিক্ দিয়ে সম্ভব না হ'লে অন্ত দিক্ দিয়ে নিজের দাম বাড়িয়ে নিয়ে সে নিজের জীবনের সার্থকতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহ'লে সব মানুষের মধ্যেই আমরা হীনতা বোধ বা শ্রেষ্ঠতা বোধের প্রকাশ দেখি না কেন? এ্যাড্‌লার তারও উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, সবায়ের মধ্যেই এই সব 'মানসকূট'কে (complex,es) যে আমরা প্রকাশিত হ'তে দেখি না তার কারণ এই যে, যাদের মধ্যে এটা দেখা যায় না তাদের মনের 'কলকাঠি'র (psychological mechanism) গুণে তাদের মনের হীনতা বা শ্রেষ্ঠতা বোধটা সমাজের হিতকর দিকটায় চালু হ'য়ে কাজে লেগে যায়। এই ভাবে কাজে লেগে যাওয়ার দরুণই সেটা আর 'দোষের' থাকে না। দোষের ব'লে গণ্য না হ'য়ে কাজে লেগে যাওয়ার দরুণ সেটা 'জাতে' উঠে গিয়ে গুণ হ'য়ে দাঁড়ায়। সমাজ এইটাই চায় ব'লেই এর বিরুদ্ধে তখন আর কিছু বলবারই থাকে না। কারণ, আসল কথাটা কাজে লাগা নিয়েই। যে জিনিষটা কোনো কাজে লাগে না—সেটা একটা আপদ। সেটাকে বহন করাটা তাই নিন্দনীয়। কিন্তু কম্‌প্লেক্স যখন কাজে লেগে যায় তখন সেটা গুণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—তখন আর তাকে দোষ দিতে যাবার কার মাথাব্যথা পড়বে? তাই যাদের মধ্যে—কাজে লেগে যাওয়ার দরুণ—কম্‌প্লেক্সটা গুণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে আর কোনো কম্‌প্লেক্স দেখতেই পাওয়া যায় না।

যে সব লোকের মনের কম্‌প্লেক্স গুণে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের দৃষ্টির প্রতিকূলতা থেকে অব্যাহতি পায় তাদের মনের কলকাঠির পেছনের 'স্প্রিং' হ'চ্ছে তাদের সমাজ-নিষ্ঠা, সাহস, সামাজিকতা বোধ এবং সহজ বুদ্ধির যুক্তি-সঙ্গতি (logic)।

মনের এই সব 'কলকাঠি'গুলো ঠিক ভাবে কাজ ক'রলে কি ফল হয়, আর না ক'রলেই বা কি ফল হয়, এবার তাই পর্য্যালোচনা ক'রে দেখা যাক্।

কোনো শিশুর কোনো একটা অসম্পূর্ণতার জন্মে তার হীনতা বোধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'খুব বেশী' না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধ'রে নেওয়া যায় যে, সে আপন চেষ্টায় তার অসম্পূর্ণতাটুকু কাটিয়ে উঠে জীবনে সফলতাই লাভ করবে। এ ধরণের ছেলেরা অন্তের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে। এদের এই অসম্পূর্ণতার পরিপূরক হিসেবে সামাজিকতা বোধ এবং সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই জাগ্রত হয়। বল্‌তে গেলে, সমাজে নিজের সম্মানজনক স্থানটুকু দখল ক'রতে চেষ্টা ক'রে এই ভাবে নিজের হীনতা বোধের পরিপূরণ ক'রেনি এমন লোক সমাজে দেখতেই পাওয়া যাবে না—তা' সে ছোটো ছেলেই হোক, আর বয়স্ক লোকই হোক।

'সমাজের অন্ত লোকদের জন্মে আমার ব'য়েই যায়'—এমন কথা 'বুকে হাত দিয়ে' বল্‌তে পারে—এমন লোক সমাজে এক জনও পাওয়া যাবে না। এর বদলে বরং এইটেই দেখা যাবে যে—যে লোক সমাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, সেই লোকই তার ঐ অক্ষমতাটাকে ঢাকবার জন্মেই—অন্ত মানুষদের জন্মে তার দস্তুরমত 'মাথাব্যথা' আছে বলে বেশী ক'রে দাবী করে। এ্যাড্‌লারের মতে এটা বিশ্বজনীন সামাজিকতা বোধেরই সাক্ষ্য।

তবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে হীনতা বোধ থাক্‌লেও তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াটা তার পক্ষে অনুকূল হওয়ার জন্মেই সে হীনতা বোধটা আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ জন্মে তাকে 'ঠেক্‌তে' না হ'চ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে দেখে মনে হ'তে পারে যে তার বুঝি হীনতা বোধ নেই—সে নিজের অবস্থায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। কিন্তু সেই লোককেই যদি ভালো ক'রে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তা' হ'লেই দেখতে পাওয়া যাবে—কি ভাবে সে তার ঐ হীনতা বোধকে প্রকাশ করে। মুখে প্রকাশ না ক'রলেও তার ধরণ-ধারণ চাল-চলনের মধ্যে দিয়েও অন্তত: ফুটে উঠবে যে তার মনের মধ্যে তার নিজের সম্বন্ধে একটা হীনতা বোধ দিব্যি শেকড় গেড়ে বসে রয়েছে।

তার এই ধরণ-ধারণ, চাল-চলনের সবটাই আসলে তার মনের ঐ গোপন হীনমন্তারই পরিচায়ক—এবং তার মধ্যে হীনমন্ততাটা একটু বেশী রকম হওয়ার জন্মেই তার ঐ রকম ধরণ-ধারণ ও চাল-চলনের উৎপত্তি সম্ভব হ'য়েছে। যে সব লোক এই ধরণের কমপ্লেক্সে ভুগচে তারা নিজেদের আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে নিজেদের ঘাড়ে যে 'ফালতু' বোঝাটা চাপিয়েছে, তার গুরু ভারটার হাত থেকে সর্ব্বদাই অব্যাহতির পথ খুঁজছে।

অনেকে নিজেদের হীনমন্ততাকে লুকোতে চায়; অনেকে আবার সে কথা সরাসরি স্বীকার করে। তারা বলে, 'আমি ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সে ভুগছি বা আমার ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স আছে।' এই

স্বীকারোক্তির ভিতর দিয়েই তারা একটা গৌরব অনুভব করে। এই স্বীকারোক্তি দিয়ে তারা এই কথাটাই বোঝাতে চায়, যে তারা —অন্ত যারা এমন ভাবে কথাটা স্বীকার ক'রতে পারে না—তাদের চেয়ে বড়ো! তারা যেন মনে মনে বলে, 'আমার অন্যো 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' নেই। আমি আমার ত্রুটির কথা ঢেকে মিথ্যে বড়াই করতে চাই না!' এইটাই যে আসলে 'বড়াই'—এটা তাদের চোখে পড়ে না। আসলে নিজের 'ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স' বা হীনতা বোধের কথা স্বীকার করার মধ্যে দিয়েই তারা কিন্তু বলে নেয় যে, তাদের অবস্থার জন্তে প্রকৃতপক্ষে তাদের মনের ঐ হীনতাবোধটাই দায়ী—তারা নিজেরা নয়। তা না হ'লে তারা···ইত্যাদি। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে তাদের মনের 'হ'তে পার্তেম'-গোছের একটা মনোভাবই প্রকাশ পায়—যার দ্বারা তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, আসলে তারা ছোটো নয়—কেবল তারা কি করবে—ঐ পোড়া হীনতা বোধটা মাঝখানে এসেই না যত কিছু গোল বাধিয়ে দিচ্ছে?

অনেক সময় তারা এমন 'সাফাইও' দেয় যে, তাদের বাপ-মারা সুশিক্ষিত ছিলেন না ব'লে কিম্বা তাদের বংশটা শিক্ষা-দীক্ষায় তেমন উন্নত না থাকার জন্তেই তারা জীবনে তেমন 'মাথা চাড়া' দিয়ে উঠতে পারলে না। কারুর বা আর্থিক অস্বচ্ছলতা, কারুর বা 'শরীরটা তেমন যুৎসই-গোছের নয়', কারুকে বা আবার মাষ্টার মশাই কিম্বা আপিসের বড় বাবু জোর ক'রে দাবিয়ে রাখে, এই রকম হাজারো রকমের 'সাফাই'এর কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়।

অনেকের হীনতা বোধ আবার একটা কল্পিত 'শ্রেষ্ঠতা বোধ' (superiority complex) দিয়ে ঢাকা থাকে। এখানে তার ঐ শ্রেষ্ঠতা বোধটা তার আসল হীনতা বোধটারই পরিপূরক হিসেবে তার মনের মধ্যে কাজ করে। এ ধরণের লোকরা আত্মাভিমানী, উদ্ধত, দাম্ভিক এবং 'চালিয়াৎ প্রকৃতির হয়। সত্যিকার গুণী হওয়ার চেয়ে 'গুণী' সাজবার দিকেই এদের ঝোঁক বেশী।

এ ধরণের মানুষদের কারো বা হয়তো গোড়ায় পাঁচ জনের সামনে একটা লাজুকতা (stage right) প্রকাশ পেয়েছিলো। পরে এরা এদের জীবনের অসাফল্যের কারণ হিসেবে ঐ লাজুকতাটাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। এরা বলে, 'কী বল্‌বো, আমার ঐ সর্বনেশে লাজুকতাটাই আমার জীবনের সব কিছু মাটি ক'রে দিলে। ঐটে যদি না থাক্‌তো তাহ'লে আর আজ আমায় পায় কে?'

ঐ 'যদি'-মার্কা উক্তি থেকেই আসলে এদের 'হীনমন্ততা'টা ধরা পড়ে।

হীনমন্ততা আবার অনেক সময় ধূর্ত্তামি, সাবধানতা, বৃথা বিদ্যাভিমান, জীবনের বৃহত্তর সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা ও অভ্যাস এবং নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সামান্ত বা বাজে কাজে আত্মনিয়োগের প্রবৃত্তির মুখোস প'রেও দেখা দেয়। এমন কি, যারা সব সময়েই লাঠির ওপর ভর না দিয়ে চলতে বা দাঁড়াতে পারে না তাদের ঐ অভ্যাসের মধ্যে দিয়েও তাদের মনের মধ্যের ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সটাই ফুটে ওঠে।

আসলে নিজেদের ওপর এদের কোনো ভরসা নেই। বিদ্‌ঘুটে রকমের বাজে জিনিষ বা বাজে কাজ নিয়ে মত্ত থাকবার একটা অভ্যাস এদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে। হয়তো খবরের কাগজই জমাচ্ছে, নয়তো নানান রকমের বিজ্ঞাপনের নমুনা সংগ্রহ করছে। এর মধ্যে দিয়ে এরা নিজের মনকে এবং পাঁচ জনকে বোঝাতে চায় যে, এর মধ্যে দিয়ে কী একটা বড়ো কাজই না এরা ক'রছে!

এম্‌নি ক'রে এরা আসলে জীবনের দামী মুহূর্ত্তগুলি নষ্ট করে। কিন্তু তাহ'লে কী হবে? এর স্বপক্ষে একটা না একটা 'অকাট্য' সাফাই এদের সব সময়েই ঠিক তৈরী থাকে! এরা জীবনের 'অকেজো' দিক্‌টার জন্তেই আপনাদিগকে প্রাণপণে তৈরী করে নেয়। জীবনের 'বাজে' দিকটার জন্তে নিজেকে তৈরী করবার অভ্যাসটা দীর্ঘকাল ধ'রে চলার পর এদের অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, তখন আর এরা এর হাত থেকে কিছুতেই অব্যাহতি পায় না। তখন এটা এদের একটা রোগ হ'য়ে দাঁড়ায়—কে যেন তখন এদের ঘাড়ে ধ'রে এই সব বাজে কাজ করিয়ে নেয়। এই রোগের অবস্থাটাকে বলে Compulsion neurosis।

যে সব ছেলেদের কিছুতেই 'বাগ' মানানো যায় না অর্থাৎ কিছুতেই পারিপার্শ্বিক জগৎ ও সমাজের অনুকূলে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও 'কেজো' ভাবে গ'ড়ে তোলা যায় না—ইংরেজীতে যাদের বলা হয় problem children—তাদেরও ঐ রকম প্রকৃতির হওয়ার কারণ—তাদের মধ্যের হীনতা বোধ। ছেলেদের কুড়েমির অভ্যাস তাদের কর্ত্তব্য এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা এবং আসলে সেটা একটা complex ছাড়া আর কিছুই নয়। চুরী করার অভ্যাসও তাই। এর দ্বারা তারা অন্তের অসাবধানতা বা অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজের হীনতা বোধেরই পরিচয় দেয়। এদের মিথ্যা কথা বলার অভ্যাসটাও এদের সত্যি কথা বলবার সাহসের অভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলে এগুলো সবই এদের মনের হীনতা বোধেরই প্রকাশ মাত্র।

মানুষের নিউরোসিস্‌ও তার ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সেরই পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। Anxiety neurosisএর রোগীরা অর্থাৎ উদ্বেগ-ক্লিষ্ট দুর্ব্বল-স্নায়ু লোকরা কত রকমের 'খেল্'ই না দেখায়! এদের সব সময়েই এক জন সঙ্গী চাই। সঙ্গী পেলে তবে এরা কাজ করতে পারে। অর্থাৎ ইহাদিগকে 'ঠেক্‌নো' দিয়ে 'খাড়া' রাখবার জন্তে অন্ত লোকের দরকার। আর পাঁচ জন এদের নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে এদের চলবে না।

এদের এই অবস্থাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের ক্ষেত্রে হীনমন্ততাটা শেষে গিয়ে শ্রেষ্ঠতা বোধে পরিণত হ'য়েছে। এদের ভাবখানা এই, যে, অন্ত লোকে এদের সেবা করুক! এই ভাবে আর পাঁচ জনকে দিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নিয়ে এরা একটা 'কেউ কেটা' হ'য়ে নেয়। বদ্ধ পাগলদের বেলায়ও তাই। ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সের রোগীই অবশেষে নিছক কল্পনার সাহায্যেই একটা মস্ত লোক হ'য়ে ওঠে।

ওপরে যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হোলো সেগুলোর প্রত্যেটির ক্ষেত্রেই কম্‌প্লেক্সগুলো যে এইভাবে পুষ্টিলাভ করে তার কারণ হোলো এই যে, ঐ সব লোকের মনের সাহসের অভাবের দরুণ তাদের ঐ কম্‌প্লেক্সগুলো সূচনায় সামাজিক এবং দরকারী 'রাস্তা' দিয়ে চালিত হ'তে পায়নি। এদের সাহসের অভাবের জন্তেই সমাজসম্মত দরকারী পথে এদের আচরণাদি চালিত হ'তে পারেনি।

এই উক্তি বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয় 'অপরাধী'দের ক্ষেত্রে। অপরাধীরা আসলে অত্যন্ত উগ্র রকমের হীনমন্ততা রোগগ্রস্ত মানুষ।

চূড়ান্ত কাপুরুষতা এবং মূর্খতার আধার তারা। তাদের ভীরুতা এবং সামাজিক নির্ব্বুদ্ধিতা আসলে একই ঝোঁকের একত্র সমাবিষ্ট দুটি অংশ মাত্র।

মানুষের 'পানদোষ'কেও এই একই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। জীবনের গুরুতর সমস্যার সমাধানে অক্ষম ব্যক্তি মদ্যপানের আশ্রয় নেয়—ক্ষণিকের জন্যে হ'লেও তার সমাধান-শক্তির অতীত সমস্যাগুলির হাত থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার আশায়! এটা আসলে তার চরম ভীরুতারই পরিচায়ক। জীবনের 'অকেজো' দিকটায় 'ঢলে' প'ড়ে সেই দিক থেকে ঐ সাময়িক 'আরাম'টুকু পেয়েই সে তৃপ্ত।

স্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে যে একটা সামাজিক সহজ বুদ্ধিযুক্ত সাহসিকতা বিদ্যমান—তার সঙ্গে এই সব 'সমাজ-ছাড়া' মানুষদের আদর্শ এবং বুদ্ধিবৃত্তির ঐখানেই তফাৎ। শেষোক্ত মানুষদের আদর্শ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ভীরুতার চাপে প'ড়ে বাঁকা রাস্তা ধরে।

সেই জন্যে দেখা যায়, অপরাধীরা সর্ব্বদাই নিজেদের স্বপক্ষে হয় একটা না একটা 'সাফাই' দাঁড় করাবেই আর নয়তো নিজেদের কৃত অপরাধের কারণটা অপরের কাঁধে চাপাবার চেষ্টা ক'রবে। এদের যুক্তি হ'চ্ছে—'সৎপথে থেকে পরিশ্রমের উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না' কিম্বা এদের 'জীবনধারণের অন্যবিধ সুব্যবস্থা না করার জন্যে সমাজই দায়ী' নয়তো 'নেহাৎ পেটের দায়েই' এদের ঐ সব অপরাধ ক'রতে হয়।

খুনী আসামীও বিচারের সময় বলে, 'নিয়তির নির্দ্দেশেই সে অমন কাজ ক'রেছে।' নয়তো ব'লে বসে, 'যাকে আমি খুন ক'রেছি সে বেঁচে থাকলেই বা কী লাভ হোতো? অমন আরো লক্ষ লক্ষ লোক তো বেঁচে র'য়েছে!' তা ছাড়া, এমন দার্শনিক খুনীও আছে, যে বলে, 'কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক ঐ আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ীটাকে মেরে ফেলাই তো ভালো হ'য়েছে—এ-দিকে দুনিয়ায় কত কাজের লোক উপোস্ করে মরছে আর ও-দিকে ওই শুক্‌নো বুড়ীটা 'যখে'র মত তার ধন-সম্পদ্ আগলে বসেছিলো বই তো নয়?'

[ক্রমশঃ।

—আশীর্ব্বাদ—

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সিদ্ধিকে তুমি আগাইয়া আনো
সন্দেহ তাতে নাই,
শব্দ ব্রহ্ম বলে শুনিয়াছি
তোমাতে প্রমাণ পাই।
তুমি লক্ষ্মীর নূপুরের ধ্বনি,
বাণীর মধুর বীণা নিক্বণই,
ধরার কল্পতরু যে তুমিই
এনে দাও যাহা চাই।

তুমিই মন্ত্র বীজের মতন
শুষ্ক ক্ষুদ্র অতি,
লুকাইয়া রাখো ফলনোন্মুখ
বৃহৎ বনস্পতি।
মুক্তা ফলাও শুক্তির বুকে,
বিপুল বাগ্মী করে দাও মূকে,
পঙ্ককে দাও তুমি পঙ্কজ
হস্তীকে গজমতি।

তুমি বর দাও তুচ্ছ কাষ্ঠ
হয়ে উঠে চন্দন,
তুমি বর দাও চিরবন্দীর
ঘুচে সব বন্ধন।
বন্ধ্যারে দাও গুণী সন্তান,
ভিখারীরে কর রাজ্য প্রদান।
সত্যবানের দেহে ফিরে আনো
জীবনের স্পন্দন।

আঁধারেতে আলো অবিকম্পিত
উজ্জ্বল মণিদীপ,
মৎস্য-চক্র লক্ষ্যকে বেঁধো
তুমি ধরি গাণ্ডীব।
মূর্খকে তুমি কর মহাকবি,
মানব অজের স্তব বর লভি।
সুন্দর তুমি আদর করেন
তোমারে সত্য শিব।

সদা অমৃতের উৎসের সাথে
রয়েছে তোমার যোগ,
তাই অনন্ত শক্তি তোমার
দেখি বিস্মিত লোক।
বিপদ-দুঃখ-শঙ্কা-মোচন,
শান্তি রাজ্য করিছ রচন
সুধাস্যন্দী তোমার বচন
হোক সার্থক হোক।

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বায়রণের প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু বীচার তাঁহার একটি কবিতার বিরুদ্ধ সমালোচনা করায় তেজস্বী বায়রণ ক্ষুব্ধ হইয়া সেই সংস্করণের সবগুলি বই অগ্নি-দগ্ধ করেন ও পুনরায় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বাহির করেন। ইহাই বহু আলোচিত "Hours of Idleness." উনবিংশতি বৎসরের এক নবীন উদীয়মান কবির পক্ষে রচনাগুলি নেহাৎ মন্দ হয় নাই। তবে অধিকাংশ কবিতাই ব্যক্তিগত—নটিংহাম, হ্যারো এবং কেম্‌ব্রিজের স্মৃতি বিজড়িত। বয়সে কিশোর হইলে কি হয়, তাঁহার কবিতার ভাবধারা ছিল সনাতন সমাজের বিরুদ্ধপন্থী—তৎকালীন চিন্তাধারার গতি-প্রবাহে তিনি চাহিয়াছিলেন বিজাতীয় বিরুদ্ধ স্রোত প্রবর্ত্তিত করিতে। কবি অথবা লেখকের এই সংহারমূলক মনোবৃত্তি তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচনী পত্রিকা Edinburgh Review বরদাস্ত করিতে পারিল না। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে Edinburgh Review তাঁহার "Hours of Idleness"-এর যে রূঢ় নির্ম্মম সমালোচনা করিল—যে অভদ্রোচিত ভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কটাক্ষপাত করিল—তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর ও তাহা পক্ষপাতিত্ব-বিহীন বলিয়া মনে হয় না। যিনি একটি মাত্র কবিতার বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া তাঁহার সমগ্র পুস্তক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহার প্রথম পুস্তকের এই নির্ম্মম সমালোচনায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সমাজের প্রতি তখন হইতে তিনি কঠোর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর বায়রণ লর্ড সভার সদস্য হন। এত দিন তিনি যাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন সেই লর্ড কারলাইল কিন্তু তাঁহার লর্ডসভায় প্রবেশকালে তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে পরিচিত করিতে বিমুখ হন। লর্ডসভায় তিনি যে উপেক্ষার সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন সে অপমান বায়রণের সহজ ভাব-প্রবণ মনকে বিশেষরূপে বিচলিত করিয়াছিল। বায়রণ ভাবিতে বসিলেন, শৈশব হইতে এমন কী তিনি পাইয়াছেন যাহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি দাঁড়াইতে পারেন? পাওয়ার মধ্যে পাইয়াছেন, শুধু সকলের অনাদর ও অবজ্ঞা। ভাবিতে গিয়া আপনাকে তাঁহার মনে হইল বড় রিক্ত বড় অসহায়। সংসারের নির্লিপ্ততা, সমাজের উপেক্ষা, মানুষের উপহাস সেই তরুণ কবিকে সর্ব্বহারার বেদনায় মুহ্যমান্ করিয়া তুলিল। বায়রণ হইয়া উঠিলেন কঠোর মানব-দ্বেষী। সাগর-মন্থনে সুধার পরিবর্ত্তে উঠিল তীব্র হলাহল। বায়রণ প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। বেগে লেখনী ছুটিয়া চলিল। পরিশেষে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে "English Bards And Scotch Reviewers" নামক যে তীব্র-সুন্দর ব্যঙ্গকাব্য প্রকাশিত হইল তাহাতে দেখা গেল বায়রণের নির্ম্মম আক্রমণ হইতে তাঁহার অভিভাবক, সমালোচক, এবং ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কোলরিজ, সদে, মূর প্রভৃতি তৎকালীন সাহিত্য-রথীরা কেহই অব্যাহতি পান নাই। ব্যঙ্গকাব্য হিসাবে বায়রণের এ পুস্তক অতুলনীয়। ইংলণ্ডের সুধী-সমাজ বিশ বৎসরের এক যুবার লেখনী-শক্তির তীব্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

"English Bards And Scotch Reviewers" এক ধার হইতে সকলকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে। ইহার ভূমিকায় বায়রণ স্পষ্টই বলিয়াছেন :

Prepare for rhyme—I'll publish, right or wrong
Fools are my theme, let satire be my song.

বাঁধ ছন্দঃ-বীণা—আমি করিব প্রকাশ,
হোক্ তাহা সত্য কিংবা হোক্ মিথ্যাভাষ :
মূর্খ যত তারা মোর আলোচ্য বিষয়,
আমার সঙ্গীত হবে তীব্র ব্যঙ্গময়।

বড় দুঃখেই বায়রণ এ কথা লিখিয়াছিলেন। "Hours of Idleness"এর বিরুদ্ধ সমালোচনা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। এই পুস্তকের এক স্থানে তাই তিনি সেই সমালোচনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এক শিশু পড়ুয়া তাহার খেয়ালবশে কি হিজিবিজি কাটিল তাহা লইয়া বৃদ্ধদের এত মাথাব্যথা কিসের? নিন্দা অথবা স্তুতি কোন কিছুই সে চাহে নাই—আপন মনে সে লিখিয়াছিল। তবে কেন তাহাতে গুরুত্ব আরোপ করা হইল?

I too can scrawl, and once upon a time
I pour'd along the town a flood of rhyme,
A schoolboy freak, unworthy praise or blame;
I printed—older children do the same.
'T is pleasant, sure, to see one's name in print;
A book's a book, although there's nothing in't.

কিবা বাধা মোর আঁকিতে লিখিতে, হোক্ না কেন তা বাজে
বহায়ে ছিলাম ছন্দের স্রোত একদা নগীর-মাঝে।
শিশু পড়ুয়ার খেয়ালের বশে উঠে ছিল যাহা গড়ে
নিন্দা অথবা স্তুতির কোনটা প্রাপ্য তাহার তরে?
ছাপায়ে ছিলাম—যেমতি ছাপায় মোর চেয়ে বড় যেবা,
ছাপার হরফে নিজ নাম হেরি আমোদ পায় না কে-বা?
একখানি বই, হয়ত তাহাতে নাইক' কিছুই সার,
তবু সে ত বই—খুসী তাহাতেই—স্বরচিত আপনার।

বায়রণের এ লেখায় এক নবীন লেখকের মনস্তত্ত্ব নিখুঁত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

লিখিতে লিখিতে অন্তরের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার ক্রুদ্ধ লেলিহান শিখা সকলকেই নূতন জ্বালার অনুভূতি বুঝাইয়া দিয়াছে।

দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া বায়রণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। মানুষের প্রতি ঘৃণায় তাঁহার সারা অন্তর ভরিয়া উঠিল। সংসার তাঁহার কাছে অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

স্বাধীন-চেতা তেজস্বী পুরুষ বায়রণ একেই ত অপরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিতেন না, তাহার উপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এখন তিনি আপনাকে একেবারে সব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। তাই চাইল্ড হেরল্ড-এর বায়রণকে আমরা বলিতে শুনিলাম :

I have not loved the world, nor the world
me
I have not flatter'd its rank breath, nor
bow'd
To its idolatries a patient knee,
Nor coin'd my cheek to smiles, nor cried
aloud
In worship of an echo ;...

সংসারে আমি বাসি নাই ভাল, সে-ও নাহি মোরে বেসেছে ;
মর্য্যাদা-ভরা দূষিত বাতাস আঘ্রাণে যবে এসেছে
চলিয়া এসেছি সেথান হইতে। ভক্ত স্তাবক যেমনি
জানু পাতি বসে প্রতিমা-পূজায় ; আমি ত পারিনি তেমনি।
বৃথা তোষামদে সকলের সাথে আমি ত পারিনি হাসিতে,
হুজুরের কথা প্রতিধ্বনিয়া আমি ত পারিনি কাসিতে।

সমাজের এই অসার মোহ, সংসারের এই অলীক অহঙ্কার, বায়রণের ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছে। তাই তিনি রেভারেণ্ড বীচারকে লিখিয়াছিলেন :

Dear Becher, you tell me to mix with
mankind ;
I cannot deny such a precept is wise ;
But retirement accords with the tone of
my mind :
I will not descend to a world I despise.
... ...
Yet why should I mingle in Fashion's
full herd ?
Why crouch to her leaders, or cring to
her rules ?
Why bend to the proud, or applaud the
absurd ?
Why search for delight in the friendship
of fools ?

* * *

I have tasted the sweets and the bitters
of love ;
In friendship I early was taught to believe ;
My passion the matrons of prudence reprove ;
I have found that a friend may profess,
yet deceive.
To me what is wealth ?—it may pass in
an hour,
If tyrants prevail, or if Fortune should
frown :
To me what is title ?—the phantom of
power ;
To me what is Fashion ?—I seek but renown.

* * *

Deceit is a stranger as yet to my soul :
I still am unpractised to varnish the truth :
Then why should I live in a hateful control
Why waste upon folly the days of my youth?

মানব-সমাজে আমি যেন মিশি, বলেছ' বন্ধু মোরে ;
তোমার বাণী যে যুক্তি-যুক্ত নিতেছি স্বীকার করে'।
কিন্তু আজিকে অন্তর মম টানিছে পিছন পানে,—
যে জগৎ আমি ঘৃণা করি সথা কেন যাব' সেইখানে ?

• • • •

কেন—কেন আমি মিশিব বন্ধু হাল ফ্যাশানের দলে ?
কেন-বা করিব মিছে চাটুবাদ নেতাদের তোষ-ছলে ?
কেন-বা মানিব নিয়ম তাহার ? কেন-বা নোয়াব মাথা
দাম্ভিক-পায়ে ? কেন-বা বাহবা দিতে হবে জানি যা-তা ?
নির্ব্বোধ যারা তাদের সহিত কেন-বা সখ্য করি ?
তাদের মাঝারে হায় রে আমোদ বৃথাই খুঁজিয়া মরি।

* * * •

ভালবাসিবার অম্ল-মধুর জানি কিবা স্বাদ মেলা,
সখ্যতা'পরে আস্থা রাখিতে শিখেছিনু ছেলেবেলা।
পেয়েছি সে ফল—জ্যাঠা বোধ করিতেছে ভৎসনা—
বন্ধু—সে জানে শপথ করিয়া করিতে প্রবঞ্চনা।

• • • •

সম্পদে মোর কিবা প্রয়োজন ?—নিমেষে মিলাতে পারে
ভাগ্যদেবীর ভ্রূকুটি বা যদি তস্কর দেখে তারে।
ক্ষমতার মোহ-জড়িত উপাধি—সে নাম আমি না চাই,
আদর্শে মোর কিবা হবে ফল ?—যশের বাসনা নাই।

• • • •

প্রতারণা সেই আমার নিকটে আজিও অপরিচিত,
সত্যেরে আমি শিখিনি করিতে আজো অতিরঞ্জিত।
তবে কেন আমি ঘৃণ্য সমাজে মিথ্যা করিব বাস ?
মূর্খ মোহেতে মিছে কেন করি যৌবন মম নাশ ?

অশান্ত-চিত্ত বায়রণের ইংলণ্ডে মন বসিল না। তাই ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি তাঁহার গৃহ-শিক্ষক হবহাউসকে সঙ্গে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া তিনি দেশ হইতে দেশান্তরে ফিরিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগাল এবং স্পেন পরিভ্রমণ করিয়া তিনি সমুদ্রপথে জিব্রাল্টার হইতে মাল্টায় গমন করিলেন। এইখানে শ্রীমতী (Mrs) স্পেন্সার স্মিথ নাম্নী এক তরুণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই তরুণীই তাঁহার ভবিষ্যৎ

চাইল্ড হেরল্ড-এর ফ্লোরেন্স-চিত্রাঙ্কনের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে। শ্রীমতী স্পেন্সারকে কেন্দ্র করিয়াই চাইল্ড হেরল্ড বলিয়াছে :

Sweet Florence! could another ever share
This wayward, loveless heart, it would be thine :
But check'd by every tie, I may not dare
To cast a worthless offering at thy shrine,
Nor ask so dear a breast to feel one pang for mine.

এই যে অবাধ্যমতি প্রেমহীন হিয়া
লইতে পারিত যদি অধিকার করি
কোন দিন কেহ মোর মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়া—
সে শুধু তুমি-ই একা ফ্লোরেন্স সুন্দরী।
কিন্তু আমি পরীক্ষিত সকল বাঁধনে,
সাহস করিয়া তাই পারি না ত আর
পবিত্র বেদিকা পরে তোমার চরণে
নিবেদিতে অর্ঘ্য মোর—তুচ্ছ উপহার।
এমন সুন্দর প্রাণ—তবু বলিব না
রাখিতে আমার লাগি' একটু বেদনা।

বায়রণ মাল্টা হইতে সেপ্টেম্বর মাসে প্রিভেসায় গমন করিলেন, এবং শরৎ ও শীতের প্রথম ভাগ আকার্ণানিয়া ও মোরিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পরিশেষে বড়দিনের সময় তিনি এথেন্সে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীমতী ম্যাকৃরি নাম্নী এক মহিলার গৃহে তিন মাস অতিবাহিত করেন। এই ম্যাকৃরির কন্যা কুমারী থেরেসের উদ্দেশে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি "Maid of Athens, Ere we part" নামক সুন্দর কবিতাটি রচনা করেন :

Maid of Athens, ere we part,
Give, oh give me back my heart!
Or, since that has left my breast,
Keep it now, and take the rest!
Here my vow before I go,
Zwn uov, o as ayarrw.

* * *

By those tresses unconfined,
Woo'd by each Ægean wind;
By those lids whose jetty fringe
Kiss thy soft cheeks' blooming tinge;
By those wild eyes like the roe,
Zwn uov, o as ayarrw

* * *

By that lip I long to taste;
By that zone-encircled waist;
By all the token-flowers that tell
What words can never speak so well;
By love's alternate joy and woe,
Zwn uov, o as ayarrw

* * *

Maid of Athens! I am gone:
Think of me, sweet! when alone.
Though I fly to Istambol,
Athens holds my heart and soul:
Can I cease to love thee? No!
Zwn uov oas ayarrw.

যাবার আগে হৃদয় মম ফিরায়ে দিয়ো ফিরায়ে দিয়ো।
যে হিয়াখানি এথেন্স-বালা তোমারে আমি সঁপেছি প্রিয়।
অথবা যখন আমারে ছাড়ি গিয়াছে তাহা তোমার কাছে,
রেখে তা' দিয়ো—আরো গো নিয়ো তার সাথে মোর যা কিছু আছে।
যাবার বেলা যেতেছি বলে' হিয়ার গোপন বারতাখানি,
ভাল যে বাসি তোমারে সখি, তুমি যে মম হৃদয়-রাণী।

* * * *

যে বেণী তব হয়নি বাঁধা, দোলায় যাহা ঈজান-বায়
চূর্ণ কেশে সোহাগ ভরে সে যেন তারে চুমিতে চায়;
চোখের পাতার প্রান্ত যাহা প্রস্ফুটিত পুষ্প সম
গোলাপ-রাঙা কোমল গালে আঁকিছে চুমা মধুরতম;
আয়ত আঁখি হরিণী সম—তাদের নামে শপথ মানি,
ভাল যে বাসি তোমারে সখি, তুমি যে মম হৃদয়-রাণী।

* * * *

বিম্ব সম ওষ্ঠ তব—যাহারে নিতি কামনা করি,
বাঁধন-রেখা যে কটিদেশে রেখার মায়া রেখেছে ভরি,
তোমার প্রীতির নিদর্শনে আমারে তুমি যে ফুল দিলে
কহিয়া গেল মরম-কথা, ভাষায় যাহার কূল না-মিলে,
ভালবাসায় যে আনন্দ যে পীড়া—তায় শপথ মানি,
ভাল যে বাসি তোমারে সখি, তুমি যে মম হৃদয়-রাণী।

* * * *

এথেন্স-বালা! চলিনু এবে, মিনতি আজি বিদায় ক্ষণে,
একাকী যখন রহিবে প্রিয়, আমার কথা স্মরিয়ো মনে।
ইস্তাম্বুলে যাব' বটে, তথাপি এই এথেন্স' পরে
পড়িয়া র'বে সারাটি হিয়া—মরমখানি তোমারি তরে।
তোমার তরে আমার প্রেমের হবে কি শেষ?
না, না, তা জানি,—
ভাল যে বাসি তোমারে সখি, তুমি যে মম হৃদয়-রাণী।

১৮১০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বায়রণ এথেন্স পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন ধরিয়া তিনি ট্রয়, কনষ্টাণ্টিনোপল এবং পুনরায় মোরিয়া পরিভ্রমণ করেন, এবং শীতকালে আবার এথেন্সে ফিরিয়া আসেন। এইখানে ক্যাপুচিন কনভেণ্টে বসিয়া তিনি আরো দুইটি ব্যঙ্গকাব্য "Hints from Horace" এবং The Curse of Minerva" রচনা করেন, ও "Childe Harold"এর প্রথম সর্গ লিখিতে শুরু

দ্রষ্টব্য :—Zwn uov, oas ayarrw—লেখাটি গ্রীক হরফের, ভালবাসা-সূচক অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইংরাজী অর্থে "My life, I love you" এইরূপ দাঁড়াইবে।

[ফ]িরিয়া দেন। পরিশেষে বায়রণ পুনরায় মাল্টা পরিদর্শন করিয়া [ই]ংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার "Childe Harold's Pilgrimage"এর প্রথম দুই সর্গ প্রকাশিত হইল। বিদেশ ভ্রমণের সুন্দর বিবরণীতে, নানা দেশের বিচিত্র কথায়, কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলীতে, আপনার বিষাদময় জীবনের আত্মকাহিনীতে, দম্ভময় অসার সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ-বাণীতে "Childe Harold's Pilgrimage" কাব্য ও সাহিত্য-জগতে এক নব যুগের প্রবর্তন করেন। কী সুন্দর সুললিত ছন্দ—যেন নৃত্যচপলা নির্ঝরিণীর মতই লীলা-নূপুর-শিঞ্জনে মানুষের প্রাণ-মন মাতাইয়া জনপদ প্লাবিত করিয়া আপনার মনে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভাবপ্রবণ নরনারী সেই অপূর্ব্ব ছন্দ-স্রোতে উচ্ছলিত ভাব-বন্যায় ভাসিয়া গেল—আদর্শবাদীর দল এই তরুণ কবির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিল। বায়রণের অসামান্য খ্যাতি তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি স্কটের প্রতিভাকেও ম্লান করিয়া দিল। বায়রণ এ সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন, "I awoke one morning to find myself famous,"—এক দিন প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া দেখিলাম আমি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছি।

ইহার পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হইল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে "The Giaour" এবং ডিসেম্বরে "The Bride of Abydos," ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে "The Corsair" এবং আগষ্ট মাসে "Lara," ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "Hebrew Melodies," ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "The Siege of Corinth" এবং ফেব্রুয়ারীতে "Parisina" প্রকাশিত হইল, এবং রোমান্স-কাহিনী রচনায় তাঁহার কবি-প্রতিভাকে সুধী সমাজ অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। শুধু ইংলণ্ডে নহে, নানা ভাষায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অনুবাদ হওয়ায় সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে তিনি বরেণ্য হইয়া উঠিলেন—তিনি যেন "The grand Napolean of the realms of rhyme"—ছন্দরাজ্যে বিখ্যাত নেপোলিয়ানের মতই একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। এমন কি মহামতি গেটে (Goethe) বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, সাহিত্য-জগতে এমন অপূর্ব্ব চরিত্রের ইতিপূর্ব্বে কখনও আবির্ভাব হয় নাই, এমনটি আর কখনও হইবে না।

১৮১২ হইতে ১৮১৬—বায়রণের জীবনের এই চারিটি বৎসর বড় সুখের বড় মধুর বড় গৌরবময়। এই সময়ে তাঁহাকে প্রত্যেক বড় ঘরের অন্দর মহলে অথবা বহির্বাটীতে দেখা যাইত—সমাজের বহু নরনারীর সহিত তাঁহাকে মিশিতে দেখা গিয়াছিল। হ্যামিল্টন টমসন লিখিয়াছেন, It should be kept in mind that during this epoch of brilliant productiveness, Byron, in spite of his follies and vanity, had lost that tone of bitter cynicism which he had affected at Newstead.

মনে করা যাইতে পারে যে, এই সুন্দর সৃজন-কালে বায়রণ তাঁহার দৌর্ব্বল্য এবং মোহ সত্ত্বেও, নিউষ্টেডে অবস্থানকালে যে তিক্ত মানব-দ্বেষের ভাব পোষণ করিতেন তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। "English Bards and Scotch Reviewers" নামক পুস্তকে নির্ব্বিচারে সকলের প্রতি তিনি যে অকরুণ বিদ্রূপোক্তি করিয়াছিলেন তাহার জন্য এই সময়ে তাঁহাকে দুঃখ করিতে দেখা গিয়াছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্কটের সহিত বায়রণের দেখা হয়। দর্শনমাত্রই উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি জন্মিল। কবিদ্বয়ের প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। প্রায় একই সময়ে ওয়ার্ডসোয়ার্থের সহিত বায়রণের সাক্ষাৎ হয়। ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রতি সাময়িক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেও বায়রণ পরে তাঁহার প্রতি পুনরায় বিরূপ হইয়া উঠেন।

বায়রণ—পঁচিশ বছরের যুবক বায়রণ—আদিত্যের মত দীপ্তিমান্ তারুণ্যে বিকশিত বায়রণ—অনুপম রূপবান অথচ একটু অঙ্গত্রুটি-বিজড়িত বায়রণ—ইংলণ্ডের যুব-সমাজে শ্রদ্ধা-প্রীতি কারুণ্যরসের সঞ্চার করিয়া আবির্ভূত হইলেন। উইলিয়াম লঙ্ লিখিয়াছেন, "All this, with his social position, his pseudo-heroic poetry, and his dissipated life,—over which he contrived to throw a veil of romantic secrecy,—made him a magnet of attraction to many thoughtless youngmen and foolish women, who made the downhill path both easy and rapid to one whose inclinations led him in that direction. Naturally he was generous, and easily led by affection. He is, therefore, largely a victim of his own weakness and of unfortunate surroundings."—এই সবের সহিত তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদা, তাঁহার কাব্যে কল্পিত নায়কের ভূমিকা গ্রহণ, এবং তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল জীবন,—যাহার উপর তিনি রোমান্সের রহস্যময় আবরণ টানিয়া রাখিয়াছিলেন,—সব কিছু মিলিয়া অনেক চিন্তা-শক্তিহীন যুবাকে এবং নির্ব্বোধ তরুণীকে তাঁহার পতি চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিত এবং তাহারাই তাঁহার অধঃপতনের পথ সুগম এবং সত্বর করিয়া দিয়াছিল, যাঁহার স্বাভাবিক মনোবৃত্তিও ছিল ঐ দিকেই। স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন উত্তেজক প্রকৃতির, এবং সহজেই মোহগ্রস্ত হইতেন। তাই তিনি স্বীয় দৌর্ব্বল্য ও অবাঞ্ছিত পরিবেষ্টনীর দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন।

১৮১২ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া বায়রণ স্যার র‍্যালফ্ মিলব্যাঙ্কের কন্যা কুমারী ইসাবেলার প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতে থাকেন। সুন্দরী যুবতী ইসাবেলাও তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরিশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

[ক্রমশঃ

★
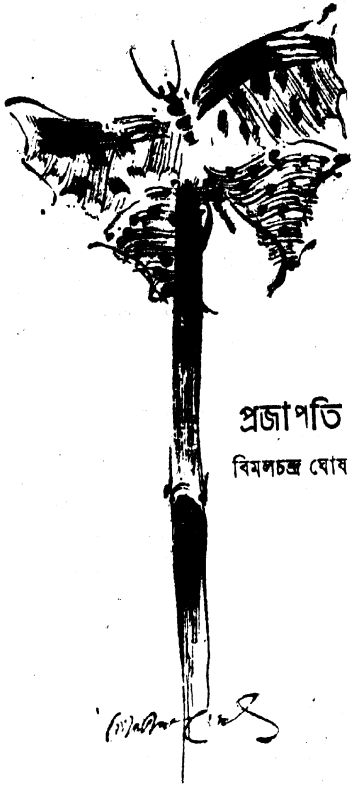
প্রজাপতি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বারুদের কালো ধূমে
তৃণভূমি গেছে চুঁয়ে
মাটির কোলের কাছে ঝুরঝুরে বাতাসে
সকালের রাঙা-রোদে
প্রজাপতি উড়ছে!

প্রজাপতি উড়ছে!
প্রলয়ের বরাভয় প্রলয়ের শিল্প,
কম্পিত রঞ্জিত পাখনায়,
দুরন্ত শেল-ফাটা বাতাসের শব্দ
থেমে গেছে নীলাকাশ স্তব্ধ;
নৃত্য-চপল পায়ে
ভাঙা দেয়ালের গায়ে
নম্র পরশ দিয়ে প্রজাপতি উড়ছে,
ভাঙা সহরের বুকে
অসাড় ইটের স্তূপে
হাজার রঙের ছিটে পাখ্‌না পুড়ছে ॥

প্রজাপতি উড়ছে!
সকালের সূর্যের সোনার আলোয় জাগা
ঝাঁঝরা টিনের শেড্‌
ধূলিসাৎ বস্তি,
লৌহ-তোরণ-দ্বার
স্প্লিন্টারে চুরমার
ইটের রাবিশে কাঁদে
প্রাসাদের অস্থি ॥
শুক্‌নো রক্তমাখা
প্রলয়ের ছবি আঁকা
নির্জন নদীতট
নগরের প্রান্ত,
মাটিতে অনেক হাড়
কী নীরব নিঃসাড়
আকাশ কী গাঢ় নীল
উজ্জ্বল শান্ত।

দিগন্তে মিশে গেছে শান্ত বনাঞ্চল
দগ্ধ বাঁশের ডগা কম্পিত চঞ্চল
রেশ্‌মি কোমল পায়ে
কী চপল ছোঁওয়া দিয়ে
রৌদ্রের সিঁড়ি বেয়ে
প্রজাপতি উড়ছে!

চাষার জেগেছে আশা
বাঁধছে নতুন বাসা
মুনিষ মানুষ হ'বে ভাঙা গলা সাধছে।
মজুর বেসুর প্রাণে
জীবনের সন্ধানে
খোড়ো নদী পার হ'য়ে ঘাটে তরী বাঁধছে
সকালের রাঙা রোদে প্রজাপতি উড়ছে ॥

কাল যা'রা মরে গেছে যাক্ মরে যাক' না
বিস্মৃতি-বিহগের ঝরে যা'ক খসে যা'ক্
রোমাঞ্চ কম্পিত কালো কালো পাখ্‌না,
যুগে যুগে বেজে গেছে কত রণ-তূর্য্য
তবু তো উষায় আজো ওঠে লাল সূর্য্য
তবুও শ্মশান বুকে
অনন্ত কৌতুকে
আজো ওড়ে প্রজাপতি কম্পিত পাখনা ॥

রঙ্, রঙ্, শুধু রঙ্!
রূপায়িত কল্পনা অবারিত অকারণ,
পাখায় পাখায় আঁকা
সুরভি কেশর মাখা
শ্মশানের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ছে।
অথৈ নদীর জল কূলে কূলে স্বপ্ন
বনে বনে কিশলয় কুসুমিত লগ্ন
গান গায় প্রজাপতি
নীরবিত সুরে সুরে
মন্থর কী অলস ছন্দ!

মরা-কঞ্চির ডালে
রঙের প্রদীপ জ্বালে
ঈষৎ পরশ দিয়ে আলুতো।
পাৎলা পাখায় তা'র
কম্পিত রঞ্জিত
কী অলস উন্মন ছন্দ!

রক্তিম বনচূড়া শিখায়িত শান্ত
নির্জ্জন নগরের প্রান্ত,
সকালের রাঙা রোদে
ভগ্ন স্তূপের বুকে
কেঁপে কেঁপে প্রজাপতি উড়ছে,
হলদে বেগুনী লাল
সবুজের মায়াজাল
হাজার রঙের ছিটে পাখনায় পুড়ছে ॥

নিষ্ফল-কামনা

শ্রীমৃণালকান্তি দাস

বৈতরণীর ঘাটে আমি পার করি শেষ খেয়ায়।
আমার ঘাটের তরী বেয়ে কত আসে যায়।
মনে মনে
গ'ণে গ'ণে
হিসেব রাখি তার—
তরী বেয়ে
হেসে-গেয়ে
কে-যে হোল পার।
আমি সদাই মনে রাখি—
আমায় সে কে দেবে ফাঁকি,
পার হোয়ে কে যায় পালিয়ে
খেয়ার কড়ি নাহি দিয়ে,
কবে যে তার দেখা পাবো, কোন্ সে অচিন্ গাঁয়।
পার হবে সে আমার শেষের নায়।

একে-একে
দেখে-দেখে
পার হোল যে সব,—
দিন যে গেলো—
সন্ধ্যা এলো,
থাম্‌লো কলরব।
সে তো তবু এলো না রে
আমার খেয়া-ঘাটের পারে,
কিসের তরে কেবা জানে,—
মানে, কিবা অভিমানে,
তখনও কি যাবে ফিরে যদি ধরি পায়।
সে তো আমার চিন্‌লো না রে হায়।

এই যে আমি
দিবা-যামী
করি খেয়া পার,
সকল কাজে
আমার মাঝে
ভাব্‌না আছে কা'র।
কাহার আশায় চম্‌কে উঠি'
স্বপন-নেশা যায় রে ছুটি',
কাহার আশায় চেয়ে থাকি'
হঠাৎ ভুলে উঠি ডাকি',—
দিনের শেষে ছায়া নামে তেপান্তরের গায়।
সে তো তবু এলো না রে আমায় সোণার নায়।

ভজহরি পরামাণিক ওরফে মহাকবি কালিদাস

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

ভোজরাজ এক দিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, যদি কোনো পণ্ডিত তাঁহাকে একটি নব-রচিত শ্লোক শুনাইতে রেন তাহা হইলে রাজকোষ হইতে তাঁহাকে বহু স্বর্ণমুদ্রা দিয়া স্কৃত করা হইবে।

ঘোষণায় স্বর্ণমুদ্রার একটা সংখ্যাও ছিল। সংখ্যাটা এত অধিক , শুনিলেও ঠিক ধারণা করা যাইবে না। আঠারো-লক্ষ-কোটি ার চেয়ে এক কথায় অনেক বলাই ভাল নয় কি?

যাহাই হউক, এই আঠারো-লক্ষ-কোটি স্বর্ণমুদ্রা এ পর্য্যন্ত এক ন কবিও পাইলেন না।

বড় আশ্চর্য ব্যাপার তো! একটা নূতন শ্লোকও কোনো কবি চনা করিতে পারিলেন না! সে কেমনতরো কথা।

আজিকার দিন হইলে আমরা—যাহারা কথনও পত্ত লিখি নাই, দই আমরাও—যেমন তেমন করিয়া চৌদ্দটা অক্ষরকে টানিয়া টুনিয়া ঠলিয়া ঠুলিয়া গোটা চারেক ছত্র না করিয়া ছাড়িতাম না। খেলার কথা তো নয়, আঠারো-লক্ষ-কোটি! না, সে কথা আর ভাবিব না। াকাগুলা হাতছাড়া হইয়া গেল—এ কথা, মনে করিলে বুক টন্ টন করিয়া উঠে।

শেষ পর্যন্ত মনটা খুব সহজেই ঠাণ্ডা হইল। গল্পের শেষ দিক্‌টা যখন শুনিলাম তখন বুঝিলাম, ভোজরাজের সবই চালাকি। যেমন তেমন কবিতা তো দূরের কথা খুব উঁচু দরের কবিতা লিখিলেও াকাটা পাওয়া যাইত না।

হয়তো বা পূর্ব-জন্মে আমিই এক জন কবি ছিলাম। হয়তো বা সত্য সত্যই ভালো কবিতা রচনা করিয়া লোভে ভোজরাজের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উত্তরীয়, কণ্ঠে পুষ্প-মাল্য, কপালে চন্দনের তিলক—আহা! আমার সেদিনকার সেই মূর্ত্তি আজ কল্পনার দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু পুরস্কার বোধ হয় পাই নাই, কিংবা হয়তো পাইয়াছিলাম। ঠিক বলিতে পারি না। একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরের উপরে এই সমস্তার সমাধান নির্ভর করিতেছে!

প্রশ্নটি এই—আমি পূর্ব-জন্মে কালিদাস ছিলাম কি না? যদি প্রমাণ হয় যে আমি কোনো জন্মে কবি কালিদাস হইয়া জন্মাই নাই, তাহা হইলে অবশ্যই সোনার টাকাগুলা আমার হাতে আসে নাই।

যদি স্থির হয়, আমিই বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় প্রধান কবির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলাম, তবে সঙ্গে-সঙ্গে ধরিয়া লইতে হইবে, পুরস্কারটা আমিই পাইয়াছিলাম। উঃ, আমি যদি কালিদাস হইয়া থাকি! আমার বিশ্বাস, আমিই কালিদাস ছিলাম এবং কালিদাসই আমি।

আমি বলিতেছি, আমিই ছিলাম কালিদাস। এ-সব যুক্তি-তর্কের কথা নয়। ইহাকে বলে ইন্‌টুইশন্।

এই ইন্‌টুইশনই আজ বলিতেছে পূর্ব্বজন্মে আমি ছিলাম কালিদাস।

আজ বেশ মনে পড়িতেছে,—শকুন্তলার কথা। ফার্ষ্ট অ্যাক্টের সেই জায়গাটা, যেখানে দুষ্মন্তকে গাছের আড়ালে দাঁড় করাইয়া মেয়ে তিনটিকে ছাড়িয়া দিলাম। দুষ্মন্ত বেচারার অবস্থা যে কাহিল।

কিন্তু হইলে হইবে কি? ওদিকে আলংকারিকের দল নায়কের জন্য যে সব গুণাবলীর তলব করিয়া রাখিয়াছেন—তাহার খবর তো জানেন! সে সব দস্তুর মানিয়া চলিতে হইলে এমন Scene একেবারে মাঠে মারা যায়।

নাটক লিখিতে বসিয়াছি, তাহারও আইন মানিয়া চলিতে হইবে। সত্য কথা বলিতে কি, এক এক দিন এমন মনে হইত যে, কাব্যশাস্ত্র শিকায় তুলিয়া বরং ধর্ম্মশাস্ত্রে মন দিব। কখনও কখনও মনে হইত, চাণক্যই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। দিব্য লিখিয়া বসিলেন,—'মাতৃবৎ পরদারেষু'। সমালোচনার পথ রাখিলেন না।

আমার অপরাধ, সত্য কথা বলিয়াছি। দুষ্মন্তের পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই লিখিয়াছি। তাহাতে নায়ক ছোট হইয়া যায়। কিন্তু আমি কি করিব?

সমালোচক বলিবে, যাহা হওয়া সম্ভব তাহা না বলিয়া যাহা হওয়া উচিত তাহাই লেখ। অর্থাৎ নায়ককে দেবতা করিয়া নাটককে জবাই কর।

ভাগ্যে তাহা করি নাই। তাহা হইলে আজ কি তোমরা আমাকে চিনিতে?

কিন্তু তাহার জন্য কি উদ্বেগ, কি দুশ্চিন্তা। বিধান যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহাদের না মানিলে নয়, অথচ তাঁহাদের পুরাপুরি মানিলে যাহা বলিতে চাই তাহা আর বলা হয় না।

নর-নারীর প্রেম জাতি-কুল প্রভৃতি মানে না। ক্ষত্রিয় দুষ্মন্ত একটি আশ্রমের মেয়েকে দেখিয়া আত্মহারা হইল—আসক্ত হইবে না এমন কথা নীতিশাস্ত্র ছাড়া আর কোথাও লেখে না। শকুন্তলাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছি মনে আছে তো? তপোবন সারল্য ফুটাইবার জন্য আয়োজন খুব অনাড়ম্বর করিয়াছিলাম। চীনাংশুক প্রভৃতি সব জিনিষই আছে। কিন্তু এ জায়গায় দেখিলা বাকলটাই মানায় ভাল।

ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখাইয়া রাজার চোখ ঝলসাইতে হইলে তাহার চেয়েও বড় রাজার দরকার।

নিতান্ত মারিয়া কাটিয়া অনেক চাহিয়া চিন্তিয়া না হয় শকুন্তলার জন্য এক জোড়া সোণার কঙ্কণ ও একখানি পট্টবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। তাহাতে ফল কি? রাজবাড়ীর দাসীও যে তাহা অপেক্ষা জমকালো বেশভূষা মাঝে মাঝে পরিয়া থাকে। এ সব স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বোকামি।

কাজেই ভাবিয়া চিন্তিয়া শকুন্তলাকে বাকল পরাইলাম এবং তাহাও একটু আঁট করিয়াই পরাইলাম। মানুষ দুষ্মন্ত মানুষী শকুন্তলাকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, জাতিকুল বিচার করিল না। সমালোচকরা অমনি খড়্গ তুলিয়া ধরিলেন—ঘাড়ে পড়ে আর কি! সে দিন কি বুদ্ধিটাই না মনে আসিয়াছিল। ধাঁ করিয়া রাজার মুখে বসাইয়া দিলাম,—

'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।'

এ সব ইন্‌টুইশনের কথা। সমালোচকের যুক্তির হাঁড়ি একেবারে কুটা করিয়া দিলাম।

আজ আমি শ্রীভজহরি পরামাণিক যদি সেই ইন্‌ট্যুইশনের জোরে বলি যে, যে ছিল কালিদাস সেই আমি, তবে তোমার বা তোমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের কি? যদি উল্টা প্রমাণ করিতে পার, কর। শুধু না বলিলে মানিব কেন?

আমার বুদ্ধি ক্রমশঃ খোলসা হইয়া আসিতেছে। আমি কি জাতিস্মর হইলাম না কি? আমার সেদিনকার শৈশবের স্মৃতি—আহা সে কি ভুলিবার কথা! গাছের আগায় বসিয়া গোড়ায় কুড়ালের ঘা লাগাইতেছিলাম। কোথা হইতে দীর্ঘশিখ জনকয়েক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে নামিতে বলিল। মনে আছে, সেদিনও আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইয়াছিল। দুষ্যন্তের বাহুস্পন্দন নিজেরই অভিজ্ঞতার ফল মাত্র।

এই বাহু-স্পন্দনের মূলেও সেই ইনট্যুইশন। ইনট্যুইশনের ক্রিয়া শুধু অন্তঃকরণে নয়, দেহেও তাহার প্রকাশ হয়।

আমি কালিদাস। আমি এক দিন বলিয়াছিলাম, সন্দেহ স্থলে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। তুমি যদি সাধু পুরুষ হও, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিতে পার। সে যাহা বলিবে তাহাই সত্য। তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে পার।

আমি শ্রীভজহরি পরামাণিক কোনো এক বিগত জন্মে কালিদাস ছিলাম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন প্রমাণ করিব, এই বাঙ্গালা দেশই ছিল আমার জন্মস্থান, আমি বাঙ্গালী ছিলাম। ইনট্যুইশন না মান, অন্য প্রমাণ আছে।

বিক্রমাদিত্যের সভায় ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট ঘটকর্পর প্রভৃতি আরও আট জন দিগ্‌গজ পণ্ডিত তো ছিলেন। কিন্তু ভোজরাজকে তাহারা কেহ হারাইতে পারিয়াছিল কি? এই শর্মা ছাড়া সেই অষ্টাদশ-লক্ষ-কোটি স্বর্ণমুদ্রা আর কেহ জয় করিতে পারিয়াছিল কি? না, পারে নাই।

কেন পারে নাই? চারি ছত্র শ্লোক মিলাইতে পারে নাই বলিয়া নয়। পেটে বিদ্যা কিছু সবারই ছিল কিন্তু ঘটে বুদ্ধিটারই অভাব যে। আজিকার দিনেই দেখ না কেন, বুদ্ধি যাহার আছে সে ইচ্ছা করিলেই বিদ্বান্ হইতে পারে! কিন্তু বিদ্যা যাহার আছে তাহারা কয় জন বুদ্ধিমান? বুদ্ধিকে ঠিক-মত ব্যবহার করাই চতুর লোকের কাজ। বাঙ্গালীর সেই চাতুর্য ভুবন-বিখ্যাত।

তাই বলি, ভোজরাজকে যে আমি হারাইয়াছিলাম সে যে শুধু আমার কবিত্বের জোরে তাহা নয়। এমন কি, কবি না হইলেও ক্ষতি ছিল না! প্রয়োজন হইলে ঘটকর্পর ভায়াকে দিয়াও দুই ছত্র লিখাইয়া লইতে পারিতাম। অথবা পৈশাচী প্রাকৃত গ্রাম্য ছড়াকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিতাম। তাহার জন্য কাজ আটকাইত না। আসল কথা, বাঙ্গালী ছিলাম বলিয়াই ভোজকে জয় করিয়াছি। অন্য কারণে নয়।

যখন শোনা গেল, ভোজরাজ নূতন শ্লোক শুনিলেই রাজকোষ উজাড় করিয়া দিবেন তখনই বুঝিলাম, ভিতরে কিছু গোলযোগ আছে। তাহা ছাড়া প্রতি দিনই শুনিতে লাগিলাম, কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা হইতে কবিরা দলে দলে আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন।

আমার সহকর্ম্মীরাও এক এক জন করিয়া দুই এক মাসের ছুটি লইয়া হয় পত্নীকে পিত্রালয় হইতে আনিবার জন্য অথবা অনুরূপ কোনো গুরুতর কারণে বিদেশ যাত্রা করিয়া যথাসময়ে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ-লক্ষ-কোটি স্বর্ণমুদ্রা সকলকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতে লাগিল।

এক দিন ঘটকর্পরকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম, ভায়া, 'বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ' নীতি হিসাবে খুব ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকাশিত হইয়া গেলে তাহাকে গোপন করিতে যাওয়ায় বিড়ম্বনা আছে। ব্যাপারটা কি বল দেখি?

ঘটকর্পর প্রথম একটু ঘাবড়াইয়া গেল; পরে অকপটে সব কথা বলিল।

ভোজরাজের সভায় কয়েক জন শ্রুতিধর পণ্ডিত আছে। কোনো কবি গিয়া নূতন শ্লোক শুনাইলেই তাহারা অমনি বলিয়া বসে—এ আবার নূতন না কি? এ তো পাঁচ শ' বছরের পুরাতন কবিতা। আমরা তো ছেলেবেলা সকলেই ইহা পড়িয়াছি। আমাদের অনেকেরই উহা মুখস্থ আছে। বলিয়া তাহারা গড়গড় করিয়া উহা মুখস্থ বলিয়া যায়। পুরস্কারপ্রার্থী কবির চক্ষু তো চড়ক গাছ!

ভোজরাজের সভাপর্ব সারিয়াই ঘটকর্পর আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল; কিন্তু ভাই সাবধান, কথাটা যেন বেশী জানাজানি না হয়। একে তো হরিদ্বার যাইব বলিয়া মহারাজের কাছে ছুটি লইয়াছিলাম, তাহার পর এই অপমান।

আমি আশ্বাস দিয়া বলিলাম—ভয় নাই, প্রকাশ হইলে বাকী সাত জনের কথাও চাপা থাকিবে না।

ঘটকর্পর দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যুগল ভ্রূ কপালে তুলিয়া বলিল,—সত্য না কি? তবে উহারাও?

আমি বলিলাম, 'হাঁ, লজ্জার যদি কিছু থাকে তো সে তোমার একলার নয়।

ঘটকর্পরের মুখে অনেক দিন হাসি দেখি নাই, সে দিন আবার হাসি দেখিলাম।

এইবার বুদ্ধির খেলা। একটি শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিলাম। এমন নীরস শ্লোক জীবনে কখনও লিখি নাই। তাহাতে কামিনীর গন্ধমাত্র ছিল না। কাঞ্চন ছিল সুপ্রচুর। কবিতাটি আজ ঠিকমত মনে আনিতে পারিতেছি না। তবে তাহার তাৎপর্য্য এই:

আমি মহারাজ যজ্ঞদত্ত সভার সকল সভ্যকে সাক্ষী রাখিয়া কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের নিকট অষ্টাদশ-লক্ষ-কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণস্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমার জীবদ্দশায় যদি এই ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে আমার পুত্র শ্রীমান্ ভোজ এই অষ্টাদশ-লক্ষ-কোটি স্বর্ণ মুদ্রা মহাকবি কালিদাসকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

টাকাটা যে পাইয়াছিলাম, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে, ইহার পরও কি বলিবার স্পর্ধা রাখ যে, আমি ভজহরি পরামাণিক ওরফে শ্রীকালিদাস শর্মা বাঙ্গালী ছিলাম না?

—✶—

ক্লান্তি

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

কাজ করলে মানুষ মাত্রেই পরিশ্রান্ত হয়। কেউ হয়ত অল্পক্ষণ কাজ করেই হয় ক্লান্ত, কেউ বা বেশী সময় কাজ করতে পারে। কিন্তু তাহলেও একটানা একই রকমের কাজ অক্লান্ত ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যেতে পারে, এ রকম লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মানুষ কেন শ্রান্ত হয়?

মানুষের শ্রান্তির মূলে আছে তার আয়ত্তাধীন মাংসপেশী আর স্নায়ু। আমরা জানি, কাজ করবার সময় পেশী-তন্তু সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচনের জন্যে দরকার উত্তেজনার। কিন্তু উত্তেজনার একটা মাত্রা আছে। সেই মাত্রা ছাড়ালে পেশী আর সঙ্কুচিত হতে পারে না। পেশী যখন কাজ করতে আরম্ভ করে তখন গোড়ার দিকে খুব তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত আর প্রসারিত হতে থাকে। তার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে ঐ রকম হতে থাকে। শেষে আর হয়ত একদম সঙ্কুচিত হয় না। মাংসপেশীর ক্লান্তির দু'টো কারণ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। (১) যে জিনিষ পেশীর কর্ম্ম-প্রেরণা বজায় রাখবে তার অভাব ঘটা, (২) সঙ্কোচনের ফলে সার্কোল্যাক্টিক এ্যাসিড এবং অন্যান্য আবর্জ্জনা-জাতীয় জিনিষ জমে যাওয়া।

ক্লান্ত পেশীকে বিশ্রাম দিলে পেশী তার কর্ম্মক্ষমতা ফিরে পায় আর আবর্জ্জনা যা জমে সেগুলো পরিষ্কার হয় প্রধানতঃ রক্তের সাহায্যে।

মস্তিষ্ক আর তার স্নায়ু-কেন্দ্র মানুষের ক্লান্তির জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। এই ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পেশী ক্লান্ত হওয়ার আগে স্নায়ু ক্লান্ত হয়, তার পর স্নায়ুকে তার কর্ম্ম-ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে পারলে পেশী বেশ কাজ করতে থাকে।

এক জন শরীরতত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, ক্লান্ত জীবের রক্ত সাধারণ জীবের দেহে সঞ্চালিত করতে সে-ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে।

এ ছাড়া মনের সঙ্গেও ক্লান্তির যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। অবশ্য মন বলতে মস্তিষ্ক আর তার বাহক স্নায়ুকেই বোঝায়।

মনে চিন্তা থাকলে কাজের শক্তি অনেক কমে যায়। রাগ বা শোকও মানুষের কর্ম্মক্ষমতা নষ্ট করে দেয়—আর মনের আনন্দ কাজের শক্তি যথেষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

ক্লান্তি দূর করবার জন্যে দরকার বিশ্রামের। এই বিশ্রাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে হওয়া দরকার। একটানা অনেকক্ষণ কাজ করে তার পর একটানা বিশ্রাম উপভোগ করলে মাংসপেশীরা আশানুরূপ কাজ করতে পারে না। পুরোপুরি ক্লান্ত হওয়ার আগেই পেশীকে ছুটি দিতে হবে। তাহলে কাজ পাওয়া যাবে অনেক বেশী। খনিতে, কারখানায় এই বিশ্রাম নিয়ে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, উপযুক্ত বিশ্রাম পেলে শ্রমিকরা অনেক বেশী কাজ করতে পারে। এখন বিশ্রামের স্বরূপটা বোঝা দরকার। অনেকে চুপ করে শুয়ে থাকাকেই বিশ্রাম বলে মনে করেন। কিন্তু তা-হলেও বিশ্রামের সময় কেউ বই পড়ে, কেউ খেলা-ধূলো করে, কেউ সিনেমা-থিয়েটারে যায়, কেউ বা গল্প-গুজব করে। তবে যারা থাকে না তাদের থেকে এদের কর্ম্মক্ষমতা মোটেই কম নয়—হয়ত বা বেশী। আসল কথা হচ্ছে এই—যে জাতীয় কাজ করার ফলে মানুষ হয় ক্লান্ত, সেই জাতীয় কাজের পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিশ্রাম পাওয়া যায়।

যে কেরাণী সে তার হাত আর মস্তিষ্ক এই দুটোকে পরিচালিত করে, সে হয়ত ফুটবল খেলে বা গল্প করে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে। তার যে জাতীয় পেশী এবং স্নায়ু ক্লান্ত হয়, সেগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে অন্যগুলোকে কর্ম্মব্যস্ত করলেও তার বিশ্রাম লাভের কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকেরা বিশ্রাম পেতে পারেন মুক্ত বায়ুতে বেড়িয়ে। বই পড়েও তাঁদের বিশ্রামলাভ করা অসম্ভব নয়।

বিশ্রাম সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় একই বিষয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে যায়। তারা যদি বিষয়ের পরিবর্ত্তন করে পড়ে তাহলে ফল পাবে অনেক বেশী। কারণ, একই বিষয় নিয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করলে মস্তিষ্কের ক্লান্তি আসে। এতক্ষণ প্রকৃত ক্লান্তির কথা আলোচনা করা গেল। এ ছাড়া আর এক রকম ক্লান্তি আছে, সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। বেশ সুস্থ সবল লোককেও দেখা যায় যে, কোন কাজ করতে গিয়ে তাঁরা অল্পেই হাল ছেড়ে দেন। বাইরে হয়ত ক্লান্তির কোন চিহ্ন ফুটে ওঠে না, তবু তাঁরা বলেন যে, তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কাজের মধ্যে উৎসাহ আকর্ষণ পেলেই ঐ জাতীয় লোকের ক্লান্তি চলে যায়।

প্রকৃত সুস্থ কে?

শ্রীনলিনাক্ষ দাস মহাপাত্র

সুশ্রুতে আছে :—

"সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে।"

যাহার বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষের সমতা ঠিক থাকে, পাচক অগ্নি সম হয়, রস, রক্তাদি ৭টি ধাতুরও সমতা ঠিক থাকে, মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম এই তিনটি শারীর মলের সমতা ঠিক থাকে, এবং প্রাত্যহিক কর্ম্ম সুনিয়মে চলে আর আত্মার, দশটি ইন্দ্রিয়ের এবং মনের প্রসন্নতা যাহার থাকে তাহাকেই প্রকৃত সুস্থ বলা যায়। এই ক্ষুদ্র ১টি মাত্র শ্লোকের এইটুকু বঙ্গানুবাদ মাত্র। কিন্তু এই একটি মাত্র শ্লোকেই আয়ুর্ব্বেদের ঋষিরা মানব জাতির সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-নীতি বর্ণনা করেছেন। আয়ুর্ব্বেদে সুস্থ ব্যক্তির আদর্শ অতি উচ্চস্তরের। এরূপ সুস্থ ব্যক্তি হাজারে একটিও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, তাই ব'লে আমরা আমাদের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করব কেন? এই আদর্শানুযায়ী আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক ভাবে গঠন না ক'রতে পারলেও, আদর্শ অনুসরণ করে চললে আমরা অনেকখানি উচ্চতর স্তরের স্বাস্থ্যবান্ হতে পারব। আয়ুর্ব্বেদের স্বাস্থ্যনীতি যখন এত উচ্চ স্তরের, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার বেলায় আয়ুর্ব্বেদের আরোগ্যের নীতি কতখানি উচ্চ স্তরের, যাহা এরূপ সুস্থতার পর্য্যায়ে রোগীকে আনতে সক্ষম! এখনকার জীবন্ত কঙ্কালের পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যুগের জীবন্ত প্রতীকরূপে জাতি গঠন করতে হ'লে এই আর্য্য সনাতন নীতি-ক্রমে

চল্‌তেই হবে। বর্ত্তমান জীবনযাত্রার বেগ ও উদ্বেগের মধ্যে আমাদের এ নীতি মেনে চলা একটু অসুবিধাজনক হ'লেও অতি নিম্ন স্তরের এক জাতি থেকে প্রচুর দৈহিক-শক্তি ও অপূর্ব্ব মনোবলে বলীয়ান্ এক উচ্চ স্তরের জাতিতে উন্নীত হ'তে হবে, এই মহান্ আদর্শে অটুট শ্রদ্ধা থাক্‌লে এ সামান্য অসুবিধা লাঘব করা যেতে পারে।

এখন আমাদের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমে দোষের সমতার কথা বল্‌ব। শরীরে রোগোৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বেই প্রথমে শারীর দ্রব্যের মধ্যে বায়ু, পিত্ত বা কফের যে কোন একটির বা দুইটির বা তিনটির হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় এবং বর্দ্ধিত বায়ু, পিত্ত বা কফ স্বয়ং দূষিত হ'য়ে ধাতুকেও দূষিত করে। সে জন্য আয়ুর্ব্বেদে বায়ু, পিত্ত ও কফকে দোষ বলে। পঞ্চ মহাভূতের যে আনুপাতিক পরিমাণ নিয়ে আমাদের দেহযন্ত্র গঠিত হয়েছে, সেই অনুপাত অব্যাহত রাখার জন্য ঠিক সেই অনুপাতেই বায়ু, পিত্ত ও কফের ভাণ্ডার আমাদের শরীরে আছে। বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিমাণের এই সমানুপাত রক্ষা করা হচ্ছে দোষের সমতা রক্ষা। এখন বায়ু, পিত্ত বা কফের পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জান্‌বার উপায় নাই। তবে উহাদের শারীর-কার্য্য সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহ হ'লেই আমরা বুঝি যে উহাদের সমতা ঠিক্ আছে। এখন উহাদের শারীর-কার্য্য কি কি, সেই সম্বন্ধে বল্‌ছি। উৎসাহ, শ্বাস-প্রশ্বাস, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা, মলাদির বেগ প্রবর্ত্তন, ধাতুগণের সম্যক্ গতি ও ইন্দ্রিয় সকলের পটুতা এই সমস্ত শারীরিক ব্যাপার সকল সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হ'লেই বোঝা যায় যে, বায়ুর পরিমাণ ঠিক আছে। শরীরের উত্তাপ, পাচক অগ্নি, ধাত্বগ্নি, দৃষ্টিশক্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, প্রভা, মেধা, বুদ্ধি, পৌরুষ ও শরীরের মৃদুতা যদি অব্যাহত থাকে তবে বোঝা যাবে যে, পিত্তের পরিমাণ ঠিক আছে। যদি শরীর বেশ স্নিগ্ধ সুপুষ্ট থাকে, বলহানি না হয়, সন্ধি-বন্ধনসমূহ বেশ সচল থাকে তবেই বোঝা যাবে যে শ্লেষ্মার পরিমাণ ঠিক আছে।

এবার সমাগ্নি সম্বন্ধে বল্‌ছি। আমাদের শরীরে পিত্ত ছাড়া অন্য কোন অগ্নির সত্তা না থাক্‌লেও, যাবতীয় পরিপাক কার্য্য সাধারণ ভাবে পিত্তের কার্য্য হ'লেও এখানে মাত্র পাচক পিত্ত বা পাচকাগ্নি সম্বন্ধেই পৃথক্ ভাবে বলা হয়েছে। যে সমস্ত আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা অন্নরসাদি সম্যক্ পরিপক্ক হয়ে রস-ধাতুতে ও মলে পরিণত হয়, সেইগুলির সম্মিলিত নাম,পাচক পিত্ত বা পাচকাগ্নি। ত্রিদোষের সমতা থাকলে পাচকাগ্নিও সাম্যাবস্থায় থাকে। যথাকালে ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপক্ক হয়ে যথাকালে ক্ষুধা উপস্থিত হলেই বোঝা যায়, অগ্নির সমতা আছে। কোন সময় ক্ষুধা হ'ল না, কোন সময় বা প্রবল ক্ষুধা, যখন তখন ক্ষুধার উদ্রেক বা বিলম্বে ক্ষুধার উদ্রেক, পেট ফাঁপা, অম্ল, চোঁয়া ঢেকুর ইত্যাদি আহার হজমের সময় উপস্থিত হ'লেই বোঝা যাবে অগ্নি কোন না কোন দোষের দ্বারা দূষিত হয়েছে, আর সমাগ্নি নাই।

এখন সমধাতু সম্বন্ধে বল্‌বার আগে ধাতু কি, জানা দরকার। ধৃ ধাতুর উত্তর কৃৎ যোগে হয়েছে ধাতু অর্থাৎ যাহা দ্বারা শরীর ধারণ হয়েছে। নানা রকমের পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য দ্বারা আমাদের দেহের আকৃতি গঠিত হ'লেও এবং তদ্দ্বারা আমাদের শারীর-যন্ত্রসমূহ স্বাভাবিকরূপে চালু থাকলেও মাত্র সাতটি পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যকে আর্য্য ঋষিরা প্রধান স্থান দিয়েছেন। কেন না, পাঞ্চভৌতিক আহার্য্য দ্রব্যের দ্বারা ইহাদের পরিবৃদ্ধি হয়েই দেহের বৃদ্ধি হচ্ছে, নানাবিধ দুষ্ক্রিয়া দ্বারা এই সাতটি দ্রব্যের ক্ষয় হলেই শরীর ক্ষীণ হয়। আবার ত্রিদোষ এই সাতটিকে দূষিত ক'রেই যে কোন রোগ উৎপন্ন করে। কাজেই এই সাতটি দ্রব্যই শরীরের মধ্যে প্রধান। এই সাতটিকে বলা হয় সপ্ত ধাতু। এই সাতটি ধাতুর যথানির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নিয়েই আমরা জন্মেছি। আহার্য্য দ্রব্যের দ্বারা এই সপ্ত ধাতুর প্রত্যেকের বৃদ্ধি হ'লেও যেন এই সাতটির পরিমাণের সমানুপাত ঠিক থাকে, তবেই ধাতুর সমতা থাকে। এখন এই সাতটি ধাতুরও কোন পরিমাণ আমাদের জানা নাই, কাজেই দেহে এদের কার্য্য দ্বারা এদের পরিমাণ উপলব্ধি করা যায় মাত্র। আহার্য্য দ্রব্য থেকে প্রথমেই রসধাতু উৎপন্ন হয়ে সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়, এবং তখন একটা বেশ তৃপ্তির ভাব আসে। প্রায়ই দেখা যায়, উপবাসান্তে কিছু আহার্য্য দ্রব্য উদরে গেলেই বেশ তৃপ্ত হওয়া যায়। আহার্য্য দ্রব্য প্রথম পরিপাক হওয়া মাত্রই রসধাতুতে পরিণত হ'য়ে সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হয় বলেই এরূপ তৃপ্তির ভাব আসে। এই রস-ধাতু পাঁচ দিন সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হতে হতে ধাত্বগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হ'য়ে রক্ত-ধাতুতে পরিণত হয়। এই রক্ত-ধাতু আবার সঞ্চালিত হ'তে হ'তে পাঁচ দিন পরে স্থির মাংস-ধাতুতে পরিণত হয়ে সমুদয় শরীর যন্ত্রাদি ও পেশী সমূহের পুষ্টি সাধন করে। এই মাংস-ধাতু আর সঞ্চালিত হয় না, তবে এই মাংসধাতু পাঁচ দিন ধরিয়া পরিপক্ক হওয়ার পর মেদধাতুতে পরিণত হয়ে শরীরে স্নিগ্ধতা আনয়ন করে, ঘর্ম্ম নিঃসৃত করে এবং শরীর দৃঢ় করে। এই মেদধাতু আবার পাঁচ দিন পরিপাকান্তে অস্থিধাতুতে পরিণত হয়ে দেহের কাঠামো সমুদয় অস্থির পুষ্টিসাধন করে। অস্থিধাতু থেকে আবার পাঁচ দিন পরিপাক হওয়ার পর অস্থির অভ্যন্তরস্থ মজ্জাধাতুর উৎপত্তি হয়। এই মজ্জা-ধাতু আবার পাঁচ দিন পরিপাকান্তে শুক্রধাতুতে পরিণত হয়ে সমুদয় শরীরে ব্যাপ্ত থাকে। এইরূপে অন্তকার আহার্য্য দ্রব্য ত্রিশ দিন পরে চরম পরিপক্ক দ্রব্য শুক্রধাতুতে পরিণত হয়। এই শুক্র-ধাতুর সম্যক্ পুষ্টির দ্বারা আমাদের দেহে বল, চালনশক্তি ও আনন্দের ভাব অটুট থাকে। মোটের উপর আহার্য্য দ্রব্য থেকে রসধাতুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য ধাতুও সেই পরিমাণে যথারীতি বর্দ্ধিত হয়, তবেই সপ্ত ধাতুর সমতা ঠিক থাকে এবং কোন দুষ্ক্রিয়ার দ্বারা যদি কোন ধাতুর ক্ষয় করা না হয় তবেই ঠিক ধাতুসাম্য থাকে।

এবার মলের সমতা কি করে হয় বল্‌ছি। আমাদের শরীরে প্রধান মল তিনটি। আহার্য্য দ্রব্যের প্রথম পরিপাকান্তে যে পার্থিব মল নির্গত হয়ে পক্বাশয়ে অবস্থান করে তাহার নাম পুরীষ, এবং যে আপ্য মল বৃক্ক (kidney) দ্বারা নিঃসৃত হ'য়ে বস্তিদেশে অবস্থান করে তাহার নাম মূত্র। মেদ-ধাতু থেকে একটি মল নিঃসৃত হয়ে সমগ্র শরীরের লোমকূপ দিয়া বহির্গত হয়, তাহার নাম স্বেদ বা ঘর্ম্ম। পুরীষ, মূত্র ও স্বেদ এই তিনটি মলপদার্থ শরীরের অপ্রাপ্ত পদার্থ হলেও যতক্ষণ শরীরে অবস্থান করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা শরীরের জন্য কিছু করে যায়। যেমন খাদ না হ'লে কোন গয়না হয় না, সেইরূপ এই তিনটি মল শরীরে কিছুক্ষণ না থাকলে শরীর থাকতে পারে না। শরীরের ময়লা নিকাশ ছাড়াও এদের পৃথক্ কার্য্য আছে। আহার্য্য দ্রব্যের প্রথম পাকান্তে যে পুরীষ

নির্গত হয় তাহাতে কথঞ্চিৎ সার পদার্থ থেকে যায়। কেন না, আমাদের পাচকাগ্নি সমস্ত দ্রব্যই সম্যক্ পরিপাক করতে পারে না। কোন কারণে শরীরের ধাতু ক্ষয় হলে এবং তজ্জন্ত সপ্ত ধাতুর পরম তেজ শক্তি, ওজ বা বল ক্ষয় হলে এই পুরীষ থেকে সার গ্রহণ করেই শরীরের বল রক্ষা হয়। শাস্ত্রে আছে "সর্ব্বধাতুক্ষয়ার্ত্তস্য বলং ভবতি বিড় বলম্' তাছাড়া বায়ু ও অগ্নিকে সাম্যাবস্থায় রাখাও পুরীষের একটা কাজ। শরীরের রসরক্তাদি নির্ম্মল করা এবং বস্তি পূরণ করা মূত্রের কাজ আর চর্ম্মের কোমলতা সম্পাদন, ও সংরক্ষণ হচ্ছে স্বেদের কাজ। এই তিনটি মলের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকলেও ইহাদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হলেই বোঝা যাবে, এদের পরিমাণ ঠিক আছে। যথাকালে নাতিদ্রব, নাতিঘন ও দুর্গন্ধহীন সুপরিপক্ক পুরীষ ত্যাগ, অনাবিল মূত্র ত্যাগ, এবং গন্ধহীন ঘর্ম্মত্যাগ হলেই বোঝা যাবে যে, মল সাম্য আছে।

এখন ক্রিয়ার সমতা কিরূপ দেখা যাক্। এতক্ষণ দৈহিক পদার্থের সমতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখন বাহিরে কাজ-কর্ম্মের দ্বারা শরীর কিরূপে সুস্থ হয় তা দেখব। ক্রিয়া তিন রকম। শারীরিক চেষ্টার নাম দৈহিক ক্রিয়া, মনের চেষ্টার নাম মানসিক ক্রিয়া, বাক্‌যন্ত্রের চেষ্টার নাম বাচনিক ক্রিয়া। অঙ্গসঞ্চালনাদি কার্য্য শারীরিক কার্য্য; অধ্যয়ন, ধ্যানাদি মানসিক কার্য্য; আর অভিনয়, বক্তৃতাদি করা হচ্ছে বাচনিক কার্য্য। শরীর সুস্থ রাখতে হ'লে এই তিনটি ক্রিয়াই অল্প-বিস্তর প্রত্যেকেরই করা উচিত। প্রত্যেকের শরীর আবার এক এক কর্ম্মে সহনশীল। কুলী-মজুররা দৈহিক কর্ম্মে অভ্যস্ত, সে জন্ত তাদের শরীর যে পরিমাণ দৈহিক কর্ম্ম করতে পারে আমরা তা পারি না। আমরা সেইরূপ মানসিক কর্ম্মে অভ্যস্ত, বক্তারা বাচনিক কার্য্যে অভ্যস্ত। আমরা যে পরিমাণ মানসিক কর্ম্ম করতে পারি এবং বক্তারা যে পরিমাণ বাচনিক কার্য্য করতে পারে কুলীরা তা পারে না; কাবেই যে পরিমাণ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পরিশ্রম করা যাহার অভ্যাস তিনি সেই পরিমাণ কর্ম্ম করলেই তাঁর ক্রিয়া সাম্য থাকবে।

শুধু দোষ, অগ্নি, মল, ধাতু ও ক্রিয়ার সমতা থাকলেই যে শরীর সুস্থ থাকবে এমন নয়। এগুলির সাম্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনেরও প্রসন্নতা থাকা চাই।

এখন আত্মা কি, আর তার প্রসন্নতাই বা কিরূপ দেখা যাক্। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বময় জীব-শরীরের যে প্রধান অচেতন উপাদান মূল প্রকৃতি তাহার অপর নাম আত্মা। আত্মা অচেতন এবং এক হলেও বিভিন্ন রকমের চৈতন্তময় পুরুষের সমবায়ে চেতনবৎ প্রতীয়মান হয় এবং বিভিন্ন রকমের আত্মা বলে মনে হয়। প্রত্যেকের শরীর পৃথক্ পৃথক্ পাঞ্চভৌতিক উপাদানবিশিষ্ট রক্ত ও মাংস দিয়ে তৈরী, এই বিভিন্ন উপাদানের রক্তমাংস সমবায়ে প্রত্যেকের একটি বিভিন্ন প্রকৃতি বা স্বভাব থাকে। তাই তার আত্মপ্রকৃতি। সেই হিসাবে চোরের আত্মা আর সাধুর আত্মা এক নয়। চোরের চুরি কার্য্য সুসম্পন্ন হ'লে যেরূপ আত্মতৃপ্তি আসে অন্ত কিছুতে তার সেরূপ আত্মতৃপ্তি হয় না। সেইরূপ সাধুর পরোপকার করতে পারলে এবং তত্ত্বজ্ঞানের মীমাংসায় যেরূপ আত্মতৃপ্তি আসে সকলের হয়ত ততখানি হয় না। যে কাজ ক'রে যার এক বিমল আনন্দের অনুভূতি আসে সে কাজ করলেই তার আত্মা প্রসন্ন হবে এবং তার শরীর সুস্থ হবে।

এবারে ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা সম্বন্ধে বলব। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। সমুদয়ে এই দশটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের অনুবর্ত্তী হ'য়ে মন না থাক্‌লে কোন কার্য্যই হ'তে পারে না, সে জন্ত মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলে। আমাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মূলাধার মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক যন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে মনই টেলিফোন অপারেটারের মত পরস্পরের সংযোগ স্থাপন করে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সুসম্পন্ন করছে। যখন দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য চলে তখন মন চক্ষুর সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ স্থাপিত করে, তখন আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না। শোনবার ইচ্ছা হ'লে আবার মন চক্ষুকে ছেড়ে কর্ণের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ করে; কোন কিছু দেখতে দেখতে মনে করুন, শোনবার কিছু ইচ্ছা হ'ল। তখন মনকে বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে চক্ষুর সংযোগ ছিন্ন করে তাড়াতাড়ি কর্ণের সহিত সংযোগ করতে হয়। ফলে মন অস্থির হয়ে উঠে। ওদিকে দেখবার ইচ্ছা আর অন্ত দিকে শোনবার ইচ্ছা সম্পন্ন করতে গিয়ে না হয় ভাল করে দেখা আর না হয় ভাল ক'রে শোনা, ফলে কোন ইন্দ্রিয়েরই পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়ায় শরীরে একটা অস্বস্তির ভাব আসে। কাজেই যখন দেখ্‌বেন তখন একাগ্রমনে ভাল করে দেখে নিবেন, তখন শোন্‌বার চেষ্টা না করলেই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা হল। এইরূপ সবই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেই খাটে। এবং এরূপ করলেই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা আসবে আর ইন্দ্রিয় সুপ্রসন্ন থাক্‌লেই শরীর সুস্থ থাক্‌বে।

সর্ব্বশেষে মনের প্রসন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা করেই প্রবন্ধ শেষ করব। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হওয়া ছাড়াও মনের আর একটি নিজস্ব কার্য্য আছে, সেটি হচ্ছে চিন্তা করা। যখন মন কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য না করে তখনই সে নিজস্ব কর্ত্তব্য করে। কোন কিছু করবার আগে আমরা একটু চিন্তা করি, তার পর কাজ করি। এই ক্রিয়ানুপূর্ব্বী পরিকল্পনা করাও মনের কাজ—আবার এই পরি-কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করাও মনের কাজ। পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য যদি তৎক্ষণাৎ সুসম্পন্ন না হয় তবে তাহা মনের স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। সুবিধা মত মন তদনুরূপ কার্য্য করতেও পারে আবার না-ও পারে। একে বলে মনের সংযম। মন সংযত থাকলে কোন কিছু করবার ইচ্ছা না থাক্‌লে তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় এবং তাতেই মন প্রফুল্ল থাকে। সৎ অসৎ কত রকমের চিন্তা আমাদের মনে প্রতিনিয়ত উদিত হচ্ছে। সৎচিন্তানুযায়ী কাজ করতে পারলে মনের প্রসন্নতা আসেই। কিন্তু অসৎচিন্তা অনুযায়ী কাজ না ক'রতে পারলে মনকে তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেই মন প্রসন্ন হয়।

—

ব্যাধির বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রাচীর

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নানা সমস্যার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন আজ দেশ। আজ দেশের দুঃখের নদীতে জোয়ারই প্রবল। অভাব-অনটন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, রোগ-শোক মানুষকে কবলিত করিয়াছে। মানুষ আজ তাহার মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে। স্বার্থ আজ তাহার মধ্যে দানবের রূপ

ধারণ করিতে উদ্যত। আজ তাহার মনের বেদীতে জ্ঞানের আলো দুর্দশার ঝোড়ো হাওয়ায় নিবিয়া যায়-যায় হইয়াছে। আজ দীনতা ও হীনতার আঁধারে দাঁড়াইয়া সে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছে।

"শরীরের নাম মহাশয়—যা সওয়াবে তাই সয়"—কথাটা ঠিক, কিন্তু সহনশক্তিরও একটা সীমা আছে। এখনকার দুর্দিনে সুখাদ্য সংগ্রহ করা একটা বড় সমস্যা। এদিকে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—পেটের কাছে অভিযোগও নাই, বিচারও নাই। কাজেই পেটের তুষ্টিসাধনে কুখাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া মানুষের দেহ ও মন ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহাতে হইতেছে কি? ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং রোগের জীবাণু দুর্বল শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ বিস্তার করিবার সুযোগ পাইতেছে। দুর্বল দেহের দুর্বল জীবনীশক্তি রোগজীবাণুকে ভাল করিয়া বাধা দিতে অক্ষম। কারণ, শরীরের ভিতরকার গ্রন্থিসমূহ (glands) যাহাদের রসে জীবাণু আক্রমণকারী শক্তি থাকে তাহারাই পুষ্টির অভাবে জীর্ণ ও অবসাদগ্রস্ত। তাই আজ সহর ও পল্লীতে মৃত্যুসংখ্যার ভয়াবহ বৃদ্ধি মানব সমাজে একটা বড় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

সংস্কার ও পথ

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, এমন একটা কিছু করা দরকার, যাহাতে রোগের প্রকোপ সহরে সহরে বা পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে। মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তব্যানুযায়ী ও সময়ানুযায়ী কার্য্য করিবেন আশা করা যায়। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণকেও এ বিষয়ে সতর্কতার সহিত মাথা ঘামাইতে হইবে। পল্লীর নালা-নর্দ্দমা, ডোবা-পুকুর, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাহাতে পরিষ্কার করা হয় সেই জন্য পল্লীর তরুণগণ সমিতি গঠন করিয়া একযোগে কার্য্য করিলে পল্লীর স্বাস্থ্যমঙ্গল হইবেই। ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইহাই হইতেছে প্রকৃষ্ট উপায়। এই সমিতির সভ্যগণকে পল্লীর রোগগ্রস্তদের শুশ্রূষার ও অভাব-মোচনের ভারও লইতে হইবে। ইহাতে পল্লীতে পল্লীতে মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে।

অনেক সময় দেখা যায়, ছোট ছোট পল্লী এমন অপ্রাহ্য ভাবে অবস্থান করে যে সেই পল্লীর 'নোংরা আবর্জ্জনা' সেই সব পল্লীর স্বাস্থ্যে ত আঘাত করেই এবং পার্শ্বস্থিত অন্যান্য পল্লীকেও ব্যাধির কবলে ফেলিতে উদ্যত হয়। এই সব পল্লীর লোকেদের জ্ঞান আছে, চিন্তা করিবার শক্তি আছে, কিন্তু তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি এতই উদাসীন যে, সামান্য পরিশ্রম ও সামান্য উত্তম খরচে তাঁহারা বড়ই কার্পণ্য দেখান। তাঁহারা বুঝেও বুঝেন না যে, তাঁহাদের—"ঘরের ঢেঁকিই কুমীর"এর মত তাঁহাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এই জন্য এই সব কার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য আমি সমিতি গঠনের উল্লেখ করিয়াছি।

কি খাইব

এইবার দেখা যাউক, কি খাইয়া এই সঙ্কট কালে আমরা বাঁচিতে পারিব। এখন পছন্দ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ বা ক্রয় করা একেবারেই অসম্ভব। বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন চাহিদানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য পাওয়াও একটা এক নম্বরের সমস্যা। কাজেই এই রকম খাদ্য-সঙ্কটের দিনে শাক-সব্‌জী, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা কলা, ডুমুর, উচ্ছে, ঝিঙে, ইচড়, পটল, ঢেঁড়স প্রভৃতি এই প্রকারের তরকারী যাহা সস্তায় পাওয়া যায় তাহাই বেশী পরিমাণে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা ভাল। এই সকলের সঙ্গে খাদ্যপ্রাণ ভিটামিন যে সকল জিনিষে বেশী আছে তাহাও নিত্য আহার করিতে হইবে। পালংশাক, পুঁইশাক, সিম, মটরশুঁটি, বরবটী, প্রভৃতি ও অন্যান্য সাময়িক সব্জী ভাল ভিটামিন সরবরাহকারী। বিশুদ্ধ বা অর্দ্ধ-বিশুদ্ধ ঘি, মাখন, ও দুগ্ধ শুধু দাম দিয়া কেন'—কালোবাজারের চড়া দাম দিয়াও এখন মেলা ভার। গৃহস্থঘরে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ অনুযায়ী নিত্য মাছ-মাংস আহার করাও এখন উপহাসের কথা। এ ক্ষেত্রে আমি বলি, 'ডাইল' বেশী ব্যবহার করা ভাল। মটর ও ছোলার ডালটার উপর আমার ঝোঁকটা কিছু বেশী। ছোলার ডালের বড়ার ডালনা, ঝোল প্রভৃতি মুখরোচক ও উপকারী। মাছের কালিয়ার পরিবর্ত্তে ছোলার ডালের 'ধোঁকার' কালিয়া বেশ উপাদেয় এবং উহা প্রোটিণে ভর্ত্তি।

ক্ষীর-ছানা ও দধি-সন্দেশ যখন পাওয়া বা খাওয়া সম্ভবপর নহে, তখন শরীরের মধ্যে উত্তাপ ও উত্তম যথা পরিমাণে সরবরাহের জন্য আমাদের দেশীয় পুরাতন নারিকেল নাড়ু ও তিলের নাড়ুর আশ্রয় গ্রহণ করাই মঙ্গলজনক। আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি—সকালে ও বৈকালে আদা, ছোলা, গুড়, ও চিড়া-মুড়কী, নারিকেল খাওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ উপকারী। পল্লীগ্রামের আমার অনেক স্বাস্থ্যসমিতিতে ছেলেমেয়েদের আমি উপরি উক্ত খাদ্যতালিকা দিয়াছি এবং ইহাতে তাহারা উপকারও লাভ করিয়াছে।

হজমের প্রশ্ন

এখন প্রশ্ন আসিতেছে—খাদ্য হজম করার সমস্যার। ভারী লৌহ পিটিয়া গঠন করিতে আরো বেশী ভারী হাতুড়ির প্রয়োজন হয়। আমরা যাহা খাই তাহা আমাদের পেটের মধ্যস্থিত পাকস্থলীতে যাইলে পাকস্থলী আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা যাঁতার মত কার্য্য করিয়া সেই ছোট-বড়, নরম-শক্ত খাদ্যদ্রব্যকে পিষিয়া ফেলে। পরে তাহা স্বাস্থ্যের নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে হজম হইয়া যায়। এখনকার দিনের দুরন্ত দুষ্পাচ্য আহার্য্য হজম করিতে পাকস্থলীকেও দুরন্ত যাঁতার মত কড়া না হইলে, অজীর্ণ রোগ ব্যাপক ভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। এই দুঃখ-দৈন্যের দিনেও আমি ছোট-বড় সকলকে নিত্য কিছু কিছু অঙ্গসঞ্চালন করিতে উপদেশ দিই। কষ্টের মধ্য দিয়া মাথার ও শরীরের চালনার অভাব নাই জানি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মন ও দেহের সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে এবং কষ্টের উৎপীড়নকে বাড়িয়া ফেলিবার শক্তি-বজায় রাখিতে শরীরের বিশেষ সাধনা একান্ত প্রয়োজন।

ফাঁকা জায়গায় বা ব্যায়ামের আখড়ায় খানিকক্ষণ প্রত্যহ হাসিয়া খেলিয়া ব্যায়াম করিলে এবং বিশেষ করিয়া পাকস্থলী ও উহার চারি দিকের পেশীর আবরণগুলিকে সঞ্চালিত করিয়া দৃঢ় ও সবল রাখিলে উহা ব্যাধির বিরুদ্ধে ব্যর্থ প্রাচীরের ন্যায় কার্য্য করিবে।

বোকাচিও—ডেকামেরণ

শ্রীসত্যভূষণ সেন

বোকাচিও (Bocacio) মধ্যযুগের ইতালীয় সাহিত্যের ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে এক জন—অপর দুই জন ছিলেন দাঁন্তে (Dante) এবং পেত্রার্ক (Petrach)। ডেকামেরণ (Decameron) বোকাচিওর প্রসিদ্ধ গল্প-গ্রন্থ—ইহাতে এক শত গল্পের সমষ্টি আছে। এই গল্পগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্ত লেখক একটি পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার মূলে এবং গল্পগুলির পটভূমিকায় আছে এমন একটি ঘটনা, যাহাকে ইউরোপের ইতিহাসে একটা ঘোরতর দুর্দ্দৈব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই ঘটনা ১৩৪৮ সনের মহামারী—যাহা ব্ল্যাক ডেথ (Black death) নামে পরিচিত।

এই মহামারীর সূত্রপাত হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য দেশের কোনও প্রদেশে। সেখান হইতে দুর্ব্বার নিয়তির ন্তায় পথে পথে ধ্বংস সাধন করিতে করিতে ধীরে ধীরে ইউরোপখণ্ডে আসিয়া এই মহামারী প্রবেশ করে। ফ্লোরেন্স (Florence) তখন ইতালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিকল্পিত শত সতর্কতা, সহরে শোভাযাত্রা এবং অন্তান্ত নানা ভাবে ভগবানের নিকট জনগণের ব্যাকুল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া ঐ বৎসর বসন্ত ঋতুর প্রথম ভাগে মহামারী ফ্লোরেন্স নগরীতে আসিয়া দেখা দিল।

প্রাচ্য দেশে এই রোগের লক্ষণ ছিল নাসিকা হইতে রক্তক্ষরণ এবং ফলে অবশুম্ভাবী মৃত্যু। এখানে অন্ত রকম। নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলের দেহে উরুসন্ধি-স্থলে (Groin) অথবা কক্ষতলে আপেল ফলের ন্তায় অথবা ডিমের ন্তায় বড় এক একটি অর্ব্বুদ (tumour) প্রথমে দেখা দিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িত। তার পরে লক্ষণের পরিবর্ত্তন ঘটিত, শরীরে কাল কাল দাগ দেখা যাইত, সাধারণতঃ বাহুতে উরুতে অথবা অন্তান্ত স্থানে ছোট-বড় নানা আকারের এবং সংখ্যায় অল্প বা বহু। ব্যাধির লক্ষণ যে ভাবেই দেখা দিত, পরিণামে ছিল অবশুম্ভাবী মৃত্যু। চিকিৎসকের এবং ঔষধের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রথম লক্ষণ প্রকাশের তিন দিনের মধ্যেই সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিত।

এই ব্যাধি ছিল ভয়ানক ভাবে সংক্রামক ; শুধু রোগীর সংস্পর্শই নয়, রোগীর কাপড় চোপড় অথবা জিনিষ-পত্র পর্য্যন্ত রোগ-সংক্রমণের কারণ হইয়া উঠিত। ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত এই রোগের সংস্পর্শে আসিলে রক্ষা পাইত না।

এমনও দেখা গিয়াছে, দুইটি শূকর এই রোগে মৃত এক ব্যক্তির পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় মুখে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। স্বভাবতঃই সকলের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল এবং সমস্ত সহরে আতঙ্কের ছায়া পড়িল। সকলেই রোগের সংস্পর্শ ত্যাগ করিবার জন্ত অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কেহ কেহ দলবদ্ধ হইয়া এমন সকল বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, যেখানে রোগের সংস্পর্শ ছিল না, সেখানে থাকিয়া তাহারা পান-ভোজনে মিতাহারী হইয়া পরিমিত সঙ্গীত আলাপ-আলোচনায় রোগ ও মৃত্যুর চিন্তা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিত। কেহ কেহ বা যথেচ্ছ পান-ভোজনে এবং নানা প্রকার আনন্দ-উল্লাসের মত্ততায় আত্মসমর্পণ করাই রোগ-সংক্রমণের ভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার উপায় বলিয়া মনে করিত। আর এক দল সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে সকল সময়ে সুগন্ধি পুষ্প বা মূল বা মসলা সঙ্গে রাখিয়া রোগের সংক্রমণ প্রতিষেধক হিসাবে ক্রমাগত তাহাই আঘ্রাণ করিত। আর এক দল ছিল যাহারা রোগের সংস্পর্শ হইতে পলায়নই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করিয়া দলে দলে তাহাদের ঘর-বাড়ী আসবাব-পত্র আত্মীয়-স্বজন সব ছাড়িয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

ইহাদের মধ্যে কোনও দলই রোগ-আক্রমণ হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিল না অথবা কোনও দলই একেবারে নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া গেল না। সকল দলের মধ্যেই অনেক লোক রোগে আক্রান্ত হইল, তখন তাহারা যেমন রোগের সংস্পর্শ পরিহার করিয়া চলিতেছিল তেমনই প্রায় সকলেই তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া গেল। রোগ-সংক্রমণের ভয় এমনই নিদারুণ হইয়া উঠিল যে, ভাই ভাইএর সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিল, ভগ্নী ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করিল না ; কোনও কোনও ক্ষেত্রে পত্নী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া গেল ; এমন কি, স্থলবিশেষে পিতামাতা পর্য্যন্ত সন্তানগণকে নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নরনারী-নির্ব্বিশেষে অসংখ্য লোক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের সেবা বা তত্ত্বাবধানের জন্ত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। সেবা-শুশ্রূষার জন্ত ভৃত্য বা পরিচারক দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতে লাগিল। স্থলবিশেষে ভদ্রঘরের রমণী পর্য্যন্ত দায়ে পড়িয়া সমস্ত সম্ভ্রম, শালীনতা জলাঞ্জলি দিয়া নির্ব্বিচারে যে কোনও পুরুষের যথেচ্ছ সেবা গ্রহণ করিতে লাগিল। বহু লোক শুধু সেবা-যত্নের অভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল—সেই জন্তই মৃত্যু-সংখ্যা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অবস্থা-বিপাকে পড়িয়া নারীর সম্ভ্রম শালীনতার আদর্শও শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। ধর্ম্ম-যাজকগণ এবং নগর-শাসনকর্ত্তাদের অপসরণে, মৃত্যুতে বা রোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়াতে নগরের ধর্ম্ম-শাসন, সমাজ-শাসন এবং রাজ-শাসন সকলই শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল।

তখন প্রথা ছিল, কাহারও মৃত্যু হইলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব মধ্যে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সম্মিলিত ভাবে ক্রন্দন-বিলাপে যোগদান করিত। মৃত ব্যক্তির পদ-মর্য্যাদার অনুপাতে নগরবাসিগণ এবং বহুসংখ্যক ধর্ম্মযাজক বাড়ীর বাহিরে অপেক্ষা করিত শবদেহের ভার বহন করিবার জন্ত। মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-মন্দিরসংলগ্ন সমাধিস্থানে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা স্কন্ধে করিয়া শবদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইত। সহর হইতে লোক অপসরণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার ফলে সম্মিলিত বিলাপের জন্ত লোকের অভাব ঘটিতে লাগিল, শবদেহ বহন করিবার জন্ত বেতনভোগী স্বল্পসংখ্যক লোক মাত্র পাওয়া যাইতে লাগিল। কয়েক জন মাত্র পুরোহিত দুই একটি দীপ সহযোগে শবানুগমন করিতে লাগিল এবং সুবিধামত যে কোনও সমাধি-প্রাঙ্গণে শবদেহ নীত হইতে লাগিল। দুরবস্থা যখন চরমে গিয়া পৌঁছিল তখন দরিদ্র ব্যক্তিরা এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যেও অনেকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের অভাবে নিজ নিজ গৃহমধ্যে সেবা-বঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যু লাভ করিতে লাগিল। অনেকের মৃতদেহ দুর্গন্ধযুক্ত [illegible] অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে লাগিল। [illegible]

দূষিত গন্ধে তাহাদের অস্তিত্বের খপর বাহিরে পৌছাইতে লাগিল। প্রতিদিন এবং প্রতি রাত্রিতে বহু লোক পথে পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিতে লাগিল। শববাহকেরা শবদেহ বহন করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িল; বহু স্থলে একই শবাধারে একাধিক শব বাহিত হইতে লাগিল। বহু ক্ষেত্রে পুরোহিতেরা একটি শবদেহের শেষকৃত্যের জন্ত আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বহু শবদেহ শেষ-কৃত্যের জন্ত তাঁহাদের অপেক্ষা করিতেছে; ইহাদের জন্ত শোক করিবার বা একবিন্দু অশ্রুমোচন করিবারও কেহ নাই। সমাধি-প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রত্যেক শবদেহের জন্ত স্বতন্ত্র সমাধি-গহ্বরের পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড একটি সমাধি-গহ্বর খনন করিয়া একসঙ্গে তাহাতে বহু শবদেহ একত্র সমাহিত হইতে লাগিল। ফলে সাধারণ অবস্থায় পণ্ডিত লোকেরাও বিধির বিধানের প্রতি একান্ত নির্ভরতার যে আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারেন না, এই অসাধারণ পরিস্থিতিতে সাধারণ লোকের নিকটও সেই আদর্শ অত্যন্ত সহজে আসিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল।

শুধু নগরই যে এমন দুর্দশাগ্রস্ত হইল এমন নয়। বাহিরে পর্ব্বত-কান্তারে দূরদূরান্তের গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত মহামারী ছড়াইয়া পড়িল। চাষীর ঘরে, দরিদ্রের কুটীরে পর্য্যন্ত দিনে-রাত্রিতে লোক মরিতে লাগিল; তাহারা চিকিৎসার ব্যবস্থা অথবা কোনও প্রকার সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা কিছুই ভোগ করিতে পাইল না। তাহাদের ঘরবাড়ী বা সম্পত্তির জন্ত মায়া মাত্র রহিল না, তাহাদের গৃহ-পালিত গরু, ছাগল, ভেড়া, গাধা, শূকর, মুরগী এমন কি কুকুর পর্য্যন্ত গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া মাঠে মাঠে শস্তক্ষেত্রে যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা, কত দাসদাসী-পরিপূর্ণ প্রাচীন বনিয়াদী-ঘরের গৃহস্থালী জনশূন্ত হইয়া গেল, কত ইতিহাস-বিখ্যাত প্রাচীন বংশ নির্ব্বংশ হইয়া পড়িল। কত বীর-পুরুষ, কত লাবণ্যময়ী রমণী, কত যৌবনমদ-গর্ব্বিত যুবক—যাহারা ছিল স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের প্রতীক, তাহারা নিজ নিজ আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের সহিত দিবসের আহার সম্পন্ন করিয়া হয়ত রাত্রির আহারের সময় পরলোকে পূর্ব্বপুরুষদের সহিত গিয়া মিলিত হইত। অনুমিত হয় যে, মার্চ্চ মাস হইতে জুলাই মাসের মধ্যে শুধু ফ্লোরেন্স নগরীর সীমার মধ্যেই লক্ষাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল—নগর-সীমার ভিতরে যে এত লোক ছিল, তাহাও পূর্ব্বে কেহ অনুমান করিতে পারে নাই।

ফ্লোরেন্স নগরী যখন এইরূপে প্রায় জনশূন্ত হইয়া পড়িতেছে, এমন সময় এক মঙ্গলবার সকালবেলা সান্তা মেরিয়া নভেল (Santa Maria Novell) মন্দিরে ধর্ম্মোপাসনা শেষ হইল। বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত ঘরের সাতটি তরুণী ঘটনাক্রমে একত্র আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পরস্পরে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা বয়সে যেমন তরুণ তেমনই যৌবনোচিত উৎসাহে এবং ভদ্রবংশোচিত আচার-ব্যবহারে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। ধর্ম্মালোচনার পরে ইঁহারা নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, তিনি বলিতে লাগিলেন,—এখন আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় এসেছে এবং প্রয়োজন হয়েছে। সকলেই তো দেখতে পাচ্ছি চারি দিকে কেবলই মৃত্যুর লীলা, ঘরে-ঘরে পথে-ঘাটে মৃত্যুর দৃশ্য, আলাপ-আলোচনায় মৃত্যুরই প্রসঙ্গ, সমস্ত নগরে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়েছে,—মৃত্যুর বিভীষিকা! এর মধ্যে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি কিসের ভরসায়? আমরা এমনই কি অমর হয়ে এসেছি যে, মৃত্যুর এমন দুর্ব্বার আকর্ষণ এড়িয়েও বেঁচে থাকব। তা হয় না। আত্মরক্ষার জন্ত আমাদেরই চেষ্টা করতে হবে—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। আত্মরক্ষার জন্ত স্থলবিশেষে নরহত্যাও অপরাধ বলে গণ্য হয় না; কাজেই আমরাও আত্মরক্ষার জন্ত নিঃসঙ্কোচে চেষ্টা করতে পারি। নগর ছেড়ে দূরে চলে যাওয়াই হবে সৎপরামর্শ। এতে আত্মীয়-পরিজনদের পরিত্যাগ করে যাওয়ার অপরাধও আমাদের হবে না। আমরাই বরং সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে এখানে পড়ে আছি। তোমাদের সকলের কথা জানি না, আমার নিজের কথা বলতে পারি, বাড়ীর এত দাস-দাসীর মধ্যে আমার নিজস্ব দাসী বলতে এখন একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আর নগরে থাকবই বা কি সুখে? বন্দিশালার বন্দীরা সব বেরিয়ে এসেছে, সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্ত লোকেরা নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করছে, সকল প্রকার অনাচার অত্যাচার শাসন অভাবে প্রশ্রয় পাচ্ছে। ফলে নগরে না আছে শান্তি না আছে শালীনতা। আমাদের সকলেরই তো গ্রামে গ্রামে ভূসম্পত্তি আছে, আসবাব-পরিপূর্ণ বাড়ী-ঘর আছে। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তো চল, আমরা একত্র সম্মিলিত ভাবে সেই সব গ্রামে গিয়ে বাস করি। সে সব স্থানে উদার আকাশের নীচে পর্ব্বত-প্রান্তরের উন্মুক্ত দৃশ্য, শস্তক্ষেত্রের ও বনস্থলীর সজীব সরলতা, পাখীর কলকূজন, মানুষের জীবনযাত্রার যা কিছু মাধুর্য্য এনে দিতে পারে সবই আছে, সেখানে প্রাণধারণের জন্ত পাব নির্ম্মল বায়ু, আহার্য্য-পানীয়ের জন্তও উপকরণের অভাব হবে না সেখানে। অবশ্য গ্রামে গ্রামেও মহামারী এবং মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছে বটে, তথাপি সেখানে জনবসতিও বিরল, জনসংখ্যাও অনেক কম, কাজেই মৃত্যুর পরিচয়ও সেখানে অনেকটা সীমাবদ্ধ।

এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন; এমন কি, প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত তাঁহারা ত্বরান্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেই এক জন একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, বলিলেন—আমরা সকলেই নারী, তোমরা সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই জান যে, আমরা সাধারণতঃ কিরূপ ভাব-প্রবণ, মনে সর্ব্বদা সশঙ্কিত ভাব, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। কাজেই শৃঙ্খলবদ্ধ কাজ আমাদের দ্বারা বেশী দিন চলবে এমন ভরসা করা সঙ্গত হবে না। তৎক্ষণাৎ আর এক জন বলিয়া উঠিলেন ঠিক বলেছ, পুরুষেরা স্বভাবতঃই আমাদের পরিচালক, কোনও পুরুষের পরিচালনা না পেলে আমাদের এই পরিকল্পনা বেশী অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু তেমন পুরুষ কোথায় পাওয়া যাবে? আমাদের পরিচিত যাঁরা ছিলেন, তারা তো সকলেই নগর ছেড়ে চলে গেছেন—অজ্ঞাতকুলশীল যার তার উপর তো নির্ভর করা যায় না।

এমন সময় তিনটি যুবা পুরুষ আসিয়া দেখা দিলেন—যুবক বটে কিন্তু সকলেরই বয়স পঁচিশের ঊর্দ্ধে। ইঁহারাও সকলেই সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান এবং রমণীদের পূর্ব্ব-পরিচিত। ইঁহাদের নিকট রমণীদের পরিকল্পনা এবং প্রস্তাব যখন উপস্থাপিত করা হইল, তখন তাঁহারা রমণীজন-সুলভ এই মনোহর পরিকল্পনায় বেশ আনন্দ অনুভব

করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা বলিলেন যে, প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহাদের ইচ্ছা তখন যুবকরাও সম্মত হইলেন।

পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতেও বিলম্ব হইল না। প্রত্যেক পুরুষের জন্য একটি পরিচারক এবং প্রত্যেক রমণীর জন্য এক জন দাসী—এইরূপে দাস-দাসী পরিবৃত হইয়া সাতটি মহিলা তিন জন পুরুষের সাহায্যে অভিযানে অগ্রসর হইলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট উদ্যান-বাটিকায় আসিয়া দেখিলেন, দাসদাসীরা অগ্রে আসিয়া সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছে, এমন কি শয্যা পর্য্যন্ত প্রস্তুত। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সুন্দর বাড়ী, গৃহসজ্জা আসবাব পত্র কিছুরই অপ্রতুলতা ছিল না, আহার্য্য-পানীয় বিলাসিতারও অভাব নাই।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠা মহিলার প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইল যে,, সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে চলিবার জন্য এক জন করিয়া দলপতি নির্দ্দিষ্ট হইবেন এবং তাঁহারই শাসন এবং ব্যবস্থা অনুসারে ও সকলের সহযোগিতায় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। যাহাতে কোনও এক জনের উপর অথবা দায়িত্ব-ভার না পড়ে এবং যাহাতে সকলেই পর্য্যায়ক্রমে দলপতির গৌরব বহনের সুযোগ লাভ করিতে পারেন, সে জন্য ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে, পুরুষ-নারী-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে এক দিনের জন্য দলপতি হইয়া সকল দায়িত্ব বহন করিবেন এবং সকল কর্ম্মব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন। ইহাদের এইরূপ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে সকলের সম্মতিক্রমে ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, প্রতিদিন বিকালবেলা বিশ্রামের সময় প্রত্যেকে একটি করিয়া গল্প বলিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিবেন। এইরূপে প্রতিদিন দশটি করিয়া দশ দিনে এক শত গল্প বিবৃত হইয়াছিল। এই এক শতটি গল্পসমষ্টি লইয়াই "ডেকামেরণ" গ্রন্থ।

বোকাচিও তাহার ডেকামেরণ গ্রন্থের গল্পগুলি কোন্ মূল উৎস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য অনেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে জার্ম্মাণীর ল্যাণ্ডো এবং ইতালীর বর্ত্তলীর মত লোক ভারতীয়, আরবীয়, বৈজান্তীয়, ফরাসী, হিব্রু এবং স্প্যানিস গল্প-সংগ্রহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ-সকল বিভিন্ন দেশের প্রচলিত গল্পের সহিত ডেকামেরণের গল্পের কোনও সাদৃশ্য আছে কি না! এই সব অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, বোকাচিওর খুব কম গল্পই একেবারে মৌলিক রচনা অর্থাৎ নিজের পরিকল্পিত। সেক্সপীয়রের মত বোকাচিও নিজের শিল্প উপযোগী উপকরণ যেখানেই পাইয়াছেন সেখান হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে যে, বোকাচিওর হাতে বহু গল্পসমষ্টি মজুত ছিল এবং তিনি সেই সকল গ্রন্থ হইতে এই সকল গল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত তথ্য এই যে, মধ্যযুগে গল্প বলা এবং গল্প শোনা সর্ব্বজন-প্রচলিত একটা আনন্দ-উপকরণ বলিয়া গণ্য হইত। খুব অল্পসংখ্যক ভাল গল্পই মৌলিকতার দাবী করিতে পারে। হিন্দুস্থান হইতে, বোগদাদ হইতে, গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস হইতে, টিউটনিক এবং কেলটিক জাতিদের উপকথা হইতে এবং বিভিন্ন প্রকার উপকরণ হইতে গল্প সংগৃহীত হইত। ভারতবর্ষের গঙ্গাতীর হইতে ফরাসী দেশের সীন নদীর তীর পর্য্যন্ত সকলের মুখে মুখে এই সকল গল্প প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল—এগুলি ছিল সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি।

পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধানের ফলে আমরা বরং এই পরিচয়ই পাই যে, বোকাচিওর পূর্ব্বে কত বিভিন্ন প্রকার এবং কত বহুসংখ্যক গল্প প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহাতে ডেকামেরণের শিল্পকৃতিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না; বরং বোকাচিও যে কত বিভিন্ন দেশের গল্পের সহিত পরিচিত ছিলেন ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সকল গল্পে মানবজীবনের আদিরস প্রসঙ্গে জীবনের লঘু দিক ধরিয়াই আলোচনা হইয়াছে। গ্রন্থের পটভূমিকায় আছে এক অতি ভয়াবহ মহামারির প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব আলোড়ন। সম্ভ্রান্ত ঘরের কয়েক জন যুবক-যুবতী লোকালয় পরিহার করিয়া নির্জ্জন বাসে বসিয়া এই সকল গল্পের জাল বুনিয়া চলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন দেশে মহামারীর এমন বিধ্বংসলীলা চলিতেছে তখন প্রকৃতিস্থ শিক্ষিত জনগণের পক্ষে এরূপ আমোদ-বিলাসের চপলতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব ও সঙ্গত হইতে পারে কি না? কিন্তু বাস্তব জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে, দেশে যখন মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় অথবা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হয়, এমন কি, দেশে যখন সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক জগতে একটি অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়, তখনও দেশে জাতীয় জীবনে খেলাধূলার বিরাম হয় না; নাটক অভিনয়ও চলিতে থাকে, সিনেমা-গৃহেও লোকসমাগমে কিছুমাত্রও দ্বিধা দেখা যায় না। এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতীগণ ভালরূপেই জানিতেন যে মহামারী এবং মৃত্যুর লীলা তাঁহাদের গৃহদ্বার-পথেও বিলসিত হইয়া চলিয়াছে; যখন তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন কেহই তাঁহাদের অপেক্ষায় ছিলেন না, তখনই তাঁহারা নগর-জীবন পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য একটু নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছিলেন মাত্র। সেই সময়ে অবসর-বিনোদনের জন্য এই সকল গল্পের সৃষ্টি। আরও প্রশ্ন হইতে পারে যে, সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতীদের পরস্পরের সাহচর্য্যে গল্পের মধ্য দিয়াও আদিরসের এরূপ নগ্ন আলোচনা সুরুচি-সঙ্গত কি না? কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সেই যুগে সেই দেশে এই সকল আলাপ-আলোচনা ভদ্র-সমাজের নিকট কিছুমাত্র রুচি-বিগর্হিত বলিয়া মনে হইত না। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বোকাচিও বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত কিম্বদন্তী, লোকগাথা প্রভৃতি হইতে গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকিলে, তাঁহার এই গল্প-সংগ্রহে তাঁহার দেশের সমসাময়িক জনগণের জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে যুগ বা যে দেশ হইতেই উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকুক এই ডেকামেরণের গ্রন্থই বোকাচিওর কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া পরিচিত শুধু বোকাচিওর নিজ সাহিত্য-জীবনে নয়, সেই যুগে তাহার দেশেও ইহা একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। বোকাচিওর অন্যান্য কাব্য ও গদ্য-সাহিত্য রচনার পরে তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-জীবনের সকল যত্ন-চেষ্টার পরে শিল্পপ্রতিভার পরিণত ফলস্বরূপ সৃষ্টি এই ডেকামেরণ। তেমনই ইতালীয় গদ্য-সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল চেষ্টার পরিণত ফলস্বরূপ সুপরিপুষ্ট গদ্য-সাহিত্যের প্রকাশ। *

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, গৌহাটী শাখার অধিবেশনে পঠিত।

বিজ্ঞান জগৎ

সাগরের শক্তি

পি, এস

সাগরের শক্তি ত্রিবিধ— (১) তরঙ্গের শক্তি (২) জোয়ার-ভাটার শক্তি ও (৩) উপরিস্থ ও নিম্নস্থ জলের. তাপের তারতম্য হইতে উৎপ্যদিত শক্তি। তরঙ্গের শক্তি এরূপ পরিবর্ত্তনশীল যে, অনেক ইঞ্জিনিয়ার ইহা কাজে লাগানো অসম্ভব বলিয়া মনে করেন; কিন্তু থিওরী হিসাবে ইহাতে কোন বাধা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কালিফর্নিয়ার এক ইঞ্জিনিয়ার ইহা কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার যন্ত্রটি মোটের উপর একটি সিলেণ্ডার ও পিষ্টন ব্যতীত আর কিছুই নহে; পিষ্টনটি র্যাচেট পল (Ratchet-pawl) যন্ত্রের সাহায্যে চাকা ঘুরায়। সমুদ্রতীরে নির্ম্মিত কংক্রীটের বাঁধের মধ্যে সিলেণ্ডারটি এমন ভাবে বসানো হয় যাহাতে জলের লেভেল (level) অর্থাৎ উচ্চতা সর্ব্বদাই ইহার নিকটে থাকে। ইহা ৪৫° কোণ (45° angle) করিয়া বসানো হয় এবং ইহার খোলা মুখ সাগরের দিকে থাকে। এই দিক দিয়া ঢেউয়ের জল প্রবল বেগে প্রবেশ করিয়া পিষ্টনকে ঠেলিয়া উপরের দিকে তুলিয়া দেয় ও তাহাতে চাকা ঘুরিয়া যায়। জল নামিবার মুখে ঘুর্ণিত চাকা ও র্যাচেটের সাহায্যে পিষ্টন যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়ায় এবং ঢেউ আসিয়া আবার চাকাটিকে ঘুরাইতে সাহায্য করে। চাকাখানি বেশ ভারী করিয়া তৈয়ারী করা হয়—যাহাতে এটি আপনার ওজনে ও বেগে খানিকক্ষণ ঘুরিতে পারে। জোয়ার-ভাটার জন্য জল উঠা-নামা করে বলিয়া যাহাতে ঢেউ লাগিবার কোন অসুবিধা না হয়, সেই জন্য সিলেণ্ডারটিকে জলের সঙ্গে ওঠা-নামা করাইবার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় গীয়ারের ব্যবস্থা আছে। অধিকন্তু যন্ত্রটি এমন ভাবে তৈয়ারী—যাহাতে পিষ্টনের ঘাতের দৈর্ঘ্য ঢেউয়ের উচ্চতার উপর নির্ভর না করে। এই জন্য জলের রন্ধ্র পথের এমন বন্দোবস্ত আছে, যাহাতে পিষ্টনের গতায়াত সহজেই পরিবর্ত্তিত করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ২ ফুট উচ্চ ঢেউয়ে ৬ ফুট দীর্ঘ ঘাতও দেওয়া যায়। একটি ক্লাচের সাহায্যে পিষ্টনের পরিবর্ত্তনশীল ঘাতের সমতা রক্ষিত হয়। হিসাবে পাওয়া যায় যে, ৪ ফুট ব্যাসের এইরূপ একটি সিলেণ্ডারের সাহায্যে ২৫০ অশ্বশক্তি উৎপাদন সম্ভব।

জোয়ারের সাহায্যে শক্তি উৎপাদন আরও সহজ এবং সস্তা বলিয়া অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ার এই পথই লইয়াছেন। "জোয়ার কল" (Tide mill) বহু স্থানে শত বর্ষেরও উপর ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জল বাড়িবার সময় ইহার সাহায্যে চাকা ঘুরাইয়া বা জল বাড়িবার পর তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া একটু একটু করিয়া আস্তে আস্তে ছাড়িয়া এই সব কল চালানো হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক স্থানেই জোয়ার-কলগুলি অতি সুলভ পন্থায় কাজ করে। যেসব স্থানে জোয়ারে জল বেশী উচু হয়, সেখানে সমুদ্রতীরে খানিকটা যায়গা বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়। এই বাঁধের দরজা প্রথম জোয়ারে খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন জল জোরে ঢুকিতে থাকে ও তাহার সাহায্যে চাকা ঘোরে। জোয়ার ভরা হইলে দরজা বন্ধ করা হয়, তার পর ভাটার সময় আবার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইলে জল জোরে বাহির হইবার সময় জলের বেগে চাকা ঘোরানো হয়। এই কল অবশ্য সব সময় চলিতে পারে না; কারণ, বাহিরের জলের লেভেল যখন ভিতরের জলের লেভেলের সমানের মত হয়, তখন জল ঢুকিবার বা বাহির হইবার সময় জলের স্রোতে চাকা ঘুরাইবার মত জোর থাকিতে পারে না। অতএব এই সব কল অনেকক্ষণ বেকার বসিয়া থাকে। এই জন্য ইহাতে বেশী লাভ হয় না। পয়সা দিয়া কল তৈয়ারী করিয়া বসাইয়া রাখিলে লাভ কি? আমাদের বাংলায় প্রবাদ আছে "আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ জন্মকাল"। এই দুঃখ দূর করিবার জন্য এখন যাহাতে সব সময় জলের স্রোত পাওয়া যায় ও তাহার সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈয়ার করিয়া ধরিয়া রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করা হয়। বৃটেনে সেভার্ণ নদীর এবং আমেরিকার ফাণ্ডি উপসাগরে এই বন্দোবস্ত আছে। এই দুই স্থানে সময় সময় জোয়ারের জল ৪০ ফুট পর্য্যন্ত ওঠে। ফাণ্ডি উপসাগর ক্যানাডার অন্তর্গত নোভা-স্কোটিয়া এবং নিউ ব্রান্সউইকের মধ্যবর্ত্তী। এই উপসাগরের মুখে এক সারি ছোট ছোট দ্বীপ থাকায় বাঁধের ভিৎ দিবার বেশ সুবিধা আছে। এখানে বাঁধ ঘিরিয়া যে প্রকাণ্ড জলাশয়ের সৃষ্টি করার কথা হইয়াছে, তাহাতে ভাটার সময় প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০,০০০ ঘন-ফুট জল বাহিরে আসিয়া চাকা ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ তৈয়ার করিবে। জলের বেগ কমিয়া গেলে যাহাতে কাজ বন্ধ না হয় তাহার জন্য ১৩,০০০ একর আয়তনের আর একটি জলাশয় সমুদ্র-পৃষ্ঠের ১৫০ ফুট উচ্চে তৈয়ারী হইবে। শক্তিশালী মোটর দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে পম্প চালাইয়া ইহা ভরিতে হইবে। উপসাগরের ও সমুদ্রের জলের লেভেল সমান হইলে এই পম্প-করা জল ছাড়িয়া ডায়নামো ঘোরানো চলিবে। সেভার্ণ বাঁধ পরিকল্পনায় সমুদ্র-পৃষ্ঠের ৫০০ ফুট উচ্চে এক জলাশয় সৃষ্টি পরিকল্পিত হইয়াছে। এই বাঁধে ৭ লক্ষ অশ্বশক্তি উৎপাদিত হইতে পারিবে ও ইহাতে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন কয়লা বাঁচিয়া যাইবে। ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্ণষ্ট গিবসন এই পরিকল্পনার স্রষ্টা। ইহাতে প্রায় ৫৫ কোটী টাকা লাগিবে। টে-নদীর মুখেও এইরূপ একটি বাঁধ দিবার পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১'৭০০ অংশ উৎপাদিত হইবে। এইরূপ বাঁধের

আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক সুবিধা পাওয়া যাইবে। ইহার উপর দিয়া রাস্তা চালাইয়া দিলে যাতায়াত পথের দূরত্ব অনেক হ্রাস হইবে। ইহার ফলে নদীতে পলিপড়ার দরুণ নৌচালনের যে অসুবিধা হইতে পারে, মডেল লইয়া বহুবর্ষব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, তাহার নিবারকণ দুঃসাধ্য নয়। আর এক রকম জোয়ার-কলে স্রোতে মোটর চলার সময় তাপ উৎপাদন এবং জল গরম করিয়া তাহার উপরের চাপ বেশি করিয়া তাপ ধরিয়া রাখা হয় (stored under pressure)। স্রোত কমিয়া মোটর বন্ধ হইলে এই তাপ কাজে লাগানো হয়। ইহার অসুবিধা এই যে, তাপ রোধের সর্বোত্তম বন্দোবস্তেও ধরিয়া রাখার সময় যথেষ্ট তাপ নষ্ট হয়।

তৃতীয় উপায়ে অর্থাৎ তাপের তারতম্যের সাহায্যে শক্তি উৎপাদন নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে বিশেষ সুবিধাজনক হয় না বটে, তবে গ্রীষ্মমণ্ডলে এই প্রভেদ যে, যেখানে ৮০০ ফুট গভীরতায় ২০° পর্যন্ত হয়, সে সমস্ত স্থানে এই উপায় কাজের হয়। কারণ, তাপের এই প্রভেদ লেভেলের ৩০ ফুট প্রভেদের সমান কাজ করে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক ক্লড (Claude) নীচের শীতল জল পাম্প করিয়া উপরের এক পাত্রে তুলিয়া লন ও তাহার নিকটস্থ আর এক পাত্রে উপরের উষ্ণ জল তুলেন। এই পাত্র দু'টি আরও উচ্চে অবস্থিত আর দু'টি ঢাকা পাত্রের সহিত সংযুক্ত থাকে। জল উঠিবার পাইপে একটি পাম্প থাকে। এই পাম্প চালাইয়া জল বাহির করিয়া দিলে গরম জলের গাত্রের উপরিস্থ চাপ কমিয়া যাইবার ফলে জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয় ও তাহার সাহায্যে টার্বিণ চালানো হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল যে, টার্বিণে ৬০ কিলোওয়াট পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাম্প চালাইতে দরকার হইয়াছিল। বাকী যাহা ছিল তাহাতে মনে হয় যে, উষ্ণমণ্ডলে এই পন্থায় বেশ কাজ চলিতে পারে। এই সমস্ত উপায়ে জ্বালানী (fuel) খরচ নাই। খরচ—কল তৈয়ারের ও তাহাকে চালু রাখার। এইরূপ কল চালাইতে গেলে তাপের প্রভেদ অন্ততঃ ৭° কাঃ হওয়া আবশ্যক।

বাঁধা জলের শক্তি

জল উপর হইতে নীচে নামিবার সময় তাহার দ্বারা কাজ করানো প্রায় সব দেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। এই জন্য নদী-প্রবাহে বাঁধ দিয়া বড় বড় জলাশয় তৈয়ার করিয়া কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া ছাড়া-জল নামিবার শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সুসভ্য দেশের সর্বত্রই যথেষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহাতে আরও এক সুবিধা এই যে—এই জলপ্রবাহের সাহায্যে সেচ-কার্য্যেরও সুবিধা হইয়া কৃষিকার্য্যের সাহায্য করে। আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মিশর, জার্মানী ও ভারতে ইহার যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে। ভারতে সিন্ধুনদের শুক্কুর বাঁধ বা লয়েড বাঁধ দুই কোটি বিঘা মরুভূমি সেচের সাহায্যে শস্য শ্যামলা করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঁধটি ১ মাইল দীর্ঘ। হিসাব করিয়া জল বাহিরের জন্য ইহাতে ৬৬টী দ্বার আছে। এই বাঁধ দিবার ফলে বছরে ১ মাস অল্প জল এবং তিন মাস বন্যার বদলে এখন সারা বছর সমান ভাবে জল থাকিয়া ৬০০০ মাইল ও ৩০ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত বড় খাল এবং ৫০,০০০ মাইল ছোট ছোট সেচ-খালে জল দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই নদী-গর্ভে পলিমাটী এত পুরু যে সমস্ত কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া নীচের পাথরের উপর ভিত্তি স্থাপন অসম্ভব বলিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কংক্রীটের চাপ তৈয়ার করাই একত্রে বাঁধিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে ; এই জন্য বাঁধটি ভিত্তির উপর ভাসমান বলা হই থাকে। সেকেণ্ডে দেড় নিযুত বর্গফুট জলপ্রবাহের সহি কারবারের জন্য এই বাঁধ তৈয়ার হইয়াছে। কিন্তু এখানে বন্যা জল এমন অতর্কিত ভাবে তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়ে বলিয়া দ্বারও অতি তাড়াতাড়ি বন্ধের ও খুলিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক দ্বারের ওজন ৫০ টন তথাপি ৬৬টি দ্বার মাত্র দেড় ঘণ্টা খোলা যায়। এই বাঁধের খাল খননও এক বিরাট ব্যাপার একসঙ্গে ৮ ঘন-গজ মাটি তুলিয়া লইতে পারে এই প্রকার খনন-যন্ত্র লাগাইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল। এই 'খন (excavators) দুইটি প্রতি মিনিটে ১৪ টন মাটি কাটিয়া খালে পাড়ে তুলিয়া দিত। লোক লাগাইয়া কাজ করিতে হইলে খালও কাটিতে লক্ষাধিক লোক আবশ্যক হইত।

আমেরিকার গ্রাণ্ড কৌল বাঁধ পৃথিবীর সব চেয়ে বড়। সেচকার্য্যে ইহা পুরাপুরি কাজে আসিতে আরও ২০ বৎসর লাগিবে। বাঁধটি ৪৩০০ ফুট দীর্ঘ ৫৫০ ফুট উচ্চ এবং তলদেশে ৫০০ ফুট মোটা। এই বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে ১৫১ মাইল লম্বা এক হ্রদ সৃষ্টি হইবে। ইহার উপর সেচের জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ২০ মাইল দীর্ঘ আর একটি হ্রদ তৈয়ার হইবে। বরফের যুগে প্রকৃতি দেবীর খেলায় বন্ধ হইয়া শুষ্ক কলোরাডো (Colorado) নদী প্রাচীন খাতে ইহা তৈয়ারী হইবে। এই বাঁধে যে কংক্রীট লাগিবে তাহার আয়তনের পরিমাণ মিশরের বড় পিরামিডের ৪ গুণ। ৬ হাজার লোক ইহাতে বছরের পর বছর কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহাতে সেচকার্য্যে ৩০০০০ লোকের অন্নসংস্থান হইবে। ইহাতে আন্দাজ ৩ কোটি পাউণ্ডের কলকব্জা লাগিবে এবং ২৭ লক্ষ অশ্বশক্তি উৎপাদিত হইবে।

ইংলণ্ডেও শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত জল বাঁধিয়া রাখার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু সেথায় জল-সেচ আবশ্যক হয় না। গ্যালওয়ে শক্তি-কেন্দ্রের (Galloway Power Works) ২৫ মাইল দীর্ঘ জলাশয় এখানের কৃত্রিম হ্রদ সমূহের অন্যতম। এখান হইতে ৪ মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গ কাটিয়া গ্লেনলী ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পুরা দমে কাজের সময় এখানে ঘণ্টায় ১১ কোটি ইউনিট উৎপাদিত হয়।

এই সমস্ত বিরাট বাঁধ তৈয়ারীর ফলে মাতা বসুমতী বাঁকিয়া চুরিয়া যাইবার বিলক্ষণ ভয় আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই বিষয়টি সঠিক পর্য্যবেক্ষণের জন্য তাঁহারা কতকগুলি চিহ্নও করিয়া রাখিয়াছেন।

জলের অন্তর্নিহিত শক্তি (potential power) কার্য্যকরী শক্তিতে পরিণত করিতে যে টার্বিণ ব্যবহৃত হয় তাহা ষ্টীম টার্বিণেরই মত দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারে জল সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়া বেগে বাহির হইয়া টার্বিণের চাকার পাতায় আসিয়া পড়িয়া চাকা ঘুরায় ; অন্য প্রকারে জল পর্য্যায়ক্রমে একটির পর একটি সচল ও স্থির পাতার পর আসিয়া লাগে।

জলের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সাফল্য বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখিবার সাফল্যের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমানে ইহাতে শক্তির অনেক অপচয় হয়। ইহাতে উৎপাদনের ব্যয় অতি অল্প বলিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ পরিচালনে ও (transmission) ও এখন অনেক কিছু অনুসন্ধানের বিষয় আছে।

এ বিষয়ে আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলায় দামোদর নদের জল বাঁধ বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টির ও সেচের বন্দোবস্তের পরিকল্পনা হইতেছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ব্যয়ের বরাদ্দ হইল ৫৫ কোটি টাকা। সারা বছরে সেচ হইবে ৭৬০,০০০ একর অর্থাৎ প্রায় ২২ লক্ষ বিঘা জমিতে। জল ধরা থাকিবে মোট ৪৭ লক্ষ একর-ফুট।' উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ হইবে ৬ লক্ষ কিলোওয়াট। বাংলা, বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়া এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিবেন। যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য এই কার্য্যে খুব তাড়াতাড়ি হাত না লাগাইলে মহা মূর্খের কার্য্য হইবে স্বীকার করিয়া ভারত সরকার প্রাথমিক অনুসন্ধানের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মার্কিণ দেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ার আমদানীর জন্য অন্ততঃ শীতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। বাঁধের স্থান-নির্ব্বাচন, সেগুলির পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত, জল ও জলের শক্তির যাহাতে সর্ব্বাধিক সদ্ব্যবহার হয় তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রভৃতির জন্য না কি অনেক সময় লাগিবে।

বলা বাহুল্য, দামোদরের বন্যায় মধ্যে মধ্যে যে ভীষণ লোকক্ষয় ও সম্পত্তি নাশ হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার স্থায়ী প্রতিকার হইয়া যাইবে। বাংলা, বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সেচ ও নৌ-বিভাগগুলিকে এ সম্বন্ধে একযোগে কাজ করাইতে এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও না কি নিযুক্ত হইয়াছেন।

"সবার উপর মানুষ সত্য"

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের রচনায় চণ্ডীদাসের এই মহাবাণীটি প্রায়ই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা যে অর্থে ইহা ব্যবহার করেন, সে সাধারণ অর্থ রসিক চণ্ডীদাসের অভিপ্রেত নহে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।

সাহিত্যিকগণ উল্লিখিত অংশের যে অর্থ ব্যক্ত করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন জীবজন্তু ও তরুলতাদির মধ্যে মানুষ বা মনুষ্যজন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, মানুষ বুদ্ধিমান্ জীব, মানুষের মধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তির এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু চণ্ডীদাস এই সাধারণ অর্থে এই পদটি রচনা করেন নাই। তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় এই যে,—হে দেহধারী সামান্য মানুষ ভাই! এই জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই অসত্য, একমাত্র মানুষই অর্থাৎ পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই সত্য।' এই পরম সত্য সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের উপরে অন্য কাহারও স্থান নাই; অন্য কথায়, তিনিই সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

নরোত্তমও বলিয়াছেন—

একটি মানুষ সেই সদা রসে বিলসই
বেদ বিধি না জানে মহিমা।
আপনার সম করে রূপেতে জগৎ হরে
আনন্দেতে নাহিক উপমা।
ঈশ্বর আদি যত তার রসে উন্মত্ত
আনন্দ চিন্ময় নাম ধরে।
নরোত্তম দাসে কয় জানিলে তাহারে পাই
কেমনে জানয়ে জীব ছার।

যিনি সমস্ত জগতে রসের বিলাস করেন, বেদও যাঁহার মহিমা জানে না, যাঁহার রূপে জগৎ বিমোহিত, এবং যিনি পূর্ণ আনন্দময়, তিনিই একমাত্র মানুষ।...ছার জীব অর্থাৎ সাধারণ দেহধারী মানুষ তাঁহাকে কেমনে জানিবে?

চণ্ডীদাসের একটি পদে তিন প্রকার মানুষের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। যথা—

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ মানুষ
মানুষ বাছিয়া লহ।
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
সংস্কার মানুষ দেহ।
সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই
সামান্য মানুষ নাম।
জীবন মরণে করে গতায়াত
ক্ষীরোদ সাগরে ধাম।

সংস্কার প্রভাবে জন্মমৃত্যু সংসারচক্রে ভ্রমণশীল দেহধারী মানুষ চণ্ডীদাসের মতে সামান্য মানুষ। এবং গোলোক ভিতরে নিত্যস্থানে যে মানুষের বসতি, তিনি অযোনি মানুষ। আর গোলোক উপরে দিব্যবৃন্দাবনে যে সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত লীলা-বিলাস করেন, তিনিই চণ্ডীদাসের—'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।'

আবার এই সামান্য মানুষই যখন প্রকৃত রসিক হন, অতীন্দ্রিয় রাধাকৃষ্ণ-লীলাতত্ত্ব যখন তাঁহার অধিগত হয়, তখন তিনি 'জীয়ন্তে মরা' সদৃশ হন অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ রাধাকৃষ্ণলীলারসে সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। চণ্ডীদাস এই রসিক মহাজনকেও মানুষ নামে অভিহিত করিতেছেন—

'মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা
সেই সে মানুষ সার।'

অতি-মানসিক প্রেমতত্ত্ব বহির্জগতের সাধারণ প্রেম নহে, প্রকৃত রসিক মরমী মানুষই সেই প্রেমধনের সন্ধান জানেন। যথা—

মানুষের প্রেম নাহি জীবলোকে
মানুষে সে প্রেম জানে।

কৃষ্ণদাস আবার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—এই দুই মানুষের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

অপ্রাকৃত মানুষ রস অপ্রাকৃত ধাম
তার নামকে বলে বৃন্দাবন।
তার রূপ রস গন্ধ আলিঙ্গন তার সঙ্গ
অপ্রাকৃত এই গুণগণ।
এই পঞ্চগুণ দড় পরম কারণ বড়
সহজ মানুষ কারণপ্রধান।

নিত্যবৃন্দাবনে সদানন্দময় অপ্রাকৃত মানুষ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তিনিই চণ্ডীদাসের সহজ মানুষ।

এই সহজ মানুষের অদ্ভুত চরিত সামান্ত জীব অর্থাৎ সাধারণ মানুষ কিরূপে জানিবে? যথা—

সেই ত মানুষের অদ্ভুত চরিত।
অদ্ভুত শৃঙ্গার তার অদ্ভুত চরিত।
মানুষ সেই জগতের সার।
লোচন কহে মহাবিষ্ণু না জানে
কেমনে জানিবে জীব ছার।

সামান্ত মানুষ যখন প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পায়, প্রকৃত রসিক হয়, তখনই সে এই অতি-মানসিক মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

এই জন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে সাধারণ ব্যক্তিকে মানুষ না বলিয়া জীব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। তদ্রূপ অনুরূপ ভাবে সাধারণ ব্যক্তি পশু সংজ্ঞায় অভিহিত দৃষ্ট হয়। নরহরি বলিয়াছেন—

কহে নরহরি মানুষ মাধুরী
বলিলে কহিলে নয়।
প্রেমের পীরিতি যাহার অন্তরে
সেই সে তাহারি হয়।

যিনি সচ্চিদানন্দ, রসময়, সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমতত্ত্ব স্বীয় জীবনে সাধনা-বলে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই মানুষ। কারণ, পীরিতি-রসসাগরে সিনান করিয়া তিনি রসময় হইয়া গিয়াছেন, রসময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্ যেরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান, রসময় শ্রীকৃষ্ণলীলা-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনিও রসময় হইয়া গিয়াছেন। এই জন্যই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

'মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা
সেই সে মানুষ সার।'
মানুষ-লক্ষণ মহাভাবগণ
মানুষ ভাবের পার।

'জীয়ন্তে মরা' অর্থাৎ সতত সমাধিস্থ যোগী ব্যক্তিই বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রকৃত রসিক নামে অভিহিত এবং ইনিই বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য। কোটি কোটি মানব-মানবীর মধ্যে এরূপ ব্যক্তির সন্ধান কচিৎ মিলে। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

'রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গুটিক হয়।'

* * *

'মানুষ নাম বিরল ধাম
বিরল তাহার রীতি।
চণ্ডীদাস কহে সকলি বিরল
কে জানে তাহার রীতি।'

লোচনদাস বলিয়াছেন—

জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারে বলি।
প্রেম পীরিতি রসে মানুষ করে কেলি।

ভগবৎ-প্রেমের সন্ধান—আস্বাদ যিনি পাইয়াছেন, তিনিই মানুষ, অন্য আর সব জীব।

সুতরাং 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই'—এই পদে চণ্ডীদাস আমাদের ন্যায় সামান্ত মানুষ অর্থাৎ জীবকে 'মানুষ' নামে অভিহিত করেন নাই।

তিরোধানের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য

কল্যাণী দেবী

এখনো মেটে না দ্বন্দ্ব, চিত্ত ভরি এখনও জ্বালা।
এখনো তাহার কণ্ঠে হয়নি কো দেওয়া
দিবা-রাত্রে গাঁথা মোর জীবনের মালা।
নীলাম্বু খুঁড়িছে মাথা আছাড়ি বিছাড়ি,
দূরের যূথিকাপুঞ্জে ফেটে পড়ে ব্যাকুলতা তারি।
ডেকেছে জোয়ার আজ, পৌর্ণমাসী আলোর জোয়ার,
আকাশ-সাগরে মুছে মুছে সব হল নীলাকার।

নীলের তরঙ্গ পরে দুলিতে দুলিতে
অবনী ভাসায়ে দিয়ে অঙ্গ-লাবণিতে
এ কী মোহন রূপে ডাকে ওই শ্রীকৃষ্ণ আমার।
নীলাম্বুতে লক্ষ তারা জ্বলে ওঠে তারে দেখে নিতে।

আমারে ধরিতে হবে আমার এ শেষ অর্ঘ্য-ডালা,
দিবা-রাত্রে গাঁথা এই জীবনের মালা।

—বাংলার বাইচ—

শ্রীশান্তি পাল

[কাল—অপরাহ্ণ। স্থান—উত্তরপাড়া লাইব্রেরী-ঘাট। উৎসুক দর্শকদল ঘাটের চতুর্দ্দিকে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বাইচ-প্রতিযোগিতা দেখিতেছে। গঙ্গাবক্ষে বালি, উত্তরপাড়া বরাহনগর, আড়িয়াদহ, কোন্নগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি পল্লীর বাইচ-সঙ্ঘের ছেলেরা নানা রঙের 'জারসী' পরিয়া স্ব স্ব পানসীতে বসিয়া আছে। তাহাদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল অস্তগামী সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভাগীরথীর অপর পারে বেণে'টালা ও চাতরার বাইচ সুরু হইতেই দর্শকবৃন্দ সোৎসাহে যুগপৎ চীৎকার করিয়া উঠিল।]

ওই ছেড়েছে বা'চের দড়ি
গোলুই ছাড়ে হাত,
হাতের কচা ঘুরোয় দাঁড়ি
ছ'খান দাঁড়ের সাথ।
তরতরিয়ে সাম্‌নে আসে,
জমায় পাড়ি রুদ্ধশ্বাসে,
গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে প'ল
সম্মুখে নিয়ে ঘাত,
ছ'খান দাঁড়ের সাথ।
ছাড়ল গড়, সব রে সব,
কিস্তী ভড়্‌চরায় ধর।
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
গোলুই-মুড়ি সামনে থো।
আজকে গাঙে তুফান ভারি
দুকূল ভেসে যায়,
জোয়ান যারা আয় রে ছুটে
বস্‌ রে এসে না'য়।
কেউ ধরে নে ক্ষেপণী ক'রে,
কেউ বা হালে থাক্‌ রে ব'সে,
চাস্‌ নে কারোর মুখের পানে
অমন ক'রে ঠায়,
ব'স রে এসে না'য়।
ফুল্‌ছে জল, নাম্‌ছে ঢল
চল্‌ রে চল্‌, ছলাৎ ছল্‌।
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
গোলুই-মুড়ি সামনে থো।
সোয়ার বলে—তোল না মাথা,
তোল রে মাজা, গাও,
গোলোর পরে কনুই ঠুকে
জোরসে টেনে যাও।
হাল্কা ক'রে নৌকা দে রে
ভাসিয়ে তুলে, ঝাপটা মেরে,
ভাটির টানে ভাটিয়ে দিয়ে
সামলে নে না নাও;
জোরসে টেনে যাও।
চলছে বা'চ, নদীর মাঝ
সাজ রে সাজ, সবাই আজ,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
গোলুই-মুড়ি সামনে থো।

ওতরপাড়া, ওতরপাড়া—
হাঁকছে কারা, ডাকছে কারা?
ওই ঘাটে চ, ওই ঘাটে চ,
পয়লা বা'চে লাগিয়ে দে থ!

এবার তোল, যা-তুই মেরে
ভাসিয়ে দে না' দুয়ের দোঁড়ে,
তোর দেখে যে টানবে সবাই
আলসেমি ছাড়, তুলিস নে হাই।

সামলে চল না'-এর মাঝি
চরের কোলে বেজায় ঝাঁঝি,
কেৎরে পাতা ভাসিয়ে রেখে
ঘুরিয়ে দে না ডাইনে বেঁকে।

কিস্তি-মাঝি পথটি জুড়ে
দাঁড়িয়ে কেন? যাও না ঘুরে।
ওই দিকে যা' চরায় বেঁধে
ভাত-ভাতে-ভাত খা' না রেঁধে।

ভাওলে-মাঝি সওদা নিয়ে
কোন্‌ দেশে যাও পাল খাটিয়ে?
একটুখানি দাঁড়াও না ভাই
আমরা আগে বাই চ'লে যাই।

ওগুলো কি সালতি ডোঙা?
ঠিক যেন তাল পাতার ঠোঙা!
বা'চ বাঁচিয়ে যা'রে তোরা
বাঁ দিক্‌ ঘেঁসে—একটু ঘোরা।

লঙর ফেলে বজরা ভাসে,
ছিপখানা কি দাঁড়িয়ে পাশে?
নেংটা ছেলে ঝাঁপিয়ে জলে
ধরতে তারে সাঁতরে চলে।

খেয়াল রেখে দুয়ের দাঁড়ে
ফেল্‌ রে সবাই দাঁড়,
যেমন ক'রে ফেলছে দাঁড়ি
নকল ক'রে তা'র।

সাম্‌নে ঝোঁকা শরীরখানি
ঝটে পাছা পিছিয়ে টানি',
হাত দুটি থো পেটের কাছে
পাটায় শুয়ে ছাড়;
নকল ক'রে তা'র।
মন ও প্রাণ লাগিয়ে টান,
বৈঠা হান, ভাঙ তুফান,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
গোলুই-মুড়ি সামনে থো।
গড়েন দিয়ে যা' রে তোরা
সামনে আছে বাঁক,
পাশ কাটিয়ে আওড় জলে
যাচ্ছে যারা যাক্‌।
তুই চ'লে চ সরল পথে
উঠবি গিয়ে বিজয় রথে,
ঘূর্ণী জলে পড়লে খাবি
বিষম ঘুরণ পাক;
যাচ্ছে যারা যাক্‌।
দু'-তিন চার চুবিয়ে মার
তোল রে দাঁড়, কি তোলপাড়।
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
গোলুই-মুড়ি সাম্‌নে থো।

ওই দ্যাখ ভাই চরের ভিতে
ইঁসকি নাচে জলপিপিতে,
ধ্যান ধ'রেছে চিংড়ী মাছে
সর্দ্দি ঝরে কেবল হাঁচে!

পানকৌটি সাঁতার-জলে
মাছের লোভে ডুব দে' চলে,—
চিতল চেলা ভড়কে গিয়ে
উঠছে ভেসে কিলবিলিয়ে।

মৎস্য-রাঙা মাস্তলে সে
হঠাৎ উড়ে বস্‌ল এসে,
বুঁদ হ'য়ে সে চার দিকে চায়
কোন্‌ ঘাটে তার শিকার পালায়।

কাদাখোঁচায় চঞ্চুপুটে
পাঁক ঘুলিয়ে খাচ্ছে খুঁটে,
বাঁচ দেখে সে তিড়িং ক'রে
লাফিয়ে বসে—লাফিয়ে ওড়ে।

গাঙ-শালিকে বাঁধছে বাসা
চরের গায়ে দেখতে খাসা,
বাচ্ছাগুলো গর্ত্তে ঢুকে
মুখ বাড়িয়ে বেরোয় ঝুঁকে।

খাগের বনে বালহাঁসেতে
ডিম ছাড়ে সে—শেওলা পেতে,
ক্যাপলা ফেলে জেলের ছেলে
মাছ পেলে না—ডিম সে পেলে।

হাঁচি এবং টিকটিকিতে
মানলে বাধ, কোনটিতে,
তুই কেন রে' যাস্ রে থেমে
গড়েন দিয়ে যা' না নেমে।

বা রে জোয়ান—বা রে জোয়ান
এই তো আমি চাই,
এমনি ক'রে টানতে হবে
পিছিয়ে যারা ভাই।
গায়ের জোর থাকলে পরে
সবাই নতি স্বীকার করে,
দুর্ব্বলেরই ভাগ্যে জেনো
কেবল লাঞ্ছনাই ;
পিছিয়ে যারা ভাই।
সজ্য বাঁধ, সাধ রে সাধ
মনের সাধ. কিসের বাদ,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
গোলুই-মুড়ি সামনে থো।

ওই যে কালো চিমনীগুলো
আকাশ পানে বাড়ায় মুলো,
ওরই পাশে বটের ছায়ে
তুলতে হবে তোর এ না'এ।

তুই বেয়ে চ বুক দে টেনে
রক্ষে-কালীর মানত মেনে,
জয় মা' ব'লে,—খয় না খেয়া
ঈশান কোণে ডাকছে দেয়া।

অকালে কের মেঘ কেন রে
স্মৃষ্টি-ছাড়া সব যেন রে,
মেঘ নয় সে কলের ধোঁয়া
মেঘের বুকে আসার ছোঁয়া।

আর কী ভাই এবার তোল,
খুব হুঁসিয়ার নড়ছে পোলো,
সবার রশি আল্‌গা না কি ?
কি যায় আসে, যায় যা ফাঁকি।

হাত্তীর বল ধর রে গায়ে
জোর টেনে যা' উল্টো বায়ে,
পাথর-কোঁদা শরীর দেখে
ভড়কে লোকে বলবে—এ কে!

আবার তোল ও ভাই দাঁড়ি
জোয়ার আসে লাগাও পাড়ি,—
কুমীর-কামট সবাই ভাগে
ছু'-ছু'খানা দাঁড়ের আগে!

ঘাটের গোড়ে সব্‌জে ঘাসে
দাঁড়িয়ে কারা ? কি উল্লাসে!
চল্ রে বেয়ে—চল্ রে বেয়ে—
বেণেটোলার বাঁচের নেয়ে।

আর কী ভাই, যা-কত মার
এবার ঘরে তোল,
ঘাটের বাটে খেলার মাঠে
উঠছে কলরোল।
গোড় বেড়েছে টিপ্‌নি রাখি'
যা' হেলে যা. দিস্ নে ফাঁকি,
বাহির জলে পড়লে শেষে
হেরেই হবি ঢোল ;
উঠ্‌ছে কলরোল।
ভাসল নাও, সামলে নাও
ঝঞ্ঝা যাও, কাটিয়ে যাও,
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
গোলুই-মুড়ি সামনে থো।
মহুয় খর চ'লেছে বাঁচ
জল-তরঙ্গে এ কি যে নাচ!
তো তো দাঁড়ি চারি ও পাঁচ
জোর জোর যাও টানিয়া,

ক্ষত-বিক্ষত হ'ল যে নাও
পূবে মেঘ হেয় ছুটিছে বাও,
ঝড়ের ঝাপটে উধাও ধাও,
বৈঠারে জোর হানিয়া।

কল্লারি কল উঠিছে জল
বাঁধ বুকে তোরা বাঁধ রে বল,
মনের ধুকরে নামিছে ঢল্
গলি' গলি যায় গলিয়া।

এ-পারও-পার ঢেউ ভেঙে তার
আছাড়ি পিছাড়ি পড়ে বার বার,
দুস্তর গাঙ হ'তে হবে পার
ছলাৎ-ছলাৎ-ছলিয়া।
জোয়ার এলো—জোয়ার এলো
জলে জলময়,
ছপাৎ ক'রে দাঁড়ের ঘায়ে
কর না তারে লয়।
আঘাত 'পরে আঘাত দিয়ে
ঢেউ কেটে যা' জল ঘুলিয়ে,
শঙ্ক রেখো না'এর সরা
হবেই হবে জয় ;
কর না তারে লয়।
জলের শ্বাস বিকট হাস
কিসের ত্রাস, দর্প নাশ।
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
গোলুই-মুড়ি সামনে থো।
ফুলিয়া ফুঁসিয়া উঠিছে জল
নেমেছে ঢল
নাও বিকল
চল রে চল
ছলাৎ-ছলাৎ—ছলাৎ-ছল।
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
জোয়ার জলে পড়লি গো!

উত্তাল তল তল গঙ্গা টলমল

টান্ রে টান ভাই লাগাও জোর,
চঞ্চল চল চল ছলাৎ ছল ছল
কলিছে কলকল জলের তোড়।
ভরপুর হ'ল গাঙ ফুলিছে জো'র জল
আজকে আর কার রক্ষা নাই,—
বৈঠায় টান দাও ত্বরায় বেয়ে যাও
বানচাল নাও লয় ধরায় ঠাঁই।

নৌকার তক্তায় ঝলকে উঠে জল
অঙ্গে ভাঙে তার তুফান ঢেউ,
এই সব দুর্য্যোগ কাটায়ে চ'লে যায়
এমন হাল-দাঁড় নেই কি কেউ!
নিশ্চয় আছে ভাই, আছে সে নির্ভীক
বাংলার গর্ভে গোপন বাস
ঘূর্ণীর হিন্দোল দেয় না তারে দোল
সঙ্কটে পায় না কখনো ত্রাস।

ঢেউ-এর সংখ্যার কাজ কি গুণে তায়
হয়ো না নৈরাশ, এগিয়ে চল,
ঝঞ্ঝার বাত্যায় হয়ো না ভয়াতুর
বাড়াও বক্ষের জলজল।

ছয় দাঁড় এক হাল করুক নির্জ্জিত
এবং নির্জ্জীব উর্ম্মিচয়,
তুস্তর-তর গাঙ নিমেষে হবে পার
হোক না ভাগ্যের বিপর্য্যয়।

শাস্ত্রের নির্দ্দেশ জান তো আছে ভাই
দংশে দংশাও—নির্ম্মম হও,
পন্থের কণ্টক করিতে নির্ম্মূল
হিংসে হিংসাও—উৎপথ লও।

বাংলার সন্তান হও রে আগুয়ান
ভাঙ রে ভাঙ ঢেউ কর্, না পথ
ভাবনায় চিন্তায় সময় বয়ে যায়
দাঁড়িয়ে নাও তোর স্থাণুবৎ!

ও ভাই হালী—ও ভাই হালী—
হস্নি ভাবে ভোর,
বাটা ঝিকি ছেড়ে দে' ধর
চাপা ঝিকিই তোর।

মাথার 'পরে ঘূরি ধে তুলে
চাপান দিয়ে বস্ না ঝুলে,
গেরেশ যেন যায় না ছিঁড়ে
একটু বাঁয়ে ঘোর,
চাপা ঝিকেয় তোর।

বা'চ বাঁচিয়ে—বা'চ বাঁচিয়ে
ঘাট যে এলো খুব কাছিয়ে,
লাগাও পাড়ি—লাগাও পাড়ি—
বেণেটোলার বাছাই দাঁড়ি।
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো হো
জোয়ার জল কাটলি গো।

দর্শকদল ছাখ উৎসব করছে
মাঠ-ঘাট প্রাঙ্গণ অঙ্গন-ভরছে,
পিল পিল করে লোক ঘাটকে আসছে
পৈঠায় পৈঠায় ছেলেমেয়ে নাচছে।

এই পাড় ওই পাড়—তুই পাড় ভর্ত্তি
লোকজন গিস্‌গিস্ করছে সত্যি,
উৎসুক চোখ সব চায় একদৃষ্টে
বেণেটোলা-বাইচের গৌরব নিষ্ঠে।

হর্ষের নির্ঝর ঝরঝর বইছে,
ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বউ কথা কইছে,
ছন্দের দোল দেয় ঘন ঘন বক্ষে :
উচ্ছ্বাস ওৎলায় তরুণীর চক্ষে।

ঘটথান্ ভেসে যায় নেই কোন গ্রাহ্য
আনমন্ চেয়ে রয় নেই জ্ঞান বাহ্য,
কঙ্কণ কিঙ্কিণ ঝঙ্কার তুলছে
মন্থর বায়ে নীল অঞ্চল দুলছে।

খেয়ার ঢেউ যায় আলতায় ধুইয়ে
টুপ টুপ ডুব দেয় শির তার হুইয়ে,
গৈরিক জল হায়, হয় আজ লাল্‌চে
অন্তরে প্রেম কোন্ মন্তর ঢালছে।

বৈঠায় টান দাও শান দাও অস্ত্রে
ভর বা'চ নৌকা চোখ চোখ শস্ত্রে,
তুর্ব্বল ভড়কায় উন্মদ নর্ম্মে
স্থান তার নাই নাই এই সব কর্ম্মে।

ছয়খান দাঁড় তোল্, ঝপ ঝপ ফেল্ রে,
ভরপুর শেওলায়!—চক্ষু মেল্ রে,
জঙ্গল জঞ্জাল সাফ কর্, আজকে
ঘর ঘর থান দাও বাংলার বা'চকে।

ইজ্জৎ রাখবার এই এক পন্থা
শক্তির চর্চ্চায় কেউ নাই মন্তা।
আপনার ইচ্ছায় আপনিই লড়বি
বৈরীর উচ্ছেদ বুক দে' করবি।

তুঃখের ঝঞ্ঝাট আমরাই বইব
মুক্তির সন্ধান আমরাই কইব,
গায় যার জোর নাই থাক সে পিছিয়ে
মর্ম্মের তক্তায় ছয় দাঁড় বিছিয়ে।

মৌনীর কাজ নয় এই বা'চ বাইতে
কলজের জোর চাই কব্জীর চাইতে।
তর্জ্জন গর্জ্জন সব কুচ ঠাণ্ডা
ঠিক ঠিক থায়গায় দাও তু'-ডাণ্ডা।

অন্দর-বন্দর তোলপাড় কর রে
নির্ব্বাণ হোক তাপ সম্বিত ভর রে।
টক্কর দিয়ে চল্ নির্ভর চিত্তে
নির্ভূল টান দাও ভুল খবৃত্তে।

হিঙ্গুল হস্তেল্ যৌতুক দাও না
সময়ে নাও আজ যা' তোর পাওনা।
শত্রুর মুখ হোক শুকিয়ে আমসী
বেয়ে চল্ বেণেটোলা তর তর পানসী।

পূর্ব্বের মেঘ ছাখ পশ্চিম ছুঁ'টল
পশ্চিম মেঘ তার উর্দ্ধেও উঠল,
পঞ্চাশ উনবায় চৌদিক ছায় রে
ঝাপটার ঝাপসায় কে বাইচ বায় রে!

বজ্রের কড় কড় ঝন্ ঝন্ শব্দ,
বিদ্যুৎ চমকায় ঘর বার স্তব্ধ,
নির্ভীক চিত্তের নির্ভয় যাত্রা
ধৈরজ নেই আর নেই তার মাত্রা।

গঙ্গার ঘোল-জল ঠগবগ ফুটছে
সামলাও নাওটায় চৌদিক ছুটছে,
রঙ্গিল নৌকায় চৌতুর নাইয়া
কৌশল দর্শাও হস্তের ভাইয়া।

শক্তির সম্মান সব ঠাঁয় দেখবে
পৌর্ব্বাপর্য্য সব এক ঠেক্‌বে।
ঘ্যান-ঘ্যান প্যান প্যান পৌরুষ নয় তা,
লাঞ্ছিত বাঞ্ছিত সব্বাই কয় তা।

মার দিয়া ভাই—মার দিয়া—
মার দিয়া ভাই—মার দিয়া—
এক নৌকো তফাৎ ক'রে
বেণিয়াটোলা আঃ গিয়া,
চাতরা দেখো গড় না ঢুকে
গড়েন দিয়ে ভাগ গিয়া
মার দিয়া ভাই—মার দিয়া।

* * *

ওতরপাড়া—ওতরপাড়া—
হাঁকছে কারা—ডাকছে কারা?
এই ঘাটে থো—এই ঘাটে থো
হেই দাঁড়ি গো—হেই হালী গো!

খেয়ার ঘাটে পান্‌সী ভিড়ে
যাত্রীগুলো নাম্‌ছে তীরে
মাঝি সে তার হাল চেপেছে'
গোলুই রোখে কোমর বেঁধে।

ডাক্‌ছে শোন পারের মাঝি
কে আছে গাঙ তরতে আজি?
উঠবে কে গো আমার না'-এ
কোন্ জোয়ানী রক্ত পায়ে!

যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তা ও শান্তি পরিকল্পনা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
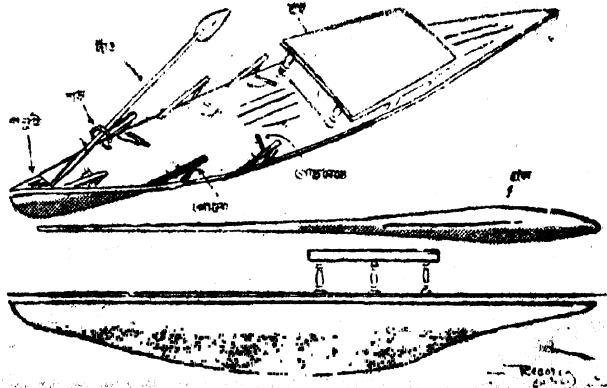
পূর্ণ সুদীর্ঘ আট বৎসর প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে যে ঘোর ধন-জন-ক্ষয় ও সম্পদ্-সম্পত্তি-ধ্বংসকারী মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহার নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। এই নিবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী সাময়িক বিরতি মাত্র; কিংবা ইহার পশ্চাতে জেতা ও বিজিত শক্তি সমূহের আন্তরিক আপ্রাণ অকপট প্রচেষ্টার ফলে চিরস্থায়ী না হউক, অন্ততঃ দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যতের তিমির-গর্ভে নিহিত। যুদ্ধমাত্রেই জেতা ও বিজিত উভয়ের প্রভূত ক্ষয় ও ক্ষতির পরিমাণ পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, যুদ্ধের অবসানে কোন পক্ষেরই প্রকৃত জয়লাভ ঘটে না। জেতার মনে সর্ব্বদা আশঙ্কা ও আতঙ্ক থাকে, এবং বিজিতের মনে বিদ্বেষ ও বিজিগীষা বদ্ধমূল হইয়া থাকে। সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হইলেই প্রচ্ছন্ন বৈরানল পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যে পরাজয়ে গ্লানি যত অধিক, যত শীঘ্র সম্ভব তাহার নিরসন প্রচেষ্টাও তত প্রবল। শক্তিমদমত্ত জার্ম্মাণী ও জাপানের এই যে পরাজয়, ইহার গ্লানি মর্ম্মান্তিক। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে জার্ম্মাণীর শোচনীয় পরাভব ঘটিয়াছিল, কিন্তু তৎপরে একবিংশ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে জার্ম্মাণী পুনরায় শক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবী-গ্রাসে উন্মত্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে শান্তি যে তদপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হইবে, তাহা কে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে?

যুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল নহে। আপাত-দৃষ্টিতে যুদ্ধ হিংসার পরাকাষ্ঠা; অপরিসীম ধনজন ও সম্পদ্-সম্পত্তির ধ্বংস ও বিনাশের কারণ। প্রতি যুদ্ধে লোকক্ষয়ের পশ্চাতে আসে অধিকতর শক্তি-শালী লোকবৃদ্ধি, এবং ধ্বংসের পশ্চাতে হয় উন্নততর সৃষ্টি। প্রয়োজনই প্রজননের মূল প্রেরণা। সুচারুরূপে যুদ্ধ পরিচালনার অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য প্রয়োজনে বিনাশ-মূলক সৃষ্টি ও আবিষ্কারের সহিত জগতের কল্যাণ-মূলক বহু সৃষ্টি ও আবিষ্কারও সংঘটিত হয়। বিনাশ-মূলক বহু সৃষ্টি এবং নূতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন পরিণামে—শান্তি কালে—মানবের শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ কল্যাণে নিয়োজিত হয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। যুদ্ধের প্রয়োজনেই বিমানের সৃষ্টি ও বহুবিধ উৎকর্ষ। প্রচণ্ড ধ্বংসকারী আণবিক বোমার আবির্ভাবের সহিত ম্যালেরিয়া বিস্তারকারী দুরন্ত মশক-নাশের নিমিত্তও এক প্রকার বোমার সৃষ্টি হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যেমন ধ্বংসকার্য্য সম্পাদিত হয়, তেমনি অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ এবং বহুবিধ কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকার অসম্ভব। ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই যে, প্রায় প্রতি ঐতিহাসিক যুদ্ধের পশ্চাতে নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি এবং মানবের ধন-সম্পত্তি ও প্রাণ-নাশের বিবিধ বৈজ্ঞানিক ও অর্থ-নৈতিক উপায়-উপকরণের সহিত ঐ সকল রক্ষা করিবারও বৈজ্ঞানিক ও অর্থ-নৈতিক উপায়-উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পশম-শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। ধর্ম্মযুদ্ধগুলির অর্থ-নৈতিক সুফল আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রিমীয়ার যুদ্ধ আহতের শুশ্রূষায় যুগান্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে বহু নব নব তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল; এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রয়োজনে যে কত শত মারণযন্ত্রের সহিত মানব-জীবনের ভাবী কল্যাণজনক উপায় ও উপপত্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শস্ত্র-চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যে বিবিধ যান-বাহন ও মারণাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে শক্তির পরিচয় ও প্রতিযোগিতা অপেক্ষা বুদ্ধির পরিচয় ও প্রতিযোগিতা অধিক। এই যন্ত্র ও গতিযুগে যুদ্ধ পরিচালিত হয়—আধুনিক বৈজ্ঞানিক কল-কৌশল, যন্ত্রপাতি ও যানবাহনে সুসজ্জিত এবং বহুবিধ উপাদান-উপকরণে সুসমৃদ্ধ জল-স্থল ও অন্তরীক্ষচারী সৈন্যদলের মধ্যে। আধুনিক যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ভর করে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি, যান-বাহন, সাজ-সরঞ্জাম এবং আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের নিয়মিত ও প্রয়োজন-পরিমিত সরবরাহের উপর। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধৃবর্গের শৌর্য্য-বীর্য্যের পরাকাষ্ঠার সহিত দেশাভ্যন্তরে কলকারখানা ও ক্ষেত-খামারের অজস্র উৎপাদন ও সরবরাহ-সামর্থ্যেরও বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধোপকরণের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের অনুপাতে যোদ্ধৃবর্গের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিপোষক অসামরিক শ্রমিক, ধনিক, বণিক্ ও করদাতৃ সাধারণ জনমণ্ডলীর নিত্য-নৈমিত্তিক আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের উৎপাদন ক্রমশঃ স্বল্পতর হইতে থাকে। নির্ব্বিঘ্নে যুদ্ধোপকরণ এবং জল-স্থল ও অন্তরীক্ষবিহারী সৈন্যমণ্ডলীর আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রুত উৎপাদন ও ক্ষিপ্র সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রকে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হয়। সরকারী যুদ্ধব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এই অর্থ যুদ্ধ-সম্পর্কিত শিল্প ও অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে বিতরিত হইয়া, ক্রমক্ষীয়মাণ অসামরিক জনমণ্ডলীর অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্বল্প-পরিমিত আহার্য্য-ব্যবহার্য্যকে অত্যধিক মূল্যে মুষ্টিমেয় ধনীর কবলিত করে। ফলে, বহুপরিমিত স্বল্পবিত্ত ও দীন-দরিদ্র জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর অভাব-অনাটন দিন দিন প্রচণ্ডরূপে বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যমূল্য অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি পায় এবং ব্যয়বাহুল্য হেতু স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণকে অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে ক্লেশ পাইতে হয়। শ্রেণী-বিশেষে এই অযথা মুদ্রা-বৃদ্ধির ফলে মূল্য-বৃদ্ধি চরমে পৌঁছায়; এবং ধনীর ধনবৃদ্ধির সহিত দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কুক্ষিগত করে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আদিম কারণ—এই যুদ্ধ-প্রয়োজনে অযথা মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। তদনুষঙ্গে কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর অবিচার ও অত্যাচার এবং সমাজদ্রোহী অতিলোভী মুনাফাবাদীদের চোরাবাজারে কার-কারবার "সোণায় সোহাগা" প্রদান করিয়াছিল। এই অর্থ-নৈতিক বিপ্লব ও তৎপ্রসূত মন্বন্তরের যৎকিঞ্চিৎ প্রশমনের নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষকে দ্রব্যমূল্য-নির্দ্ধারণ এবং অবস্থানুযায়ী প্রাপণীয় স্বল্প-পরিমিত দ্রব্যসামগ্রীর সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-বিতরণের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণ করিতে হয়। অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে সরকারের মুদ্রাপ্রচলন ও পরিচালন বিপর্য্যয় প্রশমনের ইহাই একমাত্র উপায়। নতুবা

প্রতি জনমণ্ডলীর আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে না। যুদ্ধকালে স্বাধীন দেশগুলি এই সকল বিঘ্ন-বিপত্তির প্রতিরোধমূলক দৃঢ় বিধি-বিধান যুদ্ধারম্ভেই অবলম্বন করেন; কিন্তু পরাধীন দেশের ব্যবস্থা কিরূপ বিভিন্ন, তাহা আমরা প্রচণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বাধীন দেশগুলিতে যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নূতন সংগঠনের বিধি-ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়। ভারতে তাহার জল্পনা-কল্পনা এবং তোড়জোড় অনুষ্ঠানেই যুদ্ধের সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জল্পনা-কল্পনা বিলাস এখনও শেষ হয় নাই।

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে জগতে যুদ্ধবৃত্তি তিরোহিত করিয়া চিরস্থায়ী না হউক, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন যে চতুর্দ্দশটি নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল মুখ্যত: রাজনৈতিক। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ জগতে একটি নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতির অন্তর্বর্ত্তী ব্যবধান বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইয়া উভয়ের মূলনীতি ও বাস্তব-ব্যবহারে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। এখন রাজনীতির সহিত অর্থনীতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাজনীতি এখন বহুল পরিমাণে অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। লোকবল অপেক্ষা অর্থবলই এখন রাষ্ট্রমাত্রেরই মুখ্য শক্তি। যেমন যুদ্ধ পরিচালনে তেমনি যুদ্ধান্তে শান্তি সংস্থাপনে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রবল ও প্রধান। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে ভাবী যুদ্ধ নিবারণ উদ্দেশ্যে জগতের বিভিন্ন জাতি লইয়া যে বিরাট জাতিসঙ্ঘ সংগঠিত হইয়াছিল, তাহার অর্থনৈতিক ভিত্তি অত্যন্ত শ্লথ ছিল। ইহাই তাহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। বর্ত্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান কালে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সাধারণ জনমণ্ডলীর উপযুক্ত অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে; এবং সে সংস্থাপন নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের অর্থ-সংস্থানের উপর। এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বপ্রথমে হটস্পীং নামক স্থানে একটি আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য-বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং তৎপশ্চাতে সর্ব্ব দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের মান ও বিনিময়ের সমন্বয় সংসাধনার্থ ব্রেটন উড্স্ নামক স্থানে একটি আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎপশ্চাতে আন্তর্জ্জাতিক পরিবহন ও বিশেষতঃ বিমান-পরিচালন সম্পর্কে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার অধিবেশন-স্থান ছিল নিউইয়র্ক। ইত্যবসরে স্যানফ্রান্সিস্কো নামক স্থানে আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি ও শান্তিসংস্থাপনার্থ প্রায় পঞ্চাশটি বিভিন্ন জাতির এক মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সভার অধিবেশনের অল্প দিন পূর্ব্বেই তিনি অকস্মাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সহকারী রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান্ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়া এই যজ্ঞ সমাপন করিয়াছেন। এই বৈঠকের অতুল পরিশ্রমের ফলে যে নিখিল জগতের নিরাপত্তা-বিধায়ক সর্ব্ববাদিসম্মত সনন্দ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তথাপি বর্ত্তমান মুমূর্ষু জাতিসঙ্ঘের সংগঠনের সহিত প্রস্তাবিত নূতন সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের অধীনে যে ছয়টি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মপন্থার আমরা একটু সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পরিচয় প্রদান করিব।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অর্দ্ধ শতাধিক রাষ্ট্র লইয়া জেনেভায় যে জাতি-সঙ্ঘ সংগঠিত হইয়াছিল, দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে মধ্যস্থরূপে তাহা মিটাইয়া দিতে চেষ্টা করা এই সঙ্ঘের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সঙ্ঘের "পরিষদ" (Assembly) নামে একটি সাধারণ সংগঠন; "সভা" (Council) নামে একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সংগঠন এবং জেনেভাতে ইহার একটি স্থায়ী কার্য্যালয় আছে। সঙ্ঘভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিসমূহ লইয়া পরিষদ গঠিত এবং পরিষদ হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া সভা গঠিত। সভায় প্রধান রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ স্থায়ী সদস্যরূপে আসন পাইয়াছিলেন; এবং পরিষদ অপর রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক জন সদস্য নির্ব্বাচন করিতেন। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বৎসরে একবার মাত্র এবং সভার বৈঠক বৎসরে তিন-চারি বার বসিত। ভাবী যুদ্ধ নিবারণ ব্যতীত সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত একটি আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-বিভাগও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য্য ছিল বহু দেশব্যাপী মহামারী নিবারণ; এবং শ্রমবিভাগের কর্ত্তব্য ছিল শ্রমজীবিগণের অবস্থার উন্নতি-প্রচেষ্টা। হেগ নগরে একটি আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় এবং সুইডেনের বেসল সহরে একটি আন্তর্জ্জাতিক নিকাশ-নিষ্পত্তি ব্যাঙ্ক (Bank of International Settlements) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিখিল জগতে আন্তর্জ্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ কেবলমাত্র নৈতিক শক্তির সাধায়ত্ত নহে; সুতরাং জাতিসঙ্ঘ স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, চীন-জাপানের সংঘর্ষ এবং ইতালীর আবিসিনিয়া ও এলবেনিয়া জয় নিবারণ করিতে পারে নাই। ইতালীর এবং পশ্চাতে জাপানের সহযোগে জার্ম্মাণীর জগৎ জয়ের আত্মঘাতী অভিযানও নিবৃত্ত করিতে অগ্রসর হয় নাই। সামরিক-শক্তিসম্পন্ন কোন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ জাতি কিংবা রাষ্ট্রকে শাসনে সংযত করা অসম্ভব। এই নিমিত্ত স্যানফ্রান্সিস্কো বৈঠক সম্মিলিত জাতিসমুচ্চয়-প্রস্তাবিত নব নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে সঙ্ঘভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে প্রয়োজনানুযায়ী সামরিক শক্তিলাভের ব্যবস্থা করিয়াছে। পশুবলের সাহায্যে পশুবল প্রতিহত করিতে পারা যায়; কিন্তু পশু-প্রবৃত্তি দমন করা সম্ভবপর নহে; তাহার উপায় ও কৌশল বিভিন্ন। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে স্যানফ্রান্সিস্কোর আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা সনন্দ-সঙ্কলিত সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের সংগঠনের একটু বিবরণ প্রদান প্রয়োজন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাধিক বিভিন্ন জাতি সমূহের স্যানফ্রান্সিস্কো মন্ত্রণা-বৈঠকে সম্পাদিত বিশ্ব-নিরাপত্তা সনন্দ (World Security Charter) অনুযায়ী "সম্মিলিত জাতি সমুচ্চয়" (The United Nations) নামক আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ছয়টি শাখা-প্রতিষ্ঠান। "সাধারণ পরিষদ" (General Assambly), "নিরাপত্তা সভা" (Security Council), "অর্থনৈতিক ও সামাজিক সভা" (Economic and Social Council), "বিশ্বস্ত ন্যাস-রক্ষণ সভা" (Trusteeship Council), আন্তর্জ্জাতিক বিচারালত (International

Court of Justice) এবং সরকারী দপ্তরখানা (Secretariate) সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিনিধি দ্বারা সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে। প্রত্যেক জাতির স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে পাঁচটির অধিক প্রতিনিধি ইহাতে থাকিবে না। পরিষদ সনন্দ-সম্পৃক্ত সর্ব্ব বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অধিকারী। নিরাপত্তা সভা হইবে কার্য্যনির্ব্বাহক প্রতিষ্ঠান। ইহার সভ্য-সংখ্যা একাদশ। প্রধান পাঁচটি রাষ্ট্র অর্থাৎ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, চীন ও ফরাসী ইহার স্থায়ী সভ্য; বাকি ছয়টি অস্থায়ী সভ্য সাধারণ পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। নিরাপত্তা সম্পর্কে সর্ব্ব প্রকার ক্ষমতা এই সভার। কর্ম্মপদ্ধতি ভিন্ন অন্যান্য সিদ্ধান্তে প্রধান পঞ্চ রাষ্ট্রের ঐকমত্য না ঘটিলে যে কেহ তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন। অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সভার সভ্য-সংখ্যা অষ্টাদশ। ইঁহারা সাধারণ পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সভা আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও কৃষি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবে। ন্যাসরক্ষণ সভা, যে সমস্ত দেশ কোন-না-কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের অধীন, তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় সম্মিলিত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত কিংবা বহির্ভূত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের বিচার করিবে। সম্মিলিত জাতি-সমূহের বহির্ভূত রাষ্ট্রকে এই বিচারালয়ের আশ্রয় লইতে হইলে সাধারণ পরিষদের অনুমতি ও অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। সরকারী দপ্তরখানা কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়রূপে কোন রাষ্ট্র বিশেষের আদেশানুবর্ত্তী হইতে পারিবে না। এই প্রধান ও শাখা-প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে নিরাপত্তা-সভার দায়িত্ব ও মর্য্যাদা প্রচণ্ড। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে এই সভাকে সামরিক বিষয়ে মন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত একটি সামরিক কর্ম্মচারি-সমিতি থাকিবে। জগতের জনবল ও ধনবল এবং যুদ্ধোপকরণ সম্পদের যথাসম্ভব কম বিপর্য্যয় ঘটাইয়া এই সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া নিরাপত্তা সভা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নিকট অস্ত্রশস্ত্র এবং সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্য বিনিয়োগ-প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাহাদের পরিকল্পনা পেশ করিবে। ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনানুযায়ী সম্মিলিত জাতি-সমূহের নিরাপত্তা-সভাকে কোন বিদ্রোহী অথবা অবাধ্য কিংবা বিদ্রোহোন্মুখ জাতিকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে বাধ্য অথবা সংযত করিবার নিমিত্ত যথাযোগ্য অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য-সামন্ত, উপকরণ-উপাদান, সাজ-সরঞ্জাম এবং যান-বাহন ও পরিবহনের (Transport) সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে। নিরাপত্তা-সভার স্থায়ী সদস্য পঞ্চ রাষ্ট্রের সামরিক কর্ম্মচারিবর্গের অধ্যক্ষ (Chief of Staff) কিংবা তাহাদের প্রতিনিধি দ্বারা সামরিক কর্ম্মচারি-সমিতি সংগঠিত হইবে। নিরাপত্তা-সভার আয়ত্তাধীন সৈন্য প্রভৃতি পরিচালনের ভার এই সমিতির উপর থাকিবে। সংক্ষেপতঃ সম্মিলিত জাতি-সমূহের ইহাই সংগঠন-সংস্থা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পশুবল দ্বারা পশুবলকে নির্জ্জিত করা যায়, কিন্তু পশু-প্রকৃতির উচ্ছেদ-সাধন সম্ভবে না। যুদ্ধ-প্রবৃত্তির মূল প্রেরণা কি,—সর্ব্বপ্রথমে তাহাই অবধারণ করিতে হইবে। প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হইলে তাহার প্রতিকার সহজসাধ্য হয়। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান অর্থনৈতিক মনীষী লর্ড কীনেস্ তাঁহার Economic Consequences of Peace (শান্তির অর্থনৈতিক ফলাফল) নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন,—"তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে অনশন-ক্লিষ্ট এবং ভগ্নপ্রবণ য়ুরোপের মূলীভূত অর্থনৈতিক সমস্যাটিই ছিল একমাত্র প্রশ্ন, যৎপ্রতি প্রধান জাতি-চতুষ্টয়ের মনোযোগ উদ্রিক্তকরণ ছিল অসম্ভব। য়ুরোপের ভবিষ্যৎ জীবন তাহাদের চিন্তার বিষয় ছিল না; ইহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে তাহাদের কোন ঔৎসুক্য ছিল না। তাহাদের উত্তম এবং অধম উভয় প্রকার ভাবনা-চিন্তার বিষয় ছিল,—স্ব স্ব রাষ্ট্রের সীমান্ত বিনির্ণয়, জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তিসামর্থ্যের ভার-সাম্য, সাম্রাজ্যবিস্তারের লালসা, শক্তিমান্ এবং বিপজ্জনক জাতির বলহানি, প্রতিহিংসা চরিতার্থ-প্রয়াস এবং যুদ্ধে জয়ী জাতির অসহনীয় ব্যয়ভারকে যুদ্ধে বিজিত জাতির স্কন্ধে অর্পণ।" তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতির প্রতিদ্বন্দ্বী মনীষী রাজনৈতিক ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি জেনেভার জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—মুখ্যতঃ এই ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিণ সমাধান নূতন এবং সৌখীন নামের অন্তরালে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল। ইহা সুদূর প্রাচ্যের জরুরী অভাব-ত্রুটির যথাযোগ্য প্রতিবিধানের প্রতি মনোযোগী হয় নাই কিংবা জগতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রয়াস-প্রচেষ্টা করে নাই। * * * সর্ব্বজাতি যে সর্ব্বজাতির উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকার পাইবে তাহা নহে; তাহাদের সকলের উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী যাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বজাতির আয়ত্তের অন্তর্গত হয় সে বিষয়েও নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কতিপয় সাম্রাজ্য-লোলুপ জাতির স্বার্থান্ধতা যদিও দৃশ্যতঃ জাতিসঙ্ঘের বিফলতার কারণ, তথাপি তাহার মূল কারণ আরও গভীর এবং তাহা বিভিন্ন জাতির অর্থ-নৈতিক অভাব-অভিযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের অর্থ-নৈতিক সম্পর্কই বহুল পরিমাণে বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবে। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-সংস্থাপন ও সংরক্ষণার্থ অধুনা অর্থ-নৈতিক সমস্যা-সমাধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধান অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলি স্পষ্টতঃ যুদ্ধ-বিদ্রোহের সম্পূর্ণ হেতু না হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ প্রতিহিংসা-চরিতার্থ প্রবণতা এবং ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত গৌরব-সংরক্ষণ, কিংবা পুনরুদ্ধারহেতু যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ঘটে, কিন্তু বস্তুতঃ সার্ব্বভৌমিক জাতিগুলির মধ্যে অর্থ-নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দুরাকাঙ্ক্ষাই যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ। কাঁচা মাল, সস্তা মজুর, শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়-ক্ষেত্র এবং উচ্চ সুদে মূলধন খাটাইবার ক্ষেত্র সংগ্রহার্থ প্রবল জাতিগুলির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, জগতের বিভিন্ন দেশে অর্থ-সামর্থ্য, সম্পদ্-সম্পত্তি এবং আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের বৈষম্যই আন্তর্জ্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাতের আদিম কারণ। এ সত্য এখন সকলেই উপলব্ধি করিয়াছে। বিলাতের নূতন শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন সে দিন মহাসভায় বৃটেনের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"যে, নিখিল জগতে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনই আমাদের বৈদেশিক নীতির প্রধান ও

উদ্দেশ্য। যুদ্ধের ফলে বিপর্য্যস্ত জনসাধারণকে তাহাদের শান্তিকালীন গার্হস্থ্য জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং যাহাতে তাহারা স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" ভূতপূর্ব্ব জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এণ্টনি ইডেনও তাঁহার উক্তি সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, "য়ুরোপের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে সহজ ও স্বাভাবিক করিবার নিমিত্ত বৃটেনকে তাহার নিজের কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও, প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ, তাহার নিজের স্বার্থের নিমিত্ত তাহা প্রয়োজন।" রাজনৈতিক নিরাপত্তা ব্যতীত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্ভব নহে। জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সর্ব্ববিধ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রয়োজন; কিন্তু জগতের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে দৃঢ় রাজনৈতিক মৈত্রী ব্যতীত তাহা অসম্ভব। সর্ব্ব-জাতির ঐকান্তিক নিরাপত্তা ব্যতীত অর্থনৈতিক স্থৈর্য্য আকাশকুসুম সদৃশ অলীক। আন্তর্জ্জাতিক সদিচ্ছা ও সৎপ্রবৃত্তি ব্যতীত অবশ্য কোন অর্থনৈতিক সমাধানই নির্ব্বিঘ্ন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন যথার্থই বলিয়াছেন,—"যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরাম-কালের মধ্যে নিরাপত্তার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না; পরন্তু, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপর্য্যয়ে নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। সুতরাং, এখানে যখন আমরা নিরাপত্তার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছি, তখন এই "দূষিত মণ্ডল"কে (Vicious Circle) ভঙ্গ করিতে হইবে।" এই নিমিত্ত ব্রেটন্ উড্‌সের আর্থিক বৈঠকে সঙ্কল্পিত আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের একটি উদ্দেশ্য হইতেছে—আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার এবং সমতা-সম্পন্ন উন্নতি, যাহাতে সুস্থ সবল ব্যক্তিমাত্রই কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, লোকের যথার্থ আয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক দেশের উৎপাদন-শক্তিসম্পদের উন্নতি দ্বারা অর্থ-নৈতিক নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের সর্ব্ববাদি-সম্মত বিশ্বনিরাপত্তা সনন্দেরও অন্যতম অভিপ্রায় হইতেছে,—আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টি-সম্বন্ধীয় এবং পরহিতৈষণা সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধানে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা। সর্ব্ব-জাতির স্বার্থ-সংরক্ষণার্থ এবং সমস্ত লোকের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি-বিধান ব্যতীত সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের আন্তর্জ্জাতিক পরিষদ কখনই সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিবে না। সমুদায় জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সখ্যতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জগতের সর্ব্বত্র দৃঢ় কল্যাণ-দায়ক স্থৈর্য্যশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হেতু আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয় জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের জীবনযাত্রার ধারার উন্নতি সাধন, কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ম্মের ব্যবস্থা, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক প্রগতি এবং উন্নতি বিধান, আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং তৎসম্পর্কিত সমস্যার সমাধান, আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্টিগত এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সহযোগিতা, মানবের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বজনীন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নশীল প্রচেষ্টার অনুষ্ঠান করিবেন। সম্মিলিত জাতিসমুচ্চয়ের সদস্য-দেশগুলি এই সকল সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর। সাধারণ পরিষদই এই দুরূহ কার্য্যের ভার লইবেন; অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সভা পরিষদের আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে। সংক্ষেপতঃ সমস্ত দেশের প্রত্যেকের প্রয়োজনানুরূপ সুসমন্ত ও সুসমঞ্জস অর্থ-নৈতিক উন্নতি এবং তাহাদের প্রত্যেকের জনসাধারণের যথাযোগ্য অন্নবস্ত্র ও কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক অভ্যস্ত সাংসারিক জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে জগতে দৃঢ় শান্তি সংস্থাপন অসম্ভব। সুতরাং রাজনীতির সহিত অর্থ-নীতির প্রগাঢ় সহযোগিতা ব্যতীত যুদ্ধের নিবৃত্তি ও শান্তির প্রতিষ্ঠা দুরাশা মাত্র। সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয় সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন।

সতীর দেহত্যাগ ও পীঠস্থানের উৎপত্তি

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

৮

বায়ুপুরাণে দেবীর কথিত কোনও প্রসিদ্ধ দেবীতীর্থের উল্লেখ নাই,—মৎস্যপুরাণে তাহা আছে। যোগানলে দেবীর শরীর দগ্ধ হইতে দেখিয়া দক্ষ অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহাকে অনুরোধ করেন—তুমি জগতের মাতা, জগতের সৌভাগ্য দেবতা। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই আমার কন্যা হইয়াছিলে। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে তোমা ছাড়া কিছুই নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার অনুচিত। দক্ষের এই প্রার্থনার উত্তরে দেবী বলিলেন,—যে কার্য্য (আমার দেহনাশ) আরব্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই আমাকে করিতে হইবে। মহাদেব নিশ্চয়ই তোমার যজ্ঞ নষ্ট করিবেন; পরে তুমি প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশে আমার সমীপে তপস্যা করিবে; দশ পিতার (প্রচেতাদিগের) পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবে, আমার অংশে তোমার ষষ্টিসংখ্যক কন্যা জন্মিবে এবং অবশেষে আমার সমীপে তপস্যা করিয়া তুমি পরম যোগসিদ্ধি লাভ করিবে।

দেবীর এই কথা শুনিয়া দক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, কোন্ কোন্ তীর্থে আমি তোমার দর্শন পাইব, এবং কোন্ কোন্ নামেই বা তোমার স্তুতি করিব, তাহা আমাকে বল।" দেবী বলিলেন—"সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে সর্ব্বতোভাবে আমার সাক্ষাৎকার হয়; যেহেতু জগতে আমা ছাড়া আর কিছুই নাই। তবে, যে যে স্থানে সিদ্ধি কামনায় অথবা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধকেরা আমাকে দর্শন অথবা স্মরণ করেন, সেই সেই স্থানের এবং স্থানাধিষ্ঠাত্রীর নাম বলিতেছি শুন।" এই কথার পর দেবী ভারত-খণ্ডের তৎকালপ্রসিদ্ধ দেবীস্থান এবং স্থানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামোল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—"বেদবদনে আমি গায়ত্রী, শিব সমীপে পার্ব্বতী, দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মার মুখে সরস্বতী, সূর্য্যবিম্বে প্রভা, মাতৃগণের মধ্যে বৈষ্ণবী, সতীদিগের মধ্যে অরুন্ধতী, সুন্দরীগণের মধ্যে তিলোত্তমা, জীবের চিত্তে ব্রহ্মকলা এবং সর্ব্বশরীরী জীবের শক্তি।" এইরূপে দেবী তাঁহার অষ্টোত্তর-শত তীর্থ এবং অষ্টোত্তর শত নামের বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুরাণোক্ত

দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদনের অথবা তাহাদের পতনজনিত কোনও পীঠস্থানের উৎপত্তি বা অবস্থানের নাম নাই ; এমন কি, পীঠ শব্দটিও নাই। উক্ত ১০৮ তীর্থস্থানের তালিকার মধ্যে কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ কামাখ্যা এবং কালীঘাটের কালীর আদৌ উল্লেখ নাই। বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পাটলা, বৈদ্যনাথে অরোগা, একাম্রে (ভুবনেশ্বরে) কীর্ত্তিমতী, পুরুষোত্তমে (পুরীতে) বিমলা, কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে তারা এবং চিত্রকূটে সীতার নাম পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মথুরায় দেবকী, বৃন্দাবনে রাধা এবং দ্বারাবতীতে রুক্মিণীর উল্লেখ আছে। এই বর্ণনায় কোনও তীর্থে লিঙ্গরূপী শিবের অবস্থানের কোনও প্রসঙ্গ নাই।

৯

শিব অথবা শক্তির মাহাত্ম্য পরিচায়ক অন্যান্য কতকগুলি মহাপুরাণেও (যেমন, স্কন্দপুরাণের প্রথম বা মহেশ্বরখণ্ডের দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ে) শিব এবং দক্ষের মধ্যে পরস্পর বৈরিতা এবং তন্নিবন্ধন দক্ষকৃত শিবাবমাননার ফলে দাক্ষায়ণী সতীর অনলে দেহত্যাগ এবং তজ্জনিত মৃত্যুর কারণে শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ প্রভৃতি প্রায়ই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের আদর্শে কিছু বিস্তৃততরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই সতীদেহ ভস্মসাৎ হওয়ার কথাই আছে, কুত্রাপি সতীর শবদেহ শিব কর্ত্তৃক বহন, নারায়ণ কর্ত্তৃক উহা খণ্ডশঃ ছেদন এবং ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পতন ফলে কোনও পীঠস্থানের উৎপত্তির প্রসঙ্গ নাই।

১০

পৌরাণিক সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন তান্ত্রিক সাহিত্যেও সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পতনজনিত পীঠস্থান সমূহের উৎপত্তি-বিবরণ পাওয়া যায় না। তান্ত্রিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'হারিতায়ন সংহিতা' অথবা 'ত্রিপুরারহস্যের' প্রাচীনত্ব ও প্রামাণ্য নিবন্ধন সম্মান যে অতিশয় অধিক, তাহা সুধীজনের সুবিদিত। উক্ত রহস্যের বক্তা শ্রীভগবানের অবতার শ্রীদত্তাত্রেয় গুরু এবং শ্রোতা ও অবতার-পুরুষ ভার্গব পরশুরাম। উক্ত গ্রন্থের মাহাত্ম্যখণ্ডের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দেবী,

"পিধায় কর্ণৌ হস্তাভ্যাং মন্যুনা জ্বলিতা সতী।
অশ্রাব্যং বচস্তেহস্ত দেবদেবং বিনিন্দসি ॥ ৩৭
ব্যর্থং ত্বেহতঃ ক্রতুবরং বিধ্বস্তোহস্তু পিতস্তথা।
ভর্তুর্মত্তেশ্চাপ্যেবং নিন্দকাদেব দেহকঃ ॥ ৩৮
সত্ত্বতো ধারণাদূর্দ্ধ্বং সঞ্জাতং পতিনিন্দনম্।
ইত্যুক্ত্বাহতিরুষা সংবর্ত্তাহগ্নিধারণমাস্থিতা ॥ ৩৯
ক্ষণং প্রজজ্বাল ততো দেহস্তস্যা মহাগ্নিনা।
জ্বালয়া সহিতো দেহো ভস্মশেষোহভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪০

এই সংস্কৃত ভাষার শ্লোকেও পূর্ব্বোক্ত মহাপুরাণগুলির বর্ণনার মত দেবীর স্বদেহোত্থিত যোগানলে তাহার শরীর ভস্মীভূত হওয়ার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে ; সুতরাং শিব কর্ত্তৃক সতীর শবদেহ বহনাদির প্রসঙ্গ এখানেও উঠিতে পারে না।

১১

এক-পঞ্চাশৎ খণ্ডে দেবীর দেহ বিভক্ত এবং তন্নিবন্ধন এক-পঞ্চাশৎ দেবীস্থানের সৃষ্টি হওয়ার আখ্যানের মূলে একটি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন রূপক বিদ্যমান আছে। যাঁহারা যোগশাস্ত্রের উপদিষ্ট ষট্‌চক্রভেদ এবং দেবীপ্রতিমার এবং সাধকের প্রত্যঙ্গন্যাসের বিবরণ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন এবং বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের দেবনাগর বর্ণমালার অ হইতে বৈদিক ল (ড়) পর্য্যন্ত এক-পঞ্চাশৎ বর্ণমালার (স্বরবর্ণ ১৬টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫টির) দ্বারা দেবীর (এবং সাধকেরও) সমগ্র শরীর কল্পিত হইয়াছে এবং অকারাদি ল (ড়) কারান্ত এক-পঞ্চাশৎ (৫১) লিপির প্রত্যেকটিকে দেবীর (এবং সাধকের) শরীরের এক একটি বিশেষ প্রত্যঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেই সুপ্রাচীন তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী তান্ত্রিক সাধকগণ বর্ণমালারূপিণী মহামায়ার শরীরকে এক-পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত এবং তন্নিবন্ধন উৎপন্ন এক-পঞ্চাশৎ পীঠস্থান এবং তৎসংখ্যক দেবীনামের সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় বর্ণমালার বৈদিক ল (ড়) কারের অস্তিত্ব নাই বলিয়া বাঙ্গালা দেশে রচিত দেবীস্তোত্রে "পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত—" ইত্যাদি লিখিত হইতেছে। বর্ণমালার পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বা লিপিকে পৃথক্ পৃথক্ দেবী বা শক্তিরূপেও যে সাধকেরা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও অনুসন্ধিৎসু বিদ্যার্থীর অবিদিত নাই। অচিন্ত্য বা উপাস্য দেবদেবীর সহিত উপাসক বা সাধকের অভেদ কল্পনা যে অদ্বৈতবাদমূলক তান্ত্রিক মতের এক বিশেষত্ব, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেরই সুবিদিত।

১২

শাক্যসিংহের (বুদ্ধদেবের) এবং তাঁহার কোন কোন শিষ্যের প্রোথিত দেহাংশের (ধাতু বা অস্থির) উপর স্তূপ নির্ম্মাণের এবং সেই স্তূপের পূজা প্রচলিত হওয়ার পর সেই ভাব লইয়া দেবীর দেহাংশের উপর পীঠের প্রতিষ্ঠারূপ কল্পনার জন্ম হইয়াছে—এরূপ বোধ হয়। পুরীর জগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তির ভিতর "বিষ্ণুপঞ্জর" রাখার কল্পনাও বৌদ্ধভাব হইতে উৎপন্ন। পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত অনেক হরি-মন্দিরে দেবীর দেহাংশ বলিয়া পরিচিত কোন গোপনীয় বস্তু একটা কৌটায় বদ্ধ থাকে (কালীঘাটেও আছে)। পাণ্ডা বা পূজকেরা বলেন—"উহা দেবীর সেই ছিন্ন দেহাংশ, গোপনে রক্ষিত আছে। উহা কাহারও দেখিবার আদেশ নাই—দেখিলেই সর্ব্বনাশ" ইত্যাদি। উত্তর বঙ্গের কোন কোন বিধ্বস্ত দেবীমন্দিরের সেই "কৌটার" ভিতরে রক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের বুদ্ধের অথবা তারার প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মিশরের Osiris দেবেরও দেহের অংশ (লিঙ্গ) নানা স্থানে সমাহিত এবং তদ্ধেতু পীঠস্থানে পরিণত হওয়ার প্রবাদ আছে। এই সকল কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, তন্ত্রপ্রসিদ্ধ ৺কামাখ্যাদি পীঠ বৌদ্ধ মহাযান মতের ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং মূলে বর্ণমালাময়ী দেবীর ভাবও ছিল।

মাটি কাটে

কিছু দিন আগেকার কথা। ইংলণ্ডের এক গ্রামে এক দিন রাত্তে গ্রামবাসীরা দেখলে যেন আধ মাইল লম্বা এক আগুনের প্রাচীর তাদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে। শুনলে যেন আজগুবি মনে হয়।

মাটি তুলে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

আসল ব্যাপারটা এই যে, শত্রুপক্ষ পেট্রল-ষ্টোরে বোমা নিক্ষেপ করেছিল। পাহাড়ের ওপর ছিল সেই ষ্টোর। অবশ্য লুক্কায়িত।

পাহাড় কেটে সুরঙ্গ তৈরী হচ্ছে

মিনিটে হাজার ফিট গতিতে সেই আগ্নেয় প্রাচীর পাহাড় থেকে নেমে আসতে লাগল গ্রামকে গ্রাস করতে।

গ্রামবাসীরা উর্দ্ধশ্বাসে ভয়ে পালাতে আরম্ভ করল। কিন্তু ঐ গতির সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? ওদিকে ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা তাপ সহ্য করতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে আগুন নেবাতে পারল না। এ যেন প্রলয়, নিশ্চিত ধ্বংস।

হঠাৎ দেখা গেল, এক বিরাটাকার দৈত্য আসছে ছুটে। চাওড়া চাওড়া মাটি তুলে ছুড়ে দিলে আগুনের দিকে। আর কাছেরই একটা

এই বিরাট ক্রেমে মাটি তোলা বালতি লাগানো থাকে

ড্যামে এত মাটি ফেললে যে, জল উপচে আগুনে গিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে এই আগ্নেয় প্রলয় ধ্বংস না করতে পেরে নিজেই ধ্বংস হল।

উড়ো জাহাজকে ট্র্যাক্টর তোলা হচ্ছে

বৃহত্তম শাবল—একবারে কামড়ে তোলে সাড়ে ৫২ টন মাটি; একটা বড় মিলিটারী ট্রাক তার তুলনায় কত ছোট

এই বিরাটাকার দৈত্য কে? আমেরিকান বুলডোজার।

যখন একটা বুলডোজার মন্থর গতিতে মাটি কাটতে কাটতে

এগিয়ে চলে, মনে হয় যেন একটা বিরাটাকার কচ্ছপ চলেছে। যুদ্ধ এবং শান্তি দু'য়েতেই এর উপকারিতা খুব বেশী। কোথাও মাটির স্তূপ কেটে এবড়ো খেবড়ো জমি সমতল করছে, কোথাও সেই মাটি এনে গর্ত্ত বুজোচ্ছে, আবার কোথাও বা মাটি গভীরভাবে কেটে ফেলে ক্যানাল, ড্যাম ইত্যাদি তৈরী করছে। কখনও গর্ত্ত খুঁড়তে খুঁড়তে এগিয়ে চলেছে আর তার মধ্যে তৈলের পাইপ পাতা হচ্ছে। এই সে দিন সলোমন্সের ট্রেজারী আইল্যাণ্ডের কথা। একটা বিরাট মাটি সরানো মেশিন এসে জাপদের পিলবক্স, দুটো মেশিন-গান, একটা ১০ মিলিমিটার গান আর ১২ জন জাপকে মাটি চাপা দিয়ে দিল।

মাটিকাটা যন্ত্রকে আজকাল উড়ো জাহাজেও লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দ্রুতবেগে উড়ে গিয়ে যেখান দিয়ে সৈন্য যাবে, সেই উঁচু-নীচু মাটি কেটে সমতল করে দেয়। যন্ত্র দিয়ে মাটি তুলে কোদাল দিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

ট্র্যাক্টর ট্যাঙ্ক দিয়ে এলুশিয়ান দেশের পাহাড়ী মাটি কেটে সমতল করা হচ্ছে

ঐ বালতি করে ক্রেণের সাহায্যে মাটি তোলা হয়

ইদাহোর বয়েস নদীর উপর স্যাণ্ডারসন র‍্যাক ড্যাম নামে এক বিরাট ড্যাম তৈরী হচ্ছে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কাজ শেষ হবে। পৃথিবীর মধ্যে এইটাই হবে সব চেয়ে উঁচু। উচ্চতা ৪৬৫ ফুট। এর জন্য মাটি পাথর লাগবে ৮,৮০০,০০০ কিউবিক ইয়ার্ড (গজ)। জল-সেচ করবে ৩৪,০০০ একর জমীতে।

বিরাট বিরাট মাটি-কাটা যন্ত্র শান্তির সময়ে কয়লা কেটে তোলবার কাজে ব্যবহার করা হয়। একটা কোদাল এক বারেতে মাটি তোলে ৩৫ কিউবিক ইয়ার্ড, ওজনে সাড়ে ৫২ টন।

সমুদ্রের কিনারার জল অগভীর। দাঁড়টানা নৌকা পর্য্যন্ত ভাল ভাবে চলে না। সেখানে তৈরী করতে হবে শিপ-ইয়ার্ড, জাহাজ নাবাবার কারখানা। নিয়ে এল বড় বড় ড্রেজ। মাটি কেটে জলের গভীরতা বাড়িয়ে দিলে। জাহাজ স্বচ্ছন্দে চলে এল কারখানার ভেতরে।

আজকের দিনে যখন চতুর্দ্দিকে পুনর্গঠন পরিকল্পনা চলছে, মাটি-কাটা যন্ত্রের মূল্য বড় কম নয়।

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ প্রান্তে

কে, এম, শমশের আলী

মাটির মমতা মাখা এ মর মরতে
জনম লভেছি যবে সে দিন কি ধরা

এমনি প্রাচীন ছিল? অথবা জগতে
সোনার কিরণ ছিল আলো গানে ভরা?
দিন মাস বর্ষ করি' কখন চকিতে
পঞ্চত্রিংশ বরষের বসন্ত-পবন
কোন্ মরু-পথে যেন করি পলায়ন,—
জানি নাই, না পারিনু তাহারে রুধিতে।

কি লভিনু, কি শিখিনু, পাইনি যা' তারো
তাহার হিসাব দিয়া কিবা ফল আর!
জীবন-সমুদ্র হেথা চির তরঙ্গিত
সিন্ধু-তাণ্ডবের তার। দুঃখ গ্লানি লাজ
দূরে ফেলি' শৌর্য্যভরে যে পারে দাঁড়াতে
জয়ী সেই, প্রাণ তার চির উল্লসিত।

স্বপ্নবাসর

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

আদর্শবাদ এবং মানুষের স্বভাবধর্ম্মে যখন সংঘাত আসে তখন জীবন হয়ে পড়ে জটিল সমস্যা। কারণ, আদর্শ আর বাস্তব সাধারণতঃ বিপরীত পথচারী—সমান্তরালবর্ত্তীও বলা চলে। তাই ত মানুষের মহা সাধনা চলেছে যুগ যুগ ধরে—এ সাধনা আপনাকে অতিক্রম করে নিজের মধ্যে বৃহত্তর একটা কিছু পাওয়ার সাধনা, এ সাধনা নিজের আয়ত্তকে ছাড়িয়ে নাগালের বাইরের জিনিষকে জয় করবার সাধনা, ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে মানুষের জীবনের যোগফল দাঁড়ায় অগম্যকে নিজের হাতের মধ্যে আনবার চেষ্টা। একটা অভিযানের ইতিহাস। যাকে জয় করা হ'ল তার প্রতি অধিকারবোধ তার আছে এ-কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু যা পাওয়া যায়নি তার মোহই-ত আজকে সত্যকার জনক। এহ'ল মানুষের স্বভাবধর্ম্মের কথা, এ ছাড়া আর একটা জিনিষ আজকের সংস্কৃতির মূলে রয়েছে—সে মানুষের স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখতে জানে বলেই তার আদর্শ-বাদ, তার কল্পনার প্রসারতাই বাঁচিয়ে রেখেচে অগ্রগতির অন্ত-বিহীন তৃষ্ণাকে। সে চায় বাস্তবকে অতিক্রম করে স্বপ্ন কল্পনাকে সত্য করে তুলতে। কিন্তু বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে ব্যবধান এত বেশী যে, পাশাপাশি থেকেও ওরা পারে না মিলিত হতে, তবু মানুষের একাগ্র সাধনা সেই মিলনের জন্য।

সার্কুলার রোডে কোন এক ধনীর করুণায় লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। তেরশো পঞ্চাশে মহাকাল যে দণ্ড তুলেছেন, তার বিরুদ্ধে মানুষের আত্মরক্ষার ক্ষীণ প্রচেষ্টা এ ছাড়া বড় আর কিছু নয়। এখানে সেখানে দানসত্র খোলা হয়েছে, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারী অধীর আগ্রহে দূর-দূরান্তর থেকে ছুটে আসছে। সার্কুলার রোডের এই লঙ্গরখানাটার খ্যাতি হয়েছে এই হিসেবে যে, এখানে ভাত দেওয়া হচ্ছে। ভাতের নাম শুনে ভীড় এখানে বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে। সেদিন বিকেলে লঙ্গরখানার টিকিট দেওয়া শেষ হয়ে যাবার পরও অনেক লোক এসে গেছে। তারা কাকুতি-মিনতি করে যাকে তাকে ব্যগ্রতা সহকারে প্রার্থনা জানাচ্ছে, হেই বাবা, একখানা টিকুটি দাও, নইলে আর বাঁচব না। দাও বাবা—বাচ্চাটারে টুকচা খেতে না দিলে মরে যাবে যে বাবা!

যে লোকটিকে এরা সবাই ছেঁকে ধরেছে সে কোন রকমে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বল্লে—ওই গামছা ঘাড়ে ম্যানেজার বাবু দাঁড়িয়ে আছে, ওঁর কাছে যা।

তারা অমনি সেদিকে পঙ্গপালের মত সেই লাল গামছা লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল।

—হেই বাবা—

ম্যানেজার খেঁকিয়ে চীৎকার করে বল্লেন—দূর হ—যা, যা, যা। আজ আর একখানাও টিকিট নেই।

একটা বাচ্চা ম্যানেজারের রক্তচক্ষু দেখে ভয় পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ল। আরও কয়েক জন রকম সকম দেখে গুটি গুটি সরে পড়ল, —যাই বাবা, এখনও সদর রাস্তার ওখানে টিকুটি পাওয়া যাবে।

যেতে যেতে একটি বুড়ী আর একটি মেয়েকে গালাগালি করছে—মর মাগী, যেমন তোর নোলা—ভাত ভাত করে হেদিয়ে মলো, আমি তেখনি বলেছ্যালাম যে পাবিনি। এখন, নে খাবি কি খা—নোলা নোলা। নইলে নলাটে এত কষ্ট লেকা হয়। চেরডা কাল আমার হাড়মাস ভাজা ভাজা করে খেলি, ভাতার-পুত সব খেলি, তবু তোর মরণ হয় না যে। যেমন তোর পোড়া কপাল তেমুনি আমার—নইলে আজ আমি ডাইনীর মত তোর এত দুঃখু দেখতে বেঁচে থাকব কেনে।

যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছে বুড়ী, সেই 'পোড়াকপালী' এক জন পুরুষের সঙ্গে হাসি-মস্করা করে চলেছে, বুড়ী ঠাকুমার একটা কথাও সে কানে তোলে না। স্বামিপুত্রের জন্য এতটুকু শোক তার আছে বলে মনে হয় না, তার এখন ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। পাশের পুরুষটিকে সে বলছে—জানো গো সুমুন্দি। ওই ম্যানাঝাবটা না একবালে সৈরভিদের বাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছে। সৈরভি হচ্ছে আমার সই—ওদের তেমনি দরদালান, কোঠাবাড়ীর ঠাকুরবাড়ী, পুকুর, বাগান। তার পর শুরু হয় সৈরভিদের ঐশ্বর্য্যের বিস্তৃত বিবরণ। সৈরভির মা তাকে কি রকম ভালোবাসত, সৈরভি নিজে ত সই বলতে 'মরে যেত' ইত্যাদি।

বুড়ীটি কিন্তু তখনও চুপ করেনি। সে বকচে ত বকচেই—তার বকুনির মাথামুণ্ড নেই, শেষে বিরক্ত হয়ে মেয়েটি খিঁচিয়ে উঠল, তুই থাম্ বুড়ি হাবড়ি, আমার ও-রকম ছোটলোকের খাওয়া প্যাটে সয় না। আজ কত দিন ছাই-পাঁশ ওই খিচুড়ি খেয়ে শরীলডা পাত হয়ে গেল। তাই বল্লাম যে চল হোথায় ভাত দিতেছে যাই—।

তাকে আর কথা কইবার অবসর দেয় না বুড়ী, সে কাঁদতে কাঁদতে বলে—বল্ বল্ হারামজাদী, তোর যা ইচ্ছে তাই বল্—ওরে আমার

কপাল রে, আমি কি পাপে তোর মাকে প্যাটে ধরেছিলাম রে—ওরে আমার···বুড়ি ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

যে লোকটির সঙ্গে এই মেয়েটি গল্প করছিল, সে এবারে বুড়িকে এক ধমক দিলে—থাম, থাম তুই। এখন মেলা গোলমাল করলে ভালো হবে না বলছি।

ওদিক থেকে একটি লোক এসে ওদের ডেকে বললে—এই, এই তোরা সব চলে যাচ্ছিস্ যে—দাঁড়া।

লোকটার কথায় দু-এক জন ঘুরে তাকাল কিন্তু দাঁড়ালো না—দাঁড়াবার সময় ওদের নেই, ওদিকে দেরী হয়ে গেলে আজকে আর খিচুড়িটুকুও জুটবে না। যে লোকটি ডাকছিল সে হন্‌হনিয়ে সামনে এগিয়ে এসে বললে—দাঁড়া তোরা সব।

তার পর এদিক্ ওদিক্ দেখে নিয়ে বললে—পারবি, চারটে করে পয়সা দিতে পারবি? তাহ'লে তোদের টিকিট পাইয়ে দিই।

এরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। কে এক জন বললে—দু'পয়সায় হয় না?

লোকটা বললে—যা, যা, পাতা কুড়োগে,দু'পয়সায় খেতে এসেচে।

যাদের কাছে পয়সা ছিল তাদের অনেকেই দাঁড়িয়ে গেল। চার পয়সায় ভাত, ডাল, তরকারী পেট পূরে খাও—যত পারো খাও। ওরই মধ্যে যারা সাশ্রয়ী তারা মনে মনে আগামী কালের আশায় নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে খিচুড়ির জন্ত অগ্রসর হয়। চারটে পয়সা তাদের কাছে অত সস্তা নয়।

বুড়াটি নাত্‌নীকে বললে—তা এক কাজ কর। আমার কাছে চারডে পয়সা আছে যা তুই খেয়ে আয়, রেতে সেই গাড়ীবারান্দায় দেখা হবে। আমি খিচুড়ির লাইনে যাই। যা, যা—

মেয়েটি মেজাজ দেখিয়ে বলে—না কাজ নাই, চল—তোর পয়সা খেয়ে শেষে মরি! বুড়ি যেন এ কথায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়, তবে এ রকম ভাবে পয়সা কটা বেঁচে যাওয়াতে মুখে আর বিশেষ কিছু বললে না।

আর একটি মেয়ে কাতর ভাবে এই মেয়েটির সঙ্গে যে লোকটি এতক্ষণ গল্প করছিল তাকে বল্‌লে—লক্ষ্মণ মোড়ল-পো, চারডে পয়সা আজকের ধার দাও না।

লক্ষ্মণ বিরক্তিভরে জবাব দিল—তোর কি জমিদারী আছে তাই ধার করতে এয়েছিস! শুধবি কি দিয়ে? উঁঃ, ধার করতে এয়েচে। হাঃ, সব তোয়াজের মুখ দেখে বাঁচিনে, খিচুড়ি জোটে না, ধার করে ভাত খেতে চায়। সুখের কথা শোনো একবার—যা তোর শুয়োরের পাল নিয়ে পড়ে থাকগে।

এক-কালে অবশ্য এই মেয়েটি লক্ষ্মণের অনেক সাহায্য পেতো, প্রায়ই এটা-ওটা এনে-নিয়ে দিত লক্ষ্মণ। একই গ্রামে ওদের বাড়ী, সেই সুবাদে দীর্ঘ দিনের আলাপ-পরিচয়। কিন্তু কোথা থেকে পথে এসে জুটল ওই সৈরভি, আর—

মেয়েটি আপন-মনে বকতে থাকে—সে আমি আগেই জানি, ওই চোখখাগী সর্বনাশী যেদিকে তাকাবে সেদিক্ ছারখারে যাবে—নিজের সব খেয়ে পেট ভরেনি। এই বলে দিলাম তুমাকে লক্ষ্মণ মিত্যু তুমার উয়ার হাতে—আর যা সব খাবে।

লক্ষ্মণ ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বলে—ভাখ পেঁচোর মা, তোর বড্ড বাড় হয়েছে, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

পেঁচোর মা জ্বলে ওঠে—ওরে আমার কোন্ ইয়ে এয়েছেন উনি, ভাত দেবার কেউ নয়, বলে কিল মারবার গোঁসাই। আর না দেখি কেমন মরদ—মুয়ে নুড়ো জেলে দেবো।

এর মধ্যে আর একটি প্রৌঢ় এসে লক্ষ্মণের কাছে হাত পাতলে। তাকে কোন কথা জিগ্যেস্ না করেই লক্ষ্মণ চারটে পয়সা দিয়ে দিলে! সৈরভি আর তার দিদিমা দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

লক্ষ্মণকে সবাই একটু খাতির করে; কারণ, সে ই সময়ে সবাইকে দেখা-শুনো করে, তা ছাড়া ওঁর হাতে দু'পয়সা আছে, ভিক্ষা ছাড়াও এধার ওধার থেকে কিছু কিছু রোজগার করে সে। তাই প্রয়োজন হলে তার কাছেই হাত পাতে সব আগে।

পেঁচোর মার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকে ঝগড়া করবার ভরসা সৈরভির নেই, কিন্তু লক্ষ্মণের মৃত্যু-কামনার ইঙ্গিতে সে আর স্থির থাকতে পারে না। ঝাঁ করে খানিকটা এগিয়ে এসে পেঁচোর মার মুখের ওপর দু'হাত তুলে একটু ঝুঁকে পড়ে বলে—তো আর জ্বালাবি না? ও যে তোর উবগার করেছে—ফের যদি ওসব কথা কবি ত তুই ছেলের মরা-মুখ দেখবি।

তার পর দ্রুতবেগে সে চলে যায় দিদিমার কাছে—চল্ দিদি, আর দাঁড়াতে হবে না। চল্, চল্।

দিদিমার এখানে দাঁড়িয়ে এই সব দেখতে ভালো লাগে, সে চুপ করে চেয়েই আছে ও-দিকে। যাবার তাগিদ নেই তেমন বুড়ির, পেঁচোর মা এত বড় অভিশাপে প্রথমে একটু দ'মে গিয়েছিল কিন্তু সে মুহূর্তের জন্ত, তার পর আবার গালাগালি দিতে শুরু করল, এবারে কিন্তু সৈরভিকে লক্ষ্য করে—আমার সাতটা আছে না হয় একটা যাবে। পেটের ছেলে—সিঁথেয় সিঁদূর থাকলে ছেলের ভাবনা? কিন্তু তুর জি আর নাগর জুটবে না—তাই বুঝি এত বেজেছে বুকে, ওরে দরদের ওলাউঠো! নিজের সব ভাসিয়ে দিয়ে এখন—

লক্ষ্মণ হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে পেঁচোর মার হাত চেপে ধরে—তুই থামবি কি না—।

রাগে তার হাত-পা কাঁপছে। মুখে ভালো করে কথা সরে না, আটকে যায়—নেঃ যা—। বলে সে বিরক্তিভরে চারটে পয়সা ছুড়ে দিলে মাটীতে। পয়সাটা দেখে পেঁচোর মার চোখ দুটো চক্-চক্ করতে থাকে লোভে, সে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আনিটা তুলে নিলে, তার পর নাকি-সুরে বল্‌লে—আর চারটে দে না লক্ষ্মণ, এতগুলো বাচ্চা-বাচ্চা—

বুড়ি দিদিমা এবারে মুখ ফুটে বলে—আর না বলেও পারিনে, তোর আক্কেলডা কি পেঁচোর মা—যা পেলি তাই নিয়ে খুশি হয়ে বিদেয় হ। বলি ও-শূওরের পালকে পুষতে পারে এমন ক্ষ্যামতা কার আছে বল্—।

লক্ষ্মণের ক্ষ্যামকা এই পয়সা দেওয়াটা বুড়ির ভাল লাগে না, পাছে আরও কিছু দিয়ে ফ্যালে এই আশঙ্কায় সে মরিয়া হয়ে কথাগুলো বলেই ফেল্‌লে। কিন্তু সৈরভি তাতে আরও বিরক্ত হয়—দাঁড়িয়ে কি রং দেখতেছিস, আজ যে দেখি খাওয়া-দাওয়ার গা নেই তোর, হ্যাঁ দিদি। চল্ চল্ আমরা যাই। ভাখ দেখি সবাই চলে গেছে, একলা একলা—রে দাঁড়াবলে আর।

পেঁচোর মা [illegible]

—বাবুদের কল ভাখো একবার, ওমনি খেতে দিচ্ছিল বেশ আবার পয়সা কেন্ রে বাপু। পয়সা নিয়ে দয়া? হুঃ, অমন দয়ার মুখে মুড়ো—

তার পেছনে পাঁচ-সাতটা দশ থেকে তিন বছরের ছেলেমেয়ে চলেছে, ওরা উলঙ্গ এবং যৎপরোনাস্তি নোংরা। এরা সকলেই বাবুদের বিরক্ত করে, কিছু কিছু ভিক্ষা আদায় করে। একটু এগিয়ে এসে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল পেঁচোর মা। বড় ছেলেটা মায়ের রকম-সকম দেখে নিরাশ হল, বুঝতে পারলে যে আজ আর কপালে ভাত জুটবে না। তবু ভয়ে ভয়ে বল্‌লে—ইদিকে কম্‌নে যাবি হ্যাঁ মা। ভাত—

বাধা দিয়ে তার মা বিরক্তিস্বরে বলে, থাম দিকিন্ তুই! ওঃ, আমার নবাব-পুত্তুর রে, ভাত খাবে পয়সা দিয়ে, তুর যে দেখি ভারী তরিবৎ। চল্ উদিকে, টিকুটি নষ্ট করলে বাবুরা আর কোনো দিন দেবে ভেবেছো? তোর বাবার তালুক আছে? পয়সা দিয়ে ভাত খাবে—চ খিচুড়ির লাইনে—

পেঁচোর মা হিসাবী এবং জোগাড়ে—সবার আগে আর এক লঙ্গরখানা থেকে নিজেদের টিকিট সংগ্রহ করে' তবে ভাতের লঙ্গরের খোঁজে এসেছিল। এখন সেখানেই ও ফিরে যাবে—চারটে পয়সা মবলগে লাভ। মনে মনে যোগ দিয়ে দেখলে, তার নিজ তহবিলে মোট জমা এই এক আনা নিয়ে একুনে সাত টাকা সাড়ে ন' আনা, আর দু' টাকা সাড়ে ছ' আনা হলেই দশ টাকা হবে। মোদ্দা দশটা টাকা হলে আর ভাবনা নাই। অবশ্য দশ টাকা হলে যে কি সুবিধা হবে তা' পেঁচোর মায়ের জানা নাই—তবে ওর বিশ্বাস, দশ টাকায় দুঃখ ঘুচে যেতেও পারে।

পরক্ষণে ছেলে-মেয়েদের বল্‌লে, দে তোদের পয়সাগুলো দে—হারিয়ে ফেলবি। কে ক' পয়সা পেয়েছিস্ দে—।

ছেলে-মেয়েরা মায়ের কাছে সব পয়সা দ্যায় না—ওরই মধ্যে দু'-এক পয়সা গোপন করে মেরে দেবার তালে থাকে—সুযোগ-সুবিধা পেলেই বিড়ি কিনে খাবে অথবা মাঠ-কড়াই ভাজা—।

পেঁচোর মা চলে যাবার পর লক্ষ্মণ সৈরভিকে ডাকল, শোন্।

দূর থেকেই সৈরভি বল্‌লে—বল না মোড়ল, কি বলছিস।

—চল্ ভাত খেয়ে আসি।

—না তুমি যাও মোড়ল। আমি খিচুড়ির ওখানে যাই—

—রাখ দেখি তোর দেমাক। আয়,আয়—

—না, না, মোড়ল, সেদিনের সেই পয়সা পাঁচটাই শুধ্‌তে পারলাম না, আর নতুন করে ধার করব না।

লোকে যাই বলুক, সৈরভি সে সব কথায় কান দেয় না। নিজের যা ভাল লাগে তাই করে, কারুর মতামতের অপেক্ষা রাখে না। এক কথায় নির্বিবাদীও বলা চলে তাকে। লক্ষ্মণের সঙ্গে ভাব তার বেশী দিনের নয়, কিন্তু সকলের বিশ্বাস যে, লক্ষ্মণকে সে একটু প্রীতির চোখে ভাখে, এ বিশ্বাস লক্ষ্মণের নিজেরও,তবু সে ভরসা করে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে পারে না। সৈরভি যেন নিজেকে বাঁচিয়ে দূরে দূরে রেখে চলে। তাই আজও সে যখন বল্‌লে—না, তুমি যাও মোড়ল, তখন জোর করে বল্‌তে পারলে না, না তোকে যেতেই হবে।' এই অনুরোধটুকু সে অনায়াসেই করতে পারত কিন্তু সৈরভির কথার মধ্যে না বাজলেও মনকাটা স্পষ্ট। সাধারণতঃ সে 'তুমি' বলেই তাকে লক্ষ্মণকে, কিন্তু যখন 'মোড়ল' বলে এবং 'তুমি' বলে সম্মান দেয় তখন সত্যই লক্ষ্মণ বুঝতে পারে সৈরভির মেজাজ ঠিক নেই। আজও সে বুঝতে ভুল করেনি।

এ-দিকে বিকেল হয়ে গেছে, লক্ষ্মণেরও খিদেয় পেট জ্বলছে, তার ওপর ভাতের আশায় মনটা চঞ্চল, সে আরও বারকয়েক কুণ্ঠিত ভাবে সৈরভিকে ভাত খাবার জন্য অনুরোধ করলে, কিন্তু সৈরভি গেল না দেখে একলাই গেল।

দিদিমাকে সৈরভি বল্‌লে, যা দিদি. তুইও খেয়ে আয়। আমি চল্‌লাম।

দিদিমা গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বলে, ও আমার পোড়া কপাল! তুই খাবিনে আমি খাবো সে কি কথা! ভাখ সরি, আমাকে আর জ্বালাস্‌নি।

যা, যা, গালে হাত দিয়ে ভড়ং করতে হবে না। পরে টিকিট পাবিনে—যা শীগ্‌গির। ব'লে সৈরভি ধমকাইয়া দিল।

সৈরভিকে দিদিমা ভয় করে খুব, বিশেষ করে সে যখন রেগে যায়, তখন দিদিমা আরও বেশি ভয় পায়। বোধ হয় সেই জন্যই আর কথা না বলে দিদিমা চলে গেল।

সবাই চলে গেল কিন্তু সৈরভি সেখানেই চুপ করে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তার আর কিছুই ভালো লাগছে না, ক্ষিদেও যেন মরে গেছে। রাস্তার কলটাতে জল আছে, একবার মনে হল, এক ঢোক খেলে হয়, কিন্তু সেখান থেকে নড়বার শক্তিটুকুও যেন নেই তার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কত কথাই ভাবে।…এই ত এরা কত সহজে তাকে রেখে খেতে পারল; হয়ত কষ্ট হয়েছে যেতে; তবু ত গেল।…আপনার স্বামি-পুত্র না থাকলে কে আর মুখ চেয়ে চলে? দিদিমাই বল আর পিসিমাই বল কেউ কারো নয়—পেটের ছেলের কাছে কেউ লাগে না। এদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে ওই শূয়োরের পাল নিয়ে পেঁচোর মা ঢের বেশি সুখী। যে যাই বলুক এখন, এক কালে বুড়ো বয়সে কন্না করতে ওরাই করবে।…তাই বলে পেঁচোর মার মত একগাদা ছেলেপুলে হওয়া এই ভিখারীর ঘরে ভারি বিশ্রী…কথাটা একবার সৈরভির মনে হয়। আবার মনে হয় বিশ্রীই বা কিসের, মা ষষ্ঠীর কৃপা, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, এ সবই ভগবানের দয়া। সংসারে টাকা-কড়ি খরচ হয়ে যায়, আত্মীয়-বন্ধু অসময়ে দ্যাখে না কিন্তু পেটের ছেলে বেইমানী করে না।…অন্য সময় হলে সৈরভি এসব কথা ভাবতেই পারত না কিন্তু আজ যেন ওই পেঁচোর মাকে সে ঈর্ষা করে। মনে হয়, ওর মত সুখী আর কেউ নেই।…তার নিজেরও সুখের দিন ছিল বই কি, স্বামী পুত্র ঘরবাড়ী সবই ত ছিল। তার নিজের দোষেই কি গেল সব—কপাল ত মানুষের হাতে গড়া নয়!

এই সব ভাবতে ভাবতে সে কখন পথ চলতে শুরু করে দিয়েছে খেয়াল নেই। শিয়ালদহের কাছাকাছি এসে চারি দিকের গোলমালে একটু সচেতন হল। সারাটা পথ ও লক্ষ্মণের কথা ভেবেছে। অদ্ভুত মানুষ। ইচ্ছে করলে অনায়াসে রোজগার করে ভালো ভাবে থাকতে পারে। আজকাল কারখানায় ওর মত মানুষ পেলে লুফে নেবে। হাতের কাজ ও ভালোই জানে, এককালে না কি ও চাকরি করে মাসে ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করেছে, আর আজকালকার

বাজারে ত পথে-ঘাটে পয়সা। সাত আনা মূলধন নিয়ে যদি কন্‌ট্রোলের চিনির লাইনে দাঁড়িয়ে মেয়েরা তিন আনা চার আনা বসে বসে রোজ গেলে কামাতে পারে ত ওর মত মরদ কিছু না হোক মোট বয়েই দুটো টাকা ঘরে আনতে পারে। অবশ্য মোট বইবার কথা ওকে সৈরভি বলছে না। তার চেয়ে কত ভালো কাজও ত রয়েছে। এমন ছোটলোকের মত না ভেসে বেড়িয়ে মানুষের মত থাকতে পারে ও। এর ওর উপকার করা ছাড়া যেন ওর নিজের কোন কাজ নেই।

লক্ষ্মীকান্তপুরের গাড়ীতে সৈরভি এসে চড়ে বসল, বার-কয়েক দারোয়ানের তাড়ায় দৌড়াদৌড়ি করে সে হাঁপিয়ে পড়েছে, সারা দিনমান পেটে কিছু নেই, শরীরটা দুর্ব্বল হয়ে গেছে, মাথাটা কি রকম ভোঁ ভোঁ করছে। বসে থাকতেও যেন কষ্ট হচ্ছে—গাড়ীর মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল. গাড়ী ছাড়তে এখনও অনেক দেরি।

এ রকম মাঝে মাঝে ওর হয়। কিছুতেই মন টেকে না, কাউকে ও সহ্য করতে পারে না; মনে হয় সবাই ওর ওপর অবিচার করছে। তখন সৈরভি একলা বেরিয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে যেখানে সেখানে দু'-এক দিন আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। তার পর আবার এসে জোটে নিজেদের আড্ডায়। যাবার আগে ও বুঝতে পারে, মনে হয় ওর আপনার বলতে এরা কেউ নয়, এরা সবাই স্বার্থপর—নিজেদের স্বার্থকে কেন্দ্র করে এদের দিনরাত্রি চলেছে নিজের গতিপথে। সেখানে সৈরভির স্থান নেই—পৃথিবীর আর কারও আশ্রয় নেই। এই কথাগুলো মনে হলেই নিজেকেও একেবারে অসহায় ভাবে—ইচ্ছে করে, দু'চোখ যেদিকে চায় সেদিকে চলে যেতে। বাধা দেবার যখন নেই কেউ তখন আর কিসের বন্ধন। বেরিয়ে পড়ে।

আজ কিন্তু তা মনে হয়নি। আজকে ওর বিধাতার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিযোগ যেন হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তার সংসারে যা সত্য হতে পারত তাকে মিথ্যা করে দিয়েছেন তিনি, তাই ত সবাই ওকে হেনস্থা করে। পোড়ারমুখী 'রাক্ষুসী' বলে যে তাকে যে যা খুশি বলে অবজ্ঞা করে, তার মূলে রয়েছে বিধাতার নিষ্ঠুরতা। আজকের এ দুর্ভিক্ষ তার গায়ে লাগত না, যদি মনের কথা বলবার সহানুভূতিশীল কেউ থাকত তার। লক্ষ্মণকে সৈরভির ভালো লাগে, মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে সৈরভি মন খুলে কথা বলে—লক্ষ্মণের শরীরে দয়া-মায়া আছে। কিন্তু সব সময় ওকে আপনার ভাবা যায় না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল গাড়ীতে। কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল এক সময়ে। আপিসের কেরাণী বাবুরা গালাগালি করছে,—এই এই মাগী, ওঠ না, আর কন্‌ট্রোলের আড়াই গাড়ীতে ওঠবার উপায় নেই।

সৈরভি উঠে বসল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে এক কোণে সরে গিয়ে একবার ভালো করে চারি দিকে চোখ মিলে চাইতেই ওর নজর পড়ল চাটুয্যেদের মেজ ছেলের দিকে। চাটুয্যেরা ওদের গাঁয়ের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পরিবার, আচার-নিষ্ঠার জন্য ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। অবশ্য এই মেজো বাবুই এক দিন গোপনে সৈরভিকে—সে কথা ভাবতে গেলেও সৈরভির গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সেদিন ও মেজো বাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিল—আপনি ব্রাহ্মণ, আমাকে মহাপাতকী করবেন না। আপনার পায়ে পড়ি দাদাবাবু। তার পর অন্ধকারে পা ছাড়িয়ে নিয়ে মেজদাবাবু কোথায় চলে গেলেন ও লক্ষ্য করেনি সেদিন। কিন্তু তার পর থেকে যত বার তাঁকে দেখেছে ওর ভয়ে যেন সমস্ত শরীরটা এতটুকু হয়ে যায়, অপরিসীম সঙ্কোচে সৈরভির হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যায়। আজ কিন্তু তা হ'ল না, সে ভুলেই গেল সেদিনের সে অন্ধকারের ইতিহাস—আজ মনে হল, মেজ দাদাবাবু তার নিকট আত্মীয়। একবার মনে হ'ল জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছেন। কিন্তু সৈরভি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। পাছে এত লোকের মধ্যে এই ভিখারিণীটির 'দাদাবাবু' সম্বোধনে ভদ্রলোক কুণ্ঠিত হয়, এই ভেবে সে চুপ করে যায়।—বেশিক্ষণ এই ভাবে পরিচিত লোকের কাছে অপরিচিত হয়ে বসে থাকতে ওর ভালো লাগে না। কি ভেবে ও অন্য গাড়ীতে চলে যায়।

চাটুয্যেদের মেজো দাদাবাবুকে দেখে অবধি সৈরভির দেশে যাবার জন্য মন উতলা হয়ে উঠ্‌ল। দেশে তার কেউ নেই—বাড়ি-ঘর বলতে যা ছিল একখানা কুঁড়ে, তাও নেই। স্বামীর ভিটেয়ও তার কোনো অধিকার থাকবার কথা নয়, এমন কি, সেখানে গেলে ওকে ওর দেওররা মারধোর করে। অনেক করে ভেবে তার মনে হয়,—তবু একবার গ্রামে যেতে হবে। মুখুয্যেদের সাদা চকমিলানো বাড়িটা এখনও সেই রকম ধব্‌ধবে আছে কি না, ওদের সেজো গিন্নী মানুষটি ভালো—যেন দেবতার প্রতিমা, সৈরভি বিয়ে পৈতেতে যত বার কাজ করেছে সেজো গিন্নী দু'হাতে দিয়েছেন, অমন মানুষ হয় না। কিন্তু ভগবান কি একেবারে অন্ধ—সংসারে আপনার বলতে সেজো গিন্নীর কেউ নেই, স্বামিপুত্র ছাড়া কি আর কেউ আপনার হয়?

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে, ঘণ্টা পড়ে গেছে। হঠাৎ সৈরভির মনে হয় কোথায় সেজাচ্ছে? দেশে! কেন, কে আছে ওর দেশে? পরক্ষণে ও গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। যাবে না। তার চেয়ে কলকাতা ঢের ভালো যায়গা, এখানে আত্মীয় কেউ তেমন নেই যারা তার দুরবস্থা দেখে মুখে কত দুঃখ করবে আর আশ্রয় চাইলে ঠেলে দেবে। এখানে সবাই অচেনা, অচেনা মানুষের কাছে গালাগাল খেলেও তেমন কষ্ট হয় না, গায়ে লাগে না।

সৈরভি গেট পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখল, ওপাশের বাফ্‌ল্ ওয়ালের ধার ঘেঁসে কতকগুলো দেশী সৈনিক বসে বসে খাবার খাচ্ছে। আপনার অজ্ঞাতেই ও সেদিকে খানিকটা এগিয়ে যায়। ওরা খাচ্ছে রুটি আর মাংস। এক জন খেতে খেতে সৈরভির দিকে চেয়ে ইশারায় ডাকল। সৈরভি মনে মনে চায়, এ সবে আর আজকাল ওর শরীরে অস্বস্তি হয় না, মন সঙ্কুচিত হয় না। ঘৃণায়—ও সবাইকে বেশ ক্ষমা করে অতি সহজে। সৈনিকটির অর্থপূর্ণ চাহনীটা ওর কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে না। ও ভালো করেই জানে এর জন্যে ওই লোকটাকে দোষ দেবার কিছু নেই। আর যারা খাবারের লোভে সহজে ধরা দেয় তাদেরই বা অপরাধ কতটুকু। পেটের জন্য সব কিছুই করতে মানুষ বাধ্য হয়।···কথাটা বারেকের জন্য মনে হ'তেই একটা অপরিসীম গ্লানিতে সৈরভির মন বিষিয়ে যায়—ওর ইচ্ছে করে নিজের কাছ থেকে যদি সম্ভবপর হয় ত কোথাও চলে যায় ও নিজে। এ কথা কেমন করে মনে হ'ল ওর। ভাবতে ভাবতে সৈরভির কান দিয়ে যেন আগুন ছুটতে থাকে—সত্যি সত্যি ও আবার চলতে শুরু করল। আর কোথাও নয় সোজা একেবারে তার আস্তানায়।

কি থেকে কি হয় বলা শক্ত। সেদিন রাত্রে হঠাৎ দলের মধ্যে কুড়ি-বাইশ জন একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এমন অবস্থা হ'ল শেষ পর্য্যন্ত যে গাড়ীবারান্দার তলায় এই দলটি বর্ত্তমানে বসবাস শুরু করেছিল সেই ভদ্রলোক হাসপাতালে খবর দিলেন স্বাস্থ্যহানির ভয়ে। অমনি গাড়ী বোঝাই দিয়ে গাদা করে আশ্রয়হীন রোগীদের নিয়ে গেল। যাদের ওরই মধ্যে একটু নড়াচড়া করবার শক্তি ছিল তারা গা-ঢাকা দিয়ে রইল গাড়ী চলে যাওয়া পর্য্যন্ত—ওরা হাসপাতালের কৃপাকে ঠিক মেনে নিতে পারে না। ওদের বিশ্বাস, ওখানে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না। যদি আসে ত দৈববলে, অর্থাৎ হাসপাতালের সঙ্গে লড়াই করে যে আবার ফিরে আসে বুঝতে হবে ভগবানের সত্যকার স্নেহ আছে তার প্রতি—এই ওদের বিশ্বাস। কাজেই হাসপাতালে যারা যায় তারা সজ্ঞানে যায় না।

যারা গেল তাদের মধ্যে পেঁচোর মাও আছে। আছে তাই কি, ও-রকম ত অনেকেই ছিল যারা মুছে গিয়েছে অস্তিত্বের বালাই থেকে। যারা মরেছে তারা বেঁচেছে—যারা গেল তাদেরও ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেছে। আর যারা রইল তাদের নিয়েই যত সমস্যা।

রাত তখন অনেক—হাসপাতালের গাড়ী এলো। দলের মধ্যে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছে—রাত্রির স্তব্ধতা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। আবছা আলো-আঁধারে কতকগুলো মূর্ত্তি সরে নড়ে বেড়াচ্ছে—মাঝে মাঝে টর্চ্চের আলো জ্বেলে একে একে লাস তোলা হচ্ছে। যারা মরেছে তাদের তলায় একপাশে ঠাসাঠাসি করে চাপিয়ে দিয়ে বাকী অসুস্থদের তোলা হচ্ছে।

—আর আছে কেউ?

—আজ্ঞে এখন আর কেউ ত নয়। বলে লক্ষ্মণ পেঁচোর মার ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে বিরক্তিভরে তাকায়।

গাড়ী চলে যায়—আস্তে আস্তে তার শব্দটুকুও মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। বাকী যারা এখনও এখানে আছে তারা ভাবে—আমার পালা হয়ত এমনি করেই শেষ হয়ে যাবে। আবার মনে হয়—'না, এমন করেই ত টিকে গেছি বুঝি এমন ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকব।' যারা গেল তারা মুছে গেল কিন্তু ভয়াবহ আতঙ্কের রেখাপাত করে গেল—সমস্ত আবহাওয়াটা বিষাক্ত করে দিয়ে গেল। এই গরমেও যেন মাটি খুব কন্‌কনে ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কে এক জন বলে উঠল—কি রে পদ্ম, ফিরেছিস?

পদ্ম ফিরেছে কিন্তু যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করছে; সাড়া দেবার মত অবস্থা তার নেই। তার পাশে যে লোকটি ছিল সেই পদ্মর হয়ে জবাব দিল—ফিরেছে—কিন্তুক—। বলে কথাটা শেষ করতে পারল না, বোধ হয় স্পষ্ট করে সত্যটা বলতে ভরসা হচ্ছে না।

রাত কাটল, আবার সকাল হ'ল। তখনও সবাই ভালো করে জাগেনি, দু'-এক জন এ-পাশ ও-পাশ করে ঘুমে শুচ্ছে, উঠি উঠি ভাব, কিন্তু অকারণ বসে বসে মাটি আগলে পাহারা দেওয়ার চেয়ে শুয়ে সময় কাটানো সোজা। তাই ওঠেনি যারা জেগেছে। কেবল পেঁচোর ছোট বোনটা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। মা-মা বলে সে কেবল চীৎকার করছে—চীৎকার ঠিক নয় গোঙাচ্ছে, চেঁচাবার মত বলিষ্ঠতা তার নেই—সুর করে চিঁ-চিঁ করছে তাই।

সৈরভির দিদি-মা দাব্‌ড়ি দিয়ে ওঠে—থাম, থাম, তোর মা [illegible] [illegible] — [illegible] অনেক কথাই বস্তি আপন [illegible] [illegible]

থাকে। সকালেই এভাবে দিদিমাকে চেঁচাতে দেখে সৈরভি বিরক্ত হয়—তু থাম দিদি, চীচ্‌কার করিস্ না।

—আহা আমি চেঁচাচ্ছি, তোমার ওই পীরিতের পেঁচোর মার আদরের গোধ বায়না ধরেছে।

সকালে উঠে সকলের কাছেই একটা সমস্যা হয়ে উঠলো পেঁচোরা এই দু'টি ছেলে-মেয়ে। অনেকে বললে—তবু যা হোক মা ছিল। কিন্তু এখন?

কেউ বা বল্লে—বাপ ত রয়েছে—একটা খবর দিয়ে দিলে ল্যাঠা যায় চুকে।

বাপ অবশ্য আছে, কিন্তু তাকে খবর দিলে ল্যাঠা চুকবে কি না বলা যায় না। তার তাড়ির আড্ডার আসর ছেড়ে ছেলে-মেয়ে দেখা-শোনা করবার অবসর নাই। এমনিতেই সে বড় একটা স্ত্রী-পুত্রের খবর করে না, তা এখন ত নিজেরই ভাত জোটে না।

—তবু বাপ ত বটে!

সৈরভির দিদিমা বলে—একেবারে শূয়োরের পাল গোদার কাছে জমা দিয়ে আয় না কেউ।

কিন্তু এদিকে আর এক সমস্যা—উক্ত শূয়োরের পাল তাদের বাপকে কোন দিন সু-নজরে দেখে না—শুধু জানে বাপ কেবল মাকে ধরে মারে আর গালাগালি করে—ছেলে-মেয়েগুলোকে কেবল দূর দূর করে। এ তাদের কাছে নতুন নয়।

মায়ের যে কি হয়েছে তা একমাত্র পেঁচো আর তার মেজো বোন বুঁচি বুঝতে পেরেছে—আর যারা তারা ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না তবে এই পর্য্যন্ত ওরা জানে যে, মায়ের একটা কিছু হয়েছে। ছোটটির ধারণা মা তাদের হারিয়ে গেছে।

বেলা এদিকে অনেক গড়িয়ে গেছে। আজ সৈরভির উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও নেই যেন, মাথাটা কি রকম ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সকাল বেলায় ছোলার লাইনে যেতেই হবে, নইলে সেই বেলা তিনটে পর্য্যন্ত আবার উপোস। অবশ শরীরটা টেনে নিয়ে ও গেল ছোলা আনতে—এক জায়গায় ভিজে ছোলা আর গুড় দিচ্ছে ক'দিন থেকে।

বেলা দশটা নাগাদ কোঁচড়ে ছোলা নিয়ে হাঁকাতে হাঁকাতে ও ফিরল। খিদে ছিল খুবই কিন্তু সবগুলো খেলে বোধ হয় শরীর খারাপ হতে পারে এই আশঙ্কায় খেলে না ও। ফিরেই সে খোঁজ করল পেঁচোর। পেঁচোরা নেই কেউ, কোথায় যেন গিয়েছে। সৈরভি রেগে-মেগে ছোলাগুলো ফেলে দিতে যাচ্ছিল। পরক্ষণেই আবার কি মনে হল, রেখে দিল। ভাবলে যদিই কিছু না পায় ওরা, তবে পরে পস্তাতে হবে।

পেঁচোদের একমাত্র আত্মীয় এবং অভিভাবককে লক্ষ্মণ দু'-দুবার খবর দেবার পরও সে এসে হাজির হয়নি—অথচ ছেলে-মেয়েগুলোরও মায়ের কাছে থেকে থেকে এমন বদ অভ্যাস হয়ে গেছে যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না ওরা। অসহায় বোধ করে।

সব চেয়ে বিপদ হয়েছে কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে। মেয়েটা দিন-রাত 'মা-মা' করে সোরগোল তোলে। তবু রক্ষা যে, সৈরভির কাছে থাকলে ও অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। সৈরভিরও এ এক কাজ হয়েছে ভালো। মুখে অবশ্য সে পেঁচোর মাকে গালাগাল করে, মেয়েটাকে অকারণে বকে, পেঁচোকে ধরে মার-ধরও যে করে না এমন

নয়—আবার দেখা-শুনা করা, যাবতীয় তদ্বির তদারক, রাত্রে কাছে নিয়ে শোয়া—সবই সৈরভি করে। ওরই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে মুদির দোকান থেকে দু' পয়সার তেল কিনে এনে ছেলে-মেয়েগুলোকে রাস্তার চাপা কলে স্নান করিয়ে কিছুটা ভদ্র করে তুলেছে। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণের কাছে ওর এই সব সাত-পাঁচ বাবদে দেনা হয়েছে অনেক—তা প্রায় আনা চারেকের ধাক্কা। প্রত্যেক বারই ধার করবার সময় ভাবে—এই শেষ আর নয়, পরের ছেলেমেয়ের জন্তে এত কিসের? কোথা থেকে পেঁচোর মা তার কাল হয়ে এসেছিল।

সে-দিন সকালে কতকটা জোর করেই ও লক্ষ্মণকে আবার পাঠায় পেঁচোর বাপ ছিদামের কাছে। লক্ষ্মণকে ও বললে, হাঁ গো সুমুন্দি, তুই ভেবেছিস্ কি? আমি আর কত দিন এই পাল খেদিয়ে বেড়াবো। বলি একটা বেবস্তা তুমরা করো, আমি ত মানুষ বটি। অর্থাৎ লক্ষ্মণকে আর এক দফা তাড়ির আড্ডায় যেতে হয়। সেখানে যেতে ওর আপত্তি নেই খুব, স্থানটা লোভনীয়ও বটে তবে প্রসাদের বহরটা এত সংক্ষিপ্ত যে তাতে মন ওঠে না। তবুও মন্দের ভালো।

লাভের মধ্যে এই হল যে, লক্ষ্মণ কারণে অকারণে আজকাল ছিদামের ওখানে আসা-যাওয়া করে। সৈরভিও তাতে বেশ খুশি—যাক, তবু ত ছেলে-মেয়েগুলোর হিল্লে লাগবার চেষ্টা চলছে। ওর বিশ্বাস ছিদাম সহজে ছেলে-মেয়ের ঝকি বাড়াতে চাইবে না—এই ক'দিনেই সৈরভি টের পেয়েছে, ছেলেপুলে মানুষ করা কি সোজা কথা? তাছাড়া দ্বিতীয় সংসারের যখন একটি মেয়ে হয়েছে, তখন সেখানে ছুঁচ গলানো কঠিন—পাঁচ-ছ'টা সতীনপুত, [illegible]।

ছোট মেয়েটা এখন আর মায়ের জন্ত বায়না করে না, সৈরভিকে সে পেয়ে বসেছে। এক মাত্র পেঁচো ছাড়া আর সব ক'টিই সৈরভির কথায় ওঠে-বসে। ছায়ার মত ওকে ঘিরে ঘোরে-ফেরে সব ক'টি। শুধু পেঁচো মাঝে মাঝে সটকে পড়ে—অবশ্য রাত্রে আবার ফিরে আসে। খুঁজে বেড়ায়, কোথায় ওর মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই বাড়ীটা।

সে-দিন সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্মণ ফিরতেই সৈরভি তার কাছে এলো—দেখ ত মোড়ল, মেয়েটার গায়ে দাগড়া দাগড়া কি সব যেন বেরিয়েছে। সবাই বলছেছে মায়ের দয়া।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না, সৈরভি এমন ব্যাকুল ভাবে এগিয়ে এল যে, একটা কিছু বলতে না পারলে কেমন কেমন করে হয় লক্ষ্মণের। তাই বললে—আয় দেখি আলো পানে।

ব'লে রাস্তার আলোর কাছাকাছি এলো। একটু দেখে-শুনে ও বললে—না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, রামরাত্তির পোহালে ভালো করে দেখতে হবে।

সৈরভি এ কথায় বিশেষ সান্ত্বনা পায় না, সে কতকটা বিব্রত ভাবে বলে—দেখ দেখি, পরের ছেলেমেয়ে নিয়ে এ আবার এক জ্বালা হয়েছে। যত বলি ভগবান মুক্তি দাও ততই কি!—বলতে বলতে সৈরভির কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে।

গাড়ীবারান্দা থেকে রাস্তার বাতিটা অন্ততঃ একশ' গজ হবে। পথটা বেশ অন্ধকার। চলতে চলতে পথের মাঝখানে হঠাৎ লক্ষ্মণ সৈরভির হাত চেপে ধরে, বলে—সৈরভি তোকে আমার খুব ভালো লাগে।

অভিভূতের মত মিনিটখানেক সৈরভি চুপ করে থাকে, লক্ষ্মণের কথাটা যেন ওর মাথায় যায় না। তার পর সহসা হাতটা টেনে নিয়ে বলে—তুমি নেশা করেছ মোড়ল।

—তা করেছি। তোর কাছে লুকুবো না—যা সত্যি তা বলব, করেছি একটু নেশা। কিন্তুক—

কথাটা শুনে সৈরভি জ্বলে ওঠে। মুখে শুধু বলে—হতভাগার মরণ কি অমনি হয়?

রাত হয়েছে—নিশুতি-রাত। কিন্তু সৈরভির চোখে আজ ঘুম নেই, সে শুধু আকাশ-পাতাল ভাবে। অনেক আশা-কল্পনার ছবি ওর চোখের সামনে এই ক'টা দিনে রচিত হয়েছে। ক'টা দিনে জীবনের প্রতি ওর নতুন করে মায়া গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। আজ সকালেও ওর মনে হয়েছে এই বাচ্চাগুলোকে মানুষ করবার ভার ভগমান যখন ইচ্ছা করেই ওর হাতে তুলে দিয়েছে তখন তাঁর অপমান করতে পারবে না ও কিছুতেই। নাই বা রইল চালচুলো, ঘরে ভাত ত সবার জোটে না।···আবার মনে হয়েছে, লক্ষ্মণ মোড়লের সাহায্য সে ইচ্ছা করলেই পেতে পারে। একবার একটা কথা তার মনে এসেছিল—আরও এদের মানুষ করবার ভার দু'জনে মিলে নিলে কেমন হয়? অর্থাৎ মেয়েছেলে ত আর রোজগার করতে পারে না তাই—। কিন্তু আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্তটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে এ-পাশ ও-পাশ করছিল। এক সময় উঠে বসল, কে এক জন বিড়ি ধরিয়েছে দেখে জিজ্ঞাসা করল—কে গো?

—আমি লক্ষ্মণ।

—ও।

—তা তোমার ঘুম হচ্ছে না নাকি? আমারও সেই অবস্থা।

সৈরভি ভেবেছিল যে লক্ষ্মণের সঙ্গে আর কথা বলবে না। কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে অনেক ভেবে দেখে মনে হয়েছে যে, লক্ষ্মণ এমন কিছু অন্যায় কথা ত বলেনি, ভালো তো অমন অনেকেরই অনেককে লাগে, তা ছাড়া নেশার ঝোঁকে লোকে বেফাঁস কত-কি-ই করে বসে। তবে লক্ষ্মণের অমার্জনীয় অপরাধ এই নেশা করা। পেটে যার ভাত জোটে না সে ওই পচাই গিলে ফূর্তি মেরে বেড়াবে এ কোন দেশী কাণ্ড? মাথা গোঁজবার স্থানটুকু নাই অথচ বাবুয়ানাই? নাঃ, এ একেবারেই অসহ্য। অন্য কেউ হলে সৈরভির কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু লক্ষ্মণকে সে বলতে পারে, একশ' বার যা খুশি তাই বলতে পারে—অন্যায় দেখলে চুপ করে থাকবে কেন? অবিশ্যি এই নেশার মূলে যে ছিদামের আড্ডা তাও সৈরভি অতি সহজেই আন্দাজ করে। নইলে এর আগে ত ওর মুখে মদ্‌গন্ধ আর ও-রকম বেফাঁস কথা কেউ শোনেনি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৈরভি কথা বলল, অবশ্য গাম্ভীর্য বজায় রেখে—তা আজ কি ছিদামকে বলেছিলে ওর ছেলে-মেয়ে নিয়ে যাবার কথা।

—তা তো রোজই বলি।

—সে জানি, সেখানে গিয়ে তাড়ি গিলবে, আর কাজের কথা মনে থাকবে কি করে। আর এ-দিকে যে আমি মাগী হয়রাণ হয়ে যাচ্ছি সে আর কে বুঝবে।

একটু আয়েস করে লক্ষ্মণ বলে—তুইও যেমন, পরের

ভিখিরীদের চ'য়ে খেতে দে। পরের ঝক্কি বিদেয় করে দে না ছাই! বলি যাদের ছেলে তাদের গরজ তাদের গা নেই। খামোকা—

মেজাজটা একে খারাপ ছিল তার উপর এই ধরণের কথা শুনে আরও রাগ হয়, ঝাঁঝালো স্বরে সৈরভি বলে—ফেলে দেওয়া ত সবাই পারে। ওর জন্তে তোমার কাছে বুদ্ধি চাইনি। ভগমান ওপরে আছেন—অন্তরযামিনী সব বোঝেন। বলি পেটের জন্তে পথে বেরিয়েছি বলে কি জাতধর্ম্ম সব খুইয়েছি। তোমার আর কি বলো, তাড়ি গিলে বেহেড্‌ হয়ে মেয়েছেলের কাছে পীরিত চলিয়ে বেড়াবে আর—।

লক্ষ্মণ কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু তার গলা যেন কে চেপে ধরেছে—স্তব্ধ নির্ব্বাক্‌ সে। কথাটা হজম করল। সৈরভির কণ্ঠে যে বিষ ছিল তা অত অল্প কথায় ফুরিয়ে যাবার নয়। কিন্তু লক্ষ্মণকে নিরুত্তর দেখেই বোধ হয় ও সাম্‌লে নিল। কি জানি কেন ও উঠে এসে বসল লক্ষ্মণের পাশে—মোড়ল, সত্যি ছেলেমেয়ে-গুলোর কি হবে? আমার পেটেরও নয় তবু যেন পথে ছেড়ে দিতে কেমন মায়া হয়। যা হোক একটা কিছু করতে হচ্ছে তোমাকে।—আমার একটা কথা রাখ মোড়ল—

বলে অন্ধকারে সৈরভি লক্ষ্মণের হাত চেপে ধরে। এতটুকু ভয় হ'ল না ওর।

লক্ষ্মণ ভারি গলায় জবাব দিল—ওদের বাপ ত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। তাই ভাবছিলাম একটা কথা—কথাটা যেন বল্‌তে ওর ঠিক ভরসা হয় না। সৈরভি যদি সে কথা শুনে বেঁকে বসে তবে খুব বিপদ।

কোনো একটা সমাধানের আভাসেও যেন সৈরভি আশান্বিত হয়ে ওঠে। লক্ষ্মণকে থেমে যেতে দেখে অধীর ভাবে বল্‌লে—কী কথাটা তোর বলেই ফ্যাল্‌ না।

তবু লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ করে, বলে—এই আজ সেই যে চাকুরের কার-খানা আছে সেখানকার এক বাবু আমায় বল্‌ছিল কাজ করার কথা—

সৈরভি উৎসাহভরে বলে—বেশ ত, তা খুব ভালো হয়। আমিও অনেক দিন সে কথা ভেবেছি যে, মোড়ল, তোমার এ-রকম ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়ানো সাজে না—তবে বল্‌তে পারিনি যদি মনে কর-কিছু।

তখনও লক্ষ্মণের মুঠার মধ্যে সৈরভির হাতটা ছিল। লক্ষ্মণ সেটা দৃঢ় ভাবে চেপে ধরে বলল—না সৈরভি, তুমি রাগ করতে পাবে না, আমি একটা কথা বলি, কার জন্তে রোজগার করব মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিন কাটছে, না কাটছেই। দরকার হ'ল মোট বইলাম দু'খেপ, ব্যাস হয়ে গেল। ভালো লাগে না একার জন্তে।

সৈরভি জিজ্ঞাসা করে—তা তুমি কি বল্‌তে চাও।

—আমি চাক্‌রী করতে পারি—যদি তুমি ভিক্ষে করা ছেড়ে দিতে পারো।

—ছেলেগুলোর অবস্থা?

—সেই জন্তেই ত আরো চাকরী নিচ্ছি।

—কত করে রোজ দেবে তারা?

—কাজ দেখে দাম দেবে—ভালো হলে পাঁচ সিকে পর্য্যন্ত দেবে—আর উপর-টাইম হলে দেড়া রোজ।—

—তা তোমার উপর-টাইম করে কাজ নাই। এমনিতে যা হবে তাতে তোমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

—বেশ।

তার পর দু'জনেই চুপ করে গেল—কেউ কোন কথা বলে না।

সহসা সৈরভি বল্‌লে—আচ্ছা মোড়ল, তুমি বিয়ে কর না কেনে। সংসার পেতে সুস্থির হও। এ-রকম ঘুরে বেড়ানো সাজে না—

—বিয়ে? তা করলে মন্দ হয় না। করবি তু আমাকে বিয়ে?—

—ধ্যেৎ। তোর মুখের আক-ঢাক নাই। তাড়ি খেলে মানুষের মতিচ্ছন্ন হয়।

লক্ষ্মণ মরিয়া হয়ে বলে—ক্যানে, আমাকে পছন্দ হয় না?

সৈরভি খুব চটে যায় ওর ওপর, কিন্তু কী বলবে ভেবে পায় না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তার দুর্ব্বল বক্ষ ভেদ করে, স্তব্ধ বাতাসে কী একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয় যেন তাতে। ওদিকে সেবা-সমিতির গাড়ী এসে দাঁড়াল শব তুলে নিয়ে যাবার জন্ত। আজ সৈরভির দিদিমা মারা গিয়েছে। অসুখ এমন কিছুই নয়, দুর্ব্বলতা। দিদিমা মরেছে তার জন্তে ওর কষ্ট হয়েছে—কিন্তু বুড়ো মানুষ 'হা ভাত—হা ভাত' করে যে কষ্টটা পাচ্ছিল তার চেয়ে এ যেন বিধাতা ভালো করেছেন। সৈরভির বুকের ওপর থেকে যেন পাষাণ-ভার নেমে গেছে। আরও কে এক জন মরেছে। মরবে না কেন, আজকাল যেন লঙ্গরখানার খিচুড়িতে চাল মোটে থাকে না, কেবল বাজ্‌রা আর ওই ধরণের জিনিষ, যা সাধারণ মানুষের পেটে সয় না।

সে-দিন সারা-রাত সৈরভি ঘুমোতে পারে না। আনন্দের আতিশয্যে ও যে কী করবে ভেবে পায় না—এ-পাশ ও-পাশ করে, মাঝে মাঝে উঠে এসে লক্ষ্মণের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্য করে লক্ষ্মণ ঘুমোচ্ছে কি না দেখবার জন্ত। ভাবতে ভাবতে অনেক কথা ওর মনে হয়েছে, যা এখনই মোড়লকে না বলে থাকতে পারছে না। লক্ষ্মণ মানুষের মত থাকতে পারবে এ কল্পনা যেন নানা দিকে জাল ছড়িয়েছে ওর মনে।

ভোর হতে না হতে সৈরভি উঠে পড়ে লক্ষ্মণকে ডেকে তুলল। তখনও আর সবাই ঘুমোচ্ছে। চোখ মুছতে মুছতে লক্ষ্মণ বললে—কী, রাত থাকতে ডাকাডাকি কেন?

সৈরভি অনুযোগের সুরে বলল—আত্‌, আবার বসে আছে। ওঠ, ওঠ।

অগত্যা লক্ষ্মণকে উঠে বসতেই হয়। বিড়ি ধরিয়ে বলে ও—আজ যেন শরীলতা কেমন কেমন করছেছে, জয় মা দুগ্‌গা—

তার গতিক দেখে সৈরভি বলে—ভাখ মোড়ল, দলের কেউকে বলিস্‌ না যেনে কাজ পেয়েছিস, যা সব হাউরের বাথান—

লক্ষ্মণ বেঁকে বসে ও বলে,—সৈরভি যদি ওর সংসার দেখা-শুনো না করে তবে ওর কিসের চাক্‌রি—কিসের—উপার্জ্জন চুলোয় যাক্‌ সব। সৈরভি বলে যে সংসার পাতিয়ে ও নিশ্চয় দেবে, ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম মাঝে মাঝে ও গিয়ে নিশ্চয় করে দেবে, তবে ধরা-বাঁধা থাকার মধ্যে সৈরভি নেই। ছেলে-মেয়েগুলার কথা উঠতে লক্ষ্মণ গো পেয়ে বসে, বলে—ওই শুয়োরের পাল আমি চরাতে পারব না তা বলে দিছি।

'—ছি, ছি মা ষষ্ঠী রুষ্ট হন—অমন কথা বলতে নাই মোড়ল।' বলে সৈরভি রুষ্টা দেবীর তুষ্টি সাধনের উদ্দেশে একটি প্রণাম পাঠিয়ে দিল কপালে হাত ঠেকিয়ে।

—তা নয় ত কি, আমি পারব না চাকরী করতে অমন করলে। এমনি পথে ভিক্ষে কুড়িয়ে তোর বেড়াতে ভালো লাগে? তবু আমার উপকারে আসবি না? যা, যা, মুখে আপনার সবাই হয়—

কথাটা সৈরভির প্রাণে বড় বাজল, ম্লান হাসি হেসে ও বললে—চেঁচাস্ না বাপু! আমি যাবো কিন্তু ওই তাড়ি-টাড়ি খেয়ে বাড়ি এসে টানাটানি করবে তুমি, তাতে আমি নাই। যা চোয়াড়ের মত রীত হচ্ছে দিন দিন তাতে ভরসা হয় না।

এতখানি জিভ কেটে লক্ষ্মণ বললে—পাগল হয়েছিস তুই, এই তোর পা ধরে পিতিজ্ঞে করছি, বলে লক্ষ্মণ হাত বাড়ায়—

সৈরভি ব্যস্ত হয়ে অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলে—রঙ্গরস ঢের হয়েছে, এখন কাজে যাবে ত এই বেলা যাও।

ওদিক্ থেকে ছোট মেয়েটা উঠে পাশে কাউকে না পেয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে—ওমা-আ-আ, মা-গো।

সৈরভি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

সে-দিনটা সৈরভির সুধু দিবাস্বপ্নে কাটল। কত কি আবল-তাবল যে ও ভাবছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সকালে সবাই যখন ছোলা-আমবার জন্ত চলে গেল তখন ও রইল বসে। পেঁচো আর তার ভাই-বোনেরা আপন অভ্যাসে চলে গিয়েছে—কিন্তু সৈরভি গেল না আজ ভালো লাগছে না কোনো কাজ, শুধু চুপ করে উঠন্ত রৌদ্রের পানে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে মনে মনে ভাবা।···মাস গেলে ফেলে-ডেলে চল্লিশ টাকা আয়, তিন-চার টাকায় ঢাকুরে অঞ্চলে একখানা খোলার ঘর পাওয়া যাবে। খাওয়া-দাওয়াতে আর কতই বা যাবে—মাসে সংসার থেকে বাঁচিয়ে অন্ততঃ দশ-বারো টাকা সৈরভি সঞ্চয় করে রাখবে। তার পর এক দিন ঘরকন্না পেতে দিয়ে ও আবার পথেই বেরিয়ে পড়বে। অবশ্য প্রথম মাস-দুয়েক পয়সা-কড়ি বিশেষ কিছু জমবে না, বাসনপত্র কেনা-কাটা আছে ত, একেবারে নতুন পত্তন—সবই চাই। মোটামুটি রান্না নয় মাটির হাঁড়িতে চলে, কিন্তু এটা-ওটা ভাজাটা আসটার জন্তে কড়াই দরকার, তার পরে গিয়ে থালা অন্ততঃ একখানা চাই। হাতা-বেড়ি অবশ্য না হলেও চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মাটির ভাঁড়ে মোড়লকে জল দিতে সে পারবে না। বেচারি সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও যদি মাটির ভাঁড়ে ছাড়া জল খেতে না পায় তবে কি সংসার হল! এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। বাচ্ছা মেয়েটা খিদের জ্বালায় ছটফট করছে, ওর খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এখনও ত হরিচরণ এলো না। হরিচরণ হচ্চে একটি মেয়ে, একটু পুরুষের মত তার কথাবার্ত্তা বলে তাকে সবাই হরিচরণ বলে। হরিচরণ মেয়েটা ভালো, সে এক ভাঁড় দুধ নিয়ে আসে বাচ্ছা মেয়েটার জন্ত। হোক না সে স্বার্থপর, আর সকলের মত তা বলে স্বার্থসর্ব্বস্ব নয়। হরিচরণ দুধ খাইয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ঘণ্টা-তিনেক ঘুরে আসে। তাতেই ওর অনেক পয়সা হয়।

আজ সৈরভি একটু দুশ্চিন্তায় পড়েছে। হয় ত আর মেয়েটা [illegible] না। কাল না কি ভয়ানক বিপদে পড়েছিল। কোন্ এক বাবুর কাছে পয়সা চাইতে না কি বাবুটি চটে গিয়ে বলে—এ মেয়ে কার? কোথায় পেলি—

কথাটা ভালো করে বুঝতে না পেরেই হোক অথবা ভয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে গিয়েই হোক, হরিচরণ ফট্ করে বলে ফেলেছে আমার মেয়ে।

একেবারে হাতে হাতে মিথ্যা ধরা পড়ে যাওয়ায় সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে, বাবুটি একটা পায়ের গুঁতো দিয়ে বলে—ভাগ্।

কাল হরিচরণ মোটেই জুত করতে পারেনি। এদিকে না কি ওর বিশেষ লাভ থাকে না দুধ কিনে খাইয়ে। আজ যে কি হবে বলা শক্ত! কিন্তু কি উপায়,—ভাবতে ভাবতে সৈরভি মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সে অনেক কথা। হাত পাতলেই কিছু পয়সা মেলে না—কথা শুনতে হয়, সহ্য করতে হয়।

কেউ বলে—কোলে ত দেখছি একটি নিয়ে বেরিয়েছ। এদিকে ত খেতে পাও না বলে—বলি ওর বাপ কোথায়?

—আজ্ঞে মারা গিয়েছে।

—আহা বেঁচেছে। তা তোমরা মরতে পারোনি?

—ভগমান নিচ্ছে না বাবু।

—এত মোটর, মিলিটারী লরী থাকতে মরার ভাবনা, যাও না গলা পেতে শোও গে। হুঃ।

—বাবু, আজকের মত দান। বাচ্চাটা দুধ অভাবে মরে যাবে। সৈরভি হাত পেতে বলে, কথা সওয়া ওদের অভ্যাস।

লোকটি একটা দু'আনি দিয়ে বলে—মরতে পারো না? যত সব কুকুরের দল, সহরের পথে পথে মিঠাই-খাবারের দোকানের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া কর আর কেড়ে খেতে পারো না! জানোয়ার, জানোয়ার—যাঃ, দূর হ, পারিস্ ত ধুতুরোর বীজ খেয়ে মর। কেবল কান্না আর কান্না!

অন্ত দিন হ'লে সৈরভির কথাগুলো মনে রেখাপাত করত না, আজ যেন ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। কি জন্ত এ কথা সইবে ও। অন্ত সময়ে ও ভাবতে পারত, এত কথা, সত্ত্বেও যারা ভিক্ষা দেয় তাদের মনে দয়া আছে। এই বোধটাই যে ভিক্ষাজীবীদের কাছে একমাত্র সান্ত্বনা, ভরসা এবং আশ্রয়। কিন্তু সৈরভি বিরক্ত হয়। আর দরকার কি, ঢের হয়ে যাবে যথেষ্ট এই পয়সাতে।

চলতে চলতে ও একটা পানের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। দোকানটা খুব বড় দরের পান-সিগারেটের দোকান, ঝকঝকে ঘটিগুলো সাজানো আছে কি সুন্দর। ওকে অমন ভাবে দাঁড়াতে দেখে দোকানী দাঁত খিঁচিয়ে বলে—যা, যা হাট্ যা—

সৈরভি চেয়েছিল বড় আয়নাটার দিকে, ভাবছিল না খেয়ে না দেয়ে রূপের ছিরি একেবারে গিয়েছে। মাথায় নেই তেল, এক-মাথা চুল জাল-গোল পাকিয়ে—সৈরভি নিজের মুখ নিজেই চিনতে পারছে না। তবু হাঁ করে চেয়ে আছে ও আয়নার দিকে। একবার মনে হল, আবার তেল-জল পড়লে হয়ত চেহারাটা খুব খারাপ দাঁড়াবে না। কে জানে কি রকম হবে।

[illegible] দোকানে এসে দাঁড়াতেই আর এক দফা আক্রমণ। সৈরভি তখন বললে—বাবু, পয়সা দিচ্ছি দাও না, দু'আনার দুধ।

—ওঃ, ভারি আমার পয়সাওয়ালী রে। আগে পয়সা দে তার পর, তোদের কথাও যা গোরুর গোবরও তাই। দুধ খাবে—

পয়সা দু'আনা অগত্যা সৈরভি বার করে দিলে। দোকানী একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে আর এক জনকে উদ্দেশ্য করে বলে—উঃ, দেখেচো যদুনন্দন, আজকাল লড়াইয়ের বাজারে সব বেটাই কামাচ্ছে, এদেরও দু'আনা রেট হয়েছে।

কথাটা সৈরভি বোঝে, তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত রাগে ঘৃণায় জ্বলে যায়, বেশি কিছু বলতে ভরসা হয় না, তবু ও বলে—তোমাকে পয়সা দিয়েছি দুধ দাও বাবা চলে যাই, ও সব কথায় কাজ কি?

দোকানদার সদুপদেশ দেবেই, হেসে সে বলে—ও কুকুরছানার মায়া কেন, ও ত অনেক পাবি। এখন দুধটুকু নিজে খেয়ে একটু তাগদ করে নে বাবা। আখের দেখবে।

সারাটা দিন ওর কোনো রকমে কেটে গেল। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, আনন্দ, আশা সবটা জড়িয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে। আজ লঙ্গরখানায় যাবার অবসর ছিল না, সকালে পেঁচোরা যে ছোলা এনেছে তারই দু'মুঠো মুখে দিয়ে জল খেয়েছে সৈরভি। আর ভালো লাগে না ছোটলোকদের গালাগালি সহ্য ক'রে পেট ভরানো। কি হবে এক দিন না খেয়ে থাকলে!

থেকে থেকে ওর মনে পড়ে যাচ্ছে নিজের চেহারার ছবিটা। একটা কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নয়। একবার মনে হ'ল, লক্ষ্মণ কেন ওকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা করছে! কি আছে ওর? পুরুষ মানুষ হয়ে লক্ষ্মণ কি সত্যিই উদার হতে পেরেছে? কোনো পুরুষের পক্ষে যা অসম্ভব তা ও পারলে কি করে? তা না হলে—হয় সৈরভির রূপের শিখা কিছুমাত্র আছে, অথবা লক্ষ্মণ অন্ধ, ওর দেখবার চোখ নেই। ওর ভয় হয়, শেষে কোনো দিন লক্ষ্মণ না অবজ্ঞা করতে সুরু করে। কিছুই ত বলা যায় না—সত্যটা এক দিন সপ্রকাশ হতে বাধ্য, কারণ সেটা যে সত্য!

পথে যাদের বাস—রাজপথ যাদের দেশ—পথেই তাদের শেষ। পাকা দালানে তাদের জীবন বাঁচে না, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলে তারা হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে।

সৈরভি তাড়াতাড়ি ফিরল আড্ডায়। তখন কেউ সেখানে নেই—কেবলমাত্র যে মেয়েটির অসুখ করেছে সেই পড়ে আছে। সৈরভিকে অসময়ে দেখে মেয়েটা অবাক্ হয়ে গেল, বললে, একটু জল দাও না।

তার পর একটু সামলে নিয়ে বললে—কই, খেতে গেলা না? শরীল বুঝি ভালো নাই?

শরীর-খারাপের কথাটা সৈরভি কিছুতেই সইতে পারে না, বলে—না, আমার ক্যানে শরীল খারাপ হবে। গেলাম না এমনিই—

—তোমার সেই হরিচরণ এয়েছ্যালো।

—'ওঃ' বলে সৈরভি সেখান থেকে সরে যায়। অযথা আজ কথা কইতেও ভাল লাগছে না যেন।

বেলা গেলে লক্ষ্মণ ফিরল। সে যেন হাঁপাচ্ছে। গম্ভীর ভাবে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের একখানা টিকিট সৈরভির হাতে দিল। সৈরভি বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা, হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আজ যেন লক্ষ্মণকে ওর প্রণাম করতে লোভ হয়। নীরবে শুধু চোখের চাহনিতে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল, সৈরভির চেহারার তার সবটুকুই বোধ হয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি।—নারীর চিরন্তন পূজা পুরুষের শক্তির কাছে।

লক্ষ্মণ তেরো আনা পয়সা সৈরভির হাতে দিয়ে বললে—রাখ্।

সৈরভি আর কৌতূহল চেপে থাকতে না পেয়ে প্রশ্ন করলে—ও কাগজটা কিসের মোড়ল?

—ট্রামের টিকিট—সে কি এতটুক পথ? অবিশ্যি আমাদের ঢাকুরে থাকলে ওই বাজে খরচটা আর হবে না। আমি সে সব ঠিক করেই ফেলেছি এক রকম। রবিবারটা হাতে পেলেই, ব্যাস্। আজকের রোজ এই চোদ্দ আনা।

—তা তুমি খাওনি কিছু?

—না, খিদে ছিল না। আর বড্ড মাগ্‌গি সব।

—তাই বলে উপোস করে মরবে না কি? রোসো আমি দেখ্‌ছি—

—না সৈরভি, পাগলামী কোরো না, আজে বাজে-খরচ—

সৈরভি কথাটা শুনে জ্বলে যায়, ঝাঁঝালো সুরে বলে—আজে বাজেই বটে, এ পয়সা কি আমার ছরাদের জন্যে তোলা থাকবে? বল্‌তে বল্‌তে ওর চোখ ছলছল্ করে ওঠে। লক্ষ্মণ আর কিছু বলে না, ওর যেন এক দিনের খাটুনিতেই অনাহারক্লিষ্ট দেহটা দুমড়ে গিয়েছে।

সৈরভি গজ্-গজ্ করতে করতে খাবারের যোগাড় করতে গেল। কাছেই দোকান আছে বটে, কিন্তু সে ভদ্রলোকদের খাবারের দোকান—তার ধারে ঘেঁসবার সাধ্য কি।

আজ সৈরভির সত্যিই খুব আনন্দ হয়েছে। লক্ষ্মণের রোজ-গারের পয়সা!—কারুর কাছে ধার করা নয়, কেউ দয়া করেও দেয়নি—এ একেবারে দস্তুরমত নিজস্ব, সম্পূর্ণ আপনার। সে একবার পয়সাগুলো গালের উপর রেখে অনুভব করে কি রকম ঠাণ্ডা, আবার হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে, আঁচলে বেঁধে আবার পরক্ষণে খুলে গুণে নেয়, ঠিক আছে ত? আনন্দে ও কি যে করবে ভেবে পায় না। সামনের একটা বড় দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একবার জিজ্ঞেস্ করে—'হাঁ বাবু, বাজল কটা?' সময়টা জানা যেন ওর একান্ত প্রয়োজন এমনি ভাব। বড় খাবারের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল, কত রকমের সব খাবার সাজানো। দোকানীকে বললে—বাবাঠাকুর, ওই যে লাল লাল সন্দেশ ওর দাম কত?

দোকানী বললে—একটা দু' আনা।

মনে মনে বললে—'বাপ রে!' মুখে শুধু—'ওঃ' বলেই থেমে গেল, অর্থাৎ ইচ্ছে করলেই যেন ও এখনই কিনে ফেলতে পারে। অবশেষে রাঙা আলু সেদ্ধ আর চাপাটি কিনে নিয়ে সৈরভি ফিরল, বেশি খরচ করতে ভরসা হ'ল না, আবার যদি বকুনি খায়। তাছাড়া ও-সব সখের মিষ্টি-সন্দেশে ত আর পেট ভরে না, কেবল পয়সার শ্রাদ্ধ, নৈলে সৈরভি খুবই কিনতে পারত। বকুনির ভয় আবার একটা কথা না কি।

সকলরবে ও যখন লক্ষ্মণের কাছে হাজির হয়েছে, তখন লক্ষ্মণ ধুঁকছে। উদ্বিগ্ন ভাবে সৈরভি বলে—কি হল আবার?

—'শরীলডা কেমন আনচান করতেচে।' কথা কইতেও লক্ষ্মণের রীতিমত কষ্ট হচ্ছে।

—আমি তখনই জানি। সারা দিন ভূতের খাটুনী খাটবে উপোস করে—বলি মানুষের শরীল ত! ও কিছু না, এগুলো খেয়ে নাও দিকিন, দেখবে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

লক্ষ্মণ খেলো এবং তার অনুরোধে পড়ে সৈরভিও।

জ্ঞান ছিল না কারুর—না লক্ষ্মণের, না সৈরভির। হৃৎস্পন্দনেরও কোনো সাড়া বিশেষ ছিল কি না কেউ তা বলতে পারবে না। সেই খাওয়াই ওদের ইহজীবনের জঠরানলের দাবী মিটিয়ে দিল। রান্না আলুর অদ্ভুত শক্তি। গভীর রাত্রে সৎকার-সমিতি সেবা-কার্য্যের জন্য শব সংগ্রহ করে নিয়ে গেল শ্মশানে—সেই সঙ্গে ওরাও গেল। সমিতির এক জন কর্মী একটা বিড়ি ধরিয়ে গোটা কয়েক টান দিয়ে আর এক জনকে বললে—মড়ার গাদার মধ্যে থেকে যেন কি রকম একটা গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে।

আর এক জন হেঁকে বললে—তোর হয়ে গিয়েছে। বরাবর বলে আসছি, ভীতুটাকে বাদ দিই, তা নয়—

কিন্তু সত্যি-সত্যিই গোঙানীর অস্ফুট আর্ত্তনাদ ভেসে আসছিল। কিন্তু মোটরের চাকার শব্দে সেটা যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

আবার এক জায়গায় গাড়ী থামল। এখানে অনেক ক'টি শবদেহ পড়ে আছে। কর্মীরা গাড়ি থেকে নেমে যখন মড়া তুলে গাড়িতে বোঝাই করছিল, তখন হঠাৎ যেন আর্ত্তনাদটা বেড়ে গেল—স্পষ্ট মানুষের কণ্ঠস্বর—উঃ, লাগছে লাগছে—সরে শোও না। ও মোড়ল!

টর্চ ফেলে দেখা গেল, একটি মৃতপ্রায় দেহ থেকে সেই আর্ত্তনাদ উঠছে। মুখে আলো পড়তে কঙ্কালসার শীর্ণ হাতখানা দিয়ে আড়াল করল, হাতটা নোংরা।

এক জন বললে—জ্যান্ত রে।

আর এক জন জবাব দেয়—নেঃ, ও যেতে-যেতেই কাবার হবে। দেখছিস না চেহারা, তার ওপর কলেরা। আবার মোটর ছেড়ে দিল। গাড়ির চাকার শব্দ যেন ধরিত্রীর আর্ত্তনাদকে ভেঙ্গে-চুরে আপনার যাত্রাপথে অপ্রতিহত গতিতে চলেছে এগিয়ে।

জন্মাষ্টমী

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ জন্মাষ্টমী। তাই হিন্দুভারতে আজ ঘরে ঘরে জন্মাষ্টমীর উৎসব। কেন এ উৎসব? কিসের এ উৎসব? আর আজিকার এই অষ্টমীর নাম 'জন্মাষ্টমী'ই বা হইল কেন? অষ্টমী ত সারা বছরের মধ্যে আরও অনেক আসে। কিন্তু আর কোন অষ্টমীরই এমন বিশেষ ভাবে নামকরণ হয় না; আজিকার অষ্টমীই বা 'জন্মাষ্টমী' হইল কেন?

তার কারণ যা সাধারণতঃ হয় না—একমাত্র আজিকার এই অষ্টমী—এই ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ছাড়া আর কোন দিনই যাহা হয় নাই—তাহাই আজ হইয়াছিল। চারি হাজার বৎসরেরও বেশী দিন পূর্ব্বে আজিকার এই দিনে ভগবান্ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া ভারতের হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ভারতের হিন্দু সেই সুদূর অতীত দিনের মহনীয় পূত স্মৃতির ধ্যানে আত্মসমাহিত হইয়া এই পরম গৌরবময় মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

এমন কি কখনও হয়? এমন কি আর কখনও হইয়াছে? অথবা এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে? স্বয়ং ভগবান্ যে 'মানুষ' হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, এ কথা একমাত্র হিন্দুভারত ছাড়া জগতের আর কেহই বিশ্বাস করে না কিন্তু ভারতের হিন্দু এই কথা একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করে। সে নিশ্চিতরূপে জানে যে, তাহার ঘরে সত্য সত্যই এক দিন ভগবান্ স্বয়ং আসিয়াছিলেন এবং সেই দিনের সেই আসাটুকুই তাঁহার শেষ আসা নহে। তিনি আবার আসিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে আবারও তিনি অবশ্যই আসিবেন। তিনি আসিয়া এই আশ্বাসও ভারতবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের সেই মহতী সান্ত্বনা-বাণী জপমালা করিয়াই হিন্দুভারত বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু জগতের কোন দেশে তিনি স্বয়ং আসেন নাই,—তিনি যে স্বয়ং আসিতে পারেন, এত বড় কথাটা সাহস করিয়া বলিতেও আর কোন জাতি পারেন নাই। কোন দেশে কোন জাতির মাঝে ভগবান্ নিজের পুত্রকে পাঠাইয়াছেন, কোথাও বা দূত পাঠাইয়াছেন, কোন-খানে বা ভগবান্ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তি-সাহস প্রভৃতি আত্মসম্পত্তি দিয়া তাঁহার শক্তিতে খানিকটা শক্তিমান্ করিয়া এক জন মহাপুরুষকে পাঠাইয়াছেন। ইত্যাদি' এর বেশী আর কিছু নহে। স্বয়ং ভগবানকে আসিতে দেখা আর কোন দেশের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাই এ কথা সাহস করিয়া বলিতেও অন্য কোন জাতি পারে নাই। একমাত্র হিন্দুভারতই তাঁহার আসার কথা জানে, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াছে, তাঁহাকে একান্ত 'আপনার জন' জানিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ঘর সংসার করিয়াছে এবং তিনি যে প্রয়োজন মত আবারও আসিবেন—দৃঢ় ভাবে এ কথা বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছে। তাই হিন্দুভারত তাঁর এই জন্মদিনের উৎসব-অনুষ্ঠান যুগ যুগ ধরিয়া এমনই ভাবে করিয়া আসিতেছে।

ভগবান্ যে স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাতলে আসিতে পারেন, এ কথা জগতের অন্য কোন জাতি বিশ্বাস করিতেই পারে না। কাজেই ইহা স্বীকার করিতেও চায় না। ইহা যে কেমন করিয়া সম্ভব হয় তাহা একমাত্র ভারতবাসী-ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আর কেহ নয়। ভারতের সাধনাক্ষেত্রে শ্রীভগবানের অবতারত্ব নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র হিন্দুভারতের সাধক সুকঠোর সাধনায় আত্মসমাহিত হইয়া এই সু-মহান্ আবিষ্কার করিয়াছে; অন্তরে একান্ত ভাবে ইহা উপলব্ধি করিয়াছে এবং ভগবানকে আপনার মাঝে পাইয়া, ভগবানকে নিজের মনের মত করিয়া লইয়া ভগবানের সঙ্গে ঘরসংসার করিয়া আপনার জন্মজীবন সার্থক করিতে পারিয়াছে।

আজ সেই দিন। যেদিন পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নরাকারে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের আরও পরিচয় আছে। হিন্দুর শাস্ত্রে দশাবতারের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে এই দশাবতারের মধ্যে ধরা হয় নাই। তিনি দশাবতারের মধ্যের কেহ নহেন; যেহেতু দশাবতার ভগবানের অংশাবতার মাত্র, আর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণস্বরূপ। তিনি মানুষরূপে ধরাতলে আসিয়া যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভক্তগণের নিকট তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপেই সম্পূজিত হইয়া থাকেন। আজ সেই মহাপুরুষ—শুধু মহাপুরুষরূপেই যা বলি কেন—পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানের জন্মদিন।

তাই এ দিনের কথা ভুলিতে নাই। হিন্দুভারত তাহা কোন দিন ভুলিতে পারে না। তাই আজিকার এই শুভ দিনে সেই অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া তার বর্ত্তমান দুঃখময় জীবনে সান্ত্বনা আনিতে চায়—তার তাপতপ্ত মনঃপ্রাণ শীতল করিতে চায়।

জগতে আর কোন দেশে যাহা কোনদিন হয় নাই অথবা যাহা কোন দিন হইবে বলিয়াও কোন জাতি বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাই একদিন এই ভারতে হইয়াছিল এবং আবারও হইবে বলিয়া ভারতবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে মানুষরূপে এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিতে ভারতবাসী দেখিয়াছে এবং আবারও তিনি প্রয়োজনমত আসিতে পারেন, এ কথাও ভারতবাসী বিশ্বাস করিয়া থাকে।

কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? ব্রহ্মসনাতন কেমন করিয়া 'মানুষ' হইতে পারেন? যিনি বাক্যমনের অতীত তাঁহাকে মানুষ আপনার মাঝে পাইতে পারে কিরূপে? ইহা কি সম্ভব? বলিতেছি ত ভারতীয় সাধকের সাধনার ফলে এই অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারিয়াছে। হিন্দুরই বেদ উপনিষৎ তাঁহাকে বাক্যমনের অতীত ব্রহ্মসমাতন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তবে আবার হিন্দুভারতের সাধক কেমন করিয়া তাঁহাকে আপনার মাঝে পাইবে? 'আপনার' করিয়া লইবে? বেদ বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম অবাঙ্ মনসগোচর। নেতি নেতি সিদ্ধ। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি অজ্ঞেয়, অক্ষয়, অনন্ত সত্তা মাত্র, যিনি নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ পরব্রহ্ম—এমন যে ভগবান্—তাঁহাকে পাওয়া ত দূরের কথা, মানুষ বুঝি তাঁহাকে ধারণাই করিতে পারে না। অথচ মানুষ চায়, তাঁহাকে জানিতে—তাঁহাকে পাইতে। কিন্তু এই জানা—এই পাওয়া মানুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? হিন্দুর শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। সাধকের হিতের জন্য ইহপরকালের মঙ্গল সাধন জন্য ব্রহ্মসনাতনের নানা রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। তাই বলিয়া শ্রীভগবানের এই রূপকল্পনা একটা খেয়ালের বশে হয় নয়। মানুষের হৃদ্গত এক একটি আসক্তি এবং সেই আসক্তিজনিত প্রবৃত্তির বিকাশ-বিলাস মতই মূর্ত্তি স্বয়ং আত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে।

বাক্যমনের অতীত নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মসনাতনকে লইয়া মানুষ ত নিত্য ঘরকন্না করিতে পারে না; অথচ মানুষ চায় শ্রীভগবানের সান্নিধ্য। তাই মানুষ সাধনার দ্বারা তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছে। তিনি মনের অতীত হইলেও সাধকের মনে তাঁহাকে মনোময় হইয়া পড়িতে হয়। যে সাধক যে ভাবে তাঁহাকে পাইতে চায়, সেই সাধকের মনে সেই ভাবেই তাঁহাকে ধরা দিতে হয়। কেহ মাতৃভাবে চায়, কেহ পিতৃরূপে চায়, কেহ সখা ভাবে, কেহ কন্যারূপে, কেহ পুত্ররূপে, কেহ বা কান্ত ভাবে তাঁহাকে পাইতে চায়। তিনিও সেই সেই রূপে রসে ভাবে সাধকের কাছে ধরা দিয়া থাকেন। যিনি পরব্রহ্ম নির্ব্বিকার,—সাধকের কাছে তিনি অনন্ত লীলার আধার। যিনি নিরাকার,—তিনি অফুরন্ত রূপের খনি। যিনি অজ্ঞেয় অচিন্ত্য অপূর্ব্ব অনন্ত—সাধকের কাছে তিনি রূপময়, রসময়, প্রেমময়, দয়াময় যাহা বলিবে তাই। এক কথায় তিনি সাধকের মনোময়।

তাই "সাধকানাং হিতার্থায়" ব্রহ্মসনাতনকে অবতার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মানুষরূপে ধরাতলে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নররূপে এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণব্রহ্ম। কিন্তু ভারতের সাধক তাঁহাকে ব্রহ্মসনাতনরূপে দেখিতে চায় নাই;—চাহিয়াছিল নররূপী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে। ব্রহ্মসনাতনকে লইয়া ঘরসংসার হয় না। নিজের ঘরের লোক, একমাত্র প্রিয়তম বন্ধুজ্ঞানে ভালবাসা হয় না। ভারতের সাধক যে চাহিয়াছিল ভগবানকে একান্তভাবে আপনার করিয়া পাইতে। তাই ব্রহ্মসনাতনকেও সাধকের হিতের জন্য তার ইহপরকালের মঙ্গলসাধনের জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যধামে আসিতে হইয়াছিল, মানুষ হইয়া মানুষের মধ্যে মিশিতে হইয়াছিল, মানুষেরই মত সুখ-দুঃখের অধীন হইতে হইয়াছিল, কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া কত শত মানব-কর্ত্তব্য পালন করিতে হইয়াছিল। ধরায় অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে হইয়াছিল। এমনই কত কি!

শ্রীকৃষ্ণরূপী ব্রহ্মসনাতন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সমস্ত করিয়াছিলেন। তিনি নররূপে আবির্ভূত হইয়া মানুষের সম্মুখে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, মানবীয় জীবনাদর্শের তাহাই চরম ও পরম পরিণতি। তার চেয়ে মানব জীবনের মহত্তম আদর্শ আর কিছু হইতে পারে না। মানব জীবনের চরমাদর্শ প্রদর্শন করাই হইল ভগবানের অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। অংশাবতার তিনি নহেন। কাজেই তাঁহার যাহা কিছু লীলা সমস্তই পূর্ণতার পরিচয় দিয়াছে। আংশিকতা কোনটাতেই নাই। রসে, ভাবে, কর্ম্মে, কর্ত্তব্য পালনে, ধর্ম্মসংস্থাপনে, স্নেহে, প্রেমে, বীরত্বে সকল দিক্ দিয়াই শ্রীকৃষ্ণলীলা পূর্ণতারই চরমাদর্শ। তিনি আদর্শ প্রেমিক, তিনি আদর্শ জ্ঞানী, তিনি আদর্শ কর্ম্মী, তিনি আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ সখা। সকল দিক্ দিয়াই তিনি মানব জীবনের চরমাদর্শ।

আজ সেই আদর্শ মানবের আবির্ভাব তিথি। পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের ধরাতলে অবতার গ্রহণ। এই ভারতেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। এই ভারতবর্ষের হিন্দুর ঘরে একদিন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ সেই দিন। কাজেই এ দিনের কথা কি হিন্দু কোন দিন ভুলিতে পারে? আজিকার এই দিন যে ভারতীয় হিন্দুর চিরজীবনের মহামুহূর্ত্ত বিকাশ।

কেমন এ দিন? ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর তমিস্রাময়ী নিশীথিনী। ঘন ঘোরা গর্জ্জনমুখরা গগনতল; পলকে পলকে বিদ্যুল্লতার বিকট হাসি, আর অবিশ্রান্ত আকাশপথে ছুটাছুটি। মেঘমালার বিরামবিহীন অশ্রুবিসর্জ্জন। উপরে যেন এই সব বিপরীত শক্তির এক অপূর্ব্ব বিপরীত বিকাশ! নিম্নেও আবার তাই। নিপীড়িতা ধরিত্রী যেন ব্যথাকাতর অন্তরে অসাড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কালসহোদরা কালিন্দী শ্রীবৃন্দাবনের পাদমূলে থাকিয়া কলকল নাদে উচ্চ রোলে গান ধরিয়াছে—উচ্ছল তরঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছে। কি যেন এক গৌরবগর্ব্বে স্ফীতকলেবরা হইয়া আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেছে। এখানেও এই বিপরীত শক্তির বিপরীত বিকাশ। আনন্দে-নিরানন্দে, সুখে-দুঃখে, কঠোরে-কোমলে, আলোকে-অন্ধকারে বিপরীত শক্তির বিপরীত বিধানের মধ্য দিয়া জন্মাষ্টমীর উদ্ভব। শ্রীভগবানের ধরাতলে অবতার গ্রহণ। ভারতীয় হিন্দুর ঘরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মপরিগ্রহ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের এই প্রভাব তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। যিনি বৃন্দাবনে নন্দদুলাল সাজিয়া ব্রজ রাখালের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ সে সাধের খেলা ভাঙ্গিয়া দিয়া ছুটিতে হইল তাঁহাকে মথুরায়। কংস-চাণূর-মুষ্টিকাদির বধসাধন জন্ত। যিনি "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বলিয়া ব্রজগোপীগণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, সেই তিনি যখন কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে মাতাপিতাকে মুক্ত করিবার জন্ত মথুরার কংস-কারাগারে ছুটিলেন, তখন হায় কোথায় থাকিল তাঁর এত সাধের ব্রজগোপী! প্রাণ কি কাঁদে নাই? কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বান যে বড় কঠোর? যিনি দ্বারকার রাজাসনে বসিয়া আদর্শ নৃপতির রাজ্য-শাসন প্রণালী পরিচালিত করিতেছিলেন, তাঁহার যেমন ডাক আসিল কুরুপাঞ্চালের মহাযুদ্ধে,—অমনি তিনি ছুটিলেন কুরুক্ষেত্রে। কর্ত্তব্যের আহ্বানে দ্বারকার রাজা অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া লইলেন। অখণ্ড ভারতে এক মহা-ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিলেন। অবশেষে ব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিতে হইল সেই মহাপুরুষ—সেই আদর্শ মানবকে।

তাঁহার আবির্ভাবকালে ভারতের এক মহা ভয়াবহ অবস্থা ছিল। তিনিই নিজের কর্ম্মজীবনে সে অবস্থা দূরীভূত করিয়াছিলেন, আবার তাঁহার যখন তিরোভাব ঘটে, তখনও ভারতের অতি শোচনীয় অবস্থা। সমগ্র ভারত ঘোর অন্ধ তমিস্রায় পরিব্যাপ্ত। আর আজ এই ভারতের-যে কি অবস্থা তাহা ত বলিবার নয়! আজ কোথায় তুমি আছ আমাদের অন্তরদেবতা! ওগো আমাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ এই সময় আসিয়া একবার দেখা দাও। তুমি যে এখানে আসিয়া-ছিলে এবং আসিয়া নিজেই বলিয়া গিয়াছ যে, আবার তুমি আসিবে। আমরা ডাকিলে—আমাদের প্রয়োজন হইলেই তুমি আসিবে। তোমার সেই আশার বাণী স্মরণ করিয়া আমরা যে বাঁচিয়া আছি দয়াময়! এখনও কি সে সময় হয় নাই প্রভো! এস এস—একবার আসিয়া দেখা দাও। আজ তোমার এই জন্মদিনে হিন্দুভারত তোমাকে আকুল প্রাণে ডাকিতেছে; তুমি একবার আসিয়া দেখা দাও। যদি বাহ্য জগতে তোমার প্রকট হইবার অবসর না থাকে প্রভো! তবে একবার আমাদের হৃদয়বিহারী মনোমোহন হইয়া তেমনি ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে আমাদের মনের মাঝে আসিয়া দেখা দাও। আমাদের মনের মাঝে তোমার সেই বাঁশীর সুর সপ্তস্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠুক আর তাহারই প্রবল প্রতিধ্বনি এই ভারতের জনসমুদ্রে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া চলুক। আমাদের মিলিত প্রাণের এক সুর এক স্বরে বাজিয়া উঠিয়া বিশ্বজগতের হৃদয়তন্ত্রী কাঁপাইয়া তুলুক। আজ তোমার জন্মদিনে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

কল্যাণীয়া

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সীমান্তের নীল বনরেখা
মিশে যায় অসীমের অতল গভীরে; আমি একা
উন্মুক্ত প্রান্তরে বসি সন্ধ্যার আলোকে
হেরি অন্তর্লোকে
তব রূপ চিরন্তন, হে কল্যাণী!
বিদায়ের বাণী,
আজও জাগে রন্ধ্রে রন্ধ্রে মোর,
তখনও হয়নি ভোর,
খেলা না ফুরাতে তুমি গেছ চলি, অয়ি নিরুপমা,
তবুও করেছি ক্ষমা।

দৃষ্টি চলে যায়—বহু দূর দিগন্তের পারে
মগ্ন যেথা আছ তুমি আপনার কর্ম্ম-পারাবারে,
বিরল ভবন মাঝে সন্ধ্যাদীপ জ্বালি,
দেবতার কৃপা মাগি শূন্যদৃষ্টি মেলি,
চেয়ে রও মোর মত, অনন্তের পানে।
সেইখানে,
অন্তরের গভীর গহনে, ফুটে ওঠে তারা দলে দলে,
যেন একই আকাশের তলে
দু'জনে জাগিয়া রহি,
উতলা সমীর আনে বনগন্ধ বহি'।
সেথা সেই অন্তরের চির পরিচয়,
লুপ্ত করি দিয়ে যায় সর্ব্ব লজ্জা ভয়।
সেথা আমি রাণী, সেথা মোর কামনার বাণী,
দীপ হয়ে জ্বলে ওঠে কল্যাণ-শিখায়, অয়ি [illegible]!

বিশ্বজননী—রূপের পাত্রে

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ম্যাডোনা—মাতৃমূর্ত্তি

এ দেশে প্রতীচ্য আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে ম্যাডোনা বা বিশ্বমাতৃকল্পনা বা রচনায় ইউরোপের প্রতিভা অতুলনীয়। পশ্চিমের সমুত্থান-যুগের শিল্পীরা যীশুর মাতাকে রচনা করে' অভাবনীয় প্রশস্তি লাভ করেছে। ক্রোড়ে উপবিষ্ট যীশু-মূর্ত্তি ও রূপের তরল মাদকতায় মজ্জিত একটি মাতৃস্থানীয় রমণীমূর্ত্তি রচনা করে' এ সব শিল্পীরা সকলের চিত্তহরণ করেছে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, আলো ও ছায়ার ধাঁধাঁর আশ্রয় নিয়ে। ফলে র‍্যাফেল প্রভৃতি শিল্পীর রচনা সমগ্র বিশ্বময় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।

এ জন্য মাতৃমূর্ত্তি কল্পনার ক্ষেত্রে ইউরোপের কণ্ঠেই যেন জয়মাল্য পড়েছে!

ব্যাপারটি অতি অকিঞ্চিৎকর ও লঘু। গভীর ভাবে আলোচনা করতে গেলে ইউরোপের এ দাবী একান্ত অলীক ও বায়বীয় মনে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে, আধুনিক যুগে ইউরোপীয় চিন্তা রিণেসাঁস (সমুত্থান) যুগের সমগ্র প্রচেষ্টাকে একটা ইন্দ্রিয়জ লালসাতৃপ্তির অভিনয় মনে করে। কোন গভীর অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা সে যুগে প্রতীচ্য হৃদয়ে কোন বিশিষ্ট তরঙ্গ তোলেনি। বরং মধ্য যুগের ভাগবতী নিষ্ঠা ও নিবেদনকে কক্ষচ্যুত করে' সে যুগ রসচর্চ্চাকে স্থূল ভোগের বাসনে পরিণত করে। চারত্রিজ বা আমিয়েঁ গির্জ্জার অধ্যাত্ম প্রেরণা র‍্যাফেল, ভিন্‌সি বা মাইকেল এঞ্জেলোকে প্রভাবিত করেনি একটুও। ফলে এরা যা সৃষ্টি করেছে তা ঐশী অনুভূতির ক্ষেত্রে অতি অকিঞ্চিৎকর। বরং পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ফ্রা এঞ্জেলিকো (Fra Angelico) প্রভৃতি শিল্পীর সাধনা এক অভিনব স্বর্গমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিল। ফ্রা এঞ্জেলিকোর একটা দেবদূতের (angel) মুখশ্রীর অধ্যাত্ম প্রভাব র‍্যাফেলের সমগ্র চেষ্টার সমাহারেও পাওয়া যাবে না—এই হল নব্য ইউরোপের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। কাজেই র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তির দাবী অতি তুচ্ছই হয়ে গেছে বলতে হয়—ইউরোপের দিক হ'তেও।

আবার অন্য দিক পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। প্রাচ্য অঞ্চলে মাতৃমূর্ত্তি কল্পনা ও রচনা যে অতি প্রাচীন, এ কথা খুব কম লোকেই জানে। মধ্য-এসিয়ার তুরফানে যে মাতৃমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সম্প্রতি যা' বার্লিন যাদুঘরে আছে তা' সপ্তম শতাব্দীর। বৌদ্ধ কল্পনায় শিশু পিঙ্গলাকে ক্রোড়ে ধারণ করেছে জননী দেবী হারিতী। বৌদ্ধ পরিব্রাজক yi-tsingএর মতে সে যুগে হারিতী দেবীর মূর্ত্তি প্রত্যেক মঠে ছিল। এই দেবীই ছিলেন সন্তানদাত্রী। Yi-tsingএর সময় হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ। সেই বহু প্রাচীন যুগে এই মূর্ত্তিকল্পনা রূপাধারে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি সম্ভব করে। কোন তরল ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণকে মুখ্য করে' ভারতীয় শিল্পী অগ্রসর হয়নি। মাতৃত্বের পেলব মহত্ব ও আনন্দঘন আলিঙ্গনে ক্রোড়ের শিশু ধন্য হয়েছে—এ সব রচনায়। এই বিশ্বমাতা কোন বিশিষ্ট স্থূল মাতৃত্বের উপাদানকে আধার করেনি। সকল মাতার যা উপজীব্য ও আকর্ষণ সেই অন্তরনিহিত বাৎসল্য রসই হয়েছিল এ সব রচনার ভাবকেন্দ্র; এবং এই রস মহীয়ান্ হয়েছিল ঐশী আধার পেয়ে। যা ছিল "অণোরণীয়ান্" তা এমনি ভাবে রূপে পড়েছিল "মহতো মহীয়ান্"। বিরাট ও সূক্ষ্মের এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ভারতীয় সভ্যতা ও শীলতার শুভ্র বেলায় নিজের কম্পিত আবেগের চিহ্ন রেখে গেছে।

পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ Hiun Tsang ও বলে গেছেন যে, উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্রই এই হারিতী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হত। যবদ্বীপের চণ্ডী-মেন্দুত মন্দিরে হারিতী দেবীর মূর্ত্তি আছে এবং এখানে গান্ধার কল্পনার নিবেদনও অষ্টম শতাব্দীতে হারিতী দেবীকে রূপাশ্রিত করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

ভারতকে মধ্য বিন্দু করে এই বিশ্বমাতৃত্বের রূপকল্পনা এক সময় সমগ্র এসিয়ায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। হারিতীমূর্ত্তির ভিতর আছে মাতৃত্বের চরম দর্পণ—যে মাতৃত্ব অবিশেষের অচঞ্চল উপাদানে গঠিত—যা' সাময়িকতার পদ্মে নিহিত শিশিরবিন্দুর মত অস্থির ও অধীর নয়। বিশেষের মধ্যে অবিশেষের—সাময়িকতার ভিতর চিরন্তনের এই সুপুষ্ট ঐশ্বর্য্য শুধু ভারতীয় কল্পনাই রূপমণ্ডিত করেছে। এ জন্য এ সব রচনায় নারীত্ব বা নারীর যৌবনই বড় কথা নয়—মাতৃকল্পনার অবকাশে। অথচ নারীর লালিত্য ও স্থূল সৌন্দর্য্যকে নিয়ে র‍্যাফেল প্রভৃতি শিল্পী সকলের প্রীতি আকর্ষণ করেছে। বস্তুতঃ একটি সুপুষ্টা সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তির অঙ্কে একটা সুস্থ ছেলে এঁকে দিলেই তা মাতৃমূর্ত্তি হয় না বরং তার ভিতর জেগে ওঠে একটা নিঃশব্দ দ্বন্দ্ব—একটা দুঃসহ বিরোধ। মাতৃত্বের পরম ত্যাগ, আহুতি ও আনন্দ আঁকা অতি কঠিন ব্যাপার। একটি অতি লঘু সুন্দরী নারীকে মাতৃত্বের দ্যোতক রচনা বলে চালান অসম্ভব। যারা নিবিড় ভাবে বিষয়টি অনুধ্যান করেছে তারা জানে—মাতৃত্ব এক দিকে প্রগাঢ়তায় নিঃসঙ্গ—মাতা যখন সন্তানের জন্য আত্মাহুতি দেন—পলে পলে তিল তিল করে' বা হঠাৎ সমগ্র ভাবে, তখন মাতৃত্বের প্রেরণা আসে কারও হিতোপদেশে নয়। এ জন্য মাতৃত্বের দৈবী আসন ইতর জনতার ধূলিধূসরিত বিলাসের স্তরে নিহিত নয়। শিল্পীদের সবুজ ও লাল রঙের অসংযত মাদকতার ভিতর ত্যাগের আহুতির গৈরিক ছায়া নেই। র‍্যাফেলের ধ্যানে আছে মাতার ভিতরকার নারীত্ব ও যৌবনের তরঙ্গ ভঙ্গ—অথচ মাতৃত্ব একটা তুরীয় রসের অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্রজাল। এই জিনিষটাকে অত সামান্য আধারে রাখা সম্ভব নয়।

জাপানে মাতৃমূর্ত্তি Ki-si-mo-jin নামে পরিচিত। জাপানের বিশ্বমাতা মূর্ত্তিতে লোকায়ত দিক্ এক অভিনব শ্রী উদ্ঘাটিত করেছে। কিন্তু তাতে ইউরোপের বিলাসবিভ্রম বা বিহার নেই—সন্তানের মিলিত কল্লোলে জাপানী মাতৃত্বের মূর্ত্তি অভিষিক্ত। অসীমের কাছে যেমন সব কিছুই তুল্য, মাতার নিকটও সব সন্তান তুল্য। বস্তুতঃ মাতৃত্বে পাওয়া যায় অসীমের পরিস্ফুট ব্যঞ্জনা। রত্নভূষণ ও কুঙ্কুম-লেপের স্বপ্নে মাতৃত্বের কল্পনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চীন দেশে মাতৃমূর্ত্তি Kuan-yin নামে পরিচিত। পারিবারিক বন্ধনে মর্ম্মর-ফলকের মত জমাট চৈনিক সমাজে মায়ের স্থান অতি উচ্চে—মা-ই নিখিল করুণার উৎসরূপে চীন দেশে কল্পিত। এই অফুরন্ত স্নেহ, দয়া ও সেবায় মঞ্জরিত চীন উপযুক্ত আধারেই বিশ্বমাতৃত্ব কল্পনা করেছে।

মিসরের মাতৃত্ব কল্পনাও অটুট আধার পেয়েছে। যে সভ্যতা এক সময় জীবন হ'তে মৃত্যুর সমস্যায় অধিক আলোড়িত হয়েছিল এবং এক দিকে পিরামিডরূপী অফুরন্ত কবর এবং "Book of the Dead" নামক মৃত্যুগাথার বাণীকে উচ্চারণ করে আশ্বস্ত হয়—সে সভ্যতাই এক সময় জীবনের প্রতিমাস্থানীয় মাতৃমূর্ত্তিকে কল্পনা করে Isis ও Horusএর ভিতর দিয়ে। এখানেই আমরা নিগূঢ় ভাবে মিসরের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করি। শুধু গ্রীক সভ্যতাই মাতৃত্বের কোন গভীর ও ব্যাপক কল্পনা ক'রে উঠতে পারেনি। গ্রীক সভ্যতায় এই মূর্ত্তির অভাব একটা বিশিষ্ট ভাব ও আদর্শগত দৈন্য সূচনা করে। মিনার্ভার মাতৃত্ব কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি পায়নি।

আইসিস্ ও হোরাস্—মাতৃমূর্ত্তি—মিশর

ভারতীয় কল্পনায় মাতৃমূর্ত্তির সুচিন্তিত স্তর সমুদয় দেখে বিস্ময় জন্মে। যশোদা-কৃষ্ণমূর্ত্তি সকলের মনোহরণ করে এসেছে পৌরাণিক যুগ হ'তে—অপর দিকে গণেশজননী আরও ব্যাপক ও দূরগামী সৃষ্টি। গজমুণ্ডে শোভিত গণেশ, বিশ্ব-মাতার দুঃসহ হয়নি। মাতার পক্ষে সকল সন্তানই সমান স্নেহাস্পদ—তাই গণেশ কুৎসিত নয়—জননীর বিশেষ ভালবাসার পাত্র। কাংড়া চিত্রে এবং অজস্র শ্রীকৃষ্ণ ও জননী, কালীঘাটের পটে গণেশজননীর প্রতিরূপ দেখে এ সব কল্পনার সহজ সরলতার ও আবেগ-মুখর উচ্ছ্বাসের স্পর্শ পাওয়া যায়। এতে নিছক মাংসল প্রেরণা বা তুচ্ছ নারীত্বের সুগুপ্ত প্রলোভন নেই। তা ছাড়া আরও গভীর ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রেরণা স্বপ্রকাশ হয়েছে।

মাতা শুধু স্তন্যদাত্রী নন—তিনি রক্ষণও করেন। মানব-কোরককে বহু বিপদ-আপদ হতে মুক্ত করে নিয়ে আসা মাতৃধর্ম্মের একটা বিরাট দিক্। এজন্য মা অনল অনিলকে গ্রাহ্য করে না, মৃত্যু বিভীষিকাকে তুচ্ছ করে। ভারতীয় তন্ত্র দেবীকে—বিশ্বজননীকে—শক্তিরূপে দেখেছে। এরূপ সাহস জগতের কোন সভ্যতারই ছিল না। দশমহাবিদ্যা বিশ্বজননীর দশটি দিক্ সম্যকভাবে প্রকটিত করে। কালীমূর্ত্তিকে বিশ্বজননী হিসাবে কল্পনা করতে অনেকেই কুণ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু যথার্থ জননী কেবল স্নেহ-মণ্ডিত নারী মাত্র নয়—তিনি ধ্বংসের, প্রলয়ের মূর্ত্তিও বটে—খর্পরহস্তা শক্তিরূপিণী দেবী। তিনিই সকল বিপদ হ'তে জগৎ-শিশুকে রক্ষা করেন। পুষ্পের প্রতি কোরক, বৃক্ষের প্রতি পল্লব, পশুপক্ষীর প্রতি ক্ষুদ্র প্রাণ-কোষকে এই বিরাট-মাতা সমগ্র প্রতিকূল অবস্থা হ'তে রক্ষা করেন অনন্ত কালে। প্রতি মাতাই এ ক্ষেত্রে আত্মদানে কঙ্কালসার, ত্যাগে সর্ব্বহারা এবং উৎসাহে প্রমত্তা। এই কল্পনাই ত মাতৃত্বের বিরাট রূপকে পার্থিবতার মঞ্চে স্থাপিত করতে পেরেছে!
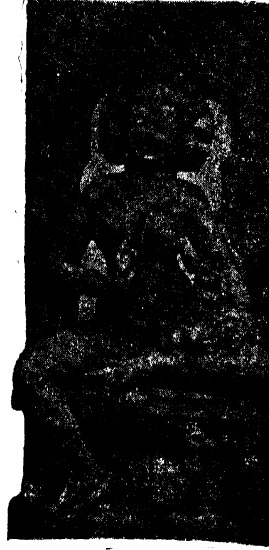
মাতৃকামূর্ত্তি, পুরী—ভারতবর্ষ

এ সব ছাড়াও হিন্দুর মাতৃকা কল্পনাও ভাব-সমুদ্রের আরও গভীর বেলাভূমিতে জগৎকে নিয়ে যায়। অসুর নিধন সময়ে ব্রহ্মাদির দেহ হ'তে শক্তিরূপিণী এসব মাতৃকারা আবির্ভূত হয়। ভারতীয় শিল্পে এ সব মাতৃকার অতি অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি আছে। এ বিপুল ঐশ্বর্য্য-সমারোহের সহিত তুলিত হওয়ার যোগ্য। মাতৃমূর্ত্তি জগতে কোন্ সভ্যতা রচনা করেছে? বস্তুতঃ প্রতীচ্য সভ্যতা এ সমস্ত কল্পনার ছায়া ও সীমান্ত ধ্যান করতে সক্ষম হয়নি, এ কথা যেন সকলের মনে থাকে।

বিশ্বমাতার এই বিরাট রূপের প্রতিবিম্ব সমগ্র ভারতীয় রচনায় অজস্র শতদলে পড়েছে। অজন্তার মাতৃমূর্ত্তির সংযত কারুতা অভিনব ব্যাকুলতা, ও সহজ স্নেহবন্ধনের সহিত তুলিত হতে পারে জগতের কোথাও এমন কিছু নেই। অপর দিকে এ আদর্শে রচিত দণ্ডনউলিকের [খোটান অষ্টম শতাব্দী] মাতৃমূর্ত্তির ক্ষণিকের কটাক্ষ যেন অসীম কালকে চিরতরে বন্দী করে' আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

পক্ষি-জীবনের বিচিত্র কাহিনী

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু

পাখীর কথা বলিতে হইলে প্রথমেই ইহাদের উৎপত্তির বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। জীবতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন যে, সরীসৃপ হইতে আদিম যুগের পক্ষী উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্যাভেরিয়ার পর্ব্বতে একটি অদ্ভুত আকারের জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কঙ্কালখানি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সেটি একটি ডানাযুক্ত এবং দীর্ঘ চঞ্চু-সমন্বিত বাদুড়ের মত কোন জীবের হইবে। প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা এই বিচিত্র জীবের নাম দিয়াছেন আর্কিয়পটারিক্স। ইহাদের চঞ্চুতে দুই সারি দাঁত ছিল। এই আর্কিয়পটারিক্সকেই পক্ষিকুলের আদি-পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। অবশ্য পুরাণের মত মানিলে গরুড়কে বিহগকুলের গোষ্ঠীপতি বা আদি জনক বলিয়া মানিতে হইবে, কিন্তু গরুড় পার্থিব জীব ছিলেন না। সুপর্ণ নারায়ণের বাহন হইয়া স্বর্গে বাস করিতেন। মর্ত্ত্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকায় মেদিনীর বিহগকুলের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্বতঃই বিচ্ছিন্ন ছিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌রা আরও অনুমান করেন যে, ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে সম্মুখের চরণ দুইটিই রূপান্তরিত হইয়া পাখীর ডানায় পরিণত হইয়াছে।

ফুসফুস ও বায়ুথলি

পাখীর একটি নাম বিহঙ্গ। বিহায়সা গচ্ছতীতি বিহঙ্গ। বিহায়স্ অর্থাৎ আকাশে গমন করে বলিয়া পাখীর নাম হইয়াছে বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম। আকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের নিমিত্ত ইহাদের দেহটি লঘু এবং নৌকার মত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বায়ু ভেদ করিয়া গমন করিবার নিমিত্ত বক্ষের সম্মুখের অস্থিটি সূক্ষ্মাগ্র হইয়া নৌকার গলুইএর মত হইয়াছে। শরীরের আয়তনে ইহাদের ফুসফুস বৃহদাকার হইয়াছে। এই প্রকার ফুসফুস ব্যতীত ইহাদের দেহের দুই পার্শ্বে অনেকগুলি বায়ুপূর্ণ থলি থাকিতে দেখা যায়। বায়ুপূর্ণ এই পাতলা থলিগুলি ফুসফুসের সহিত সংযুক্ত। ফুসফুসের উত্তপ্ত বায়ু সরু সূক্ষ্ম নলি দ্বারা এই থলিগুলির মধ্যে চলাচল করিয়া থাকে। ফুসফুস ইহাদের পৃষ্ঠের সহিত সুদৃঢ় বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত এবং পঞ্জর অতিক্রম করিয়া বক্ষের মধ্যে অবস্থিত। দেহের ভিতর হইতে ছিন্ন করিয়া ফুসফুস বাহির করিলে উহার উপর পঞ্জরের দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চয়ের নিমিত্ত যে সকল থলি পক্ষি-দেহে থাকিতে দেখা যায় তাহার বিষয়ে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌রা অনেক গবেষণা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, দেহকে লঘু করিয়া উড্ডয়নের সহায়তার নিমিত্ত এই সকল থলির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কোনও কোনও পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের মতে এই সকল থলিতে সঞ্চিত অতিরিক্ত বায়ু অশ্রান্ত পক্ষে উড়িবার কালে বা অবিরাম গান গাহিবার সময় পক্ষীদিগের শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পাখীদের পালক এবং অস্থিগুলিও বাতাসে পরিপূর্ণ থাকে। ইহাদের অস্থি ওজনে খুব হাল্কা হইয়া থাকে। ঈগলের দেহের প্রায় সমস্ত অস্থিগুলিই বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে। সামুদ্রিক পক্ষী পেঙ্গুইনদের অস্থির মধ্যে বায়ু থাকে না। উটপাখীর উরুর হাড়ের মধ্যে বায়ু থাকিতে দেখা যায়।

পাকস্থলী

ইহাদের পরিপাক শক্তি অতি অদ্ভুত। গৃহপালিত কপোতেরা পাথরের মত কঠিন শস্যগুলি কি ভাবে পরিপাক করে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরিপাকের সহায়তার নিমিত্ত ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড গলাধঃকরণ করে। ভুক্ত দ্রব্যাদি পক্ষীদের পাকস্থলীতে সুন্দরভাবে জীর্ণ হইয়া থাকে। পরিপাকের নিমিত্ত ইহাদের উদরে তিনটি পাকস্থলী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাকস্থলী (crop) ও তৃতীয় পাকস্থলী (Gizzard) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শস্যভোজী পক্ষীদের উদরে প্রথম পাকস্থলী বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে দেখা যায়। অনেক মৎস্যভোজী পাখীদের উদরে এই পাকস্থলী দেখিতে পাওয়া যায় না। শস্যভোজী বিহঙ্গদের তৃতীয় পাকস্থলীরও অত্যদ্ভুত শক্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের উদরে যকৃতের আকারও বেশ বৃহৎ হইয়া থাকে। পক্ষি-উদরে পৃথক্ মূত্র-থলি দেখা যায় না। পাখীরা মলের সহিত মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে।

রক্ত

সকল প্রাণী অপেক্ষা পক্ষীদিগের রক্তের তাপ অত্যন্ত অধিক। ইহাদের শোণিতের তাপ ১০৪ ডিগ্রি; এই কারণেই ইহাদের দেহ সকল সময়েই উত্তপ্ত থাকিতে দেখা যায়। পাখীর রক্তে লোহিত কণিকাও অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই লোহিত কণিকাগুলি আকারে—গোলাকার না হইয়া অণ্ডাকার হইয়া থাকে। ইহাদের দেহে মাংসপেশীর সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। শুধু উড্ডয়নের পেশীগুলি ওজন করিলে সমগ্র দেহের ওজনের অর্দ্ধ ভাগেরও অধিক হইতে দেখা যায়। এত অধিক পেশী থাকায় ইহাদের দেহের তাপ সর্ব্বকালে সমানভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাকে এবং শীতের উগ্রতাও ইহারা অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে। ইহাদের পালকের আবরণও দেহের তাপরক্ষণে সহায়তা করে।

পালক

গবাদির দেহে রোমাবলীর নিম্নে যেমন ক্ষুদ্র-নরম লোম থাকিতে দেখা যায়—পাখীদের দেহেও সেইরূপ বড় বড় পালকের নিম্নে ছোট ছোট কোমল পালক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইহাদের দেহে আরও ক্ষুদ্র ও অতি কোমল পালক থাকে। বিড়ালেরা যেমন গাত্র লেহন করিয়া রোমাবলীকে পরিষ্কার রাখে, পাখীরাও সেইরূপে পতত্রের পরিচ্ছন্নতার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। আহারের পর ঠোঁট পরিষ্কারের উদ্দেশে বৃক্ষশাখায় চঞ্চু ঘর্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না, চঞ্চুর দ্বারা দেহের প্রত্যেক পালকটিকে পরিষ্কার করিয়া পক্ষে ও পৃষ্ঠদেশে বিন্যস্ত করিয়া দেয়। পালকের এই প্রসাধনে চরণের নখর চঞ্চুর সহিত কঙ্কতিকার কার্য্য সম্পাদন করে। আবার পুচ্ছের নিম্নদেশ হইতে তৈলাক্ত পদার্থ চঞ্চুর দ্বারা বাহির করিয়া দেহের সমস্ত পালকে মাখাইয়া থাকে। হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষীরা এই প্রকার প্রসাধনে বহু সময় ক্ষেপণ করে। জল হইতে উঠিয়াই উহারা পালকের প্রসাধনে মনোনিবেশ করে। উহাদের পুচ্ছদেশের নিম্নভাগে তৈলাক্ত পদার্থের একটি ক্ষুদ্র থলি থাকিতে দেখা যায়। এই ভাবে তৈল-সিক্ত হওয়ার জলচর পক্ষীদের পালক জলে বহুক্ষণ থাকিলেও নষ্ট হইতে পারে না।

পালক খসা

সর্পেরা যেমন খোলস ছাড়ে পাখীরা সেইরূপ দেহের সমগ্র পালক পরিত্যাগ করে। বৎসরে একবার করিয়া ইহাদের দেহের সমগ্র পালক ঝরিয়া পড়িয়া যায় ও আবার নূতন করিয়া পালক গজাইয়া থাকে। পালক খসিয়া পড়ার ব্যাপারটি দুই এক দিনে সম্পন্ন হয় না। ধীরে ধীরে সব পালক খসিয়া পড়ে ও তাহার স্থানে অল্পে অল্পে আবার নূতন পালক গজাইয়া থাকে। প্রজনন কালের পরেই অর্থাৎ অণ্ড প্রসবাদি শেষ হইয়া গেলে পাখীদের পালক খসার সময় উপস্থিত হয়। কোন কোন পাখী আবার বৎসরে দুই বার অর্থাৎ শরৎ ও বসন্ত কালে পালক পরিত্যাগ করে। এই সময় ইহাদের সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব তিরোহিত হইয়া থাকে। মনে হয়, যেন পাখীর হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। বিলাতে চাতক এবং বাজপাখীরা ঘোর শীতের সময় পালক ত্যাগ করে এবং ইহাদের সমগ্র পালক ঝরিতে অনেক সময় লাগে। হংসেরা সমগ্র পালক একেবারেই পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এ সময় বন্যহংসেরা উড়িতে পারে না। ও দেশে যাযাবর পক্ষীদের পালক ঝরার ব্যাপার শরৎকালে দেশান্তর ভ্রমণের পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

চরণ

ইহাদের চরণের কিছু বিশেষত্ব আছে। যে পাখীর চরণ যত দীর্ঘ তাহাদের চঞ্চুও সেই পরিমাণে লম্বা হইয়া থাকে। যে পাখীর উড্ডয়ন শক্তি খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে তাহাদের পদদ্বয়ও সেই অনুপাতে সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষের শক্তি বিলোপের সহিত তাহার ধাবনের শক্তিও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রজনন কালেই পাখীরা নীড়ে অবস্থান করে অন্য সময়ে ইহারা বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া নিদ্রা যায়। কিন্তু কখনও শাখা হইতে ভূমিতে পতিত হয় না। ইহার কারণ, শাখায় উপবিষ্ট হইলেই ইহাদের চরণের অঙ্গুলি-গুলি কব্জার মত শাখাকে আপনা হইতে এমনই ভাবে আঁকড়াইয়া ধরে যে, নিদ্রিত পাখীর ভূমিতে পতন সম্ভবপর হয় না। এ বিষয়ে ইহাদের সুদীর্ঘ পুচ্ছ দেহভারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। আকাশে উড্ডয়নকালে ইহাদের পুচ্ছ নৌকার হালের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে এবং শাখায় উপবেশনকালে দেহভারের সমীকরণ করিয়া এই পুচ্ছ বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

প্রণয়রীতি

এই সময়ে পুরুষ পাখীদের পালকের বর্ণ বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল হয়, এবং কণ্ঠের স্বর মধুর ও মুখর হইয়া উঠে। বিহগেরা নূতন মনোরম সাজে কাননকুঞ্জে নৃত্য ও কূজনে তৎপর হয়। এই কালে পুরুষ টুনটুনিদের পুচ্ছ দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই সুদীর্ঘ পুচ্ছ নাচাইয়া উহারা স্ত্রী টুনটুনিদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করে। প্রজনন কালের পর পুরুষ টুনটুনির পুচ্ছের দীর্ঘ পালক দুইটি খসিয়া পড়ে ও স্ত্রী টুনটুনির মত উহাদের লেজ ছোট হইয়া যায়। যৌন-সম্মিলন কালে পুরুষ বাবুইদের গায়ের বর্ণ রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাদের মস্তক ও বক্ষের বর্ণ পিঙ্গল হইতে পীতে এবং কণ্ঠ ও চঞ্চুর বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণে পরিণত হইয়া থাকে। শালিকের প্রণয় ব্যাপার আন্তরিক। ইহাদের বাদ-বিসম্বাদ এবং কলহান্তরিত স্বরের ঘটা অনেকেই মাঠে লক্ষ্য করিয়াছেন। বুলবুলরা প্রণয়িনী লাভার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। চড়াই যে লড়াই করিয়া বিবাহ করে তাহা অনেকেরই জানা আছে। পারাবতেরা মুখোমুখী হইয়া গ্রীবা স্ফীত ও কম্পিত করিয়া প্রণয় জ্ঞাপন করে। ছাতারিয়ার বিবাহ বিশেষ গণ্ডগোলের ব্যাপার। ৫।৭টি ছাতারিয়া যখন মহাকলরবে আত্মগরিমা প্রকাশ করে স্ত্রী ছাতারিয়া তখন মৌনভাবে নিকটস্থ কোন বৃক্ষের শাখায় বসিয়া পুরুষদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করে। কুক্কুটরা কি ভাবে কুক্কুটীর মনোহরণ করে তাহা সকলেরই জানা আছে। হংসদের প্রাগ্‌মিথুন লীলায় বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই। ইহাদের প্রণয় ব্যাপার যেন ভাবহীন কবিতার মত। এমন কি, কুৎসিত পেচকরাও এই কালে পেচকীর সমক্ষে ক্ষুদ্র পুচ্ছ কাঁপাইয়া ও হ্রস্ব গ্রীবা ফুলাইয়া প্রণয় জ্ঞাপন করে। কাকেরা এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তাই তাহাদের একটি নাম হইয়াছে গূঢ়মিথুন। চিলেরা একেবারেই নীরস ভাবে চীৎকার করিয়া প্রণয় লীলায় আসক্ত হয়; ইহাতে আয়োজন বা আড়ম্বরের কোনও ঘটা থাকে না। ময়ূরদের প্রণয়লীলা যেন স্বপ্নময়ী তন্দ্রার মত মধুর ও মনোরম। ইহাদের এই ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই কালে ময়ূর শতচন্দ্রখচিত সুন্দর কলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে ও মাঝে মাঝে উন্মনা ময়ূরীকে নিজ নৃত্যে প্রবৃদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুচ্ছ কম্পিত করিয়া থাকে। শিখীর এই নৃত্য দেখিলে মনে হয় যেন রূপকথার কোন রাজকুমার ছদ্মবেশে বননিকুঞ্জে প্রণয়াসক্ত হইয়া দয়িতার সমক্ষে নিজ মনের ব্যথা ভাবের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করিতেছে। কোকিলের গানের বিষয় সকলেই অবহিত আছেন। বসন্ত-দূত কণ্ঠের অমিয় লহরী দ্বারাই কোকিলার চিত্ত হরণ করে।

গান

এদেশের ভীমরাজ, শ্যামা, পাপিয়া, এবং বিলাতের ব্লাকবার্ড, নাইটিংগেল প্রভৃতি পাখী গানের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। যে যন্ত্র হইতে ইহাদের অপূর্ব্ব সুরলহরী নিঃসৃত হয় তাহা একটি ক্ষুদ্র নলি-বিশেষ। এই নলিটির মধ্যে ৫।৬ জোড়া ক্ষুদ্র মাংসপেশী থাকিতে দেখা যায় এবং ইহার মুখে একটি পাতলা পর্দ্দা থাকে। মানুষের উদ্ভাবিত বংশী ও পাখীদের এই অপূর্ব্ব স্বরযন্ত্রের মধ্যে অনেক মিল আছে। এ দেশের সঙ্গীতজ্ঞেরা পাখীর গানে অবহিত না হইলেও জার্ম্মাণীর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিঠোভ্যান্ পাখীর গান হইতে সুর সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গানের মধ্যে ইয়োলো হ্যেমার নামক পাখীর সুর সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

নীড় রচনা

যৌন সম্মিলনের পরেই পাখীরা নীড় রচনায় মনোনিবেশ করে। ভিন্ন ভিন্ন পাখী কি ভাবে বিভিন্ন কৌশলে নীড় নির্ম্মাণ করে তাহার কিছু কিছু অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কাকের বাসা অনেকেই দেখিয়াছেন। কাক কুৎসিত হইলেও ইহাদের বাসা নিতান্ত কদাকার নহে। চিলের বাসা অপেক্ষা বায়সের নীড় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কাকের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর কলিকাতায় আমি কাকের একটি অদ্ভুত বাসা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বাসাটি টিন ও খাতোর ঝুঁটি দিয়া নির্ম্মিত হওয়ায় ইহার চুপড়ী

মত দেখাইতেছিল। শালিকের বাসা গড়ের মাঠে বড় বড় শিরিষ গাছের উঁচু ডালে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের বাসা দেখিলে মনে হয় যেন উঁচু সরু ডালের প্রান্তে কতকগুলা খড়কুটার গাদা জড় করা রহিয়াছে। উহাদের অণ্ডের বর্ণ ফিকা নীল। চটকদের বাসা অতি কদর্য্য। ইহাদের বাসার জন্য গৃহস্থের ঘর-দুয়ার অপরিষ্কার হইয়া থাকে। কাক জাতীয় হাঁড়িচাচা গাছের খুব উচ্চে উন্মুক্ত নীড় নির্ম্মাণ করে। ছাতারিয়ারা ঝোপের মধ্যে নীচু ডালে উন্মুক্ত বাসা তৈয়ারী করে। ইহাদের ডিমগুলি সুন্দর নীলবর্ণের হইয়া থাকে। লতাবিতানের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় বুলবুলের বাসা লক্ষ্য করিয়াছেন। বুলবুলের ডিম দেখিতে বেশ সুন্দর ঈষৎ গোলাপী বা লালচে সাদা জমির উপর লালের ছিট থাকায় ডিমের শোভা অতীব মনোরম হইয়াছে। টুনটুনিরা পাতার সহিত মাকড়সার জাল জড়াইয়া অতি সুন্দর নীড় প্রস্তুত করে এবং নীড়ের তলদেশে তুলা ও কোমল শৈবালের শয্যা পাতিয়া দেয়। ইহাদের নীড় এত ছোট যে সহজে লক্ষ্য করা যায় না। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন গাছে মাকড়সা জাল বুনিয়াছে। বাসা নির্ম্মিত হইলে টুনটুনিরা উহার মধ্যে ৩।৪টি অতি ক্ষুদ্র অণ্ড প্রসব করে। ইহাদের ডিমগুলিও দেখিতে বেশ সুন্দর। বাসা বাঁধিবার সময় টুনটুনিরা খুব সতর্ক থাকে। এ সময়ে ইহাদের নীড় রচনা কেহ লক্ষ্য করিলে ইহারা সে নীড় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বাবুই পাখীরা খেজুর পাতার টুকরা ছিঁড়িয়া অথবা উলুখড় দিয়া বোতলের আকারে অতি সুন্দর বাসা তৈয়ার করে এবং যাহাতে বাতাসে এই নীড় অধিক দুলিতে না পারে, সে জন্য উহার মধ্যে মৃত্তিকা-পিণ্ড সুকৌশলে জুড়িয়া দিয়া থাকে। আমি তালগাছে ইহাদের অনেকগুলি বাসা ঝুলিতে দেখিয়াছি। বাজারে শাবক সমেত নীড় বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি। পুরাতন বাড়ীর আলিসার নীচে প্রায়ই চাতকের বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। মাটি ও পালক দিয়া ইহারা বাটির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার বাসা তৈয়ারী করে। ঐ নীড়ের মধ্যে ইহারা বৎসরে ২বার অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের অণ্ডগুলি দেখিতে মন্দ নহে। এককালে ৪।৫টি ডিম্ব ইহাদের বাসায় দেখিতে পাওয়া যায়। টিয়াপাখীরা গাছের কোটরে এবং কাঠঠোকরা গুপারি •তাল নারিকেল প্রভৃতি গাছের গায়ে গর্ত্ত করিয়া অণ্ড প্রসব করে। ইহাদের নীড়ের মধ্যে তৃণ তুলাদির কোনওরূপ কোমল আস্তরণ থাকে না। শুকপক্ষী এবং কাঠঠোকরার অণ্ডগুলি একেবারে শুভ্রবর্ণের হইয়া থাকে। মাছ-রাঙার বাসা অতি কদর্য্য। জলাশয়ের পাড়ে ও নদীর তীরে গর্ত্ত করিয়া ইহারা অণ্ড প্রসব করে। ইহাদের গর্ত্তের তলদেশ মাছের কাঁটায় পরিপূর্ণ থাকে। পেচকের কোটর অতি জঘন্য। ইহারা বৃক্ষাদির কোটর, পুরাতন মন্দির, জীর্ণ ও পরিত্যক্ত ভবনাদিতে নীড় নির্ম্মাণ করে। ইহাদের বাসা সর্ব্বদাই অপরিষ্কার থাকে। চটক, চামচিকা প্রভৃতি যারা ভেক মূষিক আহার করে তাহারা অজীর্ণ চর্ম্মাদি উদিগরণ করিয়া কোটরের মধ্যেই রাখিয়া দেয়। ক্যানারি পাখীরা যেমন নষ্ট অণ্ড ও মৃত শাবকাদি নীড় হইতে ফেলিয়া দিয়া বাসাকে সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে—পেচকরা ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া নীড়কে কদর্য্য করিয়া রাখে। উটপাখীরা বালুকার মধ্যে গর্ত্ত খনন করে এবং তাহার চারি ধারে বালুকার পাড় দিয়া নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উটপক্ষীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচরণ করে। প্রত্যেক দলে একটি পুরুষ পাখী ও অনেকগুলি স্ত্রী পক্ষী থাকিতে দেখা যায়। প্রজননকালে সকল স্ত্রী পক্ষীই একই নীড়ে অণ্ড প্রসব করে। সুতরাং এক একটি বালুনীড়ে প্রায় ৫০।৬০টি অণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ে প্রত্যেক স্ত্রী অষ্ট্রীচ ১০টি অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। কোকিলরা আদৌ নীড় নির্ম্মাণ করে না। ইহারা এদেশে যে কাকের বাসায় অণ্ড প্রসব করে তাহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। এই কারণে কাককে পরভৃৎ ও পিককে পরভৃত বলা হয়। এদেশে পাপিয়ারাও ছাতারিয়ার নীড়ে ডিম্ব প্রসব করে। পাপিয়ারা দেখিতে শিকরের ন্যায়। ইহাদের চঞ্চু দুইটি কোকিলের মত আরক্ত না হইয়া পীতবর্ণের হইয়া থাকে।

বিলাতী কোকিল

বিলাতে কোকিলরা নানা পক্ষীর নীড়ে অণ্ড প্রসব করে এবং এই উদ্দেশে সকল সময়েই কীট-পতঙ্গ-ভুক্ বিহগের বাসা বাছিয়া লয়। বিলাতী কোকিল সে দেশের তিন জাতীয় খঞ্জন pied wagtail, yellow wagtail, blue headed wagtail; এক জাতীয় মুনিয়া chaffinch; দুই জাতীয় পিপ্পিট্ meadow pippit ও tree pippit; ভরতপক্ষী লিনেট্, ইয়োলো হ্যামার, ব্লাকবার্ড; তিন জাতীয় সুস্বর পাখী—Reed warbler, sedge warbler, orphean warbler, hedge sparrow থ্রাস্ ও রবিণের বাসায় অণ্ড প্রসব করে। এই সকল পক্ষীর বাসায় গিয়া অণ্ড প্রসব করিবার অসুবিধা হইলে কোকিল ভূমিতে অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে এবং পরে চঞ্চু দ্বারা সেই অণ্ড তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত যে কোন বিহগের নীড়ে রাখিয়া আসে। অনেক সময় এক একটি পাখীর নীড়ে এক একটি করিয়া অণ্ড স্থাপন করিয়া আসে এবং ঐ নীড় হইতে ২।১টি অণ্ড তুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু এ-সকল নীড় অপেক্ষা মালয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপের এক জাতীয় চাতকের বাসা অতি অদ্ভুত। ধনাঢ্য চীনারা এই চাতকের বাসা উপাদেয় আহার্য্যরূপে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে এবং ইহার ঝোল রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করে। সে দেশে চাতকরা গুহার মধ্যে এবং পর্ব্বতাদির ফাটলে মুখের লালা দিয়া কাচের বাটির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীড় রচনা করে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের নিকুঞ্জ পক্ষীরা (বাওয়ার বার্ড) গাছের শাখায় সাধারণ ভাবে নীড় রচনা করে। ইহাদের নীড়ে কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু নীড়ের অদূরে ভূমির উপর নৃত্য ও কেলির উদ্দেশে পুরুষ-পক্ষীরা যে প্রমোদ-প্রাঙ্গণ রচনা করে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাস-বৃক্ষের অদূরে খানিকটা ভূমি পুরুষ পাখীরা প্রথমে পরিষ্কার করিয়া লয়। তাহার পর সেই পরিষ্কৃত ভূমির উপর খুব রঙীন পালক সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া দেয় এবং তাহার চারি পার্শ্বে নানা বর্ণের ঝিনুক, রঙীন চুড়ী, রক্তবর্ণ পুষ্প, নানা বর্ণের বীজাদি, শুভ্র অস্থি-খণ্ড, উজ্জ্বল নিকেলের বোতাম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পছন্দমত সাজাইয়া দেয়। এক জাতীয় নিকুঞ্জ পক্ষী গাছের ছোট ছোট ডাল দিয়া মনোরম নিকুঞ্জ রচনা করে এবং তাহার দ্বারদেশ ও চত্বর ভূমি পূর্ব্বোক্ত প্রথায় সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখে। এই ভাবে কেলি-প্রাঙ্গণ নির্ম্মিত হইলে স্ত্রী ও পুরুষ পক্ষী উহার মধ্যে নৃত্যাদিতে রত হইয়া থাকে। যৌন-সম্মিলন কালে পুরুষ পাখীরা এই সকল চত্বরে মিলিত হইয়া নৃত্যাদির

প্রতিযোগিতায় মনোনিবেশ করে। পাখীগুলি দেখিতে সুশ্রী না হইলেও এবং তাহাদের রচিত নীড় সুদৃশ্য না হইলেও তাহাদের নির্ম্মিত বিচিত্র কেলি-প্রাঙ্গণ অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম হইয়া থাকে।

অণ্ড

সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে পতিত ঝিনুকের উপর যেমন বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ ও অপূর্ব্ব চিত্রণ-কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, পক্ষি-অণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ অভিনব বর্ণ ও চিত্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেকগুলি ডিমের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সকল পক্ষি-অণ্ডের মধ্যে বোধ হয় জলপিপির ডিম্বই দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। পক্ষি-অণ্ডের এই চিত্রণের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যে সকল পাখী গর্ত্তের মধ্যে অণ্ড প্রসব করে তাহাদের অণ্ডগুলি অত্যন্ত শুভ্র বর্ণের হইয়া থাকে এবং যেগুলি উন্মুক্ত নীড়ে অণ্ড প্রসব করে, তাহাদের অণ্ডের উপরেই নানা ভাবের চিত্রণ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই চিত্রণের উদ্দেশ্য অণ্ডের আত্মগোপন ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহাতে অণ্ডগুলি পাতার ফাঁকে আলো-ছায়ার মধ্যে মিলাইয়া অন্য জীবজন্তুর দৃষ্টি সহজে অতিক্রম করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই পক্ষীর অণ্ড বিচিত্র ভাবে এবং বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত ও রঞ্জিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ ক্ষুদ্র পক্ষীরা বহু ডিম্ব এবং ঈগল প্রভৃতি বৃহৎ শিকারী পক্ষী দুই-একটি অণ্ড প্রসব করে। ক্ষুদ্র বিহগেরা বৎসরে একাধিক বার এবং বৃহৎ শিকারী পক্ষীরা একবার মাত্র অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। ছোট পাখীরা বৃহৎ শিকারী পাখীদের আহার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় উহাদের অণ্ডের পরিমাণ এবং প্রসবের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। বন্য কুক্কুট অপেক্ষা গৃহপালিত কুক্কুটরা অধিক সংখ্যক অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে।

গৃহপালিত কুক্কুটী ১০।১২টি অণ্ড প্রসব করে। চিলরা ১ বা ২টি, কপোত ২টি, বুলবুল ও টুনটুনিরা ৩ হইতে ৫টি, ডাহুক ৮টি, তিতির ১৩।১৪টি অণ্ড প্রসব করে।

অণ্ডে তাপ প্রয়োগ

অণ্ড প্রসবের পর পাখীরা অণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া অঙ্গতাপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই তাপ-প্রয়োগের ফলে যথাসময়ে অণ্ড হইতে শাবক নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। হামিংবার্ড বা মধ্য আমেরিকার ভ্রামর পক্ষীরা ডিম্বের উপর ১০ দিন অঙ্গতাপ প্রয়োগ করে; ক্যানারি পাখীরা ১৫ হইতে ১৮ দিন, মোরগরা ২১ দিন, হাঁস ২৫ দিন, রাজহংস ৪০ হইতে ৪৫ দিন অঙ্গতাপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। হামিং বার্ডের মধ্যে শুধু স্ত্রী-পক্ষীরা ডিম্বের উপর উপবেশন করে এবং পুরুষ পক্ষীরা নীড় রক্ষা করিয়া থাকে। আফ্রিকার অষ্ট্রীচ বা উট-পাখীরা ৬ সপ্তাহ হইতে ২ মাস অবধি অণ্ডের উপর অঙ্গতাপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-অষ্ট্রীচ দিবসে এবং পুরুষ-অষ্ট্রীচ রাত্রিকালে অণ্ডের উপর উপবেশন করে।

সকল পক্ষীর অণ্ড এক আকারের হয় না। হামিং বার্ডের অণ্ড আকারে মটর-কড়াইএর মত হইয়া থাকে। উষ্ট্রপক্ষীর অণ্ড বর্ত্তমানে সকল পক্ষি-অণ্ডের মধ্যে বৃহৎ। ইহাদের এক একটি ডিম্ব ওজনে প্রায় তিন পাউণ্ড হইয়া থাকে। পেচক মাছরাঙা প্রভৃতির ডিম্ব সম্পূর্ণ গোলাকার হইয়া থাকে। শামুক, বক, কাদাখোঁচা প্রভৃতির অণ্ড লম্বাকার হইতে দেখা যায়। অণ্ডের মধ্যস্থিত শ্বেত বর্ণের লালা জাতীয় পদার্থে অণ্ডস্থিত ভ্রূণের পরিপোষণ হইয়া থাকে। অণ্ডের কুসুম আকারে যত বৃহৎ হয় পাখীর শাবক সেই পরিমাণ বড় হইয়া থাকে। অণ্ডের স্থূল অংশের প্রান্তভাগে পাতলা কোষের মধ্যে অল্প পরিমাণ বায়ু সঞ্চিত থাকে। অণ্ড হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বে যে অল্প সময় শাবককে অণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, সেই সময়েই এই সঞ্চিত বায়ু দ্বারা শাবকের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ডিমের খোলার গায়ে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া বায়ু চলাচল করে। শাবকের চঞ্চুর উপরে একটি ক্ষুদ্র দন্ত থাকিতে দেখা যায়। ইংরেজীতে এই দাঁতকে egg-tooth বলে। চঞ্চুতে অবস্থিত এই বিচিত্র দন্ত দ্বারা বারংবার আঘাত করিয়া অণ্ডস্থিত শাবক ডিমের খোলায় একটি ছিদ্র করিয়া থাকে এবং সেই ছিদ্রের আয়তন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া অণ্ড হইতে নির্গত হইয়া পড়ে। নির্গত হওয়ার পরে শাবকের চঞ্চু হইতে এই দন্তটি খসিয়া যায়।

মুরগীর অঙ্গতাপ প্রয়োগ

মুরগীরা প্রতিদিন ১টি করিয়া ডিম্ব প্রসব করে। সমস্ত অণ্ড প্রসূত হইলে অণ্ডগুলি একত্র করিয়া অঙ্গতাপ প্রয়োগে মনোনিবেশ করে। যাহাতে সকল অণ্ডগুলির উপর সমভাবে তাপ লাগে, তদুদ্দেশ্যে নিজ দেহের সমস্ত পালকগুলি এই কালে ফুলাইয়া রাখে এবং অণ্ডের সমস্ত অংশে তাপ প্রয়োগের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অণ্ডগুলিকে পা দিয়া উল্টাইয়া দেয়। এ সময় কুক্কুটীর আহার বা বিশ্রামের অবসর থাকে না। অনেকক্ষণ অন্তর অন্তর ক্ষণেকের জন্য উঠিয়া সামান্য কিছু খুঁটিয়া খায় এবং ভোজনানন্তর ছুটিয়া আসিয়া অণ্ডের উপর উপবেশন করে। এ সময়ে উহার অনুপস্থিতিতে ডিম্বগুলি অপসারণ করিলেও কুক্কুটীর খেয়াল থাকে না। তখন শূন্য ভূমির উপর বসিয়া সমভাবে অঙ্গ-তাপ প্রয়োগ করিতে থাকে। অণ্ডের স্থলে কাচের গুলী, খড়ির ডেলা, নুড়ি, কাঠের টুকরা বা কতগুলা হংসডিম্ব আনিয়া রাখিলেও কুক্কুটী সেগুলিকে নিজ অণ্ড বোধে তাপ দিতে থাকে। এই ভাবে হাঁসের ছানা মুরগীর দ্বারা সহজেই ফুটাইয়া লওয়া যাইতে পারে। হংসডিম্ব হইতে শাবক নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন স্বাভাবিক প্রেরণা অনুসারে জলাশয়ের দিকে গমন করে, তখন বিমাতার উদ্বেগের সীমা থাকে না। কুক্কুটী তখন আকুল ভাবে চীৎকার করিতে করিতে হংস-শাবকের পিছু পিছু ছুটিয়া যায়। ডিমে তাপ প্রয়োগের কালে মুরগীর প্রকৃতি যে কিরূপ হয় তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। এ সময়ে ইহারা চিলকেও শিকারী পক্ষীর মত আক্রমণ করিতে দ্বিধা করে না। যৌন-সম্মিলনের পর মুরগীকে অনেক সময় চুণ, বালি, খড়ির টুকরা, হাঁসের ডিমের খোলা প্রভৃতি খাইতে দেখা যায়। এই প্রকার আহার হইতে ডিমের খোলার চুণ জাতীয় উপাদান ইহারা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

দৃষ্টিশক্তি

পক্ষীদের দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ। শকুন বা গৃধ্রের আচরণ হইতে এ বিষয়ের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কোনও মৃত জন্তুর দেহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিলে ইহারা তাহার সন্ধান পায় না। এমন কি বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃত পশ্বাদির দেহের উপর উপবিষ্ট হইয়াও বস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত আহারের বিষয় বুঝিতে পারে না। আকাশে উড়িবার সময় শকুনিরা পরস্পরের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং কোথাও কোনও শকুন শবের সন্ধান পাইয়া অবতরণ করিলে আকাশচারী গৃধ্রের দল তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। তবে ঘ্রাণশক্তি দর্শনেন্দ্রিয়ের যে যথেষ্ট সহায়তা করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। শব বা গবাদির মৃতদেহ গলিত ও পূতিগন্ধযুক্ত না হইলে শকুনির ঘ্রাণেন্দ্রিয় বোধ হয় আহার নির্দ্ধারণে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে।

উড্ডয়ন

কোন্ পাখী সাধারণতঃ ঘণ্টায় কত মাইল উড়িয়া যাইতে পারে তাহার হিসাব লওয়া হইয়াছে। ছোট পাখীরা ঘণ্টায় ২০ হইতে ৩৭ মাইল উড়িয়া যায়। কাকেরা প্রতি ঘণ্টায় ২৫ মাইল, বন্য হংস ৯০ হইতে ১০০ মাইল. চাতক জাতীয় সুইফ্ট পক্ষী ৬৮ মাইল, শকুনেরা ১০০ মাইলের অধিক এবং পত্রবাহী কপোতরা ৬০ হইতে ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। শকুনরা আকাশের ঊর্দ্ধে ৬ মাইল অবধি উড়িয়া থাকে। আবার উড়িবার কালে কোন পাখী প্রতি সেকেণ্ডে কত বার পাখা নাড়ে তাহাও গণনা করা হইয়াছে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, চটকেরা প্রতি সেকেণ্ডে ১৩ বার পক্ষ সঞ্চালন করে। বন্ত-হংস প্রতি সেকেণ্ডে ৯ বার, কাক ৩ হইতে ৪ বার, সারস মাত্র দুই বার পাখা নাড়িয়া থাকে। যাযাবর পক্ষীদের দেশ ভ্রমণ কালে উড্ডয়ন শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় উহারা দলবদ্ধ হইয়া এবং আকাশের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া উড্ডয়ন করে।

জীবনী-শক্তি

কোন্ পাখী কত কাল বাঁচিয়া থাকে তাহাও কতক পরিমাণে জানা গিয়াছে। ক্ষুদ্র পক্ষীরা ২ হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ছোট পাখীরা জীবনের প্রথম বৎসরের শেষ ভাগ হইতেই প্রজনন ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া থাকে। বিলাতে চাতকরা ৭ বৎসর অবধি বাঁচিতে পারে। হাঁস ও বক ইহাপেক্ষা কিছু অধিক কাল জীবিত থাকে। একটি স্কুয়া গল্ (skua gull) স্কটলণ্ডের পক্ষিশালায় ৩২ বৎসর জীবিত ছিল। ঈগল প্রভৃতি শিকারী পক্ষীরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। একটি ঈগল-পেচক (eagle owl) বিলাতের পশুশালায় ৬৮ বৎসর জীবিত আছে। টিয়া বা তোতা জাতীয় পক্ষীরাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

লুপ্ত পক্ষী

পাখীর প্রসঙ্গে লুপ্ত পাখীর বিষয় কিছু বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারত মহাসাগরস্থিত মরিসস্ দ্বীপের ডোডো পাখী, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপের বৃহৎ অক্ পক্ষী ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের সলিটেয়ার বা "নিরালা" পক্ষী কিছু কাল পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উড্ডয়ন-শক্তির অভাবে এবং নাবিকদিগের অত্যাচারে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ইহারা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে ৭ ফুট দীর্ঘ ইপিঅরনিস নামে পক্ষহীন আর একটি সুবৃহৎ পক্ষী বাস করিত। এই সুবৃহৎ পক্ষীও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—ঐ দ্বীপে জলাভূমির মধ্যে ইহাদের সুবৃহৎ অণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অণ্ডই না কি প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের সকল পক্ষি-অণ্ডের মধ্যে বৃহত্তম। আকারে এই অণ্ড ছয়টা উট পাখীর অণ্ডের সমান। এই সুবৃহৎ অণ্ডের মধ্যে তিন গ্যালন জল ধরিয়া রাখা যায়। নিউজিল্যাণ্ডের লুপ্ত মোয়া পাখীরা বিলুপ্ত ইপিঅরনিস্ পক্ষী অপেক্ষা দীর্ঘাকার হইত। আকারে মোয়া পাখীরা উটপক্ষীর দ্বিগুণেরও অধিক হইত। এই মোয়া পাখীও ম্যাওরি জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগের উৎপীড়নে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

—সাড়া—

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন

আমার স্নায়ুতে শুনি ঝিম্‌ঝিম্ নূপুরের গান :
শ্রাবণ সায়াহ্ন ঘিরে কি মধুর বৃষ্টির নাচন,
শিহরি উঠেছে কোথা সুরে সুরে মেঘের বিতান,
আকাশে আকাশে শুধু ভীরু হাওয়া হ'ল উন্মন।

তোমাকে তোমারে ঘিরে আমার সমস্ত আশা কাঁপে :—
আর আমি ভুলে যাই, ভুলে যায় বিবাগী হৃদয়,
কোথায় সুদূর দেশে উদাসিনী দুখনিশা যাপে,
নাগরিক প্রহরেরা আত্মদানে এখানে অক্ষয়।

পায়ে পায়ে সবে চলি দূরে ফেলে এই সব দিন,—
তোমাতে আমাতে আর বর্ষাতুর সময়ের স্বাদ,
ততক্ষণে দৈনন্দিন ক্লিষ্ট প্রাণ হয়েছে আবিল,
টেনে চলা জীবনের পুঞ্জীভূত হল অবসাদ।

যদিও বেজেছে মোর স্নায়ুতে এ ক্ষীণ একতারা,
মনে মনে ভাবি তবু পাব না কি জীবনের সাড়া ?

আমাদের কথা

প্রীতিময়ী দেবী

প্রায় দিন কাগজে দেখি মেয়েদের নির্য্যাতনের অভিযোগ আর শ্বশুরবাড়ীর দুঃখের কাহিনী। মেয়েদের এ দুঃখ চিরকালের। মা-ঠাকুরমাদের আমল হতে একই ভাবে চলিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিক যুগেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এটা শুধু বধূ-নির্য্যাতন নয় নারী-নির্য্যাতনও। যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, শিক্ষা রাজনীতি অর্থনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল পরিবর্ত্তন হয়নি আমাদের পুরান ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থায়। সামাজিক বাধা-বিঘ্ন আমাদের জীবনকে যেন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। এখানে আমাদের দুঃখ আর নির্য্যাতনের সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানাইতে চাই। এ যুগের মেয়েরাও প্রায়ই উচ্চ-শিক্ষিতা। লেখাপড়া জানা মেয়েরাও সংসারের নানা-প্রকার দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ আনিতেছেন কেন? সংসারের দুঃখ কষ্ট বলিতে আর্থিক কষ্ট নহে। আমাদের মনে হয় আমাদের ত্রুটিই প্রধানতঃ ইহার কারণ। পিতামাতার নিকট কন্যা ও পুত্র ভিন্ন ভাবে শিক্ষা পাইয়া থাকে। অতি আধুনিক পিতামাতা মেয়েকে যতই লেখাপড়া শেখান না কেন, তাঁহারা নিজেদের মনোভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পিতার চাইতে মাতাই এ সব ক্ষেত্রে দায়ী। কন্যা যে পরের জন্য তৈরী হইতেছে। মেয়েদের এ সব করিতে হইবে। ছেলে মানুষ হইলে উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইবে। কন্যার জন্য পণের টাকা দিতে হইবে। মেয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইব ইত্যাদি।—মেয়েকে কথায় কথায় এ সব কথাগুলি জানান হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া মেয়েদের চঞ্চলতা, ছেলেমি আবদার অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের এ সব সাজে না বলিয়া অনেকেই উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ফলে ছেলেবেলা হইতে মেয়েরা নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া থাকে, নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিতে পারে না, কারণ তাহারা মেয়ে। যাহা সাজে বা চলিতে পারে তাহা ছেলেদের। বাড়ীতে ছোট ভাই কিংবা বড় ভাই থাকিলে তাহারা এগুলি বেশ ভালভাবে শিখিয়া থাকে। দিদি বা বোন এরা মেয়ে, এদের জন্য কিছুই হয় না বলিতেও শোনা যায়। "তোরা মেয়ে মানুষ এসব বুঝবি না।" ছোট বেলা হইতে ছেলেরা শেখে, মেয়েরা স্বতন্ত্র জগতের। লেখাপড়া শিখিলেও একদিন তাহারা ঘরের কোণেই আশ্রয় পাইবে। কাজেই তাহারাও শেখে মেয়েদের অবজ্ঞা করিতে।

মেয়েদের প্রতি এই উপেক্ষার ভাব বড় হইবার পরও পরিত্যাগ করিতে পারে না। যতই লেখাপড়া শিখুক না কেন, ছেলেদের এ মনোভাব বদ্ধমূল হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্য্যাতনের আকারে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষিত অশিক্ষিত কেহই এ মনোভাব ত্যাগ করিতে পারে না, ইহা কতকটা কুসংস্কারের সামিল। এ দোষ পুরুষদের হইলেও প্রকৃতঃ দায়ী আমরাই। পুত্র-কন্যাকে স্বতন্ত্র ভাবে মানুষ করা ও নারী পুরুষ সম্বন্ধে যে ভাব জাগাইয়া তোলা হয় ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার পরিবর্ত্তন আনিতে পারে না। এ শিক্ষার ত্রুটী আমাদের অর্থাৎ নারীর।
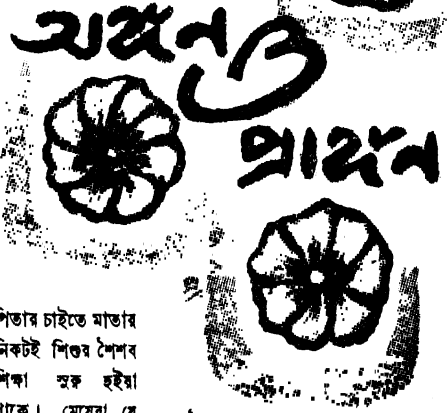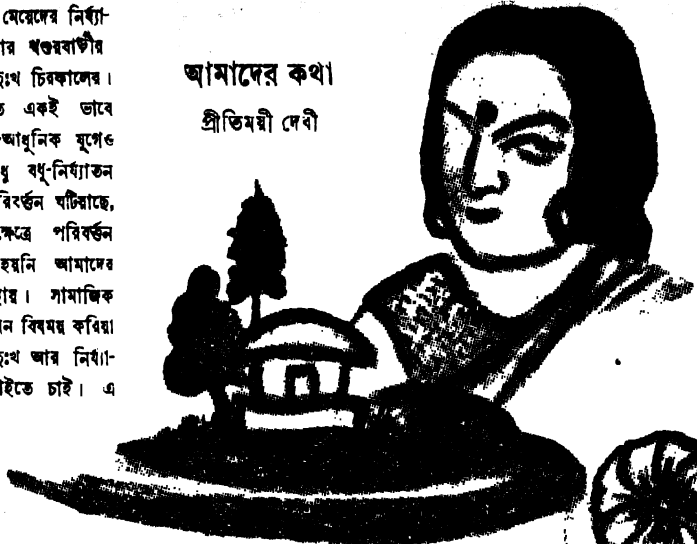
পিতার চাইতে মাতার নিকটই শিশুর শৈশব শিক্ষা সুরু হইয়া থাকে। মেয়েরা যে অনাদর অবজ্ঞা পিতৃগৃহে পাইয়া থাকে তাহার মূল কারণ হইতেছে আমাদের সমাজের পণ-প্রথা। দরিদ্র দেশে কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন পিতার পক্ষে বরের পিতার পণের দাবী মেটান যে কি কষ্টকর তাহা প্রত্যেক ভুক্তভোগীরা জানেন। পণের দাবী মিটাইতে গিয়া কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কাজেই আমাদের দেশে এক কন্যার স্থানে দুই তিনটি কন্যা পিতার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। পিতা-মাতা যে কন্যাকে স্নেহ করেন না বা ভালোবাসেন না বলি না। কন্যার প্রতি পিতামাতার করুণা মিশ্রিত স্নেহই জন্মে। অনেকেই ভাবেন, মেয়েকে মানুষ করিয়া মনের মতন করিয়া শিক্ষা দিয়া পরের হাতে দিতে হইবে। বাস্তবিক মেয়েদের জীবনের অর্দ্ধেকের বেশী অংশটাই শ্বশুরগৃহে কাটিয়া থাকে। শৈশবকাল হইতে পিতামাতা মেয়েদের যে শিক্ষাই দেন তাহা তাঁহাদের জন্য ব্যয় হয় না।

পুত্রকে মানুষ করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্তে কাটাইয়া থাকেন। তবে পুত্র কন্যা মানুষ করিতে অর্থ ব্যয় হয় প্রায় সমান। বিবাহ দিবা

কন্যাকে পরের ঘরে দিতে হয়, ইহা আমাদের সামাজিক প্রথা। মেয়েদের জীবন অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। তাদের যোগ্যতা বিদ্যা-বুদ্ধি যতই থাকুক তাহাদের সুখদুঃখ সৌভাগ্য অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

বিবাহের পর মেয়েদের সম্বন্ধে পিতামাতার দায়িত্ব কম হইয়া যায়। পিতৃগৃহের দুঃখের অভিযোগ সাধারণতঃ মেয়েরা জানে না। তাহাদের অভিযোগ শ্বশুরগৃহে আসিবার পর হইতে। লেখাপড়া শিখিয়াও মেয়েদের আর পাঁচ জন মেয়েদের মতন শ্বশুর-শাশুড়ী অন্যান্য আত্মীয়বর্গের মনোরঞ্জন করিতে হয়। সংসারে পাঁচ রকম কাজকর্ম করিতে হয়। শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা বলিয়া ইহার অন্যথা হয় না। কুমারীজীবনে মেয়েরা যে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া নিত্য নূতন সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে, বিবাহের পর তাহাদের সে স্বপ্নের সৌধ শুধু দারিদ্র্যের চাপে নয় মানুষের পেষণে ভাঙ্গিয়া যায়।

বিবাহের পর মেয়েদের নানা ভাবে কষ্ট পাইতে হয়। ভিন্ন পরিবারে ভিন্ন আচারে শিক্ষায় প্রতিপালিত হইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মাঝে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে থাপ খাওয়াইয়া চলা যে কত কঠিন তাহা বোধ হয় মেয়ে মাত্রেই জানেন। কুমারী যারা তাহারা না জানিলেও বিবাহিতা মেয়েদের এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইয়াছে। কাজেই মেয়েদের এ অবস্থায় শ্বশুর ঘরে সমতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয় তোষামোদের।

মেয়েরা যে কষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করেন তাহা কতকটা শ্বশুর-বাড়ীর লোকের উপর নির্ভর করে। মেয়ের শাশুড়ী, ননদ, জা যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের ব্যবহার আচার প্রকৃতির সঙ্গে বধূকে মিল দিয়া চলিতে হয়। বধূর আচারে ব্যবহারে ভুল ধরিয়া পাঁচ কথা শুনাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সামান্য ত্রুটী না ধরিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দিলে বধূর অসুবিধা কষ্টের অনেক লাঘব হয়। বধূর প্রতি তাঁহাদের সমবেদনা বোধ থাকা দরকার। বাহিরের চাপে মেয়েরা শিক্ষিত হইলেও ভুলিয়া যান তাঁহারা শিক্ষিতা, সংসারের কাজ করিয়া 'অবসর পাইলেও তাঁহারা সে সময়টুকুতে কিছুই করিতে পারেন না।' দু' একখানা ইংরেজী, বাংলা নভেল, বন্ধু-বান্ধব ও বাপের বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা, আর বড় জোর দৈনিক কাগজের উপর একবার চোখ বুলান। কোন কোন বাড়ীতে কাগজ পড়িবারও সুবিধা নাই। পাঁচ রকম বাজে ব্যয় করিয়া থাকেন অথচ দুআনা ৬ পয়সা মূল্যের কাগজের দাম তাঁহাদের বেশী করিয়া চোখে পড়ে। মেয়েরা বাপের বাড়ীতে যে অবাধ স্বাধীনতাটুকু পান শ্বশুর গৃহে আসিয়া তাহা পান না। বরং তাঁহাদের চলা ফেরা কথাবার্ত্তা প্রত্যেকটি অন্যের মতামতের উপর নির্ভর করে।

লেখাপড়া জানা মেয়েদের কাজের ত্রুটী থাকিলে কটুক্তি একটু বেশী শুনিতে হয়। অনেক সময় বলিয়া থাকেন "শুধু বইখানা নিয়ে স্কুল কলেজ হয় না। হাড়ী ঝাঁটা বেড়ী ধরা দুই শিখতে হয়।"

এগুলি যে করিতে হয় প্রত্যেক মেয়েরাই জানেন। ভুল সকলেরই হয় একথা কেহই বুঝিতে চান না। শিক্ষিতা বধূ পাইবার আগ্রহ ছেলের মায়ের আছে। বধূর সে শিক্ষার মর্য্যাদা দেন কোথায়? পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট বড় গলায় শাশুড়ীরা গল্প করেন, আমার বৌমা লেখাপড়া জানে, অমুক পাশ ইত্যাদি। এ প্রশংসার মূল্য কোথায় আর লোকের কাছে গল্প করিয়া মর্য্যাদাই বা তাহাদের কি বাড়িতে পারে। যাহাদের উপর তাঁহারা অসৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি যদি তাঁহাদের একটুকু সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন তবে বধূও সুখী হইতে পারে, নিজেরাও সুখী হইতে পারেন। আগের দিনে দজ্জাল শাশুড়ীদের বউ-কাটকী বলিত; এ দিনে এমন শাশুড়ীর অভাব নাই তবে অনেকাংশে কমিয়াছে। তাহা বধূদের প্রতাপে না নিজেরাই নিজের দোষ বুঝিয়া কে জানে। আজকাল ছেলেরাও চান শিক্ষিতা স্ত্রী। চান পর্য্যন্তই। স্ত্রী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলিবে। চায়ের টেবিলে চায়ের পেয়ালা সাজাইয়া অথিতি সেবা করিবে এই পর্য্যন্তই তাহাদের চাওয়া। তাছাড়া শিক্ষিতা স্ত্রীরা বাহিরের কোন কাজে আসে এটা তাঁহারা পছন্দ করেন না। ইহাতেই তাঁহারা মেয়েদের নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইতে চান। মেয়েদের প্রতি ছেলেদের উপেক্ষা-ভাব জীবনে অশান্তির মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অনেকেই তাঁহাদের শিক্ষিতা স্ত্রীর সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন সেই মামুলী ছাঁদে—"তোমরা মেয়ে হাজার লেখাপড়া শেখ মেয়েদের কাজ ঘরের বাইরে নয়। বাইরের বোঝ কি? দশ হাত কাপড়ে তোমরা কাছা দিতে পার না। তোমরা আবার মানুষ!" সৃষ্টিরক্ষা কার্য্যে নারীর প্রয়োজন। ছেলেরা মনে করেন তাঁহারা হয়ত ঐশ্বরিক শক্তি লইয়া আসিয়াছেন। বিধাতা পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন রক্ত মাংস দিয়া—রূপ শুধু ভিন্ন। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সাধনা শক্তি কম নহে। কিন্তু তাঁহাদের সে সুযোগ দেওয়া হয় কোথায়? তাঁহাদের শক্তির উৎস গৃহের কোণে চাপা পড়িয়া থাকে বলিয়া বাহিরের কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। আজকাল স্বামি-স্ত্রী উভয়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এমন স্থলে তাঁহারা যে সুখী বলিতে পারি না। উভয়ে প্রয়োজনের তাগিদে মানিয়া লইলেও স্বামীকে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের বিদ্রূপ শুনিতে হয়। মেয়েরা ঘরের মধ্যে বন্দী না থাকিয়া বাহিরে গিয়া উপায় করিবে এ যেন অসহ্য। স্বামী বেচারা মুখ ফুটিয়া স্ত্রীকে কিছুই বলিতে পারেন না। ভাবেন তিনি নিতান্তই হতভাগা। বধূ নির্ব্বাচন করিতে রূপ, রূপা ও বিদ্যা তিনটিই চাই। বিদ্যার মর্য্যাদা না দিই শিক্ষিতা বধূর দ্বারা সুবিধা পাইব অনেক। এদেশের মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারগুলিতে লেখা-পড়া, শিক্ষার চলন আছে। পুত্রবধূ ভাবী সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারিবে এই আশায় আজকাল শিক্ষিতার প্রয়োজন হইয়াছে। অশিক্ষিতা মেয়েদের দিয়া এ সুবিধাটুকু পাওয়া যায় না। লেখাপড়া অল্প জানিলে বিপদ কম নয়। স্বামী বলিবেন, মূর্খ। আত্মীয়-স্বজনেরাও বলিবেন, "লেখাপড়া জানলে এমন হয়।" মূর্খ কি না? মেয়েদের বিপদ পদে পদে।

আমরা যে নির্য্যাতনের অভিযোগ পাই তাহা শাশুড়ী ননদ জায়েরাই করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে মেয়েরাই মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিহীনা ও অধিক ঈর্ষাপরায়ণা।

শ্বশুরগৃহে মেয়েরা প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন।

[ক্রমশঃ।

স্কুলের মেয়েদের স্বাস্থ্য

শ্রীমায়া নাগ

স্কুলের মেয়েদের বেশীর ভাগই স্বাস্থ্যহানি হয় কেন? এই প্রশ্নের হয়তো উত্তর দেবার মত অনেক আছে। আজ এই প্রশ্নের জবাবে বোলবো মাত্র কয়েকটি কথা; কল্পনার জাল বুন্‌তে চাই না, যা সত্যি—সেই প্রয়োজনীয় ক'টি কথা বলচি :—

যাদের বাড়ীর কাছে স্কুল তারা স্নান করে সময় মত খেয়ে স্কুলে যেতে পারে।

যত অসুবিধা দূরের মেয়েদের, সকাল আটটায় ফার্স্ট ট্রিপে তাদের বাসে চড়তে হয়। তার মধ্যে তাদের চা খাওয়া, স্নান করা সেরে দুটি ভাত নাকে-মুখে গুঁজে যেতে হয়। এত সকালে ভাত খেতে পারা যায় না, তার উপর আবার যদি আগের দিন রাত্রে কোন কারণে পড়া তৈরী না হয় তাহলে সকালে ঐ সময়ের মধ্যে পড়াও তৈরী করতে হয়।

বাড়ী ফিরবে তারা সেকেণ্ড ট্রিপে বেলা ছ'টার সময়। সকাল ছ'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্য্যন্ত তাদের পরিশ্রম করতে হয়, তার অনুপাতে খাবার তারা পায় না। খুব দূরের মেয়েদের টিফিন আসে না। আসা সম্ভবও নয়। টিফিনে কয়েকটা চীনা বাদাম বা বিস্কুটে তো আর ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। কাজেই বাড়ী ফিরে এসে তারা দুর্ব্বলতা অনুভব করে—এতে স্বাস্থ্যের হানি হওয়া তো স্বাভাবিক।

আর একটি কথা—স্কুলে মেয়েদের টিফিন পাঠানোর সময় ঝি-চাকরদের প্রতি মায়েদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

আমি কিছু দিন বেলতলা গার্লস্কুলের সামনে আমার দিদির বাড়ীতে ছিলাম। আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি বাড়ীর ঝিয়েরা স্কুলে টিফিন নিয়ে আসবার সময় কিছু দূরে দাঁড়িয়ে খাবারের কিছু অংশ গলাধঃকরণ করে। তাদের প্রতি অভিযোগ করা অন্যায়, কারণ তারা হয়তো মনিবদের এটো পাতের কয়েক টুকরো লুচি-মণ্ডা খেতে পায়। ভালো জিনিষ দেখলে তাদের তো জিবে জল আসবেই। আমার অভিযোগ কিন্তু মায়েদের কাছেই; কারণ, ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে মায়েদেরই। তাঁরা হয়তো বলবেন—ঝি, কিংবা চাকরের হাতে খাবার পাঠান ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি, ঐ দূষিত খাবার খেয়ে আপনার মেয়ের স্বাস্থ্য কি ভাবে নষ্ট হচ্ছে? মেয়ে যখন নানা রকম রোগে ভুগবে, সেজন্য আপনাকেও বিব্রত হতে হবে। কাজেই পূর্ব্ব হতে সাবধান হোন। স্কুলে মেয়েদের ভাত পাঠাবেন না। স্কুলে ভাত খাওয়া সুবিধা নয়। যে পাত্রে খাবার দেবেন তাতে রুমাল বা তোয়ালে ঢাকা দিয়ে দেবেন না। ভাল ঢাকনীওলা পাত্রে খাবার ভরে দেবেন। যাতে মাছি না বসে বা রাস্তার ধূলা-বালি না পড়ে।

আমার মনে হয়, স্কুলে খাবার পাঠানোর পক্ষে এই যুক্তি মন্দ নয়—যে কৌটাতে তালা দেবার উপায় আছে সেই কৌটায় খাবার ভরে ঝি-চাকরদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। একটি চাবী বাড়ীতে রাখবেন আর একটি আপনার মেয়ের কাছে দেবেন।

অনেকের ধারণা, যে মেয়ে বেশি লেখাপড়া করে, তারই স্বাস্থ্য খারাপ হয়; এ ধারণা কিন্তু ভুল।

পরিশ্রম করার জন্য স্বাস্থ্যহানি হয় না—যদি বিশুদ্ধ খাঁটি জিনিষ সময় মত খেতে পায়।

রত্নাবলী

শিপ্রা দত্ত

অযত্নে অনাদরে বর্দ্ধিত সুঘ্রাণযুক্ত সুন্দর পুষ্প সকল গভীর অরণ্যে অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রস্ফুটিত হয়ে ঝরে পড়ে, কেহ তাদের সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে চক্ষু সার্থক করে না বা তাদের সুঘ্রাণের এবং রূপমাধুরীর প্রশংসা করবার সুযোগ পায় না। প্রকৃতির কোলে অনাদরে জন্মে, সকলের অলক্ষ্যে প্রকৃতির বুকেই ঝরে পড়ে। কখনও কখনও বা অকস্মাৎ তাদের সৌন্দর্য্য কাহারও গোচরীভূত হ'লে পথিক পুষ্পের রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পটিকে আপন গৃহের শোভাবর্দ্ধনের জন্য চয়ন করে নিয়ে যায়। গৃহের সকলেই পুষ্পের রূপ ও সৌরভের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত বৃক্ষের এবং মৃত্তিকার রস শোষণ করে আজ এই পুষ্পটি বর্দ্ধিত, প্রস্ফুটিত হ'য়েছে, তার সন্ধান কেউ নেয় না। এই পুষ্পের জন্মদাতার কোনও অনুসন্ধানই লোকে যেমন করে না, তেমন এই ধরিত্রীর বুকে অনেক রমণী জন্ম লাভ করেছে, যাদের উৎসাহে, প্রেরণায় উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়ে অনেক পুরুষ আজ এই পৃথিবীর বুকে আপন কীর্ত্তির দ্বারা সুযশের মালা গলায় পরে, অমর হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু সেই সব তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী, আদর্শস্থানীয়া রমণীদের কথা প্রায় কেহই জানেন না। প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত তাঁদের স্বামী, সন্তানেরা এই জগতে সবার প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে অমর হয়ে রয়েছে, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে এই সকল মহীয়সী রমণী।

কাহারও কাহারও মতে কোনও মহৎ কার্য্য—বিশেষ করে ধর্ম্ম-কার্য্য ক'রতে যাওয়ার সময় নারীর সঙ্গ ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ, নতুবা তাহাতে সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। তাই কোনও কোনও স্থানে সর্ব্বাগ্রে লিখিত থাকে—কামিনী-কাঞ্চনবর্জ্জিত স্থান। কিন্তু সব নারীকেই 'কামিনী' আখ্যা দেওয়া চলে না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। এমন অনেক রমণী আছেন, যাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে বহু মহাত্মা এই পৃথিবীতে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ ক'রতে এবং প্রচার ক'রতে সমর্থন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক জনের নাম ও দৃষ্টান্ত আজ আমি উল্লেখ করছি।

সাধু তুলসীদাসের নাম প্রায় সকলেরই জানা। ১৫৮৯ সংবতে ইঁহার জন্ম হয়। কিন্তু তাঁহার পত্নী রত্নাবলীর কথা বোধ হয় অনেকের নিকট আজও অজ্ঞাত রয়েছে এবং তুলসীদাসের ধর্ম্মজীবনে তাঁর প্রেরণা কতখানি, বোধ করি অনেকে জানেন না। তুলসীদাসের জীবনী পাঠ করে আমরা জানতে পারি, তুলসীদাসের উন্নতির প্রথম ও প্রধান সাহায্যকারী তাঁহার সহধর্ম্মিণী রত্নাবলী। কথিত আছে, একদা রত্নাবলী পিতৃগৃহে আসিবার কিছু দিন পরে তুলসীদাস বিরহ-বিচ্ছেদে পত্নীর সাক্ষাৎলাভেচ্ছু হ'য়ে শ্বশুরালয়ে গমন ক'রে পত্নীকে বলিলেন—"তোমা বিহনে আমি [illegible] জীবন ধারণ

করিতে পারিব না। অতএব তুমি বাটীতে ফিরিয়া চল।" পতির এইরূপ আচরণে পত্নী লজ্জিত হয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে স্বামীকে কহিলেন—

"লাজ না লাগত আপুকে ধোরে আয়েহু সাথ।
ধিক্ ধিক্ এ্যায়সে প্রেমকো কহা কহোঁ মৈ নাথ।
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম তামো জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরাম মহ হোত ন তও ভবভীতি।

"নাথ। আমার পশ্চাদনুসরণ করিয়া এখানে অবধি ছুটিয়া আসিতে তোমার লজ্জা বোধ হইল না? ধিক্ তোমায়, ধিক্ তোমার প্রেম ও ভালবাসায়! আমার এই অস্থি-চর্ম্ম-মাংসনির্ম্মিত নশ্বর দেহে তোমার যে পরিমাণে প্রেম ও ভালবাসা বিরাজিত আছে, উহা যদি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে চিরশান্তি লাভ করিতে পারিতে ও নিজে চরিতার্থ হইতে।" পত্নীর এইরূপ ভর্ৎসনায় তুলসীদাসের হৃদয়ে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। পার্থিব জীবে প্রেম ও প্রীতি স্থাপন অপেক্ষা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করা এবং ঈশ্বরপদে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করা শ্রেয়ঃ—তাহা তিনি উপলব্ধি কর'তে পারলেন। মুক্তির জন্য ও প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য তিনি তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা কাশীধামে প্রস্থান করেন, ক্রমে ক্রমে তিনি স্মার্ত্তবৈষ্ণব হয়ে যান এবং সংসারের সঙ্গে তাঁহার সব সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। যিনি একদা পত্নীবিরহে পদব্রজে শ্বশুরালয়ে গমন করে নিজ বাটীতে পত্নীকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেন, পরে এই পত্নীর প্রভাবে তিনি সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করে, ভগবৎপদে প্রেম প্রতিষ্ঠা করেন; এইরূপ আরও অনেক মহাত্মার জীবনে প্রতিষ্ঠার অন্তরালে তাঁদের মাতা বা স্ত্রীর প্রেরণা উৎসাহ রয়েছে। ভারতের সেই সকল মহীয়সী রমণী ভারতের বিভিন্ন নিভৃত অঞ্চলে প্রকৃতির কোলে প্রস্ফুটিত হয়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে অজস্র দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনের সাঁঝে ঝরে পড়েছে। কেউ তাদের খবরাখবর নিলে না, কেউ জানলে না এঁদের গুণ, অনাদরে অযত্নে এমনিতর বহু আদর্শ রমণীকে আমরা হারিয়েছি—এমন কি, তাঁদের জীবনগাথাও সংগ্রহ করবার সুযোগ তাঁরা আমাদের দেনি।

সুগৃহিণী

শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী

আমাদের বাঙ্গালী-সংসারে সুগৃহিণীর অভাবে অনেক সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে।

সুগৃহিণী অর্থাৎ যে নারী সংসারের সমস্ত দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসারকে পরিচালিত করেন, তিনিই সুগৃহিণী।

সুগৃহিণীর অভাবই বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। যুদ্ধের সময়ের কথা বলিতেছি না। যুদ্ধের সময়ে ত খাদ্যের অভাবে, এবং বহু সমস্ত অখাদ্য আহার করিয়া বহু বাঙ্গালী প্রাণ হারাইল।

যুদ্ধের পূর্ব্বের কথা হইতেছে।

সহরবাসী বাঙ্গালী গৃহস্থ যখন তাহাদের স্ত্রী-পুত্র পল্লীর গৃহ হইতে সহরের একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীর অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে আনিয়া আবদ্ধ করে, তখনই তাহারা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

চির পরাধীন চাকুরিজীবী বাঙ্গালী অল্প আয়ের মধ্যে বাড়ীভাড়া দিয়া স্ত্রী-পুত্র পালন করে। আহারে পড়ে চিরতরে ভাটা, থাইসিস্ বীজাণু ধরিবে ইহাতে কোন আশ্চর্য্য নাই!

পল্লীর মুক্ত বায়ু, টাট্‌কা মৎস্য, শাকসব্জী—গৃহে টাট্‌কা দুগ্ধ, এইগুলি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী সহরের রঙ্গিন নেশায় মুগ্ধ।

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন,—'পাড়াগাঁয়ে আবার মানুষে থাকে।' "অল্প বেতনের মধ্যে স্ত্রীর নিত্য-নূতন ফরমায়েস পালন করিতে পুরুষ বেচারী অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। রকমারী শাড়ী ব্লাউজের প্রাচুর্য্য…খাদ্যের দিকে শাক-চচ্চড়ি।

আর পুরুষ অফিসে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আসিয়া খালি পেটে এক পেয়ালা উষ্ণ চা' পান করিয়া ক্ষুন্নিবারণ করেন, স্ত্রীর সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই। তাহার স্নো, পাউডার, ক্রীম, রকমারী শাড়ী, ব্লাউজ চাই কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে নজর নাই।

যে বাঙ্গালী দারিদ্র্যের নিপীড়নে নিষ্পেষিত, তাহাদের ফ্যাশানের দিকে দৃক্‌পাত করা অনুচিত। সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া যাহাতে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় এবং শরীর পুষ্ট হয়, এইগুলির দিকে গৃহিণীর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শুধু পুরুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করিলে চলিবে না। গৃহিণীর নিজের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, যাহার উপর সমস্ত সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে, তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেলে সংসারে অধিক বিপদ।

যে গৃহিণী স্বীয় স্বাস্থ্য অবহেলা করিয়া শুধু স্বামি-পুত্রের আহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া সমস্ত তাহাদের-ই বণ্টন করিয়া নিজের জন্য যৎসামান্য রাখিয়া দেন, এমন গৃহিণীকে নিপুণা বলা নির্ব্বুদ্ধির কারণ।

বাঙ্গালায় এমন অনেক গৃহিণী দেখা যায়। কিন্তু গৃহিণীর স্বাস্থ্য অটুট থাকিলে সংসারে যে সকল দিকে সুশৃঙ্খলা হয় ইহা অনেক নারী বুঝেন না।

তাঁহারা বলেন;—'মেয়েমানুষ অত খাবে কেন! লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে।'…

অবশেষে ক্ষয় আরম্ভ হয়। বহু সন্তানের জননী হইয়া উত্তম আহার্য্য না পাইয়া একেবারেই লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়।

আজিকার যুগে যে দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়াছে তাহার জন্য কত নূতন ব্যাধির আমদানি হইয়াছে এই দরিদ্র বাঙ্গলাদেশে।

সেই জন্য বলা হইতেছে, বিলাসিতা একেবারে বর্জ্জন করিয়া খাদ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে। শরীর পুষ্ট হইলে রোগের বীজাণু দেহে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।

স্ত্রী কিংবা পুরুষ, উভয়ের খাদ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। পুষ্ট ও সবল শরীরে রোগের বীজাণু সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।

নারী

(জাপান)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারী-জাগরণের ইতিহাসে জাপানের প্রগতি যেমন চমকপ্রদ তেমনই মনোমুগ্ধকর।

আধুনিকদের গোষ্ঠীতে জাপান নবাগত। কিন্তু এরই মধ্যে টেক্কা দিচ্ছে আমেরিকা ও বৃটেনের সঙ্গে। তাই জাপানীদের আর একটা নামই হ'ল 'প্রাচ্য-ইয়াঙ্কি।'

জাপ-সংস্কৃতি খুব বেশী দিনের নয়; কোরিয়া ও চীনের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। জাপ অক্ষর, ভাষা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক কায়দা-কানুন সবেতেই এই প্রভাবের ছাপ আছে। তা ছাড়া জাপদের বিশেষত্ব হ'ল চটপটে ভাব ও সকল কাজে তৎপরতা। স্মরণশক্তিও খুব প্রখর। মনটা খুবই ভাবগ্রহণশীল।

অন্যান্য দেশের মত জাপানেও ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্তরের নারীদের মধ্যে খুবই পার্থক্য দেখা যায়। আগে ভয়ানক বেশী রকম ছিল, এখন আধুনিক আবহাওয়ায় অনেকটা কমে এসেছে। রাজা ও তাঁর আত্মীয়-কুটুম্বের নারীরা, সৈনিকদের নারীরা এবং দোকানদার ও চাষী, মজুরদিগের ও অন্যান্য নারীরা বিভিন্ন স্তরের। তাদের মধ্যে মেলামেশা চলতে পারে না। বহু যুগের সামন্ততন্ত্রের ছাপ এত তাড়াতাড়ি যায় না, হয়ত কোন দিনই যাবে না।

জাপানী নারীদের চরম গৌরব হ'ল সন্তানের মা হওয়ায়। অবশ্য ছেলে হলেই গৌরব বেশী, কিন্তু মেয়ে হলেও খুব একটা দুঃখ হয় না। প্রাচ্যের অনেক দেশে মেয়ে জন্মালে আত্মীয়-স্বজনরা দুঃখিত এবং বিরক্ত হন। জাপানে সেই ভাবটা অনেক কম।

সন্তান জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে সকলকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান হয়। প্রত্যেকেরই সশরীরে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। না গেলে অত্যন্ত অভদ্রতা। যাওয়াটা প্রায় বাধ্যতামূলক বলা চলে। আগন্তুকরা আসবে আশীর্ব্বাদ করতে নবপ্রসূত সন্তানটিকে আর সঙ্গে আনবে হরেক রকমের খেলনা, কাপড়, জামা। তাছাড়া শুঁটকী মাছ আর ডিম দিতে হবেই। কারণ, সেগুলি সৌভাগ্যের প্রতীক।

নতুন মা'র অবস্থা কিন্তু ভারী শোচনীয়। প্রত্যেক আগন্তুককে অভিবাদন করতে হবে, দু'-চারটে কথা কইতে হবে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য বসে থাকতে হবে, সেই দুর্ব্বল ক্লান্ত শরীর নিয়ে।

নামকরণ পর্ব্বও বৃহৎ ব্যাপার। খাওয়া-দাওয়া, নৃত্যগীত, কত কি। সাধারণতঃ বাপ অথবা কোন বিশিষ্ট বন্ধু নবাগত সন্তানের নামকরণ করে। ফুল, ঝর্ণা অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবিষয়ক নাম রাখা হয়।

এই নামকরণ ব্যাপারটা হয় সন্তান জন্মাবার সাত দিন পরে। তেত্রো দিনের দিন তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মন্দিরে দেবতার ও পুরোহিতের আশীর্ব্বাদের জন্য। তার পর কোন এক জন দেবতাকে তার বিশেষ অভিভাবক করে দেওয়া হয়।

তার পর শিশু হাসে, কাঁদে, খেলে, বড় হয়। বড় ভাই-বোনেরা ছোটদের পিঠের সঙ্গে জিম্মা করে বেঁধে খেলা করে।

একটি মেয়ে। বড় হল। জগৎকে বুঝতে শিখল। প্রচুর আশা-আনন্দ নিয়ে দেখতে লাগল তার ভবিষ্যৎ জীবন। মনোবৃত্তির দলগুলি ধীরে ধীরে খুলতে লাগল। সেই সময় থেকেই তাকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হল, নারী চিরকাল পরাধীন। তার স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকতে পারে না। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্দ্ধক্যে পুত্রের বশীভূত এবং আজ্ঞাকারী হয়ে থাকতে হবে। নারীর জীবনে এইটিই সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য। হাসিমুখে সমস্ত আজ্ঞা পালন করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, শত দুঃখে অথবা বিরক্তিতেও চোখের জল, মনের বিদ্রোহ চেপে ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটানো এই হল আদর্শ নারীর কর্ত্তব্য। তার কাজ অন্দরে—সংসার দেখা, গুরুজনের সেবা, ছোটদের আদর-যত্ন, অতিথিদের অভ্যর্থনা। বাহিরের সঙ্গে তার জীবনের কোন যোগসূত্র নেই।

লেখাপড়া অতি গৌণ। প্রধান হল সংযম। হাব-ভাবে, আচারে-ব্যবহারে মনের কথা ব্যথা যেন কোন মতে প্রকাশ না পায়। সিংদরজায় অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, মনোরম রঙের খেলা, বাড়ীর ভেতরটা ভাঙ্গা-চোরা, জীর্ণ, ধ্বংসপ্রায়। এই কৃত্রিমতার জন্য জাপানী নারীর সত্যকার জীবন কেউ দেখতে পায় না। দিনের আলোকে অপরূপ সজ্জা, বিনম্র ব্যবহার, মুখে হাসি আর রাত্রের অন্ধকারে উপাধানে মুখ লুকিয়ে সমস্ত দিনের সঞ্চিত বেদনায় গুমরে কাঁদা—এই বোধ হয় এদের সত্যকার পরিচয়।

নারীকে ভাবতে হবে শুধু পুরুষদের সুখ-সুবিধার কথা। নিজেকে যেতে হবে একেবারে ভুলে। চোখের জল, বেদনার ছাপ, পুরুষের মনকে পাছে ব্যথিত করে এই জন্য তাকে হতে হবে সদা হাস্যময়ী। তার মন, তার জীবন নিজের নয়। সে একটা পুতুলনাচের নায়িকা। দড়ি ধরা আছে পুরুষের হাতে।

জাপানী মেয়েরা গায়ে-পড়াও নয় আবার অত্যধিক লাজুকও নয়, মানে মোটেই self conscious নয়। অতি সহজ সরল ব্যবহার, অথচ তার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ছোট বয়স থেকে ক্রমাগত শিক্ষার ফলে তাদের আচার-ব্যবহার এত মার্জ্জিত হয়ে ওঠে যে, বিদেশী লোকেরা বিস্মিত হয়ে যায়। যেন মডেল-বুকের কোন মেয়ে। সর্ব্বদা হাসি, মিষ্টি কথা, মধুর ব্যবহার। বিরক্তি নেই, দুঃখ নেই, অবসাদ নেই। বিদেশীরা বাহিরটাই দেখতে পায়, কিন্তু ভেতরটা? তাদের মন চিরকালই এই সংযমের পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে।

[ক্রমশঃ।

যাযাবর

২

বৈষ্ণব-কাব্যের শ্রীরাধা কৃষ্ণ-বিরহে একদা 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর' বলে আক্ষেপ করেছিলেন। দিল্লীর কনট প্লেসকে বৃন্দাবনের রসকুঞ্জ বলে কোন মতেই ভুল করবার সম্ভাবনা নেই, তার পুরনারীরা কেউ বৃষভানুনন্দিনী নন। কিন্তু এখানকার শ্রীমতীরাও নিদাঘ রজনীতে ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করেছেন। না করে উপায় ছিল না। সমস্ত দিন ধরে মার্তণ্ডদেব এখানে যে প্রচণ্ড উত্তাপ বিকীর্ণ করেন, তাতে ঘরের ভিতরটা প্রায় টাটা কোম্পানীর অগ্নিগর্ভ বয়লারের মতো তেতে থাকে। মাথা গুঁজতে গেলে মাথা কুটতে ইচ্ছে হয়। পাখা খুলে দিলেও আগুনের হালকা লাগে। সুতরাং বাইরে ঘুমানো ছাড়া গতি নেই। শুধু মেয়েদের নয়, ছেলে-বুড়ো বাচ্চা-কাচ্চা সবারই এক অবস্থা। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর সামনের জমিতে ঘটি ঘটি জল ঢেলে উত্তপ্ত ধরণীকে করা হয় শীতল। তার উপরে খাটিয়া বিছিয়ে পড়ে সারি সারি বিছানা। দেখে মনে হয়, সরকারী হাসপাতালের তিন, পাঁচ বা সাত-নম্বর ওয়ার্ড। স্বামী, স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, ভাজ, পুত্রকন্যা সবাই শুয়েছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন, শয্যা ঘিরে নেই কোন আবরণ। অনভ্যস্ত চোখে হঠাৎ যেন একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে।

কিন্তু পৃথিবীতে অন্য আর পাঁচটা নীতিবোধের ন্যায় আমাদের শালীনতা জ্ঞানটাও আপেক্ষিক। দেশাচারের দ্বারা তার রকমফের ঘটে, প্রয়োজনের খাতিরে হয় রদবদল। কলকাতার বড়বাজারের রাস্তায় দেখা যায়, খাটো কাঁচুলী আর আঠারো গজি ঘাগরার মধ্যপথে মেদবহুল দেহের অনেকখানি অনাবৃত রেখে অসঙ্কোচে চলেছেন মাড়োয়াড়ী মহিলা। আমাদের বাঙ্গালী তরুণীদের মধ্যে কারও মতি হবে না সে সজ্জা-রীতিতে। হাঁটুর উপরে ওঠা স্কার্ট পরে ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা যাচ্ছে যত্র-তত্র। কিছু খারাপ লাগছে না চোখে। অথচ আমাদের অতি-আধুনিকাদের মধ্যে কোন দুঃসাহসিকা পারবেন না তাঁর ক্রেপ শাড়ীর ঝুল পায়ের গোড়ালী থেকে জানু পর্য্যন্ত উন্নীত করতে। যদি বা পারেন, লজ্জায় চোখ তুলে তার দিকে কেউ তাকাতে পারবো না। একই বস্তু কেমন করে শুধু মাত্র আবেষ্টন ও পরিবেশের তফাতে শ্লীল ও অশ্লীল থেকে তার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আছে সিনেমায়। শ্বশুর, ভাসুর, পুত্রবধূ ও কন্যা-জামাতা একসঙ্গে মেট্রোতে বসে গ্রেটা গার্বো ও চার্লস বোয়ারের দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন-আলিঙ্গন দেখতে যারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকার নিরামিষ প্রণয়-নিবেদন দৃশ্য তাদেরই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে, দেখেছি। শরীরতত্ত্বের আলোচনায় যে কথা বাংলায় বলতে বাধে, ইংরেজীতে তা নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করা চলে অনায়াসে।

গরমি কালে ঘরে শুলে যে দেশে জ্বরে ধরে, সে দেশে মেয়ে-পুরুষকে বাইরে ঘুমোতেই হয় এবং তিন চারটে করে আলাদা উঠান যখন শতকরা নিরানব্বই জনের বাড়ীতেই রাখা সম্ভব নয়, তখন শ্বশুর, জামাতা, মা ও মেয়ে এক জায়গায় খাট না বিছিয়েই বা করে কী? নয়া দিল্লীটা সর্ব্বজনীন সহর। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, কোশল থেকে এখানে ঘটেছে জন-সমাগম। আহারে তারা যদি বা নিজ নিজ রুচিকে রেখেছে বজায়; শয়নে মেনে নিয়েছে একই নীতি। পাঞ্জাবী মেয়েদের বসন এ রকম কমিউনিটি স্লিপিংএর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোড়ালীর কাছে আঁটা পাজামা। শিথিলবন্ধন শাড়ীর মত অলক্ষ্যে নিদ্রিত দেহের উপর অবিন্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে যে দৃশ্যটা চোখে পড়লো সে হচ্ছে সিঁড়ি-ওয়ালার ক্যাভেলকেড। দুধ, সব্জী, মাছ, মাংস, ডিম, সবই এখানে ঘরে বসে পাওয়া যায়। পসারিণী যদিও বা নেই, পসরা আসে দরজায়। মাথায় চেপে নয়, সাইকেলে। ঐ জিনিষটা এখানে অসংখ্য। কলকাতায় সাইকেল চাপতে দেখি খবরের কাগজের হকারকে। কিন্তু নয়াদিল্লীতে গয়লা, ধোবা, নাপিত, জেলে, কসাই, ফেরেওয়ালা, ব্রাউনের ছিট, গায়ের সাবান বিক্রেতা আসে সাইকেলের পিছনে মস্ত ঝুড়ি বা ঝাঁকা চাপিয়ে। মহানগরীর সওদাগরেরাও পদাতিক নয়। প্রভাতে চোখ খুলে যাকে দেখা যায় প্রথমে, তার বেসাতি দুধ। ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মতো হাড়গোড় বের করা জরাদেহ সাইকেল, তার পিছনের ক্যারিয়ারে দু'পাশে বাঁধা দুধের দুটি

টব। টিনের তৈরী, তলায় জলের মত কলের ট্যাপ, ঘোরালে দুধ বেরোয়। সামনের হাতলে ঝুলছে অনুরূপ গুটি-দুই পাত্র। আশ্চর্য্য বহন ও চলন-ক্ষমতা এই দ্বিচক্র-রথের। আশ্চর্য্যতর তার চাকা, চেন ও দুগ্ধভাণ্ডের সম্মিলিত ঐকতান বাদন। টিনের টবগুলির উপরের দিকে ঢাকনি আছে, তাতে তালা আঁটা। বলা বাহুল্য, দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ক্রেতাকে আশ্বস্ত করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা অসাবধানী লোকের ছাতায় ঘটা করে নাম লেখার মতো। 'নীরং তজ্যা ক্ষীরং গ্রহণ করতে হলে পাঁচ সের দুধকে দু'সেরে দাঁড় করাতে হয়। গয়লার পরে কলকাত্তাকা হিলশা লো, করাচীকা চিংড়ি —হাঁক দিয়ে এলো মাছওয়ালা। বলা বাহুল্য, সে ইলিশ বেশীর ভাগই বঙ্গজ নয়, এলাহাবাদের। তবে অনেক মানুষের মতো তারাও চেহারায় সব সময়ে ধরা পড়ে না, পড়ে স্বাদে। মাছওয়ালার সাইকেলের পেছনে ঝুড়ির উপরে মিহি জালের আবরণ, মাছির অত্যাচার নিবারণের জন্য। সজীওয়ালা আসে একে একে। কেউ হাঁকে "টিণ্ডা লো," কেউ হাঁকে "পালং" অথবা "গোবী"। কারো বা ঝুড়িতে আছে "টিমাটো, ভিণ্ডি, হরা ধনিয়া এবং সীতাফল অর্থাৎ কুমড়ো।" রজক বাইসিক্লের পশ্চাতে যে পর্ব্বতপ্রমাণ কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে আসে তা দেখে ত্রেতাযুগের পবননন্দনেরও বিস্ময় উদ্রেক হতে পারতো।

মেয়েদের চুল ও ছেলেদের দাড়ি দুইই সমান প্রসাধন প্রয়োজন, সময়-সাপেক্ষ। তফাৎ শুধু এই যে প্রথমটির যত্ন বৃদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল রোজ বাঁধতে হয়, দাড়ি রোজ কামাতে হয়। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে এবং যে আপিস করে সে ক্ষুরও চালায়,—এ কথা সত্য। তবুও বেণীরচনায় ভ্রাতৃজায়া বা ননদিনীর সহায়তা পেলে মেয়েরা খুশী হন; ক্ষৌরকার্য্যে নরসুন্দরের সাহায্য পেলে অনেক ছেলেরা আয়েস বোধ করে। তাই সকাল আটটা থেকে দ্বারে দ্বারে হানা দেয় হাজাম। তার সঙ্গে আছে খুব ছোট পিতলের একটি পোর্টেবল চুল্লী, অনেকটা ইকমিক কুকারের মতো আকৃতি। তাতে শীতের দিনে সর্ব্বদা জল গরম হয়। শীতের দেশের বাসিন্দারা জানেন, ডিসেম্বরের ৩৭ ডিগ্রি শীতে গালে ঠাণ্ডা জল দেওয়ার চাইতে চড় দেওয়া ভালো।

সাড়ে ন'টা থেকে শুরু হয় আপিস অভিযান। প্রথমে চাপরাশীদের দল। গায়ে খাঁকি রংএর উর্দ্দি, মাথায় পাগড়ী ও কটিতে লাল সর্পাকৃতি তিন-চার ফেরতা কোমরবন্ধ। দু'-এক জনের কোমরবন্ধে সুদৃশ্য খাপের মধ্যে হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা ক্ষুদ্র ছুরিকা। মোগল বাদশাহদের আমলের খোজা প্রহরীদের অনুকরণ। তারা অনারেবল মেম্বর বা সেক্রেটারীদের চাপরাশী। আর্দ্দালী বাহিনীতে মেজর জেনারেল। তাদের সাইকেলের পিছনে লাল খেরো কাপড়ে বাঁধা এক গুচ্ছ ফাইল, যা সাহেবেরা প্রত্যেক শনিবারই বাড়ী নিয়ে যান কাজ করার জন্য এবং বেশীর ভাগই সোমবারে ফিরিয়ে আনেন একবারও না ছুঁয়ে।

চাপরাশীদের পরে যায় কেরাণী, এ্যাসিষ্ট্যান্ট ও সুপারিন্টেণ্ডেন্টরা। সাইকেল—সাইকেল—সাইকেলের পরে সাইকেল। দেখতে ভালো লাগে। ঠিক যেন একটা সাইকেলের প্রসেশান। তার সঙ্গে আছে টাঙ্গা! সেও দ্বিচক্র যান। ঘোড়ায় টানে। সামনে ও পিছনে চার জন বসা যায় কিন্তু মুখোমুখি নয়, পিঠোপিঠি। মাথার উপরে সামান্য একটু ক্যাম্বিসের আচ্ছাদন; তাতে রৌদ্রতাপ বা বৃষ্টিধা[...] কোনটাই পুরোপুরি নিবারিত হয় না। আরোহণ অবরোহণের কা[...] পুরুষদের পক্ষে হয় জিমন্যাষ্টিকের পরীক্ষা, শাড়ী-পরিহিতাদের পক্ষে ভবাতার। একটু সতর্কতার অভাবেই পতন ও মূর্চ্ছা অসম্ভব নয়। টাঙ্গার গতি মন্থর, আসন আরামহীন এবং পরিবেশ নাসারন্ধ্রের পক্ষে ক্লেশকর। সম্প্রতি আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণার হা[...] হয়েছে বৃদ্ধি। আগে যে রাস্তাটুকুর মাশুল ছিল চার আনা, তা[...] জন্য এখন বারো আনার কমে টাঙ্গাওয়ালারা কথাই বলে না, বি[...] এমন কিছু বলে যা না শোনাই ভালো। তবে দশটা পাঁচটা[...] সেক্রেটারিয়েটের পথে মিলে সহযাত্রী। টাঙ্গাওয়ালা 'দপ্তরকো, দপ্তর যানেবালা আইয়ে' বলে চেঁচিয়ে সংগ্রহ করে সওয়ারী। তা[...] ভাড়ার অংশ বিভক্ত হয়ে পকেটের পক্ষে সুসহ হয়। ভাগের মা গঙ্গা পায় না; কিন্তু ভাগের টাঙ্গা গন্তব্যস্থল অবধি গিয়ে পৌঁছয়।

সাড়ে দশটার মধ্যে গোটা সহরটার সমস্ত মানুষেরা নিষ্ক্রান্ত হলে পথে। সব পথের একই লক্ষ্য—সেক্রেটেরিয়েট। বাবু পালালো পাড়া জুড়োলো, গিন্নি এলো পাটে।

ইম্পিরিয়েল সেক্রেটেরিয়েটটি নব নির্ম্মিত। শুধু সেক্রেটেরিয়ে[...] নয়, এখানকার বাড়ীঘর, পথঘাট, হাটবাজার সবই নতুন। নয়াদি[...] সহরটা upstart; বারাণসী, প্রয়াগ এমন কি কলকাতা [...] মুর্শিদাবাদের মতোও তার পশ্চাতে কোন tradition নেই। [...] হঠাৎ টাকা-করা ওয়ার কনট্রাক্টর, সাত পুরুষের বনেদি জমিদার নয়, কিন্তু যুগটাই যে ভুইফোঁড়দের। এ যুগে জুড়ি গাড়ীর চাইতে বেবী অষ্টিন, সাত নহবতের চাইতে মফ্‌চেন এবং খেয়াল গান অপে[...] গজলের আদর বেশী। বিত্ত হলেই হলো, নাই রইল বৈভব।

মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ কিংসওয়ে, ভাইসরয় হাউসের লৌহদ্বা[...] অবধি প্রসারিত। তারই দু'পাশে সেক্রেটেরিয়েটের দুই মহলা,—ন[...] ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, রং, রেখা, গঠনভঙ্গি হুবহু এক, যেন ময়রার দোকানে আবার খাবো বা জলতরঙ্গ ছাঁচে গড়া এ[...] জোড়া সন্দেশ। নর্থ ব্লকের সিঁড়ির মাথায় প্রস্তর-ফলকে উৎকী[...] পরিকল্পনাকার স্যার হার্ব্বার্ট বেকারের নাম। নয়াদিল্লীর প্র[...] সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বাড়ীগুলিই মুখ্যতঃ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থা[...] গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণ—যদিও পুরাপুরি নয়। থাম আর গম্বুজ আর্চের সংখ্যা কম। যা আছে তাও রোমান ধরণের অর্দ্ধবৃত্তাকা[...] মুসলিম পদ্ধতির সূক্ষ্মাগ্রভাগের নয়। থামগুলি চতুষ্কোণ ন[...] গোলাকার। নয়াদিল্লীর পত্তনে গ্রীক স্থাপত্যকে গ্রহণের পশ্চা[...] কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না তা বলা শক্ত, তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞে[...] ধারণা এই যে, জলবায়ু ও আবহাওয়ার দিক্ দিয়ে গ্রীস উত্ত[...] ভারতের সমতুল্য, যদিও তার গ্রীষ্ম অপেক্ষাকৃত সহনযোগ্য এ[...] শীত অপেক্ষাকৃত কঠোরতর। উত্তর-ভারতের মতো গ্রীসে[...] বাতাস অনার্দ্র, আকাশ নির্ম্মেঘ এবং রৌদ্র নির্ম্মল। সুতরাং গ্রী[...] স্থাপত্য নয়াদিল্লীর পক্ষে স্থায়িত্বের দিক্ দিয়ে অধিকতর উপযো[...] হবে, স্থপতিদের মনে এ বিশ্বাস দেখা দেওয়া আশ্চর্য্য নয়।

কিন্তু নয়াদিল্লীর স্থাপত্যকে পুরাপুরি কোন একটা বিশেষ সং[...] দেওয়া ঠিক নয়। সেটা ক্ল্যাসিক্যাল বটে কিন্তু নির্ভেজাল ন[...] সেক্রেটেরিয়েট দালানেও হিন্দু-পদ্ধতির [illegible] আছে—সারনাথে অশোকস্তম্ভের অনুকরণে গঠিত স্তম্ভগুলি।

ও অন্যান্য অংশে হস্তী, ঘণ্টা প্রভৃতি অলঙ্করণে। তারই সঙ্গে আছে মুসলিম স্থাপত্য রীতির পাথরের জালি, ফতেপুর সিক্রিতে চিস্তির কবরে যার বহুল নিদর্শন। রাজমিস্ত্রীরা বেশীর ভাগই এসেছে জয়পুর, রাজপুতানার অন্যান্য স্থান এবং আগ্রা থেকে। জনশ্রুতি এই যে, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাজ-নির্মাতাদের উত্তরপুরুষ। নর্থ এবং সাউথ দু' ব্লকেরই মাথায় বিরাট গম্বুজ অনেকটা রোমের সেণ্ট পল গির্জার অনুরূপ—যদিও তাকে কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চোখে দেখে মনে হয় না যে, গম্বুজ দুটির উচ্চতা কুতুবশীর্ষ থেকে মাত্র ২১ ফুট ছোট। দুটি ব্লকে মিলিয়ে সেক্রেটেরিয়েটে কক্ষ আছে প্রায় ১ হাজার, সব কয়টি মিলিয়ে বারান্দার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় আট মাইল। এলাহী কাণ্ডই বটে।

সাধারণতঃ সরকারী দপ্তরখানাটার সঙ্গে আর্টের বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। তার নামে যে দৃশ্যটি আমাদের কল্পনায় আসে তা' একরাশি নথী, পত্র, দলিল, দস্তাবেজ ও হিসাব নিকাশ। দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত টেবিলের উপর ফাইল ঘাঁটাই যেখানে একমাত্র কাজ সেখানে গৃহের গঠনভঙ্গি বা পরিবেশ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই নে। সে দালানের দেয়াল কি রংএর বা সিঁড়ি কি ধরণের সে প্রশ্ন আমাদের মনেই আসে না। পুলিশ কোর্টের দেয়ালে অজন্তার ফ্রেস্কো পেণ্টিং আমরা আশা করিনি। কিন্তু দেখলে কি খুশী হতেম না? অন্ততঃ নয়াদিল্লীর সেক্রেটেরিয়েটকে সুদৃশ্য করার চেষ্টা দেখে আনন্দিত হয়েছি।

লাল পাথরে-গড়া বিরাট ভবন, মাঝখান দিয়ে দূর প্রসারিত পথ। পথের দুপাশে শ্যামল দূর্ব্বার আস্তরণ ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। মাঝে মাঝে কৃত্রিম ঝিল, তাতে সারিবন্দী ফোয়ারা থেকে অবিরাম উৎসারিত হচ্ছে জল, পাশে পুষ্পিত মরশুমী ফুলের, ডেজী, প্যানসী, এষ্টর ও হলি হক্‌ কেয়ারী। নির্ব্বাচিত স্থানে একটি করে কমলা লেবুর গাছ, বহু যত্নে বৃত্তাকারে ছাঁটা তার ডালপালা, মনে হয় যেন ঘাটের উপর খোলা দাঁড়িয়ে আছে এক একটি ছাতা।

দালানের ভিতরটাকেও কেবলমাত্র কাজের উপযোগী না করে দর্শনযোগ্য করার প্রয়াস আছে। নর্থ ও সাউথ ব্লকে কমিটী-রুম নামক যে বৃহৎ কক্ষগুলি আছে তার সিলিং এবং দেয়াল চিত্র-শোভিত। বোম্বে স্কুল অব আর্টের শিল্পীদের আঁকা—চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ভালো কিন্তু দুঃখের বিষয় অঙ্কন-চাতুর্য্য প্রশংসনীয় নয়। এই কক্ষগুলিতে নানা রকম কমিটী, কনফারেন্স বসে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রথম প্রেস কনফারেন্সও বসলো সাউথ ব্লকের কমিটী-রুমে।

ক্রীপসের বিমান নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক বিলম্বে এসে পৌছল দিল্লীতে, বেলা তখন দুটো। সুতরাং বেলা চারটায়, মাত্র দু' ঘণ্টায় ব্যবধানে, একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকার মধ্যে তৎপরতার পরিচয় আছে যথেষ্ট। সাউথ ব্লকের সবটাই মিলিটারীর দখলে, বে সামরিক দপ্তরের মধ্যে মাত্র হোম ডিপার্টমেণ্ট আছে একটি টেরে। কারণ বোধ হয় স্বভাবনৈকট্য। ভারতে পুলিশ আর মিলিটারী প্রায় কাছাকাছি। স্বগোত্র না হলেও স্বজাতি বটে।

দরজায় কড়া সামরিক পাহারা। সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের জন্ম ইনফরমেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে ব্যবস্থা হয়েছে প্রবেশপত্রের।

প্রচুর বকশিশ ও প্রচুরতর তাড়না দ্বারা টাঙ্গাওয়ালাকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও সাউথ ব্লকের দরজায় এসে যখন অবতীর্ণ হলেন, চারটে বাজতে তখন মিনিট খানেক মাত্র বাকী। যেচোয়ার চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। কিন্তু টাঙ্গার ঘোড়াগুলি ভারতীয় যোগি-পুরুষদের মতো নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ও নির্ব্বিকার, কোন কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করা সহজ নয় বেগবৃদ্ধি, প্রায় সাধ্যাতীত। উর্দ্ধশ্বাসে রওনা হলেম কনফারেন্স কক্ষের উদ্দেশ্যে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ স্যার ফ্রেডারিক পাকল, ইনফরমেশান বিভাগের কর্ণধার। পরিচিত বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বললেন, ক্রীপসের অপেক্ষা করছেন। গোটা দুই সিঁড়ি উপরে যাচ্ছিলেন একটি শ্বেতাঙ্গ, মনে হলো সদ্য-আগত ইংরেজ বা মার্কিন রিপোর্টারদের অন্যতম। হঠাৎ পিছিয়ে নেমে এসে স্যার ফ্রেডারিককে জিজ্ঞাসা করলেন, Did you say Cripps? That's me.—এর চেয়ে বজ্রপাত হওয়া ভালো ছিল।

আমরা বিস্মিত, পাকল স্তম্ভিত, পারিষদেরা হতবাক্‌।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য, ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করতে এসেছেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব নিয়ে, আছেন ভাইসরয়ের প্রাসাদে। সুতরাং প্রেস কনফারেন্সে আসবেন বড়লাটের ক্রাউন মার্কা গাড়ী চেপে, আগে চলবে লাল মোটর সাইক্লের পাইলট সার্জ্জেণ্ট, পাশে থাকবে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা অনুরূপ কোন হোমরা-চোমরা পথ-প্রদর্শক। জমকে, জৌলুসে চিনতে বিলম্ব হবে না এক মুহূর্ত্ত। এইটেই আশা করেছে সবাই। হা হতোস্মি, কোথায় প্রাইভেট সেক্রেটারী আর কোথায় বা আগে পিছনে পিস্তল কোমরে সার্জ্জেণ্ট পাহারা! সঙ্গে একটি ভাইসরয় হাউসের চাপরাশী, বোধ করি সেও শুধু পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন্য।

সরকারী কায়দা কানুন, ফর্ম্যালিটি পরিহার করে আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল একটি পরিবেষ্টন সৃষ্টি করলেন ক্রীপস। তাঁর আন্তরিকতায় ভারতবর্ষের আস্থা গভীরতর হলো, তাঁর চেষ্টার সাফল্য কামনা করলে জনসাধারণ, তাঁর সুখ্যাতি অকৃপণ ভাষায় কীর্ত্তিত হলো সর্ব্ব প্রদেশে ও সর্ব্ব ভাষার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে।

কনফারেন্সে ক্রীপস আবেদন জানালেন সাংবাদিকদের, তাঁরা যেন ক্রীপস প্রস্তাবের সার মর্ম্ম নিয়ে পূর্ব্বাহ্নে অযথা গবেষণা না করেন। নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে মীমাংসা প্রস্তাবের কল্পিত বিবরণ প্রকাশের দ্বারা যেন অবাঞ্ছিত বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি না হয় রাজনৈতিক মহলে। বলা বাহুল্য, সে আবেদনের প্রয়োজন ছিল। সব চেয়ে বিস্ময়কর, প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রীপসের মনে অবিচলিত আস্থা। ওয়ার ক্যাবিনেটের সর্ব্ববাদি-সম্মত এই মীমাংসা-প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনায়াসে গ্রহণীয় হবে, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের বিরোধ অপনীত হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে অদম্য অভিলাষে ভারতের অগণিত নরনারী দুরূহ ত্যাগ ও দুঃসহ বেদনা বরণ করেছে তার সার্থক পরিণতি ঘটবে, এ বিষয়ে ক্রীপসের মনে সংশয়ের লেশ মাত্র ছিল না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের মনোভাব কারো অজ্ঞাত নয়, জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের প্রতি ক্রীপসের সহানুভূতি বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্দ্যও তেমনি পুরাতন তথ্য। চার্চ্চিল ইম্পিরিয়েলিষ্টদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণশীল। ক্রীপস সোশ্যালিষ্ট গোষ্ঠীতেও সব চেয়ে প্রগতিশীল।

জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন,—"এই সর্ব্ববাদিসম্মত প্রস্তাব রচনায় প্রধান-মন্ত্রী ও স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের ঐকমত্য হলো কী করে? চার্চ্চিল তাঁর মতবাদ ত্যাগ করেছেন, না কি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস বদলেছেন?" প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে ক্রীপস উত্তর করলেম, "কোনটাই নয়, দু'জনারই মতের মিল হওয়ার মতো একটা নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এর আগে চোখে পড়েনি।"

কনফারেন্স থেকে যখন বাইরে এলেম ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় ৬টার কোঠায়। অপরাহ্ন বেলার শান্তরোষ সূর্য্যের রশ্মি পড়েছে সেক্রেটেরিয়েট ভবনের রক্তাভ প্রাচীরে। সামনের ফোয়ারার উৎসারিত জল কম্পিত ধারায় বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বৃত্তাকার প্রস্তর আধারে। ঋজু, দীর্ঘ কিংসওয়ের প্রান্তভাগে দেখা যায় ওয়ার মেমোরিয়েল,—বিগত মহাযুদ্ধে মৃত ভারতীয় সৈন্যদের স্মরণলেখা যার গায়ে উৎকীর্ণ। দূরে ইন্দ্রপ্রস্থের পাষাণ-দুর্গের ভগ্নাবশেষ রূপসী তরুণীর পাশে পলিতকেশা, বিগতযৌবনা বৃদ্ধা পিতামহীর মতো নয়াদিল্লীর বর্ত্তমান বৈভবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কালের অমোঘ বিধান, অপ্রতিরোধনীয় ভবিষ্যৎ। পিছনে তাকিয়ে দেখি উন্নতশির ভাইসরয় হাউসের বিরাট গম্বুজের শীর্ষে বাতাসে মৃদু আন্দোলিত ইউনিয়ন জ্যাক,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সনাতন গৌরব-চিহ্ন। দু'শ বছর ধরে ভারতবর্ষে রয়েছে অটল, অচল, অনপনেয়। এইমাত্র যে কনফারেন্স শেষ হলো তাতে আশ্বাস ছিল ঐ পতাকার বর্ণ পরিবর্ত্তনের। সে বর্ণ গৈরিক হবে কি সবুজ হবে, তাতে চরখা থাকবে কি অর্দ্ধচন্দ্র থাকবে সে প্রশ্ন পরের। আপাততঃ এইটিই বড় কথা যে সে নতুন হবে, ভারতীয় হবে। কিন্তু সে কবে গো, কবে?

★

দুইটি চতুর্দ্দশপদী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ব্ল্যাক আউট নেই

সহরে সমস্ত ছায়া উন্মোচিত মুক্ত এত দিনে।
চৌরঙ্গীতে দীপালোক, ঝলকিত আহত নগরী।
অপগত দিনগুলি আজ ফের আনমনে স্মরি।
পুরাতন লুপ্ত আলো অবিলম্বে নিতে হয় চিনে।
দীর্ঘকাল অন্ধকারে হিংসামত্ত ক্লান্ত পৃথিবীতে
কেটেছে অনেক রাত। বিমানের অশান্ত ঘর্ঘরে
দ্বিখণ্ডিত হয়েছে আকাশ। বন্ধ্যা, শীতল মাটিতে
অনেক হাড়ের স্তূপ, মানুষ না খেয়ে পথে মরে!

আলোকের উৎস-মুখ দিকে দিকে বায় তবু খুলে।
স্থগিত হ'লো কি যাত্রা রক্তস্রাবী সন্ত্রাসে আঁধারে?
বন্ধুরা অনেকে দেখি নিরুদ্দেশ আজ পথ ভুলে।
রজনীর অন্ধকার নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারকারে।
অনেক রাতের শেষে অতর্কিত অজস্র আলোকে
সহসা বিমনা হই, ঝড় ওঠে স্মৃতি-কল্লোলকে।

এখানে

বন্দিকু হ'য়েছি আমি শব্দক্ষর ধূসর সহরে।
জনতার কোলাহলে, অজস্র যে ব্যস্ততার ভিড়ে।
যানবাহনের বেগে অঙ্গ থেকে ধূলি ঝরে' পড়ে।
সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরে কেরাণিরা বিবশ শরীরে।
সহরের উন্মত্ততা জীবিকার স্রোতে আলোড়ন
দিয়েছে অনেক ভেঙে পাখা। দেখিনি ত' নীলাকাশে
কখন উঠেছে লঘু মেঘ। যান্ত্রিক জীবনে মন
কয়েদীর মত যেন। পরিণত মোরা ক্রীতদাসে।

সহরের সীমা ছেড়ে তার পর এইখানে এসে
মন ছোটে মাঠের সবুজে। মুক্ত, শাণিত বাতাসে
কী গভীর সরলতা! উদয়-শিখরে দেখি মেশে
আকাশের নীল। পাখী গান গায়, বৃন্তে ফুল হাসে।
কৃষক উন্মুক্ত ক্ষেতে খাটে সারা বেলা। কলরব
শুধু মৌমাছির। আজ এখানে পেয়েছি এসে সব।

বাল্মীকি ও কালিদাস

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ক্রিয়াকাণ্ড-প্রধান যজুর্বেদেও দেখিতে পাই, অশ্বমেধ যজ্ঞে এক দিকে যেরূপ সমস্ত দেবতার আহ্বান এবং বন্দনা রহিয়াছে, অন্য দিকে ঠিক তেমনই সমস্ত দিক্, সব রকমের জল (প্লাবনের জল, স্থির স্রোতোহীন জল, প্রবহণশীল জল, স্যন্দমান জল, কূপের জল, ঝরণার জল, সমুদ্রের জল প্রভৃতি), বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ, (বিদ্যুতের মেঘ, গর্জ্জনকারী মেঘ, স্ফূর্জৎ মেঘ, বর্ষণশীল মেঘ, ধারাসার বর্ষণশীল মেঘ, উগ্র বর্ষণশীল মেঘ, শীঘ্র বর্ষণশীল মেঘ, গুড়ি গুড়ি বর্ষণশীল মেঘ প্রভৃতি) নক্ষত্র, নক্ষত্রিয়, অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস, ঋতু, সংবৎসর, দ্যাবাপৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, রশ্মি, বনস্পতি, পুষ্প, ফল, শাখা, ওষধি প্রভৃতির আহ্বান ও বন্দনা রহিয়াছে। (শুক্ল যজুর্বেদ ২২।২৪-২৮; আরও তুলনীয়, ৩৬।২)। যজ্ঞে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রাচ্যাদি দিক্‌সমূহ, বৎসর, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর প্রভৃতিকে আহুতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। (কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ৭।৭।১।১৫) অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে বিশ্বসৃষ্টির সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা রহিয়াছে। উষা এই অশ্বের শির, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, চন্দ্র কর্ণ, দিক্‌গুলি পদ, অহোরাত্র চক্ষুর উন্মেষ নিমেষ, পক্ষগুলি হস্তপদের পর্ব, ঋতুগুলি অঙ্গ সকল, সংবৎসর আত্মা, রশ্মি সমূহ কেশ, নক্ষত্র রূপ, ওষধি সমূহ এই অশ্বের লোম, অগ্নি মুখ, সমুদ্র ইহার উদর। (কৃষ্ণযজুর্বেদ ৭।৭।৫।২৫)। পরবর্ত্তী কালের বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই, এই যে বিশ্বসৃষ্টির বিরাট অশ্ব ইহাকে ধ্যান করিলেই ইহার ভিতর দিয়া বিশ্ব-দেবতার মহিমা উপলব্ধি করা যায়।

অথর্ব বেদের বহু স্থানেও দেখিতে পাই, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্রমা, ভূমি, আপ, দ্যৌ, অন্তরীক্ষ, দিক্, ঋতু, বাক্, পর্জন্য অহোরাত্র, বনস্পতি, ওষধি ও বীরুধ সমূহের নিকট প্রার্থনা রহিয়াছে। (১) চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চদশ সূক্তে একটি চমৎকার বর্ষার আহ্বান রহিয়াছে এবং তাহার নিকট প্রার্থনা রহিয়াছে। কবি বলিতেছেন,—বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত মেঘাবৃত দিক্‌গুলি ছুটিয়া আসুক; বায়ুর সহিত জলপূর্ণ মেঘগুলি এক হইয়া আসুক; মহাবৃষের ন্যায় গর্জনকারী বায়ু-প্রেরিত মেঘগুলির শব্দায়মান জলধারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক, শোভনদান যুক্ত মহৎ মরুৎসমূহ এই বৃষ্টিকে দেখুক অর্থাৎ বৃষ্টির সহিত মরুদ্‌গণ আমাদিগকে মহাদানে অনুগৃহীত করুক; বৃষ্টি-জলের রস সমূহ ওষধির ভিতর দিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করুক, এই বর্ষাধারা নিম্নভূমিকে পূর্ণ করুক, নানাবিধ ওষধি সমূহ পৃথক্ পৃথক ভাবে জাত হইয়া পৃথিবীকে ভূষিত এবং সমৃদ্ধ করুক। স্তবগানকারী আমাদিগকে অভ্রগুলি দেখাও; বেগযুক্ত বর্ষাধারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চলিতে থাকুক, বৃষ্টিধারা ভূমিভাগকে মহনীয় করুক,—নানা প্রকারের আরণ্য তরুলতা জাত হউক। হে পর্জন্যদেব, গর্জনকারী মরুদ্‌গণ তোমার সমীপে আসিয়া গান করুক, বর্ষার পৃথক্ পৃথক্ ধারাগুলি নিয়ে মিলিত হইয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করুক। হে পর্জন্য, তুমি গর্জন কর, মেঘগুলিকে শব্দযুক্ত কর, জলধিকে পীড়িত কর, ভূমিকে দুগ্ধসম জল দ্বারা সংসিক্ত কর। তোমার প্রেরিত বহুল বর্ষণ-সমর্থ অভ্রগুলি ছুটিয়া আসুক, ধারাসম্পাতকামী সূর্য কৃশ গোরুর ন্যায় অস্ত গমন করুক। শোভনদানশীল মরুদ্‌গণ তোমাদের মঙ্গল দান করুন, অজগরের ন্যায় স্থূল বারিধারা নামিয়া আসুক; মরুদ্‌গণদ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীর উপর বর্ষণ করুক। দিকে দিকে বিদ্যুৎ দ্যোতিত হইয়া উঠুক, দিকে দিকে বাতাস প্রবাহিত হউক, মরুদ্‌গণ কর্তৃক প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীর সঙ্গে নামিয়া আসুক। জাতবেদা অগ্নি আকাশ হইতে প্রজাগণের জন্য অমৃত ক্ষরণ করুন। সং ব্রতচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় যে দাদুরীকুল সমস্ত বৎসর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, প্রচুর জলধারা বর্ষণে সেই দাদুরীকুল এখন মুখর হইয়া পর্জন্যপ্রীতিকর রবে ভরিয়া দিক। (১)

অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডের প্রথম সূক্তে যে পৃথিবীর বন্দনা রহিয়াছে তাহা এক দিকে যেমন সহজ কবিত্বময়, অন্য দিকে সেই বন্দনার ভিতর দিয়া মাতা বসুন্ধরার সহিত মানুষের নাড়ীবন্ধন অতি দৃঢ় হইয়া দেখা দিয়াছে। নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, অরণ্য পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, ওষধি—সকলের ভিতর দিয়া সেই জননীর স্নেহ শতরূপে আমাদের উপরে বর্ষিত হোক, ইহাই কবির প্রার্থনা।

উপরে আলোচিত বৈদিক গাথাগুলি হইতে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় মনের আদিম ধারাটির সন্ধান মিলিবে। এই ধারাটিই প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে পরবর্ত্তী যুগে। এই গুলির সহিত

---

(১) অথর্ববেদ-সংহিতা, ৫।২৮।২, ৮।২।২২, ১১।৬ (৮) ।১, ১১।৬ (৮)।৫, ১১।৬(৮)।৬-৭, ১০, ১১ প্রভৃতি।

(১) সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ
সমভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো
বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু।
সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবোঽ—
পাং রসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ।
সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং
বেগাসঃ পৃথগুদ্বিজন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ।
গণাস্ত্বোপ গায়ন্তু মারুতাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্।
সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্তু পৃথিবীমনু।
... ...
অভিক্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদধিং
ভূমিং পর্জন্য পয়সা সমঙ্গ্ধি
ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষ—
মাশারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্।
সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু।
আশামাশাং বি দ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সংযন্তু পৃথিবীমনু। ইত্যাদি
(৪।১৫।১-৪, ৬-৮)

বাল্মীকির ও কালিদাসের কাব্য মিলাইয়া পড়িলে মনে হইবে, বাল্মীকির কাব্য যেমন দাঁড়াইয়া আছে কালিদাসের কাব্যের পটভূমি-রূপে, বৈদিক সাহিত্য তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে বাল্মীকির কাব্যের পটভূমি-রূপে। বৈদিক যুগে যাহা দেখা গিয়াছিল মানুষের একটা সহজ সরল বিশ্বাসরূপে, বাল্মীকির যুগে তাহারই সহিত এখানে-সেখানে কিছু কিছু কবিকল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কালিদাসের যুগে আসিয়া দেখিতে পাই, সেই আদিম বিশ্বাস কবিমানসের অবচেতনে মগ্ন হইয়াছে; তাহার উপরে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি-কল্পনা এবং কবিকল্পনাশ্রিত বিবিধ মণ্ডনশ্রী। ইহাই অতি স্বাভাবিক হইয়াছে,—এক দিকে যেমন যুগের সহিত যুগের যোগ অব্যাহত রহিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি যুগের সহিত যুগের ব্যবধানও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাস ও বাল্মীকির কাব্যে বর্ণিত প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আর একটি জিনিষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—উহা উভয় কবির ঋতু-বর্ণনা। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে ষড়-ঋতুর বর্ণনা রহিয়াছে, অন্যান্য কাব্যের ভিতরের বিশেষ করিয়া বসন্ত এবং বর্ষা ঋতুর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা পাই। বাল্মীকির রামায়ণের তিনটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা পাইতেছি।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' যে অকাল বসন্তের প্রসিদ্ধ বর্ণনা রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই বসন্ত ঐ নাটকীয় সর্গটির ভিতরে একটা জীবন্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত 'রঘুবংশের' নবম সর্গে রাজা দশরথের শিকারে ভ্রমণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বসন্তের বর্ণনা রহিয়াছে এবং 'ঋতু সংহার' কাব্যে যে বসন্তের বর্ণনা রহিয়াছে, ইহার কোন বর্ণনার ভিতর দিয়াই কবির কোন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে নাই। এই বসন্ত ঋতুকে কালিদাস নিছক সম্ভোগ-বিলাসী রসিকের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন; এই শৃঙ্গারের বিভাব স্থানীয় বসন্তের সহিত মানুষের যোগও ভোগ-স্তরল; বসন্তের অপর্য্যাপ্ত মণ্ডনকলাই এখানকার যেটুকু চমৎকারিত্ব। 'ঋতুসংহারে'র শুধু বসন্ত ঋতু নহে, ঋতুই শুধু মানুষের শৃঙ্গার-উদ্দীপক; এই এক দৃষ্টিতেই কবি সকল ঋতুর পানে তাকাইয়াছেন। ঋতুগুলির এই শৃঙ্গার উদ্দীপনার ভিতরে আমরা কবিমনের বিশেষ কোন রং লক্ষ্য করিতে পারি না। কিন্তু বাল্মীকির বসন্ত বর্ণনায় মানুষের মনের রং লাগিয়াছে। বিরহী রামচন্দ্রের নিকট পম্পাসরোবরের চারিদিকে যে বসন্ত আসিয়া দেখা দিয়াছিল, সে রামচন্দ্রের মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল।

অশোকস্তবকাঙ্গারঃ ষট্পদস্বননিস্বনঃ।
মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি। (কি-১।২১)

'অশোকস্তবকগুলিই অঙ্গার, ভ্রমরগুঞ্জনই অগ্নিনিস্বন; পল্লবের তাম্র-অর্চি লইয়া বসন্তের আগুন আমাকে প্রদগ্ধ করিতেছে।' (১) এই অবস্থাতে—

পদ্মকোশপলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ।
পদ্মকেসরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃতঃ।
নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ। (ঐ-১।৭০-৭১)

পদ্মকোশ-দলগুলি দেখিতে সীতার দুইটি নেত্রকোশের মত বলিয়াই মনে হয়; আর পদ্মকেসর-সংসৃষ্ট বৃক্ষান্তর হইতে বিনিঃসৃত বায়ু সীতার মনোহর নিশ্বাসের ন্যায়ই বহিতেছে। বসন্তে বনের বাতাসের ভিতরে যে মত্ততা আনিয়াছেন কবিগুরু সে বর্ণনার ভিতরে স্বকীয়তা রহিয়াছে।

পাদপাৎ পাদপং গচ্ছন্ শৈলাৎ শৈলং বনাদ্বনম্।
বাতি নৈকরসাস্বাদসম্মোদিত ইবানিলঃ।' (১।৮৫)

বনের চারিদিক্ নানা রকমের নানা স্বাদের মধু বুকে করিয়া ফুল ফুটিয়াছে,—আর বাতাসও অনেক রসাস্বাদে বর্দ্ধিতবৃষ্ণ হইয়াই যেন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, পর্বত হইতে পর্বতে, বন হইতে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হিমান্তে বনতরুগুলিতে এমন ভাবে ফুল ফুটিয়াছে, যেন মনে হয় তাহারা একে অন্যের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিয়া ভ্রমর-গুঞ্জনের দ্বারা একে অপরকে ডাকিয়া প্রতিযোগিতায় ফুল ফুটাইতেছে।

আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং নগাঃ ষট্পদনাদিতাঃ।
কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ। (১।১২)

এই বসন্ত সমাগমে পর্ব্বতের সানুদেশে যে মৃগটি মৃগীর সহিত ভ্রমণ করিতেছে, পম্পা-সলিলে যে কারণ্ডব পক্ষীটি তাহার কান্তার সহিত অবগাহন করিয়া প্রণয় সম্ভাষণ জানাইতেছে তাহাদের সকলের সহিতই রামচন্দ্রের একটা কোমল সহানুভূতি ব্যঞ্জিত হইতেছে।

ঘন বর্ষার রূপ বর্ণনায় বাল্মীকি অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূতের ভিতরে ঘন বর্ষার তেমন কোন রূপ নাই। তবে মেঘদূতের বর্ষার সহিত এবং সেই বর্ষাকালীন সমগ্র প্রকৃতির সহিত মানুষের যে গভীর যোগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। 'ঋতুসংহারের' বর্ষার তেমন কোন অভিনব চমৎকারিত্ব নাই, সে মানুষের শৃঙ্গাররসের আলম্বন এবং উদ্দীপনরূপেই দেখা দিয়াছে, এবং সেই শৃঙ্গারের ভিতরের বিপ্রলম্ভের রেশ অতি ক্ষীণ—সম্ভোগের সুরই প্রধান।

বাল্মীকির বর্ষার গায়ে বিরহের রং লাগিয়াছে। বর্ষার আকাশের দেহে যেন কোন দুর্ব্রণের বেদনা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাম্রবর্ণে সন্ধ্যারাগ, তাহার ভিতরে পাণ্ডুচ্ছায়া এবং চারিদিকে স্নিগ্ধ মেঘে পটচ্ছেদ যেন সেই বেদনারই আভাস দিতেছে।

সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষ্বপি চ পাণ্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্। (কি-২৮।৫)

বিরহাতুর রামচন্দ্রের চোখে আকাশের একটা আর্তি জাগিয়া উঠিয়াছে; মন্দমারুতের নিশ্বাস বহিতেছে, সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিত মেঘের ঈষৎ পাণ্ডুরতায় যেন এই বেদনা রূপ পাইয়াছে।

মন্দমারুতনিশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিতম্।
আপাণ্ডু জলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্। (ঐ ২৮।৬)

শুধু তাহাই নহে,—

এষা ধর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি।

---

(১) কিন্তু কালিদাস বলিয়াছেন,—

আদীপ্তবহ্নি-সদৃশৈর্ম্মরুতাবধূতৈঃ
সর্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্ত-সময়ে হি সমাচিতেয়ং
রক্তাংশুকা নব-বধূরিব ভাতি ভূমিঃ।
ঋতুসংহার; (ষষ্ঠ, ২১)

কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্।
নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী। (ঐ-২৮।৭, ১২-১৩)

এই ঘর্মপরিক্লিষ্টা এবং নববারিপরিপ্লুতা পৃথিবী শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায়ই বাষ্প ত্যাগ করিতেছে।...হৈম কশার ন্যায় বিদ্যুৎ কর্তৃক অভিতাড়িত হইয়া অন্তস্তনিতনির্ঘোষ আকাশ যেন সবেদন হইয়া উঠিয়াছে। নীলরেখাশ্রিতা বিদ্যুৎ বার বার স্ফুরিত হওয়ায় মনে হইতেছে, রাবণের অঙ্কে তপস্বিনী সীতার ন্যায় আমার নিকট বার বার আত্মপ্রকাশ করিতেছে।'

বাল্মীকির এই বর্ষা-বর্ণনার ভিতরে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভিতরে ঘন বর্ষার একটা মত্ত আবেগ এবং তাহার ধারা পতনের ধ্বনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দ এবং পদবিন্যাসের ভিতরেই এই বেগ এবং ধ্বনি নিহিত রহিয়াছে। প্রতি চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাসের সমাবেশ করিয়া অথবা প্রত্যেক চরণে একই পদের পৌনরুক্তি দ্বারা বর্ষার একটানা ধারা পতন ধ্বনিটির আভাস দিবার চেষ্টা হইয়াছে, আর দ্রুত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে একটা আবেগ সঞ্চারিত করা হইয়াছে।

বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি
প্রবৃত্তনৃত্যোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্নেষ্বধিকং বিভান্তি।
... ...
নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি
দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি।
জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্যা
জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ।
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা,
জাতা মহী শস্যবনাভিরামা।
বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ। (ঐ ২৮।২১,২৫-২৭)

কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনা বহু স্থানে আমাদিগকে বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়, যেমন করিয়া স্মরণ-করাইয়া দেয় এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-বর্ণনা কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনাকে। আমরা এই সব সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে পংক্তিতে পংক্তিতে ভাবে ভাষায় হবহু মিল আশা করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', 'নববর্ষা' প্রভৃতি পাঠ করিলে যেমন মনে হয়, কালিদাসের অনেক ভাবের টুকরা, অনেক দৃশ্য, উপমা, ভাষা যেন কীর্ণ হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে, তেমনি কালিদাসের কাব্যে বর্ষা-বর্ণন পাঠ করিলে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে স্মরণ হইতে থাকে—এখানে সেখানে যেন বাল্মীকির চিত্র, সুর এবং কথা ভাসিয়া আসিতেছে। বাল্মীকির বর্ণনাতেও যে পূর্ববর্তীদের স্মরণ ঘটে না তাহা নহে; তিনি যেমন বলিয়াছেন,—

গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ। (ঐ ২৮।২০)

'যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ মত্ত গজেন্দ্র সমূহের ন্যায় সমুদীর্ণনাদ মেঘগুলি গর্জন করিতেছে' আমরা কিছু পূর্বেই দেখিয়াছি, অথর্ববেদে মেঘ সমূহকে গর্জনকারী মহাবৃষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,— 'মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো'।

বাল্মীকি এই যে মেঘকে মত্তগজের সহিত উপমিত করিলেন, এই গজেন্দ্র—

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ। (২৮।২০)

এই মেঘ গজেন্দ্র, সুতরাং তাহার রাজজনোচিত ভূষণ চাই। বিদ্যুতে তাহার পতাকা, বলাকায় তাহার মালা, আর শৈলেন্দ্র শিখরের ন্যায় তাহার আকৃতি। কালিদাস বলিয়াছেন,—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর-
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতধ্বনি-
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে। (ঋঃ সঃ-২।১)

এই বর্ষাগম একেবারে 'সমাগতো রাজবদুদ্ধতধ্বনির'! জলকণ-বর্ষী মেঘ ইহার মত্ত মাতঙ্গ, তড়িৎ ইহার পতাকা আর বজ্রধ্বনি ইহার মাদলধ্বনি।(১) বাল্মীকিতে দেখিতে পাই,—

বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন। (কি-২৮।২৪)

নববর্ষায় ভূমিতে নবশাদ্বল জাগিয়া উঠিয়াছে, এই নবশাদ্বলের হরিতকান্তির মাঝে মাঝে বাল ইন্দ্রগোপের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে; এই ভূমিকে দেখিলে মনে হয়, শুকপাখীর বর্ণসম বর্ণের একখানি কম্বল লাক্ষারসের দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে এবং একটি নারী এই কম্বলে আবৃতা হইয়া বসিয়া আছে। কালিদাসে দেখিতে পাই,—

প্রভিন্নবৈদূর্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ
সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলী-দলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা
বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ। (ঋঃ সঃ—২।৫)

'দলিতবৈদূর্যমণির ন্যায় তৃণাঙ্কুরে, নবোদ্গত কন্দলী-দলে, এবং ইন্দ্রগোপ সমাবৃতা হইয়া ক্ষিতি নীলাদি রত্নভূষিতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।'

---

(১) আরও তুলনীয়—

তড়িৎপতাকাভিরলঙ্কৃতানা-
মুদীর্ণগম্ভীরমহারবাণাম্।
বিভান্তি রূপাণি বলাহকানাং
রণোৎসুকানামিব বারণানাম্।
(রামায়ণ, কি—২৮।৩১)

বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারম্
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি ।। (কি ২৮।২২)

'সলিলের অতিভার বহন করিতে করিতে এবং গর্জ্জন করিতে করিতে বারিধর মেঘগুলি পর্ব্বত সকলের বড় বড় শৃঙ্গে বিশ্রাম করিয়া করিয়া পুনরায় প্রয়াণ করিতেছে।' কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও দেখিতে পাই, যক্ষ মেঘকে বলিয়া দিতেছে,—

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ।
(মেঘদূত, পূ।১৩)

'পথে বার বার পরিশ্রান্ত হইলে পর্ব্বতের উপরে বিশ্রাম করিয়া এবং বার বার ক্ষীণ হইলে স্রোতের স্বাস্থ্যকর জল পান করিয়া গমন করিবে।'

তার পরে সেই বলাকাপংক্তি, তৃষার্ত্ত চাতক, মানসোৎসুক রাজহংস দল, সেই প্রথম মুকুলিত নীপবনে ময়ূরের নৃত্য, সেই শ্যামজম্বু বন, বননির্ঝরের প্রপাতধ্বনি, সেই কেতকীর জলসিক্ত সুরভি—ইহা বাল্মীকি ও কালিদাস উভয়ের বর্ণনায়ই ছড়াইয়া আছে।

'ঋতুসংহারে'র শরৎবর্ণনায়ও কালিদাস বাল্মীকির নিকট হইতে অনেক ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। কালিদাসের বর্ণনায় প্রথমেই দেখিতে পাই,—

কাশাংশুকা বিকচ-পদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা।
সোন্মাদ-হংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্ব-শালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা।। (ঋঃ সঃ ৩।১)

আজ রূপরম্যা শরৎ যেন নববধূর ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়াছে; কাশকুসুমে ইহার সুচিক্কণ পরিধেয় বস্ত্র, প্রস্ফুটিত পদ্মে মনোজ্ঞ মুখ, মত্তমুখর হংসের নাদে রম্য নূপুরনাদ এবং অপক্ব শালিধান্য-শোভিত ইহার তনুগাত্রযষ্টি। ১ বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই,—

সচক্রবাকানি সশৈবলানি
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্ররেখাণি সরোচনানি
বধূমুখানিব নদীমুখানি।

এই শরতে নদীমুখগুলিকে বধূমুখের মত মনে হইতেছে; কাশকুসুমের দুকূলবস্ত্রে সে মুখ অবগুণ্ঠিত, আর চক্রবাক এবং শৈবালে মিলিয়া মুখের রমণীয় পত্রলেখা রচনা করিয়াছে। (২) আবার কালিদাসের বর্ণনায় দেখিতে পাই—

চঞ্চন্মনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ
পর্য্যন্ত-সংস্থিতসিতাণ্ডজ-পংক্তিহারাঃ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা
মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য।। (ঋঃ সঃ ৩।৩)

নদীগুলি আজ সমদা প্রমদাগণের ন্যায় অতি মন্দ মন্দ চলিতেছে শরতে প্রকাশিত বিশাল পুলিনই তাহার নিতম্বদেশ, চঞ্চল মনোজ্ঞ শফরী মাছগুলি তাহার কাঞ্চীদাম,—আর উভয়তটে শোভিত শুভ্র হংসপংক্তিতেই তাহার হার। ইহার সঙ্গে আমরা তুলনা করিতে পারি বাল্মীকির বর্ণনা—

মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং
নদীবধূনাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ।
কান্তোপভুক্তালসগামিনীনাং
প্রভাতকালেষ্বিব কামিনীনাম্ ।। (কি-৬।৩০।৫৪)

মীনোপসন্দর্শিত-মেখলা নদীবধূগণের গতি আজ মন্দ,—যেন প্রভাতকালে কান্তোপভুক্তালসগামিনী কামিনীগণের গতির মত।

শরতে নদীর জল শুকাইয়া যাওয়ার যে পুলিন প্রকাশিত হয় কালিদাস পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তাহাকেই নদীর নিতম্ব দেশ বলিয়াছেন। বাল্মীকিও বলিয়াছেন—

দর্শয়ন্তি শরন্নদ্যঃ পুলিনানি শনৈঃ শনৈঃ।
নবসঙ্গমসব্রীড়া জঘনানীব যোষিতঃ।। (কি-৩০।৫৮)

কালিদাসের পূর্ব্ব-বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা বাল্মীকিতে আরও দেখিতে পাই,—

প্রকীর্ণ-হংসাকুলমেখলানাং
প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মী-
র্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্।। (ঐ ৩০।৪১)

আকুল হংসগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিয়া মেখলার শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং উৎপলের মালা রচিত হইয়াছে, এই সকল সহ উত্তম সরোবরগুলি আজ শ্রীভূষিতা বরাঙ্গনাদের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

তার পরে কালিদাসে দেখিতে পাই,—

তারাগণ-প্রবর-ভূষণমুদ্বহন্তী
মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাঙ্ক-বক্ত্রা।
জ্যোৎস্না-দুকূলমমলং রজনী দধানা
বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা।। (ঋঃ সঃ ৩।৭)

---

(১) তুলনীয়—

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী
বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং
প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্।

(২) আরও তুলনীয়,—

নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ-
র্ব্যাধূয়মানৈর্দ্রুমমারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি।। (রামায়ণ, কি ৩০।৫

তারাগণের বহিহ্ভূর্ষণ বহন করিয়া, মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত চন্দ্রের মুখ বিকাশ করিয়া আর জ্যোৎস্নার অমল দুকূল বসন পরিধান করিয়া শরতের রজনী বালা প্রমদার মত অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই,—

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা।
তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি
নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী। (কি-৩০।৪৬)

'উদিত চন্দ্রে সৌম্যমুখকান্তি, তারাগণে উন্মীলিত-চারুনেত্র, আর জ্যোৎস্নার অংশুক বস্ত্র পরিহিত শরতের রাত্রি শুক্ল-অংশুকে সংবৃতাঙ্গী নারীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।

কালিদাস বলিয়াছেন,—

স্ফুট-কুমুদচিতানাং রাজহংসশ্রিতানাং
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোমতোয়াশয়ানাং
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্। (ঋ: স: ৩।২২)

এই শরৎকালে উর্দ্ধের আকাশ যেমন মেঘমুক্ত হইয়া এবং চন্দ্র তারকায় অবকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে, তেমনই নিম্নের জলাশয়-গুলিও ঐ আকাশের মত শোভা পাইতেছে; মেঘবিমুক্ত আকাশ যেমন স্বচ্ছ নির্ম্মল মরকত-মণির তুল্যকান্তি বারিরাশি দ্বারা ভূষিত, এই জলাশয়ও তেমনি স্বচ্ছ নির্ম্মল; আকাশে যেমন চন্দ্রতারকা ছড়াইয়া আছে—স্বচ্ছ জলাশয়েও তেমনই চন্দ্রতারকার ন্যায় কুমুদ এবং রাজহংস ছড়াইয়া রহিয়াছে।

বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই,—

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্।

মহাহ্রদস্থ সলিলে হংস ঘুমাইয়া আছে, কুমুদ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—দেখিলে মনে হয় সে যেন মেঘমুক্ত রাত্রির পূর্ণচন্দ্রযুক্ত এবং তারাগণা-কীর্ণ অন্তরীক্ষ।

এইরূপে কালিদাসের শরৎ-বর্ণনা বাল্মীকির শরৎ বর্ণনাকেই নানা ভাবে স্মরণ করাইয়া দিবে। বাল্মীকির শরৎ বর্ণনার ভিতরে একস্থানে দেখিতে পাই,—

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্। (কি-৩০।৪৫)

চন্দ্রের চঞ্চল করস্পর্শে (কিরণরূপ হস্তস্পর্শে); হর্ষোন্মীলিত-তারকা (তারকারূপ চোখের তারকা) রাগবতী (আরক্তিম অনুরাগবতী) সন্ধ্যা আপনিই অম্বর (আকাশ, বস্ত্র) ত্যাগ করিতেছে। এই শ্লোকটিকে সম্মুখে রাখিয়াই যে পরবর্ত্তী কালে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোনও সংশয় নাই।—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং
তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া
পুরোঽপি রাগাদ্ গলিতং ন লক্ষিতম্।

'ঈষদুদ্বুদ্ধ রাগ বশতঃ চন্দ্র বিলোলতারক নিশামুখকে এমন ভাবে গ্রহণ করিল যে তাহার (নিশার) সমস্ত তিমিরাংশুক যে পূর্ব্বেই রাগবশতঃ খলিত হইয়া পড়িল তাহা সে লক্ষ্যই করিতে পারে নাই।' এখানেও রাগ অর্থ আরক্তিম আভা এবং অনুরাগ; বিলোল-তারক অর্থে এখানেও তারকারূপ চোখের তারকাকেই বুঝাইতেছে, 'গৃহীত' শব্দের দ্বারা প্রাপ্ত এবং চুম্বিত এই উভয় অর্থই ব্যঞ্জিত হইতেছে, তিমিরাংশুক এখানে পাত্‌লা অংশুকের ন্যায় অন্ধকারও বটে। আবার পাতলা অন্ধকারের ন্যায় রেশমী বস্ত্রও বটে, পূর্ব (পুরঃ) এখানে আগে এই অর্থেও গ্রহণ করা যায়, পূর্বদিক্‌ অর্থেও গ্রহণ করা যায়।

[ক্রমশঃ।

"হিন্দু কোড্ সমীক্ষণ"

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য

১১৪৪ সালের শেষভাগে "হিন্দু ল' কমিটি" বহু সভা ও ব্যক্তির নিজ নিজ মতামত লিখিত ও মৌখিক ভাবে গ্রহণের ব্যবস্থা করেন; তদনুযায়ী "কাশী পণ্ডিত-সমাজ" নিম্নলিখিত মন্তব্য উপস্থিত করে; এবং কমিটির আহ্বানানুযায়ী নিজ মন্তব্য মৌখিক ভাবে বলিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র লাহিড়ী এড্ভোকেট, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যাচার্য্য বি, এ, ও আমাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। ১১৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের কোনও এক সময়ে কমিটি সভাকে জানায় যে, সভার পক্ষ হইতে ১১।২।৪৫ তারিখে বেলা ১১টার সময় প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি-গৃহে উপস্থিত হইয়া নিজ বক্তব্য মৌখিক ভাবে বলিতে পারেন। আমরা তদনুযায়ী প্রয়াগে উপস্থিত হই। শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের বক্তব্য শ্রবণের পর আমার বক্তব্যের কিছু অংশ শ্রবণ করিবার পরে সভাপতি (শ্রীযুক্ত বি, এন, রাওএর অনুপস্থিতিকালে স্থানাপন্ন) শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয় সরকারী ভাবে আমার বক্তব্য শ্রবণ বা লিপিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে তৎকালে কিছু বাদ-বিসম্বাদ হয়। ফলে সভাপতিরূপে তিনি আদেশ করেন যে, আমি আমাদের সভার পক্ষ হইতে প্রেরিত লিখিত-স্মারকলিপির বাইরে কিছু বলিলে উহা লিপিবদ্ধ করা হইবে না, কমিটির সম্মুখে আমার ব্যক্তিগত মত হিসাবেও উহা উপস্থিত করা চলিবে না, কারণ, আমি সভার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, সভাপতি শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সুলভ "ধর্ম রসাতলে যাইবে" প্রভৃতি যুক্তির ও তৎসদৃশ আক্রমণই আশা করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এজন্য তাঁহাকে অবশেষে আইনের আশ্রয় (আইনটি অবশ্য আমি জানি না) লইয়া আমার বক্তব্য কমিটির সম্মুখে যাহাতে উপস্থিত না হয় তাহা করিলেন। অবশ্য তিনি পরে আমার বক্তব্য কিছু কিছু সহৃদয় ভাবে শ্রবণ করেন ও কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বেঙ্কটনাথ শাস্ত্রীকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দেন ও আমার কথার যৌক্তিকতা তাঁহাকে নিজ যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন বলিয়া আমি ও আমার বন্ধুগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ঐ ঘটনা অতীতের হইলেও এখনও সংবাদপত্রে কোড্-বিরোধী ও সমর্থকগণের নানা প্রকার আলোচনা দেখিতে পাই; সুতরাং ঐ কোড সম্বন্ধে আমার বক্তব্যগুলি যাহা (কমিটির স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী হয় নাই) এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া বিচারশীল পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। কোড্-বিরোধী ও সমর্থকগণ যদি ইহাতে কোনও অন্যায় যুক্তিতর্কের সমাবেশ দেখেন আমাকে জানাইলে আমি নিজ মতামত সংশোধন করিতে পারি। এখনও ঐ কোডের প্রতিক্রিয়া এসেম্বলী পর্য্যন্ত হইবে আশা করা যায়, সুতরাং এসেম্বলী সদস্যগণের মতামত গঠনের জন্য এখনও উহার যথেষ্ট আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ জন্য আমার বক্তব্য বিস্তৃত ভাবেই এই প্রবন্ধে লিখিত হইবে।

আমার বক্তব্য :—

১। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, আমি মনে করি যে সরকার বাহাদুর যে কোনও আইনই রচনা করুন না কেন, ধর্ম কখনও আইনের অধীন হইতে পারে না। কারণ আমাদের ধর্ম নিজ শক্তিতেই অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে ও আমাদের সত্তা স্থির রাখিয়াছে, অবশ্য ইহা আমার বিশ্বাস। সুতরাং এই কোড আলোচনা কালে উহা আমাদের ধর্মহানিকর ইহা উচ্চারণ করিতেও আমার ঘৃণা হয়। এ জন্য আমি পূর্ব্বাপর কোডের আলোচনা কালে কখনই ধর্মের কথা বলি নাই বা বলিব না ইহা স্থির করিয়াছিলাম। [অবশ্য এই সুযোগ শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় লইয়াছিলেন, কারণ আমাদের সভার স্মারকলিপিতে কন্যার দায়াধিকার ধর্মবিরোধী বলা হইয়াছিল ও তদনুযায়ী সমালোচনাও করা হইয়াছিল। যাঁহারা নিজ জীবনে ব্যভিচার পরায়ণ হইতে ইচ্ছা করেন সরকার বা তাঁহার দালালগণ তাঁহাদের সহায়তা করুন আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু আইনের নামে যুক্তি-তর্ক-হীন কতগুলি নির্বোধ উক্তি চালান যে কিরূপে সম্ভব তাহা আমি বুঝিতে পারি না। জনসাধারণ যুক্তি বা তর্কশাস্ত্রের ধার ধারে না বটে, কিন্তু সরকার যাহাদের ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন তাহাদের অন্ততঃ আইন প্রণয়নের মূল সূত্রগুলি স্মরণ রাখা বা জানা উচিত ছিল। আমার বক্তব্যে ইহাই বলিতে চেষ্টা করায় সভাপতি মহাশয় যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া কখনও বলেন যে, "ইহা ৫০ বৎসর যাবৎ এইরূপ চলিয়া আসিতেছে সুতরাং উহার পরিবর্ত্তন করা যায় না," কখনও বা বলিয়াছেন যে, "আমরা এক বিশাল হিন্দুসমাজ গঠন করিতে যাইতেছি, সুতরাং ঐরূপ দোষ অপরিহার্য্য," এমন কি ইহাও বলিতে বাধ্য হন যে, "আমি একজন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ, আমার বন্ধু (বেঙ্কট শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখাইয়া) মাদ্রাজ প্রদেশের এডভোকেট জেনারেল ছিলেন, এবং মিঃ ঘারপুরে পুণা ল' কলেজের অধ্যক্ষ, আমাদের আপনি আইন প্রণয়নের উপযোগী যুক্তি-তর্ক না-জানা অনুপযুক্ত লোক মনে করেন?" পাঠক বিচার করুন, উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হইলেই সে ব্যক্তি অন্যায় করিবে না ইহার যুক্তি কোথায়? ঐরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কি বস্তুতান্ত্রিক জগতে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় অন্যায় করিতে বা ভুল করিতে দেখা যায় না?

২। প্রত্যেক আইনের ভিত্তিতে কোনও একটি সিদ্ধান্ত ও তদনুকূল যুক্তিতর্ক থাকিতে হয় ইহা সর্ব্বজনীন সত্য। কিন্তু হিন্দু ল' কমিটি প্রস্তাবিত হিন্দু কোডে আমরা কেবলমাত্র সুবিধা, ব্যভিচার-পরায়ণতায় সুযোগ দান, ও অনর্থক সমাজকে বিরক্ত করা ভিন্ন অন্য কোনও সিদ্ধান্ত বা যুক্তিতর্ক দেখিতে পাই না, ইহাই আমার দ্বিতীয় বক্তব্য। কারণ, এই কোডের প্রথম অংশে যেখানে হিন্দুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেখানে কমিটি যে তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, বা ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ করিয়া বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। কমিটির প্রস্তাবে "যিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মাবলম্বী, এবং এই প্রস্তাব আইনে পরিণত না হইলে যিনি ইহাতে আলোচিত সমগ্র বা আংশিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে হিন্দু আইন অনুযায়ী শাসিত হইতেন, তিনিও তত্তদংশে হিন্দুপদবাচ্য" (খসড়া হিন্দু কোড ইংরাজী সংস্করণ ১ম পৃষ্ঠা) এরূপ খামখেয়ালী আবগারী বিভাগে নিয়মিত অনুগৃহীত ব্যক্তি করিলে শোভা পায়। এইরূপ করিবার হেতু প্রদর্শন মানসে কমিটি টিপ্পনীতে বলেন যে "Mayne" সাহেবের লক্ষণটিতে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে বিবেচনায় বিবাদাস্পদ স্থলগুলি আমরা পরিষ্কার ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র। ঐ

লক্ষণটি এইরূপ—"যিনি ধর্ম্মবিশ্বাসে হিন্দু, এবং যিনি জন্মতঃ হিন্দু অথচ মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্মবিশ্বাসী নহেন তিনি হিন্দুপদবাচ্য।" ইনি বলেন আমায় দেখ, উনি বলেন আমি ওঁদের বাদ না যাই, এই অবস্থা।

লক্ষণের প্রাণভূত বস্তু যে অসাধারণ-ধর্ম্ম (differentia) তাহার সম্বন্ধে ইঁহাদের জ্ঞান অতুলনীয়। Mayne সাহেবের বুদ্ধিতে যিনি ধর্ম্মবিশ্বাসে হিন্দু (অথচ জন্মতঃ হিন্দু নহেন), এবং যাঁহার পিতা-মাতার হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস আছে (অথচ নিজের নাই) এমতাবস্থায় সুবিধা ভোগের জন্যই মুসলমান বা খৃষ্টান হন নাই এমন দুই ব্যক্তিই সমান ধর্ম্মাক্রান্ত (অবশ্য তর্কশাস্ত্রীয় পরিভাষায় এই ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে)। ইঁহাদিগকেও সরকার হিন্দু আইনের বিশেষজ্ঞ বলেন। আবার দেখুন, কমিটির বিবেচনাপূর্ণ টিপ্পনীতে আছে—যাহারা জন্মতঃ বৌদ্ধ, জৈন, শিখ তাহাদের ধর্মকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকারমাত্র বিবেচনা না করিলে (যাহা কখন কখন বিবাদাস্পদ হইয়া থাকে) উহারা যে হিন্দু আইন অনুযায়ী চলে তাহাতে বাধা হয় সুতরাং কমিটি বিরোধ পরিহার মানসে হিন্দুর লক্ষণ বাক্যে ঐগুলি (বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ শব্দগুলি) নিবিষ্ট করিয়া দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পরন্তু আমার মনে হয়, কমিটি যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিলেও তাঁহাদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। কারণ, টিপ্পনীতে তাঁহারা যেমন কোচ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তদ্রূপ খোজা সম্প্রদায়ের মুসলমানগণের উল্লেখ করা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা করিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে, ঐ খোজা সম্প্রদায় তাঁহাদের মতে পঞ্চম প্রকার হিন্দু লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। উহা কি তাহারা স্বীকার করিবে? অগত্যা তাহারা বাধ্য হইয়া আমাদের শাস্ত্রীয় দায়াধিকার গ্রহণ না করিয়া কোনও এক প্রকার মুসলমান আইনই গ্রহণ করিবে; ফলে হিন্দু আইনের প্রয়োগ-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবে। অবশ্য তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই কিন্তু মহা বুদ্ধিমান কমিটি যে বৌদ্ধ ও জৈনগণকে হিন্দু আইনের সুশীতল ছায়ায় আনিবার জন্য ব্যগ্র (অবশ্য তাহারা পূর্ব্ব হইতেই আছে) হইয়া এই প্রস্তাব করিলেন তাহাদের মিলিত জনসংখ্যায় প্রায় তুল্যসংখ্যক জনগণকে বাধ্য হইয়া হিন্দু আইনের আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে। বিবেচনাপূর্ণ কার্য্যই বটে।

তার পর দেখুন, কমিটির মতে যেহেতু বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ-দিগের কোনও আইন নাই আমাদের আছে এবং উহা তাহারা মান্য করিয়া থাকে অতএব আমাদের সংজ্ঞাবাচক শব্দটির অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া খামখেয়ালীপূর্ণ অর্থ নির্দ্দেশ করা হউক। বৌদ্ধ বা জৈন-গণ যেহেতু হিন্দু আইন মানে অতএব উহাতে তাহাদের মতানুসারে পরিবর্ত্তনও হওয়া আবশ্যক। যুক্তি বটে! কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, হিন্দু সমাজ কি তাহাদের পায়ে পড়িয়া বা মিশনরী পাঠাইয়া ঐ আইন মানিতে বৌদ্ধ বা জৈনদের স্বীকার করাইয়াছিল? তাহাদের যাহা নাই তাহা তাহারা অপরের নিকট ধার করিয়াছে মাত্র। তজ্জন্য আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে কোনও পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করা উন্মাদের কার্য্য। (আমি ইহা কোন প্রকার ধার্মিক দৃষ্টিতে বলিতেছি না) এইরূপ কার্য্য করিতে থাকিলে অন্যান্য সম্প্রদায়ও (খৃষ্টান, মুসলমানগণও) অনুরূপ পরিবর্ত্তনও দাবী করিতে পারে কি না? মোট কথা, উন্মাদ ভিন্ন কোন সুস্থ ব্যক্তি এরূপ যুক্তি উপস্থিত করিতে সাহসী হয় যে, যেহেতু আমি তোমার বাড়ীতে ভাড়া দিয়া আছি, অতএব এই বাড়ীর মালিকের নামের স্থানে আমার নামও বসাইয়া লইতে হইবে, এবং তোমার অন্যান্য সম্পত্তিতেও আমার ইচ্ছানুযায়ী রদ-বদলাদি হইতে পারিবে। কমিটির সুপারিশ কি উক্ত আবদারের সদৃশ নয়? কমিটি যদি কোনও উপযুক্ত কারণ দেখাইতে সমর্থ হয়, তবে অবশ্য ইহা বিবেচনার বিষয় যে, হিন্দুর লক্ষণে বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতির সমাবেশ করা উচিত কি না? কোনওরূপ ভাবাবেগে চালিত হওয়া চলিবে না, কঠোর বাস্তবতার ভিত্তিতে উহা প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহা কমিটির মস্তিষ্কে আছে কি? আমার মনে হয় না। মোট কথা, হিন্দুর লক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া যেমন Mayne সাহেব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, (অবশ্য যদি রাজনৈতিক কারণে তিনি ঐরূপ নির্বোধ সাজিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি ধন্যবাদার্হ। সে ক্ষেত্রে নির্ব্বুদ্ধিতার ভাণও বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ কি?) তদ্রূপ কমিটিরও ঐ ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রতিভা দৃষ্ট হয়। ইহার পরও তাঁহারা অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকারূপে কয়েকটি উদাহরণ সন্নিবেশ করিয়াছেন।

তন্মধ্যে (b) চিহ্নিত উদাহরণটি যে কত ভয়ঙ্কর তাহা বুঝিবার ক্ষমতা বোধ হয় কমিটির নাই। এই উদাহরণটিকে অভিভাবক নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনের আলোচনা কালে সমালোচনা করিব। এবং দেখা যাইবে ইহার ফলে দুই সম্প্রদায়ের যে বিরোধ (হিন্দু-মুসলমানের) এখন আছে, তদপেক্ষা ভয়ানক বিরোধের সৃষ্টি কমিটী বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অজ্ঞাতসারে করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। এবং যাহা নিজেরাই জানেন না বা জানিলেও স্বীকার করিতে সাহসী নহেন, সেইরূপ কথা স্বীকার করিবার ভয়ে এই উদাহরণে কতগুলি অর্থহীন কথা বলিয়া সমাজ-সংস্কারক নামে কথিত হুজুগে লোকের হাততালি মাত্র লইয়াছেন। এবং তাঁহারা জানেন যে, ইহাতে কত বেশী বিবাদ সৃষ্টি হইবেই। কারণ, হিন্দুভাবে প্রতিপালিত হইলে মুসলমান-পত্নীর গর্ভে হিন্দু-পতির পুত্রও হিন্দু হইবে, ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুভাবে প্রতিপালন কাহাকে বলে, তাহা না বলিলে কয়েক জন অদূরদর্শীর বাহবা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বিচারকগণের পক্ষে এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করা হয় মাত্র। সে স্থলে প্রচলিত আচার-ব্যবহারকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু বা মুসলমান নির্ণয় করিতে হইবে অথচ কমিটী প্রচলিত নিয়মগুলিকে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অস্বীকার করিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ পুরাতন নিয়মগুলির উপর নির্ভর করিয়াই কতগুলি দেশাচার ও কুলাচার দাঁড়াইয়া আছে। সেই মূলটি কাটিয়া শাখাটিকে তাঁহারা রক্ষা করিতে ব্যগ্র।

(c) চিহ্নিত উদাহরণটি দেখিলেই কমিটীর সাধুতার আবরণের মধ্য দিয়াও লোলুপ দৃষ্টির প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা হিন্দু সমাজের [সে হিন্দু-পদে যাহাই বুঝি না কেন] মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় সাধু চেষ্টা করিয়া হিন্দু সমাজের হিতৈষী সাজিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি বলা যায় যে, কংগ্রেসের creed-এর বিরোধ করিলেও সে কংগ্রেসী থাকিবে ও কংগ্রেসীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে, এরূপ আইন রচিত হইলে আজ যে সমস্ত ব্যক্তি কংগ্রেসের disciplinary punishment [শৃঙ্খলা

ভঙ্গের শাস্তি] ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের সমর্থন পাওয়া যায় কিন্তু তাহা পাওয়া গেলেই কি কংগ্রেসের পক্ষে ইহা হিতকর হয়? আর ইহা কি বুঝার মত ক্ষমতা কমিটীর নাই যে, প্রত্যেক সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা আবশ্যক এবং যে ব্যক্তি সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অবশ্যই সামাজিক সুখ-সুবিধা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা আবশ্যক। ইহাকে অনুদারতা যাহারা বলে তাহারা মূর্খ। তাহারা জগতের সামান্য জ্ঞানও রাখে না। তাহারা ইংরেজের রাজনৈতিক কারণে আমাদের সমাজনাশ করার প্রচেষ্টার একটা জড় যন্ত্রের ন্যায় মাত্র। আমরা তাহাদের ঘৃণা করি। সমাজ যত উদারই হউক না কেন, তাহার শৃঙ্খলা রক্ষা আবশ্যক। ইহা বুঝিবার মত বুদ্ধি সম্ভবতঃ কমিটীর আছে ; তবে তাঁহারা (c) চিহ্নিত উদাহরণে কথিত ব্যক্তিকে হিন্দু বলিয়া বাহাদুরী দিয়া ছাড়িয়া দিলেন কেন, তাহার কারণ বুঝা অতি সহজ। অবশ্য আমি এ কথা বলি না যে, আমাদের মতে অনাচারসম্পন্ন ব্যক্তি হিন্দু নয় কিন্তু ঐ ভাবে উহা প্রকাশ না করিলেও যেমন পূর্ব্বের উদাহরণে কাজ চলিতে পারে আশা করা যায়, তদ্রূপ এ স্থলেও তাহা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ না বলিলেও ইহা বুঝা যায় যে, যে মহাপুরুষ "has merely deviated from the orthodox practices of his religion" তাঁহাকে আইনে অহিন্দু বলা হয় না? হইলে অনেকেরই কি গতি হইত ভাবিতেও কষ্ট হয়। পরন্তু, কমিটী ইহা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া দিয়া উঁহাদের শৃঙ্খলা-ভঙ্গ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছেন মাত্র। ইহা ব্যভিচার-পরায়ণতার দালালী ভিন্ন কি বলা যায়?

(d) চিহ্নিত উদাহরণে ব্রাহ্মসমাজ-প্রবিষ্ট ব্যক্তিকেও হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ভাবে ইহুদী, পার্শীরাও বাদ পড়ে কেন? কারণ, ব্রাহ্মগণ—যাহারা জোর গলায় এক সময়ে নিজেরা হিন্দু নয় বলিয়া প্রচার করিয়াছে, তাহাদের হিন্দু বলিতে বাধ্য করার চেষ্টা অনেকটা অস্ত্রবলে ধর্মপ্রচার তুল্য নহে কি? ঐ দৃষ্টান্তে পার্শী ও ইহুদীদিগকে (যাহারা ভারতে আছে), হিন্দু বলিলে কমিটীর অভিলষিত বিশাল হিন্দু সমাজ সংগঠনের কার্য্য আরও ভাল হয়।

যাহা হউক, হিন্দুর এইরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে ফলতঃ আমরা ও বৌদ্ধরা, একযোগে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইব। ইহা আমি পরে দেখাইব। লাভের কোনও আশাই ইহা দ্বারা করা যায় না। দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিকে শাস্তি দান করিয়া উপযুক্ত পথে লইয়া যাওয়া যায়। তাহাকে খুসী করিতে গেলে কোনও সময়ে প্রাণান্তকর ব্যাপার হইতে পারে। সুতরাং স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ ব্যক্তির কার্য্যে সহযোগিতা না করিয়া তাহাতে বাধা দেওয়াই সমাজহিতৈষী ব্যক্তির,° বিশেষতঃ সামাজিক অনুশাসন-প্রণেতার কর্ত্তব্য। আমি জানি যে, এই বিশাল জনসমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে একই আদর্শে পরিচালিত করা কত কঠিন। ইহা জানা সত্ত্বেও চিন্তাশীল যে কোনও ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, একটা আদর্শ সকলের পক্ষে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ভাবে অনুসরণ করা কঠিন হইলেও সমাজের পক্ষে সকলকে একই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করা তত কঠিন নয়। এবং সমাজের একটা প্রধান কার্য্যও তাহাই। এই বিংশ শতাব্দীর মনু-যাজ্ঞবল্ক্যগণের ঘটে একটু বুদ্ধি থাকিলেও ইঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, সামাজিক আইন সমাজকে সুসংগঠিত করিবার জন্যই আবশ্যক, এবং সুসংগঠন শৃঙ্খলা ব্যতীত হয় না এবং শৃঙ্খলা তখনই রক্ষিত হয় যখন শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই নবীন ধর্মশাস্ত্রকারগণ বুদ্ধির অল্পতা বা অন্য কারণে হিন্দু হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা কি যাহা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক হিন্দুতে থাকা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু, সমাজ গঠনের নামে সমাজের শৃঙ্খলাভঙ্গকারিগণকে সকল সুবিধা দিয়া আমাদের সমাজকে বিশৃঙ্খলাক্লিষ্ট করিয়া অবশেষে ধ্বংস করার মতলব গোপন করিয়া সমাজহিতৈষীর ছদ্মবেশে বোকা ঠকাইয়া হাততালি লওয়ার কাজে ব্যস্ত মাত্র। ইহাদিগকে ইহাদের দোষ প্রদর্শন করিলেও ইহারা বুঝিতে চায় না এবং বুঝিলেও Mayne সাহেবের ৫০ বৎসর যাবৎ প্রচলিত লক্ষণকে উপজীব্য মনে করে এবং উহা অপরিবর্ত্তনীয় মনে করে। অথচ ইহারাই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার প্রচলিত নিয়মগুলি পরিবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। ইহারাই সবকারের বিচারে হিন্দু আইন প্রণয়নে সর্বাপেক্ষা যোগ্য। ইহাদের অবস্থা দেখিলে মনে হয়, "হতে ভীষ্মে হতে দ্রোণে কর্ণে চ বিনিপাতিতে।

আশা বলবতী রাজন্ শল্যো জেষ্যতি পাণ্ডবান্।"

হায় আইন-প্রণয়ন!

ফলতঃ, সংজ্ঞা-প্রকরণের হিন্দুর লক্ষণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপেতঃ এই যে, আইনের মূল ভিত্তি যে তর্কশাস্ত্র (logic) তাহাতে অনভিজ্ঞতার জন্য বা ইচ্ছাপূর্ব্বক, এই কমিটী হিন্দুর যে লক্ষণ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে হিন্দুত্বের ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ণয় না করিয়াই, কেবল ক্ষমতাবলেই কে হিন্দু, কে নহে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধনের চেষ্টায় আছেন। ইহা তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত হইলে তাঁহারা হিন্দু সমাজের ছদ্মবেশী শত্রু ও তাঁহাদের উপর হিন্দু সমাজের বিশ্বাস স্থাপন করা আত্মহত্যার তুল্য। এবং পক্ষান্তরে ইহা অনিচ্ছাকৃত হইলে তাহারা অকর্মণ্য, তাহাদের হস্তে এরূপ গম্ভীর কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত নহে।

তার পর দেখুন, লোকাচার বা দেশাচার সম্বন্ধে কমিটীর ধারণা কিরূপ। তাঁহারা বলেন যে, যে সমস্ত আচারকে আমরা ছাড়পত্র দিব না তাহাদের কোনটিই এই আইনের বিরোধী হইলে গ্রাহ্য হইবে না ; যদ্যপি ঐ লোকাচারগুলি "has obtained the force of law among the Hindus in any local area" ইত্যাদি। ইহা দেখিলে মনে হয় যে, "যৎকিঞ্চ বৈ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্" না বলিয়া এখন বলিতে হইবে "যৎকিঞ্চ বৈ কমিটী র্বদিষ্যতি তৎ ভেষজম্"। কারণ হিন্দু সমাজে কোন্ আচার চলা উচিত বা নয় তাহা তাহারা এক কলমের খোঁচায় (যদিও তাহাদের মধ্যে force of law আছে তথাপি) বাতিল করিয়া আমাদের উপকার অবশ্যই করিবেন। কারণ, তাঁহারা আমাদের জন্য যাহা নির্দ্দেশ করিবেন তাহাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইতে বাধ্য। ইহাদের কথায় সেই স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের, তিনকড়ি শর্ম্মা'র কথাই মনে পড়ে। সেই শর্ম্মা যাহা ভাবিতেন তাহা সমস্তই "সূক্ষ্মতত্ত্ব অদ্ভুত প্রামিত দর্শন" হইত। তদ্রূপ ইহারাও যাহা ঠিক করিয়া দিবেন সবই হিন্দু সমাজের উন্নতিকর। (খসড়া হিন্দুকোড, ইং স পৃঃ ১—২, নিয়ম ৩—৪)।

অতঃপর আমরা পাঠকের সম্মুখে কমিটীর সংজ্ঞা প্রণয়নের আবশ্যকতা জ্ঞানের আর একটি পরিচয় দিব। সাধারণতঃ নিয়ম এই যে, সংজ্ঞা কখনও অনাবশ্যক প্রণীত হওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক সংজ্ঞার বিশেষ প্রয়োগ স্থল থাকা আবশ্যক। অন্যথা উহা ব্যর্থ কার্য্য হয়। প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক যুগের মনুযাজ্ঞবল্ক্যগণ স্ত্রীজাতির ধনসম্পত্তির উপর স্বত্ব দুই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুযায়ী উহার দায়াধিকারও সমান নহে, এ জন্য বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত বিশেষ প্রকার স্বত্ববিশিষ্ট ধনের সংজ্ঞা স্ত্রীধন করেন। উহা দ্বারা সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির অধিকৃত সম্পত্তিতে যে অধিকার থাকে তদপেক্ষা বিলক্ষণ অধিকার ঐ স্ত্রীধনে থাকে ইহা দ্যোতিত হয়। যাহা হউক, বর্ত্তমান ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা কমিটীর মনে বোধ হয় এই ধারণা হইল যে, যেহেতু মনু প্রভৃতি "স্ত্রীধন" সংজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং আমাদেরও উহা করা আবশ্যক। অবশ্য উহার আবশ্যকতা থাকুক বা না থাকুক। এ জন্য তাহারাও নিজ প্রস্তাবের ৩য় পৃষ্ঠায় ৫নং নিয়মের (i) চিহ্নিত অনুচ্ছেদে উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। করুন আপত্তি নাই কিন্তু তাঁহাদের অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে এই অতি স্থূল বিষয়টি অবশ্যই প্রবেশের সুযোগ পায় নাই যে, তাহাদের রচিত স্ত্রীধনের সংজ্ঞার পর স্ত্রীলোকের দায়াধিকার নিরূপণ করিতে যাওয়া অপেক্ষা কেবল স্ত্রীজাতির উত্তরাধিকার নির্ণয় করিয়া দেওয়াই সহজ ও উচিত, ব্যর্থ একটি সংজ্ঞার কোনও আবশ্যকতা নাই। যাহারা নিয়ম প্রণয়ন করিতে গিয়া কি ভাবে নিয়ম প্রণয়ন করিলে নিয়মের লাঘব হইবে বুঝিতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে নিয়ম প্রণয়ন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র নহে কি? এতৎ সম্পর্কে অবশিষ্ট বক্তব্য স্ত্রীধনের বিভাগ সমালোচনা কালে উপস্থিত করিব।

— নীল মাঠ—

রবীন চৌধুরী

এখানে মাঠেরা মিলে
পিঠে পিঠে আর মাছে গাছে জংগলে
ডুবে গেছে সাগরের নীল লোণা জলে।
এই সব নামো-মাঠে সাগরের নীল
নীল বন—শুধু ধূ ধূ নীল।

আহা এই মাঠে মাঠে ধান হোতো যদি,
পাখীর কথার ঝড়ে ধান বন ভেঙে যেত যদি,
আর সব মাঠ মাথা তুলে
জল ঠেলে ফেলে দিত সাগরের জলে।
কিংবা কোনো বর্ষা-উষ্ণ উননের পাশে
ছিটোনো গ্রামের ধোঁয়া ভিজে যেত ভিজে চালে এসে,
সুনীল আকাশে যদি তার পর উঠতে না পেরে
শ্রাবণ-মেঘের মত জলে ফেটে যেত একেবারে—
অথবা কোথাও এক দুর্দ্দান্ত বুনো হাঁস ভয়ে
শোনা যেত তিন দিন ঘাটে নামে নাই এক মেয়ে।

হায় এই জলেদের বনে
কোথাও মাটির পিঠ বেশী নীচে নয় কোনখানে।
গাছ-পড়া, পাখী-পড়া পৃথিবীর ঝড়ে
কবে এক পার্ব্বত্য হ্রদ হোতে উড়ে
পাখী ঝাঁক বহু জল ঘুরে
একদা বেঁধেছে নীড় নিজেদের নিশ্চিন্ত করে।
তার পর কোন দিন ঘাড় তুলে দেখে নাই চেয়ে
বাতাস বারুদ গন্ধ এনেছে কি আনে নাই বয়ে।
আর জলে, জাল পড়ে নাই কোন কালে—
মাছেরা ইতস্ততো ছুটন্ত নয় জংগলে।

সবই শুধু মিল করা মরা ছবি হায়
বোবা-পাখীদের মত গাছের মাথায়।

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৩

বাড়ী পৌঁছিয়া ভূপেন শান্তির মুখে শুনিল, সন্ধ্যা সেদিনও তাহার খবর লইয়া গিয়াছে। মোহিত বাবুর শরীর না কি খুবই খারাপ—অতিরিক্ত ব্লাডপ্রেসার, ঘরের বাহিরে আসাও বারণ। যে কোন মুহূর্ত্তেই হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া যাইতে পারে।

শান্তি প্রশ্ন করিল, আজ রাত্রেই যাবে না কি দাদা, ওখানে ?

অকস্মাৎ যেন ভূপেন শান্তির উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল, হ্যাঁ—তা যাবো না! এই আসৃছি জ্বেতে-পুড়ে আমার আর বিশ্রামের দরকার নেই।

অপ্রতিভ হইয়া শান্তি কহিল, না—অত অসুখ তাই জিগ্যেস্ করছিলুম। হঠাৎ যদি কিছু ভালমন্দ হয়ত—

হয়ত আমি কি করব! আমি ত আর ডাক্তার নই—ভগবানও নই।

শান্তি আর কথা কহিল না। ভূপেনও কাপড়-জামা ছাড়িয়া বাথরুমের দিকে চলিয়া গেল মুখ-হাত ধুইতে। রাস্তার ধুলা তাহার সর্ব্বাঙ্গে, মাথার চুলে পর্য্যন্ত যেন পুরু হইয়া জমিয়াছে। বহু দিন কলের জলে স্নান করিলে তবে যদি একটু পরিষ্কার হয়।

মা বলিলেন, কী কালো হয়ে গেছিস্ রে! একেবারে যেন চেনা যায় না।

ভূপেনের তখনও বিরক্তি কাটে নাই, সে ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল, আমি ত মেয়েছেলে নই যে, রং ফরসা রাখার জন্ম ভাবতে হবে।

আসল কথা, বিরক্তিটা তাহার নিজের উপরই। সে আসিতে আসিতে এই কথাটাই ভাবিতেছিল যে আজ রাত্রেই সন্ধ্যায় বাড়ী যাওয়া যায় কি না! সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা ম্লান হইয়া থাকে—এই সংবাদটার সহিত তাহার মনের আবেগ জড়াইয়া কী এক দুর্ব্বার আকর্ষণে টানিতেছে তাহাকে ঐ দিকেই—আর সেই জন্মই সে যেন নিজের উপর বিরক্ত। যাহাদের সহিত প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু ছিল না, থাকা সম্ভব নয়—তাহাদের সম্বন্ধে মনে এ রকম আবেগ এ রকম দুর্ব্বলতা থাকা অন্যায়। ইহাকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না।

মা জলখাবার ও চা দিয়া বলিলেন, এখনই কি ভাত খাবি, না ওখান থেকে ঘুরে আসবি আগে ?

কোথা থেকে ঘুরে আসব ? চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিতে গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে ভূপেন।

সন্ধ্যাদের বাড়ী থেকে ? না, কাল সকালে যাবি! ওর দাদু না কি এখন-তখন।

তোমাদের অত দরদ থাকে তোমরা যাও—আমি এই রাত্রে কোথাও বেরোতে পারব না।

সে সত্যই সে-দিন গেল না। হয়ত ইহা অকৃতজ্ঞতা, মোহিত বাবু সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবার কৃতজ্ঞ বোধ করিবার যথেষ্টই কারণ আছে তাহার—তবু মা-বোনের এই উদ্বেগ এবং ধারণা যেন কেমন একটা অকারণেই তাহাকে বিগ্‌ড়াইয়া দিল। ইহারা কথাটা না পাড়িলে হয়ত এক সময়ে তাহার মনে স্বাভাবিক আকর্ষণেই জয় হইত—কিন্তু এখন এমনই একটা অভিমান উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে যে, 'আজ যেন কোন মতেই আজ রাত্রে যাওয়া যায় না। সে জন্য রাত্রি যখন সত্য সত্যই গভীর হইয়া আসিল, যাওয়ার সম্ভাবনা সত্যই আর রহিল না, তখন সে অনুতপ্ত হইয়া উঠিল এবং বহু রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না।
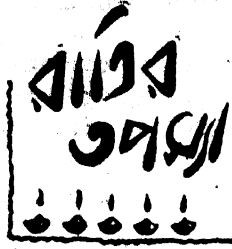
পরের দিন সকালে তাই ঘুম ভাঙ্গিতেই মুখ-হাত ধুইয়া বাহির হইয়া পড়িল—জলযোগের জন্য দশ মিনিটও অপব্যয় করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু চোরবাগানের সেই বিশেষ পরিচিত গলিটার মোড়ে পৌঁছিয়া নানা রকমের বিভিন্ন মনোভাব একই সঙ্গে যেন তাহাকে কেমন বিহ্বল ও আচ্ছন্ন করিয়া দিল—পা যেন আর চলে না। কত আশা, ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন এইখানে তাহার মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল—কত স্নেহ ও শ্রদ্ধা তাহার প্রাপ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল সেদিন, তার পর এক দিন আবার এইখানেই সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বর্ত্তমান অবজ্ঞাত, অখ্যাত, আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন জীবন-যাত্রার সূচনা হইল—এই বাড়ীটি তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উৎস।

কিন্তু না, সে জোর করিয়া পা চালাইল, স্বপ্ন যদি কিছু দেখিয়া থাকে ত সে-ই অন্যায় করিয়াছে। তাহার জীবন যা হইতে পারিত তাহাই হইয়াছে। কী পায় নাই, কী হইতে পারিত সে হিসাব আজ থাক—যেটুকু অযাচিত ভাবে, কল্পনার অতিরিক্ত রূপে সে পাইয়াছে সেই জন্যই কৃতজ্ঞ থাকে যেন সে চিরদিন—সেইটাই মনুষ্যত্ব।

দারোয়ান সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাসী-চাকরদের সকলের মুখেই অভ্যর্থনার হাসি। এ বাড়ীর সবই তাহার জানা, সে-ও সকলের পরিচিত সুতরাং কেহই ভিতরে সংবাদ দিবার বা পথ দেখাইবার চেষ্টা করিল না। বুকের অকারণ স্পন্দনকে প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সে নিজেই যত দূর সম্ভব সহজ ভাবে উপরে উঠিয়া গেল। কিন্তু সিঁড়ির মোড়টা ঘুরিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল সন্ধ্যা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই দেখা হওয়াটা লইয়া তাহার মনে মনে বহু দিনের একটা প্রতীক্ষা ছিল—প্রস্তুতিও ছিল, তবু এই আকস্মিক সাক্ষাতে সে-ও কিছুক্ষণ যেন অনড় অচল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, কোন সম্ভাষণ বা কোন প্রশ্ন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

সন্ধ্যা কাল রাত্রেই ভূপেনকে আশা করিয়াছিল, না আসাতে উদ্বিগ্নও হইয়াছিল। সেই জন্ম ভোর হইতেই তাহার একটা কান পাতা ছিল বাহিরের দিকে—একটি চির-পরিচিত পদধ্বনির আশায়। ভূপেন বাড়ীতে পা দিতেই তাই সে সংবাদ সকলের আগে তাহার কানে পৌঁছিয়াছে। আগেকার দিন হইলে সে ছুটিতে ছুটিতে নীচে আসিয়া ভূপেনকে অভ্যর্থনা করিত কিন্তু আজ যেন কেমন সঙ্কোচে বাধিল। সব কথা সে জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে তাহাদের দিক হইতেই কি একটা অন্যায় হইয়াছে, আর সেই জন্যই মাষ্টার মশাই পড়াশুনা ছাড়িয়া ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই সুদূর পল্লীগ্রামে নিজেকে একরূপ সমাহিত করিয়াছেন এবং সেই অপরাধেই খুব সম্ভব তাহাদের সহিত পত্রালাপ পর্য্যন্ত রাখিতে চান না।

এই সব কথা মনে ছিল বলিয়াই হউক, আর এই দেখা বহু দিনের প্রতীক্ষিত বলিয়াই হউক—চোখোচোখি হওয়ার পর [illegible] অনেক

সন্ধ্যারও যেন পা চলিল না। তার পর অবশ্য সে-ই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া সেই মধ্য-পথেই ভূপেনকে প্রণাম করিয়া অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল, বড্ড রোগা আর কালো হয়ে গেছেন মাষ্টার মশাই।

ভূপেনের তখনও বিহ্বলতাটা যেন কাটে নাই। তবু সে চেষ্টা করিয়া হাসিল। কহিল, আমি ত পাড়াগাঁয়ে পড়েছিলুম, ভাল ক'রে খাওয়াই হয়নি অর্দ্ধেক দিন। কিন্তু তোমারও ত শরীর খুব ভাল দেখ্‌ছি না।

সত্যই সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে। আর লম্বাও হইয়াছে যেন অনেকখানি। তাহার দেহে কৈশোরের ছোঁয়াচ লাগার বহু পূর্ব্ব হইতে সে সন্ধ্যাকে পড়াইতেছে—প্রতিদিনকার দেখার ফাঁকে ফাঁকে তাই কখন যে তাহার দেহে কৈশোরের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভূপেন বুঝিতেও পারে নাই। আজ সে প্রথম লক্ষ্য করিল যে, কৈশোরও তাহার যায়-যায়—এমন কি সন্ধ্যাকে তরুণী আখ্যা দিলেও খুব বেমানান্ হয় না। হয়ত ইহার সবটা স্বাভাবিক নয়। ভূপেন চলিয়া যাওয়াতে লেখাপড়া এক রকম বন্ধ হইয়াই গেল, অথচ কী প্রচণ্ড নেশা ছিল তাহার লেখাপড়ায়, তা সে ছাড়া এত বেশী আর কে জানে। সেই ক্ষোভ এবং এ পৃথিবীতে তাহার একমাত্র আত্মীয় দাদুর অসুখের জন্য দুশ্চিন্তাই খুব সম্ভব তাহাকে এই প্রবীণতা আনিয়া দিয়াছে, সহসা দেখিলে তরুণী মেয়ে বলিয়া সমীহ হয়।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই কয় মাসে যেন কত পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যাকে চেনাই কঠিন আজ। শুধু তাহার সেই আশ্চর্য্য চোখ দুটি, শ্রদ্ধায় ও জিজ্ঞাসায় পূর্ণ সেই স্থির দৃষ্টিটুকুই তেমনি আছে—একমাত্র সেই চোখ দুটির দিকে চাহিলেই তাহার সেই ছোট্ট ছাত্রীটিকে মনে পড়ে।

সন্ধ্যা একটু হাসিয়া কহিল, কি দেখছেন অবাক হয়ে, আমাকে কি চিন্‌তে পারছেন না?

ভূপেনও এতক্ষণে সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছে, সে-ও হাসিয়াই জবাব দিল, সেই রকমই বটে।···যাক্ কেমন আছেন দাদু?

দাদুর প্রসঙ্গে সন্ধ্যার মুখের প্রসন্ন শতদলটি যেন নিমেষে মুদিয়া গেল। ছল-ছল চোখে কহিল, কি জানি কিছুই ত বুঝতে পারছি না। উঠতে ত পারেনই না, এক দিক্‌কার পা-টাও যেন কম-জোর হয়ে গেছে, প্যারালিসিসের মত। এ ছাড়া আর কোন রকম অসুখ নেই, জ্বরটর বা কোন উপসর্গও নেই। কিন্তু ডাক্তাররা বলছে যে, ব্লাড প্রেসার একটু কমলেও উনি আর কাজ-টাজ কোন দিন করতে পারবেন না। চলুন না—দাদু উঠেছেন এতক্ষণে।

সন্ধ্যার পিছনে পিছনে ভূপেন মোহিত বাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহিত বাবুও শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, মুখে একটা অস্বাভাবিক পাণ্ডুর আভা। ভূপেনের মনে হইল, তিনি যেন এই ক' মাসেই অতিরিক্ত বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন।

ভূপেনকে দেখিয়া তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন, 'তুমি এসেছ, বাঁচলুম। জানতুম যে আমার এই রকম খবর পেলে তুমি না এসে থাক্‌তে পারবে না।···গিন্নী, মাষ্টার মশাইকে চা-টা দাও।

সন্ধ্যা কহিল, আর তোমার ওষুধ—দাদু?

দাদু ওষুধ! তার পর ভূপেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, ওষুধে ত এর কিছু হয় না। নিয়মিত ডায়েট আর বিশ্রাম। তার পর হঠাৎ এক দিন ডাক আসবে, বিনা নোটিশেই চলে যেতে হবে। তবু ডাক্তাররা ছাড়ে না, সব জেনে-শুনেও ওষুধের স্তোক দেয়।

ভূপেন এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, এখন কেমন আছেন? একটু ভাল বোধ করছেন?

ভাল? মোহিত বাবুর প্রশান্ত মুখ নির্ম্মল হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ভাল আর কি বোধ করা সম্ভব বাবা? বয়স ত কম হ'ল না, খাটছিও বহু দিন ধরে। প্রকৃতি তার শোধ নেবে বই কি। তবে একটা কথা বিশ্বাস ক'রো, ঠিক পয়সা রোজগারের জন্যই এত দিন খাটিনি, অর্থলোভ আমার এত প্রবল নয়—খাটতুম শুধু একটা অভ্যাসে, অনেক কিছু ভুলে থাকবার জন্য। যাক্—বাজে কথা বেশী বলব না, কারণ, একটু বেশী কথা কইলেই মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, বুকের মধ্যেও একটা যন্ত্রণা হয়। আর বেশী দিন নয় এটা ঠিক—বাঁ পা-টা পড়ে গেছে, ওদিককার চোখেও মোটে দেখতে পাইনে। বুকের অবস্থা খুব খারাপ। এইবার এক দিন হঠাৎ ডাক আসবে, তারই অপেক্ষা করছি।

তার পর চোখ বুজিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, অবিশ্যি তার জন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। আমি বহু দিন ধরেই প্রস্তুত আছি। এমন কি, যদি এই মুহূর্ত্তেই চলে যেতে হয় তবে এ নালিশও করব না যে, অমুক জরুরী কাজটা সারা হ'ল না কিংবা সন্ধ্যার একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারলুম না; আমরা বিষয়ী লোক—যত দিনই বাঁচি না কেন, কতকগুলো কাজ চিরদিনই অসমাপ্ত থেকে যাবে। স্নেহের বন্ধন থেকেও স্বেচ্ছায় মুক্তি ত নিতে পারব না।

সন্ধ্যা মোহিত বাবুকে ঔষধ খাওয়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল; এইবার ভূপেনের চা ও জল-খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার চোখ দুইটি আরক্ত, চোখের পাতাও ভিজা। বোধ হয় মোহিত বাবুর কথাগুলা তাহার কানে গিয়াছে। সে-দিকে চাহিয়া মোহিত বাবু হাসিলেন, কহিলেন, গিন্নী, চিরদিন কি আমাকে ধরে রাখতে চাও? তুমি ত সাধারণ মেয়ের মত অবুঝ নও ভাই—তবে অত সহজে চোখে জল আসে কেন—ছিঃ।···আচ্ছা তুমি এখন একটু ওদিক দেখা-শোনা করো গে, আমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে জরুরী কথাটা সেরে নিই।

সন্ধ্যার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কপোল বহিয়া অবাধ্য দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, পাছে আরও অপ্রস্তুত হয় এই ভয়ে সে একটু দ্রুতই বাহির হইয়া গেল। মোহিত বাবু মুহূর্ত্ত কয়েক তাহার অপস্রিয়মান মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজিলেন। তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন কিংবা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের হৃদয়-বেগ দমন করিতেছিলেন—তাহা সেই মুহূর্ত্তে বোঝা শক্ত, ভূপেন তাহা বুঝিবার চেষ্টাও করিল না, শান্ত ভাবেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে মোহিত বাবু আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, সন্ধ্যার নিকট-আত্মীয় বলতে যা বোঝায় তার অভাব নেই। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে তারা খুবই নিকট কিন্তু আত্মীয় কেউ নয়। এদের হাত থেকে সন্ধ্যাকে কে রক্ষা করবে সেই আমার ভাবনা। সন্ধ্যার যা বিষয় থাক্‌বে তা খুব সামান্য নয়—সে লোভে যদি কেউ কিছু অন্যায় করে ফেলেই ত তাকে দোষ দিতে পারব না। অথচ এই চিন্তাই আমার যাবার মুহূর্ত্তকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে—মুখে যতই যা

বলি না কেন, নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুঝতে পারব না, ওর একটা ব্যবস্থা না করে।···তাই এমন এক জনের ওপর ওর ভার আমি দিতে চাই যে ওর সম্বন্ধে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চিন্তা করতে পারবে, ওর যথার্থ কল্যাণের দিক্‌টাই শুধু চিন্তা করবে। অনেক ভেবেও বাবা, একমাত্র তুমি ছাড়া আর কারুর নাম মনে পড়ল না, তাই আমার উইলে তোমাকেই ওর অভিভাবক ও একজিকিউটার করে রেখে গেলাম।

আমাকে ? সে কি।···অতি কষ্টে ভূপেনের কণ্ঠ ভেদিয়া এই দুটি কথা বাহির হইল।

মোহিত বাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, অদৃষ্টের পরিহাস বলে মনে হচ্ছে, না ? কিন্তু এ আপৎকালে আর কাউকেই খুঁজে পেলাম না বাবা, আমি জানি সন্ধ্যাকে তুমি কত স্নেহ করো—আমি জানি কি জন্যে সেই সুদূর পল্লীগ্রামে গিয়ে আশাহীন, আনন্দহীন, কীর্ত্তিহীন জীবন যাপন করছো। তুমিই ওর ভার নাও—

ভূপেন ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি যে এর কিছুই জানি না। আইন-কানুন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই আমার।

আইন-কানুন জানো না বলেই ত অত বিশ্বাস তোমার ওপর বাবা, ও জানটা মানুষকে বড্ড বিপথে নিয়ে যায়। নিজের নির্ম্মল বিচার-বুদ্ধি ও সহজ কল্যাণবুদ্ধির কাছে জগতের কোন আইন দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া—ব্যাবহারিক আইনের কোন কথা যদি কোন দিন জানবার দরকার হয়—আমার জুনিয়র যিনি আছেন আমাদের অফিসে তাঁর শরণাপন্ন হয়ো। তিনি পাকা লোক এবং অকারণে সন্ধ্যার অনিষ্ট করবেন না।

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ যেন অবিশ্বাস্য কথা—শুনিবার পরও পরিহাস বলিয়া মনে হয়। সে ইঁহাদের কাছে অজ্ঞাত-কুলশীল, দরিদ্র, অপরিণামদর্শী তরুণ যুবক। পাছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় সন্ধ্যার ভাগ্য তাহার মত লোকের সঙ্গে গ্রন্থি বাঁধে, এই ভয়ে এক দিন তাহাকে ইঁহারা বিদায় দিয়াছিলেন, আজ আবার তাহাকেই ডাকিয়া সেই সন্ধ্যার সম্পূর্ণ ভার তাহারই হাতে তুলিয়া দিলেন! তাছাড়া মোহিত বাবু তাহার কীই-বা জানেন, কতটুকুই বা জানেন ? সে-যে নিজেই ভাল করিয়া জানে না নিজেকে, কোন দিন চিনিবার চেষ্টাও করে নাই তেমন করিয়া। যদি সে এতখানি বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিতে না পারে।···এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অসংখ্য এলোমেলো চিন্তা তাহার মাথায় ভীড় করিয়া আসিয়া কিছু কালের মত যেন তাহাকে নির্ব্বোধ, জড় করিয়া দিয়া গেল।

মোহিত বাবুর কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি বলিয়াই চলিয়াছেন, ওর একুশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলো বাধা-নিষেধ রেখে গেলাম। তার বেশী রাখবার আমার অধিকার নেই, বেঁচে থাকলেও সে অধিকার থাকত না। এটুকুও রাখলাম আমার মরা মেয়ের মুখ চেয়ে—তার কাছে করা মৃত শপথের অনুহাতে সন্ধ্যার যখন এত বড় অনিষ্টই করলাম তখন শেষ পর্য্যন্ত সেটা পালন ক'রেই যাবো, তার ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব। টাকাকড়ির বিস্তৃত বিবরণ উইলেই পাবে, সব পাকা ব্যবস্থা করা আছে। অর্দ্ধেক আছে দান—বাকী অর্দ্ধেক সব সন্ধ্যার। একুশ বছর বয়স পার হ'লে সবই ও নিজের্দ্ধে পাবে। শুধু আমার হাতের সঙ্গে যে সম্পত্তিগুলোর যোগ আছে সেইগুলো থাকবে তোমার হাতে। আমি ওকে কোন বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাই না—ওর পথ ওরই সামনে খোলা রইল। সন্ধ্যা এই বাড়ীতেই থাকবে—আগলাবার জন্য কোন লোকের দরকার নেই, আমার ঝি-চাকর সব বহু দিনের, ওরা সন্ধ্যাকে সত্যিই স্নেহ করে। রক্তের সম্পর্কের চেয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক বড়—এ আমি চিরদিন বিশ্বাস করি।

ভূপেনের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে এক প্রকার আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কিন্তু এ ভার কী আমি একা বইতে পারবো ? আর অন্ততঃ এক জনকেও দিয়ে যান আমার সঙ্গে—

মোহিত বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আর কাউকে এ ভার দেওয়া যায় না ব'লেই তোমাকে জড়াতে হ'ল বাবা। তুমিই পারবে, আমি আশীর্ব্বাদ করছি। সন্ধ্যার কল্যাণ-চিন্তা তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য পথ দেখিয়ে দেবে। নিজের সহজ-বুদ্ধির ওপর বেশী নির্ভর ক'রো—এ আমার অভিজ্ঞতার কথাই তোমাকে বলে গেলাম। সব প্রস্তুত আছে, আমার মুহুরী সত্য বাবুও নীচে আছেন, তিনিই তোমাকে সব দেখিয়ে দেবেন—কোথায় কী সই করতে হবে সব বলে দেবেন। হয়ত তোমাকে একবার আমার অফিসেও যেতে হবে।

মোহিত বাবু, বোধ করি এতক্ষণ কথা কহিবার শ্রান্তিতেই, আবার চোখ বুজিলেন। ভূপেনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কাজ করিবার, কথা কহিবার এমন কি এ দায়িত্ব বহনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার একটা উপায় পর্য্যন্ত চিন্তা করিবারও শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে তাহার। শুধু নির্ব্বোধের মত শূন্যদৃষ্টিতে মোহিত বাবুর অনড় দেহটার দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে মোহিত বাবুই আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, তাহ'লে আর আট্‌কাবো না। তুমি সব দেখে-শুনে যাওগে। যদি কিছু প্রশ্ন করবার থাকে এখনও উত্তর পাবে—এর পর হয়ত সব ঘোলাটে হয়ে যাবে—বেঁচে থাকলেও কাজে আসবো না।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইতে তিনি ইঙ্গিত করিয়া কাছে ডাকিলেন। চুপি চুপি কহিলেন, তোমাকে কিছু দেবার সাহস আমার হয়নি, তবে এমন ব্যবস্থা আছে যে, ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই নিতে পারবে। এই অনুরোধটি আমার রেখো তুমি—যদি তেমন প্রয়োজন পড়ে নিতে ইতস্ততঃ করো না। আশীর্ব্বাদ করি তুমি মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠো, এক দিন তোমার কীর্ত্তি, তোমার যশ যেন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের জন্য যে অনিষ্ট তোমার হ'লো তা যেন এক দিন ব্যর্থ হয়।···আমি যে ভুল করলুম তা যেন কোন দিন তোমাদের করতে না হয়—যে কর্ত্তব্য সহজে সামনে আসে তাকেই যেন বরণ ক'রে নিতে পারো—যা ভুল, যা শুধু একটা সংস্কার, মানুষের কল্যাণ-বুদ্ধির যা বিরোধী এমন কোন কিছু যেন তোমাদের জীবনের স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক পথকে মলিন বা বিড়ম্বিত না করে। আজ একটা কথা তোমাকে অকপটে বলে যাই বাবা, ভুল আমি করিনি, সন্ধ্যার মন কোন দিকে যাচ্ছে তা আমি ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলাম—তবু আমি যেটাকে অনিষ্ট বলে আশঙ্কা করেছিলাম তাকেও যোধ হয় ঠেকাতে পারলাম না শেষ পর্য্যন্ত। মিছিমিছি সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। তোমার প্রতি সন্ধ্যার যে শ্রদ্ধা, তার সঙ্গে কতটা স্নেহ মেশানো ছিল তা তুমি ত বুঝতে পারোইনি, আমিও বুঝিনি। সেই জন্যেই অনুতাপ হয় বাবা—মিথ্যা

মোহকে, সম্মানবোধকে আঁকড়ে না ধরে থাক্‌লেই হ'তো। প্রতিজ্ঞা বা শপথ প্রাণপণে রক্ষা করাই বীরত্ব নয় শুধু—অনেক সময়ে তাকে লঙ্ঘন করা আরও বেশী সৎসাহসের কাজ—তাতে বীরত্ব আরও বেশী। যাক্—আবারও তোমাকে হয়ত আর একটা বিড়ম্বনা, আর একটা কষ্টকর বন্ধনের মধ্যে ফেললাম—কিন্তু কোন উপায় ছিল না বাবা, কোন উপায় ছিল না। সন্ধ্যার ভার তুমি ছাড়া আর কে নেবে বলো ?…

অতিরিক্ত আবেগ ও ক্লান্তিতে মোহিত বাবু যেন হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল। সেদিকে চাহিয়া, যেটুকু ক্ষোভ বা নালিশ ভূপেনের মনে ছিল, সব ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পাছে তাহারও চোখে জল আসিয়া পড়ে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।…

সন্ধ্যা পাশের ঘরে অর্থাৎ তাহার নিজের শোবার ঘরের জানালার সামনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূপেন মোহিত বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠে যখন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল তখন সে যেন প্রথমটা চমকিয়া উঠিল। তার পর তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, আপনি চললেন ?

হ্যাঁ সন্ধ্যা, নীচে আমার কাজ আছে। তুমি দাদুর কাছে যাও।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সন্ধ্যা কহিল, আর কি আপনার দেখা পাবো না ?

পাবে বৈ কি—নিশ্চয়ই পাবে। এখন ত আসতেই হবে আমাকে। তোমার দাদু যে—আচ্ছা থাক্ সে সব কথা, পরে বলব এখন।

তখন তাহার নিজের কথাবার্ত্তার উপর, নিজের চিন্তা-শক্তির উপর যেন কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। কোন মতে প্রয়োজনীয় কাজটা সারিয়া নির্জ্জনে কোথাও যাইতে পারিলে যেন বাঁচে। তাই সন্ধ্যার প্রণাম শেষ হইবার আগেই সে স্খলিত অথচ দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিল।

[ক্রমশঃ

হাস্যকূজন

প্রাণ শর্ম্মা

অদ্ভুত পাখী এক ডাকছে,
—তিতির পাখীর ডাক হলেও হতেও পারে ;
অদ্ভুত এক সুরে ডাকছে।
সে এক দুপুর বেলায় আমি আর মুকুলিকা
একা একা হাসাহাসি করছি ;
—হঠাৎ কোথায় যেন ডাকল !
অদ্ভুত পাখী এক অদ্ভুত এক সুরে ডাকল।

খর রৌদ্রের ঝাঁজে দূরের সমুদ্দুরে
নীল জল চিক চিক করছে।
উড়ছে বালির রেখা
বাতাসে আকাশে রেখা ;
—আমরা দু'জনে শুধু হাসছি।

আমি আর মুকুলিকা,
দু'জনের হাসাহাসি
নকল করেই বুঝি ডাকছে।
—অদ্ভুত পাখী এক ডাকছে।
অদ্ভুত পাখীটার ডাকটা।
নীরব দুপুর-বেলা
নীরব সাগর বেলা
প্রতিধ্বনির ডাকে হাসছে ;
ডাকছে না পাখীটাও হাসছে।

পড়তে যখন ভালো লাগে না

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

পড়তে যখন ভালো লাগে না তখন পড়া উচিত নয়। এই হ'ল সুধীরের মত। কিন্তু আশ্চর্য্য, তার মতের সঙ্গে কারুরই মিল নেই। সকাল বেলা পড়তেই হবে এই হল সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। দিদিমা থেকে ছোট্‌দা পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে বলে পড়্, পড়্, পড়্!

প'ড়ে ত' সব হবে! দিদিমার যে এত জমিজমা, দাদামশায়ের তেলের ব্যবসা, এ দেখবে কে? খাবে কে এত টাকা?

'সুধ্‌রে!' তার বাবার গলার আওয়াজ।

'সুধ্‌রে' কেন? সুধীর বলতে কি সুধ্‌রের চেয়ে বেশী সময় লাগে? তবে মিছিমিছি নামটাকে বিকৃত করা কেন?

তবু সে বল্‌লে—আজ্ঞে।

তার মুখে আজ্ঞে শুনতে না কি সকলের ভালো লাগে। ছোট ছেলে বেশ মিষ্টি ক'রে বলে—আজ্ঞে!

কিন্তু বাবা তার মিষ্টি কথা শুন্‌তে আসেননি, তিনি দেখেছেন, ছেলেটা বই সাম্‌নে রেখে জান্‌লা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে।

এর নাম পড়া হচ্ছে?

ম্যাট্রিকটা ওকে পাশ করাতেই হবে, এ বাড়ীর কেউ ম্যাট্রিক পাশ নয়।

সুধীরের অন্য ভায়েরা ত এক ক্লাসে দু'বছরের কম থাকবে না। এটারই যা একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। বাড়ীতে ভালো ক'রে পড়িয়ে স্কুলে দিলে হয়ত উন্নতি করতে পারে।

সে-ই কি না সকালবেলা হাঁ ক'রে চেয়ে আছে?

চৈত্রদিনের আকাশ অন্ধকার ক'রে বর্ষশেষের বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে, জামরুল গাছটা পাকা জামরুলে সাদা হয়ে গেছে। এ সময়ে ঘরে ব'সে কার ভালো লাগে—'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, পড়তে'?

কবিতা বরং ভালো লাগে—ছোট পাখী ছোট পাখী
এস মোর কাছে।

কিম্বা—ছি ছি মিথ্যা কি খেলা তোমার জীবনে জীবন-ময়?

কিম্বা—
সেথা মুনি বাল্মীকি লিখে রামায়ণ,
সে বড় সুন্দর কথা শুন দিয়া মন।

বাবা এসে বল্‌লেন—পড়ছিস্ ত চেঁচিয়ে? চেঁচাতে কি হয়েছে?

দুঃসাহসে ভর ক'রে ও বল্‌লে—পড়তে ভালো লাগছে না।

পড়তে ভালো লাগছে না? তাহ'লে অঙ্ক কষ। কর, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যা শিখেছিস্। নিয়ম ক'রে না পড়লে মেরে হাড় ভেঙে দোব। গায়ের চামড়া তুলে নোব তোমার, সেটা যেন মনে থাকে!

দুপুরবেলা হাওয়াটা ভিজে-ভিজে, পূবে বাতাস না দক্ষিণে—বাইরে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

আমের বনে কোকিল ডাকছে। নদীর ধারটা এই সময়ে ওর ঘুরে আস্‌তে ইচ্ছে করে।

কিন্তু মা বল্‌লে—দুপুরে কোনো ছেলে বেরোয় না।

কেন বেরোবে না? ঐ ত বাগানের পাঁচীলের ওধারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাঁটাল গাছের তলায়, মিঠে পুকুরের পাড়ে।

শান্তিনিকেতন থেকে ওর মাসী এলো, তার এখনো বিয়ে হয়নি, সেখানে পড়ে। সে বল্‌লে—সেখানে এমনি হঠাৎ বৃষ্টি হ'লে ছুটি হ'য়ে যায়।

সেখানে যে গুরুদেব থাকেন, তিনি কাউকে বকেন না, শুধু সকলকে ভালোবাসেন।

সেই শান্তিনিকেতনের কথা শুনে কার না যেতে ইচ্ছে করে? সে দিদিমাকে ধ'রে বস্‌লো—আমি শান্তিনিকেতন যাব পড়তে।

দিদিমা ভয় পেয়ে গেলেন। বল্‌লেন—বেশী প'ড়ে-শুনে কাজ নেই তোর। বেশী পড়া-শোনা করলে মানুষ ম'রে যায়। তুই এম্‌নি বেঁচে থাক্। তোকে ত আর উপায় ক'রে খেতে হবে না। আমার যা আছে তাই তোরা ক' ভাই-বোনে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খা।

কিন্তু বাবা শুন্‌লেন না।

প্রথমে পাঠশালায়, তার পর ইস্কুলে ভর্ত্তি হল সুধীর।

মারের পরে মার, শাস্তির পরে শাস্তি। কিছুই মাথায় ঢোকে না। নারকোল গাছে উঠে ডাব পেড়ে খেতে তার চেয়ে মজা ঢের।

যতই মার খায় ততই মাথা গোলমাল হ'য়ে যায়। ছেলেবেলায় যা-ও বা বুদ্ধি ছিল, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তা নষ্ট হ'য়ে যায়।

সুধীরের এক একবার মনে হয়—যখন পড়তে ইচ্ছে করেনি তখন যদি তাকে না পড়ানো হত, তাহ'লে হয়ত সে কিছু শিখতে পারত।

এক দিন এম্‌নি ভাববার সময়ে অঙ্কের মাষ্টার মাথায় সজোরে এক গাঁট্টা মারলেন, সে-ও বক্সিং চালিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলো। স্কুল থেকে নাম-কাটা গেল।

এই সুধীর বড় হ'য়ে সিনেমা আর্টিষ্ট হ'ল বটে, কিন্তু পাশ না করার দুঃখ তার ঘুচ্‌লো না। তার ছেলে বই খুলে সকাল বেলায় সোনালী রোদের দিকে চাইলে—সে-ও চেঁচিয়ে ওঠে—পড়্, হতভাগা, কী দেখ্‌ছিস্ হাঁ ক'রে?

ইতিহাসের কথা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

১

জগতে সুখী কে?

বহু বৎসর পূর্ব্বে এক ধনবান রাজা বাস করিতেন। তাঁর নাম ছিল ক্রীসাস; তিনি লিডিয়ার অন্তর্গত সার্দ্দিশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার এত ধন ছিল যে ইচ্ছামাত্র অতি দুর্লভ বস্তু তিনি কিনিতে পারিতেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ মূল্যবান ছবি, রত্ন, মূর্ত্তি, খোদিত বস্তু প্রভৃতি যত কিছু সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য এমন সব ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ ছিল। নানা দেশ-বিদেশ হইতে এই সব ঐশ্বর্য্য দেখিবার জন্য অনেক লোক তথায় আসিত। এই রাজা ক্রীসাসের রাজসভায় কোন এক সময়ে গ্রীসের খ্যাতনামা আইন-প্রণয়নকর্ত্তা সোলন প্রসিদ্ধ এথেন্স নগরী হইতে কোন কারণে আসিয়াছিলেন।

রাজার মনে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের জন্য ভারী গর্ব ছিল। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সোলন হতবাক্ হইয়া যাইবেন। তাঁহাকে এই সব দেখাইলে সোলনের মনে অসূয়ার উদয় হইবে এবং এথেন্সে ফিরিয়া গিয়া বলিবেন যে, তিনি রাজা ক্রীসাসের মত সুখী লোক দেখেন নাই।

সোলন কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কিছুমাত্র মুগ্ধ হন নাই। ইহাতে রাজা মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি তখন ভাবিলেন, যদি তিনি ক্রীসাসকে জিজ্ঞাসা করেন এ জগতে সুখী কে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় এই উত্তর পাইবেন যে, তিনিই অর্থাৎ রাজা ক্রীসাসই প্রকৃত সুখী।

কিন্তু রাজা যেমন উত্তর আশা করিয়াছিলেন, সোলন ঠিক তেমন উত্তর দেন নাই। প্রশ্নের উত্তরে সোলন কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "আমি যত দূর জানি, তাহাতে আমার মনে হয়, এথেন্স-বাসী টেলাস (Tellus) সর্বাপেক্ষা সুখী। তাঁর পরিবারবর্গকে সুখী রাখিবার মত তাঁর অর্থ ছিল। 'তিনি দেশের জন্য লড়াই করে জয়ের মুখে মারা গেছেন,। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর ছেলেরা—এমন কি রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন' আমি টেলাসের মত সুখী লোক আর দেখি নাই।"

এই উত্তরে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি তাঁর চেয়ে সুখী নই? আমার কি অফুরন্ত ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য্য নাই?"

সোলন উত্তরে বলিলেন, "ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্য কাহাকেও প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। কারণ, ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্য এক দিনেই চলে যেতে পারে। রাজা ক্রীসাস, আপনি সুখী নন, এবং যতক্ষণ না মরবেন, ততক্ষণ সুখী হ'তে পারবেন না।"

গ্রীক পণ্ডিতের প্রত্যেক কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য; বাধ্য হইয়া ক্রীসাস চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ, তাঁহার ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সুখী ছিলেন না; তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। তাঁহার একটি পুত্র বোবা ছিল। আবার স্বপ্ন দেখেন যে, অন্য পুত্রটি মারা যাইবে। সুখ ও শান্তি পাইবার জন্য তিনি তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিতে পারিতেন। তিনি জ্ঞানী গ্রীক পণ্ডিতকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপূর্ণ বাণী ক্রীসাসের মনে গাঁথা রহিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে তিনি খবর পাইলেন, তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমে এক নূতন শক্তিশালী শত্রুর উদয় হইয়েছে। তাঁর মনে হইল, শত্রু আরো শক্তিশালী হইয়া পড়িলে হয়ত এক দিন তাঁহার লিডিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে। এই নবীন শত্রু পারস্যের রাজা কুরুষ (Cyrus)। শত্রু আরো শক্তিশালী হইবার পূর্বে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া দমন করিতে মনস্থ করিলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে ডেলফির ভবিষ্যৎ-বক্তার নিকট যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেই সময় এই স্থানের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর লোকের বিশেষ আস্থা ছিল। ক্রীসাস উত্তর জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ভবিষ্যদ্ বাণী শুনিয়া ক্রীসাস ভারী খুসী হইলেন।

ভবিষ্যদ্-বাণী—"যদি ক্রীসাস হালিস্ (Halys) নদী পার হন, তবে তিনি একটি বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবেন।"

হালিস্ নদী লিডিয়া ও পারস্য রাজ্যের সীমানা ছিল। বাণী শুনিয়া ক্রীসাসের মনে হইল যে, তিনি হালিস্ নদী একবার পার হইতে পারিলে পারস্য-রাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে পারিবেন। এই মনে করিয়া তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ক্রীসাস হালিস্ নদী পার হইলে পারস্য-রাজার সৈন্যগণের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল—কিন্তু কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে ক্রীসাস হতাশ হইয়া তাঁহার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে পারস্যরাজ কুরুষ মনস্থ করিলেন যে, রাজা ক্রীসাস তাঁহার সৈন্যদল ভঙ্গ করিয়া দিবার সংবাদ পাইলে সার্দ্দিশে (Sardis) গিয়া রাজা ক্রীসাসকে লড়াই করিতে বাধ্য করিবেন। ক্রীসাস বেশী সৈন্য সংগ্রহ করিবার সময় পাইবেন না—কাজেই তাঁহাকে হারাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে। কুরুষ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে ফল ঠিক তাহাই হইল। ক্রীসাস অল্প সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পারস্যরাজের বিশাল সেনাদলের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। সেই সময় লিডিয়া অশ্বারোহী সৈন্য বীরত্ব ও সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—এবং শত্রুরা তাঁহাদের বিশেষ ভয় করিত। লিডিয়ার অশ্বারোহী সৈন্য যখন প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিতে আসিল—তখন পারস্য-রাজের সৈন্য বিশেষ ভীত হইয়া উঠিল। কোন উপায় না দেখিয়া কুরুষ এক চাতুর্য্যপূর্ণ মতলব ঠিক করিলেন। তাঁহার সৈন্যদলের মাল বহন করিবার জন্য এক দল উট ছিল। তিনি জানিতেন, ঘোড়া মরুভূমির এই অদ্ভুত জন্তুর গায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। তিনি তাঁহার সৈন্যদলের সম্মুখ ভাগে তাঁহার উট সৈন্য স্থাপন করিলেন। লিডিয়ার সৈন্যদলের ঘোড়া উটের গায়ের গন্ধে ভয় পাইয়া পিছু হটিতে লাগিল এবং ক্ষেপিয়া উঠিল। লিডিয়ার সৈন্যদলের মধ্যে বিশেষ বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কিন্তু বীর লিডিয় সৈন্য পলায়ন করিতে জানিত না। তাহারা ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পারস্যরাজের সেনাগণের সহিত হাতাহাতি লড়াই করিতে লাগিল, কিন্তু শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্যে শীঘ্রই তাহা-দিগকে পিছু হটিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

নগরের ফটক বন্ধ করা হইল এবং নগর-প্রাকার সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করা হইল।

কুরুষ রাজধানী সার্দিশ অবরোধ করিলেন। কিন্তু খাড়া পাহাড়ে অবস্থিত নগরীতে প্রবেশ করিবার কোন পথ পাইলেন না। পরে এক দিন কোন লিডিয় সৈনিকের শিরস্ত্রাণ প্রাকারের উপর হইতে নীচে পড়িয়া যায়—সৈনিক প্রাকার হইতে লম্ফ দিয়া নামিয়া পড়ে এবং শিরস্ত্রাণ কুড়াইয়া প্রাচীরে উঠিয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করে। ঘটনাক্রমে জনৈক পারস্যরাজের সেনার নজরে ইহা পড়ায় সেই পথের সন্ধান পায়; সে কুরুষকে এই ঘটনার কথা বলে। পারস্য-রাজ তৎক্ষণাৎ সেই পথে একদল সৈন্য পাঠাইয়া অকস্মাৎ নগর আক্রমণ করিতে আদেশ দেন।

পারস্যরাজের একদল সেনা সেই গুপ্ত পথ দিয়া নিস্তব্ধে খাড়া পাহাড়ে উঠিয়া নগর আক্রমণ করিয়া লুঠ করিতে থাকে। নগরের রক্ষীদল হঠাৎ আক্রমণে সহজে নিহত হয় এবং যুদ্ধে ক্রীসাস বন্দী হন। এইবারে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত অর্থ ক্রীসাসের হৃদয়ঙ্গম হইল। ক্রীসাস হালিস নদী পার হইলে, একটি বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবে। এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, এই সাম্রাজ্য পারস্য-সাম্রাজ্য নহে, উহা তাঁহার নিজের রাজ্য। ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক উত্তর দিয়াছিল, কিন্তু তিনি নিজেই তার বিপরীত অর্থ করিয়াছিলেন।

কুরুষ বন্দী ক্রীসাসকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মারিতে আদেশ দিলেন। যখন ক্রীসাসকে কাষ্ঠস্তূপের উপর রাখিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল, তখন জ্ঞানী সোলনের কথা মনে পড়িল, "ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য প্রকৃত সুখ আনে না। যতক্ষণ তোমার মৃত্যু না হয়, ততক্ষণ তুমি সুখী হইবে না।"

তখন ক্রীসাসের মনে হইল যদি তিনি সোলনের কথা শুনিতেন, যদি তিনি তাঁহার রাজ্যের বিস্তার-আকাঙ্ক্ষা না করিয়া মনের শান্তি খুঁজিতেন! অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া প্রাণের আশা ত্যাগ করিলেন। নিরুপায়ে হতাশ প্রাণের আবেগে জ্ঞানী গ্রীক পণ্ডিতের নাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সোলন, সোলন, সোলন।"

পারস্যরাজ এই চীৎকার শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি কোন বন্ধু বা কোন দেবতাকে আহ্বান করিতেছেন? ক্রীসাস প্রথমে কোন উত্তর দিলেন না: কিন্তু 'যে শিক্ষা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষা কুরুষ শিখিতে পারেন', এই ভাবিয়া সোলন সংক্রে এবং তিনি কি বলিয়াছিলেন সমুদায় বিবরণ তাঁহাকে বলিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া পারস্যরাজের মন দ্রবীভূত হইল—তিনি অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে আদেশ দিলেন। ক্রীসাসের সব অপরাধ মার্জ্জনা করা হইল।

কুরুষ তাঁহাকে তাঁহার রাজসভায় লইয়া গেলেন এবং ক্রীসাস অবশিষ্ট জীবন পারস্যরাজের সম্মানিত অতিথি ও বন্ধুরূপে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর ক্রীসাস অনেক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মরিবার স্মরণর স্মৃতি কখনও লোপ হয় নাই। তিনি যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন অহর্নিশ সোলনের কথাগুলি চিন্তা করিতেন।

কৈলাস-সংবাদ

শ্রীযদুপতি দাস

[নক্সা]

কৈলাসেতে পাগ্‌লা ভোলা গাঁজায় দিয়ে সটান্ দম্।
চোখ ঢুল্‌ঢুল্—চর্ম্মাসনে—বল্‌ছে মুখে বব‌ম্ বম্।
গৌরী এসে পার্শ্বে তারি আসন নিল হাস্য মুখ।
বাপের বাড়ীর সবার তরে স্নেহভরে উথ্‌লে বুক।
বল্‌লে, প্রিয়! পিত্রালয়ে যাবার অনুমতি চাই।
শারদশ্রীতে ভর্‌ল ধরা আর ত বেশী দেরী নাই।
প্রিয়ার স্বরে মহেশ্বরের যোগ-সমাধি ভঙ্গ হয়।
সদয় হ'য়ে মহাযোগী হাস্যমুখে তখন কয়।
বাংলা যাবে বেশ ত দেবি! বছর পরে একটি বার।
ছেলে মেয়ে সাথে নিয়ে ক'র্‌ছ কিবা চিন্তা তার।
যুদ্ধ গেছে সত্যি থেমে শান্তি কোথা বাংলাতে?
অভাব অনটনের দৃশ্য দেখ্‌বে প্রতি পল্লীতে।
পল্লীবধূ বস্ত্রাভাবে উদ্বন্ধনে ম'র্‌ছে হায়!
এ সমস্যা পূরণ তরে তবু কোন চেষ্টা নাই।
অতিলোভ আর কালোবাজার দেশটা দিল শেষ ক'রে।
রক্ষকেরাও এই সুযোগে মা'র্‌ছে মোটা হাত ভ'রে।
পারমিটে আর কণ্ট্রোলেতে বাঁধ্‌ছে বাঁধন সরকারে।
বস্ত্র-আঁটন ফস্কা গেরো হেরবে এ সব বারবারে।
তার উপরে জলাভাবে কতই জমি মরুর প্রায়।
কোথাও আবার বন্যাস্রোতে ঘর-বাড়ী ক্ষেত ভাস্‌ছে হায়!
যুদ্ধ বরং ছিল ভাল বেকার ছিল স্বল্প ত।
দারুণ চিন্তা চাকুরীয়ার ছাঁটাই হবে অন্ততঃ।
কেরোসিন আর চিনির অভাব কে ঘুচাবে হায় রে হায়!
ভেবেছ কি এ সব বিনা তোমার পূজা কত দায়!
তাইতে বলি প্রিয়ে তোমায় সুখ পাবে না সেখানে।
জানি তবু বাপের বাড়ী কিছুতে না মন মানে।
এই না বলি চুপটি ক'রে ব'স্‌ল ভোলা যোগেতে।
পার্ব্বতীও প্রণাম করি'—চল্‌ল আপন কর্ম্মেতে।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

৮

মন্ত্রী শকটারের বুদ্ধিতে ত ইন্দ্রদত্তের দেহ নষ্ট হ'য়ে গেল। চিরদিনের জন্যে তিনি নবনন্দের এক জন হ'য়ে থাক্‌বেন—এই তাঁর বিধিলিপি স্থির হ'য়ে গেল। তখন শকটার নিজের কাজ হাসিল ক'রে রাজার আদেশ মত এক কোটি সোনার টাকা দিলেন বররুচির হাতে।

এক দিন যোগনন্দ ব্যাড়িকে গোপনে ডেকে বল্‌লেন—"সখা! আমি ছিলুম ব্রাহ্মণ—হলুম শূদ্র। এই রাজ্যভোগেও আমার কিছু সুখ হচ্ছে না মনে।"

শুনে ব্যাড়ি উত্তর দিলেন—'দেখ ভাই! যা হবার হয়েছে—তার আর চারা নেই। কিন্তু সাবধান! তোমার মন্ত্রী শকটার ভারি চতুর। তিনি সব ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন ব'লে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে। তবে এখন মুখ ফুটে কিছু বলছেন না; কারণ, সময়ের অপেক্ষায় আছেন তিনি। সুবিধা পেলেই তোমাকে মেরে—তোমাদের—মানে আর আট জন নন্দরাজকে মেরে মৌর্য্যের ছোট ছেলে চন্দ্রগুপ্তকে রাজ-পাটে বসাতে কসুর করবেন না।'

ইন্দ্রদত্ত অর্থাৎ যোগনন্দ বল্লেন—'তাতে আমার ক্ষতি কি?'

ব্যাড়ি—'না ভাই! সে হবে না। তোমার আগের দেহ যখন গেল—তখন এই দেহেই কিছু দিন স্থির থাক। দেহই না হয় গেছে বুদ্ধি ত আছে। আমার অনুরোধ—তুমি বররুচিকে মন্ত্রীর পদ দাও, সে পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্—সে তোমায় রক্ষা করবে।'

এই ব'লে ব্যাড়ি বররুচিকে যোগানন্দের কাছে রেখে চ'লে গেলেন বর্ষকে গুরুদক্ষিণা দিতে। যোগনন্দও বররুচিকে দিলেন মন্ত্রীর পদ।

বররুচি এক দিন বল্লেন—'দেখুন, ইন্দ্রদত্ত যোগনন্দ মহারাজ! শকটার বেঁচে থাকতে আপনার নিস্তার নেই জানবেন। কৌশলে তাঁকে সরাবার ব্যবস্থা করুন।'

যোগনন্দ তখন কিছু করলেন না। কিন্তু অযোধ্যা থেকে পাটলিপুত্রে ফিরে এসে তিনি নগরে রটনা করলেন যে, শকটার এক যোগী পুরুষের দেহ পুড়িয়ে ফেলেছেন। যোগী পুরুষ তখন মরেননি—সমাধিতে ছিলেন। কাজেই শকটারের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছে—মন্ত্রী বররুচি তার সাক্ষী আছেন। অতএব ব্রহ্মঘাতীকে আর মন্ত্রী রাখা চলে না। উপরন্তু, তাঁকে শাস্তি দেওয়াও দরকার। এই রটনা ক'রে নবনন্দ মিলে আদেশ দিলে—'সব ছেলে-পিলে শুদ্ধ শকটারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক। যে কথা, সেই কাজ! শকটার আর তাঁর ছেলেরা কারাগারে বন্ধ ছিলেন।

প্রত্যেক দিন তাঁদের সকলের খাবার জন্যে কিছু ক'রে ছাতু আর জল দেওয়া হ'ত। সে ছাতুটুকুতে কর বাপ-ব্যাটার পেটভরা চল্‌ত না। তাই শকটার তাঁর ছেলেদের বল্লেন—'মৌর্য্য আর তাঁর ছেলেরা যেমন প্রতিহিংসা নেবার জন্যে নিজেরা না খেয়ে চন্দ্রগুপ্তকে নিজেদের খাবার খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখে গেছেন, তোমরাও সেই ব্যবস্থা কর। যে বেঁচে থেকে প্রতিহিংসা নিতে পারবে—সেই শুধু বাঁচুক—বাকী আমরা ক'জন মরি—এস'।

শকটারের ছেলেরা ক'রে উঠল কোলাহল—'বাবা আমাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের মত বীর কেউ নেই। তার চেয়ে আপনিই প্রতিহিংসা নেবার উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনিই আমাদের ভাগের ছাতু খেয়ে বাঁচুন—আমরাই না খেয়ে মরি'।

শকটার ছেলেদের নির্ব্বন্ধ এড়াতে পারলেন না। তাঁর চোখের উপর আবার সেই বীভৎস কাণ্ড দিনের পর দিন ঘটতে থাকল। তাঁর ছেলেরা একে একে অনাহারে শুকিয়ে মরল। কিন্তু তিনি প্রতিহিংসার জন্যে বুক বেঁধে ছাতু আর জল খেয়ে বেঁচে রইলেন।

• • * •

এ-দিকে অন্য আট জনের চেয়ে যোগনন্দ বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগলেন। আসলে তিনি ত' ইন্দ্রদত্ত—তার উপর বররুচি তাঁর মন্ত্রী। এমন সময় এক দিন ব্যাড়ি ফিরে এলেন গুরুদক্ষিণা দিয়ে। যোগনন্দকে ডেকে বল্লেন—'ভাই! এবার তুমি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য কর। আমি চল্লুম তপস্যায়—আর দেখা হবে না। বররুচিকে বিশ্বাস কোরো। হঠাৎ রাজ্য পেয়ে মাথা গরম ক'রে—উপকারী বন্ধুর কোনও অহিত কখনও কোরো না'।

এই বলে ব্যাড়ি বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন তপস্যায়।

কিছু দিন যায়। যোগনন্দের বুদ্ধি দেখে প্রজারা সকলেই তাঁর খুব সুখ্যাতি করতে লাগল। দেশ-বিদেশের রাজারা তাঁদের মেয়েদের সম্বন্ধ নিয়ে আনাগোনা করতে লাগ্‌লেন। ক্রমশঃ যোগনন্দের বিয়ের ইচ্ছাও হ'ল। এক সামন্ত রাজার পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়েও যথাকালে মহা ধুমধামের সঙ্গে হ'য়ে গেল।

এই সুযোগে বররুচি এক দিন যোগনন্দের কাছে প্রস্তাব করলেন—'দেখুন! শকটার ত সত্যি আপনার কোন অনিষ্ট করেননি। পাছে অনিষ্ট করেন—এই আশঙ্কায় তাঁকে কারাবাসে পাঠান হয়েছে। আপনার বিয়ে উপলক্ষে প্রজারা সবাই আনন্দ করছে। যদি এ-সময় তাঁকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেন, বড় সুনাম হবে আপনার।'

যোগনন্দ রাজি হলেন—শকটার বররুচির কৃপায় শুধু মুক্তি পেলেন না—আবার নিজের মন্ত্রিপদও ফিরে পেলেন। কিন্তু ছেলেগুলি মারা পড়ায় তিনি ভেঙ্গে পড়েছিলেন—প্রতিহিংসার আগুনও জ্বলছিল তাঁর বুকের মাঝে ধিকি-ধিকি। কিন্তু বাইরে এসব ভাব চেপে রেখে তিনি ভাল মানুষটির মত মুখ বুজে বররুচির অনুগত হয়েই দিন কাটাতে লাগ্‌লেন।

এক দিন রাজা যোগনন্দ দুই মন্ত্রীকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ সকলেই দেখলেন যে, গঙ্গা থেকে একখানি শুধু হাত উঠে পাঁচটি আঙুল দেখালে। বররুচি তাই দেখে নিজের হাতের দুটি আঙুল দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি আবার গঙ্গার গর্ভে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অবাক্ হ'য়ে যোগনন্দ বল্লেন—'কি ব্যাপার হ'ল—বুঝলুম না। ও হাতখানা কার! কেনই বা পাঁচ আঙুল দেখালে ও হাতখানা আমাদের দিকে? আর আপনিই বা দু' আঙুল দেখালেন কেন? আর তাতে ও হাতখানা ডুবে গেলই বা কেন?'

বররুচি বল্লেন—'মহারাজ! ও নিয়তির হাত। হাত পাঁচ আঙুল দেখিয়ে বোঝালে—এ জগতে পাঁচ জনে মিলে কোন্ কাজই না করা যায়। তাইতে আমিও সায় দিলুম—পাঁচ জন ত বেশী কথা—দু'জন যদি একমত হয়, তাহ'লেও তাদের অসাধ্য কিছু থাকে না। সন্তুষ্ট হ'য়ে নিয়তি স'রে গেলেন'।

বররুচির বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে যোগনন্দ পেলেন খুব আনন্দ। কিন্তু শকটার হলেন বিষণ্ণ। বুঝলেন তিনি, বররুচি রাজার পক্ষে যত দিন আছেন, তত দিন তাঁর প্রতিহিংসা নেওয়ার সাধ মনেই চেপে রাখতে হবে।

• • • •

কিছু দিন যায়। রাজা যোগনন্দ তাঁর নতুন রাণীর একখানি ছবি আঁকলেন মস্ত বড় এক জন চিত্রকরকে দিয়ে। ছবিখানি দেখলে মনে হ'ত যেন জীবন্ত। চিত্রকরকে অনেক পুরস্কার দিয়ে রাজা ছবিখানি টাঙিয়ে রাখলেন নিজের শোবার ঘরে।

এক দিন বররুচি কোন কাজে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন—ঘর খালি—মহারাজ গেছেন স্নান করতে। হঠাৎ ছবিখানি পড়ল তাঁর নজরে। ছবিখানি দেখেই বুঝলেন তিনি, যে

ছবিতে একটা জিনিষের অভাব আছে। সামুদ্রিক-বিদ্যা জানা ছিল বররুচির। তাই বলে তিনি ঠিক করলেন—মহারাণীর কাঁকালের কাছে একটি তিল না দিলে ছবিটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তুলিতে ক'রে একটু রঙ নিয়ে তিনি ছবির কাঁকালের তিলটি এঁকে দিলেন। রাজার ঘরে যে সব পাহারা ছিল—তারা এটা লক্ষ্য করলে—কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর কাজে বাধা দেবার সাহস তাদের ছিল না।

সেদিন অবশ্য কোন গণ্ডগোল ঘটল না। কিন্তু পরের দিন রাজা যখন ছবিটি খুঁটিয়ে দেখছিলেন—তখন সেই নতুন আঁকা তিলটি তাঁর চোখে পড়ল। তিনি বুঝলেন—ঐ চিহ্নটি তখনও কাঁচা রয়েছে—সবে আঁকা হয়েছে। 'এ কার কাজ! কে মহিষীর এই গোপন অঙ্গের চিহ্ন জানতে পারল'!—এই ভাবতে ভাবতে তিনি পাহারাদের জিজ্ঞাসা করলেন—'তোরা কেউ জানিস্—আজ-কালের ভেতর এ ছবিতে কেউ রঙ দিয়েছিল'?

সর্দার পাহারা এগিয়ে এসে জোড়হাতে বল্লে—'মহারাজ! কাল মন্ত্রীমশায় যখন আপনার ঘরে এসেছিলেন, তখন তুলি দিয়ে তিনিই ছবিতে একটা ফুটকি দিয়ে দেন—এ আমরা সবাই দেখেছি'।

মহারাজ যোগনন্দ হ'য়ে উঠলেন গম্ভীর। ভাবলেন মনে মনে—'আমার স্ত্রীর গুপ্ত অঙ্গের চিহ্ন মন্ত্রী বররুচির জানা হ'ল কি ক'রে'! ভাবতে ভাবতে তিনি রেগে আগুন হ'য়ে উঠলেন। এ কথা তলিয়ে ভেবে দেখলেন না যে, বররুচি যদি সত্যি দোষী হতেন, তবে তিনি সে কথা প্রকাশ করতেন না—বরং চেপেই যেতেন।

যাই হোক, রাজা অত না ভেবে-চিন্তে মন্ত্রী শকটারকে ডেকে হুকুম দিলেন—'বররুচিকে মেরে ফেল'।

[ক্রমশঃ।

সহুরে-ইঁদুর ও গ্রাম্য-ইঁদুর

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

[বিদেশী গল্প থেকে]

একবার এক গ্রাম্য-ইঁদুর এক সহুরে ইঁদুরকে নিমন্ত্রণ করলো একটা গর্ত্তে, খুবই নগণ্য ওক্ গাছের ফল তারা খেলো।

এর পর সহুরে-ইঁদুরের পালা। সে গ্রাম্য ইঁদুরকে তার সহরের ভূগর্ভস্থ এক ভাণ্ডারে নিমন্ত্রণ করলে, এ ভাণ্ডারটা ছিল সব রকমের বাছাই খাবারে ভরা……তারা তো খুব মজা করে নানান্ রকমের খাবারের টুকরো-টাক্‌রাগুলো খেতে বসেছে,…এম্নি সময় ঘরের দরজাটা গেল খুলে…আর ঘরে ঢুকলেন স্বয়ং পাচক মশাই। গ্রাম্য-ইঁদুর বেচারা তো শব্দ শুনে বিষম ভয় পেয়ে গেল…সে চারি দিকে ছোটা-ছুটি আরম্ভ করে দিলে। সহুরে-ইঁদুর তারা এদিকে নিজের জানা-শুনো একটা গর্ত্তের মধ্যে গিয়ে গা-ঢাকা দিলে।

হতভাগ্য গ্রাম্য-ইঁদুরটা ভয়ে ভয়ে কাঁপতে সুরু করে দিলে…আসন্ন-মৃত্যুর অপেক্ষায়! বেচারা এখানের কিছুই জানে না…শুধু চারি দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল…

গেল। সহুরে-ইঁদুর এবার বেরিয়ে আসে…গ্রাম্য-ইঁদুরকে সে সাহস অবলম্বন করতে বলে…তার এদিকে ভয় তখনও কাটেনি—সে বলে: আমার ভয়ানক ভয় করছে, আমি বোধ হয় আর খেতে পারব না। তোমার কি মনে হয়, ও লোকটা আবার আসবে না কি? সহুরে-ইঁদুর তাকে বলে, আরে, 'তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? এস, আমরা বরং এই ভালো ভালো খাবারগুলো খেয়ে ফেলি—তুমি এমন খাবার জন্মেও তোমার গ্রামে দেখতে পাবে না।

গ্রাম্য-ইঁদুর তার উত্তরে বলে; তোমার মত যার দুঃসাহস সে-ই খাবে এ সমস্ত খাবার,—কিন্তু যাদের প্রাণে কোন উদ্বিগ্ন নেই—যারা স্বাধীন, তাদের কাছে আমার ঐ নগণ্য ওক্ গাছের ফলই যথেষ্ট!

শঙ্কিত প্রাণে ধন-সম্পদ্ নিয়ে থাকার চেয়ে—গরীব হয়ে থাকা শতগুণে ভালো।

কি বিপদ!

শ্রীঅনসূয়া সান্যাল

ভ্যাস্-ভ্যাসে গরমের পচা এই দুপুরে—
প্রাণ করে আই-ঢাই পড়াটা কি সোজা রে!
চুপি চুপি পালাইব মামা হাঁকে—"কেষ্টা—
আড্ডায় বেরোলেই খাবে কড়া গাঁট্টা
বদমাস গুণ্ডা পড়াশুনা নাই তোর?
এর পর দেখছি যে হবি তুই পাকা চোর
ঘরে বসে পড় গাধা ঘুরে আমি আসছি
ফিরে এসে তোর আমি মজাখানা দেখছি।"
অগত্যা পড়িতেছি জ্যামিতির সংজ্ঞা
জানলায় চেয়ে দেখি, ও পাড়ার গঙ্গা—
মাথা নেড়ে ডাকিতেছে "বক্সিং করি আয়"
বল দেখি কাঁহাতক্ চুপ করে থাকা যায়?
বই রেখে উঠে গিয়ে হাত দুটি গুটিয়ে
বলিলাম "চট্‌পট চলে আয় এগিয়ে।"
দুজনেই প্রাণপণ করিতেছি যুদ্ধ—
আচমকা বাধা পেয়ে হয়ে উঠি ক্রুদ্ধ—
চেয়ে দেখি, আরে আরে ছিঁড়িল যে কাণ,
মামা এসে দাঁড়ায়েছে যেন মূর্ত্তিমান্!
ঠাই ঠাই চড় মারে ফুলে ওঠে গণ্ড,
মনে হয় ধড় হতে উঠে গেল মুণ্ড।
মামাদের কেঠো হাতে চড় কভু খেয়েছো?
খাওনিতো? তবে আর ছাই তুমি বুঝেছো?
এলোপাথেলো ঘুসি মারে পৃষ্ঠে ও বক্ষে,
লাল নীল কত রঙ দেখি দুই চক্ষে।
বলে—"ফের বই যদি নাই দেখি হস্তে।
এবারের মত আর যাবিব না আস্তে।"
ঝর ঝর জল ঝরে দুই চোখ বহিয়া
পুনরায় বসে পড়ি বই হাতে লইয়া—
হেথা জ্বালা, হোথা ব্যথা, গরম কি ওরে ভাই।
বল দেখি এর থেকে নিস্তার কিসে পাই?

লঙ্কাকাণ্ড

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রাবণের ছোট ভাই নাম বিভীষণ,
ম্যাট্রিকে পেল হায় থার্ড ডিভিশন।
তাই শুনে দশানন কাঁপে থর-থর
ছুটে এসে দুই গালে দেয় থাপ্পড়—
সেই সাথে চীৎকার ক'রে ওঠে রোষে
রাগে তার মালকোঁচা পড়ে যায় খ'সে :
সাঁইত্রিশ বছরেতে দিলি ম্যাট্রিক
পাশ হ'লি এই ভাবে—ধিক্ শত ধিক্।
স্থাড়া ক'রে মাথা তোর—ঘোল ঢেলে শিরে
রেখে দেব সাত দিন সাগরের তীরে।
লঙ্কার অধিবাসী দেখুক সবাই—
কত দূর ইডিয়ট রাবণের ভাই।
সংবাদ শুনে কানে পাগলিনী প্রায়
বিবশা নিকষা আসে ছুটিয়া সেথায় :
আহা কচি ছেলেটার হাড় হ'লো চুর
বাবু তুই চিরদিন এমনই নিঠুর।
দয়ামায়া শরীরেতে নেই এক তিল,
যাকে পাস্ তাকে দিস্ লাথি আর কিল।
কচি ছেলেটার দোষ দেখিস্ সদাই
কুম্ভকর্ণ হ'ল কেন মাষ্টার মশাই ?
নাকে সর্ষে তেল দিয়ে নিদ্রা কেবল
কখন পড়াবে বাছা—সে কথাটা বল ?
বিভু মোর সোনা ছেলে খেটেছে ভীষণ
তাই তবু পেয়ে গেছে থার্ড ডিভিশন।
বিভুর হাতটি ধরে নিয়ে যায় ঘরে
রাবণ দাঁড়িয়ে শুধু ভাবে রোষভরে :
সংসারে কেউ যদি বোঝে এক-তিল।
নিজের পড়ার ঘরে দোরে দিয়ে খিল
নতুন নভেল হাতে বিভু হোল চিৎ।
সিনেমায় যাবে খুড়ো : ডাকে ইন্দ্রজিৎ।

অমানুষ নেতা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

আজ তোমাদের বলব কয়েক জন অমানুষ নেতার কথা। অমানুষ অর্থে যারা মানুষ নয় অর্থাৎ পশুপাখীদের রাজ্যের কয়েক জন নেতার কথাই বলব আজ তোমাদের। পশুপাখীদের মধ্যেও অনেককে নেতৃত্ব করতে দেখা গিয়েছে। তাদেরই কয়েক জনের কথা আজ তোমাদের বলব। শোন তবে এখন।

সর্ব্বপ্রথমে বলি হাঁসেদের কথা। মিঃ ডব্লিউ, এইচ হাডসন তাঁর লেখা Adventures amnog birds নামক বইতে লিখেছেন যে, একবার এক বুনো-হাঁসকে ধরে এনে তার ডানা কেটে গৃহপালিত হাঁসদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, অন্য হাঁসগুলো সন্ধ্যাবেলায় সেই বুনো-হাঁসটার অনুসরণ করে স্ব স্ব স্থানে নিজের থেকেই ফিরে আসছে। রক্ষকদের আর তত্ত্বাবধানের ভাবনা ভাবতে হয় না।

নরওয়ের কৃষকেরা গরুদের বশে রাখবার জন্য মাথা ঘামায় না। প্রত্যেক বছর বসন্ত কালের প্রথম ভাগে তারা গরুদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের একটা ব্যবস্থা করে। এই যুদ্ধে যে গরুটি সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় সেই বিজয়ীর গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয়। অন্য গরুগুলো তখন এর আনুগত্য স্বীকার করে। বিজয়ী গরুটি হয় অবিসংবাদী নেতা, সেই বিজয়ীর মৃত্যু হলে বা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করলে ঘণ্টাটি বেঁধে দেওয়া হয় পরবর্ত্তী বিজয়ীর গলায়।

একবার এক পায়রাকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পাখীদের তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই অধিনায়ক প্রতিদিন পাখীদের খাওয়া দাওয়ার সময়ে উপস্থিত থাকত এবং বিপদ আসছে বুঝতে পারলেই চীৎকার করে সকলকে সাবধান করে দিত।

অনেক অনেক যূথচারী পাখী আছে, যাদের দলপতি শিকারীর আগমন বুঝতে পারলেই জোরে ডাকতে সুরু করে। তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অন্যান্য পাখীরা পালিয়ে যায়। দলপতি কিন্তু এক জায়গায় স্থির ভাবে বসে শিকারীকে লক্ষ্য করতে থাকে। ফলে সে দলের সকলের প্রাণ বাঁচিয়ে নিজে প্রাণ দেয় শিকারীর গুলীর মুখে।

এক জাতীয় তিমি মাছদের মধ্যেও নেতৃত্বের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়েছে। এই তিমি-নেতা যখন যেদিকে যায়, অন্ধভাবে তার সগোত্ররাও তখন সেই দিকে তার অনুসরণ করে। মৎস্য-শিকারীরা তাদের এই বিশেষত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত বলে এক দিন সবংশে এই তিমিবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়।

নেকড়ে বাঘেদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য, আকৃতি, বয়স, চাতুর্য্য প্রভৃতি বিবেচনা করে নেকড়ের দল তাদের নেতাকে বাছাই করে নেয়।

পশু-পাখীদের রাজ্যে এই রকম নেতাদের অনেক খবর পাওয়া গিয়েছে। ভবিষ্যতে এই রকম আরো কতকগুলো অমানুষ নেতাদের গল্প তোমাদের বলবার ইচ্ছা রইল।

ফুল ফোটে কেন ?

শ্রীসুহাসকুমার দাস

ফুল ফুটলো। কি সুন্দর ফুল!···যেমন রং তেমন গন্ধ। কিন্তু ফুল কি কেবল তার রং আর গন্ধ বিলিয়ে দিতেই ফুটলো ? ···সারা দুনিয়াটাই একটা প্রকৃতির রাজ্য···এখানে চলতে ফিরতে নিয়ম না মেনে চললে তোমার বেঁচে থাকার মেয়াদও যাবে ফুরিয়ে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তালে তাল দিয়ে চলতে না পারলেই তোমার বিপদ।

মানুষের মধ্যে যেমন বংশ-রক্ষা করতে ছেলে-পুলের প্রয়োজন হয়—তেমনি গাছ-গাছড়া আর উদ্ভিদের পক্ষেও সেই একই নিয়ম। পুরোনো গাছ শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন গাছের জন্ম হওয়া চাই···না হ'লে উদ্ভিদের বংশ রক্ষা হবে কেমন ক'রে ?

গাছের এই বংশবৃদ্ধির জন্য তাই প্রথমেই দরকার 'ফুলের'।

…ফুল ফুটলো। ফুলের বুকের পরাগ গিয়ে পড়লো গর্ভমুণ্ডের মাথায়; ব্যস, তার পরেই ভাবী গাছের প্রতীক হ'য়ে গর্ভকোষের ভেতর জন্ম নিল বীজ। এবার জল, হাওয়া আর আলোর সংস্পর্শে গর্ভকোষই ক্রমে ক্রমে ফলের আকারে বেড়ে উঠতে থাকে।…এখন আর ফুলের প্রয়োজন কি? তার কাজ ফুরিয়েছে…এবার তাকে ঝরে পড়তে হবে।…রূপ, রসহীন ক'খানা পাপড়ি অনাদৃতের মত ঝরে পড়লো সবার আড়ালে। আজ আর কেউ তাকে চিনবেই বা কেমন ক'রে, এখন সে কেবল জঞ্জাল ছাড়া আর কী?

এখন প্রশ্ন জাগে, ফুলের বুকে অত গন্ধই বা কেন আর কিসের জন্যই বা তার অত রূপ?—এর উত্তর আছে, সহজ উত্তর; ফুলের বুকের পরাগ ফুল থেকে ফুলে উড়িয়ে নিয়ে না যেতে পারলে ফুলের সকল আশাই হবে ব্যর্থ—বীজই বা জন্ম নেবে কেমন ক'রে? তাই এই পরাগ পতনের জন্য ফুলকে প্রজাপতি, মৌমাছি, ভ্রমর…ছোট ছোট পাখী এবং আরও অনেক পতঙ্গের কাছে সাহায্য চাইতে হয়। কিন্তু সাহায্য চাইলেই কি পাওয়া যায়? তাদের সেই সাহায্যের প্রতিদানে কিছু না দিতে পারলে চলবে কেন?…তাই ফুলের বুকে এল মধু, মিষ্টি গন্ধে পাগল হ'য়ে মৌমাছি এল তার হাল্কা পাখায় ভর করে গুন্‌গুনিয়ে মধু সঞ্চয় করতে। প্রজাপতি এল তার রঙ্গীন পাখা নাচিয়ে। ফুলের রং তার মন ভুলিয়েছে। মধুর ভাগ তাকেও তো পেতে হবে। মনের আনন্দে ও ঘুরে বেড়ায় ফুল থেকে ফুলে। ফুল দিল তার বুকের মধু, মৌমাছি আর প্রজাপতি ঘটালো পরাগের মিলন। ফুল খানিকটা মিষ্টি হেসে ওদের জানালো শুভেচ্ছা। মৌমাছি জানালো তার মধুময় গুঞ্জন। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে ফুল ঝরে পড়লো। প্রজাপতি, মৌমাছি আর ভ্রমর এলো,—ওদের চোখে আজ বেদনা আর কৃতজ্ঞতার অশ্রু।…ফুল কথা কয় শেষ কথা—বন্ধু বিদায়, আমার কাজ ফুরিয়েছে।…ভোরের শিশির অশ্রু হ'য়ে ভ'রে দেয় ঝরা ফুলের পাপড়ি।

বিশ্বে যারা সবার সেরা

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ

তোমরা হয়ত জান যে মানুষের তৈরী জিনিষের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত সবচেয়ে জোরে ছুটতে পেরেছে জার্ম্মাণীর রকেট বোমা (V2) ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইটালীর বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষ এজেলো সাহেব মিনিটে প্রায় ৮ মাইল বেগে সী-প্লেন চালিয়েছিলেন। পাখীদের মধ্যে Duck Hawk এর গতি সব চেয়ে বেশী। ঘণ্টায় ১৮০ মাইল। কিন্তু দৌড়ের পাল্লায় এদের সবাইকে হার মানিয়েছে Caphenemyia (সেফেনিমিয়া) নামে এক জাতের মাছি। এরা মেক্সিকোর বাসিন্দা। সেকেণ্ডে ৪০০ গজ অর্থাৎ ঘণ্টায় ৮১৮ মাইল বেগে এরা উড়ে চলে।

আমেরিকার 'লর্ড কেলভিন' নামে যে জাহাজ আছে, তার শিকলই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় শিকল। এর দৈর্ঘ্য ৪২০০ ফুট এবং ওজন প্রায় ৭০০ মণ। সব চেয়ে বড় চা বাগান আছে সিংহলের বুডোজা নামের এক জায়গায়। এই বাগানের এক একটি ঝাড়ের বেড় ২৪ ফুট। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় টেলিস্কোপ তৈরী হচ্ছে ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজিতে। এর কাচের ব্যাস হবে ২০০ ইঞ্চি। তার পর গোঁফ; কাথিয়াওয়াড়ের এক ভদ্রলোক বিশ্বের সেরা গোঁফ সযত্নে পুষে রেখেছেন। এই গোঁফের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত, দৈর্ঘ্য আট ফুট দশ ইঞ্চি! বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি!

যুগোশ্লোভিয়ার Shava নামে এক নদী আছে। এই নদীর জল খুব মিষ্টি, খৃষ্টমাস-ডেতে এই নদীর জল নিয়ে ১,৪০,৫০৪ গ্লাশ লেমনেড এবং ১০০৫১৮ পেয়ালা চা সুমিষ্ট করা হয়েছিল অর্থাৎ অত গ্লাস লেমনেড ও অত পেয়ালা চা সুমিষ্ট করতে চিনি লাগত প্রায় ২৩গাড়ী। এ নদীর জলে স্যাকারিণ আছে প্রচুর পরিমাণে।

সব চেয়ে বড় ফুল 'র‍্যাগলেসিয়া আরগেলডি,'—সুমাত্রার বনে বুনো দ্রাক্ষালতার শেকড়ের উপর এই ফুল জন্মায়। এর কুঁড়ি এক এক একটা প্রকাণ্ড ফুলকপির মত বড় হয়। এর রং লাল, পাপড়ি পুরু, ব্যাস পুরো দু'হাত। ষ্টালিংসায়ারের কিপেন গ্রামে সব চেয়ে বড় আঙ্গুর জন্মায়। ওজনে সব চেয়ে ভারী লণ্ডনের চিড়িয়াখানার একটি অষ্ট্রীচ,—এর ওজন ৩ মণ ৩৫ সের।

দুধ খায় সব চেয়ে বেশী পরিমাণে সুইজারল্যাণ্ডের লোকরা। মাথা-পিছু সেখানকার লোক দিনে দেড় পাঁইট অর্থাৎ বছরে ৬৩ গ্যালন হিসাবে দুধ খায়। দক্ষিণ আমেরিকার কাঙ্গো সহরে এক পার্ব্বণ উপলক্ষে গীর্জ্জায় বাতি দেওয়া হয়েছিল। এ বাতির আকার শিবপুরের বিরাট বটগাছটার মত। এই বাতি দিনরাত্রি জ্বলছে, তবুও এটা নিঃশেষ হতে এখনও ১৭১০ বছর লাগবে। অষ্ট্রীয়ার ক্র্যাকাউ খনি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় লবণের খনি। পৃথিবীর সব চেয়ে দামী জিনিষ রেডিয়াম। এর এক পাউণ্ডের দাম ২৮০০০০০০ টাকা।

"বৃষ্টি আসে"

দিলীপ দে চৌধুরী

ওই, বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি আসে,
মেঘের কোলে বিজলী হাসে!
বৃষ্টি আসে।
পাগল হাওয়া ছুটছে জোরে,
বজ্র আজি ডাকছে ওরে,
গাছের পাতা কাঁপছে ত্রাসে!
বৃষ্টি আসে।
ঘূর্ণি ওঠে নদীর জলে,
নৌকারা সব প'ড়ছে টলে;
অন্ধকারে দিক্ হারা,
আজ কারা?
ভয় কি ওরে ভয় কি বল
বৃষ্টি আসুক, আসুক জল,
বজ্র ডাকুক, হোক প্রলয়
নাইক' ভয়।
কালো আকাশ রইবে না কো,
মেঘের ঘটা যতই থাক-ও
হ'বে নতুন সূর্য্যোদয়,
নাইক' ভয়।
পথের ধূলো গগন-কোণে,
শুক্‌নো পাতা উড়ছে বনে
ঝড়ো হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
বৃষ্টি আসে। বৃষ্টি আসে।

ভিক্‌টরী কাপ প্রতিযোগিতা

আই এফ, এ, শীল্ডের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার ময়দানে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলার মরশুম প্রায় শেষ হইয়া যায়। এ বৎসর বিশ্বসমরের পরিসমাপ্তিতে বিজয়োৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ভিক্টরী কাপ-প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা রচিত হয়। স্থানীয় ফুটবল-জগতের শ্রেষ্ঠতম আটটি দল ও সামরিক স্পোর্টস্ কন্ট্রোল বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত আটটি দল লইয়া এই প্রতিযোগিতার ক্রীড়া-সূচী প্রস্তুত হয়। প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের প্রথম আটটি দল হিসাবে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহঃ স্পোর্টিং, ভবানীপুর, বি, এণ্ড এ রেলওয়ে, কালীঘাট, ক্যালকাটা ও এরিয়ান্স এই প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। অপর দিকে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিভিন্ন কেন্দ্রের সামরিক খেলা-দলের মধ্যে বাছাই করা আটটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সুদূর মাদ্রাজ ও বাংলার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আর, এ, এফ দলগুলির যোগদানে এই প্রতিযোগিতা সমৃদ্ধ হয়। বস্তুতঃ, বর্ত্তমানে ভারতে অবস্থানকারী বিলাতী পেশাদার ও অপেশাদার খ্যাতনামা বিভিন্ন খেলোয়াড়কে এই সুযোগে বাংলার জনসাধারণ দেখিবার সুবিধা পায়; কিন্তু মাত্র দু'-একটি ব্যতীত বিশেষ কোন খেলোয়াড়ের আশাপ্রদ বা উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু এই প্রতিযোগিতার চরম সম্মানের অধিকারী হইবার জন্য স্থানীয় দুইটি অতিপুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী দল—ক্যালকাটা ও মোহনবাগান মিলিত

এম, ডি, ডি,

হইবে। যুগপৎ লীগ ও শীল্ডজয়ী ইষ্টবেঙ্গল আশাতীত ভাবে কুমিল্লা আর, এ, এফ, দলের নিকট ৪—০ গোলে পর্য্যুদস্ত হয়। প্রথম দফায় খেলাটি ২—২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। মহঃ স্পোর্টিং দল ইষ্টবেঙ্গলবিজয়ী কুমিল্লাকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া মোহনবাগানের বিরুদ্ধতা করে। সুযোগ সন্ধানের অভাবই কুমিল্লা দলের বিপর্য্যয়ের মূল কারণ, কলিকাতা আর, এ, এফএর ন্যায় শক্তিশালী দলকে মোহনবাগান অদম্য উৎসাহের সহিত খেলিয়া ৩—০ গোলে পরাজিত করে। ভবানীপুরকেও তাহারা দুই গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। এ যাবৎ এ বৎসর তাহারা লীগ ও শীল্ড লইয়া চার বার ভবানীপুরের সহিত মিলিত হইয়া তিনবার জয়ী হয়। একবার খেলা অমীমাংসিত থাকে। মহঃ স্পোর্টিংএর সহিত প্রথম দিন রেফারী'র ভ্রমাত্মক নির্দ্দেশে সন্দেহজনক গোলে মোহনবাগান জয়লাভে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয় দিন দুই গোলে পশ্চাদ্‌পদ হইয়া তাহারা শেষ পর্য্যন্ত অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করে ও ৩—২ গোলে জয়ী হয়। অপর প্রান্তে এরিয়ান্সকে ৬-০ গোলে ও বি এণ্ড এ রেলওয়ের ন্যায় শক্তিশালী দলকে অতি সহজে যথাক্রমে ৬-০ ও ৩-১ গোলে পরাজিত করিয়া ১০১ এরিফা 'বি' দল যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। কালীঘাটকে এক দিন অমীমাংসার পর ক্যালকাটা ৬-০ গোলে পরাভূত করে ও ১০১ এরিয়া 'বি' দলের সহিত সেমিফাইন্যালে মিলিত হয়। প্রথম দিন ক্যালকাটা কোনক্রমে ড্র করিয়া মান বাঁচায় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা একমাত্র গোলে জয়ী হয়।

এ পৃথিবীর মরে না ত' কিছু

দয়াময়ী রায়

জড়ধর্ম্মী জীবনের নিস্তব্ধ প্রহরে
গোধীর উক্তা কেন ?
মৃত্যুর তৃষ্ণার মত রাত্রির রহস্য যেন
প্রেতায়িত ছায়াছবি আলো-আঁধার অন্ধকারে।
ভীরু ভাষা চুপের আড়ালে, শিলাভূত অন্তর
কবিতার বিষণ্ণ সমাধি—উদাসী আকাশ দৃষ্টি
মৃত্তিকার বক্ষ চিরে—এ-কি···!
বিপ্লবীর পদধ্বনি, কোন্ কথা বলে···?
নিরুত্তর ছন্দপাত, ম্লান চাঁদ দুরন্ত দূরে
প্রান্তরে ছড়ান মেঘ রাত্রির কিমানো ধরে
আহ্বান আনে—মুক্তির অনেক আশা
কঠিন তরঙ্গে। দুরু দুরু বুকে
শুনি আমি, নির্ব্বিকারে প্রথম ভাষা—
"জয় হোক জীবনের।"
প্রকৃতির দুর্ব্বোধ্য ইঙ্গিত।
তমসা-তীর্থে—জীবনের প্রথম জাগায়
আলোময় উৎসব-মিছিলে দেখিলাম—
এ পৃথিবীর মরে না ত' কিছু।
ধমনীর উষ্ণ রক্ত চঞ্চল প্রবাহে
দিনের প্রথম আলো নামে নামে।

শ্রীতারানাথ রায়

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। জাপানের সরকারী ভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ-রুশ-চৈনিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ। সরকারী জাপ-ঘোষণার সত্য পাঠ—

—জাপান মিত্রশক্তিবর্গের পটস্‌ডাম চুক্তি মানিয়া লইল ও উহা কার্য্যকরী করিতে সম্মত হইল।

—জাপসৈন্য বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিল ও সর্ব্বত্র যুদ্ধ হইতে বিরত হইল।

—মিত্রশক্তিবর্গের পরম অধিনায়কের নির্দ্দেশ অনুসারে জাপানের সকল সামরিক, বেসামরিক ও নৌবিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ অতঃপর কার্য্য করিতে সম্মত হইল।

—অবিলম্বে মিত্রপক্ষের সকল সামরিক ও বেসামরিক বন্দীকে মুক্তি দিয়া যথাযোগ্য স্থানে প্রেরণ করিতে জাপান সম্মত হইল,—মিত্রশক্তিবর্গের পরমাধিনায়কের সম্মতি-সাপেক্ষ ভাবে জাপ-সম্রাট্ ও জাপ-সরকার অতঃপর রাষ্ট্র শাসন করিবেন।

মিত্রপক্ষের সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাক-আর্থার জাপ-রাষ্ট্রের অন্ত্যেষ্টি উৎসবে ঘোষণা করিলেন—নালিক গর্জ্জন আজ নিস্তব্ধ। [illegible] যবনিকাপাত। মহা বিজয় আজ অর্জ্জিত। গগন হইতে আজ আর মৃত্যু বর্ষিত হইতেছে না। সপ্তসিন্ধু বক্ষে বহন করিতেছে আজ বাণিজ্য-সম্ভার। সর্ব্বত্র মানুষ আজ দিবালোকে শির উন্নত করিয়া চলিতেছে—সমগ্র জগৎবাসী আজ হইতে স্বচ্ছন্দ শান্তিতে দিনযাপন করিবে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানের পরাজয়ের পরও আত্মপরাজয় ভুলিতে না পারিয়া বলিলেন—"পার্ল হারবারের প্রহার যেমন আমরা ভুলিতে পারি না, জাপ-রণবাদীরাও তেমনি "মিশোরী' জাহাজে আত্মসমর্পণের পীড়াও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ···আমাদের এ বিজয় মাত্র অস্ত্রের নহে, এ বিজয় অত্যাচারের উপর স্বাধীনতার। এই প্রেরণাতেই আমাদের বাহুতে আসিয়াছিল বল, স্বাধীনতার প্রেরণাতে আমাদের বীরত্ব রণাঙ্গনে অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ষ্টালিন বলিলেন—পৃথিবীতে দুইটি আপদের সৃষ্টি হইয়াছিল, ফ্যাশিজম ও বিশ্বগ্রাস। পশ্চিমে জার্ম্মাণী, পূর্ব্বে জাপান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-দানবকে তাহারাই লেলাইয়া দিয়াছিল। তাহারাই মানব জাতি ও মানব-সভ্যতাকে ধ্বংসোন্মুখ করিয়াছিল। চারি মাস পূর্ব্বে পশ্চিমের আপদ শান্তি হইয়াছে, ফলে জার্ম্মাণী বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এইবার প্রাচ্যখণ্ডের আপদের শান্তি হইল।

জাপানের এই পরাজয়ে ভারতীয় সৈন্যদের মাত্র নহে, সমগ্র ভারতবাসীর, বিশেষতঃ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের বেসামরিক নর-নারীর দান সামান্য নহে। অকাতরে প্রাণ দিয়া ভারতবাসী যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে সেতু বহিয়াই মিত্রপক্ষ শত্রুদেশে গিয়া বিজয়-কেতন উড়াইতেছে। বিপদে ভারতের দেহ ও অন্নদানের প্রভূত স্তব-স্তুতি শুনা গেলেও শ্বেতাঙ্গদের বিজয় উৎসবে কালাদের আহ্বান পর্য্যন্ত করা হয় নাই। বিলাতের 'Yorkshire Post' লিখিতেছেন—"There is every justification for the keen disappointment felt by men of the Indian Army at the fact that no representative of India was invited to be present at the surrender ceremony of the Japanese aboard the American warship "Missouri" in Tokyo Bay···The Indian Army as such does not seem to have been represented at the Rangoon ceremony, either, which is especially unfortunate as Indian troops constituted nearly 75 per cent of the 14th army."
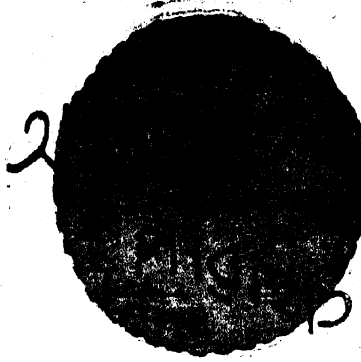
আত্মসমর্পণ—

জাপান প্রথমে বলিয়াছিল, সে মাত্র রুশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। কিন্তু মত পরিবর্ত্তন করিয়াছে। হাবে-ভাবে মনে হইতেছে, জাপানীরা বৃটেন ও আমেরিকাকে কি জানি কেন তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। এংলো-স্যাক্সন জাতিদ্বয়ও মিকাদোর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছে না। জাপ প্রধান-মন্ত্রী সে দিন জাপ-পার্লামেণ্টে জানাইয়াছেন—মিকাদো বরাবরই বৃটেন ও আমেরিকার ন্যায় শক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে ছিলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পরেও তিনি বৃটেন ও আমেরিকার সহিত আপোষ করিতে বলেন। সম্রাটের ইচ্ছাতেই যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মার্কিণ এসোসিয়েটেড প্রেসের মস্কো সংবাদদাতার সংবাদ সত্য হইলে বুঝিতে হইবে জাপানের প্রতি বৃটিশ ও মার্কিণ-করুণা-ব্যবহারে রুশিয়া একটু উদ্বিগ্ন। সংবাদদাতার ভাষা—"There is a fear that the United States, Britain and China will be too lenient with Japau."

নির্ব্বিবাদে নহে—

জাপ-সরকার আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেও জাতি নির্ব্বিবাদে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হয় নাই। জাপ সরকার এমন আশঙ্কা করেন যে, উন্মত্ত জাপরা সরকারী বিমান বাহিনী দখল করিতে পারে। যে নৌঘাটিতে (য়োকোশুকা) মার্কিণ বাহিনী সৈন্য নামায় তাহার নিকটবর্ত্তী কুরিহামার নৌ-এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয়ে জাপ-অস্ত্রশস্ত্রের গুদামে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড হয়।

সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ সহজে হয় নাই। সেখানে রেলওয়ে লাইন ধ্বংস করা হয়, ট্রেণ আক্রান্ত হয়, সৈন্যদের অস্ত্রাদি-খাদ্য-রসদ ভয়ঙ্কর ভাবে লুণ্ঠিত হয়।

ইংরেজ ফৌজ হংকং দখল করিবার জন্য অবতরণ করিলে আত্মাভিমানী জাপ সৈন্য যেমন দলে দলে নগরের বহির্ভাগে ক্যামেরণ পাহাড়ে হারিকিরি করিতে থাকে, তেমনই ভয়ঙ্কর ভাবে অবতরণকারী সৈন্যদিগকে বাধা দেয়।

মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও দক্ষিণ সাখালিনে জাপানীরা শত শত

গ্রাম ও নগর পুড়াইয়া শ্মশান করিয়াছে। বিশেষতঃ সাখালিনে scorched earth policy অনুসরণ করিয়া প্রধান নগরগুলির চিহ্নমাত্র তাহারা রাখে নাই।

বিলাতের 'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিরোশিমা হইতে জানাইয়াছেন যে—"The survivors of Hiroshima began to hate whitemen from the moment the atomic bomb was dropped. Japan's history during the last three quarters of a century can be described as an endeavour to follow the example of the West. The endeavour will continue, thanks to the seeds of revenge sown by the atomic bomb."

সুভাষচন্দ্র ও ডাঃ বা-ম—

এ মাসের অন্যতম বিশেষ ঘটনা—মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের পূর্ব্বেই সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু-সংবাদ (১৯শে আগষ্ট—ফরমোজার বিমান-দুর্ঘটনায়)। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সুবিধা হইবে মনে করিয়া সুভাষ ও তাঁহার ভারতীয় আজাদী বাহিনী জাপানের সহিত সহযোগিতা করেন। অনেকে, বিশেষতঃ বৃটিশ ও মার্কিণ সামরিক মহল জাপানের প্রচারিত এই মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করিতেছে না। মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণার কয় দিন পরেও তাঁহাকে না কি সাইগনে দেখা যায়। চীনারা বলিতেছে,—জাপানীরা যখন সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণ করে (১লা সেপ্টেম্বর), তখন তিনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন এবং ঐ সময়েই বিমানে টোকিও যাত্রা করেন। সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সম্প্রদায় না কি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর কাহিনী বিশ্বাস করেন না। রয়টারের সংবাদদাতা বলিতেছেন—সিঙ্গাপুর পুনরধিকার উৎসবে—"In marked contrast to the vociferous greetings from the Chinese, local Indians kept themselves in the back ground." আগষ্টের শেষ সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর জন্য শোকানুষ্ঠান হইলেও—"his adherents as well as large numbers of the Indians think he has done the 'vanishing trick' again."

গত ২৬শে আগষ্টের এক সংবাদে জানা যায় যে, 'এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার' রেঙ্গুন-প্রতিনিধি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনেই ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজাদী হিন্দবাহিনীর স্থানীয় অধিনায়ক মেজর জেনারল লোকনাথন তাঁহাকে বুঝান যে, পূর্ব্ব এশিয়ার সহস্র সহস্র ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য আছে। তখন তিনি বিশিষ্ট সহকর্মীদের লইয়া রেঙ্গুন হইতে পলায়ন করেন।

"অস্থায়ী স্বাধীন ভারতে"র "নেতাজী সুভাষচন্দ্রের" অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ অস্থায়ী স্বাধীন ব্রহ্মের নেতা ডাঃ বা-মও আত্মগোপন করিয়াছেন। মার্কিণ এসোসিয়েটেড প্রেস জানাইয়াছেন যে, আগষ্টের মধ্যভাগে তিনি ব্রহ্মদেশ হইতে ইন্দোচীনে পলায়ন করেন। প্রচারিত হইয়াছে যে, সুভাষচন্দ্রকে রুশিয়ায় প্রেরণের জন্য জাপ সরকার ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

জার্ম্মাণী ও জাপানে পার্থক্য—

সোভিয়েট মুখপত্র 'প্রাভদা' বলিয়াছেন—"Situation in Japan after the capitulation is appreciably different from that in Germany after the Allied victory."

জার্ম্মাণী-অধিকারে ও জাপান-অধিকারে একটু পার্থক্য আছে। জার্ম্মাণীতে মিত্রপক্ষের যে নিয়ন্ত্রণ-পরিষদ (Control Council) গঠিত হইয়াছে, তাহা চারি মিত্রপক্ষের চারি জন সেনাপতির সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কাজ করিতেছে। জাপানে মার্কিণ জেনারল ম্যাক আর্থারই সর্ব্বাধিনায়ক—সুতরাং তাঁহার দায়িত্বও সর্ব্বাধিক। অবস্থা কতকটা বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার মতন। সেখানেও মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ-পরিষদ সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করিয়াছেন।

শ্বেতাঙ্গের জাপাতঙ্ক—

তবু শ্বেতাঙ্গদের জাপ-ভীতি দূর হয় নাই, অনেকে বলিতেছেন যে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের পর জার্ম্মাণ সামরিক নেতৃবৃন্দ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, জাপ-রণপন্থীরাও সম্ভবতঃ তাহাই করিবে। জাপ নৌ ও বিমানশক্তি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। স্থলসৈন্য সুদূর সিতাং নদীর তটে কি ভাবে মিত্রশক্তির প্রহারপীড়িত হইয়াছে, জাপ জনসাধারণ তাহা প্রত্যক্ষ না করিলেও, মার্কিণী এটম বোমার সর্ব্বধ্বংসী শক্তিতে অভিভূত হইয়াছে। তবু বেশীর ভাগ জাপ-সৈন্য পরাজয়ের গ্লানি না চাহিয়া বিজয়-অহমিকা লইয়াই স্বদেশে ফিরিবে। ইহারা নিশ্চয় অপ্রত্যাশিত 'আত্মসমর্পণে' আত্মগোপন করিবে। লণ্ডন 'টাইমস্' সাবধান করিয়া দিতেছেন—"It will find in the numerous and powerful secret societies as well as in the machinery of the military police a ready-made cover for the continuation of its activities. The Allies can expect little aid from civil authorities in exposing this dangerous myth of an undefeated army."

সোভিয়েট সংবাদপত্র 'প্রাভদা'ও মিত্রপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন—"They are (জাপানীরা) planning to retain their positions and trying to prepare for a revenge."

জাপ সম্রাট্ হইতে সুরু করিয়া জাপানে প্রত্যেকটি শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ জাপ জাতিকে যেন নিঃসংশয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, মিকাদোর মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, জাতির ভবিষ্যৎ ম্লান হয় নাই; তবে বর্ত্তমান দুঃখ সহ্য করিতে হইবে ভবিষ্যৎ সুদিনের প্রত্যাশায়।

জাপ ১ম সেনাদলের অধিনায়ক লেঃ জেনারল তাদাও কাতিওকা ফিলিপিনে আত্মসমর্পণ করিয়া মধ্য যুগের রণনায়কদের এক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"যদি আমি মরি,—আবার আমি বাঁচিয়া উঠিব—আবার—আবার—সাত বার। বাঁচিয়া উঠিয়া আবার যুদ্ধ করিব।" কোন্ স্বপ্নে বিভোর হইয়া বন্দী সেনাপতি এ কথা বলিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎই ব্যাখ্যা করিতে পারে।

প্রাচ্যের শাশ্বত দাসত্ব—

শ্বেতাঙ্গদের এ আতঙ্ক কেন ? ইহা অপরাধীর আতঙ্ক। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা এশিয়াবাসীদের উপর যে অন্যায় প্রভুত্ব কয়েক শতাব্দী ধরিয়া করিয়া আসিতেছে, সে প্রভুত্ব এশিয়াবাসী সমর্থন করে নাই।

চীনে রুশিয়ার কি স্বার্থ ?

রুশিয়ার সংবাদপত্রগুলি বরাবর মার্শাল চিয়াং কাইশেকের এক-নায়ক শাসনতন্ত্রের তীব্র নিন্দা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে মলোটভ-সুং চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া রুশিয়া অভিনব রাজনৈতিক চাল চালিয়াছে। যে চীনা কমুনিষ্টদের তাহারা এত দিন সমর্থন করিয়া আসিতেছিল, এবার তাহাদের আর সে সমর্থন করিতেছে না। ডিকটেটরী চুংকিং-শাসনের সে সমর্থন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। কারণ কি ? চীনা রাজনীতি তথা অর্থনীতিতে ইংলণ্ড তথা আমেরিকার স্বার্থ সুপরিচিত। রুশিয়া কি চিয়াং কাইশেক-তন্ত্রকে সমর্থন করিয়া এংলো-স্যাক্সন স্বার্থকে নির্বিষ করিতে চাহিতেছে ? চীনা সোভিয়েট নয়া চুক্তির সর্ত্ত হইল—(১) সোভিয়েট যুনিয়ন চীনে মাত্র কুয়ো-মিনতাংকেই সামরিকাদি সাহায্য প্রদান করিবে ; (২) কানসু, শেনসি ও শানসি প্রদেশে আজিও কমুনিষ্ট নিয়ন্ত্রণে আছে। এই তিন প্রদেশেও সোভিয়েট রুশিয়া কুয়োমিনতাং সরকারের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইবে ; (৩) মাঞ্চুরিয়া হইতে রুশ সৈন্য অপসারিত হইবে ; (৪) পূর্ব্ব-তুর্কিস্থানের (শিনকিয়াং) চীনা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশিয়া হস্তক্ষেপ করিবে না ; (৫) চীনা পূর্ব্ব-রেলপথ ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ান রেলপথের পরিচালনা ৩০ বৎসর রুশ-চীন যুগ্ম নিয়ন্ত্রণে রহিবে, তৎপরে উহা চীনা নিয়ন্ত্রণে যাইবে ; (৬) ৩০ বৎসরের জন্য পোর্ট আর্থারের ঘাঁটি রুশ-চীন যুগ্ম নিয়ন্ত্রণে রহিবে ; (৭) চীনকে বহির্মঙ্গোলীয়ার স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইতে হইবে। এ সকল চুক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি, কোন্ গোপন সর্ত্তে দুর্ব্বল ও দরিদ্র চীন না চাহিতেই এত সুযোগ পাইয়া সহসা শক্তিশালী হইল তাহা আমরা জানি না। তবে এটুকু অনুমান করা কঠিন নহে যে, চীনে আসন্ন নব পরিস্থিতির সম্ভাবনায় কমুনিষ্ট রুশিয়াকে চীনা কমুনিষ্টদিগকে পর্য্যন্ত পরিহার করিতে হইয়াছে।

আবার চীনে শ্বেতাঙ্গ-তাণ্ডব ?

পরলোকগত ওয়েণ্ডেল উইলকী লিখিয়াছিলেন—

"No foot of Chinese soil should be ruled except by the people who live on it" কিন্তু রুশ-ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা যেন চীনে তাহাদের মধ্যযুগের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির সুযোগ লইতেছে। মুখে স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের বুলি কপচাইলেও মার্শাল ষ্ট্যালিন—মাত্র সাখালিন ও কিউরাইল দখল করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। ইংরেজরা হংকং দখল করিতেছেন। নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে মার্কিণরা মধ্যযুগে যেমন ২১টি ট্রিটি পোর্টে শ্বেতাঙ্গরা জাঁকিয়া বসিয়াছিল, এবারও তেমনি তেমন কিছু অধিকার সংগ্রহ করিবে।

জনক্ষয়ের খতিয়ান—

এ যুদ্ধে কম পক্ষে নিম্নলিখিত হিসাব মত জনক্ষয় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার পর সংশোধন সংযোজনা অবশ্য থাকিতে পারে।

রুশিয়া	২ কোটি ১০ লক্ষ
জার্ম্মাণী	৬০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ২৫ লক্ষের মধ্যে
পোল্যাণ্ড	৬৬ ঐ
চীন	৩০ ঐ
জাপান	২৭ ঐ
আমেরিকা	১০ লক্ষ ৭০ হাজার
	(মাত্র জাপযুদ্ধেই ২ লক্ষ ৭৭ হাজারের অধিক)
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১৪ লক্ষ ৩০ হাজার
ফ্রান্স	১০ ঐ
ইটালী	১১ ঐ
যুগোশ্লাভিয়া	১৬ ঐ ২৫ হাজার
অষ্ট্রীয়া	৭ ঐ
হল্যাণ্ড	২ ঐ ৭৫ হাজার
হাঙ্গেরী	৬ ঐ
রুমেনিয়া	৭ ঐ
গ্রীস	৭ ঐ
বেলজিয়াম	৬০ হাজার
চেকোশ্লোভাকিয়া	৬০ ঐ
ফিনল্যাণ্ড	১ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৬৬
ফিলিপাইন	৩০ হাজার

বৃটিশ-শক্তি—

অধ্যাপক হেরল্ড ল্যাস্কী তাহার নূতন গ্রন্থে বৃটেনকে "দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি" আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে অনেকে মহা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

কিন্তু বৃটেন "প্রথম শ্রেণীতে" থাকিবার দাবী করে কোন্ লজ্জায় ? বৃটেনের পরিত্রাতা আমেরিকা এবং রুশিয়ার সহিত এক পংক্তিতে বসিবার সে যে অনুপযুক্ত তাহা ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। ইংরেজ ত আজ আমেরিকার কৃপাপ্রার্থী। চার্চ্চিল হইতে এটলী পর্য্যন্ত সকলেই মার্কিণ "generosity" ও "majestic help"এর গাল-ভরা স্তুতিগান করিতেছে। ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা বাতিল করিবার প্রস্তাবে যে ভাবে কলরব ইংরেজরা করিতেছে তাহাতেই মনে হয়, ইংরেজরা মার্কিণদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার উপযুক্ত নহে। রুশিয়াকেও ইংরেজরা মুখে খোসামোদ করে। রুশ-বিদ্বেষী চার্চ্চিল পর্য্যন্ত ষ্টালিনের স্তবে পঞ্চমুখ, সোভিয়েট যুনিয়নকে এড়াইয়া চলিবার কথাটি পর্য্যন্ত আজ আর কেহ বলিতেছে না। বাস্ত ভিটার পিতৃপুরুষের ইতিহাসের ঝাঁপি আর পুরাতন পাজামা পর্য্যন্ত বাঁধা দিলেও ইংরেজরা "the Empire"এর গর্ব্বে পহেলা শ্রেণীর শক্তিত্বের দাবী করিতেছে। সাংবাদিক ঠিকই বলিয়াছেন—

"It is the proprietorial domination over millions of other peoples and other territories

—called 'our territories'—that constitutes the greatness of Britain. What wonderful greatness!"

সে প্রভুত্বে এশিয়াবাসী নিঃস্ব হইয়া পরাঙ্গপুষ্ট শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। শোষণ, বর্ণ-বৈষম্য, রাজনৈতিক আভিজাত্য, এসিয়াবাসীকে চির ক্রীতদাস করিয়া রাখিবার অনিবার্য্য লোভ এবং কৃষি সম্পদ্‌-মাত্র-সম্পন্ন দেশগুলিতে শ্রমশিল্প-সম্পদের বিক্রয়-কেন্দ্র করিয়া রাখিবার অর্থনৈতিক অপকৌশলে এসিয়ার নরনারী আর সায় দিতেছে না। তাই অতি সহজে জাপান চীনের উপকূলাংশ, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন, শ্যাম, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি যখন দখল করে তখন সেই সকল দেশবাসী তাহাকে কিছুমাত্র বাধা দেয় নাই।

"One of the contributory motives of the Japanese aggression has been the deep resentment at the disposition of the Western powers to treat Eastern peoples as their inferiors. A perfectly sincere idealism was the starting point of more selfish ambitions covered by the slogan "Asia for Asiatics." কিন্তু দুর্ব্বল বৃটেন এ কথা বুঝিলেও প্রাণের দায়ে উদার হইতে পারিতেছে না। তাহার প্রাচ্য প্রজাদের স্বাধীনতা দিলে সে যে সম্পত্তিহীন সম্রাট্ হইয়া চতুর্থ শ্রেণীর রাষ্ট্রে নামিয়া যাইবে। বিপদ বুঝিয়া রক্ষণশীলদের মুখপত্র লণ্ডন টাইমস মুখে অবশ্য বলিয়াছেন—"Big Powers must try to reconcile the new national aspirations of the races of South East Asia with the requirements of the international situation." কিন্তু কার্য্যতঃ ইংরেজদের নয়া শাসন কর্তৃপক্ষ স্বজাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া চার্চ্চিলী পন্থা পরিহার করিতে সাহস পাইতেছেন না। জাপ-জার্ম্মাণ-অধিকৃত দেশগুলির সামরিক শাসনের ব্যবস্থার জন্য Control Commissionএর ব্যবস্থা হইলেই চলিবে না। যুদ্ধের মূল কারণ যে সকল বিক্রয়-কেন্দ্র—যে সকল কেপায়-তারই-জনপদ—সে সকল কেন্দ্র ও দেশগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতি হিসাবে নিরপেক্ষ আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের ব্যবস্থা করিবার মত নিঃস্বার্থ উদারতা শ্বেতাঙ্গ জাতিদের না হওয়া পর্য্যন্ত সময়-আপদ নিবারিত হইবে না। এ প্রসঙ্গে ভারত সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পার্ল বাকের মন্তব্য আমরা উদ্ধার না করিয়া পারিলাম না—"We have been told were India to be freed now, there would be a blood bath of civil war. But if India is not freed, there will be the greatest of blood baths one day, and one not only in India. For the most callous reasons of our self-interest India ought to be freed" মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি এবং বেতার সমালোচকগণ একবাক্যে প্রাচ্যাধিকার সম্বন্ধে ইংরেজকে মত পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিতেছেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে একবার স্পষ্ট কথা বলিবার জন্য মার্কিণ বেতার-সমালোচক সেশিল ব্রাউনকে সিঙ্গাপুর হইতে বিতাড়িত করা হয়। তিনি সম্প্রতি বলিয়াছেন—"The British will not long be welcome in Singapore if they intend to appoint old misfits to run things." 'নিউইয়র্ক টাইমস'ও ইংরেজকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"The British must establish new relationship requiring imagination, forbearance and tact." কিন্তু ধর্ম্মের কাহিনী সকলে শুনিতে চাহে না।

গণতন্ত্র-গণেশায় নমঃ

অবশেষে ঘণ্টা নাড়িয়া গণ-তন্ত্র-গণেশের পূজা করিয়া, "লাল পতাকা" উড়াইয়া, বৃটেনের নূতন শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। সাধারণ নির্ব্বাচনে বৃটিশ শ্রমিক দলের সাফল্য যাঁহাদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল, তাঁহাদের সেই আশার প্রদীপ প্রায় নিব-নিব হইয়াছে। নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাট্লী ও বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ বেভিন্ যে ভাবে তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে আশান্বিত হইবার মতো একেবারেই কিছুই নাই। বেভিন্ সাহেব স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গুরুদেব মিঃ ইডেনের বৈদেশিক নীতি ভক্তি সহকারে অনুসরণ করিবেন, কারণ, তিনিও ইডেন সাহেবের সহযোগী ছিলেন যখন, তখন চার্চিল গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতি তিনি সমর্থন করিতেন। অতএব বেভিন্ সাহেব কমন্স সভায় তাঁহার বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মুক্ত পূর্ব্ব-ইয়োরোপের নূতন সর্ব্বদলীয় বামপন্থী গবর্ণমেণ্টগুলির প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন :

"The Governments which have been set up not, *in our view*, represent a majority of the people, and the impression we get from recent developments is that one kind of totalitarianism is being replaced

"গণতন্ত্র" ও "সমাজতন্ত্রের" নাম জপ্ করেন, মনে মনে ও কাজে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। পৃথিবীতে ইঁহাদের সংখ্যা আজও একেবারে নগণ্য নয়। সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের পুণ্য নাম মুখে রাখিয়া ইঁহারা চিরকাল ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দালালি করিয়া আসিয়াছেন, দেশে দেশে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বুকে ছুরি বসাইয়াছেন এবং ফ্যাশিজমের আবির্ভাবের পথ সুগম করিয়াছেন। এ্যাট্লী-বেভিনের ইহার বেশী কিছু করিবার শক্তি নাই, এবং কিছু তাঁহারা করিবেনও না।

তাহার প্রমাণ আমাদের ভারতবর্ষ। অন্যান্য বৃটিশ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের কথা বাদ দিলাম। এ্যাট্লী-বেভিনের "গণতন্ত্রের" স্বরূপ কি তাহা ভারতের ক্ষেত্র হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নয়াদিল্লী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলির নির্ব্বাচন হইবে। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদের অস্তিত্ব আর থাকিবে না, এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের বাজেট-অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাচন শেষ করিতে হইবে। বড়লাট বাহাদুর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক লাটদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু নির্ব্বাচনের কোন তারিখ এখনও ঠিক হয় নাই। তাছাড়া ব্যবস্থাপক সভার

আদৌ যুক্তিসঙ্গত হইবে না। সুতরাং কংগ্রেস-সেক্রেটারী আচার্য্য কৃপালনী প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নির্ব্বাচনের প্রস্তুতির আদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মুস্লিম্ লীগ, হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই ভাবে ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সৈনিক-বড়লাটের সরলতার ও সৎসাহসের দৌড় এই পর্য্যন্ত। সিমলা সম্মেলনে যে সব কংগ্রেস-নেতা ঘন ঘন বিবৃতি দিয়া সৈনিক-বড়লাটের সাধুতা, সরলতা ও বলিষ্ঠতার প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আজ তাঁহাদের শিশুসুলভ উত্তেজনার জন্য লজ্জিত হইয়াছেন।

বেভিন

তাঁহারা নিশ্চয়ই আজ বুঝিতে পারিতেছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি যিনি, তিনি গণতন্ত্রের আদর্শ ইহা অপেক্ষা অন্য উপায়ে পালন করিতে পারেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে সাধারণ নির্ব্বাচনে যাহাতে ভারতের কোন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস পূর্ণশক্তি নিয়োগ করিতে না পারে তাহারই ব্যবস্থা করা।

সেই জন্যই সাধারণ নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার অনেক দিন পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, অন্যান্য প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে বৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে। এখনও হাজার হাজার কংগ্রেসকর্ম্মী ও নেতা কারাগারে ও বিভিন্ন বন্দীশিবিরে আটক রহিয়াছেন। তাঁহাদের মুক্তির কোন আয়োজন নাই, কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে এবং তাহার জন্য কংগ্রেসকে প্রস্তুতও হইতে হইবে শক্তি-পরীক্ষার জন্য। এখনও সহস্র শুঁড় বাহির করিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ভারতরক্ষা আইন, বিবিধ প্রেস আইন, সব বলবৎ রহিয়াছে। সভা-সমিতি করিবার, বক্তৃতা দিবার অথবা মতামত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা নাই। সমগ্র ভারতবর্ষকে আজও একটি বন্দি-শিবিরে পরিণত করিয়া রাখা হইয়াছে, প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, নাগরিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, কিছুই নাই। ইহারই মধ্যে বেভিন্ সাহেবের সহযোগী নূতন ভারত-সচিব লর্ড পেথিক্ লরেন্স এবং সৈনিক-বড়লাট লর্ড ওয়েভেল্ ভারতবর্ষে সাধারণ নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। সেই জন্যই এই ঘোষণা সম্পর্কে কমন্স সভার বৃটিশ শ্রমিক সদস্য মিঃ রেজিনাল্ড সোরেন্সেন বলিয়াছেন :

"I am glad to learn that election are to take place in India and I only hope that complete civil liberty will be restored well before the elections, especially removal of section 93 of the 1935 Act so that there can be a completely free expression of opinion by the electorate."

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ আসফ আলী বলিয়াছেন :

"The Congress as the biggest political organisation of the country is profoundly interested in all this and…it will play its part in the coming elections with a full realisation of its importance, It must, however, be noted that it would not merely be extremely unfair but posititively unjust if normal activity is not immediately restored and…all political prisoners and detenus are not immediately released and the handicaps under which the organisation, its members and sympathisers are labouring are not immediately removed."

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সকলেই বন্দী মুক্তির জন্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু সে সব আবেদন-নিবেদন সৈনিক-বড়লাট বা নূতন ভারত-সচিব কাহারও কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই। ইহাই বৃটিশ "গণতন্ত্রের" স্বরূপ। এই 'গণতন্ত্রই' যুক্ত ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশ টোরী ও শ্রমিক মন্ত্রীরা আগ্রহান্বিত। এই "গণতন্ত্র" যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেখানে তাঁহাদের মতে "টোটেলিটেরিয়ানিজম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঠিক এই ভাবেই গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা গ্রীসের সাধারণ নির্ব্বাচনের অভিভাবক হইবেন মনস্থ করিয়াছেন এবং এই জন্যই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট গ্রীসে অভিভাবকত্ব করিবার বৃটিশ-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

এই জন্যই আমরা বলিয়াছি, বৃটিশ গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র যোগ করিলে যোগফল হইবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। লর্ড ওয়েভেল যদিও পুনরায় বিলাত যাত্রা করিয়াছেন তাহা হইলেও তিনি যে ক্রীপস্ প্রস্তাব (Cripps proposal) অপেক্ষা নূতনতর কোন উপঢৌকন সেখান হইতে বহন করিয়া নয়া-দিল্লীতে ফিরিবেন তাহা মনে হয় না। পুরাতন ক্রীপস্ প্রস্তাবের জীর্ণ প্যাকেট্ বদলাইয়া নূতন রাঙতায় মুড়িয়া লর্ড পেথিক্ বড়লাট বাহাদুর মারফৎ এখানে প্রেরণ করিবেন এবং একে একে অন্যান্য শ্রমিক মন্ত্রীরা "হুকা হুয়া" রব তুলিয়া ভারতবাসীকে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন করিবেন। কারণ, বৃটিশ লেবার লীডাররা টোরীদের পুনরুক্তি করিয়া বলিবেন যে, স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজ এক লাফে পাওয়া যায় না, পাইলেও তাহা ভোগ করিবার শক্তি ভারতের নাই, অতএব ধাপে ধাপে স্বরাজের সিংহাসনে উঠিতে হইবে। বৃটিশ প্রভুরা সেই সনাতন মনিষার প্রকাশ করিবেন যে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ভারতবাসীকে ঐ ধাপগুলি পার করিয়া দিবেন। স্বরাজের

এই ধাপগুলি ঠেলিয়া পার করিয়া দিবার জন্যই ভারতে বৃটিশ শাসন, অন্ততঃ বৃটিশ অভিভাবকত্ব কায়েম রাখা একান্ত প্রয়োজন। সবার অন্তরালে যে মোদ্দা কথাটা উঁকি মারিতেছে তাহা হইতেছে এই, বৃটিশ উপনিবেশ হাতছাড়া হইলে বৃটেনে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, কোন কিছুরই বাক্যবিলাস চলিবে না। বিশ্বের দরবারে বৃটেন চতুর্থ শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইবে। সকলেই তাহাকে ঠোক্কর মারিবার চেষ্টা করিবে, পিছনে হাততালি দিবে। এমন কি, হয়ত অন্নবস্ত্র পর্য্যন্ত বৃটিশ প্রভুদের ভাগ্যে না জুটিতে পারে। সমস্যা এইখানে। এই সমস্যার অতি চমৎকার নিখুঁত চিত্র চার্চিল সাহেব একবার তাঁহার বক্তৃতায় (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩১) আঁকিয়াছিলেন। চার্চিল সাহেব বলিয়াছিলেন (এবং ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন):

"We have forty five millions in this island, a very large proportion of whom are in existence because of our world position, economic, political, imperial. If guided by counsels of madness and cowardice disguised as false benevolence, you troop home from India, you will leave behind you what John Morley call d 'a bloody chaos' and you will find famine to greet you on the horizon on your return." (India Speeches : Churchill)

ইহাই বৃটিশ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নগ্নরূপ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা। চার্চিল সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন যে, যদি তাঁহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া দেখিতে পাইবেন, দুর্ভিক্ষ তাঁহাদের দুই বাহু বাড়াইয়া অভিনন্দন জানাইতেছে, অন্যের দেশ আকণ্ঠ শোষণ করিয়া বিলাসিতা ও মদমত্ততা আর চলিতেছে না, পরের ধনে পোদ্দারিও বন্ধ হইয়াছে কিন্তু কথা হইতেছে, "গণতন্ত্র-গণেশায় নমঃ" বলিয়া আর কত দিন এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের 'জুলুমবাজি' চলিবে?

—

বৃটেনের পরের ধনে পোদ্দারী-নীতি

ভারতের নিকট বৃটেনের যে ষ্টার্লিং ঋণ রহিয়াছে তাহা না পরিশোধ করিবার মনোভাব হইতেই বৃটেনের পরের ধনে পোদ্দারী-নীতি অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের শিল্পপতি ও বাণিজ্য-প্রতিনিধিগণ এই ষ্টার্লিং ঋণপত্রের যা হয় একটি যুক্তিসঙ্গত গতি করিবার জন্য বৃটিশ প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া এক রকম ব্যর্থ হইয়াছেন বলা চলে। মহাযুদ্ধের খরচের ভার বহন করা সম্পর্কে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি আর্থিক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহা "Financial Settlement" নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে মহাযুদ্ধের মোট ব্যয়ভার কতটা কোন্ পক্ষ বহন করিবেন তাহা নির্দ্ধারিত হয়। যে ভাবে আজ পর্য্যন্ত এই ভার বহন করা হইয়াছে তাহার একটি হিসাব এখানে দেওয়া হইল :—

(কোটি টাকার হিসাবে)

	মোট খরচ	ভারতের অংশ	বৃটেনের অংশ
১৯৩৯-'৪০	৫৪	৫০	৪
১৯৪০-'৪১	১২৭	৭৪	৫৩
১৯৪১-'৪২	২১৮	১০৪	১১৪
১৯৪২-'৪৩	[illegible]	২১৫	[illegible]
১৯৪৩-'৪৪	৭৪৪	৩৫৮ +৩৮*	৩৭৮
১৯৪৪'-৪৫ (সংশোধিত)	৮১৬	৩১৭ +৬০*	৪৩৯
	২৭২২	১১১৮ +১৫০* = ১৩৪৮	১৩৭৪

(* তারকাচিহ্নিত সংখ্যাগুলি 'Capital expenditure', অর্থাৎ মূল্যবান, স্থায়ী যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য খরচ হইয়াছে)

১৯৪৫-এর ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ১৩৬৩ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ঋণপত্র (Sterling Balance) বৃটেনের নিকট আমাদের জমা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ টাকা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট ধারেন। ধারিলে কি হইবে, তাহা শোধ করিবার কোন সদিচ্ছা তাঁহাদের আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। কি ভাবে তাঁহারা এই ঋণ শোধ করিতে পারেন? সোনা দিয়া শোধ দিতে পারেন এবং সোনা পাইলেও আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কারণ এই সোনা দিয়াই আমরা অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য মালপত্তর ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারি। ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য (Consumer goods) সরবরাহ করিয়া তাঁহারা এই ঋণ ধীরে ধীরে শোধ করিতে পারেন, অথবা আমাদের শ্রম-শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্তর ও যন্ত্রপাতি, কলকব্জা দিয়া এই ঋণভার তাঁহারা লাঘব করিতে পারেন। সদিচ্ছা থাকিলে অনেক ভাবেই এই ঋণ অন্ততঃ ধীরে ধীরে শোধ করা যায়। কিন্তু আপাততঃ তাহার কোন আভাষও তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছে না।

ষ্টার্লিং ঋণপত্রের তো এই অবস্থা। তাহা ছাড়াও "সাম্রাজ্য ডলার ভাণ্ডারে" (Empire Dollar Pool) আমাদের যে ডলার জমা রহিয়াছে তাহাও এখন তাঁহারা তাঁহাদের কবলমুক্ত করিবেন না। অর্থাৎ সকলেই জানেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশেরই স্বাধীন বহির্বাণিজ্যের সুযোগ নাই। অন্য দেশের সহিত লেন-দেন করিতে হইলে তাহা বৃটেনের মধ্যস্থতায় করিতে হইবে। এই ভাবে ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে লেন-দেন করিয়াছে যুদ্ধের সময় তাহার "ডলার মূল্য" বৃটেনের হেফাজতে "Empire Dollar Pool" -নামক ডলার ভাণ্ডারে জমা হইয়াছে। ইহারও পরিমাণ সামান্য নহে। ইহার পরিমাণ হইতেছে ১৬০০ কোটি ডলার। এই ডলারও আজ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কবলমুক্ত করিতে রাজী নহেন, কারণ তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাহা হইলে তাঁহাদের ইজ্জৎ খোয়া যাইবে। 'ইজ্জৎ' যে কোথায় আছে তাহা তো আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আসল সমস্যা মাথাব্যথা হইতেছে যে "সাম্রাজ্য ডলার ভাণ্ডার" হইতে তাঁহারা যদি ডলার খালাস্ করিয়া দেন তাহা হইলে আমরা তাহা দিয়া আমেরিকার নিকট হইতে মালপত্র, যন্ত্রপাতি কেনাবেচা করিতে পারি তাহাই বা বৃটিশ ব্যবসায়ীরা সহ্য করিবেন কি করিয়া? এমন কি ভারতের শিল্পপতিরা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এখন যখন যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে তখন আমেরিকার সহিত বাণিজ্য-সূত্রে লক্ষ ডলার [illegible] সাম্রাজ্য-ভাণ্ডারে জমা দিবেন কেন? [illegible]

সেই "ডলার" তাঁহারা পান, তাহা হইলে তাহা দিয়া অন্ততঃ কিছু কিছু কেনা-বেচা তাঁহারা আমেরিকার সহিত করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মত নন।

ভারতীয় শিল্পমিশনের অন্যতম সদস্য মিঃ শ্রফ্‌ ও মিঃ টাটা ফিরিয়া আসিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা এই অভিযোগই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে অদূর ভবিষ্যতে বৃটেন বা আমেরিকা কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবার সম্ভাবনা নাই। ষ্টার্লিং-ঋণপত্র ও ডলার-ভাণ্ডার সম্বন্ধে বৃটেনের যে মনোভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (Industrial & Economic Planning) ভবিষ্যৎ আমরা একেবারে অন্ধকার দেখিতেছি। বৃটেনের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টও যে এই সমস্যার কোন সমাধান করিবেন, তাহা মনে হয় না, কারণ তাঁহারাও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দায়ভাগের ভার বহন করিয়া চলিয়াছেন। সাম্রাজ্যের স্বার্থ ত্যাগ করিবার বাসনা তাঁহাদের আদৌ নাই। বরং শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হয়ত মনে মনে ইহাই ভাবিতেছেন যে, ভারতে শ্রমশিল্পের প্রসারের সুযোগ দিলে তাঁহাদের কাঁচা মাল পাইবার সুযোগ কমিয়া যাইবে এবং তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা যে বৃটেনের গুরু শিল্পগুলির রাষ্ট্রীকরণের (Nationalisation) পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা অনেকটা ভেস্তাইয়া যাইবে। সুতরাং তাহারা নানা ভাবে ভারতে শ্রমশিল্পায়নের (Industrialisation) পরিকল্পনা যাহাতে ব্যর্থ হয় তাহারই চেষ্টা করিবেন। করিতেছেনও তাই। ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সচিব স্যার আর্দেশীর দালাল খোলাখুলি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যে উদ্দেশ্যে বিলাত গিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। গত ২১শে আগষ্ট নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক বৈঠকে স্যার আর্দেশীর পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্রে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার যে বিধিব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা তাঁহারা নাকচ করিতে অথবা শিথিল করিতেও রাজী নন। ভারতে যে কোন শিল্পপরিকল্পনাই হউক না কেন, তাহাতে বৃটিশ পুঁজিপতিরা অর্দ্ধেক অংশীদার হইবার দাবী জানাইয়াছেন। এমন কি, ৭০ ভাগ ভারতীয় অংশ এবং ৩০ ভাগ বৃটিশ অংশ রাখিবার সর্ত্তেও তাঁহারা সম্মতি দেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কি, এবং পরের ধনে পোদ্দারী করিবার চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী নীতি তাঁহারা কতটা ত্যাগ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত।

ডলার-পাউণ্ডের বক্সিং

সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অর্থনৈতিক স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ডলার-প্রেসিডেণ্ট ও পাউণ্ড-সম্রাট প্রথম দফায় যুদ্ধোত্তর রঙ্গমঞ্চে সবেমাত্র বক্সিং বা ঘুষোঘুষি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পরে হয়ত ইহাই খুনোখুনিতেও পরিণত হইতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ "ঋণ ও ইজারা" ব্যবস্থা (Lend Lease) তুলিয়া দিয়া বলিয়াছেন, যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এখন আর নগদ মূল্য ভিন্ন কাহাকেও ধারে কিছু দেওয়া হইবে না। হোয়াইট হাউসের সম্মুখে তিনি "আজ নগদ, কাল ধার"—লেখা একটি নোটিশ লট্‌কাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছেন। তার পরেই তিনি অবশ্য একবার বৃটেনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত ঋণ আদায় করিবার জন্য তাঁহারা কাহারও উপর চাপ দিবেন না। ইহাতে মার্কিণ পুঁজিপতিরা চটিয়া আগুন হইয়া গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এই ভাবে "America's major post-war bargaining instrument" অতলান্তিকের জলে নিক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। শুনা যাইতেছে, মার্কিণ কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এই হঠোক্তি লইয়া তুমুল কাণ্ড হইবে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়া বিশেষজ্ঞদের ডাকিয়া তাঁহার জবাব তৈরী করিতেছেন। যাহা হউক, মার্কিণ পুঁজিপতিদের মনোভাব কি তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই বিরাট ঋণের সুযোগ লইয়া তাঁহারা বিশ্বের বাজারে বাদশাহী চালে বাণিজ্য ও মুনাফা করিতে অবতীর্ণ হইবেন। ইহাই মার্কিণ পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্য। সেই জন্যই তাঁহারা ইহাকে যুদ্ধোত্তর "bargaining instrument" বলিয়াছেন।

'ঋণ ও ইজারা' ব্যবস্থায় লেন-দেন মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দেওয়াতে বৃটেন একেবারে হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ অর্থনীতি-বিশারদ কীন্‌স সাহেব সদলবলে ওয়াশিংটন্ যাত্রা করিয়াছেন, যাহা হয় একটা কিছু মীমাংসা করিবার জন্য। কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট যদিও বা বৃটেনের প্রতি কোন করুণা করেন তাহা হইলে কি সর্ত্তে করিবেন তাহারও কিছু কিছু আভাষ আমরা পাইতেছি। মার্কিণ-প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাটিক সদস্য ইমানুয়েল সেলার বলিয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা বাতিল হওয়ায় ফলে বৃটেনের যে অসুবিধা হইয়াছে তাহা পূরণ হইবে যদি বিদেশে মার্কিণ মাল বিক্রয়ের পথ ইংলণ্ড সুগম করিয়া দেয়। তিনি বলিয়াছেন, "বৃটেন যে ঋণজালে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বৃটেন আমাদের সহিত অকপটতার পরিচয় দিতেছে না। আমরা তাহাকে অনেক উপায়েই সাহায্য করিতে পারি যদি তাহার ষ্টার্লিং অঞ্চলে (অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যে) আমাদের মাল কাটতির সুবিধা দেওয়া হয়। বৃটেন তাহার ষ্টার্লিং অঞ্চলে এমন সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে যে সেই অঞ্চলে অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটিশের মালই বেশী বিক্রয় হইবে। ভারতের পাওনা ডলার আট্‌কাইয়া বৃটেন ভারতবর্ষকে বৃটিশের মাল ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। বৃটেন ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, অথচ সে ভারতকে আমেরিকার মালও ক্রয় করিতে দিবে না।"

২রা সেপ্টেম্বর এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ওয়াশিংটন্ হইতে সংবাদ দিয়াছেন, এই সপ্তাহে ইঙ্গ-মার্কিণ আর্থিক সম্মেলন আরম্ভ হইলে আমেরিকা বৃটেনের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করিবে। প্রথমতঃ, আমেরিকা বলিবে "সাম্রাজ্য ডলার-ভাণ্ডার হইতে ১৬০০ কোটি ডলারের ঋণ অনেকাংশে বৃটেনকে শোধ করিয়া দিতে হইবে। ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশের এই ডলার এই ভাবে আটকাইয়া রাখিবার অধিকার বৃটেনের নাই। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা বৃটেন ভোগ করিতেছে তাহাও তুলিয়া দিতে হইবে, অথবা নূতন ভাবে সংস্কার করিতে হইবে।

এই প্রস্তাবগুলির সার মর্ম কি, তাহা কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। সার-মর্ম মিঃ ইমন্থুয়েল্ সেলারের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির মধ্যেই ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীর পণ্যবাজারে এবং মুনাফার তীর্থগুলিতে বৃটিশ পাউণ্ডের একচ্ছত্র আধিপত্য আর থাকিবে না, মার্কিণ ডলারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রস্তাবে বৃটেনের রাজী হওয়ার অর্থ হইল আত্মহত্যার পথে পা বাড়াইয়া দেওয়া। অথচ রাজী না হইয়া উপায় নাই। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ঝুনো পণ্ডিত কীন্‌স্ সাহেব নূতন কি ফরম্যুলা আবিষ্কার করেন তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা আছি। তবে এই শ্রেণীর পণ্ডিত আমেরিকাতেও কম নাই। যাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে "ঋণ ইজারার" অর্থনৈতিক যাঁতা কল বাহির হইয়াছিল তাঁহারাই কি কম পণ্ডিত না কি? আজ সেই যাঁতা-কলে পড়িয়া বৃটেন যে "বাপ! বাপ" ডাক ছাড়িয়াছে তাহার জন্ত আমাদের করুণা হইতেছে। যাহারা ভারতের পাওনা ঋণ শোধ না দিবার জন্ত নানা কৌশল করিতেছে এবং শোধ দিবার সামর্থ্যও যাহাদের নাই, তাহারা ধনকুবের মার্কিণদের সর্ব্বগ্রাসী "ঋণ ইজারার" ঋণ কি করিয়া শোধ করিবে? বৃটেনের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের অর্থসম্পদের উপর। তাহাকে সে ত্যাগই বা করে কি করিয়া এবং অন্তকে অংশীদারই বা হইতে দেয় কি করিয়া?

অর্থনৈতিক সঙ্কট আজ যে ভাবে বৃটেনের নিকট দেখা দিতেছে, তাহাকে জীবন-মরণ সঙ্কটই বলা চলে। মধ্যখান হইতে আমরা ভারতবাসীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই শতছিদ্র নৌকায় বসিয়া থাকিয়া অতল সমুদ্রে তলাইয়া যাইতেছি। পাউণ্ড ডলারের যজ্ঞে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত খুনো-খুনিতে পরিণত হইবে, এবং তখনও আমরাই প্রাণ হারাইব। আমাদের বাঁচাইবে কে? ডলার পাউণ্ডের এই সাঁড়াশী আক্রমণ হইতে আমরা কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারি? কোন উপায় নাই, কারণ, চাবিকাঠি আমাদের নাই, স্বাধীনতা আমাদের নাই, আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নাই। কে ভারতের স্বার্থ দেখিবে? যেহেতু বৃটেনের এই নিদারুণ অর্থনৈতিক স্বার্থ ভারতে রহিয়াছে এবং তাহা প্রাণপণ করিয়াও তাহাদের আজিকার সঙ্কটের দিনে রক্ষা করিতে হইবে, সেই জন্ত বৃটেন কোন মতেই ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে পারে না। অর্থনীতির সহিত রাজনীতির এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ভারতীয় শ্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ

বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্টের বৈমাত্রেয় মনোবৃত্তি ভারতীয় শিল্পায়নের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছে। কারণ, যে কোন উপনিবেশকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিয়া রাখিতে পারিলে সাম্রাজ্যবাদীদের কাঁচা মাল সংগ্রহের সুবিধা হয় এবং সেই কাঁচা মালে তৈরী ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য এই উপনিবেশের বাজারে বিক্রয় করিয়া মোটা মুনাফা করা যায়। ইহাই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির মর্ম্ম-কথা। তাই বৃটিশ পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধিতার জন্ত আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শ্রমশিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার সম্ভব হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] পুঁজিপতিরা যুদ্ধের ও আত্মরক্ষার তাগিদে পর্য্যন্ত ভারতে গুরুশিল্পের (Heavy Industry) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন। ভারতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এমন যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন যে, এই সময় বৃহৎ বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকৃটি ক্যাল কেমিক্যাল প্রভৃতি মৌলিক শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠা করিলে ভারতের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। এ যুক্তি যে কি ভয়ঙ্কর, হাস্যকর ও বালসুলভ তাহা যে কোন বালকেরও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। যুদ্ধের প্রয়োজনেই গুরুশিল্পের প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। তাহা না করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জিনিষপত্তর ও যন্ত্রপাতির কলকব্জা জোড়া দিবার কারখানা করিয়াছেন এবং এ-দিকে বর্ম্মা, ও-দিকে কাইরোর কাছাকাছি ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনীর অগ্রগতির পর যখন চারি দিকে চোখের সামনে সরিষার ফুল ফুটিয়া উঠিল, তখন তাঁহারা প্রাণের দায়ে পড়িয়া যৎসামান্ত যন্ত্রপাতি এদেশে আনিয়া কয়েকটি কারখানা গড়িয়াছেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশই একেবারে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা। এই মহৎ কার্য্য ছাড়াও তাঁহারা আর দুই একটি কাজ করিয়াছেন, যেমন কয়েক জন "Bevin Boys" বানাইয়াছেন এবং ভারতের কয়েক জন বৈজ্ঞানিককে একবার বিলাত ও আমেরিকার কয়েকটি কারখানা ও গবেষণাগার দেখাইয়া আনিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারতের অদৃষ্টে আর কিছু জোটে নাই।

ভারতীয় শ্রমিকদের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্ত ইতিমধ্যে কয়েকটি যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Post-war Economic Planning) খসড়া করা হইয়াছে। তাহাদের দোষ-গুণ এখন বিচার করিয়া লাভ নাই। যে কোন শিল্প পরিকল্পনার জন্ত যাহা একান্ত আবশ্যক তাহা হইতেছে—(১) মূলধন, (২) সুদক্ষ শ্রমিক ও টেক্‌নিসিয়ান্ এবং (৩) বৈজ্ঞানিক গবেষণা। ভারতীয় মূলধনের সলজ্জ ভাব ও গোঁড়ামি যুদ্ধের আবহাওয়ায় অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। মূলধন অনেকের হাতে জমিয়াছে এবং যাঁহাদের ছিল তাঁহাদেরও প্রচুর ফাঁপিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় শিল্প-পরিকল্পনার জন্ত আজ আর ভারতীয় মূলধনের অভাব হইবে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও বৃটিশ পুঁজিপতিরা কি ভাবে নানা কৌশলে, নানা আবদার ও জিদ্ করিয়া বাদ সাধিতেছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, সুদক্ষ শ্রমিক ও টেকনিসিয়ানের অভাব আমাদের দেশে অত্যন্ত বেশী। কিন্তু ঘোড়া হইলে চাবুকের অভাব হয় না। ভারতে শ্রমশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ শ্রমিক ও টেক্‌নিসিয়ানও গড়িয়া উঠিবে। প্রথম দিকে আমরা বিদেশী বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য লইতে পারি। তুরস্কের আতাতুর্ক সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লইয়াছিলেন, সোভিয়েটের ষ্ট্যালিন্ জার্ম্মাণ ও আমেরিকান্ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লইয়াছিলেন। সুতরাং আমরাও অন্তান্ত শিল্পোন্নত দেশের সহযোগিতা এ-ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করিতে পারি। কিন্তু সে-দিকেও বৃটিশ বা মার্কিণ পুঁজিপতিদের বিশেষ আগ্রহ নাই। তাঁহারা ভারতীয় শ্রমশিল্পের প্রসারে বাধা দিবার জন্ত এক রকম বদ্ধপরিকর বলা চলে। প্রথম দুইটি [illegible] এই ভাবে [illegible] বাধা পাইতেছে, [illegible] বৈজ্ঞানিক

গবেষণায়” উৎসাহ দিবার জন্ত তাঁহারা কত দূর উদ্‌গ্রীব তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তথাপি, চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী গত বৎসর ভারতীয় শিল্প-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতিকল্পে সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্ত একটি "Industrial Research Planning Committee" নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের গবেষণা ও সন্ধানলব্ধ তথ্যাদি ও প্রস্তাবাদি সহ একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এই রিপোর্টের প্রথমেই তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "Present research activity in India does not represent even the *bare minimum* whether judged by international standard or the actual requirements of the country in her present state of Industrial development" (Italics আমাদের)। আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতেই হউক, অথবা দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের অনুপাতেই হউক, ভারতের বর্তমান গবেষণা-মূলক কার্য্যকলাপ ন্যূনতম দাবী মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ভারতীয় শ্রমশিল্প এখনও "research-minded" হয় নাই, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। ভবিষ্যতে শিল্পোন্নতির জন্ত এবং যুদ্ধোত্তর প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত এখনই ভারতীয় শিল্প-গবেষণার দিকে কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া উচিত। শুল্ক-প্রাচীর (Tariff walls) তুলিয়া হয়ত দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে খানিকটা আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে, শুল্কের আড়ালে হয়ত আত্মপ্রসারের কিঞ্চিৎ সুযোগ তাহারা পাইতে পারে, কিন্তু এই শুল্কেরও সীমা আছে এবং কেবলমাত্র ইহারই ছায়াতলে কোন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতি সম্ভব নয়। তাহার জন্ত স্বাধীন ভাবে শিল্পবিজ্ঞানের গবেষণার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ প্ল্যানিং কমিটি" ভারত গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে একটি "জাতীয় গবেষণা-সভা" (National Research Council) স্থাপন করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। এই "জাতীয় গবেষণা-সভা" বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প, শ্রমিক ও শাসন বিভাগের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে; সভার কাজ হইবে দেশব্যাপী জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories) স্থাপন করা, বিশেষ গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা, উপযুক্ত গবেষণার জন্ত সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পরিচালক এবং বিশেষজ্ঞদের অভাব দূর করা, বিভিন্ন গবেষণাগারগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন করিয়া একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহাদের কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করা, যাবতীয় পেটেণ্টের অভিভাবক ও পরিচালক হওয়া এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রগতি ও প্রসারের পথে যাবতীয় অন্তরায় দূর করা। এই কাজটি সহজ কাজ নহে, বিরাট দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ, যাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্ত প্রচুর অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। সেই জন্ত প্ল্যানিং কমিটি এখনই একটি পঞ্চবার্ষিক বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্ত তাঁহারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রথমে একত্রে ৬ কোটি টাকা এবং পরে প্রতি [illegible] টাকা বরাদ্দ করিবার জন্ত অনুমোদন করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর পরে প্রত্যেক শিল্পের মোট উৎপাদন-মূল্যের উপর ১০০ টাকায় এক আনা হারে একটি বিশেষ কর (Cess) ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে বৎসরে ১ কোটি টাকা আন্দাজ কর আদায় হইবে এবং তাহার সহিত যদি গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ আর ১ কোটি যোগ করা যায় তাহা হইলে শিল্প-গবেষণার কাজ এক রকম চলিয়া যাইবে।

বৎসরে মাত্র ২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় একটি বিরাট মহাদেশের শিল্প-গবেষণার কাজ চলিয়া যাইবে, ইহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বৃটেন, আমেরিকা সোভিয়েট রুশিয়ার কথা বাদ দিলাম, বোধ হয় ইয়োরোপের ছোট ছোট দেশগুলিতেও গবেষণার জন্ত ইহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় করা হয়। তবে প্ল্যানিং কমিটির কেহই ইহাকে যথেষ্ট মনে করেন নাই। তাঁহারা কাজ সুরু করিবার জন্ত এই পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে, পরিকল্পনা তো হইল, কাজ আরম্ভ করিবে কে? ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভারতের জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে কেহই সজাগ হইতে

পণ্ডিত জওহরলাল

পারেন না। এই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট (National Government) প্রতিষ্ঠিত না হইলে যে কোন শিল্প-পরিকল্পনা অবশ্যই ব্যর্থ হইবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎসাহ, স্বাধীনতা ও বিকাশের কথা পরাধীন দেশে উঠিতেই পারে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই কথাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন:—

"In India the political conditions under which we have had the misfortune to live have further stunted their growth and prevented them from playing their rightful part in social progress. Fear has often gripped them,

as it has gripped so many others in the past, lest by any activity or even thought of theirs they might anger the Governnent of the day and thus endanger their security and position. It is not under these conditions that science flourishes or scientists prosper.— Science requires a free environment to grow. When applied to social purposes, it requires a social objective in keeping with its method and the spirit of the age•••We have seen in Soviet Russia how a consciously held objective, backed by co-ordinated effort, can change a backward country into an advanced industrial state with an ever rising standard of living. Some such methods we shall have to pursue if we are to make rapid progress."

(Address to the National Academy of Sciences at their annual meeting held in Allahabad on March 5, 1938—By Jawaharlal Nehru)

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা

বাঙ্গালা দেশের দুর্দ্দশার আর অন্ত নাই। প্রকৃতি ও আমলাতন্ত্র যেন হাতে হাত মিলাইয়া বাঙ্গালা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এক দিকে বন্যা, ঝঞ্ঝা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈরিতায় আমরা ধ্বংস হইয়া যাইতেছি, আর এক দিকে আমলাতান্ত্রিক নির্ব্বুদ্ধিতা, অদূরদর্শিতা, দীর্ঘসূত্রতা ও উদাসীনতা আমাদের তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে আগাইয়া দিতেছে। আমাদের বোধ হয় আর পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। এক দিকে শাসনতন্ত্রের ১৩ ধারা, আর এক দিকে প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতা, এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়িয়া আমরা একেবারে ময়দা-ভলা হইয়া যাইতেছি।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যখন বৃষ্টি হইবার কথা তখন বৃষ্টি হইল না। তাহার জন্য আউস ও আমন ফসল দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একেই ঘরে ঘরে চাল বাড়ন্ত, তাহার উপর আবার ফসল হানি। তার পর বৃষ্টি তো বৃষ্টি, একেবারে অনর্গল ধারায় বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল। নদী, নালা সব ফুলিয়া ফুঁপিয়া উঠিল। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ হইতে বিগত ২৭শে আগষ্ট তারিখে যে প্রেস-নোট প্রচার করা হইয়াছে তাহাতে বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, অবস্থার গুরুত্ব গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। "পিপলস রিলিফ কমিটির" বিবৃতিতে বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের যে মর্ম্মান্তিক অবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মনে হয়, যদি এখনই উহার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা না যায় তাহা হইলে বাঙ্গালার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। প্রবলতা ও ব্যাপকতার দিক হইতে [illegible] কখনও হয় নাই। এবারের বন্যায় অবশ্য লোকের ও গবাদি পশুর প্রাণহানি হইয়াছে খুব কম। তাহার কারণ এইবার বন্যা হুড়মুড়-তড়দাড় করিয়া আসে নাই, আসিয়াছে ধীরে ধীরে, মন্থর গতিতে। তাই গ্রামের লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষা করিবার নানা রকম ব্যবস্থা করিয়াছে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়াছে, মাচা বাঁধিয়াছে, যে যাহা পারিয়াছে তাহা করিয়াছে। এই ভাবে হঠাৎ ধ্বংসের হাত হইতে তাহারা রেহাই পাইয়াছে ঠিক, কিন্তু খাদ্যাভাবে ও আশ্রয়াভাবে তাহারা যে ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাবনা জেলার গোটা সিরাজগঞ্জ মহকুমা গত ৭ই আগষ্ট হইতে বন্যার জলে ভাসিয়া রহিয়াছে। পাবনার সদর মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চল, বেরা, সাঁথিয়া এবং ফরিদপুর থানার সমস্ত গ্রামই বন্যায় বিধ্বস্ত। রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত গ্রাম এবং নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম মহকুমার কতক অঞ্চল বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। বগুড়া জেলার সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চল বন্যার জলের তলায় সমাধিস্থ বলা চলে। প্রায় ৫০টি ইউনিয়নব্যাপী সমগ্র অঞ্চল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা পর্য্যন্ত কয়েক ফুট উঁচু হইয়া জল গিয়াছে। নেত্রকোণা মহকুমার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা থানার অন্তর্গত গ্রামগুলি বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। খারনাই ইউনিয়নের বাসিন্দারা স্ত্রী-পুত্র, গরু বাছুর লইয়া নিকটের পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পদ্মা, মেঘনা ও ধলেশ্বরী নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢাকা জেলার সদর, মুন্সীগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ মহকুমা এবং কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত ও নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নোয়াখালী জেলায় এবার যেরূপ বৃষ্টিপাত হইয়াছে গত দশ বৎসরের মধ্যে না কি এত বৃষ্টি আর হয় নাই। এই প্রবল বর্ষণের ফলে প্রায় ১০০ বর্গ মাইলব্যাপী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উত্তর-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের অবস্থা কি ভীষণ শোচনীয় হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। বন্যার দুর্দ্ধর্ষতা ও ব্যাপকতাও এই সামান্য বিবরণ হইতে কিছুটা অনুমান করা যাইবে। গ্রামবাসী ও গরু-বাছুরের দুরবস্থাও প্রায় চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আজ দুর্ভিক্ষ, কাল বন্যা, পরশু মহামারী, হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশে লাগিয়াই আছে, উদার ও দানশীল ব্যক্তিদের বদান্যতা ও মহানুভবতা তাহাদের আর কত বার এবং কত দিন বাঁচাইবে। এবারে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও বন্যায় মিলিয়া বাঙ্গালা দেশের প্রধান ফসলের যে ভীষণ ক্ষতি করিল তাহাতে অনেকেই অদূর ভবিষ্যতে আর এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন। অনাবৃষ্টির জন্য বাঙ্গালার আউস ফসলের ৪০ হইতে ৫০ ভাগ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতি করিয়াছে প্রায় ২৫ ভাগ। আমন ফসলেরও ক্ষতি হইয়াছে খুব। অনাবৃষ্টির জন্য অকালে ও বিলম্বে রোপণ করিতে বাধ্য হওয়ায় আমন ফসলের কি পরিমাণ ক্ষতি হইবে তাহা এখন কেহই বলিতে পারিতেছেন না। তাহার উপর আবার এ দেশের ভাণ্ডার হইতে চাউল রপ্তানি করা হইতেছে। এখন আমাদের দাতব্য করিবারই [illegible] বটে। বাঙ্গালার এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় সরকার [illegible] করিবেন, কি ভাবে এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের সমস্যা সমাধান করি[illegible] সে সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনাই আমরা [illegible]

বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুর কি এই জন্যই নিরুপায় হইয়া বিলাত যাত্রা করিতেছেন ?

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও বন্যার ব্যাপক ক্ষতির হিসাব কে করিবে জানি না। তবে অদূর ভবিষ্যতে যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারিরূপে আবার ইহার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহার উপর বাঙ্গালী গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রীর যে হারে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে এমনিতেই এদেশে আর দীর্ঘদিন বাঁচিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। গ্রামে তো নিত্য প্রয়োজনীয় অর্দ্ধেক পণ্যদ্রব্য পাওয়াই যায় না। পরিধেয় বস্ত্রের অভাবের কথা বর্ণনা করিয়া লাভ নাই। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে চাউলের দাম যেমন ঠিক তেমনই আছে, চৌদ্দ, পনের, ষোল টাকার নীচে নামে নাই। শাকসব্জী, লাউ কুমড়া, যাহা গ্রামে কেহ কোন দিন কেনে নাই, কিনিলেও গণ্ডা বা পণদরে কিনিয়াছে, সেখানে আজ এমন গ্রামের খবরও জানা যায় যেখানে টাকা টাকা দরে লাউ কুমড়া বিকাইতেছে। দুই তিন চার আনার মাছ গ্রামের হাটে নিলামে বিক্রয় হইতেছে, ছয় সাত আট টাকা পর্য্যন্ত সের হইয়াছে। দুধ এক সের এক টাকাতেও দুর্লভ। গাওয়া ঘি এক টাকা পাঁচ সিকা সের হইতে ৮৲ ১০৲ টাকায় উঠিয়াছে। ডিম গ্রামেতে আট আনা পর্য্যন্ত জোড়া বিক্রয় হয়। সুতরাং গ্রামের লোক কি আরামে দিন কাটাইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সহরের অবস্থাও তদ্রূপ। সহরে চাল ১৫৲ ১৬৲ টাকা মণ, ডাল ছিল দশ পয়সা চার আনা সের, হইয়াছে দশ আনা, বারো আনা। আমরা ১৯৩৯ এবং ১৯৪৫ সালে হিসাব বলিতেছি। পাঁঠার মাংস ছিল ।৶০ আনা সের, এখন ৩৲ টাকা, ডিম ছিল ।৶০ আনা কুড়ি, এখন ৩।০ টাকা কুড়ি, আলু ৬ পয়সা দুই আনা সের ছিল, এখন ৸০ হইতে ১৲ টাকা সের (কন্ট্রোলে ।৶০, কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক অখাদ্য, অতএব ১।০ সের পড়িল), পিঁয়াজ ছিল ৵০ সের, এখন ।৵০ সের, দুধ চার আনা সের হইতে ১৲ টাকা সের, মাছ ।০ আনা হইতে ৩।০-৪৲ টাকা হইয়াছে, ।৵০ সের ইলিশ হইয়াছে ২।০ সের, সরিষার তেল ।৶০ সের হইতে ১৲-১।০ সের হইয়াছে। একটি ছোট চার পাঁচ জনের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৫০৲ টাকা খরচ হইত, এখন হয় ২০০৲ টাকা। গড়-পড়তা হিসাবে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে প্রায় চতুর্গুণ। জনসাধারণের নাভিশ্বাস উঠিতেছে।

সোনার বাঙ্গালা এই ভাবে দিনে দিনে মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে। এদিকে আমাদের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালায় এমন কিছু দুশ্চিন্তা করিবার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, ৯৩ ধারা নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে। মাননীয় কেসী সাহেব তো এখন কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম করিতে বিলাত যাইতেছেন। আমাদের ভাবনা নাই।

নৃত্যশিল্পী

বহু কাল বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত ভারতীয় নৃত্যগীত যে কয়েক জন ভারতীয় কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধৃত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব-মর্য্যাদায় ...ছে, শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বসু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি গত অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ প্রাচীন বৈদিক ভারতীয় নৃত্য পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বহুল প্রচারকল্পে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী দিতেছেন। গণ্যমান্য ব্যক্তি, দেশনেতা ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। উপস্থিত গত ২২শে আগষ্ট বুধবার কলিকাতায়

শ্রীবিমলেন্দু বসু

ইন্দো-আমেরিকান্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আমেরিকান্ সৈনিক বিভাগের বহু উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সংবাদ-পত্রসেবিপূর্ণ একটি জনতার সমক্ষে তিনি তাঁহার বিখ্যাত নটরাজ ও অন্যান্য নৃত্য প্রদর্শন করাইয়া উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। শ্রীমতী চিত্রসেনা বসুর কয়েকটি নৃত্য বিশেষ মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল, মিঃ বসুর নৃত্যে অসাধারণ মৌলিকত্ব আছে। ভারতীয় নৃত্য ইঁহাদের দ্বারা পুনপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ধ্বংসোন্মুখী কলার বহুল প্রচার হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী স্মৃতি

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, কর্ণেল ডি এন ভাদুড়ী মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা হিমাংশুবালা ভাদুড়ী তাঁহার স্বর্গত একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে ১১১নং রসা রোডস্থিত তাঁহাদের সুবৃহৎ চারতলা বাড়ীখানি রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কালচারের কার্য্য পরিচালনার জন্য মিশনকে দান করিয়াছেন। বাড়ীখানির মূল্য দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রূপ পরিগ্রহ করে। বহুমুখী ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক্ ভারতে এবং জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করা, অন্যান্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির যাহা কিছু মহান্ ও বরণীয় তাহা

সাদরে গ্রহণ করা এবং ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য। এতদুদ্দেশ্যে ইন্‌ষ্টিটিউট কর্ত্তৃপক্ষের বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই কতকগুলি গ্রন্থ তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে "কালচারেল্ হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকখানি পৃথিবীর সর্ব্বত্র আশাতীত সমাদর লাভ করিয়াছে। লাইব্রেরী,

মাতা-পিতা সহ দেবেন্দ্রনাথ

লেকচার হল্, অতিথিশালা, চিত্র-প্রদর্শনী ও ধর্ম্মসভা প্রভৃতির অধিবেশনের উপযুক্ত স্থান না থাকায় ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ম্মপদ্ধতি এত দিন যাবৎ ব্যাহত হইতেছিল। আশা করি, বর্ত্তমানে কতকাংশে উহার স্থানাভাব-সমস্যার সমাধান হইবে।

এই বদান্য মহিলাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেরণায় বাঙ্গালার যে কয়জন তরুণ বাঙ্গালীর অর্থনীতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অন্নবস্ত্র করিবার নীতিকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। গত ১লা জুলাই হইতে তিনি তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের জেনারল ম্যানেজারের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার এই প্রিয় শিষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রীতে ইনি শীর্ষস্থানীয় হইবেন। কিন্তু পিতৃভক্ত সত্যেন্দ্র ক্যাসাবিয়ানকার মত আচার্য্যের আশা ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পিতামহের আশা ব্যর্থ করিয়া পিতৃ আদেশ পালনের জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সামান্য এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারিরূপে পিতার আফিসে চাকুরী লয়েন। তখন বীমা কোম্পানীকে লোকে ঘৃণা করিত। সত্যেন্দ্র বীমা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ২১ বৎসর বয়সে যখন বিলাত যাত্রা করেন, তখন তাঁহাকে যে পারিবারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, আদর্শমাত্রনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা ও সবল দেহচিত্তসম্পন্ন সত্যেন্দ্রনাথেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। পিতৃ-পিতামহের প্রেরণা হইতে তিনি লাভ করিয়াছেন সত্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, কর্ম্মশৃঙ্খলা ও কর্ম্মকৌশল বুদ্ধি। দয়াময়ী জননী তাঁহাকে দিয়াছেন চিত্তের উদারতা ও ধর্ম্মবুদ্ধি। তাঁহার জীবনাদর্শ—তাঁহার ভাষায়—Indomitable patience and aptitude for hard work. বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোম্পানীকে অবাঙ্গালীর কবল হইতে রক্ষা করিবার যে চেষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ করেন তাহা বাঙ্গালার ব্যবসায়-ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিবে। এই চির-তরুণের ব্যক্তিগত ও জাতীয় আদর্শ—স্বার্থপরতা। তিনি বলেন—দেহের স্বার্থপরতাই স্বাস্থ্য; জাতি স্বার্থরক্ষাই স্বাজাত্য; আর পরদেশের আক্রমণ ও প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশের স্বার্থ-রক্ষাই স্বাদেশিকতা। আমার জীবনের আদর্শই এই ক্ষুদ্র অহমিকা। অর্থহীনের পরার্থপরতা আর মনুষ্যত্বহীনের বিশ্বমানবতায় আমি বিশ্বাস করি না। সত্যেন্দ্রনাথের জীবন বাঙ্গালার তরুণকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

সরলাদেবী চৌধুরাণী

বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সরলাদেবী চৌধুরাণী সুপরিচিতা। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য এবং সঙ্গীত-প্রীতি তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও হিন্দী দুই ভাষাতেই তাঁহার সমান দখল ছিল। 'ভারতী'র তৃতীয় পর্য্যায়ের সম্পাদিকা হিসাবে বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার ইতিহাসে তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য।

সরলাদেবীর পিতা জানকী ঘোষাল আদি যুগের বাঙ্গালী কংগ্রেস-কর্ম্মীদের অন্যতম। এইখানেও উত্তরাধিকার প্রভাব লক্ষিত হয়।

সরলাদেবী পঞ্জাবের পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ এক জন কৃতী সন্তান হারাইল।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৪শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৫২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

কবি ইক্‌বাল

অমিয় চক্রবর্ত্তী

কবি ইক্‌বালের মুসাইরায় ডাক পড়েছে। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির যে ঐশ্বর্য তিনি সর্বকালের ভাণ্ডারে রেখে গেছেন তা নিয়ে রসিক জনের সভা বসবে নানান্ দেশে, নানান্ ভাষায়। পারসিক ভাষায় তাঁর অধিকাংশ কাব্য রচিত; উর্দ্দুতেও তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে সৃষ্টির জাদুশক্তি দেখিয়েছেন। শিল্প-পিপাসুকে তাঁর কাব্যের দুই ভাষাই শিখতে হবে, অনুবাদের উপর ভর করলে চলবে না। কিন্তু যে মহলে তাঁর ভাষার প্রচলন নেই সেখানেও তাঁর ভাবের ঢেউ গিয়ে পৌঁচেছে। দেশে বিদেশে ইক্‌বালের নাম কীর্তিত। বাংলা দেশে আমরা ইক্‌বালকে আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিদের আসরে স্থান দিয়েছি। লাহোর থেকে কলকাতায় নানা স্থানে অনুভব করেছি চতুর্দিকেই তাঁর কাব্য তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জেগেছে। সকল সম্প্রদায়ের সুধীজন ভারতের এই কবি-প্রতিভার সমাদরের জন্মে মিলিত হয়েছেন।

অনেকটা ব্যক্তিগত ভাবেই ইক্‌বালের প্রসঙ্গ অবতারণা করবো। তাঁকে যে ভাবে চিনেছি তাতে দূরত্বের বাধা ছিল না, যদিও দূরের অতিথি হয়েই গিয়েছিলাম তাঁর দরবারে। বিশেষ সৌভাগ্য মনে করি আমার জীবনের, যে তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে পঞ্জাবে গিয়ে পৌঁচেছিলাম। শুনেছিলাম তিনি কিছুকাল হতে হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাচ্ছেন, কারো সঙ্গে সহজে দেখা করেন না। প্রায়ই তাঁকে বিশ্রাম করতে হয়, কখনো বাড়ির বাহিরে যান না। তবু আমাকে ডাক পড়ল। লাহোরের টঙা-অলা হতে রাজা উজিরের কোনো মহলে তাঁর নাম ঠিকানা অবিদিত নেই—বাড়ি খুঁজে পেতে মুস্কিল হল না। মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ ছিল; শীতের রোদ্দুরে পুরোনো, লাহোরের জালি-কাজ করা গবাক্ষ, অলি গলি [illegible]

সেখানে আজও মধ্য যুগ ভারতের চিহ্ন রয়ে গেছে। গাড়ি থেকে ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যেতে নূতন পুরোনোর বিমিশ্র পরিচয় পাওয়া যায়। দরজার কাছে গিয়ে একবার মনে ভাবনা জাগল কী সাহস নিয়ে তাঁর কাছে যাব। ইক্‌বালের বিদ্যুজ্জ্বল বুদ্ধির কথা শুনেছি, বাক্‌নৈপুণ্যে তাঁর সমকক্ষ মেলে না—তাঁর সঙ্গে কি সহজে মেশা যাবে? ঘরে ঢুকেই তাঁর প্রসন্ন হাসি দেখে মনের দ্বিধা ঘুচে গেল। বললেন আমি শায়িত অবস্থাতেই বেশি সময় কাটাই, কিছু মনে করবেন না, যদি ভালো করে উঠে দাঁড়াতে না পারি। আমার স্ত্রী ছিলেন সঙ্গে, তাঁকে নমস্কার করে বসতে বললেন। খানিক বাদেই মনে হল তিনি আমাদের ঘরের লোক, কথা জমে উঠল। অনুমতি নিয়ে গড়গড়াটির নল মুখে দিলেন, গল্পে আলোচনায় এবং আহারে আপ্যায়নে বেলা কেটে গেল। পুরোনো তাঁর একটি সহচর মধ্যে মধ্যে একটু দেখা দিয়ে কুশল জেনে যাচ্ছিল; বিকেলে আমরা ফেরার আগে তাঁর আট বছরের মেয়েটি স্কুল থেকে ফিরে তাঁর কাছে চুপ করে এসে বসল। প্রসন্নতায় কবি ইক্‌বালের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর কাব্যজীবনের মূল তত্ত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন। আত্মোপলব্ধি এবং আত্মপ্রকাশের সাধনা তাঁকে যৌবনেই দুরূহ জ্ঞানের পথে এনেছিল, এবং ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় দানের চেষ্টা তাঁকে ক্রমে জাতিগত, ধর্মগত বৃহত্তর মানবিক পরিচয় দেবার আদর্শের কাছে দাঁড় করাল। তিনি বুঝলেন সভ্যতার মিলনের অর্থ একীকরণ নয় ঐক্যযোগ; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে তার সীমার মধ্যে যথার্থ মর্য্যাদা দিলে তবেই মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে সামাজিক সত্তার মধ্যে

যথার্থ করে পায় এবং কল্যাণের সমবায় সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়, প্রতি সভ্যতার বিশিষ্ট একত্বকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করতে পারলে তবেই মানব জাতির মঙ্গল বিধান সত্য হয়ে ওঠে।

তাঁর স্মিতমুখী কন্যাটি ঘরে এল যখন এই কথা তিনি বলছিলেন। ইকবাল কন্যার দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে বল্‌তে লাগলেন, আমি তত্ত্বের ব্যবসায়ী নই, প্রাণের প্রেমিক। যে দর্শনের কথা বলছিলাম তার পুরো প্রকাশ নেই আমার গদ্যের বইয়ে। আছে তা আমার কাব্যের পুষ্পলতায়, বাক্যের প্রচ্ছন্ন লীলায়। বুঝলাম প্রাণের টানই তাঁর কাছে বড়ো; শেষ বয়সে তাঁর একলা ঘরে এই কন্যাটিকে দেখে মনে হ'ল তাঁরই কাব্যের চির কল্যাণী বাণীর সে প্রতিমূর্তি।

কবি ইক্‌বালের সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব, সভ্যতার ধারা, আধুনিক জগতের আন্দোলিত অস্থির জীবনযাপনের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা চলেছিল। যথাকালে সে সম্বন্ধে বল্‌বার অবকাশ হবে; কিন্তু প্রথম দিনের আলাপে তিনি আত্মীয়তার মণ্ডলে আমাদের টেনে নিয়ে তাঁর কবি-হৃদয়ের যে পরিচয় দিলেন তার কথা বলব কোন্ ভাষায়। কবিতা পড়ে শোনালেন কয়েকটি, আধুনিক কালে রচিত তাঁর উর্দ্দু কবিতা। কবিতাগুলি অনেকটা এপিগ্রাম জাতীয়; কয়েকটি ছত্রে ঘন সন্নিবদ্ধ কোনো ভাবের পরিচয় দিয়ে বা বিদ্রূপাত্মক বাক্যের ছটায় সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কোনো সমস্যার মর্মোদ্‌ঘাটন ক'রে তিনি জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার দ্বার খুললেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে শুনলে বোঝা যেত শাণিত তাঁর শব্দ-বাণের পিছনে ছিল কত বড়ো করুণ হৃদয়ের প্রেরণা; মানব-প্রেমে সিক্ত ছিল তাঁর মন। বার্ণার্ড্ শ-কে যাঁরা বুঝেছেন তাঁদের অবিদিত নেই উজ্জ্বল বুদ্ধির খেলা বাহিরের অঙ্গনে; পিছনে থাকে ঘরের প্রশস্ত সমবেদনার মহল, বাক্য নীরব হয়ে গেছে সেইখানে। কবি ইক্‌বালের কাব্যে সেই নীরব বাক্যের মহল প্রচ্ছন্ন হয়েই থাকেনি, গীতিক কবিতায় নম্র সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর দরদী চিত্ত। যেখানে তিনি জ্ঞানী, দর্শনী, সেখানেও তাঁর প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইক্‌বালের কণ্ঠ খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল মৃত্যুর বছর দুয়েক আগেই; কিন্তু তাঁর বাক্যের মিষ্টত্ব ধীর বাণীতে বিশেষ ভাবে ধরা পড়ত। কাব্যের জগতে যাঁরা রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক তর্ক জাগিয়ে তুলতে ভালোবাসেন তাঁরা ইক্‌বালের রচনার একটি মাত্র দিক্ পৃথক্ ক'রে নিয়ে পরুষকণ্ঠে তাঁর কাব্য হতে আবৃত্তি করে থাকেন। ইচ্ছা করে কবি ইক্‌বালের স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তাঁর কবিতা লোকে আর একবার শুনুক। কণ্ঠ তাঁর নীরব কিন্তু মাধুর্যের সন্ধানী যাঁরা, ইক্‌বালের কাব্যে তাঁরা ইরানের, আরবদেশের এবং ভারতের চিরন্তন একটি সুর শুনতে পাবেন। পূর্বদেশীয় সভ্যতার বহুযুগের সাধনলব্ধ সেই শান্ত গম্ভীর সুর।

ইক্‌বালের পারসিক একটি কবিতায় চিরন্তন মানব-জাতীয় সঙ্গীত সমগ্র ভারতকে উদ্দেশ ক'রে মন্ত্রিত হ'য়ে উঠেছে—

"জানাবো সকলকে, হে হিন্দুস্তান, প্রেমের
বিশ্বাস কার নাম।
আজীবন দেবো তোমায় সেবায়, অশ্রুবিহীন ত্যাগে।
ছড়াবো আমার ধূলিকে বীজের মতো,
প্রাণ পেয়ে উঠবে তা হ'তে নবীন হৃদয়ের চারা,
দরদী মনোবেদনায় ফুটবে প্রাণের কুঁড়ি।

তাঁর জীবনকে একমুষ্টি ধূলি বলে বর্ণনা করলেন কবি, কিন্তু এই ধূলির বুকে আছে শ্যামল সুকুমার জীবনের উন্মুখ বৃত্তিগুলি। বিদ্রোহী তিনি ভ্রাতৃবিদ্রোহের বিরুদ্ধে; সংস্কারের আতিশয্য, দুষ্ট সমাজবিধিকে তিনি নত করেছেন ঐক্যকামী মানব ধর্মের কাছে। পূর্বেই বলেছি, স্বতন্ত্র সত্তার প্রকাশকে তিনি চরম সাধনার অঙ্গ বলে মেনেছিলেন। ব্যক্তিগত, সমাজগত, ধর্ম্মানুষ্ঠানগত স্বাধীন সত্তাকে অক্ষুণ্ণ বীর্যে রক্ষা করার মন্ত্র আছে তাঁর রচনায়। কিন্তু স্বতন্ত্র মুক্তিকে ঐক্য সূত্রে বাঁধবার মতো সাধনাকেও তিনি মেনেছেন; মানবসভ্যতার সাতনলী হার গাঁথবার জন্য স্বাতন্ত্র্য এবং সমবায় দুয়েরই প্রয়োজন। কবিতায় তিনি বলেছেন—

"এই ছড়ানো অক্ষগুলিকে একটি মালায় গাঁথ্‌বো
আমিও, কঠিন এই ব্রত রইল আমার।
মিলনের মুখ হতে আড়াল ঘোচাব আমি।
লজ্জা দেবো সকলকে এই আমাদের ভেদবুদ্ধির
গৃহ-বিবাদের দিনে—
সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে যাবো কী ছবিতে দেখেছি
আমার দুচোখে॥"

কবি ইকবাল সংহারমূর্তি আধুনিক য়ুরোপের প্রসঙ্গ সইতে পারতেন না; হয়তো তিনি য়ুরোপের মানবিকতার গভীর শক্তিগুলির প্রতি কিছু অবিচার ক'রে থাকবেন। যুদ্ধসজ্জা-পরিহিত রণবিলাসী নির্লজ্জ নব্য রাষ্ট্রনীতি এবং তারই উপযুক্ত পাশ্চাত্য হিংসাতন্ত্রের দর্শনবাদ তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মাকে ব্যথিত বিদীর্ণ ক্রোধান্বিত করতো। বহু রচনায় তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ভয়াবহ পরিণতি আমাদের কাছে ধরে দেখিয়েছেন; চেয়েছেন যেন পূর্বদেশীয় আত্মা তার মোহে আবৃত না হয়। ভাববার কথা এই যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ যাঁরা এ বিষয়ে তাঁদের বাণীতে সুরের ঐক্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, কবি ইক্‌বাল বিভিন্ন ভাবে সমগ্র মানুষের

হয়েই এশিয়াকে সাবধান করেছেন : দ্রুত উন্নতির লোভে পশ্চিমী রাষ্ট্রপথে প্রবৃত্ত হলে মরণং ধ্রুবং একথা স্পষ্ট করে বলেছেন। বলা বাহুল্য, এমন মনোভাব নিয়ে ডিক্টেটর নীতিকে পূজা করা কবি ইক্‌বালের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি শক্তির উপাসক ছিলেন, কিন্তু অন্ধশক্তির নয়। রাষ্ট্রনীতি আমার আলোচ্য নয়; কিন্তু ইক্‌বালের ফ্যাসিজম্‌-প্রীতি সম্বন্ধে ভুল কথা বহুল ভাবে প্রচলিত ; তাই তাঁর কবি-হৃদয়ের সাম্যবোধ এবং স্বাধীন মানব ধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা একটু বলতে চাই। বাল্‌-ই-জিব্রাইল কাব্যগ্রন্থে তিনি ১৯৩৫ সালে আত্মপ্রকাশমান নব্য ইতালীর প্রতি মিতালী জানিয়েছেন কিন্তু তাঁর প্রশস্তিবচনের লক্ষ্যস্থল রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের ধ্বংসলীলা নয়, ঠিক বিপরীত। ঐ কবিতায় তিনি বল্‌ছেন—

"পশ্চিম ছেড়েছে আজ স্বর্গের আলো-জ্বালা
মর্ত্তের পথ,
খুঁজেছে জঠরের অগ্নিতে জীবনের দীপ্তিকে।
ভুলেছে হৃদ্যতার যোগ হৃদয়ে ;
শরীরের ক্ষুধা, স্বার্থের প্রয়োজনে নেই সেই যোগ,
নেই মিলনের চরম বার্তা।"

রাষ্ট্রপথের একান্ত ডাইনে বাঁয়ে খানা বাঁচিয়ে চলার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

আইডিয়লজির গর্ত্ত দূরে রেখে মধ্যপথের সন্ধান দিয়েছেন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যে। "মুসোলিনী" কবিতায় তিনি বল্‌ছেন—

"তৃষার্ত্ত ওরা উভয়েই ; আত্ম ওদের অশান্ত ;
ঐ যে তোমার ঈশ্বর-অবিশ্বাসী সোসালিষ্টের দল ;
যারা মানুষের সাম্যকে মানে অথচ তার চেয়ে
বড়োকে মানে না—
আর ঐ যে তোমার পর দেশলুণ্ঠনকারী দস্যুর সংঘ
যাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে অন্যের সত্তাকে নষ্ট করা,
রাষ্ট্রবিস্তার করা অসাম্যের ভিত্তির পরে।
অন্ধকারে এদের চিত্ত, যতই উজ্জ্বল হোক্ না কেন
এদের বুদ্ধির ধারাল ছুরি॥"

আবিসিনিয়াকে উদ্দেশ করে অন্য একটি কবিতায় ইক্‌বাল বল্‌ছেন—

"য়ুরোপের শকুন-দল জানছে না আজ
কী সাংঘাতিক বিষ হবে তৈরী আবিসিনিয়ার
মৃতদেহ হতে—
সভ্যতার সপ্তম সর্গে দেখি মনুষ্যত্বের চরম অধোগতি,
দস্যুতা হল আজ রাষ্ট্রবিচারের উপায়,
নেকড়ে বাঘের দলের প্রত্যেকের চাই একটি করে
নিরপরাধ ছাগ-শিশু।

হায়রে, ধর্মের আয়নাটাকে চূর্ণ চূর্ণ করে ভেঙে দিল
রাস্তায় রোমানেরা ;
নিদারুণ এই দুঃখ, হে ধর্মবিশ্বাসী, এই বেদনার
শান্তি নেই॥"

পারস্য ভাষায় লেখা ইক্‌বালের বহু কবিতায় ইক্‌বাল জীবনের পরমার্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর দর্শনবাদ বিচিত্র চিত্র-উপমার সাহায্যে কাব্যে ফুটে উঠেছে। খুদি-বেখুদি নিয়ে তিনি গভীর তত্ত্বালোচনা করেছেন ; ব্যক্তিগত মানুষের সত্তার রহস্যে ডুব দিয়েছেন। আস্রার-ই-খুদি কাব্য গ্রন্থ নিকল্‌সন্‌ অনুবাদ করেছিলেন Secrets of the Self নাম দিয়ে, সেই বইখানি অনেকেরই জানা আছে।

রামুজ-ই-রোমুজি, পিয়ম্‌-ই-মশ্রিক, জবুর-আজম্‌ প্রভৃতি পারস্য কাব্য-গ্রন্থে তাঁর ভাবের ঐশ্বর্য সঞ্চিত আছে। প্রসিদ্ধ পারসিক কবি জেলালুদ্দীন রুমীর প্রভাব তাঁর কাব্যজীবনে কী ভাবে কাজ করেছে সে কথা ইকবাল তাঁর গদ্য গ্রন্থে আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু যে-ভূমিকা সামনে রেখে তিনি ভাব বিস্তার করেছেন তা চিরকালীন্‌ হলেও একালীন্‌—আধুনিক। এক সময়ে বীর্যবান আত্মচেতনার প্রকাশের তত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে
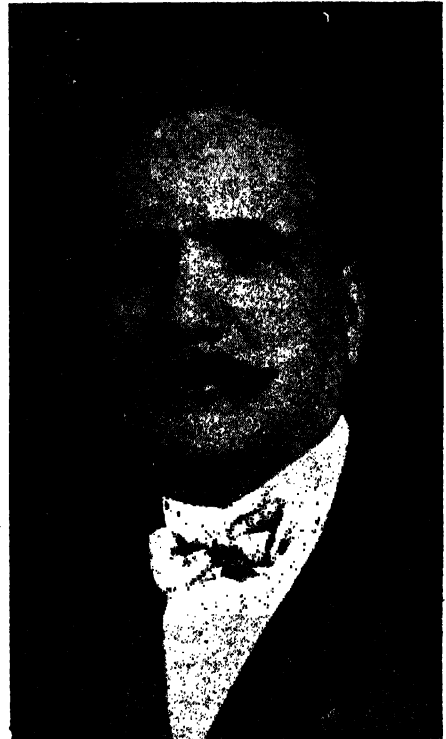
কবি ইক্‌বাল

নির্ব্বাসন

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মিলন-মলিন ধূলিতল-লীন ক্লান্ত এ ভালবাসায়, বন্ধু,
বাঁচাও নিবিড় সজল মেদুর নববিরহের আশায়, বন্ধু !
পাংশু গগনে পাণ্ডুর চাঁদ,
সব সাধ মেটা এ কি অবসাদ !
জ্যোৎস্নার বালুচরে দিগ্‌বাঁধ ঢেকে দাও কালো মেঘে ;
গুরু গুরু গুরু কাঁপাইয়া বুক
বিদ্যুৎ-ব্যথা শিহরি উঠুক
শুষ্ক মুখের হাস্য ঝরুক ঝড়ের শঙ্কা লেগে ।
নিদাঘ-রজনী নীরবে দুজনে জাগি আজ,
তোমারি চরণে জুড়ি চারি কর
নির্বাসনের নব নির্দ্দেশ মাগি' আজ ।
আজ মেঘদূত ফিরাও উজান পবনে
অলকাক্লিষ্ট মিলনের ব্যথা রাম-গিরিগুহা ভবনে ।
পথে যেতে যেতে যাক্ সে কুড়ায়ে মিলন মথিত ফুলের মালা,
শিথিল মৌর্ব্বী ভ্রূধনুভ্রষ্ট ব্যর্থ শরের মৌন জ্বালা ।
ভিন্ন করিয়া চুম্বনরত গততৃষা যত অধরপুট,
সিক্ত করিয়া উদাসীন যত অনিমেষ আঁখি-পল্লবে,
ছিন্ন করিয়া ক্লান্ত শিথিল প্রাণান্ত ভুজ-বন্ধন
অকস্মাতের দমকা হাওয়ার দুর্ল্লভ করি বল্লভে,—
নব মেঘদূত ভাসিয়া চলুক দেশে দেশে
রুদ্ধ কক্ষ অলকা ত্যজিয়া নিবিড়-নীল নিরুদ্দেশে ।
দুর্ল্লভ কর বন্ধু আমায় দুর্ল্লভ কর হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
কর অতি-বল্লভারে আমার
ঘন নীল বাসে নবীন বিরহে দুর্ল্লভতর হে ।
সারারাত জ্বলে সন্ধ্যার দীপ ছায়া পড়ে আছে পায়,
ললাটে ক্লান্তি-কালিমার টীকা
নির্ব্বাণ কর এ মিলন-শিখা,
দুটি হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে নিঃশেষ কর তায় ।
বাসি মুখে হাসি পঙ্কজতার
পঙ্কজে বড় লাগে গুরু ভার
ফিরে যায় যদি পঙ্কেতে তার গহিন তিমির-তলে,
সেথা সে আঁধারে রচিবে তপন
নূতন মৃণালে নূতন স্বপন,—
গোপন দুরাশা জানাই বন্ধু চারি নয়নের জলে ।
শেষ হ'ল নিশা, আশীষ মাগিয়া
প্রভাতী প্রণাম সারিয়াছে প্রিয়া
ভোরের বাতাসে আঁচল সারিয়া চলি যায় শুভক্ষণ,
ক্ষম গো বন্ধু এ মম প্রলাপ
এবার মিলনে হানো অভিশাপ
অপলাপ হ'তে বেঁচে যাক প্রেম লভিয়া নির্ব্বাসন ।

নীটসশের নীতিকে যেন কিছু বেশি স্থান দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যদর্শনে ; কিন্তু মনে রাখা দরকার ইকবাল ছিলেন ধর্ম্মে আস্থাবান্—ইস্‌লাম ধর্ম্ম এবং উৎকর্ষ ধারার আধ্যাত্মিক গভীরে তিনি ছিলেন নিমগ্ন। আনুষ্ঠানিক দাসত্বকে তিনি মানেননি কিন্তু সজীব সংস্কার, অনুষ্ঠানের সার্থক রূপকে তিনি সত্যের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। যে কবি "তরণিয়া হিন্দী", "হিন্দুস্থানী বাচ্চোকা", "নয়া শিবালা" প্রভৃতি কবিতা লিখে বাং-ই-দ্বারা কাব্যগ্রন্থে সমগ্র ভারতের চিত্তকে জয় করেছিলেন সেই ইকবাল মৃত্যুর বৎসর খানেক পূর্বে প্রকাশিত জর্ব্-ই কালিম্ কাব্যগ্রন্থে তাঁর ভারতীয় ঐক্যযোগের ধ্যানকে প্রকাশ করে গেছেন। এবং সেই ঐক্যযোগকে তিনি অনেক উর্ধে স্থান দিয়েছেন ভ্রাতৃবিরোধকারী নকল অনুষ্ঠানের চেয়ে। বলেছেন—

> জাতীয় সত্তা থাকে সজীব চিন্তার মিলন-যোগে—
> এই মিলনকে প্রতিহত করে যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া তা
> ঈশ্বর-বিরুদ্ধ ।"

"তরণিয়া হিন্দী" কবিতার লাইনটি মনে পড়ে—

> "ধর্ম আমাদের শেখায় না কলহ, ভারতীয় আমরা,
> ভারত আমাদের মাতৃভূমি ।"

লাহোরে তাঁকে দেখে বারম্বার মনে হয়েছিল প্রতিভার যাত্রা নিঃসঙ্গতার পথে—ইক্‌বালের চতুর্দিকে একটি নির্জনতার হাওয়া বইত, যদিও তিনি প্রায়ই লোকজনে পরিবৃত থাকতেন। একদিন আমাদের বলেছিলেন, "আধ্যাত্মিক জীবনের সুরু হয় চিত্তের নিঃসঙ্গ বোধে।" ভিড়ের মধ্যে থেকে যে সব বাণী তিনি বলেছেন তার মূল্য সমান নয়, নির্জনতার গভীর হতে কবি স্রষ্টা ইক্‌বাল যে চিরমানবিক দৃষ্টি রেখে গেছেন তার বিনাশ নেই। আসন্ন মৃত্যুর সময়ে তিনি প্রায়ই পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করতেন—প্রসন্ন বিশ্বাসের একটি সুর প্রচ্ছন্ন থাকত তাঁর প্রশ্নে। সময়ের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মন সর্বদাই উৎসুক হয়ে উঠত—বল্‌তেন তিনি, মর্ত্ত্যলোকেই কত বিভিন্ন কালের মধ্যে আমরা বাস করি ; অমর্ত্ত্যলোকের কাল সম্বন্ধে আমরা কী ভাবে জানব ? আবার বলতেন আমাদের স্বপ্নের কাল, ধ্যানের কাল, হঠাৎ অনুভূতির কাল পরকালের সঙ্গে কি যুক্ত হয় না ? সব সমস্যার উপরে ছিল তাঁর আত্মসমাহিত চেতনার দীপ্ত প্রতিষ্ঠা এই কথা বার বার মনে হয়েছে। শেষ দিনের আগে একবার তিনি ব'লে উঠেছিলেন, "আমাকে সমগ্র হয়ে প্রবেশ করতে দাও।"

শিল্পী—শফীউদ্দিন আহমেদ

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

ভবঘুরের চিঠি

২

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণাশ্রম এ দেশে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে—মহাত্মাজীর এই কথা শুনে তুমি চিন্তিত হয়ে পড়েছ, আর জিজ্ঞাসা করেছ যে চার বর্ণ ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে সে ব্যবস্থা তো চিরস্থায়ী হবার কথা! সেটা আবার লোপ পাবে কেমন করে?

একটা ভুল করেছ, ভায়া। ভগবান্ যখন চার বর্ণ সৃষ্টির কথা বলেছিলেন তখন শুধু এ দেশের কথা বলেননি। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ রয়েছে, আর সেই প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে মানুষকে যে চার ভাগে ভাগ করা যায়, এই কথাটা বলাই বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং শূদ্র ভিন্ন আপাততঃ আমাদের দেশে অন্য কোন বর্ণের অস্তিত্ব নেই, এ কথা যদি সত্যই হয়, তা'হলেও বর্ণবিভাগের সনাতনত্ব মিথ্যা হয়ে যায় না। জগৎ থেকে যে ব্রাহ্মণ লোপ পেয়ে যায়নি, তার প্রমাণ মহাত্মাজী নিজে। ক্ষত্রিয় যে লোপ পায়নি', এত বড় যুদ্ধের পরেও কি তা প্রমাণ করতে হবে? আর এই ক্ষত্রিয়রা যাদের তাঁবেদারী করে কাটাকাটি মারামারি করে বেড়াচ্ছে, তারা যে একবারে পাকা বৈশ্য তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

তা হলে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই—এ দেশে যে সমাজটাকে আমরা সনাতনধর্মীদের সমাজ বলে বড়াই করে বেড়াচ্ছি, আসলে সেটা কি? সেটা কি শুধু শূদ্রদের সমাজ? যদি চোটে না যাও, ভাই, তো বলি—আমার মনে হয় সেটা জীবন্ত মানুষের সমাজ নয়—জড়ের সমাজ। জড়ের লক্ষণই এই যে, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে না; কোন জিনিষ আত্মসাৎ করে নিজেকে পুষ্ট করবার শক্তিও তার নেই; আত্মরক্ষা করতেও সে অসমর্থ। সে শুধু যেমন ছিল তেমনি পড়ে থাকতে জানে।

সনাতন আদর্শে সমাজ গড়বার চেষ্টা আমাদের দেশেই হয়েছিল; কিন্তু দেশ পরাধীন হবার পর থেকে ক্রমে ক্রমে সে আদর্শ কাজে পরিণত করবার শক্তি আমাদের লোপ পেয়েছে। আজ সনাতন সমাজ বলে যিনি আড়ষ্ট হয়ে আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছেন, এই হাজার বৎসর ধরে তিনি আত্মরক্ষার খাতিরেও নিজেকে আর বিশেষ পরিবর্তন করতে পারেননি। মোগল আর পাঠানদের আক্রমণ থেকে যাঁরা সমাজকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলকেই স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে তা করতে হয়েছে। নানক, কবীর, নিত্যানন্দ সকলেরই ঐ এক অবস্থা। সমাজ-রক্ষণ আর পরিবর্তনের ভার যাঁদের উপর, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এ সব নূতন সম্প্রদায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখেননি। অথচ সমাজের যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুসলমানরা গ্রাস করতে লাগলো, তাদের রক্ষা করবারও কোন চেষ্টা এঁরা করেননি। মুসলমানেরা যখন বাড়ীর ভিতর এসে পড়লো, তখন কর্তারা অন্দর মহলে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে ব্যবস্থা দিলেন যে মুসলমানকে ছুঁলে জাত যাবে। কিন্তু ক্রমাগত পিছে হটা আর পালানো ভিন্ন যাঁরা আত্মরক্ষার অন্য উপায় খুঁজে না পান, পৃথিবীতে তাঁদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যে শিখজাতি না জন্মালে পঞ্জাবে হিন্দুর নাম লোপ পেয়ে যেত, হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা তাঁদের হাত থেকেও জল খেতে সঙ্কুচিত। পাছে জাতটি মারা যায়!

আমাদের বাংলা দেশেই দেখ না—আদিশূর, বল্লালসেন, আর রঘুনন্দন সমাজকে যে ছাঁচে ঢেলে গেলেন, আমাদের টোলের পণ্ডিত মশায়েরা প্রাণপণে সেই ছাঁচখানি আঁকড়ে বসে আছেন। একটু উনিশ-বিশ হলেই নাকি তাঁদের সনাতন ধর্মের প্রাণটুকু ফুস্ করে বেরিয়ে যাবে! অথচ যে যুগে সমাজে বাস্তবিকই প্রাণ ছিল, সে যুগে লোকে সমাজে সনাতন আদর্শ অনুযায়ী নূতন নূতন পরিবর্তন করতে অত আঁতকে উঠতো না। শুধু অতীতের দিকে চেয়েই তারা দিন কাটাতো না।

ধর্ম জিনিষটা সনাতন ব'লে কি সমাজের গঠনটিকেও সনাতন হতে হবে? সমাজের পরিবর্তন যদি এত বড় মহাপাতক, তা হলে উনিশ জন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উনিশখানা ধর্মসংহিতা লিখতে গিয়েছিলেন কেন, আর রঘুনন্দনেরই বা নূতন করে স্মৃতি লেখবার দরকার কি ছিল?

বর্ণাশ্রমের আদর্শে যে সমাজের ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছিল, তার মূল উদ্দেশ্য স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী স্বধর্ম পালন করাতে করাতে মানুষের মধ্যে শেষে পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব ফোটান। সকলের মধ্যে সুপ্ত মহাশক্তিকে জাগিয়ে তুলে মানুষকে ভগবানের লীলাকেন্দ্রে পরিণত ক'রে, মানুষের জন্ম সার্থক করানো। জন্মের গুণে যারা ব্রাহ্মণ, আর জন্মের দোষে যারা শূদ্র বলে গণ্য, তাদের পৃথক্ পৃথক্ গণ্ডির মধ্যে পুরে রেখে আজ কি সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে?

ধর্মপ্রতিষ্ঠাই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল ব'লে পরশুরাম নূতন ব্রাহ্মণ-সমাজের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ' পুরাতন ক্ষত্রিয়বংশ যখন নির্বীর্য হয়ে পড়েছিল, তখন বশিষ্ঠ ঋষি অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করে সমাজ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সমাজের আদর্শটা বেশ পরিস্ফুট ছিল বলেই, ধর্ম জিনিষটা সমাজবন্ধনের চাপে মারা যায়নি বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। গাছের যত দিন প্রাণশক্তি থাকে, তত দিনই তাতে নব বসন্তে নূতন নূতন ফল, ফুল, পাতা গজায়। মরা গাছটা শুধু ভূতের ভয় দেখাবার জন্য আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

আমাদের সমাজও আজ বহু কাল ধ'রে তেমনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার বৎসর আগে যারা শূদ্র ছিল, আজও তারা শূদ্রই রয়ে গেছে। স্বামী রামদাস সেই শূদ্রদের ভিতর সুপ্ত ক্ষাত্র-তেজ ফুৎকার দিয়ে যা' একটু জাগিয়েছিলেন, তা' এক ঝট্‌কাতেই নিবে গেল। বৈশ্যেরা যে দেশ-বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করবে, পণ্ডিত মশায়েরা সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ করে দিয়ে তার পথও রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। আর তাঁরা নিজে, গুরুগিরির ব্যবসা ক'রে দু পয়সা রোজগার করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। দলাদলি আর জাত-মারামারি ক'রে তাঁদের আর ব্রহ্মচিন্তার বড় বেশী অবসর থাকে না।

বাঁধনের উপর বাঁধন চড়িয়ে অতীতের গঠনটাকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখতে পারলেই কি সমাজ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো? মানুষের মধ্যে যদি তার অন্তরাত্মাই প্রবুদ্ধ হ'য়ে না উঠলো, তা' হলে কতকগুলো ছাই-ভস্ম অর্থহীন আচারের বাঁধনে তাকে বেঁধে বেঁধে কি শুভ ফল ফলবে? মানুষের জন্যই সমাজ। সমাজের ভিতরে থেকে যতক্ষণ মানুষের উন্নতি, ততক্ষণই সমাজের সার্থকতা। আর তাই যদি না হয়, তো বৃথা এই জড় সমাজের গোলামী করে কি হবে?

যাঁরা সমাজকে বহু শৃঙ্খলে বেঁধে মানুষের অন্তরস্থ ভগবানকে খর্ব্ব করেন, তাঁরা সমাজের প্রকৃত লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছেন। ভগবানকে ভুলে যাঁরা সামাজিক বাঁধনকেই বড় করে দেখেন, তাঁদের শুধু অপদেবতারই পূজা করা হয়। সেটা কৃত্রিমতার লক্ষণ, ধর্ম্মের বিকৃতি।

কতকটা স্মৃতি আর কতকটা দেশাচার মিলে যে সামাজিক ব্যবস্থা হয়েছে, তার মূলে আছে মানুষের বুদ্ধি আর খেয়াল। সুতরাং সেই সেই ব্যবস্থাগুলি সাময়িক ও অস্থায়ী। তাদের টেনে টেনে লম্বা করে চার যুগ জুড়ে রাখলে চলবে কেন?

প্রকৃত জীবনের পথ দেখিয়ে দেন শ্রুতি। সেই সনাতন আর অপৌরুষেয় শ্রুতিকে অপসারিত করে যাঁরা সামাজিক ব্যবস্থাকেই জীবনের নিয়ন্তা করে ফেলেন, কোন একটা সাময়িক শাস্ত্রকেই সনাতন ধর্ম্ম ব'লে স্থির করেন, তাঁদের জড় হয়ে যেতে খুব বেশী বিলম্ব হয় না।

আর হয়েছেও তাই। আমাদের অবনতির প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা মানুষকে ছোট ক'রে সমাজকে বড় ক'রে রেখেছি; দেবতার মন্দিরটি মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধাতে বাঁধাতে পূজার আয়োজন করতে ভুলে গেছি। দেবতাও কোন্ অবসরে মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন; আর সেই মার্বেল পাথরগুলো খসে গিয়ে আমাদের বুকের উপর চেপে পড়ে আছে।

এক দল বলছেন, বিলাতী সিমেণ্ট দিয়ে বাহির থেকে একটু জীর্ণ-সংস্কার করে দিলেই মন্দিরের কাজ চলে যাবে। আমাদের এ কালের সমাজ-সংস্কারকেরা গত পঞ্চাশ-ষাট্ বৎসর ধরে সেই চেষ্টাই করছেন। তা' সে বিষয় নিয়ে আমাদের স্মৃতি-পঞ্চাননদের সঙ্গে তাঁরা বিচার করতে থাকুন। আমার কিন্তু মনে হয়, মন্দিরের ভিতরে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে পূজার ব্যবস্থা না করতে পারলে, চামচিকের দল মন্দিরের ভিতরেই বাসা বেঁধে থাকবে। আর তা-হলে মন্দিরে ভক্ত-সমাগমও হবে না, বাহিরের জীর্ণ সংস্কার করবার লোকও পাওয়া যাবে না।

শুধু বাহিরের বাঁধন দিয়ে যাঁরা সমাজকে এক করতে গেছেন, তাঁরা কোন কালেই একটা বিরাট, প্রাণহীন জড়তা ছাড়া আর কিছুই গড়ে তুলতে পারেননি। সেখানে শেষ পর্য্যন্ত ঐক্যও থাকে না; আর অবাধ উন্নতির জন্য যে স্বাধীনতা দরকার, তা'ও নষ্ট হয়।

যাঁর আশ্রয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, সব মানুষই যাঁর কোলে এক, যাঁকে জগতে অভিব্যক্ত করবার জন্যই মানুষের কর্ম্মপ্রবাহ চলেছে, সেই ভগবানকে ছেড়ে দিলে সব যজ্ঞের আয়োজনই পণ্ড হবে। আদর্শ সমাজ মানুষের অন্তর্নিহিত সেই ভগবানের বাহন—জগন্নাথের যাত্রার রথ। জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, ঐক্য—এই রথেরই চারটি চাকা।

আমাদের সামাজিক রথখানি যে চাকা ভেঙ্গে, রাস্তা জুড়ে অচল হয়ে পড়ে আছে, তার কারণ এখানি সমাজের ব্যবস্থাপক-মণ্ডলীর অহংকারের বাহন মাত্র। কর্ত্তাদের এমন জ্ঞান নাই যে লোককে বুঝান, এমন শক্তি নাই যে তাদের চালান, এমন প্রেম নাই যে তাদের আপনার ক'রে লন। যাদের অপাংক্তেয়, অতিশূদ্র ব'লে কর্ত্তারা আপনাদের শ্রীঅঙ্গের এক শত হাতের মধ্যে ঘেঁসতে দেন না, তাদের উপর গোলামীর ছাপ ভগবান্ মেরেছেন না মানুষ মেরেছে?

ভয় পেও না ভাই! এই বুড়ো বয়সে গোলদীঘির ধারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে সমাজ সংস্কার করবার দুরভিসন্ধি আমার একটুও নেই। ভগবানের নাম করে মানুষ যে চিরদিনই মানুষের উপর অত্যাচার করে আসছে, তা' আমি বেশ জানি। ভগবান্ এত দিন তা' দেখে হাসতেন কি কাঁদতেন, তা' জানিনে। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, ক্রোধাগ্নি তাঁর চোখের কোণে আগ্নেয় গিরির অগ্নিশিখার মতো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠছে। মানুষের মনে এক দিন সে আগুন লাগবেই লাগবে। কত স্বার্থের পুঁটুলি, কত বুজরুকির ঝুলি, কত ওস্তাদের কত একচেটে স্বত্ব যে সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, আমি তাই ভেবেই—এখন থেকে শিউরে উঠছি আর মনে হচ্ছে আমাদের ঘরের কর্ত্তাদেরও বলি—"ওগো, দিন থাকতে তোমরাও ঘর সামলাও। যিনি দর্পহারী, তিনি হয়তো তোমাদেরও খাতির করবেন না।"

চাকরি পেয়ে প্রথম [illegible]
অবনীর। [illegible]
খানা বাড়ি [illegible]

মনোজ বসু

মাসের গোড়ার দিকে হপ্তা খানেকের কাজ মোটে—বাকি দিনগুলো শুয়ে-বসে কাটানো।

কিন্তু ফুর্তি উবে গেল মাসখানেকের মধ্যে। প্রকাণ্ড বাড়ি, আটখানা ঘর পাশাপাশি, তার মধ্যে দু'জন মাত্র—সে আর গিন্নিঠাকরুন ক্ষীরোদা। ঠাকুর-চাকর পারতপক্ষে এদিকে ঘেঁসে না, তারা রান্নাঘরে থাকে। অবনীও পরমানন্দে রাজি আছে তাদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে থাকতে, কিন্তু তার বেলা আদেশ মিলবে না। কড়া রাশভারি মানুষ ক্ষীরোদা, ছেলে-পুলে নেই।— ত্রিসংসারে কেউ যে আছে, অবস্থা দেখে মনে হয় না।

অতিকায় আট-আটটা ঘর হাঁ করে রয়েছে, অবনীকে গালের মধ্যে পুরে দিন রাত্রে ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করছে—এমনি একটা আতঙ্ক অহরহ মন জুড়ে রয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, কাজ পেলে সে বেঁচে যেত, কাজের

ভিড়ে ভুলে থাকতে পারত। ক্ষীরোদার হুকুম, কখন কি দরকার পড়ে—চব্বিশ ঘণ্টা তাকে হাজির থাকতে হবে বাড়িতে। খাবে-দাবে, কাজ না থাকলে বই-টই পড়বে, ইচ্ছা হলে চাই কি—গান-বাজনাও করতে পারবে—তাতে তাঁর আপত্তি নেই। গানে কিছু শখও আছে অবনীর। বাজনার জিনিষ অবশ্য সিংহ-মুখো যে খাটখানায় সে শোয় সেইটে ছাড়া আর কিছু নেই। ঠেকা দিয়ে তাতেই চালানো যেত—কিন্তু কথা বলতে গেলেই ঘরের মধ্যে গম-গম করে ওঠে, এর উপর গান গাইতে তার ভরসায় কুলিয়ে ওঠে না। আর বইয়ের মধ্যে এবাড়িতে আছে শুধু পঞ্জিকা। ক্ষীরোদা সারাক্ষণ তাঁর ঘরখানির মধ্যে থাকেন, কি করেন তিনিই জানেন। দুপুরবেলা স্নানের সময়টা বেরিয়ে আসেন একবার। আর বেরোন যখন কোন কাজের দরকার পড়ে। ভাঁটার মতো চোখের মণি ঘুরিয়ে এমন করে তাকান যে, অবনীর বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে। কথা বলেন—বাইরের কেউ শুনলে মনে করবে, ঝগড়া করছেন। গলার স্বরই ঐ রকম। ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব মোলায়েম সুরে একদিন বললেন, একা-একা কষ্ট হচ্ছে—না? মাঝে মাঝে আমার ঘরে গিয়ে গল্প-গুজব করলে তো পার।

বাবা রে—সামনে দাঁড়াতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে, গল্প-গুজব এই মানুষের সঙ্গে!

একটা জিনিষ অবনী পেয়ে গেল হঠাৎ। পেয়ে যেন বেঁচে গেল। একটি মেয়ের ছবি। ঐ আটটা ঘরেরই একটায় এক কোণে টাঙানো ছিল। ছবিটা চুরি করে এনে সে বিছানার ভিতর রাখল। ফাঁক পেলেই বের করে দেখে। দেখে আশা মেটে না। মরুভূমির মতো বাড়িটা—তার মধ্যে একমুঠো যুঁইফুল।

একলাটি অন্ধকারে গা ছম-ছম করে, তাই ঘুম না আসা অবধি শিয়রে আলো জ্বেলে রাখে অবনী। এখন আর একলা মনে হয় না—পাশে ছবিখানা। ছবি নয়, ফুটফুটে এক তরুণী। লাবণ্য মুখের উপর ঢল-ঢল করছে। ঘুম-ভরা চোখে মনে হয়, জাগ্রত প্রাণচঞ্চল মেয়েটি শান্ত হয়ে পাশে শুয়ে আছে। একের মন যেন জড়িয়ে ধরে আছে অন্যকে। নিবিড় আলিঙ্গনে সহসা সে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ছাড়ো গো, ছাড়ো—আহাঁ, লাগে—

মট-মট করে ওঠে—তখনই সম্বিৎ হয়, মানুষ নয়—ফ্রেমে বাঁধানো ছবি যে ওটা।

সকালবেলা শান্ত মুহূর্তে অবনীর ভাবনা জাগে, এ কি নূতন উৎপাত শুরু হল আবার! নির্জন এই প্রাচীন পুরীতে কবে মূর্তিমতী ছিল ঐ তরুণী। খিল-খিল করে হাসত, ধুপধাপ ছুটে বেড়াত সারাবাড়ি, গুনগুনিয়ে গান গাইত জ্যোৎস্না রাত্রে। সেই গান-হাসি রাত্রি হলেই ভেসে বেড়ায় যেন ঘরের বারান্দায়। ফ্রেমের ছবি থেকে বেরিয়ে এসে সারারাত সে পাশটিতে শুয়ে নিঃশব্দ ভাষায় মধুগুঞ্জন করে। টং-টং করে ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যায়, রাত শেষ হয়ে আসে, কথার তবু যেন শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের গল্পে যা পড়েছে, সেই রকম। গল্প সত্যি হয়ে ঘটছে তার জীবনে।

অনেক রাত্রে ক্ষীরোদা দুয়ার খুলে বারান্দা অতিক্রম করে চললেন অবনীর ঘরের দিকে। এসে জানলায় ঘা দিলেন।

ঘুমিয়েছ নাকি?

সাড়া না পেয়ে জোরে জোরে ঘা দিতে লাগলেন। অবনী ফুঁ দিয়ে তাড়াতাড়ি আলো নেবাল।

ক্ষীরোদা বললেন, আলো ছিল—দেখতে পেয়েছি। রাত কত এখন?

সাড়ে দশটা হবে আজ্ঞে—

সাড়ে দশটা ছিল দু-ঘণ্টা আগে।

তাই নাকি? টের পাইনি তো—

কি করে পাবে? কেরোসিনের খরচ তো তোমায় যোগাতে হয় না। এমন করে জানলা এঁটেছ, তবু আলো বেরুচ্ছিল। নবেল পড়া হচ্ছে?

আজ্ঞে না। নবেল কোথা পাব?

তা হলে ভগবদ্গীতা? যা খুশি পড়তে পার—কিন্তু দিনমানে পড়বে। লজ্জা করে না পরের পয়সায় কেরোসিন পোড়াতে?

অবনী চুপ করে থাকে। কিন্তু গ্রহ কাটেনি। ক্ষীরোদা বললেন, দুয়োর খোল—

অন্ধকার ঘরের মাঝখানে তিনি এসে দাঁড়ালেন। অবনী ঘেমে উঠেছে। কি সর্বনাশ হয়, কি না জানি করে বসেন এই নির্জনে নিশি রাত্রে এইবার!

হুকুম হল, আলো জ্বালো—

ছবিটা কাপড়ের মধ্যে ঢেকে অবনী আলো জ্বালল। বাঁচোয়া, যা ভেবেছিল সে সব নয়। খেরো-বাঁধা জমা-খরচের খাতা ক্ষীরোদার হাতে। এত রাত অবধি হিসাব নিয়ে ছিলেন তা হলে তিনি! কঠোর কণ্ঠে বললেন, যোগটা দেখ—

আজ্ঞে—

একশ' সতের করেছ, একশ' উনিশ হবে। দেখ—

থতমত খেয়ে অবনী বলে, তাই তো,—ভুল হয়ে গেছে।

তুমি ইচ্ছে করে করেছ। জোচ্চুরি করে মেরে দিয়েছ আমার দুটো টাকা। ভেবেছিলে, ধরতে পারবে না। মিথ্যে বলে এখন ঢাকতে যাচ্ছ।—উঁ?

অবনীর ছাতাটা তুলে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়ালেন।

পিঠের ছাল তুলে নেবো, আমায় চেনো না। তোমার মতো পাঁচ-সাতটা এর আগে ঘায়েল হয়েছে এবাড়িতে।

অবনী তড়াক করে উঠে পালাতে যায়। কাপড়ের ভিতর থেকে ছবি মেঝেয় পড়ল।

ক্ষীরোদা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এখানে আমার ছবি?

আপনার ছিল এ ছবি?

এ অবস্থার মধ্যেও অবনী একবার ছবির দিকে একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

দেয়ালে টাঙানো ছিল। ছবি চুরি করে এনেছ তুমি শয়তান।

রাগ সামলাতে না পেরে ক্ষীরোদা ছাতার বাঁট দিয়ে অবনীর পিঠে বসিয়ে দিলেন এক ঘা।

ছুটে পালাচ্ছে অবনী। ঠোক্কর লেগে ছবি বারান্দায় পড়ল, ঝনঝনিয়ে কাচ চুরমার হয়ে গেল। ক্ষীরোদা তাড়া করেছেন। পায়ের আঘাতে ছবি বারান্দা থেকে পড়ল উঠানের নর্দমায়।

শিল্পী—অনিল সেন

অনুবাদক
শিশিরকুমার সেনগুপ্ত
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ওয়াঙ লুঙের আজ বিয়ের দিন। মশারির অন্ধকারের ভিতর চোখ খুলে ওয়াঙ বুঝতেই পারে না আজকের ভোর অন্য সব দিনের থেকে ভিন্ন গোত্র কেন। সমুখের ঘর থেকে বৃদ্ধ পিতার হাঁপানী-কাসির শব্দ আসছে। তা ভিন্ন সারা বাড়ীই নিঃঝুম। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলেই পিতার কাসির আওয়াজ পায় সে। শুয়ে শুয়ে শোনে ওয়াঙ। সেই কাসির শব্দ এগিয়ে আসে, তার পর এক সময় পিতার ঘরের কাঠের দরজা কবজার চাপে আর্তনাদ করে ওঠে।

আজ এসবের জন্যে অপেক্ষা করে না সে, লাফিয়ে উঠে মশারি সরিয়ে রাখে। বাইরে এখনো পাতলা অন্ধকার—শুধু জানলায় ছেঁড়া কাগজ-চাপা ছোট চৌকো ফুটো দিয়ে দেখা যায়—দিগন্তের রঙ কেমন তামাটে সোণা হ'য়ে উঠেছে। ছেঁড়া কাগজটা টান মেরে ছিঁড়ে দেয় সে—'এখন বসন্ত আসছে আর কাগজ চাপার দরকার কি।' নিজের মনেই বিড় বিড় করে সে।

অন্ততঃ আজ সারা বাড়ীটা একটু ঝকমক করবে, একথা চেঁচিয়ে বলতে তার লজ্জা হয়। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেয় সে—স্পর্শ নেয় ভোরের হাওয়ার। পূব থেকে বইছে নরম হাওয়া—বনের মর্মরাণি সেই হাওয়ায়—আসন্ন বর্ষার সম্ভাবনা তাতে। এ-সব লক্ষণগুলিই ভাল। ফসল হাওয়ার জন্য বর্ষার প্রয়োজন। আজ বৃষ্টি হবে না বটে—তবে এমনি পূবালী হাওয়া থাকলে এ সপ্তাহেই বৃষ্টি নামবে। গত কাল সে পিতাকে বলেছিল যে, আকাশ যদি এমনি রুক্ষ থাকে তাহলে শস্য-শীর্ষগুলো পুরন্ত হ'তে পারবে না। আজকের সকালে মনে হচ্ছে যেন ভগবান্ সু-দৃষ্টি দিয়েছেন। পৃথিবী ফলবতী হবে।

সুডৌল কোমরে তূলোর নীল বেল্ট লাগাতে লাগাতে নীল প্যান্টে সে মাঝের ঘরের দিকে পা বাড়ায় তাড়াতাড়ি। আজ গরম জলে স্নান না সেরে সে জামা গায়ে দেবে না। সেখান থেকে ওয়াঙ যায় গোয়ালে—বাড়ীর একধারে এই গোয়ালটিই রান্নাঘরের কাজ করে। দরজার বাইরে থেকে একটি ষাঁড় শিং বেঁকিয়ে গম্ভীর করে আওয়াজ দেয়। শুধু রান্নাঘরটিই নয়, ওয়াঙের সমস্ত বাড়ীটিই মাটির—তাদের জমির মাটির। মাথার উপর যে খড়ের ছাউনি সেও তাদের জমিরই ফসলের। ওয়াঙের ঠাকুর্দা সেই মাটির একটি উনুন তৈরী করেছিলেন—বহু দিনের ব্যবহারে সেটি কালো হয়ে এসেছে। উনুনের মুখের উপর গোল বড় একটি লোহার কড়া বসান থাকে।

মাটির জালা থেকে সাবধানে জল তুলে ওয়াঙ কড়া ভর্তি করে খানিকটা। জল কত দামী—অপচয় করার জিনিষ ও নয়। একটু যেন ইতস্ততঃ করে, ওয়াঙ জালা শুদ্ধ তুলে সমস্ত জল কড়ায় ঢেলে দেয়। আজ ও ভাল করে স্নান করে নেবে। মায়ের কোলে যখন শিশু ছিল তার পর থেকে কেউ ওর সারা শরীর দেখেনি। আজ এক জন দেখবে। নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতেই হবে।

উনুনের পিছন দিকে সাজান থাকে শুক্‌নো ঘাসপাতা, শুকনো ডাল। যত্ন করে উনুনের মুখে সবগুলি সাজিয়ে ওয়াঙ চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালায়। শুষ্ক ঘাসে আগুন ধরে।

রান্নাঘরের উনুন ও আজ শেষ বারের মত ধরাল। ছ'বছর আগে মা মারা যাবার পর রোজ সে উনুন ধরায়। রোজ সকালে উঠে সে আগুন দেয়—জল ফোটায়। ঘরের ভিতর পিতা কাসছেন। তার কাছে ফুটন্ত জল পাত্র করে নিয়ে যায় সে। সকালের কাসি কমাবার জন্য এই গরম জলের প্রতীক্ষা করেন পিতা। যাক্ এত দিনে বাপ আর ছেলে বিশ্রাম পাবে। এ বাড়ীতে একটি মেয়ে মানুষ আসছে। এখন থেকে কি শীতে কি গ্রীষ্মে ওয়াঙকে আর ভোরে উঠে উনুনে আগুন দিতে হবে না। এখন থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেও গরম জলের অপেক্ষা করবে। ভালো ফসল হবে যে-বছর সেই জলে থাকবে কয়েকটি চা-পাতা। অনেক বছর অন্তর এ সুযোগ আসে।

যদি কখনো মেয়েটি ক্লান্ত বোধ করে—তার ছেলেমেয়েরাই সব কাজ করে দেবে। ওয়াঙের ঘরে সে সব ছেলেমেয়ে আনবে সে। এ বাড়ীর মধ্যে ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটির ভাবনা আসতেই ওয়াঙ যেন থমকে যায়। মা মারা যাবার পর এ বাড়ীর তিনটি ঘর যেন বাহুল্য বোধ হোত। এক-পাল ছেলেমেয়ে ওয়াঙের কাকার। তিনি ত সব সময় বাড়ীতে বাসা করবার চেষ্টা করছেন। আর মার সব ত আত্মীয়রাও। কত কষ্টে তাদের ঠেকানো হয়েছে।

কাকা বলেন—দুটি পুরুষমানুষের এত ঘর দিয়ে কি হয়? বাপ-বেটায় এক ঘরে শুলেই হয়। ছেলের গায়ের তাপে বাপের কাসি কম হবে।

বাবা জবাব দেন—নাতির জন্ত বিছানার ভাগ রাখছি। সে এসে আমার বুড়ো হাড়ে তাত দেবে।

এবার নাতি আসবে। নাতি থেকে নাতকুড়। এ ঘরের

দেয়াল ঘিরে বিছানা পাততে হবে—মাঝের ঘরেও। সারা বাড়ীতেই ভরে উঠবে বিছানা। শূন্য গৃহস্থালী ভরে ওঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে ওয়াঙ। উনুনের আগুন নিবে যায়—কড়ার জল ঠাণ্ডা হয়ে আসে। দরজার মুখে পিতার ছায়াঘন মূর্তি এগিয়ে আসে। কাসেন আর থুতু ফেলেন তিনি। হাঁফ নিয়ে বললেন—

'বুকে জোর পাব, এখনো জল গরম হয়নি'।

চমক ভাঙ্গতেই লজ্জা করে ওয়াঙের।

'ডাল-পাতাগুলো ভিজে গেছে।' উনুনের পিছন থেকে বলে সে ঠাণ্ডা হাওয়া—আবার যতক্ষণ না জল গরম হয় পিতা সমান কাসেন। একটা পাত্রে খানিকটা জল ফেলে নেয় ওয়াঙ। উনুনের আর এক ধারে রাখা জার থেকে বারো-চোদ্দটা শুকনো পাতা নিয়ে জলে ছেড়ে দেয়। পিতার দৃষ্টি লুব্ধ হয়ে উঠে। তিনি শাসনের স্বরে বলেন—'অপচয় করছ কেন। চা খাওয়াত রূপো খাওয়া।'

'আজ।' ছোট্ট একটু হেসে ওয়াঙ বলে—'খেয়ে সুস্থ হও আজ।'

শুষ্ক আঙুল দিয়ে পিতা পাত্রটি ধরেন যেন। মুখে ছোট ছোট আওয়াজ করেন। জলের উপর চায়ের গুটিয়ে-যাওয়া পাতাগুলি আবার চওড়া হয়। এত দামী জিনিষ যেন খেতে পারেন না পিতা।

'ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—সত্যি—' শংকিত হয়ে পিতা বড় বড় চুমুক দেন। শিশুর মত আহারের আনন্দে যেন বিভোর হয়ে যান। তবু ওয়াঙ যে কাঠের টবে বেশ করে জল ঢেলে নিচ্ছে তা দেখতে ভোলেন না। মাথা তুলে ছেলের দিকে তাকান তিনি।

'জল ত বেশী নেই। কোন রকমে একটুকুন জমিতে দেওয়া চলবে।' তাড়াতাড়ি বলেন তিনি।

ওয়াঙ জবাব দেয় না। শেষ ফোঁটা অবধি ঢেলে নেয়।

'কি হচ্ছে কি?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে বৃদ্ধ।

'নতুন বছরের পর আর গা ধুইনি আমি।' নীচু কণ্ঠে জবাব দেয় ওয়াঙ।

একটি মেয়ের জন্য যে সে গা' ধুতে চাইছে, এ কথা বাবাকে বলতে তার লজ্জা হয়। টবটা নিয়ে সে নিজের ঘরে চলে যায়। দরজা চেপে বন্ধ হয় না তার ঘরের। মাঝের ঘরে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধ বলেন—'সকালে উঠেই চা গেলা—তার পর এই ভাবে গা' ধোয়ার জন্য জল নষ্ট করা—নূতন বৌয়ের জন্য এসব করা—;

'এক দিনই ত—' ওয়াঙ চেঁচিয়ে ওঠে! তার পর যোগ করে দেয়—'গা ধোয়া হলে জলটা মাটিতেই ঢেলে দেব, বাবা—অপচয় হ'বে না'

এ কথায় বৃদ্ধ চুপ করেন। প্যান্ট খুলে ওয়াঙ স্নান করতে বসে। জানালার ফাঁক দিয়ে আসা আলোয় বসে ওয়াঙ তোয়ালে গরম জলে ভিজিয়ে তার কৃষ্ণাভ নাতিপুষ্ট দেহ মার্জনা করে। ভোরের বাতাস আতপ্ত বোধ হলেও গায়ে জল ঠাণ্ডা হতেই ওর শীত শীত করে। গরম জল ঢালতেই সারা শরীর দিয়ে একটা বাষ্প উঠতে থাকে। গা ধোয়া শেষ করে মায়ের বাক্স থেকে তুলোর একটা নূতন নীল পোষাক ও বার করে। আজ শীত করলেও, গরম কিছু পরতে ইচ্ছা হোল না। সারা শরীরের এই চারু পরিচ্ছন্নতায় আনন্দ হয় তার। শীতের জামাগুলো সব ছিঁড়ে পিঁজে গেছে। বিয়ের প্রথম দিন ওর তুলো-বেরিয়ে-আসা জামাগুলো দেখাতে ইচ্ছা হয় না মেয়েটিকে। পরে তাকেই সব কাচতে হবে—রিপু করতে হ'বে—তা বলে প্রথম দিনেই কিছুতেই নয়। উৎসব কিংবা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য তুলে রাখা একটি মাত্র ওর পোষাক যা' আছে তাই সে বার করে রাখে। তার পর নড়বড়ে টেবিলের টানা, থেকে কাঠের চিরুণী বার করে চুল আঁচড়ায়।

দরজার ফাঁক দিয়ে পিতার অনুযোগ কানে আসে—'আজ বুঝি আমায় খেতে হ'বে না। আমার বয়সে যতক্ষণ না পেট ভরে, হাড় সব জল হ'য়ে থাকে।'

'আসছি বাবা।' তাড়াতাড়ি করে চুল আঁচড়িয়ে ওয়াঙ জামায় একটা কালো সিল্কের সুতো লাগিয়ে নেয়।

টব নিয়ে সে আবার বাইরে আসে। প্রাতরাশের কথাটাই ভুলে বসেছিল সে। পায়স করে বাবাকে খাইয়ে দেবে সে। নিজে আজ সে কিছুই খেতে পারবে না। বাইরের চৌকাঠের কাছে গিয়ে সে জমিতে জলটা ঢেলে দেয়। জল ঢালতেই মনে পড়ে যে, উনুনের কড়ায় আর একটুও জল নেই। তার মানে আবার তাকে উনুন ধরাতে হ'বে। ভাবতেই পিতার ওপর একটু রুদ্ধ ক্রোধ জেগে ওঠে ওয়াঙের।

'খালি খাওয়া ছাড়া বুড়োদের আর কোন চিন্তা নেই।' উনুনের মুখে বসে মনে মনে বিড়-বিড় করে ওয়াঙ। বৃদ্ধের জন্যে এই শেষবার নিজ হাতে সে রান্না করে দিচ্ছে। কুয়ো থেকে জল তুলে সামান্য একটু জল গরম করে নেয় ওয়াঙ। খুদের মাড় করে বৃদ্ধের কাছে নিয়ে যায়।

'আজ রাত্রে আমরা ভাত খাব বাবা। এখন এটুকু খেয়ে নিন।'

পাতলা হলুদ রঙের পায়স কাঠি দিয়ে নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ বললেন—'ঘরে চাল ত কমই রয়েছে দেখছি।'

'তাতে কি হয়েছে। বসন্ত উৎসবের সময় আমরা কম খরচ করব।' ওয়াঙের জবাব বৃদ্ধ শুনতেই পান না। তিনি ততক্ষণে সশব্দে খাওয়া শুরু করেছেন।

নিজের ঘরে ফিরে এসে পোষাক পরে নেয় ওয়াঙ। গালে মাথায় হাত বুলায় সে। আর একবার কামিয়ে নিলে কেমন হয়? এখনো সূর্য ওঠেনি। নাপিতপাড়ার ভিতর দিয়ে গিয়ে ও মেয়েটির বাড়ী পৌঁছতে পারবে। পয়সা আছে কিনা দেখে ওয়াঙ। ছোট ছাই রঙের থলি থেকে পয়সা গণে সে। ছটা রূপোর আর দু'মুঠো তামার মুদ্রা। আজ রাত্রে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছে সে একথা এখনো পিতাকে জানায়নি। খুব নিকট আত্মীয় কয়েকটি আর ওর প্রতিবেশী কয়েক ঘর চাষী বন্ধু। ফেরার পথে সহর থেকে একটু মাংস ছোট একটা মাছ আর এক মুঠো বাদাম কিনে আনার মতলব ছিল তার। সুবিধে হলে কিছু বাঁশের কুঁড়ি, একটু গরুর মাংস, বাগানের তোলা কপির সঙ্গে ঠিক বানাবে সে। তাও তেল আর মশলা কেনার পর পয়সা থাকলে। কামাতে গেলে হয়ত মাংস কেনারও পয়সা থাকবে না। যাই হোক—মাথা ন্যাড়া করাই স্থির করে ও হঠাৎ।

রুক্ষ-বাক্ পিতাকে পিছনে ফেলে ওয়াঙ সকালের আলোয় বেরিয়ে পড়ে। অজাকের রক্তবর্ণ মেঘ সত্ত্বেও সূর্য দ্রুত উঠে আসছেন দিগন্ত মেঘের পাহাড় ডিঙিয়ে। ঊর্দ্ধমুখী বার্লি আর গমের শীর্ষে শিশির-বিন্দু ঝকমক করছে। ওয়াঙ ল্যাণ্ডের চাষী-মন মুহূর্তে মুগ্ধ হয়—মঞ্জুরিত শীর্ষগুলিকে ও আদর করে। বৃষ্টির প্রতীক্ষায় শীর্ষগুলি আজো শূন্যগর্ভ। বাতাসের গন্ধ নিয়ে ওয়াঙ—তাকিয়ে দেখে আকাশে।

উপরের ঘনস্তূপ মেঘে জমে আছে বর্ষা—ভারী হয়ে আছে বাতাসে। আজই গন্ধ ধূপ কিনে পৃথ্বী মায়ের মন্দিরে দেবে ওয়াঙ। আজকের দিনে দেবে সে।

মাঠের সরু বাঁকা সড়ক দিয়ে এগিয়ে চলে সে। নাতি দূরে সহরের উঁচু প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। পাঁচীলের দরজা পেরিয়ে পৌঁছবে সে যে বিরাট প্রাসাদে—সেটি হোয়াঙ পরিবারের প্রাসাদ। সেই প্রাসাদেই শিশুকাল থেকে মেয়েটি ক্রীতদাসী হয়ে আছে। ওয়াঙকে অনেকেই বলেছে—'ঐ রকম প্রাসাদে যে বহুকাল ক্রীতদাসী হয়ে আছে তেমন মেয়েকে বিয়ে করার চেয়ে একা থাকা ঢের ভাল।' তবু পিতাকে যখন ওয়াঙ বলেছিল—'কোন কালেই কি আমি বৌ পাব না?'—পিতা বলেছিলেন—'আজকালকার দুঃসময়ে বিয়ের খরচ আর মেয়ের গহনা আর সিল্কের পোষাক দিয়ে বিয়ে করতে হলে আমাদের মত গরীব লোকের ক্রীতদাসী ভিন্ন পথ নেই।'

পিতা নিজেই তখন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হোয়াঙ-প্রাসাদে গিয়ে খোজ নিলেন কোন অতিরিক্ত ক্রীতদাসী আছে কিনা।

'খুব ছোটও নয় আর বেশী সুন্দরী না হ'লেই ভাল।' পাত্রী দেখবার সময় তিনি বলেছিলেন।

বৌ সুন্দরী হবে না এ চিন্তায় পীড়িত হয়েছিল ওয়াঙ। ঘরে সুন্দরী বৌ এলে লোকে তাকে কত তারিফ করবে। ছেলের বিদ্রোহী মুখের দিকে চেয়ে বাপ চেঁচিয়ে বলেছিলেন,—'সুন্দরী মেয়ে নিয়ে করবে কি শুনি? আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসবে, তাকে সংসার দেখতে হবে—ছেলে কাঁখে নিয়ে মাঠে কাজ করতে হবে। কোন সুন্দরী মেয়ে তা করবে না। তার চিন্তা হবে শুধু ভাল কাপড়-জামার। ও সব সুশ্রী মেয়ে আমাদের ঘরের জন্য নয়। আমরা চাষী লোক। তা' ছাড়া ঐ রকম ধনীর বাড়ীতে কোন্ ক্রীতদাসী কুমারী থাকে? ছোট ছোট বাবুরা ফুর্তি করে তাদের নিয়ে। সে হিসেবেও কুৎসিত মেয়ে সুরূপার চেয়ে অনেক ভাল। বড় লোকের ছেলের নরম ডৌল হাতের চেয়ে তোমার কড়া চাষার হাত কোন সুন্দরী মেয়ে পছন্দ করবে না। বিলাসের মধ্যে মানুষ হওয়া সেই সব ছেলেদের নধর তলতলে চেহারা তোমার রোদে-পোড়া চেহারার চেয়ে ঢের বেশী মনে ধরবে তাদের।'

পিতা দিব্যি গুছিয়ে কথা বলেন। নিজের দেহের আবেদনের সঙ্গে ওয়াঙ লড়াই করে। তার পর বলে বসে—'যাই হোক; মোট কথা মুখে দাগ-দাগ কিংবা ফাটা ঠোঁট কোন মেয়ে আমি বিয়ে করব না।'

'সে দেখা যাবে কি হয়।'

তার যে বৌ হচ্ছে ও দু'টি আঙ্গিক দোষ নেই তার। এইটুকু শুধু শুনেছে ওয়াঙ। সোনার জল দেওয়া দু'টো রূপোর আঙটি আর একটি রূপোর কানের দুল কিনে বাপ মেয়ের মালিকের কাছে বিয়ের কথা পাকা করতে গিয়েছিলেন। এই অবধি হয়ে আছে। আজ ওয়াঙ নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে।

নগর-গেটের ঠাণ্ডা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে ওয়াঙ। ভিস্তিওয়ালারা জল বয়ে বয়ে বেড়ায়। পাথরের উপর উছলে পড়ে জল। পাথরের মেঝে এমন ঠাণ্ডা থাকে যে গ্রীষ্মের দিনেও ফল-ওয়ালারা মাটিতে টাটকা ফল নিয়ে বসে। শুধু ছোট ছোট কাঁচা সফতালুর ঝোড়া নিয়ে কয়েক জন চেঁচাচ্ছে—'নূতন সফতালু। বছরের নূতন ফল। খেয়ে শীতকালের গ্লানি দূর করুন।'

মনে মনে ভাবে ওয়াঙ—'সে যদি ভালবাসে ফেরার পথে একমুঠো সফতালু কিনে দেবে তাকে।' এই পথে ফেরার সময় একটি মেয়ে যে ওর পাশে পাশে চলবে এ ভাবাই যায় না যেন।

মোড় ফিরতেই নাপিতপাড়ায় এসে পড়ে সে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু আনাজ-বিক্রেতা এসে পড়েছে। সকালের বাজারে তারা মাল বিক্রী করে ফিরবে। সারা রাত ঝুড়ির উপর কুঁকড়ে বসে তারা শীতে কাঁপছে। এখন ঝুড়ি প্রায় খালি। আজকের দিনে কেউ তাকে পরিহাস করবে এ চায় না বলে ওয়াঙ তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দীর্ঘ গলির আর এক প্রান্তে গিয়ে ও নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ে। দ্রুত পায়ে এসে নাপিত কেটলি থেকে পিতলের পাত্রে গরম জল ঢালে।

'সব কামাবে?'

ব্যবসায়ী রীতিতে প্রশ্ন করে নাপিত।

'শুধু মাথা আর মুখ।'

'কান নাক কামাবে না?'

'তাতে কত লাগবে? সতর্ক হয়ে প্রশ্ন করে ওয়াঙ।

গরম জলে কালো ন্যাকড়া ভিজোতে ভিজোতে নাপিত জবাব দেয়—'চার পেন্স।'

'দু পেন্স দেব।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দেয় নাপিত—'তাহলে নাকের এক দিক্ আর একটা কান কামিয়ে দেব।'

'মুখের কোন্ দিক্ কামাবে?' পাশের আর একটি নাপিত হাসিতে ফেটে পড়ে।

সহরের এই সব মানুষদের কাছে এলেই ওয়াঙের কেমন যেন ছোট মনে হয় নিজেকে। হোক না এরা নাপিত তবু ত সহরে। তাড়াতাড়ি করে সে বলে—'যে দিকে খুশী'; তার পর নাপিতের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয় সে। কামানো হ'তে হ'তে নাপিত ওকে বিনা পয়সায় ঘাড়ে পিঠে দু'একটা রদ্দা দিয়ে শরীর বেশ ঝরঝরে করে দেয়। কপালের উপরটা কামাতে কামাতে নাপিত মন্তব্য করে—'সম্পূর্ণ মাথা কামালে মন্দ দেখাবে না তোমায়। আজকাল ফ্যাশান হোল বিনুনী না রাখা।'

মাথার তালুর কাছে রাখা বিনুনীর উপর নাপিতের ক্ষুর উদ্যত হচ্ছে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে ওয়াঙ—'বাবাকে না জিজ্ঞাসা করে কামাতে পারব না বিনুনী।' ওর কথায় হেসে ওঠে নাপিত।

যাক্—কামানো শেষ হ'লে নাপিতের হাতে পয়সা গুণে দিতে দিতে আতংকে ওয়াঙের গলা শুকিয়ে যায়; এতগুলো পয়সা!

রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কামানো মাথায় আরাম পায় ওয়াঙ। ভাবে—'যাক্—একবার ত'।

বাজারে গিয়ে এক সের মাংস কিনে নেয় ওয়াঙ—একটু ইতস্ততঃ করে বীফও খানিকটা কেনে। একে একে সব'কটি বাজার সেরে ফেলে এক জোড়া গন্ধধূপ কেনে সে। তার পর হোয়াঙ প্রাসাদের দিকে পা বাড়াতেই কেমন লজ্জা আর ভয় এসে তাকে বিবশ করে।

প্রাসাদের দরজার কাছে আসতেই আতংকে প্রাণ দুর-দুর করে ওয়াঙের। একা কি করে ভিতরে যাবে সে। মনে হোল, অন্ততঃ বাবাকে কিংবা কাকাকে কিংবা কোন পড়শীকেও ত সে আসতে বলতে পারত সঙ্গে। এত বড় বাড়ীতে আগে কখনো ঢোকেনি সে।

আর বিয়ের উৎসবের বাজার হাতে নিয়ে সে কি করে গিয়ে বলবে—'আমি আমার বৌকে নিতে এসেছি ?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে দেখে সে। বিরাট লোহার দরজা লোহার হুড়কো দিয়ে বন্ধ। শুধু হু'পাশে হু'টি পাথরের সিংহ পাহারা দিচ্ছে যেন। আর কোথাও কেউ নেই। অসম্ভব মনে করে ওয়াঙ ফিরতে যায়।

শরীর কেমন যেন অবশ মনে হয়। আগে গিয়ে কিছু কিনে খাবে সে। আজ খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল। কাছেই একটি ছোট রেস্তোঁরায় গিয়ে দুটো পেন্স দিয়ে হুকুম দেয় ওয়াঙ! রেঁস্তোরার ছেলেটি পেন্স দু'টি হাতে নিয়ে নাচায় আর তাকিয়ে দেখে কেমন ক'রে খাচ্ছে লোকটা।

—'আর কিছু নেবেন ?'

মাথা নাড়ে ওয়াঙ। তাকিয়ে বাকী লোকজনদের কাউকেই চিনতে পারে না সে। এটা গরীবদের খাওয়ার জায়গা। চারি পাশের লোকজনের তুলনায় ওয়াঙকে দেখায় বেশ সম্ভ্রান্ত। তার দিকে তাকিয়ে একটি ভিক্ষুক অবধি কাতর কণ্ঠে বলে—'দয়া করে কিছু দিন, হুজুর। সারাদিন খাইনি'।

হুজুর বলা ত দূরের কথা, এর আগে ওয়াঙের কাছে কোন ভিখারী ভিক্ষা চায়নি'। এক পেনীর এক-পঞ্চমাংশ যে মুদ্রা তাই দু'টো খুশী হয়ে ওয়াঙ তার দিকে ছুঁড়ে দেয়। ভিখারী লুব্ধ হয়ে নিজের কালো কাপড়ের মধ্যে ভরে নেয়।

সূর্য মাথার উপর উঠতে থাকে—ওয়াঙ তেমনিই বসে থাকে সেখানে। অবশেষে দোকানের চাকর অধীর হয়ে তাকে বলে—যদি আর কিছু না খান তাহলে এর পর টুলের ভাড়া দিতে হবে।

চাকরের এই স্পর্ধায় হয়ত আগুন হয়েই উঠত ওয়াঙ। কিন্তু বড় বাড়ীতে যাবার কথা ভাবতেই সারা শরীরে তার ঘাম ঝরে। ফিরে তাকিয়ে বলে—'চা দাও আমায়।' মুহূর্তেই চা এসে পড়ে। ছেলেটি বলে পেনী ?

আঁৎকে ওঠে ওয়াঙ। বাধ্য হয়ে আবার কোমরের থলি থেকে একটি পেনী বার করে দেয়।

স্বস্তিহীন হয়ে বিড়-বিড় করে বলে—'এ একবারে গলাকাটা।' মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায় ওয়াঙ তারই এক প্রতিবেশী চাষী ওপাশের দরজা দিয়ে দোকানে প্রবেশ করছে। দ্রুত চুমুকে চা খেয়ে নিয়ে ওয়াঙ একেবারে পথে নেমে পড়ে।

'যেতে ত হবেই।' নিরাশ কণ্ঠে আবৃত্তি করে ওয়াঙ। মন্দ-পায় আবার প্রাসাদ-দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দুপুর অতিক্রান্ত হয়েছে এতক্ষণে। অর্গলবদ্ধ প্রাসাদ-দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। দ্বারপ্রান্তে প্রহরী অলসভাবে বসে বসে আহার শেষে বাঁশের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছে। ওয়াঙ এগিয়ে আসতেই তার হাতে ঝোড়া দেখে কর্কশ কণ্ঠে প্রহরী চীৎকার করে ওঠে—ভাবে লোকটা বোধ হয় কিছু বেচতে এসেছে। 'কি ব্যাপার কি ?

অনেক কষ্টে ওয়াঙ জবাব দেয়—'আমার নাম ওয়াঙ ল্যাঙ—আমি একজন চাষী।'

'তা চাষী ওয়াঙ ল্যাঙ—তোমার মতলব কি ?' রুক্ষ জবাব আসে প্রহরীর। শুধু এ বাড়ীর বাবুদের ধনী বন্ধু ভিন্ন আর কারুর সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করে না সে।

'আমি এসেছি—আমি—'কথা রেখে যায় ওয়াঙের।

'এসেছ তা' দেখতেই পাচ্ছি—'গালের উপকার তিলের দীর্ঘ দু'টি চুলে মোচড় দিতে দিতে প্রহরী ধৈর্যধারণের চেষ্টা করে। অসহায়তায় ওয়াঙের কণ্ঠ যেন বাণীহীন হতে বসে। 'এখানে একটি মেয়ে থাকে'। রৌদ্রের তাপে সারা শরীরে আবার ঘাম দেয়।

প্রহরীর অট্টহাসি শুনতে পায় সে।

'তুমি সেই! একটি বরের আশায় আমরা কাল গুণছিলাম। তা' ঝোড়া হাতে নতুন বর এসেছে—আমি চিনতেই পারিনি'।'

'সামান্য একটু মাংস আছে।' যেন কত কিন্তু হয়ে বলে ওয়াঙ। প্রহরী ওকে ভিতরে নিয়ে যাবে এই আশা করে সে। কিন্তু তার চাঞ্চল্য দেখা যায় না। শেষে ওয়াঙই বলে বসে—'একা ভিতরে যাব ?'

যেন আঁৎকে ওঠে প্রহরী—'বড়বাবু তোমায় খুন করবে।'

একটু থেমে যখন দেখে যে ওয়াঙ সত্যই নিরীহ লোক, সে বলে—'রূপার একটি মুদ্রায় সব দরজারই টিকেট হ'তে পারে।'

এতক্ষণে ওয়াঙ বোঝে যে লোকটা আসলে ঘুষ চাইছে।

কাকুতি করে বলে সে—'আমি গরীব চাষী।'

'দেখি তোমার থলেতে কি আছে ?'

সরল ওয়াঙ যখন সত্যি সত্যি লম্বা পোশাক তুলে থলি বার করে বাঁ হাতের তালুতে পয়সাগুলো ঢেলে নিয়ে দেখায় যে বাজারের পর আর মাত্র বাকী আছে একটি রূপোর মুদ্রা আর চোদ্দটি তামার। প্রহরী দাঁতে দাঁত দিয়ে আক্রোশে ফোলে।

'রূপোটা আমার চাই'। ওয়াঙ কিছু বলার আগেই উদাসীন ভাবে প্রহরী হাত থেকে মুদ্রাটা নিয়ে নিজের আস্তিনে গুঁজে রাখে। তার পর লম্বা পা ফেলে ভিতরে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলে—'বর এসেছে—বর এসেছে।'

সমস্ত পরিস্থিতিটায় ওয়াঙের যুগপৎ রাগ আর অস্বস্তি হয়। তবু নিরুপায় হয়ে সে ঝোড়া তুলে নিয়ে চোখ সোজা রেখে প্রহরীকে অনুসরণ করতে থাকে।

বড় লোকের বাড়ীর ভিতরে এই প্রথম এলেও এ অভিজ্ঞতার কথা পরে তার কিছুই স্মরণ হোত না। মুখ জ্বলে যায় অস্বস্তিতে, তবু মাথা নীচু করে সে মহলের পর মহল পার হয়ে যায়। কাণে আসে প্রহরীর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা আর দু'পাশের হাসির ঝলকানি। অবশেষে হয়ত একশ' দরবার পার হবার পর প্রহরীর চীৎকার থামে। পাশের একটা ঘরে তাকে দাঁড় করিয়ে প্রহরী ভিতরের আর একটা ঘরে চলে যায়। মুহূর্তমধ্যে ফিরে এসে সে বলে—'বুড়ী মা তোমায় দেখবেন—চলো।'

ওয়াঙ এগিয়ে যায় দেখে প্রহরী বিরক্ত হয়ে তাকে থামায়—'তুমি কি ? অত মানী মহিলার সামনে তুমি ঐ ঝুড়ি হাতে করে যাবে ? তাঁকে প্রণাম করবে কি করে শুনি ?'

'তা ঠিক—তা' ঠিক।' ওয়াঙ যেন উত্তেজনায় কাঁপে।

তবু ঝুড়িটা মাটিতে রেখে যেতে ইচ্ছা করে না পাছে কিছু চুরি হয়। তার মাথাতেই আসে না যে সংসারে সকলেই তার এক সের মাংস আর একটা মাছের লোভে বসে নেই। ওয়াঙের এই বিব্রততা লক্ষ্য করে ঘৃণায় সঙ্গে প্রহরী বলে—'এ বাড়ীতে ওরকম মাংস কুকুররা খায়।' ঝুড়িটা দরজার পাশে ফেলে রেখে ও ওয়াঙকে ঠেলে নিয়ে যায় সামনে।'

সরু এক ফালি অলিন্দ দিয়ে ওয়াঙ এগিয়ে যায়। ছোট ছোট অলঙ্কৃত থাম ছাত অবধি উঠে গিয়েছে। অলিন্দ পার হয়ে যে ঘরে

গিয়ে সে পৌঁছায় তেমন ঘর সে জীবনে দেখেনি। তার বাসার মত এক কুড়ি বাসা এঘরে কুলিয়ে যাবে। ঘরের দেয়াল ও ছাতের আলংকারিক সজ্জা দেখে ওয়াঙ এত অবাক হয় যে প্রহরী না ধরে ফেললে সে চৌকাঠের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেত।

'আমাদের বুড়ী-মার সামনে অমনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাবে বুঝলে?" লজ্জায় নিজেকে সামলে নিয়ে ওয়াঙ সামনে তাকিয়ে দেখে, ঘরের মধ্যিখানে উচ্চাসনে বসে আছেন এক জন অতি বৃদ্ধা মহিলা! তার ক্ষীণ দেহে ঝকঝকে মুক্তার মতসাটিনের আবরণ। পাশেই ছোট বাতির ধারে আফিমের পাইপ। ছোট ছোট তীক্ষ্ণ কালো চোখ দিয়ে মহিলা ওয়াঙকে লক্ষ্য করলেন। সেই লোল-চর্ম্ম শুষ্ক মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বাঁদরের চাউনির মতই। জানু পেতে বসে ওয়াঙ পাথরের মেঝেতে মাথা ঠুকে প্রণাম জানাল।

প্রহরীকে উদ্দেশ করে বৃদ্ধা বললেন—'তোল ওকে। এ সবের কোন প্রয়োজন নেই। মেয়েটির জন্যই কি ও এসেছে?'

হ্যাঁ বুড়ীমা।'

'নিজে কথা কইছে না কেন?'

এতক্ষণে ওয়াঙ মাথা তোলে। প্রহরীর দিকে ক্রোধ-দৃষ্টি হেনে সে বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করে বলে—'বৃদ্ধা মাতা—আমি অতি সাধারণ লোক। আপনার সম্মুখে কি কথা কইব জানি না।'

বৃদ্ধা যেন গভীর আত্মস্থতায় তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। পাশেই একটি ক্রীতদাসী আফিমের পাইপ ওঁর জন্যে প্রস্তুত করে অপেক্ষা করছিল—তিনি সেদিকে হাত বাড়ালেন। পাইপে হাত পড়তেই তিনি যেন সব কথা ভুলে গিয়ে লোভীর মত আফিমে মন দিলেন। মুখ যখন তুললেন চোখের সে তীক্ষ্ণতা চলে গিয়েছে—একটা আত্ম-বিস্মৃতির হালকা আবরণ পড়েছে চোখে। ওয়াঙ তেমনি নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ ফেরাতেই একবার তাকে যেন দেখতে পেলেন তিনি। হঠাৎ-জাগা রাগে চেঁচিয়ে বললেন—'এ লোকটা এখানে দাঁড়িয়ে কি করছে?' সব যেন ভুলে গিয়েছেন। স্থাণুর মত প্রহরী অপেক্ষা করে।

বিস্মিত হয়ে ওয়াঙ বলে—'আমি মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করছি, বৃদ্ধা মা।'

'মেয়ে—কোন্ মেয়ে?...' পাশের ক্রীতদাসী কানের কাছে ফিসফিস করে কি বলতেই তিনি যেন আত্মস্থ হোলেন। 'ও ভুলে গিয়েছিলাম। সামান্য ব্যাপার। তুমি এসেছ ও-লান ক্রীতদাসীর জন্য। মনে পড়েছে কে যেন চাষীর সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল। সে চাষী কি তুমিই?'

'আমিই।'

'ও-লানকে ডাক তাড়াতাড়ি।' এই বিরাট ঘরে শুধু আফিমের পাইপ হাতে নিয়ে তিনি যেন একলা থাকতে চান—এমনি দ্রুততার ভঙ্গ তাঁর কণ্ঠে।

আর একটি চাকরের হাত ধরে ও-লান এসে উপস্থিত হয়। ওয়াঙ একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মেয়েটিই। বুকের মধ্যে কেমন করে।

'এস এদিকে।' উদাসীন কণ্ঠে বৃদ্ধা ডাকেন তাকে—'এই লোকটি তোমায় নিতে এসেছে।' হাত দুটি জড়ো করে মাথা নামিয়ে ও-লান তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়।

'তুমি তৈরী।'

যেন প্রতিধ্বনি হয়—'তৈরী।'

পিছনে-ফেরা মেয়েটির গলার স্বর শুনে ওয়াঙ তার দিকে তাকায়। এ স্বরে ঔদ্ধত্য বা রুক্ষতা নেই। কেমন কোমল—নিখাদ স্বর। এত শান্ত? * [ক্রমশঃ

* পার্লবাকের অনুমতিক্রমে ঈগল পাবলিসার্সের সৌজন্যে

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীসজনীকান্ত দাস
নীলিমা দেবী
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী
"সম্বুদ্ধ"

১নং

বিচিত্র

ইণ্ডোবার্ম্মা থিয়েটারে কত রকম প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে তার ঠিক নেই। তার মধ্যে এক জন এমন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে যার কথা না বলে থাকা যায় না। তার ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভা চোখে পড়বেই! এই শিল্পীর নাম থিয়োডোর স্ক্যালি।

থিয়োডোর মার্কিণ সৈন্য দলভুক্ত এক জন কর্পোরাল। বার্ম্মায় প্রত্যেক সৈনিকদের মেসে সকলেই তাকে চিনত। কি রণাঙ্গনে, কি নৃত্যাঙ্গনে, কি যুদ্ধক্ষেত্রের আর্ত্তনাদে অথবা ক্লাব হাউস ও মেসের আনন্দধ্বনিতে সর্ব্বত্রই থিয়োডোরের নাম সকলের মুখে। থিয়োডোরকে আদর করে সকলে ডাকত 'টেড' বলে।

যখনই সময় পেত, টেড বসত তার কাগজ আর তুলি নিয়ে। যখন যা খুসী তাই রূপায়িত করে তুলত তার রেখায়। কোন নিয়ম, কোন বাঁধন মানত না।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটী নিয়ে টেড গেল নিজের দেশে। ছবি আঁকা তখনও চলছে। সেখানকার কলা-রসিকরা একটা প্রদর্শনী করলে। নাম দিলে শাশুড়ী-দিবস প্রদর্শনী। টেড সেই প্রদর্শনীতে

চিত্র

দিলে নিজের কয়েকটি ছবি—হাস্য এবং ব্যঙ্গরসের অদ্ভুত পরিচয়। তার কতকগুলো এইখানে দেওয়া হ'ল।

১নং ছবি টমাস গেন্সবরোর 'ব্লু বয়'।

২নং হল লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জগদ্বিখ্যাত ছবি 'মোনা লিসা'র টেডীয় সংস্করণ।

৩নং হল শিল্পী হুইসলারের 'মাদার' ছবি।

৪নং হল শিল্পী স্যার টমাস লরেন্সের 'পিঙ্কী'। আহা, বেচারা পিঙ্কি!—খামখেয়ালী টেডের হাতে পড়ে কি অবস্থা!

৫নং ডেগার 'দুই নর্ত্তকী'। টেডের হাতে পড়ে সুন্দরী নর্ত্তকীদের অবস্থাটা বড়ই করুণ হয়ে উঠেছে।

৬নং ছবি শিল্পী লুয়েজের "ওয়াশিংটনের দেলওয়ার নদী অতিক্রম" ছবির টেড কৃত কেরিকেচার।

হঠাৎ ঘোড়ার ওপর এত দরদ অথবা টান কেন? যুদ্ধে ঘোড়ার মাংস খেয়ে নয় ত'? যাই হোক, ঘোড়া মার্কা ছবিগুলো উপভোগ্য হয়েছে। দেখে রাগই হোক আর হাসিই পাক।

৪ নং

—উপন্যাস—

প্রতিভা বসু

৬

ছবি শেষ হলে যখন বাইরে এলাম আমি আর তাকাতে পারছিলাম না লজ্জায়। বুঝলাম, নিজের অসংবৃত আচরণে ও অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছে। কিন্তু এটুকুই কি আমাদের পরস্পরের কাছে চরম প্রকাশ নয়?

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে কতক্ষণ যে ঘুম এলো না, কতক্ষণ যে [illegible] হাতের স্পর্শ অনুভব করলুম জানি না—সমস্ত হৃদয়-মন যেন গানের সুরে ভ'রে গেল।

এর ঠিক দু'দিন পরেই এলো অভিলাষ। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আশঙ্কার উদ্বেগে ভরে গেল। সেই দিনই সন্ধেবেলা বাবা এলে ও বললো, 'দেখুন, আপনাদের এই সংস্কার সত্যি আমার ভালো লাগে না। হিন্দুবিবাহের কি কোনো মানে হয়? তাছাড়া অত দেরি আমি করতে পারবো না। চৈত্র মাস কী আবার—চৈত্র মাসেই আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করুন।'

আমার বাবা তাঁর ভাবী আই. সি. এস. জামাইয়ের ব্যগ্রতায় খুশিই হলেন বোধ হয়। আমি উপস্থিত ছিলাম সেখানে, লক্ষ্য করলাম আমার দিকে তিনি আড়চোখে তাকালেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, তোমার শাশুড়ি হাজার হোক মেয়েমানুষ তো—উনি কিছুতেই চান না যে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়—একটা মাত্রই তো মেয়ে—একটু ধুমধাম, আমোদ-আহ্লাদ—'

'ধুমধাম আমোদ-আহ্লাদ—ননসেন্স—আপনাদের যত ইয়ে। আমার বাবারও ঐ এক কথা। বেশ তো করুন গিয়ে ধুমধাম, কিন্তু চৈত্র মাসে বিয়েতে বাধাটা কী?'

'চৈত্র মাসে?'—এবার বাবার নিজেরই বোধহয় খটকা হল। একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'এতদিনই গেল যখন, তখন যাক না আর একটা মাস।'—ভয়ে ভয়ে তিনি তাকালেন অভিলাষের দিকে।

অভিলাষের লজ্জা বলে পদার্থ নেই, আই. সি. এস. হয়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—লঘুগুরু ভেদ ভুলে গেছে। রাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি একমাসও সবুর করতে রাজি নই সে-কথা কতবার বলবো। এর পর আপনাদের ইচ্ছা।'—উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রে সে সাহেবি কায়দায় পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

বাবা দুঃখিত হলেন ওর ব্যবহারে অথচ সেটা লুকোবার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রে বললেন, 'অভিলাষ যা বলে সেটা সত্যিই। আমাদের যত সব সংস্কার! এ'সব সংস্কার কি শিক্ষিত ছেলের ভালো লাগে?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। একটু পরে মা ঘরে ঢুকতেই বাবা আমাকে বাইরে যেতে বললেন। আমি বুঝলাম, চৈত্র মাসেই আমার ফাঁসির ব্যবস্থার পরামর্শ। আমি নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, অভিলাষ সাড়া পেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো—দাড়ি কামাচ্ছিলো, আধেক গালে সাবান আধেক গাল কামানো। কাছাকাছি এসে আমার হাতে ভয়ানক জোরে একটা চাপ দিয়ে বললো, 'আচ্ছা তুমিই বলো তো এ সমস্ত ব্যাপারে আমার মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব কিনা?'

'কী জানি, আমি কী ক'রে বলবো, আপাতত আমার হাতটা [illegible] দাও দয়া করে।'
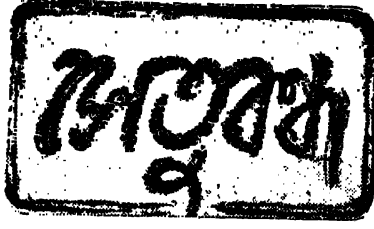
'গায়ে হাত না-দিয়ে ক কথা বলা যায় না?'

মুখে যথাসম্ভব মধুরতা ছড়িয়ে বললো, 'যায় বইকি—আমি কি তোমার বাবার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলি? কিন্তু তাঁর কন্যার বেলায় আলাদা ব্যবস্থা।'

'আশা করি সুযোগ পেলে অনেক বাবার অনেক কন্যার বেলায়ই এ-ব্যবস্থা খাটে?'

'তা হ'তে পারে—কিন্তু বর্তমানে একজন বাবার একমাত্র কন্যার গায়ে হাত দেবার আমার প্রচুর লোভ আছে।'

'বেশ তো! সে ব্যবস্থা তো হচ্ছেই—এখন আমাকে ছেড়ে দাও।'

'কী আশ্চর্য রুনি—আগে তো তুমি আমার উপর এতো নিষ্ঠুর ছিলে না।'

ফশ ক'রে ব'লে ফেললুম, 'আগে তুমি এতটা বদ্ ছিলে না।'

'রুনি!'

আমি আর জবাব না-দিয়ে গম্ভীরভাবে চ'লে গেলুম সেখান থেকে। সোজা ঘরে এসে বসতে-না-বসতেই দরজার বাইরে আবার অভিলাষের গলা শুনতে পেলাম, 'ভিতরে আসবো?'

আমি বিরক্ত হয়ে জবাব দিলুম, 'না।'

কিন্তু অভিলাষ সে-কথা শুনলো না, পরদা সরিয়ে ভিতরে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, 'রুনি, কেন তুমি আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করো? যা খুশি তাই বলো? অসম্মান অবহেলা কী তুমি করো না বলো তো?'

বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢোকবার অপরাধ ভুলে গেলুম ওর কোমল কথায়। আমরা মেয়েরা এত সেন্টিমেন্টাল আর এত বিশ্বাস করতে ভালোবাসি ব'লেই পুরুষেরা আমাদের অত ভুলিয়ে বেড়ায়। নিজের নিষ্ঠুরতায় কষ্ট হলো। মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'অভিলাষ, তুমি আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু,—তোমাকে দুঃখ দিতে আমারও কি ভালো লাগে? কিন্তু তুমি সত্যি বড়ো বাড়াবাড়ি করো।'

'কী বাড়াবাড়ি করি।'

'কী কর তার তালিকা দেয়া হয়তো কঠিন, কিন্তু তোমার ভাব-স্বভাবই আমার ভালো লাগে না।—বলতে পারো আমার মাকে তুমি ও-রকম একটা চিঠি লিখেছিলে কেন? এটা কি তোমার উচিত হয়েছে?'

'উচিত অনুচিত জানিনে—আমার মতে তোমাকে স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনে রাখাই এখন কর্তব্য। তুমি পথভ্রষ্ট হচ্ছো। শয়তান তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'তোমার মুণ্ডু—' রেগে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, স্পষ্ট ক'রে বলাই ভালো অভিলাষ, বিয়ে আমি তোমাকে কখনোই করবো না—কেটে ফেললেও না।'—

'নিশ্চয়ই করবে।' রুখে উঠলো অভিলাষ।

'জোর করবে—মারবে—না মুখে কাপড় বেঁধে বিবাহ-সভায় বসাবে। আমি কচি খুকি নই, অভিলাষ—তোমার মতো লোককে আমি চিনতে পারি।'

পাও কিনা—একমাসের মধ্যে যদি তোমাকে আমি বিয়ে না করি তো আমার নাম অভিলাষ দত্ত নয়, এই আমি তোমাকে ব'লে গেলুম।'—রাগে গরগর করতে-করতে ও বেরিয়ে গেলো।

আমি কী করি। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম কী করি।

খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, পাগলের মতো আমি উপায় ঠাওরাতে লাগলাম কী উপায়ে ওর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অভিলাষ তিন দিন থেকে চ'লে গেলো, কিন্তু আমার ভাবনা ঘুচলো না। আমি জানি এঁরা চৈত্র মাসেই আমার বিয়ে দেবেন। অভিলাষ যখন জেদ্ ধরেছে আমার বাবা তা নিশ্চয়ই পূরণ করবেন। বামুনদের শাস্ত্র ব্যুর করতে আর দেরি লাগবে না। আশ্চর্য এই—আমার যে এমন অবস্থা—খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না, ভাতে হাত দিলেই বমি আসতে চায়, এ জন্ম আমার মা বাবা একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না কী হয়েছে। চেহারার যা হাল হ'লো তা আয়নায় দেখে নিজেই শিহরিত হ'য়ে উঠলুম। এ-যন্ত্রণা আর সইতে না-পেরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম 'মা, আমাকে কি তোমরা সত্যই অভিলাষের সঙ্গে বিয়ে দেবে?'

মার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠলো, গম্ভীরমুখে বললেন, 'তোমার কী ইচ্ছে?'

'কক্ষনো না! মা, কক্ষনো না—তোমার পায়ে পড়ি মা, ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। তোমরা জানো না ও দস্যু, ওএকটা বদমাস।'

'ন্যাকামি কোরো না রুনি, এখান থেকে যাও। আমরা জানি ও বদমাস নয়—তা হ'লে ও তোমাকে বিয়ে করতো না—আর ও যদি বদ হয় তবে তুমিই বা আমার পেটের সন্তান হয়ে নির্দোষ হ'লে না কেন? তুমি ভেবো না এই ঘটনা আমার পক্ষে কম দুঃখের হয়েছে।'

'কী বলছ মা তুমি? যদি এই বিবাহ তোমার পক্ষে আনন্দের না হবে তবে কেন আমাকে হত্যা করবার এই অপরূপ ব্যবস্থা করেছো?'

'বিবাহে আমার অমত আছে তা তো আমি বলিনি। খুব মত আছে, যথেষ্ট ইচ্ছা আছে কিন্তু—তোমার প্রবৃত্তিতে আমি কষ্ট পেয়েছি। আমি আশা করিনি আমার সন্তান একাজ করতে পারে।'

'খুলে বলো মা কী হয়েছে—কী আমি করেছি।' মা চুপ ক'রে রইলেন. একটু পরে বললেন, 'চৈত্র মাসেই তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। এর মধ্যে শরীরটা একটু চেষ্টা ক'রে অন্তত সারিয়ে নাও—লোকের কাছে কেলেংকারি করে লাভ কী।'

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে রইলাম—বুঝতে পারলাম না মা কী বলতে চান। মার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ আমাকে ভাবিয়ে তুললো। অভিলাষের এ কোন নতুন ফন্দি, কী বিষ সে ঢেলে গেলো কে জানে।

চুপচাপ উঠে এলাম। মনটা বড়ো অস্থির বোধ করতে লাগলাম। ওর কাছে কি একবার যাওয়া যায় না? অভিলাষের হাত থেকে ও কি আমাকে মুক্তি দিতে পারে না?

আমি ছটফট করতে লাগলাম আমার ঘরে। রাত বেশি হয়নি, —বাবা গেছেন ব্রিজের আড্ডায়—জানলা দিয়ে দেখলাম মার ঘরে নীল আলো জলছে—আমি আমার ঘরের দরজা ভেজিয়ে অতি সন্তর্পণে নিচে নেমে এলাম—এবং একান্ত অনভ্যস্ত পায়ে রাস্তায় যখন দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমার হুঁশ হ'লো এটা ভালো হ'লো না—এই রাত ক'রে আবার আমি কেমন ক'রে ফিরে যাবো। কিন্তু মনের বাষ্প আমাকে আমার অবচেতনেই এখানে উড়িয়ে এনে ফেলেছে।

দোকানে ঢুকতেই চোখাচোখি হ'লো—দোকান ভর্তি লোকজন—কেনা-কাটা চলছে, আমি যেতেই সকলের একটা সন্ত্রস্ত ভাব এলো। আমি সেখানে দাঁড়াতেই ও উঠে এলো এবং আমাকে নিয়ে বাইরে আসতে-আসতে বললো, 'আমাদের অন্দরের আর-একটা দরজা আছে—চলুন সেখান দিয়ে যাই।'

আমার মন অত্যন্ত অস্থির ছিল, তবুও আমি হেসে ওকে বললুম, 'আমি এসেছি জিনিশ কিনতে, অন্দরের দরজা দিয়ে ঢুকলে কি আমার সুবিধে হবে?'

মৃদু হেসে ও বললো 'আমার তো তাই মনে হয়।'

'মোটেও না।'

'দেখাই যাক—অতি মন্থর গতিতে ও পা চালালো। পাশ দিয়েই দরজা, কিন্তু আমি বুঝলাম ঐ দরজায় পৌঁছতে ওর অনেক সময় লাগবে। 'আমি একটা দরকারে এসেছি' আমি বললুম।

'এতদিন কি সমস্ত দরকার চুকে গিয়েছিলো?'

'এতদিন! এতদিন কোথায়—সাত আট দিন তো মোটে আসিনি—'

'সাত-আট মিনিটেরও যেটা পথ নয়, সেখানে কি সাত-আট দিনেরও অনুপস্থিতি সুখের হয়?'

'না, সে-কথা বললে নিতান্তই সত্যের অপলাপ করা হবে—তবে আর এক জন মানুষের সুবিধেও তো আমার দেখা দরকার।'

'সে মানুষটি কে? আমি না অভিলাষ?

আমি চকিতে মুখের দিকে তাকালুম, তখুনি সামলে নিয়ে বললুম 'এখানে আর তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই—এ কেবল আমার আর আপনার কথাই হচ্ছে।'

'আমার মতো অভাজনের অদৃষ্টেও তাহ'লে শিকে ছেঁড়ে মাঝে-মাঝে, কী বলেন।'

'কী ফাজলেমি করছেন—আমার মন আজ অত্যন্ত বিচলিত।'

'কেন বলুন তো?

বলতে আমার মুখে আটকালো—একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, এমন যদি কখনো হয় যে আমাকে বাঁচাবার জন্য আমি আপনার শরণাপন্ন হই—আর তার মধ্যে যথেষ্ট বিপদ থাকার সম্ভাবনা থাকে—তাহ'লেও কি আপনি আমাকে রক্ষা করবেন?'

'সে তো ভারি মুশকিল—আমি কি ডাক্তারি শাস্ত্র জানি যে বাঁচাতে পারবো।'

এবার আমি রাগ করলাম। বোঝেনি নাকি? সমস্ত বুঝেছে।

'চুপ করলেন যে?'

'কী করবো?

'আমাকে আদেশ করুন।'

আমি দুঃখিত হয়ে বললাম, 'আপনি আমার বিপদ সমস্তই জানেন—অভিলাষ নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলো।'

'তা তো করেছিলো, কিন্তু তাতে বিপদটা কী, তা কিন্তু আমি জানি না।'

গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'হ্যাঁ—আর পনেরো দিন বাকি আছে আপনাদের বিবাহের।'

'পনেরো দিন?'

'কেন, এ-কথা সত্য নয়?'

'হয়তো সত্য, আমি জানিনে। আমার বিয়ের কর্তা তো আমি নই।'

'ও।'

'আপনি কি এতদিনেও বুঝলেন না এ-বিবাহে আমার সম্মতি নেই?'

'বুঝেছি।'

'আমি সে-কথাই বলছিলাম—আমাকে রক্ষা করুন আপনি—যে ক'রে হোক আমাকে রক্ষা করুন।'

ও হেসে বললো, 'কী আশ্চর্য! এ-কথা আপনার বাপ-মাকে বলুন—তা হ'লেই তো চুকে যায়।

'চুকে যায়—? আপনি কি ভুলে যান যে অভিলাষ আই. সি. এস? ওরা হবেন আই. সি. এসের শ্বশুর-শাশুড়ি, ওঁদের টাকা আছে, সমাজে ওঁদের মান কত। সে-মান কি ওরা বজায় রাখবেন না? আজ যদি এ জামাই ফস্‌কায়—তবে যোগ্য পাত্রের জন্য আবার কত অপেক্ষা করতে হবে তা কি জানেন?'

'তাই ব'লে আপনার অমতে হবে?'

'নিশ্চয়ই—আমি কী বুঝি—আমার আবার সুখ দুঃখ কী'—বলতে-বলতে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

ও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললো, 'তুমি কি সত্য বলছ? সত্যি তুমি আসবে আমার মতো দরিদ্রের গৃহে?'

'বিয়ে?—' আমি যেন চমকে উঠলাম। কত আমার বুদ্ধি কম, কী ছেলেমানুষ আমি! আমি তো এ-কথাটাই ভাবিনি যে তার পক্ষে আমাকে অভিলাষের হাত থেকে বাঁচানো মানেই বিয়ে করা—এ ছাড়া সে কী করতে পারে?

আমি আগাগোড়াই ভেবেছি, সে সব পারবে—অভিলাষের কবল থেকে অনায়াসে আমাকে রক্ষা করতে পারবে কিন্তু সেটা যে একমাত্র বিবাহের দ্বারাই—হতে পারে এ কথাটা এর আগে আমার মাথায় আসেনি—লজ্জায় লাল হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে বললাম, 'এ-কথা তো আমি ভাবিনি।'

গম্ভীর হয়ে বললো, 'তাহ'লে কী ভেবেছেন?'

'কী ভেবেছি আমি জানি না, আমাকে ক্ষমা করুন।'

ওর মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো, বললো, 'ক্ষমা আবার করবো কী জন্য—কী করেছেন আপনি? তবে আপনার ভালোর জন্যই বলছি, এ দেশটা এখনো তো এমন দেশ হয়ে ওঠেনি যাতে বিবাহ না-ক'রেও নির্বিঘ্ন সময়ে বা লুকিয়ে ছাপিয়ে দেখাশোনা করলে কথা হবে না, কাজেই মন যদ্দিন আপনার স্থির না হয় তদ্দিন আপনি বরং আর আমাকে দেখা না দিলেন। আমি বলি, অভিলাষকেই বিয়ে করুন—অনেক ওদের অর্থ—অর্থেই আপনার জীবন অভ্যস্ত, বিয়ের পরে দেখবেন—অন্য দুঃখ আর দুঃখ নেই—টাকাই সুখ টাকাই শান্তি। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

আমার মাথায় যদি একটা বজ্রপাত হ'তো, তবুও বোধহয় হঠাৎ এমন জড়পদার্থে পরিণত হ'য়ে যেতে পারতাম না—আমার হাত

বাড়ি ঢোকবার দরজার মুখে দাঁড়িয়েই আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম—আমি দরজায় ঠেশ দিয়ে নিজের ভার সামলালুম। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে বললুম, 'তাহলে তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে?'

'আমি নগণ্য, আমি দরিদ্র—' বলতে-বলতে ওর গলা ভেঙে গেলো। আমি অধীর আগ্রহে ওর হাত দুটো চেপে ধ'রে বললাম 'তুমি মহৎ, তুমি রাজা—আমার মতো একটা মানুষকে তুমি আশ্রয় দেবে না? আমাকে ভুল বুঝে ঠেলে দেবে?'

হঠাৎ ওর মা-র ডাক শুনে দু'জনেই এক সঙ্গে চমকে উঠলাম—'তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি' ব'লে ও দ্রুতপদে চ'লে গেলো ভিতরে, একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললো, 'চলো।'

যেতে-যেতে ও বললো, 'কাল কি একবার আসতে পারো না?'

'কী ক'রে বলবো? আজ যখন আমি এলাম তখন আমার মধ্যে আমি ছিলাম না, তাহ'লে কি আসতে পারতাম? ফিরে গিয়ে কোন তোপের মুখে পড়বো কে জানে!'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার কথা ছিলো।'

'কথা আমারও আছে! কিন্তু আজকের জল কোথায় গড়াবে তা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কাছে স'রে এসে আমার পিঠে হাত রেখে বললো, 'কিছু ভেবো না তুমি—কী ওদের সাধ্য তোমাকে কষ্ট দেবে। আমি কাল গিয়ে রেজিষ্ট্রি আপিসে খোঁজ খবর-নিয়ে আসবো—পশু যাবো তোমার বাবার কাছে।'

আমি আর্তস্বরে ব'লে উঠলাম 'বাবার কাছে! বাবার কাছে কেন?'

'যাবো না? তাঁকে তো জানাতে হবে?'

'অসম্ভব—আপনি কি অপমানিত না-হ'য়ে ছাড়বেন না?'

'অপমান আবার কী? তোমাকে চাইতে যাবো—এর তুল্য সম্মান আমার জীবনে আর আছে নাকি?'

'বাবা অমনি ইচ্ছা পূরণ করবেন এই কি আপনি ভাবেন?'

'আরে না না—তোমার বাবা যে সে পাত্র নন, তা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু একেবারে না-জানিয়েও তো হ'তে পারে না। আমি বলবো, ওঁরা যদি রাজি হন ভালো, নয়তো পৃথ্বীরাজের মতো তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে আসবো আমার ক্ষুদ্র কুটিরে। কিন্তু রানির মন সেখানে টিকবে তো?'

আমি সে ঠাট্টার জবাব দিলাম না—মনটা কেমন খারাপ লাগতে লাগলো।

'চুপ ক'রে রইলে যে?'

'কী বলবো?'

'বলবার কি কিছুই নেই?'

'অনেক আছে—এত আছে যে সমস্ত জীবন ধ'রে সমস্ত দিন-রাত ভ'রে বললেও তা শেষ হবে না—আপনি কি বোঝেন না কিছু? কিন্তু এ বুদ্ধিটা আমার ভালো লাগছে না।'

'শোনো, তোমাকে প্রথমেই দুটো কথা ব'লে নিই, তার পর এর জবাব দেবো—প্রথম হচ্ছে তুমি আমাকে আপনি বলছো কেন? আমি কি তোমার আপনি? আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—তুমি তো সত্যিই রানি—তোমার মতো মেয়ে যদি রানি না হয় তবে আর কে হবে।

বলতে ইচ্ছে করে—কাজেই তোমাকে রুনি বলতে আমি পারবো না। তারপর শোনো—আমি যদি তোমার বাবার কাছে এ-বিষয়ে না ব'লে লুকিয়ে গিয়ে বিয়ে করি সেটা আমার পক্ষে মর্মান্তিক হবে।—আমি আনবো তোমাকে জয় ক'রে—আমার আপন অধিকারে আমি তোমাকে কেড়ে আনবো, লুকিয়ে নয়। আচ্ছা রানি, আমাকে কি তুমি এতই কাপুরুষ ভাবো ?'

ওর কথা শুনতে শুনতে আমার হৃদয় লঘু হ'য়ে এলো—জোর পেলাম মনে—ভাবলাম ভয় কী, দুঃখ কী—আমরা জয়ী হবো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ও থমকে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি এখান থেকেই ফিরে যাই'—হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে—আমি সে হাত নিজের মুঠোর মধ্যে একবার নিয়েই ছেড়ে দিলুম।

বাড়িতে ঢুকলাম সন্তর্পণে,—থম্‌থম্ করছে বাড়ি-ঘর—হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখলুম ন'টা। আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠেই মার মুখোমুখি পড়ে থতমত খেয়ে গেলুম। গম্ভীর মুখে মা বললেন, 'গিয়েছিলে কোথায় ?'

পরিষ্কার জবাব দিলুম 'মনোহারি দোকানে।'

'কেন ?'

'দরকার ছিলো।'

'কী দরকার জানতে পারি কি ?'

উদ্ধতভাবে বললুম 'নিশ্চয়ই।'

'রুনি ?'

'শোনো তবে শেষ কথা—অভিলাষকে আমি কক্ষনো বিয়ে করবো না—জোর কোরো না তোমরা—যদি করো, আমি আর এক দণ্ড এ-বাড়িতে থাকবো না।'

'যাবে কোন চুলোয়—দোকানির কাছে ?'

এ-কথা বলবার সময় মার অমন সুন্দর মুখ কী যে কুৎসিত দেখালো তা আমি বলতে পারবো না। আহত হয়ে বললাম 'মা, তোমার স্বামী বড়োলোক হতে পারেন——তোমার বাবা তো মা, দরিদ্র ছিলেন ? তোমার মেয়ের বেলায় না-হয় তার উল্টোটা হোক্।'

মা চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি পাশ কাটিয়ে ঘরে চ'লে গেলাম।

ঘরে ফিরে ইজিচেয়ারে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লাম—সঙ্গে-সঙ্গে ক্লান্তিতে সমস্ত চোখ ছেয়ে ঘুম এলো। সে-রাত্রে কেউ আমাকে খেতে ডাকলো না—বিরক্ত করলো না। ঘুম ভাঙলো প্রায় শেষ রাত্রে—সারা রাত প'ড়ে ছিলাম ইজিচেয়ারে, আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বিছানায় এসেছিলাম, হঠাৎ মার ঘরে মৃদু কথোপকথনে কান খাড়া হ'য়ে উঠলো। একেবারে জানালার পাশে গিয়ে—কান পাততেই শুনলাম মার কথা, কী হয় গরীব হ'লে ? আমার বাবা গরিব ছিলেন, তাই ব'লে আমার মা তো অসুখী ছিলেন না। বিয়েতে যখন ওর এত আপত্তি তখন কেনই বা আমাদের জোর করা—দ্যাখো, এ মেয়ে ভাঙবে তো মচকাবে না, অনর্থক—'

'চুপ করো তুমি'—বাবা চাপা গর্জনে মাকে ধমকে উঠলেন, 'লজ্জা করে না স্ত্রীলোক হয়ে এই পাপের প্রশ্রয় দিতে ? তোমার মুখ থেকে যদি মেয়ের স্বপক্ষে আর-একটি কথা বেরোয় জেনে রেখো তাতে মা-মেয়ে কারুরই ভালো হবে না। কেন ও অভিলাষকে বিয়ে করবে না ? কী করেছে অভিলাষ ?—ঐ বদমাসের দোকান আমি উঠিয়ে ছাড়বো। ঐ জাতিতেই লাই ওকে অধঃপতনের পথে এমন ক'রে [illegible]

এর বেশি শোনবার আমার দরকার হল না—স্খলিত পায়ে বিছানায় এসে ভেঙে পড়লাম।

পরের দিন যে কী ভাবে কেটেছিল তা আর ভাবতে পারিনে এখন। সকাল থেকে চেষ্টা করতে লাগলাম—একবার কোনো রকমে পালাতে পারি কিনা—মন আকুল হ'য়ে উঠলো ওর জন্য।

হায় হায়—কেন এই বিপদে ফেললাম ওকে। হোক আমার বিয়ে—যাক জীবন তিলে-তিলে ক্ষ'য়ে কিন্তু হে ভগবান, ওকে তুমি দয়া করো, দয়া করো। বিকেলবেলা মা এলেন ঘরে, বললেন, 'শুয়ে আছিস্ এখনো ? উঠে আয়—আয় মা, আয়।' মা সস্নেহে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার কিছু করবার পথ তো তুই রাখিসনি, রুনি—নিজের পায়েই তুই নিজে কুড়ুল দিলি। এখন যদি বিয়ে না করিস্ স্ত্রীলোকের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো কলঙ্ক আর কী হ'তে পারে বলতে পারিস্ আমাকে ?'

মার কথার ধরনে আমি চমকে উঠলুম এবং মুহূর্তে মধ্যে আমার বুকের মধ্যে বিদ্যুতের মতো যে-কথা খেলে গেলো তাতে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চাইলো। এরা কী ভেবেছে ? কী ভেবেছে এরা—আমার কান গরম হ'য়ে উঠলো—মুখ তুলে কথা বলতে চেষ্টা করলাম মার সঙ্গে, বন্ধ হ'য়ে এলো গলা। মা আমাকে কথা বলবার অবসর দিলেন না—বাবার ডাকে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি অধীর আগ্রহে আবার মার সঙ্গে দেখা হবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু মার দেখা পেলাম না—সন্ধের পরে যিনি ঘরে এলেন তাঁকে দেখে আমার মনের অবস্থা এমন হ'লো যে স্বয়ং যম দেখেও মানুষ এমন ভয়ে আঁৎকে ওঠে না।

অভিলাষকে নিয়ে বাবাই এ-ঘরে এসেছিলেন—আমাকে বললেন, 'রুনি'—অভি তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।' এই ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং ব'লে গেলেন 'এক্ষুনি আসছি।' বলাই বাহুল্য, অভিলাষই প্রথম কথা বললো, 'তুমি বোধ হয় জানো না যে কাল সকালেই আমাদের রেজিষ্ট্রেশন হবে। আমি তোমার বাবার টেলিগ্রাম পেয়েই চ'লে এসেছি।'

আমি কথা বললাম না।

'তোমার কি বলবার কিছু আছে ?'

'না।'

'তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে ?'

'না।'

'অমন চেহারা হয়েছে কেন ?'

'জানি না।'

'আমার সঙ্গে বাক্যালাপেও রুচি নেই দেখছি।'

আমি এবার বললাম 'আর কোনো কথা আছে ?'

'আছে বই কি—শুনছে কে।'

'তবে আর ব'সে থাকা কেন !'

'বাঃ, সুন্দর জিনিষ দেখতে ইচ্ছে করে না ?'

আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু দরজার ধারে যেতেই ও আমার আঁচল টেনে ধরলো এবং ধরবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি চীৎকার ক'রে প'ড়ে গেলাম মেঝের উপর।

শব্দ পেয়ে মা ছুটে এলেন, চাকররা এলো। আমার মা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অভিলাষের দিকে তাকিয়ে আমাকে বুকে ক'রে তুলে [illegible]

দিলেন বিছানায়। তারপর মাথায় হাওয়া করতে লাগলেন। অনেক দিন পরে মার সস্নেহ স্পর্শ পেয়ে আকুল হ'য়ে আমি কাঁদতে লাগলাম তাঁর কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অভিলাষ অপরাধীর মতো বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। মা উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। একটু পরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'একটা সত্যি কথা বলবি মা একটুও লজ্জা করিসনে, লুকোসনে—মনে রাখিস আমি তোর মা—আমিই সংসারে একমাত্র তোর সুখ-দুঃখের ভাগী।' আমি উৎসুক দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মা বললেন, 'সত্যি ক'রে বল তো কদ্দিন হয়েছে।'

'কী কদ্দিন হয়েছে, মা ?'

'রুনি, আমাকে লুকোসনে,—আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি। তোর চোখের নিচে কালি—তোর শরীর খারাপ—খেতে পারিস না—আমিও সন্তানের মা—আমাকে কি ফাঁকি দিতে পারবি ?'

'মা !' আমি তীব্রস্বরে ব'লে উঠলাম, 'তুমি আমার মা হ'য়ে আমাকে এত বড়ো অপমান করতে পারলে !'

স্খলিত কণ্ঠে মা বল্লেন, 'অপমান ? এ কি তবে মিথ্যে কথা ?'

আমি উত্তেজনায় বিছানা থেকে উঠে বসলাম, সজোরে মার হাত মুচড়ে দিতে-দিতে বসতে লাগলাম, 'এত বড়ো অপমান কেন করলে ? কেন তুমি এত বড়ো অপমান করলে আমাকে।' মা হতভম্বের মতো তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তবে যে অভিলাষ বলছিলো ?'

'বলেছিলো অভিলাষ ?

'হ্যাঁ, বলেছে—'

'বলো মা, খুলে বলো। সব খুলে বলো। শয়তান, শয়তান। ওর গলা টিপে মারবো আমি—কেটে ওকে দু'টুকরো করবো।'

মা বললেন, এর আগের বার যাবার আগেই—ও আমাকে চুপি-চুপি ডেকে নিয়ে—প্রথমেই পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইলো, তার পর বললো, চৈত্র মাসেই বিয়ে না হলে লজ্জায় পড়তে হবে।'

আমি মার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম—'বোলো না, মা, আর বোলো না—মা হ'য়ে তুমি এ কথা বিশ্বাস করলে ? একবার জিজ্ঞাসা করলে না আমাকে ? আমাকে তোমার এত অবিশ্বাস ? এত অবহেলা ?'

আমি আচ্ছন্নের মতো শুয়ে পড়লাম। দুঃখে, ক্ষোভে উত্তেজনায় মনে হ'ল আমি এখনি হার্টফেল ক'রে ম'রে যাব।

অনেকক্ষণ পরে মা আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন। অপরাধীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি ভুল করেছিলাম, মানুষ যে এত নীচ হ'তে পারে তাও আমার জানা ছিলো না—এ কয় দিন আমার মনের উপরও কম যায়নি, রুনি। তুই ঠিকই বলেছিলি—গরিব বাপের মেয়ে আমি—আর সত্যি বলতে আমার বাবার হাতে প'ড়ে আমার মা যত সুখী ছিলেন আমি তার অর্ধেক সুখীও প্রথম জীবনে হইনি। তুই হলি আর সংসারে নামলো শান্তির ধারা, তোর বাবা শুধরে গেলেন। আমার বুক ভ'রে গেলো তোর স্নেহে।'

মার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। একটু পরে বললেন 'রুনি, আমি কক্ষনো অভিলাষের হাতে তোকে দেব না—ওর আরেকটা ঘটনাও দু'একদিন আগে শুনলাম—ও সত্যিই লম্পট—তোর বাবা বলেন পুরুষের নৈতিক দোষ দোষ নয়—কিন্তু আমি জানি স্বামীর চরিত্রে এ খুঁত স্ত্রীলোকের জীবনকে সবচেয়ে বেশি বিষময় ক'রে তোলে। এ নিয়ে তোর বাবার সঙ্গে আমি ঝগড়া করি না, কেননা এখানেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ ছিল এক সময়ে।

'এতদিন আমি অভিলাষকে সত্যিই ভালো ব'লে জানতাম—কিন্তু সেদিনের পর থেকে আমার মন কেমন বিমুখ হ'য়ে গেলো। তোর উপরও কম অভিমান হয়নি!—যখন বললি বিয়ে করবি না তখন যেন আমার তোকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছিলো।

একদমে মা অনেক কথা ব'লে হাঁপাতে লাগলেন। আমি নিঃশব্দে প'ড়ে রইলাম মুখ গুঁজে।

রাত্রে সকলেই একসঙ্গে খেতে বসলাম। খেতে-খেতে হঠাৎ মা বললেন, 'অভিলাষ, কিছু মনে কোরো না বাবা, আমার ইচ্ছে নয় রুনির সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়।'

বাবা আকাশ থেকে পড়লেন, হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন মার দিকে।

অভিলাষের মুখ পাংশু হ'য়ে গেলো।

বলা বাহুল্য, এর পরে অতিশয় নিঃশব্দে আমাদের খাওয়া-দাওয়া সারা হ'ল। খেয়ে উঠে অভিলাষ বলল 'আজ রাত্রিটা এখানে থাকলে আশা করি আপনাদের আপত্তি হবে না।'

বাবা মার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'অবশ্যই থাকবে, তোমার সঙ্গে আমার তো কোনো কথা হয়নি। এ-বাড়িতে প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত আমার বশ—আমি ছাড়া এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই যে আমার হয়ে কোনো কথা বললে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তা মেনে নেবে।'—বাবা রাগে গরগর করতে-করতে অভিলাষের হাত ধ'রে তাকে উপরে নিয়ে গেলেন।

আমি আর মা কিছুক্ষণ ব'সে রইলাম চুপ ক'রে, তারপর মা নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'রুনি, তোর বাবা এবার স্বমূর্তি ধরেছেন—তিনি যে একটা হেস্তনেস্ত না-ক'রে ছাড়বেন তা আমার মনে হয় না। ভাবিস্‌নে তুই—আমার জীবন থাকতে আমি ঐ অপদার্থের হাতে তোকে তুলে দেবো না।'

আমি নিঃশব্দেই ব'সে রইলাম।

[ক্রমশঃ

হীনমন্যতা

চিত্রগুপ্ত

• ২

এমনিতে সমাজের প্রতি যে-মানুষের মনোভাবটি অনুকূল ভাবেই গ'ড়ে উঠতে পারতো, হীনমন্যতার (Inferiority complex) চাপে প'ড়ে সেই মানুষেরই মনোভাবটা কী রকম সমাজ-বিরোধী হ'য়ে উঠতে পারে তা ভালো ক'রে বোঝবার জন্ম দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাক্।

এটি একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ের কাহিনী। অবশ্য মেয়েটি এদেশীয়া নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের একটি মেয়ে সে। মেয়েটি যে-পরিবারে জন্মেছিলো, সততার জন্যে সে-পরিবারটির যথেষ্ট সুনাম ছিল। মেয়েটির বাবা যত দিন সুস্থ সবল ছিলেন—তত দিন তিনি কঠোর পরিশ্রমে অর্থার্জ্জন ক'রে সংসার প্রতিপালন করতেন। কিন্তু শেষে এক দিন তিনি অসুখে পড়ে অক্ষম হ'য়ে গেলেন। মেয়েটির মাও ছিলেন খুব সাধুপ্রকৃতির মানুষ। ছেলেমেয়েদের শুভাশুভ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না।

এঁদের সব শুদ্ধ ছ'টি সন্তান হয়েছিলো। তার মধ্যে বড় মেয়েটি ছিল সবার সেরা। কিন্তু বেচারা বারো বছর বয়সেই মারা যায়। মেজো মেয়েটির স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিল না বটে, তবে সে কোনো রকমে সেরে উঠে সংসার প্রতিপালনের ভার নিলে। তার পরের সন্তানটি অর্থাৎ সেজো মেয়েটির কাহিনীই এখানে আমাদের আলোচ্য। প্রকৃত নাম গোপন রেখে মেয়েটির নাম দেওয়া যাক্—লিলি।

লিলির স্বাস্থ্যটা বরাবরই ছিল অতি চমৎকার। এদের মা রুগ্ন দুটি মেয়ে এবং পীড়িত স্বামীকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে এই স্বাস্থ্যবতী সেজো মেয়েটির দিকে তেমন মনোযোগ দেবার বিশেষ সুবিধে পেতেন না।

লিলির একটি ছোট ভাই ছিল। আর সব দিকে খুব ভালো হ'লেও এ ছেলেটিও ছিল রুগ্ন। তাই লিলি দেখ্‌তো যে তার ঐ রুগ্ন ভাইবোনগুলোর জ্বালায় তাদের সংসারে একমাত্র সে-ই যেন অনাদরে উপেক্ষায় পিষে মরচে। অথচ গুণপনার দিক্ দিয়ে সে তো কারো চেয়ে এতটুকু কম যায় না! ক্রমে তার ধারণা হোলো যে বাড়ীতে বেছে বেছে তারই কোনো আদর নেই। এমন কি, এ নিয়ে সে অনুযোগ অভিযোগ করতেও ছাড়তো না।

এদিকে স্কুলে কিন্তু লিলির সুনাম ছিল। সে ছিল ক্লাসের সেরা মেয়ে। পড়াশুনোয় তার 'ধার' দেখে ঐ স্কুলে তার পড়া যখন সাঙ্গ হোলো তখন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তার লেখাপড়া বন্ধ না ক'রে তাকে আরও বেশী পড়বার সুযোগ দেবার জন্যে সুপারিশ ক'রলেন। ফলে সাড়ে তেরো বছর বয়েসে লিলি হাই স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হোলো।

হাই স্কুলের নতুন শিক্ষয়িত্রী কিন্তু লিলিকে তেমন সুনজরে দেখলেন না। প্রথমটা হয়তো লিলি নিজেই পড়াশুনোয় তেমন সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু শেষটা দাঁড়ালো এই যে আদর এবং উৎসাহের অভাবে লিলির পড়াশুনো ক্রমশঃই বেশী খারাপ হ'তে লাগলো।

আগেকার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আদর সে যত দিন পেয়েছিলো তত দিন তার মধ্যে কোনো 'খুঁত' ছিল না। তত দিন সে স্কুলে রিপোর্টও যেমন ভালো পেতো সহপাঠিনীদের কাছ থেকে সমাদরও তেমনি পেতো যথেষ্ট।

তবে সহপাঠিনীদের প্রতি তার নিজের আচরণটা কিন্তু প্রশংসনীয় ছিল না। সর্ব্বদাই সে বান্ধবীদের সমালোচনা করতো। তাছাড়া, তাদের ওপর প্রভুত্ব করবার একটা স্পৃহাও তার আচরণের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠত। তার মনোভাবটা ছিল এই রকম, যে, সকলের মধ্যে এক-মাত্র তাকে কেন্দ্র ক'রেই বর্ষিত হ'তে থাকুক সকলের উচ্ছ্বসিত স্তুতি-বাদ—কিন্তু সমালোচনা কেউ যেন ভুলেও কখনো তার না করে!

এ পর্য্যন্ত লিলির সম্বন্ধে যেটুকু বলা হলো তা'থেকে এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জীবনে তার লক্ষ্য ছিল সকলের অবিমিশ্র সমাদর পাবার। সে চাইতো শুধু তার ওপরেই থাক সকলের বিশেষ পক্ষপাত; তার সুখ-সুবিধের দিকে সকলের থাকুক অখণ্ড মনোযোগ; এক কথায় সকলেই প্রাণপণে করতে থাকুক শুধু তারই 'খিদ্‌মৎগারী।'

এদিকে বাড়ীর যা হাল, তাতে সেখান থেকে এদিক্ দিয়ে বিশেষ সুবিধের আশা ছিল না। কাজেই তার এ-মনোভাবের প্রশ্রয়ের সম্ভাবনা যেটুকু—তা' ছিল কেবল তার স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নতুন স্কুলে ঢোকবার পর ঐখানেই বাধ্‌লো যত গোল। এখানে এসে আর সমাদর পাওয়াটা তার ভাগ্যে ঘ'টে উঠ্‌লো না। শিক্ষয়িত্রী তাকে বেশ ক'রে ধম্‌কে দিয়ে ব'লে দিলেন, পড়াশুনো তার কিছুই হয়নি এবং তার সম্বন্ধে রিপোর্টও দিলেন অত্যন্ত খারাপ। লিলির মেজাজ তা'তে একেবারে বিগ্‌ড়ে গেল। সে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ভীষণ অলস হ'য়ে গেল এবং দিনকতক স্কুলেই এলো না। এতেও অবশ্য তার যে কোনো সুবিধে হোলো তা' নয়। কারণ তার পর আবার যখন সে স্কুলে গেল তখন সেখানে তার অনাদরটা শুধু তীব্রতরই হোলো। শিক্ষয়িত্রীর 'বিষ-নজর' আর বিপর্য্যস্ত, অলস লিলির তিক্ত মেজাজের সংঘাতের ফলটা শেষে দাঁড়ালো এই যে, শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষয়িত্রী তা'কে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব ক'রে ব'সলেন।

স্কুল থেকে বিতাড়নের এই প্রস্তাবটাই শেষ পর্য্যন্ত লিলির 'গোল্লায়' যাবার পথটাকে একেবারে পরিপাটি ক'রে বেঁধে দিলে। কারণ স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কোনো কালে কোনো ছেলে বা মেয়ের কোনো হিতসাধনই হয় না। এর দ্বারা শুধু এইটিই প্রমাণ হয় যে, ঐ স্কুল বা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা আসল সমস্যাটির সমাধানে নিজেরা একেবারে অক্ষম। কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া মানে তাঁদের পক্ষে নিজেদের সেই অক্ষমতাটা পুরোপুরি মেনে নেওয়া। তাঁদের মাথায় এটা ঢোকে না যে তাঁরা নিজেরা যদি অক্ষমই হন, তাহ'লে তাঁদের পক্ষে উচিত হ'চ্ছে ছাত্র বা ছাত্রীকে তাড়িয়ে না দিয়ে তাকে সংশোধন করবার পক্ষে উপযুক্ত আর কোনো যোগ্যতর ব্যক্তিকে ডেকে আনা। বিরক্ত হ'য়ে ছেলেটিকে তাড়িয়ে দেওয়াতে নিজেদেরও কলঙ্ক, ছেলেটিরও সর্ব্বনাশ!

অন্য শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়্‌লে হয়তো লিলি শুধ্‌রে যেতে পারতো। এমন কি তার বাপ-মার সঙ্গে কথা ক'য়ে তার 'স্কুল-বদল' করার প্রস্তাব কর্‌লে সেটাও হয়তো লিলির পক্ষে সম্মানহানিকর হোতো না। মেয়েটি অধঃপতনের হাত থেকে বেঁচে যেতো। কিন্তু তা হোলো না। বুদ্ধির দোষে 'গোঁয়ার্ত্তুমি' ক'রে তার শিক্ষয়িত্রী তাকে 'বদনাম' দিয়ে স্কুল থেকে তাড়াবারই প্রস্তাব ক'রে বস্‌লেন!

লিলির ওপরে গিয়ে এর ফলটি যে কী রকম দাঁড়ালো, এর পর

তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। লিলির পক্ষে সংসারে 'দাঁড়াবার' শেষ ভরসাটুকুও লোপ পেলো। বাড়ীর অনাদর তো তাকে বাড়ীর ওপর বিরূপ ক'রেই রেখেছিলো। এখন সে দেখ্‌লে বাইরের জগৎটাও সুবিধের নয়। সংসারে কোথাও তার আদর নেই—ঘরে-বাইরে কোনখানেই তার প্রতিষ্ঠা নেই!

তখন সে মরিয়া হ'য়ে একসঙ্গে স্কুল বাড়ী সব ছেড়ে নিরুদ্দেশ হোলো। কিছু দিন তার কোনো খোঁজ-খবর কেউ পেলে না! শেষ-কালে জানা গেল যে, এক সৈনিকের সঙ্গে সে প্রণয়-ব্যাপারে জড়িত!

তার পক্ষে এ-রকম করার মানেটা একটু ভাব্‌লেই বোঝা যায়। জীবনে তার লক্ষ্য ছিল সমাজে সমাদর পাবার—প্রতিষ্ঠা লাভ করবার। হাই স্কুলের ঘটনা ঘটবার আগে পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠা-লাভের পথ হিসেবে সে জীবনের 'কেজো' দিকটাই বেছে নিয়েছিল। মন দিয়ে পড়াশুনো ক'রে 'বাহবা' পেয়ে সে বেশ খুসী ছিল। সে জান্‌তো—প্রতিষ্ঠা সে এই দিক্ দিয়েই পাবে। এই ভাবেই সে সবায়ের মনোযোগকে তার দিকে আকর্ষণ করতে পারবে।

কিন্তু হাই স্কুলের তিক্ত অভিজ্ঞতাটা তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, 'না; এদিক্ দিয়ে সুবিধে হবে না। কৈ? ঘরে বাইরে কোথাও তো কেউ আর তার তারিফ্ করচে না?' তখন সে খুঁজতে লাগ্‌লো, কোন্ দিকে গেলে, কী করলে, কার কাছ থেকে সে 'তারিফ' পাবে—যে-'তারিফ্' পাওয়াটা তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

কোথাও কারু কাছ থেকে 'তারিফ্' পাবার দুর্দমনীয় লোভেই সে বাড়ী থেকে পালিয়ে খুঁজ্‌তে লাগলো সেই অনুকূল পরিবেশটি এবং অবশেষে এক দিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই তারিফ্ পেলে ঐ সৈনিক যুবকটির কাছে। সৈনিকটি তার রূপের প্রশংসা করলে, তার গুণের সমাদর করলে এবং তার 'সাহস'কে অভিনন্দিত করলে। লিলি তা'তে গ'লে গেল। সে দেখ্‌লে, এই তো জীবনের সার্থকতা! এই তো সে পেয়েছে সমাদর! সমাদর পাওয়ার উৎসাহে বিভ্রান্ত হ'য়ে সে অবশেষে সৈনিকটির হাতে পুরস্কার দিয়ে বস্‌লো তার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তার কুমারী-ধর্ম্ম!

হৃত-রাজ্য ফিরে পাওয়ার মত এই ভাবে জীবনে আবার সমাদরের সন্ধান ফিরে পাওয়ার নবীন নেশায় মশগুল্ হ'য়ে তার কাটলো কিছু দিন। এবং তার পরে তার বাড়ীর লোকেরা তার কাছ থেকে চিঠি পেতে লাগলেন যে, সে সন্তান-সম্ভবা এবং সে বিষ খেয়ে তার জীবনাবসান ঘটাতে চায়!

বাড়ীতে এই ভাবে চিঠি লেখাটা লিলির চরিত্রেরই উপযোগী। তার আসল লক্ষ্য হ'চ্ছে বাড়ীর লোকদের, বিশেষ করে, তার মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করা—তাঁর কাছ থেকে যত্ন পাওয়া। তার মন ঘুরে ঘুরে কেবলই খুঁজে বেড়াচ্ছে—কোন্ পথ দিয়ে এটা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে। বাইরে সমাদর পাওয়াটা এর তুলনায় আসলে কিছুই নয়। তাছাড়া সে এটাও বেশ ভালো করেই জানে যে, তার মায়ের যে-মানসিক অবস্থা তাতে তাঁর পক্ষে তার ওপর 'খড়্গ-হস্ত' হ'য়ে ওঠা এখন কিছুতেই সম্ভব হবে না। বরং তাকে এই ভাবে ফিরে পেয়ে তিনি খুসীই হবেন এবং এর পর থেকে তাকে তিনি বেশী ক'রে যত্নই করবেন।

এখন বিচার্য্য এই যে, মেয়েটির এ-রকম আচরণের কারণ কি? কারণটা আর কিছুই নয়, আসল কারণ হ'চ্ছে, তার ভেতোরকার

রুগ্ন ভাইবোনদের ওপর তার মায়ের বেশী মনোযোগ দেখে সে যে নিজেকে 'উপেক্ষিতা' 'অনাদৃতা' মনে করতো তার কারণ হ'চ্ছে তার হীনমন্যতা। নিজেকে 'ছোটো বা 'হীন' ব'লে মনে করবার একটা অভ্যাস তার মধ্যে আগেই গজিয়ে উঠেছিলো। তাই কল্পনায় নিজের ওপর তার মায়ের স্নেহের অভাব সে অনুভব কর্‌তে পেরেছিলো। এই হীনমন্যতার জন্যেই সে প্রাথমিক স্কুলে সহপাঠিনীদের সমালোচনা ক'রে তৃপ্তি পেতো; জোর ক'রে তাদের ওপর 'সর্দ্দারি' চালিয়ে নিজের কল্পনার রাজ্যের একচ্ছত্রী সাম্রাজ্ঞীত্বের আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতো। আসলে সে মনে মনে অনেক আগেই জেনেছিলো যে তার দিদিরা আর ছোটো ভাইটি তার তুলনায় বেশী 'গুণের' ছেলে-মেয়ে। আর ধ'রে নিয়েছিলো যে তাদের ঐ শ্রেষ্ঠতার জন্যেই আসলে তারা মায়ের বেশী আদরের সন্তান। আর গুণের দিক্ দিয়ে নিকৃষ্ট ব'লেই সে নিজের মায়ের কাছে অনাদৃতা।

নিজের গুণপণার 'কম্‌তি' সম্বন্ধে একটা সচেতনতা তাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো, যার জন্যে সে সেই আপেক্ষিক অভাবটা পূরণ করবার জন্যেই সর্ব্বদা ব্যস্ত হোতো। সেই জন্যেই নানা ভাবে বাহাদুরি দেখিয়ে তারিফ পাবার দিকে তার ছিলো অতোখানি লোভ!

এই মেয়েটিকে কী ক'রলে সাম্‌লানো যেতো এখন সেইটে দেখা যাক্। এ রকম ক্ষেত্রে রোগীর প্রতি সহানুভূতিটা আগে থাকা দরকার। প্রথমেই তার বয়েসটা বিবেচনা ক'রতে হবে। তা' ছাড়া সে যে মেয়ে, ছেলে নয়, এটাও ভুললে চলবে না। মেয়েটির এ রকম আচরণের আসল কারণটি ছিল এই যে, সে চাইতো তার 'কদর'টা লোকে বুঝুক। মূলে এই থেকেই অতো সব কাণ্ডের উৎপত্তি। এখন এটা তো খুব দোষের ছিলো না। 'কদর' চাওয়া মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক; বিশেষ ক'রে মেয়েদের পক্ষে, তার ওপরে ঐ বয়েসে!

এদিক্ দিয়ে খানিকটা উৎসাহ পেলেই তার পক্ষে ঠিক হোতো। তাহ'লে তার 'লক্ষ্য'টির প্রতি সে জীবনের 'কেজো' পথ দিয়েই ধাবিত হোতো। এবং তার ফলটা তার নিজের এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকরই হোতো। অবশ্য তার মধ্যে একটু ত্রুটি ছিলই—সে ত্রুটিটা হ'চ্ছে তার ভেতোরকার হীনমন্যতা। এর ওপর আবার সাহসের অভাবও তার ছিল। যে জন্যে অবস্থাকে সামান্য প্রতিকূল দেখলেই সে ভীত হ'য়ে পড়্‌তো। চরিত্রের এই দুটো ত্রুটির জন্যেই তার আচরণটা গোড়া থেকে অতি সহজে অস্বাভাবিক রাস্তা ধ'রে চলতে সুরু করেছিলো। কিন্তু গোড়াতে এই ত্রুটির কথাটুকু তাকে বন্ধুভাবে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়ে সেই সঙ্গে তাকে যদি জীবনের কেজো পথ ধ'রে চলবার জন্যে দরকার মত উৎসাহ দেওয়া যেতো তাহ'লে হয়তো তার আচরণে আর কোনো ত্রুটি ঘটবার সুযোগই আস্‌তো না।

ঠিক সময়ে তার মাথায় এই কথাটি কারো পক্ষে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, যে,—

'হয়তো স্কুল বদল করলেই সব গোলোযোগের অবসান হ'তে পারে। কারণ আসলে পড়াশোনায় সে মোটেই কাঁচা নয়। তবে হ'তে পারে যে, সে হয়তো পড়াশোনায় সাময়িক অবহেলা করে থাকবে, যতটা চেষ্টা তার করা উচিত ছিল, ততটা চেষ্টা সে হয়তো করেনি। হয়তো শিক্ষয়িত্রীকে সে ভুল বুঝেছিলো।'

বুঝিয়ে দেওয়া হোতো, যাতে ঐ কথাগুলোকে সে নিজের মন দিয়ে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, আর সেই সঙ্গে তার ভীরু মনে যদি সাহস সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া হোতো তা'হ'লে তার আচরণের এমন বিসদৃশ পরিণতি হয়তো ঘটতে পারতো না। সে তখন ব্যাপারটা মন দিয়ে প্রণিধান ক'রতো এবং নিজেকে অবস্থানুযায়ী গড়ে তুলতে অভ্যাস করতো।

এ রকম ক্ষেত্রে অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে, চরিত্রের মধ্যে ভীরুতাযুক্ত হীনমন্যতা যদি বাঁকা পথে চলবার পক্ষে প্রশ্রয় পায়, তা হ'লে তার ফলে তার ভবিষ্যৎটা একেবারে চিরদিনের জন্যে মাটি হ'য়ে যেতে পারে।

আচ্ছা। এবার দেখা যাক্ যে, ঐ মেয়েটি মেয়ে না হ'য়ে যদি ছেলে হোতো, তা' হ'লে কী হোতো। ঐ বয়েসের একটি ছেলের পক্ষে তার মতন প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে শেষটা গোঁ-ভরে একটা পাকা রকমের অপরাধী (Criminal) হ'য়ে ওঠা মোটেই বিচিত্র নয়। এ ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। স্কুলে পড়তে গিয়ে কোনো ছেলে যদি একবার সাহস হারিয়ে ফেলে তা' হ'লে তার পক্ষে স্কুল পালিয়ে 'হতভাগা' ছেলেদের দলে গিয়ে 'ভিড়ে পড়া' খুবই স্বাভাবিক। কেন এটা হয়, তাও একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে। যখন তার আশা নির্ম্মূল হয়, সাহস নষ্ট হ'য়ে যায়, তখন কর্ম্মক্ষমতা হারিয়ে সে অলস হয়ে যায়। তখন সে বাঁচবার সোজা রাস্তা বার করে অভিভাবকের 'সই' জাল ক'রে। এই ভাবে সে দরকার মত ছুটির দরখাস্ত কিম্বা পড়া না হওয়ার কৈফিয়ৎ-এর চিঠি নিয়ে গিয়ে স্কুলে দাখিল করতে আরম্ভ করে। তার পর সে গিয়ে সেই দলে ভিড়ে যায়—যেখানে 'আলসেমি' করার অফুরন্ত সুযোগ।

এই সব দলে গিয়ে সে যাদের সঙ্গী পায়, তারাও এক দিন ঠিক তারই মত একই রাস্তা দিয়ে এ দলে এসেছিলো। স্কুলের তুলনায় নব আবিষ্কৃত এই দলটিকে তার স্বর্গ ব'লে মনে হয়। জগৎ, জীবন ও সাফল্য সম্বন্ধে নতুন ধরণের মন-গড়া সব ধারণার উদ্ভব হয় তার মনে, আর নতুন ধরণের নিজস্ব যুক্তির সাহায্যে সে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান্ ব'লেই মনে করে।

ভীরুতা ছাড়া আরও একটা ধারণার সঙ্গে হীনমন্যতার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সে ধারণাটা হ'চ্ছে, আমার কোনো বিশেষ 'ধার' নেই। অতএব আমার দ্বারা জগতে কিছু হবে না। এ রকম অবস্থায় ঐ বদ্ধমূল ধারণাটাকেই 'রোগী' চরম সত্য ব'লে আন্তরিক বিশ্বাস করে। এ ধরণের বিশ্বাসটাই কিন্তু আসলে হীনমন্যতা। Individual Psychology অনুসারে এ ধরণের বিশ্বাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই। এ্যাড্‌লার বলেন, 'সব লোকের দ্বারাই সব কিছু হওয়া সম্ভব। আমার কোনো 'ধার' নেই, আমার দ্বারা কিছু হবে না,—এই ধারণাটা একেবারেই ভ্রান্ত। সুতরাং কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে যখন এ ধরণের ধারণা দেখতে পাওয়া যাবে তখন বুঝতে হবে যে, সে আসলে হীনমন্যতা নামক মানসিক রোগে ভুগছে।

এই প্রসঙ্গে 'বাপ-মা বা পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া জন্মগত দোষগুণের অস্তিত্বের ওপরই ছেলেমেয়েদের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে —ব'লে যে' একটা প্রচলিত ধারণা আছে, এ্যাড্‌লার তার সত্যতাকে একেবারেই অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, জন্মগত দোষগুণের ওপরই যদি সন্তানের সাফল্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতো তা হলে মনো-বিজ্ঞানীদের তো করবার কিছুই থাকতো না। কিন্তু তা তো হয় না। মনোবিজ্ঞানীদের চেষ্টা ও সাধনার ফলে কত লোকেরই তো মনের 'গণ্ডগোল' সেরে যাচ্ছে—কত জটিল মানসিক রোগগ্রস্ত রোগীদের মনের জোট ছাড়িয়ে তাদের তো আবার সুস্থ সবল কেজো লোক তৈরী করে নেওয়া যাচ্ছে। এটা তাহ'লে কি ক'রে সম্ভব হয়?

তিনি বলেন, ঐ বিশ্বাসটাই আসলে হীনমন্যতা থেকে উদ্ভূত। আসলে মানুষের সাফল্য নির্ভর করে তার মনের সাহসের ওপর। মনোবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে হতাশ রোগীর মনের আশা সঞ্জীবিত করা, এই আশার বিদ্যুৎস্পর্শেই সে আবার কর্ম্মক্ষম হ'য়ে উঠে সংসারে নিজে প্রতিষ্ঠা পাবে এবং সমাজকেও নানা দানে পুষ্ট করে তুলবে।

অনেক সময় দেখা যায়, কিশোর বয়সের ছেলেরা স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে শেষে মনঃক্ষোভে আত্মহত্যা ক'রে বসে। এটা আর কিছুই নয়, প্রতিশোধ নেবার এ তাদের এক ধরণের কৌশল। এই ভাবে আত্মহত্যা ক'রে তারা প্রকৃতপক্ষে সমাজের ঘাড়ে নরহত্যার পাপের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চায়। এ হোলো নিজেকে জাহির করবার—নিজেকে 'ঠিক' বলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে তার স্বকীয় বিশেষ একটা ধরণ—নিজস্ব বুদ্ধিচালিত নিজস্ব যুক্তির ফল। সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিকে পরিত্যাগ ক'রে বিকৃত 'স্বকীয় বুদ্ধি' দ্বারা চালিত হ'য়েই তারা এ রকম আচরণ করে।

ঠিক সময়ে এদের ধ'রতে পারলে এদের হতাশ মনে সাহসের সঞ্চার ক'রে এদের বাঁচিয়ে দেওয়া সম্ভব।

হীনমন্যতার চাপে পীড়িত-চিত্ত ছেলেমেয়েরা চুরিও ক'রতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে তাদের চুরির প্রেরণাটা আসে তাদের মনের 'হতাশা' থেকেই—'লোভ' থেকে নয়। ছেলেদের যখন নিজেকে 'বঞ্চিত' ব'লে মনে করবার কারণ ঘটে, তখন তারা সেই বঞ্চনার 'পরিপূরক' হিসেবেই চুরি করে। অর্থাৎ তার মনের ভাবটা কতকটা এই ধরণের হয় যে, 'অন্যে যখন আমার দিকে তাকালে না, তখন আমার ব্যবস্থা আমার নিজেকেই ক'রে নিতে হবে।' কোনো একটা জিনিষের ওপর প্রবল লোলুপতার বশে সেটা চুরি করে ফেলার সঙ্গে এ ধরণের চুরির অনেক তফাৎ।

কথাটা ঠাণ্ডামাথায় স্থির ভাবে ভেবে দেখবার জিনিষ।

[ক্রমশঃ

প্রাণতোষ ঘটক

তবে বর আর ছেলে এধারে ভালই। বুড়ো অন্ধ বাপ ছাড়া কেউ নেই সংসারে। মণিমালাই সংসারের সব হয়ে থাকবে। জলকলে পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরি, নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে ছেলে। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না।—পুলকিত হয়ে ওঠে মণিমালা। ভাবী স্বামীটিকে নিয়ে মনে মনে অনেক কল্পনা-জল্পনা করতে লেগেছে সে। নামটিও সকলের অগোচরে জেনে নিয়েছে, লোকের মুখে মুখে কানে গিয়েছে তার,—নিখিলকৃষ্ণ। মাত্র ঐ শেষ কথাটুকুর জন্ত কেমন যেন বৃন্দাবনকে মনে পড়ে যায়। নিখিলই ত' বেশ, কৃষ্ণ আবার কেন! মণিমালা শুনেছে নিখিলকৃষ্ণ কালো আর মোটা, মাথার চুল তার অত্যন্ত প্লেন করে ছাঁটা। নাকের তলায় কালো ভেলভেট [illegible] মত গোঁফও নাকি আছে একজোড়া। গান-বাজনা একেবারেই জানে না, মধ্যে মধ্যে পাড়ার অপেরায় ভীমের পার্ট করে,—আপন মনে হেসে ফেলল মণিমালা। বহুক্ষণ ভেবে-চিন্তে বুকখানা দশ হাত হয়ে ওঠে, বিয়েত' তার হচ্ছে। সঙ্গী, সাথী, আলাপী কুমারীদের জন্যে 'বিয়েত' দূরের কথা, দেখাশুনাও হয়নি এখনও কারও। অনেক জনের মাত্র কথাই উঠেছে, কথাতেই ইতি হয়ে গেছে, কাজে আর পরিণত হচ্ছে না। কেমন যেন সহানুভূতি জাগে আজ। স্বামী না পেয়ে যৌবন যাদের ফিরে গেল মণিমালার জানা আছে তাদের মনোব্যথা। আইবুড়ো থেকে পদে পদে লোকলজ্জা, আত্মীয় অনাত্মীয়ের টিপ্‌পনী আর কথা, নিজের কাছে নীচু হয়ে থাকা,—ভাবতেও অন্তরাত্মা অস্থির হয় মণিমালার।
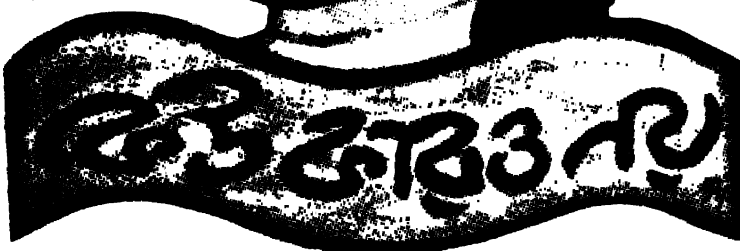
মা বল্লেন,—মণি অবাধ্য হোস্‌নে। বেশ করে আপাপাশতলা! সাপটে মেখে নে এটুকু। কতটুকুই বা দিয়েছি!

[illegible] ঝিন ঝিন করে ওঠে তার। সব মমতার পাত্রটা তুলে দিয়ে [illegible]।

বর এসেছে। গাঁয়েরই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে উঠেছে। বিয়ে করতে এসেছে, বৌ নিয়ে চলে যাবে নিজের বাড়ীতে,—সেই চাইবাসায়,—নিখিলকৃষ্ণদের দেশে।

* * *

সন্ধে উৎরে যাচ্ছিল।

শ্যামিয়ানার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখছিল মণিমালা। খাঁড়া ঝুলছে মাথার ওপর, সময় এগিয়ে আসছে। লজ্জা আর ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে যেন। বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা শুরু হয়েছে। সানাইয়ের পোঁ, ছাপাপদ্যর কাড়াকাড়ি, বর আসবে কখন তাই নিয়ে কলরব,—অবাক লাগে মণিমালার। নিজেকে আজ এক জন বলে মনে হয়। আজকের সব কিছু তাকে নিয়ে, তাকেই কেন্দ্র করে যে। সবার মাঝে মধ্যমণির মত সেজে-গুজে বসে আছে সে। গালের চন্দন চড়-চড়িয়ে ওঠে। নতুন চেলী, বাগ মানাতে পারে না, নতুন গয়না, চোখ ঝলসে যায়। মুখের গোটা সুপুরিটা গাল বদলে নেয় মণিমালা। হাতের তালু ঘামতে থাকে! এখনই হয়ত' ডাক পড়বে। একটু সামলে নেওয়ার আগেই পিঁড়ি শুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে বরপক্ষের ভিড়ে, ছাতনাতলায়।

বাড়ীর মেয়েদের অর্ডারে সানাইওলা বাজাতে শুরু করে। বাঁশীর সুরে বেজে ওঠে সেই বিখ্যাত গানের কলি,—দেখা হবে ছাতনা-তলায়—।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল!

ভোরের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে ডাকলেন মা,—মণি, ওঠ, মা। বর যাবে বারবেলা পড়বার আগে। দশটার মধ্যে বেরুতে হবে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মণিমালা। বেসামাল কাপড় বুকে পিঠে জড়িয়ে ইতিউতি তাকিয়ে নিল একবার। বাসর-ঘরের কোথাও খুঁজে পেল না বরকে। নিখিলকৃষ্ণ তখন সিগারেট ধরিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে একটু। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে এতক্ষণে। সারারাত্রির সুখনিদ্রার নিয়মভঙ্গ, চোখ দু'টো কর-কর করছে। প্রত্যুষের ঠাণ্ডা বাতাসে দু'চক্ষু মুদে আসতে চায়। অজানা অচেনা পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সে। পেছনে ফেলে যাচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া।

রৌদ্রের তেজ বাড়ছে ক্রমে ক্রমে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে।

সানাইয়ের করুণ কান্নায় সুর পাল্লা দিয়ে কাঁদছে অনেকে।

চোখের জলে ধুয়ে-যাওয়া চন্দন নতুন করে পরিয়ে দিতে হচ্ছে মণিমালাকে।

'—লেখ হে জামাই, দাসখৎ লেখ' এবার। মেয়েপক্ষ থেকে এগিয়ে এল এক জন।

—পা বাড়িয়ে দে না মণি, জামায়ের কোলের ওপর তুলে দে। অন্য এক জন কথা জুড়ল। স্মিত হাসল নিখিলকৃষ্ণ।—বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে না? যা রয় বসে তাইত' ভাল। কথার শেষে কলম ধরল সে।—বলুন ত' কি লিখতে হবে? নিখিলকৃষ্ণর গম্ভীর কণ্ঠস্বর অনেকের তামাসা করার ইচ্ছায় বাধ সাধল। ঠোঁট উলটে সরে পড়ল কেউ কেউ।—আ মরণ, এতটুকু রস-কস নেই প্রাণে! মনে মনে বলল অনেকে। চাওয়া-চাওয়ি করল পরস্পরে।

ঘড়ির কাঁটাগুলো আজ দ্রুততর হয়ে উঠেছে যেন। ন'টা বাজতে না বাজতেই সাড়ে ন'টা হয়ে গেছে: দশটা আর কার ঘর!

গাড়ীতে উঠে বসল মণিমালা। নিয়মানুযায়ী পুরোহিতের কথামত তার হাত ধরে উঠিয়ে দিল নিখিলকৃষ্ণ। নিজেও উঠে জায়গা জুড়ল অনেকটা। নিজেকে টেনে নিল মণিমালা, স্পর্শের বাইরে সরে গেল। চারি দিকের ভিড়ের মধ্যে একটি মুখের সন্ধান করছে সে। তার জন্যেই মনটা আজ বার বার হু-হু করে উঠছে। কথা বলতে পারে না সে, এক দণ্ড চোখের আড়ালে গেলেই ব্যস্ত হয়ে কান্না শুরু করে। ছোট ভাই নতুন খোকা ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে তখন। দোতলার দালানে একা একা দোলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কাজের বাড়ীর অবহেলায় তারও শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে। অনাদরে আর অযত্নে ক'দিনেই বদলে গেছে সে, পটকে গেছে যেন।

গাড়ী চলতে শুরু করল। মণিমালার কানে বাজে নতুন খোকার কান্না। ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াবার সময় যেমন ডুকরে ডুকরে কাঁদে, জামা ছাড়াতে যেমন বায়না ধরে কাঁদে, সেই পরিচিত কান্না কানে বাজে মণিমালার। মণিমালাও কাঁদে।

অনেকটা দূর যাওয়ার পর, অনেক পথ ছেড়ে এসে কথা বলল নিখিলকৃষ্ণ,—পেট কামড়াচ্ছে? চোখ তুলে তাকাল মণিমালা। এ কি বলে মানুষটা! এ কি কথার ধরণ!—কাজের বাড়ীতে গুচ্ছের বাসি জিনিষ খেলেই পেটের অসুখ নিশ্চিত। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে কথা শেষ করল সে।—কেঁদে আর কি হবে! কাঁদলে কি আর পেট-ব্যথা সারে!

বিরক্ত হল মণিমালা। মুখ ঘুরিয়ে গাড়ীর জানালার বাইরে [illegible]করে রইল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার বলল সে,—[illegible] চলবে না, শুধু মণিই ভালো। নাম যত ছোট ততই সুবিধে। ডেকেও আরাম, রেখেও আরাম।

মণিমালা নির্ব্বাক্।

রাস্তার একটা মোড়ে এসে গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করল,—কি বাবো, টিশনে ত',?

—না বাপধন টিশনে আজ নয়। এখন স্রেফ জোড়া ফটকের দিকে চালাও।

দু'পাশের গাছের ছায়ায় অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কাঁকর-পথ ধরে সশব্দে ছুটে চলল গাড়ীটা। বিশ্রী একটা সিঁটকে গন্ধ হাওয়ায় ভেসে এল। দূর জলাভূমির পচা পাঁক বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল মণিমালার, গাছের আড়াল থেকে দূরে দেখা গেল বিস্তীর্ণ দীঘির বুকে ধোঁয়ার ধূসর প্রলেপ পড়েছে। দীঘির জলের বিষবাষ্প। গাড়ীর চাকার শব্দে এক পাল বুনো শূয়োর ছোটাছুটি করে মিলিয়ে গেল গাছের ছায়ান্ধকারে। পাঁক ঘেঁটে উদরপূর্ত্তি করছিল তারা। শিউরে উঠল মণিমালা।—এত পথ থাকতে এ পথে কেন!

এই পথটিতে যারা আসে তাদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেছে। ঐ দীঘিতে যারা যায় তারা আর ফেরে না। অতিকায় ড্রাগনের দাঁতের মত দণ্ডায়মান গাছগুলোয় প্রায়ই দেখা যায় মানুষ ঝুলছে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের পা চাটতে শুরু করেছে বুড়ো সাপ একটা। একটি সুবৃহৎ ময়ালের বসতি আছে এখানে। বহু কাল শাবক-পাল নিয়ে বসবাস করছে। ভুল করে কোন গরু ছাগলও আসে না এই পথে। হাতের শিকার ফসকে গেলে সর্পযূথ হাসতে শুরু করে না কি। বুকে টানবার আগে খেলিয়ে নেয় তারা। খেলাতে গিয়েই চাল ভুল হয় হয়ত'—ছটকে ছিটকে বেরিয়ে যায় ধূর্ত্ত শেয়ালের দল। মধ্যে মধ্যে দীঘির বুকে মানুষ ভেসে ওঠে,—বনভোজন লেগে যায় সেদিন। মণিমালার বুক ফেটে যায়, নতুন করে কাঁদতে থাকে সে। কেমন যেন ভয় ভয় করে, আপশোষ হয়। আজ মিলিত জীবনের যাত্রারম্ভ এই পথ দিয়ে কেন! হতাশায় নেতিয়ে পড়ে মণিমালা। ঘোমটা-দেওয়া মাথাটায় কেবল কম্পন লাগে মধ্যে মধ্যে। মণিমালা ফুলে ওঠে, ফুলে ফুলে কাঁদে।

—দূর শালা, এ কোথায় আনলে রে! ইস্, নাকে কাপড় দাও, নাকে কাপড় দাও। ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিখিলকৃষ্ণ। নাক সিঁটকে দেখতে লাগল গাড়ীর জানলার বাইরে।—শালা যমপুরীর নিয়ে এসে হাজির করল নাকি! কি হে কোন্ দিকে চালাচ্ছ? জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে শেষের কথাগুলো বলল।

—সটকাট হোবে বাব্বা। নাক টিপে উত্তর দেয় গাড়োয়ান।

—শালা গেরাম বটে একখানা! শ্বশুরবাড়ী করতে হয়ত' ঠিক এই—স্বগত করতে করতে নিখিলকৃষ্ণ কটাক্ষে দেখে নিল নতুন বৌয়ের মুখভাব। একটা সিগারেট ধরিয়ে গুন্-গুন্ করে গান ধরল। কথা নয়, অস্ফুট গুঞ্জরণ মাত্র।

* * * *

মনের আকাশে ঝড় উঠেছিল মণিমালার। বিয়ের পাট শেষ হতে না হতেই আশ্রয় নিয়েছিল ফুলশয্যার একটি পার্শ্বে, নিরিবিলি স্থানটিতে। অনেক শ্রমের পর ক্লান্তিতে ডুবেছিল যেন। ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন কেউ জানে না। মেয়েপক্ষ হাসাহাসি করতে থাকে।

—বেশ চালাক ত' বৌটি!

—ঘুমিয়েছে না কাঁচকলা। ইস্ ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছেন যেন!

—ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিস? তার মানে সরে পড় তোমরা, মজা লুঠতে দাও আমায়। অনেক প্রকার মন্তব্য অনেকের মুখে শোনা গেল। কেবল মণিমালার কোন সাড়া নেই, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে সে। এক-আধবার চমকাচ্ছে মাত্র। নিশ্বাস টেনে নিচ্ছে বুক ভরে।

—নিখিলদা দরজায় হুড়কো দাও এবার। মেয়েদের একজন দীপ্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলে হেঁট হয়ে দেখে নিল নববধূর মুখাকৃতি। কোন পরিবর্ত্তন নেই, ঘুমন্ত মণিমালার ফ্যাকাশে মুখ চন্দ্রিকায় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল সকলে।

—যাঃ শালা সব, অনেক রাত হয়েছে। কাল ভোর হতে না হতেই আবার ট্রেণ ধরতে হবে। নিখিলকৃষ্ণ উঠে পড়ল [illegible]

করতে।—ঘরের ভেতর কেউ রইলি না ত! মিথ্যে মশার কামড় খাবি কেন? নিখিলকৃষ্ণ তন্ন তন্ন করে দেখে নেয় তক্তপোষের তলা, লোহার সিন্দুকের আড়াল, দেরাজের ভেতরটা! খিল এঁটে বসে থাকে খানিক। তার পর প্রদীপের শিখায় সিগারেট ধরিয়ে নেয়। ফুঁ দিয়ে প্রদীপটি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে ধপাস্ করে। মণিমালা চমকে ওঠে তক্তপোষ নড়ার শব্দে। আবার ডুবে যায় তন্দ্রার ঘোরে। সজোর নিঃশ্বাস টেনে নেয় বার কয়েক।

ঘরের বাইরে তখনও কলগুঞ্জন থামে না। দরজায় কান পেতে থাকে কয়েক জন। রাত্রির নিস্তব্ধতায় তাদের চুড়ির রিণি-রিণি কানে বাজে নিখিলকৃষ্ণর। হাসি পায় তার।

* * * *

—নতুন বৌ, ওঠ, আর ঘুমোয় না। ছি, ছি তুমি ঘুমুলে! মণিমালা উঠবে না কোন মতেই, ডেকে মরে গেলেও নয়।

—লক্ষ্মীটি ওঠ, ও নতুন বৌ। শোন' না, এইবার চেঁচাব কিন্তু। বাড়ীর সকলে উঠে আসবে। শীগ্রি ওঠ। রাগ করেছ, ও মণিমালা!

নাঃ আর পারা যায় না। নিখিলকৃষ্ণ যে-ভাবে কাকুতি মিনতি করছে না উঠে পারা যায় না যেন। মণিমালা উঠে বসল, অসংবৃত অঞ্চল টেনে বসে রইল সে।

—এখনও তোমার লজ্জা ভাঙল না? মুখটা তোলোই না। ও, আমায় মনে ধরেনি বুঝি! তা কি করবে বল, তোমার দুর্ভাগ্যি।

আবার কথা না বললে ভাল দেখায় না যেন।

—না না—আমি কি তাই বলেছি, আপনি—। মণিমালা চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করে। নিজের গলার মালাটা খুলে পরিয়ে দিতে যায়।

সহসা ঘুম ভেঙ্গে যায়, চোখ মেলে দেখে নিখিলকৃষ্ণ কথা বলছে।

—হ্যাঁ, ভিরমী লাগল না কি! এ যে বিড় বিড় করে, বলি ও বড়লোকের মেয়ে, হল কি তোমার? মণিমালার হাত দু'টা ধরে ঝাঁকানি দেয় নিখিলকৃষ্ণ।

—না না। কিছু নয়, ছাড়ুন আপনি। নিখিলকৃষ্ণকে ঠেলেই প্রায় উঠে পড়ে মণিমালা। তক্তপোষ থেকে নেমে কাঁপতে কাঁপতে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। লজ্জায় মরে যায় যেন। স্বপ্ন দেখছিল সে, স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছিল। কাঁচা ঘুমে বাধা পেয়ে মাথা ঘুরে গেছে তার। জানলায় দাঁড়িয়ে রইল সে পাষাণ মূর্ত্তির মত। জলের ধারা নামল দু'চোখে।

—বৌ মানুষ জানলায় দাঁড়ায় না রাত্তিরে! নিখিলকৃষ্ণ চাপা গলায় বলল।—আর আমার বাবার এত পয়সা নেই যে তুমি বেনারসী পরে ঘুম মারবে! কাপড়খানি ছেড়ে যা করতে হয় কর।

—এ কাপড় আমার মায়ের দেওয়া। অসহ্য মনে হল মণিমালার।

—তা ভাল, মর'গে ত। হলে। নিখিলকৃষ্ণ হেরে যায় যেন। বালিশ টেনে শুয়ে পড়ে। পাশ ফিরে শোয়।—কোত্থেকে যে জোটে এসে! স্বগতোক্তি করে অবশেষে।

কোথায় কতকগুলো প্যাঁচা অবিশ্রান্ত ডাক দিয়ে যায়। আকাশে শুকতারা দপ্‌দপিয়ে জ্বলছে। বাড়ীর সামনের পুকুরে প্রতিবিম্ব পড়েছে তার। মণিমালা একদৃষ্টে দেখে পুকুরের জলে আকাশের [illegible] পড়েছে। আকাশের তারা খসে পড়েছে নীচে। [illegible] মণিমালার। [illegible] বিবাহিতের জীবনের বড় স্মরণীয় রাত একটা বৃথা কেঁদে ফিরে যাচ্ছে—রাত্রি শেষ হয়ে গেল যে!

* * * *

সেরে যায় প্রণামের পালা। মানতে হয় তাই। যে যা বলে শুনে যায় মণিমালা। করতে হয় তাই করে। ট্রেণে উঠে হাঁফ ছাড়ল তার। ভিড় থেকে আর এক ভিড়ে এসে শান্ত হল যেন, নিশ্চিন্ত হল এতক্ষণে। কাহিল শরীর নিয়ে বসে রইল একপাশে সকলের দৃষ্টির আকর্ষণ হয়ে।

ট্রেণ ছুটে চলেছে।

দু' পাশের ছুটন্ত দৃশ্যাবলী মন্দ লাগছে না মণিমালার। আরও ভাল লাগছে ঐ মাটির সঙ্গে আকাশের মিলন। দিগঞ্চলে ঘন সবুজতায় মিলে মিশে এক হয়ে গেছে মাটি আর আকাশ। বেশ লাগছে দেখতে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে! মাইল পোষ্টের নম্বর-গুলো চোখে পড়লেই চোখ ফেরাচ্ছে দূর-দিগন্ত থেকে। ট্রেণের ভেতরের কলগুঞ্জন কাণে যায় না তার। সুগভীর একাগ্রতা কিছুতেই ভাঙ্গতে চায় না। যত আনন্দ আর যত উৎসাহ এত দিন জমে উঠেছিল তার মনে, সহসা কোথায় তারা লুপ্ত হয়ে গেল! জোয়ার এসে মাতিয়ে তুলেছিল তাকে, ভাটা পড়ে মিইয়ে গেছে সব। অদ্ভুত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে মণিমালাকে। কামরার ভেতর দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে চোখে পড়ল মণিমালার—'২৪ জন বসিবেক।' যাত্রীদল আইন অমান্য করেছে। গুণে দেখল প্রায় তেতাল্লিশ জন সবশুদ্ধ। আরেক দিকে তাকিয়ে দেখল, 'আরোহিগণকে সতর্ক করা হইতেছে যে ট্রেন যখন চলিবে তখন জানালার বাহিরে দেহের কোন'···ইত্যাদি। এই আইনটির অমান্য করেছে স্বয়ং নিখিলকৃষ্ণ। দরজায় দাঁড়িয়ে জানালার বাহিরে মাথা গলিয়ে দিয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছে একমনে। কি করবে মণিমালা, ডেকে পাশে বসাবে! পাশেই বসে আছে একটি কুমারী মেয়ে। বড় ছটফটে, বড় বেশী প্রগল্‌ভা। বেহায়ার মত হাসছে পরের কথায়, গুন-গুন করে গান গাইছে। পা দুটোকে নাচাচ্ছে ট্রেনের দোলার সঙ্গে সঙ্গে। পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় হতেই প্রশ্ন করে বসল মেয়েটি,—আপনার বুঝি নতুন বিয়ে হয়েছে?

—কি করে বুঝলে বল ত! সহাস্যে জিজ্ঞেস করল মণিমালা।

—হুঁ হুঁ গন্ধ পেয়ে বুঝতে পেয়েছি আমি। বাসি বেলফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে আপনার গা থেকে। নিজের সম্বন্ধে গর্ব্বিত হয়ে উঠল মেয়েটি। আরও ঘেঁসে বসল।

—কোথায় বিয়ে হল ভাই?

—চাইবাসা। ক্ষীণকণ্ঠে বলল মণিমালা।

—ওমা, আমাদেরও বাড়ী যে ঐখানে। অসাধারণ আনন্দে গলে পড়তে চায় মেয়েটি। কৌতূহলী হয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে আবার,—কাদের বাড়ীতে বিয়ে হল ভাই? কে আপনার বর বলুন ত! কথার শেষে সারা কামরাটি চোখ দিয়ে চেটে নিল একবার। দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল কোন পরিচিত মুখের সন্ধান পাওয়া যায় কি না।—কে বলুন ত', কোন্ জন?

মেয়েটির ব্যস্ততায় লজ্জিত হল মণিমালা। আশপাশের সকল যাত্রীর লক্ষ্য হয়ে নির্লজ্জের মত আবার বলল মেয়েটি,—কে ভাই, দেখান না।

মণিমালা ফিস্ ফিস্ করল,—ঐ যে যিনি দরজায় দাঁড়িয়ে জানলায় মাথা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

—কি মুস্কিল, মুখটাই দেখতে পাচ্ছি না যে! ও, এবার দেখেছি, দেখতে পেয়েছি এতক্ষণে। নিখিলদা, নিখিলই ত নাম আপনার বরের? মেয়েটির উৎসাহের রেশ কেটে গেল সহসা। মুহূর্ত্তের মধ্যে এক অসম্ভব পরিবর্ত্তন, নিরুৎসাহে ভেঙ্গে পড়ল সে। কেমন যেন মায়া হল তার। চোখে-মুখে ফুটে উঠল দয়ার ক্ষীণ আভাষ। এক বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মণিমালা। নিজের অজ্ঞাতে অনেক পাপকথা বলে ফেলেছে যেন, অনেক দোষ করে ফেলেছে নিজের পরিচয় দিয়ে।

মেয়েটি উঠে পড়ল নিজের জায়গা থেকে। সঙ্গের পরিচিতদের ভিড়ে গিয়ে বসল। মণিমালাকে দেখিয়ে কি সব বলাবলি শুরু করল তারা। মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল মণিমালা। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে, আঁতকে উঠছে কেমন। নিখিলকৃষ্ণ তখনও পর পর সিগারেট ধরিয়ে চলেছে। দাঁড়িয়ে আছে জানলায় মাথা গলিয়ে।

—আগে থেকে পরিচয় ছিল আপনাদের? আবার এসে বসল মেয়েটি। পাশে বসে জেরা করতে লাগল যেন।—আপনার স্বামীকে চিনতেন বিয়ের আগে?

মণিমালা ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে।

—তাই, বুঝেছি এতক্ষণে। করুণ হাসির সঙ্গে কথাগুলি বলল মেয়েটি। আরো এগিয়ে এল কাছে, আরও ঘন হয়ে বসল। - আপনার স্বামী আমাদের দেশের নামকরা ছেলে-এক জন। এমন কোন খারাপ কাজ নেই উনি করেননি। হঠাৎ আবার বিয়ে করবার সাধ হল কেন ওঁর!

কি বলবে মণিমালা, কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। মিন মিন করে ঘামতে লাগল সে। নতুন সিঁদূরপরা মাথাটা জ্বলতে শুরু করল। চোখের কোলগুলো ফেটে জল দেখা দিল। মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল সে। পাথরের মূর্ত্তির মত নীরব, নিস্পন্দ।

* * * *

শ্বশুরবাড়ীতে ঢুকে প্রাণ-বায়ু বেরিয়ে আসতে চায় মণিমালার। মানুষের বসতির এক জঘন্য দৃশ্য তার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে কাঁচিয়ে দেয় এক মুহূর্ত্তে।—গৃহস্থালীর কোন কিছুই দেখতে পায় না সে। ঘরের কোণে বসে আশাহত হয়ে কাঁদতে থাকে সে। নিশ্চিন্ত হয়ে কেঁদে নেয় খানিকটা। এক নতুন মানুষের আবির্ভাবে দিক্ ভুল করে ফেলে ইঁদুরের দল। ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে সন্তর্পণে ছোটাছুটি শুরু করে তারা। নবাগতটির সঙ্গে আরও কিছু এসেছে, যার আস্বাদ বহুকাল ভুলে মেরেছে তারা। মণিমালার সঙ্গে এসেছে কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি। পান্তুয়ার সুমিষ্ট গন্ধে মেতে উঠেছে তারা।

—এই আমার ঘর। জামা-কাপড় ছেড়ে সুস্থ হও এবার। এই ক'টি কথা বলে নিখিলকৃষ্ণ বেরিয়ে গেছে বহুক্ষণ। দিনের শেষ আলোক রেখা দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। দিন শেষ হয়ে রাত্রি হল বুঝি। বাড়ীর কাছাকাছি শেয়াল ডেকে উঠল কোথায়। ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত চমক লাগল মণিমালার। চমকে উঠল সে।

—সুবল, সু—ব—ল্! কঙ্কালের কান্নার মত নারী-স্বরে কথা বলল কে। মণিমালার বুকের ভেতরটা আলোড়িত হতে লাগল। কান পেতে বসে রইল সে। বহু দূর থেকে প্রত্যুত্তর ভেসে এলো। —এই. যে পুকুরপাড়ে। এলাম বলে এখনি। চিবিয়ে চিবিয়ে টানা টানা কথা।

নিখিলকৃষ্ণর ঘরেই বসে আছে মণিমালা। তার নিজের ঘরেই বসে আছে সে। বহু কালের পুরাতন ময়লা ক্যালেণ্ডার কতকগুলো ঝুলছে দেওয়ালে। সুন্দরী ললনাদের নানা ভঙ্গীর রূপ-বৈচিত্র্য। নিখিলকৃষ্ণর মানস সুন্দরী কি না কে জানে! তাদের পাশে আরও কয়েকটি ছবি। কাচ নেই ফ্রেমগুলো আছে মাত্র। দেশীয় চিত্রজগতের বিখ্যাত তারকা একেকটি, চন্দ্রাবতী, উমাশশী, আর কাননবালা। এদের মুখের সঙ্গে পরিচয় আছে মণিমালার। বহু জায়গায় বহু প্রকার ছবি এদের দেখেছে—নাম শুনেছে অনেকের মুখে। ক্ষণিকের জন্য আশ্বস্ত হল সে, তবুও ক'টা পরিচিত মুখ দেখতে পেয়েছে এতক্ষণে।

—হ্যাঁ গা, তোমার বাপের বাড়ী থেকে মিষ্টি এসেছে না? দরজায় এক নারী-মূর্ত্তির আবির্ভাব। খাটো সাড়ী একখানি এঁটে জড়িয়ে আছে তার দেহ। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ মেয়েটির উর্দ্ধাঙ্গে নিমার মত খাটো জামা একটি। মাথার চুল টেনে আঁচড়ে বাঁধা। কপালে কাচ পোকার ছোট টিপ নানা রঙের ঝিলিক দিচ্ছে।—ঐ হাঁড়িতে বুঝি আছে? মণিমালার কথার আগেই কথা বলে সে। এগিয়ে গিয়ে একটা হাঁড়ি তুলে নেয়।—তোমার শ্বশুরের খিদে লেগেছে বড্ড। গন্ধ পেয়েছেন বোধ হয়। কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি। মণিমালা ডাকল,—শুনুন। কাছে এগিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। বাধা দিল মেয়েটি।—না, না, আমি এবাড়ীর কেউ নয়। আমি জাতে নীচু। আমায় পেন্নাম করতে নেই। মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। পত্রবহুল চোখ দুটোও তার হেসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ধীরে ধীরে ফিরে এসে নিজের ট্রাঙ্কটির ওপর আবার বসল মণিমালা। ক্রমশই অবাক হচ্ছে সে, এ আবার কে?

* * * *

—ট্রেন থেকে নেমে জামা ছাড়িনি এখনও। ক্লাবে ঢুকে ফরাসের ওপর বসে পড়ল নিখিলকৃষ্ণ। হাঁফাতে লাগল বসে বসে।—ইস্, কোন্ শালা আর বিয়ে করে!

চারদিকের বন্ধুমণ্ডলী গড়িয়ে পড়ল হেসে। হামা দিয়ে এগিয়ে এল নিখিলকৃষ্ণর আশে-পাশে।—কেমন বৌ হল রে শালা? জিজ্ঞেস করল এক জন।

—বৌ ইজ বৌ, কেমন হবে আবার! আর একজন উত্তর দিল নিখিলকৃষ্ণর হয়ে। পরম দার্শনিকের মত বলল,—তফাৎ কেবল এই চামড়াটার। না হলে প্রত্যেক মেয়েই এক। বৌ কারও নতুন কিছু নয়।

—হাট্ শালা! ওরে আমার বজ্রেন শীল রে! পালোয়ানী চেহারার এক জন খিঁচিয়ে উঠল হঠাৎ।

—এ-বে এই, ওসব কথা রাখ, এখন। এই নিখ্‌লে, টাকা বের কর। তিন সের মাংস তিন টাকা বারো আনা। ঘি, ময়দা বাবদ আরও পাঁচ।

বক্তার কথার মাঝেই কথা বলল একজন।—আর কুড়িটি টাকা ভাই। বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই। পালোয়ান উল্লাস নাচাতে নাচাতে হেসে নেয় খানিক।—মাইরী, তাড়ি খেয়ে খেয়ে চড়া পড়ে গেছে পেটে। আজ একটু না হলেই নয়। কথা বলতে বলতে পেটে হাত বুলোতে থাকে সে।

—বাই বলিস নিখ্‌লে, আজ বোতল তিনেক চাবি-মার্কা চাই-ই।

সারা জীবন বুকের ভেতর লেখা থাকবে। নিখ্‌লেশালা বিয়ে করেছিল বটে! কথার শেষে দাঁড়িয়ে পড়ল বন্ধুটি। হাত পেতে দাঁড়িয়ে রইল।—ফ্যাল্ মাইরী। প্রাণ খুলে দু'চার টাকা ফ্যাল্ দিকিন আজ।

নিখিলকৃষ্ণর নতুন মনিব্যাগ নিঃশেষ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত আগেও সে দেখেছিল তিন চারখানা দশ টাকার নোট। কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল টাকাগুলো ভাবতে থাকে সে।—আর একখানা পাত্তি কি করলুম বল্ ত'? শূন্য ব্যাগটি পকেটে পুরে জিজ্ঞেস করল সে।

—আমরা ত' মিতবর সেজে সঙ্গে যাইনি! একজন বন্ধু ভুল ভাঙিয়ে দিতে চায় যেন।—কোথায় ফেলেছিস্! তো শালার যা কাণ্ড!

হতাশ হয়ে সিগারেটের প্যাকেট খোলে সে। নিজে একটা মুখে দিতে না দিতেই যে পারল তুলে নিল একেকটি।

কয়েক জনের ভাগে কুলোয় না। তারা বিড়ি ধরায় নিজের নিজের পকেট থেকে। এক জনের কাছে তাও নেই। সে বলে—বেঘলা হাফাহাফি।

সিগারেটের মৌজে চোখ বুজে ফেলেছে বিমল। চোখ বুজেই মাথা দোলায় সে। নবাবী কায়দায় সম্মতি জানায়।

* * * *

শুক্লান্ধকার ঘন হতে থাকে ক্রমে ক্রমে। চাঁদের দেখা পাওয়া যাবে সেই শেষরাত্রে, ভোরের কিছু আগে। সন্ধ্যাশেষেই কালো আঁধারে ডুবে যায় দিক্‌চক্র। বাদুড়ের দল নীড় ছেড়ে দূর আকাশে পাড়ি দেয়। বহু প্রতীক্ষার পর নিশ্চিন্তে যাত্রা শুরু করে তারা! পুকুরের তীর থেকে ঝিঁঝিঁর কীর্ত্তনগান শোনা যাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করে যায়। হঠাৎ কথা শুনে চমকে ওঠে মণিমালা।

—হ্যাঁ গো বৌ, গয়নাগাটি খুলে কাপড় চোপড় বদলাও। দরজায় দেখা যায় সেই আঁটসাঁট শ্যামাঙ্গীকে। হাতের লম্ফটা মাটিতে নামিয়ে আবার বলে,—পোষাক আষাক ছেড়ে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা কর। আর একটু বাদেই দরজায় খিল আঁটবেন। দেখাই হবে না মিথ্যে কথা থেকে যাবে একটা।

ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল মণিমালা।—না না এখুনি যাচ্ছি। দেখা করেই কাপড় ছাড়ব না হয়। এগিয়ে এল সে।—চলুন আপনি, দেখিয়ে দিন কোন্ ঘরটা। মণিমালার কথার সুরে অনুরোধের আমেজ। দেখা না করে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেটা পুরিয়ে নেওয়ার আভাষ।

লম্ফ হাতে ধীরপদে চলল মেয়েটি। সমস্ত মাটি মাড়িয়ে যেন আগে আগে চলল। একটি ঘরের দরজায় এসে পেছন ফিরল সে। —দাঁড়াও তুমি, বলে আসি আগে। লম্ফটি বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকে গেল মণিমালাকে ফেলে।

—আবার এই এতের বেলায় নিয়ে এলি ওকে? নাকী সুরের ফিস্‌ফিসানি কানে এল মণিমালার।—সুবল্ল, আমায় দেখে ভয় পাবে না ত'? আক্ষেপের সুরে কথাগুলি বলছে মানুষটি।

—না না, ঢেকেঢুকে নাও না। দেখতে পাবে কেন? তিরস্কার করল যেন মেয়েটি। দুহাতে হাতড়ে বিছানার চাদরটা টেনে কোন মতে শরীরটা ঢেকে নিল মানুষটি। শূন্যের দিকে মুখখানা তুলে বসে রইল একভাবে।

—বৌ এসেছে। নতুন বৌ এসেছে যে। মেয়েটির শেষের কথাগুলি ধমকের সুরে।

চমকে উঠল মানুষটি। শূন্যের দিকে চেয়েই বলল ধীরে ধীরে,—কোন কষ্ট হচ্ছে না ত মা?

বিহ্বল হয়ে তাকিয়েছিল মণিমালা। প্রশ্ন শুনে সাড় ফিরল তার।—আজ্ঞে না, কষ্ট হবে কেন? কথা বলতে বলতে মণিমালা বসে পড়ল প্রণামের ঢঙে। মাটিতে মাথা ঠেকাতেই মেয়েটি বলল,—বৌ যে পেন্নাম করছে, আশীর্ব্বাদ করতে হবে না!

মুখখানি নত হয়ে গেল। চাদরের ভেতর থেকে একটি হাত বের করে জিব কেটে বলল,—আহা হা, আশীর্ব্বাদ করব ত' নিশ্চয়ই। আশীর্ব্বাদ করব না আমার মাকে! রাজরাণী হও মা, খেয়ে পরে বেঁচে থাকো এই কামনাই করি। একটু থেমে আবার বলেন,—সুবল্ল, মায়ের আমার চোখ দুটো খুব বড়, নয় রে? শূন্যের দিকে চেয়েই জিজ্ঞেস করল।

—তা বড়, বেশ বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। বেশ সুন্দর বৌ হয়েছে।

তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে মানুষটির মুখে। হাসতে হাসতেই বলে—আমি যে বুঝতে পারছি। বেশ বুঝতে পারছি, মার আমার চাউনি যে গায়ে আমার বিঁধছে। অবাক হয়ে থাকিয়ে আছে মা আমার, নারে সুবল্ল!

—না না অবাক হবে কেন, অবাক হতে যাবে কেন? চল্' বৌ কাপড়চোপড় ছাড়বে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে। জোর করে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় মেয়েটি। মণিমালাও পেছন ফেরে, অনুসরণ করে তার।

—আমি মা চোখে দেখতে পাই না, আমি যে অন্ধ। মানুষটি নাকীসুরে কেঁদে ফেলে বুঝি। মণি-হীন সাদা সাদা চোখ দুটো থর-থরিয়ে কেঁপে ওঠে।

ওদের পদধ্বনি মিলিয়ে যেতেই অতি কষ্টে শুয়ে পড়লেন শ্বশুর। গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলে ফেলে দিলেন একপাশে। সানন্দে লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। মাথার বালিশের তলা থেকে বিড়ির ডিপে বের করে চৌকীর তলায় হাত চালিয়ে দিলেন। দু'হাতে তুলে নিলেন দু'টি পাত্র। একটি ছোট-খাটো কলসী আর একটি সস্তা রঙীন কাচের গেলাস। আজ বড় আনন্দের দিন তাঁর। ঘরে তাঁর লক্ষ্মী এসেছেন আজ, বিয়ে করে বৌ এনেছে ছেলে।

—কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখে কিছু দাও। ঐ রান্নাঘরে ঢাকা দেওয়া আছে দু'জনের খাবার। নিজে খেয়ে সোয়ামীকে খাইও। কথা ক'টি বলে চলে যাচ্ছিল মেয়েটি। ফিরে দাঁড়াল আবার।—খোকার আসতে দেরী হয় এট্টু। ভেবো না তুমি। কেলাবে গেলে আর ফিরতে চায় না যেন। ঘর-বাড়ী ভুলে যায়।

থাকতে পারল না মণিমালা। মুখ ফুটে বলে ফেলল,—আপনি এ বাড়ীর কে?

তির্য্যক্ দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে স্মিত হেসে বলল মেয়েটি,—আমি, আমি তোমার শ্বশুরের কাছে থাকি। সেবা করি তাঁর। আবার হাসল মেয়েটি। চোখের কোলগুলোও তার হেসে উঠল। কপালের কাচপোকার টিপটা চিকচিকিয়ে ঝিলিক দিল বার কয়েক। ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোয় তা দেখতে পেল না মণিমালা। হিল্লোলিত নারীমূর্ত্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

এক ভাবে মণিমালা বসে রইল সেখানে। শিলীভূত মূর্তির মত নীরব নিথর।—তুই যেন কি হচ্ছিস্ দিন দিন বন্ধু! নে, দরজায় খিল দে আগে। সেই কঙ্কাল-মানুষটি আবদারের ঢঙে কথা বলল। রাত্রির নিস্তব্ধতায় স্পষ্ট কানে এল মণিমালার। চমকে উঠল সে। ক্রমেই মানুষের নতুন পরিচয় পাচ্ছে যেন সে। বড় বিশ্রী লাগছে এই নরককুণ্ড। নিজের নিশ্বাসের শব্দে চমক লাগছে তার। বিষসদৃশ মানুষের জীবনে বিতৃষ্ণা জাগছে।

* * * *

রাত্রির মধ্যযামে মনে পড়ল নিখিলকৃষ্ণর। জ্ঞানহারা মানুষের সাড় ফিরল বুঝি।—এইবার আমায় ছুটি দাও মাইরী। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলল। অনুরোধ করল বন্ধুদের।—এইবার আমি যাই ভাই। বৌটা একা রয়েছে মাইরী। ব্যাচারীকে শেয়ালে টেনে নিয়ে যায় যদি! বন্ধুর দলে হাসির ফোয়ারা ছুটল। পরস্পর ঠেলাঠেলি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।—কি যে বলিস্ নিখ্‌লে! যা যা বাড়ী যা। নতুন বিয়ে করে বাইরে থাকতে নেই রাত্তিরে।

চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না নিখিলকৃষ্ণ। পরিচিত পথ, তাই কোন মতে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে গান গাইছে। শূন্যে ঘুষি চালাচ্ছে একেকবার। স্বগত করছে কখনও কখনও,—শালার অন্ধকার!

বাগানের বেড়া ডিঙ্গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল সে। নিজের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল গরাদ ধরে। নেশাচ্ছন্ন চোখে বহু কষ্টে দেখল, নতুন বৌ ঘুমোচ্ছে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে মণিমালা। ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোয় সডৌল দেহটি তার বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। অসংবৃত বসনে প্রতিটি অঙ্গের রেখা নির্লজ্জের মত ফুটে উঠেছে, বেশ লাগছে দেখতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিল হয়ত, ক্লান্ত হয়ে তন্দ্রা লেগেছে এতক্ষণে। ভাবতেও মায়া হয় নিখিলকৃষ্ণর।

—কাম কাম ডিয়ার লেডী। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জানলার গরাদ একটা সজোরে উপড়ে নেয় সে। রাত্রির অতিথিদের জন্য তার ঘরে এমন অনেক গরাদ আলগা করাই থাকে। শয্যাসঙ্গিনীরা এসে জানলায় দাঁড়ায়। বদ্ধ ঘরে ডেকে নেয় নিখিলকৃষ্ণ। জানলার গরাদগুলো তাই প্রায়ই সব আলগা। সিঁদেল চোরের মত নিজেকে গলিয়ে দেয়। ঘরের ভেতর ঢুকে এগিয়ে যায় মণিমালার কাছে। সহাস্যে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমন্ত মণিমালাকে। বিছানায় শোয়াবার জন্য টেনে নিয়ে যেতে চায় কোলে করে। টান লাগে ওপর থেকে। মণিমালার গলাটা বাঁধা: কুমড়োর সিকেয় ঝুলছে, শূন্যে ঝুলছে তার প্রাণহীন দেহ। নিখিলকৃষ্ণ কোলে করে দেখে নতুন বৌয়ের মুখখানা। কোন কষ্টের চিহ্ন সে-মুখে নেই, অভিমানে প্রাণটা বেরিয়ে গেছে মাত্র।

হাস্যময়ী গঙ্গা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

পশ্চিমে চাঁদ নামিয়া আসিছে
সম্মুখে গঙ্গা হাস্যমুয়ী;
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউএ আলো ভেঙে যায়,
ঢেউ আলো হাসে কি কথা কহি।
জোয়ারের জল কানায় কানায়
কূলে কূলে তাহা ফুলিয়া বহে।
চাঁদের আলোকে গলা কাচ যেন
তরল-উচ্ছল ছুটিয়া বহে।
যেথা সরু জল সেথায় রূপালি,
চওড়া যেথায় রূপার ধোঁয়া।
অবাধ আলোকে অবাধ সলিলে—
রূপালি ধোঁয়ায় গগনে ছোঁয়া।
আহা মরি মরি এ কি অপরূপ,
এ কি রে উদার প্রকৃতি-লীলা!
অসীম ধরারে মুছিয়া ডুবায়ে
অসীমা তটিনী হাস্যশীলা।
এই বেঁকে যায় জাহাজের মুখ,
আবার হেরি যে তটের রেখা,
শুভ্র চাদরে কে যেন টানে রে
পাড় সম সরু কাজল-লেখা।
সে সরু কাজল মোটা হ'য়ে ফোটে,
তার শিরে হেরি গাছের মাথা;
তারি ফাঁকে ফাঁকে কুটীর দু'-এক,
ঝোপে আর ঘাসে বিছানা পাতা।
আবার জাহাজ সোজা চ'লে যায়,
আবার গঙ্গা ধোঁয়ায় ঢাকা;
আলোর রৌপ্য গুঁড়া হ'য়ে যেন
নিরবধি সেই ধোঁয়াতে মাখা।
গঙ্গা, গঙ্গা, অলসগামিনী
কোটি ক্রোশ ব্যেপে আসিছ ধীরে;
স্নেহের ধারায়, পুণ্য-ধারায়
শীতলিছ' এই ধরণীটিরে।
ওগো শীতভোয়া স্নিগ্ধা জননী,
স্নিগ্ধ করিছ চোখ ও বুকে;
তোমারি দুলাল আমি শুয়ে রই
তোমারি বক্ষে পরম সুখে।

বিপিন চা করে ভাল। কতটুকু জল ফুটিলে এবং কতটুকু চায়ে কতটুকু চিনি এবং দুধ মিশাইলে নেশা ভাল করিয়া জমে ময়রার ছেলে বিপিন যেন তাহা রীতিমত শিক্ষা করিয়াছে।

অন্নদা বলে—বিপিন, বেশ কড়া করে চা দাও দিকিন্, এক গ্লাস গোকুল দা'কে দিয়ে আসি—

বিপিন বলে—কেন, গোকুল দা' নবাব না কি—দোকানে এসে খেতে পারে না?

অন্নদা বলে—ওরে বাপ্‌রে, দেখগে যা মুখখানা, ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে—কাল রাত্তিরে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রাণটা যেত আর কি—

দত্ত কোম্পানীর তিনখানা বাস কেষ্টগঞ্জ হইতে লক্ষ্মীকান্তপুর যাতায়াত করে। 'উর্বশী' নামের বাসটার কণ্ডাক্টার অন্নদা আর ড্রাইভার গোকুল।

বিমল মিত্র

কেষ্টগঞ্জের বাজারের মোড়ে তিনখানা বাস রোজ সকালবেলা সার দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ওদিকে মধুসূদনের ডাক্তারখানা 'দুর্য্যোধন হারব্যাল হোম,' তার পাশে হরিহরের মেটে-হাঁড়ীর দোকান আর তাহারই সামনা-সামনি 'পবিত্র হিন্দু হোটেল'। ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার মুখেই 'আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের' সাইনবোর্ডটা নজরে পড়ে—ভোরবেলা তাহার বাঁ দিকে ছাইগাদার উপর কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর তখনও কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে।

'আদর্শ মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে'র একাংশ চায়ের দোকান। কমলা-রংএর আলোয়ানটা জড়াইয়া অন্নদা চায়ের দোকানের উনানটির কাছে ঘেঁষিয়া একটা বেঞ্চির উপর গুটিসুটি মারিয়া বসিল।

চায়ের জল তখনও গরম হয় নাই! যা ঠাণ্ডা, হাত-পা জমিয়া বরফ হইবার জোগাড়। হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিপিন উনানে হাওয়া দিতেছিল। এখনি প্যাসেঞ্জার আসিয়া পড়িবে—[illegible] না। তা

অন্নদা চা আনিয়া দিল। বলিল—খাবে কী করে'? ব্যাণ্ডেজটা খোল—

গোকুলের সারা মুখটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, শুধু চোখ দু'টা খোলা আছে। কিন্তু নেশাখোর গোকুলের কাছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ঠোঁটের কাছে কাপড়টা একটু টানিতেই ফাঁক হইল। চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়া গোকুল বলিল—আঃ। ভাল লাগিবার অবশ্য অন্য কারণও আছে। প্রথমতঃ বিপিনের তৈরী চা, তার পর গতরাত্রির অ্যাক্সিডেণ্ট—আর তা' ছাড়া তিন দিন ধরিয়া যে বৃষ্টিটা হইতেছে। শীতকাল একে, তা'র বৃষ্টি। আর বৃষ্টি বলিয়া বৃষ্টি! কাল সারা রাত কোথা দিয়া যে বাস চালাইয়াছে সে-ই জানে—জলের নীচে পথ, নদী, মাঠ একাকার হইয়া গিয়াছে; অচেনা ড্রাইভার হইলে কী করিত কে জানে? গোকুল আজ কত বছর এই লাইনে বাস চালাইতেছে, তাই কোন রকমে কয়েকটা চিহ্ন দেখিয়া রাস্তাটা চিনিয়া লইতে পারে। কিন্তু [illegible]

পুরুত একটা পেতলের প্রদীপের সামনে নারায়ণ সাক্ষী করিয়া নাম-মাত্র দু'টো নমঃ নমঃ করিয়া সম্প্রদান-কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়াছিল। রাত্রে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। গরুর গাড়ীর মধ্যে অন্ধকারে বাতাসীর সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া বুঝিয়াছিল যাহাকে বলে উদ্ভিন্নযৌবনা, বাতাসী সেই বয়সের। কিন্তু ট্রেণে উঠিয়া ইণ্টার-ক্লাশের ক্ষীণ আলোয় বাতাসীর মুখখানি দেখিয়া গোকুল বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিল। কী জানি কেন গোকুলের সেদিন মনে হইয়াছিল, মুখখানি যেন অপরূপ। একটু আড়াল পাইলে হয়ত সেই ট্রেণের কামরাতেই গোকুল কত কী বলিয়া ফেলিত, কিন্তু অমন সুন্দর মুখখানি যে কতটা মুখরা হইতে পারে বাড়ীতে আনিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

বেহায়ার একশেষ নতুন বউ—জানালার ধারে দাঁড়াইয়া, মাথায় ঘোমটা নাই—গায়ে ব্লাউজ নাই—খোলা পিঠটা রাস্তার দিকে দিয়া চুল শুকাইতেছে। প্রথম প্রথম আপত্তি গোকুল করে নাই। কিন্তু হয়ত গোড়া হইতেই গোকুলকে ভাল লাগে নাই বাতাসীর। গোকুলের আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া পুলকিত হওয়ার পরিবর্ত্তে বাতাসীর বোধ হয় দম আটকাইয়া আসিত। মদের গন্ধ মুখ দিয়া নিশ্চয়ই বাহির হইত—কিন্তু গোকুল মদ খায় বলিয়া যেমন অন্য স্ত্রীরা করিয়া থাকে বাতাসী এতটুকু আপত্তি করে নাই।

কী একটা কথায় বাতাসী একেবারে হাসির কলোচ্ছ্বাস তুলিয়া গলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে···আর সেই হাসির তালে তালে শরীরের রেখায় রেখায় উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উঠিতেছে।

গোকুল একবার সে দিকে চাহিল—তার পর অ্যাকসিলারেটরটা আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া ষ্টীয়ারিংটা শক্ত করিয়া ধরিল। এদিক-টায় বেশী জল জমিয়াছে—আকাশে মেঘ করিয়া এমন অন্ধকার করিয়া আছে যেন হেড-লাইটটা জ্বালাইলেই ভাল হয়।

দু'জন যাত্রীকে তিনহুরিয়ায় নামাইয়া দিয়া গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

অন্নদা বলিল—দেখ গোকুলদা' কাণ্ড দেখ—

গোকুল চাহিয়া দেখিল—এবার ছেলেটিকে কোলে করিয়াছে মুসলমানটি আর বাতাসী শালমুড়ি দিয়া আদরের ভঙ্গীতে তাহারই শরীরের উপর ঠ্যাসান দিয়া একাকার হইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মুখখানির মধ্যে শুধু চোখ দু'টি দেখিয়া অন্নদা কল্পনাও করিতে পারিল না যে, ওই দৃশ্যটা দেখিয়া গোকুলদা' হাসিল, কি অবাক হইল, কি উত্তেজিত হইল। অন্নদা বলিল—বড্ড বেহায়া, না কি বল গোকুল দা'—

গোকুল এবারও উত্তর করিল না।

কয়েক দিন ধরিয়াই সন্দেহ হইতেছিল গোকুলের। যেন বড় বেশী সাজ-গোজ। সোহাগের বউ বলিয়া রঙিন সাড়ী পরিতে দিত বাতাসীকে। সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া গোকুল অকাতরে ঘুমাইত। সেই ঘুম-জড়ানো চোখে বাতাসীর সাজা-গোজা দেখিয়া এক একদিন অবাক হইত গোকুল। খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া, চুলে গন্ধ-তেল মাখিত—বড় করিয়া কুঙ্কুমের টীপ্ দিত কপালে—পায়ে আলতা পরিত। দিনের বেলার বাতাসীর সঙ্গে রাত্রের বাতাসীর যেন তেল-জলের সম্পর্ক। এক একদিন কী সন্দেহ করিয়া গোকুল বাতাসীকে নিজের বাহুযুগলের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতেই বাতাসী একেবারে কেউটে শাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া উঠিত।

সে দিন কিন্তু হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গেল।

মাঝ রাত্রে বড় একটা গোকুলের ঘুম ভাঙ্গে না—কিন্তু সেদিন ঘুম ভাঙিয়া দেখে বিছানায় বাতাসী নাই। সেই অন্ধকারেই গোকুল ঘরের বাহিরে আসিল। বার-বাড়ীর গোয়ালের মধ্যে কাহাদের ফিস্-ফিস্ আওয়াজ শুনিয়া সেই দিকে যাইতেই বেড়া ঠেলিয়া যে বাহিরে পলাইল সে এক জন পুরুষমানুষ। বাতাসীও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে—

ঘরের মানুষ ঘরেই থাকিবে মনে করিয়া, গোকুল লোকটার পিছন পিছন ছুটিল। কিন্তু অন্ধকারে যাহারা লুকোচুরি খেলে তাহাদের ধরা অত সহজ নয়। বাড়ী ফিরিয়া গোকুল দেখিল—বাতাসীও পলাইয়াছে! তাহাকেও আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

বাস এবার পাহাড়ী উপত্যকার ভিতর দিয়া চলিয়াছে;

অন্নদা বলে—একটু আস্তে চালাও গোকুল দা'—গা কাঁপছে—

গোকুল বলে—দূর, ভয় কি,—

কিন্তু অন্নদাকে অভয় দিয়াও নিজে সাবধান হইতে পারে না গোকুল। আজ যেন তাহার মনের প্রতিক্রিয়া গাড়ীর অ্যাকসি-লেটরেই আরো বেশী করিয়া চাপ দিতেছে।

খোয়াং আসিতেই বাতাসীরা ছাড়া আর সবাই হুড় হুড় করিয়া নামিয়া পড়িল। এই খোয়াং ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিয়া তাহারা শিমূল-গুড়ি যাইবে।

গাড়ী আবার ছাড়িয়া দিল।

বৃষ্টির তেজ ক্রমেই বাড়িতেছে। এক এক সময় নদীর সমান্তরালে গাড়ী চলে আবার বাঁকিয়া নদীকে অনেক দূরে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া যায়। নদীর দিকে চাহিলেই অন্নদার অন্তরাত্মা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ওঠে। এমন স্রোত জলের দু'পাশে উঁচু পাড়—পাহাড়ী খাদের ওপর ঘোলাটে জলের স্রোত যেন লাফাইয়া ফুঁপাইয়া রাগে গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিতেছে।

কিন্তু গোকুল ভাবিতেছিল অন্য কথা।

বাতাসী পলাইয়া যাইবার দু'বছর পর খবর আসিয়াছিল বাতাসী না কি চাটগাঁয়ের বাজারে রসিক মণ্ডলের ঘরে আছে।

গোকুল তখন এই দত্ত-কোম্পানীর ফলাহারী দত্ত বাবুর কাছে নতুন চাকরী নিয়াছে। ছুটি নিয়া গোকুল সোজা একেবারে রসিক মণ্ডলের বাড়ী ঢুকিয়া বাতাসীর চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়াছিল বাজারের ভিতর। আর বাজার-শুদ্ধ লোকের সে কি ভীড়, কীল, ঘুষি আর চড়—কী অমানুষিক শাস্তি যে পাইল বাতাসী, তা' সেই জানে।

সেই দিনই ট্রেণে করিয়া বাতাসীকে লইয়া গোকুল বাড়ী

আসিতেছে—পথে কোন ষ্টেশনে জল খাইতে নাবিয়াছিল—জল খাইয়া ট্রেণে উঠিতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল ; কিন্তু চাহিয়া দেখে বাতাসী নাই ; উল্টা দিকের দরজা দিয়া কখন নামিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

তার পর আজ দেখা এই 'উর্ব্বশীতে'।

খোয়াং ষ্টেশন পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও যেমন বন্ধুর, পথও তেমনি দুর্গম।

নদীটা হঠাৎ এক একবার বাঁকিয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়ে—আর কোন বার রাস্তাটা একেবারে নদীর বুক ছুঁইয়া আসে। বৃষ্টিতে, জলে, কাদায় দুর্য্যোগে মিলিয়া আজ যেন মহা প্রলয়ের পূর্ব্বাভাব সূচনা করিতেছে। গোকুলের হাতটা বার বার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কী জানি কেন, সে যেন চেষ্টা করিয়াও নিজেকে সংযত করিতে পারিতেছে না।

দূরে একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা গেল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারই উপর উঠিতে হইবে। উহারই ওপারে গোবরা। নিজের হাতে আর পায়ে গোকুল যেন অভূতপূর্ব্ব এক বিদ্যুৎ-সঞ্চালন অনুভব করে! তা'র মনে হয়—যেন এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সাহায্যে সে ওই গিরিচূড়া সোজা চড়াই-পথেই লঙ্ঘন করিতে পারে। কালই যে দুর্ঘটনার দুর্য্যোগে তাহার শরীরে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে, আজ যেন আর তাহার সে-কথা মনে পড়ে না।

গোকুল অ্যাক্‌সিলেটরটা আরো জোরে চাপিল।

বিকট গর্জ্জন করিয়া মটর দ্বিগুণ বেগে চলিতে লাগিল।

প্রতি মুহূর্ত্তের নিশ্বাসপতনে এক একটি মিনিট, পল দণ্ড ছারখার হইয়া যায়।

অন্নদা বলে—দেখ দেখ পেছনে চেয়ে—কাণ্ড দেখ—

গোকুল দেখিল। তাহাদের বাহিরের পৃথিবী যে এত দ্রুত গ্রহান্তরে আসিয়া পড়িতেছে সে দিকে যেন খেয়াল করিবার প্রয়োজনও বোধ করে না তাহারা। বাতাসীকে বহু দিন আগে গোকুল একটা পানের কৌটা কিনিয়া দিয়াছিল—সেই পানের কৌটাটা বাহির করিয়া বাতাসী পান সাজিয়াছে। একটি পানের খিলি বাতাসী নিজে হাতে লোকটিকে খাওয়াইবে—আর লোকটির বোধ হয় অভিমান হইয়াছে, কিছুতেই খাইবে না ;—এই এক খিলি পান লইয়া এক ঢলাঢলি কাণ্ড তাহাদের—

হঠাৎ কী যে হইল, ভিতরে পানের খিলি লইয়া উহাদের রঙ্গ চলিতে লাগিল, আর এক হ্যাঁচকা টানে সমস্ত গাড়ীটা এক ছুট লাফাইয়া গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে সুরু করিল ; তার পর সেই ঘোরানো পাহাড়ী পথ বাহিয়া পঞ্চাশ মাইল বেগ—গ্রহ নক্ষত্র সব নিস্তব্ধ নিথর···শুধু অবিশ্রাম বৃষ্টির ঝরণাধারা, গতির ঝড়ে সময়ের পাখনা দু'টি কখন অচল হইয়া গিয়াছে—

অন্নদা চীৎকার করিয়া বলে—থামাও, গোকুলদা'—থামাও—বলিয়া গোকুলদা'র দু'টা হাত চাপিয়া ধরে—

থামাব বৈ কি ! থামাব !···গোকুলদা কেন থামাবে !···কেউ থামাবে না···গাড়ী আকাশে তুলে নিয়ে যাবো—এই পাহাড়গুলো পেরিয়ে আর একটা উঁচু পাহাড়ে উঠবো !···তার পর অপর একটা··· আর একটা,···এমনি করে ষ্টীয়ারিংটা ধরে' ওপর থেকে ঘুরিয়ে দেব—আর গাড়ীখানা গড়াতে গড়াতে খোয়াং নদীর মধ্যে গড়িয়ে পড়বে··· সব ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে···বাতাসী মরবে···বাতাসীর বাবু মরবে··· তুই মরবি···আমি মরবো···আমি কেন থামাবো···পঞ্চাশ মাইল,··· ষাট মাইল—মিটারের দিকে চেয়ে দেখ···এইবার ফাটবে,··· চুরমার হ'য়ে ফাটবে,···আমি থামবো কেন,···আমার তো এখন মজা।

পরদিনই দত্ত কোম্পানীর ফলাহারী দত্ত বাবু গোকুলকে ডিসমিস করিয়া দিলেন। বলিলেন—তখনি জানি, ও বিয়ে-থা করেনি, ও তো পাগল হবেই—ভগবান বাঁচিয়েছেন—

ডিব্রুগড় শিবসাগরের পথে পথে গোকুল একা একা ঘুরিয়া বেড়ায়। 'উর্ব্বশী' পাশ দিয়া গেলেই সেই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে আর বিড় বিড় করিয়া কত কী বকে।

প্রেমের প্রতি

শ্রীঅরুণ সরকার

তোমায় দেখেছি।
সুরের মাথায় দেখেছি তোমায়, প্রণয়-খেলায় দেখেছি।
আজকে আবার ঝড়ের রূপে দেখতে এলাম।
জীবন হ'তে হঠাৎ যেন
জীবন জয়ের ইশারা পেলাম।

খর-বিদ্যুৎ জ্বলে না, জ্বলে না,
জীবন এখন মেঘ থমথম্ চাওয়ার বেলা,
পাওয়ার বাদল নামে না, নামে না,
ভাঙে না আকাশ বৃষ্টি-ঢালা।

হারানো শ্রাবণে অনেক স্মৃতির তুফান-ঝড়
ভুলেছে সে সব বিবর্ণ এই প্রাচীন মন,
তোমায় মাঝেই ঝঞ্ঝা নতুন উন্মুখর
মাতাল হাওয়ায় চপল-হৃদি সমর্পণ।

প্রতীক্ষার এই গুমোট গরম কাটিয়ে দাও
মুক্ত জীবন ঘূর্ণিঝড়ে ছিটিয়ে দাও।

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বায়রণ তাঁহার পিতার ন্যায় অমিতব্যয়ী ছিলেন। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে প্রাপ্য অর্থের তাগাদায় নয় বার তাঁহার কাছে পেয়াদার সমাগম হইয়াছিল এবং তাঁহাকে তাঁহার লাইব্রেরী বিক্রয় করিয়া দিতে চইয়াছিল। বহু পুস্তক প্রণয়ন করিলেও সেগুলির স্বত্বসংরক্ষণে তিনি যত্নবান্ ছিলেন না—হয় বিক্রয় করিয়া দিতেন, নতুবা কোন দরিদ্র বন্ধুকে দান করিতেন। ইহার উপর নাট্যশালার প্রতি বায়রণের অত্যধিক আসক্তি ও বহু রমণী-প্রীতি শ্রীমতী বায়রণকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করিয়া তুলিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান কুমারী আগষ্টা এডার জন্ম হয়। ইহার পর তিন মাস অতিক্রান্ত হইতে না হইতে ইসাবেলা বায়রণের বিরুদ্ধে মস্তিষ্ক-বিকৃতির অভিযোগ আনিয়া এবং তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ রহস্যজনক বক্রোক্তি করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করেন এবং শিশু-কন্যা এডাকে লইয়া অন্যত্র গিয়া বাস করিতে থাকেন।

বায়রণ ডুবিলেন। নিমেষ মধ্যে তাঁহার যশঃ-সূর্য্য কুৎসা-কালিমায় ঢাকিয়া গেল—এক লহমায় ভূমিসাৎ হইয়া গেল তাঁহার বড় সাধের বিজয়-সৌধ—তাঁহার সকল আশার—সব আকাঙ্ক্ষার হইল অপমৃত্যু।

টমসন লিখিয়াছেন, "There is no need to say anything more of this unhappy episode, save that it brought about Byron's social ruin and led him into those fatal irregularities which, in spite of rumour, he seems to have avoided previously."

—এই অসুখকর পরিণতির পর ইহার বেশী আর কিছু বলিতে হইবে না যে, ইহা তাঁহার সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে শোচনীয় অসংবৃত্তির পথে পরিচালিত করিল, যে অসংবৃত জীবনকে তিনি কাণাঘুষা সত্ত্বেও মনে হয় ইতিপূর্ব্বে পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন। লোকে এখন মনে করিতে লাগিল, তাহারা বায়রণের রহস্যের মায়া-আবরণের মোহে মুগ্ধ হইয়া ভুল করিয়াছে। সে আবরণের অন্তরালে আজ তাহারা যেন অসার পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। বায়রণ এক নিমেষে জনসাধারণের সকল শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হইলেন। নিন্দা-অপমানের তীব্র জ্বালায় দগ্ধ হইয়া আশাভঙ্গের বেদনায় মুহ্যমান হইয়া ব্যর্থ অভিশপ্ত জীবন লইয়া ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল জন্মের মত বায়রণ ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন। হায় বায়রণ! হতভাগ্য তুমি—জন্মভূমি ইংলণ্ডে তোমার স্থান হইল না। হায় ইংলণ্ড! হতভাগিনী তুমি—এত বড় কৃতী সন্তানের জন্য তোমার এক-বিন্দু করুণা সঞ্চিত রাখিতে পারিলে না?

এই সময়ে বায়রণ যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই তাঁহার ব্যর্থ গার্হস্থ্য জীবনের বেদনাময় করুণ কাহিনীর অভিব্যক্তি এবং অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল তাঁহার প্রিয়তমা বৈমাত্রেয় ভগিনী শ্রীমতী লীর (Mrs. Leigh) উদ্দেশে। বায়রণ চিত্রাঙ্কনের প্রয়াসী হইয়া তাঁহার এই "Domestic Pieces" বা "গার্হস্থ্য কণিকা"র কিছু আলোচনা না করিলে রচনা অসম্পূর্ণ হইবে। ইহাতে দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার পরিণীতা পত্নীকে প্রকৃতই ভালবাসিতেন। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি প্রিয়তমা ইসাবেলার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কথিত আছে, মিসোলঙ্ঘির রণক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় পত্নী ইসাবেলা ও কন্যা এডার উদ্দেশে পত্র লিখিয়া তিনি অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পত্নী যখন বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলেন, তখন বড় দুঃখেই বায়রণ লিখিয়াছিলেন,

> A year ago, you swore, fond she!
> "To love, to honour," and so forth:
> Such was the vow you pledged to me,
> And here's exactly what 't is worth.

> বাসিতে ভাল, রাখিতে মান, আরো কী কত করিতে
> মূর্খ নারী! আমার লাগি হয়েছে শপথ স্মরিতে
> একটি বছর মাত্র আগে। আজিকে ভাল বুঝিনু
> সে শপথের মূল্য কিবা, সেদিন যাহা খুঁজিনু।

ইংলণ্ড হইতে শেষ বিদায়ের প্রাক্কালে প্রিয়তমার স্মরণে Fare thee well" নামক কবিতাটিতে যে বেদনা যে দুঃখ যে ক্ষমাশীল প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহার অন্তরের শুভ্রতাই প্রমাণিত হইতেছে।

> Fare thee well! and if for ever,
> Still for ever, fare thee well:
> Even though unforgiving, never
> 'Gainst thee shall my heart rebel.

> বিদায় প্রিয়া! বিদায় প্রিয়া! জনম-শোধ যদি তা হয়,
> হোক্ না কেন জনম-শোধই, জানি সে তাতে হবে না ভয়।
> আমার প্রতি যদি গো অয়ি না জানে ক্ষমা তোমার হিয়া,
> তথাপি কভু অনুযোগের একটি বাণী না যাব' নিয়া।

তুমি আমাকে ক্ষমা না করিতে পার তথাপি আমি তোমার প্রতি কোন দিন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতে পারিব না।

> Would that breast were bared before thee
> Where thy head so oft hath lain,
> While that placid sleep came o'er thee
> Which thou ne'er canst know again:
> Would that breast, by thee glanced over,
> Every inmost thought could show!
> Then thou wouldst at last discover
> 'T was not well to spurn it so.

> নগ্ন করি দেখাতে তোমা পারিত যদি বক্ষ হায়
> যাহার 'পরে সোহাগ ভরে হেলায়ে মাথা রাখিতে প্রায়
> শান্তিভরা তন্দ্রা যেথা তোমার চোখে নামিত ধীরে
> যাহারে তুমি প্রেয়সী অয়ি আর না কভু পাবে গো ফিরে—
> সেই সে হিয়া পারিত যদি ধরিতে কভু তোমার চোখে
> গহনতম প্রতিটি বাণী যা আছে লেখা মরম লোকে,
> তাহলে, আমি জানি গো জানি, বুঝিতে শেষে পারিতে প্রিয়া,
> কর'নি ভাল এমন করে' তাহারে পায়ে ঠেলিয়া দিয়া।

Though the world for this commend thee—
Though it smile upon the blow,
Even its praises must offend thee,
Founded on another's woe.
বিশ্ব তবু প্রশংসাতে মুখর হয়ে যদি-ই উঠে
আর্ত্ত 'পরে আঘাত হেরি অধর পরে হাস্য ফুটে
কিন্তু তবু তুষ্টি পেয়েও ব্যথায় হিয়া উঠবে ভরি,
অপর জনের বেদনাতে তুষ্টি এ যে উঠছে গড়ি।
Though my many faults defaced me,
Could no other arm be found,
Than the one which once embraced me,
To inflict a careless wound ?
অনেক দোষে দুষ্ট যদি—বিকৃত রূপ হয়েই থাকে—
অন্য কেহ ছিল না কি দেবার তরে শাস্তি তাকে ?
যে বাহু আগে জড়ায়ে প্রেমে রচিয়া দিল কণ্ঠহার
না-সারা ক্ষত আঁকিতে বুকে সে বাহু ছাড়া ছিল না আর ?
Yet, oh yet, thyself deceive not ;
Love may sink by slow decay,
But by sudden wrench, believe not
Hearts can thus be torn away :
জানি গো জানি, তথাপি জানি, প্রবঞ্চনা তোমার নয়
প্রেম সে ক্রমে মুছিতে পারে ধীরে তা ক্রমে পায় যে ক্ষয়।
কিন্তু তবু ভাবিনি কভু হেঁচকা টানে এমন ভাবে
অকস্মাৎ দুইটি হৃদয়—যা ছিল এক—ছিঁড়িয়া যাবে।
Still thine own its life retaineth,
Still must mine, though bleeding beat :
And the undying thought which paineth
Is—that we no more may meet.
তথাপি তোমার জীবন-ধারা যেমনি বহে আগের মত
আমারো জীবন বহিবে জানি যদিও তাহা হয়েছে ক্ষত ;
বিরাম-বিহীন একটি কথা আনিছে যাহা বেদন-ভার—
তোমায় আমায় এ জীবনে হয়ত দেখা হবে না আর।
These are words of deeper sorrow
Than the wail above the dead
Both shall live, but every morrow ;
Wake us from a widow'd bed.
মৃতের 'পরে আর্ত্তনাদে বিলাপ করার বিরাট ব্যথা
তাহার চেয়েও তীব্রতর বেদনভরা এই যে কথা।
দু'জনে মোরা বাঁচিয়া র'ব, তথাপি জাগি প্রতিটি প্রাতে
দেখিব চেয়ে রয়েছি একা সঙ্গিহারা বিছানাতে!
And when thou wouldst solace gather,
When our child's first accents flow,
Wilt thou teach her to say "Father" !
Though his care she must forego ?
বেদনা হলে প্রশমিত, শান্তি পাবে যখন আর,
মোদের শিশু—কণ্ঠে যবে প্রথম ভাষা ফুটবে তার
শেখাবে কি তখন তুমি "বাবা! বাবা!" বলতে তারে
চাইবে না সে যাহার স্নেহ—উপেক্ষা সে করিবে যারে ?

এ স্বরে কত বেদনা—এ লেখায় যেন বক্ষ-শোণিত ঝরিয়া পড়িতেছে। কন্যা তাঁহাকে চিনিবে না! মুখে যখন প্রথম আধ-আধ স্বর ফুটিবে তখন কন্যার মাতা কি তাহাকে "বাবা" বলিতে শিখাইবেন ? বায়রণের ক্ষুধিত পিতৃ-হৃদয় একথা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

When her little hands shall press thee,
When her lip to thine is press'd,
Think of him whose prayer shall bless thee,
Think of him thy love had bless'd.
ছোট্ট কচি হাত দুটিতে যখন তোমায় জড়াবে সে
ওষ্ঠে তাহার ওষ্ঠ চাপি যখন তুমি উঠবে হেসে
তখন ভেবো একটি জনে শান্তি তব কাম্য যার
একদা যায় বাসতে ভাল বারেক কোরো স্মরণ তার।
Should her lineaments resemble
Those thou never more may'st see,
Then thy heart will softly tremble
With a pulse yet true to me.
একটি জনের মতই যদি হয় গো তারি আননখানি
যাহার সাথে আবার কভু দেখার আশা নেই ক' জানি,
তখন প্রিয়া মৃদুল দোলে চিত্ত তব কাঁপবে না কি ?
একটি স্মৃতি স্মরণ করে সজল হবে একটু আঁখি ?
All my faults perchance thou knowest,
All my madness none can know ;
All my hopes, where'er thou goest,
Wither, yet with thee they go.
হয়ত জান তুমি আমার সকল ত্রুটি সকল কথা,
আর ত কেহ জানে নাক' আমার কোন বাতুলতা
সকল আশা শুষ্ক হলেও তবু রবে তোমার সাথে,
যেথায় তুমি যাবে প্রিয়া যইবে তারাও সেই সে খাতে।
Every feeling hath been shaken ;
Pride, which not a world could bow,
Bows to thee—by the forsaken.
Even my soul forsakes me now.
চূর্ণ মম সকল কলি ; পায়নি কেহ প্রণাম যার ;
গর্ব্ব সে মোর—নুইয়ে মাথা তোমায় দেছে নমস্কার।
তোমায় ছেড়ে তাইত প্রিয়া আজকে মম চিত্ত হায়
তোমা-হারা বুকের মাঝে রইতে বাঁধা আর না চায়।
But 't is done—all words are idle—
Words from me are vainer still ;
But thoughts we cannot bridle
Force their way without the will.
তুচ্ছ এবে সকল কথা—আজিকে সব গিয়াছে চুকে
তুচ্ছতর অসারতর বাণী কিসের আমার মুখে ;

তথাপি মোরা যে সব কথা চাপিয়া হৃদে রাখিতে নারি,
ইচ্ছা বিনা বাহিরে এলে কী আর বলো করিতে পারি ?

Fare thee well ! thus disunited,
Torn from every nearer tie.
Sear'd in heart, and lone, and blighted,
More than this I scarce can die.

ছিন্ন আজি মিলন-রাখী—বিদায় প্রিয়া, বিদায় চাই !
নিকটতর বাঁধন সবি ছিঁড়িয়া দূরে ভাসিয়া যাই
সঙ্গিহারা ফিরি যে একা, ব্যর্থ হিয়া ঝলসে হায়,
ইহার চেয়ে মরণ ভাল, কামনা কভু করিনি যায়।

পত্নী ইসাবেলা যে বায়রণের কত প্রিয়তমা ছিলেন—তিনি যে তাঁহার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যেখানে তিনি গভীর মর্ম্মবেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

I have had many foes, but none like thee
For 'gainst the rest myself I could defend,
And be avenged, or turn them into friend ;
But thou in safe implacability
Hadst nought to dread—in thy own weakness shielded
And in my love, which hath but too much yielded,
And spared, for thy sake, some I should not spare ;

বহু শত্রু ছিল মম, তথাপি তেমন
ছিল নাক' এক জন তোমার মতন।
ছিল যারা, আত্মপক্ষ করি সমর্থন
পারিতাম প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ ;
অথবা সে মিত্ররূপে নিতাম বরিয়া ;
তুমি কিন্তু অপ্রশম্য ভয়-শূন্য হিয়া,
আপন দৌর্ব্বল্য, আর মোর প্রেম নিয়ে
নিরাপদে বর্ম্মাবৃত বসে' ছিলে প্রিয়ে।

যার কাছে করিয়াছি বশ্যতা স্বীকার
ভালবেসে ক্ষমা করে মানিয়াছি হার
ক্ষমিতে তখন যারে উচিত ছিল না,
তাহারে করিয়া ক্ষমা পেয়েছি লাঞ্ছনা।

ইসাবেলার জন্ত বায়রণ দুঃখ পাইয়াছেন, দেশত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রতি এক বিন্দু দোষারোপ করেন নাই, সকল দোষ-ত্রুটি আপনার স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনীকে লিখিত এক পত্রে ("Epistle to Augusta") দেখিতে পাই, তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, সব দোষ তাঁহার, সুতরাং তাঁহাকেই ফল ভোগ করিতে হইবে। সংসারের সহিত আজন্ম কঠোর সংগ্রাম করিয়া তিনি জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছেন। তথাপি তিনি দেখিতে চান ইহার পরেও আর কী তাঁহার জন্ত সঞ্চিত আছে।

Mine were my faults, and mine be their reward,
My whole life was a contest, since the day
That gave me being, gave that which marr'd
The gift,—a fate, or will, that walk'd astray ;
And I at times have found the struggle hard,
And thought of shaking off my hands of clay ;
But now I fain would for a time survive,
If but to see what next can well arrive,

আমারি ত দোষ, আমারেই তাই পেতে হবে তার দাম,
সারাটি জীবন চলেছে যুদ্ধ—সংগ্রাম অবিরাম।
যে দিবা আমারে দানিয়াছে প্রাণ, আরো যে তা গেল দিয়ে
একটি নিয়তি, একটি কামনা, যা গেল' বিপথে নিয়ে।
দানের মহিমা হইল নষ্ট,—সংগ্রাম সুকঠোর—
এ মাটির মায়া কাটাবার সাধ মাঝে মাঝে জাগে মোর।
তবু আমি চাই আরো কিছু দিন এখনো বাঁচিয়া থাকি—
দেখিবার সাধ ইহার পরেও আরো কি রয়েছে বাকী।

শুধু ঐ উইল সম্পর্কে যে দুই-তিনটা দিন কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন হইল তাহার বেশী আর এক দিনও ভূপেন থাকিতে পারিল না, স্কুল খুলিবার দুই তিন দিন আগেই, বলিতে গেলে এক রকম পলাইয়া গেল। কিন্তু এ পলায়ন যে কাহার কাছ হইতে—সে প্রশ্ন তাহাকে করিলে সে বলিতে পারিত না।

[উপন্যাস]

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

এ কয় দিন সন্ধ্যার সহিত যে দেখা হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু সে দেখা হওয়াটায় কিছুতেই দুই-এক মিনিটের বেশী যাইতে দেয় নাই ভূপেন। কথা যা হইয়াছে তা-ও নিতান্তই কাজের কথা—যে গুলি না কহিলেই নয়। তাহার এই ইচ্ছা করিয়া এড়াইয়া যাওয়া সন্ধ্যাও লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু মুখে কোন নালিশ জানায় নাই—শুধু তাহার মুখের করুণ বিষণ্ণতা বিষণ্ণতর হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র। শেষ দিনে মোহিত বাবুর খবর লইয়া যখন সে চলিয়া আসিতেছে তখন সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা একটি মাত্র অনুরোধ জানাইয়াছিল, দেখুন মাষ্টার মশাই—আমার এখন ঠিক ইস্কুল কলেজের কোন কোর্স পড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। এমনি খান-কতক ভাল ভাল বই-এর তালিকা যদি তৈরী করে দিতেন ত বড় ভাল হ'ত!

এ প্রসঙ্গ আগে উঠিলে ভূপেন সব কাজ ফেলিয়া বোধ হয় তখনই ফর্দ্দ তৈয়ারী করিতে বসিত—কিন্তু আজ শুধু একটু ইতস্তত: করিয়া কহিল, আচ্ছা আমি ওখানে গিয়ে তোমাকে লিখে জানাবো সন্ধ্যা!

আসল কথা, সন্ধ্যার সান্নিধ্যে তাহার যেন ভয় করে। মোহিত বাবুর সেদিনকার ইঙ্গিতটা পাইবার পূর্ব্বে সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই যে, সন্ধ্যার সহিত তাহার সম্পর্ক নিতান্ত গুরু-শিষ্যের সুগভীর আত্মীয়তাবোধ ছাড়া অন্য কোন অন্তরঙ্গ ছায়া পড়িয়াছে কি না। প্রথম তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, সন্ধ্যার আচরণের সংবাদে। সে ম্লান হইয়া থাকে, সে কৃশ হইয়া গিয়াছে, পড়াশুনায় তাহার আর আগের মত অনুরাগ নাই—সব কয়টি সংবাদই নূতন একটা সম্ভাবনার আভাস দিয়াছিল। এবার মোহিতবাবুর কথায় সে সন্দেহ যখন দৃঢ়মূল হইয়া গেল তখন সে প্রথম নিজের মনটার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল—ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সাহস রহিল না। তাই, কতকটা সে যেন নিজের কাছে ধরা পড়িবার ভয়েই, কলিকাতা ছাড়িয়া সন্ধ্যাকে ছাড়িয়া সুদূর বীরভূমের পল্লীতে পলাইয়া গেল। সন্ধ্যা মিষ্ট, সন্ধ্যার সঙ্গ লোভনীয়, সে তাহার আত্মার আনন্দ—তবু সে সুদূর, সে শুধু মরীচিকা। সে যত দূরে থাকে ততই ভাল। যে সম্ভাবনা আজ অঙ্কুর—তাহাকে অঙ্কুরেই নষ্ট করা প্রয়োজন—কোন মতে তাহাতে না পত্রোদ্গম হয়। মোহিত বাবু যে দিন এই সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়াছিলেন সে দিন হইতে আজ তাহার দায়িত্ব আরও বেশী—কঠিন তাহাকেই হইতে হইবে, নহিলে নিজের কর্ত্তব্য পালনে হয়ত ত্রুটি ঘটিবে, হয়ত-বা প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। কলিকাতার বাতাসে তাহার যৌবন-স্বপ্নের জাল বোনা আছে—সেখানে ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন সে দেখিয়াছে—সে যে এক দিন বড় হইতে চাহিয়াছিল, নিজের প্রিয় ছাত্রীটিকে বড় করিতে চাহিয়াছিল সে কথা আজও সেখানে গেলে মনে পড়ে। আজও সন্ধ্যার চোখের দিকে চাহিলে সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত রূঢ় বাস্তব যেন ভুল হইয়া যায়—লোভে মন দুলিয়া ওঠে। তার চেয়ে এই ভাল। অল্প বেতন—কদর্য্য আহার, অন্ধকার। ভবিষ্যৎ—এই ভাল ভাল তাহার এই সহকর্ম্মীদের সঙ্গ, ভাল এখানকার রুক্ষ বাতাসে বাহিত অপর্য্যাপ্ত ধূলা! স্বপ্ন সে আর দেখিবে না, দেখিবার অধিকার তাহার নাই।

এবার স্কুল খুলিবার পর ভূপেন যেন কতকটা নিজের মনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই শিক্ষকতার কাজে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিল। সে আসিবার সময় নিজের টাকাতেই শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক দুই-একখানা বই কিনিয়া আনিয়াছিল, সে-গুলি সে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়া দিয়া জোর করিয়া মাষ্টার মহাশয়দের পড়াইতে লাগিল। টিফিনের সময় মাষ্টার মহাশয়রা একত্র হইলেই সে ভাল ভাল বাংলা বই হইতে খানিকটা করিয়া পড়িয়া শুনাইত। শুধু তাই নয়—এবারে সে সেক্রেটারীকে বলিয়া পদন, সালেক এবং আরও দুই তিনটি ছেলের কোচিং-এর ভার নিজের হাতে ও নিজের দায়িত্বে তুলিয়া লইল। অর্থাৎ ইচ্ছামত যাহাতে সে পড়ার বই-এর বদলে গল্পের বই-ও পড়াইতে পারে, সে অধিকারটুকু রাখিয়া দিল।

মাষ্টার মহাশয়রা সকলেই তাহাকে পাগল ঠাওরাইয়াছিলেন। কেবল অপূর্ব্ব বাবু প্রভৃতি দুই-এক জন এই পাগলামির মধ্যেও মতলব খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতেন। অবশ্য তাঁহাদের এ অসহযোগ—ভূপেনের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল, সেটা আর সে গ্রাহ্যই করিত না; তবু এক এক সময় হতাশ হইয়া পড়িত বৈ কি! বহু দিনের অজ্ঞতায়, মূর্খতায় ও অমনোযোগে যে অশিক্ষা যে অন্ধকার ছেলেদের মনে জমিয়া উঠিয়াছে তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করা নিজের কাছেও মধ্যে মধ্যে বাতুলতা বলিয়া বোধ হইত। তাহার উপর—সব চেয়ে বড় কথা, পড়াইবে সে কাহাকে? কী ভীষণ দারিদ্র্য ইহাদের, এর মধ্যে লেখাপড়ার প্রসঙ্গটাই যে অশোভন ঠেকে। এই পৌষ মাস, সবে ধান উঠিয়াছে চাষীদের ঘরে, তবু অর্দ্ধেক ছেলে একবেলা বেগুন-সিদ্ধ খাইয়া থাকে—কেহ বা খালি পেটে স্কুলে আসে—ফিরিয়া গিয়া একেবারে ভাত খায়। গরম জামা শতকরা একটা ছেলেরও নাই, জুতা ত স্বপ্ন।··· অধিকাংশ ছেলেই খালি পায়ে শুধুমাত্র একটা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ইস্কুলে আসে। অপেক্ষাকৃত যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারাই ছেলেদের বোর্ডিং-এ রাখে, তবু সারা বোর্ডিং খুঁজিয়াও একটা আস্ত জামা বাহির হইবে না। পড়াইতে বসিয়া ভূপেনের খালি মনে হয় যাহাদের আগে পেট ভরিয়া ভাত খাওয়ানই উচিত—তাহাদের মাথা ভরিয়া বিদ্যা ঠাসিয়া দিলে কি হইবে।

তবে এবারে সে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আর একটি লোককে নিজের দলে পাইয়া গেল। বিজয় বাবু নির্ব্বিরোধী লোক, তিনি কখনও ভূপেনকে নিরুৎসাহ করেন নাই। বরং এই কাজগুলিই যে কর্ত্তব্য, ভূপেনের পথই যে শিক্ষকের আদর্শ ও একমাত্র পথ তাহাও বার বার স্বীকার করিয়াছেন; তবু কোথায় যেন তাঁহার মনের মধ্যে এ বিষয়ে একটা উপহাসের, হতাশার সুর ছিল—তিনি

কখনও তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত আগাইয়া আসেন নাই। বরাবরই যেমন নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকিতেন তেমনিই রহিয়া গেলেন; কিন্তু যাঁহার সব চেয়ে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী হইবার কথা, সেই রাধাকমল বাবু সামান্ত একটা ব্যাপারে ভূপেনের অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

কথাটা আর কিছুই নয়—এক দিন টিফিনের সময় ভূপেন রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা পড়িতেছে, রাধাকমল বাবু ঠাট্টা করিয়া কহিলেন, ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা ত করেছ ভালো—কিন্তু সময় যে বড় অল্প, কাঁচা ঘুম চটে গেলে অসুখ করবে যে!

এ শ্রেণীর পরিহাস ভূপেনের নিত্য-সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কোন কথাই কহিল না কিন্তু জবাব দিলেন যতীন বাবু। যতীন বাবু সেই অভিধানের শোক ভুলিতে পারেন নাই—সুযোগ-সুবিধা পাইলেই আজকাল ভূপেনকে খোঁচা দেন। তিনি কহিলেন, কেন পণ্ডিত মশাই, ঘুমের ওষুধ কেন?

রাধাকমল বাবু কহিলেন, ও রবি ঠাকুরের কবিতা, ও ত বোঝবার নয়—শুধু শোনবার। কানের কাছে এক জন ছড়া পড়লে কার না ঘুম পায় বলো—

অন্ত দিন হইলে ভূপেন এ কথাটাও এড়াইয়া যাইত কিন্তু আজ কি খেয়াল হইল, সে পণ্ডিত মহাশয়ের পাশে গিয়া বসিয়া কহিল, দাদা, আপনাকে আজ বলতে হবে কেন আপনি এ কবিতা বুঝতে পারেন না। কোন্ কথাটার মানে জানেন না?

রাধাকমল বাবু একটু বিপন্ন বোধ করিলেও হাল ছাড়িলেন না। কহিলেন, কথার মানে জানলে কি হবে বলো—ও যে সবটাই ধোঁয়া—যোদ্দা কথাটা কিছুতেই বোঝা যায় না।

কবে আপনি বোঝবার চেষ্টা করেছেন বলুন—ভূপেন চাপিয়া ধরিল—এই কবিতাটাই ধরুন, কোন্‌খানটায় আপনার ধোঁয়া লাগছে দেখিয়ে দিন।

এমনি করিয়া সে রাধাকমল বাবুকে দিয়াই পর পর দুই তিনটি কবিতা পড়াইয়া লইল। একটু ইঙ্গিত দিতে রাধাকমল বাবু নিজেই সব পরিষ্কার বুঝিলেন, তখন আগ্রহ করিয়া 'সঞ্চয়িতা'খানা ভূপেনের কাছ হইতে চাহিয়া লইলেন। ভূপেন তাহার সহিত, রবীন্দ্রনাথের যে বইখানা সে কিছুতেই কাছছাড়া করিত না, সেই শান্তিনিকেতন ছুটি-খণ্ডও তাঁহাকে গছাইয়া দিল—বিশেষ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ দাগ দিয়া। তার পর রাধাকমল বাবু যেন পাগল হইয়া উঠিলেন —এ যেন একটা নূতন রাজ্য তাঁহার সামনে খুলিয়া গেল। তিনি এখন সবিনয়েই ভূপেনের কাছ হইতে বই চাহিয়া লন—কোথাও সন্দেহ থাকিলে আলোচনা করেন এবং স্বেচ্ছায় এক একদিন ভূপেনের কোচিং ক্লাসে যোগ দিয়া তাহাকে সাহায্য করেন। অপূর্ব্ব বাবু বলেন বাড়াবাড়ি, যতীন বাবু বলেন ভীমরতি—তবে একটা সুবিধা এই যে, রাধাকমল বাবুকে সবাই সমীহ করেন বলিয়া সামনে কিছু বলিতে সাহস করেন না।

এই ভাবে বোঝা দিয়া দুই-তিন মাস যে কাটিয়া গেল কাজের চাপে ভূপেনের খেয়ালও রহিল না। যে ব্যথা, যে আকাঙ্ক্ষা ভুলিবার জন্ত তাহার এত আয়োজন, আশাতজের সেই বেদনা এবং চরাশায় এই আকাঙ্ক্ষা হইতে সে সত্যই দূরে থাকিতে পারিয়াছিল। কল্যা-

ইতিমধ্যে খান-দুই চিঠি দিয়াছিল, তবে সে খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। মোহিত বাবু একটু সুস্থ আছেন—কাজ-কর্ম্ম করিবার মত সুস্থ না হইলেও উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিতে পারেন, কথাবার্ত্তা গল্পগুজব করিতে কষ্ট হয় না। হয়ত, এ-যাত্রা বড় আশঙ্কাটা বাঁচিয়া গেল। সন্ধ্যার চিঠিতে এই সংবাদই থাকে শুধু—আগেকার সে অন্তরঙ্গ সুরটি, বিশ্বাস ও নির্ভরতার সেই সরল সহজ ছন্দটি আর প্রকাশ পায় না। হয়ত এ অভিমান, হয়ত এ সঙ্কোচ—ভূপেন কারণটা ভাবিয়া দেখিবারও চেষ্টা করে না। এমন কি চিঠির এই শুষ্কতায় ব্যথা পাইলেও মনে মনে ধন্যবাদ দেয় ঈশ্বরকে—তাহার কণ্টক-মুকুট অকারণে ভারী ও অসহ করিয়া না তুলিবার জন্য। সে-ও চিঠি দেয় শুষ্ক, সংক্ষিপ্ত —দুই-একটি গতানুগতিক কথা ছাড়া আর কিছু থাকে না। কাজে হউক, ইচ্ছা করিয়া হউক—এই ভাবে যদি তাহারা পরস্পরকে ভুলিতে পারে—তাহা হইলে দুজনেরই মঙ্গল।

কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে একটা ব্যাপারে তাহাকে সন্ধ্যার কথা মনে করিতেই হইল। হঠাৎ একদিন বিজয় বাবু স্কুলে আসিলেন না—ছেলে বলিল, বাবার শরীর খারাপ করেছে, শুয়ে আছেন। ইদানীং—কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর—সে বিজয় বাবুদের বাড়ী যাওয়াটা কমাইয়া দিয়াছিল, গেলেও কোচিং ক্লাসের অজুহাতে সকাল করিয়া উঠিয়া পড়িত। তাহার কারণ প্রথমত: কলিকাতাতে যাইবার দিনের বিদায়-দৃশ্যটি তাহার মনে ছিল—তার পর এখানে ফিরিয়াও, বোধ হয় সেই কারণেই, লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে, সে আসিলে কল্যাণী খুশী হয়, তাহার মুখ হইয়া ওঠে উজ্জ্বল—এবং উঠিয়া আসিবার সময় আর একটু ধরিয়া রাখিবার আগ্রহটা তাহারই সবচেয়ে বেশী। পাছে আর একটা ভুল হয়—সেই জন্ত এবারে সে প্রথম হইতেই সতর্ক হইয়াছিল, আসা-যাওয়ার সংখ্যা ও সময়, দুই-ই কমাইয়া দিতেছিল। তবুও—অসুখের কথা শুনিবার পরও না গিয়া থাকা যায় না—সে ছুটির পর আর বোর্ডিংএ না ফিরিয়া সোজা বিজয়বাবুর বাড়ীর পথই ধরিল।

অবশ্য এটা শুধুই খবর লইতে যাওয়া—কতকটা কর্ত্তব্য পালনের জন্যই, অসুখ যে গুরুতর কিছু হইতে পারে এ কথা তাহার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না, তাই বাড়ীর বাহিরে পথের উপরেই কল্যাণীকে শুষ্ক বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, ঈষৎ শঙ্কিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি কল্যাণী, কী অসুখ বিজয় বাবুর?

কল্যাণী খুব সম্ভব তাহার আশাতেই উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, তবু উত্তর দিতে গিয়া তাহার ওষ্ঠই শুধু নড়িল—কণ্ঠ ভেদিয়া স্বর বাহির হইল না। দুই এক মিনিট কথা কহিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপেন আরও ভয় পাইয়া গেল কিন্তু সেখানে আর মিছামিছি সময় নষ্ট না করিয়া তাড়াতাড়ি কল্যাণীকে পাশ কাটাইয়াই ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বিজয় বাবু দাওয়াতে পাতা চৌকীটার উপর পড়িয়া আছেন অন্ত দিনের মতই—মুখের ভাব তেমনি প্রশান্ত, তেমনি নিরুদ্বিগ্ন। ভূপেন তাঁহাকে ঐ ভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তবু একটু আশ্বস্ত হইল, কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি বিজয় বাবু, জ্বর?

বিজয় বাবু যেমন দেন ... তাহার দিকে তাকাইয়া

একটু হাসিলেন। কহিলেন, জ্বর হ'লে ত বাঁচতুম ভাই। কাল ইস্কুল থেকে ফিরে রাত্রে হ্যারিকেনের আলোতে বই পড়তে গেছি —সেই তোমার বইখানা—কেমন যেন ঝাপ্‌সা লাগল, বিরক্ত হয়ে আলোটার দিকে চাইতে গিয়ে দেখি আলোটার চার পাশে রামধনু। তখনই ভয় হ'ল, বই বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লুম। তবু তখনও ছেলেমেয়েদের কিছু বলিনি। আজ সকালে উঠে মনে হ'ল তখনও যেন রাত রয়েছে, এমনি সব অন্ধকার। খুব ঝাপসা ঝাপসা লাগছিল সব। কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করলুম—সে অবাক্ হয়ে বললে, 'সে কি বাবা রোদ উঠেছে যে!···বুঝলুম ব্যাপারটা—শুয়েই রইলুম। কিন্তু এবেলা ঘুমিয়ে উঠে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, সব অন্ধকার।

ভূপেন কথাটা শুনিয়া যেন পাথর হইয়া গেল। এ যে বেরিবেরির লক্ষণ। সে কহিল, কিন্তু দাদা, এ যা বললেন এ ত গ্লোকুমা—আপনি কি বেরিবেরি একটুও টের পাননি এত দিন?

বিজয় বাবু বলিলেন, না। ইদানীং দু-একদিন মনে হচ্ছিল বটে যে ইস্কুল থেকে এতটা হেঁটে আসতে যেন বড্ড বেশী হাঁপিয়ে পড়ছি। একটু বুক ধড়-ফড়ও করত—তবে সেটা বয়সের ধর্ম্ম বলেই মনে করেছিলুম।

ইঁহাদের অবস্থা ভূপেন জানিত। সংস্থান কিছুমাত্র নাই—জমিজমা না থাকিবার মধ্যে। মাহিনার টাকা কয়টি না পাইলে সব কয়টি প্রাণীকে উপবাস করিতে হইবে। ভগবানের এ কী মার!

এবার কথা কহিতে গিয়া তাহার গলা কাঁপিয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল, আপনার নিকট-আত্মীয় কি কেউ কোথাও নেই?

শান্তকণ্ঠেই বিজয় বাবু জবাব দিলেন, না ভাই। আর থাকা সম্ভবও ত নয়—আমরা কখন কারুর কোন উপকারে আসতে পারিনি, আত্মীয়তা থাকবে কি ক'রে বলো।

কল্যাণী ভূপেনের মুখের উপর একাগ্র নির্ভরে চাহিয়া ছিল, যেন সে ইচ্ছা করিলেই একটা প্রতিবিধান করিতে পারে। সুতরাং বিপদ্ যে কত বেশী, এ রোগ সারিবার সম্ভাবনা যে কম—সে কথা সে মুখে ত উচ্চারণ করিতে পারিলই না—ভাব-ভঙ্গীতেও কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহা হইলে এই ছেলে মানুষের দল এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সে প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া কহিল, তুমি একটু বসো কল্যাণী, আমি এখনই আসছি—

গেল সে গ্রামের ডাক্তারের কাছে। তিনিও বিজয় বাবুকে শ্রদ্ধা করিতেন; সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন কিন্তু একটু পরীক্ষা করিয়াই তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। ভূপেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, এত সিরিয়াস্ টাইপের গ্লোকুমা আমি দেখিনি—এক রাত্রের মধ্যে অন্ধ হয়ে গেল, আশ্চর্য্য!···যাই হোক্—এখনও উপায় থাকতে পারে হয়ত—কিন্তু সে এখানে কিছুই হবে না, কারণ, আমরা এর কিছু জানি না। কলকাতার কোন বড় চোখের ডাক্তারের কাছে এখনই যদি নিয়ে গিয়ে ফেলা যায় হয়ত কিছুটা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারেন। তবু সে আশাও আমি বেশী রাখতে বলি না। দেখুন না, এত বড় রোগ—বছর বছর এতগুলো লোক মরছে, হাজার হাজার লোক ভুগছে, তবু আজ পর্য্যন্ত কোন ওষুধ বেরোল না। কোন্ রোগের ওষুধ বেরিয়েছে বলুন—বেরিবেরি, প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড—কোনটারই ঠিক ওষুধ বলতে যা বোঝায়, তা নেই। এ যদি ওদের দেশে হ'ত ত ওদের চিকিৎসকরা বা বৈজ্ঞানিকরা যেমন ক'রে হোক ঐ সব রোগের ওষুধ বার করে ফেলত। একেবারে যে হয় না তা বলছি না কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় কিছুই নয়। আরে মশাই, রিসার্চ্চ করা ত চুলোয় যাক্—আমাদের দেশের ছেলেরা একবার ডিগ্রিটা নিয়ে বেরোবার পর আর কোন বই-ই পড়ে না! অথচ রোজ কত ওষুধ ওদের দেশে বেরোচ্ছে, কত নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে তার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে কী চিকিৎসা করবে বলুন দেখি? শুধু মামুলি কতকগুলো মিক্সচার আর ইন্‌জেকশান্—তাতে কি হয়!···আমরা না হয় গরীব পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার, বই কেনবার পয়সা নেই, যাদের আছে তারাও পড়তে চায় না—

এমনি আরও খানিকটা বক্তৃতা করার পর ডাক্তার বিদায় লইলেন কিন্তু ভূপেনের সেদিকে কান ছিল না। সে নিজেই যেন ইঁহাদের কথা ভাবিয়া চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। বিজয় বাবুকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল স্ত্রীর গহনা বলিতেও কোথাও কিছু নাই, যা আছে ঐ দু গাছা পেটি কল্যাণীর হাতে, উহাতে বোধ হয় আধ ভরি সোনাও নাই। আর সব সুদ্ধ, মাকড়ী প্রভৃতি দুই একটা কুঁচো জিনিষ জড়াইয়া বড় জোর আনা পাঁচ-ছয় সোনা মিলিতে পারে। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা হইতেও দুটা বড় রকমের ঋণ লওয়া আছে আর সেখানে ধার পাইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। নিঃস্বতার এরূপ ভয়াবহ চেহারা ইতিপূর্ব্বে আর ভূপেন দেখে নাই—সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অথচ উপায়ও একটা না করিলে নয়। যত দিন যাইবে ততই রোগটা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া যাইবে তা সে জানে, কিন্তু কীই বা করা যায়! ইস্কুল হইতে বসাইয়া মাহিনা দিবে না, বড় জোর মাস-দুই-এর ছুটি মিলিতে পারে। তারপর? প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাতে, সে হিসাব করিয়া দেখিল ইঁহাদের মাস-আষ্টেক চলিতে পারে। তারপর সোজাসুজি উপবাস শুরু হইবে, আর কোথাও কিছু নাই। ছেলেটি এখনও ম্যাট্রিকটা পর্য্যন্ত পাস করে নাই, তাহার দ্বারাই বা কি উপার্জ্জন হইতে পারে? এসব ক্ষেত্রে তাহাদের কলিকাতার ইস্কুলে সে দেখিয়াছে, ছেলেরা ও শিক্ষকরা কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দেন। সে অবশ্য বেশী কিছু নয়—তবু একশ' দেড়শ' টাকা সেখানে অনায়াসে ওঠে কিন্তু এখানে সে কথা মনে করাই বিড়ম্বনা। ছেলেরা এত গরীব যে, সেখানে চাঁদার খাতা ধরিতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়—আর শিক্ষকদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। অপূর্ব্ব বাবু বুঝি গত মাসে গোটা পাঁচেক টাকা ধার দিয়াছিলেন বিজয় বাবুকে, এখন কি করিয়া সে টাকাটা চাওয়া যায়, এই ভাবনাতে তাঁহার ঘুম হইতেছে না।

ভূপেন সেদিন রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। ভবিষ্যতের কথা পরে হইবে, এখন চিকিৎসার প্রয়োজন। সে আত্মীয়ও নয়, এত অল্প দিনে বন্ধুত্বের দাবীও করিতে পারে না—তবু দায়িত্ব তাহার উপরই যেন আসিয়া পড়িয়াছে। মোহিত বাবু বলিতেন, 'যে পাশ কাটাতে পারে তার কোন দায়িত্বই নেই—বিবেচনা যার আছে দায়িত্ব বলো কর্ত্তব্য বলো সবই তার।' সত্যই—ইঁহারা ত খবরটা শুনিয়া বেশ নিশ্চিন্তই আছেন—ভবদেব বাবু মালাটা শুধু একটু বেশী দ্রুত ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, রাধারাণী, রাধারাণী—সবই তোমার ইচ্ছা প্রেমময়ী! কিন্তু সে অত সহজে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে কৈ? বিজয় বাবু অবশ্য কিছুই আশা করেন না—তবু, সে যে তাঁহার স্নেহ

ব্যবহার, স্নিগ্ধ সহানুভূতির কথাটা ভুলিতে পারিতেছে না। কল্যাণী ইতিমধ্যেই কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছে—কী বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, ভাবিয়াই কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েগুলি সবাই তাহারই মুখ চাহিয়া আছে—অথচ আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কোথাও কোন উপায়, কোন পথ সে খুঁজিয়া পাইল না।

সারা রাত এ-পাশ ও-পাশ করার পর, ভোরের দিকে একটা কথা ভূপেনের মনে পড়িয়া গেল। মোহিত বাবুর এক বন্ধু আছেন খুব বড় চোখের ডাক্তার, খুবই অন্তরঙ্গতা তাঁহার সঙ্গে, এমন কি দুই বন্ধুর পরিবারের মধ্যেও যাতায়াত আছে; যদি সে সাহায্যটা পাওয়া যায়, তবে সেও অনেকটা হইবে বৈ কি! এমনি কলিকাতা যাতায়াতে ডাক্তার খরচাতে একশ টাকার ধাক্কা, তাহার উপর ঔষধ-পত্র ত আছেই।···যাঁহার এক পয়সারও সংস্থান নাই তাঁহার পক্ষে এ প্রস্তাব দুরাশাই। ভূপেনের হাতে উহার অর্দ্ধেক টাকাও নাই। সুতরাং—যতই কথাটা সে ভাবিতে লাগিল ততই মনটা এই সুবিধা লওয়ার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। মোহিত বাবুদের কাছে কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করা দুদিন আগে সে ভাবিতেও পারিত না—কিন্তু এখন অতটা অভিমান আর নাই, বিশেষ করিয়া এ অনুগ্রহ ত সে নিজের জন্য লইতেছে না, পরের জন্য ভিক্ষা করাও লজ্জাকর নয়।

তবু সে সকালে উঠিয়াও অনেকটা ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু যেখানে এক দিকে অর্থহীন সূক্ষ্ম আত্মসম্মান বোধ আর এক দিকে প্রয়োজনে দ্বন্দ্ব বাধে সেখানে প্রয়োজনেরই শেষ পর্য্যন্ত জয় হয়। সে অবিলম্বে উঁহাদিগের একখানা চিঠি লেখাই স্থির করিল। তবে সমস্যা এই যে, কাহাকে লিখিবে? হিসাবমত মোহিত বাবুকেই লিখিতে হয় কিন্তু কোথায় যেন একটা সঙ্কোচে বাধে। মনের অবচেতন অবস্থায় এটিই কখন স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, সন্ধ্যার উপর তাহার একটা জোর আছেই—তাহার কাছে সঙ্কোচের কারণ অপেক্ষাকৃত কম। পরিষ্কার এ কথাটা না ভাবিলেও, সন্ধ্যাকে চিঠি লেখাটাই সহজ বলিয়া মনে হইল। সে সব কথা জানাইয়া তাহাকে একখানা দীর্ঘ চিঠি দিল এবং সকালেই নিজে হাতে ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

সেদিন প্রায় সব মাষ্টার মহাশয়ই ছুটির পর বিজয় বাবুকে দেখিতে গেলেন। অনেক ছাত্রও গেল। নির্ব্বিরোধী ভগবদ্ভক্ত মানুষটিকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন—ছেলেরা তাঁহার মিষ্ট স্বভাবের জন্য ভালবাসিত; সুতরাং সকলেরই যে অল্প-বিস্তর আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু কী-ইবা করিবার আছে? কেহ উপদেশ দিলেন, কেহ সাবধান না হইবার জন্য অনুযোগ করিলেন—কেহ বা আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিলেন। পথ যে কোথাও নাই তা সকলেই জানেন, এ ভগবানের মার—এ মারের ভাগ নেওয়াও সম্ভব নয়—তাই সব কথাই ফাঁকা শোনাইল। এই সমস্ত সহানুভূতির মধ্যে বিজয় বাবু তেমনিই শান্ত, নম্রভাবে বসিয়া রহিলেন, যেমন চিরকাল থাকিতেন। হা-হুতাশ করিলেন না, ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না—ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনিলেন না। তাঁর সেই অদ্ভুত ধৈর্য্য ও মনের উপর জোর দেখিয়া ভূপেনের মন শ্রদ্ধায় নত না হইয়া পারিল না।

কিন্তু বিজয় বাবু স্থির থাকিলেও তাহার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। এই অসংখ্য লোকের ভীড়ের মধ্যেও বার বার কল্যাণীর ব্যথিত ব্যাকুল চক্ষু দুটি তাহার দৃষ্টির মধ্যে আশ্বাস খুঁজিতেছিল। সব আশা-ভরসা যেন সে-ই, যা হয় একটা উপায় সে করিতে পারিবেই—সে দৃষ্টির মধ্যে এই নির্ভরতাটুকুও বোধ হয় ছিল। সেদিকে যতবার চোখ পড়িতেছিল ততই তাহার দায়িত্বের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। আশা যে কম তা সে-ও বোঝে কিন্তু সত্য-সত্যই যে দিন এই কথাটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া যাইবে সে আশা একেবারেই নাই, সে দিন কি করিয়া ইহাদের দিকে চাহিবে, কি সান্ত্বনা দিবে, তাহা যেন সে কল্পনাও করিতে পারিতেছিল না। মনে মনে প্রশ্নটাকে সে যতই এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছিল ততই যেন ক্ষত স্থানে হাত পড়ার মত বার বার মন সেইখানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছিল।

এমনি মানসিক কণ্টকশয্যার মধ্যে পরের দিনটাও কাটিল। সেদিন উত্তর আসিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা সে জানে। তবু মনে মনে কোথায় একটা আশা ছিল, সন্ধ্যার পক্ষে সবই সম্ভব, হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই দিনই উত্তরটা আসিয়া যাইবে—হয়ত বা টেলিগ্রামই আসিবে। যদি জবাব না আসে, যদি সন্ধ্যা উপেক্ষা করে—এমন ভয় একবারও যে মনে উঁকি মারে নাই তাহা নয়; তবে সে আশঙ্কা এক মুহূর্ত্তের বেশী মনে দাঁড়ায় নাই। বরং সন্ধ্যার পর বিজয় বাবুর বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আশাটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—বিজয় বাবুর একটা সুব্যবস্থা হইবে এজন্য ত বটেই, সন্ধ্যার চিঠি আসিবে এ জন্যও কতকটা। কারণ যাহাই থাকুক, সন্ধ্যার চিঠি আসিবে এবং সে চিঠি প্রমাণ করিয়া দিবে যে ভূপেন বৃথা তাহার উপর আস্থা স্থাপন করে নাই—সন্ধ্যার উপর তাহার দাবী আছে, জোর আছে। যতই দূরে থাক্ তাহাদের আত্মার সম্বন্ধ একটুকু ক্ষুন্ন হয় নাই।

মানুষ অনেক জিনিষ অসম্ভব জানিয়াও আশা করে এবং আশা করিতে করিতেও মনের কাছে স্বীকার করে যে ইহা অসম্ভব, ইহা যদি না ঘটে তবে নিরুৎসাহ হইবার, ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। এমনি একটা মানসিক অবস্থা লইয়া বোর্ডিংএ ফিরিতেই প্রথম তাহার নজরে পড়িল—তাঁহাদের ঘরে, তাহারই বিছানার উপর বসিয়া আছেন সন্ধ্যাদের সরকার মশাই!

এ ঘটনা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, সমস্ত রকম অসম্ভব কল্পনারও অতীত। বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত ভূপেনের মুখে কথা সরিল না। একটা ভয়ও মনে উঁকি মারিতেছিল, তবে কি মোহিত বাবুই—। সে অতি কষ্টে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি সরকার মশাই?

সরকার প্রাণগোবিন্দ বাবু পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া ভূপেনের হাতে দিয়া কহিলেন, দিদি-ভাই দিয়েছে। কাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তাই আমাকে পাঠালে, বললে বন্দোবস্ত করে নিয়ে আসুন। হুকুম একবার যা মুখ দিয়ে বেরোবে তা আর না হবে না—সে ত জানেনই।

তার পর যতীন বাবুর দিকে ফিরিয়া বোধ হয় পূর্ব্বকথারই জের টানিয়া কহিলেন, ঐ যা বলছিলুম আপনাকে। যেমন কর্ত্তা তেমনি আমার দিদিভাই—আপনাদের ভূপেন বাবুর উপর যেমন বিশ্বাস তেমনি ভক্তি। এই ত কর্ত্তা উইল করে দিয়েছেন জানছি—সব

আমার দিদিভাই-এর কিন্তু মাষ্টার মশাই-এর হুকুম ছাড়া কিছু খরচ হবে না। তাকেও চলতে হবে এঁর হুকুমে।···কেন যে উনি এমন জায়গায় পড়ে আছেন তা উনিই জানেন,—ওঁর ভাবনা কি, উনি যা বলতেন, কর্ত্তা বাবু সেই ব্যবস্থাই ক'রে দিতেন। ব্যবসা, চাকরী, ওকালতী—কিছুরই ভাবনা ছিল না!

বিস্মিত যতীন বাবু বলিয়া উঠিলেন, বলেন কি? সত্যিই পাগল না কি আপনি মশাই!

কিন্তু ভূপেনের এ সব দিকে কান ছিল না। সে আলোটার সামনে চিঠিখানা মেলিয়া ধরিয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যা লিখিয়াছে :—

শ্রীচরণেষু—

মাষ্টার মশাই! আপনার চিঠি পেয়ে যেন একটা বোঝা নেমে গেল বুক থেকে। কিছু দিন থেকে কেবলই একটা ভয় পেয়ে বসেছিল যে, বুঝি আমরা চিরকালের মত পর হয়ে গেলাম আপনার কাছে। হয়ত কর্ত্তব্য বা দায়িত্বের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক থাকবে না আমাদের মধ্যে। সে যে কী দুঃখ তা আপনি বুঝবেন না! তাই হঠাৎ আপনার চিঠি পেয়ে এত আনন্দ হচ্ছে। আজও যে আপনি আমাকে প্রয়োজনের সময় স্মরণ করেন, আজও যে আমার ওপর এটুকু আস্থা, এটুকু বিশ্বাস আছে—এ কথাটা নতুন করে জানলুম। আপনার কোন কাজে লাগার চেয়ে অন্য কোন সার্থকতার কথা ভাবতেই পারি না মাষ্টার মশাই! এ কাজ আপনার নয়—তবু হুকুম ত আপনার মুখ থেকেই এল—এইতেই আমি সুখী।

যাক্—এবার কাজের কথা। দাদুকে সব কথা বলেছি, ডাক্তার দাদুকেও ফোন্ করে বলে রেখেছি। এখন শুধু ওঁকে নিয়ে আসা। আপনার পক্ষে আনার সুবিধা হবে কি না জানি না, চিঠি পাঠাতেও অনর্থক দেরী হয়ে যাবে, এই সব পাঁচ সাত ভেবে আমি সরকার মশাইকেই পাঠালুম। তিনি বিজয় বাবুকে কাল সকালেই সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন—আমি ডাক্তার দাদুকেও কাল বিকেলে আসতে বলেছি। এসব ব্যাপারে দেরি না করাই ভাল।

দাদু একটু ভাল আছেন। আপনি তাঁর আশীর্ব্বাদ ও আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

চিঠি পড়িতে পড়িতে আজও ভূপেনের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সেই সন্ধ্যা, তাহার ছাত্রী, তাহার বন্ধু—তাহার আত্মার অংশ।···আজও তাহা হইলে তাহাদের অন্তরের সুর কাটে নাই। এত দিনের অদর্শন এত মান-অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতেও পরিচিত তন্ত্রীটি ঠিক বাজিয়া উঠিয়াছে!

ভূপেন চিঠিখানা আর এক বার পড়িল। কতদিনের কত স্মৃতি এই কয়টি ছত্রের মধ্য দিয়া যেন ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেটা সে ভুলিতেই বসিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্তরের সেই প্রীতি, সেই শ্রদ্ধা, তাহা হইলে ঠিক তেম্‌নিই আছে—কিছুই হারায় নাই!···

আরও কতক্ষণ সে চিঠিখানা পড়িত কে জানে, সরকার মশাই-এর আহ্বানে সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল, মাষ্টার মশাই?

ও, হ্যাঁ!

ভূপেন সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কাল সকাল আটটায় গাড়ী। আজ রাত্রেই বিজয় বাবুর বাড়ী গিয়া ব্যবস্থা করা দরকার। কর্ত্তব্য আগে—সামান্য চিঠি লইয়া নষ্ট করিবার মত সময় কৈ?···সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বিজয় বাবুর বাড়ীর পথ ধরিল।

[ক্রমশঃ

রাতের লিরিক

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

এখন বৃষ্টির রাতে লিখি যদি ব'সে ব'সে একটি সনেট :
একটি কবিতা ঘিরে হৃদয়ের কান্নাটিরে যদি মেলে ধরি—
সে কান্না কি কেঁপে কেঁপে উত্তরের বাতাসেতে ভেসে ভেসে যায়?
সে বায়ু কি কেঁদে কেঁদে ভাঙে গিয়ে অবশেষে তার জানালায়!

অথবা সে কবিতাটি বুকে চেপে কিছুখন
তার পরে খেলাছলে যদি এক কাগজের মায়া-নৌকো গড়ি :
একটি মাটির দীপ জ্বেলে দিয়ে অন্ধকারে। মধুকর ডিঙার মতন
দুরন্ত গাঙের জলে যদি তারে ছেড়ে দিই এ ভরা সন্ধ্যায়।
সে নৌকো কি ভেসে ভেসে মোর কান্না বুকে ক'রে তার দেশে যায়?

এখন কি সেখেনেও নেমেছে এমন রাত বৃষ্টি আর মেঘে মেঘে
হ'য়ে একাকার :

এমন কি সেখেনেও খানিক চাঁদের কুচো
বনে বনে ক'রে ওঠে ভীরু হাহাকার।
আমার ঘরের নীচে আঁধার পুকুরে এ:ন
যে-সব হাঁসের মালা ছিঁড়ে ছিঁড়েযায়
এ-সব হাঁসের সাদা পাখার ভেতরে ··
তোর-আমের কোনো চিঠি আছে না কি হায়!

এ-সব হাঁসের দল
ছিলো কি খানিক আগে
তার গাঁয়ে কোনো এক নদীর চড়ায়?

এখন আমার মত তারো বুকে উঠেছে কি হু-হু ক'রে ঝড়?
এখন কি তারো প্রাণে জেগেছে ধূসর কোনো স্বপ্নের সাগর?
যে-সাগরে দ্বীপ মেলা দায় :
যে-স্বপ্নেতে প্রাণ জ্বলে যায় :
যেখানে বিফল খোঁজা প্রবালের চর!

আজকে বৃষ্টির রাতে একটি সনেট লিখে তাই যদি কেঁদে
কেঁদে বাতাসে ছড়াই :
একটি সনেট-ভরা কবিতায় নৌকো গ'ড়ে
শুধু যদি কান্না দিয়ে সে-ডিঙা ভরাই :
সে ডিঙা কি কেঁপে কেঁপে অবশেষে তার দেশে আজ রাতে যায়?
যা'তে লেখা সনেটের সে ডিঙা কি কাগজের?
কাগজ কি জানিনি কোথায়!

যাযাবর

৩
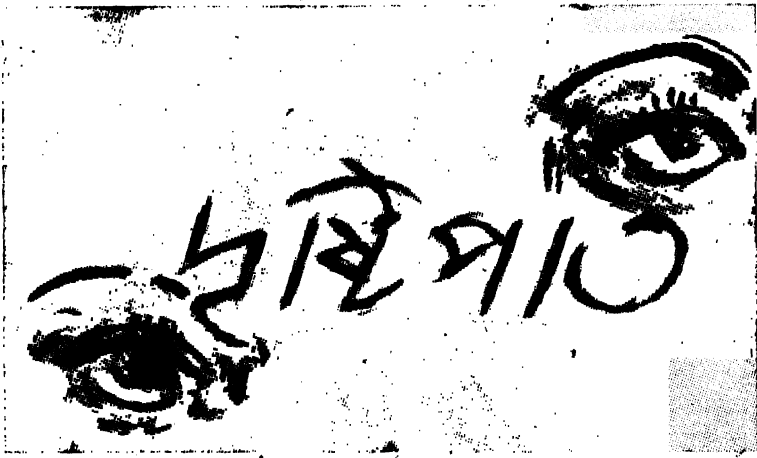
গৃহকর্ত্রীর সাত বছরের মেয়ে রেবা এসে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "মিনি সাহেব, ইংরেজ জিতবে কি জাপান জিতবে?"

মিনি সাহেব নামের পিছনে আছে ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয়, ভাষাতত্ত্বও।

বিলাতে গেলে আমাদের প্রথম রূপান্তর ঘটে বেশে, দ্বিতীয় নামে। দেশে থাকতে যারা পণ্টু, গদাই, সুরেন কিম্বা সুবোধ, বিদেশে তারাই সেন, রয়, মিটার অথবা ব্যানার্জ্জী। নয়া দিল্লীটা খাঁটি বিলাত নয়, এরসাৎস্। এখানেও ব্যক্তির পরিচয় নামের আদিতে নয়, অন্তে। পি, এল, আম্বানার আদ্য অক্ষর দুটি কিসের সংক্ষেপ তা নিয়ে কারও মাথা-ব্যথা নেই, শেষের টুকু জানলেই হলো। পদমর্য্যাদার উপরে নির্ভর করে সম্বোধনের বিশেষণ। কেরাণী হলে আম্বানার Suffix বসে বাবু, অফিসার হলে Prefix লাগে মিষ্টার।

কিন্তু মুখে মুখে কথার ধারা বদল নামেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। বিশেষ করে চাকর, বেয়ারা, আর্দ্দালী, পিওনের অশিক্ষিত উচ্চারণে অনেক সময়ে চলতি বিকৃতি থেকে আসল আকৃতি আঁচ করাই কঠিন হয়। ব্যানার্জ্জী বেনারসী হন, মিঃ ম্যাকার্টিস হন মারকুটি সাহেব। সেনগৃহের পরিচারিকা বিলাসিয়ার আদি বাস রামগিরি পর্ব্বতের সানুদেশে, ভাষা কিছুটা দ্রাবিড় এবং কিছুটা আর্য্য, উচ্চারণ মারাত্মক। সুতরাং কবে, কেমন করে, কোন্ শব্দের অপভ্রংশ ও কোন্ শব্দের অর্দ্ধাংশ মিলিয়ে তার মুখে মিনি সাহেবে দাঁড়িয়ে গেছি সে গবেষণায় সুনীতি চাটুয্যের শরণ নিতে হবে।

"বল না, মিনি সাহেব, কে জিতবে। ইংরেজ না জাপান?" প্রশ্নকর্ত্রী তাড়া দিলেন।

প্রশ্নটা নূতন নয়, ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকের কাছে শুনতে হয়েছে এ জিজ্ঞাসা। জবাব অবশ্য দিতে হয়নি। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী নিজেই দিয়েছেন উত্তর, চেয়েছেন শুধু সমর্থন। যারা তা দেননি, তারাও কী শুনলে খুশী হবেন সে সম্পর্কে [illegible] [illegible] রাখেননি কখনও; যেমন স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন শাড়ীটায় তাকে কেমন দেখাচ্ছে। সুতরাং পাল্টা প্রশ্ন করলেম, "তুমি বল, কে জিতবে।"

"ইংরেজ।" স্বর গম্ভীর, প্রত্যয়ব্যঞ্জক। স্বয়ং চার্চিলের পক্ষেও বোধ হয় এতটা নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ কাছেই ছিল। বোনের উত্তর কানে যেতেই ভাই ছুটে এল। "কি বললি? ইংরেজ জিতবে? জিতবে না হাতি।" জাপানীদের সঙ্গে পারবে ইংরেজ? ফুঃ।" বাক্যের সঙ্গে যোগ করল ভঙ্গি। ঠোঁট বাঁকিয়ে মুখে চোখে এমন একটা গম্ভীর তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করল যাতে শ্রোতাদের পক্ষে ইংরেজের জয় সম্পর্কে ক্ষীণতম আশা পোষণ করাও হাস্যকর নির্ব্বুদ্ধিতা মনে হবে।

বুড়চু রেবার চাইতে মাত্র দু'বছরের বড়। কিন্তু অভিভাবকত্বের ধারা প্রায়ই বয়সের অনুপাত মেনে চলে না। বিশেষতঃ বুড়চু স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে, রেবার এখনও বাকী। সুতরাং তর্ক-বিতর্কের মাঝপথে বুড়চু যখন থার্ড মাষ্টার বা অন্য ছাত্রদের নজীর উল্লেখ করে, রেবাকে তখন বাধ্য হয়েই বোবা হতে হয়। "কিন্তু আমাদের ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়, সে বলেছে। তার চাইতে তুমি বেশী জান কি না" এ যুক্তির উপরে আর তর্ক চলে না।

কিন্তু আজ তো ফার্ষ্ট বয়ের মতামত নয়। এ যে তার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই রেবা দমল না।

"কেন জিতবে না, ঠিক জিতবে।" কিন্তু কণ্ঠে যেন এবার সে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া গেল না।

বুড়চু অপরিসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ইংরেজ জার্ম্মাণীর সঙ্গেই পারে না, আর পারবে জাপানের সঙ্গে। হেরে ভূত হয়ে যাবে।"

"কেন হারবে? ইংরেজের কত কামান-বন্দুক, কত এরোপ্লেন। আছে জাপানীদের এরোপ্লেন?"

"জাপানীদের এরোপ্লেন নেই? হা হা হা। এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে ইংরেজের রিপালস্ আর প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ডুবিয়ে দিল কে শুনি? পারল ইংরেজ জাপানীদের কিছু করতে? ইংরেজের এরোপ্লেন তো সব ভাঙা, কী হয় তা দিয়ে?"

"ইংরেজের এরোপ্লেন ভাঙা, মিনি সাহেব? ভাঙা বুঝি [illegible]

আকাশে ওঠে কেমন করে ?" করুণকণ্ঠে আপীল জানালেন ইংরেজ হিতাকাংক্ষিণী।

কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বুচচু বলল, "ওঠে আর পড়ে যায়। কাল পত্রিকায় লিখেনি 'বিমান দুর্ঘটনা'? কলকাতায় এরোপ্লেন আকাশে উড়তে গিয়ে পড়ে গেছে। তাতে মানুষ মরেছে।"

অকাট্য প্রমাণ। শুধু ঘটনা নয়, একেবারে দিন তারিখ পর্য্যন্ত উল্লেখ। এর পরে আর তর্ক করা কঠিন। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ করল রেবা। "দেখো ইংরেজ হারবে না।"

"হারবে না? তুমি কত্ত জানো? হারবে, হারবে, হারবে। জাপানীরা চার্চ্চিলকে হাতে-পায়ে বেড়ী দিয়ে বেঁধে এনে তার পর ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবে।" বলে এমন বীরদর্পে প্রস্থান করল বুচচু যেন জাপানী নয়, সে নিজেই চার্চ্চিলকে বন্ধনের উদ্যোগ করতে গেল।

রেবা প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "কখখনো না, জাপানীরা পারবে না। পারবে মিনি সাহেব?"

তাকে কাছে টেনে আদর করে বললেম, "না পারবে না। আর পারলেই বা কি? বাঁধুক না চার্চ্চিলকে; আমাদের রেবা দিদিমণিকে তো আর বাঁধতে পারছে না।"

"ইংরেজ হেরে গেলে বিলদের কি হবে? বিলের বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে, মাকে নিয়ে যাবে, জন, লসী ও এ্যানি সবাইকে তো বেঁধে নেবে?" বিল মানে প্রতিবেশী উইলিয়ম। রেবাদের পাশের ফ্লাটের বাসিন্দা সিমস্‌-দম্পতির বারো বছরের ছেলে। জন, লসী ও এ্যানি তারই ভাইবোন।

"তা নিকনা ধরে বিলদের। ওদের ট্যাবী কুকুরটা আমাদের বিলাসিয়াকে সেদিন কামড়ে দিচ্ছিল যে।"

মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করল রেবা। বলল; "না, ধরে নেবে না ওদের। বিল আমাকে চকোলেট দেয়, টফী দেয়। বলেছে একদিন তার সাইকেলে চড়তে দেবে।"

ও হরি! এতক্ষণে ব্রিটেনবান্ধবীর প্রবল ইংরেজ হিতৈষণার আসল কারণটা বোঝা গেল। চকোলেট, টফী, তার উপরে আবার সাইকেল চড়তে দেওয়ার আশ্বাস। এর পরেও ইংরেজের পরাজয় কল্পনা করা অত্যন্ত কৃতঘ্নতার পরিচয় হবে।

বিস্ময়ের কিছুই নেই। ভারতবর্ষে ইংরেজ অনুরাগী যে ক'জন আছেন তাঁদের সবারই ঐ এক অবস্থা। চকোলেট, টফী না হোক, কারো রুটি, কারো মাছ। কারো চাকুরী, কারো প্রমোশন, কারো বা রায় সাহেব, খান বাহাদুর বা সি, আই, ই, নাইটহুড খেতাব।

কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে বাধা পড়ল। সস্ত্রীক সেন সাহেব হানা দিলেন। মিসেস বললেন, "চলুন ওখলায়।"

"সে কোথায়?" পেরু না কামস্কাটকায়?"

"তার চাইতে কিছুটা কাছে। মথুরার পথে, এখান থেকে মাইল আটেক। ফিরতি পথে নিজামুদ্দিন দেখিয়ে আনব।"

ওখলা জায়গাটা একটা দ্বীপের মতো। যমুনার ধারাকে একটি কৃত্রিম খালের মধ্য দিয়ে ভিন্নমুখী করা হয়েছে সেখানে। সে-খাল বেষ্টন করেছে এক টুকরা ভূমিখণ্ড। বৃক্ষবহুল, ছায়াচ্ছন্ন। এক- [illegible]

খালের মুখ খোলা ও বন্ধ করার জন্ম আছে লকগেট এবং ওপরে প্রশস্ত সেতু। টাঙ্গা, মোটর অনায়াসে যেতে পারে। ছুটির দিনে দলে দলে লোক আসে পিকনিক্ করতে। ওখলা নয়াদিল্লীর বটানিক্‌স।

স্থানটি মনোরম। চারদিকের ধূসর রুক্ষ ও ধূলিকীর্ণ দেশে একটুখানি স্নিগ্ধ, শ্যামলতার আমেজ যেন। যমুনার অগভীর প্রবাহ খালের দিকে প্রসারিত করার জন্ম দীর্ঘ বাঁধ। তার উপর দিয়ে উপচীয়মান শুভ্র জলধারা গড়িয়ে পড়ছে ওপাশে। বেদীর মতো পাথর দিয়ে বাঁধানো সেখানটা। চাষীদের ছেলেরা কাপড় দিয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত। খালের মুখে ছিপ ফেলে বসে আছেন দু' একজন সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁদের ধৈর্য্য বিপুল এবং আশা সীমাহীন। গাছের নীচে ফরাস বিছিয়ে বসেছেন কোন শেঠ, প্রসাদ বা গুপ্তজী। চৌরীবাজারে বিরাট লোহার আড়ৎ। সারা সপ্তাহ হন্দর হিসাবে লোহা বেচে অর্থ উপায় করেছেন প্রচুর। রবিবারে এসেছেন প্রমোদভ্রমণে। সঙ্গে এসেছে বিপুলকায়া গৃহিণী, আধ ডজন পুত্রকন্যা, গোটা চারেক বৃহদাকার টিফিন কেরিয়ার, জলের সোরাই, আলবোলা ও ভৃত্য।

এসেছে কাঁধের উপরে পিতলের চাকতী বসানো খাকী গায়ে ইংরেজ, ক্যানেডিয়ান বা অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাপটেন। বাহুসংলগ্না ফিরিঙ্গী বান্ধবী। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের প্রণয়কাণ্ডের দুঃসাহসিক অভিব্যক্তি দেখে মাঝে মাঝে লজ্জিত হতে হয় দর্শকদেরই।

স্বদেশে ইংরেজকে কখনও দেখিনি এমন মাত্রাজ্ঞানহীন। শনিবার বিকেলে পিকাডিলীতে দেখেছি প্রণয়িযুগলের দল। কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস ঠিক ভট্টপল্লীর বিধানানুযায়ী নয় বটে, কিন্তু তবুও অদৃশ্য, অলিখিত একটা রেখা টানা আছে যা' লংঘন করে না কেউ। সে-রেখা সুনীতির নয়, সুরুচির। ডিসেন্সীকে ইংরেজ ভালবাসে মনে-প্রাণে। ইনডিসেণ্ট বলার বাড়া গাল নেই ইংলণ্ডে। ছাব্বিশ মাইল জল পার হলেই কন্টিনেণ্টে দেখা যায় না এ রুচিবোধ। শালীনতার অঙ্গুলী নির্দ্দেশকে সেখানে তরুণ-তরুণী বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে যে ইংরেজ, সে ঐ সুরুচির রেখাটার কথা ভুলে গেছে নিঃশেষে। বৃটেনের বাইরে বৃটিশ-কলঙ্কের কদর্য্য কাহিনী আছে Somerset Maugham এর গল্পে ভুরি ভুরি। পালামৌ ভ্রমণে সঞ্জীবচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, শিশু সুন্দর মায়ের কোলে, পশু সুন্দর জঙ্গলে। বৃটেন—জঙ্গলের বাইরে ইংরেজকে দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না ডারুইন-তত্ত্বে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের এই নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ এই যে, চার পাশের দর্শকদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমরা ওদের সম্বন্ধে কি ভাবি না ভাবি তা নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই, নেই আমাদের সামনে ভদ্র আচরণের দায়িত্ব। বোধ হয় আরও একটা কারণ আছে। সেটা গভীরতর। এদেশে ইংরেজ তার পরিবার ও সমাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এখানে সে বল্গাহীন অশ্ব। সে যেন কলকাতার মেসে থাকা মফঃস্বলের ধনী জমিদার-নন্দন। পিছনে অভিভাবকের নেই রাশ, হাতে টাকা আছে রাশি রাশি।

দুটি ইংরেজ-দম্পতি এসেছেন নয়াদিল্লী থেকে সাইকেল চেপে এই দারুণ গ্রীষ্মে। স্নানার্থে।

নদীতে জল কোথাও বুকের ওপরে নয়, কিন্তু স্বচ্ছ। তারই মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ধরে তাদের সন্তরণ অর্থাৎ সন্তরণের চেষ্টা চলল সোৎসাহে। ওপারে বালুচরে যে মৎস্যার্থী বকের দল ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো নিশ্চল, নিথর, জলের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি দাঁড়িয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করছিল, স্নানার্থীদের সশব্দ জলক্রীড়া ও কলহাস্যে তাদের ধৈর্য্য ক্ষুণ্ণ হলো। সচকিত হয়ে বারম্বার তারা স্থান পরিবর্তন করতে লাগলো।

স্ত্রী-পুরুষের এই মিলিত স্নান-পর্ব্বটা তেমন রুচিকর নয় আমাদের দেশে। প্রাচীনপন্থীদের কথা ছেড়েই দিলাম। জীবনে মরনে শয়নে স্বপনে যারা ইংরেজের অনুগামী, তাদের মধ্যেও মেয়েরা এটা খুব স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। ক্লাবে জিন বা ভারমুথ পান করে পরপুরুষের সঙ্গে ওয়াল্জ নাচতে যাঁদের বাধে না, তাঁরাও সহস্নানটা খুব প্রীতির চক্ষে দেখেন না।

স্থিরচিত্তে বিচার করলে বোঝা যাবে এর মূলে আছে আমাদের সংস্কার। কিন্তু সংস্কারের মুক্তিতো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুদ্ধি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়। সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিপ্লব; রয়ে সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস।

আমাদের প্রাচীন সমাজে নরনারীর একটা সম্মিলিত সত্তা খুব স্পষ্টরূপে স্বীকৃত নয়। উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক, পরিবেশ বিভিন্ন এবং কর্ত্তব্য আলাদা। একমাত্র ধর্ম্ম আচরণ ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষের একত্র করণীয় কিছুর উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে নেই। শ্রীকৃষ্ণের রথে সুভদ্রার সারথিত্বকে বাদ দিলে সমগ্র পুরাণ, কাব্য ও সাহিত্যে স্বামি-স্ত্রীর মিলিত কর্ম্মের দ্বিতীয় উপাখ্যান মিলে না। সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গ নিয়েছিলেন কাঠ কুড়োতে নয়, স্বপ্নে দেখা অমঙ্গলের ভয়ে।

সেকালে পুরুষেরা করতো যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, হলকর্ষণ ও বাণিজ্য। মেয়েরা করতো গো-ব্রাহ্মণের সেবা, রন্ধন ও গৃহমার্জ্জনা। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের সময় ও সুযোগ ছিল সঙ্কীর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র নিশীথে শয্যাগৃহের স্বল্পপরিসর অবকাশের মধ্যেই তা নিবদ্ধ ছিল। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথাও স্বামি-স্ত্রীর সর্ব্বব্যাপী যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে পদে পদে। সেখানে স্বামী এবং স্ত্রী একটা বৃহৎ সংসারযন্ত্রের স্ক্রু বা বল্টু মাত্র, উভয়ে মিলে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা সৃষ্টি নয়। সারেগামার তারা আলাদা দুটি সুর, দুইয়ে মিলে একটি অখণ্ড সঙ্গীত নয়। চৌধুরী-বাড়ীর মেজগিন্নী পারেন না বাড়ীর আর তিনটি জা ও পাঁচটি ননদকে রেখে একা স্বামীর সঙ্গে সিনেমায় কিম্বা গঙ্গার ঘাটে হাওয়া খেতে যেতে। বটঠাকুরের মনেও আসবে না একা বড়গিন্নিকে দার্জ্জিলিং কি সিমলা পাহাড়ে বেড়িয়ে আনার কথা।

নরনারীর মিলিত অস্তিত্বের ধারণাটি আমাদের সমাজে অধুনাজাত। স্ত্রী-পুরুষের পৃথক সত্তা পুরোপুরি মেনে নিয়েও উভয়ের মিলিত জীবনের একটি সমগ্র রূপ সম্প্রতি আমরা উপলব্ধি করতে সুরু করেছি এবং স্বীকার করতে দোষ নেই যে, এ-জ্ঞান আমরা ইউরোপের কাছ থেকে পেয়েছি। এখনও পুরুষ দশটা পাঁচটায় আপিস করে, আদালতে যায়, ব্যবসাবাণিজ্য চালায় এবং মেয়েরা ঘরকন্নার তত্ত্বাবধান করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু দু'পক্ষের রেসপনসিবিলিটি আলাদা হলেও পলিসির যোগ থাকে। এ যুগের স্ত্রীরা আদার ব্যাপারী হয়েও স্বামীদের জাহাজের খবর রাখেন।

গৃহ এখন কেবলমাত্র স্ত্রীর প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিচারেই গঠিত নয়। বাইরে পুরুষের বন্ধুত্ব, সামাজিকতা ও অবসর-বিনোদনও শুধু স্বামীর নিজস্ব অভিরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবজন্তুর মতো বর্ত্তমানে একান্নবর্ত্তী পরিবার লুপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে। স্বামী, স্ত্রী ও দু'-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যে নাতিবৃহৎ সংসার, তাতে স্বামীর স্থান গৃহকর্ত্তার। সে স্বনামপুরুষো ধন্যঃ। সে গৃহে স্ত্রীর পরিচয়ও মেজ, সেজ বা ছোট বউ-রূপে নয়, আপন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীরূপে।

অনেকেই ভুলে যান যে, স্বামি-স্ত্রীর মিলিত জীবনের পরিপূর্ণতাও প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে, সেটা আকস্মিক নয়। বিবাহ সে পরিপূর্ণতার লাইফ ইনসিওরেন্স নয়, গ্যারাণ্টি তো নয়ই। সে শুধু means, সে end নয়। সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত অধিকার দিয়ে বিবাহ স্ত্রীপুরুষের মিলনের ক্ষেত্রটিকে সুপরিসর ও নির্ব্বিঘ্ন করে মাত্র। তাকে সফল করতে হয় উভয়পক্ষের সযত্ন চেষ্টায়, নিরলস সাধনায়। আগে প্রেম ও পরে বিবাহকে যাঁরা বিবাহ-ঘটিত সমস্ত সমস্যার সমাধান জ্ঞান করতেন, তাঁরা এখন ঠেকে শিখেছেন যে, কোর্টসিপ করে বিয়েও ফুল-প্রুফ নয়, যেমন নয় ইণ্টারভিউ দিয়ে কর্ম্মচারী নিয়োগ।

স্বামী এবং স্ত্রী দিনে দিনে একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে আপন রুচির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা এবং মতবাদের দ্বারা। পরস্পরকে গঠন করে নিজ অভিলাষানুযায়ী, সৃষ্টি করে পলে পলে। এই দেওয়া নেওয়া, ভাঙ্গা গড়া চলে অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে এবং অনেকটা অবিসংবাদে। সেটা সুগম হয় নিকটতম সান্নিধ্যের দ্বারা। সান্নিধ্য শুধু গৃহে নয়, বাইরেও।

মানুষের মন বহুবিচিত্র; তার পরিচয়ের নেই শেষ, তার সত্তা নয় absolute। পরিবেশের পরিবর্ত্তনে তার প্রকাশ হবে বিভিন্ন। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে নানা পরীক্ষায়; উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে চ রাষ্ট্রবিপ্লবে। স্বামী স্ত্রীকে আবিষ্কার করবে তিল তিল করে নিত্য নব আবেষ্টনে, যেমন মণিকার হীরা, পান্না, মুক্তাকে করে নূতন ডিজাইনের বালাতে, চুড়িতে, চন্দ্রহারে। সুতরাং স্ত্রী যদি জলকেলির সঙ্গিনী হন, তবে তাকে এমন একটি বিশিষ্টরূপে পাই, যা সকাল বেলায় সধূম চায়েরং পেয়ালা হস্তে প্রতীক্ষমানা গৃহিণীর মধ্যে নেই। স্ত্রীকে নাচঘরে অপরের বাহুলগ্না দেখে যাঁরা রাগ না করেন, তাঁরা তাকে স্নানের সহচরী পেলে দুঃখিত হবেন কেন? নারীদেহ সুইমিং কষ্টিউমে দেখলেই শকড্ হবেন, এযুগে মার্কিণ সিনেমা দেখে যাঁরা চোখ পাকিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় এমন কেউ নেই।

সেনজায়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ফিরবার পথে মোটর থামালেন নিজামুদ্দিনের দরজায়। দরজা খুলে গেল ইতিহাসের এক অনধীত অধ্যায়ের।

পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন খিলিজী তৈরী করেছিলেন একটি মসজিদ সেদিনকার দিল্লীর একপ্রান্তে। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে একদা এক ফকির এলেন সেই মসজিদে। ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়া। আউলিয়ার খ্যাতি প্রচুর হলো। সেখানেই রয়ে গেলেন এই

মহাপুরুষ। ক্রমে প্রচারিত হলো তাঁর পুণ্যখ্যাতি; অনুরাগী ভক্ত-সংখ্যা বেড়ে উঠল দ্রুতবেগে।' স্থানীয় গ্রামের জলাভাবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর। মনস্থ করলেন খনন করবেন একটি দীঘি যেখানে তৃষ্ণার্ত পাবে জল, গ্রামের বধূরা ভরবে ঘট এবং নমাজের পূর্ব্বে প্রক্ষালনের দ্বারা পবিত্র হবে মসজিদে প্রার্থনাকারী দল। কিন্তু সংকল্পে বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিতরূপে। উদ্দীপ্ত হলো রাজরোষ। প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান গিয়াসুদ্দিন তোগলকের বিরক্তিভাজন হলেন এক সামান্য ফকির, দেওয়ানা নিজামুদ্দিন আউলিয়া।

তোগলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দিনের পিতৃপরিচয় কৌলীন্যযুক্ত নয়। ক্রীতদাসরূপে তাঁর জীবন আরম্ভ। কিন্তু বীর্য এবং বুদ্ধির দ্বারা আলাউদ্দিন খিলিজীর রাজত্বকালেই গিয়াসুদ্দিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন বিশিষ্ট ওমরাহরূপে। সম্রাটের 'মালিক'দের মধ্যে তিনি হয়েছিলেন অন্যতম। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে ছয় বৎসর পর পর রাজত্ব করল চুজন অপদার্থ সুলতান, যারা আপন অক্ষম শাসনের দ্বারা দেশকে পৌঁছে দিল অরাজকতার প্রায় প্রান্ত সীমানায়। গিয়াসুদ্দিন তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা। এমন সময় খসরু খান নামক এক ধর্ম্মত্যাগী অন্ত্যজ হিন্দু দখল করলো দিল্লীর সিংহাসন। গিয়াসুদ্দিন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে অভিযান করলেন পাঞ্জাব থেকে দিল্লী, পরাজিত ও নিহত করলেন খসরু খানকে, সগৌরবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাদশাহী তক্তে।

গিয়াসুদ্দিনের দৃঢ়তা ছিল, শক্তি ছিল, রাজ্যশাসনে দক্ষতা ছিল। কিন্তু ঠিক সে অনুপাতেই তাঁর নিষ্ঠুরতাও ছিল ভয়াবহ। একদা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের অসাবধানী রসনায় রটনা শোনা গেল গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর। সুলতানের কানেও পৌঁছল সে ভিত্তিহীন জনরব। কিছুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে সুলতান আদেশ করলেন তার সিপাহশলারকে "লোকে আমাকে মিথ্যা কবরস্থ করেছে, কাজেই আমি তাদের সত্যি কবরে পাঠাতে চাই।" অগণিত হতভাগ্যের জীবনান্ত ঘটলো নিমেষে নিমেষে; গোরস্থানে শবভুক পশুপক্ষীর হলো মহোৎসব।'

কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের বিচক্ষণতা ছিল। সেকালে মুঘলদের আক্রমণ এবং তার আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ছিল উত্তর-ভারতের এক নিরন্তর বিভীষিকা। গিয়াসুদ্দিন তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পত্তন করলেন নূতন নগর, তৈরী করলেন নগর ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং প্রাচীরদ্বারে দুর্জ্জয় দুর্গ। এক দিকে ক্ষুদ্র পর্ব্বত আর এক দিকে প্রাচীরবেষ্টিত নগরী। মাঝখানে খনিত হলো বিশাল জলাশয়। বর্ষার দিনে শৈলশিখর থেকে ধারাস্রোতে জল সঞ্চিত হতো এই জলাশয়ে; সম্বৎসরের পানীয় সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস থাকতো প্রজাপুঞ্জের।

ফকির ও সুলতানে সংঘর্ষ ঘটল এই নগর-নির্ম্মাণ, কিম্বা আরও সঠিক ভাবে বললে বলতে হয় নগর-প্রাচীর-নির্ম্মাণ উপলক্ষ করেই।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দীঘি কাটতে মজুর চাই প্রচুর, গিয়াসুদ্দিনের নগর তৈরী করতেও মজুর আবশ্যক সহস্র সহস্র। অথচ দিল্লীতে মজুরের সংখ্যা তখন অত্যন্ত পরিমিত, দু'জায়গায় প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বাদশাহ অপেক্ষা করুক ফকিরের খয়রাতি খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্থের, সেটা পরিমাণ করা যায়। ফকিরের জোর হৃদয়ের, তার সীমা শেষ নেই। মজুরেরা বিনা মজুরীতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিজামুদ্দিনের তালাও। সুলতান হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "তবে রে—।" কিন্তু তার ধ্বনি আকাশে মিলাবার আগেই এত্তালা এলো আশু কর্ত্তব্যের। বাংলা দেশে বিদ্রোহ দমন করতে ছুটতে হলো সৈন্য-সামন্ত নিয়ে।

সাহজাদা মহম্মদ তোগলক রইলেন রাজধানীতে রাজপ্রতিভূ-রূপে। মহম্মদ নিজামুদ্দিনের অনুরাগীদের অন্যতম। তাঁর আনুকূল্যে দিবারাত্রি খননের ফলে পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হলো অনতিবিলম্বে। তোগলকাবাদের নগর-প্রাচীর রইল অসমাপ্ত।

অবশেষে সুলতানের ফিরবার সময় হলো নিকটবর্ত্তী। প্রমাদ গণনা করলো নিজামুদ্দিনের অনুরাগীরা। তাঁরা ফকিরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকির মৃদু হাস্যে তাদের নিরস্ত করলেন, "দিল্লী দূর অস্ত্।" দিল্লী অনেক দূর।

প্রত্যহ যোজন-পথ অতিক্রম করেছেন সুলতান, নিকট হতে নিকটতর হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রত্যহ ভক্তেরা অনুনয় করে ফকিরকে। প্রত্যহ একই উত্তর দেন নিজামুদ্দিন,—দিল্লী অনেক দূর।

সুলতানের নগর প্রবেশ হলো আসন্ন, আর মাত্র এক দিনের পথ অতিক্রমণের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিষ্য-প্রশিষ্যেরা অনুনয় করলো সন্ন্যাসীকে, এখনও সময় আছে, এই বেলা পালান। গিয়াসুদ্দিনের ক্রোধ এবং ক্রূরতা অবিদিত ছিল না কারো কাছে, ফকিরকে হাতে পেলে কী দশা হবে তাঁর, সে কথা কল্পনা করে তারা ভয়ে শিউরে উঠলো বারম্বার।

স্মিত হাস্যে সেদিনও উত্তর করলেন বিগতভয় সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, —"দিল্লী হনুজ দূর অস্ত্।" দিল্লী এখনও অনেক দূর। বলে হাতের জপের মালা ঘোরাতে লাগলেন নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে।

নগরপ্রান্তে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মহম্মদ তৈরী করেছেন মহার্ঘ্য মণ্ডপ। বিরাট কিংখাবের সামিয়ানা; জরীতে জহরতে ঝলমল। বাদ্যভাণ্ড, লোক-লস্কর, আমীর-ওমরাহ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হস্তি-যুথের প্রদর্শনী প্যারেড।

মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলের ঈষৎ উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তাঁর উত্তরাধিকারীর। পরদিন গোধূলি বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভ্যর্থনা-মণ্ডপে, প্রবল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। সিংহাসনের পাশে বসালেন প্রিয় প্রিয়তম পুত্রকে। সে পুত্র মহম্মদ নয়, তার অনুজ।

ভোজনান্তে মহম্মদ বিনয়াবনত কণ্ঠে অনুমতি প্রার্থনা করলো সম্রাটের। জাঁহাপনার হুকুম হলে এবার হাতীর কুচকাওয়াজ সুরু হয়। হস্তিযুথ নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। গিয়াসুদ্দিন অনুমোদন করলেন স্মিত হাস্যে।

মহম্মদ মণ্ডপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো ধীর শান্ত পদক্ষেপে।

কড়., কড়., কড়.ড়., কড়াৎ।

একটি হাতীর শিকলতাড়নে স্থানচ্যুত হলো একটি স্তম্ভ।

[illegible]

তিমির-তীর্থ

তিমির-তীর্থ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সূর্য্য জ্বলে দূর নভোনীলে।
আর নিচে
এখনো দুরূহ তাপ জীবনের পিচে।
তাপাক্রান্ত অশান্ত নিখিলে
সমুদ্রের স্রোতের মতন
এখনো অনেক ঢেউ, মত্ত আলোড়ন,
পথে মাঠে ফুটপাথে ঘাটে
হারানো সঙ্কেত খোঁজে বিভ্রান্ত যৌবন।

সঙ্কীর্ণ গলির মোড়ে
বাসা বেঁধে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে
এতো কাল থেকেছি সবাই,
কেরাণী 'ভিখারী মেয়ে শ্রমজীবী সব এক ঠাঁই।
চিনেছি তো রজনীর গাঢ় রহস্যকে
অন্ধকারে, নক্ষত্রখচিত নভোনীলে,
অনেক দুরন্ত গন্ধ ফুলের স্তবকে,
রোমাঞ্চিত রাত্রির নিখিলে।
কখনো দিগন্তপথে অন্ধকারে অনেক বাদুড়
চলে গেছে ডানা মেলে উড়ে,
সমস্ত দিনের পরে মাঠে-মাঠে প্রাণ মূর্চ্ছাতুর,
অনেক প্রাণের বেগ চিন্তাকাশ জুড়ে'।

অনেক বাত্যার শেষে ওখানে বসে' ভাবি
জীবন ইস্পাত হোক এই শুধু দাবী।
নির্জ্জন সন্ধ্যার মাঠে কৈশোরে শুনেছি ঝিল্লি-স্বর,
ঈশানের পুঞ্জমেঘে বর্ণচ্ছটা দেখে
কেঁপেছে অন্তর,
অনেক রাতের শেষে সর্ব্ব দেহে আজ ধূলি মেখে
আবর্ত্ত-আঘাতে জাগে নতুন মর্ম্মর।
এখানে গলির মোড়ে উন্মোচিত লাল কৃষ্ণচূড়া
ছড়ায় অনেক ঘ্রাণ,
সন্নত কিশোরী দেখি যৌবনের ভারে মূর্চ্ছাতুরা,
তৃষাদীর্ণ প্রাণ।
প্রার্থনা কি ক্ষুধা তৃষ্ণা সকল মিটায়?
ফিরিঙ্গী মেয়েকে দেখি প্রতি রবিবারে
সকালে গির্জ্জায়।
মসৃণ বোতল হাতে এখনো তো নিষিদ্ধ পাড়ায়
রাত্রি জাগে তুখোড় ইয়ার,
গ্রামদেশে মেলে না তো ওঝা, বিষ ঝেড়ে
রুগীকে বাঁচাতো যারা প্রাণে শেষ বার।
কঠিন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে শনিবারে রেস্‌কোর্স মাঠে
দ্রুত চলে জীবনের গাড়ী,
এখনো অনেক লোক খোলা পথে নির্ভীক জুয়াড়ী।

অথচ সংসারে থেকে ভাবি সারাক্ষণ
ইস্পাতের মতো হোক্ মন।
চেয়েছি সমুদ্র-বায়ু জীবনের অলিতে গলিতে
সব ক্লান্তি শ্রান্তি মুছে দিতে।
রাজনীতি ভালোবাসি, ভালোবাসি আদর্শ নায়ক—
ভালোবাসি জনতাকে, ভালোবাসি নীলাকাশে
এক ঝাঁক বক।

চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো অসংখ্য কাঠের থাম। চাপা-পড়া মানুষের আর্ত্ত কণ্ঠে বিদীর্ণ হলো অন্ধকার রাত্রির আকাশ। ধূলায় আচ্ছন্ন হলো দৃষ্টি। ভীত সচকিত ইতস্ততঃ ধাবমান হস্তিযূথের অনুভার পদতলে নিষ্পিষ্ট হলো অগণিত হতভাগ্যের দল এবং সে বিভ্রান্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে উদ্ধারকর্মীরা ব্যর্থ অনুসন্ধান করলো বাদশাহের। [illegible] [illegible]

মনোনীত করেছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপর সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত। বোধ করি আপন দেহের বর্ম রক্ষা করিতে চেয়েছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদকে।

ঐহিকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সম্পূর্ণ গিয়াসুদ্দিনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটলো নগর-প্রান্তে। দিল্লী রইল চিরকালের জন্য তাঁর জীবিত পদক্ষেপের অতীত।

দিল্লী দূর অস্ত্‌, দিল্লী অনেক দূর।

আশুমাষ্টার

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

১

আশুতোষ বাড়ুজ্যে যেদিন গ্রামের জমিদার মনোমোহন রায়চৌধুরীর পাচক হিসাবে আসিয়া ইন্দ্রপুর গ্রামে পা দিল, সেদিন কাহারও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এমন চেহারা, বাড়ুজ্যের ছেলে, লেখা-পড়া জানে, শেষে কি না আসিবে পাচকের কাজ করিতে! ইহা বিশ্বাস করিতে গ্রামের লোকের কাহারও মন সায় দিল না। সপ্তাহ খানেক যাইতে-না-যাইতেই তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, বংশমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে নানা রকমের সত্য-মিথ্যা গুজব সারা গাঁয়ে ছড়াইয়া পড়িল। আমাদের দক্ষিণের বাড়ীর উঠানে কতিপয় যুবকবৃন্দ মিশিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে শীতের রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন। তাহাদের এই রৌদ্রসেবন ও তামাক টানার আসরেও আশু ঠাকুরকে নিয়া একটা মস্ত বড় গবেষণামূলক আলোচনা হইয়া গেল। সভায় রামলোচন স্মৃতিভূষণ প্রাজ্ঞ লোক। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর-পাড়ার শ্যামাচরণ কাকা বলিলেন, "দেখেছেন পণ্ডিত মশাই, আমাদের কর্তাবাবুদের নূতন পাচকটিকে?"

পণ্ডিত মশাই হয়ত এতক্ষণ তাহার কথাই ভাবিতেছিলেন, তাই [illegible] পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি ওদিন বাজারে তাকে দেখে ত অবাক! কি লম্বা চেহারা, কি গায়ের রঙ, [illegible] টুসু টুসু করছে। তার পর কী বাহার আর পোষাকের! [illegible] Othello [illegible]

তাহাদের গল্পগুজবী কথাগুলি উপভোগ করিতেছিলাম রৌদ্র-সেবনের সঙ্গে সঙ্গে। পণ্ডিত মশাই আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই যে আমাদের অমল, ওরাও ত মন্টু বাবুর সমান অংশীদার ছিল; এখন না হয় মামলা-মোকদ্দমায় সব হারিয়েছে। তবুও ত জমিদার। তার পর কোলকাতায় কত বড় কলেজে বি-এ পড়ছে। দেখ ত তার পোষাকটা। আর এই ছোকরা যেন ময়ূরভঞ্জের রাজপুত্র! আমি ভেবেছিলুম, ওদের কোন আত্মীয়-টাত্মীয় হবে না কি? শেষে কি না শুনলুম, ওদের বাড়ীর ঠাকুর!"

কনক গ্রামের স্কুলে পড়ে। পণ্ডিত মশাইকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "জ্যেঠামশাই, মন্টু বাবুর বাড়ীর ঐ নূতন আশু-ঠাকুর! ও ত আই-এ ফেল। ওদিন আমাদের স্কুলে গিয়ে ইংরেজি বলে এসেছে।" ইন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আরে না! আই-এ পাশ! তা হ'লে রাঁধতে আসবে কেন?"

যাদব যেন কথাটা সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, "না, আমি জানি মেট্রিক পাশ। পাশ না-হউক মেট্রিক পর্যন্ত তো পড়েছেই। ওপাড়ায় ওদিন গিয়েছিলুম। নীলাদের বাড়ীতে একটা ইংরেজি চিঠি এসেছিল। কেউ-ই পড়তে পারচে না। আশু ঠাকুর কেমন সুন্দর ভাবে পড়ে দিলে।"

কনক সায় পাইয়া বলিল, "না গো জ্যেঠামশাই, আমি বলছি, সেদিন আমাদের স্কুলে কেমন ইংরেজি বলে এসেছে! ছোট স্যার পণ্ডিত একটা কথারও মানে বুঝতে পারলেন না!"

শিবু মাঝখান থেকে বলিয়া উঠিল, "ও বড়লোকের ছেলে গো। এখন অভাবে পড়ে চাকুরী করতে এসেছে।"

ইন্দ্রনাথ আবার প্রতিবাদ করিয়া বলিল; "অভাবে পড়লেই ভাত রাঁধবে?" আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তবে অমলদা ভাত রাঁধতে যায় না কেন?"

আমাকে নিয়া আমারই সামনে আমাদের জাতি-বাড়ীর ঠাকুরের সঙ্গে যদৃচ্ছা তুলনা—সমালোচনা চলুক, ইহা আমি কোন মতেই বরদাস্ত করিতে পারি নাই। তাই স্মৃতিভূষণ মশাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "আপনারা বড় পরচর্চাপ্রিয়! জমিদার-বাড়ীর ঠাকুর, বি-এ হতে পারে, আই-এ হতে পারে, চেহারায় রাজপুত্রও হতে পারে; এতে আপনাদের কী আসে যায়?"

পণ্ডিত মশাই কি বলিতে [illegible], [illegible] না [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] দিলাম।...

২

ক্রমে ক্রমে সারা গাঁয়ে আশু ঠাকুরের যশ ছড়াইয়া পড়িল। গ্রামের প্রায় যুবকের সঙ্গেই তার খুব ভাব। গান গাইতে ভাল পারে। তাই গানের আসর জমিলেই তার ডাক আসে। কুমারী মেয়েরা তাহার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন! স্কুলের ছাত্ররা তাহার মুখে ইংরেজি শুনিয়া অবাক্। পূজাপার্বণে, উৎসবে সে সকাল থেকে রাত্রি রাবটা পর্যন্ত খাটে। তার পর আবার বড় বড় পেটুকদের ভোজনে হার মানিয়া দেয়। তাই গ্রামের যুবকবৃন্দ কেউ-ই তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে নাই।

মুক্তিদাসুন্দরী রায় চৌধুরাণী অতি গুণগ্রাহিণী দয়াবতী মহিলা। তিনি আশুকে পাচকরূপে পাইয়া খুশি হইয়াছেন। কিন্তু তাহাকে রান্নাঘরে পাঠাইতে যেন কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করেন। কয়-দিন তো রান্না করিয়া সে বেশ খাওয়াইয়াছে। আর শালগ্রামশিলাটির পূজাও করিয়াছে। এই জন্যই তাহাকে নিয়োগও করা হইয়াছিল। চৌধুরাণীর কিন্তু কেমন-কেমন লাগিতেছিল। কুলীন বামুনের ছেলে, ভাল চেহারা, ভাল গায়, চমৎকার আদব কায়দা, ইংরেজি বই চোখ বুজিয়া পড়িয়া ফেলে। তিনি আর কোন মতেই পাকের ঘরে পাঠাইতে ভরসা পাইতেছিলেন না। তাই কর্তাকে অর্থাৎ মধু বাবুকে বলিয়াই ফেলিলেন, "আমার একটি নূতন ঠাকুর দরকার; আশুকে আর পাক করতে দোব না।"

"কেন?" মধু বাবু অবাক্ হইয়া বলিলেন।

"এমন লেখাপড়া-জানা ভদ্রঘরের ছেলেকে আমি পাক করতে দিতে পারব না।"

"তা হ'লে ও কি করবে?"

"সীতা ও গীতাকে পড়াবে। আর পূজো করবে।"

"ছোট রাম পণ্ডিত?"

"তাকে জবাব দাও।"

"গরীব লোকটাকে শুধু শুধু তাড়িয়ে দোব? আমি পারব না।"

"তা হ'লে আমি মাসে-মাসে তার মাইনে-টা দিয়ে দিচ্ছি। তাকে আর পড়াতে হবে না।"

"তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। ঠাকুর আনব আর তুমি তাড়িয়ে দেবে? ভাল একটা ঠাকুর আনলুম, আর তুমি তাকে মাথায় তুলে রাখবে।"

"যাই হোক, একটা নূতন ঠাকুর শিগ্‌গির চাই। আজকে বিকেলের মধ্যেই।"

মধু বাবু এরি মধ্যে মেজাজ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। গৃহিণীর বাক্যজাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সতেজে "যাও, যাও, দেখা যাবে।" বলিয়া কাছারী-ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি পা বাড়াইলেন।

৩

তিন বছর পরে এম-এ পরীক্ষা দিয়া যখন দেশে আসিলাম, শুনিলাম সীতার বিবাহ মঙ্গলমতেই (?) হইয়া গিয়াছে। একদিন পুরানো দালানের বড় জানালাটার কাছে একটা বিছানায় শুইয়া শুইয়া আমাদের এই বিরাট বাড়ীটার কথাই ভাবিতেছিলাম। প্রায় একশো বছর আগে আমার প্রপিতামহ এই বিরাট অট্টালিকা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পুরান দিনের পরিত্যক্ত রাজবাটীর মত প্রকাণ্ড ও [illegible] পড়িয়াছে। ঐ ইটগুলি যেন প্রাণবান্। যেন যে-কোন সময় লাফাইয়া পড়িতে পারে।

ভাবনার স্রোতে বেশী দূর ভাসিয়া যাইতে পারি নাই। কনক একটা algebra'র problem নিয়া আসিয়া আমার গতিটা আটকাইয়া দিল। আমি তাহার অঙ্কটা খাতায় কষিতেছি, আর কনক বলিয়া চলিল, "অমলদা, ও বাড়ীর সীতার বিয়ে হয়ে গেছে; শুনেছ?"

"হ্যাঁ, কেন রে?"

"হ্যাঁ, আর কেন? বিয়েতে যা কীর্ত্তি! আশু মাষ্টারকে তো দেখেছো? ঐ যে আশু ঠাকুর!"

"হ্যাঁ, ও কী করেছে?"

"ও আর কী করবে? সীতা চেয়েছিল ওর সঙ্গেই তার বিয়ে হয়! সীতার বাবা ত এ-কথা শুনে আগুন!"

"করলেন কী?"

"করবেন আর কী? কোলকাতার এক পুলিশ-অফিসার; কী মোটা চেহারা, আর কী মোটা গোঁফ! তার পর আবার দ্বিতীয় বর। তার সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিলে।"

"সীতা আপত্তি করেনি?"

"অ্যাঁ! মেয়ে-মানুষ আবার আপত্তি করবে?"

"সীতার মা?"

"প্রথম ত করেছিলেনই। কিন্তু শেষে যখন শুনলেন পুলিশ অফিসারের স্যাড়ে সাত শো' টাকা মাইনে, তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলেন। শুধু রাজি হলেন না, সীতাকেও মন্ত্র দিয়ে দিয়ে রাজি করে নিলেন।"

"সীতা রাজি হলো?"

"রাজি হউক বা না হউক, বিয়ে তো হলো।"

"আশু মাষ্টার এখন কোথায় রে?"

"কে জানে? সীতার বিয়ের ক'দিন আগেই জানি কোথায় চলে গেছে।"

৪

অনেক দিন কোলকাতার একটা অখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেতেছি। যে-কয় টাকা মাহিনা পাই তাহাতে নিজেরই কোন মতে চলে না। মা-বাপের অভাব-অনটনও একটু লঘু করিতে পারি নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আমাকে কষ্ট করিয়া লেখা-পড়া শিখাইয়াছেন; এত দিনে আমি টাকা রোজগার করিয়া পিতৃপুরুষের বাড়ীর রঙ ফিরাইব; তাঁহাদের সকল দুঃখ ঘুচাইব। কিন্তু আমি কিছুই করিতে পারি নাই।

কয় বছর ধরিয়া ক্রমাগত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখি আর দরখাস্তের পর দরখাস্ত করি। কোনটার উত্তর আসে, কোনটার বা আসে না। উত্তর পাইলেই নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখা করিতে যাই কিন্তু ভিড় দেখিলে মাথা গরম হইয়া যায়। তার পর বেতনের কথা শুনিলে চাকুরী করার আর নাম নিতে ইচ্ছা হয় না।

আজ-কালকার অর্থাভাব আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছেই সহানুভূতি বা সাহায্যের জন্য যাই, সেই কাষ্ঠ-সহানুভূতি প্রদর্শন করে, আর [illegible] নিন্দা করে, বলে, "ওটা কিছু কাজের নয়। এই [illegible] কত লোক কত কিছু করে দিল [illegible] লোক-[illegible]" [illegible] লোকে

কথায় কোনও কান দেই না। বিজ্ঞাপনের সারি রোজই দেখিয়া যাই।

এক দিন 'বসুমতী'তে দেখি, "সম্ভ্রান্তবংশীয়, চিঠিপত্র-লেখা ও হিসাব-পত্রে দক্ষ এক জন গ্রেজুয়েট চাই। সত্বর আবেদন করুন। এ, ব্যানার্জি, ৪৭।৬১ ভোভার লেন, কলিকাতা।"

দরখাস্ত করিলাম। ৪ দিনের মধ্যেই উত্তর আসিয়া হাজির। এত তাড়াতাড়ি আমি আশা করি নাই। ২৫শে যে দেখা করিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া রামকৃষ্ণের ফটোর নিম্নদেশে মাথা ঠেকাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

৫

প্রশস্ত হল-ঘর। কার্পেট পাতা। আধুনিক আসবাব পত্রে সাজান। মিঃ ব্যানার্জির শয়নাগার তার পাশের ঘরটাই। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তিনি তখনও ঘুমাইতেছেন। আমার উপস্থিতির খবর যে তিনি পাইয়াছেন তাহাও পাশের ঘরের কথাবার্ত্তা থেকেই অনুমান করিয়া নিলাম। বসিতে বসিতে এক ঘণ্টা গেল, দুই ঘণ্টা গেল। যখন আড়াই ঘণ্টাও যায়, তখন একটি আধুনিকা, সুন্দরী তন্বী মুখ বাড়াইয়া বলিয়া গেলেন, "তিনি উঠে মুখ-ধুচ্ছেন; একটু বসুন।" মহিলাটি চলিয়া যাইতে-না-যাইতেই একটি ভৃত্য এক plate খাবার আর একবাটি কাফি আমার সামনে রাখিয়া গেল। আমি পত্রিকা পড়িতে পড়িতে সন্দেশগুলির সদ্ব্যবহার ও কাফির বাটিটা নিঃশেষ করিলাম। এমন সময়, আবার সেই সুন্দর মুখখানা উঁকি দিয়া বলিল, "আসুন, আপনাকে ডাকছেন।"

আমি কর্ম্মপ্রার্থীর ব্যস্ততা নিয়ে মিঃ ব্যানার্জির শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। তিনি একটা পালঙ্কের উপর সুসজ্জিত কোমল শয্যায় বসিয়া আছেন। ইহার সম্মুখেই একটা চেয়ার পাতা। আমি গিয়া নমস্কার দিয়া দাঁড়াইতেই বসিতে বলিলেন।

"আপনার নাম অমলকুমার রায়চৌধুরী। না? আপনি বুঝি মাষ্টারী করেন?"

আমি মাথা নোয়াইয়া সহাস ভঙ্গিতে বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি আমার সংসার-পত্র-ব্যবসা সব দেখতে পারবেন?"

"পারবো না কেন?" আমি হাসিয়া বলিলাম।

"আচ্ছা, আপনি থাকেন কোথায়?"

"শ্যামবাজারে।"

"উঃ। অত দূর? এখানে এসে থাকতে পারবেন? সস্ত্রীক আছেন?"

"বিয়ে করিনি?"

"বিয়ে করেননি? সে কি? এম-এ পাশ, তার পর আবার ভাল কাজ করছেন, কনের বাবারা আপনাকে রেহাই দিল কি করে?"

আমি আবার বলিলাম, "হয়নি।"

"তাহলে আপনি আমার বাড়ীতে এসে থাকতে পারবেন?"

আমি খুব বেশী ভাবি নাই। বলিয়া ফেলিলাম, "পারবো না কেন?"

"তা হলে আসুন। এই পাশের ঘরটাতেই আপনি থাকবেন।" এই বলিয়া যুবতী ভদ্রমহিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন, "অমিতা, [illegible] উনি এখানে থাকবেন।"

মহিলাটি "আসুন" বলিয়া আগে-আগে গেলেন।

ঘরটি বেশ সুন্দর ভাবে সাজান। ঘরে একটা Spring-এর Single bed। ঘরের দক্ষিণ দিকটা বেশ সুন্দর খোলা। আমি "ঘরটা বেশ" বলিয়া ফিরিয়া আসিতেই মিঃ ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পছন্দ হলো ত?"

"পছন্দ হবে না? চমৎকার ঘর!"

"কবে আসছেন তবে?"

"কালকেই।"

"সকালেই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সকালেই।"

"আপনার বিছনা-পত্র-টত্র কিছু আনতে হবে না। সবই এখানে পাবেন। তার পর, আর একটা কথা। আপনাকে কত দেব বলুন ত? তিনশো টাকায় চলবে?"

"নিশ্চয়ই চলবে।"

তিনি তখন "তবে আজ আসুন" বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

আমি "আসি" বলিয়া বাহির হইলাম।

৬

মিঃ ব্যানার্জির পরিচয় সম্বন্ধে প্রথম দিন থেকেই কী রকম একটা সন্দেহ আমার মনে গজাইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার চেহারার সঙ্গে আমাদের গ্রামের সীতাদের গৃহশিক্ষক আশু মাষ্টারের একটা স্ফুটতর সাদৃশ্য রহিয়াছে। এমনি ছিল তার নাক, এমনি ছিল তার চোখ। আশু মাষ্টার ছিল ছিপ-ছিপে, রোগা, রঙ একটা ফর্সা ছিল না। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জির চন্দনকলসের মত লম্বোদর। সাদৃশ্যটা যেমন স্ফুটতর, পার্থক্যটাও তেমনি সবল। এখানে আসিয়া ভাল করিয়া জানিলাম তাঁহার নাম অমিয়কুমার, আশুতোষ নয়; চিঠিতে শুধু এ, ব্যানার্জি ছিল। তাই সন্দেহটা আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। এখানকার কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে তাহার যে-পরিচয়টুকু লাভ করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে আশু মাষ্টার মনে করার কিছুই পাই নাই।

তার পর আমার উপর তাঁহার কেন এত অপার করুণা তাহাও বুঝিতে পারি না। নিজের বাড়ীতে নিজের শয়নকক্ষের পাশের ঘরে আশ্রয় দিয়াছেন। নিত্য চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহার করিতে দিতেছেন। তার উপর আবার তিনশো টাকা মাসে মাসে। তিনশো টাকার কাজ ত আমি কিছুই করি না।

মোটের উপর সবটা ব্যাপারই আমার কাছে স্বপ্নের মত ঠেকিতেছিল।

এক দিন রাত বারটা হইবে। আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কে যেন বারে বারে দরজায় ঘা দিতেছে। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখি অমিতা দাঁড়াইয়া। দরজা খুলিতেই সে বলিল, "আপনাকে ডাকছেন, এক্ষুনি আসুন, অমল বাবু।" আমি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে তাহার অনুসরণ করিলাম। গিয়া দেখি, অমিয় বাবু শয্যায় ছটফট করিতেছেন। ঘরময় মদের গন্ধ। গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "আর ত ফাঁকি চলছে না, বলুন ত মশাই আপনি কে?"

আমি [illegible] তাঁহার অবস্থা দেখিয়া। তার পর

এত দিন পরে এই প্রশ্ন কেন, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। বলিলাম, "কেন ? হয়েছে কী ?"

"বলুন না আপনি কে ? আপনি ইন্দ্রপুরের লোকনাথ রায়-চৌধুরীর ছেলে···?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন ত ?"

"হ্যাঁ ঠিক ধরেচি, আপনার দরখাস্ত দেখেই ধরে ফেলেছি। আপনি সীতাকে চেনেন ? মনু বাবুর বড় মেয়ে ?"

"হ্যাঁ।"

"সে ত আপনার বোন ? কিন্তু তার কোন খবর রাখেন ? তার বিয়ে হয়েছিল সাতশো টাকা বেতনের এক পুলিশের সঙ্গে। এক গোঁফওয়ালা পুলিশ! সীতা,—আমার বুকের সীতা এক দিন বাদলা বিকেলে আমার বুকে তার মাথাটি রেখে বলেছিল, সে আমাকে ভালোবাসে, সে আমাকে বিয়ে করবে। উঃ! সীতা! বুড়োটা দিলে না! তিনটা তালগাছ, আর পাঁচটা নারকেল গাছের জমিদারটা দিলে না,—আমার সঙ্গে সীতার বিয়ে দিলে না! সীতার মা চেয়েছিল সীতাকে আমারই হাতে দিবে ; শেষে কিনা সাতশো টাকার নাম শুনে ভুলে গেল! সীতার বিয়ে হয়ে গেল! সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! সেই সীতার আজ কী দশা জানেন ? সে আজ খেতে পায় না। বুড়ো পুলিশটা ঘুষ খেয়েছিল। তার চাকুরী গেছে। জরিমানা হয়েছিল, ৫০০৲ টাকা। সীতা তার অলঙ্কারপত্র সব দিয়ে দানবটাকে জেল থেকে বাঁচিয়ে এনেছে। সীতা!"

তার পর অমিয় বাবু আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন, বলিলেন, "আমাকে চিনতে পেরেছেন ? আমি আপনাদের মনু বাবুর বাড়ির বার টাকা মাইনের ঠাকুর, তার পর প্রমোশন পেলে কুড়ি টাকা মাইনের মাষ্টার। চেনেন ?—সীতা! সে বাপের বাড়ী যায়নি! সে আমাকে লিখেছে ; লিখেছে কেন যায়নি। দেখবেন কি লিখেছেন ?" বলিয়া তিনি বালিশের তলা থেকে একটা চিঠি বাহির করিয়া আমাকে দিলেন। উহাতে মেয়েলি হাতে লেখা—

"আশুদা,

আমার কপালের লিপি বোধ হয় তুমি পাঠ করেছ। আমি আজ নতুন পতিতা নই। যেদিন বাবা সাতশো টাকা মাহিনার কাছে আমাকে বিক্রয় করলেন, সেদিনই আমি পতিতা হয়েছি। তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে যেদিন আর এক জনকে আমার দেহ দিতে হয়েছে সেই দিনই আমার সতীত্ব গেছে। তাই বাবার কাছে না গিয়ে এইখানে বিক্রীত দেহটাকে বিক্রী করছি, ছেলে তিনটে ও গোঁফোটার জন্ত। আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ভুলে যেয়ো।

ইতি সীতা।"

আমি পড়া শেষ করতে না করতেই অমিয় বাবু অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, "গোঁফোটাই সীতার জন্ত রাস্তা থেকে লোক নিয়ে যায়! হায় সীতা!"

অমিতার দিকে অঙ্গুলি চালাইয়া আবার বলিলেন, "ওকে চেনেন ? উনি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন বি-এ। চার বছরে চার জনার সঙ্গে প্রেম করেছেন। তার পর I. C. S.এর সঙ্গে courtship করছেন। বিয়ে হয়নি। শেষে আমার সঙ্গে। হায়! সীতার মত আর কজো[illegible]!

আমি অমিয় বাবুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্ত কথা খুঁজিতেছিলাম। তিনি আবার গদ্গদ স্বরে সুরু করলেন, "হায় সীতা!—যেতে পারবেন এক্ষুনি—সীতার বাড়ীতে। ৩৫।১০ চীৎপুর, আপার চীৎপুর রোডে যান, তবে এক্ষুনি যান। পাঁচশো টাকা দাও ত অমিতা, এক্ষুনি দাও। গাড়ীটা নিয়ে যান। মঙ্গলালকে ডাকুন।—এক্ষুনি যান!"

আমি 'না'—বলিতে সাহস পাই নাই। নোট পাঁচটা পকেটে করিয়া আমি নীচে নামিয়া গেলাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে আলোকের মত পরিষ্কার হইয়া গেল।

চীৎপুরে প্রায় রাত দেড়টায় পৌঁছিয়াছি। সমস্ত রাস্তা নীরব। শুধু সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে পতিতারা, যারা শত শত অপতিতাকে পাতিত্য থেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই পতিতাদের সারিতে আমাদেরই বংশের একটা মেয়ে! গাড়ীটা থামাইয়া আমি ৩৫।১০ নং খুঁজিতে লাগিলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে একটা অন্ধগলীতে আসিয়া পড়িলাম। ৩৫।২০,···৩৫।৮০,···৩৫।৬৬···৩৫।১০এ বাড়ীটা ভাড়া হইলেও পাড়াটা খারাপ নয়, আমার বুকের ভয়টা কমিয়া গেল। দরজায় ঘা দিলাম। "সীতা! সীতা!"

"কে ?" নিদ্রাজড়িত স্বরে উত্তর আসিল।

"দরজা খোল।"

দেশলাইয়া দিয়া পিদ্দীপ জ্বালাইয়া সীতা দরজা খুলিয়া দিল। আমি জুতা খুলিয়া প্রবেশ করিলাম। মিটিমিটি আলোতে দেখিলাম মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সীতা কেমন হইয়া গিয়াছে। কথা কহিতে পারে নাই সে। তার পরেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ঘরে মাত্র তিনটা শিশু। আর লোকজন নাই। মহা বিপদে পড়িলাম। এক কুজো জল ছিল ঘরে। সীতার মাথায় তাই ঢালিয়া দিলাম। তার পর তালপাতার পাখাটা একটা অর্দ্ধোলঙ্গ শিশুর পেটের উপর থেকে নিয়া মাথায় বাতাস দিতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে সীতা জ্ঞান ফিরিয়া পাইল।

"তুমি এখানে কেন, অমলদা ?" মৃদু স্বরে সীতা বলিল।

আমি উত্তর না দিয়া বল্লাম—"তোর স্বামী কোথায় রে ?"

"তার কথা বলো না, কোথায় মদ খেয়ে পড়ে আছে কে জানে ?"

"তোর কোন অসুখ আছে না কি ?"

"ওই তো ফীটের ব্যামো।—তুমি কেন এলে ?"

"তাই বলছি, অমিয় বাবু পাঁচশো টাকা দিলেন ; তাই তোকে দিচ্ছি।" বলিয়া নোট কয়টা বাহির করিয়া দিলাম।

"অমিয় বাবু কে ?"

"ঐ আশু মাষ্টার—তোর মাষ্টার!"

"তিনি দিয়েছেন ?"

সীতার মুখখানা স্নেহে—কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

আমি টাকাটা দিয়া "আসি" বলিয়া বাহির হইলাম। সীতা কী বলিতে চাহিয়াছিল, বলিতে পারে নাই।

রাস্তায় আসিয়া দেখি, গাড়ীতে মঙ্গলাল নাই ; চাবি দিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! আমি [illegible]

[illegible]

জম্বুদ্বীপ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

শালপ্রাংশু মহাভুজ শ্যামকান্তি হে মহাভারত !
হে বলিষ্ঠ পিতৃভূমি,
বিবাগী বিষণ্ণ কেন আজ ?
ভুতাবিষ্ট স্থবির মন্থর ?
নীরব জীমূতমন্দ্র স্তব্ধ আকাশ,
পাষাণ-মুকুটে জ্বলে—
স্তম্ভিত তুষারদীপ্ত হিমবহ্নিশিখা
হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের,
তুঙ্গ-জ্যোতি বিচ্ছুরণ,
ত্রি-মুণ্ড কালের স্তব্ধ ধেয়ান-প্রদীপে ।

দূরে ইলাবৃতবর্ষ
সুমেরু পর্ব্বতপ্রান্তে মহাশ্বেতকায়া
উদাসিনী আর্যমাতা । আদি মানবের—
সভ্যতার জন্মদাত্রী ।
বিস্মৃত উত্তরকুরু !
কাস্পিয়ান, সিন্ কিয়াঙ, অসুর-বাবিল,
কৌকাস, মোঙ্গল, সাইবেরীয়া,
মরুলিপ্ত যাযাবরী ধূ ধূ ইতিহাস
গোবিবক্ষে, সৌরকরোজ্জ্বল
পামীর-প্রেতাস্থিচূর্ণ শীতোষ্ণপিঙ্গল ।

দুর্গম রোমাঞ্চকর তিব্বতী-গুম্ফায়,
শ্যাম ব্রহ্ম তুঙ্গ-কিঙ নিপ্পনে
মহাচীনে শত শত বুদ্ধের কঙ্কাল,
প্রবাসী ভারত-আত্মা অব্যক্ত বিশাল !
প্রাচ্যপ্রজ্ঞা-দেউলের রহস্যান্ধকারে
মন্ত্রপূত মায়াদীপ
হে গম্ভীর জম্বুদ্বীপ—
তোমার আত্মার মরীচিকা,
জিজ্ঞাসা-জটিলতত্ত্বে কত ভাষ্য, কত তার টীকা ।
অর্থহীন বৈরাগ্যে উদাস
নিষ্ঠুর নিষ্কাম সত্তা ধ্যানমৌন মুমুক্ষু নিশ্বাস ।
হে মৃত ভারতবর্ষ,
যজ্ঞধূমে প্রেতবর্ণ তোমার বৈদিক মহাকাশে
বাসব বরুণ মিত্র জাতবেদাঃ বৈশ্বানর হাসে
হবির্যেষ্ণুবর্ণলুব্ধ তৃপ্ত দেবগণ—
মাটিতে কি রেখে গেছে অমের স্বাক্ষর,
[illegible] অনার্যের রুধির জর্জর ?
[illegible] কৌলীন্য [illegible] কী বিপ্র পরিচয় তার ।

অট্ট হাসে মৃত কাল
শ্মশানে চণ্ডাল
জঙ্গলে পাহাড়ে ফেরে কোল ভীল অনার্য সাঁওতাল,
উপেক্ষিত অশিক্ষিত নরপশুপাল
আসমুদ্র হিমালয় জুড়ে ।
ধ্যানের চিতায় পুড়ে পুড়ে
তোমার সন্তানগোষ্ঠী নির্জীব খোলসে ম্রিয়মাণ
ছন্নছাড়া জীবনধারায়
নিরর্থক কালধ্বংসী প্রাণোপাসনায় ।

সুমেরুশিখর থেকে দূর দক্ষিণের
স্থলচর পক্ষীরাজ্য মেরু-অন্তরীপ
হে প্রাচীন জম্বুদ্বীপ,
তব আর্য-প্রতিভার দিগ্বিজয়ী উত্তুঙ্গ গম্বুজ
অগণিত বৌদ্ধ-স্তূপাম্বুজ
স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে পাষাণে নির্বাক্
প্রশান্তসমুদ্র জুড়ে পক্ষভাঙা অযুত মৈনাক ।

হে বিরাট জম্বুদ্বীপ,
ঐশ্বরিক-দর্শনের হে আশ্চর্য বাত্যয় প্রদীপ,
কোথায় লুকালো আজ মায়াবাদী শাঙ্কর সভ্যতা
এ মানব-প্রগতির চরম শত্রুতা ?
তোমার উদ্ধত-বুকে যজ্ঞোপবীতের—
স্বার্থান্ধ তক্ষক কবে করেছে দংশন,
প্রাচ্য-পৌরাণিক যুগে
বিষের জ্বালায় ভুগে
মরেছে সে পিতৃভক্ত জামদগ্ন্য রামের সমাজ,
নির্বীর্য মৃত্তিকা তাই পৌরুষের রক্ত শুষে খায় ।

স্থিতিবান ব্রহ্মাবর্ত, আত্মদম্ভে হে দাম্ভিক ভূমি,
কোথা সে বিজয়লগ্ন,
সীমান্ত-প্রসার স্বপ্ন,
অগস্ত্য-যাত্রায় ?
সেদিন কি বিন্ধ্যবক্ষে জেগেছিল ব্রহ্মণ্য দেবতা
সবিস্ময়ে চমকিত দ্রাবিড়-প্রজ্ঞায় ?
সেদিনের উপেক্ষিত সুদূর বাংলায়
হে দাম্ভিক জম্বুদ্বীপ, তোমার যজ্ঞের ঘোড়া এসে
ফেলে গেছে জয়পত্র দীনহীন বেশে,
সেদিন এ প্রাচ্যখণ্ডে ব্যাঘ্রভজা নাস্তিক সন্তান
মানেনি বৈদিক স্তবগান ;
[illegible] প্রতিবাদী সাজের ভূমিকা

হে বিস্মৃত জম্বুদ্বীপ,
যোজনাটে দুঃস্বপ্নময় বিস্মৃত কালের তমসায়
রাজসূয়-নরমেধ যজ্ঞের শিখায়
আলোকিত হয়েছে কি কোটি কোটি প্রাণ অন্ধকার ?
কোটি কোটি কঙ্কালের নশ্বর আধার ?
অত্যাশ্চর্য সংস্কৃতির মহার্ণবপোতে
অগণিত মানুষের আকাঙ্ক্ষার বুদ্‌বুদের স্রোতে
কোথা যাত্রা ? কত দূরে ? কোথা ঐক্যতান ?
সংঘের শরণবার্তা, বৃহত্তম মানবের গান ?

বেদনা-বিমর্ষ তাই আর্যাবর্তভূমি
দুর্গম নৈমিষারণ্য, কণ্টকিত কাম্যক-কানন
শ্বাপদ-গর্জনে কাঁপে চৈত্ররথবন,
ভয়াল দণ্ডকারণ্য সারা হিন্দুস্থান !
হে ভারত কোথা গর্ব ?
স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ,
অস্তিকায় মায়াবিশ্ব বুদ্‌বুদের মতো
শূন্যময় উদাসীন ব্রত।
রক্তাক্ত খাইবার-পথে পার্বত্য গৈরিক ধূলি ওড়ে,
আসে কত সেকেন্দর
যাবনিক রণক্লান্ত বিজয়ী বর্বর,
হে ভারত, মিথ্যা কেন দধীচির ঘোরীর দুর্নাম ?
সন্ধিক্রমে এল ধেয়ে দুর্জয় উদ্দাম
আরবের মরুঝড়ে নবীন ইস্‌লাম।

তার পর,
অগ্নিধূমে ধূসর অম্বর,
চঞ্চল জীবনবন্যা মধ্য-এশিয়ার
শত শত যোজন বিস্তার,
চেতনা-বিদ্যুদ্দীপ্ত কোটি অবক্ষুরে
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রণোন্মাদ সুরে
ঐক্যবদ্ধ নবসিন্ধু বিপুল দুর্বার
চেঙ্গিসের জ্যোতির্ময় জীবন্ত আত্মার,
সিন্ধুনদে বন্যা এল ইউফ্রেতিস্ তাইগ্রিসের ঢেউ
পানিপথে ডেকে গেল দেশদ্রোহী কেউ—
শত শত স্বার্থপর,
সূত্রপাতে জয়চন্দ্র, শেষলগ্নে ক্লীব মীরজাফর।

অতঃপর ?
মন্বন্তর !
কুটিল বেণিয়াবুদ্ধি ফিরিঙ্গীর এল নৌবহর,
উন্মথিত কালাপানি বঙ্গোপসাগরে,
সৌখীন পণ্যের বোঝা এল থরে থরে
তোমার সমাধিক্ষেত্র পলাশী-প্রাঙ্গণে,
যুগান্তের প্রায়শ্চিত্তে রুধির বমনে।

হাড়িকাঠ, ফাঁসিকাঠ, বেদমন্ত্রপাঠ,
ধূমাঙ্কিত তোমার ললাট
ত্যাগে বীর্যে হাহাকারে
ছন্নছাড়া নরকের দ্বারে।
স্বর্ণাভ উদয়তীর্থে গৈরিক হিমানী বাষ্প ওড়ে
অদৃশ্য সূর্যের অভ্যুদয়
কত দূরে ?
আ-দিগন্ত তরঙ্গিত গিরিশৃঙ্গমালা
স্তিমিত গম্ভীর মৌন,
সহস্র যোজন জুড়ে শালপ্রাংশু চেতনার বাহু
ক্রমলুপ্ত অন্ধকারে মৃত কাল-রাহু
বিস্মৃতির কুয়াশায়,
বলিষ্ঠ জীবন জাগে রক্তিম উষায় ;
হে নবীন জম্বুদ্বীপ,
হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের
ত্রিমুণ্ড-তুষারশৃঙ্গে জ্বলে রক্তদীপ !

হেমমালা বসু

থাকিলেও কন্যা মাতঙ্গিনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াই উঠিতেছিল; কারণ, জন্মের কয়েক বৎসর পর হইতেই এই কন্যাটি গো-সেবা-রূপ পরম ধর্ম্ম সাধন করিয়া, ঠাকুরপূজার বাসনগুলি মাজিয়া ও পুষ্প চয়ন করিয়া, গোয়াল-ঘরে, পুকুর-পাড়ে ও ফুলবাগানে আপন একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। আবার ধান শুকাইলে ঢেঁকী-ঘরে গিয়া কোমল চরণখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধান ভানিতেও সে ভালবাসিত, সংসারে খাদ্যদ্রব্যের অকুলান হইলে বনে বনে ঘুরিয়া শাক তুলিতে, অথবা পুকুরপাড়ে বসিয়া মাছ ধরিতেও তাহাকে দেখা যাইত, এই সুন্দরী গৌরীটিকে বনদেবীর মত বনে বনে বিচরণ করিতে দেখিয়া সকলেই তাহার অদৃষ্টের বিষয় আলোচনা করিত, কিন্তু তাহার নীরব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাবটিকে সশ্রদ্ধ সম্মান দেখাইত।

অতি অল্প বয়সে মাতুর বিবাহ হইয়াছিল; পিতা গৌরীদান করিয়া তাহার বিদায় দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও বাধা জন্মিল···সকলে বলে, কলিকাতার বিনোদ বাবুই তাহার গ্রহীতা; সে জন্যও গ্রামবাসীরা তাহাকে সম্মান করিত; কারণ কলিকাতার লোকরা যে শুধু নামে লোক নয়, খুব বড় লোক···সে বিষয়ে তাহাদের কোনই সন্দেহ ছিল না।

তবে কি না, মাতুর বিবাহের সময় মহেশ ঠাকুরের সঙ্গে বর-পক্ষের কি একটা গণ্ডগোল হইয়াছিল, সেই জন্যই তো মাতঙ্গিনী এইখানে পড়িয়া রহিয়াছে···নহিলে বাবুরা তাহাকে তখনই চতুর্দ্দোলায় চড়াইয়া কলিকাতায় লইয়া যাইত, সেখানে সোনায় মুড়িয়া তিন তলা বাড়ীর উপরে বসাইয়া রাখিত। এই ঘটনাটি যদিও দশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের লোকের স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ, আর পরচর্চার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, তাই তাহারা [illegible] বেশ মনে রাখিয়াছে।

১

বিলের পারে বনবেষ্টিত বৈদ্যবাটী গ্রাম; মহেশচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় বৈদ্য না হইয়াও এই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন; কৃষকপল্লীর মধ্যস্থলে তাঁহার বৃহৎ বাগানবেষ্টিত বাটী ও ক্ষুদ্র দেবমন্দিরটি দেখিলে সত্যই 'ঠাকুরবাড়ী' বলিয়া মনে হয়।

ক্রমে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার প্রতিবেশী হইলেন, ঠাকুর মহাশয় না কি কাশী হইতে বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্য সকলের অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইয়াই রহিলেন; এখন তিনি বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষরূপে ব্যাপৃত থাকিলেও সে সম্মানের কিছুমাত্র লাঘব হইল না···জমিদার টোলের ভার তাঁহাকেই অর্পণ করিলেন।

তথাপি মহেশ ঠাকুরের মনে সুখ ছিল না···তাঁহার একমাত্র পুত্র গণেশ ঠাকুর যে কোন কালেও বিজ্ঞ ও যোগ্য হইয়া দশের কাছে তাহার মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারিবে, সে-ভরসা তিনি আর করেন না। সে জন্য তাঁহার চিত্ত পুত্রের প্রতি সতত বিরক্ত

হইয়াছিল কি,···বিবাহের পরদিন বর-পক্ষ একটা ফর্দ্দ বাহির করিয়া দানের সমস্ত জিনিষ মিলাইয়া লইতে চাহিলেন ; এটা না কি ও-দেশের রেওয়াজ, কন্যার সঙ্গে তার প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিষ দান করিতে হয়। ঠাকুর মহাশয় যখন বলিলেন, তিনি শুধু কন্যাদানই করিয়াছেন, তা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিবেন না ; তখন তাঁহারা এই সদ্‌ব্রাহ্মণকে 'ছোটলোক' প্রভৃতি কি কি সব বলিয়া বর লইয়া সেই যে গেলেন, আর এ-মুখো হইলেন না। কন্যার কুশণ্ডিকা হইয়াছিল, ফুলশয্যা হইল না···ঠাকুর মহাশয় অমন কুটুম পাইয়াও হারাইলেন। লোকে বলে বিনোদ বাবু আবার বিবাহ করিয়াছেন, ওপাড়ার ছিদাম ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতায় গিয়া সে খবরটা জানিয়া আসিয়াছেন। আশ্চর্য্য, মহেশ ঠাকুর একথা শুনিয়া একটুও বিচলিত হইলেন না। মা-ঠাকুরাণীর মুখখানি কিন্তু তখনই ম্লান হইয়া গেল, তাঁহাকে আঁচলে চোখ মুছিতে দেখিয়া ঠাকুর মশায় ধমক দিয়া উঠিলেন,—থামো। ওসব মেয়ে-কান্না আমার কাছে নয় ; সাপের মত কোঁস কোঁস করলে এ বাড়ীতেও থাকা চলবে না ; গরীবের মেয়ের বিয়ে হয়েছে, গোল ফুরিয়ে গেছে···এর চেয়ে বেশী আশা করাই যে অন্যায় !'

তার পরে দশটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, মাতঙ্গিনী যে আর কখনও কলিকাতা যাইতে পারিবে, সে আশা সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে ; সেও বেশ হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাতেই যোগদান করে না ; কেবল তাহার মাতা কন্যার সুস্থ সুন্দর দেহ ও হাসিভরা মুখের পানে চাহিয়া কত চিন্তাই করেন···সে দিকে এখন আর কেহ লক্ষ্যও করে না।

আজ গৃহিণী রান্না হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তার খড়মের শব্দ শুনিতে পাইলেন ; তাড়াতাড়ি উনুনে কাঠ ঠেলিয়া দিয়া তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, মহেশ ঠাকুর একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসিতেছেন ; কার চিঠি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, কলিকাতা হইতে তাঁহার জামাতা লিখিয়াছেন, তিনি আসচে সপ্তাহে মাতুকে লইয়া যাইতে আসিবেন। তাঁহার মাতু কলিকাতা যাইবে, স্বামীর ঘরে। সেই মুহূর্ত্তেই পৃথিবী সুন্দর হইয়া গেল, গাছপালা, বাড়ীঘর, সমস্তই তাঁহার সুন্দর মনে হইতে লাগিল···গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন 'আঃ! কথাটি শুনিবার জন্তে আমি সেই হইতে ভগবানের আরাধনা করিতেছিলাম।'

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, 'সে যেন হলো, কিন্তু কলকাতার বাবুটি যে আসচেন, তাঁকে খাওয়াবে কি গো ? তিনি তো আর আমাদের মত মুড়ী খাবেন না, সকালবেলা উঠেই তাঁর চা-বিস্কুট চাই। চা' যদি বা এখানে পাওয়া যায়, বিস্কুট তো একটা দোকানেও রাখে না ; ভাতই বা তিনি খাবেন কি দিয়ে···ঝোল ভাত কি তাঁর মুখে রুচবে ? ওপাড়ার রাঙাদিকে ডেকে পোলাও, কালিয়া, চপ, কাটলেট, এই সমস্ত সাহেবী খানা রাঁধতে শিখে নাও গো, জামাই আসছেন।'

'সে আর তোমায় বলতে হ'বে না···' দুর্গা দেবী হাসিয়া বলিলেন, 'এই বারে চট করে চান করে এস তো, ভাত বেড়ে দিই ; তোমাদের খাওয়া হ'লে তবে তো আমার ছুটী হ'বে।'

আহারান্তে গৃহিণী পান সাজিতে বসিয়াছেন, প্রতিবেশিনীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ বউমা, মাতুর বর না কি এত কাল পরে আসচে ? শুনে এমনি আনন্দ হলো যে ছুটে চলে এলাম···সত্যি ?'

রাঙা-দিদি হাত নাড়িয়া বলিলেন; 'বলি মাতুর মা, তোর কি আক্কেল বল্ দেখি ? মেয়ের মা হয়েছিস, তা মেয়ে সাজাতেও জানিস্ না ? একখানা রাঙা পাড় সাড়ী আর সেমিজ, এই কি অমন মেয়ের সাজ ? ব্লাউস, পেটিকোট, রঙীন সাড়ী আর জরীর ফিতে আনতে সহরে লোক পাঠিয়ে দে। চুলগুলো খোঁপা বেঁধে দিয়েছিস্ কেন লো, বিউনী ঝুলিয়ে দে, কলকাতায় অমন মেয়েরা তো ফ্রক পরে বেড়ায় ; আয় মাতু, আয় চুলগুলি বিউনী করে দিয়ে যাই ; আর আগানে বাগানে যেও না মা, পুকুর-পাড়ে গিয়ে যেন মাছ ধরতে বসো না—জামাই দেখতে পেলে নিন্দে করবেন ; লক্ষ্মীটির মতন ঘরে বসে থেকো।'

২

শুনিতে শুনিতে বেলা পড়িয়া আসিল, দুর্গাদেবী উঠিয়া গেলেন ; মাতুকে ঘিরিয়া বসিয়া প্রতিবেশিনীদের হাসি-গল্প তবুও চলিতে লাগিল। একটি নবীনা বলিলেন, 'মাতু তোর ভাগ্যি ভালো রে, কলকাতায় গিয়ে কত সুখে থাকবি। শুনছি, ওঁরা না কি খুব বড়লোক, তোকে নড়ে বসতেও হবে না···থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখবি, কি আমোদেই থাকবি। আমি একবার সেখানে গিয়ে হাতীর নাচ, বাঘের খেলা দেখে এসেছি ; আরও কত দোকান-পসার, কি চমৎকার সব আলো দেখলাম ; এই পাড়াগাঁয়ে কি মানুষ থাকতে পারে ? আমাদের যে উপায় নেই, তাই এখানে পড়ে থাকা।'

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি উঠিলেন, সে-দিনের মত সভা ভঙ্গ হইল। পল্লীবাসিনীরা সকলেই স্বীকার করিলেন, মাতুর মত শুভাদৃষ্ট তাঁদের গ্রামের আর কোন মেয়েরই নাই।

শনিবার আসিয়া পড়িল, বিনোদ বাবু আজ রাত্রের গাড়ীতে আসিবেন শুনিয়া রাঙাদিদি বিকাল হইতেই রান্নাঘরে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। তিনি পোলাও, কালিয়া প্রভৃতি মোগলাই খানা প্রস্তুত করিবেন, পরে মাতুকে সুন্দররূপে সাজাইয়া স্বামীর ঘরে পাঠাইবেন। গণেশ ঠাকুর অনেক ফুল আনিয়া দিল···মাতুর যে ফুলশয্যা হয় নাই, সে কথা মনে করিয়া নবীনারা গোলাপের তোড়া ও ঝালর দিয়া বড় ঘরখানি বাসর ঘরের মত করিয়া সাজাইলেন ; মল্লিকা বেলার গোড়ে মালা গাঁথিয়া রাখিলেন, শুভ্র শয্যার উপরে রঙীন ফুলের অক্ষরে বেশ বড় করিয়া লিখিলেন, ফুলশয্যা।

সন্ধ্যার পরেই 'বর এসেছে গো, মাতুদিদির বর এসেছে'—বলিয়া ছেলের দল ছুটিয়া আসিল ; মাতঙ্গিনী সভয়ে দেখিল, তাহাদের মাঝখানে একটি ভদ্রবেশধারী গৌরবর্ণ পুরুষ···তিনি বড় ঘরের বারান্দায় উঠিয়া তক্তপোষের উপরে বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজিয়ে উঠিল। পিতা তাঁহাকে 'এস বাবাজী !' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, প্রতিবেশিনীরা হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন, সে এক হুলস্থুল ব্যাপার। ইহা দেখিয়া মাতঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ঐ বিনোদ বাবু, তাহার বর। এত কাল পরে ইনি আসিয়াছেন তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে···এখন হইতে চির-পরিচিতদের ছাড়িয়া এই অপরিচিতের সহিত তাহাকে বাস করিতে হইবে।

সখীরা জানালা হইতে তাহার নিকটে আসিল ; লতা হাসিয়া বলিল, 'দিব্যি বরটি তোর মাতু, দেখে আমরা বড্ড খুসী হয়েছি !'

মণি বলিয়া উঠিল, 'কলকাতার ছেলে, ভালো তো হবেই লো !'

'কলকাতার ছেলেরা সবাই বুঝি অমন সুন্দর, তুই যে কি বলিস্ !' লতা প্রতিবাদ করিল।

'হাতের আংটীগুলো দেখছিস তো, কি রকম জ্বলচে ! ওগুলো নিশ্চয়ই হীরেবসানো আংটী, তাই অত ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলে উঠছে ! ওঠ্, ভাই মাতু, মা তোকে সাজিয়ে দিতে বলেছেন, ওঠ !' বলিয়া রাঙাদির মেয়ে সবিতা মাতুকে ঠেলিতে লাগিল।

মাতু কিছুতেই উঠিল না···সাজ-সজ্জা করিতে তাহার মোটে ভালো লাগে না, স্বাভাবিক সুন্দর ভাবটুকু নষ্ট হইয়া যায় ! সখীরা তাহার হাত ধরিয়া টানিতেছিল ; কিন্তু যেই শুনিল, বিনোদ বাবু বলিতেছেন, 'আমি খেয়ে এসেছি, আর খেতে পারব না'···অমনি তাহারা মাতুর হাত ছাড়িয়া দিয়া আবার জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

রাঙাদিদি ঘোমটার ভিতর হইতেই বরকে বলিলেন, 'সে কথা শুনব না বাপু, তোমাকে বেশ ভালো ক'রে খেতে হবে ; সারাটা দিন যে কষ্ট ক'রে রান্না করেছি, তুমি না খেলে সমস্তই নষ্ট হবে !'

'তবে চলুন'—'বলিয়া বর আসনের উপরে বসিলেন ; রাঙাদিদি রূপার থালায় করিয়া পোলাও বাড়িয়া আনিলেন, বাটি ও ডিস ভরিয়া চপ, ক্যাটলেট, কারি, কবাব ও চাটনী দিলেন ; পরে কাছে বসিয়া বরের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন।

বরের আহার শেষ হইলে রাঙাদিদি ঘরে গিয়া দেখিলেন, মাতুর সাজ-সজ্জা কিছুই হয় নাই ; সখীদের তিরস্কার করিয়া তিনি মাতুকে সাজাইতে বসিলেন, সে অনেক ওজর করিয়াও পার পাইল না··· সখীরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল ; মাতুকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া তিনি সকলকে রান্না ঘরে লইয়া গেলেন, সখীরা সার বাঁধিয়া মাতুর সঙ্গে খাইতে বসিল, হাসি-গল্পে আহার-কার্য্য চলিতে লাগিল ; রাত্রি বেশী হইলে রাঙাদিদি তাড়া দিলেন, তাহারাও উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতে পুকুরঘাটে গেল।

সুন্দর ফুলশয্যায় মাতুকে শয়ন করাইয়া দিয়া সবিতা বলিল, 'শোও ভাই মাতু, আমরা এইবারে যাই ! শোও, কিন্তু ঘুমিও না যেন ! আজকে ঘুমুতে নেই কি না, সারা রাত জেগে বরের সঙ্গে গল্প করতে হয়, আজ যে তোমার ফুলশয্যা ! চললুম, আমার এই কথাটি মনে রেখো ভাই !'

তাহারা হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইলেই গণেশ ঠাকুর বরকে সেই ঘরে দিয়া গেলেন, বিনোদ বাবু দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানার উপরে বসিলেন ; গোলাপের ঝাড় ও তোড়াগুলির পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই বিনোদ বাবু মাতুর দিকে চাহিলেন, সে শয্যার শেষ প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল, কিছুক্ষণ নীরবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ডাকিলেন, 'মাতঙ্গিনি, মাতু ! এদিকে একবার চেয়ে দেখ তো, আমি তোমার জন্তে কি এনেছি !'

মাতু নড়িলও না, বর সরিয়া আসিয়া আবার বলিলেন, 'এই দেখ, কত বড় তোড়ে মালা ; আজ আমাদের ফুলশয্যা যে ! মাথাটি একটু তোল তো, তোমার গলায় পরিয়ে দিই···"

মাতু মাথা তুলিল না দেখিয়া বর তাহার গায়ের উপরে মালা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শয়ন করিলেন।

অনেক রাত্রে রাঙাদিদি ও পিসীমা আসিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইলেন ; কিন্তু ঘরখানা একেবারে নিস্তব্ধ, কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া, তাঁহারা অবাক্ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

৩

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই দুর্গাদেবী দেখিলেন, বিনোদ বাবু পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ চক্ষে পল্লীশোভা সন্দর্শন করিতেছেন ; তাঁহাকে ঘোমটা টানিয়া সরিয়া যাইতে দেখিয়া বিনোদ বাবু মুখ ধুইয়া বড় ঘরের বারান্দায় গিয়া বসিলেন। কর্ত্তা সেখানে বসিয়া গম্ভীর মুখে তামাক সাজিতেছিলেন, বিনোদ আসিতেই হুঁকাটি হাতে করিয়া রামদেব আচার্য্যের আটচালার দিকে চলিলেন। গণেশ ঠাকুর বরের সঙ্গে গল্প করিতেছিল, রাঙাদিদি দু'পেয়ালা চা আর নিমকী ভাজিয়া আনিলেন ; একটা বড় জলচৌকীর উপরে পেয়ালাগুলি রাখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'এই চাটুকু আর নিমকী দু'খানা খাও, দাও তো বউ, দু'খানা চন্দ্রপুলি বের করে···'না' বললে শুনব না আমি, মিষ্টি একটু খেতেই হবে তোমায় ! এই যে, দু'জনে মিলে বেশ ক'রে খাও ! কাল রাত্রে মাতুর সঙ্গে কি কথা হলো, বলো না ভাই শুনি ! ওমা, কিছুই কথা হয়নি···তোমার ফুলের মালা, তাও সে গলায় পরেনি ? অবাক্ করলে মা ! মনে দুঃখ করো না ভাই তুমি, ওকে কলকাতায় নিয়ে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গণেশ ঠাকুর বলিল, 'এই পাড়াগাঁর মেয়েগুলো সব ঐ রকম, এরা চট ক'রে ধরা দিতে চায় না ! কিছু মনে করবেন না, জামাই বাবু, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রাঙাদিদি উঠিয়া বলিলেন, 'বেলা চলো, এইবারে রাঁধতে যাই ; কি খেতে ভালোবাস ভাই বল তো, তাই রাঁধবো।'

'একটু শুক্ত আর ঝোল-ভাত করুন', বর হাসিয়া বলিলেন, 'তাই খেয়ে চলে যাই !'

'ওমা, আজকেই যাবে কি, তাও কি কখনও হয় ?'

'আমার আপিস আছে যে, আজই যেতে হবে।'

ইহার পরে আর কথা চলে না ; রাঙাদিদি তাড়াতাড়ি রান্না করিয়া বিনোদ বাবুর ভাত বাড়িয়া বড় ঘরে লইয়া গেলেন, দুর্গাদেবী চোখের জলে ভাসিয়া মাতুকে খাওয়াইতে লাগিলেন,···'মা, তোকে ছেড়ে আমি কি ক'রে থাকব, বল্ !'

মাতুর খাওয়া হইল না, সে-ও তাহাই ভাবিতেছিল। বিকাল-বেলা সখীরা আসিয়া মাতুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সকলেই চিঠি লিখিতে বলে ; মাতা অনিমেষে কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, যেন আর দেখিতে পাইবেন না ! গণেশ ঠাকুর পাল্কী আনিলে হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করিয়া বর-কনেকে তাহাতে তুলিয়া দেওয়া হইল ; মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, পিতা আশীর্ব্বাদ করিয়া বর-কনেকে বিদায় দিলেন। বাহকেরা পাল্কী তুলিয়া ছুটিয়া চলিল, সঙ্গে চলিল গণেশ ঠাকুর ; কত মাঠ পার হইয়া, কত অজানা গ্রামের ভিতর দিয়া পাল্কী আসিয়া ষ্টেশনে থামিল ; মাতঙ্গিনীকে মেয়ে-গাড়ীতে তুলিয়া দিতেই সে একবার গণেশ ঠাকুরের দিকে সজল চক্ষে চাহিয়াই বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল ; গণেশ ঠাকুর বলিল, 'আমি তবে যাই মাতু, তুই পৌঁছেই চিঠি লিখবি, নইলে মা বড্ড ভাববেন।' গাড়ী তখনই ছাড়িয়া দিল।

সকালবেলা বিনোদ বাবু আসিয়া ডাকিলেন, 'উঠে পড় মাতু, আমরা কলকাতা এসেছি।' শেয়ালদা ষ্টেশনে কত লোকের ভীড়! মাতুকে রেলগাড়ী হইতে নামাইয়া বিনোদ বাবু একখানা ট্যাক্সীতে উঠিয়া পড়িলেন; মাতু অবাক্ বিস্ময়ে কলিকাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী, অসংখ্য গাড়ী ও প্রশস্ত রাস্তাগুলি দেখিতে দেখিতে চলিল…দর্জ্জি-পাড়ায় একটা একতলা বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিল, বিনোদ বাবুর ঝি মাতুকে নিয়া একটা ঘরে বসাইল; তিনখানা ঘর, একটা বারান্দা এইতো বাড়ী; বিনোদ বাবু হোটেল হইতে ভাত আনাইয়া খাইয়াই আফিসে ছুটিলেন; ঝির অনুরোধে মাতুও স্নান করিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিল না। এই নির্জ্জন পুরীতে একটি অপরিচিত লোকের সঙ্গে কেমন করিয়া বাস করিবে, ভাবিতে ভাবিতে মাতু কাঁদিয়া ফেলিল।

কাহার কোমল করস্পর্শে মাতুর কান্না থামিয়া গেল, কে মিষ্ট স্বরে বলিল, 'ও কি ভাই অমন কোরে কাঁদছ কেন তুমি? উঠে বসো, আমার পানে চেয়ে দেখ তো!'

মাতু উঠিয়া দেখিল, একটি সুন্দরী, হাস্যমুখী তরুণী বিছানায় পাশে বসিয়া আছে; মেয়েটি হাসিয়া বলিল, 'আমার নাম রেণু, তোমার নাম কি ভাই? এস, আমরা দুটিতে ভাব করি; অমন কোরে একলাটি কাঁদবে কেন? তোমাতে আমাতে কত গল্প করবো, কত জায়গায় বেড়াতে যাব, মন ভাল হয়ে যাবে!'

মাতু নীরবে শুনিতেছে দেখিয়া রেণু আবার বলিল, 'বিনোদ বাবুর সঙ্গে এখনও বুঝি তোমার ভাব হয়নি, তাই অত কান্না! এখন কি আর মায়ের জন্তে কাঁদে, এই তো স্বামী নিয়ে ঘর করবার সময়; স্বামীর সঙ্গে মেয়েরা কত মজা করে, তুমি কি কিছু জান না? আমি তোমার সব শিখিয়ে দেব…কি কথা বলতে হয়, কি কোরে স্বামীকে বাধ্য করতে হয়, সমস্ত একেবারে। এখন চলতো বোন, আমার বাড়ী দেখে আসবে…' মাতু অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া রেণু হাসিয়া বলিল, 'কাপড় কেচে, চুল বেঁধে, খাবার খেয়ে তবে এখানে আসতে পাবে; ঝি, বাবু এলে বলিস, নতুন বৌকে দিদিমণি নিয়ে গেছে, তিনি যেন ভয় না পান।'

বিনোদ বাবু আফিস হইতে আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য; ঝি তাঁহাকে জলখাবার দিয়া বলিল, পাশের বাড়ীর দিদিমণি মাতুকে লইয়া গিয়াছে; শুনিয়া তিনি খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পরে রেণু মাতুকে লইয়া আসিল…বারান্দা হইতে মৃদু-স্বরে বলিল, 'যাও ভাই, বরের সঙ্গে কথা কওগে; এখন আমি যাই, কালকে আবার আসব।'

সে চলিয়া গেলে মাতু সেইখানেই বসিয়া রহিল; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিনোদ বাবু বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'ঘরে এস মাতু।' সে তখন উঠিয়া ঘরে গেল। রেণু তাহাকে বড় সুন্দর সাজাইয়াছে, দেখিলে তারিফ করিতে হয়। বিনোদ বাবু মুগ্ধ স্বরে কত কথা বলেন, মাতু তাহার মন-মুখ কিছুই খুলিল না, সে দুই একটা কথা বলে কি না বলে। এই পল্লীবালাকে কিরূপে সহরের আদবকায়দাদুরস্ত করিবেন, বিনোদ বাবু তাহাই কেবল চিন্তা করেন। রাত্রে ঝি লুচি তরকারি কিনিয়া আনিল, তাই খাইয়া সকলে শয়ন করিলেন।

পরদিন ভোরে মাতু উঠিয়া বাহিরে যাইতেই ঝি বলিল, 'উনুনে আগুন দিয়েছি, বউদি! দুটো হাঁড়ীও এনে রেখেছি; তুমি ডাল ভাত চড়িয়ে দাও, আমি মাছ নিয়ে আসছি; বাবু এক্ষুনি খেয়ে আপিস যাবেন…কাপড় কাচবে না চান করবে, শীগ্‌গির ক'রে সেরে নাও।' কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া মাতুর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে প্রবেশ করিল।

সে-দিন আহারে বসিয়া বিনোদ বাবু দেখিলেন, মাতু অনেক রকম রান্না করিয়াছে; হাসিয়া বলিলেন, 'তবু ভালো—কথা যদি শুনতে না পাই, পেট ভ'রে খেতে তো পাব! মাছ তরকারি সবই বুঝি আমায় দিয়েছ, তোমার জন্তে কিছু রাখোনি! ঝি, মাতুর খাওয়া তুমি দেখো, আমার তো আর কেউ নেই যে ওর যত্ন করবে…' ঝি হাসিয়া বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আফিস যান বাবু, বউদির খাওয়া, থাকা, সমস্তই আমি দেখবো।'

মাতুও সে-দিন বেশ তৃপ্তি করিয়া খাইল; কলকাতায় এত জিনিস পাওয়া যায়…ঝি-টি বাজার করে বেশ! এখানে তো গাঁয়ের মত হাট নেই, রোজই বাজার বসে, কোনও অসুবিধা হয় না। সব কাজ শেষ করিয়া বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে মায়ের কাছে কি লিখিবে ভাবিতেছে, রেণু এলো চুলে বই হাতে করিয়া আসিল…'খাওয়া হয়েছে সই? এই তো, লক্ষ্মীটি হয়েছ! তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে আমার অপেক্ষা করছো…বেশ!'

ঝি রান্নাঘরের বারান্দায় ভাতের থালা আনিয়া খাইতে বসিয়াছিল, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এরই মধ্যে তোমাদের সই পাতা হয়ে গেছে, দিদিমণি! এ যে দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!'

'সই পাতা? না, সে সব কিছু হয়নি; হঠাৎ 'সই' বলে ফেলেছি!' রেণু গম্ভীর মুখে বলিল, 'বিরাট মাতঙ্গিনীর সঙ্গে ক্ষুদ্র রেণুকণায় বন্ধুত্ব স্থাপন সম্ভব হবে কি না, এখন তাই শুধু পরখ করা হচ্ছে। চল বোন, ঘরে গিয়ে বসি; তোমায় আমি আর বিনোদ বাবু ভাগ ক'রে নেব ভাই…দুপুরবেলাটা তুমি থাকবে রেণুর নিজস্ব হয়ে, রাত্তে বিনোদ বাবুর; রবিবারেও কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না—বুঝলে?

মাস চার-পাঁচ হইল, মাতু কলিকাতায় আসিয়াছে; রেণুর সঙ্গে তার এত ভাব যে সব সময় তারা এক সঙ্গেই থাকে। বিনোদ বাবুকে দেখিলে এখনও সে লজ্জায় জড়-সড় হইয়া পড়ে, আর যতটা সম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। বিনোদ বাবু তাহাকে অনেকগুলি সাড়ী ও গা-সাজানে (গহনা দিয়াছেন, জিনিষগুলি বেশ মূল্যবান। রঙীন সাড়ীগুলি মাতু সবই পরিয়াছে, গহনা পরাই তার মুস্কিল! সে দুল-সেফটীপিনগুলো পরে, দামী গহনাগুলি ক্যাশ-বাক্সে ভরিয়া ষ্টীল-ট্রাঙ্কের ভিতর রাখিয়া দিয়াছে দেখিয়া বিনোদ বাবু বলেন, গয়না পরা অভ্যেস নেই কি না, তাই!' রেণু বলে, 'ও কি সই! বরাতে যদি জুটলো, দিব্বি সেজে-গুজে থাকো; মা লক্ষ্মীকে বাক্সে বন্দী ক'রে লাভ কি ভাই? আজ গয়নাগুলো বার করো তো, আমি পরিয়ে দিয়ে যাই।'

মাতুর মনের সাধ, রেণুকে কয়েকখানা গহনা উপহার দেয়…সে কত খুশী হইয়া পরিবে! সে জন্তে সে বিনোদ বাবুকে অনুরোধ করিতে চায়, তিনি যদি রাজী না হন, সেই ভয়ে করে না। রেণুর গা-সাজানো গহনা আছে, দামী গহনা একেবারেই নাই…আমার স্বামী

নরেন বাবুও আফিস করেন, রেণুকে ভালো কাপড় গহনা কিছুই দেন না তো!

পূজা আসিয়া পড়িল; দুর্গা দেবী লিখিয়াছেন, মাতুকে আনিতে গণেশ ঠাকুর শীঘ্রই কলিক্যাতা যাইবে; চিঠি পাইয়া মাতু মহা খুসী! সে-দিন রেণু আসিতেই বলিল, 'সই, এইবারে আমি মার কাছে যাব; কত দিন···উঃ, সে কত কাল যে মাকে দেখতে পাইনি!'

রেণু কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এ-কথার উত্তর বিনোদ বাবুই দিলেন; তিনি সেখানে আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'বেশ তো, তাই যেও···মাকে দেখলে যদি তোমার পূজার আমোদ সম্পূর্ণ হয়, তা থেকে কেউ তোমায় বঞ্চিত করবে না! তবে এই গয়নাগুলো সব পরো, আমি দেখি! পূজোর সময় গয়না পরবে, তোমার মা দেখে খুসী হবেন; এখন আমায় একটু খুসী করে যাও।' রেণু এখন আর বিনোদ বাবুকে দেখিলে সরিয়া যায় না, দরকার হইলে দু'-একটা কথাও বলে; হাসিয়া বলিল, গয়নার বাক্সটা বার কর তো সই, আজ তোমাকে পরতেই হবে?'

অনিচ্ছায় মাতু উঠিয়া ষ্টীল-ট্রাঙ্কটা খুলিল; গয়না পরিতে তার কেন যে ভালো লাগে না—গায়ে সব কাঁটার মত বেঁধে বলিয়াই হয় তো! বাক্স খুলিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল—কাপড় চোপড় সমস্ত এলো-মেলো হইয়া আছে, ক্যাস-বাক্সটি সে তার ভিতরে দেখিতে পাইল না। তাহাকে বাক্স বন্ধ করিতে দেখিয়া রেণু জিজ্ঞাসা করিল, 'কই, গয়নার বাক্স বার করলে না?'

'এখন থাক' বলিয়া মাতু উঠিয়া দাঁড়াইল।

'তবে আমি যাই,' রেণু হাসিয়া বলিল, 'সয়া নিজে এসে বার না করলে সে বোধ হচ্ছে বেরুবে না—চললুম সই!'

রেণু চলিয়া গেলে বিনোদ বাবু জোর করিতে লাগিলেন, 'গয়নার বাক্সটি বার করো তো, তোমাকে আজ কিছুতেই ছাড়ব না!'

'গয়নার বাক্স তো ওর ভেতরে নেই!'

'নেই—সে কি?' বলিয়া বিনোদ বাবু নিজেই বাক্স খুলিয়া দেখিলেন, মাতুর কথা সত্য; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কবে ক্যাসবাক্সটা ওর ভেতরে দেখেছিলে?'

'চার-পাঁচ দিন আগে।'

'যাক, বেশী দিন হয়নি: এর ভেতরে কেউ এই ঘরে এসেছিল?'

'না।'

'ঘরে কে কে আসে?'

'ঝি আর সই ভিন্ন আর কেউ তো আসে না।'

'ঝির অত সাহস হবে না গো···তবে তোমার সই'—

'ছি, কি যে বলো! সই কখনো চুরি করতে পারে?' মাতু বলিয়া উঠিল।

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, 'মানুষে সব করতে পারে।'

'তাঁকে অত ছোট ভেব না গো!'

'না, আমি তা ভাবছি না···এই অবাক্ কাণ্ডই যে ভাবিয়ে তুলেছে, এ কথা আর কাউকে বল না—আমি পুলিশে খবর দিয়ে আসছি,' বলিয়া বিনোদ বাবু বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি যাইতেই রেণু ফিরিয়া আসিল, 'সই, উনি যে জল না খেয়েই বাইরে গেলেন, রাগ করেছেন না কি?'

'কি জানি···' মাতু চেয়ারটা আগাইয়া দিল, 'বসো সই!'

'সয়া যে না খেয়েই চলে গেলেন···কিছু খাবার আনিয়ে দিলে পারতে।'

'তা তো পারতুম, কিন্তু হলো কই?' মাতু হাসিয়া বলিল।

'আজকে তোমাদের ঝগড়া হয়েছে না কি?' রেণু জিজ্ঞাসা করিল।

'ঝগড়াও নেই—ভাবও নেই, জান তো?'

রেণু বসিয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য্য ভাই! তোর মত অত তফাৎ হয়ে থাকতে কাউকেই আমি দেখিনি; মিশতে যে না জানো, তা নয়; আমার সঙ্গে তো খুব মেলামেশা কর···ওঁর সঙ্গেই কেন যে এত তফাৎ হয়ে থাকো, জানি না!'

'আর এই ক'টা দিন···' মাতু মৃদুস্বরে বলিল, 'তার পরে একেবারেই তফাৎ হয়ে যাব!'

'তাই ভেবে তোমার কি আনন্দ হচ্ছে সই?' রেণু হাসিয়া উঠিল, 'বাঃ, বেশ তো! সয়া তোমায় কত ভালবাসেন, আর তুমি যেন কি রকম! অত গয়না দিয়েছেন, একবারটি পরে সেগুলো সার্থক করলে না, বেশ যা হোক! এইবারে আমি তাঁর হয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো; কেন বল তো, ওঁকে তুমি এত হেনস্তা কর?'

'আমি তো সখী, আমার সঙ্গে আবার ঝগড়া কিসের? না, ঐটি যেন তোমার সঙ্গে কখনও আমার না হয়···তার যদি কোন কারণ থাকে, তবুও না! যাবার বেলা আমি যেন হাসিমুখে বিদায় নিতে পারি ভাই, সেই কামনাই করছি।'

'তার তো এখনও দেরী আছে, বিদায়ের বাঁশী এখনই কেন বাজাচ্ছ? মিলনের বাঁশী যেমন বাজছে, বাজতে দাও।'

এ বাঁশী যদি বেসুরো বাজে তবুও? বেশ, তাই হবে! এইবারে উঠি ভাই; এখনও কাপড় কাচা হয়নি, তার পরে আবার রাঁধতে হবে।'

'কি রাঁধবি?'

'কি, আবার? রোজ যা হয়; চললুম ভাই!' বলিয়া মাতু উঠিল।

আমিও যাই···' রেণু যেন কত অনিচ্ছায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'কত সময় এসে এসে তোর কত কাজের ক্ষতি করেছি, কিছু মনে করিস্ নে সই!'

'না না! তুমি এসে আমায় কত আনন্দ দিয়েছ···সে কি দিদি, ভোলবার? আবার এসো; আমি দুটো ভাত সেদ্ধ ক'রে নামিয়ে রেখেই আসছি, দু'জনে কত গল্প করবো; বাপের বাড়ীর কথা তোমায় বিশেষ কিছুই বলিনি তো, আজকে বলতে ইচ্ছে করছে।'

'সত্যি? আমি একবারটি ওদিক্‌টা ঘুরে দেখেই আসছি··· তোর সয়া জল খেয়ে বেরিয়ে গেলেই আমার ছুটী, ভাগ্যিস্ তোর আমি ভাই, ওবেলায় রুটী ক'খানা সকালবেলাই করে রাখি, তোর মত দু'বেলা গরম গরম রেঁধে দেওয়া আমার দ্বারা হয়ে ওঠে না··· চললুম।'

রেণু চলিয়া গেলেও মাতু দাঁড়াইয়া রহিল, সই তো জানে না যে পুলিশ আসিতেছে। তারা যদি ওকেই সন্দেহ ক'রে বসে, তখন? ও ভগবান, আমাদের দিয়ে সইয়ের কোনও অনিষ্ট হ'তে দিও না, তুমি, দিও না!

৫

তখনও মাতুর রান্না হয় নাই, বিনোদ বাবু ইন্‌স্পেক্টর দত্তকে লইয়া আসিলেন, ঝি রান্নাঘরের বারান্দায় পা মেলিয়া বসিয়া দেশের গল্প বলিতেছিল, পুলিশ দেখিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। মিঃ দত্ত ঘরে গিয়া বাক্সটা দেখিলেন, পরে বারান্দায় আসিয়া ঝিকে ডাকিলেন, 'ঝি, এদিকে এস তো; আচ্ছা, এঁরা এখানে আসবার পর থেকে তুমিই তো কাজ করছো, বউমার গয়নাগুলো বাক্স থেকে বার ক'রে কে নিয়েছে, বলতে পারো?'

'এ তো বড় বিষম কথা!' ঝি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, 'বউদির গয়না চুরী হয়েছে, কই, তা শুনিনি! হেই মাগো, এমন সর্ব্বনাশ কে করলে। ও, একটা কথা মনে পড়েছে, এক দিন এক দিন'··· বলিতে বলিতে ঝি থামিয়া গেল।

বিনোদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এক দিন কি হয়েছিল ঝি?'

'বলবো? কিছু মনে করবেন না বাবু, সে হয়তো আমার ভুল; এই দিন-পাঁচ-ছয় হবে, আমি বিকেল বেলা কলতলায় বসে বাসন মাজছি, ও-বাড়ীর দিদিমণি কি একটা জিনিষ কাপড় ঢাকা দিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল, অন্ত দিন বৌদি দোর অবধি তার সঙ্গে যায়, সেদিন তা'কে দেখলুম না। আমার পানে এমনি কোরে চাইতে চাইতে গেল··· সেই দৃষ্টিটাই আমার খারাপ লাগলো, সব সময় যে আসচে-যাচ্ছে, তাঁকে কি আর সন্দেহ করা যায়, বলুন তো বাবু?'

ইন্‌স্পেক্টর দত্ত বিনোদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওঁর স্বামী কি কাজ করেন বলতে পারেন?'

'বড়বাজারে, মাড়োয়ারীর দোকানে?'

বাড়ী সার্চ্চ করে লাভ নেই কিছু, গয়নার বাক্স তো বাড়ীতে রাখেনি···দেখি, কি করতে পারি, দু'-তিন দিনেই খবর পাবেন।'

ইন্‌স্পেক্টর চলিয়া গেলে মাতু আসিয়া বলিল, 'উনি কি সইকে সন্দেহ ক'রে গেলেন?'

'সেই রকমই তো বোধ হচ্ছে।'

'ও মা কি হবে!' বলিয়া মাতু ভাবিতে লাগিল।

পরদিন রেণু আসিল না, মাতু উদ্বিগ্ন হইল, কিন্তু তাহাকে ডাকিল না···তার পরের দিন রেণু আসিয়া যখন 'আমার বড্ড অসুখ করেছিল সই!' বলিয়া শুষ্ক মুখে দাঁড়াইল, তখনও মাতু কিছুই বলিতে পারিল না···তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে রেণু অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, যে কথা বলিতে আসিয়াছিল, আর বলিতে পারিল না; পূর্ব্বরাত্রে নরেন বাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'ওরা কিন্তু টের পেয়ে গেছে, পুলিশ কালকে জহরমলের দোকানে গেছল; সেখানে খোঁজ ক'রে গয়নার বাক্সটার কথা জেনে বলে গেছে, 'ওই গয়নার বাক্সটা চোরাই মাল, ফেরৎ দেওয়া না যেন!' এইবারে সাবধান রেণু! ওদের যত ভালোমানুষ ভেবেছিলে, ওরা তা মোটেই নয় কিন্তু। তা তোমায় কি বলো, গয়নার বাক্সটা আমিই তো ওখানে নিয়ে রেখেছি, আমারই মরণ হবে!' সে সম্বন্ধে খবর পাওয়াই রেণুর উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু মাতুর ভাব বুঝিয়া সে আর কথা পাড়িতে সাহস করিল না···মাতু যেন কেমন হইয়া গিয়াছে···মুখ-খানা আঁধার করিয়া সে কেবলই কি ভাবিতেছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রেণু জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার ওপর রাগ করেছ না কি সই? আমি অসুখ নিয়েও তোমার দেখতে এলাম, তুমি যে কথাই কইছ না? না, রাগ করবার মত কিছু তো করিনি। তবে কি বাপের বাড়ী যাবে বলে এখন থেকেই······'

'না না, সে সব কিছু নয়—' মাতু ক্লান্ত স্বরে বলিল, 'আমারও শরীরটা ভালো লাগছে না, মন তো ততোধিক—'

'কেন, তোমার আবার কি হ'লো?'

'তেমন কিছু নয়···বসো সই, সত্যি তোমায় বড্ডই রোগা দেখাচ্ছে; কি অসুখ হয়েছিল ভাই?'

রেণু ম্লান হাসিল, 'তবু ভালো অসুখের কথাটা শুনতে চাইলে। আগে বসে পড়ি, তার পরে বলি!' বলিয়া যেই সে মাতুর পাশে বসিয়াছে। ঝি ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল, দিদিমণি গো, দেখসে, তোমার বাড়ীতে পুলিশ এসেছে, পাড়ার ভদ্দর লোকরা তাদের সঙ্গে কথা কইতে লেগেছে—'

'পুলিশ—আমার বাড়ীতে!' বলিয়াই রেণু উঠিয়া গেল; মাতু যেমন বসিয়াছিল, তেমনই রহিল; তাহার যেন নড়িবারও ক্ষমতা ছিল না।

রেণু বাড়ী আসিয়া দেখিল, ইন্‌স্পেক্টর দত্ত কয়েক জন কনেষ্টবল লইয়া তাহার বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, 'এই স্ত্রীলোকটিকে আমি গ্রেপ্তার করতে এসেছি, ওঁর বিরুদ্ধে চুরির চার্জ্জ আছে।'

ভাদুড়ী মশাই কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, 'আপনারা পুলিশের লোক, সব করতে পারেন, কিন্তু এই কাজটি পারবেন না; আমরা ব্রাহ্মণ-কন্তার অপমান হ'তে দেব না, সে আপনি যাই বলুন; ওঁর স্বামী এখন বাড়ী নেই, কাজেই আপনি পথ দেখুন মশাই! পাড়ার কোন মেয়ের ওপরে যা তা বলে জুলুম করতে আমরা দেব না।'

মিঃ দত্ত হাসিয়া বলিলেন,—'যা তা' ব'লে জুলুম করতে আসিনি; বেশ, আমি case file ক'রে দিই; কোর্টের অর্ডার পেলে তখন উনি যাবেন।'

তিনি সদলে চলিয়া গেলেন; রেণু মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, জানালার গরাদে ধরিয়া সামলাইয়া লইল—পরে খাটে উঠিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল; খানিক পরে ঝি আসিয়া ডাকিল, 'খাবার আনতে দেবে না কি দিদিমণি? পয়সা দাও তো, দই-মিষ্টি এনে রেখে যাই; বাবু ওই শুকনো রুটিগুলো কি ক'রে খাবে গো?' রেণু সে কথার উত্তরও দিল না।

রাত্রে নরেন বাবু আসিলেন; রেণু ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'সব শুনেছ?'

'নিশ্চয়!' তিনি ম্লান হাসিয়া বলিলেন, এ কি আর শুনতে বাকী থাকে? যাঃ, সব ফেঁসে গেল—একেই বলে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!'

নরেন বাবু জামা-কাপড় ছাড়িয়া গা ধুইয়া আসিলেন; রেণু তেমনি পড়িয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, 'উঠে পড় রেণু, তোমার তো আর পড়ে থাকলে চলবে না—এখন যে তোমায় বড্ড শক্ত হ'তে হবে! যাও, খাবার নিয়ে এস, খাওয়াটা সেরে ফেলা যাক্।'

রেণু উঠিয়া রুটি তরকারি আনিয়া দিল; তিনি খাইতে লাগিলেন, সে বাহিরের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া রহিল; নরেন বাবুর খাওয়া হইলেই রেণু জিজ্ঞাসা করিল, এখন রাত কটা?'

'এই আটটা, সাড়ে আটটা হ'বে।'

'ট্রেনের সময় তা হ'লে', যায়নি; তুমি জামাটা গায়ে দাও, আমি জিনিষপত্র গুছিয়ে নিই; দূরে, অনেক দূরে—চলো আর কোথাও যাই, এখানে থেকে পুলিশের হাতে ধরা দেব না!'

'তাতে যে আরও মুস্কিলে পড়তে হবে।' নরেন বাবু বলিলেন, ধরা পড়লে ভীষণ শাস্তি, তখন তোমাকেও বাঁচাতে পারব না। মনে করেছি, দোষ স্বীকার করবো, তা হ'লে শাস্তি কম হবে। চাকরীটা সামান্য হ'লেও উপরি পাওনা ছিল, তাতেই পুষিয়ে যেত; দশ টাকা জমাতে পেরেছি। জহরমল যা চটে গেছে—ঠিক বরখাস্ত করে দেবে। দু'জনে মিলে যে কাজ করেছি, দু'জনকেই তার ফল ভোগ করতে হবে। তুমি দেশে গিয়ে মার কাছে থেকো; ছ'মাস কি এক বছর জোর, তার পরেই আমি ফিরে আসব।'

রেণু শিহরিয়া উঠিল···তাহার ঠোঁট দুইটি একটু কাঁপিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না···বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। নরেন বাবু তাহাকে আহার করিতে বলিতে লাগিলেন, সে তাহা শুনিয়াও শুনিল না।

৬

পুলিশ কোর্টের মোকদ্দমা, শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। মিঃ দত্ত গহনার বাক্স দেখাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন; জহরমলের কর্ম্মচারীরা সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা এই বাক্স নরেন বাবুকে দোকানে রাখিতে দেখিয়াছে; নরেন বাবুও দোষ স্বীকার করিলেন, কাজেই কোন গোলই হইল না—ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন; নরেন বাবুর উকীল সশ্রমকে বিনা শ্রম করিবার জন্য কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিয়া চুপ করিলেন। রেণু একটি আত্মীয় বালককে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া আসিয়াছিল, নরেন বাবুকে যখন পুলিশ জেলখানায় লইয়া যায়, সে স্থির অপলক নয়নে তাহা দেখিল; ঠিক সেই সময়ে বিনোদ বাবু কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টরের ঘরে যাইতেছিলেন, গহনার বাক্সটি লইয়া জমাদারও তাঁহার সঙ্গে গেল। রেণু একবার সেই গহনার বাক্সটি দেখিল—তার পরেই মুখ ফিরাইয়া নরেন বাবুর হাতকড়ি-পরা হাতের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। গাড়ী তাঁহার পিছন পিছন খানিক দূর গেল, তিনি গেটের ভিতরে প্রবেশ করিলে কোচম্যান বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ী আসিয়াই রেণু বিছানায় লুটাইয়া পড়িল; ছেলেটি ভাড়া চুকাইয়া দিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিল, 'কাকীমা, আমি কি আজ এখানেই থাকবো?'

রেণু মাথা তুলিয়া বলিল, 'না, তুমি বাড়ী যাও, তোমার মা ভাববেন।'

'তুমি কবে বাড়ী যাবে, কাকীমা?'

'তোমার ছুটী হোক, তার পরে।'

'আচ্ছা, আমার ছুটী হ'লেই এখানে এসে তোমায় নিয়ে যাব, তার তো আর তিনটে দিন বাকী।'

ঝি বলিল যে, এই তিনটে দিন সে এইখানেই থাকিবে, শুনিয়া ছেলেটি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গেল।

ঝি বারান্দায় বসিয়াছিল, মাতু আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সই কোথা ঝি, ঘরে?' বাঃ, তুমি এখানে [illegible] আমি সইকে খবর দিয়ে আসছি; সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'এরি মধ্যে শুয়ে পড়েছ সই? এমন সময়ে একলাটি যে, সয়া কোথায়?'

রেণু মুখ তুলিয়া বলিল, 'জেলে।'

'জেলে?' বলিয়া মাতু রেণুর পাশে বসিয়া পড়িল; কিছুক্ষণ পরে সে ঝিকে বলিল, 'আজকে তুমি বাড়ী যেও না ঝি, জল খেয়ে সইয়ের ঘরে শুয়ে থেকো; দাদাকে যেতে বল, সইয়ের সঙ্গে এখন দেখা হবে না। সই, আমার দাদা এসেছে।'

'তোমাকে নিয়ে যেতে বুঝি······কবে যাবে?' রেণু জিজ্ঞাসা করিল।

দাদা এই তো সবে ক'লকাতা এসেছে···দু'দিন ঘুরে-ফিরে দেখুক, তার পরে।'

'বেশ, তুমিও যাও!' বলিয়া রেণু নিশ্বাস ফেলিল।

মাতু নীরবে রেণুকে হাওয়া করিতে লাগিল; অনেকক্ষণ পরে সে আবার বলিল, 'সই, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না; তুমি কি করে গয়নার বাক্সটা পেলে? আমি তো কোনো দিনও—'

'সেই যে সে দিন······বিকেলবেলা ঐ ঘরটায় বসে তোমার চুল বেঁধে দিচ্ছিলাম, বিউনী করা হয়ে গেলে তুমি উঠে সোনার ফুল বার করলে, তার পরে ট্রাঙ্ক খুলে রেখেই বাইরে গেলে; আমিও অমনি······তোমার অসাবধানতা, আমার লোভ, তার ফলে এই সর্ব্বনাশ! সই, সই! এখন আমি কি করব, কেবলই তাই ভাবছি।' বলিতে বলিতে রেণু কাঁদিয়া ফেলিল···একটু শান্ত হইয়া আবার বলিল, 'তোমার গয়না সমস্তই তুমি পাবে, তার জন্য কিছু ভেব না, কিন্তু আমার এ কি হলো সই, আমার যে সব গেল!'

'কিছুই যায়নি; এই কয়টা মাস বাদে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্যে তুমিও অত উতলা হয়ো না। আচ্ছা সই, তোমার বাপের বাড়ী কোথা?'

বাপের বাড়ীতে কেউ নেই আমার—শ্বশুরবাড়ী খালিশপুর, সেখানে আমার দেওর, শাশুড়ী, জা, এঁরা সবাই আছেন।'

'খালিশপুর আমাদের বৈদ্যবাটী থেকে বেশী দূরে নয় তো, সই, আমার সঙ্গে চলো তুমি···তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি বাড়ী যাব।'

রেণু উঠিয়া বলিল···তা গেলে মন্দ হয় না, এখানে আর কি নিয়ে থাকবো? কিন্তু···'

'এর ভেতরে কিন্তু নেই!' মাতু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, 'সই, তুমি তো জানো, আমি কখনও গয়না চাইনি—ওর জন্যে আমার মনে কিছু কষ্ট হয়নি! আমি তোমার সই, যাই কেন হোক না··· চিরকাল তোমায় আমায় সেই ভাবেই থাকব; তুমি তা'তে বাধা দিও না!'

রেণু ভাবিয়া বলিল, 'না—আমি তা'তে বাধা দেব না; কিন্তু পারবি ভাই, এই ঘটনা ভুলতে···পারবি কি সই, আগেকার মত আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে? শুনেছি, মনে সন্দেহ হ'লে মধুও এখনও বিষ হয়ে যায়······'

'পারি কি না, সে তুমি দেখতেই পাবে। এই ব্যাপারে [illegible] মনে বড় কষ্ট পেয়েছি সই, পারতুম যদি, তোমার মন থেকে [illegible] মুছে দিতুম, কিন্তু সে আমার সাধ্যাতীত!'

'উঃ, বাঁচলুম!' রেণু বলিয়া উঠিল, 'সব হারিয়েছি বটে, কিন্তু তোকে তো ফিরে পেলুম! আজ আর আমার ভেতরে কোনো কৃত্রিমতা নেই···চোখের জলে মনের ময়লা ধুয়ে গেছে সই! আজকে এই বুঝতে পারলুম, আমি কোন দিনও কারো কিছু ছিলুম না। যদি আমি তাঁর স্ত্রী হতুম, তবে কি আর তাঁকে জেলে পাঠিয়ে ফিরে আসতে পারতুম সই? আমার জন্যেই তিনি জেলে গেলেন।' বলিয়া রেণু দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

'কেঁদ না সই।' মাতু তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল —'ছয়টা মাস দেখতে দেখতেই কেটে যাবে; তিনিও কঠোর পরীক্ষা দিলেন···এখন থেকে তাঁকেও তুমি সম্পূর্ণরূপে তোমার বলে ভাবতে পারবে; তখন এই সব কষ্ট আর কষ্ট বলেই মনে হবে না।'

রেণু নীরবে ভাবিতে লাগিল; মাতু বলিল, 'ও ভাবনা এখনকার মত মন থেকে সরিয়ে দাও, ও সব যত ভাববে, তত কষ্ট পাবে; মন খারাপ ক'রে লাভ কি? এস আমরা অন্য কথা কই; ভালো কথা মনে পড়েছে সই। মা অনেক খাবার পাঠিয়েছেন দাদার সঙ্গে; এখানে নিয়ে আসি গে, তোমাতে আমাতে খাব, কেমন? ও ঝি, আমাদের ঠাঁই করে দাও, আমি খাবার নিয়ে আসছি'—বলিয়া মাতু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঝি আসন বিছাইয়া বলিল, 'ওঠ দিদিমণি, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-খানা কেচে এস; ক'দিন থেকেই তো খাওয়া নেই—ভেবে ভেবে একেবারে সারা হয়ে গেলে। বৌদির মা কেমন চমৎকার সব [illegible] আর ক্ষীরের খাবার পাঠিয়েছেন, দু'খানা মুখে দিয়ে শুয়ে পড়; আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াব।'

রেণু ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; আজ কত দিন সে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়াছে···মাথা ঘুরিতেছে, শরীর ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; সুস্থ সবলা রেণু আজ ক্ষীণা, কঠিন রোগীর মতই মলিনা। সেই সরলা সদালাপী রেণু যে পাড়ায় সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা বলিত, আজ সে চোর···কাহাকেও মুখ দেখাইবার, কাহারও সহিত আলাপ করিবার আর তাহার অধিকার নাই। না, এই পাড়া সে ছাড়িবে, এমন মুখ নীচু করিয়া থাকিতে সে তো পারিবে না। কিন্তু কোথায় বা যাইবে? শাশুড়ী যদি এ সব কথা জানিতে পারেন, আর কি তাহাকে রাখিবেন? গাঁয়ের লোকেও কত ছি ছি করিবে। হায়, এক মুহূর্ত্তের ভুলে লোকের কি সর্ব্বনাশ হয়··· কত দুর্নাম, কত বড় দুশ্চিন্তা। কিন্তু রেণুকে তো আবার উঠিতে হইবে, আবার তাহাকে সব ঠিক করিয়া লইতে হইবে, মন হইতে সমস্ত গ্লানি মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এমন ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে না।

৭

মাতু বাড়ী আসিয়া দেখিল, বিনোদ বাবু তাহার অপেক্ষা করিতেছেন, সেই গহনার বাক্সটি টেবিলের উপর রহিয়াছে। তিনি তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'বড় কষ্ট ক'রে গয়নার বাক্সটি আজকেই ফিরিয়ে এনেছি। যাক, সমস্ত গয়নাই পাওয়া গেছে, এই বারে খুব সাবধান ক'রে তুলে রাখো।'

মাতু ম্লান হাসিয়া বলিল, 'এটা আর আমাকে রাখতে বলো না···এখন তুমিই তুলে রাখো, পরে কোন ব্যাঙ্কে রেখে দিও, [illegible] থাকতে পারবে। আমি [illegible], সইয়ের দু'দিন খাবার গেছে, তোমার খাবার এই টেবিলের ওপরে ঢাকা দিয়ে রেখে গেলুম, একটু জিরিয়ে বসে খেও।'

বিনোদ বাবু অবাক্ হইয়া গেলেন, 'আবার ওই স্ত্রীলোকটার সঙ্গে মিশছ? ছি, মাতু ছি!'

মাতু ব্যথিত স্বরে বলিল, অমন কোরে বলো না। মা যদি সন্তানের আর স্ত্রী স্বামীর শত অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারে, তবে বন্ধুই কি শুধু বন্ধুর অপরাধ হ'লে বিচ্ছেদ করে বসবে? বন্ধুত্বকে অত খাট মনে করো না।'

'তা নেই করলুম'—বিনোদ বাবু বলিয়া উঠিলেন, 'তোমার যদি সব চোর-ছ্যাঁচোড়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, তবেই আমি গেছি—এমন কোরে থানা-পুলিশ করতে আর পারব না।'

'সে তোমায় করতেও হবে না'—মাতু অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'আমি তো চলেই যাচ্ছি! সইকে কেউ খারাপ ভাবতে পারেনি গো, এক দিনের ভুলে সে যা ক'রে বসেছে, তার জন্যে কি নিগ্রহই সহ্য করছে। সেই কথা মনে কোরে তুমিও তা'কে মাপ করো! ভালো লোকেও কত সময় মন্দ কাজ করে বসে, এ ব্যাপারটা তাই ব'লে ধরে নাও; আর সই আমাদের এত দিন যে উপকার করেছে, এই ছুতো পেয়ে তা যেন ভুলে যেও না।'

বিনোদ বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'বাঃ মাতু! তোমার সই কিন্তু তোমার মুখে 'খই' ফুটিয়েছে—তোমাকে দস্তুর মত সহুরে করে তুলেছে, তোমার সেই জড়সড় ভাব একেবারে দূর করে দিয়েছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। সে জন্যে সইকে আমার ধন্যবাদ জানিও; যাও, আর দেরী করো না, সত্যই সে দেহ-মনে বড় কষ্ট পেয়েছে, তা'কে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করে তোল, আমি খাব'খুনি।'

মাতু সেই যে গেল, কত রাত্রে আসিয়া শয়ন করিল, বিনোদ বাবু তাহা জানিতেও পারিলেন না।

পরদিন সকাল বেলা ঝি বাজারের পয়সা চাহিলে রেণু বলিল, 'বাজার আর করতে হ'বে না; দু'টি ডাল আর আলু রয়েছে, ভাতে-ভাত ক'রে নেব। আমি চান ক'রে আসচি, তুমি ওদের বাজার ক'রে দিয়ে এসে উনুনটায় আগুন দিয়ে দিও।'

রেণুর স্নান হইয়া গেলে মাতু এক ডিস খাবার লইয়া আসিল, —'সই, এই খাবারটুকু খেয়ে জল খাও; আমার রান্না এখুনি হয়ে যাবে, উনি আপিসে গেলে দু'জনে খেতে বসব। তোমায় আর উনুনে আগুন দিতে হবে না। কি-ই বা খাও তুমি, সে আমার সঙ্গেই হয়ে যাবে।'

রেণু ম্লান হাসিয়া বলিল, 'বেশ, আমার তা'তে কিছু আপত্তি নেই···কিন্তু দাদা কি ভাববে সই?'

'কিছু না! তুমি এই ব্যাপারটা এত বড় কোরে দেখছ কেন? যেন সবাই তোমার কথাই শুধু ভাবছে আর কারুর কিছু ভাববার নেই; আপিসের সময় ওদের কি আর ভাববার অবসর থাকে, নিজের নাম অবধি ভুলে যেতে হয়। কেন দিদি, মনের ভিতরে 'কালী মেখে রেখেছ—সমস্ত ধুয়ে-মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াও, কিছুই যেন হয়নি। যাই, দাদাকে ভাত বেড়ে দিইগে, সে এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে। ঘড়িতে যেই দশটা বাজবে, তুমি অমনি ও-বাড়ীতে যাবে, বুঝলে, বলিয়াই মাতু বাহির হইয়া গেল।

হাত দিয়াই সে ভাবিতে লাগিল, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না…… কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, সে আপিসের তাড়া নেই! সারাদিন এ-বাড়ীতে চুপ ক'রে বসে থাকা, আর ও-বাড়ী গিয়ে খাওয়া ……বড্ডই বিশ্রী লাগছে ভগবান্! আচ্ছা, যার মন এক জনার একটা জিনিষ খেতেও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, সে কি ক'রে যে এত বড় একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসলো, আমি তা ভেবেই পাই না! সেদিন যদি আমার মনের এই ভাবটা থাকতো; সেদিন যদি বুঝতে পারতাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে…… তবে কি আর হে ভগবান্, আজ আমাদের এই দুর্দ্দশায় পড়তে হতো! যাই, দেশে যাই; নতুন জায়গায় নতুন কাজ নিয়ে পড়িগে, এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব! আজ তুমি জেলে……কি করে যে রয়েছ. কত অপমান, কত কষ্ট সহ্য ক'রে। কেউ কি কখনও ভাবতে পেরেছিল যে তুমি জেলে যাবে, তাও আবার আমার জন্যে!

ভিজা চুল চেয়ারের পিঠে এলাইয়া দিয়া রেণু বসিয়া ভাবিতে লাগিল, সামনের খাবার যেমন ছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল।

৮

আজ গণেশ ঠাকুরের কলিকাতা দর্শন শেষ হইল, রাত্তের গাড়ীতে বাড়ী যাইবে; মাতু সকাল হইতেই রেণুকে তাড়া দিতেছে……'সই আজই আমরা যাব, তুমি সব গুছিয়ে নাও; বাড়ী-ভাড়া, ঝির মাইনে সব দিয়েছ তো, তবে আর কি, এইবারে চল যাই। বিকেলের রান্না তুমি করবে? না, না! ওদিকের কিছু তোমায় করতে হবে না, এদিক্ সামলাও!'

বাক্সটি গুছাইয়া রাখিয়া মাতু রান্নাঘরে গেল। আজ বিনোদ বাবুর ছুটী, তিনি রান্নাঘরের দোরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, 'মাতু, তুমি চলে যাবে?'

মাতু হাসিয়া মুখ নত করিল, এ প্রশ্নের আর উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিনোদ বাবু আবার বলিলেন, 'মার কাছে গিয়ে আমাকে হয়তো মনেও করবে না!

এবার মাতু মুখ তুলিল, ধীর অথচ স্পষ্ট স্বরে বলিল, 'সেই তো উচিত; মার কাছে গিয়েও যে সন্তান অন্য চিন্তা করে, তার যে যাওয়াই বৃথা। মার সামনে গিয়ে ভাবতে হবে—এই মা আর আমি···জগতে আর কেউ নেই, কিছু নেই! সব কথা ভুলে গিয়ে তবে মার কথা শুনতে হয়, সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে—তবে বুঝতে পারা যায়, মা কি! এই জননীর চিন্তা করতে করতে আমরা জগজ্জননীকে ধারণা করতে পারি, এঁকে মা বলে ডাকতে ডাকতে আমরা তাঁকে ডাকতে শিখি। তুমি কি এমন কোরে কখনও মার কাছে যাওনি?'

এই সরল অথচ গভীর প্রশ্নের উত্তর বিনোদ বাবু দিতে পারিলেন না—নীরবে মাতুকে দেখিতে লাগিলেন; সে যেন রোগা হইয়া গিয়াছে, মুখখানা কেমন রক্তহীন ফ্যাকাশে দেখাইতেছে, তিনি দুঃখের সহিত বলিলেন, 'তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ মাতু, শরীরের যত্ন করনি একটুও। তোমার মা কি বলবেন আমাকে?'

'কি আবার বলবেন, যদি কিছু বলতে হয় আমাকেই বলবেন'—মাতু হাসিয়া বলিল, 'এমনি ছোট্ট বাড়ীতে থাকা অভ্যেস নেই কি না, পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ী, বাগান, পুকুর ঘাট নিয়ে কত জায়গা। সমস্ত বাড়ীটা ঘুরলেই বেড়ানো হয়ে যায়। এ যেন ঠিক পাখীর মতই খাঁচার ভিতরে থাকা—সই ছিল তাই, নইলে তো জন-মনিষ্যির মুখ দেখতেও পেতাম না! দু'বেলা রাঁধা-বাড়া আর চুপটি ক'রে ঘরে বসে থাকি, তাই এক একবার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। যাক্, মার কাছে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

'তা তো যাবে'—বিনোদ বাবু বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমার কি হবে। সারা দিন আপিসের গাধা-খাটুনী খাটা, আর সন্ধ্যেবেলা শূন্য ঘরটিতে চুপ-চাপ বসে থাকা—এই তো জীবন! তোমার মা, বাবা, দাদা আছেন, আবার দেখছি সইকেও নিয়ে যাচ্ছ; এই আবেষ্টনের মধ্যে পড়ে তুমি কি আমার কথা একবারও ভাববে না—মনে পড়বে না আমি কি করেই যে রয়েছি। না পাব সময় মত খেতে, অসুখ হ'লে একটু সেবাও কেউ করবে না—এমনি একলাটি কি করেই যে থাকবো!'

মাতুর মাছ তরকারি রান্না হইয়া গিয়াছিল, ছোট্ট রান্নাঘরটি ভীষণ গরম হইয়া উঠিয়াছে, সে ভাত চড়াইয়া বাহিরে আসিল, বিনোদ বাবুর ব্যথাভরা কথা শুনিয়া সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল, 'সে তো ভাববই, মা যে নিজেই বলবেন, 'মাতু, যা, ওঁর কষ্ট হচ্ছে।' তখন আবার আসব—আবার এই ঘরটিতে সুখে-দুঃখে তোমার সঙ্গের সাথী হয়ে থাকবো! কিন্তু আজ কেন সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ? মাকে দেখবার জন্যে যে আকুল হয়ে উঠেছে, তাকে বাধা দিও না, যদি ছুটী দিলে, তবে ভাল মনে দাও, আমার আর মার মাঝখানে আড়াল ক'রে দাঁড়িও না। জানি, মার কাছে বেশী দিন থাকতে আমি পারব না, কোন মেয়েই তা পারে না, কিন্তু এখন থেকে সে কথা ভাবতে গেলে যাবার সুখটুকুই নষ্ট হয়ে যাবে।'

'না, তুমি যাও—মার কাছে গিয়ে মনের সুখে থাকো, আমি কখনও তোমার সুখের হন্তারক হবো না। তোমার মার অসাধারণ ক্ষমতার আমি প্রশংসা করি। মেয়ের মনটি তিনি এমনি করেই বেঁধেছেন—কত ভালোবাসলুম, কত ভালো ভালো গয়না গড়িয়ে দিলুম, কিন্তু কিছুতেই সে বাঁধন খুলতে পারলুম না; তাঁকে আমার প্রণাম দিও।' বলিয়া বিনোদ বাবু শোবার ঘরে চলিলেন, মাতু সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

গণেশ ঠাকুর বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিলেই মাতু ভাত বাড়িয়া দিল; সকলের খাওয়া হইলে রেণুকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া শোবার ঘরে গিয়া দেখিল, বিনোদ বাবু গয়নার বাক্সটি সামনে করিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন; মাতু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি তবে যাই—দাদা গাড়ী আনতে গেছে।'

'যাও!' বিনোদ বাবু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'এই গয়না-গুলো নিয়ে যাও মাতু, পুজোর সময় পরবে, তোমার মা দেখে কত সুখী হবেন!'

'না, ও গয়না তুমি আমার সঙ্গে দিও না। আমাদের দেশে যা চোরের ভয়! মা গয়না দেখে খুসী হবেন নিশ্চয়ই—কিন্তু যদি কিছু হয়, মনে বড্ড কষ্ট পাবেন, আমার তো মুখ দেখাবারও যো থাকবে না। ঐ যে দাদা গাড়ী নিয়ে এসেছে, এইবারে যাই। আমি যে তোমার মনের মত হ'তে পারলুম না, অন্য মেয়েদের মত সব ছেড়ে তোমায় ধরতে পারলুম না—এই ব্যথাটুকু নিয়ে যাই। গয়নার বাক্স তোমার কাছেই থাক্, ওতে আমার কিছু দরকার নেই।'

মাতু ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিনোদ বাবু তাহার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া বলিলেন, 'আমার কাছে চিঠি লিখবে না, মাতু ?'

'হ্যাঁ, চিঠি লিখব বই কি, গিয়েই তো একখানা পৌঁছোনর খবর দেব।'

'তার পরে আর না ? মাতু! বেশী যদি না লেখ, হপ্তায় একখানা ক'রে লিখো। তাতে যেন তোমার মা বাবার কথা না থাকে, দুটো ভালবাসার কথা—তুমি যে আমাকে ভুলে যাওনি, শুধু সেই কথাটি লিখে দিও, আমি তাই নিয়ে দিন কাটাব। আমার তো আর কেউ নেই মাতু! পূজোর আমোদটা মাটি ক'রে দিয়ে তুমিও চলে যাচ্ছ—এখন তোমার চিঠিই আমার সম্বল হয়ে রইলো।'

'বেশ, চিঠি আমি খুব লিখব; তোমার চিঠি পেলেই তার জবাব দেব, এইবারে যেতে দাও। দেখ, রাত হয়ে পড়েছে, গাড়ী যদি ছেড়ে দেয়, তখন কি হবে ?'

মাতু বাহিরে আসিয়া দেখিল, গণেশ ঠাকুর তাহার ও রেণুর সমস্ত জিনিষ গাড়ীর উপর তুলিয়াছে; ঝিকে মৃদুস্বরে 'ওঁকে দেখিস ঝি!' বলিয়া মাতু গাড়ীতে উঠিল; বিনোদ বাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

রেণু জিজ্ঞাসা করিল, 'সয়া কি বললেন সই, এই যাবার বেলা ?'

'যা সবাই বলে।' মাতু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'একটা জিনিষ দেখলাম সই, পুরুষরাও মেয়েদের মত মায়া দেখাতে জানে! মেয়েরা যদি সব দিক সমান রেখে চলতে পারে তবেই ওদের কাছ থেকে ভালো জিনিষ পাওয়া যায়; কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েই যে একটু ভালোবাসার আঁচ পেলে মোমের পুতুলের মত গলে যায়, সেই তো হয়েছে মুস্কিল!'

স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ

মায়া গুপ্ত

শ্রীমণীন্দ্র সমাদ্দার যে আলোচনা বসুমতীতে আরম্ভ করেছেন, তাতে যোগ দিতে পেরে গৌরব বোধ করছি। কয়েকটা কথা বলবার আছে—এগুলি ব্যক্তিগত মতামত। স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ ও পথ আলোচনা করার প্রয়োজন এই যে—কর্ম্মী এবং ভবিষ্যৎ নেতা অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হয়ে অনর্থক সময় ও শক্তিক্ষয় না করেন এবং যাতে তাঁদের আত্মত্যাগ যথাসম্ভব সার্থক হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ সহজবোধ্যরূপে জনসাধারণের সামনে রাখা হয় এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেও স্পষ্টভাষায় সাধারণের জ্ঞাতব্য করা হয়। যাতে আরো অধিক সংখ্যায় কর্ম্মী 'জাতীয়' সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ এবং স্বাধীনতার রূপ এই দুটি বিষয় নেতারা সাধারণকে বার বার জানাতেন। জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমরা নেতাদের এবং উপযুক্ত বিচারশীল কর্ম্মীদের আমাদের মধ্যে চাই। যাঁরা কারাগারে আছেন, যাঁরা মন্ত্রিত্ব এবং উচ্চপদ গ্রহণ করেননি তাঁদের কথা আমরা এত অল্প জানতে পারি কেন ? তাঁরা সকলে কোথায় ? তাঁরা সাধারণের সামনে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তাঁদের বিচার ধারা প্রকাশ করুন।

National Planning Committeeর Plan এবং Report সাধারণের দৃষ্টিগোচর করা চাই। ঐ Committeeতে যোগ্য লোকের সমাবেশ দেখতে চাই। আমরা যার তার Plan বিশ্বাস করি না। National Committeeর কাছে আমাদের আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা চাই। আমরা জানতে চাই—

(ক) নির্ম্মম ভাবে তাদের ধ্বংস করা হবে কি না—যারা জন-সমাজের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

(খ) জমির ব্যবস্থা কি হবে। স্বত্ব কাদের হবে ?

(গ) কলকারখানার মালিক কে বা কারা হবে ?

(ঘ) জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি কি হবে ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পেলে আমরা তার বিচারের পূর্ণ অধিকার চাই। সুবিধাবাদী সর্ব্বত্র আছে। জাতীয় মহাসভার এই সুবিধা-বাদীদের স্বরূপ প্রকাশ করবার দায়িত্ব জাতীয় মহাসভার। জনসাধারণ সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে সুবিধাবাদী হীন ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে বিতাড়িত করবার [illegible]

জাতীয় মহাসভার দোষ ত্রুটী এবং আদর্শগত বিচ্যুতি সংশোধন করবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষিত নরনারীকে সঙ্ঘে প্রবেশ করতে হবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পরিচালনার কাজে যুক্তিপূর্ণ মতামতগুলি কার্য্যকরী করতে হবে। কংগ্রেসে অসৎ ব্যক্তিরাও আছে, এবং বহু কংগ্রেসকর্ম্মী আছেন যাঁরা স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এই সমস্ত লোকের জন্য কংগ্রেসকে বর্জ্জন করা অথবা বিদেশে তাকে হীন প্রতিপন্ন করাকে আমরা ঘৃণ্য মনে করি। কারণ, এই সঙ্ঘ ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বুকের রক্তে তৈরি। হীন ব্যক্তিদের স্বরূপ প্রকাশ করতে হবে এবং আদর্শগত ত্রুটী যদি কিছু থাকে তা বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যে সংশোধন করতে হবে। কংগ্রেসের অশিক্ষিত (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলছি না, বলছি স্বাধীনতার মোটামুটি ধারণার শিক্ষাকে) কর্ম্মীদের শিক্ষিত করে নিতে হবে।

কংগ্রেসের বহু কর্ম্মী, বিশেষ করে যাঁরা অমানুষিক অত্যাচার ও দুঃখ সহ্য করেছেন এবং তার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন তাঁরা স্বরাজ অর্থে 'ধনিকরাজ' বলেন না ও চান না। কংগ্রেসে এমন অনেক আছে যারা জাতীয়তাকে ধনিকরাজ প্রতিষ্ঠার অছিলায় ব্যবহার করতে চায়। প্রত্যেক প্রকৃত কর্ম্মীর প্রধান কাজ শেষোক্ত লোকগুলিকে কংগ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য করা অথবা তাদের বিতাড়িত করা। উপায়—(১) জনমত সৃষ্টি (২) শিক্ষিত নূতন কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতির সমালোচনা কর্ম্মীরা করবেন এবং সে স্বাধীনতা প্রত্যেক কর্ম্মীর থাকা চাই।

জনসাধারণ নিজেদের দাবী জানাবেন।

প্রত্যেক নর-নারীর জন্য চাই খাদ্য বস্ত্র উপার্জ্জন করবার শিক্ষা, যোগ্যতা, ও প্রত্যেকের জন্য যথাসম্ভব আরাম।

প্রত্যেক নরনারীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা চাই এবং বিচার করবার অধিকার চাই।

ধর্ম্ম বা অর্থনীতির সাহায্যে অপরের ক্ষতি করবার অধিকার কারো থাকবে না।

আমরা চাই এমন রাষ্ট্রের আদর্শ যা জনসাধারণকে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে শিক্ষিত করবে।

সংক্ষেপে সমস্ত বলার চেষ্টা করলেও বলা যায় না। এ সম্বন্ধে আলোচনা আরো ব্যাপক করা চাই।

লুজোঁ

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে লুজোঁ সব চেয়ে বড় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফরমোসা থেকে এর দূরত্ব মাত্র ২২৫ মাইল আর হংকং থেকে মাত্র ৪৮৫ মাইল।

জমি অতি উর্ব্বরা, চাষবাসের পক্ষে খুবই উপযোগী। তা ছাড়া সোনা, লোহা, ক্রোম, পিতল, কাঠ ইত্যাদি এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। জনসংখ্যা ৭,৩৭৫,০০০।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যেতে হলে লুজোঁয় অবতরণ করাই সব চেয়ে সুবিধা। বহু শতাব্দী ধরে এই পথেই ফিলিপাইন আক্রমিত হয়েছে। চীনা, স্পেনীয়, ডাচ, বৃটিশ, আমেরিকান সকলেই এই পথেই ফিলিপাইন আক্রমণ করেছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জাপানীরাও এই লুজোঁ দ্বীপেই অবতরণ করে ফিলিপাইন অধিকার করে।

ফিলিপাইন অনেক যুদ্ধ দেখেছে কিন্তু এই বারকার মত ভীষণ কোনোটাই নয়। জলে, স্থলে, নভস্তলে সব দিক্ দিয়ে শত্রুর আক্রমণ।

ফিলিপাইনের সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, যাকে বলে টাইফুন। সেই জন্য জলপথে সেখানে যাওয়া বেশ বিপজ্জনক। তার পর আবার ভয়ানক কুমীরের উপদ্রব।

একজন সার্ভে অফিসার একবার একটা কুমীরের পাল্লায় পড়ে জীবন হারাতে বসেছিলেন। সমুদ্রের ধারে যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি কাজ করছেন. এমন সময় এক প্রকাণ্ড কুমীর এসে ট্যাণ্ডের এবং তাঁর পা একসঙ্গে কামড়ে ধরে। ষ্ট্যাণ্ডের পা'র ছুঁচলো মুখটা গলায় ফুটে যেতে কুমীরটা বিকট্ চীৎকার করে প্রকাণ্ড হাঁ করে। সেই সুযোগে তিনি পা ছাড়িয়ে পালান। ভদ্রলোকের খুবই উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহস ছিল বলতে হবে, নইলে সে যাত্রা তিনি কিছুতেই রক্ষা পেতেন না।

গ্রীষ্মের সময় লুজোঁ উপত্যকায় তবু চলাচল সম্ভব, কিন্তু বর্ষাকালে একেবারে অসম্ভব। এত বেশী জলাভূমি যে একটু বৃষ্টি হলেই, বাস—রাস্তা বন্ধ। আর তেমনি মশার উপদ্রব। এখন অবশ্য অনেক পাকা রাস্তা হয়েছে। শুধু পাকা রাস্তাই নয় অনেক জলাভূমি ভরিয়ে সমতল ও কঠিন করে দিব্য সহর উঠেছে। এয়ার-কুলড হোটেল, নিওন লাইট, খবরের কাগজ, রেডিও ব্রডকাষ্টিং, সিনেমার ষ্টুডিও কি নেই সেখানে! এমন কি মেয়েদের বিউটি পার্লার পর্য্যন্ত আছে।

এখানকার লোকেরা বেশ সাহসী ও কর্ম্মী। অধিকাংশই ইংরেজী কথা বলতে পারে। প্রায় বারোখানা দৈনিক খবরের কাগজ ইংরেজীতে ছাপা হয়।

ফিলিপিনেরা খুবই আধুনিক হয়ে পড়েছে। পোষাক পরিচ্ছদ সব য়ুরোপীয়। মেয়েদের বব করা চুল, ছোট স্কার্ট, হাই হীল জুতো, ভ্যানিটি ব্যাগ, মুখে পাউডার রুজ এমন কি নখে পর্য্যন্ত রঙ!

ছেলেরা বিদেশী রঙচঙে ছবিওয়ালা কার্টুন আর গল্প পড়তে ভালবাসে। মেয়েরা ফ্যাসান, ষ্টাইল, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পত্রিকা পড়ে। কোন মতে তারা যেন অন্য দেশের চেয়ে ফ্যাসানে পেছপাও না থাকে।

বাঁশ ও পামপাতা দিয়ে তৈরী টুপী,—হলিউডকেও হার মানায়

লুজোঁর আধুনিক ট্রেন

বেস বল আর বাস্কেট বল খেলার চলন ওখানে খুব বেশী।

অনেকগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আগে সে সব গুলিতে কেবলমাত্র ছেলেরাই পড়তে পেত, এখন মেয়েরাও পড়ে।

মেয়েদের জন্ত আলাদা কলেজ নয়—কো-এডুকেশন। খেলা-ধুলা, নাচ, গান, থিয়েটার, ডিবেটিং সোসাইটী সবেতেই ছেলেরা এবং মেয়েরা একসঙ্গে যোগদান করে।

শুকর দাঁতের কণ্ঠহার, পাতার ঘাঘরা, স্বাস্থ্য থাকলে তাতেও মানায়

আগে ওদেশের মেয়েরা কখনও খবরের কাগজ পড়ত না, কারণ লেখাপড়াই বিশেষ জানত না। রাজনৈতিক এবং জোটাজোটির ব্যাপার তো বুঝতই না। আজকাল প্রত্যেক মেয়েটি খবরের কাগজ পড়ে। নাগরিক অধিকার চায়। শেষ নির্ব্বাচনে প্রায় ৫০০,০০০ মহিলা ভোট দিয়েছে।

দক্ষিণ লুজোঁর লেগাস্পি সহরের মেয়োঁ আগ্নেয় গিরি

ট্রাফিক সাইন ধাক্কা লেগে উল্টে গেলে আবার সোজা হয়ে ওঠে
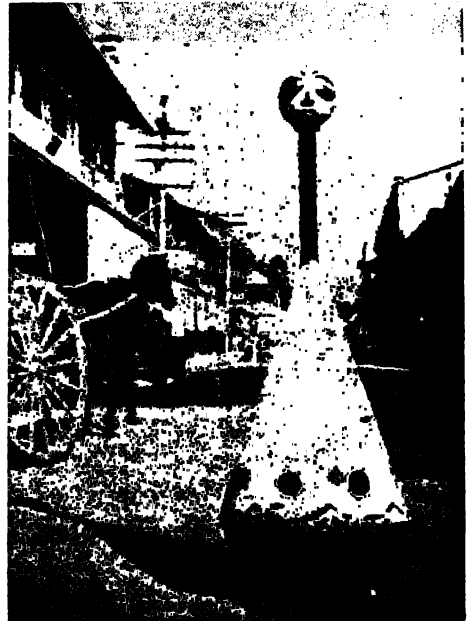
আগে যেখানে চলত গরুর গাড়ী এখন সেখানে মোটর, ট্রাম বৈদ্যুতিক বাস ইত্যাদি চলাচল করে। লুজোঁর পাকা রাস্তা দৈর্ঘ্য প্রায় ১,২৫০ মাইল। ১০০ মাইলের ওপর রেল-লাইন।

লুজোঁর এক নিগ্রো পরিবার

লুজোঁর রাস্তায় যদি কেউ মানুষ অথবা জন্তু চাপা না দিয়ে মোটর চালাতে পারে তবে সে জগতের সর্ব্বত্র নিরাপদে মোটর চালাতে পারবে। রাস্তায় ছোট বড় ছেলে-মেয়ে, কুকুর, ছাগল এমন্ ভাবে ঘুরে বেড়ায় যেন বাড়ীর উঠান। কেউ হয় ত' রাস্তায় খেলাঘর করে বসে গেছে। কাছেই কুকুর ছাগল বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ হয়ত' দিব্য রাস্তায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। রোড সেন্সের একান্ত অভাব। লুজোঁর হট ক্যাগায়ন উপত্যকায় জগতের শ্রেষ্ঠ তামাক পাতা জন্মায় যার থেকে বিশ্ববিখ্যাত ম্যানিলা চুরুট এবং সিগারেট তৈরী হয়।

লুজোঁর নারিকেলকুঞ্জ বিখ্যাত। প্রায় ১,০০০,০০০ একর জমী ঘিরে নারিকেল গাছ। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকায় যে সাবান তৈরী হ'ত তার প্রায় সমস্ত তেলই যেত লুজোঁ থেকে। সেখানকার অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ লোক নারিকেল জাতীয় শিল্প দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যেমন, তেল, দড়ি, কাছি ইত্যাদি।

তার পর লুজোঁর চিনি। মার্কিণ তার প্রধান খদ্দের। লুঁজোর সোনার খনি বহু মার্কিণ আর ফিলিপিনোকে কোটিপতি করেছে। সেখানকার পাহাড়ী এলাকায় সোনার খনির ছড়াছড়ি। কেবল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দেই লুজোঁর খনি থেকে যা সোনা তোলা হয়েছে, তার দাম ৩০,৮৫০,০০০ ষ্টার্লিং। তার মধ্যে ২১,০০০,০০০ ষ্টার্লিং এসেছে পাহাড়ী এলাকার খনি থেকে। গাঁজাও এদেশে বিলক্ষণ উৎপন্ন হয়। এক কথায় প্রাকৃতিক সম্পদ্ হিসেবে লুজোঁকে ভূস্বর্গ বলা যেতে পারে।

কানা কড়ি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পড়ে আছে কানা কড়ি
তাকায়ে যেমন চলিয়া যেতেছি তারে অবজ্ঞা করি'—
সে যেন আমারে ফিরাইল ডাকি'
বলে বিদ্রূপে বাঁকাইয়া আঁখি,
আমার মূল্য ঠিক করে দেছে নরের শুভঙ্করী।

সুধাই তোমারে আমি,
এই পৃথিবীর কয়টা জিনিষ মোর চেয়ে বেশী দামী?
কোথা যশ মান এত সমাদর?
আজিকার শিব কালিকে পাথর,
অতীব উচ্চ প্রখর সূর্য্য কোথা চলে পড়ে নামি?

মূল্য কোথায় আহা!
পলকে হতেছে অতি দীন হীন কতই সাহানসাহা।
জগৎশ্রেষ্ঠী কত সদাগর,
টাকার কুমীর, সোনার হাঙর
ফুৎকারে সব মিলায়ে যেতেছে কই কোথা গেল কাহা?

বুঝিয়াছি আমি দেখে,
কালের নিকষে অনেকের দর আমাতেই এসে ঠেকে।
পশে না কো লোক-চক্ষুর আলো
ঘন দীনতার এ ছায়াই ভাল,
জননী আমারে আদর দেখান দরহীন করে রেখে।

এতই নিয়ে আছি
পতনের ভয় নাইকো আমার এই আশ্বাসে বাঁচি।
লক্ষ্মী না হেরে অলক্ষ্মী হায়
অলক্ষ্যে মোর পানে হেসে চায়
সোহাগ করিয়া পরাইয়া দেয় মান ভয়ে মালা-গাছি।

নেপাল

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

ভারতভূমে হিমালয়'পরে স্থাপিত নেপাল রাজ্য চিরদিন হিন্দু-স্বাধীনতার লীলাভূমি। প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক যুগ হইতে নেপালের অধীশ্বর হিন্দু নৃপতি। নেপালরাজ্যে চিরদিন নেপালাধিপ হিন্দুরাজ মহারাজ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ বিজিত হইলেও নেপালে কখনও মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভারতে 'বৃটিশরাজ নেপালরাজের বন্ধুরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। নেপালের গুর্খা সৈন্যের বীরত্ব বৃটিশসিংহের প্রশংসিত। নেপালের সঙ্গে বৃটিশ-ভারত কর্তৃপক্ষের যুদ্ধবিগ্রহের পরে শান্তি স্থাপিত হইলে নেপাল-ভূপতি বৃটিশরাজের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হন। বৃটিশসিংহ নেপালরাজকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তা'ই বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, নেপালাধিপ বৃটিশ-ভারতের অনারারি কমাণ্ডার-ইন-চিপ (প্রধান সেনাপতি)।

ভারতভূমির উত্তরাংশে নেপালরাজ্য হিমগিরি'পরে রমণীয় স্থানে সংস্থাপিত। নেপাল পার্ব্বতীয় রাজ্য বটে, কিন্তু নেপালের রাজধানী কাষ্ঠমণ্ডপ (কাটমুণ্ড) সমতল উপত্যকায় স্থাপিত এবং ঐ উপত্যকা বিংশতি মাইলব্যাপী সমতলক্ষেত্র। ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলবাস্তু নেপালরাজ্যে অবস্থিত। নেপালের অপর পার্শ্বে তিব্বত রাজ্য। হিন্দু সম্রাটগণ যখন ভারতভূমি সুশাসিত করিয়াছিলেন, তখন সময়ে সময়ে নেপাল নৃপতি ভারতের সার্ব্বভৌম হিন্দুসম্রাটের নামমাত্র অধীনতা স্বীকারে স্বীয় ক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। নেপাল ভারতসম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভারতের গুপ্তসম্রা'টগণের সুশাসন সময়ে হিন্দু-গৌরব-রবি যখন মধ্যাহ্ন গগনে দীপ্যমান্ ছিল তৎকালে নেপাল-রাজ্য মহামতি গুপ্তসম্রাটগণের করদ রাজ্যরূপে সুশাসিত হইত। ভারতসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়-পথে নেপালে উপনীত হইলে নেপালপতি কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন ও নেপাল রাজ্য করদ রাজ্যরূপে হিন্দুসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সম্রাট্‌ হর্ষবর্দ্ধনের ভারতসাম্রাজ্যে নেপালরাজ কর অর্পণে স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন। নেপালের অধিকাংশ হিন্দুগণ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিব্বতের রাজা শ্রমণা গাম্পো নেপালপতিকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার এক কন্যা বিবাহ করেন ও নেপাল কিছুকাল তিব্বতের বৌদ্ধ হিন্দুরাজের অধীনতা নামমাত্র স্বীকার করে। বঙ্গাধিপ হিন্দুরাজ মহারাজ বিজয়সেন তাঁহার অজেয় বাঙ্গালী সেনা সহায়ে নেপালপতিকে পরাজিত করিয়া কর আদায় করেন ও নেপাল নৃপতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া স্বাধীন ভাবে নেপালপতিকে রাজদণ্ড পরিচালন করিতে দিয়াছিলেন। বঙ্গাধিপ হিন্দুরাজ মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন নৃপতির বন্ধুরূপে নেপালের অধীশ্বর হিন্দুরাজ মহারাজ নান্যদেব সম্মানিত ছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুগণ নেপালবাসীর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।

প্রাচীন কাল হইতে নেপালের অধীশ্বর বর্ণাশ্রমী হিন্দু। নেপাল বৌদ্ধমত অবলম্বন করিলে নেপালে বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুর্খা নামীয় বর্ণাশ্রমী হিন্দুগণ নেপালে বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া নেপালে হিন্দুস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভারত-[illegible] নেপাল নৃপতি গৌরবে নেপালভূমে হিন্দু রাজদণ্ড এরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরিচালনা করেন যে, বৃটিশ রাজ প্রীত হইয়া নেপালের স্বাধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক নেপালপতির সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন।

নেপাল হিন্দু বৌদ্ধ নৃপতি কর্ত্তৃক শাসন সময়ে নেপালের হিন্দু বৌদ্ধগণ নেওয়ার বা নাওয়ার জাতি নামে অভিহিত হয়েন। নেপাল রাজ্যে বর্ণাশ্রমী হিন্দু শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে গুর্খা হিন্দুগণ নেওয়ারগণকে কঠোর শাসনে রাখেন। হিন্দুরাজ মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রসম্মত রাজদণ্ড পরিচালন করিতে থাকেন। তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারী হিন্দু—জাতিতে ক্ষত্রিয়। তাঁহার শাসন সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও উক্ত ধর্ম্মসম্মত রাজদণ্ড পুনরায় সগৌরবে দৃঢ়ভাবে নেপালরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণের তিরোধানে তাঁহার পৌত্র নৃপতি রাও বাহাদুর নেপালের হিন্দুরাজরূপে নেপাল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুরাজ মহারাজ রাও বাহাদুর ঘাতকহস্তে ইহলীলা সংবরণ করিলে তাঁহার নাবালক পুত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সেই সময়ে নেপালরাজ্য শাসনকল্পে মারাঠা পেশবার ন্যায় রাজশক্তিসমন্বিত প্রধান মন্ত্রিপদ সৃষ্ট হয় ও মহামতি ভীমসেন তাপ্পা নেপালাধিপ হিন্দুরাজের প্রধান মন্ত্রিপদ অলঙ্কৃত করেন। প্রধান মন্ত্রী রাজার সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজ আখ্যায় অভিহিত।

মন্ত্রী ভীমসেন তাপ্পার সুশাসন সময়ে বৃটিশ-ভারতের দুইটি জেলা নেপাল সেনা কর্ত্তৃক নেপাল রাজ্যে বলপ্রকাশে গৃহীত হয়। বৃটিশ-ভারত কর্ত্তৃপক্ষ নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ও উক্ত দুইটি জেলা বলপ্রকাশে গ্রহণে উদ্যত হইলে ঐ উদ্দেশ্যে প্রেরিত অধিকাংশ বৃটিশ সেনা নেপাল সেনা হস্তে নিহত হয়। জেনারল অক্টারলোনি ও জিলেস্‌পী নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েন। নেপালের কলঙ্গা দুর্গ জেনারেল জিলেস্‌পী আক্রমণ করেন ও নেপাল সেনাহস্তে পরাজিত হইয়া নিহত হয়েন। ইংরেজ সেনাপতি মার্টিনডেল নেপালের জয়তক দুর্গ আক্রমণ করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হয়েন। নেপালের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি হিন্দুবীর অমরসিংহের নেতৃত্বে হিন্দু সেনা বিজয়লাভে সমর্থ হয়। তখন বৃটিশ সেনাপতি অক্টারলোনি আলমোড়া নামক স্থান অধিকার করিয়া সেনাপতি অমরসিংহকে সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। নেপালের প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন তাপ্পা তরাই পরিত্যাগ করিয়া সন্ধি করেন। পরবর্ত্তী কালে হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলা নিম্নভূমি বৃটিশ ভারত কর্ত্তৃপক্ষ তরাই বলিয়া দাবী করেন, কিন্তু নেপালরাজ তাহা অস্বীকার করেন। ইহাতে পুনরায় বৃটিশ-সিংহ নেপালপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার ডেভিড অকটারলোনি দুইটি যুদ্ধে নেপালী সেনাকে পরাজিত করিলে সন্ধি স্থাপিত হয়। নেপালভূমির সিমলা, মুসুরী ও নৈনীতাল ব্রিটিশরাজ পায়েন এবং বৃটিশসিংহ তরাই নেপালের অনুকূলে পরিত্যাগ করেন।

বৃটিশরাজের অবাহিতরূপে কোন যুদ্ধ ঘোষণা নেপাল করিবে না, এই শর্ত্তে বৃটিশসিংহ নেপাল হিন্দুরাজের পূর্ব্ব স্বাধীনতা স্বীকার

করেন। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নেপাল রাজ গ্রহণ করিয়াছেন। তদবধি নেপালরাজ্য স্বাধীন ভাবে পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। মহামান্য ভারত-সম্রাট্‌কে নেপালের হিন্দুরাজ অমাত্য পাঠাইয়া উপাধি দানে ভূষিত করিয়াছেন। নেপালের প্রধান মন্ত্রী স্যার চন্দ্র সমসের-জঙ্গ রাণা ইউরোপীয় যুদ্ধবিদ্যা নিজে শিক্ষা করেন ও নেপালী সেনাকে শিক্ষা দেন। মহারাজ স্যার জঙ্গ বাহাদুর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে নেপালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপালের প্রধান মন্ত্রী হইয়া দক্ষতার সহিত নেপাল-রাজ্য সুশাসন করেন। তিনি বৃটিশ রাজকে গুর্খা সৈন্য দ্বারা সহায়তা করেন। এই হিন্দু মহাপুরুষ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন। নেপালে কলেজ, সামরিক কলেজ, মেডিকেল স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুরাজ মহারাজাধিরাজ নেপাল-নৃপতি পৃথ্বীনারায়ণের বংশসম্ভূত। নেপালের প্রধান মন্ত্রিপদও বংশানুক্রমিক।

বৃটিশ রাজত্বে বিচার-বিভ্রাট ঘটিলে স্বয়ং নৃপতি (মহামান্য ভারত-সম্রাট) বিচার করেন না—তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আদালতের জজ সর্ব্বশেষ বিচার করেন। কিন্তু, নেপালে কেহ বিচার-বিভ্রাট মনে করিলে প্রত্যাশা করিতে পারে যে, নেপালরাজ (মহারাজ) স্বয়ং সুবিচার করিবেন। বৃটিশ ভারতে ব্যবহারাজীব প্রথা যেরূপ বিচার সাহায্যকল্পে প্রচলিত, নেপালে অদ্যাপি তাহা হয় নাই। ভারতীয় হিন্দু-মহাসভা নেপালের প্রধান মন্ত্রী সমীপে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বর্ণাশ্রম লোপ করা আবশ্যক। উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, তিনি বর্ণাশ্রম রক্ষক ও বর্ণাশ্রম রক্ষাই তাঁহার ধর্ম্ম। বৃটিশরাজের মিত্ররূপে নেপালরাজ বৃটিশের সমস্ত অন্যায়ের সমর্থক এরূপ মনে করা ভুল। লর্ড রেডিং যখন ভারতের বড়লাট তখন বহু নেপালী আসামের ইউরোপীয় চা-বাগানে কুলি ছিল ও তাহারা চির-দাসত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। নেপালরাজ তাহা অবগত হইয়া এক পরিদর্শক পাঠাইয়া তাঁহার রিপোর্ট পায়েন যে—নেপালী চিরদাসত্বে আবদ্ধ। নেপালের হিন্দুরাজ বৃটিশসিংহকে নোটিশ দিয়াছিলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসামের চা-বাগান হইতে সমগ্র নেপালীকে মুক্তি না দিলে নেপাল-পতি যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। তাহাতে বৃটিশ-রাজ যথাসময়ে সমগ্র নেপালী কুলীকে মুক্তি দিয়া নেপালে পাঠাইয়া মিত্রতা রক্ষা করেন। কলিকাতায় নেপালের প্রধান মন্ত্রীর একটি গৃহ আছে, প্রধান মন্ত্রীরা বৎসরে একবার আসিয়া তথায় অবস্থান করেন।

সুবিখ্যাত পশুপতিনাথ-তীর্থ নেপালরাজ্যে অবস্থিত। ঐ তীর্থে মহাদেব শিব পশুপতিনাথ নামে পূজিত। ভারতভূমি হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী পশুপতিনাথ দর্শনে জীবন পবিত্র করেন। নেপাল রাজধানী কাঠমণ্ডপের দুই মাইল পূর্ব্বে বাগ্‌মতী নদীর পশ্চিম-তীরে পশুপতিনাথ মন্দির স্থাপিত। প্রতি বৎসর শিব-রাত্রির সময়ে পশুপতিনাথ-তীর্থে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে।

অনেকে বলেন যে, নেপাল নৃপতি সূর্য্যবংশজাত ও মেবারের মহারাণার বংশসম্ভূত। অপক্ষপাত হৃদয়ে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে—নেপাল নৃপতি মেবারের রাণা বংশীয় নহেন। হিন্দুর পরম পূজ্য, ভারতের আদর্শ সম্রাট্‌, ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার নৃপতিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র হিন্দুরাজ কুশের অধস্তন পুরুষ বলিয়া হিন্দুরাজ মহারাজাধিরাজ নেপাল নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। অযোধ্যার হিন্দু সিংহাসন হইতে হিন্দুস্থান শাসন-রত জনৈক নৃপতির পুত্র নেপাল ভূমির একাংশ শাসনে রত ছিলেন। তৎকালীন নেপাল নৃপতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও উক্ত রাজপুত্র ও তাঁহার বংশীয় সন্তানেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া চলিতেন। ঐ বংশসম্ভূত হিন্দুরাজ মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীনারায়ণ বিরাট হিন্দু সেনা সংগঠন করিয়া প্রবল শক্তিতে সমগ্র নেপাল ভূমি অধিকার করিয়া নেপালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। নেপাল নৃপতি হিন্দুরাজ মহারাজাধিরাজ রাওবাহাদুর ব্রাহ্মণকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নেপালে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুকুলে প্রচলিত। কিন্তু, সে বিবাহ পুরাকালের অসবর্ণ বিবাহ হইতেও কঠোর, নেপালে অসবর্ণ বিবাহ হইলে উচ্চবর্ণের স্বামী নিম্নবর্ণের স্ত্রীর পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন না। বঙ্গদেশের জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত বিরাট জল্পেশ্বর শিবমন্দির প্রথমতঃ নেপাল নৃপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রকাশ পায়। প্রথম মন্দির বিনষ্ট হইলে কুচবিহারের স্বাধীন হিন্দুরাজ ঐ স্থানে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের উত্তর অঞ্চল যে একদা নেপাল-রাজ স্বাধীন হিন্দু নৃপতির পতাকাধীন ছিল তাহা জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়।

শরৎ-রাণী

কাদের নওয়াজ

সবুজ আঁচলে সারা কানন হেসে,
এল, অলক দুলায়ে নভে গৌরী মেয়ে।
তারি মিহিন্ বসন ঝলে বনে-বিপিনে,
রাঙা-জবার চরণ-রেখা ফেলেছি চিনে।
সে যে, খোঁপায় হিজল পরি দাঁড়ায়ে হাসে,
নীলা-উত্তরী ওড়ে তারি থির বাতাসে।
তারে, তুষিতে পাপিয়া শ্যামা সুতান তুলে,
ফুলে, ভূঁই চাঁপা ফুল হ'য়ে কর্ণমূলে।
হের, শিউলি-মালায় তারি শোভে কবরী,
তারে, দেখি ওঠে চঞ্চলি' জলে সফরী।
আজি, অন্ন-বসন-হীন বাংলা দেশে,
[illegible] না এসে।
যার, আম্র-বনানী আর দেয় না ছায়া,
শুধু শুকায়ে মরিছে লভি' মরীচি-মায়া;
সেথা, সিংহ-আসনে চড়ি শরৎ-রাণি!
তুমি কেন এলে? হেতু তার কিছু না জানি।
যদি এলে, তবে দিতে চাও কি শুভ আশিস্,
যেথা জল বিনে শুকাইছে ধান্যেরি শীষ?
যেথা, সোনার কমল আর সোনার ফসল,
কবি-কল্পনা হয়ে আছে কাব্যে কেবল।
সেথা যদি এলে, দাও কিছু দিবার মতন,
নহিলে ও কোষাকুষি কুশের আসন,
সকলি বিফল হবে জানি গো জানি
আজি, [illegible] এল শরৎ-রাণি।

ষ্টার্লিং-পাওনা সমস্যা

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাযুদ্ধের আমলে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহনে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম রাষ্ট্র আমেরিকার আর্থিক ভারসাম্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ফ্রান্স হইয়া পড়িয়াছে দরিদ্র, ব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বতার শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। পরাজিত জার্ম্মাণী ও জাপানের স্কন্ধে ক্ষতিপূরণের ভার চাপাইয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিনষ্ট সম্পত্তি কতটা ফিরাইতে পারিবে তাহা বলা সত্যই কঠিন। ভারতবর্ষ বরাবরই দরিদ্র দেশ, মহাযুদ্ধে জড়াইয়া পড়ার জন্য তাহাকেও খরচ করিতে হইয়াছে যথেষ্ট। এই বিপুল ব্যয় ভারত সরকার আংশিক ইচ্ছামত কর বসাইয়া এবং আংশিক নিত্য-নূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু একটা মজার কথা হইতেছে এই যে, যুদ্ধের সময় ভারতের অভ্যন্তরীণ আর্থিক ভারসাম্য অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেও যুদ্ধের কল্যাণে বাহিরে তাহার আর্থিক সম্ভ্রম বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা চলে। ব্রিটেনের নিকট যে ভারতবর্ষ চিরকাল দেনাদার ছিল, বর্ত্তমানে সে ব্রিটেনের এক বড় পাওনাদার হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষের ব্রিটেনের নিকট দেনাদার থাকিবার কথা নয়। ভারতবর্ষ কাঁচা মালের দিক্ হইতে অসাধারণ সমৃদ্ধ দেশ। শিল্পজীবী ব্রিটেনকে ভারতবর্ষ বরাবরই কাঁচা মাল জোগাইতেছে। যদিও তাহারই প্রদত্ত সেই কাঁচামাল হইতে উৎপন্ন সমপরিমাণ তৈয়ারী শিল্পপণ্য সে ব্রিটেনের নিকট হইতে ক্রয় করে কাঁচা মালের হিসাবে চতুর্গুণ মূল্যে, তবু ভারতের জনসাধারণ অসীম দারিদ্র্য বশতঃ এত অল্পপরিমাণ ভোগ্যপণ্য কিনিতে পারে যে, শেষ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসরই বাণিজ্যিক গতি ভারতের অনুকূলে থাকিয়া যায়। কিন্তু এই অনুকূল বাণিজ্যিক গতি সত্ত্বেও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস ও হাই কমিশনারের অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহনে, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দের পেন্সন প্রদানে এবং ভারত সরকারের মর্য্যাদার জামিনে ব্রিটেনে সংগৃহীত ভারতীয় রেলপথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত ঋণের সুদ হিসাবে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের প্রতিবৎসর এত বেশী টাকা ব্রিটেনে পাঠাইবার বাধ্যবাধকতা ছিল যে, বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত বাদ দিয়াও ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে তাহাকে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ বিলাতে রপ্তানী করিতে হইত। যুদ্ধের কল্যাণে ব্রিটেনকে প্রয়োজনীয় পণ্য জোগাইয়া ভারতবর্ষ রেলওয়ে সংক্রান্ত কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারি শত কোটি টাকা ঋণের প্রায় চারি শত কোটি টাকা শোধ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রধানতঃ ব্রিটেনকে ধারে পণ্য জোগাইতে হইতেছে বলিয়া এই ভাবে ব্রিটেনের নিকট ভারতের এক শত কোটি পাউণ্ড বা সাড়ে তের শত কোটি টাকা পাওনা জমিয়াছে। যুদ্ধকালীন নিঃস্ব ব্রিটেন তাহার জমিদারীস্বরূপ ভারতবর্ষকে পণ্যাদির জন্য নগদ মূল্য দিতে বাধ্যতা অনুভব করে নাই, ভারতীয় পণ্যাদি গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ সরকার প্রদান করিয়াছে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে পরিশোধনীয় একপ্রকার প্রতিশ্রুতিপত্র বা ষ্টার্লিং সিকিউরিটি—, এবং এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটির বদলে ভারত সরকার নোট ছাপিয়া বা ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অভ্যন্তরীণ পাওনাদারদের সন্তুষ্ট করিয়াছেন ও প্রচুর খরচ চালাইয়াছেন। [illegible] কারণে ভারতের হিসাবে ব্রিটেনের ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের এক চুক্তি অনুসারে ভারতের যুদ্ধব্যয়ের একাংশ ব্রিটেন বহন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। এই হিসাবে এবং আমেরিকার নিকট বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তস্বরূপ ভারতের পাওনা ডলারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া ব্রিটেন পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন অফিসে সমমূল্যের ষ্টার্লিং বণ্ড জমা দিবার জন্যও এই পাওনা ষ্টার্লিংয়ের তহবিল স্ফীততর হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে নোট ছাপিতে ছাপিতে ভারত সরকার বর্ত্তমানে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থায় এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতে মোট চলতি নোটের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৭৮ কোটি টাকা; বর্ত্তমানে ইহা অবিশ্বাস্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বাজারে প্রচলিত নোটের পরিবর্ত্তে সরকারী কোষাগারে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ মজুত থাকিলে সেই নোট জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হয়, কিন্তু ভারত সরকার এই যে কাগজী ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে নোটের পর নোট ছাপাইয়া চলিয়াছেন, ইহার ফলে ভারতীয় নোটের মুদ্রামর্য্যাদা অবশ্যই ক্ষুণ্ন হইয়াছে। যুদ্ধের সময় বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ। এদেশেও বিশেষ শিল্পপ্রসার হয় নাই বলিয়া ভোগ্যপণ্য উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই, কাজেই স্বল্প পণ্য-সমন্বিত এই দেশে কাঁপাই টাকার প্রাচুর্য্য ঘটায় ভারতে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে। যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন কতকটা নিরুপায় হইয়া এবং কতকটা সহানুভূতিতে দেশবাসী ভারত সরকারের এই দুর্ব্বল মুদ্রানীতি পরিচালনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ হইবার পর অবিলম্বে এই মুদ্রানীতির ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা না হইলে এদেশের অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপ্লব অনিবার্য্য বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, যুদ্ধাবসানে অতঃপর ভারতীয় মুদ্রানীতির ভারসাম্য রক্ষা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? অবশ্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ যুদ্ধসংক্রান্ত নানাবিধ ব্যয় হিসাবে ভারত সরকারকে বৎসরে গড়ে যে ৩ শত কোটি টাকা খরচ করিতে হইতেছিল তাহার অধিকাংশই অতঃপর করিতে হইবে না, অথচ আয়ের দিক্ হইতে বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থা বাঁচাইয়া ভারত সরকার যথাসম্ভব লাভবান হইতেই চেষ্টা করিবেন। এই ভাবে যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের অর্থনীতি কতকটা আয়ত্ত করা যাইবে বলিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন। তবে একথা ঠিক যে, এই ভাবে ব্যয়সঙ্কোচ ও আয়ের হার বজায় রাখিবার চেষ্টার দ্বারা ভারত সরকার যত টাকারই সাশ্রয় করুন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনার যে পর্য্যন্ত সন্তোষজনক কোন বুঝাপড়া না হইবে, সে পর্য্যন্ত শুধু ভারতবাসীর অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার নীতি কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। লোকের হাতে যদি এগারো শত কোটি টাকার কাগজী নোট থাকে অথচ সেই নোটের পশ্চাতে মাত্র ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার সোনা বাদ দিয়া বাকী সবই কাগজী ষ্টার্লিং প্রতিশ্রুতিপত্র হয়, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তর কালের বহির্বাণিজ্যে বহু অসুবিধাগ্রস্ত এই দেশে সেই মুদ্রানীতি কখনই ভারত সরকারের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও মুদ্রানীতির সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারে না। তাছাড়া ভারত সরকারের গড়ে বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা সুদের ১৬ শত কোটি টাকার ঋণপত্রও [illegible] সরকার উদ্ধার করিবে সুযোগ নাই। এই জন্যই বাজারে

ভারতের স্বাষ্য প্রাপ্য ষ্টার্লিং পাওনা শোধ দিতে ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারকে জোর তাগিদ দেন, তজ্জন্য এদেশের হিতকামী বহু মনীষী এবং জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহ অবিরাম ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

গত যুদ্ধের পরও ব্রিটেনের নিকট ভারতের বহু টাকা পাওনো হয়, কিন্তু সেই টাকা হইতে সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ-তহবিলে ভারতের সাহায্যের নামে ১১০ কোটি টাকা ধরিয়া লইয়া দরিদ্র ভারতকে ব্রিটিশ সরকার ফাঁকী দিবার ব্যবস্থা করেন। এবার ব্রিটেনের অবস্থা আরও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটেন এবার সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের খরচ চালাইতে প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব ও বিপুল ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারত ছাড়া সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য দেশগুলির নিকট এবং আমেরিকার নিকট তাহার দেনার পরিমাণ অনেক। ব্রিটেনের যে বৈদেশিক সম্পত্তি ছিল, যুদ্ধের অপব্যয়ে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় গত যুদ্ধের পরে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্রিটেন ভারতের পাওনা সম্বন্ধে যে অন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল, এবারও তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। ভারতবর্ষ তাহার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে বঞ্চিত করিয়া যুধ্যমান ব্রিটেনকে ধারে পণ্য যোগাইয়াছিল, সেই পণ্যের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। তাছাড়া এই ভাবে সঞ্চিত প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং বণ্ড ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে লগ্নী করিয়া ভারত সরকার গড়ে শতকরা বার্ষিক ১ টাকা হারে সুদ পাইলেও এদেশে ইহার পরিবর্ত্তে ভারত সরকার যে সকল ঋণপত্র বিক্রয়ে বাধ্য হইয়াছেন তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে গড়ে শতকরা ৩ টাকা সুদের।

এই ভাবে ভারতের বৎসরে অকারণে প্রায় ২০ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে। কাজে কাজেই এখনও যদি বৃটেন ভারতকে তাহার পাওনার সবটা প্রত্যর্পণ করে, তাহাতে তাহার বদান্যতার পরিচয় যেমন কিছুই থাকিবে না, ভারতেরও তেমনি এই টাকা ফিরিয়া পাইয়া লাভের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবার কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এমনই যে, ন্যায্য প্রাপ্য এই টাকার জন্য ভারতবর্ষ অধমর্ণ ব্রিটেনের করুণাপ্রার্থী হইয়া আছে এবং ব্রিটেন যদি সত্যই শতকরা এক শত ভাগ দেনা শোধ করে আমরা তাহা কার্য্যগতিকে মহা ভাগ্য বলিয়াই মানিয়া লইব। ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের একদল লোক এবং একশ্রেণীর সংবাদপত্র নানা ভাবে ব্রিটেনের দেনার পরিমাণ হ্রাস করিয়া ভারতকে ফাঁকি দিবার জন্য অপচেষ্টা শুরু করিয়াছে। সম্প্রতি কয়েকটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র জোর আন্দোলন চালাইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে যুদ্ধকালীন পণ্য জোগাইয়া তাহার জন্য যে মূল্য ধরিয়াছে তাহা নাকি ন্যায্য নয় এবং এই হিসাবে ভারতের প্রকৃত পাওনা দাবীকৃত পাওনা অপেক্ষা অনেক কম হইবে। এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সত্য ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সুখের কথা, এই কমিটি শেষ পর্য্যন্ত ভারতের সততা সম্বন্ধেই অভিজ্ঞানপত্র দিয়াছেন। কমিটি বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র সমূহের অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময় ভারতবাসীর ক্রয়-মূল্য অপেক্ষা কম দামে ব্রিটেনকে পণ্যাদি সরবরাহ করিয়াছিল এবং এজন্য স্বল্প পরিমাণ যুদ্ধকালীন পণ্য আরও কমিয়া দেশবাসীর চূড়ান্ত অসুবিধা সৃষ্টি করিলেও ভারত সরকার তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। কাপড়ের মূল্য যখন ভারতে শতকরা অন্ততঃ ৩ শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনও ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারের নিকট কাপড়ের জন্য শতকরা ১ শত ভাগের বেশী মূল্যবৃদ্ধি দাবী করে নাই। যুদ্ধের নানা প্রয়োজনে ভারতে যখন ইস্পাত ও লৌহ অত্যন্ত দুর্মূল্য ও একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল, ভারত হইতে তখন ব্রিটিশ সরকার শতকরা মাত্র ২১ ভাগ বেশী দরেই এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই সকল লক্ষণ বিচার করিয়া কমিটি ভারতের বিরুদ্ধে বেশী দাম লইবার অভিযোগ বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

শুধু বেশী দর লইবার অভিযোগ করিয়াই নয়, অন্য ভাবেও ব্রিটেনের কোন কোন জননেতা ও পত্রিকা ভারতের পাওনা কমাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি ভারতের বহু ক্ষতি করিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধেই ভারতের জনমত। ভারতের জনমতের সুযোগ গ্রহণের আগ্রহে বিলাতের ইকনমিষ্ট পত্রিকা এই মুদ্রাস্ফীতির ভয়াবহতা কমাইবার আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে সমরব্যয় বহন সম্বন্ধে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা না কি সন্তোষজনক নয় এবং এই হিসাবে কম টাকা ধরা হইলেই মুদ্রাস্ফীতি অনেকটা সঙ্কুচিত হইতে পারে। ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ এবং 'ব্যাঙ্কর' মুদ্রামানের প্রচারক লর্ড কিনেসও লর্ডসভায় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ বেশ কিছুটা না কমাইলে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি কমান যাইবে না। বলা বাহুল্য, লর্ড কিনেস বা ইকনমিষ্ট পত্রিকার এই উপদেশ ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে অযাচিত ভাবে বর্ষিত হইয়াছে। মিঃ বিড়লা ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া যথার্থই বলিয়াছেন যে, শুধু অর্থ বাড়িয়াছে বলিয়াই ভারতে মুদ্রাস্ফীতি হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে চাহিদার তুলনায় নানা কারণে পণ্যাদির জোগান অস্বাভাবিক রকম কমিয়া যাওয়ায় এবং যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জন্যই মুদ্রাস্ফীতি সম্ভব হইয়াছে। শুধু লর্ড কিনেস বা ইকনমিষ্ট পত্রিকা নয়, বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর এবং অধুনা ব্রিটেনের 'চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার' সার জন এণ্ডারসন ভারতের পাওনা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ দেওয়া সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। ১৯৪৪ সালের ২২শে জুন সার জনকে 'হাউস অব কমন্সে' যখন 'ভারতের ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমাইয়া ঐ দেশের স্বার্থহানি করা হইবে না'—এই মর্ম্মে একটি খোলাখুলি বিবৃতি প্রদানের অনুরোধ জানান হয়, তখন তিনি নিতান্ত অসহায় ভাবেই প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করেন এবং বলেন যে, এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বারা এ ধরণের সমস্যার পূর্ণ মীমাংসা না কি সম্ভব নয়। এই ভাবে পাওনার পরিমাণ কমাইবার অপচেষ্টার কথা বাদ দিলেও ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধে ব্রিটেনের যে অনেক বিলম্ব হইবে এরূপ সম্ভাবনা এখন খুব বেশী দেখা যাইতেছে। ব্রিটেনের ও তাহার বন্ধুদের দিক হইতে এ ব্যাপারে যেরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে তাহা বিশেষ উৎসাহজনক নয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত আমেরিকার ব্রেটন উডস সহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে ব্রিটেনের নিকট ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের দাবী সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা বলেন যে, ভারত ব্রিটেনের নিকট পাওনা

অর্থ আদায় করিতে চাহিলে ফ্রান্সও জার্ম্মাণীর নিকট পাওনা দাবী করিবে, কিন্তু এই দাবী পূরিত হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য ফরাসী প্রতিনিধিদের এই যুক্তি যে হাস্যকর ও অর্থহীন, তাহা আশা করি বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। প্রথমতঃ ধনশালী ফ্রান্সের সহিত দরিদ্র ভারতবর্ষের তুলনা হয় না, কাজেই যে আর্থিক ক্ষতি ফ্রান্স সহ্য করিতে পারে তাহা ভারতের পক্ষে বহন করা একরূপ অসম্ভব বলা চলে। তাছাড়া এখানে আসল ব্যাপারের পার্থক্যও যথেষ্ট। জার্ম্মাণীর নিকট ফ্রান্সের যে পাওনার কথা ফরাসী প্রতিনিধিগণ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা মূলতঃ গতযুদ্ধের জার্ম্মাণীর নিঃস্বতায় সুযোগে গড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ ভারতবর্ষের পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া ব্রিটেনকে সাহায্য করিবার ফলে। উপরি উক্ত ব্রেটন উডস কনফারেন্সে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড কিনেস অবশ্য ঠিক এ ভাবে দাবীটি চাপিয়া দিতে চাহেন নাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং ভারতকে যথাসম্ভব ফিরাইয়া দেওয়াই উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, ব্রিটেনের বর্ত্তমানে যেরূপ আর্থিক অবস্থা তাহাতে অবিলম্বে তাহার পক্ষে এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য এত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে যে, ইচ্ছা থাকিলেও তাহার পক্ষে এখন ভারতের পাওনা শোধ করা কঠিন। যুদ্ধশেষে এখন ব্রিটেন যে সকল ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিবে, সমরপণ্য সংক্রান্ত কারখানাগুলিকে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত করিবার প্রশ্ন তাহার সহিত জড়িত থাকায় দরুণ সেই উৎপাদনের পরিমাণ এখন অবশ্যই কম হইবে। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের অনেকেরই মত এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটেন যত মালই বাহিরে রপ্তানী করিতে সমর্থ হউক, তাহা হইতে দেনাশোধের জন্য কিছুই সরাইয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন তাহাকে বাহির হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও কাঁচা মাল নগদ টাকায় কিনিতে হইবে বলিয়া বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত সমস্ত অর্থ এই হিসাবেই খরচ হইয়া যাইবে। গত বৎসর আমেরিকায় হটস্প্রিং সহরে প্যাসিফিক রিলেসন্স কনফারেন্স নামে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেও ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা লইয়া আলোচনা চলে। এই আলোচনায় ফলও আমাদের দিক্ হইতে মোটেই আশাপ্রদ হয় নাই। বহু ভারতীয় শিল্পোৎসাহী এখনও আশা করেন যে, অবিলম্বে ব্রিটেনের ষ্টার্লিং পাওনার বিনিময়ে ভারতবর্ষ ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যন্ত্রাদি আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং ফলে অল্প দিনের মধ্যেই এ দেশে যথেষ্ট শিল্পপ্রসার সম্ভব হইবে। এই শিল্পপ্রগতির স্বপ্ন দেখা স্বাস্থ্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা বাস্তবে পরিণত করা সত্যই দুরূহ ব্যাপার। উপরিউক্ত প্যাসিফিক রিলেসন্স সম্মেলনে এ-সম্বন্ধে একজন পদস্থ ব্রিটিশ কর্ম্মচারী বিশেষ হতাশাজনক মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, ভারতবাসী যদি অল্প দিনের মধ্যে ব্রিটেনের ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার আশায় শিল্পপ্রগতির পরিকল্পনা রচনা করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে। *

যুদ্ধাবসান ঘোষিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিণ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঋণ ও ইজারা নীতি অনুসারে ব্রিটেনকে ধারে পণ্য সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অক্ষশক্তিকে যথাসম্ভব নির্ম্মূল করিবার জন্য ব্রিটেনের জয়ে নিজেদের স্বার্থ উপলব্ধি করিয়াই আমেরিকা এই পণ্য জোগানোর ব্যবস্থা করে, এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ায় সেই যুদ্ধকালীন নীতি চালু রাখার কোন অর্থ নাই বলিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিয়াছেন। একে যুদ্ধশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার উদ্ভবে এবং অন্তর্দেশীয় অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় ব্রিটেনকে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহার উপর বহির্বাণিজ্য পুনর্গঠনের জন্য এবং খাদ্যাদি বাহির হইতে আমদানী করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা কোথা হইতে আসিবে সে কথাও ব্রিটিশ সরকারের কর্ণধারদিগকে বর্ত্তমানে একান্ত চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী আমেরিকা ব্রিটেনকে যে ৩১১ কোটি পাউণ্ডের পণ্য সরবরাহ করিয়াছে তাহার মধ্যে ৮০ কোটি পাউণ্ডের বেশী ছিল খাদ্যসামগ্রী। এ অবস্থায় ব্রিটেনের নিজেরই জীবন ধারণ সমস্যা যখন সুতীব্র হইয়া উঠিল, তখন তাহার পক্ষে ভারতের আর্থিক স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হইয়া ষ্টার্লিং-পাওনা পরিশোধের আশু ব্যবস্থা করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না। তবু যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হইত এবং তাহার দাবী জানাইবার মত শক্তি থাকিত, তাহা হইলেও ব্রিটিশ সরকার হয়তো নিরুপায় ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াও চেষ্টা করিত পাওনাদার ভারতবর্ষকে খুসী করিতে, কিন্তু ভারত পরাধীন বলিয়া এবং ভারত সরকার একান্ত ভাবে তাঁহাদের হাতধরা বলিয়া ভারতের নিকট ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে বিশেষ চিন্তান্বিত বলিয়া মনে হইতেছে না।

সম্প্রতি ভারত হইতে এক দল শিল্পপতি ইংলণ্ড ও আমেরিকা সফরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পপ্রসারের জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কুশলী শিল্প-শ্রমিক সংগ্রহ করা। ইংলণ্ডে তাঁহারা উৎপাদন হ্রাসের অজুহাতে একরূপ অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং আমেরিকায় একেবারে অস্বীকৃত না হইলেও প্রয়োজনীয় ডলার হাতে না থাকায় জন্য যন্ত্রাদি ক্রয়ের কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ সরকার এম্পায়ার ডলার পুলের কল্যাণে ভারতের পাওনা ডলারগুলি আত্মসাৎ করিয়া পরিবর্ত্তে সমমূল্যের ষ্টার্লিং সিকিউরিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় জমা রাখিয়াছেন। অথচ ভারতে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালের শিল্পপ্রসারের জন্য মার্কিণ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অসামান্য হওয়ায় এই ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের দিক হইতে মারাত্মক হইয়াছে। প্রকাশ, ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা যাহাতে ব্রিটেন যথাসম্ভব শোধ করে, অথবা অন্ততঃ এই দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটির একাংশ ডলারে রূপান্তরিত করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার অনুমতি দেন, আমেরিকার শিল্প

---

* The Indians are basing their plan for the industrialisation of their country on their ability to get within an early period the repayment of their balances in London and the rest of the Empire, they will be disappointed."

প্রতিষ্ঠানগুলি, এমন কি মার্কিণ সরকারের বাণিজ্য বিভাগ পর্য্যন্ত নাকি এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ব্যবসায়িক স্বার্থে মার্কিণ শিল্পপতিগণ বা মার্কিণ সরকার যদি সত্যই এই চেষ্টা করেন এবং এই চেষ্টায় যদি তাঁহারা অন্তত: কতকটা সাফল্যলাভ করেন, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বহু পরিমাণে উপকৃত হইবে।

ব্রিটেন এত দিন ভারতকে যে ভাবে শোষণ করিয়াছে তাহার একটি নিজস্ব বৃহৎ ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষ গতযুদ্ধে ব্রিটেনকে প্রচুর অর্থ, বহু সৈন্য এবং অগাধ পরিশ্রম জোগাইয়াছিল, কিন্তু বিজয়ী ব্রিটেন শেষ পর্য্যন্ত এই বিরাটদানের পরিবর্ত্তে তাহার কোন উপকারই করে নাই। এবারের যুদ্ধেও ভারত যে চরম দুঃখভোগ করিয়া ব্রিটিশ সরকারকে এত সাহায্য করিয়াছে এবং অসহায় ব্রিটেনকে প্রচণ্ড প্রয়োজনের সময় ধারে পণ্য জোগাইয়া বাঁচাইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট মনে করা উচিত। এখন যুদ্ধশেষে ব্রিটেনের অসুবিধা যতই হউক, যুদ্ধজয়ের গৌরবে তাহার সমস্ত দীনতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অথচ এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানা চাপে ভারতবর্ষ হইয়া পড়িয়াছে সকল দিক্ হইতে নিঃস্ব। সোনার সহিত সম্পর্কহীন প্রায় ১১ শত কোটি টাকার নোট বাজারে ছড়াইয়া থাকা ছাড়াও ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের শেষে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬০৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। এখন ভারতের মুদ্রানীতিতে শৃঙ্খলা আনিতে, ভগ্নপ্রায় আর্থিক বনিয়াদ পুনর্গঠন করিতে এবং সুতীব্র বেকার সমস্যার সমাধান করিতে ভারতের একমাত্র আশা ব্রিটেনের নিকট পাওনা ষ্টার্লিং-সম্পদ। সুতরাং যুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে সর্ব্বস্ব দিয়া সাহায্য করার পর এখন আবার তাহার আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার যদি পাওনা আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভারতকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইবেন। ব্রিটেনের দিক হইতে দুর্দ্দিনের বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা হিসাবেও প্রতিদানে ভারতের কিছু উপকার করা উচিত। সাম্রাজ্যভোগী হিসাবে বিজয়ী ব্রিটেন হয়তো পরাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই সকল উচিত অনুচিতের প্রশ্ন স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করিবে না, কিন্তু ভারত হইতে যে পণ্য গ্রহণ করিয়া বৃটেন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং যে পণ্য হাতছাড়া করিয়া ভারতবর্ষ তাহার লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিবার সহিত ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিয়াছে সেই পণ্যমূল্য প্রদানের সময় কোনরূপ শঠতার আশ্রয় গ্রহণ কেহ আশা করিতে পারে না। ব্রিটেন যত অসুবিধা ভোগ করুক, যুদ্ধজয়ের স্বার্থ তাহার অসুবিধার চেয়ে অনেক বড়। সুতরাং বিজয়ী ব্রিটেনের নিকট হইতে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে পরাধীন এবং দরিদ্র ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের যে কোন দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন অসঙ্গত হইবে না। মোটের উপর, ভারত সরকারের দায়িত্ববোধ এবং ব্রিটিশ সরকারের সততা জ্ঞানের উপরই বর্ত্তমানে ভারতের দেড় হাজার কোটি টাকা পাওনা আদায়, তথা অসংখ্য দরিদ্র ভারতবাসীর আর্থিক স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতেছে।

শকুন্তলা

শ্রীঅজিতকুমার বসু-মল্লিক

হোমাগ্নি বিভূতি নয় কজ্জলের ঘন কাল লিখা
অঙ্কিত নয়নকোণে—মদনের অব্যর্থ সন্ধান
আশ্রম-বালিকা নহে মেনকার কামনার শিখা
দুকূল প্লাবিয়া ছোটে লালসার সর্বগ্রাসী বান।

আশ্রম-পাদপতলে পুষ্পভার-অবনতা লতা
শাখা সম বিস্তারিয়া সুকুমার দুটি বাহু-ডাল
যৌবনের মধু গন্ধে আহ্বানি পাঠায় বারতা
পুরুষের মনভৃঙ্গে চিরকাল করে সে মাতাল।

পীনোন্নত যৌবন তার বল্কলের সর্ব গ্রন্থি টুটি
প্রকাশ করিতে চায় আপনার ঐশ্বর্য্যসম্ভার
পুরুষের স্পর্শ লাগি আজি সে যে উঠিয়াছে ফুটি
দুষ্মন্তের বুকে জ্বলে তারই লাগি অগ্নি কামনার।

সহকার তরুতলে জ্বলে ওঠে রূপ-বহ্নি-শিখা
বসন্তের দোলা লাগে তপোবন শিহরিয়া ওঠে
উজ্জয়িনী উপবনে তালভঙ্গে কাঁপে নিপুণিকা
মন্মথ-কার্ম্মুক হস্তে অনর্গল অগ্নিরাশি ছোটে।

গুণ্ঠনের অন্তরালে লজ্জানতমুখী সভা মাঝে
রাজ-কুলবধূ নাহি প্রকাশিতে পারে আপনায়
পতির বিস্মৃতি তার বুকে আজ শেলসম বাজে
মিলনের মধুচিত্র ব্যর্থতায় ম্লান হয়ে যায়।

—আশ্রম-পাদপ নয়, সর্বদমনের তারা ভ্রাতা
কলসের জল নয়, মাতৃবক্ষ-সুধার সিঞ্চন
ইঙ্গুদির তৈল দেয় স্নেহে কুশ-ক্ষতে—মৃগমাতা,
মৃত্তিকার বেদী 'পরে মুনিকন্যা রচে আলিম্পন।

মানুষের উত্তরাধিকার ও ভবিষ্যৎ

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের জন্ম আজ বেশী দিন নয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ ক্রমোন্নতির পথে বহু দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন হয়নি তার উন্নতি, তাই জগতে এত অসামঞ্জস্য, এত বিরোধ, এত দুঃখ-কষ্ট। পূর্ণাবয়ব মানবতা লাভ তাকে অদূর ভবিষ্যতে করতে হবে—তা যদি সে না পারে তাহলে তাকে জীব-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়া যাবে না।

মানুষের ভবিষ্যৎ কতখানি আশাপ্রদ, কতখানি সমুজ্জ্বল, তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে মানুষের চরিত্রগত বিশেষত্বকে—অধ্যয়ন করতে হবে তার জন্মকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের ধারাকে—উপলব্ধি করতে হবে প্রকৃতির সাথে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধকে—কল্পনা করে নিতে হবে তার ভবিষ্যতের আদর্শকে।

উপরের বিষয়গুলি আজ ক্রমেই নতুন ভাবে আলোকিত হচ্ছে জীবতত্ত্বের (Biology) এবং পদার্থবিজ্ঞার (Physics) বহুমুখী আবিষ্কারের দ্বারা। জীবতত্ত্বের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, মানুষকে স্বাভাবিক ক'রে গড়ে তোলা অর্থাৎ সংক্ষেপে, সবল, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান, সৎ ও সুখী করা। এই কয়টি বিষয় নিয়ে মানুষের জীবন ও চরিত্র গঠিত।

চরিত্রগত পার্থক্যের কারণ

বৃক্ষশিশু ঘুমিয়ে থাকে ক্ষুদ্র বীজের আশ্রয়ে। কিন্তু সেই ভ্রূণাবস্থায় তার মধ্যে লুকানো থাকে তার চরিত্রগত পার্থক্য ও বিশেষত্ব। বীজ সবল হতে পারে দুর্ব্বলও হতে পারে। দুর্ব্বল মানে যে শিশুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণগুলি অনুপস্থিত তা নয়—আসলে কতকগুলি গুণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন পুরুষে (generation) ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় (dormant বা recessive),—বাকিগুলি হয় কার্য্যকরী (active or
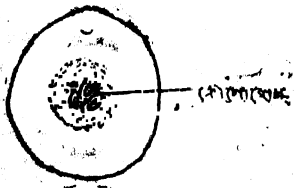
জীবকোষের (স্ত্রীবীজ) ক্রোমোজোম্ জীনের সারি

dominant)। যার মধ্যে খারাপ চরিত্রগুলির কার্য্যকরীর সংখ্যা ভাল চরিত্রগুলির কার্য্যকরীর সংখ্যার চেয়ে বেশী হয়, তাকেই আমরা অস্বাভাবিক, অসৎ ইত্যাদি বলে থাকি। পুরুষ এবং স্ত্রী-বীজের কোষের (cell) মধ্যে কতকগুলি টুকরা সুতার মত জিনিষ থাকে, সেগুলিকে বলা হয় ক্রোমোজোম্। মাতার ও পিতার উৎপাদনের বীজ মিলনের ফলে এই ক্রোমোজোম্গুলির যোগাযোগ হয়—এইগুলিই হচ্ছে বংশগত চরিত্রের পরিবাহক (Bearer of hereditary characters)। এইগুলির মধ্যে সার সার ছোট ছোট অণু সাজানো থাকে। এক একটি অণু এক একটি চরিত্র এবং দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের জন্ম দায়ী। এ গুলিকে বলা হয় জীন্ (gene)। জীনতত্ত্বকে বলা হয় Genetics বাংলায় আমরা Geneticsকে জন্মতত্ত্ব বলতে পারি। এই অণু-গুলির কতকগুলি কার্য্যকরী থাকে। কতকগুলি ঘুমিয়ে থাকে। এই ভাবে মানুষের চরিত্র এবং দেহ গড়ে ওঠে।

নানা কারণে জীনের নানা পরিবর্ত্তন হতে পারে। যাই হোক এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীনের ওপরই সোজাসুজি ভাবে (directly) আমাদের গঠন ও চরিত্র নির্ভর করে। তাই জীনকে যদি আমরা আমাদের করায়ত্ত করে ইচ্ছামত অদল-বদল করতে পারি তাহলে মানুষকেও আমরা ইচ্ছামত গড়তে পারি। বিরাট মানব-সমাজের মূলে হচ্ছে ক্ষুদ্রতম অণুর সমাজ—তাই বিরাটের উন্নতি করতে হলে আগে করতে হবে ক্ষুদ্রতমের উন্নতি। দেহকে স্বাস্থ্যবান্ করতে হলে যেমন প্রত্যেকটি মাংসপেশীর ব্যায়াম আবশ্যক—সমাজের উন্নতি করতে হলে ঠিক তেমনই প্রত্যেকটি মানুষের চরম উন্নতি আবশ্যক।

কালো ও পাঁশুটে ব্যাঙাচি একত্রে

উত্তরাধিকারের প্রতিযোগিতা

জীনগুলির সংখ্যা আপনা থেকে বেড়ে চলে—সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয় তাদের আকৃতি প্রকৃতি, আয়তন, গঠন ও ধর্ম। তাদের পরিবর্ত্তনকে বলা হয় mutation। তার পর তাদের মধ্যে চলে বুদ্ধিমূলক প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় যারা পরাজিত হয় তাদের অস্তিত্ব হয়ে যায় বিলুপ্ত। যারা জয়ী হয় বার বার পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে তারা নব নব চরিত্রের সৃষ্টি করে—সৃষ্টি করে নব নব জাতির। পরিবর্ত্তন যে সব সময়ই উন্নতির নিদর্শন তা নয়, বরং ক্ষতিকর পরিবর্ত্তনই বেশী দেখা যায়—ফলে অযোগ্য জীনের সৃষ্টি হয় বেশী এবং তারা শেষ পর্য্যন্ত বাঁচে না। এই ভাবে অসংখ্য জীন মরে যায়—বেঁচে থাকে অল্পসংখ্যক উন্নতিশীল জীন, তারাই প্রকৃতির অগ্নিপরীক্ষার কৃতী সন্তান। জীন-জগতের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিবিম্ব আমরা দেখি মানব-জগতে। সেখানেও মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে সংঘাত, বিরোধ এবং প্রতি-যোগিতা। অসমর্থের স্থান সেখানেও নেই—আবার আজ যে সমর্থ কাল সে হতে পারে অসমর্থ, এবং কাজে কাজেই বিলুপ্ত। জীন, মানুষ, বা কোন বিশিষ্ট সময়ের সমাজ, তাদের জন্ম নির্দ্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ ফুরোলেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়—যত দিন তার প্রয়োজন তত দিন প্রকৃতি তাকে দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়ে নেন—তার পর তাকে দেন সরিয়ে।

দোষের কারণ নির্ণয়

চরিত্রগত বা গঠনগত দুর্ব্বলতা বা অস্বাভাবিকতা প্রায় সকলের মধ্যেই কিছু-না-কিছু আছে। অনেক রোগের (ailments) বাহ্যিক প্রকাশ হয়তো প্রায় একই রকম কিন্তু তাদের মূল নিহিত থাকে বিভিন্ন উত্তরাধিকার সূত্রে (different hereditary

cause)। তাই এই রোগীদের ওষুধ খাইয়ে আরোগ্য করার আগে রোগের মূল জন্মতত্ত্বের সাহায্যে নির্ণয় করা দরকার। যদিও তার পরের বংশে আবার সেই রোগ দেখা দেবে এবং সে রোগকে আবার আরোগ্য করতে হবে ; কেন না, সে রোগের বংশগত মূল বীজের মধ্যে (Sperm) থেকে যাবেই। যা হোক এদিকে বিজ্ঞান অনেকখানি উন্নতিলাভ করেছে। থাইরক্সিন্, এড্রিন্যালিন্ ইত্যাদির দেহের ও মনের ওপর প্রভাব আজ প্রমাণিত।

কৃত্রিম উপায়ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইঁদুরের যৌন পরিণতি (maturation) ঘটানো গিয়াছে—অস্ত্রোপচার করে পাখির লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয়েছে। এগুলি যখন সম্ভব, তখন ভ্রূণের উপর আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আরো সুফল পাওয়া যেতে পারে। ল্যাবরেটারীতে পুরুষ-বীজের সাহায্য না নিয়ে ব্যাঙাচির সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। পিঁপড়া উই-পোকারা, কৃত্রিমভাবে পাপিণ্ডিক ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ভ্রূণের থেকে প্রয়োজন মত রাণী, শ্রমিক বা সৈনিক তৈরী করতে পারে। এক দিন মানুষও যে এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবে না তা কে বলতে পারে ? কৃত্রিম উপায়ে গর্ভধারণের পরীক্ষা আজ কৃতকার্য্য ! রাজা, রাণী, অভিজাত, সৈনিক সকলকেই মানুষ যে এক দিন শ্রমিক পর্য্যায়ভুক্ত করতে পারবে না তারই বা প্রমাণ কি ? অনেকে খাটবে, ২।৪ জন তাদের খাটুনী ভাঙিয়ে ফূর্ত্তি করবে কেন ?

সাধারণ অবস্থায়—মাছ—এট্রোপিন সালফেট প্রয়োগে

মিঃ হ্যাল্যান্ বলেছেন যে, এমন এক দিন শীঘ্রই আসবে যখন মানব-ভ্রূণকে গর্ভের বাইরেই পালন করা যাবে। এই ভবিষ্যৎ উক্তি যেদিন সম্ভব হবে সেদিন আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীন ও ক্রোমোজোম্ পরীক্ষা করে উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ভ্রূণগুলিকে বেছে নিয়ে ইচ্ছামত গড়ে নিতে পারিব। অবশ্য যত দিন না জীনগুলির রাসায়নিক ধর্ম্ম (Chemical properties) ও প্রতিভাগুলিকে আমরা আয়ত্ত করতে পারবো তত দিন কৃত্রিম উপায়ে তাদের পরিবর্ত্তন (mutation) করে, খারাপগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে বা নষ্ট করে ভালগুলিকে জাগিয়ে তুলে ক্রমোন্নতির পথ (evolution) পরিষ্কার করতে পারবো না। সমাজের ক্রমোন্নতি করতে হলেও ঠিক এই ভাবে আমাদের সমাজের ধর্ম্ম ও গঠনকে আয়ত্ত করতে হবে আগে—তার পর তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্রমোন্নতির অণুগুলিকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ করতে হবে কলুষের অণুগুলোকে।

উন্নতির পদ্ধতি

জাতির বীজের উন্নতি করতে হলে প্রথমে বিভিন্ন জাতির এবং বংশের বীজগুলোর জন্মতত্ত্বের সাহায্যে এবং জাতির অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যোগাযোগ ঘটাতে হবে (Hybridisation)। যে দেশের জলহাওয়া, মাটী, চাষ-বাস যে রকম, সেই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নূতন বংশ সৃষ্টি করতে হবে। যেমন বাঙ্গালাদেশে সৃষ্টি করতে হবে এমন জাতি যার শরীরের পক্ষে মাছ ভাত হয় উপযোগী, রুটী ডাল নয়। পাহাড়ে দেশের জাতির পা যেন সবল হয়, ফুসফুস যেন সবল হয়, নদনদীপূর্ণ দেশের লোকেরা যেন সন্তরণ-পটু হয়, এই সব দেখতে হবে। পরিবর্ত্তন ঘ'টে ভবিষ্যতে বহু নব জাতির সৃষ্টি করবে। জন্মতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে এক সোভিয়েট কৃষিতাত্ত্বিক গমের ওষধিকে তরুতে পরিবর্ত্তিত করেছেন। বছর বছর আর গমের বীজ বপন করতে হবে না। এইখানেই হোল বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার।

দুর্ব্বলের জননশক্তি নাশ ?

আজ জন্মতত্ত্বের সাহায্যে রঞ্জনরশ্মির দ্বারা মাছির রূপ ও গুণকে এমন ভাবে বদলানো সম্ভব হয়েছে যে তাকে মাছি বলে চেনা যায় না। স্তন্যপায়ী জীব ও মাছির জন্মসূত্রের নিয়ম যখন একই রকম তখন মানবতার ও সভ্যতার পথে মানুষের রূপান্তরই বা কেন সম্ভব হবে না ? মানুষ সভ্যতার যতই বড়াই করুক আসলে প্রস্তরযুগের সভ্যতা থেকে কতটুকুই বা এগিয়েছে ? জীববিদ্যাকে কতটুকুই বা মানুষ কাজে লাগাতে পারছে ? দেহের ভিতরে যে জীন-পরিবর্ত্তনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে তার দ্বারা সে অবনতির মুখেই কি এগিয়ে যাচ্ছে না ? যাঁরা মনে করেন যে দুর্ব্বলচিত্তের সংখ্যা হ্রাস ও সবলচিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধিই জীনতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য, তাঁরা ভুল করেন অনেকখানি। তাঁরা দুর্ব্বলচিত্তের লোকদের ওপর অস্ত্রোপচার করে উৎপাদনশক্তিকে নষ্ট করে দিতে চান (castrate)। কিন্তু প্রথম কথা, দুর্ব্বলচিত্তের জীন প্রত্যেক পুরুষেই দেখা দেবে, সুতরাং পিতা, পুত্র, পৌত্র প্রত্যেকের উপরই অস্ত্রোপচার করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ, আগেই বলা হয়েছে যে কোন দুর্ব্বলতা রোগ বা দোষ মানে এই নয় যে, সেই লোকটির মধ্যে সবলতার জীন নেই। বহু সবলচিত্ত লোকের মধ্যেও রোগের বা দোষের জীন আছে এবং যে কোন পুরুষে তারা জেগে উঠতে পারে। তারা পিতামাতার এক জনের কাছ থেকে নির্জীব জীন পায় আর একজনের কাছ থেকে পায় সবলতার জাগ্রত জীন। ফলে তারা হয় সবল। কিন্তু এই রকম পিতামাতার দুজনই যদি সন্তান উৎপাদনের সময় রোগের জীন সন্তানের দেহে বহন করেন, তাহলে পিতামাতা সবলচিত্ত হওয়া সত্ত্বেও সন্তান হবে দুর্ব্বলচিত্ত।

উত্তলিঙ্গ ড্রোসফিলা

কোন সবলচিত্ত লোকের বংশে যে কোন দিন দুর্ব্বলচিত্ত লোক

জন্মগ্রহণ করবে না এমন কোন কথা নাই। সুতরাং অস্ত্রোপচারের দ্বারা দুর্ব্বলচিত্তের উৎপাদন-শক্তিকে নষ্ট করলেই সমাজ উন্নত হবে না। কোন্ জীন কি ধরণের দুর্ব্বলতা বহন করে, সেটি আবিষ্কার করা হচ্ছে প্রথম কর্ত্তব্য। এই রহস্য আবিষ্কার হলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক স্বাভাবিক মনুষ্যের মধ্যেই দোষের জীন আছে। কিন্তু তাই বলে ত আর সকলেরই উৎপাদন-শক্তি নষ্ট করলে চলবে না। তখন আমাদের দেখতে হবে, কোন্ দোষগুলি বেশী ক্ষতিকর এবং কোন গুণগুলি মানুষের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বেশী চাই—সেই মত যোগাযোগ ঘটাতে হবে এবং সেই ভাবে ভ্রূণকে গড়তে হবে। এই ভাবে জন্মতত্ত্ব নির্ণয় (Genetical diagnosis) প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunology) প্রয়োগ করতে হবে। এ সম্বন্ধে

বীজ-সংমিশ্রণ প্রণালীর দ্বারা উৎপাদিত নানা জাতির গিনিপিগ

অস্লো জেনেটিক্যাল্ ইনস্টিটিউটে মিঃ লেভিট্ ও মিঃ গোরসেন্সান্ গবেষণা করছেন—কিছু ফলও পেয়েছেন।

তার পর আর একটি কথা হচ্ছে যে, দুর্ব্বলচিত্ত ও সবলচিত্ত, বুদ্ধিমান্ ও মূর্খ এ সব কথা হচ্ছে তুলনামূলক। বাঁদর পশুর মধ্যে অত্যন্ত চতুর হলেও মূর্খতম মানুষের তুলনায় একেবারে নিরেট। তেমনি বিচারক অধ্যাপক ইত্যাদির তুলনায় সাধারণ মানুষকে গাধা বলা চলে। আসলে বুদ্ধিপরীক্ষার (Intelligence test) ফলাফল শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ, শিক্ষা ও সুন্দর পারিপার্শ্বিকের সুবিধা অভিজাত-শ্রেণীই পেয়ে থাকেন বলে তাঁদের মধ্যে থেকে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও অধ্যাপকের সংখ্যা বেশী পাওয়া যায়। তাঁদের মস্তিষ্কে grey matter তো আর বেশী নেই। তবে তাঁদের মধ্যেও জীনগত পার্থক্য থাকে, কেন না, তাঁদের মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে এক এক জন বিশেষ অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান্ মহাত্মার উদয় হয়ে থাকে যাঁর সঙ্গে তুলনায় বিচারক ও সাধারণ অধ্যাপককে শিশু বলা চলে।

জন্মতত্ত্ব প্রয়োগের উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক

তাহলে আমরা দেখছি, উৎপাদন বন্ধ করে রোগ দূরীভূত করার চেয়ে নির্ব্বাচিত উৎপাদনের (Selective breeding) দ্বারা গুণের পরিধি বিস্তৃত করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্ত্তমান সমাজের শ্রেণীবিভাগ ও স্তরবিভাগ, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টির ফলে মুষ্টিমেয় অভিজাত ও পর-শ্রমজীবী শ্রেণী ছাড়া আর কেউ মানবতা বিকাশের সুযোগ পায় না। সুযোগ পেলে পদদলিত শ্রেণীগুলির সকলে না হোক অনেকেই জ্ঞানের উন্মেষের পথে পিছিয়ে পড়ে থাকতেন না, এ সত্যও আজ সোভিয়েটে হয়েছে প্রমাণিত। শ্রমিক-শ্রেণীর বহু লোক সুযোগ পেয়ে আজ সুপ্রীম সোভিয়েটের সভ্য নির্ব্বাচিত হতে পেরেছেন। মুচীর বংশধর ষ্টালিন্, কামারের পুত্র ভরো-শিলভ, কৃষক-বংশের টিমোশেঙ্কো আজ জগতের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে পেরেছেন। আজ যদি আমরা কৃত্রিম শ্রেণীবিভেদ ভুলে, জাতিভেদ ভুলে, পিতৃদত্ত অর্থস্তুপের মর্য্যাদা ভুলে সহযোগিতার সূত্রে সমাজ সৃষ্টি করি, তাহলে আদর্শ অবস্থার মধ্যে সূচিত হবে জনসাধারণের উন্নতির পথ। তখনই একমাত্র প্রত্যেকের ক্ষমতার ও বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। তার আগে বুদ্ধিপরীক্ষা বাতুলতা মাত্র। ছাত্রকে পাঠ্য পুস্তক দিয়ে অথচ উপযুক্ত শান্তিময় পড়বার ঘর না দিয়ে তার বিদ্যার পরীক্ষা করা ও বর্ত্তমান সমাজে বুদ্ধিপরীক্ষা করা একই কথা। বর্ত্তমান সমাজে সোজাসুজি চুরী বা ডাকাতি করলে কারাবরণ করতে হয়, কিন্তু আইনের আবরণে অতি সূক্ষ্ম কায়দায় জনসাধারণকে বঞ্চিত করে তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে বা ছিনিয়ে নিয়ে পর-শ্রমজীবীরা মহৎ আখ্যা পান। সেই অসৎ উপায়ে সঞ্চিত অর্থ থেকেই কিছু দানধ্যান করে তাঁরা ইহকালের ও পর-কালের পথ পরিষ্কার করে পুণ্যাত্মা মহাত্মা ইত্যাদি হয়ে ওঠেন। এই ভাবে যে সমাজের গঠন-ভিত্তি পাপের (crime) উপর গঠিত, সে সমাজে জীনের ক্ষমতা কতটুকু? এখানে ঘৃণ্য কাজের জন্যও যেমন কারাবরণ করতে হয় দেশপ্রেমের মহৎ আদর্শে মানুষকে ভালোবাসার জন্যও তেমনি কারারুদ্ধ হতে হয়।

দেখা গেছে যে, যুগে যুগে জীনের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপরতা, প্রাদেশিকতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিরোধ বেড়েই চলেছে। এই সঙ্কীর্ণচেতা সমাজের মধ্যে ছোটবেলা থেকে যারা গড়ে ওঠে, কার্য্য-পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। এই সঙ্কীর্ণতার মূলে আছে দেশের, প্রদেশের, জাতির ও পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যা। পিতা সম্পত্তি বণ্টনের সময় কোন পুত্রের প্রতি যখন পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন এবং তাঁর আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করেন, তখন সূচিত হয় ভ্রাতৃবিরোধ। ঠিক এই ভাবেই অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত রচনা করে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে বিরোধ—ফলে মানুষ হয়ে ওঠে নীচ সঙ্কীর্ণ। জীব বা জীবতত্ত্ব তার কোন প্রতীকার করতে পারে না। সদ্গুণসম্পন্ন জীবের অস্তিত্ব বিকল হয় বিরুদ্ধ পারি-পার্শ্বিকের দ্বারা—কলুষিত সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষের কলুষিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমরা দেখতে পাই,

কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঙের ছয়টি পায়ের সৃষ্টি

চুরী ডাকাতি ইত্যাদি অন্যায় কাজের জন্য কারাগার সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর দ্বারা। কারাগারে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোক খুব কমই চোখে পড়ে। কিন্তু তাই বলে কি বুঝতে হবে যে, কলুষিত জীন নিম্নশ্রেণীতেই পাওয়া যায়—অভিজাত-শ্রেণীতে পাওয়া যায় না? বিজ্ঞান এ উক্তির অসত্যতা প্রমাণ করেছে। সুতরাং এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, চোরডাকাতদের দুশ্চরিত্রের মূলে জীন নয়—তার মূলে হচ্ছে তার কলুষিত পারিপার্শ্বিক লালন এবং অবিচার। আর যাঁরা স্বর্ণস্তূপের ওপর বসে এই অভাবগ্রস্ত পাপীদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন, কঠিন বিচার করছেন, সযত্নে তাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলছেন, তাঁদের জীনগুলি কি সবই নির্দ্দোষ? তাঁরা তো চুরী করছেন না? এ
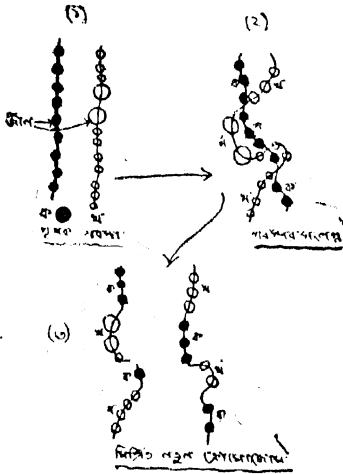
বীজকোষের মধ্যে গর্ভাধানের পর, মাতা ও পিতার দুটি ক্রোমোজোমের যোগাযোগের পর মিশ্রিত গুণাবলী-বিশিষ্ট ক্রোমোজোম তৈয়ারী হয়

উক্তি কতটা সত্য তা তাঁদের দিনকতক অভাবের তাড়নায় থাকতে বাধ্য করলেই প্রমাণিত হবে। সে অবস্থায় তাঁদের উচ্চশ্রেণীর মালমশলা দিয়ে গড়া দেহের নীল রক্ত, কিম্বা তাঁদের উৎকৃষ্ট জীন কোন কিছুই তাঁদের অসৎ পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারবে না। তাই বলছি, মানবের কল্যাণের জন্য আগে চাই সমাজের ভাঙ্গন ও পুনর্গঠন।—সব রকম সুবিধা পেয়েও যারা দোষী থাকবে তাদের আরোগ্য করতে হবে জন্মতাত্ত্বিক রোগ নির্ণয়ের দ্বারা, প্রতিক্রিয়াশীল কারাব্যবস্থার দ্বারা নয়। আজ আমরা দেখি যে সুশীল, মিষ্টভাষী, সত্যপ্রিয়, নম্র লোকের সমাজে পদে পদে বিপদ। নির্দ্দয়, কূটবুদ্ধি, লোকদের প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছে। শুধু লোক কেন, জাতির পক্ষেও এ কথা খাটে। যে জাতি যত জটিল মারণাস্ত্র আবিষ্কার করছে অর্থাৎ পাশবিকতার উপাসনা করছে তারই তত জয়-জয়কার—কিন্তু হিটলার-প্রীতি তো দস্যুপ্রিয়তারই নামান্তর। যাই হোক, এই পাশবিকতা, অন্যায়, অত্যাচারের ওপর যদি জগৎ প্লাবিত হয় এবং এই ভাবে যদি এদের বংশ পাশবিকতার পথে উন্নতি করে দেশ ছেয়ে ফেলে, তাহলে কিছু দিন পরে মানুষকে শ্রেষ্ঠতম জীব না বলে হিংস্র পশুরও অধম বলা ঠিক হবে না কি? মানুষের পূর্ণাবয়ব মানবতা লাভ না হয়ে হবে সর্ব্বাঙ্গীণ পাশবিকতা লাভ।

ভারতের প্রয়োগ ক্ষেত্র

অবশ্য এ কথা মনে করা অত্যন্ত ভুল হবে যে, চরিত্র গঠনে জীনের প্রভাব গৌণ। ভ্রূণ থেকে শিশুকালের কিছু দিন পর্য্যন্ত জীনের প্রভাবই একমাত্র প্রভাব, তার পর আসে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের প্রশ্ন। তা ছাড়া যাদের রোগ বংশগত, তারাও তাদের জীনের দ্বারা প্রভাবিত। অনেক ছেলে দেখা যায় যারা বিনা কারণে চুরী করে—প্রচুর অর্থ পেলেও তারা চুরী করে—এ স্বভাবটা তাদের মজ্জাগত। এখানেও জীনের প্রভাব। এই সব মানসিক ও শারীরিক রোগই হোল জীনতত্ত্বের সমস্যা। কিন্তু জীনতত্ত্বের পরীক্ষার উপযুক্ত বিকারহীন ক্ষেত্র আগে গড়ে নিতে হবে, তা না হলে পরীক্ষায় কোন সুফল পাওয়া যাবে না। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক কোন রোগীকে এলোপ্যাথির উগ্র ওষুধের প্রভাবমুক্ত ক'রে দেহকে আগে হোমিওপ্যাথির সূক্ষ্ম চিকিৎসার যোগ্য ক্ষেত্র করে তোলেন সালফার ৩০ দিয়ে। তার পর তাঁরা আসল রোগের করেন চিকিৎসা। তেমনি ভাবে সমাজকে আগে মুষ্টিমেয়ের সম্পদের ও অত্যাচারের উগ্রতা থেকে মুক্ত করে তবে জীনতত্ত্বের সাহায্যে মানুষের চিকিৎসা ও উন্নতি সম্ভব হতে পারে। চিকিৎসার উপযুক্ত জমি আগে চাষ করা চাই তবে ফসল হবে। আজ যদি জীনতত্ত্বের সাহায্যে মানসিক ও শারীরিক সব রোগ আরোগ্য করার উপায় হয়, তাহলে কয় জন লোক সেই চিকিৎসার ব্যয়ভার সহ্য করে চিকিৎসা করাতে পারবে? শতকরা এক জনও নয়। রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসা আজ ভারতে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু কয় জন লোক তার সাহায্য নিতে সক্ষম? যেখানে অধিকাংশ লোকের দুবেলা অন্নাভাব, সেখানে যোল বা বত্রিশ টাকা দর্শনী দিয়ে বার বার চিকিৎসা করাতে পারবে কে? যে দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ওষুধের নামে সিরাপ মেশানো জল পান করানো হয়, আর দলে দলে রোগী সেই জলকে ওষুধ বলে পান করে, সেখানে জীনতত্ত্বের প্রয়োগ এক সখের ল্যাবোরেটরি ছাড়া কোথাও হতে পারে না, যেমন হচ্ছে দিল্লীর রাজকীয় কৃষি-প্রতিষ্ঠানে (Imperial Agriculture Institute) বহু অর্থব্যয় করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নধরকান্তি পুষ্ট সবলকায় বৃষ ও গাভী লালিত হচ্ছে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের রাজছত্রের আশ্রয়ে। গাভীরা দিনে এক-আধ মণ দুধও দেয়। প্রদর্শনীতে তারা ভারেও কাটবে ধারেও কাটবে theory and practiceএর সমন্বয়ের তারা জলন্ত উদাহরণ। কিন্তু দেশের গোয়ালাদের গরু-বাছুর ইত্যাদির উন্নতি কতটুকু এগিয়েছে? তারা বরং দিনের পর দিন অস্থিচর্ম্মসার হয়ে যাচ্ছে—বাছুরগুলো অকাল-মৃত্যু বরণ করছে—ষাঁড়গুলো ক্রমেই হীনবল হয়ে যাচ্ছে। দুধের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, ফলে জল মিশছে। সেই জলীয় দুধও কিনছেন শুধু তাঁরাই যাঁরা গদিতে আসীন। গরীবরা তা থেকেও বঞ্চিত। সুতরাং দিল্লীর প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক উন্নতির উদাহরণ এই সমাজে কোন কাজে এলো না—চিরদিন পোষাকী হয়েই থাকল। এবং থাকবে যত দিন না সমাজ বদলাবে।

প্রতিযোগিতা নয়—সহযোগিতা চাই

বিভেদ সৃষ্টি করে প্রতিযোগিতা ও বিরোধ। নীট্‌শে প্রমুখ দার্শনিকেরা বলেছেন, প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু মুলারের বা ক্রপোট্‌কিনের মতে সহযোগিতার দ্বারাই যোগ্যতা গড়ে উঠে। শুধু আত্মসুখের জন্ত মানুষের জগতে আবির্ভাব হয়নি। প্রকাণ্ড বিশ্বের সমাজে এক এক জন মানুষের স্বার্থের স্থান কোথায়? তার কোন মূল্যই নেই। চার্ব্বাকের বাণী—'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—' মানুষের আদর্শ নয়। প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের এক একটি অণুবিশেষ। তাদের প্রত্যেকে যখন বিশ্বের জীবলীলার অভিনয়ে তাদের আপন আপন অংশ গ্রহণ করবে তখন মানুষ হবে মহান্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কঠিন অভিনয় আজও চলছে কিন্তু তার রূপ আজ অতি কদর্য্য। অভিনয় করছে যারা পুরস্কার তারা পাচ্ছে না, পাচ্ছে মুষ্টিমেয় প্রথম শ্রেণীর দর্শকেরা—নাট্যগৃহের মালিক হিসাবে। অগণিত জনসংখ্যা পরিচালিত হচ্ছে মুষ্টিমেয়ের খেয়ালের ও স্বার্থসিদ্ধির জন্ত। হাজার পার্লিয়ামেণ্ট, সৎশিক্ষা (?) পুলিশ, আইন, তৈরী হলেও এই সমাজে কিছু দিন অন্তর সঙ্কটজনক পরিস্থিতি আসতে বাধ্য। একটি সঙ্কট পথ করে দেবে আর একটি সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পাশবিকতার প্রতিযোগিতা চালাবে স্বার্থান্ধ হয়ে। তবে এই ভাবে সঙ্কটের আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা এক দিন এই সমাজের ভিত্তি উঠবে নড়ে। যাবে সব ভেঙ্গেচুরে—গড়ে উঠবে নতুন সহযোগিতার সমাজ। সেই বিভেদহীন একত্বসূত্রে গাঁথা একটি সামাজিক প্রাণ যত দিন না গড়ে উঠবে, তত দিন বিজ্ঞানের মঙ্গলজনক তথ্যগুলি ল্যাবোরেটরির গণ্ডীর মধ্যেই থাকবে সীমাবদ্ধ। জনসাধারণের কাছে তথ্যগুলি থাকবে অর্থহীন অবোধ্য। Theory ও practice-এর হবে না যোগাযোগ। কলেজে বিজ্ঞানতত্ত্বের যে সব বিষয় পড়ানো হয়, যে সব বিষয়ে গবেষণা হয় তার সঙ্গে মানব সমাজের কোন সম্বন্ধ নেই বলে, ছাত্রেরাও বিজ্ঞানের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করার জন্ত উৎসুক হয় না। Science for Science's sake এ উক্তি ক'জনেরই বা ভাল লাগতে পারে? গবেষণার একটা বাস্তব পরিণতি থাকা চাইতো।

বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন চাই

হঠাৎ এক দিন এক জনকে খানিকটা আফিং খাইয়ে দিলে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু একটু একটু করে অভ্যাস করলে আফিং মৃত্যু ঘটায় না। সেই রকম আবার সিফিলিস্ রোগে উপযুক্ত মাত্রায় ওষুধ দিলে রোগের বীজাণু নষ্ট হয়ে যায় বটে, কিন্তু সেই ওষুধ জল দিয়ে পাতলা করে প্রয়োগ করলে বীজাণুগুলি ওষুধের দুর্ব্বলতার সুবিধা নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং রোগও সারে না; মাঝখান থেকে বীজাণুগুলি আত্মরক্ষায় আরও পটু হয়ে ওঠে, রোগও চেপে বসে। তখন রোগীকে মেরে ফেলা ছাড়া রোগ সারানোর উপায় থাকে না। তাই কর্ণসংশোধন দরকার। কড়া ওষুধে কিছু কিছু সাময়িক প্রতিক্রিয়া হতে পারে (after effect) কিন্তু পরে সেগুলি থাকে না, রোগও সারে। সমাজের পরশ্রমজীবিতার রোগ সারাতে হলে এই রকম আকস্মিক প্রচণ্ড বিপ্লবের দরকার। তার [illegible]

আসবে ভারসাম্য এবং সে সাম্য হবে চিরস্থায়ী। মানবতালাভের জন্ত ক্ষণস্থায়ী বিপদকে ভয় পেলে চলবে না।

পূর্ব্বরাগজনিত বিবাহের সুফল

বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিকদের মত হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়ের ইচ্ছামত জীবনের সাথী নির্ব্বাচন করতে দিলে বংশের উন্নতি হয়। বিবাহের ভিত্তি অর্থনীতির উপর না হয়ে যদি প্রেমের ওপর হয়, সেই মিলনে থাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সরলতা—ফলে সন্তানের উপরেও সেই স্বাভাবিকতার প্রতিবিম্ব পড়ে। জাতিভেদ, দেশভেদ ভুলে বিবাহ হওয়া উচিত। আন্তর্জ্জাতিক বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণে, জীনের সংমিশ্রণে mutation-এর পথ সুগম হয়—বিবর্ত্তনের (evolution) হয় ক্রমোন্নতি। তার পর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের মত হচ্ছে যে, বংশের উন্নতি সাধন করতে হলে পিতার এবং বিশেষ করে মাতার জীবন ও মনের বোঝা হাল্কা হওয়া দরকার। মাতার ওপরই পুত্রের লালন-পালনের আসল দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর পিতৃবর্গ কোন দায়িত্ব কাঁধে না নিয়ে মাতৃত্বের আদর্শের গুণগানে পঞ্চমুখ হন। ফুয়ারের (Fuhrer)—'Be a good mother'—বাণীতে পুলকিত হয়ে ওঠেন। মাতারাও দাসীর মতই সারাজীবন খেটে যান এবং পুত্রের পর পুত্রের জন্ম দিয়ে শরীর পাত করেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে, সন্তান উৎপাদনের বিরুদ্ধে আধুনিকারা যে ধর্ম্মঘট সুরু করেছেন তার সুফল সম্ভাবনাই অধিক। ফলে তাঁরা নিজেদের মানবত্বার উন্নতির জন্ত অনেকটা সময় ব্যয় করতে পারবেন, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং বছর বছর অযোগ্য রুগ্ন সন্তানের দুর্ব্বিসহ ভার থেকে ধরিত্রীকে মুক্তি দিতে পারবেন। তাছাড়া অল্পসংখ্যক পুত্রদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায়। কিন্তু স্নেহ ও শিক্ষার ভাগীদার যদি অধিক সংখ্যক হয়, প্রাপ্য দ্রব্যের ভাগেও তত কম পড়ে। জগতে অমানুষের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী?

ক্ষতিহীন জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রথমে ক্ষতিহীন জন্মনিয়ন্ত্রণের উন্নতি সাধনও জনসাধারণের কাছে প্রচার আবশ্যক। এইটি হবে মাতৃকুলের ইচ্ছাবিরুদ্ধ সন্তানের বোঝার বিপক্ষে প্রথম আত্মরক্ষার লাইন। অনেকে হয়তো শুনলে কানে আঙুল দেবেন, জীবহত্যার মহাপাপের ভয়ে শিউরে উঠবেন। তবুও আমি বলব, বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মতেই প্রয়োজন মত নিপুণ অস্ত্রোপচারের দ্বারা গর্ভরোধ আত্মরক্ষার দ্বিতীয় লাইন। অবশ্য প্রথম লাইনেই যাতে আত্মরক্ষা করা যায় সেই ব্যবস্থাই সুপ্রশস্ত। কিন্তু যেখানে অকৃতকার্য্য হলে দ্বিতীয় লাইনেই আত্মরক্ষা করতে বাধা নেই—যত দিন পর্য্যন্ত সমাজের কাঠামো না বদলাচ্ছে। অনিচ্ছাপ্রসূত সন্তান কখনো স্বাভাবিক হয় না। আর অযোগ্য রুগ্ন সন্তানের জন্ম দিয়ে মাতাকে ও সন্তানকে সারা জীবন অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যনৈতিক যন্ত্রণায় তিলে তিলে ধ্বংস করা, সঙ্গে সঙ্গে রোগ সমাজে ছড়িয়ে সমাজের প্রচুর ক্ষতি করার চেয়ে মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে গর্ভ নষ্ট করা অনেক ভালো। এই ভাবে মাতৃত্বের জোর করে চাপানো বোঝাকে সরাতে পারলে মানুষ আপনা হতেই মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রেমের কাহিনী

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

শুভদা মুখুজ্জ্যে নতুন লেখক। মাত্র অল্প দিন তার লেখা বেরুতে আরম্ভ হয়েছে—এক পয়সার কয়েকটা সাপ্তাহিক কাগজে। এখনো তার গল্প থেকে আঁতুড়ের গন্ধ যায়নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার লেখা নিয়ে ছোটখাটো আলোচনা হয় মধ্যে মধ্যে! কেউ বলে ভালো; কেউ বলে মন্দ; কেউ বলে কিছু নয়—'সবে ত কলির সন্ধ্যে'—'অমন কত লেখক এলো গেল—এই বয়সে ঢের দেখলুম'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সতীশ কিন্তু এ-সবে কান দেয় না। সকলের চেয়ে জোর গলায় বলে ওঠে—ক্ষুদ্র যাহা, ক্ষুদ্র তাহা নয়, 'সত্য যেথা কিছু আছে বিশ্ব সেথা রয়'। এই বলে নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত-পা নেড়ে বলতে থাকে—ভাবী কালের একমাত্র লেখক আস্‌ছে দেখে নিস্—গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে।

বন্ধুরা হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে সতীশটা একেবারে উন্মাদ!

বাস্তবিক সতীশ যে কি দেখতে পেয়েছে তার লেখার মধ্যে তা সেই জানে! শুভদার লেখা কোন কাগজে বেরিয়েছে শুনলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। যেমন করে হোক একখানা কাগজ কিনবেই। তার পর বন্ধু বান্ধব ও অফিসের সহকর্মী, যে যেখানে আছে সকলকে পড়িয়ে দেবে তাদের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দেবে এবং তর্ক করে চেঁচিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দেবে যে অন্য সব লেখকদের লেখা কিছু নয়, শুভ দার সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না, ও-সব ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের জোলো গল্প বলার দিন চলে গেছে—এখন চায় লোক দেশের কথা শুনতে, মাটির কথা শুনতে। দেখে নিস্ He is the comming man! ডুবিয়ে দেবে সকলকে—এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করলুম।

সতীশ একেবারে মূর্খ নয়—লেখা-পড়া জানে, বাংলা সাহিত্যের রীতিমত খবর রাখে, তাই তার মতামতটাকে সহজে উপেক্ষা করতে কেউ পারে না। তবু তারা বলতে ছাড়ে না, সতীশ এটা তোর নেহাৎ বাড়াবাড়ি হচ্ছে—একটা নতুন ছোক্‌রা সবে লিখতে সুরু করেছে, এর মধ্যেই তার লেখা বর্ত্তমান সব লেখকদের চেয়ে ভালো—এ কথা আমরা মানতে রাজী নই—এটা নেহাৎই তোর 'প্রোপাগ্যাণ্ডা'।

এক জন হয়ত খপ্‌ করে বলে ওঠে, হ্যাঁ রে, শুভদা মুখুজ্জ্যের সঙ্গে কি তোর কোন আত্মীয়তা আছে? আবার কেউ-বা বলে, সে কি তোর সম্বন্ধী হয়?

এ-কথা শুনলে সতীশ ভীষণ রেগে ওঠে। বন্ধুদের গালাগালি দিয়ে বলে, ও-রকম আত্মীয় পেলে নিজকে সৌভাগ্যবান্ বলে মনে করতুম। তার পর একটু থেমে, বড় করে একটা দম নিয়ে আবার বলে, আত্মীয়ই ত! শুধু আমার কেন, দেশের সকলের! সমাজে যারা উৎপীড়িত হচ্ছে, নির্য্যাতিত হচ্ছে, প্রতিনিয়ত তাদের কথা যে শোনায় সে ত সকলের চেয়ে আপনার জন। এই বলতে বলতে উত্তেজিত কণ্ঠে সে আবৃত্তি করে ওঠে, "এই সব ম্লান, মূক, মূঢ় মুখে দিতে হবে ভাষা!"

বন্ধুরা সকলে হো-হো ক'রে বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে কিন্তু তাতেও সতীশ দমে না।

এ-দিকে বাড়ীতে ফিরতে সতীশের স্ত্রী অনুপমাও রেগে উঠে বলে, এই সব ছাই-ভস্ম কাগজ কিনে পয়সা নষ্ট করতে কে তোমায় বলেছে? একটা পয়সা পেটে থাকে-না, কেবল রোজ রোজ এমনি ক'রে সব বাজে কাগজ কিনবে! এ-সব কাগজ কি [illegible] ভদ্রলোকে পড়ে, যার নাম কেউ কোন দিন শোনেনি সেই সব [illegible] কোথা থেকে যে আমদানী করো তুমি তা ত জানি না। [illegible] যদি ভাল কাগজ হতো বুঝতুম তার মানে হয়! আবার [illegible]

দাদারা কত বড় বড় ভাল ভাল কাগজ কেনে তাদের ত এ-কাগজের নামও করতে কোন দিন শুনিনি।

সতীশ বললে, ওগো, এও ভালো কাগজ—তুমি পড়ে দেখো না একবার, কি সুন্দর গল্প বেরিয়েছে শুভদা মুখুজ্জ্যের।

অনুপমা মুখটা বেঁকিয়ে বললে, ছাই লেখে! আমি পড়ে দেখেছি এর আগের কাগজগুলো, কেবল একঘেয়ে সেই কারখানার লোকেদের দুঃখ, কষ্ট আর মনিবদের অত্যাচার-অনাচার! না আছে লেখার কোন রকম রস-কষ, না আছে প্রেম-ভালবাসা। এই লেখা পড়বার জন্যে আবার মানুষ পয়সা দিয়ে কাগজ কেনে?

সতীশ তখন গম্ভীর হয়ে বললে, আরে জোলো প্রেম আর নাকে-কান্না ত ঢের হলো বাংলা সাহিত্যে—সে সব পড়ে পড়ে লোকের অনেক দিন অরুচি ধরে গেছে। এখন দেশের লোকের সত্যিকার কাহিনী শোনাবার সময় এসেছে, তাই শুভদা মুখুজ্জ্যের এত নাম।

অনুপমা বললে, এর নাম ত কেবল তোমার মুখেই শুনি, আর কাউকে ত বলতে শুনি না?

সতীশ বললে, শুনবে এক দিন সকলের মুখে, এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করলুম। আরে কটা লোক সত্যিকারের সাহিত্য চেনে বা বোঝে? ক'টা লোক সত্যিকারের জহুরী?

মুচকি হেসে অনুপমা বললে, মানছি তোমার মত সাহিত্যের জহুরী আর নেই বাংলা দেশে, কিন্তু তাই বলে কি অফিসে জলখাবার না খেয়ে সেই পয়সা দিয়ে তার লেখাগুলো কিনতে হবে?

সতীশ বললে, ভাল লেখা ক'জন চেনে, তার প্রচার হওয়া ত দরকার।

অনুপমা বললে, কাগজ তুমি না কিনলে যে লেখকের নাম প্রচার হয় না, তার না হওয়াই উচিত।

সতীশ বললে, আহা-হা, তুমি কথাটা মোটে বুঝতে পারছো না। আমাদের মত লোকরা যদি কাগজ কিনে এর লেখা নিয়ে আলোচনা শুরু করে, তাহ'লে এক দিক থেকে তার নামও শীগ্‌গির যেমন বাড়বে অন্য দিক থেকে তেমনই কাগজওলারাও তার লেখা বেশী করে ছাপাবার জন্যে উৎসাহ বোধ করবে। এক জন ভাল লেখককে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এ রকম করতেই হবে। সব দেশেই লেখকরা এই ভাবে ওঠে। এটা দেশবাসীর একটা কর্তব্য কর্ম।

বিরক্ত হয়ে অনুপমা বললে, কিন্তু কোন্ দেশের লোক এই ভাবে নিজের জলখাবার না খেয়ে সেই পয়সা দিয়ে কাগজ কিনে লেখককে উৎসাহ দান করে! লেখা খেয়ে কি পেট ভরে?

এইবার সতীশ রেগে উঠলো। বলল, কারুর কারুর ভরে। কিন্তু জল খাই না তোমায় কে বললে।

অনুপমা বললে, আমি বলছি—কেন না আমার কাছ থেকে প্রত্যেক দিন যে পয়সা নিয়ে তুমি আফিস বেরোও তাতে জল-খাবার খেয়ে আর কাগজ কেনা চলে না।

সতীশ বললে, জলখাবার বলতে তুমি যা বোঝো আমি হয়ত তা বুঝি না। কেউ খায় রসগোল্লা সন্দেশ, কেউ খায় মুড়ি ছোলাভাজা। কাজেই আমার মত গরীব কেরাণীর পক্ষে শেষেরটাই যথেষ্ট।

অনুপমা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর আর সে তাকে কি বলবে ভেবে পেলে না।

সত্যি বড় গরীব তারা। স্বামী অল্প মাইনের চাকরী করে, তাই দিয়ে কোন রকমে খেয়ে-পরে বাড়ীভাড়া দিয়ে তাদের দিন চলে। তবু ওরি মধ্যে সংসার-খরচের পয়সা দু'-চারটে বাঁচিয়ে অনুপমা স্বামীকে দেয়, যাতে একটু ভাল জলখাবার সে আফিসে খেতে পায এই আশায়। তাই পেটে খাওয়ার চেয়ে লেখক-প্রীতি যার বেশী তাকে কি বলবে ভেবে না পেয়ে তার চক্ষু দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললে, তোমার যেন সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

এর কোন উত্তর না দিয়ে সতীশ অন্য কাজে মন দেয়।

বাস্তবিক কথাটা অনুপমা মিথ্যা বলেনি। আমাদের দেশে নতুন লেখকের লেখা নিয়ে ঠিক এতটা বাড়াবাড়ি আর কেউ করে না। অফিসের ছুটির পর যখন সবাই ছোটে বাড়ীর দিকে, তখন সতীশ এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে কাগজের 'ষ্টলটায়' গিয়ে সমস্ত কাগজগুলো খুঁজে খুঁজে দেখে কোনটায় শুভদার লেখা বেরিয়েছে। তার পর সেটা কিনে নিয়ে বাসায় ফেরে। আবার যে কাগজে শুভদার লেখা বেরিয়েছে তার বিক্রী বেশী হচ্ছে কি না খোঁজ নেয়। হিন্দুস্থানী কাগজ-বিক্রেতাটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে খইনী টিপতে টিপতে বলে, হ্যাঁ ও তো বেশী বিক্তা হায় বাবুজী।

খুশীতে সতীশের মুখটা তখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এমনি করে যত দিন যেতে লাগল ততই শুভদা মুখুজ্জ্যের লেখা নানা কাগজে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সতীশ বন্ধুমহলে তখন উঁচু গলায় বলতে শুরু করলে, ভাখ, যা বলেছিলুম হাতে হাতে ফলছে। এই ক'দিনের মধ্যে কতগুলো কাগজ ওর লেখা ছাপছে। সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রায় সবগুলোতেই ইদানীং শুভদা মুখুজ্জ্যের লেখা বেরোয়।

লেখা পড়তে পড়তে এক এক দিন সতীশের ভয়ানক ইচ্ছে করে লেখককে দেখতে কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হয় না। কাগজের আফিসে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে, সেই লেখক থাকে বিদেশে, ডাকে লেখা পাঠায়। বীরভূম জেলায় কি একটা নগণ্য গ্রামে তার বাড়ী, সতীশ সে দেশের নাম পর্য্যন্ত শোনেনি কোন দিন।

এমনি ভাবে আরও কিছু দিন কাটবার পর সতীশ আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলে না। একখানা চিঠি লিখে ফেললে শুভদা মুখুজ্জ্যের নামে। ভক্তের চিঠি যেমন হয়, উচ্ছ্বাসপূর্ণ, এ কিন্তু সে রকম নয়,—সমস্ত জাতির আশা-ভরসা যে তিনি, এই কথাটাই চিঠিটার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বার বার লেখা। এবং সব শেষে বড় বড় কাগজে লেখবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে সে চিঠি শেষ করলে।

ভক্তদের কাছ থেকে যে সব চিঠি আসে তার উত্তর অধিকাংশ লেখকই দেয় না। শুভদা মুখুজ্জ্যের বেলাও তার ব্যতিক্রম হলো না। সতীশ এতে একটু মনে ব্যথা পেল তবু কিন্তু এর জন্যে তাঁর ওপর তার রাগ হলো না বরং মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করলে এই ভেবে যে, দিনরাত হয়ত কত চিন্তা, কত লেখার মধ্যে তিনি ডুবে আছেন, এ-সব ছোট-খাটো ব্যাপারে মন দেবার সময় কি?

যাই হোক, সে বছর সব চেয়ে জনপ্রিয় কাগজের পূজাসংখ্যায় শুভদা মুখুজ্জ্যের একটি গল্প প্রকাশিত হতে দেখে সতীশ একেবারে

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। এই প্রথম বড় কাগজে তাঁর লেখা বেরুল। তারই অনুরোধ হয়ত তিনি রক্ষা করেছেন, এই ভেবে সতীশ মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করলে। বন্ধুবান্ধব মহলে এবার সে গলা ছেড়ে আলোচনা শুরু ক'রে দিলে। বললে, সমস্ত লেখককে এক দিন ডুবিয়ে দেবে এই শুভদা মুখুজ্জ্যে দেখে নিস্—'দিন আগত ঐ!'

সত্যি দেখতে দেখতে ছ-মাসের মধ্যে বড় বড় কাগজেই শুভদার লেখা একে একে ছাপা হ'তে লাগল। এমনি ক'রে শুভদার লেখা যত কাগজে বেরোয়, সতীশের উৎসাহও যেন তত বাড়ে। সে মনের আনন্দ চাপতে না পেরে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ পত্রাঘাত করে লেখককে অভিনন্দন জানায়। কোন চিঠির কোন জবাব যদিও আসে না, তবু সে এতটুকু ক্ষুব্ধ হয় না।

এর কিছু দিন পরে হঠাৎ সতীশ খবর পেলে যে, শুভদা মুখুজ্জ্যে প্রায় এক বছর হলো কলকাতায় বাস করছেন। কথাটা কানে যাবামাত্র সতীশ একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলো তাঁকে চোখে দেখবার জন্যে।

অনেক কষ্টে তাঁর ঠিকানাটা জোগাড় ক'রে শেষে এক দিন সকালবেলা সতীশ বেরুল তাঁর বাসার উদ্দেশে। বৌবাজার অঞ্চলে একটা অত্যন্ত নোঙরা গলির মধ্যে ততোধিক নোঙরা ও পুরোনো ভাঙা বাড়ীর নীচের তলায় একখানা ঘর ভাড়া করে শুভদা একা থাকে। এটা একটা কেরাণীদের 'মেস'। ভক্ত যেমন দেবদর্শনে যায় তেমনি ভাবে আশা-আকাঙ্ক্ষায় দোদুল্যমান হৃদয়ে সতীশ চললো। কিন্তু সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে ভাঙ্গা একটা তক্তাপোষের ওপর ছেঁড়া একখানা রঙীন চাদর বিছিয়ে দোয়াত-কলম নিয়ে অতি শীর্ণদেহ, কৃষ্ণবর্ণ একটি যুবককে লিখতে দেখে সতীশের মনে এমন একটা ঘা লাগল যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তার পর অতিকষ্টে মনোভাব গোপন ক'রে মুখে ক্ষীণ হাসি টেনে এনে সতীশ বললে, আমি আপনার এক জন ভক্ত, এর আগে কয়েকখানি চিঠি দিয়েছিলুম বোধ হয় পেয়েছেন? আজ আপনাকে একবার চোখে দেখতে এলুম।

শুভদার ভাবমগ্ন চোখ দু'টি সহসা যেন জ্বলে উঠলো। বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি—যে চিঠি আপনি লিখেছিলেন—বসুন বসুন। এই বলে তার পাশে তাকে জোর ক'রে বসালো। তার পর শুরু হলো লেখার সম্বন্ধে নানা আলোচনা। সতীশ উত্তেজিত ভাষায় তাকে এমন ভাবে অভিনন্দিত করলে যে, তা শুনে শুভদার মনে হলো পৃথিবীতে বুঝি সে ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোন শুভাকাঙ্ক্ষী নেই! কলকাতার সহরে সে নতুন এসেছে, লোকজন কারুর সঙ্গে তেমন আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়নি, কাজেই সতীশকে এই ভাবে নিকটে পেয়ে সে যেন অনেকটা ভরসা পেলে। তখন আস্তে আস্তে সতীশ তাকে বললে, আপনি এ রকম আবহাওয়ার মধ্যে থেকে কেমন ক'রে যে অমন সুন্দর লেখেন বুঝতে পারি না।

শুভদা বললে, যাদের অবস্থা এর চেয়েও খারাপ তারা কি করে, জানুন দেখি।

সতীশ তার উত্তরে বললে, কিন্তু আপনার বেলা ত সে কথা খাটে না—আপনি একা মানুষ, সংসারের আর কোন দায়িত্ব নেই আপনার কাছে, তবে এ রকম স্থানে থাকেন কেন?

শুভদার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। সে বললে, দায়িত্ব যেমন নেই আয়ও ত তেমনি অল্প।

অল্প! বলে সতীশ লাফিয়ে উঠলো। তার পর কণ্ঠে যৌবনের সুর এনে বললে, এত বড় লেখক যে তার আয় অল্প? তাছাড়া আপনি ত চাকরীও করেন।

শুভদা তখন বিষণ্ণ মুখে বললে, তাছাড়া নয়, ওই চাকরীটুকু আছে বলে এখনো এ রকম স্থানে থাকতে পেয়েছি, তা নাহ'লে শুধু লেখক হ'লে সহরে বাস করার কথা কল্পনাও করতে পারতুম না।

সে কি? বলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তার মুখের দিকে তাকাতেই শুভদা বললে, হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, চাকরী না থাকলে এই সব বড় কাগজে লেখাও এত দিনে বেরুত কি না সন্দেহ।

তার মানে। সতীশ যেন কোন অসম্ভব কথা শুনছে এমনি ভাবে তার মুখের দিকে তাকালে।

শুভদা বললে, তার মানে খুবই সোজা, বড় সাহেবকে খুশি করতে হলে আগে তার চাকর-পেয়াদাকে বক্শীস করতে হয়, জানেন ত?

অর্থাৎ? সতীশ বললে।

শুভদা একটু ইতস্তত: করে বললে, অবশ্য আপনাকে বলতে আমার কোন লজ্জা নেই কারণ আপনি যখন আমার এত হিতৈষী। এই বলে সে যা বললে তা শুনে সতীশের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। শুভদা বললে, অর্থাৎ ঘুস দিতে হয়। তবে সম্পাদকদের নয়, তাদের চেলা-চামুণ্ডাদের, যারা সর্ব্বদা তাদের ঘিরে থাকে। কাউকে সিনেমা দেখাতে হয়, কাউকে বই কিনে উপহার দিতে হয়, কাউকে বা 'চাঙ্গুয়ায়' খাওয়াতে হয়; তা নাহ'লে নতুন লেখকদের বড় কাগজে পাত্তা পাবার উপায় নেই। অবশ্য এ বিষয়ে ছোট কাগজগুলি ভাল, তারা লেখা ছাপে আর তার দরুণ লেখককে কিছু খরচ করতে হয় না।

এই বলে থামতেই সতীশ একেবারে রাগে জ্বলে উঠলো। বললে, এই কথাগুলো কাগজের সম্পাদকের কাণে তুলতে পারেন না কোন রকমে?

শুভদা হতাশ হয়ে বললে, তাহ'লে আর আশা নেই। কোন দিনই লেখা বেরুবে না, এ বোধ হয় সহজেই বুঝতে পারছেন। তারা কেউ সম্পাদকের বন্ধু, কেউ গুণগ্রাহী, কেউ বা শালা-সম্বন্ধী হয়।

অত্যন্ত ম্লানমুখে সতীশ বাসায় ফিরে এলো। অপমানে, লজ্জায়, ক্ষোভে তার যেন গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করছিল। সেদিন সারারাত্র তার চোখে ঘুম এলো না। কেবলই মনে হতে লাগল, এর কি কোন প্রতিকার নেই? এত কষ্ট, এত দুঃখ সহ্য করতে হলে কি ভাল লেখা কলম দিয়ে বেরোয়! যার ওপর সমস্ত জাতির আশা ভরসা, ভাবী কালের একমাত্র লেখক যে, তার এই রকম অপমান সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না স্থির করলে। তাই পরের দিন ভোরে উঠেই আগে সে শুভদার কাছে চলে গেল, তার পর বললে, দেখুন, আমার মনে হয়, এত অবমাননা সহ্য করে বড় কাগজে লেখা আপনার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন, এর চেয়ে ছোট কাগজে লেখা সহস্র গুণে ভাল।

শুভদা ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

সতীশ উত্তেজিত স্বরে বললে, দরকার নেই বড় কাগজের। তার চেয়ে গল্পের বই প্রকাশ করবার চেষ্টা করুন, তাহলে [illegible] লোক পড়তে পারবে। আপনাকে বিচার করতে পারবে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে তখন শুভদা বললে, সে চেষ্টাও আমি করেছিলুম কিন্তু নূতন লেখকের গল্পের বই কেউ ছাপতে চায় না, একজন, দু'জন কাপি দেখবার জন্তে নিয়েছিলেন কিন্তু ফেরৎ দিয়েছেন এ সব গল্প অচল বলে। তাদের ধারণা, প্রেমের গল্প না হ'লে চলবে না—এ সব দুঃখের কাহিনী পয়সা দিয়ে কেন লোকে পড়তে যাবে? দিবারাত্র যে সব অভাব-অনাটনের মধ্যে মানুষ থাকে, অবসর সময় চিত্তবিনোদন করবার জন্তে নভেল নাটক পড়তে গিয়ে সেই সব কাহিনী না কি আবার কেউ পছন্দ করে না। এই বলে মিনিট কয়েক চুপ করে শুভদা কি যেন চিন্তা করলে। তার পর অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে আবার বললে, প্রেমের গল্প লেখা কি সহজ কথা? প্রেম কি, যে জীবনে সে কথা কোন দিন জানলো না, তার পক্ষে কি ক'রে তা লেখা সম্ভব! চিরদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কেটেছে, যাকে আমি জানি চিনি—তাকে বাদ দিয়ে কি লিখবো? মিথ্যে কথা? সে আমার দ্বারা হবে না। তাতে যদি বই ছাপা না হয় তো কি করবো! আমার লেখার দ্বারা যদি পাঠকদের চিত্তবিনোদন করতে না পারি ত সে আমার দুর্ভাগ্য! বলতে বলতে শুভদার কণ্ঠস্বর বার বার কেঁপে উঠলো!

শুভদার মুখ থেকে সেই সব শুনতে শুনতে সতীশের চোখে জল এসে পড়লো। সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, কুচ্ পরোয়া নেই, আমি ছাপাবো আপনার বই, দেখি পাবলিসাররা কি ক'রে বাধা দেয়। ওঃ, বলে কি না প্রেমের গল্প ছাড়া চলবে না! দেশের কথা, কৃষক শ্রমিকের ওপর অন্যায় অবিচারের কথা এখনো শুনবে না লোকে? একদিন আপনার লেখার জন্তে আপনার দোরে তাদের মাথা খুঁড়তে হবে—দেখে নেবেন এই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি!

শুভদা কুণ্ঠিত ভাবে বললে, যদি বিক্রী না হয়, তাহ'লে আপনার যে লোকশান হবে!

সতীশ বললে, তা যদি হয় হোক, তাতে কোন দুঃখ নেই—মনে করবো দেশের কাজ করতে গিয়ে লোকশান খেয়েছি।

এই বলে সতীশ শুভদাকে গরম গরম ভাষায় উত্তেজিত ক'রে চলে গেল। শুভদার মনও সত্যি সত্যি তখন কিসের উচ্চাশায়, গর্ব্বে ও আনন্দে যেন স্ফীত হয়ে উঠলো!

কিন্তু বাড়ীতে ফিরে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সতীশ হিসাব ক'রে দেখলে যে একখানা বই বার করতে গেলে অন্ততঃ পাঁচশো টাকার দরকার, তখন তার মাথা ঘুরে গেল। পাঁচটা টাকা যার সংস্থান নেই সে কোথায় পাবে পাঁচশো! সতীশ চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণী, কলকাতার সহরে বাড়ী ভাড়া দিয়ে, স্বামি-স্ত্রীর খেতে-পরতেই কুলোয় না। কি ক'রে কোথা থেকে সে টাকাটা জোগাড় করবে, তারি চিন্তায় তার তখন আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল।

শেষে 'লাইফ ইন্সিয়োরের পলিসি' বাঁধা দিয়া এবং অফিসের 'প্রভিডেন্ট ফণ্ড' ও 'কো-অপারেটিভ সোসাইটী' থেকে ধার করে এক দিন সতীশ ছাপলে শুভদার বই।

বই ত বেরুল, এখন বিক্রী হবে কি ক'রে—সেও এক মহা চিন্তা! বড় বড় নাম-করা প্রকাশকদের কাছে সতীশ বইগুলি জমা রাখতে চাইলে বিক্রী করবার জন্তে, কিন্তু তারা কেউ রাজী হলো না। বললে, ও-সব বই চলবে না, ওর জন্তে কে এতো হাঙ্গামা পোয়াবে মশাই? লিখেয় ফেলো—গুলির লাভ—টক লাভ—এতো মজুরী পোষাবে না।

তখন বিষণ্ণ মুখে সতীশ সব ছোট ছোট দোকানে সেই বইগুলি জমা দিয়ে এলো। তার পর থেকে রোজই একবার ক'রে দোকান-গুলোয় ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিতো, কখানা বিক্রী হলো।

এমনি ভাবে যখন এক বছর কেটে গেল, তখন সতীশ যা হিসেব পেলে তাতে দেখা গেল মাত্র তেইশখানা বই বিক্রী হয়েছে! বলা বাহুল্য, সতীশ খুবই মুসড়ে পড়লো। তার মাথার ওপর এত টাকা দেনা! সে ভেবেছিল বই যেমন যেমন বিক্রী হবে, তা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেনাটা শোধ করবে। কিন্তু তা যখন হলো না তখন সতীশের দুর্ভাবনা আরো বেড়ে গেল।

ইত্যবসরে এক দিন একখানা উপন্যাস লিখে এনে শুভদা তাকে পড়তে দিলে। সতীশ বইখানা পড়ে লাফিয়ে উঠলো। বললে, এই ত চাই—আজকে জনগণের যা দাবী তা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এর ছত্রে ছত্রে। এ উপন্যাস বেরুলে সমস্ত দেশ রীতিমত ক্ষেপে উঠবে—এই আমার বিশ্বাস। সতীশ বললে, যেমন করে হোক, এখানা ছাপাতেই হবে!

এই একখানা বই থেকে আগেকার বইয়ের খরচা পর্য্যন্ত যে উঠে আসতে বাধ্য এ সম্বন্ধে সে সুনিশ্চিত। কিন্তু আবার টাকার প্রশ্ন উঠলো, কোথা থেকে সে পাবে এত টাকা।

অনেক চিন্তা ক'রে সতীশ তার দেশের পৈতৃক ভিটেটা—বাগান-পুকুর সমেত বাঁধা দিয়ে এই টাকাটা জোগাড় ক'রে আনলে; তার পর সেই উপন্যাসটা ছেপে আবার দোকানে দোকানে জমা দিয়ে এলো!

কিন্তু এবারও তাকে হতাশ হতে হলো। এক বছরে মাত্র একশো-খানা বই বিক্রীর হিসাব যখন সে পেলে তখন রীতিমত চিন্তান্বিত হলো। কি করা এখন উচিত ভাবতে ভাবতে সহসা তার মাথায় এই চিন্তা গেল যে এর চেয়ে একখানা ছোট সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করলে শুভদার লেখা জনসাধারণের মধ্যে খুব শিগগির ছড়িয়ে পড়বে। শুভদাকে লোকে যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বুঝবে ততক্ষণ যেন দেশের লোকের কাছে তার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—এই তার মনের বিশ্বাস। তাই এইবার সে শেষ চেষ্টা করলে। অফিসের দারোয়ানদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার ক'রে এনে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করলে। শুভদা মুখুজ্জ্যে হলো সম্পাদক, আর সে প্রকাশক। তার পর শুভদার কলম দিয়ে যাতে ভাল লেখা বেরোয় সেই জন্য তাকে নিয়ে এসে নিজের বাসায় রাখলে। বললে, এ জঘন্য জায়গায় আমি আর আপনাকে থাকতে দেবো না। আমার বাড়ীতে কোন ঝামেলা নেই। শুধু আমরা স্বামি-স্ত্রী আর একটা ঝি। সেখানে আপনার লেখার কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া আমার স্ত্রীর সেবাযত্ন পেলে আপনার লেখার আরোও উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তাই হলো। শুভদাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে সতীশ তার স্ত্রী অনুপমার সঙ্গে আগে তার আলাপ করিয়ে দিলে। বললে, এঁকে তুমি দাদার মত দেখবে—এঁর সেবা-যত্নে যেন কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে সর্ব্বদা নজর রাখবে। আর সব শেষে বললে, মনে রেখো এত-বড় লেখকের সেবা করতে পারা আমাদের সৌভাগ্য।

ত্রুটি দূরে থাক এমনি সেবা-যত্ন করতে অনুপমা শুরু করলে যে, শুভদা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লো। সে তার লেখার ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে সর্ব্বদা সাজিয়ে রাখে, সময়ে অসময়ে চায়ের

পেয়ালা হাতে ক'রে এসে তার পেছনে দাঁড়ায়, আবার বেশীক্ষণ লিখতে দেখলে রাগ করে তার হাতের কলম কেড়ে নিতে নিতে বলে, শরীরটা আগে, দিন-রাত এত চিন্তা করলে শেষে অসুখ করে যদি—

হেসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুভদা উত্তর দেয়, তাহলে ত বাঁচি।

বিস্ফারিত চোখে অনুপমা বলে, ও মা, সে কি কথা, অসুখ আবার লোক কামনা করে না কি।

একটু ইতস্তত: ক'রে শুভদা জবাব দেয়, এ রকম সেবা করার লোক থাকলে কে এমন বে-রসিক আছে যে কামনা না করে।

এই বার ছেলেমানুষের মত খিল খিল ক'রে হেসে উঠে অনুপমা। বললে, চুপ—আপনি ত ভারী দুষ্টু। দাঁড়ান, উনি অফিস থেকে বাড়ী এলে বলে দেবো, আপনার এই কথা। সুশ্রী, পরিপূর্ণ-যৌবনা, অনুপমার কণ্ঠে সেই কথাটি যেন সঙ্গীতের মত বেজে ওঠে।

শুভদা বললে, আর আমিও বলে দেবো যে, তুমি আমার কলম কেড়ে নিয়ে লিখতে দাও না—রোজ দুপুরে।

অনুপমা তখন মিনতি ক'রে বললে, লক্ষ্মীটি, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, ও-কথাটা তাঁকে বলবেন না—আপনাকে লিখতে দিই না শুনলে তিনি ভীষণ গালাগাল দেবেন আমায়। এই বলে একটু থেমে আবার বললে, আপনি জানেন না যে, আপনার সম্বন্ধে তাঁর কি রকম উঁচু ধারণা। আপনার মত লেখক বাংলা দেশে আর কেউ নেই, এই তাঁর বিশ্বাস। তাই আপনার যাতে না লেখার কোন রকম অসুবিধা হয়—তার জন্যে আমায় রোজ কত উপদেশ দেন।

শুনতে শুনতে শুভদার বুকের মধ্যেটা কেমন ক'রে ওঠে। সত্যি এ রকম ভালবাসা সে তার জীবনে আর কখনো পায়নি।

*　　　*　　　*

কাগজ চলে। শুভদা লেখার দিকটা নিয়ে মেতে থাকে আর সতীশ ব্যবসার দিকটা। কিন্তু যত দিন যায় শুভদার লেখার সুর যেন ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। আগেকার সে তীব্রতা যেন জুড়িয়ে আসে, মধুর রসের আমেজে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে তার লেখনী।

পাঠক-সমাজে এত দিনে সত্যিকার চাঞ্চল্য শুরু হয়। সতীশ ট্রামে, বাসে যেতে যেতে যখন শোনে যে শুভদার লেখা নিয়ে আলোচনা চলেছে, তখন তার বুকখানা যেন দশ হাত হ'য়ে ওঠে। এমনি করে তার কাগজের বিক্রী যেমন বাড়তে লাগল ওদিকে শুভদাও তেমনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল। শুভদার কলম তখন যেন অমৃতবর্ষী হয়ে উঠেছে। যা লেখে তাই পড়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়, বিশেষ ক'রে তার প্রেমের গল্পগুলি অতুলনীয়। কাগজে কাগজে তার কত প্রশংসা বেরুতে লাগল। সতীশের আনন্দ আর ধরে না। তার ভবিষ্যদ্বাণী যে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে তার জন্যে তার অহঙ্কারের সীমা নেই!

কিন্তু সহসা যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো। শুভদার লেখার উৎস যেন শুকিয়ে গেল। ভাল লেখা দূরে থাক সে সর্ব্বদা কেমন যেন চিন্তাকুল হয়ে থাকে…লেখায় তার কোন উৎসাহই দেখা যায় না। কলম হাতে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ-চাপ ব'সে সে কি ভাবে। সতীশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত। শুভদার মুখের প্রতিটি রেখা যেন তার সুপরিচিত। তাই কিছু দিন ধরে তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করবার পর সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না।

এক দিন নিঃশব্দে শুভদার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। শুভদার তখনো হুঁস হয়নি, তেমনি ভাবে কলম মুখে দিয়ে নীরবে বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সতীশের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে সে যেন চমকে উঠে তার মুখের দিকে তাকালে, অমনি সতীশ মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি বলুন ত—আপনি ইদানীং লেখা বন্ধ করে চুপচাপ বসে কি ভাবেন বলুন ত? আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছি কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে এত দিন সাহস হয়নি।

শুভদা এ কথার কোন জবাব দিতে না পেরে, প্রথমটা একটু ইতস্তত: করলে। তার পর আবার চুপ করে রইল তেমনি ভাবে, কিন্তু সতীশ ছাড়বার পাত্র নয়। তাই আবার যখন তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন শুভদা হঠাৎ বলে উঠলো, আমার এখানে আর ভাল লাগছে না। মনে করছি এইবার একটা 'মেসে' গিয়ে থাকবো।

সতীশ সাগ্রহে বলে উঠলো, এর জন্যে এত চিন্তার কি আছে—আমাকে ত বললেই পারতেন, আপনার লেখার যেখানে গেলে সুবিধা হবে সেইখানে যেতে কখনো আমি আপনাকে বাধা দোব না এটা অন্ততঃ আপনার জানা উচিত ছিল। এই বলে সেই-দিনই সতীশ খুঁজে খুঁজে একটা ভালো 'মেস' তার জন্যে ঠিক করলে।

শুভদা সেখানে এসে বাস করতে শুরু করলে। কিন্তু এখানে এসেও তার লেখার বিশেষ উন্নতি দেখা গেলো না। তার চিন্তা যেন আরো বেড়ে গেছে বলে সতীশের মনে হলো। শুভদা দিনরাত অন্য-মনস্ক হয়ে থাকে। তার চেহারাও ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যেতে লাগল। আসল ব্যাপারটা জানবার জন্যে সতীশ অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লো। গোপনে সে বড় ডাক্তার ডেকে এনে তার শরীর পরীক্ষা করালে, ডাক্তার দামী দামী টনিকের ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেল।

সতীশ তার প্রত্যেকটি কিনে এনে দিলে। দেখতে দেখতে শুভদার টেবিলটা ভরে উঠলো নানা রকমের ছোট-বড় শিশিতে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হলো না। দিন দিন যেন শুভদা শুকিয়ে যেতে লাগল। তখন সতীশ এক দিন এসে বললে, না, এখানে থাকা আর আপনার উচিত হবে না—আপনি চলুন আমার বাসায়। 'মেসে' কখনো আপনার মত 'আর্টিষ্ট' থাকতে পারে? এখানে কে আপনাকে দেখবে! ওখানে তবু অনুপমা রয়েছে তার সেবা-শুশ্রূষা পেলে আপনি নিশ্চিত ভাল হয়ে উঠবেন!

এই কথা শোনা মাত্র শুভদার চোখ মুখ যেন নিমেষে উৎসাহে জ্বলে উঠলো। সে ভাল ছেলের মত সুড় সুড় ক'রে গিয়ে আবার সতীশের বাসায় উঠলো।

আশ্চর্য্য! অল্প কয়েক দিন যেতে না যেতে শুভদা যেন আবার নতুন মানুষে রূপান্তরিত হলো। হাসিতে-খুশিতে স্বাস্থ্যে রসিকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার দেহ-মন। তাকে দেখলে কে বলবে যে অল্পদিন আগেও সে ছিল রুগ্ন ও ভগ্নোৎসাহ। আবার শুভদার লেখনী চললো অশ্রান্ত গতিতে।

সতীশের আনন্দ আর ধরে না! একদিন সে হাসতে হাসতে বললে, দেখলেন ত, অনুপমা যেন যাদু জানে—আপনি কি ছিলেন আর কি হয়েছেন এই ক'দিনে!

শুভদা হেসে এর একটা কি জবাব দিতে গেল কিন্তু পারলে না। সহসা সতীশের মুখের দিকে চেয়েই থেমে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য! আবার তার পরের দিন থেকে শুভদার মনে কি হলো তা কে জানে! সতীশ লক্ষ্য করলে সে আবার চিন্তামগ্ন হয়ে থাকে। এমনি করে যত দিন যায় তত যেন সে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

সতীশ এক দিন তার স্ত্রীকে গোপনে জিজ্ঞেস করলে, অনু বলতে পারো, শুভদা কেন এমন ক'রে থাকে? যেন মন-মরা? যেন উৎসাহহীন!

অনুপমা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে, তা আমি কি ক'রে জানবো কার মনে কি আছে?

সতীশ বললে, আরে আমি কি বলছি যে তুমি জানো! তুমি রাগ করছো কেন মিছিমিছি। বলে একটু কণ্ঠস্বরটা নামিয়ে আবার সে বললে, আচ্ছা কোন কৌশলে জেনে নিতে পারো আসল ব্যাপারটা কি?

ও-সব আমার দ্বারা হবে না! বলতে বলতে ঝাঁজালো কণ্ঠে অনুপমা স্বামীর কাছ থেকে দূরে ছিটকে চলে গেল। ইদানীং অনুপমার মেজাজটাও যেন কেমন রুক্ষ হ'য়ে ওঠে স্বামীর কথায়।

পত্নীপ্রেমে বিভোর, উদার-হৃদয় সতীশ স্ত্রীর এই অহেতুক বিরক্তির কারণ নির্ণয় করতে না পেরে শুধু শুধু জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, আচ্ছা আচ্ছা থাক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা অফিসের ছুটির পর সতীশ কাউকে কিছু না বলে আর এক জন বড় ডাক্তার সঙ্গে ক'রে একেবারে বাড়ীতে এসে হাজির হলো। তার পর শুভদার নাম ধরে ডাকতে লাগল নীচের ঘর থেকে। কিন্তু কারো কোন সাড়া না পেয়ে শেষে ডাক্তার বাবুকে নীচে বসিয়ে রেখে সে ওপরে উঠে গেল।

—আরে সব গেল কোথায়? বলতে বলতে সে ওপরের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল—অনুপমাও নেই, শুভদাও নেই। ঘরের দোর খোলা, সন্ধ্যে আলাও হয়নি—ঘর অন্ধকারে পূর্ণ। সতীশ অনুপমার নাম ধরে বার-কতক চেঁচিয়ে ডাকলে যদি সামনে বা পাশের কারো বাড়ীতে কোথায় গিয়ে থাকে এই মনে করে। কিন্তু তাতেও কোন সুবিধা হলো না। তখন সে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লো, অনুপমা ত কখনো এ রকম করে না, সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালার সময় কোন দিন ঘরের বাইরে থাকে না। তাই ব্যাপারটা ভালো করে জানবার জন্যে সে ঘরের আলোটা আগে জ্বাললে। তার পর আলমারীর কপাটটা ও ট্রাঙ্ক-বাক্সগুলোর চাবির কলগুলো টেনে টেনে দেখলে। সবই ত ঠিক আছে। তবে গেল কোথায় অনুপমারা—এমনি সব নানা কথা চিন্তা করতে করতে নীচে নামতে যাবে এমনি সময় দেখলে বিছানার ওপর একটা খামে লেখা তার নামের চিঠি।

তাড়াতাড়ি চিঠিখানা হাতে তুলে নিয়ে পড়তেই তার মুখ কালিবর্ণ হয়ে উঠল। চিঠিখানা হাত থেকে খসে মেঝের পড়ে গেল। সে বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবুর ডাক কানে যেতেই যেন তার চমক ভাঙল। সতীশ নীচে নেমে এসে ডাক্তারবাবুকে তাঁর ফিস্‌টা দিয়ে দিতে দিতে বললে, রোগী বেড়াতে গেছে কখন ফিরবে স্থির নেই—তাজেই আপনাকে আর ধরে রাখবো না।

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বিদায় নিতে সতীশ ওপরের ঘরে এসে একেবারে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। শেষ কালে শুভদা তার এত বড় সর্বনাশ করলে! আর অনুপমা! একবারও তার মনে হলো না সতীশের কথা! তার এত দিনের এত ভালবাসা সব ব্যর্থ হলো! শেষে কি না তাকে না বলে পালালো শুভদার সঙ্গে! সতীশ আর চিন্তা করতে পারলে না। তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে গেল! স্ত্রী ছাড়া জগতে তার আপন বলতে আর কেউ ছিল না। আর শুভদা ছাড়া অন্য কোন লেখকের লেখাও তার ভাল লাগত না। এখন সে কি করবে! কেমন ক'রে বাঁচবে! কি নিয়ে জীবন কাটাবে! কিছুই স্থির করতে না পেরে যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লো। এদিকে দেনার দায়ে তার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে আছে—শুভদার জন্যে! তার মনে ভরসা ছিল, এক দিন শুভদার যখন খুব খ্যাতি হবে তখন সমস্ত দেনা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ দিয়ে শোধ করবে! কিন্তু হায়, তার সে সব আশা মরীচিকার মত কোথায় মিলিয়ে গেল!

সতীশ সারারাত ধরে নানা রকম চিন্তা ক'রে শেষে এই স্থির করলে যে, আর সেখানে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—শুধু কেলেঙ্কারীর ভয় নয়—দেনার ভয়টাও আরো বেশী! তাই সে-দিন ভোরে টাকাকড়ি যা ছিল সঙ্গে নিয়ে একেবারে অজ্ঞাত পথে যাত্রা করলে। পৃথিবীতে আর কারুর প্রতি তার মায়া-মমতা নেই, আর কাউকে সে ভালবাসবে না! মানুষের ভালবাসা যেখানে সব চেয়ে প্রবল, অবলম্বনটাও বুঝি সেখানে তার সব চেয়ে বেশী। তাই এক সন্ন্যাস ছাড়া আর তার কোন পথ সে তখন দেখতে পেলে না।

* * * *

আট বৎসর পরে। হঠাৎ একদিন একটি জীর্ণ শীর্ণ লোক গাল-ভরা দাড়ি-গোঁফ, ময়লা জামা-কাপড় পরা, এস্‌প্লানেডের মোড়ে যে কাগজের ষ্টলটা, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় সব মাসিক পত্রিকাগুলো উলটিয়ে একাগ্রমনে শুভদা মুখুজ্যের লেখা পড়তে লাগল। লোকটির মুখের দিকে সবাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাকাতে লাগল। বিরক্ত হয়ে কাগজওয়ালা বললে, আপনি'ত কিনবেন না কেন তবে ভীড় করছেন মিছিমিছি—যারা কিনবে'তাদের পড়তে দিন!

ব্যথিত মনে সেই লোকটি তখন সেখান থেকে সরে গেল। হঠাৎ বড় ঘড়িটার দিকে চেয়েই চমকে উঠলো সে। ছ'টা বাজতে আর মাত্র পনেরো মিনিট দেরী। সেইদিন সন্ধ্যা ছ'টায় বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শুভদা মুখুজ্যেকে 'টাউন হলে' সহরবাসীরা সম্বর্দ্ধিত করবেন। সভাপতি মেয়র।

তখন আর কোন কথা না ভেবে ছুটতে ছুটতে সেই লোকটি একেবারে 'টাউন হলের' সামনে গিয়ে হাজির হলো, কিন্তু এত ভীড় যে ভিতরে ঢুকতে পারলে না। অনেক ঠেলাঠেলি ক'রে ব্যর্থ হয়ে শেষে বাইরে এসে একটা 'লাউড স্পীকারের' তলায় দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা শুনতে লাগল।

সকলের বক্তৃতার পর শুভদা মুখুজ্যের অভিভাষণ সুরু হলো। "সভাপতি মশায় ও মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী, আপনারা আজ যে সম্মান আমাকে দিলেন-আমি তার যোগ্য নই—এ শুধু আপনাদের আন্তরিক ভালবাসা—" এই পর্য্যন্ত শুনেই সেই লোকটির দু'চোখ বেয়ে দরদর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সেই কণ্ঠস্বর—সেই চির

পরিচিত কণ্ঠস্বর! তার আশে-পাশে যে সব শ্রোতা ছিল, তারা তাকে কাঁদতে দেখে পাগল মনে করে কানাকানি করতে লাগল। কিন্তু সে তেমনি অচল অটল হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল এবং বক্তার প্রতিটি কথা—তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন উৎকণ্ঠিত আগ্রহে গিলতে লাগল।

সভা ভঙ্গ হতে সেই লোকটি সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু একবার শুভদা মুখুজ্জ্যেকে চোখে দেখবে বলে। কিন্তু এত ভীড় ও ঠেলাঠেলি যে, মোটর গাড়ীর কাছে সে এগিয়ে যাবার আগেই গাড়ীটা ছেড়ে দিলে। সেই বিরাট মোটর গাড়ীটার দিকে চেয়ে সে তখন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে যেন তার সম্বিৎ ফিরে এলো। তখন সে আশে-পাশের দু'-চার জন লোককে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, উনি এখন কোথায় থাকেন বলতে পারেন?

কয়েক জন তার কথার উত্তর না দিয়েই চলে গেল। শেষে এক জন বললে, 'লেকে'র ধারে।

শুভদা মুখুজ্জ্যে এখন প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকে। উপস্থিত বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। সিনেমায়, থিয়েটারে সর্ব্বত্র তার নাটক অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করেছে। হাজার হাজার টাকা তার উপার্জ্জন! মোটর গাড়ী, দাস-দাসী অসংখ্য এখন তার। সে রীতিমত ধনী!

পরদিন সকালে সেই লোকটি খুঁজে খুঁজে লেকের ধারে গিয়ে হাজির হলো এবং একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকার ফটকে শুভদা মুখুজ্জ্যের নাম লেখা দেখে বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটা ভোজপুরী দারোয়ান এসে তাকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, কেয়া দেখ্‌তা হিঁয়া,—ভাগো।

লোকটি চমকে উঠে বললে, একবার শুভদা বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই—আমার ভিতরে নিয়ে চলো ত।

দারোয়ানটি তার বেশভূষার দিকে চেয়ে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বললে, তোমায় মত লোকের সঙ্গে বাবু দেখা করে না—যাও ভাগো জল্‌দি। এই বলে তাকে সেখান থেকে যেতে বললে।

আচ্ছা, থাক্ দেখা যদি না করে ত ক্ষতি নেই। এই বলে দারোয়ানের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, হ্যাঁ বাবা, তোমার মত দারোয়ান আর ক'জন আছে?

বিরাট গোঁফের প্রান্ত দু'টি চুমরে সে বললে, চার জন।

এ ছাড়া চাকর-বাকর ক'জন আছে?

দশ জন।

তার পর সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা এই বাড়ী, এত বড় বাগান, মোটরগাড়ী সব শুভদা বাবুর?

দারোয়ান বিরক্ত হয়ে বললে, হ্যাঁ, সব তার নয় ত কি তোমরা বাবাকা হ্যায়, যাও ভাগো জল্‌দি।

এঁ্যা, সব তার—বলিস্ কি রে—সব তার—। বলতে বলতে তার দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার ভবিষ্যদ্বাণী এত দিনে তবে কি সত্য হলো!

এমন সময় সোঁ ক'রে বিরাট একখানা মোটর গাড়ী ফটকের মধ্যে থেকে বেরিয়ে যেমন চলে গেল—অমনি রাস্তা থেকে কাদা ছিটকে উঠে সেই লোকটির সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল।

সেই গাড়ীর মধ্যে শুভদাকে সে দেখলে কিন্তু কোন কথা তার মুখ দিয়ে তখন বেরুল না। যেন সে হতভম্ব হ'য়ে গেছে!

দারোয়ানটি হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, ঠিক হ্যায়। সেই লোকটি কিন্তু তাতে এতটুকু বিরক্ত হলো না। বরং শুভদা যে মোটর-গাড়ী চড়েছে, তারই চাকার কাদা মনে করে তার সারা দেহ যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সে সস্নেহে তখন তার জামা-কাপড়ে যে কাদা লেগেছিল তার ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলুতে লাগল।

যত হাত বুলোয় তত তার চোখ দিয়ে যেন ধারা বেয়ে পড়ে।

দারোয়ানটা এবার রুখে উঠে বললে, পাগল হ্যায়—যাও, ভাগো—

সেই লোকটি তখন ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল। তার চোখ দিয়ে তেমনি ভাবে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কে সে—কেউ তার কোন পরিচয় জানতে পারলে না। সহরের জনস্রোতের মধ্যে সে কোথায় হারিয়ে গেল।

প্রাণ ও মন

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

সর্ব্ব ঘটে আছে রাম—ভূত সে-ও আছে সর্ব্ব ঘটে
স্বর্গ ত্যজি চিত্ত মোর মৃত্তিকার জয়ধ্বনি রটে।
প্রাণ উড়ে নীলাকাশে—মন যেন কাদা-খোঁচা পাখী
কখনো সে মাছরাঙা আমিষের পানে চেয়ে থাকি।
প্রাণ উর্দ্ধমুখে চায় সবিতার—উদয়ন পানে
মন-গৃধ্র শবভুক বুভুক্ষায় চায় সে শ্মশানে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৮

অভিনব এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন বিকৃষ্টে স্তম্ভের সংখ্যা কিছু অধিক হইবে। ত্র্যস্ররঙ্গপীঠে—প্রতিরঙ্গমধ্যে স্তম্ভ স্থাপনীয়। ইহারই পরেই অভিনবের টীকায় কিয়দংশ বিলুপ্ত—অতএব এই স্থলে তিনি কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

তিনি পরে আবার বলিয়াছেন যে—রঙ্গপীঠ বাদ দিয়া পীঠের অভ্যন্তরমণ্ডপ (অর্থাৎ—রঙ্গশির, নেপথ্যগৃহ ইত্যাদি) দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। রঙ্গপীঠের প্রতি কোণে এক একটি স্তম্ভ—ইহারা অষ্টহস্ত অন্তর, সংখ্যায় চারটি। তদনন্তর আর দুইটি (এ দুইটি কোথায় বসান হইবে তাহা অভিনব বলেন নাই)। এই ছয়টি স্তম্ভ পরাপর অষ্টহস্ত অন্তর। এই কথা হইতে মনে হয় যে, এই দুইটি স্তম্ভ রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে মত্তবারণী-মধ্যে ঈষৎ টেরচা-ভাবে স্থাপনীয়।

রঙ্গপীঠ বাদ দিলে উহার পশ্চাতে দ্বাদশহস্ত আয়াম (দীর্ঘ) ও দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বিস্তৃত যে অভ্যন্তর-মণ্ডপ রহিল, তাহার সম্মুখভাগে (অর্থাৎ ঠিক রঙ্গপীঠের পশ্চাতে) চতুর্হস্ত আয়াম (দীর্ঘ) ও দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বিস্তৃত যে ক্ষেত্র—তাহাই 'রঙ্গশির'। উহাতে আড়াআড়ি দুইটি তুলা (কড়ি) দিতে হইবে।

প্রতি তুলায় অষ্ট হস্ত অন্তর চারিটি স্তম্ভ—মোট দুইটি তুলায় আটটি। কিন্তু তুলা দুইটির পরস্পর ব্যবধান মাত্র চারি হাত; এই কারণে অভিনব বলিয়াছেন যে, চতুর্হস্তান্তরাল হইলেও তিরশ্চীন ভাবে (টেরচা ভাবে—আড়াআড়ি ভাবে) বিন্যাস করিতে হইবে।

রঙ্গপীঠের 'উপরি'ভাগ (১০১ শ্লোক) বলিতে বুঝিতে হইবে—'রঙ্গশিরঃ'—যাহা রঙ্গপীঠের উপরে শিরোরূপে বর্তমান। অভিনব বলিয়াছেন যে—বিকৃষ্ট মণ্ডপে রঙ্গপীঠ অপেক্ষা রঙ্গশির উন্নত—ইহা বলা হইবে "(রঙ্গপীঠস্য যদুপরি শিরোরূপমিত্যর্থঃ, তথা চ বিকৃষ্টমণ্ডপে রঙ্গপীঠাপেক্ষয়া রঙ্গশির উন্নতং বক্ষ্যতে"—অভিনব-ভারতী, পৃঃ ৬১)। উক্ত রঙ্গশীর্ষে নিয়ম করিয়া আটটি স্তম্ভ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

মূলঃ—ততঃপর নেপথ্যগৃহও প্রযত্নসহকারে কর্তব্য। আর তাহাতে রঙ্গপীঠ প্রবেশের (উপযোগী) একটি দ্বার থাকিবে। ১০৩।

সঙ্কেতঃ—প্রযত্নতঃ (বরোদা); প্রযোক্তৃভিঃ (কাশী)। অভিনব বলিতেছেন—মূলে 'দ্বারং চৈকং' থাকিলেও দুইটি দ্বার কর্তব্য ইহাই মহর্ষির আশয়। কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে "কার্য্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্য তু" (নাঃ শাঃ ২।৭৫)। অতএব, রঙ্গপীঠের পৃষ্ঠস্থানীয় যে 'রঙ্গশিরঃ'—তথায় দ্বিতীয় দ্বারও থাকিবে। দ্বার দুইটি হইলেও এক-বচন জাত্যভিপ্রায়ে ("যে দ্বারে, তেন দ্বারমিতি জাত্যাবেকবচনম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬১)। মূলে কেবল এক-বচন ত নহে, সুস্পষ্ট 'এক'—শব্দটিও রহিয়াছে—উহার গতি কি হইবে? ইহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—'এক' শব্দ এস্থলে রাশিবাচক—সংখ্যাবাচক নহে। রাশি—সমূহ। অতএব 'একং দ্বারং' অর্থে দ্বাররাশি বা দ্বারসমূহ ("এক-শব্দশ্চ রাশ্যভিপ্রায়েণ, রাশিকরণে চ নিমিত্তম্"—অঃ ভাঃ, পৃ ৬১; রাশ্যপেক্ষয়ৈকবচনম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬১)। রঙ্গশিরে এই দুইটি দ্বার নেপথ্য হইতে রঙ্গে পাত্রপ্রবেশের উপায়-স্বরূপ। কক্ষ্যাধ্যায়েও বলা হইবে দ্বার দুইটি—নেপথ্যগৃহের দুইটি দ্বারের মধ্যভাগে বাদ্য-ভাণ্ডের বিন্যাস কর্তব্য—"যে নেপথ্য-গৃহদ্বারে ময়া পূর্বং প্রকীর্ত্তিতে। তয়োর্ভাণ্ডস্য বিন্যাসঃ" (১৩২ বরোদা; কাশী ১৪।২)। এই কারণে অভিনব সিদ্ধান্ত করিলেন—দুই দ্বার রঙ্গশীর্ষে, নেপথ্য-গত পাত্র-প্রবেশার্থ; চ-কারের প্রয়োগে ইহাও সূচিত হয়—অন্তেরও প্রবেশার্থ—"তেন দ্বারদ্বয়মেব রঙ্গশিরসি নেপথ্যগতপাত্রপ্রবেশায়, চকারাদন্তপ্রবেশার্থম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬৮)। এতদ্ব্যতীত আবার তৃতীয় দ্বারও নেপথ্যের আছে—উহা পরে বলা হইতেছে। মতান্তরে—এই তৃতীয় দ্বারই জন-প্রবেশ দ্বার ("জনপ্রবেশনদ্বারং চ ত্রীণি বা কার্য্যাণি মতান্তর ইতি সংগৃহীতং ভবতি"—অঃ ভাঃ, পৃ ৬৮)।

মূলঃ—আর অন্য একটি জন-প্রবেশের (উপযোগী) (দ্বার) অভিমুখ-ভাবে করণীয়। পক্ষান্তরে, রঙ্গের অভিমুখে দ্বিতীয় দ্বারও কর্তব্য। ১০৪।

সঙ্কেতঃ—জনপ্রবেশন তৃতীয় দ্বার—ইহা নেপথ্যের তৃতীয় দ্বার—ভার্য্যাদি লইয়া নট-পরিবার ইহা দ্বারা প্রবেশ করে ("জনপ্রবেশনং চ তৃতীয়-দ্বারং নেপথ্যগৃহস্য যেন ভার্য্যামাদায় নটপরিবারঃ প্রবিশতি"—অঃ ভাঃ পৃঃ ৬১)।

এখন প্রশ্ন—মূলে আছে তৃতীয় দ্বার 'অভিমুখভাবে' কর্তব্য—কিসের অভিমুখে? উত্তর—পূর্বদিক্ অভিমুখে, পূর্বদিক্ কোন্‌টি হইবে? ত্রয়োদশাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—নেপথ্যের ভাণ্ডদ্বার যে মুখে তাহাই পূর্বদিক্—"যতো মুখং ভবেদ্ভাণ্ডদ্বারং নেপথ্যকস্য চ। সা মন্তব্যা তু দিক্ পূর্ব্বা নাট্যযোগেন নিত্যশঃ (নাট্যযোগে বিপশ্চিতা)। (১৩।১১— বরোদা; কাশী-সং—এ শ্লোকটিই নাই)। ভাণ্ড-দ্বার—যে দুই দ্বারের মধ্যে ভাণ্ড-নিবেশ কর্তব্য। ভা[illegible] রঙ্গাভিমুখ হওয়া প্রয়োজন; অতএব নেপথ্য হইতে রঙ্গপীঠ পূর্বমুখ—রঙ্গাপেক্ষায় দর্শকাসন আরও পূর্বে। আর দর্শকাসনের শেষ প্রান্তে পূর্বসীমায় দর্শকগণের প্রবেশ-দ্বার—ইহাও বলা হইল। নেপথ্যের তুলনায় রঙ্গপীঠ ও দর্শকাসন পূর্বদিকে আর দর্শকাসনের তুলনায় রঙ্গপীঠ, নেপথ্য প্রভৃতি পশ্চিম-দিকে।

এই যে দ্বিতীয় দ্বারের কথা শ্লোকটির শেষার্দ্ধে বলা হইল—ইহা রঙ্গগৃহের পূর্বপ্রান্তে—সামাজিক (দর্শক) দিকের প্রবেশার্থ ('অন্যত্তু দ্বারমাভিমুখ্যেন পূর্বস্যাং দিশি কুর্য্যাৎ দ্বারবৃত্ত্যা সামাজিকজনপ্রবেশার্থম্"—বরোদা সং অভিনবভারতী, পৃঃ ৬১)।

অতএব মোটের উপর নাট্যগৃহ হইবে চতুর্দ্বার। মতান্তরে, পার্শ্বেও অতিরিক্ত দ্বারদ্বয় কর্তব্য—যাহাতে নাট্যগৃহের মধ্যে আলোক-বাতাস আসিতে পারে ("এবং চতুর্দ্বারং নাট্যগৃহম্। অন্যে তু... অন্যদ্বারদ্বয়ং পার্শ্বস্থিতং কুর্য্যাদালোকসিদ্ধ্যর্থমিতি ষড়্‌দ্বারং নাট্যগৃহমাচক্ষতে"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭০)। এ মতে—নাট্যগৃহের ছয়টি দ্বার।

মূলঃ—আর, চতুরস্র পরিমাণতঃ অষ্টহস্ত, সমতল ও বেদিকা সমলঙ্কৃত কর্তব্য। ১০৫।

সঙ্কেত—অর্থাৎ—অষ্টহস্ত-পরিমাণ সমচতুরস্র, সমতল, বেদিকাদ্বয়যুক্ত রঙ্গপীঠ কর্তব্য। বেদিকা দুইটি শোভাযুক্ত। উহাদিগের প্রমাণ—দেড় হস্ত উচ্চ ("বেদিকে শোভাযুক্তে কার্য্যে পূর্বপ্রমাণ-[illegible]"—অঃ ভাঃ, পৃ ৭০)। বেদী দুইটি এসিবার উপযোগী আসন।

...বণিক হিসাবে ঐ সকল জনবিরল স্থানে গিয়া ... পারিবে।

জনসংখ্যা হ্রাসের প্রকৃষ্টতম পন্থা অবশ্যই জন্ম...

...বণকে জন-নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ দানের ... প্রমাণ-নির্দিষ্ট ... ত্র্যস্রেও দুইটি—পীঠস্থ বেদিকা-দ্বয়ের ... পক্ষে সম্ভব নহে। ... হস্ত দীর্ঘ ও দ্বাদশ হস্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে অষ্ট হস্ত ও উত্তর-দক্ষিণে দ্বাদশ হস্ত—রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে।

মূল :—পক্ষান্তরে, রঙ্গশীর্ষ সমুন্নত ও সম পরিমাণ কর্ত্তব্য। বিকৃষ্টে উন্নত করা উচিত। আর চতুরস্রে সম। ১০৭।

সঙ্কেত :—সমুন্নত—রঙ্গপীঠাপেক্ষায়। বিকৃষ্টে রঙ্গশীর্ষ রঙ্গপীঠ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত; আর চতুরস্রে রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষ সমতলে অবস্থিত।

চতুরস্র নাট্যগৃহের বিবরণ এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

মূল :—এইরূপে এই বিধি অনুযায়ী চতুরস্র গৃহ হইবে। অতঃপর ত্র্যস্রগৃহের লক্ষণ বলিব। ১০৮।

সঙ্কেত :—অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ত্র্যস্রবোঽস্য লক্ষণম্—বরোদা; ত্র্যস্রস্য মণ্ডপস্যাপি সম্প্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্—কাশী। মোট অর্থ প্রায় একই রূপ।

মূল :—প্রযোক্তৃগণ-কর্ত্তৃক ত্র্যস্র নাট্যগৃহ ত্রিকোণ কর্ত্তব্য। রঙ্গপীঠ ত্রিকোণই করাইতে হইবে। ১০৯।

মূল :—ঐ গৃহের দ্বার সেই কোণেই কর্ত্তব্য; আর দ্বিতীয়টি রঙ্গপীঠের পৃষ্ঠে কর্ত্তব্য। ১১০।

সঙ্কেত :—রঙ্গপীঠ ত্রিকোণ। অভিনব বলিয়াছেন—রঙ্গশির ও নেপথ্য-গৃহও ঐরূপ অর্থাৎ ত্রিকোণ। সেই কোণে—বারুণী দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে। এইটি জন-প্রবেশন দ্বার—যাহার মধ্য দিয়া ভার্য্যাদি লইয়া নট-পরিবার প্রবেশ করে। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপীঠে প্রবেশের আরও দুইটি দ্বারও কর্ত্তব্য। এই দুইটির সাহায্যে রঙ্গশিরঃ হইতে রঙ্গপীঠে প্রবেশ ও নির্গম করা যাইবে। মূলে 'দ্বিতীয়ং'—একবচনের প্রয়োগ থাকিলেও অভিনব বলিয়াছেন—চতুরস্র ও বিকৃষ্টের ন্যায় ইহাতেও দুইটি দ্বার হইবে—আর ঐ দুই দ্বারও জন-প্রবেশন-দ্বারের ন্যায় পশ্চিম দিকে হইবে—"তেনৈব কোণেন—বারুণীগতেন—দ্বারং জন-প্রবেশনং যেন; তস্মিন্নেব কোণে—দ্বারে কর্ত্তব্যে"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭০।

দ্বারং তেনৈব কোণেন কর্ত্তব্যং তস্য বেশ্মনঃ—বরোদা; ...তু প্রবেশনে—কাশী।

মূল :—ভিত্তি-স্তম্ভ-সমাশ্রিত যে বিধি চতুরস্রের, প্রযোক্তৃগণ-কর্ত্তৃক সে সকলই ত্র্যস্রের পক্ষেও প্রযোক্তব্য। ১১১।

সঙ্কেত :—চতুরস্রে যেরূপ বিধানে ভিত্তি-কর্ম্ম, স্তম্ভ-স্থাপন ইত্যাদি প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে, প্রয়োজন মত যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন সহকারে ত্র্যস্রগৃহেও সেইরূপ বিধানানুযায়ী স্তম্ভ-সন্নিবেশ ভিত্তি-স্থাপনাদি কর্ত্তব্য।

মূল :—এইরূপে এই বিধি অনুসারে বুধগণ-কর্ত্তৃক নাট্যগৃহ-সমূহ কর্ত্তব্য। পুনরায় ইহাদিগের এইরূপ যথাবিধি পূজা বলিব। ১১২।

সঙ্কেত :—অভিনব বলিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত বিধানানুযায়ী বহু মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। 'নাট্যগৃহসমূহ' অর্থে—বহু নাট্যগৃহ নহে; কারণ, নাট্যগৃহ অষ্টাদশ প্রকার হইলেও ... তিন প্রকার মাত্র—বিকৃষ্ট মধ্যম, চতুরস্র কনিষ্ঠ ও ত্র্যস্র কনিষ্ঠই ব্যবহৃত হইয়া থাকে—অবশিষ্ট পঞ্চদশ প্রকার নাট্যগৃহ অচল। বুধগণ—ঊহাপোহ-বিচার-কুশল। পুনরায়—প্রথম অধ্যায়ে পূজার সম্বন্ধে বিধানমাত্র দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ে পূজার পদ্ধতি ও উপচারাদি বলা হইবে—এই কারণে বলা হইয়াছে—'যথাবিধি'। ইহাদিগের (এষাম্—মূল)—মণ্ডপস্থ দেবতাদিগের।

পুনরেষাং প্রবক্ষ্যামি পূজামেবং যথাবিধি—বরোদা; অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পূজামেষাং যথাবিধি—কাশী।

। ইতি শ্রীভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে মণ্ডপ-বিধান নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।
(কাশীর পাঠান্তর—প্রেক্ষাগৃহ-লক্ষণ)

তৃতীয় অধ্যায়

মূল :—সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন শুভ নাট্যগৃহ কৃত হইলে (তথায়) সপ্তাহ (কাল) জপ-পরায়ণ দ্বিজগণ সহ গাভীসমূহ বাস করিবেন। ১।

সঙ্কেত :—মণ্ডপ-নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে প্রথমে পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই পূজাপদ্ধতি বা প্রয়োগক্রম এই তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

জপ্যপরৈঃ দ্বিজৈঃ (মূল)—জপপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ সহ। রক্ষোঘ্ন-মন্ত্র-জাপক ব্রাহ্মণগণ সহ। ইহাতে গৃহদোষ নষ্ট হয়।

মূল :—তাহার পর (নাট্য) গৃহ ও রঙ্গপীঠের অধিবাস করাইতে হইবে।—

নিশাগমে মন্ত্রপূত তোয়-দ্বারা প্রোক্ষিতাঙ্গ—। ২।

মূল :—যথাস্থানান্তরগত, দীক্ষিত, প্রযত, শুচি ও ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া অহতবস্ত্রধারী নায়ক—। ৩।

সঙ্কেত :—দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে দশম শ্লোক পর্য্যন্ত একসঙ্গে সম্বন্ধ। কর্ত্তৃপদ—নায়কঃ; কৃত্বা (৩য় শ্লোক), নমস্কৃত্য (৪র্থ শ্লোক—উহার কর্ম্ম—মহাদেবাদি বহু দেবতা—৪র্থ হইতে নবম শ্লোক পর্য্যন্ত), প্রণম্য, সমাবাহ্য (দশম শ্লোক)—এইগুলি উহার অসমাপিকা ক্রিয়া; আর 'বদেৎ'—সমাপিকা ক্রিয়া (দশম শ্লোক)।

তাহার পর—সপ্তাহানন্তর। অধিবাস করাইবেন কে?—নাট্যাচার্য্য। অধিবাস—দেবতার আগমন। দেবগণ যখন মণ্ডপে আসিয়া মণ্ডপের নানা স্থানে অধিষ্ঠিত হন, তখন বলা যায় যে দেবতাগণ মণ্ডপে অধিবাস (অর্থাৎ আগমন) করিলেন। নাট্যাচার্য্য ধর্ম্মানুসারে মন্ত্রপাঠাদি দ্বারা দেবতাগণকে উপনিমন্ত্রণ (আবাহন) করিলে দেবতাগণ মণ্ডপে আগমন করেন—ইহাই নাট্যমণ্ডপের ও রঙ্গপীঠের অধিবাস।

নিশাগমে মন্ত্রপূত তোয়দ্বারা প্রোক্ষিতাঙ্গ—সন্ধ্যাকালে মন্ত্রপূত জল আপনার সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিবেন (নাট্যাচার্য্য)।

যথাস্থানান্তরগত—যে যে স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহাকে রঙ্গ-পূজা করিতে হইবে, সেই সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক।

দীক্ষিত—দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক, ব্রতধারী হইয়া। প্রযত—সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়। শুচি—শরীর ও মনে শুদ্ধিযুক্ত। ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া। অহত—অখণ্ড, অচ্ছিন্ন-বস্ত্র-ধারণপূর্ব্বক। ছিন্ন বস্ত্র-ধারণে অকল্যাণ হয়। নায়ক—নাট্যাচার্য্য।

৩। নায়কোঽহতবস্ত্রধৃক্ (বরোদা); নাট্যাচার্য্যোঽহতাম্বরঃ (কাশী)।

মূল :—সর্ব্বলোকোত্তব ভব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া, ও জগৎপিতামহ, আর বিষ্ণু, ইন্দ্র ও গুহকে—। ৪ ।

সঙ্কেত :—সর্ব্বকার্য্যারম্ভে প্রথম পরমেশ্বর স্মরণ উচিত—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭৩। জগৎপিতামহঞ্চৈব বিষ্ণুং মিত্রং গুহং তথা (বরোদা); পদ্মযোনিং সুরগুরুং (কাশী)।

মূল :—সরস্বতী ও লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মেধা, ধৃতি, মতি, সোম, সূর্য্য, লোকপালগণ ও অশ্বিদ্বয়—। ৫ ।

সঙ্কেত :—ধৃতিং (বরোদা), স্মৃতিং (কাশী)। সোমং (ব); সেন্দুং (কা)। অশ্বিনৌ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়—নাসত্য ও দস্র।

মূল :—মিত্র, অগ্নি, স্বরসমূহ, বর্ণসমূহ, রুদ্রগণ, কাল ও কলি, মৃত্যু ও নিয়তি আর কালদণ্ড—।৬।

সঙ্কেত :—সুরান্ (ব)। স্বরান্ (কা)। মিত্রমগ্নিং সুরান্ বর্ণান্ রুদ্রান্···(ব); মিত্রমগ্নিং স্বরান্ রুদ্রান্ বর্ণান্···(কা)। সুরান্ অপেক্ষা স্বরান্ পাঠ ভাল ; কারণ, 'বর্ণান্' পদের সহিত উহার সামঞ্জস্য হয়। সুরান্—সাধারণভাবে সকল দেবতাই বুঝায়—উহাতে বৈশিষ্ট্য কিছু নাই ; কারণ, বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেবতাকে বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে নিবেশিত করার ব্যবস্থা ত দেওয়া হইয়াছে। নিয়তি স্থলে নির্ঋতি পাঠও পাওয়া যায়।

মূল:—বিষ্ণু-প্রহরণ, ও নাগরাজ বাসুকি, বজ্র, বিদ্যুৎ, সমুদ্রসমূহ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাসমূহ, মুনিগণ—।৭।

সঙ্কেত :—বিষ্ণুপ্রহরণ—সুদর্শনচক্র। নাগরাজং চ বাসুকিং—দুই প্রকার অর্থ হয়—(১) নাগরাজ অনন্ত ও (সর্পরাজ) বাসুকি (২) যিনি নাগরাজ তিনিই বাসুকি। পাঠান্তর—নাগরাজং খগেশ্বরম্ (কাশী)।

মূল :—[ভূতগণ, পিশাচগণ, যক্ষগণ, গুহ্যকগণ ও মহোরগগণ, অসুরগণ, নাট্যবিঘ্নগণ, ও অন্যান্য দেবরাক্ষসগণ সমূহ—। ৮ ।]

সঙ্কেত :—বরোদা-সংস্করণে অষ্টম শ্লোকটি প্রক্ষিপ্তবোধে, ব্র্যাকেট মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। কারণ, বরোদা-সংস্করণে নবম শ্লোকটির সহিত ইহার কিছু সাম্য ও পুনরুক্তি আছে। কাশী-সংস্করণে বলা হইয়াছে—"অসুরান্নাট্যবিঘ্নাংশ্চ তথান্যান্ দৈত্যরাক্ষসান্"—এ শ্লোকার্দ্ধ সকল পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। বরোদার পাঠ—'দেবরাক্ষসান্'—উহা অপেক্ষা কাশীর পাঠ 'দৈত্যরাক্ষসান্'—ভাল। কারণ, দৈত্য ও রাক্ষসের মধ্যে মিল যতটা, দেব ও রাক্ষসের মধ্যে তাহার কিছুই নাই।

মূল :—আর নাট্যকুমারীগণ ও মহাগ্রামণ্যকে, যক্ষগণ ও গুহ্যকগণ ও ভূতসঙ্ঘ-সমূহকে—। ৯ ।

সঙ্কেত :—[illegible] চ মাতৃশ্চ। যক্ষাংশ্চ গুহ্যকাংশ্চৈব ভূতসঙ্ঘাংস্তথৈব চ—এ অংশ কাশী-সংস্করণে দৃষ্ট হয় না। অভিনবগুপ্ত [illegible]—'মহাগ্রামণী'—[illegible] নাম। পাঠান্তর—গ্রামাধিদেবতাঃ।

মূল :—ইঁহাদিগকে ও অন্য দেবর্ষিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক অঞ্জলি-রচনা করিয়া, বিভিন্ন যথাযথ-স্থানগত (দেবাদিকে) সম্যগ্‌রূপে আবাহনপূর্ব্বক অনন্তর বলিবেন—। ১০ ।

অন্যা[illegible]
যথা[illegible]
ন্যাংশ্চ রাজর্ষীন্
নিমন্ত্র্যোক্তবচোঽবদৎ"

এই সকল ও অন্যান্য রাজর্ষিগণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যথাস্থান-স্থিত দেবগণকে নিমন্ত্রণ (আমন্ত্রণ) পূর্ব্বক এই বাক্য বলিয়াছিলেন। অবদৎ—ইহা কাশী-সংস্করণে ছাপার ভুল—'বদেৎ' (বলিবেন) হওয়া উচিত। অন্য—ইহা দেবর্ষিগণের বিশেষণ হইতেও পারে, আবার প্রথমাধ্যায়োক্ত অন্যান্য দেবগণকে বুঝাইতেও পারে। শেষোক্ত মত অভিনবগুপ্তের।

মূল :—ভগবদ্‌গণ-কর্ত্তৃক রাত্রিকালে আমাদিগের পরিগ্রহ করা উচিত ; আর অনুগামিগণ সহ (আপনাদিগের) এই নাট্যে সাহায্যও প্রদেয় ।১১।

সঙ্কেত :—ভগবদ্ভির্নিশায়াং নঃ (ব); ভবদ্ভির্নৌ নিশায়ান্তু (কাশী)।

প্রথমার্দ্ধের সরল অর্থ—'হে ভগবদ্‌গণ ! রাত্রিতে আমাদিগকে আশ্রয় করা আপনাদিগের পক্ষে উচিত। অর্থাৎ—রাত্রিতে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করা (ভয়হেতু হইতে অভয় প্রদান করা) আপনাদিগের কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া আপনাদিগের অনুচরগণ সহ আমাদিগের নাট্যপ্রয়োগে সাহায্য-প্রদানও করা উচিত।

মূল :—এক স্থানে সকলের সম্যগ্‌রূপে পূজা করিয়া ও কুতপ-সম্প্রয়োগ-পূর্ব্বক নাট্য-প্রসিদ্ধির নিমিত্ত জর্জ্জরের উদ্দেশে পূজা-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ১২ ।

সঙ্কেত :—একত্র (মূল)—এক স্থলে, স্থণ্ডিল-ভূভাগে (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭৩)। স্থণ্ডিল—পরিষ্কৃত, গোময়াদি-দ্বারা অনুলিপ্ত ভূমিভাগ। সম্পূজ্য সর্ব্বানেকত্র (ব); সম্পূজ্য দেবতাঃ সর্ব্বাঃ (কা); নিমন্ত্র্য দেবতাঃ সর্ব্বাঃ—পাঠান্তর। কুতপ-সম্প্রয়োগ—চতুর্ব্বিধ বাদ্যভাণ্ডের একত্র নিবেশন—জর্জ্জরের পূজার্থ অবস্থাপন ("কুতপমিতি চতুর্ব্বিধাতোদ্যভাণ্ডানি, একত্র নিবেশনং জর্জ্জরস্য পূজার্থমবস্থাপনম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৭৪)। কুতপ বলিলে বুঝায় অর্কেষ্ট্রা—চার প্রকার বাদ্যযন্ত্রের একত্র সমাবেশ। চতুর্ব্বিধ বাদ্যভাণ্ড—(১) তত (তন্ত্রী বাদ্য—তাঁতের বা তারের বাজনা—বেহালা, বীণা ইত্যাদি) (২) অবনদ্ধ (চর্ম্ম-দ্বারা সংবদ্ধ—ঢক্কা-জাতীয় বাদ্য—মৃদঙ্গ-মুরজাদি) (৩) ঘন (তাল-বাদ্য—ধাতুনির্ম্মিতবাদ্য—করতাল, পেটাঘড়ি ইত্যাদি), ও (৪) সুষির (ছিদ্রযুক্ত বাদ্য ; সুষির—ছিদ্র ; (ছিদ্রে বায়ু প্রবেশ করিলে বাদ্যটি বাজিতে থাকে, বংশী ইত্যাদি) কাশী-সংস্করণ নাট্য-শাস্ত্রের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে আতোদ্য-বিধি দ্রষ্টব্য—"ততঞ্চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেব চ। চতুর্ব্বিধন্তু বিজ্ঞেয়মাতোদ্য লক্ষণান্বিতম্। ১। ততং তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবনদ্ধং তু পৌষ্করম্। ঘনং তালস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষিরো বংশ উচ্যতে"। ২।—এই চতুর্বিধ আতোদ্য অর্থাৎ বাদ্যের একত্র নিবেশের নাম 'কুতপ'।

[ক্রমশঃ ।

মানসিক রোগ

ডাঃ সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেরই এখনও স্পষ্ট ধারণা নাই।

পথে-ঘাটে যখন আমরা বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করি তখন আমরা তাদের সম্বন্ধে সাবধান হয়ে চলি। তাদের সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি! তা ছাড়াও যারা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যবহার করে তাদের সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি "হয়ত মাথা খারাপ।"

শরীরের রোগ সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক, তাঁদের মধ্যে অনেকের ধারণা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে অথবা নার্ভ খারাপ হয়েছে—অথবা অন্য কোন শারীরিক গোলযোগ হয়েছে—যার ফলে মাথা খারাপ হয়েছে। ম্যালেরিয়া রোগে জীবাণু ধ্বংস হ'লে রোগ ভাল হয়। অনেকে সেই রকম ধরণের চিন্তা করেন—নূতন কোন জীবাণু যদি পাওয়া যায়। অনেকে নানা রকম স্নিগ্ধ ও বলকারক ওষুধ দেন—খাদ্য সম্বন্ধেও নানা রকম বিচার করেন। এই রকম গবেষণা ও অন্বেষণ হয়ত এক দিন মানুষকে এমন কোন সন্ধান দিতে পারবে, যা দিয়ে সত্যি অতি সহজেই মানুষ এই রোগ সারিয়ে ফেলতে পারবে। এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড (Endocrine gland) সম্বন্ধে খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) সম্বন্ধে ও অন্যান্য বহু বিষয়ে গভীর গবেষণা চ'লেছে এবং তার মূল্যও কম নয়। এই ধরণের চিন্তার সাহায্যে মানুষ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে অবশেষে যেখানে গিয়ে আর অগ্রসর হ'তে পারে নাই সেখানে মানুষ নূতন করে চিন্তা করেছে—নিরাশ হয় নাই। এই নূতন চিন্তা মানুষকে এক অদ্ভুত নূতন রাজ্যের সন্ধান দিয়েছে। যাঁরা অলৌকিকে বিশ্বাসী তাঁদের বিষয় আমরা আলোচনা করছি না—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র—তাঁদের সফলতা সম্বন্ধে ক্রমে আমরা আলোচনা করবো। নূতন চিন্তায় মনোজগতে এই রোগের কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে এই প্রশ্নের মীমাংসায় উন্মাদ বা বিকৃত মনের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। সামাজিক জীবনেও অনেক জটিল ও বৃহত্তর সমস্যার মীমাংসায় এই বিজ্ঞানের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য্য।

মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য-মূলক চিন্তায় ও দ্বন্দ্বে, সমাজে সমাজে বিভেদ বিরাগ ও কলহে, জাতিতে জাতিতে সন্দেহে, সংঘর্ষে মানুষ সভ্যতাকে অস্বীকার করেছে—হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা মানুষকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে—অন্যায় অবিচার, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার আজও মানুষের সভ্যতার নামেই অতি সহজ। মানুষ আজও আদিম পশুবৃত্তিতে বিশ্বাসী। মানুষের সভ্যতার গৌরব অত্যাচারীর গৌরবে, মহত্ত্বের নামে—অত্যাচার করার কৌশলে—উচ্ছৃঙ্খল মনের বিলাসিতায়। বর্ত্তমান সভ্যতার এই দৃষ্টিভঙ্গীর এমনই পরিবর্ত্তন আশা সম্ভব যে, বর্ত্তমান যুগ বর্ব্বর যুগ বলেই অভিহিত হতে পারে; বর্ত্তমান যুগ মানুষের সংগ্রামের অধ্যায়। মানুষ এক দিন স্থায়ী ভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে—এই আশা নিয়েই বৈজ্ঞানিকেরা অগ্রসর হয়েছেন।—বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মনের প্রভাব সামাজিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে, কি ভাবে উন্নতির বিঘ্ন সৃষ্টি করে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় ক্রমে আলোচন করব। প্রথমতঃ মনের রোগ সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া দরকার।

মনের রোগ সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে মন সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রধান ভাবে মনকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা যায়—সংজ্ঞান মন (Conscious mind) ও নির্জ্ঞান মন (Unconscious mind)।

এই মুহূর্ত্তে আমরা যে সব বিষয় চিন্তা করছি সে সব মনের সামনে ভাসছে। এই প্রবন্ধ পড়া হচ্ছে—এখন অন্য বিষয় আমরা চিন্তা করছি না—সুতরাং এ বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় আমরা ভাবছি না। মনের এই অংশকে আমরা সংজ্ঞান মন বলব।

পড়তে পড়তে এমন হতে পারে, হঠাৎ আমাদের মন হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে মগ্ন হ'য়ে গেছে। কখন আমাদের এমন ফাঁকি দিয়ে নূতন চিন্তা এসে আমাদের মনকে অন্য দিকে নিয়ে গেছে আমরা বুঝতে পারি না। ইতিমধ্যে হয় ত অনেকটা পড়াও হয়ে গেছে। যদি প্রশ্ন করেন—এতক্ষণ কি পড়ছিলেন—তখন হঠাৎ মনে পড়বে কতক্ষণ অন্য চিন্তা করতে করতে অজ্ঞাত ভাবে প'ড়ে চলেছি—যা পড়ছি সে সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবো না। মন যে নিজের আয়ত্তের মধ্যে নাই এ কথা বুঝতে দেরী হয় না। অভ্যাসের সাহায্যে ও অন্যান্য অনেক চেষ্টা করেও মনের একাগ্র চিন্তা সহজে আসে না। স্বাধীন ভাবে অপর কোন শক্তি মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে বসে—মনের যে অংশ থেকে এই প্রভাব আসে তাকে আমরা নির্জ্ঞান মন বলি।—আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে যত কিছু জমা হয়ে আছে—নির্জ্ঞান মন তার ইচ্ছামত সেই সব জমা জিনিষগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করে পরিচালনা করে—আমরা বেশ বুঝতে পারি। আমরা কত সময় কত কাজ করে বসি—তখন আমাদের সে কাজে কোন হাত নেই—এ কথা বোঝাতে চেষ্টা করি। ব্যাখ্যা করে বলতে হয়—হঠাৎ হয়ে গেছে—করে ফেলেছি ইত্যাদি—। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে আমরা যে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে পরিচালিত হই—এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি দুর্ঘটনা যত কিছু অস্বাভাবিক অঘটন আমাদের স্বেচ্ছায় হয় না—আমরা যেন আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাই—অজ্ঞাত অদৃশ্য চালক আমাদের পরিচালিত করে নিয়ে চলে—তখন আমরা নিতান্ত অসহায়। নির্জ্ঞান মনই আমাদের অদৃশ্য চালক। অদৃশ্য চালক নির্জ্ঞান মন যখন আমাদের বিপদে ফেলে—নানা রকম ভুল, ত্রুটি, দুর্ঘটনা এনে আমাদের বিকল করে দেয়—তখন আমরা আমাদের ব্যর্থতার জন্য আমাদের দোষী সাব্যস্ত করি না—কারণ, সংজ্ঞান মনে আমাদের চেষ্টার সত্যি কোন ত্রুটি থাকে না। অতীতের কর্ম্মের ফল অথবা ভাগ্যের কথাই মনে পড়ে। অতীতের কর্ম্মের উপরে আমাদের হাত নাই, ভাগ্যের উপরেও কোন প্রভাব নাই—এ কথা চিন্তা করলে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকে না—এই ভাবে

রায় সৌভাগ্যবান্ তাদেরও বিফলতা ও নিতান্ত ভাগ্যহীনের সফলতা আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু যেখানে আমরা এ কথা স্বীকার করি যে—কর্মের যত কিছু ফলাফল কোন বিষয়েই মানুষের দায়িত্ব নাই, সেখানে মানুষ নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করে। সেই কারণেই মানুষ ফলেরও আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না। কর্মের দায়িত্ববোধ নিষ্ক্রিয় জীবনে কঠিন ভারস্বরূপ, তা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই অনেক সময় মানুষ বলে—"কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" কর্মের ফলাফলের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার জন্য যে ভাবেই আমরা আমাদের সমর্থন করি না কেন—আমাদের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করতে যখন আমরা অসমর্থ হই তখনই আমাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। ব্যর্থতার জন্য আমরা ক্লেশ অনুভব করি না—আমাদের শক্তির পূর্ণ ব্যবহারে অসমর্থতার জন্যই আমরা অন্তরে ক্ষুণ্ণ হই। এই অসমর্থতার কারণ সজ্ঞান মনে সন্ধান করে কোনই লাভ নাই—নির্জ্ঞান মনেই তার সন্ধান পাওয়া যায়।

আমাদের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করার যে অক্ষমতা এ অভিজ্ঞতা আমাদের মনে দুঃখই নিয়ে আসে—সেই জন্যেই মানুষ দুঃখের অভিজ্ঞতাকে মনে স্থান দিতে চায় না—নির্জ্ঞান মনকেও অস্বীকার করে। এই কারণেই নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে মনে যেন একটা ঐকান্তিক বাধা আসে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই অন্তর্নিহিত বাধার কারণ কি? মানুষ যে কারণে ভুল ভ্রান্তি করে ও জীবনের ব্যর্থতাকে বরণ করে নেয়—সেই কারণ জানা গেলে মানুষ তার অন্তর্নিহিত বিঘ্ন থেকে মুক্ত হতে পারে—মানুষের মুক্তি একমাত্র অন্তর্নিহিত অজ্ঞানতার বন্ধন থেকেই মুক্তি। অন্তর্নিহিত অজ্ঞানতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত না হলে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ কি? ব্যর্থতা ও পরাজয়ে মানুষ কি আকাঙ্ক্ষা করতে পারে; ব্যর্থতা মানুষের শাস্তিস্বরূপ। নীরবে মানুষ শাস্তি গ্রহণ করে—শাস্তির যেন প্রয়োজন আছে। মানুষ অন্যায় ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করে—দান, ধ্যান, পূজা, অর্চনা মনের শান্তির জন্যই। অতীতের অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা মানুষের মনকে পীড়িত করে বলেই মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়—অজানা অপরাধের জন্য মানুষ কাতর ভাবে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মনের অজানা রাজ্যের কল্পলোকে কাল্পনিক কারণেই মানুষ যেন শাস্তি গ্রহণ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করে। অদৃশ্য অজানা নির্জ্ঞান মনের অন্তর্নিহিত কল্পনায়—অদ্ভুত মনঃ সৃষ্টির (Phantasy) প্রভাব থাকে। মনের এই অংশকে অধিশাস্তা (Super-ego) বলা যায়। বংশানুক্রমিক ভাবে ও শৈশব থেকেই অসংখ্য সামাজিক বাধা-নিষেধ মানুষের জীবনকে পরিচালিত করে। সম্ভবতঃ সেই ধারণা থেকেই মানুষের মনে অধিশাস্তা জন্মগ্রহণ করে।

বাধা-নিষেধের কথা আমরা বলেছি—প্রশ্ন হচ্ছে কার সম্বন্ধে, কোন্ শক্তির বিরুদ্ধে এই সামাজিক বাধা-নিষেধ এসে উপস্থিত হয়। মানুষের মনের অপর একটি শক্তির বিরুদ্ধে এই বাধা-নিষেধের প্রশ্ন আসে। মানুষের মনের যে অংশে এই শক্তির উৎস থাকে সেই অংশকে ইচ্ছাসমষ্টি বা ইদ্ (Id—অদম্) বলা হয়। এই ইদের বিরুদ্ধেই অধিশাস্তা দণ্ডায়মান হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, মানুষের মনে প্রত্যেকের মধ্যেই যৌন মিলনের ও বহুগামিতার (Polygamy) আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষের এমন কামনা

পারে ...

চায়। উন্মু...

রক্ষা করাই অধি...

দেয়—এক দিকে ইদের ... অধিশাস্তার নীরব কঠোর আদেশের প্রভাব আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মনের এই প্রকৃতিকে উভয় বলতা (ambivalence) বলা যায়। উভয় বলতাই ব্যর্থতা এনে দিতে পারে। জীবনের প্রতি স্তরেই উভয় বলতার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

অধিশাস্তা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে সামাজিকতার দিকে আকর্ষণ করে রাখে—কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখাও হবে, অধিশাস্তা ত্রুটি-হীন নয়। এই জন্যই অনেক সময় সামাজিক নিয়ম রক্ষা করার জন্য অধিশাস্তা অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়ে। অধিশাস্তাই মানুষের মনে অতিরিক্ত অন্যায় বোধ এনে দেয় মানুষ অন্যায় করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যস্ত হয় অত্যন্ত কঠোর ভাবে জীবন যাপন না করে শান্তি পায় না—এমন কি মৃত্যুকে বরণ করতেও দ্বিধা করে না। অধিশাস্তার অতিরিক্ত শাস্তির ফলে মানুষের মনের বিকৃতি দেখা যায়। অধিশাস্তার মূর্তি যেন শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ তাপসেরই মূর্তি—রূঢ় কঠোর।

ইদের কথা—ইদ যেন ছেলে মানুষ—আবদারে শিশু—কোন জ্ঞান নাই—আছে কেবল একগুয়েমী জেদ—তা ভিন্ন অপর কিছুই সে জানে না। জেদ করলেই ত সব সম্ভব হয় না। কিন্তু সম্ভব হোক আর নাই হোক—ইদের কোন বুদ্ধি নাই। বাস্তব জগতের সঙ্গে ক্রমাগত বাধা পেয়ে আঘাতে আঘাতে কঠোর অভিজ্ঞতায় ইদের এক অংশের চৈতন্য হয়—বিবেচনা করতে পারে বাস্তব জগতে কি কত দূর সম্ভব—ইদের এই অংশকে অহম্ (Ego) বলা হয়। মনের এক অংশ জানে আমি কে—কার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক—আমার ক্ষমতা কত দূর। অহমের মূর্তি অনেকটা বিবেচক পথ-প্রদর্শকের মূর্তি। অধিশাস্তা ও ইদের মধ্যে মধ্যস্থতা করা অহমেরই কাজ।

ইদের পরিণতি বিবেচনা করে দেখা যাক। মনে করুন, ইদের অসামাজিক ইচ্ছার প্রকাশ পেল। অবৈধ প্রণয়ের জন্য ইদ প্রণয়িনীর কাছে যাবে। অবৈধ প্রণয় অসামাজিক এ কথা অহম্ বোঝাতে ত্রুটি করল না—ইদ সে কথা বুঝল না—ইদ তার জেদ্ ছাড়ল না। নিরুপায় হয়ে দুর্গম রাস্তায় গভীর রাত্রে অহম্ ইদকে যথাস্থানে পৌঁছে দিলে। ইতিমধ্যে অধিশাস্তার ইদের কাণ্ড জানতে বাকী রইল না সবই কানে গেল।—ইদ তখন প্রণয়িনীর বাড়ীর সামনে এসেও প্রবেশ করতে পারল না—কেমন গা ছম্-ছম্ করতে লাগল—কি এক অজ্ঞাত ভয়। অধিশাস্তার প্রভাবে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব।

ইদের এই অবৈধ বাসনার অপর এক পরিণতি সম্ভব। এই বাসনা সামাজিক মঙ্গল কাজেও পরিণতি লাভ করতে পারে। ইদ্ যদি তার শক্তি ফল মূল উৎপাদনের চেষ্টায় নিয়োগ করতে পারে—অবৈধ বাসনা মহৎ ও উন্নত কাজে পরিণত হতে পারে। ইদের গতি পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন। এই কাজে অহম্ যখন সফল হয় অতি নিম্নস্তরের ইচ্ছা সামাজিক মহৎ কাজ সম্ভব হয়—এই উন্নত মহৎ পরিণতিকে উৎপত্তি (sublimation) বলা হয়।

...না পারে
...যে ইদের গতি
...নানা অদ্ভুত লক্ষণ
...রীরিক রোগ লক্ষণের
পশ্চাতে...সম্ভব নহে...। সাধারণ শারীরিক রোগ চিকিৎসার এইখানেই চিকিৎসক অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়ে যান। আতঙ্ক রোগের লক্ষণে ও অন্যান্য মানসিক রোগে কিছুটা শারীরিক রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সব রোগ লক্ষণকে বিপরিণামী লক্ষণ (Conversion Symptoms) বলা হয়। মূর্চ্ছা-রোগে এই রকম লক্ষণ দেখা যায়। এই সব রোগ চিকিৎসার কথোপকথনই প্রধান চিকিৎসা। এই চিকিৎসাকেই মনঃ সমীক্ষণ (Psycho-analysis) বলা হয়। মনঃ সমীক্ষণের সঙ্গে কর্ম্মের সাহায্যে চিকিৎসাই (Occupational Therapy) মানুষকে জীবনে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—জীবনে কামনা পূর্ণ করাই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। শৈশব হতেই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে শৈশবের প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখার উপরেই মানুষের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। নীরব শান্ত শিষ্ট বালক সকলেরই প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু দুরন্ত বালক "ডানপিটে" আখ্যা লাভ করে—তারা প্রায়ই ঘরের জিনিষ কেটে ভেঙ্গে নষ্ট করে বসে থাকে। এখানে জানা প্রয়োজন, শিশুর মধ্যে যে ইদ বসে আছে সে অত্যন্ত বেপরোয়া। শিশু বা বালক যেখানে ধ্বংস করেই আনন্দ লাভ করে, মানুষকে আঘাত করেই আনন্দ অনুভব করে, অপরের প্রতি 'নিষ্ঠুরতার (Sadism) আনন্দ—এ কথা বোঝা প্রয়োজন। অহম্ যখন এই ইচ্ছাকে সামাজিক মঙ্গল কর্ম্মে নিয়োজিত করে তখন এই আঘাতের বাসনা সেবার ন্যায় মহৎ কর্ম্মে পরিণত হতে পারে। দুরন্ত বালকের সেবার মূর্ত্তি গ্রহণ করাই সম্ভব। এই ভাবেই বড় বড় অস্ত্র-চিকিৎসক শত শত মানুষের প্রাণ রক্ষা করছেন। তরবারির দুরন্ত নিষ্ঠুর আঘাতে মানুষ যেখানে মস্তক ছিন্ন করেছে—সেখানে এই অহিংসবাদের চিন্তা সামাজিক মঙ্গলের সম্ভাবনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কর্ম্মের মধ্যেই ইদ ঊর্দ্ধগতি লাভের সুযোগ লাভ করতে পারে।

নির্জ্ঞান মনের সব কথাই মনের ভেতরে চাপা লুকোন থাকে—সহজে জানা যায় না। নির্জ্ঞান মন অজানা রাজ্যে প্রবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ—অতি কৌশলে নির্জ্ঞান মনকে জানতে পারা যায়—পরে আলোচনার বিষয়। এইবার মনের রোগ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। [ক্রমশঃ।

—নাম—

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার খাতার এক কোণে
হয়তো আনমনে
অলস খেয়ালে লিখেছিলে
দুইটি অক্ষরে তব নাম।

যে নাম লিখেছি কত বার
যে নামে ডেকেছি কত বার
কত যে বিকালে রাতে
কত ছন্দে সুরে
বর্ষার দুপুরে
কানে কানে অবিরাম।

তবু মনে হোল এ শুধু তা নয়,
এ দুটি অক্ষর ঘিরে
আরো আছে সহস্র বিস্ময়
এত দিন পাইনি ঠিকানা
এত যে রহস্য বাকি
ছিল না তো জানা।

দেশান্তর পার হয়ে
পার হয়ে প্রাচীন সীমানা
এ কোন্ দ্বারের কাছে
এসে পৌঁছিলাম।

নারী

নারী-হৃদয়ের সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা, ঘাত প্রতিঘাত, নারী-হৃদয়ের অতি গোপনতম রহস্যটির সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তিনি দরদভরা দৃষ্টি লইয়া নারীর হৃদয়ের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াছেন, তিনি নারীর দরদী বন্ধু।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে বলিয়াছেন কল্যাণী।

"বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্প-কানন মাঝে
হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহ-কাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে
সর্ব্ব শেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

পুরুষের প্রেয়সী, সন্তানের জননী, গৃহের গৃহিণী নারী আপন মহিমায় মহিমান্বিতা।

"প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণডালা ধরি।"—"কল্যাণী"

মমতাময়ী নারী তাহার কল্যাণস্পর্শে পুরুষের জীবন স্নিগ্ধ মধুর করিয়া রাখে, তাহার প্রাণে নিত্য নব উৎসাহ, নব প্রেরণার সঞ্চার করে। সে পুরুষের সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী। পুরুষ যখন নারীকে কেবল মাত্র তাহার ভোগের ও বিলাসের সামগ্রী মনে করিয়া তাহাকে আপন অধিকারের মধ্যে বাঁধিয়া তাহার ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া ওঠে, তখন নারীর অন্তরও বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। পৌরুষের দম্ভের পদতলে নারীর অবলুণ্ঠিত আত্মমর্য্যাদা বিধাতার নিকট আবেদন জানায়—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা!" —"সবলা"

চিরদিন অন্তঃপুরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, নারীকে সকল আলো বাতাস হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার চারি ধারে নিষেধের গণ্ডী টানিয়া পুরুষ ধীরে ধীরে নারীর প্রাণশক্তি শোষণ করিয়া লয়। "অন্যের ইচ্ছা বোঝাই করা জীবন" তাহার দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে—

"শুনি নাইতো মানুষের কি বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা।
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।" —"মুক্তি"

এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের অপেক্ষা মৃত্যুই হইয়া ওঠে তাহার অধিক কাম্য—

"মনে হচ্ছে সেই চাকাটা ঐ যে থামল যেন,
থামুক তবে, আবার ওষুধ কেন।" —"মুক্তি"

অন্তঃপুরের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে যে নারী তিলে তিলে আত্মদগ্ধ হইয়া মরিতেছে তাহার হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার 'ফাঁকি'তে দেখি, মৃত্যুপথযাত্রিনী 'বিনু' [illegible] 'বাংলা মঙ্গল' করিতে চলিয়াছে। এই

সুযোগ—"নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে" যে জীবন এত দিন একটানা স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল তাহা আজ বাহিরের আলোকের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইল—

"আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশভরা সকল আলো ধরে
বর-বধূরে নিল বরণ করে।" —'ফাঁকি'

সামাজিক আচার এবং সংস্কারের দোহাই দিয়া যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালার নারীর উপর যে পীড়ন চলিয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে ক্ষুব্ধ ব্যথিত করিয়াছে। তাঁহার নিষ্কৃতি তো দেখি মঞ্জুলীর পিতা মঞ্জুলী'র মায়ের অশ্রু, অনুরোধ সব উপেক্ষা করিয়া 'মঞ্জুলী'র বিবাহ দিলেন এমন এক পাত্রের সহিত যে তাঁহার কন্যাপেক্ষা বয়সে "পাঁচগুণের বড়।" এই নিষ্ঠুরতার মূলে হইতেছে পিতার সমাজে ওঠার দুর্দমনীয় লিপ্সা—

"বাপ বললে কান্না তোমার রাখো
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে
জানো না কি মস্ত কুলীন ও যে,
সমাজে তো উঠতে হবে, সেটা কি কেউ ভাবো,

মুছিয়া [illegible] সুখে দুঃখে দিন যায়, ক্রমে বাল-বিধবার কৈশোর উত্তীর্ণ হইল, যৌবন আসিল—

অবশেষে হোলো
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
কখন শিশুকালে
হৃদয়লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি।
জানতো না তো আপনাকে সে
শুধায়নি তার নাম কোন দিন
বাহির হ'তে ক্ষ্যাপা বাতাস এসে
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে,
সে যে প্রেমের ফুল,
আপন রাঙা পাঁপড়ি ভারে আপনি সমাকুল।
আপনাকে তার চিনতে যে আর নাই কো বাকি,
তাই তো থাকি থাকি
চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশ-পারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায়
আলোর ঝরণা বেয়ে,
রাতের অন্ধকারে
কোন অসীমের রোদন ভরা বেদন লাগে তারে।

যৌবনের অপূর্ব্ব অনুভূতি বিধবা মঞ্জুলিকার "কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জল-ভরা এক ছায়া।" মঞ্জুলিকার মা মেয়ের ব্যথা বুঝিলেন—

"মায়ের স্নেহ অন্তর্য্যামী তার কাছে ত রয় না কিছু ঢাকা।"

তিনি স্বামীর নিকট কাতর মিনতি জানাইলেন—

"যার খুসী সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্ব'রে
আমি কিন্তু পারি যেমন ক'রে
মঞ্জুলিকার দেবোই দেবো বিয়ে।"

মঞ্জুলিকার পিতা আমাদের তথাকথিত ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুসমাজের এক জন, তিনি এ প্রস্তাব হাস্য-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ শাস্ত্রপরায়ণতা এবং লোকাচারের নাম দিয়া নারীর প্রতি এই চিরাচরিত নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ঐ মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে
তোমার পুঁথির শুকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ
[illegible]।"

যে নারীকে বারবনিতা আখ্যা দিয়া, সমাজ ও সংসারের [illegible] দিয়া, চিরদিন ধরিয়া তাহাকে আপনার লালসারিপুর [illegible] পাইবার উপায়স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছে, সেই দুর্ভাগিনীর [illegible] সুপ্ত নারীত্বের সন্ধান পাইয়াছেন দরদী রবীন্দ্রনাথ। [illegible]তে তিনি দেখাইয়াছেন, পুরুষ আপনার দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া নারীকে পঙ্কে নামাইয়া তাহাকে আপনার স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেও পতিতার অন্তরের এক কোণে সুপ্তাবস্থায় থাকে এক মহিয়সী নারী। পতিতাকে তুমি ধূলায় ফেলিয়া রাখিয়াছ, বলিয়াই সে পতিতা, তাহাকে তুলিয়া নারীর আসনে বসাও, মর্য্যাদার অবমাননা সে করিবে না, পতিতা হইবে নারী [illegible]।

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

(অপর্ণা ব্যানার্জ্জী)

বাঙ্গালী যেখানে তাহার স্বাতন্ত্র্য লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানেই সে বিশেষ আসন লাভ করিয়াছে এবং ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্যের মূল। তাহার পূজা, উপাসনা, অর্চ্চনা; তাহার যাগ, যজ্ঞ, হোম, আরতি; তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, ভাষা গৌরব, গরিমা, জাতি-কুল-মান, ফেরঙ্গ সভ্যতায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণের দ্বারা আলোচিত হয় নাই বলিয়া তাহার নিজেকে সম্যক্ পরিচয় পায় নাই। এই পরিচয়ের প্রয়োজন হইলে বাংলার সমাজ, ধর্ম্ম, সাধনাকে বুঝিতেই হইবে।

বাঙ্গালী সকল দিক হইতেই নিজেকে পৃথক্ করিয়াছে। তাহার নিজস্ব ভাবধারা তাহাকে প্রাধান্য দিয়াছে। ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন আমরা বাংলার আগমনী গান হইতেই পাই। আগমনী গান ভারতের আর কোথাও নাই। কোন জাতি এমন করিয়া গান রচনা করিতে পারে নাই। কোন জাতি এমন করিয়া গান গাহিতে জানে না। সাধনার দিক হইতে সুরের দোলা দিয়া এত নিবিড় ভাবে ভালবাসিতে পারে নাই। বাঙ্গালী এই আগমনী গানকে কেন্দ্র করিয়া ভাষা ও সুরের মাধুর্য্যের ভিতর, ছন্দের কলতানে যে আনন্দ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কোন দিন কেহ কখনও করিতে পারিবে না। মেনকার মেয়েকে এই বাঙ্গালী ঘরে ঘরে মায়ের আসন দিয়াছে। প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। প্রকৃতির আনন্দ সত্তায় যে মাধুরিমা, সেই মাধুরিমাকে মধুর করিয়া আগমনীর সাজ পড়িয়াছে। তাই আজ বাংলার আগমনী বাঙ্গালীর অন্তরের একান্ত আপনার। বাংলা ভাষা বাঙ্গালার অপূর্ব্ব সম্পদ। এই সম্পদের সঠিক পরিচয় জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া প্রাচীন ইতিহাসের শুধু পাতা উল্টাইলেই যে হইবে তাহা নয়। একনিষ্ঠ সাধকের মত ভাষার কমল বনে ভাবসাধনায় বিভোর হইয়া আচার্য্যের গীত আর দোঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত অনুধ্যান করিতে হইবে। এই অনুধ্যানই বাংলা সাহিত্যের ভিতর বাঙ্গালী জাতির যে ইতিহাস তাহা বাহির করিয়া দিবে। কবির গান, পাঁচালীর [illegible] শ্যামা সঙ্গীত, কীর্ত্তন, গাথা, স্তব, স্তোত্র প্রভৃতি কত যে মধুর ছন্দের মধুরতর ভাব-সম্পদ জাতির কৃষ্টিকে রূপ দিয়াছে [illegible]। সেই আলোকের রশ্মিকণাই আজ বাংলার [illegible] বৈশিষ্ট্যের প্রাণ-[illegible]

[illegible] হিসাবে ঐ সকল জনবিরল স্থানে গিয়া বসবাস করিতে পারিবে।

জনসংখ্যা হ্রাসের প্রকৃষ্টতম পন্থা অবশ্যই জন্মশাসন। বর্তমানে জনসাধারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহ দানের নীতি অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যবিভাগের মারফৎ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন যাহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহ দান করা হইবে। অতিরিক্ত সন্তান প্রসবের দরুণ যে সকল স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা এবং যে সকল স্ত্রীলোক যথেষ্ট সময় ব্যবধানে সন্তান প্রসব করিতে ইচ্ছুক, মেয়ে-ডাক্তারগণ প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রে ঐ সকল স্ত্রীলোককে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রণালী শিক্ষাদান করিবেন।

জনসংখ্যার সমস্যাকে কমিশন একটি গুরুতর সমস্যা বলিয়া মনে করেন বটে—কিন্তু কমিশনের মতে প্রাথমিক সমস্যা হইল কৃষি ও শিল্পের অনুন্নত অবস্থা। ইহার প্রতিকার অতিশয় কষ্টসাধ্য বটে, তথাপি কমিশন মনে করেন যে, ক্রমবর্দ্ধমান জনগণের বাঁচিয়া থাকার পক্ষে আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সম্ভব তো বটেই, জনসাধারণের খাদ্যমানের উন্নতিসাধনও সম্ভব।

পুষ্টির সমস্যা

কমিশন স্বীকার করেন যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভারতবর্ষে অস্বাস্থ্য আধি-ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাবল্য বর্তমান। কোনও কোনও খাদ্যের অভাবে যে সকল রোগের উৎপত্তি হয়, ভারতবর্ষে ঐ সকল রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

এইরূপ অনুমান হয় যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও ভারতবর্ষের শতকরা ৩০ জন পর্য্যাপ্ত আহার পায় না এবং অবশিষ্টের মধ্যেও বহু লোকের খাদ্য স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী নহে। কাজেই ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মতালিকার একটি প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত পুষ্টিকর আহার্য্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। সুসমঞ্জস ও সন্তোষজনক খাদ্য-বস্তুর ব্যবস্থা করা জনসাধারণের একটি বিরাট অংশেরই সাধ্যাতীত; সুতরাং জীবনরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি না হইলে এবং [illegible] জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাইলে খাদ্যের উন্নতিসাধন সম্ভবপর নহে। কমিশন [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; উহাতে [illegible]

[illegible]

গোল আলু, মিষ্টি আলু, সকর-কন্দ আলু [illegible] পর্য্যালোচনা করিয়া কমিশন এই মত প্রকাশ [illegible] জমির উপর চাপ যখন খুব বেশী তখন [illegible] হইতে যাহাতে সর্বাধিক লাভ পাওয়া যায়, সেই [illegible] করা উচিত। তাহা করার একটি উপায় হইল [illegible] মাপে গোল আলু প্রভৃতি আবাদ করা। [illegible] ক্যালরি হিসাবে এই সকল ফসলের যাহা প্রধান [illegible] গুলির উপরে বসিয়া এই সকল ফসল আবাদ করিলে [illegible] সমপরিমাণ সবজি ও ক্যালরির সংস্থান হয়। সুতরাং [illegible] ফসল আবাদের দিকে নজর দেওয়া হইবে, অন্যান্য [illegible] করিয়া শরীররক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক ফসল আবাদের জন্য [illegible] পরিমাণ জমি পাওয়া যাইবে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য

কমিশনের মতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য উৎপাদক [illegible] উভয়ের পক্ষে ন্যায্য হারে রক্ষা করা যুদ্ধোত্তর কৃষি [illegible] প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জটিল বিষয়ের সমস্ত দিক [illegible] করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

নীতি রচনা কমিটির বৃত্তি, [illegible] এবং [illegible] (বিলাদি) বিষয়ক সাব-কমিটি ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত [illegible] বিবেচনা করিতেছেন:—(ক) উৎপাদকগণের ন্যায্য মূল্য [illegible] করণ সম্পর্কিত নীতি; (খ) এই ভাবে নির্দিষ্ট মূল্য [illegible] উপায় এবং ঐ মূল্যে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য [illegible] ব্যবস্থা করুন। যুদ্ধকালে ভারতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ [illegible] অবলম্বিত ব্যবস্থাদি হইতে নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতা [illegible]

(ক) প্রতি ৫ একর আবাদী জমির মধ্যে চারি [illegible] খাদ্যশস্যের চাষ হয় এবং যে পরিমাণ [illegible] তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ [illegible] সুতরাং ধান, চাউল এবং গমের মূল্য [illegible] মূল্যসংক্রান্ত সমস্যার মূল কথা।

(খ) যুদ্ধকালের অব্যবহিত [illegible] গমের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া [illegible] মূল্য যাহাতে স্থির থাকে তাহার ব্যবস্থা [illegible] পণ্যের মূল্য এই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব [illegible] গমের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য [illegible] করিতে [illegible]

[illegible]

অতএব উহার পরিচালনা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা আবশ্যক।

উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা

আংশিক বেকারত্বই (অর্থাৎ সর্বসময় কম না থাকা) পল্লীর বৈষয়িক জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

অন্যান্য ব্যবস্থাসহ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহের সমবায়ের দ্বারা ঐ সমস্যার সমাধান সম্ভব :—(ক) সেচ, উন্নত ধরণের বীজ, সারদান প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে ব্যাপকভাবে চাষ আবাদের বন্দোবস্ত করা; (খ) কুটীরশিল্পের প্রসার সাধন; (গ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বালচাঁদ নগরের আদর্শে কৃষি-শিল্প প্রবর্তন; (ঘ) করস্থাপনপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা এবং সরকারী অর্থসাহায্যসহ গঠিত পঞ্চায়েৎ মারফৎ পল্লীর পূর্ত্তকার্য্য সংগঠন ব্যবস্থা; (ঙ) অতি বসতিবহুল অঞ্চল হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বসতিসম্পন্ন অঞ্চলে গমন (চ) জল-বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নতি করিয়া ব্যাপক ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠা।

কমিশনের অভিমতে ছোট এবং মাঝারি গৃহস্থের ক্ষেত্রে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, তাহাদিগকে লইয়া বহু উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট দায় সহ পল্লী সমবায় সমিতি সংগঠন করিতে হইবে এবং ঐ ভাবে সংগঠিত সমবায় সমিতিগুলি বহু উদ্দেশ্যবিশিষ্ট অথচ নির্দিষ্ট দায়সম্পন্ন সমবায় সমিতি ইউনিয়ন গঠন করিতে হইবে। এই কার্য্য অতি বিপুল।

সুতরাং কমিশন এই সুপারিশ করিতেছেন যে প্রত্যেক প্রদেশে কতিপয় নির্বাচিত অঞ্চলের সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থা পর্যালোচনার ব্যবস্থা করিয়া এবং উহার ফলাফলের ভিত্তিতে পল্লীর বৈষয়িক অবস্থা উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া সমবায় সমিতি ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত কার্য্য আরম্ভ করা হউক। এই ভাবে প্রণীত পরিকল্পনা বহু উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া কার্য্যকরী করিতে হইবে।

প্রদেশসমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি ও কার্যপরিচালনা সম্পর্কে যোগাযোগ রক্ষার জন্য কমিশন নিম্নলিখিতরূপ সুপারিশ করিয়াছেন :—

(ক) মন্ত্রিমণ্ডলের একটি উন্নয়ন কমিটি গঠন।

(খ) উন্নয়ন বিভাগ ও অর্থবিভাগের সেক্রেটারীদের লইয়া একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠন।

(গ) জেলা অফিসারের অধীনে জেলার সমস্ত উন্নতিমূলক কার্যের সমন্বয় সাধন।

নূতন আদর্শ চাই

অতঃপর রিপোর্টে নূতন আদর্শ ও নূতন শপথ গ্রহণ করার আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় [illegible] আছে; কিন্তু [illegible] জনসাধারণের [illegible] কেবল ঐ পথে অগ্রসর হওয়া যায়। দেশবাসীর মনে এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে উচ্চাদর্শ থাকিলে তাহার ফলে এইরূপ চেষ্টায় সাফল্যলাভের আশা করা যায়। অতীতে কর্ম্মবিমুখতা এবং পরাজিতসুলভ মনোভাব যথেষ্ট ছিল। মূল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের যোগ্য কি না এই বিষয়েই সন্দেহ ছিল। দুঃখদারিদ্র্য ও অনশনকে স্বাভাবিক ঘটনাচক্র বলিয়াই অধিকাংশ সময় লোকে মানিয়া লইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের দুরবস্থাজনিত নৈরাশ্য এখনো বিদ্যমান। শাসক অথবা শাসিতের মনের ভাব যদি এইরূপ হয় তবে তাহা প্রগতির পক্ষে বিঘ্নকর হইয়া দাঁড়ায়। ভাবী কালের প্রতি দূরদৃষ্টি বা আস্থার ভাব না থাকিলে কোন কাজই করা যায় না।

বাঙ্গালার শরৎচন্দ্র

বাঙ্গালার সর্বজনপ্রিয় নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু দীর্ঘ দিন কারাবাসের পর মুক্তি পাইয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে আজ কঠোর কর্ত্তব্যের দিগন্ত বিস্তৃত কণ্টকাকীর্ণ পথ। মন্বন্তর ও মহামারীতে মুমূর্ষু বাঙ্গালাদেশ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। আত্মিক দুর্গতি ও পারস্পরিক দলাদলির পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত বাঙ্গালাদেশ তাঁহার অভাব

অনুভব করিতেছে। তিনি আজ তাঁহার প্রিয় বাঙ্গালার ম্রিয়মাণ জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসুন। ঐক্যের ও বীর্য্যের পথে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। তাঁহাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। মরণোন্মুখ বাঙ্গালা আবার বাঁচিয়া উঠুক।